দশটি উপন্যাস

দশটি উপন্যাস

সুবোধ ঘোষ

সপ্তর্ষি
সপ্তর্ষি
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৭০

প্রকাশক :
ভোলানাথ দাস
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ প্রবীর সেন

মুদ্রাকর :
প্রদ্যুৎকুমার মান্না
বিশ্বকর্মা প্রেস
২/১/এ, আশুতোষ শীল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

দশটি উপন্যাস

সুজাতা

শালবনে ঘেরা এই ছোট শহরের কিনারায় ওই শান্ত বাংলোবাড়িটার নীরব বাতাস আজকাল যখন তখন গুনগুন ক'রে ওঠে। গুনগুন করে একটা দোলনা-দোলানো আর ঘুম-পাড়ানো গান। কখনও আয়া, আর কখনও বা স্বয়ং চারুই গান করে।

প্রায় এক বছর হল, একটি দোলনা দুলছে এই বাড়ির ভিতরে। চারুর মনের এতদিনের একটা স্বপ্নই যেন সত্য হয়েছে।

বিয়ের পর প্রায় দশটা বছর ধরে শুধু বই পড়ে পড়ে, কাঁটা-কুরুশ নেড়েচেড়ে, সিল্কের আর উলের ফুল তুলে তুলে, আর বাংলোর লনে মরশুমি ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে যেন হাঁপিয়ে পড়েছিল জীবন। তার পরেই এক নতুন বেদনায় চারুর চোখ দুটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেদিন একটা নতুন প্রাণের কান্না বেজে উঠল চারুর বুকের কাছে, সেদিন যেন নতুন ক'রে হেসে উঠল চারুর ওই হাঁপিয়ে-পড়া জীবন।

যে চারু যখন তখন এই বাংলোবাড়ির নিভৃতে যে কোনও একটা সোফায় ঘুমিয়ে পড়ত, ঘুমোতে ভালবাসত যে চারু, সেই চারুই এখন যেন সারাটা রাত জেগে থাকতে ভালবাসে। কারণে অকারণে আর যখন তখন ছোট্ট একটি এক বছর বয়সের মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালই লাগে চারুর। ব্যাপার দেখে হেসে ফেলে উপেন। ঘুম ভাঙালে এত রাগ করত যে ঘুম-কাতুরে চারু, সে আজ কেমন জব্দ হয়েছে।

চারুও বলতে ছাড়ে না।—মশাই বা কি কম জব্দ হয়েছেন!

উপেন বলে—আমার জব্দের কী দেখলে?

চারু—অফিস থেকে আর ক্যাম্প থেকে এখন সন্ধের আগেই ঘরে ফিরতে হচ্ছে কি না?

উপেন আর প্রতিবাদ করে না। করতে ইচ্ছাও করে না। চারুই আবার একটা পুরনো অভিমানের জের টেনে হেসে হেসে কথা শোনায়।—যাক, তবু যে মেয়ের টানে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরছ, এটাও কি আমার কম ভাগ্যির কথা।

উপেন—শুধু কি মেয়ের টানে?

চারু—রাখুন মশাই, আর কথা বাড়াবেন না। সে সব কথা কিছুই ভুলিনি। রাত ন'টা পর্যন্ত অফিসের ফাইল না ঘাঁটলে ঘুম আসত না যার চোখে, ঘরে যে একটা মানুষ আছে সেকথা ভুলেও একবার ভাবতে পারত না যে মানুষ...।

উপেন—কিন্তু ন'টা বছর ধরে অফিসে যেতে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিন আমাকে লেট হতে হয়েছে কেন, কিসের টানে?

চারুর একটা হাত টেনে ধরতেই উপেনের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে চারু, কিন্তু পারে না। হেসে ফেলে চারু। আজকাল এই বাংলোবাড়ির ভিতরে প্রতি সন্ধ্যাতেই এই রকমই মিষ্টি হাসির ঝঙ্কার বেজে ওঠে। দোলনার কাছে এগিয়ে যেয়ে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে দুজনেই তাকিয়ে থাকে।

এখনও এক বছর বয়স হয়নি, কিন্তু উপেন ও চারুর ভালবাসার জীবনের যে স্বপ্ন আজ স্নিগ্ধ সুন্দর ও কোমল একটি ফুলের মত রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে আর দোলনায় দুলছে, তার একটা নামও

দিয়ে ফেলেছে চারু। ওর নাম রমা।

উপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা রহস্যের কথা বলতে গিয়ে ঝক্ ক'রে হেসে ওঠে চারুর চোখ। —স্বপ্নের মধ্যেই হঠাৎ ওই নাম ধরে মেয়েটাকে ডেকে ফেলেছিলাম, তাই।

যখন তখন দোলনার কাছে এসে ঘুমন্ত রমাকে কোলের উপর তুলে নিয়ে বসে থাকে চারু। রমার গালে গাল ঠেকিয়ে দুর্নিবার এক আদরের আবেশে যেন মুগ্ধ হয়েই ডাকতে থাকে চারু—রমা রমু রম। রমা, এই ডাকটা যেন চারুর বুকের ভিতর থেকেই মধুরতার বিহ্বল শোণিতের শিহর হয়ে আপনা থেকেই ভাষা হয়ে ফুটে উঠেছে।

আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখতে থাকে উপেন। তার পরেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে হিংসুকের মত একটা আগ্রহ নিয়ে।

—দাও, দাও ; ওকে আমার কাছে দাও। তুমি ওই সোফায় বসে এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

চারুর হাত থেকে রমাকে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতর পায়চারি ক'রে বেড়ায় উপেন।

বৃথাই একটা আয়াকে রাখা হয়েছে। নানা কথার মাঝখানে উপেন হঠাৎ আক্ষেপ করে—তুমিই যদি দিনরাত এটাকে ঘাঁটাঘাঁটি করবে, তবে পয়সা খরচ ক'রে আয়া রাখবার দরকার কী ?

চারু বলে—ওসব স্টাইল আমার সহ্য হবে না। আয়া রাখবার দরকার নেই। আয়া-ফায়ার হাতে মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারব না।

ঠিক কথা। এক বছরের মধ্যে শুধু মাঝে মাঝে দোলনা দোলানো ছাড়া আয়াকে আর কোনও কাজ করতে দেয়নি চারু। আয়ার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে চারুর অন্তরাত্মা।

উপেন অনুযোগ করলে চারু প্রতিবাদ করে—না, না, এ কাজ পরকে দিয়ে হয় না।

—কেন ?

—কেন আবার কী ? নিজের মনের আনন্দকে যেমন পরকে দিয়ে হাসিয়ে নেওয়া যায় না। তোমার পয়সা বাঁচবার ইচ্ছে থাকলে আয়াকে বিদায় ক'রে দিতে পারো।

এই ভাবেই রমা নামে মাত্র এক বছর বয়সের শিশু ওই মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে এই বাংলোবাড়ির হাসি গান অভিযোগ আর ঝগড়া সবই যেন মিষ্টি সুরে বাজে। ওই রমারই জন্মদিন দেখা দিল একদিন। শালবনে ঘেরা ছোট শহরের কিনারায় রেল-ইঞ্জিনিয়ার উপেনের বাংলোবাড়ির লনের উপর উৎসবের আয়োজন রঙিন হয়ে উঠল।

মাইল পাঁচেক দূরে এক পাহাড়ি নদীর স্রোতের উপর রেলওয়ের জন্য ব্রিজ নির্মাণের পর্ব চলছে এখন। বিকাল হবার আগেই ঘরে ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল উপেন। ক্যাম্পের অফিসের খাতাপত্র সই করে বাইরে এসে দাঁড়ায় উপেন। ওভার্শিয়ার এসে সম্মুখে দাঁড়ায়।

ওভার্শিয়ার খুশি মনে জানায়—সুসংবাদ আছে স্যার।

সুসংবাদ এই যে, কাজ ছেড়ে দিয়ে আর কোনও কুলি পালিয়ে যায়নি। কারণ কলেরার ভয় কমে গিয়েছে। ডাক্তার এসে পড়েছে। ওষুধ-পত্র দেওয়া হয়েছে। জল ফিলটার করার ব্যবস্থা হয়েছে। মাত্র দুটো মৃত্যু হয়েছে কাল রাত্রে। আর নতুন ক'রে কোনও কেসও হয়নি, মৃত্যুও হয়নি।

খুশি মনে ট্রলির উপর উঠে বসে উপেন। পা চালায় ট্রলিম্যান। ছাতার ছায়ায় বসে উপেন দু'পাশের ফোটা-পলাশের শোভা দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার পরেই নিজের হাতের ফাইলের ভিতর থেকে ছোট একটি ফটো বের করে মুগ্ধ চোখের সামনে তুলে ধরে এক বছর বয়সের একটি মেয়ের মুখের ছবি। হেসে ওঠে উপেনের সারা মুখ।

বাংলোর বারান্দায় যখন উপেনের পায়ের শব্দ বেজে উঠল, তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। লনের উপর টেবিল সাজাতে আরম্ভ করেছে বয় আর বেয়ারা। আর, ঘরের ভিতর আয়ার সঙ্গে চারুর তর্ক চলছে।

আয়া বলে—বেবিকে আমার কাছে এখন দাও মেমসাব। তুমি তোমার কাজ করো।

চারু বলে—আমার আবার কাজ কী এখন ?

আয়া বাইরের বারান্দার দিকে চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বলে—শুনতে পাচ্ছ না, সাহেব এসে পড়েছেন।

হ্যাঁ, শুনতে পায় চারু, বারান্দার দিক থেকে উপেনের পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে এই ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। রমাকে নিয়ে আয়া চলে যেতেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করে উপেন।

গলার টাই-কলার খুলতে খুলতে উপেন একটা ধূর্ত দৃষ্টি তুলে চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—আজ তা হলে তোমার মেয়ের জন্মদিন।

চারু—আজ তোমার মেয়ের জন্মদিন।

উপেন—তার পর ?

চারু—তার পর মানে ?

উপেন—তার মানে আর এক বছর পর ?

চারু—আবার জন্মদিন হবে রমার।

উপেন—আমি জানতে চাই, প্রত্যেক বছর কি শুধু রমারই জন্মদিন হবে ?

চারু ভ্রূকুটি করে—সাবধান।

উপেন—কী ?

চারু—আর নয়। একটিকে নিয়েই মায়ার জ্বালায় মরছি, চোখের ঘুম পর্যন্ত ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। এই একটিই ভাল। রক্ষে করুন ভগবান, আর চাই না।

গায়ের শার্ট খুলে হুকের সঙ্গে দুলিয়ে দিয়ে চারুর মুখের দিকে তাকাতেই চারুর চোখে পড়ে একটি জিনিস। উপেনের কনুইয়ের কাছে সুতো দিয়ে বাঁধা একটি মাদুলি।

চমকে ওঠে চারুর চোখ—সর্বনাশ ! ওটা তুমি এখনও পরে রয়েছ ?

ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে এবং মাদুলিটাকে খুলে ফেলবার জন্য হাত বাড়ায় চারু, কিন্তু উপেন সরে যায়। —থাক না, তাতে কি হয়েছে ?

চারু—না আর নয়।

উপেন—কী যে বল ? পিসিমার দেওয়া এমন একটা পয়া জিনিস, গুরুজনের ইচ্ছের অমান্যি করতে নেই। একদিন তুমিই না রাগ করেছিলে, এই মাদুলি পরতে চাইনি বলে ?

চারু—আর রাগ করব না।

উপেন—কেন ?

চারু—মাদুলির কাজ তো হয়েই গিয়েছে।

উপেন সরে যায়, কিন্তু চারু ছাড়ে না। স্বামী-স্ত্রীতে একটা ধস্তাধস্তির মতই ব্যাপার বেধে ওঠে এই বাংলোবাড়ির এক কক্ষের নিভৃতে।

—না, আর নয়, রক্ষে করুন ভগবান। বলতে বলতে সজোরে উপেনের হাতটা চেপে ধরে মাদুলিটা এক টান দিয়ে খুলে ফেলে চারু, আর ব্লাউজের গলার ফাঁক দিয়ে টুপ করে ফেলে দেয়। সরে যায় চারু। —বেঁচে থাক আমার ওই একটিই, আর চাই না।

যেন পাল্টা একটি মিষ্টি প্রতিশোধ নেবার জন্য চারুর কাছে এগিয়ে আসতে থাকে উপেন। অকস্মাৎ বাইরের বারান্দায় ধ্বনিত হয় একটা কণ্ঠস্বর। —হুজুর !

বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ায় উপেন। উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

আবার ডাক শোনা যায়। —হুজুর।

জানালার কাছে এগিয়ে এসে কৌতূহলের চক্ষু নিয়ে বাইরের বারান্দার দিকে তাকায় উপেন, চারু প্রশ্ন করে—কী ?

উপেন—একটা মেয়ে।

চারু বিস্মিত হয়—মেয়ে ?

উপেন—হ্যাঁ, রমার মতনই।

চারু—তার মানে ?

উপেন—এই এক বছর বয়স, সামান্য কিছু বেশিও হতে পারে, এইটুকু একটা মেয়ে।

বারান্দার প্রান্তে এক কোণে একজন চৌকিদার আর দুজন দীন-দরিদ্র চেহারার কুলি শ্রেণীর মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। আর, বারান্দায় মেঝের ওপর শোয়ানো ছিল এক টুকরো ছেঁড়া কম্বলে জড়ানো দেড় বছর বয়সের একটা ঘুমন্ত মেয়ে।

ধমকের মত কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করে উপেন।—কী চাও ?

চৌকিদার—এই মেয়েটার কী হবে হুজুর ?

উপেন—তা আমি কী জানি। ওটা কার মেয়ে ?

একজন কুলি—আপনার ট্রলি-কুলি বুধনের মেয়ে।

উপেন—বুধন ? সেই ভাল্লুকে আঁচড়ানো মুখ, রোগা লোকটা ?

কুলি—হুজুর।

উপেন—লোকটা কি পালিয়েছে ?

চৌকিদার—মরেছে।

উপেন— অ্যাঁ ?

চৌকিদার—লোকটা মরেছে, লোকটার বউটাও মরেছে।

উপেন—কেমন ক'রে ?

চৌকিদার—কলেরাতে।

উপেন—কিন্তু, আমার অপরাধটা কী হল ? এখানে ওদের মেয়েকে নিয়ে এসেছ কেন ?

চৌকিদার—কোথায়, কার কাছে থাকবে মেয়েটা ?

ধমক দেয় উপেন—আমি কী জানি।...যাও যাও। সরে পড়ো।

মোটর গাড়ির হর্ন শোনা যায়। রমার জন্মদিনের উৎসবে নিমন্ত্রিতেরা একে একে আসতে আরম্ভ করেছে। উপেন আরও ব্যস্ত হয়ে হাঁক দেয়—যাও যাও, চলে যাও। এখানে এসে গোলামাল করো না।

ব্যস্তভাবে একটা শার্ট গায়ে চড়িয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় উপেন, উৎসবের আসরে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করার জন্য। চৌকিদার আর কুলি দুজনে কম্বলে জড়ানো শিশুকে নিয়ে লনেরই আর এক প্রান্তের শেষ কোণে এক গাছের তলায় গিয়ে বসে থাকে।

এতক্ষণ ধরে অপলক চোখ নিয়ে আগন্তুক মেয়েটার দিকে দেখছিল চারু। মাঝে মাঝে ছটফট করছিল চোখ দুটো। উপেন চলে যেতেই, কেন যেন ব্যস্তভাবে একবার ডাক দিল চারু—আয়া, আয়া।

আয়া আসতেই আবার বারান্দায় এসে দেখতে পায় চারু, চলে গিয়েছে লোকগুলি।

আয়া প্রশ্ন করে—কি ?

চারু—কিছু না।

আয়ার হাত থেকে রমাকে কোলে নিয়ে লনের উপর সাজানো আসরের দিকে এগিয়ে যায় চারু।

চায়ের আসর। অভ্যাগতরা রমাকে আদর করলেন। একটা টেবিলের উপর নানা উপহারের এক স্তূপ তৈরি হয়ে গেল। বয় চা পরিবেশন করে। অভ্যাগতেরা আলাপ করেন।

মাত্র দশ বার জন অভ্যাগত। কতিপয় মহিলাও আছেন। সকলেই সম্পন্ন সমাজের মানুষ। কেউ অফিসার, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ জমিদার। একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, বেশির ভাগ অভ্যাগতেরই সঙ্গে একটি করে কুকুর। কারও কোলের উপর সুন্দর একটি তিব্বতি পুড্‌ল। কেউ শিকল ধরে কাছে টেনে রেখেছেন তাঁর প্রিয় হাউণ্ড আর টেরিয়ারকে। কারও স্প্যানিয়েল সামনের দু'পা দিয়ে প্রভুরই গলা জড়িয়ে অনবরত কান দোলায়।

নিজের নিজের কুকুরের প্রতি কার কত মায়া তাই নিয়ে একটা আলোচনার কলরব জাগে আসরে। কার কুকুর কি খেতে ভালবাসে আর কত বুদ্ধিমান, ব্যাখ্যা করে বলতে থাকেন অভ্যাগতেরা। সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রীতির কাহিনী বর্ণনা করেন এস-ডি-ও চক্রবর্তী। কুকুরের মুখের কাছে একটি বিস্কুট এগিয়ে দেন চক্রবর্তী। কুকুরটা কামড় দিয়ে বিস্কুট ভাঙে। সেই ভাঙা বিস্কুট

নিজের মুখেই ফেলে দিয়ে চক্রবর্তী বলেন—আমার টম সারা রাত আমার বুকের উপরেই শুয়ে থাকে। এ যে কি মায়া, সেটা আর বুঝিয়ে বলতে পারব না। আশ্চর্য, কোথা থেকে এরকম মায়া আসে মানুষের মনে !

আসরের চায়ের টেবিলের কাছে কখনও বসে, আর কখনও ঘুরে বেড়াতে থাকে উপেন আর চারু। এরই মধ্যে হঠাৎ মাঝে মাঝে দুজনেরই চোখের দৃষ্টি ছুটে যায় লনের প্রান্তে একটা গাছতলার দিকে, যেখানে তখনও চুপ করে বসে আছে চৌকিদার, সেই দুজন কুলি, আর ঘাসের উপর শোয়ানো ও কম্বলে জড়ানো সেই শিশু।

মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যায় উপেন আর চারু। একটা অস্বস্তির ভাব হঠাৎ বিচলিত করে চোখের দৃষ্টি। তারপর আবার প্রসন্ন হাস্যে অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ করে।

বেয়ারাকে কাছে ডেকে উপেন দূরের গাছতলার দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দেয়—ওদের চলে যেতে বলো।

চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন—কে ওরা ?

উপেন—কোথা থেকে একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসে বলছে...।

সাগ্রহে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান চক্রবর্তী—লেপার্ডের বাচ্চা ?

উপেন—না।

চক্রবর্তী—হরিণের ? আমি জীবজন্তুর বাচ্চা বড় ভালবাসি মিস্টার বায়।

উপেন হাসে—না, না, হরিণের বাচ্চা-টাচ্চা নয়।

গাছতলাব দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ব্যস্তভাবে চক্রবর্তী বলেন—ভাল্লুকের বাচ্চা বোধ হয়।

উপেন বাধা দিয়ে বলেন—মানুষের বাচ্চা।

—মানুষের বাচ্চা ! হতাশ হয়ে আর যেন ক্ষুদ্র একটি তুচ্ছতার ধিক্কার ধ্বনিত করে বসে পড়েন চক্রবর্তী।

উৎসবের আসর ভাঙতেই লনের প্রান্তে গাছতলায় বেয়ারার গর্জন শুনে এগিয়ে যায় উপেন আর চারু। উপেন বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে চৌকিদারকে বলে—এই নাও, আর এই মুহূর্তে ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে যাও।

চৌকিদাব বলে—যাব কোথায় হুজুর ? এই মেয়েকে এই তল্লাটেই কেউ ঘরে রাখতে রাজি হবে না।

—কেন ?

—খুব ছোট জাতের মেয়ে। কাছাকাছি দশ গাঁয়েও ওই জাতের কোনও লোক নেই।

—অন্য গাঁয়ে খোঁজ করো।

—করব হুজুর, কিন্তু সেই কটা দিন কোথায় থাকবে মেয়েটা ?

একজন কুলি বলে—মেয়েটাকে তো শেয়ালে নিয়েই যাচ্ছিল, ভাগ্যিস আমরা হঠাৎ পৌঁছে গেলাম।

চারুর চোখ আতঙ্কে ও বেদনায় শিউরে ওঠে। উপেনও যেন অস্বস্তি আর অপ্রস্তুত অবস্থায় বার বার চারুর মুখের দিকে তাকাতে থাকে।

উপেন আমতা আমতা করে চারুকে উদ্দেশ করেই বলে, যেন একটা পরামর্শ খুঁজছে উপেন—তা হলে...যাকগে...এসব ঝঞ্ঝাট...কী বলো... নিয়েই যাক।

চারু—কিন্তু...কী বলছ তুমি ? শেয়ালে নিয়ে যাবে মেয়েটাকে ?

উপেন—না, তা বলছি না। কিন্তু...।

চারু ডাক দেয়—আয়া।

উপেন যেন এতক্ষণে সাহস পেয়ে আরও জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—আয়া।

আয়া আসতেই চারু বলে—মেয়েটাকে কটা দিন পুষতে পারবে ?

আয়া—পারব না কেন, আমার কাজই তো তাই।

চারু—তা হলে নিয়ে চলো মেয়েটাকে। ...গরম জল দিয়ে চান করিয়ে একটা গরম জামা কাপড় পরিয়ে দাও এখনই।

চৌকিদার ও কুলিরা খুশি হয়ে আভূমি প্রণত হয়ে সেলাম জানায়—সেলাম সাব, সেলাম মেমসাব।

উপেন আর চারু, দুজনেই যদি নিজের নিজের মনটাকে চিনতে পারত, তবে বোধ হয় দুজনে আজই সাবধান হয়ে যেত, এবং অরণ্য শ্বাপদের শাবকের মত অতি ছোট জাতের একটা মেয়েকে এই বাংলোবাড়ির এক নিভৃতে প্রাণবাঁচানো একটা আশ্রয় দিত না। উপেন জানে, চারুও বিশ্বাস করে, এই ঝঞ্ঝাট মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য। তারপর, নিকটে বা দূরের গাঁয়ের ওই জাতের কোনও লোক খুঁজে বের করে মেয়েটাকে তার হাতে গছিয়ে দিতে হবে। তার জন্য হয়ত কিছু টাকা চাইবে লোকটা। নিক না, একশো বা দুশো টাকা নিয়ে কোনও জাতের লোক যদি মেয়েটাকে পুষতে নিয়ে যায়, তবে ভালই তো। চৌকিদার বলে গিয়েছে, জাতের লোক খুঁজে আনবে! উপেন বলে দিয়েছে—যত শিগগির পারো নিয়ে এসো।

এই বাংলোবাড়ির সীমার মধ্যে একটা মানুষের মেয়ের আবির্ভাবকেও অতি সাধারণ একটা ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করেছে চারু আর উপেন। এই বাড়ির দেওয়ালের খোপের মধ্যে যেমন কদিনের জন্য নতুন শালিক এসে ঠাঁই নেয়, আবার কদিন পরেই উধাও হয়ে যায়, তেমনি একটা ঘটনা মাত্র। মেয়েটা আছে, কদিন পরে কেউ এসে নিয়ে যাবে, বাস, এর চেয়ে বেশি কিছু চিন্তা করার ব্যাপার এর মধ্যে নেই।

ক্লাবের ঘড়িতে যখন রাত নটার ইঙ্গিত ঢং করে বেজে ওঠে, তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিলিয়ার্ড খেলার লাঠি থামায় উপেন, আর ঘরে ফিরে যাবার কথা মনে পড়ে।

বাংলোবাড়ির দুই কক্ষে তখন দুটি শিশু-জীবনের ঘুমন্ত রূপ নিঃশব্দে ফুটে রয়েছে। একটি ঘরে চারুর বুকের কাছে ঘুমন্ত রমা, পীযূষভারে কোমল একটি উত্তাপের নীড়ের মধ্যে সুখসুপ্ত হয়ে রয়েছে একটি শিশু মেয়ে। আর, অন্য একটি ঘরে আর একটি শিশু মেয়ে, নতুন বিছানায় একা একা ঘুমোয়, তার তৃষ্ণার্ত অধরের কাছে দুধের বোতল শিথিলভাবে পড়ে রয়েছে। একটি শিশু হল এই বাড়ির এক দম্পতির শোণিতস্নেহের সৃষ্টি। আর একটি শিশু—দেখে মনে হয়, এই পৃথিবীতে যেন একা একা হঠাৎ চলে চলে এসেছে, এখনও মানুষের কোল পায়নি। বাংলোবাড়ির দেয়ালঘড়িতে একতারার সুরের টোকার মত রিম-রিম করে সময়ের সঙ্কেত বাজে। চমকে ওঠে চারু, তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে, আর আপন মনেই আক্ষেপ করে—ইস, ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান আর কোনও দিন হবে না। ন'টা বাজল, এখনও ঘরে ফেরার নাম নেই।

কি যেন মনে পড়ে যায় চারুর। ধীরে ধীরে ওঠে। পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। এই বারান্দা আর ও বারান্দা পার হয়ে ছোট একটি ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় ঠেলা দেয়। দেখতে পায়, মেঝের উপর পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে আয়া। তার পরেই ঘরের আর এক প্রান্তে দৃষ্টি ছুটে যায়। দেখতে পায়, সদ্য ফোটা ফুলের কুঁড়ির মত একটা ঘুমন্ত মেয়ের মুখ, তার ঠোঁটের কাছ থেকে সরে গিয়েছে দুধের বোতল। একটা স্নেহশীল শীতল ও কঠিন জড় পদার্থ ওই বোতলটা।

যেন মনের ভুলেই হঠাৎ দুধের বোতলটাকে মেয়েটার মুখের কাছে এগিয়ে দেবার জন্য হাত তুলে এগিয়ে যায় চারু। কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে থমকে দাঁড়ায়। থাক, এতটা বাড়াবাড়ির দরকার নেই। তা ছাড়া একটা ছোট জাতের বাচ্চাকে ছোঁয়াছুঁয়ি করারও দরকার মনে পড়ে না। আয়াকেই ডাক দেয় চারু। ঘুম থেকে উঠে আয়াই নিজের হাতে দুধের বোতলটাকে মেয়েটার মুখে ছুঁইয়ে দেয়।

পায়ের শব্দ বাজে বাইরের বারান্দায়। ফিরে এসেছে উপেন। সোফায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে হাঁক দেয় উপেন—সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি এরই মধ্যে।

চারু এসে বলে—কী বললে ?

উপেন—মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি ?

চারু—রমাও ইঞ্জিনিয়ারিং করে নাকি, যে রাত ন'টা পর্যন্ত জেগে থাকবে ?

উপেন—আমি তোমার মেয়েটার কথা জিজ্ঞেস করছি না। ওই যে, নতুন একটি অম্বালিকা এসেছে...সেই মেয়েটা।

চমকে ওঠে চারু—বেশ তো, মুখে মুখে সুন্দর একটা নামও দিয়ে ফেললে দেখছি।

উপেন—হ্যাঁ, নামটা হঠাৎ মুখে এসে গেল, কী করব বল ? রমার নামটাও তো তুমি হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে বলে ফেলেছিলে, না ?

গম্ভীর হয় চারু—হ্যাঁ।

উপেন—কী করছে অম্বালিকা ?

চারু—আয়ার ঘরে ঘুমোচ্ছে।

যে পিসিমার দেওয়া মাদুলি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হাসাহাসির ব্যাপার হয়ে গেল, তিনি হলেন উপেনের দূর সম্পর্কের পিসিমা। শ্যামবাজারে এখনও সেকেলে ঢঙের চক-মিলান যেসব দালান বাড়ি দেখা যায়, এবং তারই মধ্যে যে বাড়িটা আজও পুরনো সৌষ্ঠব নিয়ে অটুট হয়ে রয়েছে, সেই বাড়িটা হল পিসিমার বাড়ি। পিসিমারই সম্পত্তি। সংসারে একটি মাত্র স্নেহের দায় আছে পিসিমার, তার নাম অধীর। পিসিমার নাতি। পিসিমার একমাত্র মেয়ের একমাত্র ছেলে। মেয়ে মারা যাবার পর এই নাতিকে কোলে নিয়ে শোক ভুলেছিলেন পিসিমা।

অসুস্থ শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য, অর্থাৎ চিকিৎসকের নির্দেশে হাওয়া বদল করতে মাঝে মাঝে ছোট নাগপুরের শালবনের কোলে ছোট পাহাড়ের গা-ঘেঁষা, সুবর্ণরেখার এক স্রোতের ধারে এই ছোট রেল-টাউনে এসে আত্মীয় উপেনেরই এই বাংলোবাড়িতে থেকে যেতেন পিসিমা। পিসিমা এখানে এসেও নাতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে মাঝে মাঝে সংসারের মায়ার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। চারুর ছেলে-পিলে হয় না, চারুর সংসারটাকেই তাই বড় মায়াহীন আর শূন্য বলে মনে হয়েছিল পিসিমার। কিন্তু এইবার খুশি হয়েছেন, এতদিনে এই বাড়ির বুকে এক শিশুর কান্নায় সংসারের মায়া জেগে উঠেছে। সার্থক হয়েছে তাঁর মাদুলি।

সেই কবে, মাত্র দু'মাস বয়সের রমাকে আদর ক'রে একদিন চলে গেলেন পিসিমা। যাবার আগে অনেক কথাই বলে গেলেন পিসিমা। কলকাতায় কবে বাড়ি করবে উপেন, কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন। সমাজের কথা বলেন, এইটুকু শিশু রমারও ভবিষ্যতের অর্থাৎ বিয়ের কথা বলেন। নিজের বংশগর্বের উল্লেখ করে উপেনকে স্মরণ করিয়ে দেন, রমাকে বড় বংশের ঘরে দিতে হবে। বংশে বড়, বিষয়ে বড়, শিক্ষায় বড়, এমনই একটি ঘরে। পিসিমার কথার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যেন একটা উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং মনে হয়, বড় বলতে তিনি তাঁরই ঘরের কথা বলছেন। উপেনের টাকাকড়ি বেশ আছে, পিসিমা ভুলতে পারেন না সেই সত্যও।

কলকাতা থেকে এক বিখ্যাত কথকঠাকুরকে নিয়ে এসে এখানেই এক বছর বয়সে রমার জন্মমাসের সারা মাসটাই বেশ ঘটা করে চণ্ডীপাঠ করাবেন, এই আনন্দের একটা ইচ্ছা জানিয়ে চলে গিয়েছেন পিসিমা। কিন্তু আজও আসতে পারেননি। মাসটা যে শেষ হতে চলল। কেন এলেন না পিসি। তিনি কি আবার বাতের ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েছেন ? চিঠি দেওয়া হয়েছে পিসিমাকে, কিন্তু সে চিঠির উত্তর আজও এল না কেন ?

উপেন আর চারুর চিন্তার প্রশ্নগুলিকে নিশ্চিন্ত করে দিয়ে সেদিনই কলকাতা থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে উপস্থিত হলেন সেই বিখ্যাত কথকঠাকুর। গঙ্গাজলে ভরা প্রকাণ্ড একটা তামার কলসী নিজের হাতেই বহন করে স্টেশন থেকে এতটা পথ হেঁটে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন পিসিমার চিঠি। নাতি অধীরের পরীক্ষা, তাই আসতে পারলেন না পিসিমা।

কথকঠাকুর বললেন—কথকতা আমার পেশা নয়। আমি সত্যিই কথক নই। বলতে পারেন, ধর্মপ্রবক্তা। আমি ইংরাজির অধ্যাপক। চণ্ডীপাঠ করি নিজের মনের তৃপ্তির জন্য, এবং যারা ধর্মের তত্ত্ব একটু কষ্ট করে বুঝতে চায়, তাদের জন্য। শুনে একটু যেন ঘাবড়েই যায় উপেন, এবং সত্যিই বোকা ছাত্রের মত একটু ভয় পেয়ে বলে ফেলে—নিশ্চয় কষ্ট করে বুঝতে চাই স্যার। থাকুন আপনি, আর যতদিন ইচ্ছে চণ্ডীপাঠ করুন।

অধ্যাপক বলেন—শুনেছি জায়গাটার হাওয়া বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ, অন্তত পনেরোটা দিন থেকে·দেখি

শরীরটা একটু...অর্থাৎ চণ্ডীর অন্তত দুটো অধ্যায় সমাপ্ত করার পর... ।

কিন্তু কি আশ্চর্য, মাত্র আর একটা ঘন্টা পরেই দেখতে পায় উপেন ও চারু, ইংরাজির অধ্যাপক গঙ্গাজলের সেই প্রকাণ্ড কলসী হাতে নিয়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। উপেন ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—সে কী ? আপনি চলে যাচ্ছেন যে ?

অধ্যাপক তাঁর কপালে টোকা দিয়ে বলেন—যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু যেতে হল। আপনার আয়ার কাছে শুনলাম এবং স্বচক্ষেও দেখলাম, আপনি একটা অন্ত্যজের মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসে লালন করছেন।

উপেন—আশ্চর্য !

অধ্যাপক—আশ্চর্য হতে নেই উপেনবাবু। ধর্মবিধিতে বলে, অন্ত্যজের স্পর্শও শুধু দোষাবহ নয়, তার সান্নিধ্যও দোষাবহ। শুধু ছোঁয়াছুয়ি নয়, ওসব বস্তু নিকটে রাখাও চলে না। আপনি শিক্ষিত বিদ্বান মানুষ, নিশ্চয় জানেন যে, সায়েন্সেও এই ভয়ের কথা লেখা আছে।

উপেন—কী কথা ?

অধ্যাপক—অন্ত্যজ মানুষের শরীর থেকে একরকমের গ্যাস বহির্গত হয়, সে গ্যাস সদ্বংশীয়ের দেহ মন ও আত্মার ক্ষতি সাধন করে।

উপেন—এরকম গ্যাস কি কখনও দেখতে পাওয়া গেছে ?

অধ্যাপক—না। আপনি কি কখনও ভাইটামিন দেখেছেন ? ভাইটামিন চক্ষে দেখতে পাওয়া যায় কি ?

উপেন—না।

অধ্যাপক হাসেন—তা হলে ভাইটামিন কি মিথ্যা ?...আচ্ছা, আসি, বিদায় নিতে আজ্ঞা দিন তা হলে।

চলে গেলেন ধর্মপ্রবক্তা অধ্যাপক। চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করতে গিয়েই হেসে ফেলে উপেন। কিন্তু চারু হাসতে পারে না। চারু বলে—আমার সত্যিই কেমন ভয় করছে।

উপেন—কিসের ভয় ? অম্বির শরীর থেকে যে ভয়ানক গ্যাস বের হয়ে আমাদের দেহ মন ও আত্মার একেবারে... ।

চারু—ঠাট্টা ছেড়ে দাও। ভদ্রলোক একটি বেলাও না থেকে, মুখে একটু জলও না দিয়ে চলে গেলেন, এটা কি ভাল হল ?

উপেন—আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলব, খুব ভাল হল। এই সব গোবর মাখানো সায়েন্সকে যারা বিশ্বাস করে তাদেরই অকল্যাণ হয়। ওইরকম লোকের কাছ থেকে চণ্ডীর ব্যাখ্যা শুনেও কোনও কল্যাণ হয় না।

হ্যাঁ, একটা কথা ভাবতে খারাপ লাগছে উপেনের। পিসিমা দুঃখিত হবেন। পিসিমা খুব বেশি রাগ করেও ফেলতে পারেন। যাই হোক, পিসিমার পক্ষে বেশি দিন রাগ করে থাকা সম্ভব হবে না কারণ, যাকে নিয়ে এই সমস্যা, সে আর এখানে কতদিন ?

স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা হয়। একটা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা। এই আলোচনা শুনলে মনে হয় দুটি মানুষ যেন নিজের মনটাকে সন্দেহ করতে পারছে।

উপেন বলে—সমস্যাটা কী জানো ? কুকুর বেড়ালও দশটা দিন কাছে থাকলে মায়া পড়ে যায় আর এটা তো হল মানুষের মেয়ে। ছোট জাতের হোক, আর যারই হোক, একটা মানুষের বাচ্চা তো বটেই। বেশিদিন কাছে রাখা উচিত নয়।

চারু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে—ঠিকই বলেছ। আমি আয়াকে বলে দিয়েছি। মেয়েটাকে দূরে দূরে রাখবে।

উপেন—হ্যাঁ, ওসব জিনিসের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি ছোঁয়াছুঁয়ি না হওয়াই ভাল।

চারু—জাতটাও তো ভাল নয়।

উপেন—আসল কথা হল, ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই একটা মায়া পড়ে যেতে পারে।

এই আলোচনা শুনলে মনে হয়, নিজের নিজের মনকে চিনতে পেরেছে দুজনেই, তাই আগে

থেকেই সাবধান হবার জন্য যেন প্রতিজ্ঞা করছে দুজনে।

আবার স্মরণ করিয়ে দেয় চারু—চৌকিদারকে তাড়া দাও, যেন তাড়াতাড়ি জাতের লোক নিয়ে আসে আর মেয়েটাকে নিয়ে যায়।

কদিন পরের ঘটনাতেই কিন্তু প্রমাণিত হয়ে যায়, নিজের নিজের মনকে চিনতে ভুল করেছে দুজনেই। একটা পরের মেয়ে তাকে ছোঁয়াও উচিত নয়, কারণ ছোঁয়াছুঁয়ি হলে মায়া পড়ে যেতে পারে। কিন্তু এই মায়া এড়াবার শক্তি দুজনের কার কতখানি আছে, সেটা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারেনি দুজনের একজনও। এত যুক্তি বুদ্ধি খাটিয়ে যে প্রতিজ্ঞা করল দুজনে, সেই প্রতিজ্ঞাটাই ঠুনকো কাচের মত ছোট একটি ঘটনায় ভেঙে গেল, আর তার ফল এই হল যে, দুজনেই দুজনের উপর রাগ করে আর অভিযোগ করে আর একটা সমস্যা সৃষ্টি করে বসল।

সাতদিনের জন্য দূরের এক লাইন দেখার জন্য সফরে বের হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার উপেন। ফিরে এসে যখন বাংলোবাড়ির ফটকে প্রবেশ করে উপেন, তখন দেখতে পায়, আয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আয়ার কোলে একটা বাচ্চা মেয়ে।

চেঁচিয়ে ডাক দেয় উপেন—রমা, রম, রমু। আয়া কাছে আসছে না দেখে হাত তুলে ইঙ্গিতে কাছে আসতে বলে। আয়া কাছে আসতেই উপেনের দুই চক্ষু যেন একটা স্পর্শে হেসে ওঠে—অ্যাঁ, এটা কে রে ? এটা সেই অম্বালিকাটা না ?

আয়া হাসে। উপেন বলে—ভয়ানক দুষ্টু হবে এই মেয়েটা, দেখছ না কিরকমের চোখ ?

বলতে বলতে মেয়েটার গাল টিপে আদর করে ফেলে উপেন—অম্বি...টাট্ টাট্।

জানালা দিয়ে এই দৃশ্য দেখে ভ্রূকুটি করে চারু। উপেন ঘরে প্রবেশ করতেই চারু প্রায় একটা ঝগড়ার মত ব্যাপার বাধিয়ে তোলে—তুমি ছুঁলে কেন মেয়েটাকে ?

—তাতে কী হয়েছে ? আমার জাত গিয়েছে ?

—জাত যাবে কেন, কিন্তু নিজের কথাই তো রাখতে পারলে না। আদর করার জন্য তোমার নিজের মেয়ে ঘরে নেই ?

সেই সন্ধ্যাতেই প্রতিশোধ নিল উপেন। হঠাৎ চারুর কাছে ব্যস্তভাবে ছুটে এসে প্রশ্ন করে—থার্মোমিটার আছে ?

—আছে। কেন !

—মেয়েটার জ্বর এসেছে বোধ হয়।

—কোন মেয়েটার ?

—অম্বির। নিশ্চয় সাংঘাতিক জ্বর, বোধ হয় গা পুড়ে যাচ্ছে।

চমকে ওঠে, বিচলিত হয় চারু।—জ্বর কেন হল ? কি আশ্চর্য, ইস, পুড়ে যাবে কেন ? কী যে বলছ, মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

উপেন বলে—মেয়েটার মুখটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

আয়ার ঘরের ভিতরে এসে ঢোকে চারু। সঙ্গে সঙ্গে উপেনও আসে। কিন্তু হঠাৎ ভুল করল চারু। অম্বির কপালে হাত দিয়ে বার বার যেন একটা শিশুর অসহায় জীবনের কোমল স্পর্শ অনুভব করে চারু। আশ্চর্য হয়ে বলে—কই, জ্বর বলে তো মনে হচ্ছে না !

সেই মুহূর্তে দেখতে পায় চারু, মুখ টিপে হাসি লুকিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে উপেন।

উপেন বলে—নিজের কথাই তো রাখতে পারলে না, মেয়েটাকে ছুঁয়ে ফেললে কেন ?

রাগ করে উত্তর দিতে গিয়ে হেসে ফেলে চারু। তারপর আবার শান্ত চিত্তে আর শান্ত স্বরে দুজনের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে।—আসল কথা কী জানো, কাছে রাখলে এরকম ছোয়াছুঁয়ি হবেই, আর...।

উপেন—আর মায়া-টায়া পড়বেই।

চারু—কাজেই।

উপেন—কাজেই তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া ভাল। নিজের মেয়ে নিয়েই উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার তাল সামলাতে পারে না মানুষ, তার ওপর যদি একটা পরের মেয়েকে নিয়ে...নাঃ, আর দেরি করা

উচিত না। আর দু'একমাসের মধ্যে মধুপুরে বদলি হতে হবে। তার আগেই মেয়েটাকে ওর একটা জাতের লোকের কাছে...।

পিসিমার চিঠি এসেছে।—সকল ব্যাপার শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। তুমি জানো, তুমি কত উচ্চ সদ্বংশের সন্তান। তোমাদের সাতপুরুষের কেহ কুলীন ব্যতীত অন্য কোনও নীচ ঘরের সহিত কুটুম্বিতা পর্যন্ত করে নাই। ভাবিয়া পাই না, তুমি কি করিয়া তোমার জাতের উচ্চতা ও শুচিতা ভুলিয়া একটি অন্ত্যজের মেয়েকে ঘরে স্থান দিতে পার। আশা করি, পত্রপাঠ উহাকে বিদায় করিয়া দিবে।

পিসিমার চিঠি পড়ে ক্ষুব্ধ হয় উপেন, কিন্তু পিসিমার উপর ক্ষুব্ধ হতে পারে না। পিসিমা ওই জাতের বড়াই নিয়েই তাঁর সারা জীবন ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। কলকাতায় যখন কলেজে পড়ত উপেন, তখন প্রতি রবিবার এই পিসিমারই বাড়িতে এসে খেয়ে যেতে হত। পোলাও থেকে পায়েস, বিশ রকমের খাবার নিজের হাতে রান্না করে উপেনকে খাওয়াতেন এবং খাইয়ে খুশি হতেন পিসিমা।—আমার সব কুটুম্বের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে বড় বংশের ছেলে উপেন। তাই তো তোমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করি। পিসিমার স্নেহের কারণটা যাই হোক, স্নেহটা তো আর মিথ্যা নয়। পিসিমার সম্পর্কে বিশেষ একটা শ্রদ্ধার টান অনুভব করে উপেন। এমন পিসিমা দুঃখিত না হলেই ভাল।

অম্বির কথাটা বার বার ভাবতে হচ্ছে। পিসিমা যাই বলুন, উপেন আর চারু ঠিক জাত বাঁচাবার সমস্যা নিয়ে মনটাকে দুশ্চিন্তায় বিব্রত করছে না। অম্বি নামে ওই মেয়েটারও যে একটা ভবিষ্যৎ আছে।

মেয়েটার ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে গিয়েই সমস্যাটা অনুমান করতে পারে উপেন আর চারু। এই মেয়েকে তো চিরকাল কাছে রাখা যাবে না। ভিন জাতের আর ছোট জাতের একটা মেয়েকে বড় করে তুললেই আপনজন হয়ে যাবে না মেয়েটা। সমাজ আছে, সমাজের নিয়ম আছে। মেয়েটাকেও ভবিষ্যতে একটা সমস্যায় পড়তে হবে।

কিছুদিন মাত্র কাছে রাখতে হবে, কিন্তু এই কিছুদিনের মধ্যে মেয়েটার উপর যেন মায়া পড়ে না যায়। মাত্র এইটুকু হল উপেন আর চারুর মনের দাবি।

বদলি হবার দিন যতই এগিয়ে আসে, ততই চৌকিদারকে তাড়া দেয় উপেন। শেষে একদিন, বদলি হবার দুদিন আগে সমস্যা থেকে একেবারে মুক্ত হবার সুযোগ পেয়ে গেল উপেন আর চারু।

বাংলোর বারান্দায় বসে বই পড়ছিল উপেন। দূরে লনের বেড়ার গা ঘেঁষে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আয়া, কোলে অম্বি। হঠাৎ ফটকের কাছে আগন্তুক কয়েকটা মূর্তিকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে উপেন। আসছে চৌকিদার, সঙ্গে আরও তিনজন লোক।

চৌকিদারকে দেখতে পেয়েই বিচলিত হয়, আর ছটফট করে বারান্দায় এসে ডাকতে থাকে উপেন।—আয়া আয়া। শিগগির এদিকে চলে এসো।

আয়া নিকটে আসে। চৌকিদার এগিয়ে আসছে। উপেন রাগ করে ধমক দেয় আয়াকে।—ওখানে ঘুরঘুর করছ কেন ? শিগগির ঘরের ভেতর চলে যাও।

আয়া ঘরের ভিতর চলে যাবার পরমুহূর্তে উপেন যেন সন্ত্রস্তের মত একলাফে বারান্দা থেকে সরে গিয়ে অন্য ঘরের ভিতর লুকিয়ে পড়ে। বারান্দায় চিৎকারের মত কর্কশ কতকগুলি আহ্বানের স্বর বাজতে থাকে—হুজুর, হুজুর।

যেন এই আহ্বানের শব্দগুলি সহ্য করতে গিয়ে আরও বিচলিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে উপেন। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে একবার বাইরে উঁকি দেয়, তারপর জানালা বন্ধ করে দেয়।

চারু এসে বিস্মিত হয়।—এ কী হচ্ছে ?

উপেন—ওরা এসে গেছে।

চারু—কারা ?

উপেন—ওই ওরা, অম্বির জাতের লোক।

থরথর করে কেঁপে ওঠে চারুর দুই চোখের দৃষ্টি।—কই দেখি।

স্বামী আর স্ত্রী একসঙ্গে দৃষ্টি তুলে আবার খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বারান্দার দিকে তাকায়।

চৌকিদার বলে—পঞ্চাশ টাকা, আর কিছু কাপড়-চোপড়...আর এক আধটা কম্বল...এই পেলেই ওরা মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে পুষতে রাজি আছে হুজুর।

উপেন হতভম্বের মত চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—খুব কম টাকাই তো দাবি করেছে, কিন্তু লোকগুলি ভাল কি মন্দ বুঝতে পারছি না।

চারু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—ঝাঁটা মারো...দূর দূর দূর!

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে মারমূর্তি হয়ে বের হয়ে আসে উপেন—ভাগো ভাগো, ভাগো। আগে নিজেরা মানুষ হও, তার পর পরের মেয়েকে মানুষ করতে এসো। যত সব ইডিয়ট হামবাগ্!

চৌকিদার ভীতভাবে বলতে থাকে—সেলাম হুজুর, যাচ্ছি হুজুর, ঠিকই বলেছেন হুজুর।

অমানুষগুলিকে তো বিদায় করে দেওয়া হলো, আর হাঁপও ছাড়ল উপেন আর চারু। কিন্তু সমস্যার কথাটা দুজনেই চিন্তা না করে পারে না। এইভাবে যদি মেয়েটাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা আর চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে কি হবে উপায়?

তা হলে মেয়েটা এই বাড়িরই মেয়ের মত হয়ে উঠবে যে। তখন? তখন যে মেয়েটাই এই বাড়িকে নিজের বাড়ি বলে মনে করে বসবে।

কী জটিল সমস্যা। মেয়েটাকে তখন এই বাড়ি থেকে বিদায় দিলে মেয়েটাই বা সহ্য করবে কেমন করে সেই বিদায়? এখনও কথা বলতে শেখেনি, বোঝেও না কিছু, মাত্র আয়ার কোলই চিনতে পেরেছে। কিন্তু আর একটু যখন বড় হবে, তখন উপেন আর চারুকেও যে আপন জন বলে মনে করে ফেলবে! এইটুকু একটা শিশুর সেই মনের টানকে ছিঁড়ে দিতে পারা যাবে তো।

অনেক আলোচনা আর গবেষণা করে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে আর একবার একটা প্রতিজ্ঞা করেন।—না, আর বেশি দেরি করলে চলবে না। মধুপুরে গিয়েই, খোঁজ খবর করে কোনও সাধারণ গরীব...এই ধরো কোনও চাপরাশি বা বেয়ারার ঘরে মেয়েটাকে যদি সঁপে দেওয়া যায়, তবে মন্দ হয় না। ছোট জাতের মেয়েদের তো এই বয়েসেই বিয়ে হয়। কিছু টাকা দিলে পাত্র পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

নিশ্চয়, আর কোনও সন্দেহ থাকে না উপেন আর চারুর মনে। কিন্তু...এইবার থেকে আর একটা বিষয়ে সাবধান হতে হবে। চারু বলে—মেয়েটা যেন কখনই ভাবতে না শেখে যে, আমরা ওর আপনজন। আমাদের জন্য যেন কোনও মায়া না জেগে বসে মেয়েটার মনে। তা হলেই কিন্তু সমস্যা জটিল হবে।

অর্থাৎ, এইবার থেকে একটু নির্মম হতে হবে, এই ধরনেরই একটা সিদ্ধান্ত করে উপেন আর চারু।

কাঁদছে অম্বি। অম্বির একটানা একঘেয়ে কান্নার স্বর শোনা যায়। বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় চারু। বারান্দার আর এক প্রান্তের দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করে আয়াকে ধমক দেয় চারু—মেয়েটা এরকম বিশ্রিভাবে কাঁদছে কেন আয়া? দোলনা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

আয়াও চেঁচিয়ে উত্তর দেয়।—দোলনা অনেক দুলিয়েছি।

চারু—তবে কাঁদছে কেন মেয়েটা?

আয়া আরও জোরে চেঁচিয়ে বলতে থাকে—তুমি তো এক মেয়ের মা হয়েছে, তুমি কি জানো না, বাচ্চা মেয়ে কিসকে লিয়ে এমন করে কাঁদে।

যেন এক ছলক করুণ রক্তের আভা হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে চারুর মুখের উপর। চুপ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে চারু। মনে হয়, যেন অনেক কষ্টে আর ইচ্ছা করে শরীরটাকে কাঠ করে রাখতে চাইছে। উপেন গম্ভীরভাবে বলে—শক্ত হতে চেষ্টা করছ বুঝি?

চারু খেঁকিয়ে ওঠে—তুমি অসভ্যতা করো না।

হাসি লুকোতে গিয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় উপেন

মধুপুরের তিন বছরের জীবন দেখতে দেখতে কেটে গেল। আবার নতুন জায়গায় বদলি হবার সময় এগিয়ে এল। দুজনের মনে হঠাৎ সমস্যাটা আবার দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তোলে।

এতদিন যেন মনের ভুলে ভুলেই গিয়েছিল দুজনে। একটা পরের মেয়ে এই ঘরেরই বাতাসে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। কিন্তু এত দেরি করা উচিত ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হয়। দুজনেই দুজনের উপর দোষারোপ করে। কথা কাটাকাটির পর আবার দুজনেই শান্তভাবে আলোচনা করে।—মেয়েটারই ওপর অন্যায় করা হচ্ছে। আর দেরি করলে বাড়ির মেয়ের মত হয়ে উঠবে যে। তখন কী হবে উপায় ? বিয়ের বয়স যখন হবে, তখন বিয়েই বা হবে কার সঙ্গে ? মেয়েটার মন এই বাড়ির মেয়ের মত হয়ে উঠবে, অথচ বিয়ে দিতে হবে একটা ছোট ঘরে। কেমন করে সেই ঘরকে সহ্য করবে মেয়েটা ? তার চেয়ে, এখান থেকে যাবার আগে একটা পাত্র-টাত্র খুঁজে বের করে মেয়েটার গতি করে দেওয়া যায় তো ভাল।

ঘরের জানালায় একটা ছোট্ট মেয়ের হাসি-হাসি মুখ ভেসে ওঠে। রমার মুখ। বাইরের ফুলের টবের উপর দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দেয় আর ডাক দেয় রমা—বাবা !

তার পরেই ডাক দেয়—মা।

চারু বলে—দুষ্টুমি করো না রমা, যাও পুতুল নিয়ে খেলা করো।

ঘরেব অন্য একটা জানালায় আর একটা ছোট্ট মেয়ের হাসি হাসি মুখ হঠাৎ ভেসে ওঠে। বাইরের ফুলের টবের উপর দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দিয়েছে অম্বি। উঁকি দিয়েই উপেনের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—আপ্পি !

তারপর চারুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—আম্মি ! দৌড়ে চলে গেল অম্বি।

উপেন আর চারু আলাপ করে—এই ডাকগুলি কি অম্বি আপনা-আপনি শিখল ?

চারু—না, আয়া শিখিয়েছে।

উপেন—যাক, তবু ভাল, রমার মত বাপ-মা আরম্ভ করলেই হয়েছিল আর কি ?

কি আশ্চর্য, এই ধরনেরই এক একটা প্রাচীর তুলে নিজের মেয়ের কাছ থেকে পরের মেয়েকে দূরে সরিয়ে রেখেছে উপেন আর চারু। অম্বির কাছে তারা হল আপ্পি আর আম্মি, বাবা আর মা নয়।

কিন্তু যখন রমা আর অম্বির ঝগড়ার ভাষা শুনতে পায়, তখন দুজনেই আবার আশ্চর্য হয়, আর, মনের এলোমেলো চিন্তার মধ্যে বুঝতে পারে, এই ব্যবধান যে ব্যবধানই নয়। পৃথিবীতে এক আপ্পি আর আম্মিকে পেয়েই ধন্য হয়ে গিয়েছে অম্বি।

রমা অম্বিকে তুচ্ছ করে মুখ বেঁকিয়ে বলে—তোর তো মা নেই।

অম্বি—তোর তো আম্মি নেই।

রমা—তোর তো বাবা নেই।

অম্বি—তোর তো আপ্পি নেই।

উপেন আর চারু দুজনেই একসঙ্গে ধমক দেয়—ওকি হচ্ছে !

ধমক দিয়েই যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ে দুজনেই। এত সতর্কতা তবু কোথা থেকে যেন একটা কঠিন বিদ্রূপ চক্রান্ত করে বার বার ভেঙে দিচ্ছে আর ভুয়ো করে দিচ্ছে তাদের এই সতর্কতার প্রাচীরকে। অম্বি নামে ওই পাঁচ বছর বয়সের একটা ভিন্ন রক্তের মেয়ে যেন নিজের মনের অহংকারেই রমার সঙ্গে সমান তাল রেখে এই বাড়ির স্নেহের আঙিনায় ছুটোছুটি করার শক্তি পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাধা দিতে হবে। বাধা দিচ্ছেও উপেন আর চারুবালা। বেশ ভেবে চিন্তে আর ইচ্ছা করে নির্মম হবার চেষ্টা করছে। রমা আর অম্বির মধ্যে আরও শক্ত পাথরের প্রাচীর তৈরি করতে হবে। যেন বুঝতে পারে অম্বি, আপ্পি আর আম্মির গা ঘেঁষে থাকবার অধিকার অম্বির নেই। রমা যা, অম্বি তা নয়। এখন থেকেই ওইটুকু মেয়েকে ওর জীবনের এই কঠোর সত্য বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে সমস্যা বাড়বে।

এরই মধ্যে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অপিসের দারোয়ানের সাহায্যে এক পাত্রের সন্ধান পেল

উপেন। রেলের কুলিসর্দারের এক ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারা যায় অম্বির। পাত্রের বাপের কিছু ক্ষেত খামার আছে। ছোট জাত। পাত্রের খুড়ো সেই কুলিসর্দারই এসে একদিন উপেনের বাড়ির বারান্দায় উঠল।

কিন্তু সেইরকম ঘটনা ঘটে গেল আবার। চারুবালা ব্যাপার দেখে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তার পরেই চেঁচিয়ে ওঠে চারু—দূর করো, যত সব আপদ!

হঠাৎ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে উপেন। বেচারা কুলিসর্দারকেই ধমক দেয়—যাও যাও, যাও।

মুখভার করে চুপ করে বসে রইল চারুবালা। যেন দুর্বোধ্য একটা বেদনা বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে, এবং নিজেরই অদৃষ্টের বিড়ম্বনার দিকে তাকিয়ে ছলছল করে উঠছে তার চোখ। সান্ত্বনার ভঙ্গিতে চারুবালার হাত ধরে উপেন—অকারণে আমার ওপর রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

জানালার কাছে ভেসে ওঠে এক জোড়া কৌতূহলী হাসি-হাসি শিশু মুখ! রমা আর অম্বি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কী যেন শোনে আর কী যেন ভাবে। তার পরেই জানালা থেকে নেমে চলে যায়।

উপেন বলে—এখন বুঝতে পারছি, এভাবে কিছুই হবে না।

চারু—কী?

উপেন—বাজে লোকের হাতে মেয়েটাকে দিতে পারা যাবে না। আমিও পারব না, তুমিও পারবে না।

চেঁচিয়ে ওঠে চারু—তা হলে মেয়েটা কি বাড়ির মেয়ের মতই হয়ে উঠবে না কি?

—না, তা বলছি না। বলছি, যদি ভাল একটা অনাথ আশ্রমে ওকে দিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে...।

—তা হলে কী?

—তা হলে আমাদেরও মনে দুঃখ থাকবে না যে মেয়েটার ওপর অন্যায় করা হল। কারণ, ভাল অনাথ আশ্রমে থাকলে মেয়েটা লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে একটা ভাল মানুষের সংসার পেয়েই যাবে।

—আছে এরকম আশ্রম?

—আছে নিশ্চয়, খোঁজ নিতে হবে।

—আশ্রম খুঁজতে আবার কতদিন লাগবে, কে জানে?

—না আর দেরি করলে চলবে না। মেয়েটা এরই মধ্যে অনেক ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে।

—কী করেছে?

—আয়াই বলে, দিনরাত রমার সঙ্গে হিংসেহিংসি করছে, রমাকে মারধরও করে অম্বি।

—রমাও তো অম্বিকে মারে।

—কিন্তু রমা তো কোনও সমস্যা নয়। রমার ওপর আমাদের যতই মায়া বাড়ুক আর আমাদের ওপর রমার যতই মায়া বাড়ুক না কেন, তাতে তো কোনও সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে না। কিন্তু অম্বি যদি আমাদের দুজনকে আপনজন ভেবে বসে...।

—ভেবে বসেছে, তোমারই জন্য এসব কাণ্ড হচ্ছে।

রাগ করে উপেন—আমাকে দোষ দিও না, তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত মন আমার। আমি আজ পর্যন্ত একটা পুতুলও অম্বির জন্য কিনে আনিনি। তুমিই স্টাইল করে ওর জামার ছাঁট ছেঁটেছ আর সেলাই করেছ।

হেসে ফেলে চারুবালা—তুমি যত পুতুল রমাকে এনে দিয়েছ, অম্বি সবই কেড়ে নিয়েছে।

—অ্যাঁ, কোন সাহসে কাড়ে?

—ভগবান জানেন।

দূরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় উপেন আর চারুবালা আয়া একটা নতুন ডল রমার হাতে তুলে দিচ্ছে। অম্বি বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে আয়ার উপর উপদ্রব করছে।

উপেন রাগ করে অম্বির হাত থেকে ডল কাড়বার জন্য যেন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায়। চারুও সঙ্গে সঙ্গে উপেনের পিছনে হন্ত-দন্ত হয়ে হেঁটে আসতে থাকে। চারু বার বার বাধা দেয়—এটা আবার কিরকম পাগলামি করছ তুমি!

—না আমার কাছে ওসব আবদার নেই, আমি শক্ত মানুষ। তুমিই লাই দিয়ে দিয়ে সমস্যা বাড়িয়েছ।

চারুবালা মুখ টিপে হাসে—ইস।

থামতে হয় উপেনকে। চারুই উপেনের হাত ধরে উপেনকে থামতে বাধ্য করে।—ছেলেমানুষে এরকম ঝগড়া ঝগড়া খেলা খেলেই থাকে, কিন্তু তুমি তার জন্য সত্যিই মাথা খারাপ করছ কেন?

উপেনের রাগটা হঠাৎ অপ্রস্তুত হয় এবং চারুর দিকেই ভ্রূকুটি করে বলে—না, মোটেই খেলা নয়। অম্বির মনে মতলব আছে।

চারু হাসে—বেশ তো, ওইটুকু একটা মেয়ে না হয় একটু মতলবের খেলাই খেলল।

উপেন বলে—ওই দেখো, আবার কেমন ঝগড়া শুরু করেছে অম্বি।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে চারু আর উপেন, সত্যিই আবার চেঁচাতে শুরু করেছে অম্বি।—আমার ডল কই আয়া? আমার ডল?

অম্বি বলে—আমার ডল কই?

আয়া—তোমার ডল নেই।

অম্বি—ইস? সঙ্গে সঙ্গে রমার হাত থেকে ডল কেড়ে নেয় অম্বি। রমা কাড়বার চেষ্টা করতেই রমাকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। মুখ ভার করে বসে থাকে রমা। আড়ি করে—তোমার সঙ্গে খেলব না।

অম্বি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রমার একটা হাত ধরে অনুরোধ করে—আমার ওপর অকারণে রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

চারুবালাব বিদ্রূপই সত্য হয়ে উঠল। অম্বির মুখের মান-ভাঙানো কথাগুলি শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে উপেন; তারপর অপ্রস্তুতভাবে হাসতে হাসতে চলে যায়।

কিন্তু এই ধরনের ক্ষণিক মধুরতার দৃশ্য দেখে খুশি হয়েও পরমুহূর্তে উদ্বিগ্নভাবে ভাবতে থাকে উপেন আর চারুবালা। অম্বি যেন ধীরে ধীরে একটা ছলনা বিস্তার করছে। সাবধান হতে হবে। অম্বিরই কল্যাণের জন্য, আর নিজেদের জীবনকে একটা ভুল মায়ার জাল থেকে বাঁচাবার জন্য।

রমার জন্য মাস্টার ঠিক করা হয়েছিল। পড়াতে এল মাস্টার। রমার দেখাদেখি অম্বিও একটা বই নিয়ে মাস্টারেব কাছে এসে বসে। আয়া এসে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই বিদ্রোহ করে অম্বি, চেঁচিয়ে আয়াকে খিমচে একটা অস্বস্তিকর দৃশ্য সৃষ্টি করে। মাস্টার অবাক হয়। উপেন এসে বলে—থাকুক, থাকুক।

চারুবালা অনুযোগ করে—থাকুক তো বললে, কিন্তু আর কতদিন?

—যতদিন অনাথ আশ্রমে না যায়, ততদিন এসব সহ্য করতেই হবে।

সহ্য করতে হল আরও একটা দুঃসহ ঘটনা। প্রতিদিনের মত খাবাব ঘরের টেবিলের কাছে বসে আদরের সুরে ডাক দিল উপেন—রমা! রমা!

সেই মুহূর্তে ছুটে আসে রমা। একটা পুডিং ভেঙে চামচে দিয়ে রমাকে খাইয়ে দেয় উপেন। চারুবালা সামনে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে সে দৃশ্য দেখে। রমার নানা রকমের দুষ্টুমির কথা আলোচনা করে স্বামী স্ত্রী। উপেন হাসতে হাসতে বলে—এরই মধ্যে এটার মুখটা একেবারে তোমার মুখের মত হয়ে উঠেছে। দেখা মাত্র যে কেউ বলে দেবে তোমার মেয়ে।

—কিন্তু মিসেস চক্রবর্তী যে বললেন, তোমার মুখের আদল পেয়েছে।

—আমি তো ও রকম কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

চারু রাগ করে—এ আবার কেমন কথা!

—আরে আমার নিজের মুখটা তো দেখতে পাচ্ছি না যে মিলিয়ে দেখব।

অকস্মাৎ দু'জনেই চমকে ওঠে, নিকটেই যেন একটা শিশুকণ্ঠের কান্নাভরা চিৎকার ছটফট করছে। হ্যাঁ, অম্বিরই চিৎকার।

খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায়, অম্বিকে শক্ত করে ধরে রয়েছে আয়া। অম্বি দেখতে পেয়েছে, উপেন চামচ দিয়ে পুডিং খাইয়ে দিচ্ছে রমাকে। ছটফট করছে অম্বি, পাঁচ বৎসরের একটা পরের মেয়ে উপেনের হাত থেকে আদুরে পুডিং খাবার জন্য লুব্ধ হয়ে ছটফট করছে। আয়াকে চড় ঘুঁষি মেরে ব্যতিব্যস্ত করছে অম্বি। আয়া শেষে হার মেরে আর রাগ করে অম্বির হাত ছেড়েই দেয়—যাঃ। আর সহ্য করতে পারে না।

এক দৌড়ে ছুটে এসে অম্বি উপেনের খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়। পুডিং-এর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটি লুব্ধ মুখের ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

উপেনের হাত থরথর করে কাঁপতে থাকে। ছোট্ট একটা মেয়ের সামান্য একটা লুব্ধ দৃষ্টির দাবি, কিন্তু কী প্রচণ্ড এই দাবির শক্তি। চারুর মুখের দিকে বার বার ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায় উপেন। চারু মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

অম্বি বলে—আমার পুডিং আপ্পি ?

বিষণ্ন ও করুণ হয়ে ওঠে উপেনের মুখ। ধীরে ধীরে চামচ তোলে, পুডিং ভাঙ্গে উপেন, দ্বিধাগ্রস্ত হাতটা কাঁপতে থাকে। একবার চামচ নামিয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মোছে উপেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অম্বি ডাকে—আমার পুডিং আপ্পি।

চামচ তুলে অম্বির মুখে পুডিং তুলে দেয় উপেন। চমকে ওঠে চারুবালা।

চলে যায় অম্বি, চলে যায় রমা। সেই চামচ দিয়েই নিজের খাবার খেতে যাচ্ছিল উপেন, চারু উত্তপ্তস্বরে বাধা দেয়—ও চামচ রেখে দাও।

উপেন শক্ত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করে—কেন ?

জবাব দেয় না চারু। উপেন চেঁচিয়ে ওঠে—বলো, তুমি আপত্তি করছ কেন ?

চারু নিরুত্তর।

উপেন—ছোট জাতের মেয়ে চামচে মুখ দিয়েছে বলে চামচ অশুদ্ধ হয়েছে, এই তো। খানিকটা গোবর খেয়ে ফেললেই শুদ্ধ হতে পারা যাবে তো, তবে এত ভয় কিসের ?

উত্তর দেয় না চারু।

উপেন—বলো, কিসের ভয় ? জাতের ভয় না মায়ার ভয় ?

চারু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে—মায়ার ভয়।

—কেন ?

—ভুল করছ তুমি। দুদিনের জন্য একটা পরের মেয়ে ঘরে রয়েছে, এই মাত্র, তাকে নিয়ে এত আদরের বাড়াবাড়ি কেন ?

—তুমি করছ না ?

—না, আমি তোমার চেয়ে ঢের শক্ত, ঢের সাবধান।

—ও।

চামচটাকে সশব্দে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে অন্য একটা চামচ হাতে তুলে নেয় উপেন। তাড়াতাড়ি খেতে থাকে। কিন্তু খাওয়া সমাপ্ত করে না। হঠাৎ খাবার ছেড়ে হাত ধুয়ে উঠে যায়।

সেদিন ছিল রমার জন্মদিন।

অম্বিও বায়না ধরল, আমিও ঠিক রমার মত ফুলের মালা গলায় দিয়ে, চন্দনের টিপ পরে, আম্মির কোলে বসে পায়েস খাব।

চারুবালা বলে—না।

চারুবালার আঁচল ধরে ঘুরঘুর করতে থাকে অম্বি। নাকি-কান্নার সুরে সেই একই আবদার—আমার জন্মদিন চাই।

চারুবালা চেঁচিয়ে আয়াকে ডাক দিয়ে বলে—ওকে নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে।

অম্বিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য একটা ঘরে বন্ধ করে রাখে আয়া। চিৎকার শোনা যায়, ঘরের দরজায় লাথি মেরে সেই প্রচণ্ড আবদার একটানা এক সুরে ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

—আমার জন্মদিন, আমার জন্মদিন। আম্মি, আমার জন্মদিন।

ঘরের ভিতর ছটফট ক'রে আর রাগ ক'রে ঘুরতে থাকে উপেন। যেন একটা ধিক্কার দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—হুঃ, জন্মদিন, সেদিন কোন সর্বনেশে তারা ছিল আকাশে।

অন্য ঘরে চুপ করে বসে শুনতে থাকে চারুবালা, অম্বির চিৎকার। তারপর চোখ মোছে, তারপরেই ক্ষুব্ধভাবে উপেনের কাছে এসে বলে—আমি জব্দ হলে খুশি হবে তো ? এসো, দেখে খুশি হয়ে যাও।

এগিয়ে যেয়ে ঘরের বন্ধ কপাট খুলে অম্বিকে হিড়হিড় করে টেনে আনে চারুবালা। মালা পরিয়ে দেয়, চন্দনও পরিয়ে দেয়। গম্ভীর মুখে যেন বিনা আগ্রহের একটা কলের মত কাজ করে যায়। কোলের উপর অম্বিকে বসিয়ে পায়েস খাইয়ে দেয়। হেসে ওঠে অম্বির জলে-ভেজা চোখ।

শেষ হয় অম্বির জন্মদিনের অনুষ্ঠান। অম্বিকে কোল থেকে নামিয়ে, সেই রকমই গম্ভীর মুখে কলের মত ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানার উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ে চারুবালা।

শ্যামবাজারের পিসিমার চিঠি মাঝে মাঝে আসে।

পিসিমার চিঠিতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে। একটি হল বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে, কী রকম জমালে উপেন, আর কবে বাড়ি করছে উপেন ? আর একটি হল, রমার বিয়ের সম্বন্ধে ভবিষ্যতের একটা আগ্রহের কথা। আর, একটা বিক্ষোভের কথা—সেই অজাত মেয়েটা এখনও বাড়িতে আছে কেন ?

সমাজের ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন পিসিমা। ভুল করলে, রমার বিয়ে নিয়েই ভবিষ্যতে মুশকিলে পড়তে হবে।—বুঝিলাম, তোমরা সেই অন্ত্যজা মেয়েটাকে ঘরে পুষিয়া রাখিয়াছ। এখন না হয় পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু একদিন দেশের দিকে ফিরিয়া আসিয়া সমাজের মধ্যে থাকিতে হইবে। বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ না যে, অজাত-কুজাতের ওই মেয়ে ঘরে থাকিলে সমাজে তোমাদের যে নিন্দা রটিবে, তাহার ফলে রমার জন্য সদ্বংশীয় পাত্র সংগ্রহ কবাও অসম্ভব হইবে।

পিসিমার উপদেশগুলি যেন নিষ্ঠুর সত্যের মত চিন্তিত করে তোলে চারুবালাকে। চারুবালার কাছে এসে দাঁড়ায় উপেন। সান্ত্বনার সুরে আর শান্তভাবে বলতে থাকে।—ভুল যদি বল, তবে আমার ভুল, তোমার ভুল, আর অম্বি নামে ওই এতটুকু একটা মেয়েরও ভুল। আমরা সবাই না জেনে ভুল করছি। পিসিমা ঠিকই বলেছেন।

চারু—কিন্তু কিসের ভুল ?

উপেন—আমার তো মনে হয়, আমরা কেউ ভুল করছি না। আমি ভুল করিনি, তুমিও ভুল করছ না, অম্বিও ভুল করছে না। শত হোক, একটা মানুষের মেয়ে তো। কাছে থাকলেই এরকম ভুল সবারই হবে।

—কাছে রাখাই যে ভুল হচ্ছে।

—হ্যাঁ, এটাই হল কথা। কিন্তু, এবার বোধ হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কী ?

—দার্জিলিং-এ একটা অরফ্যানেজ আছে। বেশ ভাল ব্যবস্থা। অতি সুন্দর ব্যবস্থা। হাজার পাঁচেক টাকা থোক দিতে হবে। বাস, আর কোনও দায় নেই।

—তবে, ওখানেই একটা ব্যবস্থা করে ফেলো।

—করে ফেলতেই হবে, এখান থেকে চলে যাবার দিনও তো আর বেশি বাকি নেই। এবার অনেক দূরে, একেবারে, সেই দেরাদুনের কাছে।

—চিরকালটা কি ঘুরে ঘুরেই কাটবে ?

—অন্তত আর পনেরোটা বছর তো বটেই।

—তারপর ?

—তারপর কলকাতা।

—পনেরো বছর পরের কথা ছেড়ে দাও, এখনকার কথাই ভাবো। আয়াটাও জেদ ধরেছে, এইবার দেশে চলে যাবে। বুড়ো বয়সে আর বিদেশে থাকতে চায় না। চাকরিও করতে চায় না।

—কেন ?

—রমা আর অম্বি ওকে বড় মারধর করে।

দরজার কাছেই আয়ার ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যায়। —হামি আর থাকতে পারবে না সাব।

উপেন—কেন ?

আয়া—এ নোকরি আচ্ছা নেহি সাব। মায়াভি হোবে, আর মারভি খাইবে।

উপেন বলে—না, আর বেশি দিন নয়। শিগগিরই তোমাকে ছেড়ে দেব।

আয়া চলে গেলে যেন একটু আতঙ্কিতের মতই বিষণ্ণ স্বরে উপেন বলে—দেখলে তো, আয়া কেমন সাবধান হয়ে গিয়েছে। মায়াভি হোবে, মারভি খাইবে, আমাদেরও এই দশা হবে, যদি সাবধান না হই।

শেষ কথায় চারুবালাকে একটু উৎসাহিত করে চলে যায় উপেন—দার্জিলিং-এর অরফ্যানেজে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি, মনে হচ্ছে দু'এক দিনের মধ্যেই উত্তর এসে পড়বে।

ভুল হয়নি উপেনের অনুমানে। উত্তর এল দুদিন পরেই।

বাস, এখন শুধু পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক, আর সেই সঙ্গে অম্বিকে নিয়ে একদিন মাস্টারকে দার্জিলিং রওনা করিয়ে দিতে হবে, আর কোনও সমস্যা নেই।

এক গাদা রঙিন খেলনা, জামা-কাপড়, ছবি, টফি, চকোলেট আর লজেন্স কিনে এনে টেবিলের উপর ঢেলে দিল উপেন। অম্বিকে ডাক দিয়ে বলে—অম্বি, এই সব তোমার।

—আমার ?

—হ্যাঁ, কিন্তু মাস্টার মশাই-এর কথা শুনতে হবে, তবে এসব পাবে।

মাস্টারের কানের কাছে ফিস-ফিস ক'রে বলে যায় উপেন—বাস, আমাকে দিয়ে আর কোনও কাজ করাবার চেষ্টা করবেন না। এইবার সব দায় আপনার। ভুলিয়ে-ভালিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে রওনা হয়ে যান, আমাকে কিন্তু আর কোনও পরামর্শ করতে ডাকবেন না। আমি চললাম।

মুখ কালো ক'রে, দুপ-দাপ ক'রে হাঁটতে-হাঁটতে, যেন নিজেরই মনের ভিতরের একটা আর্তনাদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করতে করতে চলে যায় উপেন। চারুবালার কাছে গিয়ে বলে— আমি আজ ট্যুরে চললাম, কাল ফিরব।

চারুবালার কোনও আপত্তি গ্রাহ্য না ক'রে বের হয়ে গেল উপেন।

মাস্টার মশাই চারুবালাকে আশ্বস্ত করেন—কোনও চিন্তা করবেন না, এ আর কী এমন কঠিন কাজ ?

অম্বির শিশু-মনকে প্রলুব্ধ করার জন্য গল্পের ফাঁদ পাতেন মাস্টার। নতুন দেশের কথা। বরফের দেশ, ঝরনার দেশ, চাঁদের দেশ, সোনার সূর্য ভাসে সেই দেশের আকাশে।—যাবে অম্বি ? প্রশ্ন করেন মাস্টার। মুগ্ধ শিশুচক্ষের বিস্ময় নিয়ে উত্তর দেয় অম্বি—যাবে।

সমস্ত বাড়িটাই যেন ভয়ে অভিভূত হয়ে রইল। রওনা হবার জন্য তোড়জোড় করছেন মাস্টার মশাই। রমাকে নিয়ে আয়া চলে গেল। অম্বির, পাঁচ বছর বয়সের একটা মেয়ের চোখের দৃষ্টি আর মুখের ভাষার শব্দকে ভয় পেয়ে এই বাড়ির আত্মা যেন মুখ লুকিয়ে ফেলছে। চারুবালাও একটা ঘরের ভিতর নিজেকে বন্ধ ক'রে রাখল, যেন এই দৃশ্য চোখে দেখতে না হয়।

মাস্টারের কাছে কতবার জিজ্ঞাসা করেছে চারু।—আশ্রমে কোনও কষ্ট দেয় না তো। মাস্টার বলেছেন—আপনি বিশ্বাস করুন, যে অরফ্যানেজে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানকার খাওয়া-পরা-থাকা সাজপোশাক আপনার এই এখানকার তুলনায় অনেক ভাল। খুব সুখে থাকবে মেয়েটা। লেখাপড়া, গান, সব শিখবে। বড় হয়ে ডাক্তারি পড়তে পারবে। আপনি বৃথা ভাবছেন।

হ্যাঁ, বিশ্বাস করেছে চারুবালা। সুখেই থাকবে মেয়েটা, এই বাড়ির সুখের চেয়ে সেখানে অনেক

বেশি সুখ ! কিন্তু তবু কেন স্বস্তি পায় না মন ? মনে হয় ছোট্ট একটা অবুঝ মেয়েকে লোভ দেখিয়ে বনবাসে পাঠানো হচ্ছে। সব চেয়ে বেশি রাগ হয় নিজেরই উপর। এতদিন ধরে যাকে ছেড়ে দেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিল মন, আজ ছেড়ে দেবার এত ভাল সুযোগ পেয়েও এরকম দুঃসহ অস্বস্তি বোধ হয় কেন ?

বদ্ধ ঘরের নিভৃতে বসে শুনতে পায় চারুবালা, মাস্টারের পায়ের শব্দের পিছু পিছু দুটি ছোট ছোট পায়ের জুতোর শব্দ নিকটে এগিয়ে আসছে। রওনা হয়েছেন মাস্টার। চলে যাচ্ছে অম্বি।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অম্বি। প্রশ্ন করে মাস্টারকে—রমা যাবে না ?

—না।

—আপ্পি ?

—না।

—আম্মি ?

—না।

—তবে আমিও যাব না।

এইবার মাস্টার বাধ্য হয়েই কৌশলের সাহায্য নেন। হেসে হেসে প্রচণ্ড একটা মিথ্যা কথা বলেন—আপ্পি, আম্মি, রমা সবাই সেখানে আগেই চলে গিয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে অম্বি—অ্যাঁ, আমিও যাব।

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র চাপানো আছে। মাস্টার আগে আগে চলে যাচ্ছে। পিছনে অম্বি। ট্যাক্সির কাছে পৌঁছতেই মাস্টার হঠাৎ একটা আর্তনাদের প্রতিধ্বনি শুনে পিছন ফিরে তাকান। দেখতে পান, বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে চারুবালা।

সেই মুহূর্তে, চারুবালাকে লক্ষ ক'রে পিছনে ছুটতে থাকে অম্বি—ওই যে আম্মি, আম্মি আম্মি।

মাস্টার তারস্বরে চেঁচিয়ে নানা প্রলোভনের কথা ঘোষণা করতে থাকেন—এই যে, এখানে কত লজেন্স, পুতুল, আর ছবি আছে অম্বি, কত গণেশ আর সিংহ। চলো যাই সেখানে, যেখানে চাঁদের দেশ, বরফের পাহাড়, ঝর্নার গান, বনের পরী !

কিন্তু বৃথা, আম্মি নামে একটি মায়াভরা মূর্তির কাছে চাঁদের দেশের আহ্বানও মিথ্যে হয়ে যায়। —না আমি যাব না। কখ্‌খনও যাব না। বলতে বলতে চারুবালার দিকে ছুটেই চলেছে অম্বি।

অম্বি এসে চারুবালার স্তব্ধ মূর্তিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু চারুবালার হাত দু'টো, আর সেই সঙ্গে বুকের ভিতরটাও যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। অম্বিকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত দুটো একবার ছটফট করে ওঠে। তবু যেন অনেক কষ্টে হাত দুটোকে শক্ত ক'রে রাখে চারুবালা। অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি হাসতে থাকে। অম্বি বলে—মাস্টার বড় দুষ্টু, মিথ্যুক।

চারু প্রশ্ন করে—কেন ? কী করেছেন মাস্টার মশাই ?

অম্বি বলে—তোমাকে লুকিয়ে রেখেছিল।

চোখ ছলছল করে, গম্ভীর হয় চারুবালা। অম্বিই সান্ত্বনা দেয়—আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব না আম্মি, তুমি কেঁদো না।

দু'দিন পরে বিষণ্ন পরিশ্রান্ত বেদনাহত মূর্তি নিয়ে আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে চারদিকে উঁকি দিতে দিতে ঘরে ঢুকল উপেন। ট্যুর থেকে ফিরে এসেছে উপেন। জানে উপেন, অম্বি চলে গিয়েছে! এক একটা শূন্য ঘর আর বারান্দার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে রুমাল বের করে চোখ মোছে উপেন। হঠাৎ চমকে ওঠে, কী যেন দেখতে পায় উপেন। এক জায়গায়, মেঝের উপর, অম্বিরই একটা ডল পড়ে আছে। ফোলা ফোলা গাল, হাসি হাসি মুখ একটা ডল। ডলটা তুলে নিয়ে, ডলের মুখে হাত বুলিয়ে, আর জলভরা চোখ নিয়ে আর দাঁত চিবিয়ে, কে জানে কার উপর রাগ ক'রে বলতে থাকে উপেন—ডল, পুতুল মাত্র, কাঠখড়ের পুতুলও ঘরের ভালবাসা পায়,...কিন্তু মানুষের মেয়ে...আর্বজনা... ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

অকস্মাৎ আড়াল থেকে হাসিতে আর আহ্লাদে উপচে পড়া মিষ্টি একটা ডাক যেন বাঁশির সুরের

মত বেজে ওঠে—আম্মি।

বিস্ময়ে চমকে ওঠে, আর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে উপেনের। —সে কী রে অম্বি, তুই ?

অম্বি ছুটে এসে উপেনের হাত ধরতে যায়। আলগোছে হাত সরিয়ে নেয় উপেন। অম্বি বলে—মাস্টার বড় দুষ্টু।

—বুঝেছি। আর দুষ্টুমি করবে না মাস্টার।

অম্বির অভিযোগের মর্ম বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই। বুঝেছে উপেন, বুঝেছে চারুবালা। অম্বি যেন বলতে চায়—আমি যাব না। দুনিয়ায় যেসব মাস্টারির শাসন আমাকে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চায়, সেই সব মাস্টারি বড় দুষ্টু, বড় নিষ্ঠুর।

না, আর এরকম নিষ্ঠুরতা করা উচিত হবে না। মেয়েটার মনটা এই বাড়িকেই আপন ক'রে নিয়েছে। সুতরাং থাকুক না, বাড়ির মেয়ের মত হয়েই। বড় হোক, বেঁচে থাকুক, তারপর ভগবান একটা উপায় করে দেবেনই। সাধারণ গেরস্থ ঘরের যে কোনও জাতেরই হোক না কেন, খেয়ে পরে একরকম সুখে আছে, এরকম একটা পাত্র কি পাওয়া যাবে না ? ভাল বরপণ দিলে পাওয়া যাবেই।

স্বামী-স্ত্রীর আলোচনায় এই নতুন সিদ্ধান্ত জন্মগ্রহণ করে। বাড়ির মেয়ের মতই থাকুক অম্বি। কিন্তু,...কিন্তু ও যেন বুঝতে পারে যে, ও হল এই বাড়ির মেয়ের মত। আর বেশি কিছু নয়। নইলে...নইলে আবার সমস্যা দেখা দেবে।

কদিন পরেই সমস্যাটা আবার দেখা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন হয়ে আর অতি সাবধানতায় অবিচল থেকে, সেই সমস্যাকে অঙ্কুরেই ছিন্ন করে দিল চারুবালা ও উপেন।

রমার সঙ্গে হিংসুটেপনায় আর একটু দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল অম্বি। কিন্তু অম্বিকে বুঝিয়ে দিল চারুবালা ও উপেন, রমার অধিকারে আর অম্বির অধিকারে অনেক পার্থক্য আছে।

ঘটনাটা এই। এক সন্ধ্যায় চারুবালার শোবার ঘরে ঢুকেই দেখতে পায় অম্বি, খাটের উপর চারুবালার বিছানার পাশেই, যেন চারুবালার বুক ঘেঁষে, আর একটি ছোট্ট বিছানা রয়েছে, ছোট্ট একটি বালিশও। —অ্যাঁ, এখানে রমা শোয়, বুঝেছি। চেঁচিয়ে ওঠে অম্বি।

বায়না ধরে অম্বি—আমিও আম্মির কাছে শোব !

আয়া বলে—কভি নেহি। আয়াকে খিমচে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের ছোট্ট বালিশটা আয়ার ঘর থেকে নিয়ে ছুটে আসে অম্বি। চারুবালার বিছানার এক পাশে রাখে, গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ে।

প্রমাদ গনে চারুবালা। ঘর থেকে সরে গেল চারুবালা। আয়া এসে অম্বিকে বোঝায়—এখানে তোমার শুতে নেই।

—কেন ? রমা শোয় কেন ?

আয়া বলে—রমা হল আম্মির মেয়ে।

—আমি তা হলে কী ?

—তুমি আম্মির মেয়ে নও।

অন্য ঘরে গম্ভীর হয়ে বসে ছিল উপেন আর চারুবালা। —আম্মি, আম্মি ! চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসে অম্বি।

চারুবালা—কী ?

অম্বি—আম্মি, রমা বুঝি একলাই তোমার মেয়ে ?

চারু—হ্যাঁ।

অম্বি—আমি আম্মি ?

চারুবালার করুণভাবে হাসে—তুমি আমাদের মেয়ের মত।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচ বছর বয়সের একটা মূর্তি। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় মায়াময় কৌতূহল যেন আজ সব চেয়ে কঠিন একটা উত্তরের আঘাত পেয়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। দুষ্টু অম্বিকে মুহূর্তের মধ্যেই একেবারে ধীর স্থির ও শান্ত ক'রে দিয়েছে, ওই একটি উত্তর।

উপেন বলে—খেয়েছ অম্বি ?

অম্বি—না।

উপেন—খেতে যাও, আয়া খাইয়ে দেবে।

শান্তভাবেই, বাধ্যভাবে, ধীর ধীরে চলে যায় অম্বি।

ধীরে ধীরে শোবার ঘরে ঢোকে। চারুবালার বিছানার এক পাশে ছোট বালিশে ঘুমিয়ে আছে রমা। রমার মুখের দিকে একবার তাকায়। তার পর নিজের ছোট বালিশটাকে হাতে তুলে নিয়ে চলে যায় অম্বি।

জাতের ভয়ে নয়, মায়ার ভয়ে যে সাবধানতার প্রাচীর তুলে দিল উপেন আর চারুবালা, সেই প্রাচীর অটুট হয়েই রইল এই পরিবারের আরও পনেরোটি বছরের জীবনে। বেরিলি গোরখপুর আর শিলিগুড়ি, একে একে সার্ভিসের এক একটি অধ্যায় শেষ ক'রে অবসর জীবনের আশ্রয় কলকাতার বাড়িতে এসে যখন ঠাঁই নিলেন উপেন, তখনও দেখতে পাওয়া গেল যে, এই পরিবারের বাপ-মায়ের স্নেহের কক্ষটি সেইরকমই দুভাগে ভাগ করা আছে। সেই প্রাচীর আজও আছে।

একটি ঘরে চারুবালার খাটের পাশেই আর এক খাটে শোয় আপন মেয়ে রমা, আর পাশের ঘরে একটি খাটে শোয় অম্বি। দুই ঘরের মাঝখানে একটি দরজা, এবং এই দরজা যদিও বন্ধ থাকে না, তবু একটি পর্দা ঝুলতে থাকে। আপন মেয়ে আর পরের মেয়েকে এইভাবেই পৃথক ক'রে রেখেছেন চারুবালা। আপন মেয়ে রমা হল নিকটে, আর পরের মেয়ে অম্বি একটু দূরে।

বিগত পনেরো বছর ধরে এই সাবধানতার প্রাচীরকে একটু একটু করে আরও কঠিন করে তুলতেও ভুলে যাননি উপেন আর চারুবালা। রমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য মাস্টার এসেছে। এসেছে ইংরেজির মাস্টার, আর গানের ও সেলাই-এর মাস্টারনি। অম্বি শুধু একটু দূর থেকে আর আড়াল থেকে দেখেছে। কাছে যায়নি। নিষেধ ক'রে দিয়েছেন আপ্পি আর আম্মি।

এই ব্যবধান স্বীকার করে নিয়েছিল অম্বি। মেয়ে নয়, মেযের মত হয়ে থাকবার যে অধিকার পেয়েছে অম্বি, সেই অধিকারের চেয়ে বেশি কোনও অধিকার তার নেই।

অম্বি হয়ত বুঝতে না পেরে প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়েছিল, কী ক্ষতি হবে লেখাপড়া শিখলে ? কেন তাকে গান শিখতে দিতেও এত আপত্তি করেন আপ্পি আর আম্মি ?

উপেন আর চারুবালার চিন্তার যুক্তিগুলি কোনওদিন দেখতে পায়নি, তাই বুঝতেও পারেনি অম্বি।

সাবধান হয়েছিলেন উপেন, সমাজের দিকে তাকিয়ে। আর অম্বির ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে। লেখাপড়া শিখে অম্বি যদি একটা ভদ্রলোকের মেয়ের মনের মত মন পেয়ে বসে, তবে সমস্যা যে আরও জটিল হয়ে উঠবে।

বহু দূর অতীতের সেসব চেষ্টার কাহিনী এখন অতীতের একটা স্মৃতি মাত্র। আজ দেখা যাচ্ছে, উপেন আর চারুবালার প্রত্যেকটি পরিকল্পনা যেন ব্যর্থ ক'রে দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে অম্বি। যে মেয়েকে ভদ্রলোকের মেয়ের মত হতে দিতেও চাননি, বাড়ির মেয়ের মতও মনে করতে চাননি, সেই মেয়ে আজ তাঁদের নিজের মেয়ের মত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ওই মেয়ের মত পর্যন্ত, বাস, আর নয়, তার বেশি নয়। অম্বিকে মানুষ করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গিয়েছেন উপেন আর চারুবালা। কারণ, সমস্যাটা এসেই পড়েছে। রমার বিয়ে দিতে হবে, অম্বিরও বিয়ে দিতে হবে। ভয় হয়, অম্বি যদি রমার মতই শখ আর মন পেয়ে বসে ? রমার জন্য যেরকম পাত্র পাওয়া যাবে, অম্বির জন্য সেরকম পাত্র তো আর পাওয়া যাবে না। জাত-পাত-জন্মের ইতিহাস নিয়ে অম্বির একটা পরিচয় আছে, আর সেই পরিচয়টা তো সুবিধের নয়। সুতরাং, কে বিয়ে করবে অম্বিকে, জাত-পাত শিক্ষা-দীক্ষা ও অবস্থার দিক দিয়ে একটু নিচু গোছের মানুষ ছাড়া ? তাই একটু কঠিনভাবেই সতর্ক হয়েছেন উপেন ও চারুবালা।

একজন মেয়ে, আর একজন মেয়ের মত। এই নিয়মে নিজেদের মনকে বেঁধে রেখেছেন উপেন আর চারুবালা। কিন্তু বাইরের আগন্তুকের চোখে ঠিক উল্টোটাই বোধ হয়। মনে হয়, রমাই যেন

একটু দূরের একটা প্রাণ, আর অম্বি একেবারে নিকটের। রমা যেন এবাড়ির স্নেহ আর আদরের মাথায় চড়ে বসে আছে, আর অম্বি রয়েছে কোল ঘেঁষে আর বুক ঘেঁষে।

ভোরে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে ঘড়ির দিকে তাকাতেই ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে অম্বি। মনে পড়ে যায়, ঘরের নানান কাজের কথা। মনে পড়ে আম্পি এতক্ষণে বাইরে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে। কিন্তু ঠাকুরটা কি চা এনে দিয়েছে এতক্ষণে ? নিশ্চয়ই দেরি করছে ঠাকুর। প্রথমেই ঠাকুরকে চায়ের তাগিদ দেয় অম্বি। পরে নিজেই ব্যস্তভাবে চা তৈরি ক'রে নিয়ে উপেনের হাতের কাছে এনে দেয়। সস্নেহ স্বরে কথা বলেন উপেন, তুই এত ব্যস্ত হয়ে উঠিস কেন অম্বি ? দুমিনিট দেরি হলই বা।

উপেন বেড়াতে যাবেন, কিন্তু অম্বি একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উপেনকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয় না।—এ আলোয়ানটা ছেঁড়া, এটা কেন গায়ে দিয়েছ ? ঘরের ভিতর থেকে অন্য একটা আলোয়ান নিয়ে এসে উপেনের গায়ে জড়িয়ে দেয় অম্বি।

রাঁধুনী-দিদির সঙ্গে আলাপ করে অম্বি, ঘরে কী আছে আর কী নেই, এবং কী আনতে হবে। নিজেই ঘরে ঢুকে মশলার শিশি থেকে তরকারির ডালা পর্যন্ত অন্বেষণ করে। তারপর লিখতে বসে বাজারের ফর্দ। উপেন ভোরের হাওয়া খেয়ে ফিরে এসেই আবার বাজারে যান একবার। অম্বি তার আগেই বাজারের ফর্দ আর হিসাব তৈরি ক'রে রাখে।

এঘর আব ওঘর ঘুরে কাজ করে অম্বি। ঠাকুর চাকর ও মালীকে নির্দেশ দেয়। বাগানের গাছে জল দেওয়া থেকে শুরু ক'রে বারান্দার ফুলের টবের সেবার কাজ পর্যন্ত, সবই একবার নিজের চোখে না দেখে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না অম্বি। এই বাড়ির প্রাণটাকেই যেন দুহাতে আগলে রাখতে চায় অম্বি, তারই জন্য ক্ষান্তিহীন কাজের দায় গ্রহণ করেছে। কোন কাপড় ধোপাকে দিতে হবে, আর কোন কাপড় বাড়িতেই কাচতে হবে, তারও লিস্ট ক'রে ফেলে অম্বি। তাগিদ দেয় ঠাকুরকে, আম্মির স্নানের জন্য গরম জল হল কি না ?

এই ভাবেই চলে অম্বির কাজের-জীবনের পালা। রমার জীবনের পালা অন্য রকমের। সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যস্ত হয়ে ওঠে রমাও। সে ব্যস্ততার রূপ ভিন্ন। পড়ার তাগিদ, লেখার তাড়া। কলেজের উৎসবে আবৃত্তি করতে হবে, তার জন্য শেক্সপিয়র আর মাইকেল থেকে কবিতা মুখস্থ করার সাধনা। স্পোর্টসও আসছে, স্কিপিং-এর দড়ি নিয়ে ছাদে চলে যায় রমা। টিউটর আসেন। রমার পড়ার ঘরে যখন জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পাঠ মুখর হয়ে ওঠে, তখন অন্য ঘরে আলনার উপর আম্পির ধুতি আর চাদর গুছিয়ে রাখতে থাকে অম্বি। তারপর কলেজের বাস আসে। ব্যস্তভাবে হেঁটে বাসের ভিতরে গিয়ে বসে রমা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অম্বি। মুখে হাসি লেগে থাকে অম্বির কিন্তু সে হাসি যেন একটু ক্লান্ত। শরীরটাকেও এতক্ষণে যেন একটু ক্লান্ত বলে মনে হয় অম্বির। আস্তে আস্তে বাগানে নেমে এক গাছের ছায়ায় বসে লেস বুনতে থাকে অম্বি।

এই লেস বোনাও যেন অম্বির জীবনের এক বেআইনি সাধনা, তাই সন্তর্পণে আর চারদিকে চোখ রেখে লেস বোনে অম্বি। আম্মি যেন না দেখতে পান। গানও শুধু গুনগুন করে অম্বির মুখে, একটা তৃষ্ণাকে যেন বুকেব ভিতর গোপন করে রাখছে অম্বি। যেন শুনতে না পান আম্মি। কারণ, এই সবই তার জীবনের নিষেধ।

ব্যারাকপুরের এই নতুন বাড়ির আর এক নিভৃতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চিন্তাকুল আলোচনা চলতে থাকে।

চারুবালা বলেন—সেই তো, সেই সমস্যাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল। পরের মেয়ে নিজের মেয়ের মত হয়ে উঠল, অথচ...।

উপেন—কী হল ?

চারু—কে এখন বিয়ে করবে এই নিরেট মুখখু মেয়েকে ?

উপেন—সমস্যাই বটে। তবে, ধরো, বাঙালি সমাজেরই মধ্যে যদি এমন কোনও ছেলে পাওয়া যায়, জাতে যাই হোক, লেখাপড়া সামান্য কিছু শিখেছে, আর ছোটখাট চাকরি বা দোকানদারি-টারি করছে, খেয়ে পরে বাঁচবার মত রোজগার করছে.. ।

চারু—পাওয়া আর যাবে না কেন। খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।

উপেন—তা ছাড়া, যদি ভাল বরপণ দিই তবে...।

চারু—তা হলে তো হয়েই গেল। অম্বির মত মেয়েকে খুশি হয়ে বিয়ে করতে রাজি হবে।

হঠাৎ রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন উপেন—কিন্তু অম্বি রাজি হবে কি ?

স্বামী-স্ত্রীতে আবার বচসা বাধে। সেই পুরনো আক্ষেপ আর অভিযোগ। অম্বি যদি রাজি না হয় তবে তার জন্য দায়ী কে ? কে ভুল করেছে ? অম্বিকে লেখাপড়া না শেখাতে বলেছিল কে ?

স্বামী-স্ত্রীতে আর একটা প্রশ্ন নিয়ে অভিযোগের হানাহানি চলতে থাকে। কে আদর দিয়ে দিয়ে অম্বির মনটাকে শৌখিন ক'রে তুলেছে ? উপেনের মতে, আদর দিয়েছেন চারুবালা। চারুবালার মতে, আদর দিয়েছেন উপেন।

স্বামী-স্ত্রীর, এই বাড়ির বাপ ও মার এই রুক্ষ রুষ্ট কথার হানাহানির মধ্যে যেন একটা করুণতা আছে। বুঝতে পেরেছে দুজনেই, অম্বির মন তাঁদেরই মেয়ের মত একটা মন হয়ে উঠেছে। যার তার হাতে অম্বিকে গছিয়ে দিলেই কি সুখী হতে পারবে অম্বি ?

স্বামী-স্ত্রীর আলোচনার স্বর আবার শান্ত হয়ে আসে। সমস্যার সমাধানের জন্য এইবার একটু শক্ত মন নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। সিদ্ধান্ত করেন দু'জনেই। প্রথম, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক।

সুশ্রী সুন্দরী গৃহকর্মনিপুণা পাত্রী, সাধারণ লেখাপড়া জানা, সাধারণ উপার্জনক্ষম পাত্র হলেই চলবে। ভাল যৌতুক দেওয়া হবে।

আর, দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল, অম্বি যেন বুঝতে পারে যে, আপত্তি করা বা রাজি না হওয়া ওর পক্ষে সাজে না। রমার পক্ষে যা সাজে, ওর পক্ষে তা সাজে না। রমা এবাড়ির মেয়ে এবং অম্বি এবাড়ির মেয়ে নয়। সুতরাং, নিজের ভাগ্যকে চিনতে শিখে আর মেনে নিয়ে যেন অম্বিও বিদায় নেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রাখে।

চারুবালা বলেন—যাতে রাজি নয়, তাই করতে হবে।

রমাকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। রমার জন্য উপযুক্ত পাত্র খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। সমস্যা হল অম্বিকে নিয়ে। তাই অম্বির একটা গতি করে ফেলতেই হবে। আগে অম্বির বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর রমার।

মাত্র দুটি মাস হল ব্যারাকপুরের এই নতুন বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে উপেন-পরিবার। এই বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার জলে সূর্যাস্তের রক্তিম ছবি আর গান্ধী-মঠের সাদা চূড়া দেখা যায়। বাড়ির নির্মাণও এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। পশ্চিমের বারান্দার সিঁড়িটা, দোতলার দক্ষিণের ব্যালকনি এখনও অসম্পূর্ণ। প্রতিবেশীদের সকলের সঙ্গে এখনও ভাল করে পরিচিতও হননি উপেন।

পাশের বাড়ির জানালায় মহিলাদের কৌতূহলী চক্ষু মাঝে মাঝে এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। নিকটের বাড়ির দুই ফ্ল্যাটের দুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতিবেশিনী দুই মহিলার মধ্যে আলোচনা এবং গবেষণাও মাঝে মাঝে ধ্বনিত হতে শোনা যায়। বিশেষ করে রমা আর অম্বির সম্পর্কেই আলোচনা হয় বেশি।

একজন বলে—পিঠোপিঠি আপন বোন বলেই তো মনে হয়। কিন্তু বয়স যেন সমান সমান।

আর একজন বলেন—নিশ্চয় যমজ বোন।

—মেয়ে দুটো ভালই।

—একটি একটু বেশি শান্ত।

—একটি একটু বেশি চঞ্চল।

—একজন বাপের মুখের আদল পেয়েছে, আর একজন মায়ের মুখের আদল পেয়েছে।

তৃতীয় আর এক মহিলা আর এক ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আলোচনায় যোগ দেন এবং সকলকে চমকে দিয়ে বলেন—দু-বোন নয়।

—তবে।

—একজন হল উপেনবাবুর মেয়ে।

—কোনটি ?
—ওই, যেটি কলেজে পড়ে।
—আর একটি কে ?
—আর একটি হল মেয়ের মত।
—সে আবার কী ?
—কী জানি, মেয়ের মার সঙ্গে আলাপ হল, উনি তো তাই বললেন।
সেই ক্ষণে উপেনের বাড়ির জানালায় দুটি হাসি-হাসি মুখ এক সঙ্গে দেখা দেয়।
একজন প্রতিবেশিনী বলেন—তোমাদের কথাই হচ্ছিল।
রমা—কী কথা ?
প্রতিবেশিনী—ও তোমার কে হয় ?
রমা—বোন।
প্রতিবেশিনী—এ কিরকম হল ? তোমার মা বললেন, ওটি হল তাঁর মেয়ের মত।
রমা—তাতে কী হল ?
প্রতিবেশিনী—তা হলে তো আর বোন হল না।
রমা—তা হলে বোনের মত ?

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কথাটা বলেই জানালা থেকে সরে আসে রমা। আর ঘরের নিভৃতে এসে অম্বিকে যেন ঠাট্টা ক'রে রাগাতে থাকে—বোনের মত ! বোনের মত !

মেয়ের মত, এই কথাটাকেই যেন সহ্য করতে পারে না অম্বি। কিন্তু সহ্য করতে হয়। আম্মি বা আপ্পি, যখনি যাঁর কাছে অম্বির পরিচয় দেবার সময় এই কথাটা উচ্চারণ করেন, তখনই অম্বির বুকের ভিতর যেন একটা কাঁটার খোঁচা লাগে। মলিন হয়ে ওঠে মুখটা। কখনও আভাস দিয়ে ছলছল করে চোখ। এটা যে একটা পরিচয়ই নয়। কথাটা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেয় অম্বিকে, এই পৃথিবীতে যেন বিনা অধিকারে আর ভুল ক'রে জন্ম লাভ করেছে ওর জীবন।

অম্বির বিষণ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে রমা যেন আজ একটু বেশি বিচলিত হয়। অম্বির হাত ধরে টান দেয় রমা। —আয় তো একবার আমার সঙ্গে।

আপত্তি করে অম্বি, কিন্তু অম্বিকে জোর ক'রে হিড়-হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যায় রমা। একেবারে এসে থামে সেই ঘরের দরজার কাছে, যেঘরের নিভৃতে বসে আলাপ করছিলেন উপেন আর চারুবালা।

উপেন আর চারুবালাকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করে রমা। —তোমরা অম্বিকে শুধু 'মেয়ের মত' 'মেয়ের মত' কর কেন ?

ভয়ার্তের মত বিব্রতভাবে তাকিয়ে থাকেন উপেন আর চারুবালা। রমা বলে—আজ পর্যন্ত আমাকে বললেই না, ও আমার কে ?—আমার বোন নয় ?

চারুবালা বলেন—বোন বইকি ?
—তবে তোমার মেয়ের মত হয় কী করে ?
—তুই ওসব বুঝবি না।
—বুঝিয়ে দিতে হবে।
—ওকে আমরা পেলেছি।
—আমাকে পালনি বুঝি ?
—ওকে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছি।
—আর আমাকে ?
—তুই যা, ওঠ এখান থেকে। তুমি অনেক জ্বালা জ্বালিয়ে হাড়মাস ভুগিয়ে তবে এসেছ।
রমা বলে—বুঝলাম, অম্বি তোমাদের জ্বালায়নি বলেই ও হল মেয়ের মত।

উপেন ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে যেন তাঁর নিশ্বাসের বেদনা দমন করবার চেষ্টা করেন। রমা বলে—আম্মি কথাটার মানে কী মা ? মায়ের মত ?

চারুবালা রাগ করেন—মায়েব মত কেন হবে ! ওটা একটা কথা, কথাটার মানে হল, মা ।

রমা—শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াচ্ছে, ও হল আমার বোন, তুমি হলে ওর মা, কিন্তু ও হল তোমার মেয়ের মত । অদ্ভুত !

চলে গেল রমা। অম্বিকেও হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেল। অম্বি বলে—তুই কী আবোল-তাবোল বকছিস, আম্মি কী ভাববেন বল তো ?

কিন্তু ঘরের নিভৃতে নীরব হয়ে বসে রইলেন উপেন আর চারুবালা। রমা মেয়েটার মুখরতাগুলি কী ভয়ানক ! মুহূর্তের মধ্যে মনের কতগুলি গর্ব বিশ্বাস ও ধারণাকে যেন এলোমেলো ক'রে দিয়ে গেল রমার প্রশ্ন আর মন্তব্যগুলি ।

কথা প্রসঙ্গে উপেন আর চারুবালার মধ্যে আলোচনা আবার একটু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উপেন বলেন—অম্বি যদি আজ আমাকে বাপের মত মনে করে, আর তোমাকে মায়ের মত মনে করে... ।

চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবালা—কেন মনে করবে ?

উপেন—কী আশ্চর্য, কথাগুলি গায়ে বিঁধছে কেন তোমার ? তুমি তো এই চাইছ। অম্বি যেন আমাদের আপন বাপ-মা বলে না মনে করে, এতদিন ধরে অম্বিকে তাই মনে করাতে চেয়ে এসেছ, চেষ্টাও করে আসছ। তবে আজ কেন... ।

চারুবালা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে শেষে অভিযোগ করেন—আমাকে তর্কে হারিয়ে তুমি কী সুখ পাচ্ছ বুঝি না। কিন্তু আমি ভালর জন্যই চেয়েছি, অম্বি যেন নিজেকে রমার সমান মনে না ক'রে বসে।

অগত্যা উপেনও তাঁর মনের অভিমান আর উষ্মাকে একটু শান্ত ক'রে আনেন এবং চারুবালার মতেই সায় দিয়ে স্বীকার করেন—হ্যাঁ, সমস্যা হল সেইখানে। জাত বুঝে একটু নিচু ঘরে, নিচু অবস্থার ঘরেই ওকে বিয়ে দিতে হবে, কিন্তু ও এই ভুলই বুঝবে যে, আমরা ওর ওপর নিষ্ঠুরতা করলাম ।

চারুবালা বলেন—উচিত হচ্ছে, এবার একটু ভাল করেই শক্ত হওয়া, যেন অম্বি ভুল না বোঝে ।

বাইরের বারান্দায় আগন্তুক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরের সাড়া পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন উপেন। চারুবালা বলেন—বোধ হয়, মেজমামা এসেছেন ।

চারুবালার মেজমামা অর্থাৎ উপেনের মামাশ্বশুর এসেছেন। উপেন আর চারুবালা বাইরে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। হলঘরে বসে মেজমামাও নানা কুশল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন, কই তোমার মেয়েরা কই ?

চারু—মেয়েরা তো নয়, একটি মেয়ে ।

মেজমামা—আর সেই পালিতা মেয়েটা ?

চারু—হ্যাঁ, সেও আছে ।

মেজমামা—ডাকো, একবার দেখে যাই ওদের ।

রমা আর অম্বি এসে প্রণাম করে চারুবালার মেজমামাকে। মেজমামা সস্নেহে রমার একটা হাত ধরে বলেন—এটা বুঝি তোমার সেই পালিতা মেয়েটা ? আর ওটি হল তোমার আপন... ?

মুহূর্তের মধ্যে অম্বির মুখের উপর দিয়ে যেন এক দুর্লভ হর্ষের দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে চলে যায়। ভুল ক'রে যে কথাটা বলে ফেলেছেন আম্মির মেজমামা, সেই কথাটাই যে অম্বির জীবনের স্বপ্ন ।

কিন্তু দেখা যায়, মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা পরাভবের আঘাতে অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে চারুবালার মুখ। চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবালা—না, ওই তো রমা, আমার আপন মেয়ে। আর ওই হল অম্বি...এখন আমার মেয়েরই মত ।

অম্বির দু চোখের হর্ষ আবার নিষ্প্রভ হয়ে যায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি, তারপর চলে যায় ।

চারুবালা কথা প্রসঙ্গে নিজের মেয়ে রমার নানা গুণের কথা বলতে থাকেন। লেখাপড়ায় ভাল, থার্ড ইয়ার, ইংরেজিতে অনার্স নিয়েছে। স্পোর্টসে প্রাইজ পায়, ডিবেটে আর আবৃত্তিতে প্রাইজ পায়। ভাল গাইতে পারে, ক্র্যাফটস শিখেছে নানা রকম ।

রমা আপত্তি করে এবং মায়ের মুখে তার এই প্রশংসার কীর্তন শুনে লজ্জাও পায়। কিন্তু চারুবালা বলেন—রমার জন্য একটি ভাল পাত্র আপনি খোঁজ করুন মেজমামা।

পরমুহূর্তে অন্য ঘরে গিয়ে একটা আলমারি থেকে কতগুলি এমব্রয়ডারি আর লেসের কাজ তুলে নিয়ে এসে মেজমামার চোখের সামনে তুলে ধরেন চারুবালা। —আপনি দেখুন মেজমামা। নিজের মেয়ে বলে বাড়িয়ে বলছি না। রমার হাতের কাজ কত সুন্দর দেখুন।

চেঁচিয়ে ওঠে রমা—এগুলি আমার তৈরি নয় মা।

—তোর নয় ? তবে কার ?

—অম্বি করেছে !

—অম্বি ? অম্বিকে কে শেখাল ? তুই ?

—না, নিজে শিখেছে।

—নিজে শিখেছে ? তোর দেখাদেখি ?

—আমি কিন্তু কোনওদিন দেখিয়ে দিইনি।

অপ্রসন্নভাবে চুপ করে এবং মনের ভিতর পরাভবের ক্ষোভ কোনওমতে সংযত করে দাঁড়িয়ে রইলেন চারুবালা। মেজমামা আশ্বাস দিয়ে গেলেন, উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করবেন।

তার পরেই অন্য ঘরে অম্বির কাছে গিয়ে যেন একটা চাপা আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য উপস্থিত হলেন চারুবালা। —এসব তুই শিখলি কবে ?

—অনেকদিন আগেই।

—তবে লুকিয়ে রেখেছিলি কেন ? আমাকে বলিসনি কেন ?

উত্তর দেয় না অম্বি। চারুবালা মন্তব্য করে—বুঝেছি।

অম্বি ছলছল চোখে বলে—কী বুঝলে আম্মি ? আমি কিন্তু...

কিন্তু ক্ষুব্ধভাবেই অম্বির আদুরে ভঙ্গির প্রশ্ন আর কাতর স্বর উপেক্ষা করে উপেনের কাছে এসে তর্ক বাধিয়ে বসেন চারুবালা। —সমস্যা খুবই খারাপ দিকে গড়াচ্ছে।

—কী ?

—রমাকে হিংসে করতে আরম্ভ করেছে অম্বি।

মেজমামার মন্তব্য শুনেই চারুবালার সংস্কারের গর্ব আহত হয়েছিল। তাঁর নিজের মেয়েকে পালিতা মেয়ে বলে বোধ হয়েছে মেজমামার, আর অম্বিকে আপন মেয়ে। অম্বির মুখের হাসিটাও লক্ষ্য করেছেন চারুবালা। অভিযোগ করেন চারুবালা—দেখলে তো, ওর মনে বিষ ঢুকেছে।

উপেন বলেন—অম্বিকে দোষ দিচ্ছ কেন ? বলো, মেজমামার চোখে বিষ আছে।

—কেন ?

—আমরা ওকে মেয়ের মত বলছি, কিন্তু পৃথিবী যে সেটা বুঝতে চাইছে না।

চারু—তুমি বলতে চাও, ভুল করছে পৃথিবীর মানুষ, অম্বি নয় ?

হতাশভাবে উপেন বলেন—কে জানে ?

উপেন আর চারুবালার আলোচনায় আবার নানারকম সতর্কতার সিদ্ধান্ত একে একে দেখা দিতে থাকে। লোকে যেন ভুল না বোঝে, যেন পৃথিবীর চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিতে পারে, রমা হল আপন মেয়ে, আর অম্বি মেয়ের মত। এইবার পৃথিবীর চোখের সামনেই অম্বিকে নিজেদের কাছ থেকে, এই পরিবারের অন্তরের বৃত্ত থেকে একটু ভিন্ন করে না রাখলে ভুল করবে সবাই, আর অম্বির মনও মিথ্যা গর্বে ও বিশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাবে।

অম্বিকে স্পষ্ট করেই বলে দিলেন চারুবালা—ওসব কাজ তোমার সাজে না, দরকারও নেই। রমা যা করবে, তোমাকে তাই করতে হবে, এর কোনও মানে নেই। মেজমামার কাছে আমাকে যেরকম নাকাল করলে, এরকম যেন আর কখনও আমাকে করো না।

লেসের বোঝা একটা আবর্জনার পিণ্ডের মত পাকিয়ে নিয়ে চুপ করে ঘরের একান্তে বসে থাকে অম্বি। ছটফট করে। তারপর আলমারির মাথার উপরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেই লেসের স্তূপ,

বিছানার উপর শুয়ে পড়ে অলসভাবে, বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে অম্বি।

অম্বি আর ভুল করতে চায় না। বুঝেছে অম্বি, আম্মি আর আম্মির মনের দুঃখটা কোথায়? রমার পক্ষে যে কাজ সাজে, অম্বির পক্ষে সে কাজ সাজে না। রমার সঙ্গে যেন কোনও কাজের তুলনার মধ্যে পড়তে না হয়। রমা যেসব কাজ করে না, এইবার থেকে মাত্র সেই সব কাজের মধ্যে হাত দুটোকে উৎসর্গ করে দিতে হবে। আর, আম্মি ও আম্মি যেন কখনও বুঝতে না পারেন, কোনও দুঃখ আছে অম্বির মনে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসে অম্বি। ঘর থেকে বের হয়। তারপর এঘর থেকে ওঘর ঘুরে কাজ করতে থাকে। মনে পড়ে, চোখে দেখতে পায়, আম্মির জুতোগুলিতে পালিশ নেই। বিকেল হয়েছে, বেড়াতে বের হবেন আম্মি। অম্বি ব্যস্তভাবে আম্মির জুতোতে পালিশ লাগাতে থাকে।

রমা সাজসজ্জা সেরে ব্যস্তভাবে এসে অম্বিকে দেখে বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে—এ.কী, তুই এখনও এসব করছিস কী? বেড়াতে যাবি না?

—আমি বেড়াতে যাব না।

—তার মানে?

—তার মানে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।

বাইরের ঘরে গিয়ে উপেনের পায়ের কাছে জুতো জোড়া এগিয়ে দিয়ে অম্বি বলে—ও জুতো রাখো। এটা পরো।

চারুবালা আসেন। রমা চিৎকার করে—অম্বি এরকম বদমাইশি করছে কেন?

—কী?

—বলছে, বেড়াতে যাবে না।

—নাই বা গেল, তুই একা যা।

রমা আপত্তি করে—আমি একা যাব না।

অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে রমা বলে—তুই না বলেছিলি, গঙ্গার ঘাটে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে?

অম্বি—হ্যাঁ বলেছিলাম, তাতে হয়েছে কী?

—তবে এখন যাবি না বলছিস কেন?

চারুবালা বলেন—যাবে না ওর ইচ্ছে, তুই জবরদস্তি করছিস কেন?

রমা—তা হলে আমারও যেয়ে কাজ নেই।

চুপ করে থাকেন চারুবালা আর উপেন। তারপর যেন অনিচ্ছার সুরে চারুবালা অম্বিকে বলেন—তবে তুইও যা।

ঘরের ভিতরে গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে অম্বি। অম্বির সাজ দেখে চমকে ওঠেন উপেন আর চারুবালা। একটা সাধারণ মিলের শাড়ি, আঁচলটা আবার ছেঁড়া, যেন ইচ্ছে করেই রুক্ষসুক্ষ একটা মূর্তি ধারণ করে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অম্বি।

রমা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে অম্বিকে ধমক দিতে থাকে। অম্বির ভাঙা বেণীটাকে নাড়া দিয়ে, আভরণহীন কানটাকে টিপে আর ছেঁড়া আঁচলটাকে দোলা দিয়ে রমা বলে—আমি যাব না, তোর সঙ্গে যেতে আমার ঘেন্না করছে।

মা ও বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অভিযোগ করে রমা—তোমরা ওকে এত লাই দিচ্ছ কেন? কিছু বলছ না যে?

নিরুত্তর হয়ে এদিক-ওদিক মুখ করে তাকিয়ে থাকেন চারুবালা ও উপেন।

অম্বি হেসে ফেলে, আর রমাকে পাল্টা ধমক দিয়ে বলে—তুই বেশি বাজে বকিস না। চলো আম্মি।

যাবার সময় চারুবালাকে বলে যায় অম্বি—দুধ জ্বাল দেওয়া হয়নি এখনও, রাঁধুনী-দিদিকে মনে করিয়ে দিও আম্মি।

অম্বির ভালর জন্যই এই রকম কঠোরতা করতে হয়েছে। এই ধারণা আছে বলেই কঠোরতা করতে পারলেন চারুবালা। কিন্তু, তবু উদাস দৃষ্টি মেলে পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন।

উপেনের পাশে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে দুটি মেয়ে, একটি নিজের মেয়ে, আর একটি পরের মেয়ে। চারুবালার চোখের দৃষ্টি কাঁপতে থাকে, যেন নিজের এই কঠোরতাকেই সহ্য করবার শক্তি খুঁজেছেন তিনি।

চাকর এসে প্রশ্ন করে—আপনি যে এখন বের হবেন বলেছিলেন মা, ট্যাক্সি ডাকব ?

মনে পড়ে চারুবালার, শ্যামবাজারে পিসিমার বাড়িতে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন।

ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখতে পান চারুবালা, ড্রেসিং আলমারির পাশে টুলের উপর রাখা আছে একটা নতুন তাঁতের শাড়ি, ব্লাউজ, মেঝের উপর ভেলভেটের একজোড়া চটি।

আম্বির জন্যই রেখে দিয়ে গিয়েছে অম্বি। কিন্তু দেখতে পেয়ে চারুবালার দুই চোখে যেন জ্বালা লাগে। কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা বিদ্রূপকে সাজিয়ে রেখে গিয়েছে মেয়েটা ! অম্বির নাম করে নিন্দা বর্ষণ করেন। —মেয়েটা যেন আমাকে জব্দ করার জন্যই জন্মেছে।

শেষ পর্যন্ত নতুন তাঁতের শাড়ি ঠেলে সরিয়ে রাখলেন চারুবালা। চাকরকে বললেন—আমি যাব না।

ফটকে গাড়ি এসে থামে। গাড়ি থেকে নেমে আসেন শ্যামবাজারের পিসিমা, সঙ্গে এক যুবক।

শ্যামবাজারের পিসিমা এর আগেও কয়েকবার এসেছেন ব্যারাকপুরের এই বাড়িতে। পিসিমার সংসার খুবই ছোট, একমাত্র নাতি ওই অধীরই হল পিসিমার যত স্নেহ উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার দায়। একবার কেদার-বদ্রী ঘুরে আসবেন, কিন্তু তার আগে নাতির বিয়ে দিয়ে সংসার থেকে দায়মুক্ত হতে চান পিসিমা। তাই কেদার-বদ্রীর আহ্বান বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কারণ অধীর কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। শুধু বই-পত্র আর লেখাপড়া নিয়ে যেন একটা খামখেয়ালের জগতে বাস করছে অধীর। পিসিমার মনে এটা একটা দুঃখ। অনেক কোম্পানির কাগজ আছে পিসিমার। মাঝে মাঝে রাগ করে বলেন পিসিমা—যদি বিয়ে না করিস, আমি আর মাত্র একটি বছর দেখব, তার পর হাসপাতালে সব সম্পত্তি দান করে দেব। পিসিমার হুমকি এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দেয় অধীর। অধীরই পাল্টা বিদ্রূপ করে, আমি বিয়েও করব না, আর তোমার সব কোম্পানির কাগজও খাব।

পিসিমা বলেন—ওটি হবে না।

পিসিমার সকল কথার মধ্যে কয়েকটি আগ্র্‌ সব চেয়ে বেশি প্রবল, এবং নিত্যদিন তাই নিয়েই আলোচনা করেন, বাড়ির ঝি'র সঙ্গে কিংবা সরকারমশাই-এর সঙ্গে। এক হল বংশের গর্ব, দুই কেদার-বদ্রী যাবার আকাঙ্ক্ষা, তিন অধীরের বিয়ের জন্য চিন্তা ! একটি বড় ঘর চাই, বড় ঘরের সুন্দর ও সুশিক্ষিতা একটি মেয়ে চাই। তাই পিসিমার এটা একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিদিন খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পাঠ করেন। কিন্তু কোনও পাত্রীই পছন্দ হয় না। প্রতিদিন অধীরকে একবার রাজি করাতে চেষ্টা করেন—বিয়ে করবি কি না বলিস ?

অধীর বলে—না।

—কেন ?

—ইচ্ছে হয় না।

—ইচ্ছে হলে করবি তো ?

—ইচ্ছে হবে না কোনওদিন।

পিসিমা বস্তুত একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। অধীরের বন্ধু যারা আসে মাঝে মাঝে, তাদেরও অনুরোধ করেন, বন্ধুকে বিয়ে করতে রাজি করাও।

অধীরের বন্ধু বলতে মাত্র দু-তিন জন যারা আসে, তারাও অধীরের মতই লেখাপড়ার জগতে বাস করে। সকলেই রিসার্চ স্কলার। ওদের মন পড়ে থাকে দূর বেলভেডিয়ারের ন্যাশনাল লাইব্রেরির গ্রন্থরাজ্যের মধ্যে। কেউ ইতিহাস, কেউ ভাষা, এবং কেউ বা সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে। পিসিমার অনুরোধ শুনে অনেকেই বিচলিত হয়, এবং অধীরকে অনুরোধও করে—তুমি বিয়ে করে ফেলো অধীর।

অধীরের উত্তরে সেই এক কথা। —যেদিন ইচ্ছে হবে।

—কবে ইচ্ছে হবে ?

—তা বলতে পারি না। মোট কথা মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল নয়।

বন্ধুরা হাসে। এই ধরনের আলোচনার জের মাঝে মাঝে ন্যাশনাল লাইব্রেরির কক্ষে এবং বারান্দার উপরে স্কলার বন্ধুদের এক ছোট সমাবেশের মধ্যেও দেখা দেয় এবং গ্রন্থরাজ্যের শুষ্কতার মধ্যে সরসতার ছোঁয়াও লাগে।

বেশি নয়, সংখ্যায় ছয় জন মাত্র। ন্যাশনাল লাইব্রেরির গ্রন্থরাজ্যের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সমাবেশ গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে প্রৌঢ় সৌম্যমূর্তি ডক্টর ব্যানার্জিও আছেন। আর সবাই যুবক। এক একটি কক্ষে নোটবই ও পেন ও বিপুল গ্রন্থের স্তূপ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই সকলে অধ্যয়ন করে চলে যান। কুশল প্রশ্ন, পারিবারিক সংবাদ এবং বিশেষ করে নিজের নিজের গবেষণার বিষয় নিয়ে সকলের মধ্যে বেশ একটি অন্তরঙ্গ আলোচনা চলে। পড়া শেষ হলে, কখনও অধীরের কক্ষে, কখনও ডাঃ ব্যানার্জির কক্ষে, এবং কখনও বা বারান্দায় অথবা লনের উপর একটি আলাপমুখর আড্ডা দেখা দেয়। অধীরের গবেষণার বিষয় হল—এভরি ম্যান ইজ বর্ন ইকোয়্যাল।

রুশো বলছেন, এভরি ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি। কিন্তু অধীর প্রমাণ করতে চায়, শুধু ফ্রি নয়, ইকোয়্যাল, জন্মগত কোনও সংস্কার বলেও কিছু নেই। হেরিডিটি একটা ভুয়া থিওরি। কাস্ট একটা অতি মিথ্যা, ব্লাড কোনও সংস্কারেরই ধারক নয়। এমন কি আপন-পর সম্পর্ক, আত্মীয়তাবোধ, এগুলিও হল অবস্থার সৃষ্টি। রক্তের বন্ধন, নাড়ির টান—এসবই ভুয়ো।

গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ছেলে অধীর। পিসিমাই গর্ব করে বলে থাকেন যে, সাত পুরুষ ধরে কুলীন ছাড়া অন্য কোনও নিচু ঘরে এই পরিবারের কোনও সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি।

অধীরের মনে যেন একটা ভয় আছে, বংশগত আভিজাত্যের ওই সংস্কারকে কোনওদিন বিশ্বাস না করে বসে অধীর ? তাই বন্ধুদের বলে, আমার এই রিসার্চ ডক্টরেট পাবার জন্য নয়, আমি আমার মনকেই বোঝাচ্ছি।

—এখনও কি বুঝতে পারনি ?

—একটু বাকি আছে।

হ্যাঁ, একটু বাকি আছে, আজও একেবারে সন্দেহহীন হতে পারেনি অধীর। পাণ্ডিত্যের দ্বারা যে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে, সেই সত্যকে আজও যেন অনুভব করতে পারছে না অধীর। একটা খটকা যেন অলক্ষ্যে মনের ভিতর রয়ে গিয়েছে। স্কলার বন্ধুদের কাছে সেই কথাও বলে অধীর। —আর একটি প্রমাণ চাই, তবেই আমার গবেষণার শেষ হবে। এমন একটি প্রমাণ, এমন একটি তথ্য, যে তথ্য অধীরের মনের খটকার অবশেষটুকু চূর্ণ করে দিয়ে বিস্ময় আর বিশ্বাসে ভরে দেবে মন।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এক নিগ্রো দার্শনিকের সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই ঘটনার বিবরণ পাঠ করে আশ্বস্ত হয় অধীরের মন। এই নিগ্রো দার্শনিকও চিকাগো ধর্মসভায় ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানগভীর সুন্দর এক ভাষণ দিয়েছিলেন। আফ্রিকার উপকূলে এক অরণ্যময় প্রান্তে এই নিগ্রো দার্শনিকের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। শত্রুপক্ষের আক্রমণে পরাজিত হয়ে গোষ্ঠীসুদ্ধ সকলের সঙ্গে বালকও রজ্জুবদ্ধ হয়ে জঙ্গলের প্রান্তে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়েছিল। অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল পাশে। শত্রুপক্ষ দামামা বাজিয়ে উল্লাসে নৃত্য করছিল। আর কিছুক্ষণ পরেই সকল বন্দির সঙ্গে বালককেও পুড়িয়ে মারবে জয়ী শত্রুর দল। জয়ী ও পরাজিত, দুই গোষ্ঠীই নাকি উগ্র নরখাদক সমাজের মানুষ। দৈব অনুগ্রহে পালিয়ে যাবার সুযোগ পেল বালক। হাত-পায়ের বাঁধন যেন হঠাৎ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। শত্রুর অগোচরে পালিয়ে এসে উপকূলের নিকটে শ্বেতাঙ্গ দাস-ব্যবসায়ীদের একটি জাহাজ দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিল বালক। ক্রীতদাস হয়ে আমেরিকায় চালান হল। সেই নরখাদক অরণ্যচারী মানুষের বংশজ নিগ্রো বালকই হল সেই দার্শনিক।

কিন্তু তবু সন্দেহ থাকে। হেরিডিটি, বংশজ গুণ ও শোণিতের সংস্কার কি সত্যই মিথ্যা ? ইউনেস্কোর রিপোর্ট পাঠ করে আর একদিন আর একবার বিস্মিত ও সেই সঙ্গে আশ্বস্ত হয় অধীর। ইউনেস্কোর তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে, রেসিয়্যাল ট্যালেন্ট বলে কিছু নেই। প্রতিভা জাতিগত নয়।

রক্তের মধ্যে উত্তম ও অধম কোনও জাতিভেদ নেই। তবু যেন মনে একটা সংস্কারের ছায়া ছটফট করে—সাত পুরুষের বংশগর্বে লালিত গোঁড়া হিন্দুর মন একটা প্রত্যয় খুঁজে পেতে চায়, সে এই গ্রন্থরাজ্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। নানা অরফ্যানেজ ঘুরে বংশগত সংস্কারের সত্যতা বা মিথ্যার বিচার করেছে অধীর, কিন্তু তাতেও নিঃসংশয় হতে পারে না।

খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পাঠ করতে করতে সেদিন চমকে উঠলেন পিসিমা—এ কী, উপেনই যে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। কই আমাকে তো একদিনও বলেনি।

উপেনের মেয়ে রমার কথা মনে পড়ে পিসিমার। এই তো উপযুক্ত মেয়ে। অনেকদিনের আগের মনের আশাটাকেও নতুন করে মনে পড়ে। অনেকদিন থেকে মনে মনে এই কথাটাই বুঝে এসেছেন পিসিমা, রমা যেমন উপযুক্ত মেয়ে, তেমনই উপযুক্ত ঘর—পালটি ঘর। পিসিমা জানেন, উপেনরাও সাত পুরুষ কুলীন ছাড়া অন্য কোনও নিচু ঘরে কাজ করেনি।

উপেনের মেয়ে রমার সঙ্গে যদি অধীরের বিয়ে দেওয়া যায়, তবে সব দিক দিয়েই ভাল হয়। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই পিসিমার। চেনা ঘর, দূর সম্পর্কে কুটুম্বও বটে। কিন্তু রাজি হবে কি খামখেয়ালি নাতিটা ?

বাড়ির ঝি-র সঙ্গে আলাপ করে পিসিমা তাঁর নিজের মনের ধারণাই প্রকাশ করেন, যদি একবার উপেনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ছোঁড়াটাকে ফেলতে পারি, তবে বুঝলে বটার মা, আজকালকার ছেলেদের তো চিনি। মেয়ের মুখের একটি কবিতা শুনলেই হয়ে যাবে।

কিন্তু যে একরোখা ছেলে, নিয়ে যাওয়া যায় কি করে ?

অনেক চেষ্টা করে, আর অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত অধীরকে রাজি করালেন পিসিমা। ওরে, উপেন হল তোর বাবার বন্ধু, তোর একটা ভদ্রতা থাকাও তো উচিত। আমি এর মধ্যে সাত দিন ঘুরে এলাম, তুই একদিনও গেলি না। ওরা কি ভাবলে বল দেখি ?

অধীর—উপেনবাবুর বাড়িতে মেয়ে-টেয়ে আছে নাকি ?

পিসিমা—থাক না, তাতে তোর কী ?

অধীর—তাতে তোমার কথার মানেটা বুঝতে পারতাম, এই আর কি !

পিসিমা রাগ করেন—তোকে সাধছে কে ? আমি কেদার-বদ্রী চলে যাচ্ছি, আর কোম্পানির কাগজ হাসপাতালে দান করে দেব।

অধীর হাসে—চলো।

চারুবালাকে প্রণাম করে অধীর। পিসিমা চারুবালার সঙ্গে যে আলোচনা করতে চান, সে আলোচনা অধীরের সম্মুখে চলে না। পিসিমা অধীরকে বলেন—তুই ও-ঘরে বসে বই-টই দেখ দাদু। আমরা একটু সংসারের কথা বলি।

রমার পড়ার ঘরে প্রবেশ করে অধীর এবং সত্যিই বই ঘাঁটতে থাকে। বই-এর পৃষ্ঠায় নাম লেখা—রমা রায়।

এদিকে পিসিমা ও চারুবালার আলোচনা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। পিসিমা বলেন—খবরের কাগজে দেখলুম, মেয়ের বিয়ে দিতে চাও। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, রমা পাশ না করার আগে রমার বিয়ে দেবে না। তাই আমি কিছু বলিনি, নইলে আমারও অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল কথাটা পাড়ি।

চারুবালা—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি অম্বির জন্য।

পিসিমা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে যান—অম্বির জন্য ? তাই বলো, তবে বৃথাই এলুম।

চারুবালার আগ্রহে পিসিমা সবিস্তার বর্ণনা করেন, অধীরের কথা। বিবরণ শুনে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন চারুবালা—আপনি এতদিন কেন বলেননি পিসিমা ? আপনার নাতি, তায় আবার এত গুণের ছেলে, এরকম পাত্র পেলে এখুনি রমাকে পার করে দিই। পাশ করবে না হয় পরে।

পিসিমা—তা হলে বলো ? উপেন রাজি হবে তো ?

চারু—খুব রাজি হবে। ভাগ্যি ভাল বলতে হবে, যদি এই বিয়ে হয়।

পিসিমা—কিন্তু একটা সমস্যা আছে। ছেলেকে রাজি করানো। তবে আমার বিশ্বাস কী জানো ?

রমাকে একবার দেখলে মন ফিরে যাবে। তাই ওকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আর তোমাদেরও বলি অধীরকে তোমরাও মাঝে মাঝে ডেকো।

—নিশ্চয়ই ডাকব।

—কিন্তু রমা কোথায় ?

—এই এল বলে, আর একটু অপেক্ষা করুন।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বারান্দায় কতগুলি পদধ্বনির সাড়া শোনা যায়। উপেন এসে ঘরে ঢোকেন। কিন্তু রমা আর অম্বি দুজনেই যেন নিজেদের মনের উল্লাসে কলরব জাগিয়ে আর হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে রমার পড়ার ঘরে।

পিসিমা এবং চারুবালা যেরকমের ঘটনা তৈরি করতে চাইছিলেন, তাই হল। রমার পড়ার ঘরে এক অপরিচিত যুবক বসে আছে, কল্পনা করতে পারেনি রমা আর অম্বি। দুজনেই ঘরের ভিতর ঢুকে অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

রমা প্রশ্ন করে—আপনি কাকে চান ?

অধীর—কাউকেই না। আমার দিদিমা এসেছেন এই বাড়িতে।

অন্য ঘরে, উপেনকে দেখেই পিসিমা প্রশ্ন করেন—রমা কোথায় ?

—রমা আর অম্বি ওই ঘরে।

চমকে ওঠেন পিসিমা। অপ্রসন্নভাবে ভ্রূকুটি করে বলেন—অম্বি আবার ওঘরে গেল কেন ?

চারুবালাও একটু বিচলিত হন। তিন অভিভাবক একসঙ্গেই ব্যস্তভাবে উঠে রমার ঘরে প্রবেশ করেন। পিসিমার নির্দেশে উঠে এসে উপেনকে প্রণাম করে অধীর। তারপর আলাপ আর প্রশ্নের পালা চলতে থাকে। উপেনের প্রশ্নে অধীর বলে—একটা চাকরিও করছি, আর রিসার্চও করছি।

চারুবালা বলেন—রমার জন্মদিন আসছে, সেদিন তোমাকে আসতেই হবে।

উপেন—শুধু জন্মদিনে কেন, রোজ আসবে, তুমি অবনীর ছেলে, বলতে গেলে আমাদের আপন জন।

অধীর—রমা কে ?

চারুবালা রমাকে দেখিয়ে দিয়ে পরিচয় শোনান—ওই আমার মেয়ে রমা, থার্ড ইয়ার চলছে, ইংলিশে অনার্স নিয়েছে। ডিবেটে প্রাইজ পেয়েছে, স্পোর্টসে প্রাইজ পেয়েছে।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে অম্বির দিকে তাকিয়ে একবার আমতা আমতা করে কী যেন বলতে চেষ্টা করেন চারুবালা, তার পরেই বলে ফেলেন—ওই হল অম্বি, আমাদের মেয়ের মতই।

অম্বির মুখের উপর যেন অদৃশ্য এক চাবুকের আঘাতের জ্বালা এসে লেগেছে। মুখ ঘুরিয়ে নেয় অম্বি। পিসিমা উপেক্ষাভরে অম্বির দিকে একবার তাকান। তাঁর ইচ্ছে অম্বি এখানে না থাকলেই ভাল।

অম্বিরও বোধ হয় হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ভুল হচ্ছে অম্বির। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা অম্বির পক্ষে সাজে না। এই মেলামেশার আসরে অম্বির কোনও কাজ নেই। যে কাজ অম্বিকে এখন করতে হবে, সেই কাজ মনে পড়ে যায় অম্বির। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে যায় অম্বি, এবং ঠাকুরকে চা তৈরি করতে নির্দেশ দেয়।

চায়ের কাপ নিজের হাতে নিয়ে পড়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয় অম্বি—আম্মি।

চারুবালা বের হয়ে আসেন। অম্বির মুখের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে থাকেন। অম্বির হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে চলে যান।—কী হল আম্মি ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে অম্বি। কিন্তু কোনও উত্তর দেন না চারুবালা। এবং ঠাকুরের কাছ থেকে অন্য এক কাপ চা নিজের হাতে নিয়ে চারুবালা ফিরে আসেন, এবং অধীরের হাতে তুলে দেন। অম্বি স্তম্ভিতের মত বারান্দার আর এক প্রান্তে উদাস ও আনমনার মত চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে—আবার কোথায় ভুল হল ?

পিসিমা আর অধীর বিদায় নিল। চারুবালা বলেন—তুমি তো আমাদের একেবারে পর নও অধীর। এসো মাঝে মাঝে। নিকট জন বলতে আমাদের আর কজনই বা আছে ?

সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। মনটা ভালই ছিল চারুবালার। অধীর ছেলেটিকে খুবই পছন্দ হয়েছে। উপেনও বার বার এসে চারুবালার সঙ্গে আলোচনা করেন ; এবং কথা প্রসঙ্গে আশাও প্রকাশ করেন—খুবই ভাল হয়, যদি অধীরের সঙ্গে রমার বিয়ে হয়।

চারুবালা আরও উৎফুল্লভাবে আশা প্রকাশ করেন—হবে না কেন ? রমাকে দেখে অপছন্দ হবার তো কোনও কারণই নেই।

উপেন আবার আবৃত্তি করেন সেই কথা—রমাকে নিয়ে তো কোনও সমস্যা নেই, সমস্যা হল অম্বিকে নিয়ে।

চারুবালা বলেন—রমার বিয়ের আগেই যদি অম্বির একটা গতি হয়ে যেত, তবে বেশ হত। বয়সে অম্বিই তো বড়, অন্তত মাস ছয়েক তো বটেই।

উপেন- -আমার মনে হয়, অম্বিও এখন সমস্যাটা বুঝতে পারছে, এখন তো আর সেই পাঁচ বছর বয়সের সেই মধুপুরের বাসার একটা বাচ্চা নয়। বড় হয়েছে, বুঝতেও পারছে। শুধু ভয় হয়, আমাদের যেন ভুল না বোঝে।

চারুবালা—কী ভুল করেছি যে আমাদের ভুল বুঝবে ?

উপেন উত্তপ্ত স্বরে বলেন—এই যে আজ কাণ্ডটা হল। মেয়েটাকে একটা ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে সারা রাজ্যি ঘুরিয়ে আনা হল।

চারুবালার মেজাজও উত্তপ্ত হয়—তুমি আমাকে খোঁটা দিচ্ছ মনে হচ্ছে !

উপেন—খোঁটা দিচ্ছি আমার অদৃষ্টকে। ছিঃ।

চারুবালা বিরক্তভাবে ঘর ছেড়ে চলে যান। যেতে যেতে মন্তব্য করেন—আমি লাই দিতে পারব না, পরের মেয়েকে মাথায় নিয়ে থাকতে পারব না।

চারুবালার মনের একটা ভয় এইবার চারুবালাকে সত্যই মাত্রা ছাড়া ভাবে কঠোর করে তুলেছে। পিসিমা সবই জানেন, কোনও এক জঙ্গলের কোনও এক অন্ত্যজ কুলি পিতা-মাতার সন্তান হল অম্বি। পিসিমা এই বাড়ির ধুলো মাড়ান, এই তাঁর যথেষ্ট কৃপা। অম্বি আছে বলেই পিসিমা এই বাড়ির জল খান না। তবু সব সহ্য করে আর ক্ষমা করে, এই বাড়ির মঙ্গলের জন্যই রমাকে ঘরের বউ করে নিয়ে যেতে চান পিসিমা। অধীরের সঙ্গে রমার বিয়ের প্রস্তাব এই মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি অধীর জানতে পারে যে, জাতপাতের সংস্কার তুচ্ছ করে এই বাড়ির মানুষগুলি এক অন্ত্যজ মেয়েকে নিয়ে স্নেহের আর আদরের মাখামাখি করছে। বড় বংশের ছেলে অধীরের মনে বড় সংস্কার থাকবে, এ তো খুব স্বাভাবিক। কিন্তু পিসিমা সহায় আছেন, তাই ও সমস্যা দেখা দেবে না। অম্বির জাতের কথা জানতেও পারবে না অধীর।

বারান্দা দিয়ে নিজের মনের উষ্মায় মন্তব্য করতে করতে চলে যাচ্ছিলেন চারুবালা, হঠাৎ সেই মন্তব্যের আঘাতে বারান্দার একপ্রান্তে একটি ছায়া নড়ে ওঠে। পরের মেয়ে—কথাটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছে অম্বি।

—আম্মি ? তীব্রস্বর আর্তনাদের মত আহ্বান শুনে থমকে দাঁড়ান চারুবালা। ডাক দিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অম্বি। অম্বির চোখে মুখে অদ্ভুত একটা শাণিত কৌতূহল ছটফট করছে। এরকম অশান্ত হতে অম্বিকে কখনও দেখেননি চারুবালা।

—আমি কে আম্মি ?

এত কঠোর আর এত স্পষ্ট একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না চারুবালা। প্রশ্ন শুনে হঠাৎ চমকে এক পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ান চারুবালা। অম্বি বলে—কোনওদিন বলনি, আজ বলতেই হবে। আমি না শুনে ছাড়ব না।

—তোর তো বড় সাহস বেড়েছে অম্বি।

—বলো, আমি না শুনে ছাড়ব না।

—কী শুনতে চাস ?

—আমার ছোঁয়া চা কি বিষ ?

চারুবালা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে—বুঝেছি, বেশ বুদ্ধি রেখে ঝগড়া করতে শিখেছিস তো ?

চিৎকার করে অম্বি—বলো, আমি কে, আমার ছোঁয়া চা মানুষে খাবে না কেন ?

মেজাজ হারিয়ে উত্তপ্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবালা—তুই ছোট জাত। সে জাতের ছোঁয়া ভদ্রলোক খায় না, সে জাতের দরজা মাড়ায় না ভদ্র জাতের মানুষ।

—আমার জাত ছোট কেন হল ?

—ছোট জাতের বাপ-মা'র ঘরে জন্মেছিস, তাই।

—কোথায় সেই ছোট জাতের বাপ-মা ?

—নেই, পৃথিবীতে নেই। থাকলে তুই আর আমার বোঝা হয়ে...।

চারুবালাব হাত ধরেছিল অম্বি, শক্ত করে। হাত ছাড়িয়ে চলে যান চারুবালা। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, উগ্র চোখের দৃষ্টি হঠাৎ জ্বালায় ছলছল করে ওঠে। ছটফট করে চলে যান চারুবালা। অম্বি একটা ভাঙা মূর্তির মত মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে।

নিজের ঘরে বিছানার উপর শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন চারুবালা। উপেন এসে বলেন—তুমি ওসব কথা ওকে কেন বলতে গেল ? কী লাভ হল ?

কোনও উত্তর দেন না চারুবালা। ঠাকুর এসে বলে—অম্বিদি বললেন, খাবেন না।

উপেন—অম্বি খায়নি এখনও ?

ঠাকুর—না।

চারুবালা উঠে বসে—তোমরা খেয়েছ ?

উপেন—হ্যাঁ, আমি খেয়েছি।

ঠাকুর—রমাদিও খেয়েছেন।

চারুবালা ঠাকুরকে বলেন—আমি খাব না।

ঠাকুর কুণ্ঠিতভাবে চলে যায়।

উপেন—নাঃ, আমার আর এসব ভাল লাগে না। উদ্‌ভ্রান্তের মত আব আক্ষেপের সুরে বলতে বলতে চলে যান উপেন।

কিছুক্ষণ পরেই চারুবালা ওঠেন। রান্নাঘরে ঠাকুরকে থালাতে খাবাব সাজাতে বলেন। নির্দেশ দেন—নিয়ে এসো।

অম্বির ঘরে ঢুকে ডাক দেন চারুবালা—অম্বি।

অম্বি ধড়ফড় করে উঠে বসে। চোখে হাসি দেখা দেয়। লজ্জা পায় অম্বি। একেবারে শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে যায় অম্বির চেহারা। উল্টো অনুযোগ ক'রে চারুবালাকে অম্বি প্রতিবাদ জানায়—ছিঃ, আম্মি, তুমি এসব কী করছ ? আমি একটুও রাগ করিনি আম্মি।

—তা হলে খা।

খেতে বসে অম্বি। চারুবালা বলেন—আমরা তো আর তোর পর নই, তোর ছোঁয়ায় আমাদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু বাইরের লোক, সমাজের আর পাঁচজন তো তোকে আর মায়ার চোখে দেখে না। তারা জাত বুঝে চলে।

উপেনের ছায়ামূর্তি দেখা যায়, দরজার বাইরে নিঃশব্দে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা দেখে শান্ত হয় উপেনের উদ্বিগ্ন চোখ, নিজের হাতে দুধের বাটি তুলে অম্বিকে খাইয়ে দিচ্ছেন চারুবালা।

অম্বির কাছে, একটা পরের মেয়ের কাছে এইভাবে হার মানতে মানতে চলেছে এই বাড়ির সব উষ্মা অভিযোগ সতর্কতা আর কঠোরতা। কিন্তু এখনও বোধ হয় বুঝতে পারেন না উপেন আর চারুবালা, তাঁরা হার মানছেন, হার মানতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের নিজেদেরই অন্তরের গোপনে নিহিত একটা স্নেহান্ধতার কাছে।

তবে এইবার কিছুটা আশ্বস্তও হয়েছেন উপেন আর চারুবালা। অম্বি তার জন্ম-পরিচয় জেনেছে। এইবার বুঝেছে অম্বি। বুঝেছে আরও ভাল করে নিজের অদৃষ্টকে। রমাতে আর অম্বিতে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যটুকু স্বীকার করে নিয়ে অম্বি নিশ্চয়ই এইবার তার ভাগ্যকে স্বীকার

করে নেবে শান্তভাবেই। আপ্পি আর আম্মির স্নেহকে সন্দেহ করবে না অম্বি।

সুতরাং, অম্বির বিয়ের জন্যও একটু ভাল করে চেষ্টা করতে হয়। জাতের সংস্কারে বাঁধা এই সমাজে কোথাও কোনও উদার মানুষ আছে, যে মানুষ জাত মানে না, শুধু মানুষের মেয়ে বলে সম্মান করে অম্বিকে ঘরে নিয়ে যাবে ? হয়ত আছে। কিন্তু কেমন করে খোঁজ পাওয়া যায় ?

অনুসন্ধান করেন উপেন। আশ্রমে পালিতা মেয়েদের বিয়ে হয় কোথায়, কেমন করে ? খোঁজ নিয়ে আরও হতাশ হয়ে পড়েন, এবং কল্পনা করতেও ভীত হয়ে ওঠেন উপেন। চারুবালাকে আরও চিন্তিত করে দিয়ে উপেন বলেন—যেখানেই খোঁজ করছি, দেখছি পাত্র আছে ঠিকই। কিন্তু একেবারে ভিন্ন ধর্মের পাত্র, যারা জাতপাত মানে না। তা ছাড়া, আর যে সব ব্যাপার শুনলাম, সে আরও ভয়ানক। যত নারী আশ্রম জুড়ে যত সব পাপীর দল বসে আছে। সেখানে বিয়েটা একটা কৌশল মাত্র, মেয়েগুলিকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যায়।

আতঙ্কিতভাবে তাকিয়ে থাকেন চারুবালা। —তোমাকে আর ওভাবে খোঁজ করতে হবে না। ওই বিজ্ঞাপনই ভাল। লোক বুঝে খোঁজখবর নিয়ে তবে সম্বন্ধ করা যাবে।

বিজ্ঞাপনেরই সূত্রে এক প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক এসে দেখা দিলেন একদিন। পাত্রের পিতা। উপেন স্মরণ করতে পারেন না, কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোক বলেন—আমি ও আপনি এক কলেজেরই ছাত্র ছিলাম। নামটা এখনও স্মরণে আছে, বিজ্ঞাপন দেখেই বুঝেছি। যাক, ওসব যৌতুক-ফৌতুকের আগ্রহে নয়, আপনার মত মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা হবে, মাত্র এই আগ্রহে। তা ছাড়া আপনাব মামাশ্বশুরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আপনার পরিচয় জেনে আরও আগ্রহ হল।

হ্যাঁ, ভদ্রলোক মেজমামার কাছ থেকে উপেনের সম্পত্তির কথা শুনতে পেয়েই উৎসাহিত হয়েছেন।

ভদ্রলোক বলেন, তিনি এসব বিষয়ে অতি উদার ; যৌতুক সম্বন্ধে তাঁর কোনও দাবি নেই, ওটা স্বেচ্ছার ব্যাপার। দাবি করা বর্বরতা। তিনি শুধু মানুষ বোঝেন। মানুষ ভাল হলেই সব ভাল।

ভদ্রলোক কথা প্রসঙ্গে সমাজের নিন্দা করেন। এখনও কতরকম জাত-পাতের সংস্কারে বাঁধা রয়েছে সমাজ ! বংশ বড় কথা নয়, ভদ্রতা হল বড় কথা। টাকা আসল নয়, রুচি ও শিক্ষাদীক্ষা হল আসল কথা। আক্ষেপ করেন—কবে যে সমাজের মনে উদারতা জাগবে ?

আশা জাগে উপেনের মনে। সকৃতজ্ঞ ও সপ্রশংসভাবে আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে পাত্রের পরিচয় জানতে থাকেন উপেন। পাত্র সুশ্রী। পাত্র দোকান দিয়েছে, কাপড়ের দোকান, তবে একটু ক্যাপিটালের দরকার হয়ে পড়েছে।

—তার জন্য কোনও চিন্তা নেই।

—আমি আপনার কাছ থেকে এইরকমই আশা করেছিলাম উপেনবাবু। আপনার মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী করে নিয়ে...।

উপেন এইবার আসল সমস্যার কথা উত্থাপন করেন। —একটি কথা আপনাকে জানাই। পাত্রী আমার মেয়ে নয়। যার বিয়ের কথা বলছি, সে আমার মেয়ের মত।

—আজ্ঞে ?...হ্যাঁ, তাতেই বা কী এসে যায় ?

—আমার পালিতা মেয়ে। মেয়েটি জাতে ছোট।

—কী রকম ? কুলীন ঘরের নয় ?

—ছোট জাতের...বেশ একটু, যাকে বলে জল অচল জাত।

ভদ্রলোক অপ্রসন্নভাবে এবং একটু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ান। —এরকম কথা আপনার কাছে শুনব বলে আশা করিনি।

—সে কি ? আপনার মত সন্দেহমুক্ত, উদার চিত্ত...।

—রাখুন মশাই। তার চেয়ে যদি বলতেন, মেয়ের দুটো পা নেই...।

বলতে বলতে চলে গেলেন ভদ্রলোক। —এরকম লোক-ঠকানো বিজ্ঞাপন আর দেবেন না মশাই।

অসহায় অপমানিতের মত, আহত রোগীর মত অবসন্নভাবে বসে থাকেন উপেন। চারুবালা কাছে এগিয়ে আসেন।

উপেন বলেন—শুনলে তো ?

—শুনেছি। এইরকম ব্যাপার যে দাঁড়াবে, সেটা বিশ বছর আগেই বোঝা উচিত ছিল।

—কী করা যায় ?

—ওসব ভদ্র ঘরের আশা ছেড়ে দাও। আর কী সব ভদ্র ঘর দেখছ তো ?

আশ্চর্য করল অধীর। পিসিমার যে প্রশ্নকে প্রতিদিনই সোজা উত্তর দিয়ে শুধু না করে এসেছে অধীর, আজ সেই প্রশ্নের সম্মুখেই যেন হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল অধীরের এতদিনের সংকল্পের শক্ত গ্রন্থিটা। আমতা আমতা করে যে ভাষায় উত্তর দেয় অধীর, তার মোটামুটি অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বিয়ে হলে আপত্তি নেই।

তবে তো ওষুধ ধরেছে! পিসিমার গম্ভীর মুখে হাসির ছায়া কাঁপে, এবং সেই সাফল্যের আনন্দ ঝি বটার মা'র কাছে জানিয়ে এবং অধীরকে সঙ্গে নিয়েই সোজা উপেনের বাড়িতে চলে এসেছেন পিসিমা।

—লক্ষণ ভাল, লক্ষণ ভাল। পিসিমা উৎফুল্ল স্বরে বলতে থাকেন। আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হল।

চারুবালা—কী ভেবেছিলে ?

—ভেবেছিলাম, ছোঁড়াকে যদি একবার কোনওমতে টেনেটুনে নিয়ে এসে রমার সামনে ফেলতে পারি, তবে ওর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে যাবে।

পিসিমার কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে চারুবালার চক্ষু। উপেনও শুনে খুশি হন।

চারুবালা প্রশ্ন করেন—কিন্তু অধীর কোথায় ?

পিসিমা—অধীরও এসেছে।

সুবিজ্ঞা পিসিমা অধীরকে আর একবার রমার পড়ার ঘরে বসিয়ে, অর্থাৎ রমার চোখের সামনে বসিয়ে রেখেই ভিতরে এসেছেন।

অধীর বাইরের বারান্দায় বসতে চেয়েছিল, আর রমাকে আপনি বলে সম্বোধনও করেছিল। পিসিমাই অধীরের ভুল শুধরে দিয়েছেন—রমাকে তুই আপনি করে বলছিস কেন রে ? আপনি নয়, তুমি তুমি। তোর চেয়ে বয়সে রমা কত ছোট!

রমাও ভদ্রতা করে বলেছে—বারান্দায় বসবেন কেন ?

অধীর—তোমার পড়ার ব্যাঘাত হবে।

রমা—একটুও না। আমার পড়া হয়ে গিয়েছে।

পড়ার কথা উঠতেই অধীরের পড়ুয়া জীবনের সব আগ্রহ রুচি আর ইচ্ছা যেন একটা স্বচ্ছন্দ সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। পড়ার কথা থেকে বই-এর কথা, সাহিত্যের কথা, কাব্যের কথা, শেক্সপিয়র ও শেলি পর্যন্ত আলোচনা গড়াতে থাকে।

কলেজ ম্যাগাজিনে রমার লেখা একটি কবিতার খুব প্রশংসা করে অধীর। কবিতার নাম 'চন্দ্রমল্লিকা'।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয় অধীর। চন্দ্রমল্লিকা, এই কথাটাই যেন কয়েকদিন আগের একটি মিষ্টি গম্ভীর ও শান্ত মুখচ্ছবি চকিতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে অধীরের, তার হাতে একটা চন্দ্রমল্লিকা ছিল, এই ঘরে এইখানে দাঁড়িয়েছিল সে। হঠাৎ চলে গেল। রমার মা যাকে বললেন তাঁর মেয়ের মত, কোথায় গেল সেই মেয়ে ? সেটি কি এই বাড়িরই মেয়ে ? এখানেই থাকে ?

রমাকে প্রশ্ন করে অধীর—আচ্ছা, সেদিন যে আর একজনকে দেখলাম, তোমার মা যাকে বললেন মেয়ের মত...।

—অম্বির কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ।

—আসুন।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে রমা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—অম্বি!

কোনও সাড়া না পেয়ে, বারান্দা থেকে নেমে বাগানের এক প্রান্তের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—অম্বি! দেখতে পায় রমা, অম্বি দাঁড়িয়ে আছে জলের ঝারি হাতে, চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে।

—আসুন। অধীরকে ডাক দিয়ে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অম্বির কর্মব্যস্ত মূর্তির সম্মুখে দাঁড়ায় রমা। বিব্রত লজ্জিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে অম্বি। রমাই চিৎকার করে অম্বির গুণের পরিচয় ব্যাখ্যা করে, এবং সেই ব্যাখ্যায় অম্বির পরিচয় যেন এক নতুন রহস্যের ফুলের মত ফুটে ওঠে। রমা বলে—আমি কবিতায় চন্দ্রমল্লিকা লিখি, আর অম্বি সত্যি চন্দ্রমল্লিকা ফোটায়।

বিস্মিত অধীরকে আর একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় রমা।—এই যত সব ফুল দেখছেন, সবই ওর হাতের যত্নে তৈরি। ওর হাতে জাদু আছে।

কথা প্রসঙ্গে অধীর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—অম্বির লেখা কবিতা কোথায়? দেখতে চাই কার রচনা ভাল।

রমা বিব্রতভাবে বলে—অম্বি ওসব...।

অধীর নিজের কথার ঝোঁকেই নানা প্রশ্ন করতে থাকে।—অম্বিও কি ইংলিশে অনার্স নিয়েছে। অম্বির এখন কোন ইয়ার? কোন কবিকে ভাল লাগে অম্বির? শেক্সপিয়রের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ভাল, না মিল্টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ভাল?

রমাই অপ্রস্তুত হয়ে, আর একটু বিচলিত হয়ে বাধা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে অধীরকে—অম্বিকে কেন মিছিমিছি ওসব কথা বলে...।

হঠাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন উপেন, চারুবালা আর পিসিমা। উপেন আর চারুবালা পিসিমাকে নতুন বাড়ির অন্দর ও বাহিরের মূর্তিটাকে দেখিয়ে ঘেরাফেরা করছিলেন। কোথায় এখনও কাজ বাকি আছে কোথায় নতুন দুটো ঘর আরও হবে। একটা অসম্পূর্ণ সিঁড়ির কাছে এসে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন পিসিমা। আতঙ্কিত পিসিমা বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন—এ যে আত্মহত্যার ব্যবস্থা করে রেখেছ উপেন।

তারপর আবার নারকেলের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পারিবারিক নানা সমস্যা ও কথা আলোচিত হয়। অম্বির জন্য যে দুশ্চিন্তা রয়েছে মনে, সেকথাও প্রকাশ করেন চারুবালা। অম্বির সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—মেয়েটা অবুঝ নয়, এবং ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ, যেকোনও জাতের ঘর, একটু গরীব হলেই বা ক্ষতি কী, মোটামুটি মানুষ ভাল, এইরকম ঘরে যদি মেয়েটাকে নিতে কেউ রাজি হত তবে...।

পিসিমা আশ্বাস দেন—বলো তো আমি চেষ্টা করি।

—চেষ্টা করুন পিসিমা।

পিসিমারও মনের ইচ্ছা, অম্বির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা আগেভাগেই করে রাখা ভাল। কারণ পিসিমার মনে একটা শঙ্কা আছে যে, উপেনের এই সম্পত্তির অধিকারে যেন অম্বি নামে ওই পরের মেয়েটা কোনও ভাগ দাবি করার সুযোগ না পায়। যেন ওই ঝঞ্ঝাটই না দেখা দেয়, তারই জন্য পিসিমার মনে চিন্তা আছে। একমাত্র মেয়ে রমাই পাবে সম্পত্তি, এবং রমার পাওয়ার অর্থ তাঁর নাতি অধীরের পাওয়া। অম্বির যদি বিয়ে না হয়, তা হলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। কারণ মায়ার বশে উপেন তার ওই পালিতা মেয়ের জন্য সম্পত্তির কিছু রেখে যাবেই। সমস্যার এই দিকটা কদিন থেকেই পিসিমার মনের ভিতরে একটা দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তুলছে।

অম্বির সম্বন্ধে উপেন আর চারুবালার মায়ার ব্যাপার দেখে মনে মনে আরও সাবধান হয়েছেন পিসিমা। হ্যাঁ, খোঁজ করতে হবে, উপেনের এই পালিতা মেয়েটার জন্য এমন একটি পাত্র খুঁজতে হবে, যাকে মাত্র দু-তিনটি হাজার টাকা হাতে ধরিয়ে দিলেই সে খুশি হয়ে উপেনকে দায়মুক্ত করে দেবে। তারপর, উপেনের যা রইল, সবই মেয়ে রমার জন্য, অর্থাৎ জামাই-এর জন্য; অর্থাৎ তাঁরই স্নেহের নাতি অধীরের জন্য রইল। এই ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলেই খুশি মনে কেদার-বদ্রী যেতে পারবেন পিসিমা।

পিসিমা তাঁর যুক্তিগুলি মনের ভিতর চেপে রেখে শুধু ইচ্ছাটাকেই ব্যক্ত করলেন। আশ্বাস

দিলেন—কোনও চিন্তা নেই, অম্বির একটা না একটা গতি করে দিচ্ছি।

হঠাৎ চোখে পড়ে সকলেরই, চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছে অধীর আর রমা, আর চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছে অম্বি। দৃশ্যটাকে দেখতে ভাল লাগে না কারও। তাই সবাই ব্যস্তভাবে ঘটনাকে যেন একটু ভাল করে বুঝবার জন্য এগিয়ে এসে এখানে দাঁড়িয়েছেন।

অধীর রমার কলেজ ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে—রমার কবিতা চমৎকার। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, অম্বি কেমন লেখে ?

চারুবালা মৃদু হেসে বলেন—তুমি ভুল বুঝেছ অধীর। অম্বির ওসব গুণ নেই। অম্বি এইসব ফুল ফোটানো আর বাগান সাজানোর কাজই করতে পারে, আর এইসব কাজ নিয়েই আছে।

অধীর হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। পিসিমাই বাধা দিয়ে বলেন—চলো দাদু।

অম্বি একা দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। আর উপেন চারুবালা পিসিমা রমা ও অধীর ফটক পর্যন্ত এগিয়ে যায়। বিদায় নেয় পিসিমা ও অধীর।

এত বড় পৃথিবীর সংসারভরা এই আলোছায়ার মধ্যে যেন বিশেষ করে তিনটি স্থানের ঘটনার রূপগুলিই একে একে বদলে যেতে থাকে। ব্যারাকপুরের এই নতুন বাড়ি, শ্যামবাজারের ওই বনেদি বাড়ি, আর বেলভেডিয়ার বাগানের ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাঠকক্ষ। এই তিন ভিন্ন স্থানের মানুষগুলির মনের আগ্রহও এক একটি কারণে ও ঘটনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পিসিমা ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন, দুটি চেষ্টায়। অধীরকে বিয়ে করতে রাজি করাবার চেষ্টায়। পিসিমার বিশ্বাস আছে, অধীরেব বিয়ে করতে রাজি হওয়ার অর্থ রমাকে বিয়ে করা। উপেনের সম্পত্তির বংশের ও স্বভাবের গুণগান করেন পিসিমা। রমার প্রশংসায় সর্বদা মুখর হয়ে থাকেন পিসিমা। অধীর শোনে, বেশ আগ্রহ নিয়েই শোনে। কিন্তু স্পষ্ট করে কোনও মন্তব্য করে না।

আর একটি দুরূহ ব্রতে ব্রতিনী হয়েছেন পিসিমা। অম্বির জন্য একটা পাত্রের সন্ধান। বটার মাকে বলেন, ড্রাইভারকে বলেন, বলতে বলতে মনের কথাও প্রকাশ করে ফেলেন পিসিমা—তোমরা চেষ্টা করে একটা খোঁজখবব করো, যেমন তেমন একটা মানুষ হলেই হল। দোজবরে হোক, আব তেজবরে হোক। যে কোনও জাত হোক। হাভাতে হোক, আর যাই হোক, কুড়িয়ে পাওয়া একটা মেয়েকে পাব করতে হবে, তার জন্য তো আর রাজপুত্তুর পাওয়া যাবে না।

ড্রাইভার আশ্বাস দেয়, বটার মা'ও বলে—দেখছি খুঁজে, নিশ্চয় পাওয়া যাবে এমন পাত্তর।

ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাঠকক্ষে একা বসে যখন বই-এর স্তূপ ঘাঁটাঘাঁটি করে অধীর, তখন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। হঠাৎ নিজেই লজ্জা পায়।

পর্দা সরিয়ে প্রৌঢ় স্কলার ডক্টর ব্যানার্জি যখন উঁকি দেন, তখন আনমনা ও উদাস অধীরকে দেখে বেশ একটু বিস্মিত হন। হেসে হেসে প্রশ্ন করেন—হ্যালো ইয়ং স্কলার, আনমনা কেন ?

লজ্জিত অধীর ডক্টর ব্যানার্জিকে কাছে ডেকে আবার তার থিসিস নিয়ে আলোচনা করে। ডক্টর ব্যানার্জি আশ্চর্য হয়ে বলেন—সে কি, আর কিছুই তো এগোয়নি দেখছি, সেই হেরিডিটির চ্যাপ্টার নিয়েই পড়ে আছ।

স্কলার বন্ধুরা মাঝে মাঝে লাইব্রেরির বারান্দার আড্ডায় আলোচনা করতে বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে সন্দেহই করে ফেলে—অধীরের হল কী ? আজকাল প্রায়ই অ্যাবসেন্ট হচ্ছে দেখছি। যায় কোথায় ?

বন্ধুরা জানে না, অধীর তখন ব্যারাকপুরের এক নতুন বাড়ির বাতাসে যেন তার জীবনের প্রথম অনুভূত এক সৌরভের রহস্যকে সন্ধান করে ফিরছে। প্রায়ই আসে অধীর। এবং অধীরের এই আসা-যাওয়ার ঘটনার ভিতর দিয়েই এই বাড়ির যে পরিণাম তৈরি হয়ে চলেছে, সেটা এই বাড়ির বাপ ও মা অনুমান করতে পারেন।

অধীর বুঝতে পেরেছে, কেন সে আসে ? কোনও গুণ নেই, কবিতা লিখতে পারে না, সামান্য লিখতে পড়তে মাত্র শিখেছে, অম্বি নামে সেই মেয়েই যে মূর্তিমতী কবিতার মত ফুটে রয়েছে। এই বাড়ির বাগানের চন্দ্রমল্লিকাও যেন অম্বির মতই গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ। শুধু চোখের তৃষ্ণা নয় বুঝতে

পেরেছে অধীর, তার মনের এক দুর্বার তৃষ্ণা তাকে একেবারে বেহায়া করে দিয়ে এই বাড়ির দিকে টেনে আনে, প্রায় প্রতিদিন। অম্বিকে দেখতে ভাল লাগে, অম্বিকে দেখতে আশ্চর্য লাগে।

আর, উপেন ও চারুবালা বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের সুন্দরী শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না মেয়ে রমার রূপের আর গুণের আকর্ষণেই অধীর নামে ওই শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন আর উচ্চবংশীয় ছেলেটি এখানে আসে। দেখতে পান, দেখে নিঃসংশয় হন উপেন আর চারুবালা। রমার প্রতিভা, রমার লেখাপড়ার কৃতিত্ব, রমার নানা গুণের প্রশংসা করে অধীর। অম্বির সঙ্গেও মাঝে মাঝে কথা বলে অধীর, কিন্তু সেটা নিতান্তই কথা বলা মাত্র। দেখে খুশি হয়েছেন চারুবালা, অম্বিও অধীরের কাছ থেকে দূরে থাকতে ভালবাসে। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে অম্বিকে, ভাল করেই জানে অম্বি, অম্বির ছোঁয়া জল খেলে জাত যাবে অধীরের। সুতরাং অন্য কোনও ভয়কে মনে স্থান দেন না চারুবালা ও উপেন।

এর মধ্যে চিন্তার দিক থেকে শুধু নির্বিকার মনে হয় রমাকে। রমা এখনও যেন রহস্যের বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারেনি। আড়ালে আলাপ করে হাসাহাসি করেন উপেন ও চারুবালা।—রমা মেয়েটার মনটা একেবারে সাদা। এখনও কল্পনাও করতে পারেনি যে, অধীর ওকে বিয়ে করতে চায়, ওরই জন্য অধীর আসে, বিয়ে হবে অধীরেরই সঙ্গে। যদি বুঝত, তবে রমা সেদিন অমন করে অধীরকে একা ঘরে বসিয়ে রেখে গটগট করে কলেজের স্পোর্টসে চলে যেতে পারত না। এখনও স্পোর্টস-ই ওর কাছে জীবনের সব চেয়ে বেশি প্রিয়।

চারুবালা মাঝে মাঝে উপদেশ দেন রমাকে—অধীর এলে ওরকম হেলাফেলা ভাব দেখাসনি। কত ভাল ছেলে, কত শিক্ষিত, কত বড় বংশের ছেলে। আপন জন মনে করে বলেই তো আসে।

কিন্তু এই উপদেশ প্রায়ই ভুলে যায় রমা।

বারান্দার থামের পাশে সোফায় বসে আপ্পির চাদরের ছেঁড়া রিপু করে অম্বি। হঠাৎ ফটকের দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে। অধীর আসছে, থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে অম্বি। কিন্তু অধীর এসেই হাসিমুখে অম্বির কাছে দাঁড়ায়। অম্বি অপ্রস্তুত ভাবে আর একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলে—আসুন, রমা আছে ওখানে।

অধীরও একটু বিব্রতভাবে চলে যায় রমার ঘরের দিকে। রমাও অধীরকে দেখতে পেয়েই ব্যস্তভাবে বলে—আসুন। পরমুহূর্তে বলে—ওই যে ওখানে অম্বি বসে রয়েছে।

অধীর বলে—হ্যাঁ, অম্বির সঙ্গে দেখা হয়েছে।

দু চারটে মোটা মোটা বই আর ম্যাগাজিন অধীরের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে রমা বলে...পড়ুন, আমি আসছি।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে অম্বিকে দেখে একবার থমকে দাঁড়ায় রমা। তারপর বলে—গীতার মা ডেকেছে, আমি চললাম অম্বি।

অম্বি—কেন ?

রমা—চণ্ডালিকার রিহার্সাল আছে।

তারপর একটু ভ্রূভঙ্গি করে আর বাইরের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে আস্তে আস্তে বলে—আর পারি না, ভদ্রলোক সব সময় বই নিয়ে যত ঘ্যানর ঘ্যানর. ধেৎ।

অম্বি শাসনের ভঙ্গিতে বলে—ছিঃ, কী আবোল-তাবোল বলছিস !

চলে যায় রমা।

চারুবালা এসে বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেন অম্বিকে—রমা কোথায় গেল ?

অম্বি উত্তর দেয়—গীতাদের বাড়ি।

চারুবালা মেয়ের উদ্দেশ্যে ধমক দিতে গিয়ে সামলে নিলেন। তারপর ঘরের ভিতরে অধীরের কাছে এসে রমারই প্রশংসা করে বলেন—রমা খুব সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে কি না. তাই ওরই ওপর অভিনয় দেখাবার ভার পড়েছে। গুণ আছে, লোকে ছাড়বে কেন ? যাক তুমি চা না খেয়ে যেও না অধীর।

চারুবালা চলে যেতেই এই বাড়ির এইখানে যে একটি নিভৃত এক মধুর সুযোগ নিয়ে আপনি ধরা

দেয়, সেই নিভৃতের মধুরতা তুচ্ছ করে থাকতে পারে না অধীর। পড়ার ঘর থেকে নিজেই উঠে আসে বই হাতে নিয়ে। অম্বির কাছে এসে দাঁড়ায়। অম্বি অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়ায়। অধীর বলে—তোমার সব চেয়ে বড় গুণ কী জানো অম্বি ?

অম্বি আশ্চর্য হয়—আমার ?

অধীর—হ্যাঁ তোমার সব চেয়ে বড় গুণ হল, তোমার কোনও গুণ নেই।

অধীরের কথার মধ্যে যেন মোহ আছে। কিন্তু শুধু শুনতে পেয়ে নয়, অধীরের চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে সন্ত্রস্ত হয় অম্বির চোখের দৃষ্টি। অধীরের ওই চোখেও যে কেমন একটা মুগ্ধতা ফুটে রয়েছে।

অম্বি প্রশ্ন করে—দিদিমা কেমন আছেন ?

হেসে হেসে অনুযোগ করে অধীর—এই কি আমার কথার উত্তর হল ?

অম্বি হাসে—আমি কী বলব বলুন ?

অধীর—কেন ? জিজ্ঞাসা করলেই তো পারো, আমার সব চেয়ে বড় দোষ কী ?

অম্বি—আপনার দোষ ?

অধীর—হ্যাঁ।

অম্বি হাসে—আপনার দোষ থাকলেও আমি তো কিছু জানি না, বুঝতেও পারি না।

অধীর—সত্যিই বুঝতে পারো না ?

অম্বি—না।

অধীর—আমার সব চেয়ে বড় দোষ, তোমাকেই দেখবার জন্য এখানে আসি।

চমকে ওঠে, ভীতভাবে মুখ লুকোবার চেষ্টা করে অম্বি। ঘরের ভিতর থেকে ডাক শোনা যায় চারুবালার—তোমায় চা দেওয়া হয়েছে অধীর।

একেই বোধ হয় বলে পরশমণির ছোঁয়া। অম্বির মনের সব ভাবনা ও স্বপ্নের রং বদলে দিয়ে গেল অধীরের ওই কয়েকটি কথা আর অধীরের চোখের ওই দৃষ্টি।

কাজ করতে করতে আনমনা হয় অম্বি। জীবনে এই প্রথম হঠাৎ ভুল করে কাজের মাঝখানেই বারান্দার উপর এসে দাঁড়ায়। দৃষ্টি ছুটে যায় ফটকের দিকে। আগন্তুক একটা পদধ্বনির জন্য অম্বির মনের কল্পনাই যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কখনও বা এসে রমার পড়ার ঘরের ভিতরে দরজার বাইরে থেকে উঁকি দেয়। দেখতে পায়, শুধু একা রমা পড়ার বই কোলে নিয়ে কৌচে বসে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ চোখ মেলে তাকায় রমা। প্রশ্ন করে—কী রে ? চোরের মত তাকাচ্ছিস কেন রে ?

ঘরে প্রবেশ করে অম্বি—তুই ডাকাতের মত ঘুমোচ্ছিস কেন রে ? পরীক্ষা এগিয়ে আসছে মনে নেই।

—তুইও আমাকে শাসন করবি ? রমা তেড়ে আসে। অম্বি ছুটে গিয়ে হলঘর পার হয়ে একেবারে ভিতরের বারান্দায় গিয়ে আম্বির পিছনে ভালমানুষের মত দাঁড়ায়। রমা ব্যর্থ হয়ে ভালমানুষের মত বই হাতে চারুবালার চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

কৌতূহলী হয়ে রমাকে প্রশ্ন করেন উপেন—কী, কিছু বুঝতে হবে নাকি ? হিস্ট্রি ?

রমা বই-এর আড়ালে মুখ টিপে হাসে—না।

উপেন বাইরে বের হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। চারুবালা বলেন—ব্যাঙ্কের কাজ সেরে, জিনিসপত্রগুলি একেবারে কিনে নিয়েই চলে এসো।

কতগুলি পায়ের শব্দের সাড়া এগিয়ে আসে। প্রবেশ করেন পিসিমা আর অধীর।

উপেন বলেন—আসুন পিসিমা, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেবেন, এখনি একবার কাজে বের হতে হচ্ছে।

অম্বি বলে—এই রোদের মধ্যে এখন আবার কোথায় চললে আম্নি ?

উপেন—রোদে পুড়ে আর জলে ভিজে পাহাড়ে জঙ্গলে কাজ করেছি ত্রিশটি বছর। রোদের ভয় আমাকে দেখাস না অম্বি !

কিন্তু উপেনকে সহজে রেহাই দেয় না অম্বি। দেখতে পায় অম্বি, আপ্পির কামিজের একটা বোতাম নেই। ছুঁচ সুতো আর বোতাম নিয়ে আসে অম্বি। জামাতে বোতাম বসিয়ে ছুঁচ চালাতে থাকে। তারপরও থামে না। উপেনকে চেয়ারে বসিয়ে, জুতোর ফিতে আবার ঠিক করে বেঁধে দেয়। ব্রাশ নিয়ে আসে, উপেনের মাথার চুল অম্বি নিজের হাতেই ব্রাশ করে দেয় ভাল করে।

উপেন স্নেহার্দ্র স্বরে বলেন,—অম্বির অত্যাচার এইভাবেই সহ্য করছি পিসিমা। এই মেয়েটা আমাকে একটা খোকা করে রেখেছে।

পিসিমা শুকনো স্বরে বলেন—তুমি বেরুচ্ছ উপেন, কিন্তু আমার যে একটা দরকারি সংসারী কথা ছিল..।

—হ্যাঁ বলুন। ইঙ্গিতে পিসিমাকে অন্য ঘরে আসতে আহ্বান জানিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন উপেন আর চারুবালা। চারুবালা বলে যান—অধীরকে চা দিতে ভুলিস না রমা।

কিন্তু ভুল হয় রমার। হঠাৎ রমাও পাশের বাড়ির এক জানালার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে—দরকারি কথা?

সত্যিই পাশের বাড়ির জানালায় এক মহিলার মূর্তি হাত তুলে ইঙ্গিতে রমাকে ডাকছিলেন। অম্বির দিকে তাকিয়ে রমা বলে—হাসিবৌদি ডাকছেন, কী যেন বলতে চাইছেন।

চলে যায় রমা। ভিতরের বারান্দায় আবার এক নিভৃত অধীর ও অম্বির সান্নিধ্যকে যেন নিবিড় করে দেবার জন্য আপনি রচিত হয়।

অম্বি চোখ তুলে তাকাতে পারে না তারই মুখের দিকে, যাকে দেখবার জন্য ওর সারাক্ষণের আগ্রহ উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

অধীর বলে—রমা ঠিকই বলেছিল অম্বি। তোমার হাতে জাদু আছে।

অম্বি লজ্জিত হয়। —ওরকম করে বলবেন না।

অধীর—স্বচক্ষেই তো দেখলাম, তোমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে উপেনবাবু কেমন শিশুর মত হয়ে গেলেন।

ওদিকের পাশের বাড়ির জানালায় হাসিবৌদি আর রমার মধ্যে আলোচনা চলে। হাসিবৌদির কথাগুলির আড়ালে কেমন একটা ঠাট্টা যেন লুকিয়ে। প্রশ্ন করেন হাসিবৌদি—কে উনি?

রমা বলে—আত্মীয়।

হাসিবৌদি—কেমন আত্মীয়?

রমা—বাবার মাসতুতো ভাই-এর পিসিমার নাতি, শ্যামবাজারে থাকেন।

হাসিবৌদি নাক কুঁচকে হাসেন—অ্যাঁ, তাই বলো, অনেক দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

রমা—হ্যাঁ।

হাসিবৌদি—তা হলে নিকট সম্পর্ক হয়ে যেতে কোনও অসুবিধা নেই?

রমা—আজ্ঞে? কী বললেন?

হাসিবৌদি হাসতে হাসতে জানালা থেকে সরে যান—আচ্ছা আসি।

রমার হঠাৎ মনে পড়ে চায়ের কথা। নিজের মনেই আক্ষেপ করে—দূর ছাই, ভুলেই গিয়েছি। চা, চা তৈরি করো ঠাকুর। বলতে বলতে অন্য দিকে চলে যায় রমা।

অন্য ঘরে পিসিমা সেই দরকারি সংসারী কথাটা ব্যক্ত করেন—অম্বির জন্য পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। ভালপাত্র, বেশ ভাল পাত্র। তোমরা আর মনে কোনও বাধা না রেখে রাজি হয়ে যাও উপেন।

পাত্রের পরিচয়ও জানিয়েছেন পিসিমা—পাত্রের একটু বয়স হয়েছে, এই যা। আর জাতের দিক দিয়ে একটু নিচু, এই মাত্র। কিন্তু টাকাপয়সা বেশ আছে। আর সংসারে একেবারে একা মানুষ, আপন বলতে কেউ নেই। সামান্য রকমের যৌতুক দিলেই...।

চারুবালার মুখটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়, চোখও হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন—পাত্রের বয়স কি খুবই বেশি?

পিসিমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন—হ্যাঁ গো, বেশি বৈকি, এই আমাদের অধীরের বয়সেরই মত একটু

বেশি বয়স ।

চারুবালা হাঁপ ছাড়েন—তা হলে আর কী এমন বয়স ? বেশ কাঁচা বয়স, অম্বির সঙ্গে মানাবে ভাল ।

পিসিমা বলেন—সহজে কি রাজি হয় ? শুধু আমার উপদেশে রাজি হয়েছে, আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে কিনা ।

উপেন বলেন—আপনি যখন বলছেন ভাল, তখন আমাদের মনে আর কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না পিসিমা ।

পিসিমা আবার সেই সামাজিক ভয়ের কথা তুলে সূক্ষ্ম কৌশলে যেন আর একবার উপেনকে একটু ভয় পাইয়ে দেন । পিসিমা বলেন— অম্বিকে বিদায় না করার আগে আমিই বা কোন প্রাণে রমাকে বিয়ে করবার জন্য অধীরকে বলতে পারি । তোমরা জাতের নিয়ম না মেনে যে বংশের সম্মান একটু গোলমাল ক'রে রেখেছ ।

চুপ ক'রে শুনতে থাকেন উপেন ও চারুবালা ।

পিসিমা বলেন— তবু তুমি কী যেন ভাবছ উপেন ।

উপেন— মেয়েটার কথাই ভাবছি পিসিমা । নিজের মেয়ে নয়, কিন্তু তবু ওই মেয়েটাই চলে গেলে আমার কী দশা হবে বুঝতেই পারছেন, স্বচক্ষেই তো দেখলেন । আমি কিসে পয়সা খরচ করলাম, আমি মনে করতে পারি না । মনে করিয়ে দেয় অম্বি । আমার হাতের লাঠিটা হাতের কাছে অম্বি এগিয়ে না দিলে, লাঠি নিতেই ভুলে যাই ।

চারুবালা বলেন— কথাটা সত্যিই, অম্বি চলে গেলে সব চেয়ে বেশি কষ্টে পড়তে হবে ওঁকেই ।

পিসিমা মনের বিরক্তি চেপে রেখে বলেন— তাতো হবেই । কাজের ঝি-চাকর চলে গেলে কষ্টে পড়তে হয় । ওরকম কষ্ট সবাইকে সহ্য করতে হয় । আমার কাছেও তো ছিল সাবিত্রী, এগারোটি বছর ! হঠাৎ চলে গেল, আমাকেও কষ্টে পড়তে হয়েছিল বইকি ।

চমকে ওঠেন উপেন আর চারুবালা । কাজের ঝি-চাকর চলে গেলে যতটুকু কষ্ট হয়, মাত্র ততটুকু কষ্ট হবে অম্বি চলে গেলে ? তাই কি ? এই ভয়ংকর মিথ্যাটাই কী সত্য ? উপেনের শান্ত চোখ দুটো হঠাৎ বড় বেশি ছটফট করতে থাকে ! চারুবালা কেঁপে কেঁপে নিঃশ্বাস ছাড়েন ।

উপেন কুণ্ঠিতভাবে বলেন— না, কথাটা ঠিক তা নয় । যাক গিয়ে...পাত্র যদি ভাল হয় ।

পিসিমা—যদি বলছ কেন, সব দিক দিয়ে ভাল পাত্র ।

চারুবালা— বেশ তো, কথা রইল, আমরাও একবার পাত্রকে দেখি ..তারপর ।

পিসিমা— নিশ্চয়, দেখবে বইকি ।

ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অধীর তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে অম্বিকে কী যেন বলবার জন্য চেষ্টা করছিল ; আর অম্বির চোখ দুটোও যেন ভয় পেয়ে অধীরের মুখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে ছিল ।

অধীর বলে— তোমার সঙ্গে আমারও যে একটা দরকারি সংসারী কথা আছে অম্বি ।

অম্বি বলে— বলুন ।

ডাক শোনা যায়—অধীর কোথায় রে ।

পিসিমা ডাকছেন । এই দিকেই আসছেন পিসিমা, উপেন আর চারুবালা । আর কথা বলা হল না । চলে গেল অধীর ।

অন্য ঘরের নিভৃতে জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অম্বি সেই মানুষের মূর্তিটাকে, যে মানুষ আজ না বলা কথার বেদনা নিয়ে চলে গেল ।

রমার জন্মদিনের উৎসবটাই একটা ঘটনা সৃষ্টি ক'রে অধীর ও অম্বির মনকে আরও নিবিড় সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে মধুর পরিণামের চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে দিল ।

সে ঘটনায় বেদনার অশ্রু ছিল, কিন্তু সেই অশ্রুর মধ্যেও ক্ষণিকের এক হর্ষময় মধুরতা হঠাৎ দেখা

দিয়ে আবার যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

রমার জন্মদিন। প্রতি বছর রমার জন্মদিন হয়ে আসছে। আর শুধু আপ্পি আর আম্মির কাছে গল্প শুনেছে অম্বি, ছোট্ট অম্বি একদিন রমাকে হিংসে ক'রে আর জোর ক'রে জন্মদিন করিয়ে নিয়েছিল। সেই কাহিনীটুকুই জানে অম্বি, সেই ঘটনার ছবি একটুও মনে পড়ে না। অম্বি জানে, তার জন্মদিনটাই হারিয়ে গিয়েছে এই পৃথিবীর বাতাসে চিরকালের মত।

রমার জন্মদিন। পরিপাটি সাজে সেজেছে রমা। অম্বির ঘরের ভিতর হঠাৎ এসে ধমক দেয় রমা—কি, আজও তুই পেত্নী সেজে থাকবি না কি ? তা হবে না।

অম্বিকে প্রায় জোর ক'রে সাজাতে থাকে রমা। সাজ শেষ হলে হাত ধরে বাইরের ঘরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে, যেখানে অভ্যাগতদের জন্য আসর সাজানো হয়েছে।

অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠেন, এবং তারপরেই স্নেহাক্ত ও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন চারুবালা ও উপেন। রমার সঙ্গে ড্রয়িংরুমের দিকে চলে যাচ্ছে অম্বি। উপেন আর চারুবালা চাপাস্বরে, যেন একটা বেদনা চাপা দিয়ে আলাপ করেন— অম্বিটার মুখটা কী সুন্দর দেখতে তো। কপালের শুধু একটা চন্দনের টিপেই সারা মুখটা মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের দোষ...।

উপেন— আমাদেরই ভাগ্যের দোষ বলো।

চারুবালা— তা তো বটেই।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সব চেয়ে আগে এলেন পিসিমা, সঙ্গে অধীর। এসেই রমার গলায় পরিয়ে দিলেন একটি হার— জন্মদিনের উপহার।

উপেন আর চারুবালা একসঙ্গে বলেন— এ আবার কী কাণ্ড করলেন পিসিমা। আপনার আশীর্বাদই যথেষ্ট।

পিসিমা— এতদিন তোমরা দূরদেশে ছিলে, চোখেও দেখতে পাইনি মেয়েটাকে, আর মনের সাধও পূর্ণ করতে পারিনি। আজ সুযোগ পেয়েছি, ছাড়ব কেন ?

ড্রইংরুমে সোফার উপর একা বসে ছিল অম্বি। হাতে একটি ছবির অ্যালবাম। রমার জীবনের উনিশটি জন্মদিনের তোলা ফটো। শেষ দিক থেকে অ্যালবামের পাতা ওলটাতে এক জায়গায় এসে থামে অম্বি। ফটোতে চারুবালা ও উপেন পাশাপাশি বসে আছেন, তাদের মাঝখানে তিন বছর বয়সের রমা। কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার পাতা উলটে একেবারে প্রথম পাতায় এসে থামে অম্বি। চারুবালার বুকের উপর রয়েছে এক বছর বয়সের রমা। এক শিশুর প্রাণ তার মায়ের স্নেহের তপ্ত নীড়ের মধ্যে শুয়ে আছে। সে ছবি দেখতে দেখতে ছলছল করে অম্বির চোখ। পিছন থেকে এগিয়ে এসে অম্বির কাছে দাঁড়ায় অধীর। কে জানে কখন এসে এবং কতক্ষণ ধরে চুপটি ক'রে অম্বির সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল অধীর।

অম্বি চমকে ওঠে— আপনি কখন এলেন ?

অধীর—অনেকক্ষণ। কী দেখছিলে তুমি ?

—রমার জন্মদিনের ছবি।

—কোন ছবিটা সবচেয়ে ভাল ?

—সবগুলিই ভাল।

—না, আমি বলব ?

—বলুন।

অধীর দেখায় দুটি ছবি— এটা আর এটা, কেমন ? সত্যি নয় ?

—হ্যাঁ, সত্যি। এলবামের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হল ওই দুটি ছবি, একটি আম্মির কোলে একবছর বয়সের রমা, আর একটি আপ্পি ও আম্মির মাঝখানে তিন বছর বয়সের রমা।

অম্বি তখনও ধারণা করতে পারেনি, কদিনের পরিচিত এই সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ভিন-জগতের একটি মানুষ অম্বির মনের গভীর গোপন করা জীবনের সব চেয়ে বড় অভাবের বেদনাময় রূপটি ধরে ফেলতে পেরেছে। কিন্তু বুঝতে হল আর কিছুক্ষণ পরে।

রমা এসে অধীর আর অম্বিকে ডেকে নিয়ে গেল। আক্ষেপ করে রমা— যা সব চেয়ে খারাপ

লাগে আমার, তাই এখন করতে হবে।

অধীর—কী ?

রমা— গান।

আসরে গিয়ে চারুবালা ও উপেনের কাছে দাঁড়ায় দুজনে, অম্বি ও রমা পাশাপাশি দুটি শান্ত স্নিগ্ধ ও সুন্দর মেয়ে। সেই ভুল করল অভ্যাগতেরা, এবং সেই ভুল করলেন চারুবালা ও উপেন, অম্বিও।

আগন্তুক মহিলা ও ভদ্রলোকেরা, সবাই নিকট বা দূর সম্পর্কের আত্মীয় অথবা পরিবারের বন্ধুস্থানীয়, প্রত্যেকেই অম্বিকে দেখিয়েই প্রথম প্রশ্ন করেন, এইটি বুঝি আপনার আপন মেয়ে আর ওইটি পালিতা। বেঁচে থাকো, সুখে থাকো।

চারুবালা বলেন— না, এটি আমার মেয়ে রমা, ওইটি হল এখন আমার মেয়েরই মত।

অম্বির স্নিগ্ধ মুখে বেদনার ছায়া পড়ে। চারুবালাও তারপর যেন আক্রোশের সঙ্গে প্রত্যেকেরই ওই অদ্ভুত ভুল ধারণার উপর রাগ করে আরও জোরে বলে থাকেন— এটি হল আমার মেয়ে। ওটি হল মেয়ের মত।

মেয়ের মত ! মেয়ের মত ! শুনতে শুনতে আর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না অম্বি। চারুবালারও অভিমান ও অহংকারের কোথায় যেন ঘা পড়েছে। অম্বির সুন্দর সাজ আর মুখের ছলনায় তাঁর নিজের মেয়েরই পরিচয় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অম্বির দিকে অপ্রসন্নভাবে তাকান চারুবালা, যেন অম্বি এখানে না থাকলেই ভাল ছিল।

চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল অম্বি। আসরের এক প্রান্তে সোফার উপর বসে অধীর দেখতে পায় সেই দৃশ্য। চমকে ওঠে অধীরের চোখের কৌতূহল।

রমার কলেজ-বান্ধবীরা একটা গান রচনা ক'রে উপহার দিয়েছে রমাকে। রমাকে এখনি গাইতে হবে সেই গান। পীড়াপীড়ি করেন গুরুজনেরা। বান্ধবীরাও সমর্থন করে। শেষে গাইতে হয়। সুন্দর গলায় সুন্দর সুরে গান গায় রমা। বান্ধবীরাও সুরে সুর মিলিয়ে গানের মধুরতা আরও মধুর ক'রে তোলে।

কিন্তু এই গানের জগৎ থেকে নীরবে সরে পড়েছে অধীর। এখানে একজনের জন্মদিনের মাঙ্গল্য কলরব ও আনন্দ সুরময় হয়ে উঠেছে, কিন্তু আর একজন কোথায় গেল, যার জন্মদিনের পরিচয় অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে ?

চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে একটি ছায়া ঘুরে বেড়ায়, দেখতে পায় অধীর। অম্বির কাছে এসে দাঁড়াতেই নীরব ও আনমনা অম্বি চমকে ওঠে—কে ?

—আমি ?

—আপনি কেন উঠে এলেন ?

—তুমি কেন উঠে এলে ?

—আপনি বুঝবেন না।

—আমি বুঝেছি।

—পৃথিবীতে কারও বোঝবার সাধ্যি নেই।

—আমার সাধ্যি আছে।

—বলুন তো, কেন ?

অধীর সমবেদনার সুরে সান্ত্বনা দিয়ে বলে— ওটা তো একটা কথার কথা মাত্র, তার জন্য এত দুঃখ পাও কেন ?

চোখ বড় ক'রে বিস্মিত হয়ে অম্বি প্রশ্ন করে—কী কথা ?

অধীর— আম্মির আর আপ্পির মুখের ওই কথা, মেয়ের মত।

দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে অম্বি। জীবনে এই প্রথম একজনের চক্ষু ধরে ফেলেছে তার জীবনের সব চেয়ে গোপন রহস্যকে।

অধীর বলে— তুমি তো উপেনবাবুর মেয়ে, কার সাধ্যি আছে পৃথিবীতে অস্বীকার করবে এই

সত্য ?

—আপনি স্বীকার করেন ?

—নিশ্চয়ই।

অম্বি— বলুন, আর একবার বলুন, আমারই তা হলে ভুল হয়েছে। বলুন, ওটা একটা কথার কথা মাত্র।

অধীর— বলছি, তোমার অভিমানের ভুল। ওটা তোমার আপ্পি ও আম্মির কথার ভুল। পৃথিবীর চোখের কাছে তুমি যে উপেনবাবুরই মেয়ে।

আসর থেকে জন্মদিনের মহিমার সঙ্গীত রেশ ছড়ায়, সেই রেশ ভেসে আসে। অধীর প্রশ্ন করে— তোমার জন্মদিন কবে অম্বি ?

অম্বি— হারিয়ে গিয়েছে অন্ধকারে।

অধীর—বুঝলাম না।

অম্বি— এত বুঝতে পারছেন, এটা বুঝতে পারছেন না কেন ? আমার জন্মদিনের খবর কেউ জানে না।

অধীর— আমি যদি বলি, কেউ একজন জানে।

—কে ?

—ওই আকাশ। এই রকমই সেদিন আকাশে তারা ছড়িয়ে ছিল।

অম্বি হাসে— সত্যি কথা ?

অধীর— বিশ্বাস করবে কি, যদি বলি, আজ তোমার জন্মদিনকেই ভালবেসে উপহার দিতে ইচ্ছে করছে আমার।

অম্বি—বিশ্বাস করব।

অম্বির একটা হাত ধরতে চেষ্টা করতেই হঠাৎ আতঙ্কিতের মত পিছিয়ে সরে যায় অম্বি।

অধীর বলে—বলো, নেবে আমার উপহার ?

চমকে ওঠে অম্বি।

অধীর—বলো অম্বি।

অম্বি মুখ তোলে— পেয়ে গেছি উপহার।

—পেয়েছ ?

—হ্যাঁ।

—কী ?

—জন্মদিনই যার অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে, তাকে আপনি মানুষ বলে ভেবেছেন। তার দুঃখটাকে চিনেছেন। এর চেয়ে বেশি আর কোনও উপহার আশা করি না...কিন্তু বড় ভয় করবে... সহ্য করতে পারব না...আপনি ভুল করবেন না অধীরবাবু।

বলতে বলতে হঠাৎ ছটফট ক'রে ওঠে অম্বি, যেন তার মনের খুশির ভিতর থেকে একটা ভুলের ভয় হঠাৎ তপ্ত হয়ে কণ্ঠস্বরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। যার ছায়ার কাছে যাবার অধিকার নেই, তারই ছোঁয়া মুগ্ধ হয়ে গ্রহণ করেছে অম্বি। ভুল হয়েছে, উঁচু জাতের মানুষের মনের একটা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অপরাধ ক'রে ফেলেছে অম্বি।

কারণ, অম্বি বিশ্বাস করে, সে ছোট রক্তেরই মানুষ। মিথ্যা বলবেন কেন আম্মি ? কিন্তু জেনে-শুনেও চোরের মত এ কী কাণ্ড করে বসল ? যেন একটা ভয়ংকর অপরাধের ভয় থেকে পালিয়ে যাবার জন্য ছুটে চলে যায় অম্বি।

সত্যিই অধীর ধারণা করতে পারে না, কী ভুল হল। নিজের মনকে ঠকাতে চায় না অধীর। স্পষ্টই বুঝতে পারে, উপেনবাবুর বাড়িতে, উপেন ও চারুবালার স্নেহে পালিতা ওই অম্বিকেই, টবের চন্দ্রমল্লিকারই মত যার জীবন, সেই অম্বির সুন্দর মুখটাকেই ভালবেসে ফেলেছে তার মন। গুণ নেই অম্বির, মনে করতেও হাসি পায় অধীরের। পূর্ণ চাঁদের মায়ার মত মায়া নিয়ে, মমতার লতার মত দুটি সেবার হাত নিয়ে একটি বাড়ির প্রাণের সব প্রয়োজনকে স্নিগ্ধ ক'রে রেখেছে যে, তাকে একটা

বিস্ময়ের মূর্তির মতই যে মনে হয়।

ঠাট্টা ক'রে একদিন যে কথাটা অম্বিকে বলেছিল অধীর, প্রতিক্ষণেই বুঝতে পারে অধীর, মোটেই ঠাট্টা নয় সেই কথাটা। — ইচ্ছে করে আমার, কটা দিন জ্বর হয়ে পড়ে থাকি।

হেসেছিল অম্বি— এ আবার কেমন অদ্ভুত ইচ্ছে।

অধীর—তা হলে তুমি একটা ভুল করে ফেলবে, আর সেই ভুলেই তোমার ভুল ভেঙে যাবে।

অধীরের কথার তাৎপর্য সূক্ষ্ম হলেও বুঝতে পেরেছিল অম্বি। যে মেয়ের দুহাতে সেবা আর মমতা ব্যাকুল হয়ে আছে, সেই মেয়ে কী হঠাৎ আগ্রহে ছুঁয়ে ফেলবে না অধীরের জ্বরে বিব্রত কপালের তপ্ততা।

আজ একটু আশ্চর্য হয়, সত্যিই বুঝতে পারে না অধীর, কেন সেদিন অমন ক'রে আতঙ্কিতের মত হাত সরিয়ে নিল অম্বি। অধীরের স্পর্শকে সত্যিই কি ভয় করছে অম্বি ?

লাইব্রেরির কক্ষে বসে অকারণে বিচলিত হয় অধীর। নিজের মনেই বিড়বিড় করে। লিখতে গিয়ে হাতটা যেন অকারণে ছটফট করছে।

—ভুল, কিসের ভুল ? নিজের মনে বলতে বলতে উঠে পড়ে অধীর।

অম্বিকেই সোজা ও সুস্পষ্ট প্রশ্ন ক'রে তা হলে জেনে নেওয়া উচিত, কিসের ভুল ? অমন হেঁয়ালি ক'রে সরে গেলে চলবে না।

অম্বি জানে, হ্যাঁ ভয় করছে অম্বিরই মন। জেনে-শুনে অন্যায় করতে পারবে না অম্বি। ভালবাসার ওই দুই চক্ষু শুধু তাকিয়েই তৃপ্ত হোক, ওই মানুষকে স্পর্শ করার অধিকার নেই অম্বির। অম্বি নিজেকে অন্ত্যজা অস্পৃশ্যা বলেই বিশ্বাস করে।

কিন্তু নিয়তিই যেন করুণাপরবশ হয়ে অম্বির এই ভুল ভাঙাবার জন্য পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়ে দিয়ে গেল। সমাজ সংসারের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন কোনওদিন জাগেনি অম্বির মনে, সেই অম্বিই বুঝতে পারে যে, সমাজ আর সংসারও ভুল করে। বিধাতার কাছে ঘৃণ্য অস্পৃশ্যা ও অন্ত্যজা নয় অম্বি। ধীরে ধীরে এই বিশ্বাসের জাগরণ অম্বির জীবনের বিষণ্ণতাকে আবার সুস্মিত ক'রে তুলতে থাকে। মনে হয়, এবং বিশ্বাসও করে অম্বি, অধীর নামে এই ভালবাসার মূর্তিকে স্পর্শ করার অধিকার তারও আছে। কিন্তু স্পর্শ না করাই ভাল।

গঙ্গার ঘাটে, বেড়াতে গিয়ে অদৃশ্য এক ভক্তকণ্ঠের উৎসারিত গানের ভাষা অম্বির নিঃশ্বাসকেই যেন একদিন নতুন ভাবনায় চঞ্চল ক'রে তোলে। গাইছেন ভক্ত— জাত-পাতের বড়াই করো কেন সংসারের মানুষ ? প্রেমেই আপন হয় মানুষ। সেই পরম আপনের কাছে কেউ ছোট নয়, আর কেউ বড় নয়। গান শুনে অম্বির মন যেন এক আশার দীক্ষা লাভ করে।

এই গানের ভাষা আর সুর শুনে চমকে ওঠেন উপেন।

বিমর্ষ হয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকেন। অম্বি প্রশ্ন করে—কী ভাবছ আপ্পি ?

উপেন— এখানে আর আমি বেড়াতে আসব না।

অম্বি— কেন আপ্পি ?

উপেন— ওই সব আজে-বাজে গানের জন্য।

অম্বি—গানের জন্য ?

উপেন— হ্যাঁ, ওটা গান নয়, ওটা একটা গালাগালি।

চণ্ডালিকার অভিনয় দেখতে গিয়েছিল অম্বি। অম্বির দুই চক্ষুর বিস্ময় যেন এক আলোকের জগতে পথ খুঁজে বেড়াতে থাকে, অস্পৃশ্যার হাতের উপহার ওই স্নিগ্ধ বারি পান করলেন ভিক্ষু। ওই চণ্ডালিকা মেয়ের বেদনার রূপটিকে যেন দেখতে পেয়েছে অম্বি, তার নিজের অন্তরের গভীরে। অভিনয় দেখতে দেখতে চমকে ওঠে অম্বির মনের কল্পনা। তৃষ্ণার্ত এক জীবনপথিককে বারি দান করছে অম্বি এবং সেই পথিকের মুখটি যে অধীরেরই মুখের মত।

যে ভুলের ভয় কঠিন ক'রে রেখেছিল অম্বির মনের আবরণ, যার জন্য সেদিন অম্বিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি অধীর, সেই ভুলের মিথ্যাকে বুঝতে পারে অম্বি ; সে মিথ্যাকে তুচ্ছ করবার সাহসও যেন মনের ভেতর হঠাৎ জেগে উঠে আসতে থাকে।

ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একা একা ওপারের সন্ধ্যাকাশের রং দেখছিল অম্বি। অম্বি নিজেই জানে না, কেন সে আজকাল একা একা এইভাবে কিসের জন্য এখানে আসে ? গঙ্গার ঢেউ-এর শব্দের মধ্যে কি কোনও সান্ত্বনা আছে ?

বিকাল হয়ে এসেছে। হঠাৎ চারুবালার কাছে গিয়ে অম্বি বলে— আমি একবার গঙ্গার ঘাটে বেড়িয়ে আসি আম্মি।

চারু—একা যাবি ?

অম্বি— হ্যাঁ।

চারু—তা হলে যা।

অম্বি চলে যেতেই উপেন রাগ ক'রে চারুবালাকে বলেন— খুবই খারাপ লক্ষণ চারু।

চারু আতঙ্কিত হল। —তার মানে ?

উপেন— অম্বির মনে বড় বেশি সাহস জেগেছে। এসব ভাল নয়।

চারু আশ্চর্য হয়ে বলেন— তুমি কি মেয়েটাকে কোনও সন্দেহ করছ ?

চেঁচিয়ে ওঠেন উপেন— হ্যাঁ, আজকাল আমাদের অপমান দেখতে ভালবাসে। যে গান শুনে আমার মনের সব গর্ব জব্দ হয়ে গেল, সেই গান শুনতে গেল অম্বি। শত হোক, পরের মেয়ে হল পরের মেয়ে।

চারু—কিছুই বুঝতে পারছি না।

উপেন— একটা সন্ন্যাসী গঙ্গার ঘাটে গান গাইছিল, জাতের বড়াই করো কেন মানুষ, ভগবানের কাছে কেউ ছোট আর কেউ বড় নয়। শুনে তোমার ওই অম্বির চোখে মুখে কী আনন্দ ! যেন আমাকে ঠাট্টা করার জন্যই.. ।

চারু—একথা সত্যি। পরের মেয়ে কখনও আপন মেয়ের মত হতে পারে না। কিন্তু তার জন্য দুঃখ ক'রেও কোনও লাভ নেই। বড় হয়েছে, বয়স হয়েছে, এখন নিজের স্বার্থ বুঝে নিয়ে যদি পর হয়ে যায়, ভালই। ওকেও দোষ দিই না।

সেদিন আর একটি রহস্য কল্পনাও করতে পারেনি অম্বি। কখন অম্বিকে পথে দেখতে পেয়ে আর অনুসরণ ক'রে অধীরও নিঃশব্দে পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

চমকে ওঠে অম্বি— আপনি কেমন ক'রে এখানে এলেন ?

অধীর হাসে— মনে মনে টের পেয়ে।

অম্বি হাসে— কখ্খনও না !

অধীর— তা'লে রমার কাছ থেকে খবর পেয়ে এসেছি।

অম্বি— তাই বলুন।

কত গল্প করে অধীর। মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে অম্বি, গান্ধী নামে এক মহাপুরুষের সারা-জীবনের এক সত্য আগ্রহের কথা বলছে অধীর। এক অন্ত্যজা অস্পৃশ্যাকে ঘরের লক্ষ্মীরূপে লক্ষ্মী নাম দিয়েই আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন যে মহামানব, তাঁর নাম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই ঘাট।

গান্ধীঘাটের কাছে বোধিবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আর অধীরের কাছে গল্প শুনে ধন্য হয়ে যায় অম্বির প্রাণের সব কৌতূহল। বুদ্ধ, যে মহাপুরুষের নামের পুণ্য ধারণ ক'রে রেখেছে এই বটের ছায়া, সেই মহাপুরুষ ছোটবড় ভেদ অস্বীকার ক'রে গিয়েছেন। কত অস্পৃশ্যা ও অন্ত্যজাকে তিনি মহীয়সীর সম্মান দিয়ে গিয়েছেন। শুনতে শুনতে এই বোধিবটের ছায়ার স্নিগ্ধতাকেই পুণ্যময় বলে মনে হয় অম্বির। ভুল ভেঙে যায়, পূর্ণ হয় বিশ্বাসের দীক্ষা। না, তারও অধিকার আছে, শুধু এই পৃথিবীর তরুলতা ও ফুলকে ভালবাসার অধিকার নয়, ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায়, কিন্তু নিজের অন্তরের আনন্দের মধ্যেই বুঝতে পারে, অধীরকেও ভালবাসবার অধিকার তার আছে। আর অধিকার যখন আছে, তখন সেই ভালবাসার মানুষের হাতে হাত রেখে আর কানে কানে একটা বিস্ময়ের উপহার

দিতে পারবে না কেন অম্বি ? এমন কুণ্ঠার কোনও অর্থ হয় না।

কিন্তু এখানে এত মানুষের চোখের সামনে কেমন ক'রে তার হাতে হাত রাখা যায় ? একটি নিভৃত কি পাওয়া যায় না ?

—এত আনমনা হয়ে কী ভাবছ অম্বি ? অধীরের প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে অম্বি। ব্যস্তভাবে বলে —চলুন এবার বাড়ি ফিরে যাই।

অধীর—এতক্ষণ আমিও আনমনা হয়ে একটা কথা ভাবছিলুম।

অম্বি— কী কথা ?

অধীর— তোমাকে এত ভাল লাগল কেন ?

অম্বি— চলুন, অনেক দেরি হয়ে গেল।

অধীর হাসে— এর কোনও কারণই যেন বুঝে উঠতে পারছি না।

অম্বি— আজ এখানে কিসের জন্য এত বেশি ভিড় ; কিছু বুঝতে পারছি না।

অধীর—যদি জানতাম যে, আমাকেও তোমার এইরকমই ভাল লাগে, তবে...।

সামনের পিছনের ও আশে পাশের এত জীবন্ত চক্ষুওয়ালা ভিড়টাকেই যেন হঠাৎ তুচ্ছ ক'রে অম্বির একটা হাত ধরে ফেলে অধীর।

—ছিঃ, এ কী করছেন ? যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছে অম্বি। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আরও ব্যস্তভাবে বলে— চলুন, আম্মি হয়ত এতক্ষণে খুব ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

কী অদ্ভুত আর কী রকম নিষ্ঠুর যেন অম্বির এই কুণ্ঠা। গঙ্গার ঘাটে লোকের মেলার মধ্যে অম্বির সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে অম্বিকে যেসব কথা বলে অধীর, তার কিছুই কি বিশ্বাস করতে পারেনি অম্বি ? তবে কেন অমন ক'রে হাত সরিয়ে নিল ? অনেক কিছুই কল্পনা ক'রে অধীর, কিন্তু কোনওটিকেই অম্বির ওই অদ্ভুত ভীরুতার কারণ বলে মনে হয় না।

তবে ওটা কি অম্বির মনের একটা লজ্জার বাধা ? কিন্তু ওই মেয়ের মনকে তো এমন কিছু লাজুক বলে মনে হয় না। চোখ দুটোও ভীরু নয়। অধীরের মুখের বেপরোয়া কথাগুলি শোনবার সময় বেশ তো অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেই দুটি চোখ। ভালবাসার কথা শুনতে যার কোনও সঙ্কোচ নেই, সে কেন হাত সরিয়ে নেয় ? কেন বার বার সেই একই কথা বলে, আপনি না বুঝে বড় ভুল করছেন অধীরবাবু !

গঙ্গার ঘাটে অম্বির পাশে দাঁড়িয়ে অমন সুন্দর সূর্যাস্ত দেখবার আনন্দের মধ্যেও যেন একটা ফাঁকি ছিল ; কাঁটার মত মনের ভিতর বিঁধছে সেই ফাঁকি। অম্বির চোখের চাহনি আর মুখের চেহারাটি তো বেশ স্বচ্ছ আর সরল ; কিন্তু অম্বি নিজে যেন ঠিক তার বিপরীত। একটা রহস্য, একটা খামোকা ভয়ের খেয়াল। ভালবাসার কথা শুনতে ভালবাসে কিন্তু ভালবাসার কথা বলতে পারে না। কাছে এগিয়ে আসে, পাশে দাঁড়ায়, কিন্তু হাত ধরতে গেলেই যেন চমকে ওঠে আর সরে যায়।

ভাবতে গিয়ে নিজেরই উপর রাগ ক'রে যেন নিঝুম হয়ে যায় অধীরের মন। অম্বি নামে ওই মেয়েকে ভালবাসার অধিকার তার আছে ; কিন্তু ভালবাসলেই কি ভালবাসা পাওয়ার অধিকার এসে যায় ? সন্দেহ হয়, অধীরের জীবনে হঠাৎ বোধ হয় বড় কঠিন একটা ভুল হয়ে গেল। কোনও নারীকে না ভালবেসেও জীবন বেশ সহজে সানন্দে ও হেসে হেসে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। অধীরের এই ধারণার অহংকার শাস্তি পাবে আর জব্দ হবে বলেই বোধ হয় অম্বির সঙ্গে অধীরের দেখা হয়েছিল। ভুলতে পারা যায় না এবং চেষ্টা ক'রেও বোধ হয় ভুলতে পারা যাবে না, অম্বি নামে ওই মেয়ের চোখমুখ চলা-বলা আর হাসি হর্ষ ও গম্ভীরতা দিয়ে তৈরি করা অদ্ভুত এক মধুরতার ছবিকে। সন্ধ্যাকাশের আভা যখন ওর মুখের উপর লুটিয়ে পড়ে তখন মনে হয়, ওই মেয়ে যেন রঙিন আকাশেরই এক টুকরো শোভা। মৃদু বাতাসের ছোঁয়া লেগে ওর কপালের কাছে কালো চুলের গুচ্ছ যখন আধভাঙা হয়ে ফুরফুর করে, তখন মনে হয় এই মেয়ে যেন একটি মালতি লতা। অধীরের মুখের কথাগুলি শুনতে শুনতে যখন ওর চোখ দুটো অপলক হয়ে যায়, তখন মনে হয় যেন একটা ভরা নদীর প্রাণ শান্তভাবে জোয়ারের শব্দ শুনছে। নিজেকেই প্রশ্ন করে অধীর, তার লজিক-পড়া আর সায়েন্স-জানা মনের সব যুক্তি-বুদ্ধি কী তবে সত্যিই একটা মোহের মধ্যে পড়ে বোকা হয়ে

গেল ?

কেন ভাল লাগে অম্বিকে ? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর খুঁজে পায় না অধীর। এবং ভাবতে গিয়ে মনের ভিতরে যেন যত উদ্ধত তর্ক আর যুক্তিগুলি নিজের দুর্বলতার লজ্জায় ছোট হয়ে যায়। অম্বির চেয়ে কত বেশি সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আছে। রমাই তো অম্বির চেয়ে দেখতে বেশি সুন্দর। অম্বির চেয়ে বেশি লেখাপড়া জানা শত-শত মেয়ে এই শ্যামবাজারে আর ব্যারাকপুরেও আছে। এই জীবনে কত মেয়ের সঙ্গে অধীরের আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে। কিন্তু কোনওদিন তো কোনও পরিচিতার সুন্দর মুখ স্মরণ করে অধীরের মনে ভাবনার কোনও উত্তাপ কোনও লজ্জা আর কোনও আগ্রহের চঞ্চলতা জেগে ওঠেনি। তবে অম্বি কেমন ক'রে আর কিসের জোরে অধীরের প্রতিক্ষণের নিঃশ্বাসে এই দুর্বার পিপাসা ভরে দিল ?

উপেনবাবুর পালিতা মেয়ে অম্বি ; বোধ হয় উপেনবাবুর কোনও আত্মীয়-কুটুম্ব অথবা বন্ধুর মেয়ে। এর চেয়ে বেশি গভীরের কোনও রহস্য কল্পনা করেনি অধীর। অনুমানে যেটুকু ধারণা হয়েছে, তাই শুধু জেনে রেখেছে অধীর। অম্বির জন্ম-পরিচয় জানবার জন্য কোনওদিন বিশেষ কোনও কৌতূহলও অনুভব করেনি। উপেনবাবু এবং চারুবালা এবং দিদিমাও অধীরের কাছে অম্বির জন্ম-পরিচয় জানাবার কোনও দরকার অনুভব করেননি। অম্বিকেও কোনওদিন এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি অধীর। দরকার কী ? অম্বি তো এখন সত্যিই উপেনবাবুর মেয়ে। অম্বির বাপ-মায়ের পরিচয় জানবার জন্য প্রশ্ন করারও কোনও অর্থ হয় না। শুধু অম্বির মনে ব্যথা দেওয়া হয়।

কিন্তু অম্বিকে যেন আজও ঠিক চিনতে পারা গেল না। অম্বি যেন তার জীবনের অনেক কিছু অধীরের কাছে ধরা পড়িয়ে দিয়েও জীবনের কোনও নিবিড় একটা রহস্যকে দুর্লভ রত্নের মত গোপন ক'রে রাখতে চায়। চৈত্র সন্ধ্যার দমকা বাতাসের মত হঠাৎ এসে সৌরভ ছড়িয়ে দেয় ঠিকই কিন্তু তার পরেই যখন দূরে পালিয়ে যায়, খুঁজতে গেলে আর পাওয়া যায় না।

রাগ হয় অম্বির উপর, কিন্তু কী আশ্চর্য অম্বিকে ভুলে যেতে ইচ্ছে করে না কেন ? অম্বির হাতের সামান্য একটা স্পর্শের জন্য এই ব্যাকুলতা কেন ? এই ভালবাসা আর ভাললাগা মোহগুলি কী কোন নিয়মের ধার ধারে না ? অধীরকে আনমনার মত লাইব্রেরি ঘরের নিভৃতে চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখে অনেকবার ঠাট্টা করেছেন ডক্টর ব্যানার্জি—কী হ'ল ফ্রেণ্ড ? কাকে ভাবছ ?

অধীর হাসে— নিজেকে।

ডক্টর ব্যানার্জি— অর্থাৎ অন্য একজনকে ভাবতে কেন ছাই এত ভাল লাগছে, তাই না ?

অধীর— আমি নিজের মনের সমস্যাই ভাবছি ডক্টর ব্যানার্জি।

ডক্টর ব্যানার্জি— আমিও যে তাই বিশ্বাস করছি। তা হলে এতদিনে সমস্যায় পড়েছ! উইশ ইউ গ্র্যাণ্ড সাকসেস !

বলতে বলতে চলে যান ডক্টর ব্যানার্জি। কিন্তু অধীরের মন থেকে সেই প্রশ্নটা যেন চলে যাবার নামও করে না। কেন ভাল লাগে অম্বিকে ? মনে হয় অধীরের, এর চেয়ে বেশি কঠিন প্রশ্ন বোধ হয় এই সংসারেই নেই। এবং এই প্রশ্নের উত্তর নেই।

যদি ভুল হয়ে থাকে হোক। এই ভুলের শেষ না দেখা পর্যন্ত বোধ হয় ভুল ভাঙবে না। তবে আর দেরি ক'রেই বা লাভ কী ? তাড়াতাড়ি একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলাই উচিত। অম্বির কাছে গিয়ে, অম্বিকে একটি নিভৃতে ডেকে নিয়ে এসে সোজা স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করতে পারা যায় ; আমার ভালবাসাকে তুমি ভুল মনে করছ কেন ? কেন হাত সরিয়ে নাও ? কিসের আপত্তি ?

তার হাতে হাত রাখবার জন্য কেন এই ব্যাকুলতা ? ভাবতে গিয়ে নিজের মনকে শত ধমক দিয়েও কেন বোঝাতে পারে না অম্বি, এবং বোধ হয় নিজেও বুঝতে পারে না, তার এতদিনের ভিতু জীবনটাকে এ কোনও ভয়ানক লোভে পেয়ে বসল ? ইচ্ছা করে, এবং কল্পনা করতেও ভালই লাগে অম্বির, হঠাৎ একটা জ্বর এসে এই শরীরটাকে একেবারে অসহায় ক'রে বিছানার উপর শুইয়ে রাখুক, অন্তত পাঁচটা দিন। আসুক অধীর, অম্বির মুখের করুণ ও উদাস হাসির দিকে তাকিয়ে ছলছল করুক ওর ওই দুই চক্ষু ; তারপর হঠাৎ অম্বির একটা হাত টেনে নিয়ে বসে থাকুক অধীর। যদি তাই হয়, যদি সেই সুযোগ পাওয়া যায়, এবং কেউ যদি দেখে না ফেলে, তবে অধীরের হাতের সেই ছোঁয়া

মনে মনে বরণ ক'রে নিয়ে অম্বির বোধ হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে যেতেও ভাল লাগবে।

শুধু ঘরের নিভৃতে বসে জাগা-মনের ভাবনাগুলির সঙ্গে নয়, মাঝরাতের আর ভোরের ঘুমের স্বপ্নের সঙ্গেও যেন অম্বির মনটা লড়াই ক'রে হাঁপিয়ে ওঠে আর লজ্জা পায়। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, বিছানার উপর বসেই শাড়ির আঁচল দিয়ে ঠোঁট মোছে। শিউরে ওঠে শরীরটা ; আঃ, স্বপ্নও এত স্পষ্ট হয়!

নিজেরই মনের নতুন দুঃসাহসগুলির রূপ দেখে আশ্চর্য হয় অম্বি। বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাসের আনাচে-কানাচে, কিংবা বোধ হয় এই রক্তধারার মধ্যেই এই দুঃসাহস অনেক অভিমানে লুকিয়ে পড়ে ছিল। আম্মি বলেছেন— তার দেহের ছোঁয়াকেই ভয় করে উঁচু জাতের পৃথিবীর যত প্রাণ। কী অদ্ভুত নিষ্ঠুর ভয়! গাছের পাতা ও ফুলের ছোঁয়াকে কুড়িয়ে নিয়ে বুকে আর মাথায় তুলে নিতে পৃথিবীর কোনও মহাপবিত্রের মনেও কোনও আপত্তি নেই। অম্বির দেহটা কি ওই পাতা আর ফুলের চেয়ে কম জীবন্ত ? তবে কিসের এই ভয় ? অধীরের মনেও কি সেই ভয় আছে ?

অধীরের মনে ওরকম কোনও ভয় আছে কি না বোঝা যায় না। বুদ্ধ আর গান্ধীর কথাগুলিকে কি অধীরও সত্যিই বিশ্বাস করে ? কিংবা অধীরের কাছে ওসব কথা শুধু কতগুলি গল্পের কথা ? ভুলেও তো একবার অধীর একথা নিজের মনের জোর দিয়ে বলতে পারল না যে, ঠিকই বলেছিলেন বুদ্ধ আর গান্ধী, জন্ম আর জাতের জন্য মানুষ বড় হয় না, ছোটও হয় না। সত্যিই অম্বির মনের চিন্তাগুলি যেন মাঝে মাঝে একটা দুঃসহ অভিমান সহ্য করতে চেষ্টা করে। মানুষ না হয়ে বাগানের একটা চন্দ্রমল্লিকা হ'য়ে জন্ম নিলেই তো ভাল ছিল। তা হলে সারা পৃথিবীর চোখের সামনে অধীরের বুকের উপর লুটিয়ে পড়তে অম্বির জীবনে কোনও বাধা থাকত না, কোনও অন্যায়ও হত না।

এ কী হল মনের দশা ? সকালবেলার খবরের কাগজের ছবি আর লেখাগুলির উপর চোখ আর মনের আগ্রহ ধরে রাখবার চেষ্টা ক'রেও ধরে রাখতে পারে না অম্বি! মনটা যেন একজনের পায়ের শব্দ শোনবার জন্য ছটফট করছে। কখন আসবে অধীর ? আসুক একবার। আজও কী একটি নিভৃতে দাঁড়িয়ে অধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার সুযোগ পাওয়া যাবে না ?

অম্বির এই শান্ত দেহটাই যেন বিদ্রোহ ক'রে উঠতে চায়। অধীরকে স্পর্শ করবার তার অধিকার নেই, এই মিথ্যা অভিশাপকে চূর্ণ ক'রে দিতে ইচ্ছা করে। আর আপত্তি করবে না, হাত সরিয়ে নেবে না অম্বি।

ভিতরের ঘরে তখন পিসিমা উল্লাসের সঙ্গে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করছিলেন যে, নাতি তাঁর বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। একেবারে স্পষ্ট করে মুখ খুলেই এবার বলেছে।

পিসিমা বলেন— আমি জিজ্ঞেস করলুম, তা হলে বল পাত্রী দেখি। নিজের মুখেই বললে, পাত্রী দেখাই আছে। বলতে বলতে আহ্লাদে গলার স্বর কেঁপে ওঠে পিসিমার।

পিসিমা— রমাকে খুবই মনে ধরেছে বুঝতে পারছি। এইবার তোমরা একটা দিনক্ষণ ঠিক করো।

উপেন— আর অম্বির জন্যে যে পাত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন ?

পিসিমা— সে তো ঠিকই আছে। আজ বলো আজ, কাল বলো কাল। পাত্র দেখো, দিন ঠিক করো।

আলোচনা করতে করতে সকলে বাইরে আসেন। অম্বিকে লক্ষ ক'রে চারুবালা বলেন—অধীর যদি আসে, তবে এক মুহূর্তও যেন এখানে আর দেরি না করে।

একটি কার্ড অম্বির কাছে দিয়ে উপেন বলেন— অধীরের নেমন্তন্ন পত্র। রমাদের কলেজের স্পোর্টস দেখার নেমন্তন্ন। আমরা চললাম। অধীরকে বলবি, অবশ্যই যেন যায়।

চারুবালা বলেন—বলবি, না গেলে রমাও দুঃখ করবে।

দেখে চমকে ওঠে অম্বি। অধীর আসছে। কিন্তু না, অসম্ভব। উঁচু জাতের ওই মানুষের মনের একটা ভুল ধারণার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকানো উচিত নয়। তার হাতে হাত রাখা দূরে থাকুক, তার

পা ছুঁয়ে প্রণাম করাও উচিত নয়। যদি কোনও দাবি করে অধীর, তবে অম্বি আজ স্পষ্ট করেই বলে দেবে, তোমার দাবি সত্য কিন্তু আমিই যে মিথ্যা। ক্ষমা করো, এত কাছে এসো না, একটু দূরেই থাকো।

বারান্দার এই দিকে, এই থামের পাশে যেখানে একা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়তে চেষ্টা করছে অম্বি, সেটা যে সত্যিই একটা নিবিড় নিরালা। যদি সোজা এসে এখানেই অম্বির কাছে দাঁড়ায় অধীর ? ভয় পায় অম্বি। আজ অম্বি তার নিজেরই স্পর্শলোলুপ হাতটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কে জানে অধীরকেই হতভম্ব ক'রে দিয়ে কোন ভুল ক'রে ফেলবে অম্বি ? চেয়ার থেকে উঠে ভিতরের ঘরের দিকে ছুটে চলে যায় অম্বি।

যেন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে অধীর। আজ স্পষ্ট ক'রে অম্বির কাছে তার জীবনের আকাঙ্ক্ষার কথা ঘোষণা ক'রে দিয়ে যাবে। অম্বিই তার জীবনের স্বপ্ন। অম্বিই তার জীবনের প্রয়োজন। এর মধ্যে কোনও ভুল নেই।

ঘরে কেউ নেই, এমনই একটি অবাধ নিভৃত তৈরি হয়ে আছে। এবং অধীরও এসেছে তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট ক'রে ঘোষণা ক'রে দেবার জন্য, নইলে শান্তি পাচ্ছে না অধীর।

অধীর সোজা অম্বির কাছে এসে দাঁড়ায়। —আমি একটুও ভুল করছি না অম্বি। ডাকো তোমার আম্পিকে, ডাকো তোমার আম্মিকে, সবার সামনেই জানিয়ে দিয়ে যাই, আমি একটুও ভুল করছি না।

—কেউ নেই বাড়িতে।

—তুমিও কি নেই ?

—আমি তো আছিই। যাব কোথায় ?

—আমার কাছে।

চমকে ওঠে, চুপ ক'রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি।

—বলো অম্বি, তোমার আপত্তি নেই। যদি একটুও আপত্তি থাকে, তবে এখনই বলে দাও।

—একটুও না অধীরবাবু। একথা আমাকে দিয়ে বলিয়ে কী সুখ পাচ্ছেন আপনি ? আজও যদি না বুঝে থাকেন, তবে কোনও দিনই বুঝবেন না।

অধীরের মনের সব বিমর্ষতা মুছে যায়। প্রণাম করে অম্বি। বাধা দেয় অধীর, কিন্তু অম্বি শোনে না। —সেদিনের ভুল ক্ষমা করো, আজ তোমাকে ছোঁবার অধিকার পেয়েছি।

—কে দিল অধিকার ?

—দিয়েছে আমার মন।

অধীর বলে— আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি অম্বি। তোমার খোঁপায় একটি চন্দ্রমল্লিকা, কপালে খয়েরের টিপ তারার মত আঁকা, চাঁপা রঙের ঢাকাই তাঁতের শাড়ি তার মধ্যে হাসনুহানার সুগন্ধ। এই সুন্দর মূর্তি নিয়ে তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছ। বলতে পারো, আমার এই স্বপ্নের মানে কী ?

—মানে হল, তুমি সুন্দর।

—কথা এড়িয়ে যেও না। বলো, কবে ওই স্বপ্নের মত ক'রে তোমাকে কাছে পাব।

—তোমার যেদিন ইচ্ছা।

—এই মাসেই, এই আষাঢ়ের কোনও শুভদিনে।

—বেশ।

—তা হলে দিদিমাকে বলি।

—বলো।

চলে যাচ্ছিল অধীর। অম্বি হঠাৎ বলে— ইস, কী সাংঘাতিক ভুল !

রমাদের কলেজের স্পোর্টসে যাবার জন্য নিমন্ত্রণের কার্ডটা অধীরের হাতে তুলে দিয়ে অম্বি বলে— আম্পি বার বার ব'লেছেন, এখনি যাও, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

অধীর কি যেন ভাবে। অম্বি বলে— যাও, নইলে রমাও দুঃখ করবে।

স্পোর্টস-এর মাঠের একপাশে এক জায়গায় পাশাপাশি চেয়ারে বসে চারুবালা ও উপেন অধীরের প্রতীক্ষা করেছিলেন। — অধীর কি ভুলেই গেল ?

কিন্তু পরমুহূর্তেই চারুবালা ও উপেন খুশি হয়ে দেখতে পেলেন, অধীর এসেছে। রমার তখন হার্ডল রেস শুরু হয়েছে। ফার্স্ট হল রমা।

চারুবালা অধীরের দিকে তাকিয়ে বলেন,— আমি জানিতাম, রমা ফার্স্ট হবে।

রমা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রশ্ন করে— অম্বি আসেনি ?

তারপর অধীরকে দেখেই ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে হঠাৎ বলে ফেলে— আপনি এলেন কেন ? উঃ, কি ভীষণ লজ্জা করছে আমার ! এইবার আপনি চলে যান।

অধীর হেসে ফেলে—তা হলে আমি চলি।

চারুবালা ভ্রূভঙ্গি ক'রে মেয়েকে ধমক দেন— কথা বলার কি ছিরি ?...ওর কথা তুমি গ্রাহ্য করো না অধীর।

চোখ বেঁধে হাঁড়ি ভাঙবার খেলা। রমা লাঠি হাতে হাঁড়ি ফাটাবার জন্য ভুল ক'রে মাঠের কিনারায় এসে পড়ে। চারুবালা ভ্রূকুটি ক'রে হাসতে থাকেন, রমা যেন একটা পাগল অন্ধের মত আই চাই করতে করতে বাঁধা চোখ নিয়ে আর লাঠি ঘুরিয়ে এই দিকেই আসছে অথচ হাঁড়িটা মাঠের মাঝখানে পোস্টের গায়ে নির্বিকার দুলছে।

কী বিশ্রী ভুল করছে রমা ! ভুল আন্দাজ করছে। যেন আকাশে বাড়ি মারবার জন্য লাঠি তুলেছে।

ও কী ? ওখানে যে অধীর দাঁড়িয়ে আছে। আসর সুদ্ধ দর্শক হাসতে থাকে। প্রায় অধীরেরই মাথা লক্ষ ক'রে লাঠি তোলে রমা। এক লাফ দিয়ে সরে গিয়ে অধীর হাসতে থাকে।

ঘটনা দেখে হেসে ফেলেও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান চারুবালা। উপেনের কানে কানে বলেন— রমাটা কি ইচ্ছে ক'রে অধীরকে অপ্রস্তুত ক'রে সরিয়ে দিতে চাইছে ? ওর মতলব কী ?

উপেন বলেন— তুমি কেন মিছিমিছি ছেলেমানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বুঝবার চেষ্টা করছ ? বাইরে থেকে দেখে ওসব কিছু বোঝা যায় না।

চারুবালা— আমার যেন কেমন ঠেকছে। মেয়ের বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর আমার বিশ্বাস নেই।

উপেন— না, না, তুমি খামোকা ওসব কথা ভাবছ।

তখন একা ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে গান গাইছিল অম্বি, গলা খুলে। আজ তার জীবনের পরিণাম একেবারে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। তার যে ভাগ্যের দোষ দেখে আপ্পি আর আম্মি কত চিন্তা করেছেন, কত আক্ষেপ করেছেন, সেই ভাগ্যের শুভ স্বরূপের সংবাদ শুনতে পেয়ে কত খুশি হয়ে উঠবেন দুজন, আপ্পি ও আম্মির মুখ হেসে উঠবে। সেই কল্পনার আনন্দ যেন অম্বির এতদিনেব সাবধানতায় বাঁধা মনকে মাতিয়ে দিয়েছে।

রেডিও হতে উৎসারিত সঙ্গীতের একটি স্তবক শুনে নেয় অম্বি। তার পরেই রেডিও বন্ধ ক'রে সেই গান গাইতে থাকে। তার পর আর এক স্তবক।

বাড়ির বারান্দায় উঠে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ান চারুবালা ও উপেন। —কে গাইছে গান ? অম্বিও গাইতে পারে না কি ?

চারুবালা— অম্বি নয়। রেডিওর গান।

সন্দেহ মেটাবার জন্য পর্দার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখেন চারুবালা। ফিরে এসে বলেন—হ্যাঁ, অম্বিই গাইছে।

উপেন গায়ের চাদর নামিয়ে অপ্রস্তুতের মত স্বরে বলেন— অম্বি কী কখনও গানের মাস্টারের কাছে গান শিখেছিল ?

—না। কোনওদিন তো দেখিনি। অম্বিকে কখনও গান শেখানো হয়নি।

—তবে, এ কিরকম হল ? শেখানো হল না, তবুও শিখল। তা ছাড়া, রমার চেয়েও ভাল গলা

গেল ?

এটাও যেন চারুবালা ও উপেনের জীবনের একটা সংকল্পের পরাভব। অম্বির গলার সুন্দর গান শুনে আনন্দিত হতে পারছেন না। নিজেদের বুকের ভেতরেই যেন একটা কাঁটার খোঁচা বিঁধছে। হঠাৎ গান বন্ধ হয়। বোধ হয় বুঝতে পেরেছে অম্বি, আপ্পি ও আম্মি ঘরে ফিরেছেন। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে ভিতরের বারান্দার দিকে আসতে থাকে অম্বি, এবং শুনতে পায়, ঠিক, আপ্পি আর আম্মিই কথা বলছেন। থমকে দাঁড়ায় আপ্পি।

তার পরেই শিউরে ওঠে অম্বির সারা শরীর। যেন এক জ্বালাময় শিহরণ। দুঃসহ বেদনায় আবিল হয়ে যায় চোখের দৃষ্টি। আপ্পি আর আম্মির আলোচনার ভাষা থেকে একটি যে নিদারুণ তথ্য অম্বির কানে এসে বেজেছে, সেই তথ্যের জ্বালা নিষ্ঠুর কৌতুকে পুড়িয়ে দিচ্ছে অম্বির বুকের পাঁজর।

উপেন— আমার ইচ্ছা, রমা পরীক্ষাটা দিয়ে নিক, তারপর একটা ভাল দিন বুঝে...।

চারু—কিন্তু পিসিমার ইচ্ছে, শুভস্য শীঘ্রং, যত শিগগির হয় তত ভাল। বিয়ের পরেও পরীক্ষা দিতে পারে রমা। আর অধীরের মত বিদ্বান ছেলের বউ যে হবে, তার পড়াশুনার কোনও অসুবিধেও হবে না।

উপেন— এটা আমাদের ভাগ্যি বলেই মানতে হবে যে, রমার জন্য অধীরের মত পাত্র পাওয়া গিয়েছে।

সবই শুনতে পায় অম্বি। ছুটে চলে যায়, যেন মরিয়া হয়ে ছুটে উপরতলার ঘরে এসে দুহাত দিয়ে মাথাটা নিষ্ঠুরের মত টিপে ধরে। তার পরেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে নম্বর ডাকে। অধীরকে আহ্বান করে।

—শুনুন, আপনি কি সত্যিই আমার সব কথা বিশ্বাস করেছেন।...

চোখ দিয়ে জল গড়ায়, কিন্তু নিজেকে কঠোর ক'রে, যেন আত্মহত্যার প্রয়াসের মতই অম্বি জানিয়ে দেয় অধীরকে, আমাকে যদি বাঁচতে দিতে চান, তবে একথা এখন কাউকে বলবেন না। না কাউকে না। দিদিমাকে নয়, আপ্পি আম্মিকেও নয়। পায়ে পড়ি আপনার, আপনি শুধু চুপ ক'রে থাকুন .কতদিন ? জানি না, ভগবান জানেন। হ্যাঁ, আসবেন বইকি...একশো বার আসবেন।

জীবনে এই প্রথম নিজেকে অপরাধিনী মনে করেছে অম্বি। কী ভয়ংকর ভুলে আপ্পি আর আম্মির মনের একটা বড় সাধকে যেন হত্যা করতে চলেছিল অম্বি। কিন্তু সময় থাকতেই ধরা পড়ে গিয়েছে অম্বির সেই ভুল। রমাকে অধীরের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য তৈরি হয়েছেন, অনেক আশা নিয়ে দিনক্ষণের অপেক্ষা করছেন আপ্পি আর আম্মি। এই সত্য যদি প্রথমেই এমনই আকস্মিক কোনও ঘটনায় বুঝতে পারত অম্বি, তবে অম্বি অধীরের মুখের দিকেও তাকাত না, তাকাতে যতই ইচ্ছে হোক, আর মনের ভিতর যে স্বপ্ন যতই কান্না কাঁদুক না কেন। নিজের উপর কঠোর হবার শক্তি আছে অম্বির। এতদিন সেই শক্তি নিয়েই অম্বির জীবন চলছে।

নতুন ক'রে আর একবার ভয়ানক কঠোর হতে পারবে না কেন অম্বি ? নিশ্চয়ই পারবে। আপ্পি আর আম্মির মনের আশাকে এখন নিজের প্রাণের রক্ত দিয়েই সফল ক'রে তুলতে হবে। রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ে হবে, এই আকাঙ্ক্ষিত একটা ঘটনাকেই এখন প্রতি মুহূর্তের চিন্তা আর চেষ্টা দিয়ে সত্য ক'রে তুলতে হবে। এই হবে অম্বির জীবনের এক নতুন ব্রত। দুঃসহ, কিন্তু হাসিমুখেই এই ব্রত পালন করবে অম্বি।

হ্যাঁ, হাসিমুখেই এই বাড়ির জীবনের পরিণামকে যেন জোর ক'রে পথ ঘুরিয়ে দেবার জন্য অম্বির প্রতিদিনের চেষ্টা চলতে থাকে। রমার কাছে অধীরের প্রশংসা, আর অধীরের কাছে রমার প্রশংসা। যেন জাদুকরির মত রমার মনে সেই মোহ সঞ্চারিত করতে চায় অম্বি, যে মোহ ভালবাসা হয়ে ফুটে উঠতে পারে। অধীরের মনের উপরেও যেন সেই সূক্ষ্ম ও জটিল মায়া রচনার পরীক্ষা চালায় অম্বি। অধীরের কাছে রমাকে মোহনীয় ও লোভনীয় ক'রে তোলবার জন্য নানা কথা ও কাহিনী ও ঘটনায় পরিবেশন করে অম্বি।

পড়ার ঘরে রমার কাছে গিয়ে অনেক চিন্তা আর উদ্বেগের ভঙ্গিতে অম্বি বলতে থাকে— অধীরবাবু তোর এত প্রশংসা করে কেন ?

—প্রশংসার যোগ্য বলে, এর মধ্যে কেন আবার কী ?

—না, অধীরবাবু কেন করেন ?

—হরির মা'ও তো আমার প্রশংসা করে।

—ঠাট্টা না ক'রে তোমার একটু বোঝা উচিত রমা।

—তুই কী বোঝাতে চাস আমাকে ?

—অধীরবাবুর মত ভাল মানুষ হয় না।

—তা কে না জানে ? বিদ্যা অনেকেরই থাকে, কিন্তু অমন ভাল মন খুব কম দেখা যায়।

—আমার ভয় হয়, এরকম একটা ভাল মনও শেষ পর্যন্ত যদি কোনও দুঃখ পায়।

—তার মানে ?

সহসা উত্তর দিতে পারে না অম্বি। অম্বির অনুরোধগুলির মধ্যে যেন চাপা কান্নার সুর লুকিয়ে রয়েছে, অথচ অম্বি যেন এক নতুন হর্ষের সুর দিয়ে ঢাকতে চাইছে সেই করুণতা।

রমার কত প্রশংসা করে অধীর, রমার কাছে সে কথা বর্ণনা করতে গিয়ে অম্বি হঠাৎ আরও স্পষ্ট ক'রে দেয় তার চেষ্টার ইঙ্গিত। —অধীরবাবুর কাছে তুই যদি রোজ পড়া শিখে নিতে পারিস, তবে কলেজের সব মেয়ের মধ্যে তুই নিশ্চয়ই ফার্স্ট হবি।

রমা বলে— হ্যাঁ, কিন্তু তুই যদি অধীরবাবুর কাছ থেকে পড়া শিখিস তবে কী হবে বুঝতে পারিস ?

অম্বি— কী ?

রমা— তবে তুই এই পৃথিবীর সব মেয়ের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে যাবি।

বিব্রত হয় অম্বি। কিন্তু উপায় খোঁজে, আশা ছাড়ে না।

অধীর যেদিন এল, সেদিন আবার নতুন ক'রে অম্বি তার পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য তেমনি সূক্ষ্ম প্রয়াসের কুহক সৃষ্টি করে। রমার মত ভাল মেয়ে হয় না। রমাকে যে মানুষ আপন ক'রে নেবে, সে মানুষ জীবনে সুখী হবেই হবে। রমা যে সব প্রশংসা করেছে অধীরের নামে, সে সব প্রশংসার কথাই অধীরকে বিচিত্র এক উৎসাহ নিয়ে শোনাতে থাকে অম্বি।

রমার পড়ার ঘরে অধীর এসে ঢুকতেই রমা বলে— অম্বিকে ডেকে দিচ্ছি।

অধীর হাসে— তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

রমা— আমার কথা ছেড়ে দিন। হয়ত ডলিদের বাড়ি চলে যাব। আবার চণ্ডালিকার রিহার্সাল আরম্ভ হয়েছে।

রমা চলে যায়, এবং একটি মিনিট পরেই উদাসভাবে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায় অম্বি। অম্বি বলে— আপনি কিছু মনে করবেন না অধীরবাবু। একটু অপেক্ষা করুন, এখনই আপ্পি আপনার সঙ্গে গল্প করবার জন্য আসবেন।

অধীর হাসে— তার মানে, আপনি এখন এখানে আমার কাছে বসে দু'টো কথাও বলতে পারবেন না, এই তো ?

অম্বি—সত্যিই আমার কাজ আছে অধীরবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন।

অধীর— আপনার কথা আমি একটুও বিশ্বাস করলাম না, বিশ্বাস করুন।

অম্বি— রমাকেও বিশ্বাস করা আপনার উচিত হয়নি।

অধীর—তার মানে ?

অম্বি— ও যে একটা ছুতো ক'রে চলে গেল, বুঝতে পারেননি ?

অধীর—বুঝতে পারলেও আমার কী করবার আছে ?

অম্বি— রমাকে আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনার সঙ্গে দু'টো কথা বলবার জন্য কত আশা

ক'রে বসে থাকে রমা ; আপনি শুধু ওর আজে-বাজে কথাগুলিকেই দেখতে পান, ওর মনটাকে দেখতে পান না।

গম্ভীর হয় অধীর।

মনে হয় অম্বির, তার এই ব্রত সফল হয়, যদি আর একটু চেষ্টা করা যায়। যদি একটু কঠোর হওয়া যায়, যদি তার মনের কান্নাকে আরও ভাল ক'রে চেপে অধীরের মনে রমার নামে এক নতুন মোহ সৃষ্টি করতে পারা যায়।

এক এক সময় অধীরের কথা ও মন্তব্য থেকে যেন আশার আভাস পায় অম্বি। মনে হয়, অধীরের মনে রমার সম্বন্ধে একটা আকর্ষণের মায়াবোধ জাগছে। এই সত্য কল্পনা করতে একদিকে যেমন নিশ্চিন্ত হয় অম্বি, তেমনি আর একদিকে মনে হয়, কী দুঃসহ এই সত্য!

রোজই আসছে অধীর, এবং অধীরের একমাত্র কৌতূহল হল, কেন অম্বি তার বিয়ের প্রস্তাবকে বাধা দিল ? বিষণ্ণ হয়ে আছে অধীরের মন। সুযোগ খোঁজে, সোজা প্রশ্ন ক'রে অম্বির কাছ থেকে এই রহস্যের অর্থ জেনে নিতে চায়, কিন্তু ঠিক সুযোগ পায় না। যতবার নিভৃতে দেখা পেয়ে কথা প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে চেয়েছে অধীর, ততবারই কোনও না কোনও ঘটনায় প্রশ্ন অসমাপ্ত থেকে যায়। হয় চা খেতে ডাক দেন চারুবালা, নয় অম্বি সরে যায় কোনও কাজের অজুহাতে।

ব্যারাকপুরের গঙ্গার কলস্বর যখন অনেক রাতের নীরবতার মধ্যে হঠাৎ এক একবার বেজে ওঠে, তখন ঘুম ভেঙে যায় অম্বির, এবং আর ঘুম আসে না। গঙ্গার ঘাটে একা একা বেড়াতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে অম্বি। গঙ্গার ঘাটেও এখন আর সূর্যাস্ত দেখবার সুযোগ পাওয়া যায় না। আষাঢ়ে মেঘের ঘটায় কালো হয়ে আছে আকাশ। কিন্তু গঙ্গার ঢেউ তো আছে, আর জলের শব্দে অদ্ভুত সান্ত্বনার ভাষা আছে। কাছে গিয়ে দেখতে আর শুনতেও ইচ্ছা করে ; কিন্তু না, আর না। ভয় হয়, পিছন থেকে হয়ত ব্যস্তভাবে ছুটে আসবে একটি সুন্দর মানুষের ছায়া। একেবারে পাশে এসেই আবার সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করবে—তুমি এমন ক'রে লুকিয়ে থাকছ কেন ?

কিন্তু সে এখন কোথায় ? কলকাতাতেই আছে কি ? অনেক দিন হল, এই বাড়িতে আর আসেনি অধীর। আপ্পি আর আম্মির কথাবার্তা থেকেও কোনও সংবাদ ধরতে পারে না অম্বি। আশ্চর্য লাগে, এই বাড়ির কারও মন একটুকুও বিচলিত হয় না কেন ?

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারে অম্বি, এই বাড়ির মন সত্যিই বিচলিত হয়ে উঠেছে। শ্যামবাজার থেকে পিসিমার চাকর একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। অধীরের অসুখ। খুব জ্বর আর মাথাধরা।

বাড়িসুদ্ধ সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, আপ্পি আর আম্মি তৈরি হয়েছেন, এখুনি শ্যামবাজারে গিয়ে অধীরকে একবার দেখে আসবেন।

দেখে খুশি হয় অম্বি। কিন্তু এই খুশির ভিতরেই যেন একটা কাঁটা লুকিয়ে রয়েছে। অধীরকে দেখতে যাবার অধিকার এই পৃথিবীর সবারই আছে, শুধু নেই অম্বির।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আবার বিছানার উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছা করে। নিজের এই হাত দু'টোকেই যেন আবর্জনা বলে মনে হয় অম্বির। সে মানুষ যে নিজেই শখ ক'রে চেয়েছিল এই জ্বর, শুধু অম্বির হাতের একটা ভুল দেখবার লোভে। অধীরের কপালে অম্বির হাতের ছোঁয়া লুটিয়ে লুটিয়ে জ্বরের সব জ্বালা আর তাপ স্নিগ্ধ ক'রে দেবে, সেই মানুষের এমন একটি স্বপ্নকেই আজ তুচ্ছ ক'রে দূরে সরে থাকবে অম্বি।

কিন্তু বুঝতে ভুল হয়নি অম্বির। এই অসুখের খবর যে অম্বিকেই কাছে পাওয়ার আহ্বান। কিসের আশায়, কার জন্য, এই খবর এসেছে, কল্পনা করতে অসুবিধা নেই। তবু যেতে পারবে না অম্বি, এবং সেই মানুষও অম্বির এই হৃদয়হীনতা দেখে হতভম্ব হয়ে অম্বিকে চিরকালের মত অবিশ্বাস করুক।

হঠাৎ রমা এসে বলে—আমি যাচ্ছি অম্বি।

—কোথায় ?

—অধীরবাবুর অসুখ, একবার দেখে আসি।

অম্বি অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে। রমার চোখের ওই চঞ্চলতা কি সত্যিই একটা ব্যাকুলতা ? রমার মনে তবে কি সত্যিই... ।

রমা বলে—তুই যাবি না ?

অম্বি—না।

রমা—কেন ?

অম্বি—কেন আবার কী ? যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

রমা গম্ভীরভাবে বলে—ইচ্ছা যদি না করে তবে না যাওয়াই ভাল।

চলে গেল রমা। আপ্পি আর আম্মির সঙ্গে একই গাড়িতে বসে রমা চলে যাচ্ছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এই রহস্যটাকে বুঝতে চেষ্টা করে অম্বি, এবং বুঝতে পারে, হ্যাঁ, রমার মন আজ অধীরের কাছে গিয়ে বসবার জন্য সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অধীরের জন্য রমার মনে এতদিনে একটা মায়াভরা কৌতূহল দেখা দিয়েছে।

অম্বির চেষ্টা আর ইচ্ছাই সফল হয়েছে। জানালার কাছে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল অম্বি, সে নিজেই জানে না। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে একটা অন্ধ ভিখারি চেঁচিয়ে গান গাইছে আর বৃষ্টি পড়ছে। ভিখারিকে চাল দিয়ে বিদায় করার পর, আর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে ভিজবার পর অম্বির চোখ থেকে যেন বেদনার ঘোর কেটে যায়। ভালই হল। যেন একটা মানত সফল হল এতদিনে।

তবু একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর পেলেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাবে অম্বির সব উদ্বেগ। অধীরও কি তবে রমারই আশায় তার জ্বরের শরীর নিয়ে দরজার দিকে তৃষ্ণার্তের মত উৎসুক হয়ে তাকিয়ে বিছানার উপর চুপ ক'রে পড়ে আছে ? কে জানে, এতক্ষণে বোধ হয় রমাকে দেখতে পেয়েই শান্ত হয়ে গিয়েছে অধীরের চোখের প্রতীক্ষা।

তাই যেন হয়। ফটক থেকে ফিরে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকতেই ঝি চেঁচিয়ে ওঠে—এ কী গো অম্বিদি ? মিছিমিছি ভিজছ কেন ?

অম্বি হাসে—ভয় নেই, আমার জ্বর হবে না।

পিসিমার পরিকল্পনাও প্রায় সফল হয়ে এসেছে। অম্বির জন্য যে পাত্র সংগ্রহ করেছেন পিসিমা, সেই পাত্রের পক্ষ হতে পাতিপত্র রচনা করার প্রস্তাবও এসে গেল। নইলে অন্য জায়গায় পাত্রী খুঁজবেন তাঁরা। পিসিমাও ব্যস্তভাবে উপেন আর চারুবালাকে নানা তাগিদে বিচলিত ক'রে তুললেন। পিসিমার কথার জালে তাঁদের মনের প্রশ্নগুলিও যেন বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। ভুল হয়ে যাচ্ছে যুক্তি। পিসিমার কথার উপর বড় বেশি বিশ্বাস। পিসিমাকে বড়ই উপকারী জন বলে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন দুজনে। পাত্রপক্ষের লোক আর উপেনবাবু একদিন পাতিপত্রে সিঁদুরের ছাপ দিয়ে বিয়ের প্রস্তাবও পাকা ক'রে ফেললেন।

আর একটা প্রস্তাব, পিসিমা তাঁর সংকল্পের আর এক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এইবার, অধীরকে স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করবেন, এবং বলবেন। রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ের তারিখটা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে, শুধু অধীরকে একটু জিজ্ঞাসা করা। শুধু দুজনের মন একটু বুঝে নেওয়া। রমার কী ইচ্ছে, পরীক্ষার আগেই রাজি কি না ? অধীরও কি তাই চায় ?

এইজন্যই একবার রমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন পিসিমা। দুটিতে এক সঙ্গে বসে গল্প করলে বলেই ফেলবে মনের কথা, আর পিসিমা আড়াল থেকে শুনেই ফেলবেন। পিসিমা বলেন—ওগো আমি তো দিদিমা হই, নাতির সঙ্গে একটু রগড় আমি করব না তো কে করবে ?

ক'দিন পরে পিসিমা নিজেই এলেন দুটি চিঠি হাতে নিয়ে, দুটি নিমন্ত্রণ পত্র। রমা আর অম্বির কাছে লেখা অধীরের দুটি চিঠি। জন্মদিনের নিমন্ত্রণ। পিসিমা উপেনের বাড়ির ফটকে ঢুকবার আগেই একটি চিঠিকে কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলেন। অম্বির নামে লেখা নিমন্ত্রণের আহ্বানলিপি ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ে থাকে। পিসিমা এসে শুধু রমার হাতে তুলে দেন নিমন্ত্রণপত্র।

দেখে খুশি হয় অম্বি। শুধু রমার কাছেই অধীরের নিমন্ত্রণের চিঠি এসেছে। আর মনে সন্দেহ থাকে না। অধীরের মনে রমার জন্য যে আহ্বান জেগে উঠেছে, তার প্রমাণ ওই নিমন্ত্রণের চিঠি। শুধু রমারই কাছে, আর কারও কাছে নয়। চোখের জলে আর বিস্ময়ে এই প্রমাণকে সত্য বলে স্বীকার করতে চেষ্টা করে অম্বি।

আর কোনও প্রশ্ন নেই। অম্বির আর একটি মানতও সফল হয়েছে। অধীরের মন আজ রমাকেই খুঁজছে।

ভাল হল, আপ্পি আর আম্মির জীবনের একটা সাধের আশাকে ব্যথিত করবার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেল অম্বির জীবন। আরও ভাল, অম্বিকে একটা ছলনা, একটা মিথ্যা ভালবাসার খেয়াল, একটা ফাঁকির কুহকিনী বলে বুঝে ফেলতে পেরেছে অধীর। সুখী হোক অধীর। অম্বিকে মনে প্রাণে যদি ঘৃণা করতে পারে অধীর, তবেই একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে অম্বি।

চোখের কোণ দুটি ছলছল করে, নিঃশ্বাসের মধ্যে যেন কাঁটা খচখচ করে, করুক। কেউ দেখতে পাবে না, বেশ ভাল ক'রে এই বেদনা লুকিয়ে ফেলতে পারবে অম্বি। রমার বিয়ের দিনে অম্বির মুখের হাসি দেখে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সন্দেহবাদীও ধরতে পারবে না যে, অম্বির বুকের ভিতর তার জীবনের সব চেয়ে প্রিয় স্বপ্নটা নিজেই নিজের গলায় ছুরি দিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আপ্পি আম্মি আর রমা সুখী হবে। সব চেয়ে বেশি সুখের কথা, অধীর সুখী হবে। তবে আর দুঃখ করবার কী আছে? অম্বি জানে, সেই পাঁচ বছর বয়স থেকেই জানে, কেমন ক'রে সংসারের এক একটা সুন্দর ও মধুর মায়া আর ভালবাসার লোভ থেকে নিজেকে টেনে নিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে হয়। সেই যে কবে, আজও স্মৃতির কুয়াশার ভিতর যেন জ্বলজ্বল করে সেই দৃশ্যটা। আম্মির বিছানা থেকে অম্বি তার ছোট বালিশটা তুলে নিয়ে আয়ার ঘরে চলে গেল। আম্মির বুক ঘেঁষে শোবার অধিকার ছিল না, সেই পাঁচ বছর বয়সের অম্বির। আজও ঠিক তেমনই সরে যেতে হল। সহ্য করা এমন কি কঠিন কাজ? এখন তো অনেক বড় হয়েছে অম্বি। অনেক বয়স হয়েছে, বুকের হাড়গুলি কেমন যেন পাথর পাথর হয়ে গিয়েছে।

রমাকে সাজিয়ে দিল অম্বি। সেই সাজে, যে সাজে অধীরের স্বপ্ন অম্বিকেই সাজাতে চেয়েছিল একদিন। সেই চন্দ্রমল্লিকা, হাসনুহানার সৌরভ, খয়েরের টিপ, আর চাঁপা রঙের শাড়ি। রমা আশ্চর্য হয়, কেন অম্বি যাবে না? চারুবালাই রমার আপত্তি খণ্ডন করেন, রমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এসে বলে দেন—বনেদী বংশের উঁচু জাতের বাড়িতে অম্বি যেতে পারে না, যাওয়া উচিত নয়।

পিসিমার বাড়িতে এই ঘটনার মীমাংসা হয়ে গেল বড় স্পষ্ট ভাবেই। রমা এল। অধীরের সঙ্গে নিভৃতে বসে রমার অনেক গল্প আর আলোচনাও হল। পিসিমা বার বার দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ান, উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। তারপরেই অপ্রসন্ন মুখে গজগজ করতে করতে অন্যত্র চলে যান। আবার ফিরে এসে শুনবার চেষ্টা করেন, কী বলছে অধীর রমাকে?

শুনে হতাশ হয়ে পড়েন পিসিমা। অম্বি, অম্বি, অম্বি। শুধু অম্বির কথাই আলোচনা করছে দুজনে। রমাই বলে দেয়, অম্বি নিজের হাতে এভাবে সাজিয়ে দিয়েছে রমাকে। শুনে মনে মনে হাসে অধীর। অম্বির নানা গুণের কথা প্রাণ খুলে বলতে থাকে রমা। আর অধীরও অম্বির নামে সব গল্প আর সব ঘটনার বর্ণনাকে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনতে থাকে।

অধীর বলে—অম্বি বোধ হয় নিজেকে খুব চালাক মনে করে।

রমা—বোধ হয় কেন, সত্যিই অম্বির ধারণা যে, ওর চেয়ে জ্ঞানী ব্যাক্তি ভূ-ভারতে নেই। সর্বদা, মামাকে উপদেশ দিচ্ছে অথচ নিজে...।

অধীর—নিজে কারও সামান্য একটা অনুরোধের সম্মান রাখতেও রাজি নয়।

বলতে বলতে গম্ভীর হয় অধীরের মুখ। তারপর রমার মুখের দিকেই যেন একটা বেদনাহত দৃষ্টি তুলে বলতে থাকে—তোমাকে বলা উচিত নয়, তবু না বলে থাকতে পারছি না, আমি আশা করেছিলাম, আজ অন্তত অম্বি আসবেই।

রমা বলে—আমিও আশ্চর্য হয়েছি। তা ছাড়া আমারও মনটা এত রেগে গেল যে আমিও ওকে আসবার জন্য বললাম না।

অধীর—তোমার তবু একটা সুবিধা আছে রমা, অম্বির ওপর রাগ করতে পারো। কিন্তু আমি যে অম্বির ওপর রাগই করতে পারছি না।

খিলখিল করে হেসে ওঠে রমা। অধীর বলে—তুমি বোধ হয় আমাকে ঠাট্টা করছ রমা—

রমা বলে—হ্যাঁ, আপনাকে ঠাট্টা করাই উচিত। এ কথাটা আমাকে না বলে অম্বির কাছে বলে ফেলতেই তো পারেন।

আড়াল থেকে শুনে চমকে ওঠেন পিসিমা। হ্যাঁ, অম্বি নামে ওই অজাত একটা মেয়ে বড় বেশি ছলনা বিস্তার করেছে। ওই মেয়েটাই পথের কাঁটা। ওকে পথ থেকে তাড়াতাড়ি সরাতে না পারলে পিসিমার সংকল্প ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। নিজেকে আরও কঠোর ক'রে, এবং চক্রান্ত আরও কঠোর ক'রে নিয়ে প্রস্তুত হন পিসিমা। অধীরের মন থেকেই অম্বি নামের মোহ চূর্ণ করে দিতে হবে।

রমার মুখের নানা গল্প শুনে নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছে অধীর। এতদিনে অম্বির ইচ্ছার চক্রান্তটাকে চিনতে পেরেছে অধীর। রমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে অধীরের চোখের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অম্বি তার মনের গোপন একটা চেষ্টাকে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। অম্বির ইচ্ছা, রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ে হোক, এই রহস্যের আভাস এক দুঃসহ বিস্ময়ের আঘাতের মত অনুভব করেছে অধীর। কিন্তু কেন ? ভালবাসা কি এই রকম একটা লুকোচুরি খেলার আবেগ ? খামখেয়ালের উল্লাস ? অধীরের জীবনের আশা আর আনন্দগুলি কি অস্থির ইচ্ছার হুকুম মেনে উঠবে বসবে আর ছুটে বেড়াবে ? এই বিস্ময়ের চরম হিসাব নিকাশ করবার জন্যই উপেনের বাড়িতে দেখা দিল অধীর।

অধীরকে দেখতে পেয়েই ভয় পায় অম্বি। অধীরের চোখে যেন দুর্জ্ঞেয় একটা প্রশ্ন জ্বলজ্বল করছে। এবং সেই প্রশ্ন ধ্বনিত হওয়া মাত্র বুঝতে পারে অম্বি, তার শেষ প্রয়াস সফল হয়নি। রমাও একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছে অম্বিকে।

অধীর বলে—আমি তো আর দেরি করতে পারি না।

অম্বি বলে—ভুল করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।

—কেন ?

অম্বি বলে—আপনার ক্ষতি হবে।

অধীর—কিসে আমার ক্ষতি হয় বা না হয়, সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে।

বাগানের কাছে বাঁশের খুঁটি বেয়ে নতুন মাধবীলতা অনেক উপরে উঠে গিয়েছে আর নতুন বর্ষার জলো বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে দুলছে। এ হেন একটা ভয়ানক নিরালার এক কোণে অম্বি আজ অধীরের চোখের সামনে আটক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চলে যাবার সুযোগ পায়নি। বাড়ির ভিতর থেকেও কোনও ডাক আসে না, কেউ ডাকলেও এখান থেকে শুনতে পাওয়া যাবে না। ছুতো ক'রে সরে যাবার উপায় নেই অম্বির। অধীরের মুখের ওই স্পষ্ট দাবি যেন পরোয়ানার মত অম্বির কানের কাছে এসে অম্বিকে এই মুহূর্তে তৈরি হয়ে নিতে বলছে।

অম্বি বলে—আপনাকে আমার চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করতে পারবে, এমন মেয়ে কি এই পৃথিবীতে নেই ?

অধীর—থাকতে পারে !

অম্বি—আমার উপর মায়া করতে আপনার যতটুকু ভাল লাগছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাল লাগবে, এমন মেয়েও তো কত আছে।

অধীর চেঁচিয়ে ওঠে—না, নেই। আমি তোমার চেয়ে বেশি বোকা নই অম্বি।

উপায় নেই। কোনও যুক্তি, কোনও অনুরোধ কোনও অজুহাত আর কোনও ছলনার জোরে অম্বির প্রাণ অধীরের ওই প্রতিজ্ঞার দাবিকে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে আর মিথ্যা বুঝিয়ে পালিয়ে যাবার পথ পাচ্ছে না।

কিন্তু, আর এই সব তুচ্ছ বাজে যুক্তি আর তর্কের দরকার কী ? একটি সত্য কথা বলে দিয়েই তো এই মুহূর্তে অধীরের মনের এই প্রতিজ্ঞার জোর চূর্ণ ক'রে দেওয়া যায়। উঁচু জাতের এতবড় বংশগর্বের মানুষ যে এখনও অম্বির এই শরীরটার রক্তমাংসের ইতিহাসে কোনও খবরই রাখে না।

হঠাৎ অম্বির চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে। অধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে, যেন বুকের ভিতর মস্ত একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হতে চেষ্টা করছে অম্বি। অম্বি বলে—আপনি তো জানেন, কত বড় বংশের কত উঁচু জাতের মানুষ আপনি ?

অধীব—জানি বইকি ?

অম্বি—আপনি তো জানেন যে, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে অনেক নীচ জাতের মানুষ আছে।

অধীর—জানি।

অম্বি—নীচ জাতের মানুষের মনও নীচ হয়ে থাকে। বিশ্বাস করেন নিশ্চয়ই ?

অধীর—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অবিশ্বাস করবার জন্যই প্রমাণ খুঁজছি।

কী যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ নীরব হয় অম্বি। থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে অম্বির দুই কালো চোখের তারা। আর, চোখের কঠোর দৃষ্টি যেন হঠাৎ বেদনায় ছলছল ক'রে ওঠে।

আশ্চর্য হয় অধীর—তুমি আজ আমাকে এসব প্রশ্ন করছ কেন অম্বি ?

উত্তর দেয় না অম্বি।

অধীর বলে—রমা বোধ হয় তোমাকে বলেছে যে, আমি জাতপাতের মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য রিসার্চ করছি।

তবু উত্তর দেয় না অম্বি। মাধবীলতার ভেজা পাতা থেকে টুপটাপ ক'রে জলের ফোঁটা অম্বির খোঁপার উপর ঝরে পড়তে থাকে। অধীরের মুগ্ধ চোখ দুটো হঠাৎ এক নতুন সন্দেহে যেন তীব্র হয়ে চমকে ওঠে।—তুমি, তুমি কি তোমার নিজের জাতের কথা ভাবছ অম্বি ?

অম্বি—হ্যাঁ।

অধীর—তুমি কি উপেনবাবুর মত...মানে আমাদের মত জাতের মেয়ে নও ?

অম্বি—না।

অধীরের এতক্ষণের সব আগ্রহ যেন স্তব্ধ হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে অতি শান্ত স্বরে, যেন ছোট একটি বিস্মিত আর্তনাদের মত শব্দ ক'রে অধীর প্রশ্ন করে—তবে ?

অপলক চোখে অধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে অম্বির প্রাণটাও যেন নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে শিউরে উঠে। ভয় পেয়েছে অধীর। উঁচু জাতের মানুষের ভালবাসা হঠাৎ নীচ জাতের ছায়া দেখে আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। ভালই হয়েছে। এই মুহূর্তে অধীরকে সব ভুল মোহ থেকে মুক্ত ক'রে দিতে পারবে অম্বি।

অধীরের মনকে হঠাৎ আঘাতে যেন চরম ক'রে চূর্ণ করার জন্যই নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দেয় অম্বি।—আমি ভয়ানক ছোট জাত। আমি অন্ত্যজা, অস্পৃশ্যা। আমার রক্তে দোষ আছে, আপনাদের পবিত্র পৃথিবীতে আমি একটা আবর্জনা।

অধীর নিঃশব্দে স্থির হয়ে শুনতে থাকে। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় অম্বি, একি ? অধীরের দুই চোখ যেন মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। যেন এই জগতের এক বিস্ময়কে, এবং অধীরের জীবনের এক অন্বেষণের সত্যকে এতদিনে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে অধীর।

অধীর হাসে—তুমি ভয় দেখাচ্ছ অম্বি, কিন্তু ভুল করছ, তুমি আমার জীবনের সব অন্বেষণের জয়গান গাইছ। সত্য বলে বুঝতে চেয়েছিলাম যে কথাকে, তুমি তারই রূপ, তারই প্রমাণ। তুমিই আমার বিশ্বাস, আমার থিওরির শেষ অধ্যায় আজ আমি লিখব। আমার জিজ্ঞাসার তৃপ্তি তুমি। সব চেয়ে বড় বেদনার শান্তি তুমি। তুমি ভুলভাঙানো এক সুন্দর সত্যের মূর্তি। জাত মিথ্যা, রক্ত মিথ্যা—তোমার মধ্যেই তার প্রমাণ পেলাম।

আরও লুব্ধ ও মুগ্ধ হয়ে উঠেছে অধীরের অন্তরাত্মা। কিন্তু একেবারে অসহায়ের মত নীরব হয়ে যায় অম্বি। অধীরের এই প্রেমিকতা যেন স্বর্গের সুধার চেয়ে বেশি মধুর। কিন্তু এই প্রেম অম্বিকে আহ্বান করছে, আম্নি আর আম্মির মনে দুঃখের আঘাত হানবার এক চক্রান্তে। মরতে পারে অম্বি, কিন্তু আম্নি আর আম্মির কাছে হীন হতে পারে না। এই বাড়ির মায়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না অম্বি। এই সহজ সত্যটুকু বুঝতে পারছে না অধীর।

অম্বি বলে—না। তবু আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।

অধীর—তবুও না ?

কী আশ্চর্য ! অম্বির এই পাথুরে হৃদয়ের পরিচয় কোনওদিন পায়নি অধীর। এ যে পাথরের ফুল। কিন্তু কিসের আশায়, কোন মোহে, অধীরের এই আহ্বানকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দেবার শক্তি পাচ্ছে অম্বি ? এ কোন রহস্য ?

অধীর প্রশ্ন করে—কোথায় কার কাছে কোনও আকর্ষণের লোভে আমার ডাক এমন ক'রে তুচ্ছ করতে পারছ অম্বি ? এর কি কোনও গোপন কারণ আছে ?

অম্বি বলে—আছে, তোমার প্রতি আমি নিষ্ঠুরতা করতে পারি, এমন কারণও আছে, আকর্ষণও আছে, লোভও আছে।

উত্তপ্ত স্বরে অধীর প্রশ্ন করে—শুনি, কী সেই আকর্ষণ ?

অম্বি—শুনতে চাইবেন না, পায়ে পড়ি আপনার। আপনি শুধু বিশ্বাস করুন, আপনার স্বপ্নের চন্দ্রমল্লিকা মরে গিয়েছে।

ক্ষীণ সন্দেহ নিয়ে ফিরে যায় অধীর।

অধীরের মনের এই অবস্থারই সুযোগ নিলেন পিসিমা। কথা প্রসঙ্গে, আভাসে জানিয়ে দিলেন,—একটা ভাল খবর শুনেছিস অধীর ? বেশ ভাল ঘরে অম্বির বিয়ে হচ্ছে। পাত্র বেশ পয়সাওয়ালা মানুষ।

চমকে ওঠে অধীর, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু দিদিমাকেও অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। বিচলিত অধীরের যুক্তি বুদ্ধিও যেন এই দুঃসহ সংবাদে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। মনটাই সন্দেহের বশে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। অম্বির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে অধীরের মন। টেলিফোনের রিসিভার তুলে ধরে অধীর।

অধীরের ভাষাও যেন হঠাৎ তিক্ততায় উন্মত্ত হয়ে গরলে পরিণত হয়েছে। অম্বিকে স্পষ্ট করেই নিষ্ঠুর অভিযোগে আক্রমণ করতে কুণ্ঠিত হয় না অধীর।—এমন তামাসার, এমন হীনতার কোনও প্রয়োজন ছিল না। টাকা আমার আছে, চাইলেই পাবে। এখনও পেতে পারো। কিন্তু টাকার কাছে বিকিয়ে যায় কারা ? তুমি কনকধুতুরা, বিষ আছে তোমার ওই সুন্দর হাসিতে আর নিঃশ্বাসে ; তুমি আমার সারা জীবনের বিশ্বাসের সাধনাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলে। আজ আমাকে নতুন ক'রে লিখতে হবে, শুরু করতে হবে আবার—বলতে হবে পৃথিবীকে, জাত আছে, ছোট-জাত। তাদের রক্তে ছোটতা আছে। তার প্রমাণ তুমি।

অম্বির ক্ষীণ প্রতিবাদের ভাষা অধীর শুনতে পায় না। কল্পনাও করতে পারে না অধীর, তার কথার আঘাতে এখন দূর ব্যারাকপুরের একটি কক্ষের নিভৃতে অম্বি নামে এক মেয়ের দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

অধীর বলে—কিসের আকর্ষণ ? সে আকর্ষণ কি এতই সুন্দর যে তার জন্য তোমার কাছে আমার জীবনের সব অনুরোধ মিথ্যে হয়ে গেল ?

অম্বি—তবে শোনো।

কিন্তু অম্বির আবেদন শুনতে পায় না অধীর। টেলিফোন রেখে দিয়েছে অধীর। বার বার প্রশ্ন করেও উত্তর পায় না অম্বি।

চিঠি লেখে অম্বি।—তোমাকে সুখী করবার শক্তি আমার নেই, কারণ আমি চিরকাল আমার আপ্লি আর আম্মির গা ঘেঁষে পড়ে থাকতে চাই। এই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লোভ। কিন্তু তুমি আমাকে সুখী করতে পারো। আমাকে যদি সুখী করতে চাও, তবে রমাকে বিয়ে করো।

রমাকে বিয়ে করো। অম্বির চিঠির এই প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হয় না অধীর। বিশ্বাসঘাতিকারা এই রকম আত্মত্যাগের ছলনা দেখায়। কিন্তু বুঝতে পারে না অম্বির যুক্তিগুলি। চিরকাল আপ্লি আর আম্মির গা ঘেঁষে পড়ে থাকবার আনন্দটুকু হারাতে চাই না। এ কথার অর্থ কি ? তবে অম্বি কি বিয়ে করতে চায় না ? তবে দিদিমা এ কোন কথা বললেন ?

নিজেকে শান্ত ক'রে নিয়ে টেলিফোনেই আবার অম্বিকে ডাকে অধীর। এবং পরমুহূর্তে সেই

দুঃসহ সন্দেহের চরম মীমাংসা হয়ে যায়।

—আমার বিয়ে? অম্বি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ।

—কোথায়, কবে, কার সঙ্গে?

—বেশ এক টাকাওয়ালার সঙ্গে।

—কোথায় শুনলে?

—ভাল মুখ থেকেই শুনেছি।

—তবে শোনো, কিন্তু একটি কথা দাও।

—কী?

—এমন বিয়ের লগ্নের আগে তুমি একবার আসবে আমার চোখের কাছে।

—কেন?

—এই পৃথিবীকেই একটা ঘটনা দেখিয়ে দেব।

—কী?

—তোমার পায়ের ধুলোর দাগ এই সিঁথিতে বরণ ক'রে নিয়ে তোমার চোখের সামনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়বে এই ছোটজাতের মেয়ে, আর উঠবে না।

—অম্বি। অম্বি।

কোনও উত্তর পায় না অধীর। কিন্তু অধীরের বুকে যেন তীক্ষ্ণ একটা আক্ষেপের খোঁচা লেগেছে। কী কুৎসিত সন্দেহ! কী ভয়ানক মূঢ়তা! নিজের ভুলের বেদনা সহ্য ক'রতে না পেরে ছটফট ক'রে বেড়ায় অধীর। বার বার অম্বির চিঠির সেই লাইনটাই পড়ে, 'আমাকে যদি সুখী করতে চাও, তবে রমাকে বিয়ে করো।'

বার বার এই লাইনটিই পড়ে অধীর। হেসে ওঠে অধীরের চোখ। চিৎকার ক'রে ডাক দেয় অধীর—দিদিমা!

বটার মা'র সঙ্গে কথা বলছিলেন পিসিমা। রমার সঙ্গে অধীরের আসন্ন বিয়ের শুভ ঘটনার সম্ভাবনার কথা আলোচনা করছিলেন। একটু আগেই দেখেছেন পিসিমা, উপেনের বাড়ির চাকর রাদু এসে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছে অধীরকে; আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন পিসিমা। ধারণা করেছেন, রমার চিঠি এসেছে। পিসিমাই যে ক'দিন আগে রমাকে আড়ালে ডেকে ফিসফিস ক'রে শিখিয়ে দিয়ে এসেছেন, তুমি বাছা মাঝে মাঝে অধীরকে চিঠি দিয়ো, দুটো ভাল কথা লিখে নেমন্তন্ন করো। জানই তো, আজকালকার শিক্ষিত ছেলে, ওসব বড়ই ভালবাসে।

আশার আলো দেখতে পেয়েছেন পিসিমা। বটার মাকে বলেন—ঠিক, আমি যা ভাবছি তাই হয়েছে বটার মা। ভগবান বুঝি এতদিনে কৃপা করলেন।

পিসিমা অধীরের কাছে এসে খুশিভরা কণ্ঠে বলেন—কী রে ভাই?

অধীর—তুমি কি চাও যে, আমি বিয়ে করি?

—নিশ্চয়ই।

—তবে শোনো।

পিসিমা এইবার যেদিন আসবেন সেদিন একেবারে শুভ সংবাদ সঙ্গে নিয়ে আসবেন। উপেন আর চারুকে এই আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন পিসিমা। আর দেরি করা উচিত নয়। কিন্তু অধীরের সম্মতির কথা নিয়ে কবে আসবেন পিসিমা, এই কথাই উৎসাহিতভাবে আলোচনা করেন উপেন আর চারুবালা। এবং হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখতে পেলেন, সত্যিই পিসিমা আসছেন। অধীরও সঙ্গে আছে।

রমার পড়ার ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে থাকে অধীর, পিসিমা ধীরে ধীরে গম্ভীর মূর্তি নিয়ে উপেনের কাছে এগিয়ে আসেন।

উপেন বলেন—পিসিমাকে স্মরণ করা মাত্র যখন পিসিমা উপস্থিত হয়েছেন, তখন বুঝতে

পেরেছি, নিশ্চয়ই শুভ সংবাদ আছে আছে।

তিক্ত ও কঠিন মুখ নিয়ে পিসিমা বলেন—হ্যাঁ শুভ সংবাদ। আমাকে যখন ঠাকুর ঘরে ঢুকে বলতে হয়েছে...।

—কী ?

—বলিয়ে ছেড়েছে গো। অধীরের বিয়ের কথা ঠাকুরকে নিবেদন করতে হয়েছে। ঠাকুরের কৃপা চাইতে হয়েছে। চাইয়ে ছেড়েছে গো।

উপেন আর চারুবালা উৎসাহিত হয়ে হাসতে থাকেন। কিন্তু পিসিমার চোখ হতাশ উদাস ও বিষণ্ণ। পিসিমা হাঁপ ছেড়ে বলেন—অধীর বিয়ে করবে বলেছে।

চারু—দিনক্ষণের কথা ?

পিসিমা—তা জানি না, একটা দিন হলেই হল।

চারু—পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ভাল ছিল।

পিসিমা—কিসের পরীক্ষা ?

চারু—রমার ?

পিসিমা—রমার পরীক্ষা রমা দিক না কেন। অম্বির তো পরীক্ষা-টরীক্ষা নেই।

চারু চেঁচিয়ে উঠেন—তার মানে ? অম্বি ? অম্বি মানে কী ?

পিসিমা আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন—অম্বিকেই তো বিয়ে করতে চায় অধীর।

পিসিমার কথা শোনামাত্র নিস্তব্ধ হয়ে আর শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন উপেন আর চারুবালা। পিসিমাকে এক অদ্ভুত বিশ্বাসঘাতিকার মত মনে হয়। কিন্তু দেখা যায়, ভীতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন পিসিমা।

চারুবালা বলেন—কিন্তু অধীর যদি জানে যে অম্বির জাতটা কী, তা হলে নিশ্চয়ই...।

পিসিমা বলেন—সে কি আর জানতে কিছু বাকি আছে। সবই জানে। যার জানাবার সেই জানিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত ! অধীর কী বলে শুনবে ? বলে, অম্বি তো এখন উপেনবাবুরই মেয়ে।

উপেন—তবে আপনার আর কী জানবার আছে ?

পিসিমা—আমার কিছুই জানবার নেই। নাতি শুধু জানতে চায়, অম্বি রাজি আছে কি না।

চারুবালা ধিক্কারের সুরে চেঁচিয়ে ওঠেন—ওর রাজি হতে কি আর বাকি আছে না কি ? জেনে শুনে ইচ্ছে করেই এই কাণ্ড করেছে। রাজি হয়েই আছে।

পিসিমা—তবু একবার অম্বিকে জিজ্ঞেস করে অধীরকে তোমরাই জানিয়ে দিও। আমি আর এর মধ্যে নেই...। আর এই নাও...।

অম্বির বিয়ের সেই পাতিপত্র উপেনের হাতের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে পিসিমা চলে গেলেন, পৃথিবীকে ধিক্কার দিতে দিতে, সংসারের অদ্ভুত অনিয়মগুলিকে অভিশাপ দিতে দিতে।

বাইরের বারান্দায় গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন পিসিমা। চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর কাঁদলেন। পিসিমার মনের রাজ্যেও যেন একটা ওলট-পালট হয়ে গেল হঠাৎ।

শ্যামবাজারের বাড়িতে আর ফিরলেন না পিসিমা। তাঁর নিজের মনের হীনতাকেও আজ যেন দেখতে পেয়েছেন পিসিমা। তাই নিজেকেই অশুচি বোধ করছেন।

মনে পড়ে পিসিমার, অধীরের সেই কথাগুলি, তোমার কোম্পানির কাগজগুলি কাড়তে চাই না, কিন্তু তোমার আশীর্বাদ কাড়তে চাই।

আবার ফিরে আসেন পিসিমা। নিস্তব্ধ উপেন আর চারুবালার কাছে এসে একটি কাগজের প্যাকেট সঁপে দিয়ে বলেন—এগুলি তোমার কাছেই রাখো।

উপেন আতঙ্কিতের মত তাকান—কেন ? পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ, এসব কার জন্য ?

পিসিমা—অম্বিকে দিয়ে গেলাম। যখন হার মেনেছি, তখন ভাল করেই হেরে যেতে চাই। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমি এখন কাশী যাব, তারপর কোথায় যাব জানি না।

চলে গেলেন পিসিমা।

এবাড়ির অন্তরে যেন এক ভয়ংকর পরাভবের অপমান রেখে দিয়ে পিসিমা সরে পড়লেন। বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে শুধু সহ্য করবার চেষ্টা করেন উপেন ও চারুবালা। এ কী কাণ্ড ? কোন নিয়ম ? রমাকে পছন্দ না ক'রে অম্বিকে পছন্দ করে, এ কোন প্রেমের চক্ষু ? শিক্ষিত উচ্চবংশীয় অধীব শিক্ষা দেখল না, বংশও দেখল না ? রূপও দেখল না। তবে দেখল কী ?

প্রথমে অধীরের কথা আলোচনা করেন। অধীরের উপর শুধু অভিমানের মত একটা অভিযোগ ব্যথা দেয় চারুবালাকে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারেন, অধীরের দোষ নয়। দোষ যার, অলক্ষ্যে দংশন দান ক'রে এই বাড়ির এতদিনের স্নেহের শোধ দিল যে সাপিনী, সে-ই এখন মনের উল্লাস লুকিয়ে ওই ঘরে বসে রয়েছে। পরের মেয়ে, একটা অজাতের মেয়ে এইভাবে এতদিনে কৃতজ্ঞতার শোধ দিল। আড়াল থেকে ছলনার জোরে একটা ভাল ছেলের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। রমা পারবে কেন ওই সাপিনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ? বড় জাত আর ছোট জাতের পার্থক্য এই।

কী আশ্চর্য ! বলতে বলতে উপেন ছটফট করেন। যেন এই সর্বনাশটুকু করবার জন্যই ধীর স্থির শান্ত অথচ হীন একটা হিংসা একটা বাচ্চা মেয়ের মূর্তি ধরে এই পরিবারের বুকের কাছে দেখা দিয়েছিল। বাইশ বছর ধরে বড় হয়ে, এতদিনে তৃপ্ত হয়েছে এই হিংসা। তাদের নিজের মেয়েকে পৃথিবীর কাছে ছোট ক'রে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সেই হিংসাটা।

—মেয়ের মত নয়; সাপের মত। চিৎকার করে ওঠেন চারুবালা।

—ভুল হয়েছে। চেঁচিয়ে ওঠেন উপেন।

তারপরেই নিজেকে সংযত ক'রে উপেন বলেন—যাক, আর দেরি করা উচিত নয়। অম্বিকে জানিয়ে দাও, জিজ্ঞাসা ক'রে নাও, তারপর নিঃশব্দে বিদায় ক'রে দাও। আমাদের আর চিৎকার ক'রে লাভ কী ?

কিন্তু চিৎকার ক'রে ওঠেন চারুবালা।—কিন্তু আমাকে বাদ দাও। ও মেয়েকে চেলির জোড়ে সাজিয়ে দিয়ে আমি উৎসব করতে পারব না। আমার হাতে মঙ্গল-ঘট সাজানো চলবে না। আমি উলু দিতে পাবব না, আমি আশীর্বাদ করতে পারব না। আমি ফিরে এসে যেন দেখতে পাই, তুমি এই সাপের মতকে বিদায় ক'রে দিয়েছ।

ঘর থেকে ছুটে বের হলেন চারুবালা। কিন্তু অম্বি শুনতে পেয়েছে আম্মির আক্ষেপের কঠোর ভাষাগুলি। শুনে চমকে উঠেছে।

ছুটে আসে অম্বি। এবং চারুবালাকে ছুটে যেতে দেখেই বাধা দিয়ে ডাক দেয় অম্বি—আম্মি।

—চুপ ! চুপ ! আমি কারও আম্মি নই। সাপের মত তুই, রক্তে বিষ আছে তোর।

ছুটে যান চারুবালা। অম্বি আর্তনাদ ক'রে পিছু পিছু ছুটে যায়—আম্মি। আম্মি।

কিন্তু সর্বনেশে এক আঘাতের বেদনায় তীক্ষ্ণ স্বরে অম্বির গলা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে যায়। ভাঙা সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ে গিয়েছেন চারুবালা। ছুটে আসে রমা আর উপেন আর অধীব।

অচেতন ও দুর্বল অসাড় দেহ নিয়ে বিছানার উপর পড়েছিলেন চারুবালা।

অধীরের টেলিফোনের ডাক শুনে ছুটে এসেছেন অধীরের ডাক্তার বন্ধু। মাথায় আঘাত পেয়েছেন চারুবালা। ডাক্তার বলেন—রক্ত চাই। 'বি' টাইপ রক্ত।

কিন্তু চাইলেই, এবং টাকা খরচ করতে তৈরি হলেও রক্ত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে হল। ডাক্তারের টেলিফোনের জিজ্ঞাসার উত্তরে রক্তব্যাঙ্ক সংক্ষেপে দুঃখ প্রকাশ ক'রে জানিয়ে দেয় 'স্টক'-এ এখন সব টাইপের রক্ত নেই। 'এ' আছে 'এ-বি' আছে, আর 'ও' আছে। 'বি' একেবারেই নেই। চিন্তায় পড়লেন ডাক্তার। চলে গেলেন, এবং ফিরে এলেন রক্ত আহরণ ও সঞ্চার করবার যন্ত্রসম্ভার সঙ্গে নিয়ে।

আর দেরি করলে চলবে না। এই মুহূর্তে রক্ত সঞ্চার করতে হবে চারুবালার দেহে। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। রক্ত দেবার জন্য উপেন এগিয়ে আসেন। ডাক্তার আপত্তির ভঙ্গিতে বলেন, আপনি বুড়ো মানুষ, আর কেউ নেই ?

কিন্তু উপেনের অনুরোধে রক্তের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করেই বলেন—চলবে না।

রমা এগিয়ে আসে। রমার রক্তের নমুনা পরীক্ষা ক'রে দেখে মন্তব্য করেন—চলবে না। আর কেউ নেই ? দেরি করলে চলবে না'। কুইক।

অম্বি এগিয়ে আসতেই উপেন চমকে উঠে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অম্বি বাধা মানে না। অম্বির দুই চক্ষুর কঠোর দৃষ্টি দেখে উপেন হঠাৎ কুণ্ঠিতভাবে চোখ ঘুরিয়ে নেন।

অম্বির দেহের উপরেই ডাক্তারের শোণিতগ্রাহী যন্ত্র পিপাসিতের মত মুখ এগিয়ে দেয়। রক্তের নমুনা পরীক্ষা ক'রে খুশি হয়ে ওঠে ডাক্তারের চক্ষু। মিল, মিল পাওয়া গিয়েছে। এই তো, সুন্দর 'বি' টাইপ রক্ত। অম্বির রক্তের কণিকা চারুবালারই রক্তের কণিকার একই মায়ার উত্তাপ দিয়ে গড়া।

অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলেন—সুন্দর মিলে গেছে। চলবে। কিন্তু আপনার শরীরও যে দুর্বল মনে হচ্ছে। অনেকখানি রক্ত টানতে হবে, ভয় করছে না তো ?

অম্বি বলে—আপনি আর একটুও দেরি করবেন না ডাক্তারবাবু।

কী আশ্চর্য, অম্বির সারা মুখে কী-যেন এক পরম তৃপ্তির আনন্দ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

অম্বির দেহ থেকে রক্তধারা আহরণ করেন ডাক্তার। তারপর অন্য ঘরে গিয়ে সংজ্ঞাহীন চারুবালার দেহে রক্ত সঞ্চার করেন। সমাপ্ত হয় ডাক্তারের কাজ।

যাবার সময় খুশি হয়ে বলে যান ডাক্তার। —আর আশঙ্কা করবার কিছু নেই।

ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করেন চারুবালা। উপেন বলেন—এ কী রকম ব্যাপার হল ? এ কেমন রক্তের মিল ?

অধীর—আপনি কি আশ্চর্য হয়েছেন ?

উপেন—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মেলে না, রমার সঙ্গে মিলল না, মিলল গিয়ে...।

অধীর মৃদুহাসি হাসে। —আপনি কি মনে করেন, রক্তের মধ্যে জাত আছে ?

চারুবালা হঠাৎ চোখ মেলে তাকান—কী বলছ, তোমরা ?

অধীর বলে—আচ্ছা, আমি এবার আসি।

আস্তে আস্তে হেঁটে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায় অধীর।

চারুবালা—কী কথা বলছিল অধীর।

উপেন বলেন—অধীর নয়, আমিই বলছিলাম। আবার একটা অপমান সইতে হল চারু।

—কী ? কে অপমান করল ?

—অম্বি। অম্বির রক্তের মধ্যে ডাক্তার তোমার রক্তের মিল খুঁজে পেয়েছে।

—কী ? অম্বি রক্ত দিয়েছে ? উত্তেজিত হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করেন চারুবালা।

উপেন—হ্যাঁ।

চারু—কেন ?

উপেন—কেন জানি না। জানে অম্বি, জানেন তোমার ভগবান, জানে এই সংসারের যত অদ্ভুত অনাসৃষ্টির নিয়মকানুন। শুধু তুমি জান না, আর আমি জানি না।

অবসন্নের মত আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়েন চারুবালা। চারুবালার চোখ ছলছল করে।

উপেন বলেন—হার হল, সব দিক দিয়ে। হার হল চারু। অম্বি দেনা শোধ ক'রে দিল, আর ওকে বলবার কিছু নেই, ওর কথা ভুলে যাও।

চারুবালা বলেন—হ্যাঁ, ভুলেই যেতে চাই।

যেন নরম হয়ে আসছে চারুবালার মনের কঠোর বিক্ষোভগুলি। চারুবালা ভাঙা ভাঙা স্বরে বলতে থাকেন—দোষ মেয়েটার নয়, দোষ আমাদের ভাগ্যের। এমনই হয়ে থাকে। দয়া ক'রে আমাকে বাঁচিয়েছে অম্বি, ওর ওপর রাগ করবার অধিকারও রইল না।

হঠাৎ প্রশ্ন করেন চারুবালা—অম্বি কোথায় ?

—ওই ঘরে। ডাকব ?

—না। তুমি জিজ্ঞাসা করে এসো।

—কী ?

—আর কী চায় অম্বি ? আমাদের জব্দ করবার আর কোনও শখ যদি থাকে মনে বলে ফেলুক এখনি।

উপেন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। —দেখো, আর কোনও কথা বলাই উচিত নয়। শুধু যেটুকু কর্তব্য আছে, তাই করো।

চারু—জিজ্ঞাসা করে এসো, কবে বিদায় নিতে চায়। তারপর অধীরকে জানিয়ে দাও।

যাবার আগে অম্বির বিছানার কাছেই এসে একবার দাঁড়ায় অধীর। অবসন্নভাবে যেন একটা তন্দ্রা চোখে নিয়ে শুয়ে আছে অম্বি। অম্বিকে প্রশ্ন করে অধীর—কী ব্যাপার ?

অম্বি—আমার নিশ্বাসে বিষ আছে অধীরবাবু, আমি বিশ্বাস করি। আর আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ কী জানেন, আমি এখনও বেঁচে আছি।

অধীর—কথার অর্থ ?

অম্বি—আমিই আম্মির এই কষ্টের কারণ। আপনি পিসিমাকে বৃথাই পাঠিয়েছেন, আমি বিয়ে করব না।

অধীর—তা হলে আমাকে তোমার আর বলবার কিছু নেই ?

অম্বি—আছে।

অধীর—বলো।

অম্বি—আমাকে ঘেন্না ক'রে চলে যান, আর আপনি সুখী হোন।

অধীর—চলে যাচ্ছি, কিন্তু দুঃখ এই যে, তোমাকে ঘেন্না করে যেতে পারলাম না। আমি তোমাকে ভালবেসে ভুল করিনি, কিন্তু তুমি আমাকে ভালবেসে ভুল করেছ।

অম্বি—হ্যাঁ, ভুল ক'রে ভালবেসেছি অধীরবাবু, বুঝতে পারিনি।

অধীর হাসে। —তুমি নিশ্চিন্ত হও অম্বি, দুঃখ করো না, তোমার সেই ভুলের কথা ভেবেই আমি সুখী হতে পারব। এ ছাড়া সুখী হবার আর কোনও পথ নেই।

অম্বি দুহাতে চোখ ঢাকা দিয়ে বলে—ভুলে যাও।

উত্তর না পেয়ে আরও ব্যাকুল হয়ে অম্বি বলতে থাকে। —তুমি সুখী হবে, রমাকে বিয়ে করো। আমার কথা রাখো।

অম্বির চিঠিকে দুমড়ে মুচড়ে অম্বির বিছানার উপর ফেলে দেয় অধীর। —এই অনুরোধ ক'রে বৃথা আমাকে অপমান করো না অম্বি। রমা বেচারাকে ঠকাবার পরামর্শ আমাকে দিও না। তার চেয়ে ভাল, আমিই জীবনে ঠকে যাই।

চলে যায় অধীর। কিন্তু অম্বি বুঝতে পারে না যে অধীর চলে গিয়েছে। অম্বি বলে—কিন্তু আমাকে ক্ষমা করে যাও। আপ্পি আর আম্মির মুখের হাসি নষ্ট করতে পারব না আমি, আমার এই দুর্বলতা ক্ষমা করো।

দরজা পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়ান এবং শুনে চমকে ওঠেন উপেন। এ কী ? কার সঙ্গে কথা বলছে অম্বি।

শুনতে থাকেন উপেন, অধীরের পায়ের শব্দ হনহন ক'রে বাইরের বারান্দার উপর দিয়ে যেন ছুটে চলে যাচ্ছে।

বাইরের অন্ধকার থেকে একটা দমকা বাতাস ঘরে এসে ঢোকে। ফরফর ক'রে দুমড়ানো একটা চিঠি ঘরের ভিতর থেকে উড়ে এসে উপেনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে।

চমকে ওঠেন উপেন। চিঠি পড়েন উপেন। চিঠির ভাষা বলেছে—তুমি ভুল করো না, রমাকে বিয়ে করো, তাহলেই আমি সুখী হব।

পড়েই বিস্ময়ের অপলক চক্ষু নিয়ে তাকিয়ে থাকেন এবং পরমুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে উপেন চেঁচিয়ে ওঠেন—হেরেছি চারু, সত্যিই হেরে গিয়েছি। অম্বির কাছে আমাদের জীবনের সব ভুলের অহংকার হার মেনেছে।

চিঠি পড়েন, উঠে বসেন এবং চোখ বন্ধ করেন চারুবালা।

উপেন বিচলিত হয়ে বলেন—বলো চারু, একি মেয়ের মত একটা প্রাণের কথা, না মেয়ের চেয়েও... ।

চারুবালা—দেখো এখন, স্বীকার করো, যাকে মেয়ে বলে মানতে ভয় করেছিলে, সে-ই তোমার মেয়ের চেয়েও... ।

উপেন ব্যাকুলভাবে বলতে থাকেন—হার মেনেছি চারু। হার মানতেও বড় আনন্দ হচ্ছে, অম্বি আমাদের ফাঁকি ধরিয়ে দিয়েছে। অম্বি ! অম্বি !

উপেন ছটফট করতে করতে অম্বির ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ান, তারপর ডাক দেন—আয়। একবার কোনওমতে কষ্ট ক'রে তোর আম্মির কাছে আয় অম্বি।

অপরাধিনীর মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে চারুবালার বিছানার কাছে দাঁড়ায় অম্বি। চারুবালার চোখ দুটো ঝকঝক করে। অপলক চোখে অম্বির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তার পরেই হঠাৎ, জলে ভেজা রোদের মত এক ঝলক স্নিগ্ধ হাসির আভা ফুটে উঠে চারুবালার চোখ-মুখ জুড়ে যেন থমথম করতে থাকে। চারু বলেন—অধীর তোকে বিয়ে করতে চায় ? তুই রাজি আছিস তো ?

অম্বি বলে—না।

—কেন ?

—আমি বিয়ে করতে চাই না।

—কেন ?

—রমার বিয়ে হোক।

—কিন্তু তোরও তো বিয়ে হওয়া চাই।

—না চাই না। আমি যে তোমাদের... ।

—বল, চুপ করে রইলি কেন ! বল, তুই আমাদের কে ?

কেঁদে ফেলে অম্বি—আমি যে তোমাদের ছেলের মত, চিরকাল তোমাদের কাছেই থাকতে চাই। আমি চলে গেলে তোমাদের দেখবে কে বলো ?

বেদনাভরা লজ্জার আঘাতে আহত হয়ে চমকে ওঠেন চারুবালা ও উপেন।

উপেন বলেন—আমাদের অনেক ভুল হয়েছে অম্বি, কিন্তু তুইও এখন ভুল করছিস। বিয়ে তোকে করতেই হবে, এবং অধীরের সঙ্গেই বিয়ে হবে।

—কেন আপ্পি ?

উপেন—কেন আবার কী ? আমরা হাসতে চাই, আবার কাঁদতেও চাই ! তোকে সুখী করতে চাই, আবার তোকে ছেড়ে দেবার দুঃখে কষ্ট পেতেও চাই। তুই তো বুঝবি না, এ কেমন দুঃখ। তুই যে আমাদেরই... ।

—আপ্পি ! চেঁচিয়ে ওঠে অম্বি। উপেনের মুখের দিকে জলভরা দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিয়ে যেন বিদ্রোহিণীর ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। যেন শেষ বোঝাপড়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে অম্বির সমস্ত অন্তর। উপেনের মুখের ওই ভাষাকে সহ্য হয় না। হাত দিয়ে উপেনের মুখ চেপে ধরে অম্বি—বলো না আপ্পি, আর ওকথা বলো না। সহ্য করতে পারব না।

চারুবালা—শোন অম্বি।

উপেন—আরে, তুই যে আমাদেরই মেয়ে।

শুনে শিউরে ওঠে, তারপরেই যেন স্তব্ধ হয়ে উপেনের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে অম্বি। তারপরেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে চারুবালার পিঠের উপর মুখ লুকোয় অম্বি, গুনগুন ক'রে কাঁদতে থাকে। সারা জীবন উৎকর্ণ হয়ে ছিল অম্বির প্রাণ যে সত্যের ঘোষণা শোনবার জন্য, এতদিনে এই অদ্ভুত এক লগ্নে সেই সত্যের ধ্বনি শুনতে পেল অম্বি। মেয়ের মত নয়, আমাদেরই মেয়ে। আঃ সারা জীবনের একটা অভিমানের জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

চারুবালা অনুযোগ করেন—ছিঃ, এ কী করছিস অম্বি ? সব মেয়েরই বিয়ে হয়, বাপ-মাকে ছেড়ে থাকতে হয়।

অকস্মাৎ রমা বিস্মিত চক্ষু নিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে—একি ? অম্বি কাঁদছে কেন ?

চারুবালা হাসেন—বিয়ের কথা শুনে কাঁদছে।

রমা আশ্চর্য হয়—বিয়ে ? কার বিয়ে ?

চারু—অম্বির।

রমা—কার সঙ্গে ?

চারু—অধীরের সঙ্গে।

ঝক্ ক'রে হেসে ওঠে রমার কৌতুকদীপ্ত দুই চক্ষু। রমা বলে—তোমরা বিশ্বাস করেছ বুঝি, অম্বি কাঁদছে ?

চারুবালা বলেন—চুপ কর তুই।

রমা—আমি বলছি হাসছে, নিশ্চয়ই হাসছে।

এগিয়ে এসে জোর করে অম্বির মুখ তুলে ধরে রমা। হ্যাঁ, অম্বির চোখ সত্যিই জলভরা ; কিন্তু তারই মধ্যে দেখা যায়, অম্বির দুই ঠোঁটে যেন এক কৃতার্থ জীবনের হাসি সলজ্জ আভাস দিয়ে ফুটে উঠেছে। যেন একটা শিশুর কচি মুখের হাসি ; যেন বহুদূর হতে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বাপ-মার কোলের কাছে লুটিয়ে পড়েছে, আর সেই আনন্দ সইতে না পেরে হেসে উঠেছে।

অম্বির মুখের দিকে বড় বড় চোখ ক'রে তাকিয়ে রমা হাসে—আমি আগেই জানতাম।

রূপসাগর

রূপসাগরের ঘাট বড় পিছল।

কে জানে কোন রূপের কথা গান গেয়ে শুনিয়ে যেত সেই নন্দ বাউল! মাথা দুলিয়ে আর টলে টলে নাচত নন্দ বাউল। গুনগুন করত তার হাতের একতারা। গানটা শুনতে ভালই লাগত, যদিও বুঝতে পারা যেত না, কী বোঝাতে চাইছে গানটা। রূপের আবার সাগর হয় কী করে? হলেও, রূপসাগরের ঘাটটা পিছল হবে কেন? এবং সে পথে চলতে গেলে পা দুটো কেনই বা টলমল করবে? বোধ হয় মস্ত একটা মিস্টিক তত্ত্বের কথা মিষ্টি করে গেয়ে চলে যেত নন্দ বাউল।

সে নন্দ বাউল আজ আর নিশ্চয় বেঁচে নেই। আজ নিশীথ রায়ের বয়স ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়ে আরও সাত মাস। নন্দ বাউলকে যেদিন শেষবারের মত দেখেছিল নিশীথ এবং নন্দ বাউলের গলায় গানটাকেও শেষবারের মত শুনেছিল, সে দিনটি হল আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগের একটি চৈতালি দিন। নন্দ বাউল তখন সত্তর বছর বয়সের বুড়ো। তার উপর ছিল যক্ষ্মা রোগ। জরা আর যক্ষ্মায় একসঙ্গে মিলে বুড়ো মানুষের সেই ছোট্ট শরীরটাকে প্রায় শেষ করে এনেছিল। সব সময় ধুকপুক করত নন্দ বাউলের পাঁজরগুলি। হাত-পা কাঠি-কাঠি, ধড়টা ছেঁড়া খড়ের পুতুলের মত, নন্দ বাউলের সেই মূর্তি খালের ধারে একটা কদমের ছায়ার মধ্যে টিনের ছাপর আর বাঁশের বেড়া দেওয়া একটা ঘরের দাওয়ার উপর বসে থাকত।

কিন্তু নন্দ বাউলের মুখের হাসিকে সেই ভয়ানক জরা আর যক্ষ্মাতেও মেরে ফেলতে পারেনি। নন্দ বাউলের রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে সব সময় অদ্ভুত রকমের একটা হাসি ফুটে থাকত। সেদিনও নিশীথের চোখের সামনেই সেই হাসিমুখ নিয়ে মাথা দুলিয়ে, চোখ বন্ধ করে আর একতারা বাজিয়ে রূপসাগরের কথা গেয়ে গেয়ে যেন বিভোর হয়ে গেল বুড়ো বাউলের মর-মর প্রাণটা গান শেষ করার পর খুব জোরে একবার কেশেছিল নন্দ। মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্তও উথলে পড়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, মুখ ধুয়ে এসে আবার নন্দ তার একতারা কোলের উপর রেখে দাওয়ার উপর চুপ করে বসে রইল। মাথা ঝুঁকিয়ে চোখের সামনের সকলকেই, যেন পৃথিবীর সব আলো ছায়া আর শব্দকে একটা প্রণাম জানাল। আবার ঝিক করে হেসে উঠল বুড়ো নন্দ বাউলের মুখ।

শুনেছিল নিশীথ, সবাইকে আর সব কিছুকেই প্রণাম করে নন্দ বাউল। কদমের ছায়ার কাছে কোনও মানুষ এসে দাঁড়ালেই প্রণাম করে। সে মানুষ কুসুমপুরের নায়েব মশাই হোক আর নৌকাঘাটের মজুর সেলিম শেখ হোক। খালের জলে কচুরিপানার সবুজের মধ্যে যখন নীল ফুল ফোটে, তখন সেই ফুলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে নন্দ। ক্ষেতের উপর ধানের মঞ্জরির দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে। শালিকের ঝাঁক এসে যখন বাঁশঝোপের ভিতরে কর্কশ স্বরে চেঁচামেচি করে, তখন শুধু সেই শব্দ শুনেই মাথা নিচু করে আর জোড়-হাত বুকে ছুঁইয়ে একটা প্রণাম না করে পারে না নন্দ বাউল।

সেই নন্দ বাউল আজ আর নিশ্চয় নেই। এখান থেকে, কালিকাপুরের এই পাহাড় আর শালবনের ছায়ার কাছ থেকে অনেক দূরে রাজশাহি জেলার কুসুমপুরের খালের কাছে সেই টিনের ছাপরের ঘরটাও আর নেই। সেই কদমের ছায়াটা আছে কিনা কে জানে! কিন্তু সেই নন্দ বাউলকে

আজও বার বার মনে পড়ে। তাই নন্দ বাউলের মুখের সেই হাসিটাকেও বার বার মনে পড়ে যায়।

কিন্তু মনে পড়ে কেন ?

এখানে একটা সেকেলে পুকুর আছে, তার পাথর-বাঁধানো ঘাট এখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। কী আশ্চর্য, তিনকড়ি মাহাতো বলেন, এই পুকুরটার নাম রূপসাগর। পুকুরের দক্ষিণ কোণে একটা মন্দির ছিল কোনকালে, সেটাও এখন একটা ভাঙা-পাথরের ঢিপি মাত্র। একটা বুড়ো বটের গোড়ায় সিঁদুর-মাখানো একগাদা নুড়ি পড়ে আছে। রাতের শেয়াল এসে নুড়িগুলিকে ঘাঁটাঘাঁটি করে চলে যায়। কারা যেন আবার এসে নুড়িগুলিকে গুছিয়ে রেখে দিয়ে যায়। বোধ হয় নিকটের ওই গাঁয়ের সাঁওতালেরা।

কাল সন্ধ্যাবেলা রেডিওতে ওই গানটাকেও কে যেন একবার গেয়েছে। অনেক দিন পরে গানটাকে নূতন করে শুনতে বেশ ভালই লেগেছে। এবং ভাবতে গিয়ে মনে মনে একটু লজ্জাও পেয়েছে নিশীথ, গানটাকে যেন আগের চেয়ে আর একটু বেশি ভাল লাগল, যদিও আজও ঠিক বোঝা যায় না, কী বলতে চাইছে গানটা।

ভাল লাগছে অনেক কিছুই। রাখা পাহাড়ের ওই গম্ভীর ধোঁয়াটে নীল দেখতে ভাল লাগে। নিকটের শালবনে সারা রাত ধরে একটা ঝড় ছুটোছুটি করেছে। শালের কাঁচা আঠার গন্ধ এখনও বাতাসে ভেসে আসছে। লাল মাটির উপর দিয়ে কন্টিকারির একটা আঁকা-বাঁকা ঝোপ অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। ঝোপের ছায়ায় খরগোশ দৌড়ায়। আর একটু দূরে লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে টবের ট্রেন। ফায়ার-ক্লে, কেওলিন আর রঙিন মাটি টবে বোঝাই করছে কুলির দল। কুলিদের গান শোনা যায়। শুনতে ভালই লাগে।

কালিকা মাইনস-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের এই ছোট বাংলোবাড়িটাও আজ নানারকম মিষ্টি কলরবে ভরে গিয়েছে। ঘাটশিলা থেকে এসেছেন কাকিমা আর কাকিমার ভাই নরুমামা। মুসাবনি থেকে এসেছেন জেঠামশাই। মৌভাণ্ডার থেকে এসেছে নিশীথের দুই খুড়তুতো ভাই— দেবেশ আর চঞ্চল। মুসাবনিতে জেঠামশাইয়ের কাছে থাকে নিশীথের আপন বোন বেণু ; দশ বছর বয়সের ছোট্ট বেণু ; সে-ও এসেছে ! জ্বর হয়েছে, তবুও এসেছে। ওই বেণুকে বড় ভালবাসেন জেঠামশাই। বেণু যে এই জেঠামশাইকেই 'বাবা' বলে ডাকে। সেই যখন মাত্র এক বছর বয়স বেণুর, এক মাসের মধ্যে নিশীথের বাবা আর মা দুজনেই মারা গেলেন, তখন থেকে বেণু জেঠামশাইয়ের কাছেই আছে।

জেঠামশাই বললেন— বেণুটা ভয়ানক কান্নাকাটি করল, অগত্যা নিয়ে এলাম।

কাকিমা বললেন— এনে ভালই হয়েছে। এত কাছে থেকেও দাদার বিয়েটা দেখবে না মেয়েটা, সে কেমন কথা ?

জেঠামশাই একবার চোখ মুছলেন। কেন, অনুমান করতে পারে নিশীথ। জেঠামশাই বোধ হয় তাঁর বড় আদরের ভাই সেই নীরেন আর ভ্রাতৃবধূ মায়ালতার কথা ভাবছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন জেঠামশাই— আজ তোর বিয়ে, কিন্তু আজ যারা সবচেয়ে বেশি আনন্দ করত, তারা দুজনেই যে নেই। আমার যে একটুও ভাল লাগছে না, নিশি !

জেঠামশাইয়ের কথায় ঘরের বাতাসও যেন একটু ব্যথিত হয়। কাকিমা চুপ করে আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন। জেঠামশাই নিজেই আবার চেঁচিয়ে হেসে উঠে সবাইকে ব্যস্ত করে তোলেন—কই, কোথায় গেল সব ? দেবেশ আর চঞ্চল কোথায় ? ফুলের ঝুড়িটা কোথায় রাখলে নরু ? বেণু, এদিকে আয় দেখি, বেশ মিষ্টি করে একটা গান গেয়ে নে, তারপর রওনা হয়ে যাই।

মীরাকে প্রভু পরম মনোহর...বেণুর গান প্রায় শেষ হয়ে আসে। নরুমামা ফুলের ঝুড়ি হাতে নিয়ে তৈরি হলেন। দুটো মোটরগাড়ি অনেকক্ষণ আগেই তৈরি হয়ে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা নিশীথের নিজের গাড়ি, আর একটা কন্ট্রাক্টর জানকীবাবুর।

এখন মাত্র সকাল আটটা, কালিকা মাইনস-এর শেষ খাদের সীমা পার হলেই যে লালমাটির কাঁচা রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে সোজা গালুডি। তারপর পাকা সড়ক ধরে টাটা হয়ে একেবারে সিনি। সিনিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম, তারপরেই দলমা পাহাড়কে বাঁয়ে রেখে আবার ঘুরে যেতে হবে। টেলিগ্রাম

করে দেওয়া হয়েছে, খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজ-এর বিভূতি সিনিতে এসে অপেক্ষা করবে। পুরোহিত চক্রবর্তী মশাইকেও সেখান থেকে তুলে নিতে হবে। তারপর সোজা চাণ্ডিল, এবং চাণ্ডিল পার হয়ে পুরনো বরাভূমের গড় ছাড়িয়ে রাজপোখরা, যেখানে মহুয়াবনের পাশে অনেকগুলি গালার কারখানা। বাজার আর থানা পার হয়ে, নতুন পটারি আর রোমান-ক্যাথলিক আশ্রম ছাড়িয়ে যেখানে সুন্দর সুন্দর বাড়ি আর বাগান নিয়ে ছোট একটি শৌখিন শহর ফুটে রয়েছে, সেখানে একটি বাড়ির ফটকের থামে বাড়ির নামটাও লেখা আছে— অলক্তক। লাক্ষা মার্চেন্ট শীতলবাবুর বাড়ি।

ছেলেবেলার দেখা সেই নন্দ বাউলের মুখের হাসিটাই বোধ হয় আর একবার নিশীথ রায়ের মনের ভিতরে ফুটে ওঠে। রওনা হবার আগে জেঠামশাইকে প্রণাম করে নিশীথ। তারপর ঘরের ভিতরে গিয়ে বাবা আর মার ফোটোকেও প্রণাম করতে ভাল লাগছে। জিওলজির মানুষ নিশীথ রায়; শক্ত পাথর আর মাটির রহস্য ঘাঁটাঘাঁটি করে কালিকা মাইনস-এর যে ম্যানেজারের জীবন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় বারো ঘণ্টা ব্যস্ত হয়ে থাকে, সেই মানুষের মনেও যেন প্রশ্ন জেগেছে। একটা মানুষকে মনেপ্রাণে ভালবাসলে কি পৃথিবীর সব কিছুকেই এমন করে ভাল লাগে?

কাকিমাও হেসে হেসে ঠাট্টা করেন— কী রে নিশি? তোকে যে আজ বড় বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে?

বেণু চেঁচিয়ে ওঠে—বউদি নিশ্চয় দেখতে আরও বেশি সুন্দর।

কাকিমা— তাই নাকি রে?

নিশীথ হেসে ফেলে— আমার তো তাই মনে হয়।

গাড়ি দুটোও যেন হেসে উঠে স্টার্ট নিল। কাকিমা আর বেণুকে নিয়ে নিশীথের গাড়িটা আগে আগে, পিছনের গাড়িতে জেঠামশাই ও আর সবাই। গালুডির কাছাকাছি এসে রেল-লাইনের লেভেলক্রসিং-এর কাছে একবার থামতে হল। বেণুকে খাওয়াবার জন্য শিশি থেকে গেলাসে ওষুধ ঢালেন কাকিমা, এবং নিজের জন্য ফ্লাস্ক থেকে মিছরি-জল। গাড়ির স্টিয়ারিং দু হাতে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রেখে চুপ করে বসে থাকে নিশীথ।

হু-হু করে ছুটে চলে যাচ্ছে ট্রেনটা। নিশীথ রায়ের মনের ভিতরেও একটা লাল মাটির পথের উপর দিয়ে যেন একটা শিহর ছুটে চলে যায়। ওই তো, ওইরকমই একটি ট্রেন, এবং এই লাইনেই ছুটে চলে যাচ্ছিল সেই ট্রেন। যদি সেদিন সেই ট্রেনের সেই কামরাতে নীরাজিতার সঙ্গে দেখা না হত, তবে কি আজ নিশীথ রায়ের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ইচ্ছাটা এরকম ব্যাকুল হয়ে রাজপোখরা নামে এক লাক্ষানগরের অলক্তকের কাছে এগিয়ে যাবার লগ্ন খুঁজে পেত?

একটা শিপমেন্টের ব্যবস্থা করবার জন্য কলকাতায় এসে পোর্টঅফিস, কাস্টম-হাউস আর ব্যাঙ্কে পুরো সাতটি দিন ছুটোছুটি করবার পর কালিকাপুরে ফিরবার সময় নাগপুর এক্সপ্রেসের একটা কামরার ভিতরে ঢুকতে গিয়েই পিছু-পা হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল নিশীথ রায়। দরজার পাশে কার্ড ঝুলছে। কার্ডের গায়ে নাম লেখা— নীরাজিতা সরকার। একটা বার্থ রিজার্ভ করেছে কোনও এক যাত্রিনী।

কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল নিশীথ রায়, এই কামরার ভিতরে ঠাঁই না নেওয়াই বোধ হয় ভাল। তারপর সেই কামরাতেই ঢুকে আর চুপ করে বসে বসে একটা অস্বস্তিও অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করেছিল। কামরার ভিতরে নিশীথ রায় ছাড়া শুধু ওই একজনই যাত্রী ছিল, এক তরুণী। যদি ট্রেন ছাড়ার এক মিনিটও আগে বুঝতে পারত নিশীথ, আর কোনও যাত্রী এই কামরাতে উঠবে না, তবে বোধ হয় নিশীথ রায় ওই হাওড়াতেই সেই কামরা থেকে নেমে অন্য কামরার ভিতরে গিয়ে ঠাঁই নিত।

শিপমেন্টের ব্যবস্থা করতে গিয়ে হাজার হয়রানি ভুগে একেই তো মনটা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়েছিল, তারপর এই অস্বস্তি। অচেনা ও অজানা এই তরুণী দেখতে ভাল হলেই বা কী আসে-যায়? ভদ্রভাবে একটা কথা বললে ভদ্রভাবে উত্তর দেবে কিনা কে জানে? নিজের থেকে যেচে আলাপ করবে বলেও মনে হয় না। একই কামরার ভিতরে দুটো মানুষ শুধু চুপ করে থাকবে, এটাও যে একটা দুঃসহ অভদ্রতার ব্যাপার। মহিলার মনের রীতি-নীতিই বা কেমন, কে জানে? হয়ত নিশীথের চোখের প্রত্যেকটা দৃষ্টিকেই লোভীর দৃষ্টি বলে মনে মনে সন্দেহ করবে, আর সেই গর্বে

বিভোর হয়ে বসে থাকবে মহিলা। ইচ্ছে করে নিজেকে এভাবে কারও মনের ভিতরে লাঞ্ছিত হতে দেবার সুযোগ দিয়ে লাভ কী ?

কিন্তু খড়্গপুরে এসে ট্রেনটা থামলেও এবং অন্য কামরায় চলে যাবার জন্য চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত চলে যেতে পারেনি নিশীথ। আজ মনে পড়ে, এবং মনে পড়তেই লজ্জাও পায় নিশীথ, নীরাজিতার মত মেয়েকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েও সেদিন মনের ভুলে কী ভয়ানক অস্বস্তিই না মিছামিছি পুরো দুটি ঘণ্টা সহ্য করতে হয়েছিল !

ছোট স্যুটকেস আর বেডিংটা নিজেই হাতে তুলে নিয়ে কামরা থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ বাধা পেয়েছিল নিশীথ। বাধা দিল নীরাজিতা।

—আপনি কি এখানেই নামবেন ?

অপরিচিতার হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠে উত্তর দেয় নিশীথ। —না আমি এখন যাব টাটানগর।

অপরিচিতা বলে— তবে এখানে নামছেন কেন ?

—অন্য কামরায় সিট আছে বোধ হয়।

—অন্য কামরায় যাবেন কেন ?

—যাচ্ছি...মনে হচ্ছে, আপনার বোধ হয় খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

—আপনি খুব ভুল বুঝেছেন। বরং আপনি অন্য কামরায় চলে গেলে আমার পক্ষে একলা এই কামরাতে থাকতে কী রকম অস্বস্তি হতে পারে, বুঝে দেখুন।

নিশীথ রায়ের চিন্তার এতক্ষণের ভুলটাই লজ্জিত হয়। —তাই তো, ঠিকই বলেছেন আপনি, আমি অতটা ভেবে দেখিনি। ...আপনি কোথায় যাবেন ?

—আমিও যাব টাটানগর।

—আপনার বাড়ি টাটানগব ?

—না, সাক্‌চিতে আমার মামা থাকেন। আমাদের বাড়ি আরও দূরে।

—রায়পুরে বোধ হয় ?

—না, অত দূরে নয় ; ওদিকেও নয়। আমাদের বাড়ি সিনি থেকে সামান্য দূরে, রাজপোখরার কাছে।

—সেই লাক্ষানগরের কাছে বোধ হয় ?

—লাক্ষানগরেই। আমার বাবার গালার কারবার আছে।

—আপনার বাবার নাম ?

—শীতলচন্দ্র সরকার।

—তাই বলুন, তিনি তো আমাদের গালুডির ধীরেনবাবুর কাকা।

অপবিচিতার চিন্তান্বিত চেহারাটা এতক্ষণে যেন একটু সুস্মিত হয়ে ওঠে। —হ্যাঁ। ধীরেনদাব সঙ্গে আপনার চেনাশোনা হল কেমন করে ?

—আমিও যে গালুডির কাছেই কালিকাপুরে থাকি।

—কালিকাপুর ? যেখানে ফায়ার-ক্লে, কেওলিন আর...

—আর ম্যাঙ্গানিজও কিছু কিছু আছে। আমি কালিকা মাইনস-এর ম্যানেজারি করি।

আরও আশ্বস্ত হয় এবং একটা হাঁপ ছেড়ে হেসে ওঠে তরুণী। —তা হলে মুসাবনির ডাক্তার হরদয়ালবাবু হলেন আপনার...

—আমার জেঠামশাই, তাঁকে চেনেন নাকি ?

—খুব চিনি। তিনি তো প্রায়ই সাক্‌চিতে আমার মামার বাড়িতে আসেন, তিনি আমার মামাব বন্ধু। তিনিই একদিন বলেছিলেন যে, তাঁর এক ভাইপো কালিকা মাইনস-এ ম্যানেজারের পোস্টে আছে। কিন্তু...

নীরাজিতার কথার আবেগ হঠাৎ থেমে যায়। কিন্তু কী ? ডাক্তার হরদয়ালবাবুর মুখ থেকে শোনা কোনও একটা কথা একেবারে স্পষ্ট করে মনে পড়ে গিয়েছে বলেই বোধ হয় থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে নীরাজিতা ; ভাইপো বিয়ে করতে চায় না, হরদয়ালবাবুর সেই অভিযোগ নীরাজিতার মত এক

অনাত্মীয়া ও বিনা-সম্পর্কের মেয়ের মুখের ভাষায় মুখর হয়ে উঠতে পারে না। নীরাজিতার পক্ষে সে কথা আলোচনা করা অশোভন তো বটেই, নির্লজ্জতাও নিশ্চয়।

নিশীথ রায় হঠাৎ হেসে ফেলে— বুঝেছি, জেঠামশাইয়ের মুখে আমার নামে ভয়ানক কোনও অভিযোগ শুনেছেন।

রুমাল দিয়ে কপাল মুছে নিয়ে নীরাজিতা হাসতে চেষ্টা করে, এবং সেই চেষ্টাটাই যেন ব্যর্থ হয়ে নীরাজিতার মুখের উপর একটা লাজুক গম্ভীরতার আভা ফুটিয়ে তোলে। নীরাজিতা বলে— হ্যাঁ, অভিযোগই বটে...তার মানে, জেঠামশাইয়ের কোনও কথা আপনি কানেই তোলেন না, আর কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চান।

নিশীথ বলে— ঠিকই শুনেছেন। কালিকাপুর জায়গাটা সুন্দর ; কাজটাও মন্দ নয় ; বেশ ভালই লাগে। কিন্তু...

নিশীথ রায়ের কথার আবেগও হঠাৎ মাঝপথে স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু নীরাজিতার চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, নিশীথ রায়ের মুখ থেকে ওই কিন্তুর উত্তর শোনবার জন্য ওর মনের ভিতরে একটা কৌতূহল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আনমনার মত, এবং কেমন একটু বিব্রতভাবে বিড়বিড় করে ওঠে নিশীথ রায়— কিন্তু ওখানে একা একা পড়ে থাকতে আজকাল বেশ ভয় করে।

নীরাজিতা হাসে। —জায়গাটা খুব বেশি জংলা বোধ হয়।

অপ্রস্তুত হয়ে যেন নিজের মনের একটা অসতর্ক বাচালতাকে শুধরে দেবার জন্য চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ— না না, সে সব ভয় নয়। জঙ্গলটাই তো সবচেয়ে সুন্দর।

প্রথম আলাপের ভাষাটা সেদিন তরতর করে তরল স্রোতের মত এইভাবে স্বচ্ছন্দে অজস্র প্রশ্ন আর কৌতূহলের কলরব নিয়ে এই পর্যন্ত এসে কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। অনেক পিছনে পড়ে আছে খড়্গপুর। ট্রেন তখন রাতের ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হু-হু করে ছুটে চলেছে! বাইরের বাতাস বৃষ্টিতে ভিজছে। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছোট ছোট ঝাপটা কামরার ভিতরে এসে ছিটকে পড়ে। এবং এতক্ষণ পরে এই ক্ষণিক নীরবতার মধ্যে নিশীথের চোখ দুটো স্পষ্ট করে দেখবার সুযোগ পায়, আনমনার মত জানালা দিয়ে বাইরের বর্ষাসিক্ত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে নীরাজিতা। স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, একটা অস্বস্তির ছায়া ছটফট করছে নীরাজিতার মুখের উপর। এবং সেই মুখটি দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর।

রাতের আকাশের মেঘ কখন ফুরিয়ে গিয়েছে, বাইরের বাতাসের বৃষ্টি-ভেজা শিহর কখন থেমে গিয়েছে, বুঝতে পারেনি নিশীথ। বুঝল তখন, যখন আর একবার নীরাজিতার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পায় নিশীথ, জানলার কাছে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে আকাশের এক টুকরো চাঁদের স্নিগ্ধ চেহারাটাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করছে নীরাজিতা।

তবে কি কবিতা লেখার অভ্যাস, কিংবা ছবি আঁকার শখ আছে নীরাজিতার? হতে পারে। কিন্তু নীরাজিতা নিজে বোধ হয় এখন কল্পনাতেও সন্দেহ করতে পারছে না যে, এই চলন্ত ট্রেনের কামরার ভিতরে একটা মানুষের উৎসুক চোখের বিস্ময়ের সামনে ওর নিজের চেহারাটা সুন্দর একটা কবিতার ছবি হয়ে ঢলঢল করছে। যেখানে থাকে নীরাজিতা, বাজপোখরা নামে সেই লাক্ষানগরকেও একটা রূপকথার দেশ বলে মনে হয়।

—আপনি কি প্রায়ই এই পথে যাওয়া-আসা করেন?

নিশীথের প্রশ্ন শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকায় নীরাজিতা। উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

—এইরকম একা একা?

নীরাজিতা হাসে— না, আজই এই প্রথম। ছোটকাকার ব্লাডপ্রেসারের কষ্ট হঠাৎ বেড়ে গেল, তাই তিনি সঙ্গে আসতে পারলেন না। অথচ আমাকে যেতেই হবে, কালকেই বড়দির ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন আছে। কাজেই বাধ্য হয়ে...

—কলকাতাতে আপনার প্রায়ই যেতে হয়, তার মানে আপনি স্টুডেন্ট?

—এখন আর নয়।

—তার মানে?

ন্তা হাসে— বাবার ইচ্ছে, মেয়েকে অনর্থক আর বেশি পড়িয়ে কষ্ট দিতে তিনি রাজি নন। ফিফ্‌থ ইয়ারও শেষ করবার সুযোগ পেলাম না।

—এটা কিন্তু ভাল হল না। ফিফ্‌থ ইয়ারে এসে পড়া ছেড়ে দেবার কোনও অর্থ হয় না।

নীরাজিতা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে—বাবা বলেন, তোকে তো আর ফরেস্ট-অফিসার হয়ে জঙ্গলে থাকতে হবে না, এত বোটানি চর্চা করে লাভ কী ?

নিশীথও উৎসাহিত হয়ে বলে— আপনি বোটানি পড়েন ?

—হ্যাঁ।

—অনার্স কোর্স ?

—হ্যাঁ।

নিশীথ হাসে— আমি জিওলজি।

ট্রেনের কামরার আলোকিত নিভৃতের নীড়ে এতক্ষণে দুটি অপরিচিতের খোলা মনের হাসি যেন ঘরোয়া জানাজানির পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আর ভয় নয়, অস্বস্তিও নয়। এবং আলাপের ভাষাও যেন এই ক্ষণিক পুলকের ভুলে আরও অবাধ হয়ে যায়।

নিশীথ বলে— একটা কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, আপনার বাবা কেন হঠাৎ আপনাকে পড়া থেকে ছাড়িয়ে...

হঠাৎ মাথা হেঁট করে নীরাজিতা, আবার একটা অস্বস্তির ছায়া নীরাজিতার মুখের উপর ছটফট করতে থাকে। ছায়াটা ভীরু , কিন্তু সেই ভীরুতাটা বড মিষ্টি।

নিশীথ বলে— কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলছি। বোধ হয় আপনার বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে।

কোনও কথা না বলে শুধু আস্তে একবার মাথাটা দুলিয়ে উত্তর দেয় নীরাজিতা— না।

—তা হলে বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে বোধ হয়।

কোনও উত্তর দেয় না নীরাজিতা। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা নেই, নীরাজিতার ওই হেঁটমাথা আর নীরবতা কী কথা বলতে চাইছে।

রাতের ট্রেন ফিকে জ্যোৎস্না গায়ে জড়িয়ে আপন মনের উল্লাসে হু-হু করে ছুটে চলে যাচ্ছে। চাকুলিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ধলভূমগড় আর ঘাটশিলাও পার হয়ে গেল। খোলা জানালার উপর হাত রেখে, এবং সেই হাতের উপর মাথা পেতে দিয়ে নিঝুম হয়ে বসে আছে নীরাজিতা। তবু দেখতে পায় নিশীথ, নীরাজিতার সেই বন্ধ চোখের পাতায় যেন ভেজা জ্যোৎস্নার রেখা চিকচিক করছে। নিশীথের বুকের ভিতরে সব নিশ্বাস একসঙ্গে চমকে উঠে এলোমেলো হয়ে যায়। কী ভাবছে নীরাজিতা ? হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেল কেন নীরাজিতা ? চোখে জল কেন ? নীরাজিতার চোখ দুটো কি সত্যিই নিশীথের মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা ইচ্ছাটাকেই দেখে ফেলতে পেরেছে ?

গালুডিও বোধ হয় পার হয়ে গিয়েছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পায় নিশীথ, টাটার ব্লাস্ট-ফার্নেস-এর রক্তাভা ফুটে থাকে যে আকাশে, সেই আকাশটা বড় কাছে চলে এসেছে। টাটানগর পৌঁছতে আর দেরি নেই।

চুপ করে এবং একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে নিজেরই মনের একটা ছন্নছাড়া তুমুল অস্বস্তির বেদনার সঙ্গে লড়াই করে নিশীথ রায়। জিওলজির পাথুরের কঠোরতা যেন ছোট একটা বনলতার মায়ার কাছে বার বার দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে ডাক দেয় নিশীথ রায়— শুনছেন, টাটানগর এসে পড়েছে।

চমকে উঠে মাথা তুলে তাকায় নীরাজিতা। —কী বললেন ?

—টাটানগর।

হাঁপ ছাড়ে নীরাজিতা—ও, তাই বলুন।

—আপনি কি এত রাত্রে একাই সাকচি যাবেন ?

নীরাজিতা হাসে— না, তা কেন হবে ? মামার গাড়ি নিশ্চয় স্টেশনে এসে অপেক্ষা করছে।

—আর একটা কথা—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ রায়। ট্রেনটা একটু মৃদুগ, একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টার আনন্দে অলস হয়ে প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে চলেছে। আর কয়েকটা নীরাজিতা-নামে সেই সুন্দর ছবি, ছোট বনলতার মায়ার মত স্নিগ্ধতার এই রূপ, এই ঢিলে খোঁপ গলার এই চিকচিকে সুতলীহার আর মুগার-কাজ-করা এই রঙিন শাড়ির আঁচল এই রাতের আলোছায়ার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

নীরাজিতাও যেন দম বন্ধ করে দু চোখের ভীরু বিস্ময় অপলক করে নিশীথ রায়ের সেই বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিশীথ বলে— আপনাকে যদি চিঠি লিখি, তবে... ?

—লিখবেন।

—কোনও আপত্তি নেই তো ?

—না।

—ঠিকানাটা ?

—নীরাজিতা সরকার, অলক্তক, রাজপোখরা, মানভূম।

গরম হাওয়ার ছোঁয়ায় নিশীথের গাড়ির স্টিয়ারিং বেশ তেতে উঠেছে। টাটানগর ছেড়ে আসা হয়েছে অনেকক্ষণ। পথেব দু পাশে ন্যাড়া ও রুক্ষ চেহারার পাথুরে ডাঙা। রোদের জ্বালা ভেদ করে পিচ-ঢালা সড়কের আলগা ধুলো উড়িয়ে নিশীথ রায়ের গাড়ি নিজের মনের উল্লাসে ছুটে যেতে থাকে। সিনিও বোধ হয় আর খুব বেশি দূরে নয়।

পথের দু পাশে একটা গাছের ছায়াও নেই। পৃথিবীটা এখানে তার কোটি বছর আগের সেই শ্যামলতাহীন কঠিন চেহারার গর্ব নিয়ে শক্ত হয়ে বসে আছে। সড়কের দু পাশের ডাঙা যেন সেকেলে জড়ের প্রকাণ্ড শিবির। শুধু পাথর আব পাথর ; এবড়ো-খেবড়ো চাপ-চাপ, তাল-তাল ; আবার থরেথরে সাজানো ; যত নিরেট ও কঠোব ধুসরতা ! রোদের জ্বালায় মুগ্ধ হয়ে ডাঙার সারা বুক জুড়ে ঝিকঝিক করে হাসছে অজস্র অভ্রের কুচি। অনেক দূরে সেরাইকেলার রিজার্ভ জঙ্গলেব সীমানা এক টুকরো মেঘাভ ছায়ার আলপনার মত দেখা যায়।

কাকিমা বলেন— ইস, কি বিশ্রী শুকনো জায়গা রে নিশি ! একটু ঘাস পর্যন্ত নেই।

নিশীথ হাসে— এই তো পৃথিবীর বনেদী চেহারা, কাকিমা।

কাকিমা—কী ভয়ানক বনেদী চেহারা রে বাবা !

—তুমি বলছ ভয়ানক, কিন্তু আমাদের কালিকা-মাইনস্-এব মালিক রবার্টসন কী বলে জান ?

—কী ?

—স্টোনি গ্রেভ অব এ প্যারাডাইস। একটা স্বর্গের পাথুরে কবর। রবার্টসন প্রায়ই এখানে এসে এই ডাঙার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। জায়গাটা লিজ নেবার জন্য দিন রাত কী চেষ্টাই না করছে বেচারা !

বেণু চেঁচিয়ে ওঠে-- কী ? কিসের গল্প বলছ দাদা ?

নিশীথ হাসে— আমি বলছি পাথুরে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প ! এখানে সিসা আছে, তামা আছে, বেণু। সোনাও থাকতে পারে। তা ছাড়া, আমিও একদিন এই ডাঙার ওই পুবদিকের একটা শুকনো ঝরনার বালি খুঁড়ে খুব সুন্দর একটা গন্ধ পেয়েছিলাম।

কাকিমা হাসেন— প্যারাডাইসের ফুলের গন্ধ ?

—গন্ধকের গন্ধ। কিন্তু রবার্টসন স্বপ্ন দেখেছে, পেট্রল আছে এখানে।

বেণু বলে— একটু বউদির গল্প বলো না, দাদা।

হেসে ফেলে, এবং গল্পই বন্ধ করে দেয় নিশীথ। কাকিমাও হেসে বেণুকে আশ্বস্ত করেন— আর একটু পরে বউদিকে তো দেখতেই পাবি। ঝুনুমাসির চেয়েও সুন্দর, কী চমৎকার একটা বউদি !

বাড়িয়ে বলেননি কাকিমা, ঠিকই অনুমান করেছেন। কাকিমার বোন ঝুনুমাসির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর নীরাজিতা। তবু তো কাকিমা আরও অনেক কিছুই জানেন না। কেন সেদিন সেই ট্রেনের কামরার জানালায় হাত রেখে এবং সেই হাতের উপর মাথা পেতে দিয়ে নিঝুম হয়ে চোখ বন্ধ

করে বসে ছিল নীরাজিতা, সে কথা কাকিমা জানেন না। নীরাজিতার বন্ধ চোখের পাতায় সেদিন কেন ভেজা জ্যোৎস্নার রেখা চিকচিক করে উঠেছিল, সে কথা প্রথম চিঠির ভাষাতেই জানাতে দিতে ভোলেনি নীরাজিতা : যার মুখের দিকে বার বার তাকাতে ইচ্ছা করছিল, অথচ তাকাতে সাহস পাচ্ছিলাম না, এবং যাকে আর জীবনে কোনওদিন চোখে দেখবারও সুযোগ হবে না জানতাম, সেই মানুষ চোখের কাছেই বসে আছে, এমন অবস্থায় পড়লে অন্তত আমার মত কোনও মেয়ের চোখ কি একটু না ভিজে থাকতে পারে, বলুন ?

নীরাজিতার শেষ চিঠির কথাগুলিও মনে পড়ে ; আর এভাবে দূর থেকে শুধু ভালবাসার কথা লিখে লিখে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। অলক্তকের মেয়েকে যদি ভাল লেগে থাকে, তবে সোজা চলে এসে তার হাত ধরে তাকে নিজের কাছে নিয়ে যাও।

এর পর বোধ হয় দুটো সপ্তাহও পার হয়নি। জেঠামশাইয়ের কাছে চিঠি দিয়েছিল নিশীথ, এবং শীতলবাবুকে চিঠি লিখেছিলেন জেঠামশাই। জেঠামশাইয়ের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রথম চিঠিতেই নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথের বিয়ের কথা এবং বিয়ের দিনও ঠিক করে ফেললেন শীতলবাবু। নিশীথও শীতলবাবুর কাছ থেকে আকুল আশীর্বাদে মুখর একটি চিঠি পেয়েছিল আমার বড় আদরের মেয়ে নীরাকে তোমারই হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই, নিশীথ।

অনেকগুলি গাছের ছায়া কাছে এসে পড়েছে। অনেকগুলি যজ্ঞডুমুর আর ঘোড়ানিমের একটা জটলা। টু সিনি— সেভেন মাইলস্! পথের পাশে কাঠের পোস্টে লেখা সঙ্কেত চোখে পড়তেই গাড়ির স্পিড মৃদু করে দেয় নিশীথ। এই তো এখানে এসে খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজ-এর বিভূতি অপেক্ষা করবে বলে কথা আছে, এবং পুরুতমশাইও।

কিন্তু শুধু চক্রবর্তী মশাই একাই গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিভূতি আসতে পারেনি। এক ঝুড়ি ফুল পাঠিয়ে দিয়েছে বিভূতি। একগাদা স্থলপদ্ম আর হলদে গোলাপ। চক্রবর্তী মশাই বললেন— বিভূতিবাবু আসতে পারলেন না, তিনি খুবই দুঃখিত। খুব জরুরি কাজে আটক হয়ে পড়েছেন।

খবর শুনে নিশীথের এত হাস্যোজ্জ্বল মুখের শোভাও যেন ব্যথিত হয়ে ওঠে। নিশীথের বন্ধু বলতে বোধ হয় ওই একজনই আছে, খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজ-এর বিভূতি। নিশীথের বিয়েতে বিভূতি আসতে পারল না, জেঠামশাইও দুঃখিতভাবে বলেন— বোধ হয়, সত্যিই খুব জরুরি কাজ আসবার কোন উপায় নেই, নইলে বিভূতি কি নিশির বিয়েতে না এসে পারত ?

হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় নিশীথ। কাকীমা বলেন— এখানে আর রেস্ট নিয়ে মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, নিশি। বরং বেলা থাকতেই রাজপোখরা পৌঁছে যাওয়া ভাল।

দুটো গাড়ি আবার একসঙ্গে স্টার্ট নিয়ে ছায়া-কুঞ্জের স্নিগ্ধতার ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যায়।

ধূলিধূসর দুটো মোটরগাড়ি যখন উৎফুল্ল কলরবের সম্ভার নিয়ে অলক্তকের ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন সুবর্ণরেখার বালিয়াড়ির সব বালুকণা বিকালের আলোতে সোনার মত জ্বলছে।

রাজপোখরার এই লাক্ষানগরের চেহারাও অদ্ভুত। এই বিকালের আলোতেও একটা বিরাট নিদমহলের মত মনে হয়। ঝাউয়ের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বড় বড় বাড়ি, বড় বড় ফটক, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান সবই নীরব। গালার কারখানাগুলিও বড় শান্ত, কারখানা বলেই মনে হয় না। সাড়া-শব্দ যদি কিছু থেকেও থাকে, তবে এই সারিসারি ঝাউয়ের অবিরাম কাতর স্বরের উচ্ছ্বাসে সে সাড়া-শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু বোঝা যায়, মানুষ আছে ; অনেক শৌখিন মানুষের জীবন এখানে শান্ত বৈভবের মধ্যে নীড় রচনা করে রয়েছে। কোনও বাড়ির বারান্দায় বড় বড় অ্যালসেশিয়ান, কোনও বাড়ির বারান্দার সামনে হাল মডেলের মোটরগাড়ি। কোনও বাড়ির লন-এর চারদিকে অজস্র ডালিয়ার ভিড়।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি শান্ত, একেবারে নিস্তব্ধ এই অলক্তক। আগন্তুক দুটি মোটরগাড়ির হর্ন অনেকক্ষণ ধরে অনেকবার বেজেছে। কিন্তু সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অলক্তকের বুকে কোনও চাঞ্চল্যের শব্দ বেজে ওঠে না।

জেঠামশাই বিরক্ত হয়ে বলেন— এ কীরকমের ব্যাপার হল, নিশি ? ফটকে তালা ঝুলছে কেন ?

অলক্তকের বন্ধ ফটকের ওই তালার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েছিল নিশীথ। এবং বুঝতেও পারছিল নিশীথ, তার চোখ দুটো যেন দুঃসহ একটা উত্তাপের জ্বালায় পুড়ে যাচ্ছে। এমন ভয়ানক বিদ্রূপও কী পৃথিবীতে থাকতে পারে ? নিশীথ রায়ের জীবনের প্রথম ভালবাসার অলক্তক পাথরের চেয়েও কঠোর হয়ে গেল কেন ?

অলক্তকের ফটকে আমপাতার ঝালর দুলছে। দেখে বোঝা যায়, পুরনো দিনের কোনও উৎসবের আমপাতা নয়। টাটকা সবুজ আমপাতা ; আজই বোধ হয় কয়েক ঘণ্টা আগে এই ফটকের রূপ টাটকা সবুজ দিয়ে সাজিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। অলক্তকের প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া ও মসৃণ মোজেয়িক-এর বারান্দাটাকেও এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাওয়া যায়। বেণু চেঁচিয়ে ওঠে— ওই যে, বারান্দাতে কী সুন্দর আলপনা আঁকা হয়েছে কাকিমা !

অলক্তকের জীবনে উৎসবের লগ্ন দেখা দেবার আগেই যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে সাবধান হয়ে গিয়েছে অলক্তকের প্রাণ। উৎসবের আমপাতা আর আলপনাকে জঞ্জালের মত ফেলে রেখে দিয়ে বাড়ির মানুষগুলি কোথায় যেন চলে গিয়েছে। কেন ? কিসের জন্য ? কিন্তু বাড়ির মালিটা পর্যন্ত নেই ; একটা কথা বলে এই দুঃসহ বিস্ময়কে একটু করুণা করবার জন্যও কেউ একখানে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে নেই। একটা নির্মম রহস্যকে শুধু তালা দিয়ে বন্ধ করে ফটকের বুকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে, নিজের বুকের ভিতরে যেন আঁচড়ে আঁচড়ে এই এক মাসের ইতিহাস আর নীরাজিতার চিঠির লেখাগুলিকে খুঁজে খুঁজে পড়তে থাকে নিশীথ। কই ? তার মধ্যে তো নীরাজিতার এক বিন্দু সন্দেহ, এবং এক তিল আপত্তির একটা ছায়াও ছিল না। নীরাজিতার মনের কথা, শীতলবাবুর চিঠির কথাগুলিও মনে পড়ে। শীতলবাবু তো শেষ চিঠিতে নিশীথকে একেবারে প্রাণখোলা আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন : শুভকাজে আর দেরি করতে চাই না। এই মাসের কোনও ভাল দিনে বিয়েটা হয়ে গেলেই ভাল।

মিথ্যা, ভয়ানক মিথ্যা নন্দ বাউলের মুখের সেই হাসিটা। মনে পড়ে নিশীথের, রূপসাগরের কথা গাইতে গিয়ে নন্দ বাউলের বুকের ভিতর থেকে এক ঝলক কাঁচা রক্ত উথলে পড়েছিল। নিশীথ রায়ের মনে হয়, তারও বুকের ভিতর নিশ্বাসটা বোধ হয় রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

জেঠামশাই বলেন— কী আশ্চর্য, শীতল সরকারের কী মাথা খারাপ হল ?

কাকিমা বলেন— বিয়ের তারিখটা জানতে তোর কোনও ভুল হয়নি তো, নিশি ?

নিশীথ বলে — না।

—এঁরা কোনও ভুল করেননি তো ?

—না, এঁরা কালকেও টেলিগ্রাম করে আমাকে জানিয়েছেন, আমিও টেলিগ্রামে উত্তর দিয়েছি। ভুল হবার কোনও কারণ নেই। কাকিমা করুণভাবে বলেন— তবে ?

—তবে এখনও বুঝতে তোমরা ভুল করছ কেন কাকিমা ?

—সত্যিই বুঝতে পারছি না।

—এই বিয়েতে এঁদের আপত্তি আছে।

কাকিমা রেগে চেঁচিয়ে ওঠেন— আপত্তি ? কী এমন মস্ত মানুষ শীতল সরকার, আর তার মেয়েই বা কী এমন দেবীটি ?

হেসে ফেলে নিশীথ রায়। —এখানে দাঁড়িয়ে, এ রকম রেগে আর চেঁচিয়ে নিজেকে অপমান করে লাভ কী কাকিমা ? চলো, আর দেরি না করে ফিরে যাই।

জেঠামশাই ধীরে ধীরে হেঁটে আবার গাড়ির ভিতরে উঠে বসেন। চঞ্চল আর দেবেশ গম্ভীর হয়ে গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে নীরবে অলক্তকের দিকে যেন ওদের রুষ্ট চোখের সব আক্রোশ নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বেণু কেঁদে ফেলে। কাকিমা চেঁচিয়ে ওঠেন— ফিরে চলো, নিশি।

সুবর্ণরেখার বালিয়াড়িতে এইবার সন্ধ্যা নামবে। বিকালের শেষ আলোতে রঙিন হয়ে গিয়েছে সুবর্ণরেখার স্রোত নুড়ি আর বালুকণা। দূরের দলমা পাহাড়ের গায়ে ছায়ার রেখাগুলি কালো হয়ে এসেছে। লাক্ষানগরের ঝাউয়ের সারির ছায়া থেকে পালিয়ে যাবার জন্য যেন ছটফট করে স্টার্ট নেয় দুটি ধূলিধূসর মোটরগাড়ি।

কিন্তু গাড়ি দুটো হঠাৎ একটা ইশারার বাধা পেয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তার ওপারের একটি ছোট বাংলোবাড়ির বারান্দা থেকে নেমে এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন। বার বার হাত তুলে ইশারায় থামতে বলছেন ভদ্রলোক। ওই বাংলোর চারিদিকে ডালিয়ার ভিড় জঙ্গলের মত ঘন হয়ে রয়েছে। বেণু লোভীর মত চেঁচিয়ে ওঠে— কী সুন্দর ডালিয়া!

প্রৌঢ় বয়সের ভদ্রলোক। ইনিও বোধ হয় একজন লাক্ষা মার্চেন্ট। মোটা শরীর, ঢিলে গেঞ্জি, ঢলঢলে পাযজামা এবং গায়ে একটি চাদর। ভদ্রলোকের মুখটা যেন খুব বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে। হন হন করে হেঁটে এসে সোজা জেঠামশাইয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক হাতজোড় করে অনুরোধ করেন— যদি কিছু না মনে করেন, তবে গরিবের বাড়িতে একবার আসুন। একটু বিশ্রাম করে তারপর যাবেন।

জেঠামশাই বিব্রতভাবে হাসেন— মাপ করবেন, আমরা একেবারে সিনিতে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করব।

ভদ্রলোক বলেন— আমার অনুরোধ রাখলে বড খুশি হতাম। শুধু দশ মিনিটের মত একটু জিবিয়ে নিয়ে, সামান্য একটু চা ইত্যাদি...

জেঠামশাই একটু বিস্মিত হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভদ্রলোক আরও উৎসাহিত হয়ে বলতে থাকেন— আপনারা এভাবে চলে যাবেন, ব্যাপারটা দেখতে বড়ই খারাপ লাগছে বলে আপনাদের একটু বিরক্ত করতে চাইছি—

জেঠামশাই গাড়ি থেকে নামেন। ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে চঞ্চল আর দেবেশকেও ডাকাডাকি করেন— চলো বাবা, সবাই চলো। বেণুকে হাত ধরে বলেন— চলো মা, আমার ডালিয়া দেখবে চলো। কাকিমার সামনে গিয়ে বিনীতভাবে হাতজোড় করেন— আসুন।

ভদ্রলোকের আহ্বানের টানে সকলেই সেই ছোট বাংলোবাড়ির দিকে, সেই ডালিয়ার ভিড়ের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকে। শুধু চুপ করে একা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে দলমা পাহাড়ের বুকের কালো-কালো ছায়ারেখার দিকে তাকিয়ে থাকে নিশীথ।

ভদ্রলোক নিশীথের কাছে এগিয়ে এসে বলেন— আপনিও চলুন।

—একটা কথা বলবেন?

—বলুন!

—আপনার প্রতিবেশী এই শীতলবাবুদের ব্যাপারটা কী?

ভদ্রলোক বিপন্নের মত তাকিয়ে থাকেন— আমাকে বৃথা এসব প্রশ্নের মধ্যে টানবেন না। আমার কোনও কথা বলা উচিত নয়।

—বলুন, আমি কিছুই মনে করব না।

—বিয়ের সবই তো ঠিক ছিল। কিন্তু আজ দুপুরেই কোথা থেকে একটা খারাপ সন্দেহের খবর কে যেন এসে দিয়ে গেল, তাই ওঁরা খুব বেশি ভয় পেয়ে গেলেন। কাজেই, অর্থাৎ বোধ হয় শেষ পর্যন্ত কোনও উপায় ছিল না বলেই, তার মানে, চক্ষুলজ্জার ভয়ে বাড়ি ছেড়েই চলে গিয়েছেন।

—কিসের সন্দেহ?

—শীতলবাবু খবর পেয়েছেন যে, পাত্রের...

—বলুন।

—পাত্রের চরিত্র খারাপ।

ভদ্রলোক যেন নিজেরই মুখের ওই ছোট্ট একটি কথার শব্দ শুনে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। চুপ করে নিশীথের গম্ভীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তার পরেই ব্যগ্রভাবে গায়ের চাদর টানাটানি করে নিজেরই এই অপ্রস্তুত অবস্থার অস্বস্তিটাকে সামলাবার চেষ্টা করেন। তারপরেই উৎসাহিত স্বরে এবং প্রায় চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন। — থাকগে, যেতে দিন, এসব বাজে কথা আমাদের আলোচনা করাই উচিত নয়। মোট কথা...

নিজের কথার ঝোঁক হঠাৎ সামলে নিয়ে ভদ্রলোক বলেন— আপনি তা হলে এখানেই বিশ্রাম করুন।

চলে গেলেন ভদ্রলোক। নিশীথ তেমনি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ঝাউয়ের শব্দের সঙ্গে নিজেরও আহত নিশ্বাসের ছোট ছোট শব্দগুলিকে মিশিয়ে দিয়ে শুধু দেখতে থাকে, দলমা পাহাড়ের গায়ে ছায়ার রেখা আরও ঘন হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই।

নন্দ বাউলের সেই গানটার অর্থ যেন একটু একটু বুঝতে পারা যাচ্ছে। রূপসাগরের ঘাট বড় পিছল, চলতে গেলে পা টলমল করে ওঠে। এবং আছাড় খায় তারাই, যারা বড় বেশি মুগ্ধ হয়ে, খুব বেশি ভালবাসে আর হঠাৎ বড় ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পা টলমল করত না, আছাড় খেয়ে পড়ে যেতেও হত না, যদি আগে একটু ধুলো ছড়িয়ে দিতে পারা যেত। একটু ফাঁকি, একটু চালাকি, আর বেশ একটু বাজে অহঙ্কারের ধুলো।

নন্দ বাউলের গানটাই শুধু নয়, ছেলেবেলার একটা পরীক্ষার কথাও মনে পড়ে। সেটা ছিল ডিকটেশন অর্থাৎ শ্রুতিলিখনের পরীক্ষা। নিশীথের খাতাটাকে শক্ত করে খিমচে ধরে লেখাগুলিকে দুবার পড়েছিলেন সেই বৈদ্যনাথ স্যার ; সেই মস্তবড় টাক আর মস্তবড় একজোড়া গোঁফ। নিশীথের লেখার মধ্যে একটাও বানানের ভুল খুঁজে পেলেন না বৈদ্যনাথ স্যার। পেনসিলের শিষ ঘষে-ঘষে খুব সরু আর তীক্ষ্ণ করে নিয়ে আর একবার খাতাটাকে খিমচে ধরলেন। লেখাটাকে আবার পড়লেন। ভ্রূকুটি করে লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। বারো বছর বয়সের নিশীথের মনের ভিতরে যেন মস্ত একটা আশার চাঁদ ঝকমক করে ফুটে ওঠে। এইবার দশের মধ্যে দশ নম্বর দিয়ে ফেলবেন বৈদ্যনাথ স্যার। না দিয়ে পারবেন কেন ? বৈদ্যনাথ স্যারের ওই তীক্ষ্ণমুখ পেনসিল নিশীথের লেখার উপর একটাও আঁচড় দিতে পারেনি। সেই মুহূর্তে চমকে উঠেছিল নিশীথ, বারো বছর বয়সের সেই আশার চাঁদ যেন দপ করে নিভে গেল। বৈদ্যনাথ স্যারের পেনসিল অদ্ভুত এক আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে সমস্ত লেখাকেই একটানে কেটে দিয়ে একটা শূন্য বসিয়ে দিল।

বৈদ্যনাথ স্যারের সেই তীক্ষ্ণমুখ পেনসিলের রাগের অর্থ কোনওদিন বুঝতে পারেনি নিশীথ। কিন্তু মনে হয়, আজ যেন একটু একটু বুঝতে পারা যাচ্ছে। এটাই বোধ হয় নিয়ম, যে ভালবাসার ভুল ধরার কিছুই নেই, সেই ভালবাসার আশাকে একেবারে শূন্য করে দিতে ভাল লাগে। কিন্তু ভাল লাগল কার ? নীরাজিতার মনের ভিতরেও কী বৈদ্যনাথ স্যারের পেনসিলের মত একটা তীক্ষ্ণমুখ নিষ্ঠুর আক্রোশ লুকিয়ে ছিল ?

কোথা থেকে কে যেন হঠাৎ এসে শীতল সরকারের কানের কাছে নিশীথের চরিত্রের গল্প বলে দিয়ে গিয়েছে। কে বলে গেল ? এবং কোন গল্পটা ? এই ত্রিশ বছর বয়সের জীবনের উপর দিয়ে কত গল্পই তো কতরকম কাণ্ড করে চলে গেল ; কিন্তু সে সব গল্পের মধ্যে এমন কী ভয়ালতা আছে যার জন্য নীরাজিতার মত মেয়ের ভালবাসাও ভয়ে ভীরু হয়ে যেতে পারে ?

কলকাতার ডালহাউসি স্কোয়ারের সেই মস্তবড় সওদাগরি অফিসের একটা আলোচনার গুঞ্জন এবং সেই সঙ্গে অফিসের মানুষগুলির মুখের সেই বাঁকা-বাঁকা হাসির ছবিটা মনে পড়ে। স্মিথ অ্যান্ড জনসনের রেয়ার-আর্থ ডিপার্টমেন্টে তখন রিসার্চ অফিসার হয়ে কাজ করছিল নিশীথ। কাজটা নেবার এক মাস পরেই কলকাতার হাসপাতালেই বাবা মারা গেলেন। সন্ধ্যাবেলাটা ঘরের ভিতরে বসে থাকতে পারেনি নিশীথ। ঘরভরা মানুষের কান্নায় করুণ সেই ঘরের বেদনা সহ্য করতে না পেরে, আর বোধ হয় নিজেরও বদ্ধ নিশ্বাসের গুমোট সহ্য করতে না পেরে, একটা পার্কের নিরালা কোণে বেঞ্চির উপর অনেক রাত পর্যন্ত একা একা বসে ছিল নিশীথ। পরের দিনও অফিসের একটা ছোট কামরার নিভৃতে আনমনার মত চুপ করে বসে ছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, অনন্তবাবু আর ধীরাজবাবু হঠাৎ কামরার ভিতর ঢুকে নিশীথের সেই আনমনা মনটাকেই চমকে দিয়েছিলেন।

একগাল হাসি হেসে ঢলে পড়েন অনন্তবাবু— কলকাতার রাতগুলো কী করে একটু ভালভাবে কাটানো যায় বলুন শুনি, নিশীথবাবু ?

ধীরাজবাবু মুখ টিপে হাসেন। — নিশীথবাবুকে অনর্থক এসব প্রশ্ন কেন অনন্তবাবু ? একটা ভাল পার্কে বেশ একটু রাত পর্যন্ত যদি ওত পেতে বসে থাকতে পারেন, তবে বেশ ভাল জিনিসের সন্ধান পেয়ে যাবেন, এবং রাতটা মন্দ কাটবে না।

—তাই নাকি নিশীথবাবু ?—নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন অনন্তবাবু।

হঠাৎ দুজনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ান, অনন্তবাবু এবং ধীরাজবাবু। তারপরেই নিশীথের সেই বিমূঢ় চেহারাটার দিকে তাকিয়ে আর একবার হেসে কামরা ছেড়ে চলে যান।

সেদিন থেকে অফিসের নানা ঘরে নানা জনের মুখ-টেপা হাসির ফাঁকে ফাঁকে একটা চাপা আলোচনার গুঞ্জন রোজই জেগে উঠত। সেই আলোচনার ভাষা কিছু কিছু নিশীথও নিজের কানে শুনেছে। ভাগ্য ভাল, চাকরিটা বেশিদিন ছিল না। ছ মাস যেতেই চাকরিটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু স্মিথ অ্যান্ড জনসনের অফিসের ঘরে সেই গুঞ্জনটা কি আজও বেঁচে আছে? এবং সেই গুঞ্জনই কি বাতাসে বাতাসে এতদূরে ভেসে এসে লাক্ষানগরের শীতল সরকারের কানের কাছে নিশীথ রায়ের চরিত্রের গল্প হয়ে বেজে উঠেছে?

কিন্তু ওটা যে একটা ঘোর মিথ্যা অপবাদের গল্প। অনন্তবাবু আর ধীরাজবাবুর মত ভয়ানক অন্ধ মানুষের একটা বিদঘুটে কল্পনার গল্প। এই গল্পটাকেই কি শুনতে পেয়েছেন আর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ফেলেছেন শীতল সরকার ও তাঁর মেয়ে নীরাজিতা?

সুবর্ণরেখার বালিয়াড়িতে ছায়া পড়েছে। পশ্চিম আকাশের রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। চোখে পড়ে নিশীথের, ডালিয়ার বাগানের ভিতরে ছুটোপুটি করছে বেণু। বাড়িটার ফটকের থামে একটা নাম লেখা আছে— শিবদাস দত্ত। নামটা বোধ হয় ওই ভদ্রলোকেরই নাম, যিনি অলক্তকের ঘৃণা আতঙ্ক আর দুর্ভাবনার আসল রহস্যের কথাটা নিশীথকে এইমাত্র শুনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন।

নিশীথের জীবনের আরও গল্প আছে; এবং মনে করবার চেষ্টা করলে একে একে মনে পড়েও যায়! এবং এটাও সত্য যে, অনেক বছর আগের দেখা একটি মেয়ের নাম আজও হঠাৎ এক এক বার নিশীথ রায়ের ভাবনার মধ্যে বেজে ওঠে। শ্যামলীর নামটা ভুলে যায়নি নিশীথ।

শ্যামলীর বাবা গোপালবাবু ছিলেন নিশীথের বাবার অফিসের ক্যাশিয়ার। নিশীথের বাবা মারা যাবার পরেও গোপালবাবু মাঝে মাঝে নিশীথদের কলকাতার বাসায় আসতেন। নিশীথের একটা ভাল চাকরি হল কিনা, শুধু এইটুকু জানবার ইচ্ছা ছাড়া আর কোনও ইচ্ছা গোপালবাবুর ছিল না। অন্তত সে রকম অন্য কোনও ইচ্ছার কথা তাঁকে কোনওদিন বলতে শোনেনি নিশীথ। সেই গোপালবাবু খুবই আকস্মিকভাবে একদিন সকাল দশটার সময় অফিসে যাবার জন্য তৈরি হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। শুনেছিল নিশীথ, রোজ লক্ষ টাকা ঘেঁটে ঘেঁটে আর গুণে গুণে যাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরি-জীবন পার হয়েছে, সেই ক্যাশিয়ার গোপালবাবু নিজের জমার খাতায় দশটা টাকাও রেখে যেতে পারেননি।

শ্যামলীর দুর্ভাগ্যের আর একটা খবর জানতে পেরেছিল নিশীথ। শ্যামলীর বিয়ের একটা সম্বন্ধ প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছিলেন গোপালবাবু; কথা ছিল, আসছে শ্রাবণেই বিয়েটা হয়ে যাবে। কিন্তু সে শ্রাবণ এলেও শ্যামলীর বিয়ে হল না। হবেই বা কেমন করে? বিয়ের খরচ আসবে কোথা থেকে? কে দেবে? পাত্রপক্ষই চিঠি দিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ বাতিল করে দিল।

আরও একটা সমস্যা। শ্যামলীদের দিন চলবে কী করে? নিশীথ রায় নিজেই যেচে শ্যামলীর মার কাছে গিয়ে একটা কথা বলেছি— বলুন, আপনাদের এই অবস্থায় আমি কী সাহায্য করতে পারি?

শ্যামলীর মা বলেন— শ্যামলীর পড়াটা যেন নষ্ট না হয়; যাতে অন্তত এই চারটে মাস কলকাতায় থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করে দাও, নিশীথ। শ্যামলীর পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই দেশের বাড়িতে চলে যাব।

হ্যাঁ, সেই চারটে মাস শ্যামলীদের কলকাতায় থাকবার সব খরচ নিশীথই দিয়েছিল। এমন মস্ত কোনও টাকা খরচের ব্যাপারও সেটা ছিল না। মাসে মাসে শ'দেড়েক টাকা, এবং শ্যামলীর পরীক্ষার ফি-এর জন্য একশো কুড়ি টাকা, এইমাত্র।

মাঝে মাঝে শ্যামলীদের বাড়িতে যেতে হত। শ্যামলীর পড়ার সুবিধা বা অসুবিধার খোঁজ নিতে হত। এবং এমন একটা সন্ধ্যাও দেখা দিয়েছিল, যে সন্ধ্যায় শ্যামলীর চোখে জল দেখে শ্যামলীকে সান্ত্বনাও দিতে হয়েছিল। কারণ, শ্যামলীদের বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল নিশীথ, গোপালবাবুর একটা ফোটোর দিকে তাকিয়ে আকুল হয়ে কাঁদছে শ্যামলী।

শ্যামলীরা দেশের বাড়িতে চলে যাবার পর বুঝতে পেরেছিল নিশীথ, বেশ চমৎকার একটা গল্প এরই মধ্যে সেই আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে একেবারে আলিপুর পর্যন্ত ছুটে চলে গিয়েছে। আলিপুরের ছোড়দি বললেন— শ্যামলী মেয়েটা তো দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয়, নিশি ?

চমকে ওঠে নিশীথ। —এ কথা আমাকে বলবার মানে কী ছোড়দি ?

ছোড়দি হাসেন— সত্যিই রাগ করলি নাকি ?

—হ্যাঁ।

—তা হলে শুধু আমার ওপর রাগ করছিস কেন ? তোদের পাড়াসুদ্ধ মানুষের ওপরও রাগ কর তা হলে ?

—তার মানে ?

—তার মানে সবাই যে জানে।

—কী জানে ?

—শ্যামলীর সঙ্গে তোর খুব ভাবসাব হয়েছে।

—তা হয়েছে। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু তাতে কী আসে-যায় ?

ছোড়দি আশ্চর্য হয়ে ভ্রূকুটি করেন— তাতে ভালমন্দ অনেক কিছু আসে-যায়। লোকে আশ্চর্য হয়; লোকে অনেক কিছু সন্দেহ করে।

নিশীথ আশ্চর্য হয়— সন্দেহ ?

—হ্যাঁ। ভাবসাব হল, অথচ বিয়ে হল না, এটা তো ভাল কথা নয়।

—আমার সঙ্গে শ্যামলীর বিয়ে হবে এরকম কোনও কথা তো ছিল না।

—সেইজন্যেই তো ব্যাপারটাকে এত খারাপ দেখাচ্ছে। শ্যামলীকে বিয়ে করলেই ভাল করতিস।

—কী আশ্চর্য, বিয়ে করতে ইচ্ছে হলে তো বিয়ে করব।

—ইচ্ছে করলেই তো হয়।

—না। মানুষের পক্ষে ইচ্ছে করে ইচ্ছে তৈরি করা সম্ভব নয়।

ছোড়দিও আর কোনও তর্ক না করে নিশীথের হাতের কাছে এক পেয়ালা চা তুলে দিয়েছিলেন। আলিপুরের ছোড়দির বাড়ির সেই চা কোনওমতে খেতে পেরেছিল নিশীথ। কিন্তু বিডন স্ট্রিটের মাসিমার বাড়িতে এসে চায়ের কাপে একটা চুমুকও দিতে পারেনি। মাসিমা বড় বেশি গম্ভীর হয়ে বললেন— তোমার নামে এসব ভয়ানক কথা শুনতে আমাদের বড় কষ্ট হয়, নিশীথ।

—কী কথা ?

—গোপালবাবুর মেয়ে শ্যামলীর সঙ্গে...

চা না খেয়েই ঘর ছেড়ে চলে যায় নিশীথ। এবং আশ্চর্য হয়ে ভাবে, মানুষের জীবনের সব সত্য ও মিথ্যা কি এরকম এক একটা ভুয়ো গল্পের সৃষ্টি ?

সেই ভুয়ো গল্পটা কি আজও মরে যায়নি ? একটা মেয়ের উপকার করতে চেষ্টা করেছিল নিশীথ, কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার, সেই চেষ্টার গল্পটা একটা উপকারের গল্প না হয়ে নিশীথেরই চরিত্রের গল্প হয়ে গেল ! এতদিন পরে সেই ভুয়ো গল্পটাই কি উড়ে এসে অলক্তকের শীতলবাবু আর নীরাজিতাকে চমকে দিয়েছে ?

শিবদাস দত্তের বাংলোবাড়ির বারান্দায় আলো জ্বলে উঠেছে। জেঠামশাই কোথায় ? কাকিমাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন ? শিবদাসবাবুর সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক বের হয়ে পড়ল নাকি ? নইলে এতক্ষণ ধরে চা খাওয়ার কথা তো ছিল না ? এবং চা খেতেই বা এত সময় লাগবে কেন ? দেখতে পেয়ে একটু আশ্চর্য হয় নিশীথ, ডালিয়ার বাগানের পাশে ঘাসের উপর মাদুর পেতে ক্যারাম খেলছে চঞ্চল আর দেবেশ।

এদিকে ওদিকে সব বাড়িরই জানলায় আলো ফুটে উঠেছে, এবং অনেক দূরের দলমা পাহাড় এইবার একেবারে আবছা হয়ে গিয়েছে। আর, একেবারে যেন নিরেট অন্ধকারটি হয়ে মুখ ঢেকে রয়েছে অলক্তক।

ঝাউয়ের কাতর শ্বাসানি থামলেও নিশীথের মনের উতলা নিশ্বাসের অস্থিরতা একেবারে শান্ত হয়ে যায়নি। জানতে ইচ্ছে করে, কোন গল্প শুনতে পেয়ে শিউরে উঠল নীরাজিতা ?

একটা ফোটোর গল্প মনে পড়ে। সেটাও চাকরি-জীবনের একটা ঘটনার গল্প। স্মিথ অ্যান্ড জনসনের অফিসের চাকরি নয়, কলকাতার বিখ্যাত বাঙালি ব্যবসায়ী পরিতোষবাবুর মিনারেল সাপ্লাই কোম্পানির একটা চাকরি। নিশীথের কাজে বড় খুশি হয়েছিলেন পরিতোষবাবু। কিন্তু অফিসের ম্যানেজার কৈলাসবাবু মাঝে মাঝে ঠোঁটে দাঁত চেপে অদ্ভুতভাবে হাসতেন, এবং নিশীথের কাছে এসে হেঁয়ালির মত একটা কথা প্রায়ই ফিসফিস করে বলতেন— শুধুই কি আপনার কাজ দেখে মালিক খুশি হয়েছেন মশাই ? আপনি কি তাই মনে করেন ?

নিশীথ বলে— তাই তো মনে করি।

ঠোঁটে দাঁত চেপে বিড়বিড় করেন কৈলাসবাবু—খুব ভুল করছেন, নিশীথবাবু। এই অফিসের কেউ অন্তত আপনার চেয়ে কম এফিশিয়েন্ট নয়।

পরিতোষবাবুর গিরিডি-অফিসের ম্যানেজার কাজ ছেড়ে দেবার পর কলকাতার অফিসে একটা আশার সাড়া জেগে উঠল যেদিন, সেদিন নিশীথ রায়ের দিকে অনেকগুলি চোখ বার বার অপ্রসন্ন হয়ে তাকিয়েছিল। কোনও সন্দেহ নেই, এইবার গিরিডি-অফিসের ম্যানেজার হবে পরিতোষবাবুর আদুরে অফিসার এই নিশীথ রায়। আটশো টাকা মাইনে, তার উপর অমন সুন্দর একটি শৌখিন কোয়ার্টার।

তার পরের দিনই পরিতোষবাবু একটি বেনামি চিঠি পেলেন, অনেক মিনতি করে অনেক কথা লিখেছে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী, নিশীথ রায়ের মত সাংঘাতিক খারাপ চরিত্রের মানুষকে আর বেশি প্রশ্রয় দেবেন না। ওর টেবিলের দেরাজটা একটু সার্চ করলেই সব জানতে পারবেন।

নিশীথের টেবিলের দেরাজ সার্চ করেছিলেন পরিতোষবাবু, এবং একটা ফোটো পেয়েছিলেন, সেইসঙ্গে একগাদা প্রেমপত্র, নিশীথের কাছে লেখা ; এবং সেই প্রেমপত্রের বক্তব্যও একগাদা বীভৎসতা।

—এসব কী বস্তু, নিশীথ ? নিশীথকে কাছে ডেকে নিয়ে অদ্ভুত একটা গম্ভীর হাসি হেসে প্রশ্ন করেছিলেন পরিতোষবাবু। প্রথমে শুধু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল নিশীথ, তারপর চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠেছিল।

পরিতোষবাবু আরও গম্ভীর হয়ে বলেন— আমার কিন্তু বিশ্বাস করতে একটুও ভাল লাগছে না, নিশীথ।

নিশীথ বলে— সেটা আপনি বুঝে দেখুন। মোট কথা, আমি বিদায় নিলাম।

—সে কী ! আমি তো তোমাকে মোটেই সন্দেহ করছি না।

—আপনার অনুগ্রহ। কিন্তু আমার পক্ষে আপনার চাকরিতে থাকা সম্ভব হবে না।

—তা হলে আমার গিরিডি-অফিসের ম্যানেজার হবে কে ?

—কৈলাসবাবু।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল নিশীথ, কিন্তু গল্পটা নিশীথকে ছেড়ে দেয়নি। পরিতোষবাবুর অতবড় অফিসের ঘরে যে গল্পটা সেদিন ফিসফিস করে উঠেছিল, সেই গল্পটাকে চার বছর পরেও একদিন শুনতে পেয়েছিল নিশীথ। বেলঘরিয়ার ডাক্তার রাজকিশোরবাবু, যিনি নিশীথের বড় ভগ্নীপতির বড়দা, তিনি পথে দেখা হতেই দুঃখ করলেন— সবটা শুনেছি নিশীথ, শুনে বড় দুঃখ পেয়েছি। চাকরি যাক, কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু এরকম একটা বিশ্রী কারণে, অর্থাৎ চরিত্রের জন্য চাকরি যাবে কেন ?

সেই ফোটোর গল্পটাকেই কি শুনতে পেয়েছে অলক্তক ? কিন্তু ওটা কী সত্যিই মানুষের চরিত্রের গল্প হল ? কৈলাসবাবুর চক্রান্তের সৃষ্টি ওই গল্পটাকে একটুও সন্দেহ না করে রাজকিশোরবাবুর মত অলক্তকের শীতলবাবুও তা হলে বিশ্বাস করেছেন ? এবং নীরাজিতাও।

জেঠামশাই আর কাকিমা যে ওই ডালিয়ার বাগানের আড়ালে ডুব দিয়েই রইলেন। কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। ওঁরা দুজনে তা হলে ঘরের ভিতর বসে গল্প করছেন। বেণুটাই বা কোথায়

গেল ? ক্যারামের খটাস-খটাস আর শোনা যায় না। দেবেশ আর চঞ্চলও বোধ হয় ঘরের ভিতরে গিয়ে বসেছে।

কিন্তু সন্ধ্যাও যে পার হতে চলল। সবাই বোধ হয় শিবদাস দত্তের আরও বড় অনুরোধের পাল্লায় পড়েছে। শুধু চা নয়, বোধ হয় একেবারে রাতের খাওয়া না খাইয়ে ছেড়ে দেবেন না পরম অতিথিবৎসল ওই শিবদাস দত্ত।

জীবনের ত্রিশ বছর বয়সের সব অনুভবের ইতিহাস যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজতে চেষ্টা করছে নিশীথ— সত্যিই এমন কোনও ছায়া, কোনও শিহর, আর কোনও দাগ আজও সে ইতিহাসের স্মৃতি-বিস্মৃতির ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে কি, যার জন্য নিশীথ রায়ের চরিত্রটাকেই ভয় করতে হবে ? যদি থেকে থাকে, তবে এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাক না কেন ? তা হলে নিশীথ রায়ের মনও সব ক্ষোভের জ্বালা থেকে এই মুহূর্তে মুক্ত হয়ে যাবে, নীরাজিতাব ঘৃণাকে মনে মনে বরং অভিনন্দিত করে কালিকাপুরে ফিরে যেতে পারবে নিশীথ।

সন্ধ্যার আলোতে ঝাউয়ের ছায়া কখনও দোলে, এবং কখনও বা সিরসির করে কাঁপে। কিন্তু ভাবতে গিয়ে যেন নীল জলের প্রকাণ্ড একটা ঢেউ নিশীথের চোখের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সাদা ফেনার ফোয়ারা ছড়াতে থাকে। ঝাউয়ের শব্দ সমুদ্রের কল্লোলের মত মনে হয়।

না, নিতান্ত মিথ্যে নয়। একেবারে মিথ্যে একটা প্রহেলিকার শব্দ নয়। সত্যিই একদিন পুরীর সমুদ্রতটের বালুবেলায় বেড়াতে বেড়াতে নিজেরই বুকের ভিতর একটা ইচ্ছার কল্লোল শুনতে পেয়েছিল নিশীথ। নাটোরের কেশববাবু সপরিবারে পুরীতে বেড়াতে এসেছিলেন। কেশববাবুর চেহারাটা এখনও বড় স্পষ্ট মনে পড়ে, ফরসা পাতলা ও লম্বা মানুষটি। জরির কাজ-করা একটা লক্ষ্ণৌ-টুপি ছিল তাঁর মাথায়, এক হাতে মোষের শিংয়ের স্টিক, আর এক হাতে পাইপ, সেই কেশববাবু প্রায় এক ঘণ্টা ধরে নিশীথের কাছে তাঁর মাছ-ধরার নানা মজার গল্প বলেছিলেন।

সেদিন, পুরীর সমুদ্রেব সেই বালুবেলার উপর বিকালের আলোতে কেশববাবুর সঙ্গে প্রথম যখন আলাপ হল, তখন আব একজন সেখানে ছিল, এবং তার হাতে একটা সেতারও ছিল। কেশববাবুব মেয়ে অনুবাধা। কেশববাবুর মাছ ধরার গল্প শুনে অনুরাধাও বার বার হেসে উঠেছিল, এবং নিশীথ রায়ের চোখ বেশ একটু বিস্মিত হয়ে দেখেছিল, অনুরাধাব মুখের হাসিটা অনুবাধার সেই ছিপছিপে সুন্দর চেহারার সঙ্গে কী সুন্দর মানিয়েছে।

কেশববাবু বললেন—তোমার পবিচয় জানতে পেরে বড় খুশি হলাম। তোমার বাবা নীরেন আর আমি একদিন সাংঘাতিক বর্ষার মধ্যে জেলেডিঙি নিয়ে একেবারে মাঝপদ্মা পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। মাছ ধরতে পারিনি, কোনওমতে প্রাণটা বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলাম। একটু থেমে নিয়ে খুশির স্বরে একটা আক্ষেপ করে ওঠেন কেশববাবু—আঃ, ছেলেবেলার সে সব দিন, কী দিনই না গিয়েছে !

প্রশ্ন করেছিল নিশীথ—পুরীতে আর কতদিন থাকবেন ?

—পুরীতে আর মাত্র এক সপ্তাহ।

—তারপর কলকাতায় ফিরবেন ?

—না, এই গ্রীষ্মটা শেষ না হবার আগে কলকাতায় ফিবব না। ভাবছি, ওয়াল্টেয়ারে গিয়ে আর একটা মাস সমুদ্রের হাওয়া খাব।

সেই একটা সপ্তাহ, রোজই বিকালে কেশববাবুর সঙ্গে দেখা হত। তার মানে অনুরাধাব সঙ্গেও দেখা হত। বিকেল ফুরিয়ে যখন সন্ধ্যা নামত, যখন ঢেউয়ের নীলটুকু আর দেখা যেত না, শুধু সাদা ফেনার হাসিটুকু আরও অন্ধকারের বুকে নেচে নেচে আছাড় খেত, তখন কেশববাবুই অনুরোধ করতেন—যদি কোনও কাজের তাড়া না থাকে, তবে আর একটু সময় এখানে থেকে যাও, নিশীথ। অনুরাধার সেতার শুনে যাও।

কেশববাবুর শখ, সন্ধ্যা হলে পুরীর সমুদ্রের সেই বালুবেলায় কোনও একটি নিভৃতে বসে মেয়েব হাতের সেতার বাজনা শোনেন। নিশীথও শুনেছিল। আজও মনে পড়ে, অনুরাধাব সেতারেব ঝংকার আর সমুদ্রের কল্লোল একসঙ্গে মিশে কী অদ্ভুত এক শব্দের উৎসব জাগিয়ে তুলত !

অনুরাধার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা হয়নি বললেই হয়। সাত দিনের মধ্যে মোট সাতটা কথাও হয়নি। কিন্তু অনেক কথা মনে হয়েছিল নিশীথের, তার মধ্যে বিশেষ একটা কথা নীরব কল্লোলের মত নিশীথের বুকের ভিতরেই বেজেছিল। একটা ইচ্ছার কথা। অনুরাধাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

ইচ্ছা করে, বাস, ওই পর্যন্ত ; তার পর তো পুরী ছেড়ে চলেই গেলেন কেশববাবু আর অনুরাধা, এবং অনুরাধার সেতারও। সত্যি কথা, অনুরাধা চলে যাবার পর মনে হয়েছিল নিশীথের, পুরীর সমুদ্রের কল্লোল যেন মধুরতা হারিয়েছে।

নিশীথের ছুটি ফুরোতে আরও কিছুদিন বাকি ছিল, এবং ইচ্ছে করলেই ওয়াল্টেয়ারে গিয়ে অনুরাধার সেতার আবার শোনবার সুযোগও ছিল। কিন্তু ওয়াল্টেয়ারে যায়নি, যেতে পারেনি নিশীথ। এমন কী, কেশববাবুর কলকাতার বাড়ির ঠিকানা জানা থাকা সত্ত্বেও কোনওদিন কেশববাবুর বাড়িতে আসেনি নিশীথ। সেই বর্ষাতে না, এবং এই তিন বছরের মধ্যে কোনও একটি দিনেও না। এবং আজ কল্পনাও করতে পারে না নিশীথ, এখন কোথায় কোন সমুদ্রের বালুবেলার উপর বসে সেতার বাজাচ্ছে কেশববাবুর মেয়ে অনুরাধা।

তিন বছর আগের জীবনের এই গল্পটাই কি আজ নীরাজিতার কানে কানে কেউ বলে দিয়ে গিয়েছে ? কে বলবে ? নিশীথ রায়ের সেই ইচ্ছার তো ভাষা ছিল না, তবে সেটা মানুষের কানে পৌঁছবে কী করে ? ভালবেসে ফেলা আর ভালবাসতে ইচ্ছা করা, এই দুয়ের মধ্যে কি কোনও তফাত নেই ? সেই তফাতটুকু বুঝতে পারবে না নীরাজিতা, তাই-বা কী করে সম্ভব হয় ?

কে জানে কী ভেবে আর কী শুনে ভয় পেয়েছে নীরাজিতা ! কিন্তু নিশীথ রায়ের মন কী বলে ? অনুরাধার সেতার শুনে ওরকম একটা ইচ্ছা না হওয়াই কি উচিত ছিল ? নিশীথ রায়ের চরিত্রের গায়ে একটা ক্ষতের দাগ ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে তিন বছর আগের ওই একটা ইচ্ছা ? আশ্চর্য ! এই যে পৃথিবীর বুকের ভিতরে আর বাইরে নির্জীব শক্ত পাথরের স্তর আর স্তূপ পড়ে রয়েছে, তাদেরও গায়ে ক্ষতের চিহ্ন আছে। নানারকম ইচ্ছার ক্ষত, এবং সে ইচ্ছার উপর কারও কোনও হাত ছিল না। মানুষের পাঁজর নিশ্চয় আর্কিয়ান গ্র্যানিটের চেয়ে বেশি নির্জীব আর বেশি কঠিন কোনও বস্তু নয়।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় নিশীথ। শিবদাস দত্তের চায়ের জল কি এই এক-দেড় ঘন্টার মধ্যেও ফুটে উঠতে পারল না ? তবে এত দেরি হচ্ছে কেন ? এখনই রওনা হলে কালিকাপুর ফিরতে কত রাত হয়ে যাবে, সেটা কি অনুমান করতে পারছেন না জেঠামশাই ?

চক্রবর্তী মশাই অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছেন। রাজপোখরাতেই তাঁর এক কুটুমের বাড়ি আছে, সেখানেই তিনি আজ থেকে যাবেন। দেখতে পায় নিশীথ, কনট্রাক্টর জানকীবাবুর যে গাড়িটা আজ এখানে বরযাত্রী বয়ে আনবার দুর্ভাগ্য সহ্য করেছে, সেই গাড়ির ড্রাইভার মুনিরামও কোথায় যেন গিয়েছে। মুনিরামও কি শিবদাস দত্তের চা খেতে গিয়ে আটকে পড়ল ? কালিকাপুরে ফিরে যাবার উৎসাহটাই শিথিল হয়ে গেল, কিংবা রাজপোখরার এই লাক্ষানগরের উপর রাগ করতেই ওরা ভুলে গেল ?

কে যেন গাড়ির কেরিয়ারের ঝাঁপ খুলছে, শব্দ শুনেই চমকে ওঠে নিশীথ। —কে ?

—আমি মুনিরাম।

—কী করছ তুমি ?

—কাকিমা ফুলের ঝুড়িটা চাইছেন।

স্থলপদ্ম আর হলদে গোলাপের ঝুড়িটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল মুনিরাম। কাণ্ড দেখে মনে মনে হেসে ফেলে নিশীথ। —বাঃ, তবে কি শিবদাস দত্তের বাড়িতে এই স্থলপদ্ম আর হলদে গোলাপ উপহার দিয়ে, তার বদলে একঝুড়ি ডালিয়া উপহার নেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন কাকিমা ? পুরনো কুটুমবাড়িতে এসেও এতটা প্রীতির মাখামাখি কেউ করে না। শিবদাস দত্ত তো মাত্র দেড় ঘন্টার চেনা এক ভদ্রলোক !

ইচ্ছে না থাকলেও বার বার অলক্তকের দিকে নিশীথের চোখের দৃষ্টিটা সেই রকমই রক্তাক্ত বিস্ময়ের জ্বালা নিয়ে ছুটে যায়। ছায়া, আবছায়া আর অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে

শীতল সরকারের বাড়িটা, নিশীথ রায়ের চরিত্রের একটা গল্প শুনে যেন একটা আতঙ্কিত দুঃস্বপ্ন নিরেট হয়ে গিয়েছে।

এত ভয় কেন ? যদি কোনওদিন, কিংবা আজও এখনি হঠাৎ এসে নীরাজিতা প্রশ্ন করে, তবে অনায়াসে একটা স্বপ্নের গল্প হেসে হেসে বলে দিতে পারবে নিশীথ। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন, ঘুমের মধ্যে সেই স্বপ্নকে একটুও খারাপ লাগেনি, কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে পড়তেই লজ্জা পেয়েছিল নিশীথ। এক নারীর মূর্তি, এবং সত্যিই পৃথিবীতে ওরকম কোনও নারী আছে কিনা, জানে না নিশীথ। মুখে কথা নেই, চোখে হাসি নেই, একবিন্দু সাজ বা লাজের শোভা নেই, শুধু একটা নারী-শরীর। নিশীথের একেবারে চোখের কাছে এসে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, ঢিপ ঢিপ করে নিশীথের হৃৎপিণ্ডটা। সরে যায় না সেই মূর্তি, এবং নিশীথও বলতে পারে না যে, সরে যাও। সে মূর্তির চোখ দুটো শুধু বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকে নিশীথের চোখ দুটোকেও অলস করে ফেলতে থাকে। সেই অদ্ভুত মূর্তির দুই ঠোঁটের কাঁপুনিগুলিকে এক চুমুকে পান করে পাগল হয়ে যাবার জন্য নিশীথ রায়ের নিশ্বাসের বাতাস তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায়।

বড় বিশ্রী ও নির্লজ্জ একটা স্বপ্ন। কিন্তু নিতান্তই স্বপ্ন, একেবারে বস্তুহীন একটা অসারতা। এরকম একটা স্বপ্নের দায়ে নিশীথ রায়ের চরিত্রটাকে দায়রা আদালতে সোপর্দ করতে হবে, এমন কোনও নিয়ম কি আছে ?

মাদল বাঁশি বাজিয়ে এবং বড় বড় জ্বলন্ত মশাল নিয়ে সাঁওতালদের একটা উৎসবের মিছিল চলে গেল। তার পরেই বিদ্যুতের একটা ঝিলিক ; অলক্তকের চেহারাটাও যেন ঝিক করে একটা ঠাট্টার হাসি হেসে আবার অন্ধকারের ভিতরে মুখ লুকিয়ে নিল।

আতঙ্কিতের মত চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায় নিশীথ। বুঝতে পারা যায়, আকাশের পুব আর দক্ষিণ জুড়ে ঘন মেঘের ভার থমথম করছে। বাতাসও খুব ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ঝড় উঠবে বোধ হয়। বৃষ্টি হবে নিশ্চয়। আরও দেরি করিয়ে দিয়ে, এবং আরও দুর্ভোগে নাকাল করে আর জলকাদা মাখিয়ে দুর্দশার চরম করে দিয়ে তবে মুক্তি দেবে রাজপোখরার এই বিদ্রূপে বিষাক্ত রাত্রিটা। বিরক্ত হয়ে এবং কাকিমা ও জেঠামশায়ের কাণ্ডজ্ঞানের উপর আস্থা হারিয়ে বার বার গাড়ির হর্ন বাজাতে থাকে নিশীথ।

এ কী ! হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে নিশীথ। অলক্তকের এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় করছে কেন ? নিশীথ রায়ের এতক্ষণের এত প্রশ্নের সব অহংকার যেন হঠাৎ একটা আতঙ্কের ঝিলিক খেয়ে চমকে উঠেছে।

কী আশ্চর্য, এতগুলি গল্প এত সহজে মনে পড়ে গেল, কিন্তু সবশেষে মনে পড়ল সেই গল্পটা, যেটা কোনও অপবাদ আর চক্রান্তের গল্প নয় ; শুধু একটা ইচ্ছার গল্প নয়, উপকারের গল্প নয়, অসার স্বপ্নের গল্পও নয়। সেটা যে একেবারে একটা বাস্তব সত্য, একটা ঘটনা, নিশীথ রায়ের ত্রিশ বছর বয়সেরই একটা নিদারুণ ভীরুতা। গালুডির ধীরেনবাবুর স্ত্রী সুনয়নাকে ভয় করে নিশীথ বায়ের মত মানুষ, এই গল্পটা যে সত্যিই নিশীথ রায়ের চরিত্রের গল্প। এই গল্প কেউ না জানুক, নিশীথ রায় নিজে তো জানে। কালিকাপুরের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে কেন ? বার বার তিনবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কালিকাপুর থেকে পালিয়ে যাবার জন্য কেন ব্যাকুল হতে হয়েছিল ? কেন বাংলোর ফটকের উপব 'আউট' টেনে দিয়ে ভিতরের ঘরের মধ্যে চুপ করে লুকিয়ে বসে থাকতে হয় ? কালিকাপুরের কাঁচা সড়কের উপর মোটর গাড়ির শব্দ শুনলেই কেন চমকে উঠতে হয় ? চিঠির উপর গালুডির ডাকঘরের ছাপ দেখলেই সে চিঠি খুলতে নিশীথ রায়ের হাত কেন কেঁপে ওঠে ?

সে নারীর নাম সুনয়না, বয়সের তুলনায় শরীরটা যেমন বেশি ভারী, মুখটা তেমনই বেশি কাঁচা। কেউ না জানুক, এবং সুনয়নার সেই শান্ত ও গম্ভীর চেহারা দেখে পৃথিবীর কারও চোখে এক বিন্দু সন্দেহ নাই বা দেখা দিক, নিশীথ জানে, কী ভয়ানক আবেদন ওই সুনয়না ! সুনয়নার দুঃসাহস দেখে শিউরে উঠতে হয়, ভয় পায়, সরে যাবার জন্য প্রাণটা ছটফট করে ওঠে ; কিন্তু সরে যেতে পারেনি নিশীথ। ভুলে যায়নি নিশীথ রায়, বরং ভাবতে গিয়ে বার বার নিজেরই ভীরুতাকে ঘৃণা করে ধিক্কার দিয়েছে। একবার নয়, অনেকবার এই ভীরুতার অভিশাপ সহ্য করতে হয়েছে।

তবে আর অলক্তকের উপর কিসের অভিমান ? অলক্তকের ঘৃণা ভয় আর সন্দেহের উপর এত রাগ করবার কী আছে ? সুনয়নার গল্পটা যদি শুনে থাকে নীরাজিতা, তবে কি নীরাজিতার ভয় পাওয়া উচিত নয় ? বুকে হাত দিয়ে জোর করে বলবার সাহস আছে কি নিশীথ রায়ের, সুনয়নার লেখা চিঠির কথাগুলি নিশীথ রায়ের চরিত্রেরই গল্প নয় ? নিজেকে হীরার টুকরো বলে মনে করলেই বা কী ? হীরা হলেও দাগী হীরা। অলক্তকের বন্ধ ফটকের ওই প্রকাণ্ড তালাটার দিকে রাগ করে তাকাবার কোনও অধিকার নিশীথ রায়ের নেই, গল্পটা নীরাজিতা সরকার জানতে পারুক বা না পারুক।

জিওলজির মানুষ, শক্ত পাথর ঘাঁটাঘাঁটি করে সারা দিনের বারোটি ঘন্টা পার হয়ে যায়, সেই নিশীথ রায়ের মুখটা অভিমানী ছেলেমানুষের মুখের মত কোমল হয়ে যায়, এবং চোখ দুটোও যেন ছলছল করে। একটা কথা শুধু জানতে পারল না নীরাজিতা। সুনয়না নামে সেই ভয়ের শাসন থেকে বাঁচতে পারা যাবে, নীরাজিতার ভালবাসার মধ্যে এই সৌভাগ্যের প্রতিশ্রুতি দেখতে পেয়েছিল নিশীথ রায়। তাই তো অনেক লোভে লোভী হয়ে এই রাত্রেরই একটি লগ্নের উৎসবে নীরাজিতার হাত ধরে নিশ্চিন্ত হবার আশায় ছুটে এসেছিল নিশীথ রায়।

না, আর রাগ করে নয়, বেশ খুশি মনেই রাজপোখরার এই ঝাউয়ের ছায়া থেকে এইবার অনায়াসে ছুটে চলে যেতে পারবে নিশীথ রায়। পঞ্চাশ মাইল স্পিডে গাড়িটা ছেড়ে দিলে কালিকাপুর পৌঁছে যেতে খুব বেশি রাত হয়ে যাবে না।

কিন্তু ও কী ! কার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কাছে এসে পড়েছে বেণুটা ?

বেণুর চোখ দুটো যেন নতুন উল্লাসে জ্বলজ্বল করছে। কাছে এসেই চেঁচিয়ে ওঠে বেণু—প্রতিভাদি তোমাকে ডাকতে এসেছেন, দাদা। শিগগির চা খাবে চলো।

বেণুর প্রতিভাদি ? তার মানে ওই ডালিয়া বাগানের মালিক শিবদাস দত্তের মেয়ে ? তাই কি ?

নিশীথ রায়ের মনের নীরব প্রশ্নের উত্তর প্রতিভার মুখের কথায় আপনি বেজে ওঠে।—আপনার চা আর খাবার এখানেই দিয়ে যাবার জন্য বাবা বললেন। আমিই বললাম, বাঃ, তা কেন হবে ?

—কী বললেন ?

—চা খাবেন চলুন।

কোনও কুণ্ঠা নেই, কথার মধ্যে কোনও সূক্ষ্ম সৌজন্যের সতর্কতা নেই, সোজা সরল ও সুস্পষ্ট ভাষার একটা আহ্বান, চা খাবেন চলুন। আকাশে মেঘ, বাতাস বড় ঠাণ্ডা, ঝাউয়ের ছায়া সিরসির করে দোলে, ফটকের আলোটাও যেন ঝাঁজ হারিয়ে ঢলঢল করে ; এবং শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভার মুখের হাসি যেন রাজপোখরার রাত্রিটাকে হঠাৎ আরও স্নিগ্ধ করে দিয়েছে। গাড়ির ভিতরে বসে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিশীথ রায়, এবং একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না।

কিসের বিস্ময় ? প্রতিভাকেই একটা বিস্ময় বলে মনে হয়, কারণ প্রতিভাও কি জানে না যে, কিসের জন্য নিশীথ রায়ের মনুষ্যত্বটাকেই সন্দেহ করে আর ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে অলক্তকের শীতলবাবু আর তাঁর মেয়ে নীরাজিতা সরকার ?

প্রতিভা দত্তের সাজের মধ্যেও বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। একটা চওড়া লাল-পেড়ে শাড়ি পরেছে প্রতিভা ; প্রতিভার মত বয়সের কোনও আধুনিকা এরকম একটা লাল-পেড়ে শাড়ি পরেছে, এরকম দৃশ্য কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারে না নিশীথ। প্রতিভার চোখের চশমাটা সোনার ফ্রেমের বটে, কিন্তু নিতান্তই সাদাসিধা ফ্রেম। এলোমেলো খোঁপাটা একটা সিল্কের রুমাল দিয়ে বাঁধা। পায়ে জুতো নেই। নিশীথ রায়ের চোখ দুটো স্বীকার করে, ওরকম পা জুতো দিয়ে না ঢেকে রাখাই ভাল। সত্যিই, পিচ-মাখানো কালো পথের উপর প্রতিভা দত্তের পা দুটো যেন ফুলের মত ফুটে রয়েছে, দুটি লালচে কোমলতার স্তবক।

নিশীথ বলে—আপনি মিছেমিছি কষ্ট করলেন। আমার চা খাবার ইচ্ছেই নেই।

—ইচ্ছে নেই কেন ?

শিবদাস দত্তের মেয়ের মুখে সত্যিই যে কোনও সঙ্কোচের বালাই নেই। সোজা সরল প্রশ্ন। উত্তর দিতে গিয়ে ভাবতে হয়, উত্তরের ভাষাটাকেও তাড়াতাড়ি তৈরি করতে পারে না নিশীথ রায়

এবং আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নেমে কুণ্ঠিতভাবে বলে—আপনি আমাকে এ ধরনের কোনও প্রশ্ন না করলেই আমি খুশি হব।

প্রতিভা বলে—কিন্তু আপনি চা না খেলে কি আমরা খুশি হব ?

নিশীথ হেসে ফেলে—খুশি না হোন, দুঃখিত হবারও কোনও কারণ নেই।

—আপনি খুবই ভুল কথা বললেন। আপনি আমাদের সামান্য একটা অনুরোধ তুচ্ছ করবেন, অথচ আমরা দুঃখিত হব না, এটা কেমন করে হয় ?

অপ্রস্তুতের মত প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিশীথ রায়, এবং কল্পনাও করতে পারে না বোধ হয়, শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভার সেই ঝকঝকে সপ্রতিভ মূর্তির সামনে নিশীথের চেহারাটাকে কী ভয়ানক বোকা বোকা উদ্‌ভ্রান্তের মত দেখাচ্ছে।

নিশীথ বলে—আপনিও আমাকে অনুরোধ করতে এসেছেন, ভাবতে একটু আশ্চর্যই লাগছে।

—আশ্চর্য বোধ করছেন ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—আপনি কি জানেন না, কেন অলক্তকের ফটক বন্ধ ?

—জানি বইকি।

—জানেন না বোধ হয়, নইলে আমাকে চা খাইয়ে খুশি হবার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন না।

প্রতিভার চশমার সোনার ফ্রেম যেন ঝিক করে জ্বলে ওঠে—বুঝলাম না, কী বলতে চাইছেন আপনি।

—এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে বললে...

—বলুন, আমি কিছুই মনে করব না।

—আপনি জানেন না। নিশ্চয়, ওরা আমার চরিত্রের খবর শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

—কিন্তু আমার ভয় কিসের ?

—ভয় না করুন, একটু ঘেন্নাও তো করতে হয়।

—একটুও না।

—কী বললেন ?

—আমি কাউকে ঘেন্না করতে পারি না।

—কেন ?

—সে অহংকারই আমার নেই।

রাজপোখরার আকাশের পুবে আর একটা লিকলিকে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। নিশীথ রায়ের মুখে একটা অদ্ভুত প্রশ্নও যেন ভয়ানক কৌতূহলের জ্বালায় ছটফট করে ওঠে—কিসের অহংকার নেই।

—চরিত্রের অহংকার।

চরিত্রের অহংকার নেই, এরকম একটা কথাকে এত অহংকারের সুরে উচ্চারণ করতে পারে কোনও মেয়ে, কল্পনা করতে পারেনি নিশীথ। লাক্ষানগর রাজপোখরার পথের উপর ঝাউয়ের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে শিবদাস দত্ত নামে এক ভদ্রলোকের মেয়ের মুখে এরকম একটা কথা নিজের কানে শুনতে না পেলে বিশ্বাসও করতে পারা যেত না। কিন্তু কত স্পষ্ট করে, আর একটুও কুণ্ঠিত না হয়ে কথাটা বলে দিয়েছে প্রতিভা।

প্রতিভার সোনার ফ্রেমের চশমার কাচে আকাশের বিদ্যুতের ঝিলিক বার বার চমক জাগিয়ে খেলা করছে। মনে হয় নিশীথের, প্রতিভা দত্তেরও জীবনে একটা অহংকার যেন বার বার ঝিলিক দিয়ে জেগে উঠছে। প্রতিভার মুখটাকেও বড় বেশি অহংকারে গড়া একটা মুখ বলে মনে হয়। পৃথিবীর কোনও ভ্রূকুটির, কোনও অপবাদের, কোনও অভিযোগের ভয় করে না। চরিত্রের অহংকার নেই, এটাই যেন প্রতিভা দত্তের চরিত্রের সবচেয়ে বড় অহংকার।

ভুলে গিয়েছে নিশীথ, শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভা শুধু সৌজন্যের খাতিরে নিশীথের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু চা খাওয়ার একটি সাগ্রহ অনুরোধ জানাতে ; এবং নিশীথের পক্ষেও সৌজন্য রক্ষা করতে হলে এখন শুধু একটা ভদ্রতার হাসি হেসে প্রতিভার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হয়, ডালিয়ার বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে ওই বাংলোবাড়ির একটি চায়ের আসরের দিকে।

কিন্তু নিশীথ রায়ের চোখ দুটো বোধ হয় নিবিড় এক কৌতূহলের আবেশে হঠাৎ অভিভূত হয়ে গিয়েছে। রাজপোখরার পথের উপর সুন্দর একটা রহস্য নিশীথের চোখের কাছাকাছি এসে মনের ভিতর একটা নীরব বাচালতার ঝড় জাগিয়ে দিয়েছে। অনেক কথা বুকের ভিতর ঠেলাঠেলি করছে। কিন্তু কথাগুলিকে বুকের ভিতরেই চেপে রাখতে হয়। বলা যায় না। বললেই মাত্রাছাড়া অভদ্রতা হয়ে যাবে ; এবং সেসব কথার একটি কথাও স্পষ্ট করে বলবার কোনও অধিকার নিশীথ রায়ের নেই।

সত্যিই কি ওই কথাটা প্রতিভা দত্তের জীবনের একটা অহংকারের প্রতিধ্বনি ? প্রশ্ন করতে পারে না, কিন্তু নিশীথ রায় তার অপলক চোখ নিয়ে প্রতিভা দত্তেরই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ; যেন আশা করছে নিশীথ, প্রতিভা দত্তের মুখটাই আর একটু মিষ্টি এবং আর একটু নরম হয়ে নিশীথ রায়ের প্রশ্নের আকুলতা শান্ত করে দেবে।

চমকে না উঠলেও একটু আশ্চর্য হয় নিশীথ। সত্যিই প্রতিভা দত্তের মুখে যেন একটা আক্ষেপের বেদনা করুণ হয়ে উঠেছে। মাথাটাকে একটু হেঁট করেছে প্রতিভা, এবং মুখের হাসিটাকেও যেন দু ঠোঁটের ফাঁকে গুটিয়ে নিয়েছে। মনে হয়, কী যেন ভাবছে প্রতিভা, এবং সেই ভাবনার ছোঁয়া সহ্য করতে না পেরে প্রতিভার সব অহংকারের ছায়া পালিয়ে গিয়েছে। অহংকারে গড়া মুখ নয়, বেশ একটু বেদনার্ত মুখ।

রাজপোখরার আকাশের চেহারা বদলায় না। থমথমে মেঘের আড়ালে সব তারা ঢাকা পড়ে গিয়েছে, আর বিদ্যুতের চমকও থামছে না। কিন্তু হয় নিশীথ রায়ের চোখের আশা, নয় প্রতিভা দত্তের মুখের ছবি এক একটা চমক লেগে বদলে যাচ্ছে। শুধু দেখতে থাকে নিশীথ রায়, প্রতিভা দত্তের চোখের উপর ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে উঠেই মিলিয়ে গেল, আর আনমনা হাসির মত ছোট একটা হাসিকেও লুকিয়ে ফেলল প্রতিভা। যেন কাউকে ঠাট্টা করছে প্রতিভা, এবং সেই ঠাট্টার আড়ালে যেন একটা উত্তপ্ত ধিক্কারও আছে। নইলে চশমার কাচের আড়ালে প্রতিভা দত্তের চোখ দুটো হঠাৎ ধিক করে জ্বলে উঠবেই বা কেন ?

বড় শান্ত দেখাচ্ছে প্রতিভাকে ; বেশ শক্ত রকমের শান্ত। ঠোঁটের উপর দাঁত চেপে কী যেন ভাবল প্রতিভা, এবং তার পরেই আরও শক্ত হয়ে গেল প্রতিভার মুখের রূপ। মনে হয়, খুব সাবধান হয়ে গিয়েছে প্রতিভা। খুব জোরে চলতে চলতে হঠাৎ পায়ের কাছে একটা গভীর গর্ত দেখতে পেয়ে মানুষের চোখ যে রকম চমকে উঠে সাবধান হয়ে যায়, সেই রকম চোখ করে নিজেরই আঙুলের একটা আংটির দিকে তাকিয়ে আছে প্রতিভা।

বোধ হয় ভয় পেয়েছে প্রতিভা, নইলে বেণুর ছোট্ট হাতটাকে এত শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে কেন ?

—চলো, প্রতিভাদি। ছটফট করে চেঁচিয়ে উঠেছে বেণু।

নিশীথ বলে—বেণুকে যেতে দিন।

কোনও উত্তর না দিয়ে, এবং অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বেণুর হাতটাকে তেমনই শক্ত করে ধরে প্রতিভা বলে—আপনিও চলুন।

—যাচ্ছি, কিন্তু বেণুকে ছেড়ে দিন।

বেণু বলে—হ্যাঁ, আমাকে ছেড়ে দাও, প্রতিভাদি। আমি যাই, নইলে চঞ্চলদা আমার ডালিয়া চুরি করে ফেলবে।

বেণুকে ছেড়ে দিলে নিশীথের চোখের সামনে একলা হয়ে যেতে হবে, এই ভয় ছাড়া আর কি ভয় করতে পারে প্রতিভা ? একলা হতে চায় না, ইচ্ছে নেই, এবং নিশীথ রায়ের চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভাষার রকম-সকমও বোধ হয় প্রতিভা দত্তের সপ্রতিভ মনের ভিতরে একটা সন্দেহের উৎপাত ঘটিয়ে

দিয়েছে।

বুঝতে পারে নিশীথ, শিবদাস দত্তের মেয়ে নিশীথ রায়ের কাছে সৌজন্যের অতিরিক্ত আর কিছু বলতে চায় না, জানতেও চায় না।

—আমার একটা অনুরোধ শুনুন। নিশীথ রায়ের গলার স্বরে যেন একটা অসহায় আবেদন, একটা সান্ত্বনালোলুপ পিপাসা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রতিভা দত্তের সপ্রতিভ মূর্তিও চমকে ওঠে। চোখ তুলে নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে, ভীরু বিস্ময়ে বিব্রত হয়ে প্রতিভা দত্ত বিড়বিড় করে—কী বললেন ?

—বেণুকে চলে যেতে দিন। আমি তো যাচ্ছিই।

প্রতিভা দত্তের হাতটা একবার কেঁপে উঠেই শিথিল হয়ে যায় এবং বেণুও ছাড়া পেয়ে যেন নূতন উল্লাসের নাচের মত ফুরফুর করে দৌড়ে চলে যায়।

নিশীথ হাসে—আপনি বোকা নন ; বেণুকে ছেড়ে দিতে কেন বললাম, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।

—কিন্তু ভুল করলেন।

—কেন ?

—আপনি যদি আমাকে একলা পেয়ে কোনও নূতন কথা বলেন কিংবা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি কোনও উত্তর দেব না।

—কী বলব আমি ? কী সন্দেহ করছেন আপনি ?

—আপনি নীরাজিতার উপর রাগ করে এখুনি একটা হিরোয়িক কাণ্ড যদি করতে চান...

—নীরাজিতার ওপর রাগ ভুলে গিয়েছি ; বিশ্বাস করুন।

প্রতিভা হাসে—বিশ্বাস করলাম।

—তা হলে তোমার আপত্তি করবার কী আছে ?

চমকে ওঠে প্রতিভা—মাপ করবেন।

—তা হলে বলো চরিত্রহীনকে তুমি ঘেন্নাই কর।

—না।

—ভয় কর।

—না।

—তবে ?

—আমার কথা তুলছেন কেন ? আমার কথা আমি ভাবছি না।

—তার মানে ?

—আপনার কথা। আপনি কিছু জানেন না বলেই বোধ হয় ভয় পাচ্ছেন না, তাই হঠাৎ শুধু চোখের দেখা দেখে শিবদাস দত্তের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

—সব কিছু জানলেও বোধ হয় ভয় পাব না।

—অসম্ভব।

—না।

—নিশ্চয়।

—কেন ?

—আপনি পুরুষ।

—চরিত্র নিয়ে বড়াই করে না সেই রকম পুরুষ।

—কিন্তু স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে বড়াই করতে না পারলে মনে মনে মরে যাবেন।

—তোমার মত মেয়ে যদি স্ত্রী হয়...

—আপনি খুবই ভুল কথা বলছেন, নিশীথবাবু ; আর অনর্থক আমাকে দিয়ে বেহায়ার মত অনেক কথা বলিয়ে নিচ্ছেন।

—তুমিই ভুল করছ, প্রতিভা। তোমাকে দিয়ে তোমার কোনও ইতিহাস বলিয়ে নিতে চাই না।

শুধু বিশ্বাস করতে বলি।

—কী ?

—চরিত্রের অহংকার নেই, এমন মেয়েকেই আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

—কেন ?

— আমার চরিত্রের অহংকার নেই বলে।

মাথা হেঁট করে প্রতিভা। যেন প্রতিভার এতক্ষণের বাচালতা হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছে। লজ্জা পেয়ে নয় ; প্রতিভা দত্তের এই হেঁট-মাথার ভঙ্গিটা যেন বিচিত্র এক অভিবাদনের আবেশে হঠাৎ কোমল হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। নিশীথ রায় নামে এই ভদ্রলোকের, যাকে এক ঘন্টা আগেও চিনত না, যার নামও কোনওদিন শোনেনি প্রতিভা দত্ত, তার ইচ্ছার দুঃসাহস দেখে আশ্চর্য হতে হয়। প্রতিভা দত্ত নামে একটি মেয়ের জীবনের কোনও গৌরবের কথা, কোনও গুণের কথা শুনতে পাননি ভদ্রলোক। শুধু যে মেয়ের জীবনের এক ভয়ানক স্বীকৃতির কথা শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু তবু একটু ভয় নেই, একটুও কুণ্ঠা নেই। সেই মেয়েকেই ভালবাসতে চান। চরিত্র নিয়ে অহংকার করবার অধিকার নেই যে মেয়ের, সে মেয়ের চরিত্রটা কী রকমের, এটুকু না বুঝবার মত মূর্খ নন ভদ্রলোক। কিন্তু...তবু...কী আশ্চর্য, চরিত্রে ক্ষত আছে, শুধু এটুকু জেনেই ভালবাসার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। খামখেয়ালি ভদ্রলোক, মাথা-খারাপ ভদ্রলোক। কিন্তু বুঝতে পারে প্রতিভা দত্ত, নিজেরই বুকের দুরুদুরু চঞ্চলতার ভাষা বোধ হয় বুঝতে পারে, ভদ্রলোকের এই খামখেয়ালের দাবি যে প্রতিভা দত্তেরই জীবনের জন্য দুর্লভ এক শ্রদ্ধার ঘোষণা হয়ে বেজে উঠেছে।

প্রতিভা দত্তের চরিত্রের অহংকার মিথ্যে করে দিয়েছে যে ঘটনা, একটা-দুটো নয়, অনেক অদ্ভুত ভাষা, অদ্ভুত দৃষ্টি, অদ্ভুত চিঠি আর...একটা ভয়ানক অদ্ভুত স্পর্শ, সবই যে প্রতিভা দত্তের ভাবনা ও অনুভবের স্তরে স্তরে আজও নানা ধিক্কার, নানা আক্ষেপ আর নানা লজ্জা ছড়িয়ে রেখেছে।

এই ভদ্রলোক কল্পনাতে যত বড় একটা সন্দেহকে ধারণা করতে চেষ্টা করুন না কেন, এ ধারণা করতে পারছেন না যে, মাত্র এক বছর আগে, চরিত্রবান এক শিক্ষিত ভদ্রলোক শিবদাস দত্তের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ব্যাকুল হয়েও শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে পারেননি। বরং ভয় পেয়ে, ঘৃণা করে, এবং রাগ করে হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। শীতল সরকারের ওই অলক্তক আজ নিশীথ রায়কে যে-ধরনের ঠাট্টা আর অপমান করেছে, শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভাকেও যে প্রায় সে-ধরনেরই একটা বিদ্রূপে আহত হয়ে একদিন এই ডালিয়ার বাগানের নিভৃতে মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। এবং ওই শিবদাস দত্তও বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে আছাড়-খাওয়া ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন।

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের সব আয়োজনও ঠিক ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি চিঠি পেলেন শিবদাস দত্ত, বিয়ে করতে রাজি নন সেই ভদ্রলোক, সেই চমৎকার শিক্ষিত ইয়ংম্যান। ভদ্রলোক নিজেই অত্যন্ত শক্ত ভাষায় শিবদাস দত্তকেও ভর্ৎসনা করে চিঠি দিয়েছিলেন : আশা করি, আমার আচরণে বিস্মিত না হয়ে নিজের মেয়ের চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে সাবধান হতে চেষ্টা করবেন।

প্রতিভা দত্তের চরিত্রের কোন ঘটনার গল্প শুনতে পেয়ে বিয়ের জন্য ব্যস্ত-ব্যাকুল সেই ভদ্রলোক হঠাৎ সাবধান হয়ে গেলেন, আজও কল্পনা করতে পারে না প্রতিভা। হ্যাঁ, অসম্ভব নয়, প্রতিভা দত্তের হাতের লেখা এমন চিঠি পৃথিবীর কোথাও হয়ত আজও আছে, যে-চিঠির ভাষা প্রতিভা দত্তের চরিত্রের রূপ ধরা পড়িয়ে দিতে পারে। সন্দেহ হয়েছিল প্রতিভার, প্রায় সাত বছর আগে মধুপুরে লেখা সেই চিঠিগুলি কি ? মিথ্যে নয়, এক বিন্দুও মিথ্যে নয়, মধুপুর থেকে চিঠি পাওয়ার আশায় দিন গুনত প্রতিভা, এবং মধুপুরে চিঠি লিখতে ভাল লাগত।

জীবনের অতীতের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি আজ এই মুহূর্তে প্রতিভা দত্তের চোখের উপর দিয়ে যেন চকিত মিছিলের মত ছুটে চলে যায়। এই রাজপোখরা থেকে মোটরগাড়িতে একটানা দৌড়ে পথ পার হয়ে রাঁচি পৌঁছে হোটেল-মিরাণ্ডার বারান্দায় বসে এক পেয়ালা চা খেতে হল ; তারপর হাজারিবাগ রোড ধরে এগিয়ে গিয়ে চুটুপালু পাহাড়। পথের কত বাঁক পার হয়ে, সমস্ত খাড়াই পথটা

গাড়ির দোলানির সঙ্গে হাসতে হাসতে পার হয়ে একেবারে চুটুপালুর মাথার উপরে এসে থামতে হয়েছিল। নীচের শালবন সবুজ রঙের পাতলা বনাতের মত দেখায়। ঝরনাগুলি সরু সরু রেখার মত। শোভেন্দুর সঙ্গে সেই একটি দিনের জন্য অত দূরে বেড়াতে যেতে দিতে শিবদাস দত্তও কোনও আপত্তি করেননি। এবং আজও ভুলে যায়নি প্রতিভা, সেদিন চুটুপালুর মাথার উপরে সেগুনের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে, এবং কোনও কথা না বলে শোভেন্দু হঠাৎ প্রতিভার কাঁধে হাত রেখেছিল। ভুলে যায়নি প্রতিভা, সেদিন শিউরে উঠেছিল প্রতিভা, শোভেন্দুর হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে হয়েছিল। এবং ফিরবার পথে শোভেন্দুও প্রতিভার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। কে জানে শোভেন্দুর সেদিনের রাগ হয়ত আজও পৃথিবীর এখানে ওখানে প্রতিভার চরিত্রের নামে ভয়ানক গল্প রটিয়ে বেড়ায়!

রাজগিরে বেড়াতে যেতে হয়েছিল একবার। শিবদাস দত্ত ছিলেন ; সে সময় প্রতিভা দত্তের মা বেঁচে ছিলেন, এবং তিনিও সঙ্গে ছিলেন। আজও স্মরণ করতে পারে প্রতিভা, সেই ভদ্রলোকের নাম বিকাশ ; বিলেতে গিয়ে সার্জারির পরীক্ষায় পাশ করে এবং তিন-চারটে সোনার মেডাল নিয়ে দেশে ফিরেছে সেই বিকাশ। রাজগিরে বাড়ি ভাড়া করে বাবা মা আর অনেকগুলি ভাইবোনের সঙ্গে প্রায় একটা মাস রাজগিরে ছিল বিকাশ। সেই মস্তবড় পাথরটা, জরাসন্ধের বৈঠক, তারই কাছে রোজ সন্ধ্যায় ঘুরে ফিরে বেড়াত বিকাশ। প্রতিভাও বেড়াতে যেত ; এবং বিকাশের সঙ্গে রোজই দেখা হত। কিন্তু আলাপ হয়নি। তবু অস্বীকার করে না প্রতিভা, এবং আজও স্মরণ করতে পারে, বিকাশকে দেখতে ভাল লাগত। সন্ধ্যা হলে এক এক দিন এমন কথাও মনে হয়েছে, এতক্ষণে বোধ হয় জরাসন্ধের বৈঠকের কাছে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে বিকাশ।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, অস্বীকার করে না প্রতিভা, ইচ্ছে করে হোক কিংবা অনিচ্ছাসত্ত্বে হোক, মনটা অনেকবার উঁকি দিয়ে পৃথিবীর অনেক সুন্দর মুখ দেখেছে। কোনও কোনও দেখার অনুভব মনের কোণে রঙ ছিটিয়ে দিয়েছে। এবং সেজন্য নিজের উপর কোনও মুহূর্তে এতটুকুও রাগ হয়নি।

বুঝতে পারেনি প্রতিভা, কতক্ষণ এভাবে এক ঠাঁইতে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। ফটকের আলো পথের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে, এবং বুঝতে পারে প্রতিভা, নিশীথ রায়ও এক পা নড়েনি—যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। নিশীথের পায়ের হরিণের চামড়ার চটি একেবারে স্তব্ধ হয়ে পথের মাটির সঙ্গে লেগে রয়েছে, একটুও উসখুস করে না।

জানে না, কোনও দুঃস্বপ্নেও সন্দেহ করতে পারবে না এই নিশীথ রায়, প্রতিভা দত্তের এই শরীরের স্নায়ু ও শিরার ভিতর আজও মাঝে মাঝে যে বিদ্রূপের শিহর তপ্ত হয়ে ছুটাছুটি করে। কিন্তু এর জন্য নিজের উপর ছাড়া আর কারও উপর প্রতিভা দত্তের মনে কোনও অভিযোগ নেই। যদি ঘৃণা জাগে, সে ঘৃণা নিজেরই জীবনের একটা শুভ বিশ্বাসের প্রগল্‌ভতার বিরুদ্ধে। সেই বিশ্বাসের আনন্দকে একটু সামলে রাখবার মত মনের জোর পায়নি, সে ভুল নিজের ভুল ছাড়া আর কারও ভুল নয়।

ভালবাসতে হলে শুধু মন প্রাণ দিয়ে নয়, আরও কিছু দিয়ে ভালবাসতে হয়, এ কথা তিন বছর আগের প্রতিভা দত্তকে কেউ কানে কানে বলে শিখিয়ে দেয়নি। কিন্তু মিহির মিত্রের সঙ্গে এক বছরের চেনাশোনার পর যেন নিজেরই নিশ্বাসের মধ্যে এই কথা শুনতে পেয়েছিল প্রতিভা। কিসের অন্যায়? কেন ভুল হবে? ক্ষতি কী? যার সঙ্গে সারা জীবন আপন হয়ে থাকতে হবে, স্বামী হবে যে, মনে প্রাণে ভালবেসেছে যে, দেখা হলেই একটা চরম সান্ত্বনা পেয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় যে, তার বুকের কাছে মাথাটা এগিয়ে দিতে আপত্তি হয়নি প্রতিভার। প্রতিভা নিজেই আজ আশ্চর্য হয়ে যায়, আজকের এই ভীরু শরীরটা কেমন করে সেদিন এত দুঃসাহস পেয়েছিল? তিন বছর আগে কলকাতার বাড়িতে সেই এক বছরের জীবন যেন একটা একটানা উৎসবের মত পার হয়ে গিয়েছিল।

সেই মিহির মিত্র বিলেত চলে যাবে, কোনওদিন এরকম বিচ্ছেদের অভিশাপ কল্পনা করতে পারেনি প্রতিভা। মিহির মিত্র বিলেতে থাকতেই একটা বিয়ে করে ফেলবে, এমন আশঙ্কা কখনও

প্রতিভা দত্তের কোনওক্ষণের দুর্ভাবনার মধ্যেও দেখা দেয়নি। যেদিন প্রথম খবরটা শুনেছিল প্রতিভা, সেদিন খবরটাকে বিশ্বাসই করতে পারেনি। কিন্তু মিহির মিত্রের একটি চিঠি এসে প্রতিভা দত্তের ভুল ভেঙে দিয়েছিল। মিহির মিত্র দুঃখ প্রকাশ করেনি ; বরং যেন একটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে চিঠিটা লিখেছিল ; কিছু মনে করো না প্রতিভা, এবং বিশ্বাস করো, তোমাকে ভয় পেয়ে আমি বিলেতে পালিয়ে এসেছি এবং বিয়ে করেছি।

কিসের ভয় ? এই প্রশ্নের উত্তরও ছিল সেই চিঠিতে। প্রতিভা দত্তের চরিত্রকেই ভয় পেয়েছে মিহির মিত্র · আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি, তবু তুমি ও ভুল কেন করলে, প্রতিভা ? যেটা বিয়ের পরে হওয়া উচিত, সেটা...ছিঃ...তুমিই বুঝে দেখো, তার পর তোমার জন্য আমার মনে কোনও আগ্রহ আর থাকতে পারে কি ?

মিহির মিত্রের চিঠিটাকে একটা মাস হাতের কাছে রেখেছিল প্রতিভা। চিঠিটাকে বার বার পড়ে যেন নিজের জীবনের শেষ গর্বটাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেষ্টা করত। এবং একদিন মাঝরাতে ঘুম থেকে বিছানার উপর উঠে বসে ভূতে-পাওয়া মানুষের মত রেগে কেঁদে আর হেসে হেসে চেহারাটাকে আধমরা করে ফেলেছিল প্রতিভা। মিহির মিত্রের ভালবাসা মিথ্যে হয়ে গেল, সেজন্য নয়। মিহির মিত্র অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করল, সেজন্য নয়। নিজেকে ঘৃণা করেছিল প্রতিভা। বুকের পাঁজরগুলিতে দিনরাত একটা আতঙ্ক যেন যন্ত্রণা দিয়ে প্রশ্ন করত, চরিত্র হারালে কেন, প্রতিভা ? ছিঃ !

রাজপোখরার বাড়িতে এসে তিন বছরের মধ্যে প্রতিভা দত্তের পাঁজরভাঙা সে আতঙ্ক অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রতিভা দত্তের জীবনটাই শান্ত হয়ে গিয়েছে। একটি সত্য বুঝে নিয়েছে প্রতিভা, মানুষকে ভালবাসার নিয়ম সে জানে না। ভালবাসতে গিয়ে এত ভুল করে যে মেয়ে, পৃথিবীর কাউকেই তার আর ভালবাসতে যাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া, কাউকে ভালবাসার অধিকারও তার নেই। তার পক্ষে কারও স্ত্রী হওয়া উচিত নয়।

পৃথিবীর কারও উপর রাগ নেই, কোনও অভিযোগও নেই প্রতিভার। এমন কি, এক বছর আগে প্রতিভাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে উঠেও শেষ পর্যন্ত প্রতিভার চরিত্রকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলেন যে ভদ্রলোক তাঁর উপরেও না। সে ভদ্রলোকের অপরাধ কোথায় ? সে ভদ্রলোক যে ঘৃণার কথা চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন, সে ঘৃণা যে একেবারে রক্তমাংসের ঘটনা দিয়ে গড়া বাস্তব সত্য। কে জানে, হয়ত দূর বিলেত থেকে মিহির মিত্রের জীবনের একটা এক বছরের নিছক রোমান্সের গল্প প্রতিভা দত্তের চরিত্রটাকে ঠাট্টা করবার জন্য চারদিকে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে এই লাক্ষার দেশে, এই ম্যাঙ্গানিজ ফায়ার-ক্লে আর কেওলিনের দেশে এসে পড়েছে। ভালই হয়েছে, নিজেকে চিনতে পেরেছে প্রতিভা।

অনেকক্ষণ এইভাবে পথের উপর দাঁড়িয়ে এই নীরব ভাবনার অভিনয় করতে গিয়ে পার হয়ে গিয়েছে। আর দেরি করা উচিত নয়। চায়ের আসরে এতগুলি মানুষ অপেক্ষায় চুপ করে বসে আছে, তারাই বা কী ভাবছে ? বেণুও বোধ হয় আবার এখনি ছুটে আসবে। নিশীথ রায়কে স্পষ্টই বলে দেওয়াই ভাল, না, আর এভাবে আপনি আমাকে অকারণে পথের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না।

ভুল করছে, খুব অন্যায় করছে নিশীথ রায়। প্রতিভা দত্ত যেন জোর করে মনের ভিতর নিশীথ রায়ের চোখের চাহনি, মুখের ভাষা আর এই থমকে-থাকা শক্ত চেহারাটার উপর রাগ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টাও বোধ হয় বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ; তাই থেকে থেকে হঠাৎ কেঁপে উঠছে প্রতিভা দত্ত, এবং এতক্ষণে নিজেরই মনে একটা নতুন ভুলের রকম চোখে পড়ছে। না, নিশীথ রায়কে শুধু চা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে নয় ; প্রতিভা দত্তের প্রাণের একটা আহত গৌরবের দুঃসহ বেদনা যেন একটা আবেগে ছুটে এসে এখানে দাঁড়িয়েছে। দেখতে ইচ্ছা হয়েছে, চরিত্রহীন মানুষ সত্যিই দেখতে কেমন ? ভালবাসার মানুষের কাছ থেকে ঘৃণার আঘাতে পীড়িত হলে চোখে মুখে যে বেদনা ফুটে ওঠে, সেই বেদনাই বা দেখতে কেমন।

কিন্তু আসা উচিত হয়নি। কোনও দরকার ছিল না। আর এই বুদ্ধিমান নিশীথ রায়ের ধূর্ত প্রশ্নের

কাছে নিজেকে এমন করে ধরা পড়িয়ে দেবারও কোনও দরকার ছিল না।

—চলুন।

কথাটা বলেই আস্তে আস্তে মুখ তোলে প্রতিভা, আর যেন জোর করে মনের সব শক্তি দিয়ে নিজেকে সাবধান করে দিয়ে আবার সেই সামান্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে। —অনেক দেরি হয়ে গেল, সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

—কিন্তু তুমি আমাকে একটি কথা দাও, প্রতিভা।

—পারব না। মাপ করবেন।

—তা হলে, আমার অন্য একটা কথা শোনো।

—বলুন।

—তুমি যদি রাজি না হও...

—নীরাজিতাকে এত শিগগির ভুলে যাচ্ছেন কেন ?

—ভুলে গিয়েছি, ভুলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারব না।

—নিজেকে বৃথা কষ্ট দেবেন কেন ?

—তাই ভাল লাগবে।

—তা হলে একজনের ওপর যে ভয়ানক অন্যায় করা হবে।

—কার ওপর।

—স্ত্রীর ওপর।

—কার স্ত্রী !

—আপনার।

—আমার স্ত্রী কেউ হবে না। কোনও কালেই হবে না।

—তার মানে, আপনি বিয়ে করবেন না !

—না। শুধু তুমি যদি হও...

আঁচল তুলে চশমা-সুদ্ধ চোখ ঢেকে ফেলে প্রতিভা দত্ত। নিশীথ রায় চমকে ওঠে। —কী হল প্রতিভা।

—কিছু না।

—তবে একটি কথা বলো, প্রতিভা। হ্যাঁ কিংবা না।

—হ্যাঁ।

প্রতিভা দত্তের একটি হাত ধরবার জন্য হাত এগিয়েই হাতটাকে সামলে নেয় নিশীথ রায়, এবং ব্যস্ত হয়ে বলে, চলো।

শিবদাস দত্তের বাংলোবাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরটার ভিতরে চায়ের আসরও যেন মনে মনে আশা-নিরাশার বড় কঠিন এক দ্বন্দ্ব সহ্য করছিল। কাকিমার চোখের চেহারা দেখে মনে হয়, তিনি যেন প্রাণপণে আশা ধরবার চেষ্টা করছেন। বার বার বারান্দার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেন। আসছে কি নিশি ? সত্যিই নিশিটা একবার ভুল করেও এদিকে এসে পড়বে না কি ? যদি আসে তবে...কাকিমা আবার তাঁর মনের অদ্ভুত একটা ইচ্ছাকে যেন জোর করে সাহস দিতে থাকেন। কেন, সম্ভব হবে না কেন ?

কিন্তু নিশীথ আসছে না। আসবে বলে মনে হয় না। প্রতিভার অনুরোধও কি ব্যর্থ হয়ে গেল ? নিশিটার যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে, যদি ভদ্রতাবোধ থেকে থাকে, তবে প্রতিভার অনুরোধ রক্ষা না করে থাকতে পারবে না। মেয়েটা নিজেই গিয়েছে নিশিকে ডেকে আনবার জন্য ; নিশিরও তো একটু বোঝা উচিত।

চায়ের আসরে কাটা-ফলে সাজানো ডিশগুলি চুপ করে পড়ে আছে। কেক-বিস্কুটের একটা স্তূপ, পাঁউরুটির স্লাইসের দুটো স্তূপ, আর দুটো প্লেটের উপর মাখনের দুটো বড় চাকা, সবই যেন অপেক্ষায় থেকে থেকে প্রায় হতাশ হয়ে মিইয়ে আসছে।

শিবদাস দত্ত গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে কোমরে ন্যাপকিন জড়িয়েছেন। এবং জেঠামশাইয়ের

আপত্তি অগ্রাহ্য করে নিজের হাতেই লুচি ভেজে ও আলুর দম রেঁধে ফেলেছেন। —আপনারা যখন দয়া করে এতটা সময় থেকেই গেলেন, তখন কি শুধু আর চা-বিস্কুট দিয়ে আপনাদের...না, সে হতে পারে না। আপনি জানেন না, আমি একটি ওস্তাদ রাঁধিয়ে এবং আমার রান্নার সুনাম আছে।

কাকিমা হেসে হেসে আপত্তি করেছিলেন। —যদি নিতান্তই লুচি আলুর দম খাওয়াতে চান, তবে আপনি কেন...

শিবদাস দত্ত বলেন—প্রতিভার কথা বলছেন ? হাসালেন। ও মেয়ে রান্নাবান্না জানেই না ; তা ছাড়া, আমার মত ভাল রাঁধতে ওর সাধ্যি কী। ও তো দূরের কথা, ওর মারও কোনওদিন সাধ্যি হয়নি।

কাকিমা হাসেন। —না না, আমি প্রতিভার কথা বলছি না। আমি বলছি, আমিই তো পারি।

—আপনার হাতের রান্না খাবার সৌভাগ্য অস্বীকার করব না। মাথা পেতে স্বীকার করব। কিন্তু আজ নয়। আজ আমি আমার হাতের রান্না আপনাদের খাওয়াবার সৌভাগ্য ছেড়ে দেব না।

শিবদাস দত্তই বাড়ির ভিতরের বারান্দায় একটা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আর স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করেছেন। সত্যিই আধ ঘন্টার বেশি সময় নেননি শিবদাস দত্ত। শিবদাস দত্তের কাণ্ড দেখে জেঠামশাই, কাকিমা আর বেণুর হাসাহাসি থামতে না থামতেই লুচিভাজার গন্ধে ভরে গেল বাংলোবাড়ির বাতাস।

বেণুর হাত ধরে প্রতিভা চলে যাবার পরেই কাকিমার মনটা যেন একটা আশার চমক সহ্য করতে গিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে অনেক কথা ভেবে ফেলেছে। এমন কি একবার জেঠামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসাও করে ফেলেছেন কাকিমা, চক্রবর্তী মশাই গেলেন কোথায় ?

ড্রাইভার মুনিরাম বলে, এই রাজপোখরাতেই আছেন ; কালীমন্দিরের সেবাইত উনকা কুটুম আছেন।

প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়েও শুধু একটি কথা ভেবেছেন কাকিমা। কাকিমার মনের ভিতরে যেন একটা জেদ বার বার মুখর হয়ে কাকিমার ভাবনাকে আরও বিচলিত করে তুলেছে। বেশ মেয়ে ; বেশ সুন্দর মেয়ে। শীতল সরকারের মেয়েটা কি দেখতে প্রতিভার চেয়ে ভাল ? কখনওই না। এ মেয়ের সঙ্গে যদি দুটো ভাল কথা না বলতে পারে নিশি, তবে বুঝতে হবে, নিশির চোখ নেই। তা ছাড়া, শীতল সরকারের ও তার মেয়ের এরকম ভয়ানক অমানুষিক ব্যবহারের পর আর ওদের কথা মনে রাখবারই বা দরকার কি নিশির ?

জেঠামশাইয়ের মনটা যেন ভার হয়ে রয়েছে, সেটা তাঁর চোখ দেখলেই বোঝা যায়। মাঝে মাঝে হাসছেন বটে, এবং শিবদাস দত্তের প্রীতি, ভদ্রতা আর অকপট ব্যবহারের রকম দেখে বেশ খুশি হয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু শীতল সরকারের অদ্ভুত ব্যবহারের আঘাতটা সহ্য করতে গিয়ে যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন জেঠামশাই। তাঁর মনের ইচ্ছাও মাঝে মাঝে দু-একটা হঠাৎ প্রশ্নের মধ্যে যেন তাঁরও একটা আশার দুঃসাহস ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। কাকিমার মুখের দিকে তাকিয়ে জেঠামশাইও বলেছেন, শিবদাসবাবুর মেয়ে, এই প্রতিভার মত মেয়ে...বাস্তবিক...ওর মুখের একটি কথা শুনেই আমি বুঝে ফেলেছি, এ মেয়ের মন যেন...যাকে বলে সোনার খনি।

জেঠামশাইও বার বার বারান্দার দিকে তাকিয়েছেন। তাঁরও চোখে ওই একই প্রশ্ন—নিশি আসছে কি ? আসবে তো নিশি ? প্রতিভার অনুরোধের দাবি ঠেলতে না পেরে নিশি যদি এখানে চায়ের আসরে এসে বসে, তবে...তবে অন্তত এইটুকু বোঝা যাবে যে, একেবারে হতাশ হবার কোনও কারণ নেই।

শিবদাস দত্ত তাঁর কোমরের ন্যাপকিন খুলে রেখে চাদর গায়ে দিয়ে চায়ের টেবিলের কাছে একটি চেয়ারে বসেন। এবং টেবিলের উপর সাজানো খাবারের স্তূপের দিকে তাকিয়ে তৃপ্ত হয়ে বলেন—যাক, আপনারা যে আমাকে এই সামান্য ভদ্রতাটুকু করবার সুযোগ দিলেন ডাক্তারবাবু, তার জন্যে আপনাদের সহস্র ধন্যবাদ।

জেঠামশাই বলেন—আমাদের ধন্য করে দিলেন বলুন।

শিবদাসবাবু হঠাৎ গম্ভীর হন। —না ডাক্তারবাবু। আপনারা জানেন না, আজ আপনাদের একটু

আপ্যায়ন করে আমি আমার একটা ভয়ানক দুঃখকে শান্ত করবার সুযোগ পেয়েছি।

জেঠামশাই আশ্চর্য হন। —আপনার দুঃখ ? আপনার মত মানুষকেও ভগবান দুঃখ দেন কেন, জানি না মশাই !

শিবদাস দত্ত হাসেন। —ঠিক আপনারা আজ অকারণে যে দুঃখটা পেলেন, প্রায় সেইরকম একটা দুঃখ।

—তার মানে ? জেঠামশাইয়ের গম্ভীর চোখের দৃষ্টি হঠাৎ তীব্র হয়ে ওঠে।

শিবদাস দত্ত বলেন—প্রতিভা এখন সামনে নেই তাই বলছি। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, মশাই। মেয়েটার বিয়ের সব ব্যবস্থা ঠিক করা হয়েছে। বেশ ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। যেদিন বিয়ে হবার কথা, ঠিক সেদিনই সকালবেলা ছেলেটির কাছ থেকে একটা ভয়ানক চিঠি পেলাম, বিয়ে করতে সে রাজি নয়।

—কেন ? ছেলেটার এরকম মাথা খারাপ হল কেন ? রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন কাকিমা।

শিবদাস দত্ত হাসতে হাসতে চাদর তুলে চোখ দুটো বেশ ভাল করে ঘষে নিয়ে বলেন—মাথা খারাপই হয়েছিল বোধ হয়, নইলে ওরকম চিঠি লিখতে পারত না। যাই হোক, আমিও একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছি।

—কী রকম ? প্রশ্ন করেন জেঠামশাই।

—তার মানে মেয়েটাই নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে।

—বুঝলাম না, শিবদাসবাবু।

—মেয়েটা বিয়েই করবে না ! আমিও বলি, তাই ভাল।

কাকিমার মুখটা করুণ হয়ে ওঠে। —এ কী বলছেন ? এরকম জেদের কোনও অর্থ হয় না। এ তো চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া।

শিবদাসবাবু হাসেন। —যাই হোক, তাই বলছি, আপনারাও কিছু মনে করবেন না। শীতলবাবু ভয়ানক ভুল করলেন মনে হচ্ছে, এবং আপনাদেরও মনের উপর একটা আঘাত লাগল ; কিন্তু সেজন্য বিমর্ষ হয়ে পড়বেন না। ...হ্যাঁ, আপনাদের ছেলেটির কী যেন নাম ?

—নিশীথ।

—হ্যাঁ, নিশীথেরও উচিত এসব ভুলে গিয়ে, বেশ খুশিমনে আবার...অর্থাৎ রাগ করে চিরজীবন নিজেকে ঠকিয়ে রাখবার কোনও অর্থ হয় না।

হেসে ফেলেন কাকীমা। —আপনাকেও তো ঠিক এই কথাই আমরা বলেছি।

—আজ্ঞে ?

—প্রতিভা বিয়ে করবে না কেন, এবং আপনিই বা প্রতিভার বিয়ে দিতে উৎসাহ বোধ করবেন না কেন ?

শিবদাসবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলেন—আমাব কথাগুলি কেমন যেন হয়ে গেল মনে হচ্ছে। আপনাদের কাছে বোধ হয় খুব বাজে কথা বলে মনে হচ্ছে...কিন্তু ব্যাপার কী জানেন, আমি সত্যিই বড় ভয় পেয়েছি, ডাক্তারবাবু।

শিবদাসবাবুর মুখের সেই বেদনার দিকে তাকিয়ে জেঠামশাই ও কাকিমা দুজনেই বেদনাহতের মত স্তব্ধ হয়ে যান। নিশীথকে ডাকতে গিয়েছে প্রতিভা ; এবং এখনও দুজনের একজনও আসছে না। কী এত কথা বলছে প্রতিভা ? কী এত কথা বলছে নিশি ? দুজনে বোকার মত একটা বাজে তর্ক বাধিয়ে ঝগড়া করছে না তো ? ভগবান জানেন ! কিন্তু যদি ঝগড়া-টগড়া বা বাজে তর্ক না করে থাকে, যদি একটু বুঝে দেখে যে, ওদের দুজনের জীবনে একটা মিল আছে, একটা দুঃখের মিল, তবে দুজনের জন্য দুজনেরই মনে কি কোনও মায়াও দেখা দেবে না ? বেচারা শিবদাস দত্তের এই স্যাঁতসেঁতে চোখ দুটো এখনই হেসে উঠতে পারে, যদি শোনা যায় যে...

কে এল ?

না, নিশি নয়। প্রতিভাও নয়। হঠাৎ এসে চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েছে বেণু। কাকিমা বলেন—নিশি আসবে না ?

বেণু চিন্তিতভাবে বলে—আসবে বোধ হয়।

—প্রতিভা কোথায় ?

বেণুর মুখটা যেন দুশ্চিন্তার বাধা তুচ্ছ করে হঠাৎ হেসে ওঠে।—প্রতিভাদির সঙ্গে বড়দার তর্ক শুরু হয়েছে।

শিবদাসবাবুব বিব্রতভাবে বলেন—তর্ক ? ছিঃ, এসব প্রতিভার খুবই অন্যায়...আমি যাচ্ছি।

জেঠামশাই ও কাকিমা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন—না না না। আপনি যাবেন না।

—নিশীথ বেচারার মন একে তো লজ্জিত ও দুঃখিত, তার ওপর যদি কেউ গিয়ে তর্ক করে বেচারাকে বিরক্ত করে, তবে...আমিই একবার যাই, ডাক্তারবাবু।

জেঠামশাই হাসেন—আপনি কেন যাবেন ?

—নিশীথের চা আর খাবার পৌঁছে দিয়ে আসি।

কাকিমা হাসেন—না। যদি নিশি না আসে, যদি খাবার পৌঁছতেই হয়, তবে খাবার পৌঁছে দেবার লোকের অভাব হবে না। আমি আছি, চঞ্চল আছে, দেবেশ আছে।

—তা হলে আপনারা খেতে আরম্ভ করে দিন। আমি নিশীথের অপেক্ষায় থাকি।

বারান্দার উপর ছায়া দেখতে পেয়ে আর পায়ের শব্দ শুনে হেসে উঠলেন কাকিমা।—না, আপনাকে আর অপেক্ষা করতে হল না।

নিশীথ আর প্রতিভা এসেছে। নিশীথের মুখটা শান্ত ও প্রসন্ন, প্রতিভা গম্ভীর। কাকিমার মনের একটা সাধের সন্দেহ যেন খুঁটে খুঁটে দুজনের মুখের ভাবের রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন না কাকিমা। তাঁর চোখের চাহনিতে আশা-নিরাশার সেই দ্বন্দ্বই চলতে থাকে। একবার আশা হয়। এবং পরমুহূর্তে সেই আশাকেই সন্দেহ করেন। না, এত সহজে এবং তাড়াতাড়ি কিছু আশা করা যায় না। নিশীথ আর প্রতিভা, দুজনে দুটি বাচ্চা ছেলে আর মেয়ে তো নয় যে, পাঁচ মিনিটের চেনাশোনার মায়াতেই মনে-প্রাণে বন্ধু হয়ে যাবে।

জব্দ হোক শীতল সরকার ও তাঁর মেয়ের অহংকার, কাকিমার মনে এরকম একটা জেদের দাবি যে ছটফট করছিল না, তা নয়। রাজপোখরা থেকে ফিরে যাবার আগে যেন শুধু অসহায় একটা বেদনার ভার নিয়ে ফিরতে না হয়, শীতল সরকারের জন্য একটা পাল্টা বিস্ময়ের আঘাত রেখে দিয়ে চলে যেতে পারলেই ভাল ছিল ; কাকিমার কল্পনার মধ্যে প্রতিশোধ নেবার একটা কঠোর আগ্রহের দাবিও বার বার জোর করে উঠছিল ঠিকই। কিন্তু শুধু সেজন্য বোধ হয় নয়। নিশীথের হঠাৎ আহত জীবনের বেদনার দাগটাকে এই মুহূর্তে মুছে দিয়ে, ছেলেটাকে হাসিয়ে আর সুখী করে ফিরিয়ে নেবার জন্য মনের ভিতর একটা মায়ার দাবিও বার বার জোর করে উঠছিল। কিন্তু শুধু সেজন্যও বোধ হয় না। প্রতিভা মেয়েটাকে দেখতে বড় ভাল লেগেছে, একটু মায়াও পড়ে গিয়েছে ঠিকই। এটাও একটা কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নিশ্চয় নয়, যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে পড়ে আশা করতে চেষ্টা করছেন কাকিমা, আজই এই মুহূর্তে প্রতিভারই সঙ্গে নিশীথের বিয়ে হয়ে যাক না।

কাকিমার এই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেলে তিনি দুঃখিত হবেন নিশ্চয়। কিন্তু সে দুঃখ ভুলে যেতেও পারবেন। এক মাস দু মাস বা দু বছর পরে, একদিন না একদিন পৃথিবীর কোনও মেয়ের সঙ্গে নিশীথের বিয়ে হয়ে যাবে। নীরাজিতার চেয়ে অনেক সুন্দর ও অনেক ভাল মেয়ের সঙ্গে, এবং হয়ত এই প্রতিভার চেয়েও ভাল মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে নিশীথের। নিশীথের জন্য দুঃখ করবার এবং শীতল সরকারকে জব্দ করবার কথা চিন্তা করবার আর কোনও দরকার হবে না। কিন্তু...কাকিমা বার বার তাকিয়ে দেখতে থাকেন, এবং জেঠামশাই দু-একবার অপলক চোখ নিয়ে দেখতে থাকেন, শিবদাস দত্তের ওই স্যাঁতসেঁতে চোখ, বার বার চাদর দিয়ে ঘষে যে চোখ দুটোকে লাল করে ফেলেছেন ভদ্রলোক। কে জানে কোন অভদ্রর কাছ থেকে হঠাৎ একটা অপমানের মার খেয়ে ভদ্রলোকের জীবনটাই আতঙ্কে ভরে গিয়েছে ! মেয়ের বিয়ে দেবার কথা ভাবতেই ভয় পান। মেয়ের বিয়ে হবে না বলেই মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। তার মানে, সেই অপমানের দুঃখটাকেই চিরস্থায়ী করে মনের মধ্যে পুষে রেখে চোখ দুটোকেই স্যাঁতসেঁতে করে রেখেছেন।

শিবদাস দত্তের ওই চোখের সজলতা একেবারে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আর হাসিয়ে দিতে পারা

যায় না কি ? ভগবান কি সহায় হবেন ? যে কথা ভাবেন জেঠামশাই, সেই কথা ভাবেন কাকিমা। শিবদাস দত্তের মত একটি সরল প্রাণের মানুষ সুখী হবে, অন্তত এইজন্য প্রতিভার সঙ্গে নিশীথের বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে যান কাকিমা। না, ও মেয়ের মুখটা বড় বেশি বিষণ্ণ। বোধ হয় মানুষকে বিশ্বাস করবারই সাহস হারিয়েছে এই মেয়ে।

চা ও খাবারের সৎকার শুরু হয়। শিবদাস দত্ত টেবিলের এদিকে ওদিকে ঘুরে চেঁচামেচি করেন। চঞ্চল আর দেবেশের ডিশে গাদা গাদা লুচি ঢালতে থাকেন। প্রতিভাও টেবিলের এক দিকে টি-পট ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং কাকিমা দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে যান, নিশীথও কোনও সংকোচ না করে, বরং চঞ্চল ও দেবেশের সঙ্গে গল্প করতে করতে বেশ আগ্রহের সঙ্গে হাত চালিয়ে খাবার খেয়ে চলেছে।

কাকিমার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলে বেণু। চমকে ওঠেন কাকিমা। কিন্তু বেণু যেন ভয়ানক আবদারের আবেগে দুরন্ত হয়ে কাকিমাকে আঁকড়ে ধরেছে। আর দেরি কেন ? কিসের অসুবিধা ? বেণুর প্রশ্নগুলি কাকিমাকে ভয়ানক বিব্রত করছে। কাকিমা বলেন—আমাকে বিরক্ত করিস না। বাবাকে বলনা গিয়ে।

—কী ? কী বলছে বেণু ? প্রশ্ন করলেন জেঠামশাই।

বেণুও সেই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে জেঠামশাইয়ের কানের কাছে সেই ভঙ্গিতে একটা দুরন্ত আবদারের দাবি ফিসফিস করে শুনিয়ে দিতে দিতে ছটফট করতে থাকে। চমকে ওঠেন জেঠামশাই। বিড়বিড় করে বলেন—তা আমি...কী করব রে বেণু !

কিন্তু বেণু হতাশ হয় না। চুপ করে জেঠামশাইয়ের কোল ঘেঁষে বসে কি যেন ভাবে, তার পরেই উঠে প্রতিভার কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে প্রতিভার হাত ধরে।

প্রতিভা হাসে—কী বেণু ?

প্রতিভার কানের কাছে কী যেন বলতে চায় বেণু। প্রতিভাও হেসে হেসে মাথাটাকে অনেকখানি নামিয়ে বেণুর মুখের কাছে কান পাতে। চমকে ওঠে প্রতিভা। এবং প্রতিভার মুখের সেই হাসি যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে কালো হয়ে যায়। প্রতিভার গলার স্বর এবং মুখের ভাষাও ভীরু স্বপ্নের ভাষার মত বিড়বিড় করে। —আমাকে এসব কথা বলতে নেই, বেণু।

—তবে কাকে বলব ?

প্রতিভার প্রাণটা যেন আরও ভয়ানক একটা প্রশ্নের শব্দ শুনতে পেয়েছে। উত্তর দিতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আর টি-পট ছুঁয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে, বাগানের ডালিয়ার উপর বারান্দার বাতির আলো ছড়িয়ে পড়েছে, অল্প হাওয়ায় ডালিয়াগুলির রঙিন শোভা দুলছে।

প্রতিমার মুখের এই নীরবতাও বেণুকে হতাশ করতে পারে না।

আস্তে আস্তে টেবিলের আর-এক দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশীথের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় বেণু !—বড়দা !

—কী ?

নিশীথের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বেণু।

হেসে ওঠে নিশীথ। সঙ্গে সঙ্গে কাকিমার মনের সব আশা যেন তাঁর দুচোখ ছাপিয়ে হেসে ওঠে। এমন কী জেঠামশাইয়ের মুখের গম্ভীরতাও হঠাৎ ফিকে হয়ে যায়।

বেণুর পিঠে হাত বুলিয়ে নিশীথ হাসে। —বেশ ভাল মেয়েটির মত এখন তুমি চুপটি করে বসে থাকো তো, বেণু ?

কিন্তু বেণু চুপটি করে বসে না। বেণুর মনের ভিতরেও যেন একটা দুরন্ত জেদ আকুল হয়ে উঠেছে। রাগ করে বেণু—না, কখ্‌খনও চুপটি করে বসব না। তোমার কোনও কথা শুনব না।

নিশীথের একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বেণুও তার আশার দাবিকে একেবারে বিদ্রোহের ভঙ্গিতে ব্যক্ত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

হেসে ওঠেন শিবদাস দত্ত—কী হল ? বেণু-মা এত রাগ করে কেন ?

বেণু চেঁচিয়ে ওঠে—প্রতিভাদির বিয়ে হবে কবে ?

—আঃ—সত্যিই, আস্তে একটা আক্ষেপ করে ওঠেন জেঠামশাই। বোকা মেয়েটা কী সাংঘাতিক

একটা কথা মনের ঝোঁকের ভুলে বলে ফেলেছে। কাকিমাও বিব্রত বোধ করেন। এবং ঠিকই, যা আশঙ্কা করেছিলেন দুজনে, তারই প্রমাণ দেখতে পান। হো-হো করে হেসে উঠলেন শিবদাস দত্ত, এবং চাদর তুলে জোরে জোরে চোখ ঘষলেন।

চঞ্চল আর দেবেশকে আরও দুবার লুচি আলুর দম সেধে দিয়ে শিবদাসবাবু এইবার চেঁচিয়ে তাঁর আর একটি অপরাধের জন্য মার্জনা চাইতে থাকেন।—নিজের মনের বাতিক মেটাবার জন্য আপনাদের তো এতক্ষণ আটক করে রেখে রাত করে দিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আপনাদের একটা দুর্ভোগে ফেললাম।

—কিসের দুর্ভোগ ?

—ধরুন, এখন যদি রওনা হন তবে টাটা পৌঁছতে পৌঁছতে...

—আজ আর রাত করে টাটা পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে নেই। আমরা মাঝপথেই আজকের রাতটার মত রেস্ট নেব।

—মাঝপথে মানে ?

—সিনির কাছাকাছি। নিশীথের ছেলেবেলার এক বন্ধু থাকে সেখানে। তার বেশ বড় কোয়ার্টার আছে। সে বেচারা কাজের চাপে পড়ে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেনি...অবিশ্যি না এসে ভালই হয়েছে। শীতলবাবুর অদ্ভুত ব্যবহারের রকম দেখে আমাদের মত ওর আর দুর্ভোগ ভুগতে হল না।

কাকিমা হাসেন—এলে অবিশ্যি আপনার লুচি আলুর দমের আনন্দ বেশ ভাল করে ভোগ করে যাবার সৌভাগ্য হত সে বেচারার।

শিবদাসবাবু বললেন—আর একটা অনুরোধ করতে চাই, যদি সাহস দেন তো বলি।

জেঠামশাই হাসেন—নির্ভয়ে বলুন।

—আজকের রাতটাব মত এখানেই যদি থেকে যেতেন, তবে...

—আপনাকে সত্যিই এবার একটু ভয় করতে হচ্ছে, শিবদাসবাবু। আপনি আর এসব অনুরোধ করবেন না। আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে অনেক উপদ্রব করলাম ; এবার আমাদের বিদায় দিয়ে খুশি হয়ে যান।

—মাঝরাত্রিতে হঠাৎ বন্ধুর বাড়িতে উঠলে, সে বন্ধু যতই বন্ধু হোক, তাকে একটু অসুবিধায় ফেলা হয়, এবং নিজেদেরও কষ্ট পাওয়া হয় না কী ?

—নিশীথের বন্ধুটি সেরকম বন্ধু নয়। প্রাণের বন্ধু বলতে যা বোঝায়, তাই। বিভূতির মত ভাল ছেলে খুব কম দেখা যায়।

—বিভূতি ? প্রশ্ন করেই শিবদাস দত্তের চোখের দৃষ্টিটা থমকে থাকে। আর, প্রতিভা দত্তের চোখ দুটো আশ্চর্য হয়ে হঠাৎ কেঁপে ওঠে।

—খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজে কাজ করে বিভূতি। সিনির কাছে ওর একটা অফিস আর কোয়ার্টারও আছে। বিভূতির বাবা যোগেশ এখন বেঁচে নেই ; যোগেশও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বিভূতিও তার বাপের জীবনের সবচেয়ে বড় 'গ্লোরি' যেটা ছিল, সেটা সম্পূর্ণভাবে পেয়েছে।

শিবদাসবাবু যেন আর্তনাদ করেন—কী সেটা ?

—নিখুঁত চরিত্র, স্টেনলেস স্টিলের মত চরিত্র। নিশীথও কতবার আশ্চর্য হয়ে বিভূতির কত সুখ্যাতির গল্প আমাদের কাছে করেছে। তাতেই বুঝেছি যে ওরকম নিখুঁত চরিত্রের ছেলে হয় না।

শিবদাসবাবু বলেন, এই বিভূতির সঙ্গেই প্রতিভার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল, আর বিভূতিই চিঠি দিয়ে...

প্রতিভা দত্তের ছায়াটা ছটফট করে ওঠে। চায়ের আসর থেকে আস্তে আস্তে যেন আলগা হয়ে, তারপর একেবারে ঘর ছেড়েই চলে যায় প্রতিভা। জেঠামশাই আর কাকিমা শিবদাস দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। যেন বোবা হয়ে গিয়েছেন, বোকা হয়ে গিয়েছেন, নিজেদের মুখরতার লজ্জায় মনে মনে মরে গিয়েছেন দুজনেই।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ। চায়ের আসর থেকে সরে গিয়ে বাইরের বারান্দার উপরে দাঁড়ায়। তারপর প্রায় চেঁচিয়ে, একটা কঠোর স্বরে চাপা আক্রোশ চাপতে না পেরে ডাক দেয়

নিশীথ, একবার শুনে যাও, কাকিমা।

বিচলিত হন, একটু আতঙ্কিতও হন কাকিমা, এবং সেই সঙ্গে যেন একটা আশার সাহসও কাকিমাকে ব্যস্ত করে তোলে। নিশীথের ডাকটা যেন দুঃখ রাগ ও যন্ত্রণার একটা গম্ভীর প্রতিধ্বনির মত বেজে উঠেছে।

কাকিমা উঠে গিয়ে নিশীথের কাছে এসে দাঁড়াতেই নিশীথ বলে, এখনি কি একটা বিয়ের ব্যাপার হয়ে যেতে পারে না ?

কাকিমা চমকে ওঠেন, বিয়ে ! তুই প্রতিভাকে বিয়ে করতে চাস ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু প্রতিভা কি...

—প্রতিভা রাজি আছে। কিন্তু এখনই বিয়ে করতে রাজি হবে না বোধ হয়।

—খুব হবে। খুব হবে। রাজি করিয়ে ছাড়ব—বলতে বলতে প্রায় ছুটে চলে গেলেন কাকিমা। এবং বারান্দা থেকে নেমে ডালিয়া-বাগানের রঙিন ভিড়ের আশেপাশে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতে থাকে নিশীথ। চোখ তুলে দেখতেও পায় নিশীথ, রাজপোখরার আকাশের মেঘের ঘটাই একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছে। কোথায় ঝড় আর কোথায় বিদ্যুৎ ? খোলা আকাশের এক দিকে এক টুকরো চাঁদ ঝকঝক করছে।

বেণু ছুটে গিয়ে প্রতিভার হাত সেই যে ধরল, ধরেই রইল। হাত ছাড়ল তখন, যখন প্রতিভা বলতে বাধ্য হল, হাত ছাড় বেণু, নইলে সাজব কী করে ?

চক্রবর্তী মশাইকে ডাকবার জন্য মুনিরামকে গাড়ি নিয়ে ছুটিয়ে দিয়ে জেঠামশাই সেই যে বারান্দার উপর দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়েই রইলেন, যতক্ষণ না চক্রবর্তী মশাইকে নিয়ে মুনিরাম ফিরে এল।

শিবদাস দত্ত চেয়ারের উপর বসে সেই যে ফুঁপিয়ে উঠলেন, তারপর থেকে চাদর দিয়ে চোখ ঘষতেই থাকেন ; হেসে উঠলেন তখন, যখন কাকিমা এসে কাছে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিলেন, আপনার কিছু ভাবতে হবে না ; আমরাই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

তবু পায়ে চটি, পায়জামা পরা আর গেঞ্জি গায়ে সেই চেহারার উপরেই চাদর ফেলে দিয়ে বাইরে বের হয়ে গেলেন শিবদাস দত্ত ; এবং ফিরে আসতে আধ ঘন্টাও সময় নিলেন না।

একে একে, রাজপোখরার আকাশের টুকরো চাঁদের আলোতে পথের ঝাউয়ের ছায়া পার হয়ে শিবদাস দত্তের ডালিয়া-বাগানের ধারে এসে দাঁড়ালেন যাঁরা, তাঁদের পরিচয়ও পেলেন জেঠামশাই। এসেছেন রাজেনবাবু আর জ্যোতিবাবু ; হরবংশবাবু আর মিসেস ফস্টার। জ্যোতিবাবুর স্ত্রী এসেছেন ; তাঁর সঙ্গে অভয়া আর মঞ্জুলিকাও এসেছে। রাজেনবাবুর বড় ছেলে মাধবও এসেছে। মিসেস ফস্টার প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া হাতে নিয়েই চলে এসেছেন। হরবংশবাবুর হাতে রঙিন শাড়ির প্যাকেট দেখা যায়।

অভয়া আর মঞ্জুলিকার চটপটে হাতে উঠোনের উপর প্রকাণ্ড একটা আলপনা আঁকা হতেই বা কতক্ষণ লেগেছিল ? দেরি হয়নি। কোনও কাজেরই দেরি হয়নি। মাধব তিনবার বাইরে দৌড়ে গিয়ে তিনবার ফিরে আসে ; এবং একা হাতেই চা তৈরি করে আর খাবার পরিবেশন করে। রাজপোখরার ইতিহাসে এক অদ্ভুত হঠাৎ-উৎসবের সব ব্যস্ততাকে মিষ্টি করে দিতে মাধবেরও এক ঘন্টার বেশি সময় লাগেনি।

বিয়ে যখন শেষ হয়েছে, কাকিমা যখন প্রতিভার সিঁদুর-আঁকা কপালটার দিকে তাকিয়ে হেসে-কেঁদে প্রতিভার গলা জড়িয়ে ধরেছেন, যখন উৎসবের মুখরতা একটু শান্ত হয়েছে আর মিসেস ফস্টার নবদম্পতিকে 'ব্লেসিং' জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন, তখন শিবদাস দত্তের বাড়ির ফটকের কাছে একজন আগন্তুকের ছায়া এগিয়ে আসে। ছায়াটা ফটক পর্যন্ত এসে যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে থমকে যায়।

শিবদাস দত্ত ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে ডাক দেন—আসুন, আসুন শীতলবাবু।

শীতলবাবুর ছায়া আতঙ্কিতের মত সেই মুহূর্তে সরে গিয়ে, এবং প্রায় ছুটে পালিয়ে যায়।

অলক্তকের মানুষগুলি ফিরে এসেছে ? শিবদাস দত্ত বোকার মত এবং ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে

তাকিয়ে দেখতে থাকেন, ফিরে এসেছে বোধ হয়। তা না হলে অলক্তকের জানালায় আলো ফুটে উঠবে কেন ?

সেই মুহূর্তে পটপট করে, যেন একটা অন্ধকারের ধিক্কারে আহত হয়ে অলক্তকের আলোগুলি নিবে যায়।

লাক্ষানগর রাজপোখরার ঝাউয়ের মাথায় যখন সকালবেলার রোদ ঝলমল করে, তখন অলক্তকের বন্ধ দরজা ও জানালাগুলি আস্তে আস্তে খুলতে থাকে। ততক্ষণে অলক্তকের বাইরের বারান্দাকে ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে দিয়েছে মালী। সেই আলপনার এক কণিকা সাদা গুঁড়োও আর বারান্দার কোথাও নেই। ফটকের আমপাতার ঝালরও অদৃশ্য হয়েছে।

ঘরের ভিতরে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে শীতল সরকারের ক্লান্ত চোখের দৃষ্টিও আর কোনও আতঙ্কে ছটফট করে না। দূরে দলমা পাহাড়ের মাথা রোদে ছেয়ে গিয়েছে। আর নিকটে শিবদাস দত্তের বাংলোর ডালিয়াবাগানও শান্ত হয়ে গিয়েছে। কাল রাতে যেন একটা বিচিত্র খেয়ালের মাতলামিতে পাগল হয়ে শিবদাস দত্তের বাগানের ডালিয়াগুলি হেলে-দুলে কী না কাণ্ড করেছে ?

বাড়ির সবাইকে, সেই সঙ্গে নীরাজিতাকেও আদ্রা স্টেশনের ওয়েটিং-রুমের ভিতরে কয়েক ঘণ্টার অস্বস্তিকর অপেক্ষার বন্ধন থেকে মুক্ত করে কলকাতার ট্রেনে চড়িয়ে দেবার পর, হাঁপ ছেড়েছিলেন শীতলবাবু। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তার পর নিজে সেই ওয়েটিং রুমের ভিতরে একা একা বসে, ঘুমিয়ে সারা দুপুর বিকেল আর সন্ধ্যা পার করে দিলেন। রাত দশটার আগে রাজপোখরা আর ফিরবেন না, সেই অনুযায়ী হিসেব করে ঘন্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করে রাত দশটার কিছু পরেই রাজপোখরা ফিরেছিলেন শীতল সরকার। যা আশা করেছিলেন, তাই দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। শীতল সরকারকে অপ্রস্তুত করবার জন্য, উদ্বিগ্ন করবার জন্য, বিপদে ফেলবার জন্য সাকচির ডাক্তার হরদয়ালবাবু কোনও প্রতিশোধের মূর্তি ধরে ঝাউয়ের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে নেই। কেউ নেই। ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ন, পীড়িত বা ব্যথিত কোনও ছায়া পথের উপর ঘুরে বেড়ায় না। অলক্তকের বন্ধ ফটকের মস্তবড় তালাটা দেখতে পেয়ে ওদের পক্ষে ব্যাপারটা বুঝতেও কোনও অসুবিধা হয়নি। তা ছাড়া, শিবদাস দত্তকেও বলে রাখা হয়েছিল, যদি ওরা রাগ করে কোনও অশোভন কাণ্ড বাধিয়ে তোলে, তবে শিবদাস দত্ত যেন সোজা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, কেন, আব কিসের জন্য অলক্তকের মন ভয় পেয়ে, ঘৃণা আর রাগ করে এই বিয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছে।

অলক্তকের ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে, জানালা দিয়ে মুখ বের করে রাজপোখরার সেই আকাশের দিকে নিশ্চিন্ত মনে তাকিয়েছিলেন শীতল সরকার, যে আকাশে তখন আর মেঘ ছিল না, বিদ্যুতের চমকও ছিল না। বরং, পরিষ্কার আকাশটা টুকরো চাঁদের আলোতে ঝলমল করছিল।

শীতল সরকারের চোখ দুটো চমকে উঠল তখন, যখন শিবদাস দত্তের বাংলোর দিকে চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ ছুটে চলে গেল। ও কী ! কী ব্যাপার ? শিবদাস দত্তের ডালিয়াবাগানের উপর এত রাত পর্যন্ত আলোর হাসি ঝলমল করে কেন ? এত ছায়া ঘোরে কেন ? আর, ও রকম শান্ত আর চাপা চাপা কলরবের মিষ্টি শব্দই বা শোনা যায় কেন ?

তাই বিস্মিত হয়ে শিবদাস দত্তের বাংলোর কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন শীতল সরকার। আর, বারান্দার উপর ডাক্তার হরদয়ালবাবুর হাস্যোজ্জ্বল মূর্তিটিকে দেখতে পেয়েই চমকে উঠেছিলেন, সত্যিই যে উৎসব ! শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভার সঙ্গে কারও বিয়ে হয়ে গেল ? নিশীথের সঙ্গেই কি ?

শিবদাস দত্তের ফটকের কাছে আলো-ছায়ার মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নেরই উত্তব পেয়ে ছুটে চলে গিয়েছিলেন শীতল সরকার। এবং, কে জানে কেন, হয় রাগ করে নয় ভয় পেয়ে অলক্তকের আলোগুলিকে আবার পটাপট করে নিবিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সকাল হতেই শীতল সরকারের সেই ভয় একেবারে যেন ধুয়ে মুছে বারান্দার আলপনাটারই মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তাঁর মনেও কিছুমাত্র গ্লানি নেই। বাধ্য হয়ে হরদয়াল ডাক্তারের সঙ্গে একটা অভদ্রতা করতে হয়েছে, এইমাত্র। উপায় ছিল না। সময়ও ছিল না যে ; তা না হলে

টেলিগ্রাম করে হরদয়াল ডাক্তারকে নিশ্চয়ই জানিয়ে দিতেন শীতল সরকার, আজ বিয়ে হবে না, চিঠিতে বিস্তারিত জানাবেন পরে।

কিন্তু শিবদাস দত্ত এ কী কাণ্ড করে বসে রইলেন! ভদ্রলোক বরাবরই একটু কেমন যেন ঢিলেঢালা স্বভাবের মানুষ। যেমন কথাবার্তায়, তেমনি সাজ-পোশাকে। এবং প্রকৃতিতেও। মনের জোর বলে কোনও বস্তুই শিবদাস দত্তের প্রকৃতিতে নেই। কিন্তু নিজের মেয়ের জীবনের শুভাশুভ বিবেচনা করবার শক্তিটুকুও যে নেই, শিবদাস দত্তকে এতটা সন্দেহ করতে পারেননি শীতল সরকার। হরদয়াল ডাক্তারের ভাইপো নিশীথ রায় নামে যে ছেলের সঙ্গে প্রতিভার বিয়ে দিলেন শিবদাস দত্ত, সেই ছেলের চরিত্রের কথা জানতে পেরেও একটুও কুণ্ঠা, একবিন্দু ভয় দেখা দিল না শিবদাস দত্তের মনে?

শীতল সরকারের সম্পর্কে শিবদাস দত্তের মনে কোনও শত্রুভাব আছে, এমন অভিযোগ শিবদাস দত্তের শত্রুও করবে না। অবশ্য, শিবদাস দত্তের কোনও শত্রু আছে কিনা সন্দেহ। কাজেই, প্রতিবেশী শীতল সরকারের উপর রাগ করে, নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও একটা গায়ের জ্বালা মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে শিবদাস দত্ত, এ সন্দেহের কোনও অর্থ হয় না। শীতল সরকারের উপরে কেন, বোধ হয় এই পৃথিবীর কারও উপর রাগ করে না শিবদাস দত্ত, এবং রাগ করলেও গায়ের জ্বালা ধরে না নিশ্চয়। তা ছাড়া, গায়ের জ্বালা থাকলেই বা কী? হরদয়াল ডাক্তারের ভাইপোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে যদি কারও ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে শিবদাস দত্তের নিজেরই ক্ষতি, বিশেষ করে তাঁর আদরের মেয়ে প্রতিভারই ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি সহ্য করতে গিয়ে শিবদাস দত্তের সারাজীবনের গায়েই যে জ্বালা ধরে যাবে।

সন্দেহ হয়, হরদয়াল ডাক্তারের কথার চালাকিতে মুগ্ধ হয়ে, কিংবা নিশীথেরই সুন্দর চেহারাটার দিকে তাকিয়ে একটা ভালমানুষি মায়ায় পড়ে শিবদাস দত্ত এই কাজটা করেছেন। শীতল সরকারকে অবিশ্বাস করেছেন শিবদাস দত্ত, আর হরদয়াল ডাক্তারকেই বিশ্বাস করেছেন। ভদ্রলোকের মনে এই সন্দেহটুকুও হল না যে, ভাইপোর চরিত্র সম্বন্ধে আসল খবর জানা থাকলেও হরদয়ালবাবুর পক্ষে সেটা মুখ খুলে বলে ফেলা সম্ভব নয়, বরং দরকার পড়লে মুখ বন্ধ করে সত্য কথাটা চেপেই যাবেন।

শিবদাস দত্তের উপর একটুও ক্ষোভ জাগে না; বরং দুঃখ বোধ করেন শীতল সরকার। ভদ্রলোক তাঁর ওই ঢিলে-ঢালা স্বভাবের দোষেই এই ভয়ানক ভুল করে বসে রইলেন।

ঘরের ভিতর থেকে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে শিবদাস দত্তের ভুলের কথা ভেবে যখন মনে মনে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন শীতলবাবু, ঠিক তখন অলক্তকের ফটক পার হয়ে তাঁরই দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসেন, শিবদাস দত্ত।

হ্যাঁ, ঠিকই ধারণা করেছিলেন শীতল সরকার, শিবদাস দত্ত নিজেই আসবেন। না এসে পারবেন কেন? এতক্ষণ যে আসতে পারেননি, তার একমাত্র কারণ, এতক্ষণ ভোর থেকে এই এক ঘন্টা আগে পর্যন্ত মেয়ে-বিদায়ের ব্যাপার নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়েছিল। অলক্তকের ঘরের ভিতরে বসে শুনতে পেয়েছিলেন শীতল সরকার, শিবদাস দত্তের ডালিয়াবাগানের কাছে আবার একটা কলরব বাজছে। মোটরগাড়ির ইঞ্জিন গুমরে উঠছে আর হর্ন বাজছে। রাজপোখরার বাতাস থেকে ভোরবেলার এই জাগ্রত উৎসবের হর্ষ ছুটে চলে যেতেই বুঝতে পেরেছিলেন শীতলবাবু, শিবদাস দত্তের নতুন কুটুম হরদয়াল ডাক্তার সদলবলে চলে গেলেন। নীরাজিতা যে বিপদ থেকে বেঁচে গেল, সেই বিপদটাই কী ভয়ানক একটা জেদ করে, আর কে জানে কোন কৌশলে শিবদাস দত্তের মেয়েটাকে যেন একটানে লুফে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

ঢিলে পায়জামা, গায়ে গেঞ্জি, আর গেঞ্জির উপর চাদর। শিবদাস দত্ত এগিয়ে এসে শীতল সরকারের মুখের দিকে চোখ তুলে কী যেন বলতে গিয়ে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে কেঁদে ফেললেন। —প্রতিভাকে ছেড়েই দিলাম, শীতলবাবু।

—ভুল করলেন।

—অ্যাঁ, ভুল? কী ভুল হল, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন, শীতলবাবু।

—প্রতিভার উপর আপনি অন্যায় করলেন।

—কিন্তু...প্রতিভা তো...

—প্রতিভা যদি জানত যে নিশীথের চরিত্র ভাল নয়, তবে..

—জানে, জানে। আপনার কাছ থেকে শুনে আমিই প্রতিভার কাছে কথাটা বলে ফেলেছিলাম।

শীতলবাবু আশ্চর্য হন। —প্রতিভা জেনেও কোনও আপত্তি করল না ?

—কই, কোনও আপত্তির কথা তো ওর মুখে শুনলাম না !

শীতলবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বলেন—কিন্তু আপনার আপত্তি করা উচিত ছিল।

ত্রুটি স্বীকার করেন শিবদাস দত্ত। —ঠিকই উচিত ছিল ; কী আশ্চর্য, কথাটা আমার আর মনেই পড়েনি, শীতলবাবু।

—প্রস্তাবটা কি হরদয়ালবাবুই তুলেছিলেন ?

শিবদাস দত্ত বিব্রতভাবে বলেন, কই, তাও তো ঠিক মনে পড়ছে না। কে যে কখন প্রস্তাব করল, আর কার চেষ্টায় বিয়েটা হয়ে গেল, আমি ঠিক এখনও ধরতে পারছি না, শীতলবাবু।

—তা হলে অনুমান করছি, নিশীথ আর প্রতিভা দুজনে নিজেরাই ইচ্ছে করে...

—হতে পারে। আমার অপরাধের মধ্যে এই যে, ওঁরা একটু চা পর্যন্ত না খেয়ে রাজপোখরা থেকে ফিরে যাচ্ছেন দেখতে পেয়ে আমার বড় খারাপ লেগেছিল। তাই, বাধ্য হয়ে, চা খেতে নেমন্তন্ন করে ফেললাম। আর, তার পরিণাম এই হল যে, মেয়েটার বিয়েই হয়ে গেল।

চাদর দিয়ে ভেজা-চোখ ঘষে আবার ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়ে রাজপোখরার সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকেন শিবদাস দত্ত। ঝাউয়ের ছায়ার সারি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে সড়কটা খোলা ডাঙার বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে যেন ছায়ানীল দিগন্তের পায়ের কাছে গিয়ে মুছে গিয়েছে। শিবদাস দত্ত প্রশ্ন করেন, হরদয়ালবাবুর ভাইপো নিশীথ কোথায় যেন কাজ করে, জায়গাটার নামটা বলতে পারেন শীতলবাবু ?

করুণভাবে হাসতে থাকেন শীতল সরকার, সেসব খবর আমি জানি। সবই আমার কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। জায়গাটা খুব দূরদেশের কোনও জায়গা নয়। আর নিশীথের চাকরিটাও খারাপ নয়। নিশীথের বিদ্যাবুদ্ধিও যথেষ্ট। সেসব নিয়ে ভাবনা করবার কিছু নেই। প্রশ্ন হল, ওই একটি প্রশ্ন, যেটা ভাবতে গিয়ে আপনার জন্য দুঃখ বোধ করতে হচ্ছে।

শিবদাস দত্ত আবার শীতল সরকারকে আশ্চর্য করে দেন। —দুঃখ ? দুঃখ বোধ করছেন কেন ? আমি তো, বলতে গেলে, কান্নাকাটি করেও বেশ ভালই বোধ করছি, শীতলবাবু।

—নিশীথের চরিত্র যদি ভাল হত, তবে আর কিছু বলবার ছিল না। দুঃখ বোধ করতাম না।

—ও, হ্যাঁ। তা বটে। কিন্তু...কথাটা কী জানেন, চরিত্র বলতে আমি স্পষ্ট করে কিছু বুঝে উঠতে পারি না। এটাই বোধ হয় আমার চরিত্রের ভয়ানক একটা...

শীতলবাবু হাসেন—তা না হলে আর এই ভুল করবেন কেন ?

—নিশীথ কি খুব রাগী স্বভাবের মানুষ ?

—সে খবর রাখি না। মোট কথা...

—মিথ্যে কথা-টথা বলবার অভ্যাস আছে বোধ হয়।

—আরে না মশাই, ওসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার হয় না।

—তা হলে, সন্দেহ করতে হয় যে...

—সন্দেহ নয়, প্রমাণ আছে আর সাক্ষি আছে, নিশীথের চরিত্র ভাল নয়, এক মহিলার সঙ্গে নিশীথের ঘনিষ্ঠতা আছে।

—আমারও সম্প্রতি এক মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

—তার মানে ? কার সঙ্গে ?

—মিসেস ফস্টারের সঙ্গে। চমৎকার মানুষ। কদিনেরই বা পরিচয়, তাতে আবার বিদেশি মানুষ, কিন্তু আলাপ করলে একেবারে ঘরের মানুষের মত মনে হয়।

শীতলবাবু হাসেন—আপনার দোষ এই যে, আপনি পৃথিবীর সবাইকে আপনারই মত ভালমানুষ

ভাবেন।

—ঠিক কথা, শীতলবাবু। নিশীথকে দেখে মনে হল, ছেলেটি আমার চেয়েও ভালমানুষ।

—মোটেই নয়।

বিরক্ত হয়ে একবার ঘরের ভিতরে টেবিলটার দিকে তাকান শীতলবাবু। টেবিলের উপর সেই চিঠি এখনও পড়ে আছে, যে চিঠিটা কাল সকালে শীতল সরকারের হাতে পৌঁছেছিল, এবং যে চিঠির বক্তব্য পড়েই আতঙ্কিত হয়ে, নীরাজিতার অদৃষ্টের বিপদ বুঝতে পেরে, শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে সাবধান হতে পেরেছেন শীতলবাবু। ওই চিঠিটাই নীরাজিতার জীবনটাকে একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। নীরাজিতা নিজেও ওই চিঠি বার বার তিনবার পড়েছে। তার পর মনে পড়ে শীতলবাবুর, নীরাজিতা নিজেই চেঁচিয়ে উঠেছিল—আমি এখনি কলকাতা চলে যাব।

চিঠিটা যেন ছোট একটা ইতিহাসের বৃত্তান্ত। আটপৃষ্ঠার একটা রিপোর্ট। ওই চিঠির একটা পাতা পড়লেই শিবদাস দত্তের মোহ ভেঙে যাবে, এবং বুঝতে পারবেন যে, ভালমানুষি খেয়ালের ভুলে মেয়েকে তিনি কোন সর্বনাশের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ঠিক কথা, চিঠিটা নিশীথ রায়ের চরিত্রের গল্প বলতে গিয়ে যেসব কথা বলেছে, তার কোনওটাই অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। চিঠিটা যে লিখেছে, তার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোনও কারণ নেই, তার নিজের কোনও স্বার্থের অভিসন্ধিও নেই। শুধু সত্যের খাতিরে, এক নিরীহ ভদ্রলোকের মেয়ের জীবনকে একটা বিপদ থেকে সাবধান করে দেবার জন্য এই চিঠি এসেছে। এখনও ভেবে দেখতে পারেন, নিশীথ রায়ের মত মানুষের কাছে মেয়েকে সঁপে দেবেন কিনা! আপনাদের কোনও দোষ নেই, আপনার মেয়েরও কোনও ভুল হয়নি। সব না জেনে, আপনাদের শুধু বিশ্বাস করবার ভুলেই এই বিয়ে হতে চলেছে। কিন্তু গালুডির ধীরেন যে আপনাদেরই আত্মীয়। আপনারা কি জানেন না, সে কী প্রকৃতির মানুষ। আর, তার স্ত্রী সুনয়না কোন প্রকৃতির মেয়েমানুষ?

দোষ শুধু নিশীথের একার নয়। দোষ তিনজনের। ধীরেনের দোষ, সুনয়নার দোষ আর নিশীথের দোষ। সুনয়নার সঙ্গে নিশীথের যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তারপর নিশীথের পক্ষে বিয়ে করবার চেষ্টা বা ইচ্ছা না করাই উচিত ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সব জেনে-শুনেও, কেন যে নিশীথ আর এক নারীর জীবনকে একটা সমস্যার মধ্যে টেনে আনবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারছি না।

নিশীথের সাধ্য নেই, সুনয়নার ছায়া থেকে সে সরে যেতে পারে। কারণ সুনয়নাই তাকে সরে যেতে দেবে না। লজ্জার কথা, আপনার আত্মীয় ধীরেনই নিশীথকে সুনয়নার গ্রাস থেকে মুক্তি দেবে না। আপনি জানেন, ধীরেন কী বস্তু!

ধীরেন, সুনয়নার যে দশা করেছে, তাতে সুনয়নার পক্ষেও নিশীথের অমন দশা করে তোলাই স্বাভাবিক। আর নিশীথের পক্ষেও অমন দশা মেনে নিয়ে পড়ে থাকাই উচিত, বিয়ে করা মোটেই উচিত নয়।

জানেন না নিশ্চয়, আগে নিশীথই গালুডিতে গিয়ে সুনয়নার মুখের হাসি দেখে মুগ্ধ হত, সুনয়নার জীবনের অভিমান ভাঙিয়ে, আর সুনয়নাকে ভালবাসার সান্ত্বনা দিয়ে ফিরে যেত। আজকাল অধঃপতনের রকমটা আরও ভয়ানক হয়ে আরও গভীরে নেমে গিয়েছে। নিশীথ আজকাল গালুডিতে যায় না, সুনয়নাই কালিকাপুরে আসে। খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, নিশীথের কালিকাপুরের কোয়ার্টারে কতদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুনয়নাকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কালিকা মাইনস-এর কুলি কেরানি থেকে শুরু করে ডাক্তার পর্যন্ত সকলেই জানে, সুনয়নার চোখের সামনে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকে নিশীথ।

আমি জানি, সুনয়না নিজের থেকে চলে না গেলে, সুনয়নাকে চলে যেতে অনুরোধ করবার সাহস পর্যন্ত নিশীথের কোনওদিন হয়নি। সুনয়না বললেই, শত কাজ থাকলেও, পাহাড়ের ধারে একবার বেড়িয়ে না এসে পারে না নিশীথ, নিশীথের মনে শত দুর্ভাবনা থাকলেই বা কী? সুনয়না দাবি করলেই, কালিকাপুরের সেই ছোট পুকুরটা, সেই রূপসাগরের এক কোণে ঘাসের উপর বসে আর

বুনোফুলের উপর রঙিন ফড়িংয়ের খেলা দেখতে দেখতে সুনয়নার সঙ্গে গল্প করতে হয়। একদিন জ্বর হয়েছিল নিশীথের ; আমিই খবর পেয়ে নিশীথকে দেখতে গিয়েছিলাম। নিশীথের ঘরের ভিতরে ঢুকে নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছি, নিশীথের শিয়রের কাছে বসে আছে সুনয়না। আমাকেই সাবধান করে দিল—ঘরে ঢুকবেন না, নিশীথবাবুর জলবসন্ত হয়েছে।

তবে আর বাকি রইল কী ? নিশীথের বিয়ে করবার দরকারই বা কী ? পরনারীর মোহ মায়া লোভ আর সেবা নিয়ে এত জড়িয়ে পড়েছে যার জীবন, সে মানুষ আপনার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন ? জানি না, আপনার মেয়ে নিশীথকে চেনে কিনা ! চিনে থাকলেও, কতটুকু চিনেছে জানি না এবং যেটুকু চিনেছে, সেটুকু ভুল চেনা চিনেছে।

আমি পড়েছি সে সব চিঠি ; সুনয়না যেসব চিঠি নিশীথকে লিখেছে সেসব চিঠির ভাষা আর কথা এখানে উল্লেখ করে আপনাকে আর বেশি আতঙ্কিত করতে চাই না, যেটুকু জানিয়েছি, তাই যথেষ্ট বলে মনে করি। হ্যাঁ, এইটুকু শুধু না বলে পারছি না ; নিশীথ বিয়ে করে, এটা সুনয়নার একটুও পছন্দ নয়। সুনয়নার আপত্তি শুধু আপত্তি নয়, সে আপত্তি একটা উন্মাদের রাগ। যদি বিয়ে করে নিশীথ তবে নিশীথের স্ত্রী নামে সেই দুর্ভাগিনীকে চিরকালের মত সরিয়ে দেবে সুনয়না, নয় নিজে চিরকালের মত সরে যাবে। এই অবস্থায়, বুঝে দেখুন...

চিঠিটা বাতাস লেগে ফরফর করছে ; শীতলবাবু যেন তখনও চিঠিটার দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছেন, এবং শিউরে উঠছে তাঁর চোখ-মুখ। যাক, ভাগ্য ভাল, নীরাজিতা এখন নিরাপদ। এতক্ষণে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছে নীরাজিতা। কিন্তু, শিবদাস দত্তের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে শীতল সরকারের চোখ দুটো এইবার ছলছল করে ওঠে। এবং ক্ষুব্ধ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন শীতলবাবু—আপনার ওপর এবার আমার সত্যিই রাগ হচ্ছে, শিবদাসবাবু।

—আমার ত্রুটি যদি কিছু হয়ে থাকে, তবে অবশ্য...

—ত্রুটি ? আপনি প্রতিভার জীবনটাকেই নষ্ট করলেন।

শিবদাসবাবুর দুই লাল চোখ আরও ব্যথিত হয়ে থরথর করে। —বুঝলাম না শীতলবাবু।

—নিশীথ অন্য এক নারীর প্রতি আসক্ত। এবং সেই নারীও নিশীথের প্রতি আসক্ত। সবচেয়ে ভয়ের কথা এই যে, সেই নারী একটি ভয়ানক স্বভাবের মানুষ। আপনার মেয়ের প্রাণটাই নিরাপদ থাকবে কিনা সন্দেহ।

শীতল সরকারের দুই হাত জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকেন শিবদাস দত্ত। —অসম্ভব। বিশ্বাস করতে পারি না। আপনি মিছেমিছি ভয়ানক একটা সন্দেহের কথা বলছেন, শীতলবাবু।

শীতলবাবু বলেন, আপনি কি বলতে পারেন, আপনাকে মিছেমিছি ভয় দেখিয়ে আমার কোনও লাভ আছে ?

—না না ; যত ভুল কথাই বলি না কেন, আপনাকে ওকথা বলতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি একটা মিথ্যে গল্প শুনেছেন।

—না। মিথ্যে নয়, গল্পও নয়। যার কাছ থেকে এসব খবর পেয়েছি, সে যদি মিথ্যেবাদী হয়, তবে এ সংসারের সত্যবাদী কেউ নেই। যে লিখেছে, তাকে আমি তিনপুরুষ ধরে চিনি। তার ঠাকুরদাকে চিনতাম, তার বাবা আমার দাদার বন্ধু, আর তাকেও চিনি। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের ম্যানেজার মিস্টার স্টোকার নিজের মুখে আমাকে বলেছেন, বিভূতি হল আয়রন-ম্যান। অর্থাৎ...

শিবদাস দত্ত হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন, এবং শীতল সরকার বিরক্ত হয়ে বলেন, এখনও যদি স্পষ্ট করে না বুঝে থাকেন, তবে আমি আমার নিজেরই জানা একটা ঘটনার কথা বলি।

—বলুন।

—মিস্টার স্টোকারের একটি যুবতী ভাইঝি এই বিভূতির কাছ থেকে চমৎকার একটি ধমক খেয়ে শেষ পর্যন্ত ইণ্ডিয়া ছেড়েই চলে গিয়েছে।

—কেন ?

—বিভূতির চরিত্র লোহার চেয়েও শক্ত। সুন্দরী মিস স্টোকারেরও সাধ্য হয়নি যে, বিভূতিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে একটা বাজে কথা বলে।

শিবদাস দত্তের চোখে ছোট একটা ভ্রূভঙ্গি শিথিল হয়ে যেন হাসতে থাকে। —তা হলে বলুন, খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি আপনাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, নিশীথের চরিত্র ভাল নয় ?

—বললাম যে, নিশীথের চরিত্রের একটা ইতিহাস লিখে জানিয়েছে।

শিবদাস দত্তের লাল চোখের ছলছল করুণতা আর নিশ্বাসের উদ্বেগ যেন সেই মুহূর্তে হো-হো করে হেসে মরে যায়। শীতল সরকারের হাত ছেড়ে দিয়ে যেন দুর্বার এক খুশির উচ্ছ্বাস সহ্য করতে গিয়ে হো-হো করে হেসে ওঠেন শিবদাসবাবু।

শীতল সরকার ভ্রূকুটি করেন, আপনি কি সবই অবিশ্বাস করলেন ?

—খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি চিঠি দিয়েছে আপনাকে। তাই বলুন। বিশ্বাস করতেই হাসি পাচ্ছে, শীতলবাবু।

কলকাতার রেসের মরশুম পড়তেই গালুডিতে আর একটা দিনও থাকে না যে ধীরেন বোস, তারই স্ত্রী সুনয়না যেন গালুডির আলোছায়ার মধ্যে নিজের জীবনটাকে সঁপে দিয়ে বসে আছে। কলকাতায় যাবার জন্য সুনয়নার মনে কোনও ব্যাকুলতা নেই ; যদিও সুনয়নার মা আজও বেঁচে আছেন, এবং প্রায় প্রতি মাসেই একটি করে চিঠি লেখেন : অন্তত এবার পূজার সময় কলকাতায় এসে একটা মাস আমার সঙ্গে থেকে তারপর চলে যাস, সুনি ; এমন কিছু সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে তো থাকিস না। গালুডি থেকে এবেলা রওনা হলে ওবেলায় কলকাতাতে পৌঁছতে পারা যায়। তবে কেন ? কিসের অসুবিধা ? বাধাই বা কিসের ? ধীরেনের যদি সময় না হয়, তবে তুই তো একলাই চলে আসতে পারিস।

সুনয়নার জীবনের উপর মায়া করার মত একজনই মানুষ আছেন। তিনি হলেন সুনয়নার মা ; আর যাঁরা আছেন, তাঁরা আপনজনের মত। সুনয়নার জেঠতুতো দাদা পরেশ আছেন, যিনি সুনয়নার লেখাপড়ার খরচ থেকে শুরু করে বিয়ে দেবার খরচ পর্যন্ত সব দায় স্বীকার করে খুড়তুতো বোনের জীবনের উপর অনেক দয়া করছেন। আজও সুনয়নার মা, পরেশেরই কলকাতার বাড়িতে আছেন। বিধবা খুড়িমাকে দয়া করলেও শ্রদ্ধা করেন পরেশদা। আজও সুনয়না ইচ্ছে করলে পরেশদার বাড়িতে এসে একটা বছর থাকতে পারে ; এবং থাকলে বাড়ির কোনও মানুষ একটুও বিরক্ত না হয়ে বরং খুশিই হবে। কিন্তু কলকাতায় আসবার জন্য সুনয়নার মনে কোনও ইচ্ছা আছে কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য হয়েছেন পরেশদা। তিনবছর হল বিয়ে হয়েছে সুনয়নার ; বিয়েতে আট-দশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলতেও একটুও কুণ্ঠিত হননি পরেশদা। যে মেয়ের জীবনের উপকার করতে গিয়ে এতটা করলেন পরেশদা, সেই মেয়ে এই তিন বছরের মধ্যে কলকাতায় আসবার নামও করল না। মনে মনে বেশ ক্ষুণ্ণও হয়েছেন পরেশদা। মানুষও এমন করে উপকার ভুলে যায় ; এত অকৃতজ্ঞ হয় ! কাকা বেঁচে থাকলে, কিংবা সুনয়নার কোনও আপন দাদা থাকলে, সুনয়নার জন্য এর চেয়ে বেশি কী আর করতেন ? বিয়ের পর পরেশদাকেই সব চেয়ে বেশি পর বলে মনে করে ফেলল সুনয়না, কী দুঃখের কথা !

পরেশদা কল্পনাও করতে পারেন না, কেন, সুনয়নার মন কিসের বিভ্রমে এত কঠোর হয়ে গেল ? ধারণা করতে পারেন না পরেশদা, তিনি নিজেই ভুল করে একটা ভুল সন্দেহ নিয়ে সুনয়নার জীবনের একটা কঠোর অভিমানকেই অকৃতজ্ঞতা বলে মনে করেছেন। এবং সুনয়না জানে, আর কলকাতায় গিয়ে মার কাছে কিংবা পরেশদার সামনে দাঁড়াবার কোনও অর্থ হয় না। সুনয়নার মুখে হাসি দেখলেও ওঁরা কিছু বুঝতে পারবেন না ; চোখে জল দেখলেও না।

এই গালুডির আলো ছায়া থেকে সরে গিয়ে পৃথিবীর কোনও জনতার চোখের সামনে মুখ দেখাতে যেন ভয় করে সুনয়নার। দরকার নেই। গালুডির এই ছোট বাংলোবাড়ির একটি ঘরের ভিতরে শুধু আয়নার কাছে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেই হল। এই আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে চিনতে পারে সুনয়না। কেন হঠাৎ চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, কেন ঠোঁটের উপর অদ্ভুত হাসি সিরসির করে ওঠে, আর কেনই বা একটা রুক্ষ ভ্রূকুটি মাঝে মাঝে চোখ দুটোর উপর ছটফট করে, সবই বুঝতে পারে সুনয়না। কখনও নিজের এই জীবনের উপর প্রবল মায়া, কখনও নির্মম ঘৃণা এবং

কখনও বা একটা উল্লাস সুনয়নার চোখ মুখ আর ঠোঁটের উপর খেলা করতে থাকে।

পরেশদার দোষ নেই। কিন্তু উপকার করতে গিয়ে, সুনয়নার জীবনে একটা উৎসবের আনন্দ এনে দিতে গিয়ে, আট-দশ হাজার টাকা খরচ করে কী ভয়ানক অভিশাপের মধ্যে সুনয়নাকে ঠেলে দিয়েছেন পরেশদা ! গালুডি স্টেশন পার হয়ে, লাইন ধরে আধ মাইলের বেশি যেতে হয় না, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে যে সুন্দর চেহারার বাংলোবাড়িটা, সেই বাড়িটাকে দেখেই কি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন পরেশদা ? বাড়ির ফটকের দুপাশে দু-সারি দেওদার ; ছায়াটা যেমন মিষ্টি, তেমনই মিষ্টি বাংলোবাড়ির চারদিকের যত লতার ফুলের রূপ আর গন্ধ। এহেন মিষ্টি চেহারার বাড়ির মানুষটার চেহারাও তো কম মিষ্টি নয়। ধীরেন বোসকে দেখলে সবার আগে সবারই মনে এই সন্দেহ দেখা দেবে যে, মানুষটি হয় কবি, নয় দার্শনিক। এমন চমৎকার একটি জায়গাতে, এমন সুন্দর একটি বাংলোবাড়ি তৈরি করে নিয়ে যিনি জীবনের নীড় গড়ে নিয়েছেন, তাঁর মনের রুচি আর শখের প্রকৃতি সহজেই বুঝে ফেলতে পারা যায়। তা ছাড়া, পরেশদা নিজে এসে নিজের চোখে দেখে গিয়েছিলেন, কী চমৎকার কারবাব করে ধীরেন বোস। কারবারের বাৎসরিক প্রফিটের হিসাব পর্যন্ত জেনে গিয়েছিলেন পরেশদা। ঘাটশিলা, চাইবাসা আর গোলমুড়িতে স্টোন-চিপ ও লাইম-ঘুটিং সাপ্লাই করে ধীরেন বোস। গালুডি থেকে চার মাইল দূরে একশো বিঘা জায়গা জুড়ে ধীরেন বোসেব ইজারা কোয়ারি। একশো মজুর কাজ করে ; আর, চারটি ট্রাক দিবারাত্রি ছুটোছুটি করে। সে ধীরেন বোসের সঙ্গে সুনয়নার বিয়ে দেওয়া, সৌভাগ্যের অনুগ্রহ বলে মনে করেছিলেন পরেশদা। অস্বীকার করে না সুনয়না, সুনয়নাও যে বিয়ের আগে একদিন, কলকাতার বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের ছবি দেখতে দেখতে বুকের ভিতরে একটা নিবিড় নিঃশ্বাসের বিস্ময় সামলে রাখবার চেষ্টা করেছিল ; সত্যিই তো, ধীরেন বোসের মত মানুষ সুনয়নাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, এর মধ্যে সৌভাগ্যের অনুগ্রহ ছাড়া আর কী রহস্য থাকতে পারে ?

পরেশদা কি ধীরেন বোসকে চিনতে আর বুঝতে ভুল করেছিলেন ? না, একটুও ভুল করেননি। ধীরেন বোস তার জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে একটি কথাও বাড়িয়ে বলেনি, এবং মিথ্যেও বলেনি। বিয়েব পর গালুডির এই বাড়িতে এসে, দেওদারের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে যেন জীবনের এক সফল স্বপ্নের আনন্দে স্নিগ্ধ হয়ে সুনয়না নিজেও বুঝতে পেরেছিল, গালুডির এই নিরালা বাংলোবাড়ির সুখের মধ্যে কোনও ভেজাল নেই, মিথ্যে নেই। ধীরেন বোস ভালবাসতে জানে, ভাল কথা বলতে জানে, আর কাজ-কারবার নিয়ে খাটতেও জানে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, এহেন ধীরেন বোস একদিন, বিয়ের পর মাত্র দুটো মাস পার হয়েছে সেই দিন, সুনয়নারই হাত ধরে রেল-লাইনের পাশে বেড়াতে বেড়াতে যেকথা বলল, সে কথা একেবারে নতুন রকমের একটা জীবনের ইচ্ছার কথা ! —এই মাটি-বেচা জীবন আর ভাল লাগে না, সুনয়না।

আশ্চর্য হয়েছিল সুনয়না—তার মানে ?

—বড় বেশি পরিশ্রম। দিনরাত মজুরদের পিছনে লেগে থাক, মাসে দশবার ওদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি কর, টেণ্ডার নিয়ে সাধাসাধি কর ; বিল আদায় করতে হিমসিম খাও ; তবে গিয়ে বড় জোর হাজার-দুহাজার টাকা মাসে রোজগার করা যায়। এ অবস্থায় চললে টাকার মুখ আর কখনও দেখতে হবে না।

—এর চেয়েও বেশি টাকা রোজগার করার দরকার কী ?

ধীরেন বোস হাসে—তুমি বোধ হয় প্লেন লিভিং আর হাই থিংকিং ভালবাস।

সুনয়নাও হাসে—ওসব তত্ত্বকথা বুঝি না। তবে এটুকু বুঝি যে যেমনটি আছি, তেমনটি থাকতে পারলেই ভাগ্যির কথা।

—না, সুনয়না। এতে সুখী হওয়া যাবে না।

—সুখী হয়েই তো আছি।

—তুমি বুঝবে না, সুনয়না।

—বুঝিয়ে দাও।

ধীরেন বলে—আমি বরং বলব যে, হাই লিভিং আর প্লেন থিংকিং হল আসল সুখের জীবন।

সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারে রেল-লাইনের পাশে পাশে স্বামীর হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে এই প্রথম চমকে ওঠে সুনয়না। ধীরেন বোসের কথাগুলিকে একটু বেশি অদ্ভুত মনে হয়েছে ; তার চেয়ে বেশি অদ্ভুত মনে হয়েছে ধীরেন বোসের গলার স্বর। ধীরেন বোসের মুখের ওই তত্ত্বকথার মত ধীরেনের গলার স্বরটাও যেন কেমন এলোমেলো ; এবং ধীরেনের নিঃশ্বাসের বাতাসে অদ্ভুত একটা গন্ধও যেন টলমল করছে।

ধীরেনের মুখটাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে সুনয়না। ধীরেন বলে. এখনও বুঝতে পারলে না সুনয়না ?

—না।

সুনয়নার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নেয় ধীরেন—আমি ভালরকম পয়সা কবতে চাই সুনয়না। মাসে দু-এক হাজার নয়, দু-এক লাখ হলে তবে খুশি হতে পারি।

—আজ বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?

—একটা পরামর্শের কাজে গিয়েছিলাম।

—কী খেয়ে এসেছ ?

ধীরেন হাসে—যা খেয়েছি, সেটা খাওয়া কি দোষের ?

—না, দোষের নয়। কিন্তু আমার সামনে খেলেই তো পারো।

—তুমি কিছু মনে করবে না ?

—আমার সামনে খেলে একটুও আপত্তি করব না। কিন্তু...

—কী ?

—তুমি আবোল-তাবোল কথা বলতে পারবে না।

—তার মানে ?

—এই যে, এখন যেসব কথা বলছ। দু-এক লাখ টাকার কথা, বড়লোক হবার কথা !

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে ধীরেন—এটা যে আমার স্বপ্নের কথা, সুনয়না। আমাকে বড়লোক হতেই হবে। মাটি-বেচা এই সামান্য রোজগারে আমি সুখী হব না, তুমিও সুখী হতে পারবে না।

সেইদিনই কলকাতার বাড়িতে চিঠি দিয়েছিল সুনয়না। —আমি এখন কলকাতায় যেতে পারব না, মা। কবে যেতে পারব, তাও বলতে পারছি না।

গালুডির এই তিন বছরের জীবনের মধ্যে শেষ দুটো বছরের জীবনটাই সুনয়নার জীবনের একটা মোহ। অতি অদ্ভুত ও অতি নির্মম একটা মোহ। সেই মোহ দু বছর ধরে সুনয়নার চোখে মুখে বিচিত্র হাসি, বিচিত্র জ্বালা আব অদ্ভুত উল্লাসের শিহর জাগিয়ে সুনয়নার জীবনটাকে ব্যস্ত করে রেখেছে। কালিকা মাইনস্-এর নিশীথ রায় হল সুনয়নার জীবনের নতুন মোহ।

মনে পড়ে সুনয়নার, যেদিন নিশীথ রায়কে এই বাড়িতে চা খেতে ডেকেছিল ধীরেন, এবং নিশীথও যেন সেই চা খেতে এসে ধন্য হয়ে গিয়েছিল, সেদিন নিশীথ রায়কে একটা নতুন অভিশাপের আবির্ভাব বলে মনে হয়েছিল সুনয়নার। নিশীথের সঙ্গে একটি কথাও বলেনি সুনয়না, কিন্তু নিশীথ রায় সেজন্য নিজেকে একটুও অপমানিত বোধ না করে ধীরেন বোসের হাতে দু হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে চলে গিয়েছিল।

—কিসের চেক ? জিজ্ঞাসা করেছিল সুনয়না।

—শেয়ার কেনা-বেচা করব, সেইজন্যে নিশীথ রায়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিলাম।

হ্যাঁ, ধীরেন বোস তার নতুন ইচ্ছার নেশা আর অহংকারে মাটি-বেচা কারবার অনেকদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর, রেসের মরসুমে রেস, এবং শেয়ার মার্কেট। মাসের বিশটা দিন কলকাতাতেই পার করে দেয় ধীরেন। গালুডিতে যখন ফিসে আসে, তখন দু-চারটে হুইস্কির বোতল ছাড়া আর কোনও সম্পদ সঙ্গে নিয়ে আসে না। সেই হুইস্কি ফুরোয় ; এবং আবার কলকাতার রেসের কিম্বা শেয়ার মার্কেটের আহ্বান এসে ধীরেন বোসের আশা আর কল্পনা উতলা করে দেয়। আবার কলকাতা যাবার জন্য ছটফট করতে থাকে ধীরেন বোস। আবার টাকা চাই। কিন্তু কোথায় টাকা ?

—তুমি যদি নিশীথ রায়কে নিজের মুখে বল, তবে কিছু বেশি টাকা ধার পাওয়া যেতে পারে।

নেশার আবেশে ছল-ছল দুটো লাল চোখের অলস দৃষ্টি তুলে সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে একদিন আবেদন করেছিল ধীরেন। আর, সুনয়নার দু চোখে যেন দুটো আগুনের জ্বালা দপদপ করে উঠেছিল।

কিন্তু সুনয়নার চোখের সেই চাহনিকে যেন প্রচণ্ড একটা অবহেলার কঠোর হাসি দিয়ে তুচ্ছ করে চেঁচিয়ে ওঠে ধীরেন—গালুডির টিম্বার-মার্চেন্ট রামগোপাল চৌহানকে চেন ?

—না।

—রেলওয়েতে স্লিপার সাপ্লাই করে, কনট্রাকক্টর রামগোপাল চৌহান আমার বন্ধু।

—বুঝলাম।

—রামগোপালকে বলা আছে, কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য যখনই তোমার গাড়ির দরকার হবে, তখনই পাঠিয়ে দেবে।

—আমার গাড়ির দরকার নেই।

ধীরেন উঠে দাঁড়ায়—দরকার আছে। তোমাকে আজই একবার কালিকাপুর যেতে হবে।

—কেন ?

—নিশীথকে গিয়ে বলতে হবে, অন্তত তিনটে হাজার টাকা আমার খুব দরকার।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে, ভ্রূকুটি করে চোখের চাহনি প্রায় হিংস্র করে নিয়ে সুনয়না বলে—আর একবার ভেবে নিয়ে বল।

—কিছ্ছু ভাববার নেই। আমার ওসব ভাববার গরজ নেই।

—নিশীথ রায়ের কাছে গিয়ে আমি টাকা চাইলে নিশীথ রায় যদি আমাকে অপমান করে ?

ধীরেন হো-হো করে হেসে ওঠে—অপমান ? নিশীথ রায় তোমাকে অপমান করবে ? ছিঃ, তোমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে নিশীথ রায়।

সুনয়না সেদিন যেন নিজের অদৃষ্টটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্য একটা আক্রোশ নিয়ে কালিকাপুর মাইনস-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের কাছে দাঁড়িয়েছিল। টাকার জোরে পরস্ত্রীর মুখের দিকে হাঁ করে তাকাবার আনন্দ পেতে চায়, সে মানুষকেও এইরকম ভ্রূকুটি দিয়ে ঘৃণা করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটে গিয়েছিল সুনয়না।

কিন্তু সুনয়নারই অদৃষ্টের পরিহাস। ঘৃণা করতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সুনয়না। সুনয়নার কথা শুনে কী ভয়ানক চমকে উঠল নিশীথ রায়। ভয় পেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল নিশীথের চোখ দুটো।

—আপনি কেন এসেছেন ? সামান্য টাকার জন্য আপনি এতটা পথ কষ্ট করে এখানে ছুটে এসেছেন, ছিঃ ! একটা চিঠি দিলে আমিই তো গালুডিতে গিয়ে, ধীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে.

নিশীথের গলার সেই ভয়াতুর ভাষার শব্দ শুনে নিশীথের ভীরু চেহারার দিকে সুনয়না হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

প্রশ্ন করে সুনয়না—আমার এখানে আসা কি অন্যায় হয়েছে ?

—নিশ্চয়। ধীরেনবাবু শেয়ারের কারবার করেন, তাঁর টাকার দরকার পড়েছে ; কিন্তু সেজন্য আপনি টাকার যোগাড়ে ছুটোছুটি করবেন কেন ?

—তা হলে আমি চলে যাই।

—নিশ্চয়। আমি নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে আসব, যদি অবশ্য টাকার যোগাড় করতে পারি।

—আপনি টাকা দেবেন কেন ?

সুনয়নার প্রশ্নে বিব্রত হয়ে নিশীথের মুখের চেহারা এইবার করুণ হয়ে যায়। —ঠিকই বলেছেন। আর টাকা দেবার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু...

—কী ?

—কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আর টাকা দেওয়া উচিত নয় ; তবে আমি দেব না।

—সেটা আপনি ভেবে দেখুন।

—আপনি যদি আমাকে মিছেমিছি কোনও সন্দেহ না করেন, তবে এবারের মত টাকা দিতে পারি।

—কিসের সন্দেহ ?

নিশীথ হঠাৎ নিরুত্তর হয়ে যায়।

সুনয়না বলে—না, কোনও সন্দেহ করছি না।

—শুনে সুখী হলাম।

নিশীথ হেসে ফেলে—ভয় ভেঙে গেল। আপনি আমাকে ভুল বোঝেননি।

চলে যায় সুনয়না ; এবং পরদিনই নিজে গালুডিতে এসে ধীরেনের হাতে তিন হাজার টাকার একটা চেক ধরিয়ে দেয় নিশীথ। তারপর, আর পনেরোটা মিনিটও দেরি করেনি ধীরেন। চেক হাতে নিয়ে যেন একটা দুরন্ত স্বপ্নের নেশায় আকুল হয়ে কলকাতার ট্রেন ধরবার জন্য স্টেশনের দিকে ছুটে চলে যায়।

আর, সুনয়নার দু চোখ থেকে ঝরঝর করে একটি নীরব কান্নার বেদনা জল হয়ে ঝরে পড়তে থাকে।

—এ কী করছেন ? চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ।

—আপনি কী ভয়ানক ভুল করলেন, বুঝতে পারছেন ? আস্তে আস্তে বলে সুনয়না।

—না।

—ধীরেন বোসের স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখবার দায় স্বীকার করে নিলেন।

—না, কখখনও না ; হতে পারে না। আপনি আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

—আপনি বিপদে পড়ে গিয়েছেন। আমার দোষ দেবেন না।

—কিসের বিপদ ?

—এই যে এত রাত হয়ে গিয়েছে ; অথচ আপনি এখানে আমার সামনে একা বসে আছেন। গালুডিতে ফিরে যাবার এখন আর কোনও গাড়ি নেই।

—তাতে কী হয়েছে ? আমি এখনি গিয়ে স্টেশনে বসে থাকব।

—কিন্তু আমি যেতে দেব না।

সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোনও প্রতিবাদের ভাষা ফিসফিস করেও উচ্চারণ করতে পারেনি নিশীথ। কী অদ্ভুত রকমের একটা আক্রোশ নিয়ে জ্বলজ্বল করছে সুনয়নার চোখ দুটো। সেই সঙ্গে সুন্দর গড়নের ঠোঁট দুটো কী নিবিড় আবেশে গোলাপের পাপড়ির মত ফুলে উঠেছে।

নিশীথ বলে—আমাকে যেতে দিন।

—না।

—কেন ?

—আপনার যাবার ইচ্ছা নেই।

—কে বললে ?

—আপনি নিজের মনকে জিজ্ঞেস করুন।

যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে নিশীথের মুখটা। কী ভয়ঙ্কর সত্য কথা বলে দিয়েছে সুনয়না ! সুনয়নার এই জ্বলজ্বল চোখের দৃষ্টি যেন নিশীথের বুকের তপ্ত নিঃশ্বাস আর শোণিতের সব ক্রন্দনের খেলা একেবারে স্পষ্ট করে দেখে ফেলেছে।

না, সে রাতে কালিকাপুর ফিরে যেতে পারেনি নিশীথ। সকাল হতে যখন এই বাংলোবাড়ির দেওদারের ছায়া পার হয়ে হনহন করে হেঁটে স্টেশনের দিকে চলে গেল নিশীথ, তখন শুধু মনে হয়েছিল, হঠাৎ আত্মহত্যা করবার পর নিশীথ রায়ের একটা রক্তমাংসহীন প্রেতচ্ছায়া ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। সুনয়নার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি নিশীথ। আর, সুনয়না শুধু অপলক চোখ তুলে নিশীথ রায়ের সেই পলাতক মূর্তির দিকে তাকিয়ে এই দেওদারের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

নিশীথ রায়কে ভালবাসে সুনয়না, এ কথা কারও মুখে শুনতে পেলে সুনয়না আশ্চর্য হয়ে হেসে ফেলবে। পৃথিবীর কোনও মানুষকে ভালবাসতে পারে সুনয়না, এই কথাটা সুনয়নারই কাছে আজ

সব চেয়ে বেশি অবিশ্বাসের কথা হয়ে গিয়েছে। নিশীথ রায়কে ভালবাসার কথা কোনওদিন মনেও হয়নি সুনয়নার। শ্রদ্ধা ? সে তো আরও অসম্ভব। মায়া ? তাই বা বলা যায় কী করে ? জলবসন্ত হয়ে একলা ঘরে খাটের উপব শুয়ে একদিন ছটফট করেছিল নিশীথ এবং সেই নিশীথের গলা জড়িয়ে ধরেছিল সুনয়না। কিন্তু জানে সুনয়না, সে মায়া নিশীথ নামে একটা মানুষের জন্য মায়া নয়। নিজেবই একটা স্বার্থকে, সুনয়নার একটা ইচ্ছার সান্ত্বনাকে জড়িয়ে ধরে ছিল সুনয়না।

এক বুক জলে ডুবে যাবাব পর আরও গভীরে তলিয়ে যেতে ইচ্ছা করে, এমন আক্রোশ কোনও মানুষের জীবনে সম্ভব নয়। কিন্তু সুনয়নার জীবনে সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে। ডুবলে একেবারে জলের গভীরে ডুবে যাওয়াই ভাল। হাঁটুজলে নাকানি-চুবানি খাওয়া আরও দুঃসহ ব্যাপার। নিশীথ বায়কে যেন এই ডুবন্ত জীবনের চিরসাথী করবার জন্য একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে সুনয়নার জীবনে একটা উল্লাসের বিকার বরণ করে নিয়েছে। নিশীথ রায় সুনয়নাকে ভয় পায়, কিন্তু নিশীথকে ভয় পাইয়ে সুখী হওয়াই যেন সুনযনাব জীবনের সাধ। সুনয়নার দিকে মাঝে মাঝে যেভাবে তাকায় নিশীথ, তার মধ্যে ঘৃণা ছাড়া আর কোনও ভাবের ছায়াও থাকে না। কিন্তু সুনয়নার বুকের ভিতরে যেন একটা অট্টহাসির শব্দ বেজে ওঠে, দেখি, কত ঘৃণা কবতে পারে।

টাকা চায় না সুনয়না ; কিন্তু নিশীথ রায় টাকা দেয়। কোনওদিনও আপত্তি করে না সুনয়না। টাকা নিতে লজ্জাও নেই বোধ হয়। ববং নিশীথ রায়ের শরীরটার মত নিশীথ রায়ের টাকাকেও যেন নিজের ইচ্ছামত খেলা করবার বস্তু বলে মনে করে ফেলেছে সুনয়না। ধীরেন বোস নামে একটা মানুষ, যাকে ইহজগতের সব মানুষ আজও সুনয়নার স্বামী বলে জানে, সে মানুষ ইচ্ছে করেই সুনয়নার জীবনকে একলা করে দিয়ে রেস শেয়ার আর হুইস্কির জগতে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে। আত্মহত্যা করতে পারেনি সুনয়না ; পাগল হয়ে যেতেও পারেনি। তাই বেঁচে থাকবার জন্য নিশীথ রায়ের টাকা আর নিশীথ রায়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে। এই সত্য বুঝতে পারে নিশীথ, এবং এই সত্য স্বীকার করে সুনয়নার মন। নারী ও পুরুষের মধ্যে এর চেয়ে পঙ্কিল সম্পর্ক আর কী হতে পারে ?

সুনয়না জানে, হাঁপ ছাড়তে চায় নিশীথ। টাকা নাও, কিন্তু আর এসো না—নিশীথের চোখ দুটো যেন নীরবে ধিক্কার দিয়ে এই কথা বলে দিতে চাইছে। কিন্তু সুনয়নার অন্তরাত্মাও যেন নীরবে খিলখিল করে হেসে ওঠে ; এবং নিশীথকে একদিন স্পষ্ট কবে বলেও দিয়েছে সুনয়না—টাকা চাই না, দিয়ো না , কিন্তু আমি আসবই। সাধ্যি থাকে তাড়িয়ে দিয়ো।

—একদিনের ভুলকে চিরকালের ভুল করে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী সুনয়না ? বিড়বিড় করে একদিন সুনয়নাকে নিজের মনেব একটা মুখচোরা ঘৃণার আভাস জানিয়ে দেবার জন্য একটু মুখরতা করেছিল নিশীথ।

সুনয়না বলে, ভুলটা এত বিস্বাদ হয়ে গেল কেন ? কারও সঙ্গে ভালবাসা হয়েছে বোধ হয় ?

কী করে বোঝাবে নিশীথ, হ্যাঁ, মানুষের জীবন যে ভালবাসাই খোঁজে ; ভালবাসাহীন এই গলা-জড়িয়ে ধরা জীবন যে একটা ভয়ানক শাস্তি। আজীবন সহ্য করার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। কিন্তু সুনয়না যেন না-বোঝবার জন্য পণ করে বসে আছে।

শুধু একদিন, কে জানে কোন ভাবনার ব্যথায় ছটফট করে উঠেছিল সুনয়নার মন। কালিকাপুরের পুরনো কালের সেই ছোট পুকুরটা, রূপসাগর যার নাম, তারই ভাঙা ঘাটের পাথুরে সিঁড়ির উপর নিশীথের পাশে দাঁড়িয়ে একটা লাল শালুকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আনমনার মত বলে উঠেছিল সুনয়না—ভালবাসতে পারলে ভালই হত, নিশীথ।

ভয় পেয়ে চমকে ওঠে নিশীথ—তার মানে ?

—তার মানে, সরে যেতে পারতাম। তুমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে।

—অদ্ভুত কথা বলছ।

—কেন ?

—আমি তো জানি, মানুষ কাউকে ঘৃণা করলে তবেই তার কাছ থেকে সরে যেতে পারে।

হেসে ফেলে সুনয়না— তবে তুমি আমার কাছ থেকে সরে যেতে পারছ না কেন ? তুমি তো আমাকে যথেষ্ট ঘেন্না কর।

মাথা হেঁট করে বিড়বিড় করে নিশীথ—ঘেন্না করি না বোধ হয়।

—তবে কী ?

নিশীথও হাসতে চেষ্টা করে, বোধ হয় ভয় করে। শুধু মনে হয়, তোমার ক্ষতি করছি, নিজেরও ক্ষতি করছি।

—আমার ক্ষতি করেছ বইকি। কিন্তু তোমার কী ক্ষতি হয়েছে, বুঝতে পারছি না। অবশ্য, টাকার দিক দিয়ে কিছু ক্ষতি হয়েছে ঠিক। কিন্তু...

—কী ?

সুনয়না হাসে—তোমার কি এই ধারণা যে, আরও কম টাকাতে সুনয়নার মত একটা মানুষকে যখন তখন এভাবে এরকম একটা রূপসাগরের নিরালা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে যা-ইচ্ছে-তাই বলা যায় ?

চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ—আমি টাকার ক্ষতির হিসেব করছি না।

—তবে কিসের হিসেব করছ ?

—ফাঁকির হিসেব।

—ফাঁকি ?

—নিশ্চয়ই। ভালবাসার চিহ্ন নেই, তবু এরকম মেলামেশা...কোনও অর্থ হয় না ; নিছক একটা ফাঁকি নিয়ে পড়ে থাকা।

—তাই বলো। ভালবাসা পাওয়ার জন্যে, আর ভালবাসার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

—ঠিক কথা।

—তা হলে কাউকে ভালবেসে ফেলো।

—ফেলেছি বোধ হয়।

—তবে তাকে বিয়ে করো।

—নিশ্চয়ই করব।

—বেশ তো। কিন্তু তাতে আমার কী আসে যায় ?

আবার চমকে ওঠে নিশীথ—তার মানে ?

—আমার যা দরকার তা পেতেই থাকব। আমাকে সরিয়ে দেবার সাধ্য তোমার হবে না।

—আমার সাধ্য না হোক, কিন্তু আর একজনের সাধ্য যে হবে না, এতটা ধারণা করছ কেন ?

—আমাকে বড় বেশি দুর্বল বলে মনে করছ, নিশীথ! খুব ভুল করছ।

—তুমি আমাকেও বড় বেশি দুর্বল বলে মনে করছ।

—সত্যি কথা।

—কেন ?

—আমাকে তুচ্ছ করবার সাধ্য তোমার নেই ; তাই তুমি দুর্বল।

নীরব হয়ে যায় নিশীথ।

খিলখিল করে হেসে ওঠে সুনয়নার—আমার কথা ভাবতে তোমার মনে যে ঘৃণা লাগে, সেই ঘৃণাকেই যে তুমি ভালবাস। এত বিদ্বান হয়ে এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পার না কেন ?

নীরব নিশীথ রায়ের মাথাটাও এইবার হেঁট হয়ে যায়। একটুও মিথ্যে বলেনি, বাড়িয়েও বলেনি সুনয়না। যে নারীকে বেশিক্ষণ কাছে রাখবার জন্য কোনও আগ্রহ অনুভব করে না নিশীথ, যে নারীকে চিরকালের সঙ্গিনী বলে কল্পনা করতেও বুক কেঁপে ওঠে, সেই নারীর হাত ধরবার জন্য কতবার নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছে নিশীথ রায়ের এই ভদ্র শরীরের একটা মত্ততা। পরনারীর মন, প্রাণ ও দেহের সঙ্গে এ হেন ছন্নছাড়া সম্পর্কের অনুভব যে নিশীথ রায়ের বুকের পাঁজরের স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। অস্বীকার করতে পারে না নিশীথ।

সুনয়না বলে—আমি একটা অনুরোধ করব, শুনবে ?

—বলো।

—তুমি বিয়ে করো না।

—একথা বলবার অধিকার তোমার নেই।

—নেই ঠিকই ; কিন্তু তোমার ভালর জন্যই বলছি।

—যে মেয়ে আমাকে ভালবাসে তাকেও বিয়ে করব না, আমাকে এরকম পরামর্শ দেওয়া মানে আমার ক্ষতি করা।

সুনয়নার চোখের দৃষ্টি দপ করে জ্বলে ওঠে। —আজ পর্যন্ত তোমার কোনও ক্ষতি করিনি ; কিন্তু যদি বিয়ে কর, তবে ক্ষতি করব। না করে পারব না। আমার ইচ্ছে না থাকলেও তোমার ক্ষতি করে ফেলব নিশীথ।

আর কোনও কথা না বলে, কালিকাপুরের রূপসাগরের সেই নিরালা থেকে যেন একটা যন্ত্রণাকে মূর্তি নিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল সুনয়না।

তারপর আর সাতটা দিনও পার হয়নি, আবার কালিকাপুরে এসে ম্যানেজার নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের সামনে গাড়ি থেকে নেমেই একটা নির্মম বিস্ময়ের আঘাতে সুনয়নার প্রাণটাই যেন কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিশীথের মালী হেসে হেসে খবর দিল—সাহেব বিয়ে করতে গিয়েছেন।

কার সঙ্গে বিয়ে ? কোথায় বিয়ে ? মালীর কাছে প্রশ্ন করে কোনও উত্তর পায়নি সুনয়না। উত্তর পেয়েছিল কালিকাপুর থেকে ফিরে এসে, গালুডির এই বাংলোবাড়ির ভিতর ঢুকে নিজেরই ঘরের টেবিলের কাছে এসে। ধীরেন বোসের নামে একটা হলদে খামের চিঠি এসেছে। বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। রাজপোখরার শীতল সরকারের মেয়ে নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথ রায়ের বিয়ে। ছাপার অক্ষরে লেখা চিঠির এক প্রান্তে হাতের লেখার একটি অনুরোধও রয়েছে : তুমি না আসতে পার, অন্তত সুনয়নাকে পাঠিয়ে দিয়ো, ধীরেন। ইতি শীতল সরকার।

আয়নাতে নিজের মুখের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে সুনয়নার নিজেরই বুক থরথর করে কেঁপে ওঠে। সর্বনাশ। নিজেরই এ কী ভয়ানক ক্ষতি করল নিশীথ রায়! নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথের ভালবাসাবাসির মূর্খ অহংকারটাকে এই সুনয়না বোস যে একমুহূর্তে চূর্ণ করে ধুলো করে দেবে। সুনয়নার চরিত্রহারা রক্তমাংসের আক্রোশগুলিকে কি ভয় করতে ভুলেই গেল নিশীথ রায় ? আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেরই চোখের আগুনের জ্বালাটাকে দেখতে দেখতে থাকে আর কাঁপতে থাকে সুনয়না।

আর একবার রামগোপাল চৌহানের গাড়ি চেয়ে পাঠাতে হয়, এবং কালিকাপুরেও যেতে হয়। কিন্তু তখনি ফিরে আসতেও হয়। না, ফেরেনি নিশীথ রায়। নীরাজিতাকে সঙ্গে নিয়ে কালিকাপুরে ফিরে আসতে আরও সাতটা দিন দেরি করবে নিশীথ। কালিকা মাইনস-এর কেরানিবাবুর কাছ থেকে খবর নিয়ে জানতে পারে সুনয়না, সাকচিতে বউভাতের অনুষ্ঠানের পর, আরও পাঁচটা দিন ওদিকেই পার করে দিয়ে ম্যানেজার নিশীথ রায় মঙ্গলবার এখানে ফিরবেন।

আর মাত্র তিনটে দিনের অপেক্ষা ; সেই অপেক্ষার যন্ত্রণা সহ্য করতে গিয়ে একটা ঘণ্টাও বোধ হয় ঘুমতে পারেনি সুনয়না। এবং ঘুমহারা চোখের সব যন্ত্রণা বিদ্যুতের জ্বালার মত ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠল তখন, যখন মঙ্গলবারের বিকালের আলোতে সুনয়নাকে গালুডি থেকে কালিকাপুরে নিয়ে যাবার জন্য কনট্রাক্টর চৌহানের গাড়ি বাংলোবাড়ির দেওদারের ছায়ার কাছে এসে দাঁড়াল।

বিকালের আলো যখন রঙিন হয়ে এসেছে, কালিকাপুরের শালবনের উপরে উড়ন্ত পাখিগুলিকে যখন রঙিন আলোর উড়ন্ত ফুলের ঝাঁক বলে মনে হয়, তখন কালিকা মাইনস-এর ম্যানেজার নিথীশ রায়ের কোয়ার্টারের ফটকের কাছে কনট্রাক্টর চৌহানের গাড়িও তীব্রস্বরের হর্ন বাজিয়ে উড়ন্ত আক্রোশের মত হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর থেমে যায়।

গাড়ি থেকে নামে না সুনয়না। গাড়ির ভিতরে চুপ করে বসে, নিজেরই দুই চোখের বিদ্যুতের জ্বালা জোর করে চোখেরই উপর সুস্থির করে রেখে নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বারান্দায় কেউ নেই। বারান্দার গা-ঘেঁষা প্রথম ঘরের দরজায় যে পর্দাটা ফুরফুর করে উড়ছে, সেই পর্দার দিকে চোখ পড়তেই সুনয়নার দু চোখের জ্বালাময় চাহনিতে একটা নতুন হাসির শিহর লাগে। সুনয়নার চোখের দৃষ্টিটাও যেন একটা হিংস্র কৌতুকের আবেগে ফুরফুর করে উড়তে

থাকে। লাল ভেলভেটের চটি-পরা এক জোড়া পা, আর লালচে মেঘের মত রঙের একটা সিল্কের শাড়ির আঁচল দেখা যায়। কালিকা মাইনস-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের জীবনের নীড়ে নব-বিহগীর আবির্ভাব ; নতুন সুখের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে সেই নীড়।

—আর একবার হর্ন বাজাও, ড্রাইভার। আনমনার মত অপলক চোখ নিয়ে নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের সেই ঘরের ভিতরের রঙিন আবির্ভাবের ছায়ার দিকে তাকিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে সুনয়না। ড্রাইভার আবার হর্ন বাজায়।

কনট্রাক্টর চৌহানের এই গাড়ির হর্নের শব্দ চিনতে নিশীথ রায়ের পক্ষে একটুও অসুবিধা নেই ; বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি করবার কথা নয়। জানে সুনয়না, এবং সুনয়নার বুকের ভিতরের আক্রোশটাও আশায় ছটফট করছে, এই মুহূর্তে চমকে উঠবে আর ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার উপর দাঁড়াবে নিশীথ রায় ; আর, এক জোড়া ভীত ও করুণ চোখের দৃষ্টি তুলে অসহায়ের মত এই গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবে।

তারপর আর কতক্ষণই বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে নিশীথ রায় ? আস্তে আস্তে, ওই ভীরুতারই ভারে অতিষ্ঠ হয়ে সুনয়নার এই দুই চোখের চাহনির কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াতে হবে। সুনয়না বলবে—চলো, বেড়িয়ে আসি। এখনই চলো। ওজর আপত্তি শুনতে চাই না। এখনই যেতে হবে।

সুনয়নার সেই আহ্বান অস্বীকার করতে পারবে কি নিশীথ রায় ? সাধ্য হবে কি ?

সুনয়নার কল্পনার ভাষাগুলিই যেন নীরবে হেসে ওঠে। রুমাল তুলে দুই ঠোঁটের অদ্ভুত এক থরথর হাসির কাঁপুনি চেপে রাখতে চেষ্টা করে সুনয়না।

নিশীথকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাওয়া যায় ? রূপসাগর নামে সেই সেকেলের ইতিহাসের ছোট পুকুরটা বেশি দূরে নয়। বড় বড় তালের ছায়ায় রূপসাগরের কিনারার সেই নির্জন নিভৃতের অনেক জায়গা এখনও নরম ঘাসে ছেয়ে রয়েছে। সেই নিভৃতের আবেদন ভুলে যাবার সাধ্য হবে কি এই নিশীথ রায়ের ? সেখানে গিয়ে আজও এই মুহূর্তে নিশীথ রায়ের হাত ধরে যদি সুনয়না, তবে নিশীথ রায়ের চোখ দুটো সুনয়নার মুখের দিকে পাগলের মত না তাকিয়ে থাকতে পারবে কি ?

থাক রূপসাগরের ছায়াময় নির্জনতা আর নিভৃত। কালিকাপুরের শালবনের কিনারা ধরে এগিয়ে গিয়ে লালমাটির কাঁচা সড়ক যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কালো টিপির মত ছোট পাহাড়ের যে কোনও একটা পাথরের উপরে বসে সূর্যাস্তের শেষ আভার দিকে তাকিয়ে নিশীথ রায়কে যদি প্রশ্ন করা যায়—কী ইচ্ছে করছে, নিশীথ ? আমার কাছ থেকে এখনই উঠে যেতে চাও ? এখনই ঘরে ফিরতে মন চাইছে ? আমি বলছি, না যেয়ো না।

চলে যেতে সাধ্য হবে কি নিশীথ রায়ের ? আবার মুখের উপর রুমাল বুলিয়ে যেন একটা হাসির জ্বালা মুছতে থাকে সুনয়না। পৃথিবীর যে কোনও মানুষ বিয়ে করুক, কিন্তু তুমি বিয়ে করলে কেন নিশীথ রায় ? নিজেকেই চিনতে আর বুঝতে ভুল করলে কেন ? বিশ্বাস করলে না কেন যে, তুমিও ডুবে গিয়েছ ? সুনয়না বোস তোমার সেই ডুবন্ত জীবনের সঙ্গিনী।

না, রূপসাগর নামে পুকুরটার কিনারাতে নয় ; শালবনের শেষের সেই ছোট পাহাড়ের পাথরে উপরেও না ; আজ নিশীথ রায়কে তার এই মিথ্যা খেলাঘরের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে একবার গালুডিতে চলে গেলেই ভাল। গালুডির বাড়ির বারান্দার উপরে সেই বেতের চেয়ারের উপর বসে সুনয়নার হাতের যত্ন আর আগ্রহের ছোঁয়া দিয়ে তৈরি এক পেয়ালা চা খেয়ে নিক নিশীথ, দেওদারের ছায়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকুক। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা পড়ুক গালুডির রাঙামাটির মাঠ। ঘরের আলো জ্বলে উঠুক। সুনয়না বোসের মুখটা ভাল করে নিশীথ রায়ের চোখে পড়ুক। তারপর দেখা যাক, আজকের রাত শেষ না হবার আগে কী করে কালিকাপুরে ফিরে আসতে পারে নিশীথ রায় ?

সুনয়না বোসের কল্পনা এইবার একটি প্রতিজ্ঞার মত যেন নিরেট কঠোর আর নির্মম হয়ে ওঠে। তাই ভাল। নিশীথ রায় যেন আজ তার মন প্রাণ আর আত্মার হাড়ে হাড়ে বুঝে ফেলতে পারে যে, ডুবন্ত জীবনের পাঁক থেকে মুক্ত হয়ে তীরে উঠবার মত শক্তিও তার নেই, সাহসও নেই ; ভালবেসে

বিয়ে-করা জীবনের রঙিন নীড়টাই ভুয়ো ; বিশ্বাস করবার চরম সুযোগ পেয়ে যাক নিশীথ, সুনয়নাকে তুচ্ছ করবার ইচ্ছাটাও একটা কপট ইচ্ছা।

আর সারারাত ধরে এই কোয়ার্টারের একটি ঘরের নিভৃতে নিশীথ রায়ের অপেক্ষায় জেগে বসে থেকে আজই বুঝে ফেলুক নীরাজিতা, কেমন মানুষকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছে।

কিন্তু ও কে ? গাড়ির হর্নের শব্দ শুনে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়েছে আর গাড়ির দিকে তাকিয়েছে যে, সে তো নিশীথ রায় নয়। নীরাজিতাও নয়। কিন্তু সুনয়নার চোখের অপরিচিত কোনও মূর্তিও নয়। ও যে প্রতিভা !

সেই প্রতিভা : চোখে সেই সোনার ফ্রেমের চশমা। সুনয়নার দুই চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা ভয়ানক বিস্ময়ের আবেশ থমথম করে। প্রতিভা এখানে, তবে মিহির মিত্র কোথায় ?

প্রতিভাদের কলকাতার বাড়িটাকে এখনও যেন স্পষ্ট করে চোখে দেখতে পাচ্ছে সুনয়না। প্রতিভার বাবা শিবদাসবাবু সম্পর্কের দিক দিয়ে পরেশদার খুড়শ্বশুর হন। বউদিদের সঙ্গে কয়েকবার প্রতিভাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে প্রতিভার সঙ্গে চেনাশোনার যে সূচনা হয়েছিল, সেটা তিন বছরের অন্তরঙ্গতায় কী সুদূর বন্ধুত্বের ইতিহাস হয়ে উঠেছিল ! সেই তিন বছরের স্মৃতি আজও সুনয়নার মনে একটুও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। মনে আছে সবই ; প্রতিভার সঙ্গে শেষ দেখার ঘটনার সেই ছবিও মনে আছে।

সুনযনার মাথার ভিতরে একটা ভয়ানক বিস্ময়ের বিদ্রূপও বাজতে থাকে। যে প্রতিভার মুখেব দিকে তাকিয়ে সেদিন, সেই শেষ দেখার দিনে কেঁদে ফেলেছিল সুনয়না, আজ যে সেই প্রতিভা সুনযনার এই মুখ এখানে দেখতে পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠবে। —তুমি এখানে কেন সুনয়না ? প্রতিভাব প্রচণ্ড বিস্ময়ের এই প্রশ্নের কি জবাব দেবে সুনয়না ?

জানত সুনয়না, এবং কে না জানত যে, মিহির মিত্রের সঙ্গে প্রতিভার ভালবাসা হয়েছে ; মিহির মিত্রের সঙ্গে প্রতিভার বিয়ে হবে ? কে না দেখতে পেয়েছিল, মিহির মিত্রের সঙ্গে প্রতিভার মেলামেশাব রীতিনীতির মধ্যে কোনও কুণ্ঠার বালাই নেই ? যারা সব খবর জানত না, তারা মিহির আর প্রতিভাকে একসঙ্গে দেখে স্বামী-স্ত্রী বলেই মনে করে ফেলত। কিন্তু সুনয়না কল্পনাও করতে পারেনি যে, বিয়ে না হতেই প্রতিভার মত মেয়ে...

সত্যিই, সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে ভয় পেয়ে সেদিন কেঁদে ফেলেছিল সুনয়না।

সিনেমার ছবি দেখবার জন্য সন্ধ্যাবেলা প্রতিভাকে ডাকতে এসেছিল সুনয়না। এবং ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকেই শিউরে উঠেছিল সুনয়নার চোখ। আর দু হাতে চোখ ঢেকে, ভয় লজ্জা দুঃখ আর ঘৃণারও একটা দুঃসহ আলোড়ন বুকের ভিতরে চেপে রেখে ঘর ছেড়ে ছুটে বের হয়ে গিয়েছিল সুনয়না। মিহির মিত্র প্রতিভার ভালবাসার মানুষ হলেনই বা, কিন্তু স্বামী তো নন। কিন্তু এ কী অদ্ভুত দুঃসাহস প্রতিভার ! প্রতিভার শরীরের রক্তে কি একটুও ভয় নেই, লজ্জা নেই ?

প্রতিভাদের বাড়ির বারান্দায় মাত্র আর পাঁচ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল সুনয়না। প্রতিভাও সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। কী আশ্চর্য, সুনয়নাকে চোখ মুছতে দেখে, আর সুনয়নার মুখটাকে আতঙ্কিত হতে দেখে হেসে ফেলেছিল প্রতিভা। —লজ্জার ব্যাপার বলতে পারো, কিন্তু এতে তোমার কাঁদবার কী আছে, সুনয়না ? ভয় পেলে কেন ?

—ছিঃ ! শুধু এই ঘৃণার কথা কোনওমতে বলতে পেরেছিল আর চলে গিয়েছিল সুনয়না। দুই বান্ধবীর মধ্যে সেই শেষ দেখা আর শেষ কথা। তার পব এই আজ।

সুনয়নার মুখের সেই ধিক্কারের প্রতিধ্বনিটা যেন তিন বছর পরে ছুটে এসে সুনয়নারই জীবনের উপর এক প্রচণ্ড কৌতুকের ধ্বনি হয়ে এই মুহূর্তে বেজে উঠবে। মাথা হেঁট করে সুনয়না, আর অনুমান করতে পারে ; এইবার আস্তে আস্তে হেঁটে এই গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে প্রতিভা ; প্রতিভার মুখটা বোধ হয় এক মিনিট ধরে হো-হো করে হেসে নিয়ে তারপরেই চেঁচিয়ে উঠবে ছিঃ।

কোথায় গেল আর কেমন করে কিসের অভিশাপে পুড়ে গেল তিন বছর আগের সুনয়নার সেই ভয়, লজ্জা আর ঘৃণার অহঙ্কার। প্রথমে বুঝতে পারেনি সুনয়না, চোখ দুটো ভিজে গিয়েছে বলেই

মাথাটা আপনি হেঁট হয়ে গিয়েছে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে চমকে ওঠে, এবং সন্দেহ করে ; সত্যিই কি আজ তিন বছর আগের সুনয়নার সেই অহঙ্কারের জন্য একটা মমতার কান্না এসে সুনয়নার অন্তরাত্মায় ছটফট করে উঠেছে। ঘৃণা করছে নিজেকে ? লজ্জা পেল, ভয় পেল কি গালুডির সুনয়না ?

—এসো সুনয়না ! সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ খুশির স্বরের আহ্বান শুনেই মুখ তোলে সুনয়না। হ্যাঁ, প্রতিভা এসে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে আর ডাকছে।

সুনয়না হাসে, আশ্চর্য !

—কিসের আশ্চয ?

—তোমাকে এখানে দেখতে পাব বলে যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

—আমিও যে ভাবতে পারিনি, তোমাকে এখানে দেখতে পাব।

গাড়ি থেকে নামে সুনয়না। —তুমিও খুব আশ্চর্য হয়েছ বলো ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—অন্য কাউকে দেখতে পেলে আশ্চর্য হতাম না। তুমি বলেই—

সুনয়নার মুখের হাসি হঠাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তিন বছর আগের সুনয়নার জীবনের গৌরব যে বুকের ভিতর আর্তনাদ করে উঠেছে। কী ভয়ানক ধিক্কার প্রতিভার এই সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের মধ্যে বেজে উঠেছে !

সুনযনা আস্তে আস্তে বলে, নিশীথবাবু কোথায় ?

—মাইনস-অফিসে গিয়েছে। ডেকে পাঠাব ?

প্রতিভার মুখেব দিকে তাকাতে গিয়ে সুনয়নার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। —না। আমি নিজেই যাব।

প্রতিভা হাসে, এখনি যাবে ?

—হ্যাঁ। আর, এখনি নিশীথবাবুকে একবার গালুডিতে নিয়ে যাব।

— দরকার থাকলে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে।

—তুমি অনুমতি না দিলেও চলবে।

—ছিঃ, এ কী কথা বলছ সুনয়না !

শিউরে ওঠে সুনয়নার চোখ। ছিঃ, সত্যিই যে তিন বছর আগের ধিক্কারের প্রতিধ্বনিটা বেজে উঠেছে !

কিছুক্ষণ আনমনার মত কী যেন ভাবে সুনয়না ; তারপরেই হাসতে চেষ্টা করে। —তুমি বোধ হয় আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ প্রতিভা।

—বিশ্বাস করো সুনয়না, একটুও ভয় পাইনি।

—একটা ঠাট্টা করেছি শুধু। সত্যি কি বিশ্বাস করলে যে তোমার নিশীথবাবুকে গালুডিতে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি ?

—নিয়ে গেলে আমার ক্ষতি কী ?

সুনয়না হাসে—ক্ষতি নেই ?

—না।

—এমন বিশ্বাস কেমন করে হল ?

—জানি না।

—মস্ত বড় বিশ্বাস পেয়েছ, প্রতিভা। সবচেয়ে ভাল হত, যদি তোমার নিশীথবাবুও এই বিশ্বাস পেতেন।

—আমার মনে হয়, নিশীথও তাই বিশ্বাস করে।

—কী ?

—তারও কোনও ক্ষতি হবে না।

—তার মানে ?
—আমাকে জানে নিশীথ।
—কী জানে ?
—সবই জানে।
—কেমন করে জানতে পারলে ?
—আমিই জানিয়েছি।
—তবুও ভালবাসা হল ?
প্রতিভা হাসে—সেইজন্যেই ভালবাসা হল।
—কিন্তু তুমি কি কিছু জেনেছিলে ?
—নিশীথের কথা বলছ ?
—হ্যাঁ।
—নিশীথই জানিয়েছে।
—বিয়ের পরে ?
—বিয়ের আগে। তা না হলে এ বিয়ে হতই না।

সুনয়নার মনের ভিতরে এতক্ষণের প্রতিজ্ঞার উল্লাস যেন হঠাৎ আহত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। প্রতিভাব কাছে হার মানতে হচ্ছে যে! কী কঠিন প্রতিভার বিশ্বাস! কত উদার প্রতিভার সাহস! প্রতিভার জীবনকে ভয় পাইয়ে বিষণ্ণ করে দেবার শক্তি নেই সুনয়নার। অন্য কোনও মেয়ে নয়; নিখুঁত চরিত্রের নীরাজিতা নয়। এ যে সেই প্রতিভা!

এবং প্রতিভা বলেই যে অদ্ভুত একটা মায়ার ছোঁয়া লেগে সুনয়নার আক্রোশটাও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। প্রতিভা আর নিশীথ, বেচারা এই দুটি মানুষ যে দুটি আহত জীবনের মানুষ। অনেক আশা করে দুজনে দুজনের ভালবাসা পেয়ে সুখী হতে চাইছে।

হেসে হেসে আর ঠাট্টা করতে পারে না সুনয়না। সুনয়নার গলার স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে করুণ অভিনন্দনের মত ফিসফিস করে। —তোমরা দুজনেই দেখছি মস্ত মহৎ—আশ্চর্য! ...হ্যাঁ, কিন্তু আমি যে অন্য রকমের খবর পেয়েছিলাম, প্রতিভা।

—কী ?
—শুনেছিলাম, এমন কি নিমন্ত্রণের চিঠিও পেয়েছিলাম, নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথের বিয়ে।
—ঠিকই শুনেছিলে। কিন্তু সে বিয়ে হল না।
—কেন ?
—নিশীথের চরিত্রে নাকি দাগ আছে; কে যেন সে খবর নীরাজিতার বাবা শীতলবাবুকে জানিয়েছে।
—তাইতেই বিয়ে ভেঙে গেল ?
—হ্যাঁ। নীরজিতা সরকারের পাণিগ্রহণের জন্য রাজপোখরাতে গিয়ে দেখতে পেলেন নিশীথ রায়, শীতল সরকারের বাড়ি অলক্তকের ফটক বন্ধ, বাড়িতে কেউ নেই।

সুনয়নার চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে ওঠে। —কী বলছ, প্রতিভা!
—একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি কথা বলছি।
—মানুষকে এমন অপমানও করতে পারে মানুষ ? নীরাজিতারও কি মাথা খারাপ হয়েছিল ?
—জানি না।
—চমৎকার দুর্ঘটনা!
—হ্যাঁ, চমৎকার দুর্ঘটনাই বটে। তা না হলে, আমাকে আর এখানে আসতে হত না।

সুনয়না যেন দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্লান্তভাবে বলে—খুব ভাল করেছ প্রতিভা। তুমি একটা ভদ্রলোকের জীবনকে অপমান থেকে বাঁচিয়েছ। খুব ভাল হল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার কী যেন ভাবতে থাকে সুনয়না। তারপর মুখের চেহারাটা যন্ত্রণাক্ত হয়ে ওঠে। যেন প্রাণপণে মনের ভিতরটা কুণ্ঠার সঙ্গে সংগ্রাম করে আরও কঠোর একটা কৌতূহলের

চঞ্চলতা চেপে রাখতে চেষ্টা করছে সুনয়না। কিন্তু পারছে না। প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে চায় ; বার বার কেঁপে ওঠে সুনয়নার ঠোঁট দুটো।

প্রতিভা বলে—তুমি কী যেন বলতে চাইছ, সুনয়না।

—সামান্য একটা কথা জানবার ছিল, না জানলেও চলে..অর্থাৎ...

—আমি বলতে পারি, তুমি কার কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছ।

—তার মানে...

—তার মানে, মিহির মিত্রের কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছ।

—হ্যাঁ।

—সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। লণ্ডন থেকেই একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, আমাকে ভাবতেই ভয় পায় মিহির মিত্র।

সুনয়না আশ্চর্য হয়, কিসের ভয় ?

—চরিত্রের ভয়।

—কার চরিত্র ?

—আমার।

আবার আনমনার মত বিড়বিড় করে সুনয়না—মানুষ মানুষকে এমন অপমান করতে পারে !

—কিন্তু সেজন্য আর দুঃখ করবার দরকার কি সুনয়না ? মানুষ মানুষকে সম্মান করতে পারে, সেটা তো দেখতে পাচ্ছ।

—কী ?

—নিশীথ আমাকে বিয়ে করেছে। এর চেয়ে বেশি সম্মান কোনও পুরুষ কি কোনও মেয়েকে...

—নিশ্চয়, প্রতিভা। খুব সত্যি কথা। খুব ভাল হল। নিশীথবাবু মানুষের মত মানুষ বলেই...

হঠাৎ কথা বন্ধ করে সুনয়না। আর, প্রতিভাই আশ্চর্য হয়ে যায়। কেঁদে ফেলেছে সুনয়না।

—এ কী ব্যাপার, সুনয়না ? প্রশ্ন করেই প্রতিভা অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

—খুব ভাল হল, প্রতিভা। সুনয়নার চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের শান্ত। সুনয়নার গলার স্বরে যেন নিবিড় এক সান্ত্বনার আবেগ টলমল করে। হঠাৎ যেন সুনয়নার জীবনটাই সুখী হয়ে গেল, পরম নিশ্চিন্ততার আবেশে শান্ত হয়ে গেল।

—চলো প্রতিভা, তোমার ঘরের ভিতরে বসে একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে তারপর চলে যাব। ..তুমি আজই এসেছ ?

—কাল এসেছি।

—সাকচিতে বউভাত হল বোধ হয়।

—হ্যাঁ।

—তোমার জেঠাশ্বশুর হরদয়ালবাবু চমৎকার মানুষ। ওঁরা সবাই নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন ?

—সবাই বড় বেশি খুশি হয়েছে।

সুনয়না হাসে—হওয়াই উচিত। এবার নিজেরা দুটিতে মিলেমিশে খুশি হয়ে আর সুখী হয়ে থাক।

ঘরের ভিতরে ঢুকে প্রতিভার সঙ্গে গল্প করতে করতে সুনয়না যেন নিজের সত্তার অস্তিত্বটাও ভুলেই গিয়েছে। ঘরের চেহারাটা এবার বদলে দিতে হবে, প্রতিভা। এ ঘরে এসব টেবিল চেয়ার রাখবে না। এই ঘর শুধু তোমাদের দুজনের গল্প করবার ঘর। বাইরের কেউ যেন এখানে এসে না বসে।

ঘরের এদিকে-ওদিকে আর আলনার উপর এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা কাপড়-চোপড়ের দিকে তাকিয়ে সুনয়না বলে—আমি গালুডি থেকে তোমার জন্য একজন ঝি পাঠিয়ে দেব। খুব ভাল কাজ জানে, খুব পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মানুষ। চমৎকার ঘর গোছাতে পারে ঝি-টা। তোমার অনেক কাজের ঝঞ্ঝাট বেঁচে যাবে, প্রতিভা।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে দূরের শালবনের আবছায়ার দিকে তাকিয়ে

সুনয়নার মুখরতা যেন আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠে।—এখানে বেড়াবার মত অজস্র ভাল ভাল আর বড় সুন্দর জায়গা আছে, প্রতিভা। নিশীথবাবু হয়ত এবার ঘরকুনো হবার জন্য চেষ্টা করবেন, কিন্তু তুমি বাধা দিও। রোজ সকালে একবার, আর সন্ধ্যায় একবার দুজনে মিলে বেড়িয়ে এসো। ..আচ্ছা, আমি চলি এবার, প্রতিভা। নিশীথবাবুকে বলো, আমি নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। একদিন সময় করে দুজনে গালুডিতে আমার ওখানে যেয়ো, কেমন?

—একটু অপেক্ষা করো সুনয়না। নিশীথের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলেই ভাল হয় না কী?

সুনয়না ছটফট করে ওঠে—না, প্রতিভা। আমি চলি। নিশীথবাবুকে বলো, যেন আমার অভদ্রতাব জন্য কিছু না মনে করেন।

সুনয়নাব সঙ্গে ফটক পর্যন্ত হেঁটে এসে প্রতিভাও গাড়ির কাছে দাঁড়ায়। সুনয়না হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। তাবপর আবার অদ্ভুত রকমের একটা হাসি হেসে প্রতিভার মুখের দিকে তাকায়।—একটা অনুরোধ ছিল, প্রতিভা।

—বলো।

—কালকেই কি যেতে পারবে?

—আমাব পক্ষে না পাববার তো কথা নয়। কিন্তু নিশীথের যদি কোনও কাজ থাকে, তবে...

সুনয়না বলে—তবুও চেষ্টা করো প্রতিভা। একটু তাড়াতাড়ি করো...কালই যদি যেতে পার তবে বড় ভাল হয়...নইলে..

কথা শেষ না করেই চুপ করে গেল সুনয়না।

আর, কনট্রাক্টর চৌহানের গাড়িও শব্দ করে স্টার্ট নিয়ে কালিকাপুরের সড়কের লাল ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে গেল।

গালুডির বাংলোবাড়ির গেটেব দেওদারের ছায়া পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে সুনয়না। একটা কাচের গ্লাস আছাড় খেয়ে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল। বাড়িটার বুকের একটা ভয়ানক পিপাসার স্বপ্ন যেন আর্তনাদ করে উঠেছে। ধীরেন বোস তা হলে কলকাতা থেকে আজই ফিরে এসেছে।

অন্যদিন হলে, এই একটা সামান্য গেলাসের আছাড় খাওয়া শব্দ শুনেই সুনয়নার মুখের উপর এক ঘৃণাব জ্বালা ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু কী আশ্চর্য, সুনয়নার জীবনটা যেন সব অভিযোগের বেদনা হারিয়ে একেবারে হালকা হয়ে ফিরে এসেছে। সুনয়নার লজ্জাহীন রক্তমাংসের আক্রোশগুলিও যেন ভস্ম হয়ে ঝরে গিয়েছে। পৃথিবীর কারও উপর এক বিন্দু রাগ নেই: বরং মনে হয় সুনয়নার প্রাণটাই যেন একটা পঙ্কিল হিংসার রসাতলে তলিয়ে যাবার গ্লানি থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। কালিকাপুরেব দুটি মানুষ, সেই সুন্দর স্বামী-স্ত্রী বেচারাদের সৌভাগ্যকে অভিনন্দিত করে চলে আসতে পেরেছে সুনয়না।

ধীরেন বোস নামে যে মানুষটার হাতের গেলাস খসে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল, সেই মানুষটার উপরেও যে একটুও রাগ হয় না। যেমন আছে থাকুক, যা নিয়ে থাকতে ভাল লাগে তাই নিয়ে ভাল থাকুক মানুষটা। ওকে ঘৃণা করবার কোনও অধিকার নেই সুনয়নার। এতদিন যে ঘৃণা করেছে সুনয়না, সেটা তো সুনয়নারই জীবনের একটা মাতাল অভিমানের রাগ।

ঘবের ভিতরে ঢুকে একবার থমকে দাঁড়ায় সুনয়না। একটা সোফার উপরে কাত হয়ে পড়ে আছে ধীরেন বোস। হুইস্কির বোতল প্রায় খালি হয়ে এসেছে। সোফার কাছে ছোট একটা টেবিলের উপর অনেক কাগজপত্র পড়ে আছে। কলকাতায় গিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে আর শেয়ার-মার্কেটে ভাগ্যের যে কারবার করে এসেছে ধীরেন বোস, তারই নথিপত্রের কতগুলি আবর্জনা।

অন্যদিন হলে, ধীবেন বোসের এই চেহারাব দিকে, নেশায় বিগলিত এই অস্থিহীন ও অর্ধলুণ্ঠিত অবস্থার দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে নিজের ঘরের দিকে চলে যেত সুনয়না। কিন্তু আজ বোধ হয় শুধু একবার ভ্রূক্ষেপ করেই চলে যেতে চায়।

তাকাতে গিয়ে সুনয়নাব চোখে যেন একটা নতুন বিস্ময়ের চমক লাগে। দরজার কাছে থমকে

দাঁড়ায়। ধীরেন বোসের চেহারাটা যেন সোফার উপরে পড়ে আগুনে পোড়া সাপের মত কাতরাচ্ছে। নেশা করে শরীরটাকে এবং সেই সঙ্গে বোধ হয় মন, প্রাণ আর আত্মার সব সাড়াও অবশ করে পড়ে থাকাই ধীরেন বোসের জীবনের নিয়ম। এরকম জ্বালাময় অস্থিরতা নিতান্তই ব্যতিক্রম। সন্দেহ হয় সুনয়নার, কলকাতা থেকে কী একটা জ্বরের জ্বালা কিংবা কঠিন কোনও অসুখের অস্বস্তি নিয়ে গালুডি ফিরে এসেছে মানুষটা ?

দেখতে পেয়েছে ধীরেন বোস, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুনয়না। সুনয়নার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আস্তে আস্তে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ধীরেন বোস। এটাও ধীরেন বোসের অভ্যাসের ব্যতিক্রম। এমন অবস্থায় সুনয়নাকে দেখলে একবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠাই ধীরেন বোসের জীবনের নিয়ম। এবং ধীরেন বোসের সেই বিদঘুটে আনন্দের আওয়াজটাকে ঘৃণা করে তৎক্ষণাৎ অন্য ঘরে চলে যাওয়া সুনয়নারও জীবনের নিয়ম।

আজ কিন্তু চলে যায় না সুনয়না। ধীরেন বোসের চোখের দৃষ্টি যেন একটা নীরব হাহাকার। যেন ভয়ানক একটা ছায়া দেখে ভয় পেয়ে বোবা হয়ে গিয়েছে ধীরেন বোস।

ঘরের ভিতরে ঢুকে, আস্তে আস্তে হেঁটে ধীরেনের কাছে এসে দাঁড়ায় সুনয়না—কখন কলকাতা থেকে ফিরলে ?

—এই তো, সন্ধ্যার একটু আগে !

—চা-খাবার খেয়েছ ?

—অ্যাঁ ? চমকে ওঠে ধীরেন বোস।

—চা-খাবার !

—কোথায় চা-খাবার ? কে দেবে ?

—কেন ? শুকদেব বাড়িতে ছিল না ?

—ছিল।

—তবে ?

—কিন্তু শুকদেব কেন মিছেমিছি আমাকে চা-খাবার খাওয়াবে !

—তুমি চেয়েছিলে ?

—না।

—কেন ?

ধীরেন হাসে—শুকদেবের কাছে চা-খাবার কবেই বা চেয়েছিলাম ? তা ছাড়া...

—কী ?

—বেচারা শুকদেবকে বিরক্ত করে লাভ কী ? ওর কাছ থেকে চেয়ে চা-খাবার খেয়েই বা লাভ কী ?

—কিন্তু আজকাল আমার কাছ থেকেও তো চা-খাবার কোনওদিন তোমাকে চাইতে দেখি না।

—তা তো বটে। তোমাকেও বিরক্ত করতে চাই না বলেই—

সুনয়না হাসে—ভাল কথা...আচ্ছা, একটু ভাল হয়ে বসো ; চা-খাবার আনছি।

সুনয়নার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায় ধীরেন বোস। নেশাক্ত আর অবসন্ন চোখ দুটো যেন একটা মৃত্যুময় অন্ধকারের কবর থেকে হঠাৎ উঁকি দিয়ে একটা অকল্প্য আলোকের দিকে তাকিয়েছে। বড় বেশি বিস্মিত হয়েছে ধীরেনের নেশাক্ত চোখ কিন্তু ততক্ষণে ঘর ছেড়ে চলে যায় সুনয়না।

পনেরো মিনিটও সময় লাগে না। চা-খাবার নিয়ে ধীরেন বোসের সেই অদ্ভুত এক নতুন জাগরণের দুই চোখের বিহ্বল দৃষ্টির কাছে এসে দাঁড়ায় সুনয়না। চা-খাবার খায় ধীরেন বোস ; আর সুনয়না চুপ করে দাঁড়িয়ে ধীরেনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জানে না, এবং হিসাবও রাখে না সুনয়না, চা-খাবার খেয়ে একটা হাত আলগাভাবে এগিয়ে দিয়ে কতক্ষণ ধরে বসে আছে ধীরেন। বুঝতে পেরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে সুনয়না। এক গেলাস জল নিয়ে এসে নিজেরই হাত দিয়ে ঘষে ঘষে ধীরেনের শিথিল হাতটাকে ধুয়ে দেবার পর তোয়ালে খোঁজে।

ধীরেনের হাতটাকে মুছে দেবার পর আবার চুপ করে দাঁড়ায়। আস্তে একবার হাঁপ ছাড়ে সুনয়না ; তার পরেই চলে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দেয়।

ধীরেন বলে—একটা চিঠি ছিল।

মুখ ফেরায় সুনয়না।—চিঠি ?

—হ্যাঁ। রাজপোখরা থেকে শীতলকাকা আমাকে লিখেছেন।

সুনয়নার হাতে দুটো চিঠি তুলে দিয়ে ধীরেন বলে—সেই সঙ্গে আর একটা চিঠিও আছে। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতিবাবু শীতলকাকাকে যে চিঠিটা লিখেছেন।

ধীরেন বোসের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, অবিচল ও নিষ্কম্প মূর্তি নিয়ে চিঠি দুটো পড়তে থাকে সুনয়না ; এবং পড়া শেষ হতেই চিঠি দুটো টেবিলের উপর রেখে দেয়।

ধীরেন বোসের স্ত্রী সুনয়না বোসের এই শান্ত ও সুন্দর রক্তমাংসের এক ভয়ঙ্কর অনাচারের তদন্ত করে যেন সংসারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করেছে এই চিঠি। কিন্তু একটিও মিথ্যে কথা বলেছে কি ? একটিও না। একটুও বাড়িয়ে লেখেনি খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতিবাবু ; সুনয়না বোসের চরিত্র একটা অভিশাপ মাত্র। নিশীথ রায়ের জীবনকে ক্লেদাক্ত করেছে সুনয়নার নিঃশ্বাসের গোপন দুঃসাহস।

কিন্তু কী আশ্চর্য, সুনয়নার শান্ত ও গম্ভীর মুখের উপর একটা ক্ষীণ হাসির রেখা যেন দূর প্রদীপের আলোর মত মিটমিট করে। তারপরেই আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সোফার কাছে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে ধীরেনের মাথায় হাত রাখে সুনয়না।

ধীরেন বোসের নেশাক্ত চোখের বিস্ময়কে আবার নতুন করে চমকে ওঠবার সুযোগ দেয় না সুনয়না। এক হাতে ধীরেনের মাথা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। ধীরেনের মাথার উপর নিজেরও মাথাটাকে কাত করে পেতে দেয় ; আর, ধীরেনের কপালে হাত বোলাতে থাকে। তারপর...

তারপর বোধ হয় একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল ধীরেন বোসের অলস সত্তাটাই। যখন হঠাৎ চোখ মেলে তাকায় ধীরেন তখন বুঝতে পারে, অনেকক্ষণ হল চলে গিয়েছে সুনয়না। দেয়ালঘড়ির কাঁটা রাত ন'টার ঘর পার হয়ে গিয়েছে , শুধু টিকটিক করে বাজছে ঘরের শূন্যতা।

সোফা থেকে নামে ধীরেন। চটি পায়ে দিতে ভুলে যায়। বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠে ধীরেন। যেন সুনয়নাকে কী একটা কথা বলবার ছিল ; এবং সে কথা না শুনেই চলে গিয়েছে সুনয়না।

ঘুমিয়ে পড়েছে কি সুনয়না ? ঘর থেকে বের হয়ে এবং বারান্দা পার হয়ে সুনয়নার ঘরের ভিতর ঢোকে ধীরেন বোস। হ্যাঁ ঠিকই সন্দেহ করেছিল ধীরেন। ঘুমিয়ে পড়েছে সুনয়না। কিন্তু বিছানার উপরে নয়। একটা চেয়ারের উপর, একেবারে নিঝুম হয়ে বসে আছে সুনয়না, মাথাটা যেন দুর্ভর ক্লান্তির ঘোরে একদিকে কাত হয়ে আছে। চোখ দুটো কুঁচকে আছে ; আর চোখের কোলের সিক্ত কাজল কাদা হয়ে রয়েছে।

সুনয়নার হাতে ছোট একটা শিশি। কোলের উপর ছোট হাত-ব্যাগটা হাঁ করে পড়ে আছে।

হাত বাড়িয়ে সুনয়নার হাতের শিশিটাকে আস্তে আস্তে তুলে নেয় ধীরেন।

চমকে ওঠে, চোখ মেলে তাকায় সুনয়না, আর শিশিসুদ্ধ ধীরেনের হাতটাকে চেপে ধরে।

হেসে ফেলে ধীরেন।—এটা আমারই দরকার ; তোমার দরকার নয়।

—ছিঃ ! শিশিটা কাড়বার চেষ্টা করে সুনয়না।

ধীরেন হাসে—তা হয় না সুনয়না। আমাকে যেতে দাও।

—কিন্তু তাতে কি আমার যাওয়া তুমি আটকাতে পারবে ?

—তা জানি না। তোমার যাবার ইচ্ছে থাকলে যেয়ো ; কিন্তু আমাকে আগেই যেতে হবে।

আরও শক্ত করে, দু হাত দিয়ে ধীরেনের হাতটাকে যেন খিমচে ধরে সুনয়না।—একটা দয়া করবে ?

—বলো।

—তোমার পায়ে পড়ি ; আমাকে আগে যেতে দাও।

সত্যিই, সুনয়না যেন একটা দুর্বার আনন্দের জ্বালায় হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে ; আর ধীরেন বোসের

চটিহীন পা দুটোর উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে, সেই হাত মাথায় ছুঁইয়ে, আবার শক্ত হয়ে দাঁড়ায় সুনয়না।

ধীরেন তবু অবিকার ও অবিচল।—তা হয় না, সুনয়না। বড় জোর...

—কী?

—বড় জোর এই বিষ দু ভাগ করে, দুজনে এক সঙ্গেই...

চেঁচিয়ে ওঠে সুনয়না।—ঠিক, ঠিক বলেছ। তবে আর দেরি করো না লক্ষ্মীটি; দয়া করে আমার পাশে বসো।...এসো...

আয়না-টেবিলের উপর থেকে ছোট একটা গেলাস হাতে তুলে নিয়ে সুনয়নারই সঙ্গে এক চেয়ারের উপর বসে ধীরেন বোস। শিশির ভিতরে যে শান্ত ও সুন্দর ক্ষমার মধুরতা তরল হয়ে টলটল করছে, সে মধুরতাকে গেলাসে ঢেলে দু ভাগ করে ধীরেন।

সুনয়নার হাতে শিশিটা, আর ধীরেনের হাতে ছোট গেলাস। সুনয়নার মুখের দিকে তাকায় ধীরেন।

—কী বলছ?

—মনে কোনও দুঃখ নেই তো সুনয়না?

—না।

—কোনও রাগ?

—একটু না। কিন্তু তুমি?

—কী?

—আমার উপর কোনও ঘেন্না..

—ছিঃ।

—তবে?

সুনয়নার ঠোঁট দুটো যেন বিপুল পিপাসার আবেগে থরথর করে কাঁপছে। যাবার আগে একটা চরম স্পর্শের স্বাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় সুনয়না।

এক হাতে সুনয়নার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নেয় ধীরেন, সুনয়নার দুই ঠোঁটের সেই শিহরিত পিপাসার দিকে লোভীর মত তাকায়। নিশ্চিন্ত হতে চায় ধীরেনও। এবং বুঝে নিতে চায়, শেষ পর্যন্ত ভালবেসেই চলে যাওয়া গেল। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?

শেষ চুমোর তপ্ততা যেন শান্ত হতে চায় না। বিষের ছোঁয়া বরণ করে ভিন্ন আর ছিন্ন হবার আগে দুটি জীবনের ক্ষত যেন মিলনের উৎসবে বিহ্বল হয়ে উঠেছে।

বাইরে ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে সময়ের শব্দটা যেন আচমকা ঝঙ্কারের মত বেজে ওঠে। ধীরেন বলে—আমার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে, সুনয়না। বুকের ভেতরটা কেমন যেন হাঁসফাঁস করছে।

—কেন?

ধীরেনের দু চোখ থেকে ঝরঝর করে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে থাকে।—এভাবে গলাগলি হয়ে দুজনে মরে না গিয়ে এভাবে বেঁচে থাকলে ক্ষতি কী হত, সুনয়না।

—কী বললে? মুখ তুলে ধীরেনের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সুনয়নার হাতের শিশিটা যেন পিছলে পড়ে যেতে চায়।

—এভাবে দুজনের বেঁচে থাকার সাধ্য কি হবে না?

—খুব সাধ্য হবে।

ধীরেনের হাত থেকে গেলাসটা কেড়ে নিয়ে, গেলাস আর শিশি, দুটি বস্তুকেই একসঙ্গে আঁকড়ে ধরে জানালার বাইরে ছুঁড়ে দেয় সুনয়না।

সুনয়নাকে নিয়ে গাড়িটা সড়কের লাল ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে ফটকের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতিভা। প্রতিভার মনের ভাবনাগুলিকে যেন একটা দুরন্ত হেঁয়ালির মধ্যে ফেলে রেখে, আর নিজের জীবনটাকে সব হেঁয়ালির গ্রাস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে,

একেবারে হালকা হয়ে চলে গেল সুনয়না।

ভয় পেয়েছে কি সুনয়না ? কিন্তু কই, সুনয়নার চোখে তো ভয়ের কোনও ছায়া দেখা গেল না। ভয় পেলে কি মানুষের মুখ অমন শান্ত ও সুন্দর হাসিতে ছেয়ে যেতে পারে ?

তবে কি হার মেনে, হতাশ হয়ে আর ক্লান্ত হয়ে নিজের জীবনের একটা বিদ্রূপের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ছটফটিয়ে পালিয়ে গেল সুনয়না ?

তাও যে মনে হয় না। যার বুকের ভিতরে আক্রোশের জ্বালা থাকে, বিফল স্বপ্নের অভিমান থাকে, কিংবা ব্যর্থ অহংকারের বেদনা থাকে, সে কি এমন করে খুশি হয়ে, শুভ ইচ্ছার উপহার দিয়ে আর অবাধ প্রীতি জানিয়ে চলে যেতে পারে ?

তবে কি একটা জয়ের আনন্দে আকুল হয়ে চলে গেল সুনয়না ?

ফটকের কাছ থেকে সরে আসে ; আস্তে আস্তে হেঁটে আবার ঘরের দিকে ফিরে যায় প্রতিভা। এবং বারান্দার উপর উঠে চেয়ারের উপর বসে পড়তেই আশ্চর্য হয়ে নিজেরই চোখের উপর হাত বোলায় প্রতিভা। ভিজে গিয়েছে চোখ দুটো। কিন্তু বুঝতে পারে না, কার জন্য এবং কিসের মায়ায় চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল ?

কার জন্য দুঃখ হয় ? সুনয়নার জন্যই বোধ হয়। কিন্তু নিশীথের মুখটাও মনে পড়ছে কেন ? সে বেচারার বুকের ভিতরে কোনও বেদনা চিরকালের আক্ষেপ হয়ে লুকিয়ে রইল না তো ?

বুঝতে কি আর কিছু বাকি আছে ? কেন এসেছিল সুনয়না, এই প্রশ্ন প্রতিভার কাছে এখন আর না-বোঝবার মত কোনও রহস্য নয়। কিন্তু সুনয়না যে সেই রহস্যকে ছিন্ন ভিন্ন করে, একেবারে ধুলো করে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। সুনয়নার চোখের সেই হাসির ছায়াটা যেন প্রতিভার মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই দপ করে হেসে উঠল আর নিবে গেল। তবে কি প্রতিভারই জীবনের উপর করুণা করেছে সুনয়না ?

হয়ত তাই। কিন্তু শুধু তাই নয়। কালিকা মাইনসের ম্যানেজার নিশীথ রায়ের জীবনেরও উপর সুনয়নার মায়া হঠাৎ খুশি হয়ে হেসে ওঠেনি কি ? এবং এই মায়া কি নিতান্তই মায়া ? কিংবা...

প্রতিভার ভাবনাটা ভুল করেনি বোধ হয়। নিশীথ রায়কে সত্যিই ভালোবেসেছে সুনয়না। তা না হলে, নিশীথ রায়ের জীবনের ঘরে প্রতিভাকে দেখতে পেয়ে এত খুশি হয়ে উঠবে কেন সুনয়না ? যেখানে আঘাত হানবার সুযোগ ছিল, আঘাত হানা উচিত ছিল, সেখানে সান্ত্বনা দিয়ে আর সাহস দিয়ে, এবং যেন নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল সুনয়না। সুনয়নার মুখটা মনে পড়লে প্রতিভার মাথাটা আস্তে আস্তে হেঁট হয়ে যায়।

কালিকাপুরের শালবনের ছায়াময় কালো চেহারা আর দূরের পাহাড়ের চেহারা হঠাৎ বদলে গিয়েছে মনে হয়। দেখতে পায় প্রতিভা, যেন হেসে ঢলঢল করছে চারিদিকের মাঠ, পাহাড় আর শালবন। সন্ধ্যা হতেই পূবের আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ নিশ্চয়।

বারান্দার আলো দপ করে জ্বলে ওঠে। বেয়ারাটা এসে সুইচ টিপছে। প্রতিভার হাতের আছে একটা চিঠি দিয়ে চলে যায় বেয়ারা।

রাজপোখরার চিঠি ; শিবাদাসবাবু লিখেছেন। চিঠির লেখা পড়তে পড়তে প্রতিভার চোখ দুটো আবার জলে ভরে যায়। চিঠির কথাগুলি যেন একটা ছোট ছেলের কান্নাহাসির মত করুণ-মধুর যত কথা। বোঝা যায়, চিঠি লিখতে লিখতে শিবদাস দত্তের চোখ দুটো বার বার কেঁদেছে আর হেসেছে : ভাল আছিস তো, মা ? আমার যে এখুনি ছুটে গিয়ে তোকে একবার কোলে নিতে ইচ্ছে করছে।...নিশীথ ভাল আছে তো ?...কোনও ভাবনা করিস না, প্রতিভা...মানুষের মিথ্যে কথা শেষ পর্যন্ত কারও ক্ষতি করতে পারে না।

চিঠির শেষ লাইনে একটি কথা লিখেছেন শিবদাস দত্ত, একটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু শিবদাস দত্তের এই আক্ষেপের ভাষা যেন একটা প্রাণখোলা হাসির প্রতিধ্বনি।—শীতলবাবু একটা অদ্ভুত কথা বললেন ; বেচারা নিশীথের চরিত্রের নানারকম অপবাদ করে একটা ভয়ানক বাজে চিঠি বিভূতিই লিখেছে। আমি সে চিঠি পড়েছি আর বার বার হেসেছি।

প্রতিভার চোখে-মুখে যেন একটা হঠাৎ প্রসন্নতার দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে। বিভূতি,

খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের সেই বিভূতি, লোহার মত কঠিন যার চরিত্রের শুদ্ধতা, সেই ভদ্রলোকই তা হলে শীতল সরকারের মেয়ে নীরাজিতার জীবনকে কলুষের ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়েছে !

হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় প্রতিভা। সুইচ টিপে বারান্দার আলো নিবিয়ে দেয়, আর চাঁদের আলোতে ঢলঢল করছে কালিকাপুরের মাঠ পাহাড় আর শালবনের যে শোভা, তারই দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিভূতিকে যে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে। জানে না বিভূতি, এখন কল্পনাও করতে পারছে না বিভূতি, প্রতিভার জীবনের কত বড় উপকার সে করে ফেলেছে ! বিভূতির চিঠি অলক্তকের উৎসবের আলপনা মুছে দিয়েছিল বলেই না প্রতিভা আজ নিশীথ রায়ের ভালবাসার এই ঘরে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে।

যেন প্রতিভার মুখের ভিতর থেকে হাসিটা বার বার উথলে উঠছে। ভাগ্য ভাল প্রতিভার, প্রতিভাকে ঘৃণা করেছিল বিভূতি। আরও ভাগ্য, নিশীথকেও ঘৃণা করে বিভূতি। তা না হলে, আজ যে শীতল সরকারের মেয়ে নীরাজিতা এই বাড়ির এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কালিকাপুরের পূর্ণিমা-চাঁদের আলোতে ঢলঢল ওই শালবন আর পাহাড়ের শোভা দু চোখে ভরে দেখত।

ফটকের কাছে গাড়ির শব্দ। দেখতে পায় প্রতিভা, হ্যাঁ, নিশীথেরই গাড়ি। গাড়ির হেড-লাইট জ্বলছে না। নিশীথের গাড়িটাও যেন এই জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা গায়ে মেখে আস্তে আস্তে হেসে গড়িয়ে বাড়ি ফিরছে।

বারান্দার উপর উঠে আশ্চর্য হয় নিশীথ। —তুমি কি আমার আসতে দেরি দেখে...

প্রতিভা হাসে। —না, তোমার আসতে দেরি দেখে ভাবনা করব আমি সে মেয়ে নই।

নিশীথও হাসে। —এতটা তুচ্ছ করো না, প্রতিভা !

নিশীথের কাছে এগিয়ে গিয়ে, নিশীথের গলা দু হাতে জড়িয়ে হেসে ওঠে প্রতিভা। —বাবার চিঠি এসেছে।

—তাই বলো। সেজন্য এত খুশি।

—শুধু সেজন্য নয়।

—তবে ?

—মনে পড়ল, তোমার বন্ধু বিভূতিবাবু বড় উপকারী মানুষ !

নিশীথ হাসে—হ্যাঁ, বিভূতি বেচারা আমার একটা উপকার করেছে, স্বীকার করতেই হবে।

—তার মানে ?

—বিভূতি তোমাকে ঘেন্না করতে পেরেছিল বলেই না আমি আজ...

প্রতিভার মাথায় হাত বুলিয়ে নিশীথ মুগ্ধ হয়ে বলে—আজ তোমাকে এখানে চোখের এত কাছে দেখতে পাচ্ছি।

—বিভূতিবাবু কি তোমাকে শ্রদ্ধা করে ?

—তা জানি না। তবে অশ্রদ্ধাই বা করবে কেন ?

সুইচ টিপে আলো জ্বেলেই নিশীথের হাতের কাছে শিবদাস দত্তের চিঠিটা এগিয়ে দেয় প্রতিভা।

চিঠি পড়েই হো-হো করে হেসে ওঠে নিশীথ। —বিভূতিটার মাথা খারাপ। ...যাই হোক বিভূতির কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

—কেন ?

—বেচারা চেষ্টা করে শীতলবাবু আর তাঁর মেয়ের উপকার করবার জন্য এভাবে অলক্তকের উৎসবটা ভেঙে দিতে পেরেছে বলেই তো তোমাকে...

প্রতিভাকে বুকের কাছে টেনে নেয় নিশীথ। আস্তে আস্তে ফিসফিস করে প্রতিভার কানের কাছে যেন জীবনের একটা সৌভাগ্যের আর তৃপ্তির গুঞ্জরন শোনাতে থাকে, ভালই করেছে বিভূতি।

—একটা কথা...

—কী ?

—শীতলবাবুর কাছে তোমার নামে এরকম অপবাদের চিঠি দিয়েও বিভূতিবাবু ফুল উপহার

পাঠিয়েছিল কেন ?

—ফুল ? ও, হ্যাঁ...মনে পড়েছে, একঝুড়ি ফুল পাঠিয়েছিল বিভূতি।

—কেন ?

—এটাও বিভূতির একটা অভ্যাস, একটা স্টাইলও বলতে পাব। চিরকাল বিভূতিকে তো এইরকম নানা কাণ্ড করতে দেখছি।

—তার মানে ?

—তার মানে, বেচারা মিছেমিছি নানারকম কাণ্ড করে ফেলে। যা না করলেও চলে, তাও করে।

—কিছুই বুঝতে পারছি না।

—যেমন ধরো ; বি-এস্‌সি পরীক্ষাতে যে কাণ্ডটা করেছিল বিভূতি। পরীক্ষার হলে বসে অমন বেপরোয়া হয়ে, এত বড় একটা বই আলোয়ানের আড়ালে রেখে, গার্ডের চোখে ধুলো দিয়ে...ওভাবে দশ-বারোটা নম্বর বেশি পাওয়ার জন্য...না, কোনও দরকার ছিল না। তবু...

—এইবার বুঝলাম।

—ওর চাকরিটার কথাই ধরো-না কেন। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের সাহেব-মালিক বিভূতির সেই চমৎকার চালাকিটা ধরতেই পারেনি। নইলে আমাদের ত্রিপুরারি সেনেব মত এত যোগা ক্যান্‌ডিডেটকে বাদ দিয়ে বিভূতিকে চিফ সুপারভাইজার কববে কেন ?

—সেটা আবার কী ব্যাপার ?

—ত্রিপুবারি সেনকেই চিফ সুপাবভাইজার করা হবে, খবসোয়ান ম্যাঙ্গানিজেব বিলাতি মালিকেবা একরকম সিদ্ধান্ত করেই ফেলেছিলেন ; বিভূতিও ওই কাজের জন্যে দরখাস্ত কবেছিল ; কিন্তু বিভূতিব চেয়ে ত্রিপুরারি দশগুণ বেশি কোয়ালিফায়েড। ওই কাজ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই বিভূতির পক্ষে ছিল না, কিন্তু বিভূতি দমবার পাত্র নয়। বিভূতি এক পুলিশ অফিসারকে বেশ কিছু টাকা খাইয়ে ত্রিপুবারির নামে একটা খারাপ রিপোর্ট করিয়েছিল যে, ত্রিপুরারি আগে বেভল্যুশনাবি দলে ছিল, এবং এখনও হাড়ে-হাড়ে অ্যান্টি-ব্রিটিশ। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের ডিরেক্টর-বোর্ড এই রিপোর্ট পেয়েই ত্রিপুরারির সম্পর্কে সাবধান হয়ে গেল। কাজটা পেয়ে গেল বিভূতি।

- -চমৎকাব ব্যাপার।

—টাকা-পয়সাব ব্যাপারেও বিভূতির এরকম খেয়াল আছে ; যা না করলেও চলে, তাই করবে।

—কী রকম !

—বিভূতি বেশ বড়লোকেব ছেলে। চাকরি-বাকরি না করলেও ওর চলে যাবে, কোনও অভাবেই পড়তে হবে না। কিন্তু টাকার ওপর বিভূতির বড় মায়া। কোনও চ্যারিটিতে কোনওদিন একপয়সা চাঁদা দিয়েছে বলে মনে পড়ে না। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, কারও কাছে ধার স্বীকার করে না বিভূতি।

—তার মানে ?

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নিশীথ।—কারও কাছ থেকে টাকা বা কোনও জিনিস ধার নিলে সেটা মনেই রাখতে পারে না বিভূতি ; এমনই ভুলো মন। গালুডির চৌহানবাবুর সঙ্গে বিভূতির একবার কলকাতার রাস্তায় দেখা হয়েছিল। আলিপুরে একটা বাড়ি কেনবার জন্য সেদিনই পাঁচ হাজার টাকা বায়না করবে বলে ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গিয়েছিল বিভূতি। কিন্তু ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। অগত্যা চৌহানবাবুর কাছ থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কাজ চালিয়ে নিয়েছিল। চৌহানবাবু কোনও রসিদ চাননি, আর বিভূতিও দেয়নি। বাস্...তারপর এই তো পুরো তিনটি বছর পার হয়ে গিয়েছে, বিভূতি এখনও মনে করতে পারছে না যে, চৌহানবাবুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। চৌহানবাবু বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন।

—আরও চমৎকার ব্যাপার।

—বিভূতির এসব কাণ্ড দেখতে ভাল লাগে না ঠিকই, এরকম কাণ্ড করা উচিতও নয়, কিন্তু একটি বিষয়ে বিভূতির প্রশংসা না করে পারি না।

—কী ?

—সেটা তুমিও শুনেছ। বিভূতির চরিত্র নিখুঁত ; বিভূতি আমার বিশ বছরের চেনা বন্ধু ; কিন্তু

শতমুখে স্বীকার করব, জীবনে সেরকম কোনও ভুল করেনি বিভূতি, যে ভুল...

—কী ?

নিশীথ গম্ভীর নয়, এবং গম্ভীর মুখটা ধীরে ধীরে করুণ হয়ে উঠতে থাকে। —যে ভুল আমি করেছি।

প্রতিভার সোনার ফ্রেমের চশমার আড়ালে চোখের তারা দুটো যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে জ্বলে ওঠে। —তুমি কোনও ভুল করোনি, নিশীথ !

—কী বললে ?

—আমিও কোনও ভুল কবিনি। আমি চেঁচিয়ে গর্ব করে বলছি, নিশীথ, তোমার আমার ওই ভুলকেও আমি নমস্কার করতে পারি, কিন্তু তোমার বন্ধু বিভূতির চরিত্রকে ঘেন্না করতেও ঘেন্না হয়।

—বিভূতির উপব খুব রাগ করছ বলে মনে হচ্ছে।

নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে এইবার প্রতিভার চোখ দুটো সত্যই রাগ করে ছটফট করতে থাকে। —বড় ভুল কথা বললে নিশীথ।

—অ্যাঁ ?

হেসে ফেলে প্রতিভা ; আর তেমনই ছটফট করে সুইচ টিপে আলো নিবিয়ে দিয়ে নিশীথের বুকের সঙ্গে আরও নিবিড় হয়ে এলিয়ে পড়ে। —বিভূতিকে সত্যই ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে, নিশীথ। বিভূতি তোমাব যে উপকার করেছে, তার চেয়ে বড় উপকার হয় না !

—কী ?

—আমাকে বিয়ে করেনি বিভূতি, এর চেয়ে বড় উপকার আমার জীবনে আর কী হতে পারে ? বিভূতি বেচারা আমার মুক্তিদাতা।

সত্যিই যেন মুক্তির আনন্দে উচ্ছল একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে প্রতিভা।

নিশীথের নিঃশ্বাস হঠাৎ যেন কেঁপে ওঠে, আমাকেও মুক্তি পেতে হবে—

হেসে ওঠে প্রতিভা ; এবং নিশীথও প্রতিভার চমকে-ওঠা বুকের শিহরটুকু অনুভব করতে পারে। নিশীথ বলে—কিন্তু তুমি সেজন্য কিছু ভেবো না, প্রতিভা। আমি কাউকে ভয় করি না ; কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পাববে না।

প্রতিভা বলে, আজ সন্ধ্যার একটু আগে সুনয়না এসেছিল।

চমকে ওঠে নিশীথ , এবং বুঝতে পারে নিশীথ, তার বুকেব এই টিপটিপ শব্দ, ভীরুতার এই আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে প্রতিভা।

নিশীথের হাত ধবে প্রতিভা। —চলো ঘরের ভিতবে গিয়ে বসি।

ঘরেব ভিতরে না গিয়ে, দু পা এগিয়ে গিয়ে বাবান্দার চেয়ারের উপর ক্লান্তভাবে বসে পড়ে নিশীথ। চেযাবেব গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিভা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর, যেন বুকের ভিতরের ভীরু নিশ্বাসগুলির সঙ্গে মনে মনে সংগ্রাম করে আবও ক্লান্ত হয়ে যাবার পর, আস্তে একটা হাত তুলে প্রতিভার হাত ধরে নিশীথ। —তোমাকে অপমান কবেনি তো সুনয়না ?

—না।

—আমাকে অপমান করে গিয়েছে বোধ হয় ?

—না।

—কেন ? আমাকে অপমান করা ছাড়া সুনয়নার তো এখানে আসবার কোনও দরকাব হতে পারে না।

—তা জানি না। কিন্তু সুনয়না তোমাকে গালুডিতে গিয়ে চা খেয়ে আসবার নেমন্তন্ন করে গিয়েছে।

—দুঃসাহস !

প্রতিভা হাসে—কার দুঃসাহস ?

—সুনয়নাব ; আমাকে গালুডিতে গিয়ে চা খেতে নেমন্তন্ন করা যে তোমাকে অপমান করা।

—আমাকেও নেমন্তন্ন করেছে সুনয়না।

—সে কী ! আশ্চর্য হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ।—তোমাকে নেমন্তন্ন করে কেন ? তোমাকে চেনে না কি সুনয়না ?

—হ্যাঁ। সুনয়না যে আমার অনেকদিন আগের চেনা বন্ধু।

—তাই বলো, বন্ধু বলেই চক্ষুলজ্জার খাতিরে নেমন্তন্ন করে ফেলেছে। নইলে...

—কী ?

—নইলে আমার সামনে তোমাকে, আর তোমার সামনে আমাকে অপমান না করে খুশি হত না সুনয়না।

—সুনয়নাকে এরকম ভয়ানক মানুষ বলে মনে করছ কেন ?

—জানি বলেই মনে করছি। তুমি কিছুই জান না।

—কিন্তু আমাকে বন্ধু বলে নেমন্তন্ন করেনি সুনয়না।

—তবে ?

—তোমার স্ত্রী বলে।

—অসম্ভব।

—বিশ্বাস করো, নিশীথ। সুনয়না খুব খুশি হয়েছে।

—কিসে খুশি হল ?

—আমাকে এখানে দেখতে পেয়েছে বলে।

—বুঝলাম না প্রতিভা।

—বুঝতে পার না কেন নিশীথ ? আমাকে যে চেনে জানে, আমার ভুল নিজের চোখে দেখেছে সুনয়না, আমার জন্যে একদিন কেঁদে ফেলেছিল সুনয়না।

বলতে বলতে মাথা হেট করে প্রতিভা। এবং প্রতিভার সেই হেঁটমাথা-মূর্তির দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে নিশীথ। তারপর আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এসে প্রতিভার চোখে হাত দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ—ছিঃ, প্রতিভা ! সেজন্য সুনয়নাকে ভয় করবার কোনও দরকার হয় না।

—সুনয়নাকে ভয় করছি না, নিশীথ। ভয় করছি নিজেকে।

—কেন ?

—সহ্য করতে পারব কিনা বুঝতে পারছি না।

যেন প্রতিভার জীবনের পথে একটা অতি নিষ্ঠুর পরীক্ষার আসন্নতার ছায়া দেখতে পেয়েছে প্রতিভা। সেই পরীক্ষার কাছে পরাভব যেন মানতে না হয়; তারই জন্য প্রাণের ভিতরে একটা প্রতিজ্ঞার জোর ভরে রাখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে প্রতিভা।

—কী সহ্য করতে হবে বলে ভাবছ, প্রতিভা ?

—তোমার শুনে কোনও লাভ নেই, ক্ষতিও নেই, নিশীথ। জিজ্ঞাসা করো না।

—আমি বলতে পারি।

প্রতিভা হাসে।—তবে বলো।

—ভাবছ, সুনয়না যদি আমাকে আবার...অসম্ভব, প্রতিভা, আমি আত্মহত্যা করতে পারব, তবু সুনয়নার ছায়ার কাছেও আর দাঁড়াতে পারব না।

—কিন্তু যদি বুঝতে পার যে, সুনয়না তোমাকে ভালবাসে ? তবে ?

হেসে ফেলে নিশীথ।— যদি পশ্চিমে সূর্য ওঠে, তবে ?... তোমার প্রশ্নটারই কোনও অর্থ হয় না, প্রতিভা। সুনয়নার মত মানুষ ওসবের ধার ধারে না। সুনয়না একটা বেপরোয়া উৎপাত মাত্র। মানুষকে নিজের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দেওয়াই ওর প্রাণের একটা আনন্দ।

প্রতিভা হাসে।— কিন্তু যদি সত্যিই সুনয়না তোমাকে ভালবেসেছে বলে তুমি বুঝতে পার, তবে..

—যদি একটা কাল্পনিক ঘটনা বলে সেটা মেনেই নিই, তবু তাতেও কিছু আসে-যায় না। নিশীথ রায় সুনয়নাকে কোনওদিন ভালবাসেনি, ভালবাসতেও যাবে না। তুমি মিছিমিছি...

—না আমিও সেজন্য ভাবি না। সুনয়না যদি তোমাকে ভালবাসে, তবে আটকাবে কে ? আর সেটা তোমার দোষই বা হবে কেন ? কিন্তু...

—আর কিন্তু কেন ? কোনও কিন্তু নেই।

—যাই হোক ; তা হলে গালুডিতে গিয়ে সুনয়নার বাড়িতে চা খেয়ে আসি চলো।

—আমি যাব না।

—আমি যাব কি ?

—সেটা তোমার ইচ্ছে। আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় যে, তুমি যাও।

—কিন্তু তুমি না গেলে, শুধু আমি একা গেলে সুনয়নাকে অপমান করা হয় না কি ?

—আমার জীবনেব মানের উপর কোনও দরদ আছে সুনয়নার যে আমাকে ওর মান-অপমানের কথা ভাবতে হবে ?

—আছে।

—কী ? ভ্রুকুটি করে তাকায় নিশীথ।

—সুনয়না বলতে গেলে আমাদেরই দুজনেব কথা ভেবে অনেক কথা বলেছে।

—কী কথা ?

—তোমার সঙ্গে বোজ বেড়াবার কথা।

—তার মানে ?

—হ্যাঁ, সুনযনা একটা ঝি পাঠিয়ে দেবে বলে গিয়েছে ; খুব ভাল কাজ জানে ঝিটা ; আমাকে কোনও ঝঞ্ঝাট সইতে হবে না।

বাবান্দার আলো জ্বালিয়ে প্রতিভার মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে নিশীথ। যেন দেখতে চায় নিশীথ, প্রতিভার চোখ দুটো হঠাৎ ঠাট্টার আবেগে হাসছে না তো ? নইলে এসব আবোল-তাবোল কথা বলে কী লাভ হচ্ছে প্রতিভার ?

প্রতিভা বলে—সুনয়নার ইচ্ছে, এই ঘরের ভিতরে কোনও চেয়াব-টেবিল থাকবে না। এই ঘরটা শুধু তোমার আমাব জন্য একটা নিরিবিলি ঘর হবে।

—সুনযনাব এসব কথা বলে লাভ কী ?

—সুনযনা তোমাব ভাল চায়।

—আমাব ভাল চেয়েই বা সুনয়নার লাভ কী ?

—সুনযনা তোমাকে ভালবাসে।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় নিশীথ। এবং অনেকক্ষণ পাব হয়ে যাবার পরেও যখন কথা বলে না নিশীথ, তখন প্রতিভাই কথা বলে—তা হলে চলো।

—আজ এত বাতে কেমন করে যাব ? আজ নয়।

—কবে যাবে ?

—একদিন যাওযা যাবে।

—কিন্তু সুনযনা যাবার সময় বিশেষ একটি অনুরোধ করে গিয়েছে।

—কী ?

—যেন কালই আমবা যাই। যেন দেরি না করি।

—কী ? নিশীথেব চোখ দুটো যেন একটা বিভীষিকার ছায়া দেখে চমকে উঠেছে।

—হ্যাঁ, কালই একবার গালুডি যাবাব জন্য চেষ্টা করতে বলে গিয়েছে সুনয়না, নইলে..

—নইলে কী ?

—সে কথা বলেনি সুনয়না।

হাত বাড়িয়ে প্রতিভার একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে নিশীথ—প্রতিভা !

—বলো।

—সুনয়না বোধ হয়...আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে, প্রতিভা ; সুনয়না যেন ভয়ানক কিছু করবে বলে মনে হচ্ছে—

—কেমন করে বুঝলে ?

—সে মানুষ এরকম ভাষায় কথা বলে না। কোনওদিন বলেনি। এ ভাষা সুনয়নার মুখে একেবারে নতুন ভাষা। সুনয়না বোধ হয় চিরকালের মত সরে যাবার মতলব করেছে।

—কোথায় সরে যাবে ?

ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ—তুমি বড় ভুল করেছ, প্রতিভা।

প্রতিভার মুখ করুণ হয়ে যায়—কী ভুল করলাম ?

—তুমি সুনয়নার কথার অর্থ বুঝতে পারনি। ছি-ছি, আমাকে তখনই যদি একবার খবর পাঠাতে।

—তবে কী হত ?

—তবে সুনয়নাকে আটকে রাখতাম।

—আটকে রেখে কী লাভ হত ?

—আঃ, একটা মানুষ নিজেকে সহ্য করতে না পেরে প্রাণটারই ইতি করে দিতে চায়, তাকে আটকে রেখে দুটো ভাল কথা বলে সান্ত্বনা দিয়ে, তাকে তো বুঝিয়ে দিতে পারা যেত যে, না এরকম হতাশ হতে নেই। সুখী হয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার তোমারও আছে।

—আমি এতটা ভাবতে পারিনি নিশীথ ; সুনয়নার কথা শুনে একটা খটকা লেগেছিল, এই মাত্র।

চুপ করে বাইরের পৃথিবীর জ্যোৎস্নাসিক্ত বিহ্বল শোভার দিকে তাকিয়ে নিশীথের চোখ দুটো যেন ধীরে ধীরে সজল হয়ে উঠতে থাকে। আনমনার মত, যেন ভাঙা-ভাঙা নিশ্বাসের বেদনার শব্দ দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে অস্ফুটস্বর এক-একটা কথা বলে নিশীথ।—রাত হয়ে গিয়েছে...কিন্তু এখনই একবার...এমন কিছু দূর নয় গালুডি—গেলে ভাল হত।

হঠাৎ প্রতিভার দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে নিশীথ।—ও কী ! তুমি আবার এ কী কাণ্ড করেছ, প্রতিভা ?

দেখেছে নিশীথ, এক হাতে কপাল টিপে চুপ করে চেয়ারের উপর বসে আছে প্রতিভা। আর, দু চোখের দুই কোণে বড় বড় জলের ফোঁটা টলমল করছে।

প্রতিভা হাসে।—ঠিক আছে। তুমি যা বলছ, সবই শুনছি ; সব সহ্য করতে পারছি ; তুমি দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবে না !

—তুমি কি আমার কথায় দুঃখ পেলে ?

—না। মানুষের জন্য মানুষের মনে মায়া থাকবে, এতে আশ্চর্য হব কেন, সহ্য করতেই বা পারব না কেন ?

—আমার সত্যিই যে বড় কষ্ট হচ্ছে, প্রতিভা।

—সুনয়নার জন্য নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ।

—আমারও কষ্ট হচ্ছে, নিশীথ, বিশ্বাস করো।

—তুমি আমাকে ভুল বুঝলে না তো ?

—একটুও না। তোমাকে ভাল করে চিনতে পারলাম।

—তাই কি কষ্ট পাচ্ছ ?

—হ্যাঁ।

—আমাকে সন্দেহ হয়।

—না, সন্দেহ নয়। তোমাকে বিশ্বাস করি।

—কী ?

—সুনয়নাকে আজ ভাবতে তোমার ভাল লাগছে।

—সত্যি কথা। মনে হচ্ছে, সুনয়নার কাছে যেন ছোট হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে, সুনয়নাকে ভুল বুঝেছিলাম। বুঝতে পারছি, সুনয়নার অনেক ক্ষতি করেছি। সুনয়না সুখী না হলে আমি...আমরা সুখী হতে পারব কিনা, বুঝতে পারছি না, প্রতিভা।

নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিভার চোখ দুটো ক্ষীণ দীপের শিখার মত করুণ হতে হতে শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলে। জীবনের সবচেয়ে কঠোর পরীক্ষাটাকে সহ্য করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে প্রতিভা।

এগিয়ে এসে প্রতিভার কাঁধের উপর মাথার ভার এলিয়ে দিয়ে ছটফট করে ওঠে নিশীথ। —তোমার কাছেই পরামর্শ চাইছি, প্রতিভা। একটা উপায় বলে দাও।

—এই রাতটা কেটে যাক, তারপর চলো গালুডি যাই।

—কিন্তু গালুডি গিয়ে যদি দেখতে পাই যে,... না, সে রকম কিছু ঘটে যাবে না, কী বলো, প্রতিভা ? সুনয়না নিজেই যখন কালকে যেতে বলেছে, তখন সুনয়নাকে বিশ্বাস করা যায়, নিশ্চয় আমাদের অপেক্ষায় থাকবে সুনয়না।

—আমার তো তাই মনে হয়।

নিশীথের মাথায় হাত বোলায় প্রতিভা। নিশীথকে এভাবে আশ্বস্ত করবার অর্থ কী বোধ হয় নিজেও বুঝতে পারেন না প্রতিভা। শুধু বুঝতে পারে যে, নিশীথকে আশ্বস্ত করবার মত জোর আছে প্রতিভার প্রাণে, এবং হাত দুটোও অভিমানের বেদনায় দুর্বল হয়ে যায়নি।

অনেকক্ষণ পরে নিশীথেব দিকে একবার তাকায়, এবং তাকাতে গিয়ে অনেকক্ষণ চোখ ফেরাতে পারে না প্রতিভা। একেবারে আনমনা হয়ে গিয়েছে নিশীথ, যেন অনেক দূরের কোনও মায়ার জগতের দিকে তাকিয়ে আছে।

এবার আর বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই প্রতিভার, যাকে ভয় করত তাকেই আজ মায়া করতে চায় নিশীথের মন। যাকে এতকাল ঘৃণা কবে এসেছে, তাকেই ভাল লাগতে শুরু করেছে।

কিন্তু ভুল করছে কি নিশীথ ? ভুল নয়, একটুও ভুল নয়। যদি এটা ভুল হয়ে থাকে তবে এটা মানুষেরই মনের ভুল। এ বকম ভুল না করলেই বোধ হয় মানুষ অমানুষ হয়ে যায়।

ঠিকই তো, প্রতিভাব মনটা যে নীববে প্রশ্ন কবে করে নিজের মনের কাছ থেকেই উত্তর আদায় কবতে থাকে। আজ সুনয়নার কথা ভাবতে গিয়ে যদি হো-হো করে হেসে উঠত নিশীথ, তবে নিশীথকে একটা নিষ্ঠুব হাসির হৃদয়হীন অভিনেতাব মত মনে হত না কি ? এবং নিশীথের সেই হাসির শব্দ শুনে প্রতিভাবই বুকের ভিতবটা ভয় পেযে চমকে উঠত না কি ?

তাই এইটুকু বুঝতে পারছে বলেই নিশীথের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে প্রতিভার হাতটা একটুও ব্যথিত না হয়ে বরং খুশিই হয়ে ওঠে। এটা কোনওও পরীক্ষা নয়।

কাল সকালে সুনয়নার চোখেব কাছে গিয়ে যখন দাঁড়াবে নিশীথ, তখন, এবং তারপর যা হবে, তারই ছবি যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে প্রতিভা ; এবং বুঝতে পারছে, সেটাই তো পরীক্ষা। সহ্য করতে পাবা যাবে কি ?

পাবা যাবে না বোধ হয়, এবং সেজন্য দুঃখ নেই।

জানবে সুনয়না, নিশীথের মন সুনয়নাকে আজ শ্রদ্ধা কবে, সুনযনাকে ভাল লেগেছে নিশীথের : সুনয়নাকে মহৎ বলে মনে হয়েছে নিশীথের। সুনয়নাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে নিশীথের ব্যথিত মুখটা আবেদনময় হয়ে উঠবে। তুমি কোন দুঃখে আর কেন নিজেকে ঘেন্না করবে, সুনয়না ? তোমাবও বেঁচে থাকবার সব অধিকার আছে।

সুনয়নাও আশ্বস্ত হয়ে বেঁচে থাকতে চাইবে। এবং তার পর ? নিশীথ ও সুনয়নার এই ক্ষমাময় নতুন সম্পর্কের পাশে একটা অবান্তর ছায়ার মত প্রতিভা যদি পড়ে থাকে, তবে এই দুই বেচাবার জীবনের আনন্দে বিড়ম্বনা ঘটানো হয় না কি ?

মনে মনে হেসে ফেলে প্রতিভা। আর, যেন মনেরই একটা দুরন্ত ব্যাকুলতায় হঠাৎ ছটফট করে উঠেই মুখ ফিরিয়ে নেয় : চোখ ভিজে গিয়েছে, কিন্তু মুখের উপর যেন অদ্ভুত একটা প্রতিজ্ঞার হাসি ঢলঢল কবতে থাকে, চাঁদেব আলোতে ঢলঢল শাল-বনেব শোভার চেয়েও মধুর ও মায়াময় সেই হাসি।

নিশীথের জন্য চা তৈরি কবতে হবে ; ব্যস্ত হয়ে ওঠবার আগে প্রতিভা শুধু মনে মনে একটা প্রার্থনা সেরে নেয়। যেন মনেব এই হাসির জোরটা কাল পর্যন্ত অটুট থাকে।

কালিকাপুর থেকে গালুডি ; সকালবেলার রোদ, শালবনের হাওয়া আর সড়কের লাল ধুলোর সঙ্গে যেন ছোঁয়াছুঁয়ির আর ছুটোছুটিব খেলার মত একটা খেলার আবেগে দৌড়তে থাকে নিশীথের গাড়ি। সড়কের এক বাঁক ঘোরবার সময় স্টিয়ারিং ঘোরাতে গিয়ে একটু চমকে ওঠে, এবং সাবধান হয় নিশীথ। হঠাৎ বড় বেশি আনমনা হয়ে গিয়েছিল নিশীথ, এবং গাড়ির স্পিড একটুও কমিয়ে না দিয়ে একেবারে বাঁকের কাছে চলে এসেছিল। এবং আর একটু ভুল হলেই, স্টিয়ারিং ঘোরাতে আর একটু দেরি করলেই...। না, খুব বেঁচে গিয়েছে গাড়িটা, তেঁতুলগাছটার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে। আব সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলে গাছটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গাড়িটা চুরমার হয়ে যেত!

গাড়ির সামনেব সিটে নিশীথেরই পাশে বসে ছিল প্রতিভা। গাড়িটার স্পিডের মাথায় বাঁক ঘোরবার সময়ে প্রতিভার শান্ত চেহারাটা নিশীথের গায়ের উপর আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। প্রতিভার সোনার ফ্রেমের চশমাটাও ছিটকে পড়ে গিয়েছিল।

নিশীথ লজ্জিতভাবে হাসে। — গাড়িটা খুব বেঁচে গিয়েছে, প্রতিভা। আর একটু ভুল হলেই....

চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে প্রতিভাও হাসে। —আমার চশমাটাও বেঁচে গিয়েছে।

গাড়ির স্পিড মৃদু করে দিয়ে নিশীথ রায় যেন উদাসভাবে সামনের আকাশের দিকে তাকায়। আর প্রতিভা চোখের উপর চশমাটাকে চেপে দিয়ে পাশের শালবনের দিকে তাকায়।

দুজনেরই প্রাণ যেন ইচ্ছে করে একটা পরিণাম ভুলে যাবার জন্য চেষ্টা করছে। দুজনেই ভুলে গিয়েছে যে, শুধু গাড়িটা আর চশমাটা নয়, নিশীথ আর প্রতিভার প্রাণ দুটোও চুরমার হয়ে যেত, যদি আরও একটু বেশি রকমের আনমনা হয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাতে ভুলে যেত নিশীথ। কিন্তু সেটা যেন দুর্ঘটনা হত না; হঠাৎ খেয়ালেব আত্মহত্যার মত সে দুর্ঘটনা যেন বেঁচে যাওয়ার মত একটা সুন্দর পরিণাম হয়ে উঠত। তা হলে আর এইভাবে, এমন সুন্দর একটা সকালবেলার আলো-ছায়া, পাখির ডাকের শব্দ আর শালবনের হাওয়ার ভিতর দিয়ে ছুটে ছুটে একটি অগ্নিময় পরীক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে হত না। অদৃষ্টের যত জটিল প্রশ্নের জ্বালা বরণ করবার জন্য, আর পাগল হয়ে যাওয়ার মত একটা বিপদেব দিকে এ রকম অসহায় হয়ে দৌড়তে হত না।

না, আর ক্ষণিক্ষণ কল্পনা কববার এবং সামনের আকাশের দিকে কিংবা পাশের শালবনের দিকে তাকিয়ে থাকবার দরকাব হয়নি। রেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে সামান্য কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা যখন আরও মন্থর হয়ে বাঁ দিকের পথে ঘুরে যায়, তখন একটি বাংলোবাড়ির ফটকের দু পাশের দুটি দেওদারেব প্রকাণ্ড রৌদ্রাক্ত চেহারাও চোখে পড়ে যায়।

বাংলোবাড়িব ফটকেব সামনে গাড়িটা থামে। আর, নিশীথ ও প্রতিভা যেন একটা নতুন বিস্ময়ের ভারে হঠাৎ অনড় হয়ে শুধু চোখ মেলে দেখতে থাকে, বাংলোবাড়ির বারান্দার উপরে যেন দুটি নতুন ধবনের সুখী মানুষ গায়ে-গায়ে মেশামেশি হয়ে হাসাহাসি করে..

কী করছে ওরা দুজনে? ধীরেন আর সুনয়না?

একটা টেবিলের কাছে চেয়ারের উপর বসে আছে ধীরেন। টেবিলের উপর একটা কাগজ। পেন্সিল হাতে নিয়ে কাগজেব উপব কী যেন লিখছে ধীরেন। আর সুনয়না ধীরেনেরই চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে টেবিলের সেই কাগজটার কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে কথা বলছে। কে জানে, কোনও স্বপ্নের আর কোনও আহ্লাদের জমা-খরচের হিসেব করছে ওরা দুজন?

নিশীথের গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই চেয়ার ছেড়ে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় ধীরেন; আর, সুনয়না যেন একটা প্রবল খুশির ফোয়ারার মত হেসে ওঠে। —কী আশ্চর্য, সত্যিই তুমি আশ্চর্য করে দিলে, প্রতিভা।

ধীরেন বলে—কী সৌভাগ্য! আমিও ভাবতে পারিনি, নিশীথবাবু, আপনি নিজেই কষ্ট করে একেবারে মিসেসকে সঙ্গে নিয়ে...

গাড়ি থেকে নেমে নিশীথ আর প্রতিভা এগিয়ে আসে। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে যেন এই নতুন বিস্ময়ের কুহক সহ্য করতে চেষ্টা করে বিড়বিড় করে নিশীথ। —তার মানে?

নিশীথের প্রশ্নটা যেন একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের গুঞ্জন! গালুডির এই বাংলোবাড়ির জীবনটা এ

কোন ছদ্মবেশ ধরে নতুন রকমের সৌজন্য সমাদর আর প্রীতির অভিনয় শুরু করে দিয়েছে ? এত হাসে কেন ওরা ? এত খুশি কেন ওরা ?

ধীরেন বলে...আমাদের উচিত ছিল, একদিন গিয়ে আপনার দুজনকে এখানে এনে, অন্তত একটু চা খেয়ে যাবার জন্য—

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সুনয়না। —থামো, থামো, তুমি ভদ্রতা করতে গিয়ে আমাকে বিপদে ফেলছ।

—কেন ?

—আমি যে কালই কালিকাপুরে গিয়ে প্রতিভাবে আর নিশীথবাবুকে নেমন্তন্ন করে এসেছি।

—তাই বলো।

নিশীথ হাসতে চেষ্টা করে। —তার মানে, নেমন্তন্ন না করলে আমরা আসতাম না ?

সুনয়না হাসে। —নিশ্চয় আসতেন না। ...তা ছাড়া...

—কী ?

—নেমন্তন্ন করেও একটা ভয় ছিল।

—তার মানে ?

—অর্থাৎ, প্রতিভা আসতে পারে বলে মনে মনে একটা বিশ্বাস ছিল ; কিন্তু আপনি আসবেন বলে বিশ্বাসই করতে পারিনি।

নিশীথ বোধ হয় আবার আরও কিছুক্ষণ আরও বেশি আশ্চর্য হয়ে সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু ধীরেনের একটা উল্লাসের ভাষা শুনে চমকে ওঠে, আর ধীরেনেরই মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে নিশীথ।

ধীরেন বলে—আর এখানে নয়, নিশীথবাবু।

—কী ?

—এই বাড়ি বেচে দিলাম। চৌহানবাবুই কিনে নিলেন। কালকেই বিক্রি রেজেস্টারি করা হবে।

নীরব হয়ে, আর চোখ দুটো অপলক করে, যেন প্রকাণ্ড একটা কৌতূহলের তোলপাড় শব্দ বুকের ভিতরে সামলে রেখে শুনতে থাকে নিশীথ, গালুডির ধীরেনবাবু যেন তাঁর জীবনের এক পরম জয়ের তৃপ্তি, গান করে শুনিয়ে চলেছেন।

—চৌহানবাবু দর দিয়েছেন মোট ছত্রিশ হাজার টাকা। আমিও তাতেই রাজি ; এতেই আমার সব দেনা মিটিয়ে দিয়ে হাজার পাঁচেক টাকা হাতে থেকে যাবে। ...বাস, ওতেই হয়ে যাবে। ...আপনি তো জানেন, একটা কোয়ারি আমার লিজ নেওয়া আছে। . সেখানে আপনিও তো একবার গিয়েছিলেন, কিসের সালফেট না কার্বনেট খুঁজতে...হ্যাঁ, সেই গাঁয়ে, সেই করমপুরাতে গিয়ে থাকব। কিস্তিতে একটা ট্রাক কিনে নেব। তার পর, একটা বছর খেটেখুটে দু-চারটে ভাল অর্ডার যদি সাপ্লাই করতে পারি, তবে আর কী ? ট্রাকের কিস্তি শোধ করে দেব, আর কারবারটাও মোটামুটি দাঁড়িয়ে যাবে। ..প্রফিট ? মাসে শ-দুই টাকা হলেই হয়ে গেল। তারপর...তারপর সুনয়নার হাত। যদি রোজ মুরগিভাত খাওয়াতে পারে সুনয়না, তবে তাই খাব। যদি, ভাজা-নিমপাতা, জংলা-কুলের অম্বল আর ডাল-ভাত খাওয়ায় সুনয়না, তবে তাই খাব। ...হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনার টাকাগুলো দিতে খুবই দেরি হয়ে গেল যদিও...সুনয়না বললে মোট এগারো হাজার টাকা আপনার কাছ থেকে ধার নেওয়া হয়েছে...এইবার সে টাকাটা আপনাকে অনায়াসে দিয়ে দিতে পারব।

হো-হো করে হেসে ওঠে ধীরেন। সুনয়না চুপ করে দাঁড়িয়ে আর মাথা হেঁট করে যেন একটা অদ্ভুত লাজুক-হাসি লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। প্রতিভার সোনার ফ্রেমের চশমার কাচও যেন ঝিক ঝিক করে হাসে। আর, নিশীথ রায়ের চোখ দুটো চিকচিক করতে করতে হঠাৎ একেবারে যেন মুগ্ধ হয়ে যায়।

প্রতিভা বলে, চা খাওয়াবার যে নামও করছ না, সুনয়না ? তোমার মতলব কী ?

—মতলব হল, শুধু চা খাইয়ে ছাড়ব না। দুপুর না হবার আগে যেতে পারবে না, আর ভাত

খেয়ে যেতে হবে।

ধীরেন বলে—আমি তা হলে এখনই একবার বাজার ঘুরে আসি। থলিটা দাও সুনয়না।

প্রতিভা হাসছে ; প্রতিভার জীবনের যত ভয় অভিমান আর উদ্বেগ কি একেবারে মিথ্যে হয়ে আর শূন্য হয়ে চৈতী ঝড়ের ধুলোর মত উধাও হয়ে গেল ? প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয় নিশীথ। প্রতিভা যেন সেইসব অদ্ভুত গল্পের নায়িকার মত, যারা পরীক্ষায় জ্বলন্ত অঙ্গার মুঠো করে ধরতে একটুও ভয় পায় না, এবং পরীক্ষায় জয়ী হয়ে নিজেরই দুঃসাহসিক হাতটার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে, হাতে একটা ফোস্কাও পড়েনি, কোনও জ্বালা জ্বলে না।

ধীরেনবাবু হাসছেন। এই ভদ্রলোকের জীবনটাও যে জয়ের গর্বে হাসছে বলে মনে হয়। সুনয়নাকে সঙ্গে নিয়ে করমপুরা নামে এক জংলা গাঁয়ে থাকবেন, আর সুনয়নার হাতে রান্না ডাল-ভাত খেয়ে ধন্য হয়ে যাবেন। পরশপাথরের মত কী যেন একটা বস্তু, কী চমৎকার স্বপ্ন কুড়িয়ে পেয়েছেন ভদ্রলোক।

সুনয়নাও হাসছে। বর্ষার জলে ধোয়া হয়ে গায়ে আবার নতুন রোদ লাগিয়ে যেমন ঝলমল করে হেসে ওঠে শালবন, সেইরকম ঝলমলে সুখী হাসি। সুনয়নার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে নিজেরই চোখের চেহারাটা কল্পনা করতে পারে নিশীথ। নিশীথের চোখ ছাপিয়ে যেন অদ্ভুত এক তৃপ্তি উথলে উঠছে। হেসে হেসে প্রতিভার সঙ্গে কথা বলছে যে-সুনয়না, তার মুখের দিকে তাকাতে নিশীথ রায়ের চোখের চাহনি এত তৃপ্ত হয়ে যাবে, এ যে নিশীথ রায়ের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। নিশীথের চোখ দুটো যেন সুনয়নার মুখের দিকে একটা সশ্রদ্ধ অভিনন্দনের মত তাকিয়ে আছে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নিশীথ। —বাঃ, খুব কাণ্ড করলেন আপনারা !

--জাঁকিয়ে সুখের সংসার করতে দুজনে করমপুরাতে চলোলেন ; এদিকে কালিকাপুরের অবস্থা যে কাহিল।

—কী হল ?

প্রতিভা বলে—রান্না করবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমাকে রান্না করতে দেখলে ভদ্রলোক হেসে হেসে...

—প্রতিভার রান্নাবান্নার রকম যদি আপনি দেখতেন, তবে আপনিও হাসতেন। বেগুন ভাজতে গিয়ে আগে কড়াতে বেগুন ছাড়ে, তারপর তেল।

সুনয়না হাসে। —কী আর করবে বেচারা ? ওসব কাজের ধার ধারেনি কখনও, কিছু শেখেওনি ; আর, বেচারা কল্পনাও করতে পারেনি যে, রান্না করবার একটা লোকও পাওয়া যাবে না, এমন একটা জায়গাতে এসে ওকে থাকতে হবে।

—তা হলে, আমারই অপরাধ ?

ধীরেন বলে—কোনও চিন্তা করতে হবে না। চৌহানবাবুর বাড়িতে রান্না করে যে পাঁড়ে, তার ভাইটাও বেশ রান্নাবান্না জানে। আমি ওকে ঠিক করে দিচ্ছি। মাইনে পঁচিশ টাকা, খাওয়া ; আর বছরে একজোড়া ধুতি আর একজোড়া গামছা।

—একটা ঝিয়ের কথা বলেছিলাম, মনে আছে তো ?

—হ্যাঁ।

—করমপুরা যাবার আগেই আমি সেই ঝিটাকে তোমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব।

—না, এবার এক কাপ চা না হলে আর...

—এখনি হয়ে যাবে...এসো, প্রতিভা।

—আমি বাজার ঘুরে আসি, কেমন ?

—এসো।

—আমি একবার চট করে ঘাটশিলা ঘুরে আসি।

প্রতিভা রাগ করে তাকায়। —ঘাটশিলাতে আবার কিসের কাজ ?

—ঠিক কাজ নয়, একটা অনুরোধ রাখবার কাজ। যাব, শুধু আধ ঘণ্টা থাকব, আর ফিরে আসব।

সুনয়না হাসে। —যান যান। কোনও ঠিকাদারের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে আসবেন না, তা হলেই হবে।

নিশীথও হাসে। —ঘুষ খাওয়ার মত চরিত্রের জোর যদি থাকত তবে তো খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতির মত এত দিনে প্রায় লাখখানেক টাকা...থাকগে ওসব বাজে কথা।

ঘাটশিলাতে গিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে যে কাজটা সেরে দিয়ে চলে আসবে বলে মনে করেছে নিশীথ, সেটা সত্যিই কোনও কাজ নয়। কালিকা-মাইনস-এর স্টোরবাবু রমেশের বাবা ত্রিলোচনবাবুর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ। রমেশ বার বার অনুনয় করে বলে গিয়েছে, একবার দয়া করে গরিবের বাড়িতে যাবেন স্যার।

রমেশের বাড়ি ঘাটশিলা, চাকরি করে কালিকাপুর। রমেশের বাড়ির যা অবস্থা, এবং পৈতৃক সম্পত্তি বলতে যা আছে, তাতে রমেশের চাকরি করবার কোনও দরকারই ছিল না। তবু চাকরি করে রমেশ। এবং, নিশীথ জানে, চল্লিশ টাকা মাইনে পেয়েই স্টোরবাবু রমেশ খুশি ; ধূর্ত ঠিকাদারগুলো রমেশকে খুশি করবার জন্য কতবার সেধেছে, কিন্তু রমেশ শুধু ঠিকাদারগুলোকে মুখ খুলে গালাগালি দিয়ে খুশি হয়েছে। একটাও অন্যায় পয়সা স্পর্শ করে না রমেশ। তাই বোধ হয় রমেশকে একটু বেশি পছন্দ করে নিশীথ।

ঘাটশিলা যাবার পথে গাড়িটা উদ্দাম হয়ে ছুটতে থাকে, কিন্তু নিশীথ রায়ের হাত আর কোনও ভুল করে না। অনেক কথা মনের ভিতরে তোলপাড় করতে থাকলেও আনমনা হয়ে যায় না। এবং, কেন যেন বার বার বিভূতির কথাই মনে পড়ে। আরও মনে পড়ে, বিভূতির চরিত্রের বেশ সুনাম আছে। বিভূতির সেই চরিত্রের খ্যাতি জেঠামশাই পর্যন্ত শুনেছেন ; বিশ্বসুদ্ধ মানুষই বোধ হয় শুনেছে।

বিভূতির সঙ্গে একদিন তো দেখা হবেই। ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায়, আর মনে মনে একটা অস্বস্তির হাসিও হেসে ফেলে নিশীথ। নিশীথের পাশে প্রতিভাকে দেখতে পেয়ে বেচারা বিভূতির চোখ দুটো বোধ হয় শিউরে উঠবে। নিশীথকেও একটা ঘৃণার জীব বলে মনে করবে ; মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আর কোনও কথা না বলেই চলে যাবে। নিশীথের জীবনকে একটা অশুচি বিভীষিকার বিলাস বলে মনে করবে, কিংবা মনে মনে ঠাট্টা করে একটা ধিক্কারের হাসি লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করবে বিভূতি। বাঃ, বেশ হয়েছে। যেমন 'দেবা' তেমনই 'দেবী'। নিশীথের মত মানুষের সঙ্গে প্রতিভার মত নারীকেই মানায়। না প্রতিভা, না নিশীথ, দুজনের কেউই পৃথিবীর কোনও শুচিতাময় জীবনের মানুষকে ঠকাবার সুযোগ পেল না ; সাধ্যই হল না। বেশ ভাল হল। ভাবতে গিয়ে একটা নিশ্চিন্ততার হাঁপ ছাড়বে বিভূতি।

চরিত্রহীন মানুষের প্রতি বিভূতির ঘৃণা যেমন ভয়ানক, চরিত্রশীল মানুষের প্রতি বিভূতির মায়াও তেমনই ভয়ানক। আজও মনে করতে পারে নিশীথ, নিরীহ ও নির্দোষ চরিত্রের মানুষকে আরও কতবার এইভাবে রক্ষা করেছে বিভূতি। কলেজের ছাত্র ছিল যখন বিভূতি, তখন ইংলিশের লেকচারার অমিয়বাবুকে ঠিক এইরকম একটা ভয় থেকে রক্ষা করেছিল। মঞ্জু নামে থার্ড ইয়ারের যে ছাত্রীটির সঙ্গে অমিয়বাবুর বিয়ের কথা একেবারে পাকাপাকি হয়েছিল, বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সেই ছাত্রীটির জীবনের কয়েকটা আশ্চর্য-রকমের গোপন ঘটনার বৃত্তান্ত যোগাড় করতে পেরেছিল বিভূতি ; এবং অমিয়বাবুকে জানিয়েও দিয়েছিল। একটিও মিথ্যে কথা বলেনি বিভূতি। ওই মঞ্জু নামে ছাত্রীটি বছর চারেক আগে বাড়ির মাস্টারের সঙ্গে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল, এবং প্রায় এক বছর পরে বাড়ি ফিরেছিল। ঘটনাটা হল কানপুরের। কী আশ্চর্য, প্রায় চার-পাঁচ বছর আগের সেই কানপুরের একটা ঘটনার বৃত্তান্ত কলকাতাতে বসেই যোগাড় করতে পেরেছিল বিভূতি।

নিশীথ এবং আরও কেউ কেউ বিভূতিকে একটু অনুযোগও করেছিল—এসব ব্যাপারে তোমার এত ইন্টারেস্ট না থাকাই ভাল, বিভূতি। একটা মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিয়ে তোমার যে কী লাভ...

বিভূতি বলেছিল, সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু উপায় নেই। বেচারা অমিয়বাবুর কাছেও তো আমার একটা কর্তব্য আছে। অমিয়বাবুর মত একজন শুদ্ধ ও সজ্জন মানুষের স্ত্রী হবে মঞ্জু নামে এ রকম একটা...এক্সকিউজ মি, নিশীথ—

বন্ধুরা বলেছিল—কিন্তু তুমি তো চিরকাল মঞ্জুর বিয়ে বন্ধ করে রাখতে পারবে না। আজ না হোক, কাল, অমিয়বাবুর না হোক, অন্য কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ে হয়ে যাবেই।

—হ্যাঁ, হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি আমি সেখবরও কোনওদিন পাই, যেদিনই পাই না কেন, তখন একবার দেখে নেব।

—অ্যাঁ! নিশীথ এবং আরও কোনও কোনও বন্ধু আতঙ্কিতের মত চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিল।

—হ্যাঁ, চরিত্রের ক্ষত লুকিয়ে, আর একটা সজ্জন মানুষের বিশ্বাস ফাঁকি দিয়ে যদি কোনও মানুষ বিয়ে করে ফেলে, তবেই বা তাকে ক্ষমা করব কেন?

—কী করবে তুমি?

—জানিয়ে দেব। স্বামী, কিংবা স্ত্রী, যে বেচারা ঠকবে, তাকে সব খবর জানিয়ে দেব।

—স্বামী-স্ত্রীর জীবনে মিছিমিছি একটা অশান্তি এনে দেবে?

—ওই রকম অশান্তি হওয়াই যে ভাল। ওটা প্রায়শ্চিত্ত, এবং ওতে ফল ভালই হবে।

—ফল ভাল হবে কেমন করে?

—হয় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, নয় ভালবাসা ভেঙে যাবে।

নিশীথ ভয় পেয়েছিল।—তোমার মনটা তোমার চরিত্রের মতই শক্ত।

বিভূতির চোখ দুটো হেসে উঠেছিল। আমি তাই চাই। এবং এখানেই বোধ হয় তোমার ও আমার প্রভেদ!

সেদিন ভয় পেয়েছিল, কিন্তু রাগ করতে পারেনি নিশীথ। এবং আজও ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়; আজও যে রাগ হচ্ছে না। বেচারা বিভূতির মনটা এমন কঠোর বলেই তো প্রতিভাকে আজ বুকের কাছে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে নিশীথের। আঃ, সারাটা রাত কেমন নিঝুম হয়ে নিশীথের বুকের কাছে মাথা গুঁজে দিয়ে ঘুমিয়ে রইল প্রতিভা; যেন কত শত বছরের একটা চেনা আশ্রয়ের শান্তি তৃপ্তি আর নিবিড়তার মধ্যে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে জীবনটা সঁপে দিয়েছে প্রতিভা। বার বার তিনবার প্রতিভার সেই ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিল নিশীথ।

আজ বিভূতির সঙ্গে যদি একবার ধীরেনবাবু আর সুনয়নার দেখা হয়ে যায়? নিশীথের বুকের সব নিঃশ্বাসের বাতাস যেন এক বিপুল কৌতুকের আবেগে নেচে ওঠে। হেসে ফেলে নিশীথ। দেখে লজ্জিত হবে কি বিভূতি? কিংবা আশ্চর্য হবে? সুনয়নাকে সত্যিই বাঁচিয়ে দিয়েছে বিভূতির চিঠির সেইসব অভিশাপময় অভিযোগ। সুনয়নার অদৃষ্ট যে একটা পুণ্যস্নান সেরে নিয়ে ধীরেনবাবুর জীবনে নতুন আশীর্বাদ হয়ে ধরা দিয়েছে। বাঃ, বেশ করেছে বিভূতি। মনে হয়, থার্ড-ইয়ারের ছাত্রী সেই মঞ্জুর জীবনও এখন তার স্বামীর ভালবাসার সাথী হয়ে এইরকম একটি মহুয়া-বনের স্নিগ্ধ ছায়ার পাশে...

হ্যাঁ, স্টোববাবু রমেশের বাড়িটা দেখা যায়। সড়কের দু-পাশে এই ছোট ছোট দুটো মহুয়াগাছের ছায়া পার হয়ে গেলেই রমেশের বাড়ির বাগানের কাছে পৌঁছে যাবে নিশীথের গাড়ি।

কী কাণ্ড করেছে রমেশ! সারা বাগান জুড়ে কতবড় একটা মণ্ডপ। রমেশের বাবার শ্রাদ্ধবাসর, যেন একটা মহামেলা কিংবা মহোৎসবের আসর। মণ্ডপের প্রবেশপথে সত্যিকারের দুটি সোনার কলস রাখা হয়েছে; তার উপর আম্রপল্লব আর নারকেল। বাগানের পশ্চিম দিকের একটা ময়দান, গাড়ির পার্কিং-এর জন্য খড়ি দিয়ে দাগিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক গাড়ি এসেছে। আসবেই তো, রমেশের বাবা ত্রিলোচনবাবু বলতে গেলে একজন দিগ্বিজয়ী কনট্রাক্টর ছিলেন। এবং টাটানগর ও তার আশপাশের যে কোনও গণ্যমান্য ও সজ্জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এক টাটানগরেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা এক শতেরও বেশি। এই কথা রমেশের কাছেই শুনেছিল নিশীথ।

রমেশও এসে এবং হেসে হেসে বিনীতভাবে বলে, আমি ঠিকই বলেছিলাম স্যার। টাটানগর থেকে ঠিক এক শত জন রেসপেক্টবল এসেছেন। সবসুদ্ধ গাড়ি এসেছে ত্রিশের ওপর। ওঁরা যে বাবাকে বড় ভালবাসতেন, স্যার।

মণ্ডপের ভিতরে ঢুকতেই দেখতে পায় নিশীথ—হাজারেরও বেশি নিমন্ত্রিত সজ্জন বসে আছেন। রমেশ বলে, এখন শুধু কীর্তন; বেলা দুটো পর্যন্ত কীর্তন চলবে। বিকেলে ভাগবত-পাঠ। আর

সন্ধ্যার পরেই যাত্রা... 'বিল্বমঙ্গল' গাওয়া হবে। খুব ভাল যাত্রাপার্টি আনিয়েছি, স্যার।

নিশীথ হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে—এবার আমি চলি রমেশ।

রমেশ অনুনয় করে—কিছুক্ষণ থেকে যান, স্যার।

রমেশের অনুনয়ের বিনিময়ে আর একবার হেসে শুধু বলতে হবে না, উপায় নেই রমেশ। আমাকে এখনি গালুডি ফিরতে হবে,. এই সামান্য কয়েকটা কথা বলে অনায়াসে এইমুহূর্তে আবার গালুডির দিকে ছুটতে পারত নিশীথ ; কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়ে দূরের ভিড়ের এক দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে নিশীথ, জেঠামশাই এসেছেন দেখছি—

হ্যাঁ, রমেশের বাবার বন্ধু ডাক্তার হরদয়ালবাবুও সাকচি থেকে এসেছেন এবং নিশীথকে দেখতে পেয়েই নিশীথের দিকে এগিয়ে আসছেন।

—আপনি তা হলে একটু বসুন স্যার, আমি অন্য দিকের ডিউটিগুলি একটি একটি করে...

—হ্যাঁ।

চলে যায় রমেশ : এবং জেঠামশাই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে নিশীথের কাছে দাঁড়ান। তারপরে আসরের একদিকে চেয়ারের উপর প্রায় গড়িয়ে পড়ে থাকা প্রকাণ্ড-চেহারার এক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বিরক্তভাবে বিড়বিড় করেন, ওই যে হাসছে, ওই যে প্রকাণ্ড-চেহারা ভদ্রলোক, বুকে সোনার চেন ঝুলছে, ওই ভদ্রলোক হল রাজপোখরার সেই অভদ্রটার কুটুম।

নিশীথ হাসে—তাতে আপনার কী ? আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন ?

—হ্যাঁ...বিরক্ত হবার কোনও দরকার ছিল না ; কিন্তু সত্যিই বিরক্তি বোধ করছি। লোকটা আবার চেঁচিয়ে ভাগ্নীর বিয়ের কথা বলে লেচকার দিচ্ছে।

—কে ওঁর ভাগ্নী ?

—ওই তো শীতল সরকারের মেয়েই তো ওর ভাগ্নী। শীতল সরকারের মেয়ের বিয়ে ঠিক করে এইমাত্র উনি খরসোয়ান থেকে ফিরছেন। ...যাকগে, এসব কথার সঙ্গে আমাদের এখন আর কোনও সম্পর্ক নেই...প্রতিভা কেমন আছে ?...শিবদাসবাবুর চিঠি পেয়েছ ?

নিশীথ মাথা নাড়ে। প্রতিভা ভাল আছে, এবং শিবদাসবাবুর চিঠি প্রায় রোজই আসে। জেঠামশাই ব্যস্তভাবে বলেন, আমি এখনই টাটা ফিরব, নিশি। ...তুমি কি এখন...

—আমি এখন গালুডি যাব।

চলে গেলেন জেঠামশাই, এবং নিশীথ যেন একটা অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনবার লোভ সামলাতে না পেরে আস্তে আস্তে হেঁটে, আসরের যত চেয়ারের এক-একটা সারি পার হয়ে সেই প্রকাণ্ডকায় ভদ্রলোকেরই কাছে একটি চেয়ারের উপর এসে বসে।

শীতল সরকারের মেয়ের মামা, সেই প্রকাণ্ডকায় ভদ্রলোক তাঁরই পাশের চেয়ারে আসীন, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

—যাক, শেষ পর্যন্ত পাত্রকে রাজি করাতে পেরেছি। এক কথায় কি ওরকমের একটা জাঁদরেল পাত্র রাজি হয়, মশাই ?

—খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের সুপারিনটেন্ডেন্ট। যেমন শিক্ষিত, তেমনই কঠোর চরিত্র।

—তার মানে ?

—তার মানে আজকাল এরকম খাঁটি চরিত্রের ইয়ং-ম্যান আপনি ভূভারতে পাবেনই না। সেই জন্যেই তো প্রায় হাতে-পায়ে ধরে সাধতে হয়েছে।

—বুঝলাম না।

কী যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যান শীতল সরকারের মেয়ের মামা, প্রকাণ্ডকায় সেই ভদ্রলোক। বুকের সোনার চেনে হাত বুলিয়ে নিয়ে নিশীথের দিকে একবার সন্দিগ্ধভাবে তাকান। তারপর নিশীথকেই প্রশ্ন করেন, মশাইয়ের কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে ?

—কেন ?

—আমরা একটা প্রাইভেট বিষয়ে আলোচনা করছি বলে ?

—না।

এইবার নিশীথের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করেন প্রকাণ্ডকায় ভদ্রলোক। হ্যাঁ...কী বলছিলেন ? কেন পাত্রকে হাতে-পায়ে ধরে সাধতে হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

শীতল সরকারের মেয়ের মামা গলার স্বর মৃদু করে ফেলেন। —আপনার কাছে খুলে বলতে আপত্তি নেই। একটা সমস্যা ছিল...অর্থাৎ ভাগ্নীটি এক চরিত্রহীন যুবকের সঙ্গে প্রেম করে বসেছিল।

—এ তো ভাল কথা নয়—

—ভাগ্নীর কোনও দোষ নেই। বেচারী জানতই না যে, ছেলেটির চরিত্রে দোষ আছে।

—যাই হোক, না জেনে-শুনে ভুল করেও তো প্রেম করেছে ?

—হ্যাঁ ; কিন্তু শুধু চিঠিতে। বিশ্বাস করুন, শুধু চিঠি। শারীরিক কোনও ইয়ে-টিয়ে...একেবারেই না। একবার সেই-যে ট্রেনের মধ্যে দুজনেব দেখা হয়েছিল, তারপর আর দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতও হয়নি।

—পাত্র না-হয় রাজি হল, পাত্রী কী বলে !

—পাত্রী আগেই রাজি হয়েছে। বলামাত্র রাজি হয়েছে। না হয়ে কি পারে, মশাই ? মেয়েটার এরকম একটা উপকার করল যে, তার ওপর একটা শ্রদ্ধাব ভাব...

—একটা কৃতজ্ঞতার ভাবও...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমার কাছেই বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছে মেয়েটা, বিভূতিবাবুর মত মানুষ কি বাজি হবে মামা ? আমি ভরসা দিয়ে এসেছিলাম, রাজি করাবই।

—বেশ ভাল হল। শীতলবাবুও একটা মনস্তাপের কারণ থেকে বেঁচে গেলেন।

—গেলেন বইকি। এই দেখুন, আমাকে অনুরোধ করে কী চিঠি লিখেছিলেন শীতলবাবু।

শীতল সরকারের মেয়ের মামা পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে নিয়ে পাশের ভদ্রলোকের হাঁটুর উপব রেখে ফিসফিস করেন। —এই নিয়ে পাঁচবার হল, শীতলবাবুকে আমি একটা পারিবারিক বিপদ থেকে বাঁচালাম।

হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েই একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ ; তারপরই হন হন করে হেঁটে আসরের ভিড়ের কলরব, মৃদঙ্গের শব্দ আর মণ্ডপের সোনালি ঝালরের ঝিকিমিকি উল্লাসের কাছ থেকে সরে গিয়ে সোজা নিজের গাড়িতে গিয়ে বসে। স্টার্ট নিতেও দেরি করে না। আবার ছোট-মহুয়াবনের ছায়া পার হয়ে গালুডির দিকে ছুটতে থাকে নিশীথের গাড়ি, এবং সেই সঙ্গে নিশীথের জীবনেব একটা বিস্ময়ের হাসি। বাঃ, বেশ ভাল হল, শেষ পর্যন্ত নীরাজিতারও দুঃখ করবার কিছু রইল না। নীরাজিতার জীবনকে নিশীথের মত মানুষেব স্পর্শের ভয় থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে যে, তারই কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছে নীরাজিতা। হওয়া উচিত। বিভূতির জন্য শ্রদ্ধা জেগেছে নীরাজিতার মনে। ভাল হয়েছে। বিভূতির জীবনের সঙ্গিনী হয়ে ধন্য হতে চায় নীরাজিতা। হবে বইকি।

এতক্ষণে যেন নিজেকে ক্ষমা করতে পারে নিশীথ। নীরাজিতারও কোনও ক্ষতি হল না। বরং নীরাজিতা এখন নিজেরই সৌভাগ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে, বিভূতির মত মানুষের জীবনসঙ্গিনী হয়ে সুখী হওয়া অদৃষ্টের লেখা ছিল বলেই বোধ হয় নিশীথ রায়ের চরিত্রটা ঘৃণ্য হয়ে উঠেছিল।

রেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং পার হবার সময় আর একবার হেসে ফেলে নিশীথ। নীরাজিতা বোধ হয় এখন মনে মনে নিশীথ রায় নামে শুচিতাহীন রক্তমাংসের একটা মানুষকে, একটা অধঃপতিত চরিত্রকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। একটা দুশ্চরিত্র মানুষের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থাটা ভেঙে গেল বলেই না নীরাজিতা বিভূতির মত মানুষের স্ত্রী হবার সৌভাগ্যটাকে পেয়ে গেল।

বাংলোবাড়ির ফটকের কাছে গাড়ি থামিয়ে, আর দেওদারের ছায়া পার হয়ে ভিতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নিশীথ, নীরাজিতার বিয়ে।

সুনয়না আর প্রতিভা একসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে পাশের ঘরের

ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ধীরেন।

নিশীথ বলে, বিভূতির সঙ্গে নীরাজিতার বিয়ে।

খবরটা যেন একটা চরম মীমাংসার খবর। বিভূতির সঙ্গে নীরাজিতার জীবনের মিলন হবে, খুবই ভাল খবর। এ খবর শুনে কেউ চমকে ওঠে না, ভ্রূকুটিও করে না। কারও চোখের চাহনিতে তুচ্ছতা বা বিদ্রূপের ছায়া কাঁপে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটা স্বস্তিময় নীরবতা যেন থমথম করে। নিশীথের মুখের এই শুভবার্তার মধ্যে একটা পরিণামের প্রাণ যেন হাঁপ ছেড়ে বলছে, সব ভাল যার শেষ ভাল।

খবরটা যেন অনেকগুলি মানুষের জীবনের একটা উদ্বেগেরও অবসান। কেউ আর এই অভিযোগ করতে পারবে না যে, আমি সুখী নই। প্রতিভা আর সুনয়নার মুখের হাসি যেন শান্ত অভিনন্দনের হাসি। ভালই হয়েছে ; যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে। নীরাজিতার ভাবনায় ও কল্পনায় আর এমন কোনও যন্ত্রণার দংশন থাকতে পারে না, যার জন্য কোনও মানুষের বিরুদ্ধে তার মনে অহরহ একটা আক্রোশের জ্বালা ছটফট করবে। নীরাজিতার কোনওই ক্ষতি হল না।

ধীরেন বলে—খুব ভাল হল।

ধীরেনের কথাগুলি যেন ধীরেনের একলা উপলব্ধির কথা নয়। এই চারটি মানুষেরই মন নীরবে ধীরেনের মত শুভেচ্ছার অনুভবে ভরে গিয়েছে। নীরাজিতা কিংবা বিভূতি দুজনের কেউ ওদের জীবনের এই শুভ পরিণামের রূপ, ওদের বিয়ে দেখবার জন্য নিমন্ত্রণের চিঠি দেবে বলে আশা করা যায় না ঠিকই ; ভয় আছে ওদের দুজনেরই মনে। এই চারজন মানুষের ছায়ার মধ্যে ক্ষত আছে, এবং সে ক্ষতকে খুবই ঘৃণা করে দুজনে। কিন্তু নীরাজিতার এই ঘৃণা আর এই ভয়কে ঘৃণা করতে এই চারজন মানুষের মনে কোনও ইচ্ছার ছায়াও নেই ; বরং, মনে হয় যে, এবং সত্যই একেবারে স্পষ্টভাষায় আর একটা কথা বলে সবাইকে হাসিয়ে দেয় নিশীথ।

--বিভূতির সঙ্গে নীরাজিতার বিয়ে অবধারিত ছিল বলেই...

সুনয়না হাসে—কী ?

—প্রতিভার সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়ে গেল।

ধীরেন বলে—এবং সুনয়না আমাকে ডাল-ভাত খাওয়াবার গ্যারান্টি দিয়ে একটা গাঁয়ের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে।

গালুডির এই বাড়িতে এই চারজন মানুষের নিরুদ্বিগ্ন ও কৃতার্থ জীবনের হাসি আরও অনেকক্ষণ মুখর হয়ে থাকে। খাওয়ার পাট সারা হবার পর যখন কালিকাপুরে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় নিশীথ আর প্রতিভা তখন শুধু এদের দুজনের মুখের হাসি নয়, ধীরেন আর সুনয়নার মুখের হাসিও যেন অদ্ভুত এক অনুভবের আবেশে ছলছল করে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায় ; চোখে চোখে যেন একটা ক্ষমার উৎসব জেগে উঠে নীরবে বলছে, যদি কোনও ক্ষতি করে থাকি, তবে ক্ষমা করো।

আবার কালিকাপুরের দিকে , গালুডির রেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে নিশীথের গাড়িটা আবার সড়কের দু পাশের শাল আর সেগুনের ছায়ার ভিতরে এসে পড়তেই নিশীথ বলে, এইবার একটা কথা সাহস করে বলব প্রতিভা ?

প্রতিভা হাসে। --প্রতিভার কাছে ভয় করে কিছু বলবার ছিল নাকি ?

নিশীথও হাসে। —ছিল।

—কী কথা ?

--নীরাজিতার কথা। নীরাজিতা যে খুশি হয়ে বিভূতিকে বিয়ে করতে চেয়েছে, এ খবর শোনবার পরে মনের একটা ভার মিটে গেল। বেচারার তো কোনও দোষ..

--হ্যাঁ, বলো।

--নীরাজিতা চরিত্রহীন মানুষকে ভয় পায় আর ঘৃণা করে, এটা নিশ্চয় ওর অপরাধ নয়। বিভূতির মত মানুষের সঙ্গেই ওর বিয়ে হওয়া উচিত ছিল, খুব ভাল হল।

রাজপোখরাতে ডালিয়া-বাগানের কাছে একটা ছোট চেয়ারের উপর বসে আর সামনের ছোট একটা টেবিলের উপব মাথা ঝুঁকিয়ে প্রতিভার কাছে লেখা একটা চিঠিতে ঠিক এই কথাগুলি লিখলেন শিবদাসবাবু। —খুব ভাল হল প্রতিভা। আজ নীরাজিতার সঙ্গে বিভূতির বিয়ে হয়ে গেল। আমি খুব ফূর্তি করে বিয়েতে খেটেছি। মাংস রাঁধবার ভার আমার উপরেই ছিল।

শিবদাসবাবুর চিঠি লেখা যখন সারা হয়, ঠিক তখনই অলক্তকের বারান্দার আলপনা পিছনে ফেলে রেখে আর বিভূতির পাশে পাশে হেঁটে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায় নীরাজিতা।

অলক্তকের শঙ্খ-মুখর ফটক পিছনে ফেলে রেখে বিভূতির গাড়িটা যখন গম্ভীর গুঞ্জন তুলে আস্তে আস্তে ঝাউয়ের ছায়া পার হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন ডালিয়ার বাগানের কাছে শিবদাসবাবুর চেহারাটার দিকে দুজনে একসঙ্গে তাকায়, বিভূতি আর নীরাজিতা। তারপর দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে।

বিভূতির গাড়ি এখন আর পথের কোথাও থামবে না। রাজপোখরা থেকে সিনি ; সিনিতে বিভূতিব বাংলোবাড়িটা এখন অনেক আলো আর অনেক ফুলের স্তবক ঘরে ঘরে সাজিয়ে নিয়ে বিভূতি আর নীরাজিতার জীবনের শুভমিলনের আনন্দ বরণ করবার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে।

শুভ মিলন নিশ্চয় ; কিন্তু শুধু শুভ বলতে রাজি নয় খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি।

বিভূতি বলে, শুদ্ধ বিবাহ বলতে আমার আরও ভাল লাগে।

—কী বললে ?

—চরিত্রের দিক দিয়ে যারা শুদ্ধ, শুধু তাদেরই বিয়েকে একটা শুভ ব্যাপার বলা যেতে পারে। কিন্তু ট্র্যাজেডি এই যে, ঘোর চরিত্রহীন মানুষগুলোও নিজেদের বিয়েকে শুভ-বিবাহ বলে রঙিন কাগজের চিঠিতে বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে নেমন্তন্ন করতে একটুও লজ্জা পায় না।

নীরাজিতা হেসে ওঠে। —তাতে নিজেকেই ঠকানো হল।

—কিন্তু এ-ও এক আশ্চর্য, ঠকতেও লজ্জা পায় না। দৃষ্টান্ত...

গাড়ি ড্রাইভ করছে বিভূতি : এবং একই সিটের উপর বিভূতির পাশে বসে আছে নীরাজিতা। গাড়ির ভিতরে যে আলোটা জ্বলছে, সে আলোটাকে জড়িয়ে একটা ফুলের মালা দুলছে। চকিতে একবার নীরাজিতার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বিভূতি বলে—আমি দৃষ্টান্ত হিসাবে কাদের কথা বলছি, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ নীরা ?

নীরাজিতা হাসে, খুব বুঝতে পেরেছি ; কিন্তু ওদের কথা আমাদের আলোচনা না করাই ভাল।

—ঠিক কথা।

চুপ করে বিভূতি, এবং নীরাজিতাও চুপ করে চলন্ত গাড়ির শব্দের সঙ্গে জীবনের এক বিপুল কৌতূহলের চঞ্চলতা মিশিয়ে দিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে। বিভূতি, খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি, যার বুকের বাতাস শরৎকালের সকালবেলার বাতাসের মত, একফোঁটা ধুলোর চিহ্ন নেই যে বাতাসে, সেই মানুস যেন নীরাজিতারই অদৃষ্টের ইঙ্গিতে পরিত্রাতার মত এসে নীরাজিতাকে একটা ভয়ানক ভুলের গ্রাস থেকে মুক্ত করে দিয়ে নিজেরই জীবনের সঙ্গিনী করে নিয়েছে। কালিকাপুরের নিশীথের তুলনায় কোনও দিক দিয়ে ছোট হওয়ার দূরে থাকুক, বরং সব দিক দিয়ে বড়, এই বিভূতি যে নীরাজিতার জীবন একটা আকস্মিক গৌরবের উপহার। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি রোজগারে বড়, পদ-প্রতিষ্ঠায় বড়, চরিত্রে বড়। নীরাজিতার মনে দুঃখ করবার কিছু নেই। সব দিক দিয়ে জিত হয়েছে নীরাজিতার। সব খবর জানেন পিসিমা, তাই আশীর্বাদ করবার সময় তিনি আনন্দের আবেগে কেঁদে ফেলেছেন। —কোনওদিন তো শিবপুজো করিসনি নীরা, তবু তোর ওপর শিবের কী দয়া ! নইলে এত সহজে ওরকম খারাপ স্বভাবের একটা মানুষের মতলব থেকে বাঁচতে পারতিস না। সৌভাগ্য বলে সৌভাগ্য। পুণ্যি বলে পুণ্যি ! নইলে কি বিভূতির মত সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে হয় ?

ভাবলে এখনও ভয় করে। কালিকাপুরের নিশীথ, ইস, কী অদ্ভুত ছলনা জানে লোকটা ! যার শরীরটা এত কলুস ছুঁয়েছে, তার মুখটা কী অদ্ভুত কপটতা করে খাঁটি ভালবাসার হাসি হেসেছিল।

কিন্তু ভাগ্য ভাল ; পিসিমা সেদিন একটুও বাড়িয়ে বলেননি ; শিবেরই দয়া ; নীরাজিতার জীবন একটা উচ্ছিষ্ট পৌরুষের স্পর্শে অপমানিত হবার ভয় থেকে বেঁচে গিয়েছে।

মনে মনে নিজের বেকুব মনটার উপরেও রাগ করে নীরাজিতা। না বুঝে-সুঝে, একটুও সন্দেহ না করে ট্রেনের কামরাতে দেখা একটা মানুষের চোখের চাহনির সেই আগ্রহটাকে কেন হঠাৎ ভাল লেগে গিয়েছিল ? মনটা লোভী হয়ে উঠেছিল ; সেকথা ভাবতে মনের উপরই রাগ হয়। কিন্তু সেই ভুলের মনটাকে ক্ষমা করেও দিতে পেরেছে নীরাজিতা। কী করে বোঝা যাবে ? দেখে বুঝতে পারা যে নিতান্তই অসম্ভব। ফুলের পাপড়ির উপর যে শিশিরের ফোঁটা টলমল করে, সেটা সাপের বিষের ফোঁটাও হতে পারে বলে সন্দেহ করতে পারে কে ? সন্দেহ করবার এত বড় শক্তিও বা কজন মেয়ের কাছে ?

শুধু কি নিজেরই সেই ভুলের মনটার উপর রাগ হয় ? নিশীথের মুখটা মনে পড়লে এখনও নীরাজিতার মনে একটা ঘৃণাভরা রোষের জ্বালা ছটফটিয়ে ওঠে। অলক্তকের ফটক তালাবদ্ধ হয়ে একটা কঠোর উপেক্ষা দিয়ে মানুষটাকে তাড়িয়ে যে শাস্তি দিয়েছে, সেটা কী আর এমন শাস্তি ? আরও শাস্তি হওয়া উচিত ছিল ; এবং বুঝতেই পারা যাচ্ছে, সে শাস্তি পেয়ে যাবে লোকটা। প্রতিভার মত মেয়ের চরিত্রের কাছে অপমানিত হতে হতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, হয়েই যেন যায়, লোকটার চরিত্রহীন আহ্লাদের প্রাণটা !

—কী ভাবছ নীরা ?—হঠাৎ প্রশ্ন করে বিভূতি ; এবং সেই প্রশ্নের শব্দে যেন একটু চমক লেগে কেঁপে ওঠে নীরাজিতা।

—বাড়ির কথা ভাবছ বোধ হয় ? এবং সেই জন্যে এত গম্ভীর হয়ে...

নীরাজিতা হেসে ফেলে।—বাড়ির কথাই ভাবছি, কিন্তু সে বাড়ি অলক্তক নয়।

—তবে ?

—যে বাড়িতে যাচ্ছি।

—সেটা আমার নিজের রোজগারের টাকায় কেনা বাড়ি। সেবাড়ির ফটকের কাছে এসে দাঁড়াবারও ওদের সাধ্যি নেই।

নীরাজিতা যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে।—ওরা..ওরা তোমার বাড়ির কাছে আসবে কেন ?

বিভূতি হাসে, তুমি কাদের কথা ভাবছ ?

—আমি ভাবছি,..ওই ওদের কথা...যাদের বিয়েকে একটা ভয়ানক অশুচি কাণ্ডের দৃষ্টান্ত বললে তুমি এখনই .

—না না, ওদের কথা বলছি না। শিবদাস দত্তের মেয়ে আর নিশীথ কোন সাহসে আমার বাড়িতে আসবে ? .ওরা নয় ; আমার দুটি দরিদ্র ভ্রাতা আছে, দুটি হতভাগা, সদাগর অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি। ষাট-সত্তর টাকা মাইনে পায়।

—ঠাকুরপোরা কি কেউ ..

—না, কেউ না। ওরা কেউ আসেনি। ওদের আসা নিষেধ।

—তোমার বিয়েতেও যদি ওরা না আসে...

—ওরা তো আসতেই চায়। কিন্তু আমি আসতে দেব কেন ?

—ওরা ভাল করে জানে যে, বড়দার চরিত্রে কোনও মায়াভরা দাদাপনা নেই।

নীরাজিতা অপ্রস্তুতের মত কুণ্ঠিতভাবে বলে—আমি সতিাই সব খবর জানি না। কিন্তু ধারণাও করতে পারছি না, কেন তুমি ওদের সম্পর্কে এত...

ওরা এলে আর যেন নড়তেই চায় না। বড়দার সঙ্গে দেখা করবার কাজটা তো এক সেকেন্ডেই হয়ে যায়, কিন্তু তারপর আরও সাতটা দিন ধরে পড়ে থেকে বড়দার অন্ন ধ্বংস করতে চায়। এসব আমি নিতান্ত অপছন্দ করি।

নীরাজিতা আরও কুণ্ঠিতভাবে, যেন একটু ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে—সিনির বাড়িতে কি তা হলে শুধু মা একাই এসেছেন ?

—মা ? কার মা ?

--তোমার মা ?

--আমার মা তো দেশের বাড়িতে থাকে।

—তা জানি। বাবার কাছে শুনেছি...

—কী শুনেছ ?

—তোমার মা এখন হালিশহরে তোমাদের পুরনো বাড়িতে একাই থাকেন।

—ঠিকই শুনেছ।

—আমি ভেবেছিলাম, তোমার বিয়েতে মা নিশ্চয় সিনিতে আসবেন।

—আসবার উপায় নেই।

--কেন ?

—আসতে দিচ্ছে কে ? দেশ-গাঁয়ের একটা বুড়ি মানুষকে আমার সিনির বাড়িতে থাকতে দিলে ম্যাকেঞ্জি, লিস্টার আর হ্যারিস মনে করবে যে অনর্থক একটা বুড়ি চাকরানিকে খাটিয়ে-খাটিয়ে কষ্ট দিচ্ছে বিভূতি।

—সর্বনাশ !—নীরাজিতার বুকটা যেন বেফাঁস চমকে উঠে ছোট একটা আর্তনাদ ছেড়ে কাঁপতে থাকে।

—সর্বনাশ মানে ?—স্টিয়ারিং শক্ত করে আঁকড়ে ধরে নীরাজিতার মুখের দিকে চকিতে একটা শক্ত চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে, এবং গম্ভীর গলার স্বর গমগমিয়ে প্রশ্ন করে বিভূতি।

—সাহেবরা ওরকম ধারণা করলে করুক না কেন। তা বলে বুড়ো মা কি তার ছেলের কাছে থাকবে না ? এ তো আশ্চর্যের কথা।

—একটুও আশ্চর্যের কথা নয়, নীরা। মা যে কী ভয়ানক উৎপাত সৃষ্টি করতে পারে, সেটা তুমি নিজের চোখে না দেখবার আগে বিশ্বাস করতে পারবে না।

--শুনিই না ; কী উৎপাত করেন ?

—আমার সিনির বাড়িতে মাকে একবার আসতে দিয়েছিলাম। সাত দিন ছিল। কিন্তু সেই সাত দিন শুধু কেঁদে কেটে আর গালাগালি দিয়ে আমাকে ছারখার করেছে।

—বুঝলাম না।

—আমার দুটি দরিদ্র হতভাগা ভ্রাতাকে আমি টাকা দিয়ে সাহায্য করি না, এই হল আমার পাপ ; এবং কেন সাহায্য করব না আমি, এই হল আমার মাতৃদেবীর অভিযোগ।

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। সিনি পৌঁছতে দেরি আছে।

দূরে পাহাড়ের মাথার উপরে মেঘের গায়ে ফিকে জ্যোৎস্নার সাদা ছোঁয়া লুটিয়ে পড়েছে। এবং নীরাজিতার চোখের দৃষ্টিও যেন সাদা হয়ে বিভূতির হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ ঠিকই, বেশ শক্ত হাত। স্টিয়ারিং-এর লোহার সঙ্গে বিভূতির হাতের মুঠো দুটো লোহার গিঁটের মতই শক্ত হয়ে এঁটে আছে।

নীরাজিতার চোখ দুটো সাদা হয়ে গিয়েও যেন জোর করে একটা রঙিন কল্পনার ছবি দেখবার চেষ্টা করছে। সিনির বাড়িটা কি সত্যিই বিভূতির একলা জীবনের কঠোর শাসনে একেবারে নীরব হয়ে আছে ? হাসিমুখে এগিয়ে এসে নীরাজিতাকে হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাবার কেউ নেই ? বিভূতির বউ দেখতে কী সুন্দর, এমন কথা বলবারও কোনও মানুষ থাকে না সেখানে।

বিভূতি বলে—আমার বাড়িতে তুমি কোনও বাজে গণ্ডগোল শুনতেই পাবে না, নীরা। হই-হল্লা আমি নিতান্ত অপছন্দ করি।

তবে কি সিনির বাড়িতে কোনও উৎসবের আয়োজন নেই ? খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতির জীবনের একটা মধুর পরিণামের ঘটনাকে প্রীতি জানাবার জন্য কেউ সেখানে আসবে না ?

—আমার একটা আশঙ্কা আছে, নীরা।

—কী ?

—মস্ত বড একটা বাজে খরচের পাল্লায় পড়তে হবে।

—কিসের জন্য।

—একটা প্রীতিভোজ দিতেই হবে। অন্তত হ্যারিস, লিস্টার আর ম্যাকেঞ্জিকে একটা কক্‌টেল দিতেই হবে ; তা ছাড়া আর আট-দশজন ভি আই পি আছেন। তাঁদেরও একটা খানাপিনা না দিলে নয়। অন্তত তিন-চার শো টাকা খরচ হয়ে যাবে।

সিনির দিকে মোড় ফেরার সাইন দেখাচ্ছে যে পোস্টটা, সেটাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গাড়ির হেড-লাইটের আলো পড়ে লেখাটা জ্বলছে—টু সিনি সেভেন মাইলস্। কিন্তু নীরাজিতার চোখের সাদা চাহনির উপর যেন রক্তাক্ত আতঙ্কের ছায়া লুটিয়ে পড়েছে। লেখাটাকে কতকগুলি লাল আঁচড়ের দাগ বলে মনে হয়।

টু সিনি ; নীরাজিতার জীবন খরসোয়ান-ম্যাঙ্গোনিজের বিভূতির জীবনের ঘরের দিকে হু-হু করে ছুটে চলে যাচ্ছে। কারণ বিভূতির গাড়ি বেশ স্পিড নিয়ে ছুটছে। কিন্তু নীরাজিতার বুকের ভিতরের একটা ভীরুতা যেন এই স্পিড সহ্য কবতে না পেরে এখনই গাড়ি থেকে সড়কের ধুলোর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যেতে চায়।

বিভূতি বলে—অবশ্য, সে আশঙ্কার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

—কী বলছ তুমি ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার শুদ্ধ-বিবাহের আনন্দ সামান্য একটা তিন-চার শো টাকার খরচকে এত ভয় করে কেন ? কথা বলতে গিয়ে হাঁসফাঁস করতে থাকে নীরাজিতা।

হেসে ওঠে বিভূতি।—কোনও ভয় করি না। দশ-পনেরো জনকে কক্‌টেল দিতে আর খাওয়াতে তিন শো টাকা খরচ হয় হোক ; কন্ট্রাক্টর মূলচাঁদকে বলব, পুরো তিন হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

—তাতে কী হবে ?

হো-হো করে হেসে ওঠে বিভূতি। তাতে মূলচাঁদ তখনই খুশি হয়ে তিন হাজার টাকা আমার হাতে তুলে দেবে, আর ধন্য হয়ে চলে যাবে। অর্থাৎ আমার নিট লাভ হবে দু হাজার সাত শো টাকা।

টু সিনি। এইবার সোজা সিনির সড়ক ধরে ছুটে চলেছে বিভূতির গাড়ি। দূরে ছোট ছোট অনেক আলোব ভিড় দেখা যায়। বোধ হয় বাবুদের কোয়ার্টার্ব , কিংবা অফিসারদের বাংলোয় আলো জ্বলছে।

সাদা ধবধবে একটা বাড়ির সামনের লনে আলোর কাছে এক-একটা ক্যাম্প-চেয়ারের উপর গড়িয়ে পড়ে আছে কয়েকটি শ্বেতাঙ্গিনীর শরীর। জাঙিয়ার আকারের ছোট প্যান্ট, আর দেখতে কাঁচুলির চেয়েও ছোট আকারের নেটের ব্লাউজ গায়ে, কতকগুলি সাদা ধবধবে আলস্যের ফুল নেশাতুর হয়ে পড়ে আছে।

বিভূতি হাসে।—একটা মজার কথা বলি, শোন নীরা। ওই যে দেখছ, ওদের মত একটি বস্তু একবার আমার হাত ধরতে এসেছিল ; কিন্তু তাকে দুটি কথায় এমনই অপমান করে দিয়েছিলাম যে, বিলিতি সেই মিস মহোদয়া এ দেশ ছেড়ে সোজা বিলেতে চলে গেল।

—শুনেছি, শুনেছি, শুনেছি—বলতে বলতে নীরাজিতার গলার স্বর যেন চেঁচিয়ে ওঠবার জন্য ছটফট করে ওঠে। বিভূতির মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে অদ্ভুত রকমের একটা জ্বলজ্বলে হাসি হাসতে থাকে নীরাজিতা।—তোমার এই গ্লোরিব গল্প টাটানগরের মামির কাছে শুনেছি ; কলকাতাতে বউদির কাছে শুনেছি। রাজপোখরাতে ঘরভরা লোকদের কাছে বাবা জোরে জোরে চেঁচিয়ে এই গল্প বলেছেন, তাও শুনেছি।

বিভূতি হাসে।—শুনে তুমিও কি একটু...

—কী ?

—আশ্চর্য হওনি ?

নীরাজিতার গলার স্বরে যেন একটা ধোঁয়াটে উল্লাসের শব্দ ঠক করে জ্বলে ওঠে।—খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। আর, সেই জন্যই মামাকে বলেছিলাম যে...

—কী ?

নীরাজিতা হাসে। —বলেছিলাম, বিভূতিবাবুর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে দেওয়াতে পারেন, তবেই আমার বিয়ে হতে পারে। নইলে বিয়েই হবে না। পৃথিবীতে আর কাউকে আমি বিশ্বাসই করব না।

—কী আশ্চর্য, তোমার সেই অভিমানই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল, নীরা।

—জয় বলতে জয়। শেষ পর্যন্ত তুমিও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছ যে, নীরাজিতা আর যে ভুল করুক না কেন...

—হ্যাঁ নীরা, যখন কোনও সন্দেহ রইল না যে, নীরাজিতা আর যা ভুল করে থাকুক না কেন, সে ভুল করেনি নিশ্চয়, যে ভুল করলে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়, তখন...সত্যি কথাটা একটু বেহায়ার মত বলতে ইচ্ছে করছে নীরা, তখন তোমাকে মনে মনে বড় ভাল লেগে গেল। মনে হল, তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে বোধ হয়। কিন্তু...

—কী ?

—কিন্তু ওভাবে এক নারীকে শুধু মনে মনে ভালবাসাও ঠিক উচিত হবে না বলে মনে হল। কে জানে, নীরাজিতাও তো পরস্ত্রী হয়ে যেতে পারে ; কার না কার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে নীরাজিতার। তাতে চিরকাল মনের ভিতরে এই লজ্জা থেকে যেত যে, আমি মনে মনে এক পরনারীর জন্য অনেক অনুরাগ পুষেছি। তাতে পৃথিবীতে কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে আমার বিবেকে বাধত। মনে হত, বেচারার প্রতি অন্যায় করছি। কিন্তু...

কথা শেষ না করেই চকিতে আর একবার নীরাজিতার বিস্মিত মুখটার দিকে তাকিয়ে বিভূতির চোখ দুটোও একটা নিখুঁত শুদ্ধতার গর্বে হেসে হেসে ঝকঝক করে। —কিন্তু আমার গর্ব ও আনন্দ এই যে, জীবনে প্রথম যাকে মনে মনে ভালবাসতে চেয়েছিলাম, তাকেই আমি বিয়ে করলাম। আমার চরিত্রের সম্পর্কে আমার একবিন্দুও অভিযোগ নেই, নীরা।

কী কঠোর শুদ্ধতার সাধনা। নিজের চরিত্রের সম্বন্ধেও বিভূতির মনে কোনও ক্ষমমায় দুর্বলতা নেই। বিভূতির এই শুদ্ধ পৌরুষের উপর কোনও চরিত্র-ঘাতক কলুষের ছায়াও পড়েনি কোনওদিন—গর্বিত হবারই কথা।

বিভূতির গাড়ি চমৎকার একটা উজ্জ্বলতার কাছে এসে পড়েছে। বিভূতির বাংলোর ফটকের কাছে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। চাপকান-পরা দুটি মানুষ। বোধ হয় বিভূতিরই চাপরাসি আর বেয়ারা।

বিভূতির গাড়ি থামে। পিছনে আরও একটা গাড়ির শব্দ প্রচণ্ড হর্ষের শিহর তুলে ছুটে আসছে শোনা যায়। হ্যাঁ, নীরাজিতা আর বিভূতির জীবনের শুদ্ধ ও শুভ মিলনের জন্য রাজপোখরার অলক্তকের যত প্রীতি আর আশীর্বাদের বস্তুময় সম্ভার নিয়ে যে গাড়িটার আসবার কথা, সেই গাড়িটাও প্রায় এসে পড়েছে।

স্টিয়ারিং-এর চাকা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে একবার নীরাজিতার একটা হাত ধরে বিভূতি। —এসো, নীরা।

নীরাজিতার হাতটা যেন কেঁপে ওঠে। বিভূতির হাতটা কত ঠাণ্ডা ! যেন একটা নিখুঁত লোহার আগ্রহ নীরাজিতার নরম হাতটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে।

খরসোয়ানের রাত্রি যখন একেবারে নীরব হয়ে যায়, আর বিভূতির এই চমৎকার চেহারার বাড়িটা মাঝরাতের চাঁদের আলো গায়ে জড়িয়ে ধবধব করে, তখন ইস্পাতের আলমারির একটি দেরাজ টেনে ব্যাঙ্কের জমার বইগুলি এক-এক করে খুলে ব্যালান্সের অঙ্কের সংখ্যাগুলির দিকে তাকায় আর মনে মনে হিসাব করে বিভূতি। এবং দেরাজ বন্ধ করেই মৃদুস্বরে ডাক দেয়—নীরা।

এতক্ষণ ধরে এই ঘরের ভিতরই একটা সোফার উপর বসে ছিল নীরাজিতা। কিন্তু জানে না বিভূতি, কখন তার ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে নীরাজিতা, এবং এখন কোন ঘরে কোথায় বসে আছে আর কী করছে, তাও কল্পনা করতে পারে না। ডাক দেবার পর সাড়া না শুনতে পেয়ে আবার ডাক দেয় বিভূতি —নীরা, কোথায় গেলে তুমি ?

কী আশ্চর্য, নীরাজিতা কি ভুলেই গেল যে, খরসোয়ানের এই রাতটা আজ বিভূতি ও নীরাজিতার

জীবনের সত্যিকারের প্রথম শুভরাত্রি হবার গৌরবে চিহ্নিত হয়ে যাবে ? খাওয়ার পালা সারা হবার পরে, এই তো ঘণ্টা দুই আগে, বিভূতি একেবারে স্পষ্টভাষায় এবং চোখের চাহনিতে কোনও কুণ্ঠা না রেখে নীরাজিতার কানের কাছে ফিসফিস করে হেসেছে—আর বেশি দেরি হবে না, নীরা, কিন্তু তুমি ভুল করে ঘুমিয়ে পড়ো না। আমি শুধু ব্যাঙ্কের জমার বইগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই...

না, ঘুমিয়ে পড়েনি নীরাজিতা। জাগা চোখ দুটোকে অপলক করে নিয়ে এই ঘরের ভিতরই সোফার উপর চুপ করে বসেছিল ; এবং মাঝে মাঝে বিভূতির মুখের দিকে তাকিয়ে কে জানে কি দেখবারও চেষ্টা করেছিল। তারপর সোফা থেকে উঠে আর সেন্ট ও পাউডারে সুরভিত করা সেই সুন্দর চেহারার একটা ক্লান্ত ও বিস্মিত শোভাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পিছনের বারান্দার রেলিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খরসোয়ানের আকাশের চাঁদটাকে দেখতে নিশ্চয় খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছে নীরাজিতার ; তা না হলে এই দু ঘণ্টা ধরে রেলিং-এর কাছে একই জায়গায় একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কেন, আর চোখ তুলে শুধু আকাশের দিকেই বা তাকিয়ে থাকে কেন নীরাজিতা ?

নীরাজিতার চোখের দৃষ্টিই বা এত কঠোর রকমের শান্ত কেন ? ঠোঁট দুটো ঠাণ্ডা কেন ? আঙুলের নতুন আংটিটা এত ঢিলে মনে হয় কেন ? হাতের আঙুলগুলি কি হিমের ছোঁয়া লেগে সিঁটিয়ে গিয়েছে ?

রুমাল দিয়ে গলার ঘাম মুছতে গিয়ে নীরাজিতার হাতটাও কেঁপেছে। আর, রাগ করে কপালটাকে টিপে ধরেছে নীরাজিতা। ছিঃ, এত ভয় কিসের ? বুকটা মিছেমিছি এরকম টিপটিপ করে কেন ?

—নীরা ! তুমি এখানে এসে কী করছ ?

বিভূতির ডাক শুনে চমকে ওঠে নীরাজিতা। বিভূতির মৃদু গলার স্বরে যেন একটা বিরক্ত বিস্ময়ের বাতাস ফিসফিস করে উঠেছে। ঠিকই তো, বিভূতির একটু বিরক্ত হবারই কথা। বিভূতিকে হঠাৎ একলা করে ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসে নিজেকেও কেন একলা করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীবাজিতা ? নীরাজিতা কি জানে না, এই কিছুক্ষণ আগে বিভূতির চোখের চাহনিটা কুণ্ঠাহীন হয়ে, কী বিপুল আশায় উৎফুল্ল হয়ে নীরাজিতাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল ?

খবসোয়ানের এই নীরব রাতের আকাশের চাঁদ যে নীরাজিতার জীবনের এক পরম অঙ্গীকারের সঙ্কেত হয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—সময় হয়েছে, নীরাজিতা। আর অপেক্ষা করতে হবে না। যে বিভূতিব চরিত্রেব গৌরবকাহিনী শুনে নীরাজিতার বাইশ বছর বয়েসের শরীরটা শ্রদ্ধার আবেশে বিচলিত হয়ে মামার কাছে একেবারে বেহায়া হয়ে বলেই দিতে পেরেছিল যে, বিভূতিবাবুর সঙ্গে যদি হয়, তবে হয়ে যাক ; তা না হলে, এখন আর আমার বিয়ের কথা নিয়ে আপনাদের কোনও চেষ্টা আর কোনও চিন্তা করবার দরকার নেই।

খবসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের সেই বিভূতি আজ নীরাজিতার শরীরের সেই শ্রদ্ধার আবেশ বরণ করবার জন্য নীরাজিতার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু...কী যেন বলতে চায় নীরাজিতা। সুরভিত মূর্তিটাকে হঠাৎ একটু কুঁকড়ে দিয়ে আর আঁচলটাকে দু পাক দিয়ে হাতে জড়িয়ে রেলিং-এর কাছ থেকে এক-পা পিছনে সরে যায়।

বিভূতি হাসে। খরসোয়ানের এই ভয়ানক শান্ত রাতের চাঁদটারই মত নীরব ও ধবধবে সাদা হাসি। নীরাজিতার কাছে এগিয়ে আসে বিভূতি, আর নীরাজিতাকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধবে।

- আঃ, নীরাজিতার বুকে একটা অদ্ভুত রকমের আতঙ্কের নিশ্বাস যেন ফুঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু বিভূতিব বুকের যত অনুভবের পেশি আর স্নায়ুগুলি যে নীরাজিতার সেই ভীরু শরীরের আর্তনাদ শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। নীরাজিতার কানের কাছে ফিসফিস করে বিভূতি। —আমার নীরা যে এইরকম ভয় পাবে, শিউরে উঠবে আর হেজিটেট করবে, এ আমি জানতাম...আমি জানতাম...আমি .. বলতে বলতে বিভূতির মুখের সেই শান্ত হাসি যেন উগ্র আগুনের আভার মত জ্বলতে থাকে। বিভূতির প্রাণ যেন ঠিক এই রকম একটি লজ্জিত, কুণ্ঠিত, আতঙ্কিত ও ঠাণ্ডা কোমলতার ছোঁয়া আশা করেছিল। এই রকম একটি অনিচ্ছা-ভীরু শরীর ; এক-পা পিছনে সরে যাওয়া একটি চকিত বিস্ময় ; শরীরের উপর এই রকম একটি চরিত্রময় আবরণের অনাহত শাসন বাঁচিয়ে রেখেছে যে নারী, সেই নারীর ভালবাসাকেই যে ভালবাসা বলে মনে করে বিভূতি। খুশি হয়েছে বিভূতি ; বিভূতির কল্পনা

আজ নীরাজিতার শুদ্ধ শরীরের সব অনুভব আর লজ্জা আপন করে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বিভূতির হাত দুটো ধন্য হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নীরাজিতা যেন এরই মধ্যে হাঁপাতে শুরু করে দিয়েছে। বিভূতির দু হাতের এই বন্ধনের বেড়া থেকে একটু আলগা হবার জন্য মাঝে মাঝে ছটফট করে উঠেছে নীরাজিতা।

বিভূতি বলে—কী, নীরা ?

—শুড়ো, একটা কথা বলছি, শোনো।

—বলো।

—শরীরটা ভাল বোধ করছি না। ভাল লাগছে না।

বিভূতি হাসে।—ভয় করছে, নীরা ?

—হ্যাঁ।

আরও দুরন্ত আগ্রহে নীরাজিতকে বুকের উপর চেপে ধরে বিভূতি। ভয় করছে নীরাজিতার ? কী সুন্দর ভয় ! বিভূতির চোখ দুটো যেন এই রকম একটি ভয় ছিন্নভিন্ন করবার সৌভাগ্যে মত্ত হয়ে দপদপ করে জ্বলছে। নীরাজিতার ঠোঁট দুটো ঠাণ্ডা ! কী চমৎকার শীতলতা ! বিভূতির নিশ্বাসের পিপাসা যেন ঠিক এই রকম একটি শীতলতাকে লুব্ধ দংশনে বিক্ষত করবার জন্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

—এসো, নীরা।—নীরাজিতার হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে চরম আহ্বানের ভাষা ধ্বনিত করতে গিয়ে বিভূতির গলার স্বর যেন আরও মুগ্ধ হয়ে কেঁপে ওঠে।

আর, নীরাজিতার সুরভিত চেহারাটা দ্বিধাহীন আত্মোৎসর্গের মত বিভূতির সেই আহ্বানের স্বরে যেন বন্দি হয়ে বিভূতির পাশে পাশে হেঁটে ঘরের ভিতরে চলে যায়।

এবং তারপর, খরসোয়ানের রাতের চাঁদ যখন দূরের পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি এসে ধুলেলা বাতাসের আবরণে ময়লা হয়ে যায়, এবং বিভূতির এই চমৎকার বাড়ির চেহারাটাও ঠিক আর ধবধব করে না, তখন বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর স্নানসারা শরীরটাকে নতুন করে সাজাতে গিয়ে কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নীরাজিতা। ভেজা শাড়িটা যেন একটা রক্তাক্ত স্মৃতির জ্বালাময় লজ্জার কুণ্ডলীর মত গুটিয়ে রয়েছে। অলক্তকের মেয়ের আতঙ্কিত শরীরটার প্রত্যেক লজ্জা আর বেদনার্ত চমকগুলিকে পরমলোভ্য প্রসাদের মত আত্মসাৎ করতে গিয়ে কী প্রখর আনন্দে জ্বলজ্বল করেছে অলক্তকের মেয়ের স্বামী ওই বিভূতির চোখ দুটো ! কিন্তু জ্বলছে কেন নীরাজিতার স্নানসারা ঠাণ্ডা শরীরটা ? কী আশ্চর্য, শরীরটাতে এখনও ময়লার ছোঁয়া লেগে আছে বলে মনে হয়।

খরসোয়ানের জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে আর মিশিয়ে দিয়ে নীরাজিতার প্রাণটাও হেসে উঠতে পেরেছে। পুরো তিনটে মাস পার হয়ে গেল, তবু রাজপোখরার অলক্তকের কাছে ফিরে গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবার জন্য নীরাজিতার প্রাণে যেন কোনও দাবিই নেই। শীতলবাবুর কাছ থেকে অনেক চিঠি এসেছে। কবে আসতে চাও নীরাজিতা ? দিন ঠিক করে শুধু একটা চিঠি দিয়ো ; তোমাকে আনবার জন্য সেদিনই গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু অলক্তকের এ রকম এক একটা স্নেহাক্ত আহ্বানের ব্যাকুলতার স্বর শুনেও বিচলিত হয় না নীরাজিতার মন। চিঠির উত্তরে চিঠি দেয় নীরাজিতা—যাব, কিন্তু দেখি কবে যেতে পারি। ওর যে এখন খুব কাজের চাপ ; একটুও সময় নেই।

বউদির চিঠি এসেছে।—বিভূতিবাবুর না হয় সময় নেই, কিন্তু তোমার সময়ের অভাব কোথায় ? বিভূতিবাবুর না হয় কাজের চাপ কমে গেলে আসবেন। কিন্তু তোমার একবার আসতে অসুবিধে কিসের ?

বউদির চিঠির উত্তরে যেকথা লিখে জানিয়েছে এবং আজও চিঠিতে লিখেছে নীরাজিতা, সেকথা বউদিকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। এবং বউদিও মন্তব্য করেছেন, এ রকমটি দেখিনি। দুটি দিনের জন্য ছাড়াছাড়ি সহ্য করতে পারে না, এ যে একেবারে কপোত-কপোতীর প্রেম।

নীরাজিতার চিঠির বক্তব্য পাঠ করে অলক্তকের মানুষগুলি ঠিক দুঃখিত হতে পারেনি ; বরং মনে

মনে একটু খুশিই হয়েছে। নীরাজিতা সত্যিই রাজপোখরাতে আসতে চায়, কিন্তু একলাটি আসতে চায় না। যেদিন আসবে, সেদিন দুজনে একসঙ্গেই আসবে। বিভূতির কাছছাড়া হয়ে দুটো দিনের অলক্তকের জীবনও সহ্য করতে কষ্ট হবে নীরাজিতার ; বেশ তো, আরও কিছুদিন দেরি করুক, তারপর দুজনে যেন একসঙ্গেই আসে।

অলক্তকের মানুষেরাও এই তিন মাসের মধ্যে কয়েকবার এসে নীরাজিতার খরসোয়ান-জীবনের হাসি আনন্দ আর তৃপ্তির ছবি দেখে গিয়েছে। সারাদিন বইপড়া আর ফুলের আদরের যত কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে নীরাজিতা। টবের ফুলের গাছগুলিকে দিনে তিন চার বার করে যত্ন করা ; সকাল সন্ধ্যা দু বেলা ফুল তুলে মনের মত করে তোড়া বাঁধা, আর সেগুলি ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা ; এই কাজ।

সন্ধ্যাবেলা যখন ঘরে ফেরে বিভূতি, তখন বিভূতিও দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়, এবং বিভূতির চোখের চাহনিতে সুন্দর একটি তৃপ্ত অহংকারের হাসিও জ্বলজ্বল করে। নীরাজিতা যেন বিভূতিরই জীবনের সান্ধ্য-অভ্যর্থনা হয়ে আর সুন্দর সাজে সেজে অপেক্ষায় রয়েছে। বিভূতি এসে চেয়ারের উপর বসে পড়তেই নীরাজিতা নিজের হাতে বেবি-টেবিলটাকে টেনে নিয়ে এসে বিভূতির সামনে রাখে ; টাটকা তোলা ফুলের তোড়া দিয়ে সাজানো একটা ফুলদানি টেবিলের উপর রেখে দিয়েই চলে যায় নীরাজিতা। তার পর চায়ের পট নিজের হাতে তুলে নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখে। তারপরেই বিভূতির পাশের চেয়ারে বসে পড়ে নীরাজিতা।

—রাজপোখরা থেকে কোনও চিঠি এসেছে ?

—হ্যাঁ।

—কী লিখেছে ?

—ওই একই কথা।

বিভূতি হাসে। —বেশ তো, দুদিনের জন্য একবার ঘুরে এসো না কেন, নীরা ?

—না, যদি যাই তবে দুজনে একসঙ্গে যাব।

—বেশ তো, তবে চলো, কালই চলো।

চমকে ওঠে নীরাজিতা। —কাল ! কেন ? তোমার কি সময় আছে ? ছুটি নিয়েছ নাকি ?

—ইচ্ছে করলেই ছুটি পেতে পারি।

নীরাজিতার চোখের চাহনি হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায়, যেন নীরাজিতার কল্পনার একটা ছবি হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। বিভূতি যদি ছুটি পায়, তবে বিভূতির সঙ্গেই রাজপোখরাতে যাবে নীরাজিতা। এই তো নীরাজিতারই ইচ্ছার কথা। এতদিন এই কথাই বলেছে আর চিঠিতে লিখেছে নীরাজিতা। কিন্তু সেই ইচ্ছার পথ মুক্ত হয়ে যেতেই নীরাজিতার উৎসাহ যেন চমকে উঠে দু পা পিছনে সরে যেতে চাইছে। রাজপোখরাতে যেতে চায় না নীরাজিতা।

—কেন নীরা ? হঠাৎ আনমনা হয়ে গেলে কেন ?

নীরাজিতা যেন আনমনা ভাবনার ঝোঁকে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —না, এখন গিয়ে কোনও লাভ নেই।

—লাভ নেই ! তার মানে ?

হেসে ওঠে নীরাজিতা। —তার মানে, এখন রাজপোখরার বাগানে পাকা আমের গন্ধ থমথম করে না। আম পাকতে এখনও দেরি আছে।

—তা হলে বলো, আর মাসখানেক পরে রাজপোখরাতে যেতে চাও ?

—হ্যাঁ ?...তা যেতে হবে বলে আশা করতে দোষ কী ?

—কীরকম যেন এলোমেলো কথা বলছ নীরা ?

চমকে ওঠে নীরাজিতা। —এলোমেলো কথা ?

—হ্যাঁ ; মনে হচ্ছে, যেন কারও ওপর রাগ করে কথা বলছ।

নীরাজিতা ঝংকার দিয়ে হেসে ওঠে। —সত্যি কথা। রাগ হচ্ছে নিজেরই ওপর।

—কেন নীরা ?

—বাবা আর বউদিকে এই সামান্য একটা কথা লিখতে পারলাম না যে, হ্যাঁ, অমুক দিন রাজপোখরাতে যাব। তা ছাড়া...বাড়ির চিঠিগুলোও এমন একঘেয়ে কথায় ভরা যে...

—কী ?

—রাজপোখরাতে যাবার জন্য মনে কোনও উৎসাহ জাগে না।

বিভূতি হাসে। —এর আসল রহস্য কী, সেটা আমি বুঝতে পারছি।

—কী ?

—খরসোয়ানের এই বাড়ির জীবনকে তুমি বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছ।

নীরাজিতা মাথা হেঁট করে লাজুক হাসি লুকোতে চেষ্টা করে।

—থাক ওসব কথা ; আর এক কাপ চা খাও।

এর পর খরসোয়ানের সন্ধ্যাটা যেন দু ভাগ হয়ে যায়। ভিতরের একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে ইস্পাতের আলমারি খোলে বিভূতি। অনেক কাগজপত্রের ফাইল আর ব্যাঙ্কের অনেকগুলি জমার বই বের করে নিয়ে অন্তত একটা ঘণ্টা ধরে একটা হিসাবের আনন্দে তন্ময় হয়ে থাকে। আর, নীরাজিতা আস্তে আস্তে বারান্দার উপর পায়চারি করে বেড়ায়। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায় আর রেলিং-এর উপর দু হাতের ভর রেখে যেন আকাশের তারা গুনে গুনে একটা অদ্ভুত হিসাবের কাজে প্রাণটাকে ব্যস্ত করে রাখে।

আর, বুকের ভিতরের একটা দুঃসহ রাগের জ্বালার সঙ্গে যেন সমস্ত নিশ্বাসের জোর দিয়ে লড়াই করতে থাকে নীরাজিতা। রাগ হয় নিজের উপর ; মিথ্যে নয় নীরাজিতার এই ধারণা। আর, কে জানে কেন, রাগ হয় অলক্তকের সেই ফটকটার উপর ; রাগ হয় পৃথিবীর একটা বাস্তব সত্যের ভয়ানক নিষ্ঠুরতার উপর। নিশীথ রায় নামে সেই মানুষটার চরিত্রে দোষ থাকে কেন ? মানুষটাই নিষ্ঠুর। ওকে ক্ষমা করা যায় না।

ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় নীরাজিতা। এবং এই লজ্জার মধ্যে যেন ভয়ানক গোপন অপমানের দংশন আছে। সে লোকটার উপর আবার রাগ হয় কেন ? নীরাজিতার কাছে এসে ক্ষমা চাইবার জন্য কোনও চেষ্টা করল না ; বলতে গেলে একটা মুহূর্তও অপেক্ষা করল না ; একেবারে নির্লজ্জ লোভের ডাকাতের মত যাকে সামনে পেল তাকেই—প্রতিভার মত মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে চলে গেল। প্রতিভা কি ওর ঘরের সুখের লোভটাকে এতদিনে হতাশ করে দিয়ে, সেই ভদ্রলোকের কাছে...কী যেন সেই ভদ্রলোকের নাম, বিলেত থেকে ফিরে এসে কলকাতায় এখন একটা হোটেল করেছে যে ভদ্রলোক ? প্রতিভার কীর্তির কথা যার কাছ থেকে শুনতে পেয়েছিল নিশীথ !

চলে গেলেই তো পারে প্রতিভা। কালিকাপুর মাইনস-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের বাংলো বাড়িতে মিছে মায়ার খেলা জমাবার চেষ্টা না করে তার চরিত্রের সেই প্রাক্তন বান্ধবের কাছে চলে যেতে লজ্জা কেন ? ঠিকানা কি জানা নেই ? নিশীথ রায় নামে মানুষটাকে শান্তিতে থাকতে দিক না কেন প্রতিভা।

কী অদ্ভুত চিন্তা। চিন্তার রকম দেখে নিজের এই মনটাকেই ঘেন্না করতে ইচ্ছা করে। নিশীথ রায় নামে সেই ভদ্রলোকের জীবনের ভালমন্দের কথা ভেবে খরসোয়ানের এই সান্ধ্য-জীবনের আনন্দ নষ্ট করে কেন নীরাজিতা ?

যার কথা ভাবা উচিত, যার জীবনের সঙ্গিনী হয়ে খরসোয়ানের এই তিনটি মাসের দিন ও রাতের সঙ্গে হেসে খেলে প্রাণটাকে মিশিয়ে দিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করছে নীরাজিতা, তার হিসাবের কাজ শেষ হতে মাঝে মাঝে রাত হয়ে যায়। তারপর খাওয়া ; এবং তারপর...

অসহ্য ! নীরাজিতার জীবনটা যেন বাথরুমের একটা মিররের সামনে দাঁড়িয়ে, ভেজা তোয়ালে দিয়ে শরীরের সব ঘৃণা মুছে মুছেও শুদ্ধ হতে পারে না। মনে হয় বুকের ভিতরে কোণে কোণে ময়লা লেগে আছে।

বাথরুমের মিররটাই শুধু জানে, এক-এক দিন কেঁদে ফেলেছে নীরাজিতা। এবং নীরাজিতাও ওর চোখের জল দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। কেন ? কিসের যন্ত্রণা ? শুদ্ধচরিত্র স্বামীর ছোঁয়া বরণ করে কোনও নারীর গা ঘিনঘিন করে উঠতে পারে না ; তবে কেন অলক্তকের মেয়ের এই শাস্তি ?

দেখতে পাওয়া যায়, একটু দূরে একটা পোড়া বস্তির ছাই আর কয়লা ছড়িয়ে পড়ে আছে। খরসোয়ানে এসে এই চমৎকার বাড়ির জীবনের সাতটা দিন পার হতে না হতে এমনই এক সন্ধ্যায় ওই বস্তিটাতে আগুন লেগেছিল। বস্তির বুকটা যেন হঠাৎ আতঙ্কে ছিঁড়ে গিয়ে ভয়ানক চিৎকার করে উঠেছিল। বস্তির লোকেরা হাঁড়ি ক্যানেস্তারা আর বালতি হাতে ছুটে এসেছিল।

জল চাই ; আগুন নেবাবার জন্য এই বাড়ির বাগানের ওই প্রকাণ্ড ইঁদারা থেকে জল দেবার জন্য ফটকের কাছে এসে ভিড় করে চেঁচিয়ে উঠেছিল বস্তির লোকেরা—পানি চাহিয়ে, সাহেব। ঘর জ্বল যাতা হ্যায়, সাহেব। মেহেরবানি কিজিয়ে, সাহেব।

কিন্তু কী চমৎকার নির্বিকার বিভূতির সেই চোখের দৃষ্টি। বস্তির আর্তনাদ শুনে একটুও বিচলিত হয়নি বিভূতি।—হঠ্ যাও, গোলমাল মত্ করো।—শুধু একটি কথা বলে দিয়ে চুপ করে গিয়েছিল বিভূতি।

বিভূতির সেই নির্বিকার চোখের দিকে তাকিয়ে নীরাজিতাও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেছিল—ওদের জল নিতে দিলে কী ক্ষতি হত ?

বিভূতি গম্ভীর হয়ে বলেছিল, কী লাভ হত ?

—অন্তত দু-চারটে ঘরের আগুন নেবাতে পারা যেত।

—বুঝলাম, কিন্তু তাতে আমার কী লাভ ?

নীরাজিতার কান দুটো একটা কঠোর বিস্ময়ের আঘাতে যেন কিছুক্ষণের জন্য বধির হয়ে গিয়েছিল।

নীরাজিতার এই বধিরতা যখন ভেঙেছিল তখন শুনতে পেয়েছিল, গুনগুন করে যেন আপন মনের একটা সুখের সুরে কথা বলছে বিভূতি—আমার অনেকদিনের ইচ্ছা এতদিনে সফল হল।

—তার মানে ?

—ওই বস্তিটাকে দেখলেই আমার চোখ দুটো ঘিনঘিন করত।

—কারণ ?

—কারণ, ওই বস্তিতে যারা থাকে তারা...তারা হল কতকগুলো দুশ্চরিত্র মেয়েলোক। ওটা একটা নরকগোছের জায়গা।

উত্তর দেয়নি নীরাজিতা। শুধু বিভূতির সেই শান্ত স্তব্ধ ও পবিত্র চেহারাটার দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়েছিল। এবং মনে মনে যেন নিজেরই একটা ভুল আর্তনাদের লজ্জা সহ্য করেছিল। বিভূতির মত মানুষকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না নীরাজিতা, কিন্তু সেটা বিভূতির দোষ নয়। বিভূতি ভুল করছে, বিভূতির অন্যায় হয়েছে, এতটা ভাবতে সাহস করতে পারে না নীরাজিতা। ভদ্রলোক কারও চরিত্রের কলুষ সহ্য করতে পারে না ; এর জন্য ভদ্রলোক এইরকম একটা মমতাহীন কাণ্ড করে ফেলল। করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সত্যিই তো মমতাহীন নয়।

আজও খরসোয়ানের এই অন্ধকারময় শান্ত সন্ধ্যায় নীরাজিতার সুরভিত চেহারাটা বারান্দার নিভৃতে পায়চারি করে ঘুরে বেড়ায় আর মাঠের বাতাস মাঝে মাঝে হু-হু করে ছুটে আছে। নীরাজিতার বুকের ভিতরের একটা বোবা বাতাস যেন হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে।—নিশীথ রায়ের বুকটা কি এই রকম শান্ত কঠোর ও নির্বিকার ?

বিশ্বাস হয় না, সে মানুষটার বুকটা দুর্বল নিশ্চয়। এই রকম একটা বস্তির কতকগুলি চরিত্রহীন প্রাণীর আর্তনাদ শুনে সে লোকটা বোধ হয় নিজেই জলের ক্যানেস্তারা হাতে নিয়ে...

আবার সে ভদ্রলোকের কথা চিন্তা করে কী বুঝতে চাইছে নীরাজিতা ? একটা মমতাময় বুক থাকলেই মানুষ সচ্চরিত্র হয়ে যায় না।

এই তো, আজ প্রায় এক মাস হল কোনও একটা কোলিয়ারির এক কম্পাসবাবু এসেছিলেন। কম্পাসবাবুর মেয়ের বিয়ে, কিন্তু বিয়ের সব খরচ যোগাবার মত টাকা নেই। এদিক-ওদিকের দু চারটে মাইনস এর ভদ্রলোকেরা প্রত্যেক দশ-বিশ টাকা সাহায্য করেছেন। এখন, আর এক শো টাকা হলেই নিশ্চিন্ত হয়ে যান কম্পাসবাবু।

বিভূতি আর নীরাজিতা যখন সকালবেলা ড্রইংরুমে বসে গল্প করছিল, তখন এলেন কম্পাসবাবু।

এবং বেশ আশান্বিত একটা ভাব নিয়ে, চোখের দৃষ্টিটাকে অদ্ভুতভাবে ছলছলিয়ে এক শো টাকা সাহায্যের আবেদন শোনালেন। সব কথা শোনবার পর বিভূতি শুধু একটি কথা বলল—'সরি'।

—আজ্ঞে ?—ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

বিভূতি শুধু মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয়, না, হবে না।

চলে গেলেন কম্পাসবাবু। এবং নীরাজিতা আবার বোধ হয় একটা দুঃসহ বিস্ময়ের বেদনা সহ্য করতে না পেরে প্রশ্ন করেছিল—ভদ্রলোককে কিছু টাকা দিলেই পারতে।

--তাতে লাভ ?

নীরাজিতার গলার স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে।—একটা অভাবের মানুষকে সাহায্য করা হল, এই লাভ।

—আমার টাকাগুলো চ্যারিটির ফান্ড নয়, নীরাজিতা।

কিছুক্ষণ আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকবার পর কেমন-যেন একটা আক্রোশের স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে নীরাজিতা।—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

—হ্যাঁ।

—এই ভদ্রলোককে তুমি চেন ?

—খুব চিনি।

—ভদ্রলোকের মেয়েটিকে চেন ?

—অনেকবার দেখেছি। বেশ হাসিখুশি চেহারা, দেখতেও বেশ মেয়েটা।

—মেয়েটি কেমন ?

—তার মানে ?

—চরিত্র কেমন ?

—নিমাইবাবু, শ্যামবাবু, ঈশ্বরীবাবু সকলেই তো বলেন, খুব ভাল স্বভাবের মেয়ে।

—তার মানে, সত্যিকারের ভাল চরিত্রের মেয়ে।

—তাই তো।

—তা হলে, অন্তত একটা সচ্চরিত্রতার জন্য খুশি হয়ে মেয়েটির বিয়েতে তোমার এক শো টাকা সাহায্য করা উচিত ছিল না কি ?

—তুমি কম্পাসবাবুর তরফে ওকালতি করছ বলে মনে হচ্ছে।

নীরাজিতা হঠাৎ বলে ফেলে—আমি তোমাকে বুঝতে চাইছি।

বিভূতির চোখে সূক্ষ্ম একটা ভ্রূকুটির ছায়া কেঁপে ওঠে।—আমাকে বুঝতে কি তোমার কিছু বাকি আছে ?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—তবে বুঝতে চেষ্টা করো।

—সেই জন্যেই জিজ্ঞাসা করছি, কম্পাসবাবুকে ওভাবে এক কথায় 'না' বলে ফিরিয়ে দিলে কেন ?

—লোকটা ভয়ানক চালাক এবং অসৎ।

—কেন ?

—লোকটার ছোট একটা বাড়ি আছে। লোকটা অনায়াসে বলতে পারত যে, আপনি দয়া করে বাড়িটা বন্ধক রেখে আমাকে কিছু টাকা দিন। তা হলে বুঝতাম যে, গরিব হলেও লোকটার মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যারা টাকা দান চায়, তারা মানুষ নয়।

—কিন্তু যারা টাকা দান করে, তারা তো অমানুষ নয়।

—আমার মতে তারাও অমানুষ।

নীরাজিতার চেহারাটা যেন নিশ্বাসহীন একটা স্তব্ধতার প্রতিমূর্তির মত বিভূতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবং বিভূতি হঠাৎ বিড়বিড় করে ওঠে।—আমি নিশীথ রায় নই, নীরা।

—তার মানে ?

—মেয়েমানুষের দুঃখের কথা শুনলেই যে চরিত্রহীনের মেরুদণ্ড মায়ায় গলে যায়, আর পকেট খালি করে টাকা ঢালে, সে মানুষ আমি নই।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে হাসতে থাকে নীরাজিতা। খরসোয়ানের এই চমৎকার শুদ্ধতার জীবন, যে জীবন চাঁদের আলোতে ধবধব করে, সেই জীবনের ভার যেন অলক্তকের মেয়ের অদৃষ্টের উপর অনড় হয়ে বসে কড়কড় শব্দ করছে। অলক্তকের মেয়ের সহ্যের পাঁজরগুলি পটপট করে বাজছে। সেই ভয়ানক যন্ত্রণাকে প্রচণ্ড একটা ফাঁকির হাসি দিয়ে ভুলিয়ে দেবার জন্য শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নীরাজিতা।

বিভূতিও হাসে—এখন বুঝতে পেরেছ বোধ হয়।

—হ্যাঁ।

—তবে ? তুমি মিছেমিছি তর্ক করলে আমার বেশ খারাপ লাগে, নীরা।

নীরাজিতা হাসে—আর তর্ক করব না।

আর তর্ক করেনি নীরাজিতা। কারণ আর কিছু বোঝবারও বোধ হয় বাকি নেই। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের এই বিভূতির জীবনে সোনারূপার কোনও বালাই নেই ; আছে শুধু একটি ঐশ্বর্য, পরশমানিকের মত যে ঐশ্বর্য সব ঐশ্বর্যের সেরা—চরিত্র।

নীরাজিতার এই বিশ্বাসও মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়েছে : দেখেছে নীরাজিতা, বিভূতি নামে এই মানুষটির চরিত্রে যেন শানিত হীরার ধার আছে। তা না হলে, লিস্টারের বাড়িতে কক্‌টেল আর নাচের নিমন্ত্রণ পেয়েও সারাটা সন্ধ্যা নীরাজিতার কাছেই চুপ করে বসে থাকতে পারলে কেমন করে বিভূতি ?

—না, নীরা ; ওসব হুল্লোড়ের মধ্যে যেতে একটুও ইচ্ছে করে না।

—কেন ?

—কোথা থেকে তিনটে ধিঙ্গি-ধিঙ্গি মিস্ এসে ঠাঁই নিয়েছে লিস্টারের বাড়িতে। ওসবের ছায়ার কাছেও যেতে নেই।

—কেন ?

—গেলে বিপদে পড়তে হবে। ধিঙ্গিগুলোর পেটে এক গেলাস হুইস্কি-সোডা পড়লেই আর রক্ষা নেই। হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দেবে।

বিভূতির কথাগুলিকে শ্রদ্ধা করবার জন্য যেন প্রাণপণে চেষ্টা করে নীরাজিতা। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে বিভূতির গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। নীরাজিতার মনটাও যেন ব্যাকুলভাবে কামনা করছে, বিভূতির কথাগুলি শুনতে শুনতে ভরে যাক না কেন মন।

ঠিক সেই সময় বাইরে বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায় একটা মূর্তি ; এবং সেদিকে চোখ পড়লেই বুঝতে পারে নীরাজিতা, সেই কম্পাসবাবু এসেছেন।

—কী ব্যাপার ? আবার কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন ?

কম্পাসবাবুর হাতে একটা হাঁড়ি। হাসছেন কম্পাসবাবু। আজ মেয়ে-জামাই এসেছে, স্যার। তাই এই সামান্য...

—কী ?

—জয়নগরের মোয়া। জামাই নিয়ে এসেছে। সবসুদ্ধ চার হাঁড়ি এনেছিল। নিমাইবাবুর বাড়িতে, শ্যামবাবু আর ঈশ্বরীবাবুর বাড়িতে এক এক হাঁড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছি ; আর এটি স্যার আপনার জন্য...

হো-হো করে হেসে ওঠে বিভূতি। —বেশ বেশ ; এনেছেন যখন, তখন রেখে যান।

বারান্দার মেঝের উপর হাঁড়িটাকে নামিয়ে রেখে এবং হাসিমুখে একটা নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন কম্পাসবাবু।

আর, নীরাজিতার চোখ দুটো যেন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। হাঁড়িটার দিকে নয়, বিভূতি নামে এই শুদ্ধচরিত্র মানুষের মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে নীরাজিতা।

বিভূতি হাসে—কম্পাসবাবুকে দেখে তুমি খুব চটে গিয়েছ বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—তোমার মত মানুষকে কত সহজে ঘৃণা করতে পারে একটা সামান্য মানুষ।

—ঘৃণা ?

—হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কী ? নইলে তোমাকে এক হাঁড়ি মোয়া দিয়ে যাবে কেন সেই মানুষ, যার মেয়ের বিয়েতে তুমি এক শো টাকাও দিতে পারলে না, আর মানুষটাকে এক কথায় হাঁকিয়ে বিদেয় করে দিলে ?

বিভূতি হাসে—লোকটা আমাকে ঘৃণা করতে এসে যে এক হাঁড়ি মোয়া রেখে যেতে বাধ্য হল।

—খুব লাভ হল বোধ হয় ?

—খুব না হোক, অন্তত পাঁচটা টাকা লাভ হল।

—তা হলে বল তোমার অপমানের ফি হল পাঁচ টাকা। যেকোনও মানুষ ইচ্ছে করলেই পাঁচ টাকা তোমার হাতে তুলে দিয়ে তোমার গায়ে...

আর বলতে পারে না নীরাজিতা। যে কথাটা নীরাজিতার মুখের কাছে চলে এসেছে, রুমাল দিয়ে চেপে যেন সেই কথাটাকে নীরব করে দেয়।

এবং সেদিনই খরসোয়ানের মাঝরাতের নীরবতার মধ্যে বাথরুমের মিররের সামনে দাঁড়িয়ে বার বার থুতু ফেলে যেন বুকের ভিতরের একটা ঘৃণার উদ্গার শান্ত করতে চেষ্টা করেছিল নীরাজিতা।

—নীরা ? নীরা ?—আস্তে আস্তে হেঁটে আর মৃদুস্বরে ডাক দিতে দিতে এই সময় রোজই যেমন নীরাজিতার কাছে দাঁড়ায় বিভূতি, ঠিক সেভাবে নয়, যেন একটু ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে, হন্তদন্ত হয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসে বিভূতি। রোজই এই সময় চোখের চাহনি নিবিড় করে নিয়ে যেভাবে হাসে বিভূতি, আজ ঠিক সেভাবে নয়, যেন একটা অস্বস্তিকে কোনওমতে রুক্ষ হাসি দিয়ে হাসিয়ে নীরাজিতার কাছে এসে দাঁড়ায়। এই সময় নীরাজিতার হাত ধরতে গিয়ে বিভূতির হাতটা রোজই যেমন একটু নরম হয়ে যেতে চেষ্টা করে, আজ কিন্তু ঠিক তেমন করে নরম হয়ে যাবার চেষ্টা করে না। বরং বিভূতির হাতটা যেন সন্দেহে ও অভিযোগে বেশ একটু কঠিন হয়ে নীরাজিতার হাত ধরে—আমি এতটা ভাবতে পারিনি, নীরা !

আশ্চর্য হয় নীরাজিতা—কী ?

—তুমি বাইরে এক রকম আর ভিতরে আর এক রকম, ছিঃ !

চমকে ওঠে নীরাজিতা। —এরকম অদ্ভুত সন্দেহের মানে ?

—তোমাকে আমি কোনওদিন অবিশ্বাস করিনি, কিন্তু আজ করতে হচ্ছে।

নীরাজিতার চোখ জ্বলে ওঠে—স্পষ্ট করে বলো, কিসের অবিশ্বাস ?

বিভূতি গম্ভীর হয়। —দোষ করেও তোমার এত রাগ করে কথা বলা একটুও ভাল দেখায় না।

নীরাজিতা চেঁচিয়ে ওঠে—কিসের দোষ ? চরিত্রের ?

বিভূতি হেসে ফেলে। —ছিঃ, সে সন্দেহ থাকলে কি আজ তোমার হাত ধরে কথা বলতাম ?

—সন্দেহ করলেই পারতে।

—সন্দেহ করব কেন ? আমি ইডিয়ট নই। তা ছাড়া...

—কী ?

নীরাজিতার কানের কাছে মুখ এগিয়ে ফিসফিস করে বিভূতি। আর নীরাজিতার শরীরটা যেন ঘৃণাক্ত ক্ষতের জ্বালায় থরথর করে কেঁপে ওঠে। খরসোয়ানের জীবনের সেই প্রথম রাতের আর্তনাদটা বুকের ভিতর গুমরে উঠেছে। বাথরুমের মিররটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। রক্তাক্ত বেদনার স্মৃতি লুকিয়ে রেখে ভেজা শাড়ির কুণ্ডলিটা অসাড় হয়ে পড়ে আছে। নীরাজিতার বাইশ বছর বয়সের এই শরীরটার অনাহত চরিত্রনিষ্ঠার প্রমাণ পেয়ে কি উৎকট খুশির হাসি হেসেছিল অলক্তকের মেয়ের স্বামী।

বিভূতি বলে—সে কথা নয়। আমার অভিযোগ হল আমার সন্দেহ, তুমি আমার আলমারি খুলে

ব্যাঙ্কের জমার বইগুলো নাড়াচাড়া করেছ আর দেখেছ।

—কেন এমন সন্দেহ হল ?

—আলমারির চাবিটা যেখানে থাকে, আজ চাবিটাকে সেখানে পেলাম না।

—তুমি মনে করে দেখো, চাবিটা কোথায় রেখেছিলে।

—চাবিটা টেবিলের দেরাজে ছিল। কিন্তু চাবিটাকে বালিশের তলা থেকে পেলাম।

—তুমিই বালিশের তলায় চাবিটাকে রেখেছিলে। কিন্তু ভুলে গিয়েছ।

—না ; আমার ভুল হয় না।

বিভূতির মুখের দিকে তাকিয়ে আর দু চোখের চাহনিকে যেন পুড়িয়ে পুড়িয়ে কথা বলে নীরাজিতা—তোমার ব্যাঙ্কের জমার বইগুলো যদি আমি দেখে থাকি তো দেখেছি। তাতে তোমার ক্ষতি কী ?

—তাতে আমার লাভ কী ? ওসব জিনিস তুমি ছুঁলে কি আমার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ডবল হয়ে যাবে ?

—এতদিনে...এইবার বুঝলাম।

—কী বুঝলে ?

নীরাজিতার চোখের চাহনি যেন ঠক ঠক করে কাঁপে। হাতের রুমালটাকে মুখের কাছে তুলে নিয়ে আস্তে একবার কামড়ে ধরে। তারপরেই হেসে ওঠে।—তুমি সচ্চরিত্র।.

—ঠাট্টা করছ বলে মনে হচ্ছে।

—তোমার মত মানুষকে ঠাট্টা করব ?

—ছিঃ !

নীরাজিতাকে আস্তে আস্তে বুকের কাছে টানে বিভূতি ; আর নীরাজিতাও বিভূতির কাঁধের উপর মাথাটা এলিয়ে দেয়, আর অদ্ভুতভাবে যেন ডুকরে ডুকরে হাসতে থাকে। বিভূতি বলে—রাজপোখরা থেকে চিঠি এসেছে।

—কে লিখেছে ?

—তোমার বাবা।

—কী লিখেছে ?

—সব ভাল খবর। একটা মজার খবরও আছে।

—কী ?

—সেই চরিত্রহীন দম্পতি রাজপোখরাতে এসেছেন।

—কে ? কে ? কারা এসেছে ?—ছটফট করে বিভূতির হাতের মঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে নীরাজিতা।

—নিশীথ আর প্রতিভা। আধপাগলা বেকুব, সেই শিবদাস দত্ত একেবারে নির্লজ্জ হয়ে রোজই উৎসব করছে।

বিড়বিড় করে নীরাজিতা—জঘন্য ! কী ভয়ানক দুঃসাহস !

—কী বললে নীরা ?

—বেশ বুঝতে পারছি, বাবাকে অপমান করবার জন্য, চরিত্রহীনতার বড়াই দেখাবার জন্য ওরা রাজপোখরাতে এসেছে।

—ছেড়ে দাও ওদের কথা।

নীরাজিতা চেঁচিয়ে ওঠে—না, কখ্খনও না।

বিভূতি আশ্চর্য হয়—কী বললে ?

—আমি কালই রাজপোখরায় যাব।

—কিন্তু আমার তো ছুটি নেওয়া সম্ভব হবে না, নীরা।

—তুমি ছুটি নিয়ে পরে এসো, আমি কালই চলে যাই।

—কিন্তু...

নীরাজিতা যেন উতলা হয়ে ভয়ানক এক প্রতিশোধের স্বপ্নের সঙ্গে কথা বলতে থাকে।—কিন্তু

আবার কি ? একবার অপমানিত হয়ে শিক্ষা হয়নি ; আবার এসেছে ; আমার সৌভাগ্যকে ঠাট্টা করতে এসেছে একটা...এইবার আরও ভাল শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে।

প্রতিভা বলে—বড় জোর দুটি দিন, তার বেশি দেরি হবে না।

নিশীথ হাসে—ভয় হয় ; শেষ পর্যন্ত সাত দিন করে ফেলবে।

—না, ইচ্ছে করে একটি দিনও দেরি করব না।

—কিন্তু এই দুটি দিনই বা আমি একা একা কেমন করে... ।

—বই-টই পড়ে কোনওমতে দুটি দিন পার করে দাও, লক্ষ্মীটি।

নিশীথ আবার হাসে—আচ্ছা, তাই হবে। এসো তা হলে।

চাইবাসা যেতে হবে। প্রতিভার ছোট মাসিমা যিনি তিন বছর ধরে রোগশয্যায় পড়ে আছেন, জপের মালা হাতে নিয়ে আর খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে চরম অন্তিমের প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলেন যিনি, তিনি আর মালা জপতে পারছেন না। খবর এসেছে, বুকটা এখনও টিপটিপ করছে। যেকোনও মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেতে পারে।

তাই চাইবাসা যাবার জন্য তৈরি হয়েছেন শিবদাস দত্ত। প্রতিভাও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে। মর-মর ছোট মাসিমাকে শেষ দেখা দেখে নিয়ে ফিরে আসবে।

কথা আছে, হরবংশবাবু তাঁর গাড়িটা পাঠাবেন। গাড়িটা এলেই রওনা হয়ে যাবেন শিবদাস দত্ত আর প্রতিভা। শিবদাস দত্তও নিশীথকে সান্ত্বনা দিয়েছেন—মাত্র দুটো দিন নিশীথ। আমি ইসমাইলবাবুকে বলে রেখেছি ; তাঁর পোলট্রি থেকে দুটো ভাল জাতের মুরগি পাঠিয়ে দেবেন। তুমি আমার কুকিং ডিক্সনারি দেখে নিজের পছন্দমত একটা রান্না বেছে নিয়ে...হ্যাঁ, যদি গ্রেভি একটু ঘন করে নিতে চাও, তবে পাঁচ চামচ কাস্টার্ড পাউডার মিশিয়ে নিও।

কিন্তু ফটকের সামনে রাস্তার উপর যে গাড়িটা ছুটে এসে দাঁড়াল, যে গাড়ির শব্দ খুব জোরে একবার গরগর করেই থেমে গেল, সেটা হরবংশবাবুর গাড়ি নয়। শিবদাস দত্ত সে গাড়ির দিকে তাকিয়েও চিনতে পারেন না, কার গাড়ি ?

কিন্তু নিশীথ চিনতে পারে, এবং নিশীথের চোখ দুটোও একটু আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে। গাড়িটা যে কালিকাপুর মাইনসের জনস্টনের গাড়ি।

গাড়ি থেকে প্রথমে যিনি নামলেন, তাঁকে খুব ভাল করেই চেনেন শিবদাস দত্ত। নিশীথও চিনতে পারে, তিনি হলেন এই লাক্ষানগর রাজপোখরারই মিসেস ফস্টার ; বিয়ের দিনে যিনি এই বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে এবং কত খুশি হয়ে নিশীথ আর প্রতিভাকে ব্লেসিং জানিয়েছিলেন।

কিন্তু মিসেস ফস্টারের পরেই গাড়ি থেকে নামলেন যে তরুণী, তাঁকে শিবদাস দত্ত চেনেন না। এক শাড়িপরা শ্বেতাঙ্গি তরুণী, ফরফর করছে তরুণীর সোনালি চুলের বব্।

নিশীথ কিন্তু তরুণীকে চিনতে পারে ; আরও আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে নিশীথের চোখ। প্রায় এক মাস ধরে কালিকাপুরের জনস্টনের বাংলোর বারান্দায় ছোট একটা কাচের গেলাস হাতে নিয়ে আরাম-চেয়ারের উপর যে নারীকে বসে থাকতে দেখেছে নিশীথ, সেই নারী।

কখনও গাউনপরা এবং কখনও ব্রিচেসপরা সেই নারীকে রোজই সন্ধ্যায় জনস্টনের সঙ্গে বেড়াতে কিংবা শিকারে যেতে দেখেছে নিশীথ।

সেই মূর্তিকে আজ শাড়ি-জড়ানো সাজে দেখতে পেয়েও তার মুখটাকে বেশ স্পষ্ট চিনতে পারা যায় ; এই তো সেই মুখ, যে মুখের রঙ কাচের গেলাসের চেরি-মদেরই মত সব সময় লাল টকটকে উজ্জ্বলতায় টলমল করতে দেখেছে নিশীথ। জানে না নিশীথ, কে এই আগন্তুক, জনস্টনের বাংলোতে এসে প্রায় পনেরো দিন ধরে যে ঠাঁই নিয়েছে। মাইনস-এর লোকেরা বলে, বিলেত থেকে জনস্টনের এক বান্ধবী এসেছেন।

মিসেস ফস্টারের মুখ গম্ভীর। কিন্তু সে শ্বেতাঙ্গি তরুণীর মুখটা যেন চটুল হাসির একটা ফোয়ারার মুখ। মিসেস ফস্টারের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে এবং বাড়ির বারান্দার উপরে উঠে শিবদাস দত্তের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে শ্বেতাঙ্গি তরুণী। —নমস্কার।

বেশ ভাল বাংলা বলতে পারে এই শ্বেতাঙ্গি তরুণী। এবং মিসেস ফস্টারই পরিচয় করিয়ে দেন—আমারই আত্মীয়ের, আমার এক কাজিন ব্রাদারের মেয়ে।

শ্বেতাঙ্গি হাসে—আমি লিজা মিটার ; আমি আপনার মত একজন খাঁটি বাঙালির পত্নী।

শিবদাস দত্ত বিব্রতভাবে হাসেন—শুনে বড় খুশি হলাম মা।

রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন মিসেস ফস্টার।—কিন্তু আমি ওর জঘন্য উপদ্রব থেকে মুক্তি পেতে চাই।

শিবদাস দত্ত অপ্রস্তুতের মত তাকান।—উপদ্রব ?

—হ্যাঁ, অসহ্য উপদ্রব। সব সময় মদ খুঁজছে, টাকা চাইছে আর গেলাস ভাঙছে। সেই কারণে আপনার কাছে এসেছি মিস্টার দত্ত।

—আমি কী করতে পারি বলুন ?

—আমাকে এক হাজার টাকা ধার দিন। টাকাটা ওর হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই। ও বলছে, এক হাজার টাকা হাতে পেলে চলে যাবে।

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না মিসেস ফস্টার।

—এই দুরন্ত মেয়ে সিমলা চলে যেতে চায়। চলে যাক, এখনি চলে যাক। আমি আর ওকে এক মিনিটও এখানে থাকতে দিতে ইচ্ছুক নই। ..প্লিজ মিস্টার দত্ত, আমাকে উদ্ধার করুন।

একটা চেয়ারের উপর ধপ করে বসে পড়ে লিজা মিটার ; আর পা দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে বার বার ঘরের ভেতরের একটা আলমারির দিকে তাকায়। জ্বলজ্বল করে লিজা মিটারের চোখ।

শিবদাস দত্ত উঠে দাঁড়ান , বোধ হয় টাকা আনবার জন্য ঘরের ভিতরে যেতে চান। লিজা মিটার হঠাৎ মাথা দুলিয়ে, আর সোনালি চুলের বব্ কাঁপিয়ে শিবদাস দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে। আপনার সেলারে ভাল বস্তু আছে বলে মনে হয়।

—চুপ লিজা। গর্জন করে ওঠেন মিসেস ফস্টার।

লিজা মিটার মুখে রুমাল ছুঁইয়ে আরও জোরে শব্দ করে হাসতে থাকে। প্রতিভার মুখের দিকে আস্তে একটা শিথিল চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে নিশীথের মুখের দিকে তাকায়। আবার জ্বলজ্বল করে লিজা মিটারের চোখ।

উৎফুল্ল হয়ে হি-হি করে হেসে কথা বলে লিজা—আমার স্বামী আপনার মত বয়সের মানুষ। বেচারা আমার ইচ্ছার ফ্রিডমে একটুও বাধা নেয় না। সেই জন্যেই আমি সুখী ; আমার জীবন অত্যন্ত সুখী জীবন।

মুখ ফিরিয়ে বাগানের ডালিয়ার দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে থাকে নিশীথ। প্রতিভা বারান্দা থেকে সরে গিয়ে সিঁড়ির তিন ধাপ নেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মিসেস ফস্টার লজ্জিত ও বেদনার্ত মুখ নিয়ে এক হাতে কপাল টিপে আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

টাকা আনতে ঘরের ভিতর চলে যান শিবদাসবাবু। লিজা মিটার বলে—মাত্র চার মাস হল স্বামীর সঙ্গে ইন্ডিয়াতে এসেছি। ক্যালকাটাতে এক মাস ছিলাম। বাস, তার পর আর নয়। স্বামীকে স্পষ্ট বলে দিলাম, ক্যালকাটার হোটেল নরকের চেয়েও খারাপ।

কেউ কোনও প্রশ্ন করছে না, কিন্তু লিজা মিটারের মুখ থেকে যেন একটা বৃত্তান্তের ফোয়ারা আপনি উথলে উঠছে। ইন্ডিয়াতে আসবার পর থেকে কোথাও একটানা এক মাস থাকতে পারেনি লিজা মিটার। কলকাতার হোটেল ছেড়ে দিয়ে অল্প দিনের জন্য শিলং-এ গিয়েছিল লিজা। লিজার স্বামী বড় চমৎকার ভদ্রলোক, কোনও আপত্তি করেননি। বরং এক বন্ধুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে নিয়ে এসে লিজার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দমদম পর্যন্ত লিজার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন ; আর প্লেন ছাড়বার আগে লিজাকে বিদায় দিতে গিয়ে লিজাকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরতেও চেয়েছিলেন , কিন্তু .

শিলং-এর পর ডিব্রুগড। মিস্টার ওয়ালটারের বাড়িতে পাঁচ দিনের অতিথির জীবন ; কী চমৎকার পাঁচটি উৎসবের দিন। তার পর চা-বাগান , সেখানে সাত দিন। মিস্টার ডন্ট, কী সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক। ডন্টের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সাতটি সকালের গলফ্ খেলার আনন্দ আজও ভুলতে পারেনি

লিজা মিটার।

তারপর দার্জিলিং। তারপর ভাইজ্যাগ ও রাঁচি। এক এক জায়গা থেকে বন্ধুদের আমন্ত্রণ আসছেই, আর লিজা মিটারও সেই আমন্ত্রণের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য ছুটে যাচ্ছে। —প্রভাত-বেলার ঘুম-ভাঙা সুখী হংসীর মত আমি উড়ে বেড়াই। বলতে বলতে আবার হেসে ওঠে লিজা মিটার।

শিবদাস দত্ত ঘরের ভিতর থেকে এসে মিসেস ফস্টারের হাতে টাকা তুলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেয় লিজা মিটার। এবং মিসেস ফস্টারও লিজার হাতে টাকা ফেলে দিয়ে হাঁপ ছাড়েন।

টাকা হাতে পেয়েই উঠে দাঁড়ায় লিজা মিটার। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার দিকে তাকায়। ছটফট করে কাঁপতে থাকে লিজা মিটারের জ্বলজ্বলে চোখ। আমার স্বামী, ভেরি ইনোসেন্ট লাভিং স্বামী। বেচারা আমাকে ধরবার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। খবর পেয়েছি, আমার খোঁজে শিলং-এ গিয়েছিল ভদ্রলোক। তারপর একবার ডিব্রুগড় ঘুরে সোজা রাঁচিতে গিয়েছিল। আশঙ্কা হয়, আজ হয়ত কালিকাপুরে এসে গিয়েছে ভদ্রলোক।...কিন্তু বৃথা...ভদ্রলোক বৃথা হয়রান হচ্ছেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় লিজা মিটার। পর-মুহূর্তে প্রায় একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে আর সিঁড়ি ধরে তরতর করে নেমে যেতে থাকে। মিসেস ফস্টার আর-একবার জোরে হাঁপ ছাড়েন।

হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ায় লিজা। সোনালি চুলের বব্ দুলিয়ে আর অভিবাদনের ভঙ্গি করে প্রতিভার মুখের দিকে তাকায়। —বিদায় ; নমস্কার !

—আপনার স্বামীর নাম ?

লিজা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—চমৎকার নাম। মিহিরকুমার মিটার।

চলে যায় লিজা। ফটকের কাছে এসে গাড়ির ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে—সিধা চল খড়্গপুর।

লিজা মিটারকে নিয়ে গাড়িটা শব্দ করে ফটকের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণের জন্য শিবদাস দত্তের বাড়ির বারান্দাটা যেন শব্দহারা হয়ে যায়।

প্রথম কথা বলেন মিসেস ফস্টার।—কী অপমান ! কী অপমান ! নির্লজ্জ মেয়েটা আমার খানসামাকে চড় মেরেছে, ওর সন্ধ্যাবেলার রাক্ষুসে পিপাসার জন্য হুইস্কি এনে দিতে পারেনি বলে।. যাক, আপনাকে হাজার ধন্যবাদ, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমি সাত দিনের মধ্যে আপনাকে টাকাটা দিয়ে যাব।

মিসেস ফস্টার বারান্দা থেকে নেমে ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। শিবদাসবাবুও মিসেস ফস্টারের সঙ্গে নানা সান্ত্বনার কথা বলতে বলতে এগিয়ে যান। আর প্রতিভার মুখের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে নিশীথ রায়। ডালিয়ার বাগানের দিকে ও রকম ফ্যালফ্যাল করে ভীরুর মত তাকিয়ে আছে কেন প্রতিভা ?

প্রতিভার কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে নিশীথ—কী হল প্রতিভা ?

প্রতিভা মাথা নাড়ে—কিছু না।

—লিজা মিটারের অবস্থা দেখে মন খারাপ লাগছে বোধ হয় ?

—না।

—তবে ?

—মিহিরকুমার মিত্রের অবস্থার কথা ভেবে খারাপ লাগছে।

—কেন ?

—ভদ্রলোককে আমি জানি।

—কীরকম ভদ্রলোক।

—সচ্চরিত্র।

চমকে ওঠে নিশীথ। প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে নিশীথের চোখের চাহনি উদাস হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাসের বাতাস হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে বুকের ভিতরে যেন গুমগুম শব্দ করে বেজে উঠল।

কথা বলতে গিয়ে নিশীথের ঠোঁট দুটো কুঁকড়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় ; দাঁতে দাঁতে ঘষা লেগে শব্দ

হয় যেন—এই মিহির মিত্রই বোধ হয়...

—হ্যাঁ।

কেঁপে ওঠে নিশীথের চোখ। কত সহজে জীবনের এক ভয়ানক অপমানের স্বীকৃতি শুনিয়ে দিল প্রতিভা। প্রতিভার এই মুখর দুঃসাহসের মূর্তিটিকে দেখতে ভয় করে, দেখতে ভাল লাগে না। মিহির মিত্রের অবস্থার কথা ভেবে শিবদাস দত্তের মেয়ের চোখে কী ভয়ানক ও কী নির্লজ্জ করুণা ছলছল করছে।

রূপসাগরের ঘাট বড় পিছল! এতদিনে যেন গানটার অর্থ বুঝতে পারা যাচ্ছে। গানটা একটা ধিক্কার।

—বুঝলাম। বলতে গিয়ে নিথীশের গম্ভীর গলার স্বর যেন তপ্ত হয়ে ধকধক করে, বেচারা মিহির মিত্রের জন্য তোমার মায়া এখনও...।

—মিহির মিত্রের জন্য নয়।

—তবে কার জন্য?

—মানুষের জন্য।

—উঃ মস্ত বড় দার্শনিকের মত কথা বলছ দেখছি।

প্রতিভার চোখ থরথর করে কেঁপে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ জলে ভরে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে প্রতিভা।—আজ বোধ হয় আমাকে ঘেন্না করতে পারছ নিশীথ?

—কী বললে? হেসে ওঠে নিশীথ।

—কোনও মানুষ কোনকালের একটা ভুলের জন্য মিহির মিত্রের মত এত বড় শাস্তি পাবে, ভাবতে আমার একটুও ভাল লাগে না নিশীথ; আমার সত্যি ভয় করে।

প্রতিভা নয়, মনে হয়, জীবনের রূপসাগরের একটা রহস্যের ঢেউ হঠাৎ উথলে উঠে কলস্বরে কথা বলছে। নিশীথের বুকের ভিতর একটা কাপুরুষ অহংকার যেন লজ্জা পেয়ে শিউরে উঠেছে।—প্রতিভা, ডাকতে গিয়ে প্রতিভার হাত ধরে ফেলে নিশীথ।

হেসে ফেলে নিশীথ; আর, হঠাৎ যেন ছেলেমানুষের মত দুরন্ত আনন্দে চঞ্চল হয়ে প্রতিভাকে হাত ধরে হিড়হিড় টেনে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায়।

ঘরের ভিতরে একটি বড় মিরর। তারই সামনে দাঁড়িয়ে নিশীথ আর প্রতিভা মিররের বুকের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে থাকে প্রতিভা, নিশীথ রায়ের মুখটা কী সুন্দর পিপাসার আবেশে উৎসুক হয়ে প্রতিভার কপাল ছুঁয়ে রয়েছে। দেখতে থাকে নিশীথ, প্রতিভার হাত দুটো কী নিবিড় আগ্রহে নিশীথের গলা জড়িয়ে ধরেছে।

নিশীথ হাসে।—উঃ, আর একটু হলে পরীক্ষায় ফেল করে ফেলতাম প্রতিভা।

—থাক ওসব কথা। এখন দুটো দিন...

ফটকের কাছে আগন্তুক-গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা যায়। নিশীথ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে বলে—হরবংশবাবুর গাড়ি এসেছে বোধ হয়।

নিশীথের কপালে হাত বুলিয়ে প্রতিভাও বিমর্ষভাবে বলে।—শুধু দুটো দিন, লক্ষ্মীটি, মন খারাপ করো না।

নিশীথ হাসে—ইচ্ছে করলেই কি মন খারাপ বন্ধ করা যায়।

প্রতিভা হাসে—আমি একটা উপায় বলে দিতে পারি, যাতে মন খারাপ না হয়।

—বলো।

—এই দুটো দিন শুধু মনে করবে যে, আমি এই পাশের ঘরে বসে আছি।

শিবদাস দত্ত ডাক দেন—এইবার রওনা হতে হয় প্রতিভা।

আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন শীতল সরকার।—এ কী অদ্ভুত কথা বলছিস তুই? শিবদাস দত্তের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া তোর পক্ষে যে নিতান্ত একটা অপমান?

নীরাজিতা হাসে—অপমান না ছাই?

চমকে ওঠেন শীতল সরকার। —এখন যে ওবাড়িতে নিশীথ আছে।

—থাকুক না।

—আজ যে ওবাড়িতে শিবদাস দত্তও নেই, প্রতিভাও নেই। বাপমেয়েতে চাইবাসা চলে গিয়েছে ; প্রতিভার এক মর-মর মাসিমার সঙ্গে শেষ দেখা করে আসবার জন্য।

—শিবদাস দত্তের কাছে আমার কোনও কাজ নেই ; প্রতিভার কাছেও না।

—তবে ?—এইবার আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠেন শীতল সরকার। এবং বড় বউদিও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন।

—এ কী কাণ্ড, নীরাজিতা ? তুমি আবার ওবাড়িতে যাবার জন্য, মিছে কেন...। বউদি যেন একটা উদ্বেগে বিব্রত হয়ে বার বার আপত্তি করতে থাকেন।

—কাজ আছে।

বউদি শিউরে ওঠেন। —কিন্তু বিভূতিবাবু যে আজই, আর কিছুক্ষণ পরে এসে পড়বেন।

—আসুক।

—কিন্তু নিশীথের কাছে তো তোমার কোনও কাজ থাকতে পারে না।

নীরাজিতা হাসে। —নিশীথবাবুর কাছে একটা কাজ আছে।

—ও রকম মানুষের কাছে তোমার কী কাজ থাকতে পারে ?

নীরাজিতার ঠোঁট দুটো অদ্ভুত রকমের শক্ত হয়ে যেন একটা দুরন্ত আক্রোশের আবেগে কেঁপে ওঠে। —ক্ষমা চাইব।

—কী ?—শীতল সরকারের আর্তনাদ যেন অলক্তকের সব অহংকারের শান্তি চূর্ণ করে দিয়ে কাঁপতে থাকে।

চলে যায় নীরাজিতা। অলক্তকের ফটক পার হয়ে হতভম্ব ভীত ও করুণ অলক্তকের ছায়া পিছনে ফেলে রেখে, ঝাউয়ের ছায়া পার হয়ে এবং ডালিয়া-বাগানের কিনারা ধরে হেঁটে হেঁটে শিবদাস দত্তের নীরব বাড়িটার বারান্দায় উঠে বাইরের ঘরের একটি চেয়ারের দিকে অপলক চোখ তুলে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নীরাজিতা।

ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ, আর বোধ হয় ভিতরের ঘরের দিকে চলে যাবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নেয়।

নীরাজিতা হাসে। —আমি ভুল করে চলে আসিনি। জানি, কাকাবাবু বাড়িতে নেই, প্রতিভাও নেই। আমি ইচ্ছে করে তোমার কাছেই এসেছি।

নিশীথ আশ্চর্য হয়। —আমার কাছে ?

—হ্যাঁ।

—বলো।

—হয় কাছে এসো, নয় কাছে যেতে বলো। তা না হলে কী করে বলি।

নিশীথের চোখের বিস্ময় এইবার যেন একটা রহস্যের ভয়ে ছমছম করতে থাকে। —আজ আর ও কথা তোমার বলা উচিত নয়।

—আজই যে বলবার সুযোগ পেলাম।

বারান্দা থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে আর এগিয়ে গিয়ে, এবং দরজার কাছে এসেই ঘরের ভিতরে যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে লুটিয়ে পড়ে নীরাজিতা। চেয়ারের কাঁধটা ধরে আর নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। —ক্ষমা চাই নিশীথবাবু।

—তুমি ক্ষমা চাইছ কেন নীরাজিতা ? আমি যে সত্যিই...লোকে যাকে বলে...

চেঁচিয়ে হেসে উঠতে গিয়েই কেঁদে ফেলে নীরাজিতা। —লোকে যাকে বলে চরিত্রহীন ?

—হ্যাঁ।

চোখের উপর রুমাল চেপে ধরে বিড়বিড় করে নীরাজিতা—আপনার বন্ধু বিভূতিবাবু একেবারে নিখুঁত পবিত্র-চরিত্রের মানুষ।

—তা বইকি। বিভূতির শত্রুও বিভূতির চরিত্রের অপবাদ দেয় না।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু...

নিশীথের কাছে এগিয়ে এসে, আর নিশীথের প্রায় বুকের কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে নীরাজিতা। আর, নিশীথ যেন অসাড় পাথরের মূর্তির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নীরাজিতার সেই হেঁটমাথার সুন্দর খোঁপাটার দিকে অদ্ভুত এক মমতার চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকে।

আস্তে আস্তে মাথা তোলে নীরাজিতা। —নিশীথবাবু!

—কী?

—সত্যিই বুঝতে পারলেন না? না, একটুও ইচ্ছে হয় না?

—ক্ষমা করো, নীরাজিতা!

—কেন?

—উচিত নয়।

নীরাজিতার মুখটা করুণ হয়ে হাসতে থাকে। —আমি ঠিক এই ভয় করেছিলাম, নিশীথবাবু।

—ভয়?

—হ্যাঁ; ভয় হয়েছিল, আপনি সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু...

—কী?

—কী চমৎকার প্রতিশোধ!

শিবদাস দত্তের বাড়ির ফটকের সামনে রাস্তারই উপর দাঁড়িয়ে একটা মোটরগাড়ির হর্ন যেন রুষ্ট ধিক্কারের গর্জনের মত হাঁপ ছাড়ছে। ডালিয়া-বাগানের বাতাসের ভিতর দিয়ে ছুটে এসে সেই গর্জনের শিহর এই ঘরের নিরালার উপর আছড়ে পড়েছে।

হো-হো করে হেসে ওঠে নীরাজিতা। —বুঝতে পারছেন নিশীথবাবু?

—কী?

—হর্নের আওয়াজটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে না কি?

চমকে ওঠে নিশীথ। নীরাজিতা বলে—আপনার বন্ধুর গাড়ির হর্ন।

—কে? বিভূতি এসেছে?

—হ্যাঁ।

—তুমি ভুল করে বড় অন্যায় করলে, নীরাজিতা।

নীরাজিতা হাসে। —অন্যায়?

—হ্যাঁ, বিভূতি বেচারা হয়ত তোমাকে ভুল বুঝবে।

—কী ভুল বুঝবে?

—একটা বাজে ধারণা করতে পারে বিভূতি, তুমি যেন ইচ্ছে করে আমার কাছে কিছু আশা করে...

—ঠিকই ধারণা করবেন আপনার বন্ধু।

খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতির গাড়ির হর্ন উদ্দাম হয়ে বাজতে থাকে। নিশীথ বলে—চলো নীরাজিতা।

রুমাল দিয়ে কপালটাকে একবার মুছে নিয়েই নীরাজিতা বলে—চলো।

আর, ডালিয়া-বাগানের কিনারা দিয়ে নিশীথেরই পাশে পাশে হেঁটে ফটকের কাছে এসে হেসে ওঠে নীরাজিতা। —তুমি কখন এলে?

—এখনই; তুমি এখানে কখন এলে?

—অনেকক্ষণ হল।

বিভূতির চোখের উপর যেন ধোঁয়াটে আগুনের ছায়া ভাসতে থাকে। —তারপর...?

—তুমি বলো।

—খরসোয়ানের বাড়িতে ফিরে যেতে চাও?

—নিশ্চয় চাই; কিন্তু...

—কী?

—তার আগে দেখতে চাই, তুমি নিশীথবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়েছ।

—নীরাজিতা!—চিৎকার করতে গিয়ে বিভূতির গলার স্বর যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

নীরাজিতা হাসে।—ভেবে দেখো!

—নীরাজিতা!

—ভেবে দেখো।

কী ভয়ানক স্নিগ্ধ ও শান্ত হাসি হাসছে নীরাজিতা। এবং অলক্তকের খোলা ফটকটাও যেন বিভূতির সৌভাগ্যের, অহংকারের আর পবিত্র চরিত্রের দিকে তাকিয়ে একটা খোলা ঠাট্টার হাসি হাসছে।

স্টিয়ারিং-এর চাকার উপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে আনমনার মত কী যেন দেখতে থাকে বিভূতি। হাতের শক্ত মুঠোটা আলগা হয়ে যাচ্ছে। তার পরেই গাড়ি থেকে নেমে, আর সড়কের ঝাউয়ের ছায়ার একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়ায়।

নিশীথের দিকে একটা অসহায় ও ভীরু চাহনি তুলে ডাক দেয় বিভূতি—একটা কথা শুনে যাও, নিশীথ।

খিলখিল করে হেসে যেন একটা মিষ্টি খুশির ধমক ছাড়ে নীরাজিতা।—তুমি নিশীথবাবুর কাছে এসে কথা বলো।

বর্ণালী

আর মাত্র একটি বাড়ি বাকি আছে, সে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেলে এই রাস্তায় নিমন্ত্রণ করবার মত আর কোনও বাড়ি বাকি থাকে না। বাকি আছে শুধু নগেন বাবুর বাড়ি।

একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে হাতের একটা কাগজের উপর চোখ বোলায় অশেষ। কাগজটা হল এই রাস্তার সেই সব ভদ্রলোকদের নাম আব বাড়ির ঠিকানার একটা তালিকা, যাঁদের নিমন্ত্রণ করতে চান ত্রিদিববাবু। আগামীকাল রাত্রি আট ঘটিকায় ত্রিদিববাবুর মেয়ের বিয়ে। এপাড়া আর ওপাড়ার অনেক বাড়িতে ত্রিদিববাবুর নিমন্ত্রণের অনুরোধ নিয়ে অনেক লোক আজ বিকাল থেকে ছুটোছুটি করছে। ত্রিদিববাবুর স্ত্রী নিজেও একটা গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন। কাছাকাছি পাড়ার বিশেষ বিশেষ চেনা-শোনার সম্পর্ক আর সমাদরের বাড়িতে তিনি নিজে গিয়ে মেয়েদের নিমন্ত্রণ করে আসবেন।

কলকাতা শহরের আরও কত জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। ত্রিদিববাবুর আত্মীয়-কুটুম্ব আছেন, অতি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব আছেন। তা ছাড়া অফিসের ভদ্রলোকেরাও আছেন। নিমন্ত্রণ করার পালা তিনদিন আগেই শুরু হয়েছে।

দূরের নিমন্ত্রণগুলি একটু আগে আগে সেরে রাখা হয়েছে। কাছের নিমন্ত্রণগুলি আজ সেরে ফেললেই চলবে। কিন্তু কাছের নিমন্ত্রণের সংখ্যাও তো কম নয়। কম করেও আড়াই'শো বাড়ি হবে। খুব ঘটা করে আর খুব খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন ত্রিদিববাবু।

ঢাকুরিয়ার এই পাড়া, যে পাড়ায় ত্রিদিব সরকারের বাড়ি, সেটা সব চেয়ে পুরনো পাড়া না হলেও চেহারার দিক দিয়ে কম পুরনো নয়! এই পাড়ায় যেমন সাবি সারি তিনতলা বাড়ি আছে, তেমনই সারি সারি একতলা বাড়িও আছে, যেগুলির গায়ে পলেস্তারার চিহ্ন নেই! বড় বড় গ্যারেজে যেমন বড় বড় শৌখিন গাড়ি দেখা যায়, তেমনই ছোট ছোট মুড়ি-মুড়কির দোকানও দেখা যায়; আর ময়লা চেহারার রিক্সাগুলিকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

নকুলেশ্বরতলা পার হয়ে কালী মিত্তির লেনের বাড়িগুলিতে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছে শম্ভু। কসবার দিকে এগিয়ে যেয়ে বাজারের পাশে ফ্যাক্টরি রোড়ের বাড়িগুলিতে নিমন্ত্রণ করবার ভার পেয়েছে বিমল আর লক্ষ্মীচরণ। বুদ্ধমন্দিরের দিকে গিয়েছে নারায়ণ। আর এই পুরনো বাগান স্ট্রিটের বাড়িগুলিতে নিমন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়েছে অশেষ; যার মেসোমশাই হন ত্রিদিববাবু।

খুব এলোমেলো এই পুরনো বাগান স্ট্রিট। ত্রিদিববাবুর বিরাট বাড়িটা হল এই স্ট্রিটের এক নম্বর, তার পাশেই তেত্রিশ নম্বর এবং তার পাশেরটা তেত্রিশের উনিশ। রাস্তাটার আবার নানা শাখা রাস্তা আছে, গলি আছে। সবই কিন্তু পুরনো বাগান স্ট্রিট।

তবুও বাড়িগুলিকে খুঁজে নিতে বিশেষ কোনও অসুবিধা হয়নি। যদিও অশেষ এপাড়ার মানুষ নয়, এবং এই রাস্তার এত শাখা-প্রশাখার ভিতরে কোনওদিন আসেনি। বাইশ নম্বর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়ে যেতেই, বাইশ নম্বর বাড়ির ধীরাজবাবুর কাছ থেকে জেনে নিতে পেরেছে অশেষ, পঁচিশ নম্বরটা কোন দিকে আর কতদূর হবে।

নামের তালিকার উপর লাল পেন্সিলের দাগ দিয়েছে অশেষ। না, আর কোনও বাড়ি বাকি নেই!

শুধু বাকি ওই একটি বাড়ি, নগেনবাবুর বাড়ি, যার নম্বর হল একচল্লিশ।

উনচল্লিশ নম্বরের বাড়ির ছেলেটি বলে দিল, আরও অনেক এগিয়ে যেতে হবে। বাঁদিকের ওই সরু রাস্তার ভিতরে ঢুকতে হবে। তারপরে একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছেই একচল্লিশ নম্বর, নগেনবাবুর বাড়ি। ইনকাম ট্যাক্সের ইনস্পেক্টর নগেনবাবু।

আলিপুরের নিউ পার্ক রোড আর ঢাকুরিয়ার এই পুরনো বাগান স্ট্রিট ; কত পার্থক্য। অশেষের মত ছেলে, আলিপুরের একটা পরিচ্ছন্ন এলাকায় যার বাড়ি, আর সকাল-সন্ধ্যা নিউ পার্ক রোড দিয়ে যাওয়া আসা করা যার অভ্যাস, তার পক্ষে ঢাকুরিয়ার বিচিত্রজটিল পুরনো বাগান স্ট্রিটের এলোমেলো ধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়ানো বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার বৈকি! সন্ধ্যা থেকে হাঁটা শুরু হয়েছে, এবং রাত প্রায় নটা হতে চলল ; সত্যিই অশেষের নিঃশ্বাসে হাঁপ ধরে এসেছে। ঘুরতে আর ভাল লাগে না। কিন্তু উপায় নেই ; মেসোমশাই-এর অনুরোধ এড়ানো যায় না। এড়ানো উচিতও নয়! আপন জন বলতে যারা আছে, তারা এসময় এত বড় একটা কাজের ব্যাপারে একটু সাহায্য না করলে কাজের ব্যাপারটা ভালমত চুকে যাবেই বা কী করে!

জোরে হাঁপ ছেড়েই দেখতে পায় অশেষ, হ্যাঁ, একটু দূরে যে বাড়িটার দেয়াল ঘেঁষে একটা ল্যাম্পপোস্ট দাঁড়িয়ে আছে, সেই বাড়িটা নগেনবাবুর বাড়ি হতে পারে!

এগিয়ে যায় অশেষ, এবং এইবার একটা আরামের হাঁপ ছাড়ে। ল্যাম্পপোস্টের মাথা থেকে যে আলো বাড়িব দরজার মাথার উপর পড়েছে, সেই আলোতেই দেখা যায়, দরজার মাথার উপর ফিকে আর ফ্যাকাশে একটা সংখ্যা, একচল্লিশ নম্বর।

দরজার কড়া নাড়ে অশেষ। খুলে যায় দরজা।

—আঃ, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল। আপনাদের এই রাস্তার বাড়ির নম্বরগুলি বড় এলোমেলো।

স্বচ্ছন্দে ঘরের ভিতর ঢুকে, আর হাতের কাগজের দিকে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে কথা বলে অশেষ। কার সঙ্গে কথা বলছে, সেটা ভাল করে তাকিয়ে যেন বুঝতেও চায় না অশেষ। তাড়াতাড়ি নিমন্ত্রণটা জানিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারলে হয়। তারপর বিয়ে-বাড়ির হট্টগোলের ভিতর ফিরে গিয়ে এক কাপ চা খেতেই হবে। রাত হয়েছে বলে চা খেতে দিতে আপত্তি করবেন মাসিমা। অগত্যা নিজের হাতেই চা তৈরি করে নিতে হবে। সন্ধ্যার পর অন্তত চার-পাঁচ কাপ চা খাওয়া যার অভ্যাস, সে মানুষের প্রাণটা যে এই তিন ঘণ্টা হাঁকাহাকির পর চা-এর জন্য আইঢাই করতে শুরু করে দিয়েছে।

কাগজের নামের তালিকায় লেখা আছে, নগেনবাবু, নগেনবাবুর স্ত্রী, আর তাঁদের দুই মেয়ে ; বাড়ির এই চারজনের নিমন্ত্রণ।

—কাল রাত্রি আট ঘটিকায় ত্রিদিববাবুর মেয়ের বিয়েতে আপনাদের নিমন্ত্রণ।

কথাটা একট নিঃশ্বাসে সেরে দিয়েই মুখ তুলে তাকায় অশেষ। এবং, এইবার ভাল করে যাকে দেখতে পায়, তাকেই লক্ষ করে বলে—আপনারা দুই বোন, আপনার বাবা আর মা, অনুগ্রহ করে অবশ্য কাল সন্ধ্যায় বিয়ে দেখতে যাবেন। তা ছাড়া, মনে রাখবেন, কষ্ট করে সামান্য কিছু খেয়ে আসতেও হবে।

—কার বাড়ি বললেন? একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে যে, তাকেই লক্ষ করে নিমন্ত্রণের ভাষা উচ্চারণ করেছে অশেষ। একটা টেবিল, টেবিলের উপর বই-এর স্তূপ। সেই টেবিল ছুঁয়ে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অলকা ; অপরিচিত এক আগন্তুক ভদ্রলোকের আনমনা কথাগুলি শুনছিল। কিন্তু নিমন্ত্রণের অনুরোধ শুনতে পেয়ে এইবার সেই মেয়েকে একটু চমকে উঠতে হয়েছে। অলকার পিছন থেকে একটি ফ্রকপরা মেয়েও আশ্চর্য হয়ে উঁকি দিয়েছে।

—ত্রিদিববাবুর বাড়ি। উত্তর দেয় অশেষ।

মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে অলকা। তারপরেই বলে—আপনি একটু বসুন। আমি মাকে ডেকে দিচ্ছি।

চেয়ারের উপরে বসে অশেষ। অলকাও ভিতরের দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে যেয়ে ডাক দেয়—মা, এখানে এসো একবার।

অলকার মা বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে ভিতরের ঘরের দরজা পার হয়ে এই ঘরে ঢোকেন। অলকা বলে—ইনি কী বলছেন শোনো।

অশেষ বলে—ত্রিদিববাবুর মেয়ের বিয়েতে আপনাদের নিমন্ত্রণ। আপনার দুই মেয়ে, আর আপনারা স্বামী-স্ত্রী, চারজনেই দয়া করে যাবেন।

অলকার মা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে বলেন—ত্রিদিববাবুর মেয়ের বিয়ে ? ওই যে এক নম্বর যাঁর বাড়ি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি কি ত্রিদিববাবুর কেউ হও ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হলাম...অর্থাৎ ত্রিদিববাবু হলেন আমার মেসোমশাই।

অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে আনমনার মত কি-যেন ভাবেন অলকার মা ; তার পরেই অলকাকে বলেন—ওঁকে একবার ডাক।

অলকা আবার ভিতরের ঘরের ভিতরে কয়েক পা এগিয়ে যেয়ে ডাক দেয়—বাবা, একবার এদিকে এসো।

মোটা চটির শব্দ শোনা যায়। ভিতরের বারান্দার উপর দিয়ে, আর যেন ঘষা খেয়ে খেয়ে চটির শব্দটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে এই ঘরের ভিতরে ঢোকে।

—কী ব্যাপার ? অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন অলকার বাবা।

অশেষ হাসে—ত্রিদিববাবুর মেয়ের বিয়ে। কাল সন্ধ্যায় দয়া করে একবার যাবেন। আপনারা স্বামী-স্ত্রী, আর আপনার দুই মেয়ে।

—বেশ ! বেশ খুশি হয়ে নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন অলকার বাবা।

—আচ্ছা আসি, নমস্কার। চলে যায় অশেষ।

অলকার মা বলেন—আমার যে ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগছে।

অলকার বাবা বলেন—আমার মনে হয় ত্রিদিববাবুকে বুঝতে আমরাই ভুল করেছি। বড়লোক হলেও ভদ্রলোক অহংকারী নন।

অলকার মা বলেন—তা না হয় হল, কিন্তু ত্রিদিববাবু তোমার মত মানুষের নামও জানেন বলে মনে হয় না।

অলকার বাবা—বোধ হয় পাড়াসুদ্ধ সকলকেই নিমন্ত্রণ করতে চান, তাই কারও কাছ থেকে পাড়ার সব বাড়ির লোকের নাম যোগাড় করেছেন।

অলকার মা—ভগবান জানেন।

ত্রিদিববাবু ডাকছেন—অশেষের গলা শুনছি মনে হচ্ছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে উত্তর দেয় অশেষ।

—এত দেরি হল কেন অশেষ ?

—দেরি না হয়ে উপায় কী বলুন ? আপনাদের পুরনো বাগান স্ট্রিট যে একটা ধাঁধা। বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে নগেনবাবুর বাড়িটা, একচল্লিশ নম্বরের বাড়ি।

—নগেনবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—নিমন্ত্রণ করে এসেছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কার সঙ্গে দেখা হল ? নগেনবাবুর স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন ?

—নগেনবাবুর স্ত্রী ছিলেন। নগেনবাবুও ছিলেন।

—কী বললে ? যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করেন ত্রিদিববাবু।

অশেষ বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ ! সাক্ষাৎ নগেনবাবুকেও বলে এসেছি।

--কিছু বুঝতে পারছি না। এখানে একবার এসো অশেষ।

ত্রিদিববাবু বসেছিলেন যে ঘরে, অর্থাৎ সেই প্রকাণ্ড হলঘরের ভেতরে ঢুকেই অশেষ বলে—নগেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে মেসোমশাই।

ত্রিদিববাবুর চেয়ারের পাশের চেয়ারে বসেছিলেন যে ভদ্রলোক, তিনি এইবার হেসে ওঠেন—কই, আমার সঙ্গে তো তোমার দেখা হয়নি ! আমি তো এই মাত্র বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা এখানে এসেছি !

অপ্রস্তুত হয়ে, এবং যেন হঠাৎ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে অশেষ। তারপর বিব্রতভাবে বিড়বিড় করে—এ কেমন ব্যাপার হল ? আমিও যে ঠিক বুঝতে পারছি না।

ত্রিদিববাবু—ঠিক একচল্লিশ নম্বরের বাড়িতে গিয়েছিলে কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নগেনবাবু ভুরু কুঁচকে নিয়ে সন্দিগ্ধের মত তাকিয়ে প্রশ্ন করেন। —ভুল করে একচল্লিশের এক নম্বরে যাওনি তো ?

—আজ্ঞে না। সে রকম ভুল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

নগেনবাবু হাসেন—একচল্লিশের এক নম্বরে কিন্তু এক ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর দুই মেয়ে থাকে। ঠিক আমার বাড়ির মতই, স্বামী স্ত্রী আর দুই মেয়ে।

চমকে ওঠে অশেষ। —আজ্ঞে হ্যাঁ ! তা হলে সত্যিই ভুল হয়েছে।

নগেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে লাজুক ভাবে হাসেন ত্রিদিববাবু। —দেখলেন তো, কত সহজেই মানুষের ভুল হয়ে যায়।

নগেনবাবুও হাসেন—হ্যাঁ, কমেডি অব এরর। যাকগে, শেষ পর্যন্ত জানা গেল, আমার বাড়ির চারজনের নিমন্ত্রণ হয়েছে। এই যথেষ্ট। আপনি মিছিমিছি একটা ফর্মালিটির জন্য চিন্তিত হবেন না ত্রিদিববাবু।

ত্রিদিববাবু—একচল্লিশের এক নম্বরে যিনি থাকেন, তাঁকে আপনি চেনেন বলে মনে হচ্ছে। ব্যক্তিটি কে, কেমন, অর্থাৎ আমার নিমন্ত্রণ নেবার মত রেস্পেক্টব্‌ল্ বটে তো ?

—আমাকে একটু অসুবিধায় ফেললেন ত্রিদিববাবু। রেস্পেক্টব্‌ল্ বলতে, অর্থাৎ . .।

ত্রিদিববাবু—অর্থাৎ...এটা তো একটা সহজ কথা..অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্স দেন, বেশ একটু সঙ্গতিসম্পন্ন, যার মানে .. ।

হেসে হেসে মাথা নাড়েন নগেনবাবু। —আজ্ঞে না। আপনি যা সন্দেহ করছেন, ঠিক তার বিপরীত।.

ত্রিদিববাবু—তার মানে একটা বাজে লোক।

নগেনবাবু—সাধারণ গরিব ভদ্রলোক। ভাড়া বাড়িতে থাকেন। কোন এক হাসপাতালে কম্পাউণ্ডারের কাজ করেন ভদ্রলোক।

—ছিঃ। বিরক্ত হয়ে অশেষের দিকে তাকান ত্রিদিববাবু।

অশেষ বিব্রতভাবে বলে—মেসোমশাই কি সত্যিই বিরক্ত হলেন ?

—তা সত্যি কথা বলতে গেলে, একটু বিরক্ত হয়েছি বৈকি !

অশেষ—কেন ?

ত্রিদিববাবু—চারটে ফালতু মানুষ এসে নিমন্ত্রণ খেয়ে চলে যাবে, এটা আমার মোটেই দুশ্চিন্তার বিষয় নয় ! যেখানে এক হাজারের বেশি লোক খাবে, সেখানে দু' দশটা অনিমন্ত্রিত মানুষ এসে ঢুকলে কোর্মা পোলাউ-এর কমতি পড়ে যাবে না। প্রশ্ন হল ; যেটা আমার প্রেস্টিজের প্রশ্ন।

আশ্চর্য হয় অশেষ—আমার সামান্য একটা ভুল, যেটা একটা হাসাহাসির ব্যাপার মাত্র, তাতেই আপনি যদি এত ভাবিত হয়ে আর প্রেস্টিজের কথা ভেবে... !

ত্রিদিববাবু—তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না অশেষ। আমি যে মানুষকে চিনি না, পছন্দ করি না, খাতির করি না ; সে মানুষকে আমি যদি হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে বসি, তবে সে নিশ্চয় মনে করবে যে, আমি তাকে খাতির করছি।

অশেষ হেসে ফেলে—তাতে ক্ষতি কী ?

ত্রিদিববাবু—তর্ক যদি করতে চাও তবে বলব, অনেক ক্ষতি। আমারই প্রেস্টিজের ক্ষতি ; যেসব সম্মানিত ভদ্রলোক আর মহিলারা এখানে আসবেন, তাঁদেরও প্রেস্টিজের ক্ষতি। তা ছাড়া, কম্পাউণ্ডার লোকটারও ক্ষতি। লোকটার মনে মিছিমিছি একটা অহংকার ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

অশেষের মুখের চেহারা এইবার একটু অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।—আমি একটু তর্ক করে বুঝতে চাই মেসোমশাই।

ত্রিদিববাবু—তর্ক করবে ?

অশেষ—আজ্ঞে হ্যাঁ। সাতান্ন নম্বর বাড়ির যে সত্যব্রতবাবুকে নিমন্ত্রণ করে এলাম, তাঁকে তো দেখে মনে হল...।

নগেনবাবু বলে ওঠেন—সত্যব্রতবাবু দপ্তরির কাজ করেন।

অশেষ—যাই হোক, দেখে মনে হল, ভদ্রলোক বেশ গরিব অবস্থার মানুষ।

ত্রিদিববাবু হেসে ফেললেন—বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি সংসারের নিয়ম কানুনের কোনও খোঁজ রাখ না। সত্যব্রতের এক খুড়শ্বশুর আছেন, যে ভদ্রলোক হলেন আমাদের মিস্টার ম্যাকেঞ্জির সেক্রেটারি চাটুজ্জের ছেলের বন্ধু। চাটুজ্জের ছেলে সত্যব্রতের খুড়শ্বশুরের কথায় ওঠে বসে। চাটুজ্জেও ছেলের কথা শুনে চলেন। আর ম্যাকেঞ্জি তাঁর সেক্রেটারি চাটুজ্জে বলতে অজ্ঞান। সুতরাং, ম্যাকেঞ্জির কাছ থেকে যেকোনও কাজ আদায় করতে হলে...এইবার বুঝতে পারছ তো অশেষ, এই সত্যব্রতের সাহায্য নিতে হয়। সত্যব্রতের খুড়শ্বশুর লোকটাও সত্যব্রতকে মানে।

অশেষ—কিন্তু ষোল নম্বর বাড়িতে মাতাল লোকটাকে নিমন্ত্রণ করলেন কেন ?

ত্রিদিববাবু চোখ বড় করে তাকান—জগৎবাবুর কথা বলছ ?

অশেষ—হ্যাঁ।

ত্রিদিববাবু—উনি হলেন সাপ্লাই ডিরেক্টর মজুমদার সাহেবের বড় শ্যালক। কখন যে জগৎবাবুর মত লোকের সাহায্য নেবার দরকার হয়ে পড়বে, কোনও ঠিক আছে কি ? বেশ ভেবে চিন্তে আর ইচ্ছে করেই জগৎবাবুকে নিমন্ত্রণ করেছি।

অশেষ হেসে ফেলে—সংসারের নিয়ম-কানুন যে এত সূক্ষ্ম, সেটা জানতাম না।

ত্রিদিববাবু—জানতে না বলেই তো ভুল করলে। তোমার মাসিমা এই যে এত দেরি করে ফিরলেন, কেন জান ?

অশেষ—না।

ত্রিদিববাবু—বিখ্যাত অভিনেত্রী মোহিনী দেবীকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে এত দেরি হয়েছে।

অশেষ—সে কি ! মোহিনী দেবী কি আমাদের কোনও..।

ত্রিদিববাবু—আরে না না, আমাদের কোনও আত্মীয় নয় ! যার বিয়েরই কোনও ঠিক নেই, সে আবার ভদ্রলোকের আত্মীয় হয় কী করে ?

অশেষ—তাই তো আশ্চর্য হচ্ছি। মোহিনী দেবীকে নিমন্ত্রণ করবার কী দরকার ছিল ?

ত্রিদিববাবু—পপুলার ভয়েস নামে কাগজটাকে হাতে রাখা দরকার।

অশেষের চোখ দুটো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখতে পেয়ে ত্রিদিববাবু আবার হেসে ফেলেন।—বুঝতে পারছ না বোধ হয় !

অশেষ—না।

ত্রিদিববাবু—পপুলার ভয়েসের মালিক অনুকূল বোসের স্ত্রী মোহিনী দেবীর অভিনয় খুব পছন্দ করেন। মোহিনী দেবীর অভিনয় দেখে অনুকূল বোসের স্ত্রী এমনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন যে, রোজ সকালে নিজে মোহিনী দেবীর বাড়িতে গিয়ে ফুল উপহার দিয়ে আসেন। কাজেই...।

অশেষ—ঠিক বুঝতে পারছি না।

ত্রিদিববাবু—মোহিনী দেবীকে দিয়ে বলিয়ে অনুকূল বোসের স্ত্রীকে প্রভাবিত করা যেতে পারে। আর স্ত্রীর কথায় অনুকূল বোস যে প্রভাবিত হয়ে থাকেন, সেটা তোমার মাসিমাও জানেন। সুতরাং, অনুকূল বোসকে হাত করতে হলে মোহিনী দেবীর সাহায্য দরকর। খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছি। আমার

ব্যাঙ্ক, আমার যত কনট্রাক্ট আর সাপ্লাই-এর খবর, আর মামলাটার বিবরণ ছেপে পপুলার ভয়েস শেষে একটা অসহনীয় অবস্থা না সৃষ্টি করে ফেলে। সেই জন্যেই মোহিনী দেবীর সাহায্য নিয়ে...।

অশেষ—এইবার বুঝতে পারছি।

ত্রিদিব—তা হলে আর একটু কষ্ট করো অশেষ।

অশেষ—বলুন।

ত্রিদিববাবু—নগেনবাবুর বাড়িতে একবার যাও। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কথা বলে যথারীতি নিমন্ত্রণ করে এসো।

নগেনবাবু আপত্তি করেন—না না ; এত ফর্মালিটির দরকার নেই।

ত্রিদিববাবু—না ; দরকার আছে। যার যথা প্রাপ্য প্রেস্টিজ, তাকে তা দিতে হয়। না দিতে পারলে সেটা নিজেরই অসম্মান।

নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে অশেষ—একচল্লিশের এক নম্বরের কোন দিকে আপনার বাড়িটা ?

নগেনবাবু—বাঁ দিকে ; ফটকের কাছেই গ্যারেজ, দেখলেই চিনতে পারবে।

ত্রিদিববাবু বললেন—হ্যাঁ, সেই সঙ্গে ভুলটা শুধরে দিয়ে আসতে ভুলবে না।

অশেষ—তার মানে ?

ত্রিদিববাবু—তার মানে সেই কম্পাউণ্ডারের বাড়িতে গিয়ে বলে আসবে যে, ভুল করে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

অশেষ—নিমন্ত্রণ করা হল না, এই কথাই কি ভদ্রলোককে জানিয়ে আসতে বলছেন ?

ত্রিদিববাবু—হ্যাঁ।

অশেষ—এটা ভাল দেখায় না মেসোমশাই।

ত্রিদিববাবু—তুমি তর্ক করলে আমি আবার অসুবিধায় পড়ব অশেষ। যে লোকের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, শত্রুতা নেই, মিত্রতাও নেই, মুখের চেনা পর্যন্ত নেই, যার কাছে আমার কোনও দরকারই নেই, তাকে মিছিমিছি কেন নিমন্ত্রণ করব বল ? মানুষের কথার আর কাজের একটা উদ্দেশ্য না থাকলে সেটা যে পাগলামির ব্যাপার হয়ে যায় !

—বেশ, তাই বলে আসছি।

ঘর ছেড়ে চলে যায় অশেষ। বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায়। পুরনো বাগান স্ট্রিটের এক নম্বর বাড়ি আলোয় ঝলমল করছে। বাগানের পাশে রঙিন সামিয়ানা খাটানো হয়ে গিয়েছে। বাড়ির চারটে ঘরে একই সঙ্গে রেডিও বাজছে। কলকাতা, সিংহল, শিলং আব দিল্লি এক সঙ্গে গান গাইছে ; চার বকমের ভাষায় চার রকমের সুরের গান। এক নম্বরের বাড়ির উল্লাসের ভাষা যেন বিরাট একটা প্রলাপের সঙ্গীত হয়ে বাজছে।

এক কাপ চা খাবাব ভরসা ছেড়ে দেয় অশেষ। সত্যি কথা, মাসিমার কাছে গিয়ে আবদার করে এই রাত ন'টায় এক কাপ চা খাবার জন্য মনের ভিতর কোনও আগ্রহের তাগিদও যেন আর অনুভব করে না অশেষ।

ভুল শুধরে আসতে হবে। মেসোমশাই-এর সংসারের নিয়ম-কানুনকে ইচ্ছা করে তুচ্ছ করতে চায়নি অশেষ। তবু ভুল হয়ে গিয়েছে। ঠিকই তো, অশেষ শুধু মাসতুতো বোনের বিয়েতে একটু খেটে দিয়ে সাহায্য করতে এসেছে। মেসোমশাই-এর চিন্তা, ইচ্ছা আর বিবেচনার উপর নিজের কোনও অভিমত খাটাতে আসেনি !

ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে আবার হাঁকডাক করতে হবে, শুধু একটা বিশ্রী ভুলের কথা বলবার জন্য। ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে যাবেন, তারপর হেসে ফেলবেন। সে হাসিটা ঠাট্টার মত অশেষের কানের উপর বাজতে থাকবে। মুখ টিপে হেসে হেসে অশেষকে একটা ভদ্রগোছের অপমান করবার সুযোগ পেয়ে যাবেন কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোক।

এক নম্বর বাড়ির ফটক পার হয়ে চলতে চলতে জোরে জোরে সিগারেট টানে অশেষ। নিজেরই

মনের একটা গ্লানিময় ভীরুতার সঙ্গে যেন লড়তে লড়তে পথ হাঁটে। সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো দূরে ছুঁড়ে দিয়ে নিজেই আবার মনে মনে যেন জোর করে খুশি হতে চেষ্টা করে। কিসের অপমান ? কার অপমান ? ভদ্রলোকের ঠাট্টার হাসিতে যদি কারও অপমান ঘটে, সেটা মেসোমশাই ত্রিদিব সরকারের অপমান হবে। অশেষকে চেনে না, অশেষের নামটাও জানে না একচল্লিশের-এক নম্বরের বাড়ির মানুষগুলি।

এখন মনে হয়, মেসোমশাই ত্রিদিব সরকারের এই ধরনের দরকারের কাজে সাহায্য করবার উৎসাহ দেখানোই ভুল হয়েছে। জীবনে কোনওদিন এরকম বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিমন্ত্রণ করবার কাজ করেনি অশেষ। নিমন্ত্রণ করবার ভাষাও ভাল করে বলতে জানে না। অথচ ভুল করে, সবচেয়ে সহজ কাজ মনে করে সবচেয়ে কঠিন কাজের ভার নিয়ে এখন প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। এর চেয়ে অনেক সহজ কাজ কতই তো ছিল ! সামিয়ানা খাটানো আর আসর সাজাবার ভার নিলেই ঠিক হত।

তাই তো ! এখন মনে পড়েছে, তাই বুঝতে পারা যাচ্ছে, নিমন্ত্রণের অনুরোধ শুনতে পেয়ে কেন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে ছিল ভদ্রলোকের সেই মেয়ে। একটা ছোট টেবিল, টেবিলের উপর বই-এর স্তূপ। ভদ্রলোকের মেয়ে বোধ হয় ছাত্রী, কিংবা টিচারও হতে পারে পারে। এত গম্ভীর মুখ আর এত সাবধানে যে তাকায় আর কথা বলে, সে কি ছাত্রী হতে পারে ?

একটা গম্ভীর মুখও যে দেখতে এত সুন্দর হতে পারে, ধারণা ছিল না অশেষের। চোখ দুটো বেশ টানা টানা বলেই তো মনে হয়। কিন্তু মহিলার মুখের ভাবে কেমন যেন একটা অনিচ্ছা ; চোখ টান করে তাকাতেই চায় না। ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি যেন ছায়ার মত চোখের উপরে শিউরে রয়েছে। চোখের বড় বড় পাতাগুলি কি এতই ভারি যে অশেষের দিকে একবার ভাল করে চোখ খুলে তাকাতেই পারল না মহিলা।

অশেষের মনের শান্তি আবার যেন একটা আশঙ্কার কামড় খেয়ে চমকে উঠে। বেশ তীব্র একটা অস্বস্তির জ্বালা অনুভব করে অশেষ। এইবার সেই মহিলা কেমনতর চোখ করে তাকাবেন ? সেই গম্ভীর আর লাজুক চোখ হঠাৎ ধিক্ করে জ্বলে উঠবে না তো ? মানুষ কত অভদ্রতা করতে পারে, তারই প্রমাণ চোখের সামনে দেখতে পেয়ে একটা ঘৃণার বিস্ময় মহিলার চোখের পাতায় শিউরে উঠবে না কি ?

যাক গে। ঘটনাকে বড় বেশি তন্ন তন্ন করে চিন্তা করা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে অশেষের কোনও সম্পর্ক নেই। অশেষ শুধু ত্রিদিব সরকারের ইচ্ছার প্রতিনিধি। তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলে ভুল শুধরে দিয়ে সরে আসলেই হবে।

ল্যাম্পপোস্টের মাথায় আলো জ্বলছে, এই তো একচল্লিশের এক নম্বর বাড়ি। আর, ওই তো, একটা গ্যারেজ, নিশ্চয় একচল্লিশ নম্বর।

নগেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে নগেনবাবুর স্ত্রীর কছে নিমন্ত্রণের অনুরোধ জানাতে হবে। মুখ গম্ভীর করে আর মনে মনে হেসে হেসে নগেনবাবুর বাড়ির ফটকের কাছে এসে হাঁক দেয় অশেষ.—বাড়িতে কে আছেন ?

কি ভয়ানক রূঢ় নগেনবাবুর স্ত্রী মুখের ভাষা ! অশেষের বিনীত ভঙ্গি আর মৃদু ভাষার নিমন্ত্রণের অনুরোধ শোনা মাত্র নগেনবাবুর স্ত্রীর চোখ দুটো রুক্ষ হয়ে গেল।

—আমার পায়ে বাতের ব্যথা। আমার পক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া সম্ভব নয়।

চেয়ারের উপর বসে মোটা শরীর আস্তে আস্তে একবার দুলিয়ে অশেষকে কথাগুলি শুনিয়ে দেন নগেনবাবুর স্ত্রী।

অশেষ—আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন আপনি। শরীর অসুস্থ থাকলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয় !

—শরীর সুস্থ থাকলেও যেতাম না। কটমট করে তাকান নগেনবাবুর স্ত্রী।

হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে, আর কুণ্ঠিতভাবে বিড়বিড় করে অশেষ—যাই হোক, আপনার দুই মেয়ে নিশ্চয়..।

নগেনবাবুর স্ত্রী—ওরা কেউ এখন এখানে নেই। দু'জনেই শিলিগুড়িতে মামার বাড়ি গিয়েছে।

অশেষ টেনে টেনে হাসে—অগত্যা...তা হলে আর কী করবেন বলুন? যারা নেই তারা কী করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে...।

মাথা কাত করে আর গলার স্বরে যেন একটা উৎকট ক্ষোভের ঝাঁজ ঢেলে দিয়ে নগেনবাবুর স্ত্রী বলে ওঠেন—ওরা থাকলেও যেত না। ওরা ওদের বাবা ভদ্রলোকের মত আহাম্মক নয়!

—আজ্ঞে? অশেষের গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

নগেনবাবুর স্ত্রী—কম চালাক এই ত্রিদিব সরকার? প্রত্যেক বছর ফাইল হাতে নিয়ে ছুটে ছুটে ওঁর কাছে আসবেন আর ট্যাক্স ফাঁকির সুবিধাটুকু আদায় করে নিয়ে যাবেন, এই হল ত্রিদিব সরকারের কাজ। অথচ আজ পর্যন্ত একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন না ভদ্রলোক। অন্য ইনস্পেক্টর হলে ত্রিদিব সরকারের কাছ থেকে কম করে পাঁচ হাজার টাকা কৃতজ্ঞতা বাবদ আদায় করে নিত।

এর পর নগেনবাবুর স্ত্রীর চোখের সামনে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার সাহস পায় না অশেষ, দাঁড়িয়ে থাকার আর দরকার আছে বলেও মনে করে না।

অশেষ বলে—আচ্ছা, নমস্কার।

নগেনবাবুর স্ত্রী বলেন—উনি এলে বলব।

অশেষ— নগেনবাবু অবিশ্যি জানেন, আমি আপনাদের এখানে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। ওঁকে আর কিছু বলবার দরকার হবে না।

—তার মানে? আশ্চর্য হয়ে অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন নগেনবাবুর স্ত্রী।

অশেষ—নগেনবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

নগেনবাবুর স্ত্রী—কোথায় দেখা হল।

অশেষ—ওখানে, ত্রিদিববাবুর বাড়িতে।

নগেনবাবুর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন—কেন? কেন? ওখানে গিয়ে কেন বসে আছেন ভদ্রলোক?

আর দেরি করে না অশেষ। নগেনবাবুর বাড়ির ফটক পিছনে রেখে ব্যস্তভাবে একটানা হাঁটা দিয়ে একচল্লিশের-এক নম্বরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছাড়ে।

এই বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে হবে। দরজা খুলে গেলে এখানে দাঁড়িয়ে কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোকের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে চলে যেতে হবে, এই মাত্র। —ভুল করে আপনাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে; ত্রিদিব সরকার আপনাদের কাউকে নিমন্ত্রণ করেননি। মাত্র এই কয়েকটি কথা। ব্যস্, তারপরেই অশেষের এই বৃথা হয়রানির অস্বস্তিও শান্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু ততক্ষণ এই অদ্ভুত অস্বস্তিটা সামলে রাখতে পারলে হয়! ঘেমে ওঠে অশেষের কপালটা। বুকের ভিতরে একটা ভয়-ভয় ছায়াও যেন ছম ছম করে। ময়লা চেহারার দরজা, এই তো একটা বাড়ি। পলেস্তারা নেই। দরজার মাথার উপর, আলকাতরার দাগ দিয়ে ছোট্ট করে লেখা একটা সংখ্যা, একচল্লিশের-এক; সেই দাগটাও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। এহেন বাড়ির দরজার কড়া নাড়তে গিয়ে অশেষের হাতটা যেন হঠাৎ ভয়ে ও লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে যায়।

কোনও অর্থ হয় না। সামান্য একটা ভুল শুধরে দিয়ে চলে যেতে হবে, তার জন্য এতটা ভীরু হয়ে যাওয়াও যে একটা অদ্ভুত দুর্বলতা। দরজার কড়া নাড়ে অশেষ।

—কে?

যার ভয় করেছিল, তারই সাড়া শুনতে পায় অশেষ। ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করে উঠেছে সেই মহিলার কণ্ঠস্বর।

খুলে যায় দরজা। অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে যেন বিড় বিড় করে অশেষ—আপনি কাইন্ডলি একবার আপনার বাবাকে ডেকে দিন।

ঘরের ভিতরের দিকে এগিয়ে যেয়ে ডাক দেয় অলকা—বাবা।

ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন, অলকার বাবা, আর অশেষকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন—ওকি? তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

অশেষ—সামান্য একটা কথা বলে চলে যাব। সেই জন্যে...।

—তাতে কী হয়েছে ? সে জন্য কি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ? ভেতরে এসো।

ঘরের ভিতর ঢুকে চেয়ারের উপর বসে অশেষ। কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোকের মাত্রাছাড়া ভদ্রতার এই উল্লাস যেন অশেষের চোখে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। রুমাল বের করে চোখ মুখ মুছতে থাকে অশেষ।

মাথায় টাক আছে। ঘাড়ের উপরে থোকা থোকা সাদা চুল। কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোকের ভুরু দুটোও সাদা। আদুড় গায়ের উপর একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিয়েছেন ভদ্রলোক। চুপ করে বসে দেখতে থাকে অশেষ, মেয়ের দিকে তাকিয়ে ইশারায় কি-যেন বললেন ভদ্রলোক এবং সেই তরুণীও ভিতরের ঘরের দিকে চলে গেল।

এইবার বেশ জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে অশেষ। এইবার ওই গম্ভীর মুখের মহিলা এই ঘরে ফিরে আসবার আগেই কম্পাউন্ডার ভদ্রলোককে আসল কথাটি জানিয়ে দিয়ে সরে পড়তে হবে।

ফ্রকপরা আর বেণীদোলানো মেয়েটি ঘরের দরজার কাছে হঠাৎ এসে দাঁড়ায়, উঁকি দেয় ; তারপরেই আবার ছুটে চলে যায়। মেয়েটার চোখে কী চমৎকার একটা খুশি-খুশি হাসি ছটফট করছে। কম্পাউন্ডার ভদ্রলোকের এই ছোট মেয়েটি তাঁর ওই বড় মেয়েটির ঠিক উল্টোটি বলে মনে হয় : একেবারেই গম্ভীর নয়, আর একেবারেই চঞ্চল নয় ! যাই হোক ..

অশেষ বলে—আমি যে জন্যে আবার ফিরে এলাম, সেটা হল...।

কম্পাউন্ডার ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন—আগে চা খেয়ে নাও তারপর তোমার কথা শুনব।

—চা ! আতঙ্কিতের মত তাকায় অশেষ। সত্যিই তো ; কম্পাউন্ডার ভদ্রলোকের বড় মেয়ে চা-এর কাপ হাতে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেছে। বড় মেয়ের পিছু পিছু সেই বেণীদোলানো মেয়েটিও এসেছে।

ঘাড়ের সাদা চুলের উপর হাত বুলিয়ে ভদ্রলোক বলেন—চা তৈরি হয়েই গিয়েছিল। রাত্রিতেও আমার এক পেয়ালা চা না হলে চলে না। রাত জাগবার দরকারে চা খেয়ে খেয়ে এই অভ্যাসটি পাকা হয়ে গিয়েছে। এখন ভাল করে ঘুমোতে হলেও এক কাপ চা চাই। তা ছাড়া, রাত্রিবেলা আমি এক কাপ চা আর একটা রুটি ছাড়া আর কিছুই খাই না। এই বয়সে যত কম খাওয়া যায়, শরীর তত ভাল থাকে।

অশেষ হাসে—আপনি প্রায় ঠিক কথাই বলেছেন। এসব তত্ত্ব আমিও কিছু কিছু জানি ! আমি ডাক্তার।

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ওঠেন—ঠিক হয়েছে।

অশেষ—কী ?

ভদ্রলোক—ওই ওরা, নিজের কানে শুনে বুঝে নিক, আমি ঠিক কথা বলি কিনা ! ওরা বিশ্বাসই করতে চায় না যে, এই বয়সে কম খাওয়া মানে সুস্থ থাকা। ওরা মনে করে, আমি ইচ্ছে করে কম খাই।

অশেষ হাসে—তবে কম খাওয়ারও একটা মাত্রা আছে। এক কাপ চা আর একটা রুটির উপর নির্ভর করা যায় না। তাতে ব্লাডপ্রেসার একটু বেশি কমে যাবার আশঙ্কা আছে।

কম্পাউন্ডার ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসতে থাকে দুই মেয়ে। কম্পাউন্ডার ভদ্রলোক বলেন—যাকগে ; আমি তোমার মেসোমশাই ত্রিদিববাবুকে মনে মনে বরাবর খুব শ্রদ্ধা করি। কেউ কেউ বলে, উনি নাকি খুব অহংকারী মানুষ। ছিঃ, লোকে মানুষকে বুঝতে কত ভুল করে। ত্রিদিববাবু যদি সত্যিই অহংকারী হতেন তবে বিমান চৌধুরীর মত একটা কম্পাউন্ডার মানুষকে সপরিবারে তাঁর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে পারতেন কি ?—

চুপ করেন বিমান চৌধুরী। এদিক-ওদিক তাকান। তারপর বড় মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—ডাক্তারের সামনে আমি তোরও একটা অন্যায় অভ্যাসের কথা বলে দিতে পারি অলকা।

অলকার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। কিন্তু বিমান চৌধুরী যেন অলকার সেই গম্ভীর

মুখের নীরব প্রতিবাদ গ্রাহ্য করলেন না। অশেষের কাছে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করে ফেললেন বিমান চৌধুরী—রাত জেগে এত লেখা-পড়া করা কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল ?

অশেষ হাসে—মোটেই ভাল নয় !...কিন্তু রাত জেগে এত লেখা-পড়া করবার কারণটা কী ?

বিমানবাবু—অলকা এইবার বি-টি পরীক্ষা দেবার সুযোগ পেয়েছে।

অশেষ—উনি টিচার বোধ হয়।

বিমানবাবু—হ্যাঁ। চার বছর হল একটা মেয়ে-স্কুলে পড়াবার চাকরি করছে।

অশেষ—কোথাকার ইস্কুল ?

বিমানবাবু—গড়িয়ার বাণী মন্দির। আচ্ছা, এইবার তিলকার অবাধ্যতার কথাটা বলে দিই ? কেমন ?

হেসে হেসে ছোট মেয়ের মুখের দিকে তাকান বিমানবাবু।

একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে আর হাত তুলে বিমানবাবুর মুখ চেপে ধরে তিলকা। কিন্তু বিমানবাবু তিলকার সেই কঠোর আপত্তির আক্রমণ সহ্য করে বলেই ফেললেন—চমৎকার নাচতে পারে তিলকা। কিন্তু আমি বলি,—না রে মেয়ে, পেটে দুধ-ঘি ভাল মত না পড়লে অত নাচতে নেই। নাচ যে ভয়ানক শক্ত এক্সারসাইজ, নয় কি ডাক্তার ?

অশেষের গলার স্বর যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে ফিসফিস করে—তা বইকি !

বিমান চৌধুরী—কিন্তু আমার কথা গ্রাহ্য করে না তিলকা। সমস্যা এই যে, যিনি কোনও আপত্তি করেন না, বরং লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েকে উৎসাহ দেন, আর নাচিয়ে নাচিয়ে মেয়েটাকে রোগা করে দিচ্ছেন, তিনি হলেন...ওই যে।

দরজার দিকে তাকিয়ে যার দিকে ইঙ্গিত করেন বিমানবাবু, তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকেন।

অলকার মা'র সেই নীরব হাসির উপর যেন হঠাৎ রাগ করে উঠলেন বিমান চৌধুরী।—উনিই বা কি কম অবাধ্য ? শুধু উপোস করবার ছুতো খুঁজছেন। পাঁজি ঘেঁটে ঘেঁটে এক গাদা উপোসের দিন বের করেছেন। খুব পুণ্যি করছেন ; কিন্তু এদিকে হার্টের দশা।

অশেষ বলে—হার্ট দুর্বল মানুষের বেশি উপোস করা উচিত নয় !

—শুনলে তো। অলকার মা'র দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকেন বুড়ো কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরী। তার পরে মুখ ফিরিয়ে শান্তভাবে অশেষের দিকে তাকান—আর এক কাপ চা হোক।

—না না, আর নয় ! বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় অশেষ। একচল্লিশের-এক নম্বরের এই বিচিত্র মুখরতার মধ্যে যেন নিদারুণ একটা বিদ্রূপ হাসছে। ভয় পেয়েছে ডাক্তার অশেষের বলিষ্ঠ চেহারাটাই।

কিন্তু আর ভয় করলে চলে না ; লজ্জা করে চুপ করে থাকবার উপায় নেই। এবার শুধু বলে দেওয়া আর চলে যাওয়া।

অশেষ বলে—আমি যেকথা বলতে এসে ছিলাম সেটা হল...বড়ই লজ্জাজনক একটা ভুল...তার মানে...।

বিমান চৌধুরীর সাদা ভুরু একটা মৃদু সংশয়ের ছোঁয়ায় আস্তে আস্তে একবার কেঁপে ওঠে। চুপ করে তাকিয়ে থাকে অলকা, তিলকা আর বিমান চৌধুরীর স্ত্রী। একচল্লিশের-এক নম্বরের একটা ভয়ানক কৌতূহল যেন অশেষ ডাক্তারের বিনয়-বিব্রত নিষ্ঠুরতার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

অশেষ বলে—আমি ভুল করে আপনাদের নিমন্ত্রণ করে ফেলেছি। ত্রিদিব সরকারের বাড়িতে আপনাদের নিমন্ত্রণ নেই। ভুল, আমার ভুল। আমি আপনাদের বাড়িকে নগেনবাবুর বাড়ি মনে করে...।

—তাই বলো ! হো হো করে হেসে ওঠেন বুড়ো কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরী। অলকার মুখে একটা ক্ষীণহাসির রেখা শিউরে ওঠে, খিলখিল করে হেসে ওঠে তিলকা। আর, চোখ বড় করে একটা বিস্ময়ের হাসি হাসতে থাকেন অলকার মা।

গম্ভীর হয়ে গেল না, স্তব্ধ হয়ে গেল না, কোনও তিক্ত ভ্রূকুটি চমকে উঠল না ; শুধু একটা বিপুল কৌতুকের আবেগে হেসে উঠল একচল্লিশের-এক। মাথা হেঁট করে, কাঠগড়ার আসামীর মত শুকনো মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অশেষ।

বিমান চৌধুরী বলে—তাতে কী হয়েছে ? ঠিক আছে। তোমার লজ্জিত হবার কিছু নেই।

—চলি। বিড় বিড় করে অশেষ।

—হ্যাঁ এসো। জোরে হাঁপ ছাড়েন বিমান চৌধুরী।

ব্যস্তভাবে, যেন ছটফট করে পা চালিয়ে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যায় অশেষ ; রাস্তার উপরে নেমে আরও জোরে পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছেন ত্রিদিব মেসোমশাই। ভুল শুধরে ফিরে এসেছে অশেষ, আর নগেনবাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিমন্ত্রণের অনুরোধ বার বার জানিয়ে এসেছে।

অশেষও এইবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। কারণ, রাতের খাওয়ার পাট চুকে গিয়েছে অনেকক্ষণ। রাতও বেশ হয়েছে ; যদিও বাড়ির ভিতরে ও আশে-পাশে একটা হুই হুই ব্যস্ততা তখনও শব্দ করে বাজছে। ডেকরেটারের লোকজন গেট সাজাচ্ছে, ওরা বোধ হয় সারারাত ধরে কাজ করবে। চেঁচামেচি করে হাতুড়ি ঠুকছে, তার বাঁধছে লোকগুলি।

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বার কথা ভুলে গিয়ে, বিনা কাজের তাড়নায় বারান্দার উপর পায়চারি করে বেড়ায় অশেষ। পুরনো বাগান স্ট্রিটের এক নম্বর, ত্রিদিব সরকারের এই প্রাসাদের মত বাড়ির বারান্দার মোজেয়িক চকচক করে। কেমন একটু ঘৃণা বোধ করে অশেষ। ত্রিদিব মেসোমশাই নামে এই ভদ্রলোকের বুদ্ধিময় অদ্ভুত প্রেস্টিজের আহ্লাদ যেন চকচক করছে। ছিঃ।

রাত প্রায় বারোটা। পুরনো বাগান স্ট্রিটের সব বাড়ি নীরব হয়ে গিয়েছে ; শুধু এই উৎসবের বাড়িটা ছাড়া। বুঝতে পারে অশেষ, ঘুমোবার আশা বৃথা। এই ব্যস্ততার উৎসব যেন একটা ভুয়ো অহংকারের উৎসব। এই বাড়ির আজকের রাতের চেঁচামেচি সহ্য করাই বোধ হয় সম্ভব হবে না !

বারান্দার উপর পায়চারি করতে করতে ওদিকের ঘরের হাসাহাসির কলরবের একটা উৎসবের ছবিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে আসে অশেষ। নমিতার গায়ে এক-এক সেট গয়না চড়িয়ে বার বার বুঝে দেখছেন মাসিমা, কোন সেট নমিতাকে সব চেয়ে ভাল মানায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভাবে হি হি করে মাঝে মাঝে হেসে উঠছে নমিতা। চার বার পরীক্ষা দিয়েও মেট্রিক পাশ করতে পারেনি নমিতা। পারবে কেমন করে ? অশেষ এই বাড়িতে এসে কতবার নিজের চোখে দেখেছে, পরীক্ষার দিনেও সকাল বেলায় জুয়েলারি ক্যাটালগ দেখছে নমিতা।

নমিতার বিয়ের সম্বন্ধের কিছু কিছু তথ্য অশেষও জানে। শৈলেশ্বর ঘোষ নামে যে ভদ্রলোক আগামীকাল এই নমিতাকে বিয়ে করবার জন্যে আসবেন, সেই ভদ্রলোকও বেশ বড়লোক। বেশ শিক্ষিতও বটে। বেশ বিদ্বান। মাস্টার অব্ ল ; আবার ফিলসফিতেও ডক্টরেট্ পেয়েছেন। এ হেন শৈলেশ্বর ঘোষ কি বিয়ের যোগ্য অন্য পাত্রী পেতে পারতেন না। নমিতার মত মেয়েকে বিয়ে করতে একটুও আপত্তি করলেন না, আশ্চর্য ! হ্যাঁ, নমিতা যদি একটা রূপসী মেয়ে হত, তবে না হয় বলা যেত যে, শৈলেশ্বর ঘোষ শেষ পর্যন্ত রূপ দেখে নমিতাকে বিয়ে করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। রূপ তেমন কিছুই নয়, গুণ বলতে তো ওই, সেই নমিতাকে বিয়ে করে ডক্টর শৈলেশ্বর ঘোষের জীবন যে কেমন সুখী হবে—যাক এ সব চিন্তার কোনও অর্থ হয় না।

কিন্তু চিন্তাটা যেন ঘুরে ফিরে বার বার এসে অশেষের মনের ভিতরে খচ্‌খচ্ করে। ডক্টর শৈলেশ্বর ঘোষের মত পাত্রের সঙ্গে অলকার মত মেয়েকেই যে সবচেয়ে ভাল মানায়, এতে কি কোনও সন্দেহ আছে ? ইচ্ছে করলে শৈলেশ্বর তো অনায়াসে অলকাকে বিয়ে করতে পারতেন।

বারান্দার চকচকে মোজেয়িক মাড়িয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে মনে মনে হেসেও ফেলে অশেষ। অশেষের মনটা যেন পুরনো বাগান স্ট্রিটের এই বিরাট এক নম্বরের উপর রাগ করে নমিতার বিয়ের সম্বন্ধটাকে ভাংচি দেবার চেষ্টা করছে।

সত্যিই এই বিরাট এক নম্বরের উপর রাগ হয়েছে বলেই কি ? না, সেই একচল্লিশের-এক নম্বরের

উপর মায়া হয়েছে বলে ?

ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারের উপর বসে বাইরের রাস্তা আর দূরের একটা ল্যাম্পপোস্টের দিকে তাকিয়ে থাকে অশেষ। একটা জঘন্য কাজের গ্লানিময় স্মৃতি বার বার অশেষ ডাক্তারের চোখ দুটোকে জ্বালা দিয়ে বিরক্ত করছে। যেন এই মুহূর্তে একটা প্রায়শ্চিত্ত খুঁজছে অশেষ। নইলে ঘুমোতেই পাবা যাবে না।

রাত জেগে পড়াশোনা করে অলকা। তার মানে, বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখনও বাইরের ওই ঘরে বইয়ের স্তূপ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে টেবিলটা, সেই টেবিলের পাশে চেয়ারের উপর বসে বই পড়ে অলকা। বি-টি পাশ করবার একটা জেদে বেপরোয়া হয়ে লেখা-পড়া করে।

গম্ভীর মুখও দেখতে এত সুন্দর লাগে ?

মুখ টিপে হাসলেও যে অলকাকে অদ্ভুত রকমের সুন্দর দেখায়। কেমন স্বচ্ছন্দে, একটুও কুণ্ঠিত না হয়ে, কত তাড়াতাড়ি এক কাপ চা এনে দিল অলকা !

সেই অলকাকে অপমান করে ফিরে এসেছে অশেষ। বোকার মত, ত্রিদিব মেসোমশাই-এর বাজে কথায় হঠাৎ রাগ করে নিমন্ত্রণ বাতিল করবার জন্যে আবার ওখানে ছুটে যাবার দরকার ছিল না। ঝোঁকের মাথায় এই ভুল হয়ে গেল। কিন্তু এই ভুলও কি শোধরানো যায় না ?

ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় অশেষ, নিজের মনের সঙ্গে কপটতা করতে চায় না। বুঝতে এখন আর একটুও অসুবিধা নেই ; কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকার কাছে মাপ চেয়ে অলকাকে একটু খুশি করবার জন্য ছটফট করছে অশেষের মন।

মনে মনে সাবধান হতে চেষ্টাও করে অশেষ। অনেক গল্পে আর উপন্যাসে পড়েছে অশেষ, এরকম ব্যাকুলতা আর মাপ চাইবার ইচ্ছাটাই শেষ পর্যন্ত ভালবাসায় দাঁড়িয়ে যায়।

না অশেষের পক্ষে এতটা নভেলি কাণ্ড করা সম্ভব নয় ! কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকার সঙ্গে একটা ভালবাসার ব্যাপার ঘটিয়ে তোলবার কোনও ইচ্ছে নেই অশেষের। শুধু অলকার ভুল ভেঙে দেবার ইচ্ছা। অলকা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, পৃথিবীর মানুষ ত্রিদিব সরকারের মত অভদ্র নয় ! অকারণে, শুধু ভদ্রতার জন্যই ভদ্রতা করতে পারে, এমন মানুষও আছে।

এখনই, এত রাত্রে একচল্লিশের-এক নম্বরের দরজার কাছে গিয়ে কড়া নাড়লে অভদ্রতা করা হবে ঠিকই, কিন্তু একেবারে স্পষ্ট ভাষায় যদি বলা যায়, আমি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মাপ চাইতে এসেছি, তবে সে অভদ্রতাকে একটুও সন্দেহ করবে না অলকা।

মিথ্যে নয়, সত্যিই বাধ্য হতে হচ্ছে ; তা না হলে ঘুমোতেই পারা যাবে না।

আবার সিঁড়ি ধরে নামতে হয়। তরতর করে, যেন একটা মিষ্টি নিশির ডাকের মত আহ্বানের মোহে সিঁড়ি ধরে স্বচ্ছন্দে নেমে যায় অশেষ। এক নম্বর পুরনো বাগান স্ট্রিটের ফটক সাজাবার শব্দ পার হয়ে রাস্তার উপরে দাঁড়ায়। তারপর দূরের নীরব আলো-আঁধারের রহস্যের দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে।

দরজার কড়া নাড়তে হল না। একচল্লিশের-এক নম্বরের একটা জানালা খোলা, এবং সেই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, টেবিলের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে একমনে লিখে চলেছে অলকা।

বেশ বেপরোয়া মেয়ে তো ! এত রাত্রে জানালা খোলা রেখে আর আলো জ্বালিয়ে ঘরের ভিতর বসে থাকলে যে এই মেয়ের সুন্দর মুখটাকে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে যেকোনও লোকে দেখে ফেলতে পারে। সেটা কি অনুমান করতে পারে না অলকা ? কিংবা অনুমান করতে পারলেও পরোয়া করে না ?

ডাক দিতে গিয়েই চুপ করে যায় অশেষ। ডাকতে কুণ্ঠাবোধ করছে, শুধু এই জন্য নয় ! কী বলে ডাকবে, এ ধরণের মেয়েকে কী বলে ডাকা যায়, এটা একটা প্রশ্ন বটে ? একটু ভেবে নেবার দরকার হয়, ঠিক কিন্তু এ কারণেও নয় ! অলকার গম্ভীর মুখের সেই রূপ, সেই ছাঁদ আর সেই ভঙ্গি কত

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নিজের ভাবনা নিয়ে একলা বসে আছে যে মেয়ে এবং কেউ দেখছে না বলে ভেবে নিয়েছে যে মেয়ে, সে মেয়ের মুখে কোনও পোজ থাকে না। সে মুখ যদি হাসে, তবে সে হাসি পরকে দেখাবার হাসি নয়! সে চোখে যদি জল দেখা দেয়, তবে সেই জলভরা চোখ পরকে দেখাবার চোখ হতে পারে না!

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অশেষ, শুধু অলকা নামে এই মেয়ের আপন-রূপ দেখবার লোভে। সত্যিই কি খুব গম্ভীর? এবং সত্যিই কি সব সময় দু'চোখের উপর ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে থাকে?

না, একটুও গম্ভীর নয় অলকা। এবং চোখে ভ্রূকুটির কোনও চিহ্ন নেই। অলকার মনের ভিতরে যেন আলো জ্বলছে; চোখ মুখ দিয়ে সেই আলো উপচে উঠেছে। পরীক্ষাব পড়া পড়তে কিংবা পরীক্ষার লেখা লিখতে কি এমন করে হেসে ঝিকমিক করে কারও চোখ আর মুখ?

রাত বারোটার সময় কোনও নিঃসম্পর্কিতা নারীর ঘরের জানালার কাছে উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যে নিতান্তই অভদ্রতা, এই বোধ মনের ভিতরে থাকলেও অশেষ-ডাক্তার সেই জানালার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যাবাব জোর যেন নিজেরই মনের ভিতরে খুঁজে পায় না। ডাক দিলে চমকে উঠবে, আর আশ্চর্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাবে। এবং অশেষের দিকে শুধু একটু সুন্দর-গম্ভীর মুখ তুলে কথা বলবে। সত্যিই কি, অলকা চৌধুরী তার জীবনের এই হাসিকে কোনও মানুষের জন্য গোপন উপহারের মত লুকিয়ে রেখেছে?

আধ মিনিটের মধ্যে মনের ভিতর কত রকম জল্পনা-কল্পনা আর গবেষণার উৎপাত ঘটে গেল। ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় অশেষ। জানালার উপর হাত রেখে মৃদু স্বরে ডাক দেয় অশেষ—শুনছেন!

—কে? আতঙ্কিতেব মত চমকে উঠে আর মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকায় অলকা।

—আমি আবার বাধ্য হয়ে আপনাদের একটু বিরক্ত করতে এসেছি। কিন্তু আশা করি বিরক্ত হবেন না!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অলকা। রুক্ষস্বরে বলে—বেশ বিরক্ত হব।

অশেষ—আমি শুধু সামান্য দু'চারটে কথা বলে চলে যাব।

অলকা—এই রাত বারোটার সময় কারও বাড়িতে গিয়ে সামান্য দু'চারটে কথা বললেও বাড়ির মানুষ বিরক্ত হয়।

অশেষ—তা জানি। আব, আপনার কাছে কড়া কথা শুনব বলে তৈরি হয়েই এসেছি।

অলকা—সত্যি কথা বললেই কড়া কথা বলা হয় না।

অশেষ—আপনি এত কথা বলছেন, কিন্তু না বললে এরই মধ্যে আমার সামান্য কথা শেষ হয়েই যেত। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারতাম।

জানালার কাছে এগিয়ে এসে অলকা বলে—বলুন।

অশেষ—আমার অনুরোধ, কাল দুপুরে আপনি আর বাড়ির সবাই, অর্থাৎ আপনার বাবা, মা ও তিলকা, আমাদেব বাড়িতে একবার অনুগ্রহ করে যাবেন।

অলকা—কেন?

অশেষ—আপনাদের নেমন্তন্ন।

অলকা—কেন?

অশেষ—এমনি; তেমন বিশেষ কোনও কারণ নেই। আমার বোন সুধার জন্মদিনটা অবশ্য এই কিছুদিন হল পার হয়ে গিয়েছে...সুতরাং একটু বাড়িয়ে নিয়ে বলতে পারি, সুধার জন্মদিন উপলক্ষে...।

—দেখুন অশেষবাবু। বলতে গিয়ে অলকার চোখ দুটো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আপনি বোধ হয় নিজেকে খুব চালাক মনে করেন।

অশেষ—চালাক মনে করি ঠিকই; কিন্তু খুব ভাল করে জানি, আজ এই সময়ে এখানে এসে এইসব কথা বলে একটা নির্বোধের মত কাজ করছি।

অলকা বিরক্ত হয়ে এবং যেন একটু ক্লান্ত হয়ে হাঁপ ছাড়ে। —যাক, আপনার সঙ্গে তর্ক করবার

একটুও উৎসাহ আমাব নেই। শুধু এইটুকু বলে দিতে চাই, আপনি যে কথা বললেন, এই কথা হয় ভয়ানক অহংকারের কথা, নয় খুব অশোভন একটা ইচ্ছার কথা।

—অহংকারের কথা! আশ্চর্য হয় অশেষ।

অলকা—হ্যাঁ মশাই ; নিজের মনের অহংকারে এতই মজে আছেন যে, একেবারে বিশ্বাস করে বসে আছেন...।

অশেষ—কী ?

অলকা—বড়মানুষের বাড়িতে একবার ডাকলেই আমাদের মত মানুষেরা তখনই যাবার জন্য দৌড় দেবে।

অশেষ—ইচ্ছে করে শক্ত কথা বলছেন আপনি, কারণ আপনি আমাকে একটা ভদ্রলোক বলেও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

যেন হঠাৎ একটু লজ্জিত হয়েছে অলকা। রুক্ষ স্বর একটু নরম হয়ে যায়। অলকা বলে—আপনিই বুঝে দেখুন, আপনার কাণ্ড দেখে যেকোনও মানুষের পক্ষে একটু বেশি আশ্চর্য হওয়া স্বাভাবিক কিনা ?

অশেষ—আমি আপনার সব অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েই বলছি, আশ্চর্য হবেন না। আমাদের বাড়িতে আপনাদের মত অনেকেই আসেন। নতুন পরিচয় হয়েছে, এমন কত ভদ্রলোক ও মহিলা আসেন। সুধার নতুন নতুন বান্ধবী হরদম আসছে। আমরাও কত বাড়িতে যাচ্ছি ; নিমন্ত্রণ খেয়ে আসছি। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কী আছে বলুন ? আপনাদের সঙ্গে না হয় এই কয়েক ঘণ্টা আগে আলাপ হয়েছে, এই মাত্র। কিন্তু তাতেই বা কী ?

অলকা—কিন্তু নিমন্ত্রণ করছেন কেন ?

অশেষ—বুঝতেই পারছেন, আমারই ভুলে আজ আপনাদের যে অপমানটা হয়ে গেল...।

অলকা—অপমান ? কিসের অপমান ?

অশেষ—এই যে ত্রিদিব মেসোমশাই-এর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করবার ব্যাপারে আমি এসে যে কাণ্ডটা করলাম। একবার নিমন্ত্রণ করে সেই নিমন্ত্রণ আবার প্রত্যাহার করবার জন্য ছুটে আসে মানুষ, ছিঃ।

অলকা—কিন্তু আমরা তো একটুও অপমানিত হয়েছি বলে মনে করছি না। ত্রিদিব সরকারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ না হলে আমরা ছোট হয়ে যাব, এমন অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদের নেই। কিন্তু আপনিই দেখছি এরকম অদ্ভুত বিশ্বাস রাখেন।

অশেষ—আমি আপনাকে আমার বক্তব্য ঠিক বোঝাতে পারছি না।

অলকা—থাক, এসব কথা। আপনার বক্তব্য বুঝতে পারলেই বা কী হবে ?

অশেষ—আমাদের বাড়িতে যাবেন।

অলকা হেসে ফেলে—আপনি অদ্ভুত কাণ্ড করছেন অশেষবাবু।

অশেষ—কিন্তু আমার যে খুবই খারাপ লেগেছে।

অলকা—কী ?

অশেষ—এই যে...অদ্ভুত ব্যবহার আপনাদের সঙ্গে আজ করতে হল ?

অলকার চোখের ছোট ভ্রূকুটি যেন একটা নতুন বিস্ময়ে টান হয়ে ওঠে। অলকা বলে—আপনার খুব খারাপ লাগছে ?

অশেষ—হ্যাঁ।

অলকা—তবে নিমন্ত্রণ ভাঙতে আবার এসেছিলেন কেন ?

অশেষ—আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু আমি তো নিমিত্ত মাত্র ; ত্রিদিব মেসোমশাই-এর মেয়ের বিয়ে। তিনি জানেন, কাকে নিমন্ত্রণ করা দরকার আছে বা নেই। আমি তো যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি। এক্ষেত্রে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার অধিকারই বা কতটুকু ?

অলকা হাসে—তাই বলুন। আপনার মন খারাপ হয়েছে বলে...।

অশেষ—সত্যি কথা। এখন আপনারা যদি কাল আমাদের আলিপুরের বাড়িতে গিয়ে দয়া করে খুড়িমা ও সুধার সঙ্গে একটু গল্প করে, সামান্য কিছু খেয়ে...।

অলকা হাসে—তার চেয়ে আরও ভাল ব্যবস্থা তো হতে পারে।

অশেষ—বলুন, কী ব্যবস্থা ?

অলকা—সবচেয়ে ভাল, আপনিই যদি কাল দুপুরে আমাদের এখানে এসে সামান্য কিছু খেয়ে... ।

অশেষ—বেশ তো ।

অলকা—বেশ ; আপনার নিমন্ত্রণ রইল ।

অশেষ—তা হলে বলুন, আজকের ওই ব্যাপারের জন্য আমার সম্পর্কে কোনও খারাপ ধারণা আপনার...আপনাদের মনে থাকবে না ।

অলকা—না ।

—আচ্ছা, এখন তবে আসি । চলে যাবার জন্য রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায় অশেষ । ল্যাম্পপোস্টের মাথার আলো সোজা এসে অশেষের মুখের উপর পড়েছে । হাতটাকে আলোর দিকে তুলে ঘড়ি দেখে অশেষ ।

অলকা চৌধুরীর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয় ; আর চোখের ছোট ভ্রূকুটি একবার শিউরে ওঠে । ত্রিদিব সরকারের আত্মীয় হয়, এই ভদ্রলোকের কথা আচরণ হাসি বিস্ময় অনুনয় আর যুক্তি সবই অদ্ভুত । শুধু অদ্ভুত নয় মুখটা ।

কিন্তু ওই সরল মুখটা কি সত্যিই একটা সরল মনের ছবি ? মনের ভিতরে কি অদ্ভুত কোনও সংকল্প নেই ?

যেভাবে কথা বললেন, অকাতরে যে ধরনের ভর্ৎসনা সহ্য করলেন, এবং যে সব কথা বললেন, তাতে তো এই সন্দেহ করতে হয় যে, ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে । মুখ দেখে অবশ্য মনে হয় না যে, ভদ্রলোক একজন পাগল-গোছের, কিংবা খামখেয়ালি লোক । ...কিন্তু এটাও তো মিথ্যা নয় যে, অনেক সময় মুখ দেখে পাগল আর সেয়ানা চেনা যায় না । পাগলের মুখ জ্ঞানীর মত, আর মতলবের মানুষের মন নিতান্ত সরল হয়ে থাকে । এই ভদ্রলোক কি সেই রকম একজন সরল মানুষ ? কোনও উদ্দেশ্য নেই ?

অলকা চৌধুরীও জানে, ওর গম্ভীর মুখ দেখে অনেকে ভুল করে এই ধারণা করে যে, ওর মন বুঝি ঘুমিয়ে আছে । কিন্তু অলকা নিজেই জানে যে, কত চতুর কত সতর্ক আর কত ধূর্ত এই অলকা চৌধুরীর মন । মানুষ চিনতে জানে অলকা । একটি কথায় মানুষের মনটাকে বাজিয়ে ভিতরের ইচ্ছার রকমটা বুঝে ফেলতে পারে অলকা । সেই জন্যেই তো অলকার জীবন ঠকেনি ।

অশেষ ডাক্তারের মনের ভিতর যদি কোনও ইচ্ছা থেকে থাকে, তবে সেই ইচ্ছাকে এখনি ধরে ফেলতে পারা যায় । সেটুকু বুদ্ধি আছে অলকার, এবং লোভও হয় অলকার, অদ্ভুত একটা কৌতুকের মত লোভ ; সেই বুদ্ধির কৌশলে অশেষ ডাক্তারের ইচ্ছাটাকে এই মুহূর্তে ধরে ফেলতে ।

—অশেষবাবু । ডাক দেয় অলকা ।

—বলুন । মুখ ফিরিয়ে তাকায় অশেষ ।

—আপনি তো কাল দুপুরে আসছেন ।

—নিশ্চয় ।

—আমি দুপুরে বাড়িতে থাকব না ।

—বিশেষ কোনও কাজ আছে ?

—না, বিশেষ কোনও কাজ নেই । এমনি একটু এদিক-ওদিক ঘুরতে বের হব ।

—বেশ তো । আপনি যেখানেই থাকুন না, আমি ঠিক যথাসময়ে এসে আমার খাওয়া খেয়ে চলে যাব ।

অলকার প্রশ্নের সব সূক্ষ্ম চতুরতা যেন একটা ধাক্কা খেয়ে অলকার মনটাকে চমকে দেয় । সত্যিই তো, অশেষ ডাক্তারের মন একটা সরল মন । খেয়ালি হলেও সরল খেয়াল । বিমান চৌধুরীর এই বাড়িতে এসে অনায়াসে নিমন্ত্রণ খেয়ে চলে যেতে পারবেন ভদ্রলোক ; বিমান চৌধুরীর বড় মেয়ের সঙ্গে একটা কথা বলবার জন্য কোনও ইচ্ছার তাগিদা নেই । বলবার সুযোগ না পেলেও অসুখী হবেন না ভদ্রলোক ।

এহেন এক ভদ্রলোককে মিথ্যে সন্দেহ করবার লজ্জায় অলকা নিজের উপর রাগ করে ; বড় বেশি অভদ্রতা করা হয়েছে। অলকা বলে—অনেক রাত হয়েছে অশেষবাবু।

ব্যস্ত হয়ে অশেষ বলে—হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি।

একচল্লিশের-এক নম্বরের এই বাড়িতে যথা সময়ে অর্থাৎ দুপুরে নিমন্ত্রণ খেতে এসে যাকে দেখতে পাবে না বলে জানা ছিল অশেষের, এসে দেখতে পায় যে, সে-ই শুধু আছে, আর কেউ নেই।

অশেষ—একি ব্যাপার ? যাঁকে দেখতে পাব বলে আশা করিনি, তিনিই আছেন দেখছি। আর যাঁদের সঙ্গে অনেক গল্প করব বলে মনে মনে তৈরি হয়েছিলাম, তাঁরাই নেই !

অলকা হাসে—হ্যাঁ, আমি জানতাম না যে, আজ দুপুরে হাওড়ায় আমার বড় মামার বাড়িতে সবারই যাবার কথা ছিল। এটাও একটা নিমন্ত্রণের ব্যাপার। না যেয়ে উপায় ছিল না, তাই সকলকে যেতে হল। শুধু আমি বাধ্য হয়ে থেকে গেলাম।

অশেষ—ভুল করে নেমন্তন্ন করার শাস্তি।

অলকা—শাস্তি কেন হবে ? বাবা আর মা দু'জনেই কত দুঃখ করে বলে গিয়েছেন যে, আপনি যেন কিছু না মনে করেন।

অশেষ—আমি দুঃখ করব কেন ? আবার আসবার একটা ছুতো পেয়ে গেলাম।

অলকা—আসতে হলে ছুতোর কোনও দরকার হয় কি ?

অশেষ—হয় বইকি ! আপনি কাল আমাকে যেরকম ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন...।

অলকা—হ্যাঁ, একটু অন্যায় হয়ে গিয়েছে অশেষবাবু। কী করব বলুন, একজন ভদ্রলোক, যার সঙ্গে মাত্র একঘণ্টা আগে আলাপ হয়েছে, সেই ভদ্রলোক যদি রাত বারোটার সময় জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়, তবে.. ?

অশেষ—তবে পুলিশ ডাকা উচিত।

অলকা—আপনিই বলুন, একটু সন্দেহ হয় না কি ?

অশেষ—হওয়া উচিত। কিন্তু এই যে এসে এখন নেমন্তন্ন খাচ্ছি, এটা আমার কোনও সন্দেহজনক ব্যবহার নয় তো ?

অলকা হেসে ফেলে—মানুষ চিনতে পারি।

অশেষ—অমানুষ চিনতে পারেন কি ?

অলকা—হ্যাঁ ?

অশেষ—বুঝলাম ; আমাকে দেখে প্রথমে অমানুষ মনে হয়েছিল, পরে মানুষ মনে হয়েছে।

অলকা—আপনিই বা আমাকে কী মনে করেছেন, কে জানে ?

অশেষ—একটু আশ্চর্য মনে হয়েছে।

অলকা—প্রশংসা করে বলছেন, না নিন্দে করে ?

অশেষ—প্রশংসা করে বলছি। আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, আপনি কেন রাগের মাথায় আমাকে নেমন্তন্ন করে বসলেন।

অলকা—না। যখন বুঝলাম যে, সত্যিই আপনি একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য খুবই দুঃখিত হয়ে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন, তখন...।

অশেষ—এই মাত্র ?

অলকা—শুধু এই মাত্র নয়, দেখলাম আপনি নিতান্ত সরল মনের মানুষ।

অশেষ—তার মানে ?

অলকা—তার মানে, বুঝলাম যে আপনার কাছ থেকে কোনও ভুল কথা শোনবার ভয় নেই।

অশেষ—কিসের ভুল কথা অলকা চৌধুরী ?

অলকা—আপনার মত মানুষের পক্ষে আমার মত মানুষকে যেকথা বলা উচিত নয় !

অশেষ—বুঝেছি। কিন্তু এসব কথা আপনার মনেই বা এল কেন ?

অলকা—আপনি যদি ভরসা দেন যে, আমাকে নির্লজ্জ বলে মনে করবেন না, তবে বলতে পারি।

অশেষ—নিশ্চয় মনে করব না। বলুন।
অলকা—আমার বিয়ে।
অশেষ—কবে ?
অলকা—এখনও দিন ঠিক নেই। তবে খুব শিগগিরই।
অশেষ—এইবার আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি কি ?
অলকা—হ্যাঁ, অনায়াসে।
অশেষ—এই বিয়ে নিশ্চয় ভালবাসার পর বিয়ে ?

অলকা চৌধুরীর এতক্ষণের মুখরতার আবেগ হঠাৎ এই সরল প্রশ্নের স্পর্শে লজ্জিত হয় যেন! মাথা হেঁট করে মুখের একটা নিবিড় রক্তিমতার শিহরণ লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে অলকা। তার পরেই মাথা নেড়ে স্বীকার করে। —হ্যাঁ।

অশেষ—দু'জনের অনেকদিনের পরিচয় নিশ্চয়।
অলকা—হ্যাঁ। প্রায় পাঁচ বছরের পরিচয়।
অশেষ—ভদ্রলোক নিশ্চয় খুব শিক্ষিত মানুষ।
অলকা—শিক্ষিত তো বটেই, বিদ্বানও বলতে পারেন। আর...।
অশেষ—বলুন।
অলকা—আর আশ্চর্য রকমের উদারও বলতে পারেন।
অশেষ—কেন ?

অলকা—তা না হলে এত টাকা-পয়সার মানুষ হয়ে আমার মত এ রকম একটা আশি টাকার মাস্টারনি মানুষকে কি কেউ আপন করতে চায় ?

অশেষ—ঠিকই বলেছেন আপনি। কিন্তু আপনি কি তাঁর এই উদারতার জন্যই...।

অলকা—না অশেষবাবু ; আমি গরিব হলেও আমার যথেষ্ট অহংকার আছে ; যে অহংকার সেই ভদ্রলোকের টাকার অহংকারের চেয়ে কম শক্ত আর কম জেদী নয় ! তাঁর টাকা থাক বা না থাক, আমি গ্রাহ্যই করি না। কিন্তু একটা সত্য গ্রাহ্য করতে হয়, টাকার মানুষ হয়েও যে মানুষ গরীবের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, সে-মানুষ মহৎ মনের মানুষ।

অশেষ—নিশ্চয়। সেই জন্যে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি শুধু এই প্রমাণ পেয়েই...।
অলকা—এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে ?
অশেষ—কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যেও বিয়েটা হয়ে গেল না কেন ?
অলকা—সেটাও ভদ্রলোকের একটা শুভেচ্ছার জন্য। তাঁর ইচ্ছা .।

মাথা হেঁট করে লজ্জিতভাবে কথা বলে অলকা—তাঁর ইচ্ছা আমিও বিদুষী হয়ে উঠি। আগে তাঁর দাবি ছিল, আমি এম-এ পাশ করব, একটা ডক্টরেটও নেব, তারপর বিয়ে হবে। কিন্তু...।

অশেষ—কী ?

অলকা—এখন তিনি আমারই ইচ্ছার সম্মান রাখতে চেয়েছেন। আমি বলেছি, বিয়ের পরেও তো আমার পড়াশুনা চলতে পারে।

অশেষ হাসে—তাই তো উচিত। বিদ্বান স্বামীর স্ত্রীর পক্ষে পড়াশোনা করবার সুবিধা কত ! গুরু যিনি পতিও তিনি, আপনার মত মেয়ের পক্ষে এই রকমই জীবন হওয়া উচিত।

খাওয়া শেষ হবার পর সিগারেট ধরিয়ে যখন ভিতর বারান্দা থেকে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ায় অশেষ, তখন বুঝতে পারে অশেষ নিমন্ত্রণ খাইয়ে এই একচল্লিশের-এক নম্বর যেন প্রচণ্ড একটা ঠাট্টা করল।

এখন কল্পনা করতে পারে অশেষ, বিমান চৌধুরীর মেয়ে গভীর রাতে আলোর কাছে মুখ ভাসিয়ে রেখে যে হাসি হাসছিল, সে হাসি এক বিদ্বান ভদ্রলোকের জীবনের জন্য উৎসর্গ করা হয়ে গিয়েছে। তখন ঠিকই সন্দেহ হয়েছিল। এবং সেই সন্দেহের পর আর এখানে আসবার জন্য একটা মূর্খ খেয়ালের তাড়না স্বীকার করা উচিত ছিল না।

কী অদ্ভুত উৎসাহ নিয়ে, কত মুখরতা করে, আর কত সহজে বিমান চৌধুরীর এই সরল-গম্ভীর

মেয়ে তার জীবনের ভালবাসার ইতিহাস কত স্পষ্ট করে, এবং কত গর্ব করে বলে দিল। অলকার এই মুখরতা যেন অশেষের উপর একগাদা তুচ্ছতার ধূলিবর্ষণ। তা না হলে, একটু সংকোচ বোধ করত অলকা ; একটু ভয় পেত, এবং বুঝতে পারত যে, একদিনের পরিচিত এক ভদ্রলোকের কাছে নিজের জীবনের ভালবাসার একটা গর্বময় বর্ণনা করা কোনও মেয়ের পক্ষে উচিত নয়।

তবে একটা উপকার করেছে অলকা। যথাসময়ে অশেষকে সাবধান করে দিয়েছে। কোনও ছুতো করে এখানে আসলে যেন একটি বিষয়ে সাবধান থাকে অশেষ। অপরের ভালবাসার নারীকে কোনও অদ্ভুত কথা, কোনও ভুল কথা বলবার চেষ্টা না করে। জেনে ভালই হল, ভাগ্য ভাল যে অলকা একটু বেশিরকমের নির্লজ্জ আর মুখর হতে পেরেছে। তাই এখন নিশ্চিন্ত হতে পারছে অশেষ, অলকা চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হবার অধিকার তার নেই।

সব চেয়ে ভাল হল, অলকার কাছে অপমানিত হবার আশংকা থেকে বেঁচে গেল অশেষ। সত্যিই যে অলকা চৌধুরী দেখতে ভাল, এবং ওইরকম সুন্দর মুখ দেখবার জন্য মানুষের চোখ হঠাৎ ভুলে ব্যস্ত হয়ে উঠতেও পারে। সে ভুল অশেষও করে ফেলত কিনা কে জানে ? আর, এইরকম একটি ঘরের নিভৃতে, যেখানে অলকা ছাড়া আর কেউ নেই, সেখানে অলকার মুখের দিকে আর বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ একটা ভুল কথা মুখ থেকে বের হয়ে যেত বোধ হয়!

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তৈরি হয় অশেষ, আর বৃথা দেরি না করে চলে যাওয়াই ভাল। মানে মানে সরে পড়বার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। এইবার যাবার আগে অলকাকে শুধু একটা ধন্যবাদ জানানো ছাড়া আর কোনও কথা বলবার নেই। হ্যাঁ, যখন এত কথাই জিজ্ঞাসা করা হল, তখন আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে আপত্তি কী ? এবং এটা যে একটা জিজ্ঞাসাও বটে।

অলকা ঘরে ঢুকতেই অশেষ জিজ্ঞাসা করে।---অনেক কিছু জানলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের নামটা তো জানলাম না।

অলকা—জানতে পারবেন একদিন।

অশেষ—কিন্তু আমাকে জানাতে আপনার আপত্তি কিসের! আমার মত একজন সামান্য পরিচিতের কাছে যখন এতগুলি কথা বললেন, তখন কেন...

টেবিলের উপর থেকে মোটা একটা বই তুলে নিয়ে অশেষের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে, সোজা অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে অলকা---এটা তাঁরই বই, তাঁর নাম পাবেন এর ভিতরে।

অশেষের হাত কেঁপে ওঠে। যেন হঠাৎ ঘৃণায় জ্বালায় কেঁপে উঠেছে হাতটা। অলকার এই মুখ একটা বেহায়া মুখ। এই হাসি নির্লজ্জ হাসি। অত্যন্ত চটুল ফাজিল আর লঘু স্বভাবের এই অলকা, যার চেহারা দেখেই বোঝা যায়, বয়স তিরিশের বেশি ছাড়া কম নয়। যাত্রী-সম্পর্কের কোনও পুরুষ আত্মীয়ের কাছেও কোনও বয়স্কা মেয়ে জীবনের ভালবাসার কীর্তি এমন করে দেখায় না। মুখ এত গম্ভীর অথচ স্বভাব এত চটুল হতে পারে, এটা বিমান চৌধুরীর এই মেয়েকে এই অবস্থায় না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না।

অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে অশেষের এই কিছুক্ষণ আগের ধারণাগুলিও যেন ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়তে থাকে। মুখে বড় বড় গর্বিত অহংকারের কথা, কিন্তু মনটা আসলে একটা বড়লোকের বউ হবার জন্য লোভের স্বপ্ন দেখছে। এই লোভটাকেই পাঁচ বছরের একটা অধিকার খাঁটি প্রেমের ব্যাপার বলে বাখান করে নিজেকে একটা আদর্শ প্রেমিকা বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে অলকা।

বইটা খুলে বই-এর প্রথম পাতায় লেখা নামটার দিকে তাকায় অশেষ। সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে। বইটা বন্ধ করে দিয়ে অলকার মুখের দিকে তাকায়, আর্তনাদের মত শব্দ করে শিউরে ওঠে অশেষের গলার স্বর—ডক্টর শৈলেশ্বর ঘোষ!

অলকা—হ্যাঁ, চেনেন নাকি!

অশেষ—চিনি না, নাম শুনেছি।

অলকা—আর একটা কথা আপনি শুনলে আমাকেও একটু প্রশংসা করবেন।

অশেষ—কী ?

অলকা—আমার মত অল্পশিক্ষিতা মেয়েও তাঁর থিসিস লেখার কাজে অনেক সাহায্য করতে পেরেছে।

অশেষ—কী সাহায্য করেছেন আপনি ?

অলকা—তিনি যে বিষয়ে বলেছেন, সেই বিষয়ে যত ভাল ভাল রেফারেন্স বই ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে আমিই নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

অশেষ—আর কী সাহায্য করেছেন ?

অলকা—কত বই থেকে কত চ্যাপটার নিজের হাতে কপি করে দিলাম। দিস্তা দিস্তা কাগজ সারা রাত ধরে লিখে ভরে ফেলেছি।

অশেষ—আর কী ?

অলকা—প্রেসে গিয়েছি, তাগিদ দিয়ে তাঁর লেখার প্রুফ তাড়াতাড়ি আদায় করে নিয়ে এসেছি।

অশেষ—আর কী ?

অলকা মাথা হেঁট করে মুখের একটা বিচিত্র লজ্জা লুকোতে চেষ্টা করে—আর কিছু না। আপনি খুব বেশি জিজ্ঞাসা করে ফেলেছেন।

অশেষ—বলুন, জানতে চাই। আমার কাছে বলতে আপনার লজ্জা কিসের ? অশেষের কথাগুলি যেন একটা চাপা গর্জনের মত ফুটতে থাকে। আর চোখ দুটোও অদ্ভুত ভাবে জ্বলতে থাকে।

অলকা আশ্চর্য হয়—আপনি বোধ হয় খুব বেশি রকম একটা কিছু সন্দেহ করছেন।

অশেষ—হ্যাঁ।

অলকা—আপনার সন্দেহ ঠিক নয়।

অশেষ—তার মানে ?

অলকা গম্ভীর হয়ে বলে—তার মানেও মুখ খুলে বলব, এতবড় বেহায়া আমাকে মনে করবেন না।

কথা শেষ করতেই অলকার চোখের কোণদুটো ছলছল করে ওঠে। অলকা বলে—চিরজীবন যার সঙ্গে থাকতে হবে, তার সেই অনুরোধ যদি রাখতে পারতাম, তবে এমন কিছু ভুল বোধ হয় হত না। কিন্তু, কে জানে কেন, বড় ভয় হল। শৈলেশ্বরের অনুরোধের কথা শুনে বুক কেঁপে উঠল। পালিয়ে এলাম। তারপর আর যাইনি। যেতে লজ্জা লাগে। শৈলেশ্বর কত দুঃখ পেল বুঝতে পেরেছি। তাই বার বার চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছি বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলা হোক। শিগগির বিয়েটা হয়ে যাক।

অশেষ—কী বলে শৈলেশ্বর ? কী উত্তর দিয়েছে ?

অলকা—আশ্চর্য, কোনও উত্তরই দেয়নি।

অশেষ—দেখা করে কথাটা বলেছিলেন ?

অলকা—না বড় ভয় আর বড় লজ্জা করে অশেষবাবু। কিন্তু আমার তো মনে হয়, আমি কোনও ভুল করিনি।

অশেষ—আচ্ছা চলি। হ্যাঁ, সত্যি করে বলুন তো, আমার কাছে এসব কথা এত সহজে আপনি কেন বললেন ? কেমন করে বলতে পারলেন ? এসব কথা কোনও মেয়ে যে তার বাপ-মার কাছে, তার মেয়ে-বন্ধুর কাছেও বলে না।

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে অলকা। আস্তে আস্তে ঠোঁট কাঁপিয়ে বিড় বিড় করে। একটা কথা আপনাকে বলিনি অশেষবাবু, শৈলেশ্বর বলেছে—আমার নাকি হিস্টিরিয়া আছে।

অশেষ—হিস্টিরিয়ার ঝোঁকে এসব কথা আর কার কাছে বলেছেন ?

অলকা—বিশ্বাস করুন, কারুর কাছে বলিনি। এই প্রথম আজ আপনার কাছে বলে ফেললাম। কেন বললাম, তাও বুঝতে পারছি না।

অশেষ—আপনি বোধ হয় নিজেকে খুব চালাক, খুব সাহসী আর খুব সাবধানী বলে মনে করেন !

অলকা—হ্যাঁ। শৈলেশ্বর বলে, এটাও নাকি আমার একটা হিস্টিরিয়া।

অশেষ—কখনও ভেবে দেখেছেন কি, শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে আপনার যে ভালবাসা হল, সেটাও

একটা হিস্টিরিয়া কিনা ?

অলকার চোখ দুটো যেন একটা অদ্ভুত আতঙ্কে জ্বলতে থাকে। —না। এমন সন্দেহের কোনও অর্থ হয় না। আপনি আমার মনে বৃথা সন্দেহ এনে দেবার চেষ্টা করছেন। আপনি মনে করছেন যে...।

অশেষ—কী ?

অলকা—আমার ভালবাসা ভুয়ো ?

অশেষ—না, তা মনে করব কেন ?

অলকা—যাক, খুব বেঁচে গেলেন আপনি।

অশেষ—কেন ?

অলকা—যদি ভুয়ো বলতেন, তবে আপনাকেই সন্দেহ করতাম।

অশেষ—যাক ; আমি চলি এবার।

—অশেষবাবু। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে যেন বাধা দেয় অলকা।

অশেষ—বলুন।

অলকা—আমি আজ আরও একটা কাণ্ড করেছি ; বোধ হয় হিস্টিরিয়ার ঝোঁকে আপনাকে কতগুলি মিথ্যে কথা বলেছি।

অশেষ—কি মিথ্যে কথা ?

অলকা—বাবা, মা আর তিলকা, ওরা কেউ হাওড়াতে মামার বাড়িতে আজ যেতে চায়নি, আমিই জোর করে ওদের পাঠিয়ে দিয়েছি।

অশেষ—কিসের জন্য ?

অলকা—এখন মনে হচ্ছে, বোধ হয় আপনার সঙ্গে একলা বসে গল্প করবার জন্য।

অশেষ—হ্যাঁ, খুব ভুল করেছেন।

অলকা—ভুল করি আর যাই করি...আমার একটা উপকার করতে হবে অশেষবাবু।

অশেষ—যদি সাধ্যি থাকে করব।

অলকা—শৈলেশ্বরের কাছে একবার আপনাকে যেতে হবে।

অশেষ—কেন ?

অলকা—একবার জিজ্ঞাসা করবেন, আর দেরি করছে কেন ? এই মাসেই তো আমাদের বিয়ে হয়ে যেতে পারে।

অশেষ—যদি এ মাসেই না হয়, তবে...তবে ক্ষতি কী ? পাঁচ বছর যখন অপেক্ষা করতে পেরেছেন, তখন...।

অলকা—না, আর অপেক্ষা করতে পারছি না। অপেক্ষা করবার ইচ্ছে নেই, শক্তিও বোধ হয় আর নেই। আপনি তো বিশ্বাস করতে পারবেন না, শৈলেশ্বরও ধারণা করতে পারে না যে, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ওর কথা ভাবি। সমস্তক্ষণ ভাবি অশেষবাবু। আমি আনমনা হতে চেষ্টা করলেও আমার মন শৈলেশ্বরকে ছাড়তে চায় না ; তাই আপনাকে বলছি একটা উপায় বের করুন।

অশেষ ভ্রূকুটি করে তাকায় ; —আপনি নিজে গিয়ে শৈলেশ্বরের কাছে একথা জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না কেন ?

অলকা—বলেছি, অনেকবার বলেছি ; কিন্তু উনি যেটা বলছেন, সেটা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। শৈলেশ্বর বলছেন, এখনই বিয়ে হওয়া উচিত নয়।

অশেষ—এই যে কিছুক্ষণ আগে বললেন, খুব শিগগির আপনাদের বিয়ে।

অলকা—বলেছিলাম বোধ হয় !

অশেষ—শৈলেশ্বর যদি শেষ পর্যন্ত সত্যিই আপনাকে বিয়ে না করে, তবে ?

অলকা—তবে শৈলেশ্বর নিজেই ঠকবে।

অশেষ—কেন ?

অলকা—আমার মৃত্যু হবে। নিজের চেষ্টায় চুপচাপ মরে যাব।

অশেষ—তাতে শৈলেশ্বরের কী ক্ষতি হবে ?

অলকা—আমার মত আর কে ভালবাসবে শৈলেশ্বরকে ? কার সাধ্যি আছে ?

অশেষ—শৈলেশ্বরকে আপনি খুব বেশি ভালবাসেন ?

অলকা—হ্যাঁ অশেষবাবু। জানি না কেন ? কত ভোগাচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে, বার বার হতাশ করে দিচ্ছে, তবু।

আবার ফুঁপিয়ে ওঠে অলকা।—কী ইচ্ছে করে জানেন ? ইচ্ছে করে শৈলেশ্বর আর কাউকে ভালবাসুক, বিয়ে করুক। তারপর ওর জন্য আমার আর ভাবনা করবার কিছু থাকবে না। ও সুখী হয়েছে, আমি শুধু এটুকু জেনেই নিশ্চিন্ত হয়ে অনায়াসে মরে যেতে পারব, বিশ্বাস করুন অশেষবাবু।

অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে, এইবার নিজেরই মনের ভিতরের একটা বিচিত্র ঝড়ের শব্দ যেন শুনতে থাকে অশেষ। অদ্ভুত একটা মায়াময় বেদনার আবেগ যেন ঝড় হয়ে শব্দ করছে। জীবনের সব আশা কী-ভয়ানক এক ছলনার কাছে সঁপে দিয়েছে কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকা ! মানুষ যে নিশির ডাক শুনেও এত ভুল করে না। শৈলেশ্বর ঘোষ কোনও মুহূর্তেও অলকা নামে এই নারীকে জীবনের সঙ্গিনী হবার জন্য আহ্বান করেনি। শুধু নিজের স্বার্থে আর দরকারে দাসীর মত খাটিয়েছে। একটা প্রচণ্ড লোভের ইচ্ছাকেও সফল করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু শৈলেশ্বরের এই সব নির্মমতাকেই মমতার চরম বলে বিশ্বাস করে ফেলেছে অলকাব মত একজন শিক্ষিতা মেয়ে, বয়স যার ত্রিশের কম নয়।

এখনও এই সামান্য সন্দেহ করবার মত বুদ্ধির উদয় হল না অলকার মনে, শৈলেশ্বর যে কোনওদিনও সত্যি সত্যি অলকাকে ভালবাসতে চায়নি ; আজও জানে না অলকা, আর কয়েক ঘন্টা পরে, অলকাব মনের সকল আবেগ আশা মোহ আর ভালবাসার আস্পদ সেই শৈলেশ্বর ওই ত্রিদিব সরকারেব জামাই হবার জন্য এই পাড়াতেই একটা বিরাট বাড়ির ভিতরে হাজার মানুষের চোখের সামনে অনায়াসে একটা উৎসবের আসরে আসীন হবে।

শৈলেশ্বর হল শৈলেশ্বর। শৈলেশ্বর মত প্রকৃতির মানুষ বর্বব কি অবর্বর, সে প্রশ্ন নিয়ে বিচার করবাব আর মনের ভিতরে একটা তর্ক বাধাবার ইচ্ছাও নেই অশেষেব। অশেষের মনের ভিতরে যে ঝড়ের শব্দ বাজছে, তাব মধ্যে শুধু একটি করুণ শব্দ সবচেয়ে বেশি করুণ বলে মনে হয়। একটা আক্ষেপ। বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকা চৌধুরীর চেয়ে বেশি মূর্খ মেয়ে পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ ! একটা মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে অলকার আত্মাটাই মূর্খ হয়ে গিয়েছে। এত মূর্খ যে, এখন আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছার জোর পাচ্ছে না।

অশেষের বুকের ভিতব একটা রাগের জ্বালা হঠাৎ ছটফট করে ওঠে, এমন মূর্খ মেয়ের মরে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অশেষের নিঃশ্বাসের বাতাস যেন অদ্ভুত এক সমবেদনার ছোঁয়ায় কেমন হয়ে যায়।—মূর্খ বলেই মরবে কেন ? মূর্খ বলেই তো ওকে বাঁচানো উচিত। কিন্তু বাঁচাবেটা বা কে ? আর কি করেই বা বাঁচানো যায় ?

মাথা হেঁট করে ; যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন একটা মুখ নিয়ে, আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে অশেষ। দরজাটা পার হয়ে পথের উপর নেমে পড়তেই অলকাব ডাক শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

অলকা—কোনও কথা না বলে ও ভাবে চলে যাচ্ছেন কেন অশেষবাবু ?

অশেষের চোখ দপ্ দপ্ করছে।—কিভাবে চলে যাচ্ছি ?

অলকাও আস্তে আস্তে এগিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়।—

—আপনি বোধ হয়...

অশেষ—কী ?

অলকা—আমাকে সত্যিই হিস্টিরিয়া রোগী বলে মনে করছেন !

অশেষ—তা মনে করতে হচ্ছে বইকি !

অলকা—তার মানে আপনি আর এবাড়িতে আসবেন না ?

অশেষ—না।

অলকা—কেন ?

অশেষ—আমি যখন আপনার কোনও উপকার করতে পারব না, তখন... ।

অলকা—শৈলেশ্বরের কাছে গিয়ে আমার হয়ে দুটো কথা বলবেন, এটা কি একটা খুব কঠিন কাজ ?

অশেষ বিরক্ত হয়ে ভ্রুকুটি করে । —খুব কঠিন কাজ ।

অলকা—কেন ?

অশেষ কিছুক্ষণ অপলকভাবে অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে । তারপর যেন একটা লোভী সমবেদনার ব্যাকুলতা জোর করে চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে অনুরোধের সুরে বলে—আপনার চোখ বড় বেশি লাল হয়ে উঠেছে । আমার অনুরোধ, এখন চুপচাপ শুয়ে পড়ুন । অন্ততঃ ঘন্টা তিন চার ঘুমিয়ে থাকুন ।

আর কোনও কথা না বলে, পুরনো বাগান স্ট্রিটের দুপুরের রোদের সঙ্গে মনের জ্বালা মিশিয়ে দিয়ে হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে থাকে অশেষ ।

শুভ উৎসবের সন্ধ্যা ! নিমন্ত্রিতের ভিড়ে গম্‌গম্‌ করে পুরনো বাগান স্ট্রিটের এক নম্বর ।

হলঘরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের আসরের কাছে এসে সৌজন্য ও আপ্যায়ন পর্ব পালন করতে থাকেন ত্রিদিব সরকার ।

টি ম্যাকফার্সন লিমিটেডের যিনি বড়বাবু, অর্থাৎ ক্ষমতার দিক দিয়ে সর্বেসর্বা, যাঁর কাছ থেকে আজকাল বিরাট একটা অনুগ্রহ আশা করছেন ত্রিদিববাবু ; সেই মুখার্জিবাবুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে ত্রিদিববাবু বলেন—আপনাকে আমি স্যার নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াব !

এই মুখার্জিবাবু অনুগ্রহ করে একটি সই ছাড়লে ত্রিদিব সরকারে টেণ্ডার জয়ী হয়ে যাবে, এবং একটা সাপ্লাই-র যে আশি হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট পেয়ে যাবেন, তা থেকে কম করেও লাভ থাকবে বিশ হাজার টাকা ।

মুখার্জিবাবু বলেন—আমি একটা বাতাসাও মুখে দেব না ত্রিদিববাবু । আমি বাড়ির বাইরে হাওয়া ছাড়া আর কিছু খাই না ।

ত্রিদিববাবু হাত জোড় করেন—আমার কথা ভেবে একটু দয়া করুন স্যার ।

মুখার্জিবাবু—না মশাই, আপনার ওপর বিশেষ দয়া করতে গিয়ে আমি নিজেকে প্রাণে মারতে পারবো না ! বাঙালি বাড়ির নিমন্ত্রণের খাবারের গন্ধ নাকে গেলেও আমার অসুখ করে ।

ত্রিদিববাবু—তা হলে আর কী বলব বলুন ?

মাথার উপরে বিদ্যুতের পাখা ঘুরছে, ত্রিদিববাবু তবু একটা হাতপাখা হাতে নিয়ে মুখার্জিবাবুর কাছে এগিয়ে যান । আপত্তি করেন মুখার্জিবাবু । —আহা করেন কি মশাই ? তা ছাড়া, আমি এখনি উঠব ।

ত্রিদিববাবু—আরও কিছুক্ষণ থেকে যান স্যার ।

মুখার্জিবাবু—না । আমি যাঁর আসবার অপেক্ষায় এতক্ষণ বসে ছিলাম, তিনি আর আসবেন বলে মনে হচ্ছে না ।

ত্রিদিববাবু—কে ? কে স্যার ? কার অপেক্ষা করছেন আপনি ?

মুখার্জিবাবু—বিমান চৌধুরী ।

ত্রিদিববাবু—এ নামের কোনও ভদ্রমহোদয় এখানে আসবেন বলে তো মনে হচ্ছে না ।

মুখার্জিবাবু—সে কি ?...ও, এইবার বুঝলাম ; বিমান চৌধুরীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়নি নিশ্চয় !

ত্রিদিববাবু—কোথায় থাকেন তিনি ?

মুখার্জিবাবু—এই তো, আপনাদের পুরনো বাগান স্ট্রিটের কোনও বাড়িতে থাকেন । নম্বরটা আমার মনে পড়ছে না ।

—অশেষ, এদিকে এসো ! চেঁচিয়ে ডাক দেন ত্রিদিববাবু । এবং অশেষ কাছে এসে দাঁড়াতেই প্রশ্ন

করেন—এ কী রকমের ব্যাপার হল ? এই পাড়াতে এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকতে আমার এখানে তাঁর নিমন্ত্রণ হল না, এ কি রকমের ব্যাপার ? বিমানবাবুর নিমন্ত্রণ হয়নি কেন ?

অশেষ—কোন বিমানবাবু ? কম্পাউণ্ডার ?

মুখার্জিবাবু বলে ওঠেন—হ্যাঁ, কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরী। আমি ওকে বলি, দেবতুল্য চৌধুরী। আমি জীবনে মাত্র একবার আমার চেয়ে বয়সে ছোট একটি ব্যক্তিকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছি, তিনি হলেন এই বিমান চৌধুরী। অনেক বছর আগে, বোম্বাই থেকে ট্রেনে কলকাতায় ফিরছি, হাওড়াতে নেমে একটা ট্যাক্সিতে ওঠবার পর দেখি, আমার ক্যাশব্যাগটাই নেই। কোম্পানির এক লক্ষ এগার হাজার টাকার নোট সেই ব্যাগে ছিল। ট্যাক্সির ভিতরে আমি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে বসেছিলাম। আর বাড়ি ফিরে এসে সারারাত পাগলের মত বিড়বিড় করেছিলাম। সকাল হতেই এক অচেনা ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন, আর সেই ক্যাশব্যাগটি দিলেন। আমি পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে গিয়েই বুঝলাম, এরকম মানুষ এখনও পৃথিবীতে আছে।

অশেষ—উনি পুরস্কার নেননি নিশ্চয়।

মুখার্জিবাবু—না।

অশেষ—উনিই নিশ্চয় কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরী ?

মুখার্জিবাবু—হ্যাঁ, সে কথাই তো বলছি। একশো চার ডিগ্রি জ্বর গায়ে নিয়ে দু'মাইল রাস্তা ধুঁকতে ধুঁকতে পার হয়ে এসে একটা কম্পাউন্ডার মানুষ এক লক্ষ এগার হাজার টাকা আমাকে দিয়ে চলে গেল, তাঁকে কি সত্যই কম্পাউন্ডার বলে মনে হয় বলুন ? আমি প্রণাম করেছিলাম তাঁকে। এখনও মাঝে মাঝে এসে প্রণাম করে যাই। এরকম একজন দেবতুল্য মানুষ পাড়ায় থাকতে আপনি তার খবর রাখেন না, নিমন্ত্রণও করেন না ত্রিদিববাবু ? অদ্ভুত।

বুকে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন ত্রিদিব সরকার। —নিমন্ত্রণ করা হয়েছে স্যার। বিশ্বাস করুন। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি যে, আপনি আমার শ্রদ্ধেয় কম্পাউন্ডারবাবুর কথা বলছেন। ... এই তো, এই অশেষ নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছে।

ভ্রূকুটি করে অশেষ—না।

ত্রিদিববাবু অশেষের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করেন—কেন ? তবে কি তুমি সত্যই ভুল করে...।

কোনও কথা না বলে, ত্রিদিব সরকারের এই প্রচণ্ড কপটতাকে বোধ হয় আর সহ্য করতে না পেরে সেই মুহূর্তে সরে যায় অশেষ। মুখার্জিবাবুর দিকে তাকিয়ে ত্রিদিববাবু বলেন—দেখলেন তো স্যার, এই সব ছেলে-ছোকরাদের ভুল ? কী সাংঘাতিক ভুল !

মুখার্জিবাবু—যেতে দিন ওসব কথা। আমি নিজেই যাচ্ছি। বিমানবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করেই বাড়ি যাব।

ত্রিদিববাবু—একটু বসুন স্যার। আমি যাচ্ছি। আমি বিমানবাবুকে ডেকে আনছি। অশেষ যে ভুল করেছে, সে ভুলের জন্য আমি বিমানবাবুর কাছে মাপ চেয়ে, তাঁর হাত ধরে তাঁকে এখানে নিয়ে এসে তবে খুশি হতে পারব।

মুখার্জিবাবু—থাক মশাই, আপনি ব্যস্ত হবেন না। শুধু বিমানবাবুর সঙ্গে নয়, ওঁর স্ত্রী আর মেয়ে দুটির সঙ্গেও আমার দেখা করবার দরকার আছে।

ত্রিদিববাবু—ওঁরা সকলেই আসবেন স্যার। আমি ওঁদের সবাইকে এখনি গাড়ি করে নিয়ে আসছি। আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে, বিয়ে দেখিয়ে, তারপর নিজের হাতে পরিবেশন করে খাইয়ে তবে আমি ওঁদের ছেড়ে দেব।

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ত্রিদিব সরকার। সত্যই এক মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ত্রিদিব সরকারের চতুর অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

মুখার্জিবাবু বলেন—এবছরের নতুন কনস্ট্রাকশনের জন্য ইট সাপ্লাই-এর টেণ্ডার দাখিল করেছে যে প্রকাশ গাঙ্গুলি, সে ভদ্রলোকও বিমানবাবুকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করেন। প্রকাশ গাঙ্গুলির ছোট ছেলেটির পিঠের একটা ফোঁড়া অপারেশন হয়েছিল। ছেলেটা ঘুমোতে পারত না। প্রকাশ গাঙ্গুলি বলেন, মশাই, কী অদ্ভুত মানুষ কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরী ! সারা রাত জেগে ছেলেটাকে কোলে

নিয়ে বসে থাকতেন, আর ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করতেন। যে কাজ ছেলের মা'র দ্বারা সম্ভব হয়নি, সে কাজ সম্ভব করে ছিলেন কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরী। অথচ একটা পয়সাও দাবি করেননি।

চেঁচিয়ে ওঠেন ত্রিদিব সরকার—আমি চললাম স্যার! শ্রদ্ধেয় বিমানবাবুকে এখনি নিয়ে আসছি।

বর এসেছেন। ত্রিদিব সরকারের মেয়ের বিয়ের লগ্ন আসন্ন। বর শৈলেশ্বর ঘোষও আসনের উপর আসীন হয়েছেন। সাজানো গেটের মাথার উপর নহবত। আর গেটের ভিতর দিয়ে অজস্র নিমন্ত্রিতের আনাগোনা। পুরনো বাগান স্ট্রিটের দু'পাশে মোটরগাড়ির লম্বা লাইন।

ফটকের কাছে পায়চারি করে অশেষ। সবই শুনতে পেয়েছে অশেষ, ত্রিদিব সরকারের চক্রান্তের আর চতুরতার দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। বিমান চৌধুরীকে সপরিবারে ডেকে আনবার জন্য গাড়ি নিয়ে ছুটে গিয়েছেন ত্রিদিব সরকার। বিশ হাজার টাকা লাভের টেণ্ডার মাঠে মারা যাবে; সে কনট্রাক্ট নির্ঘাত বাগিয়ে ফেলবে ওই প্রকাশ গাঙ্গুলি, যদি আজ কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরীর মন জয় করতে না পারেন ত্রিদিব সরকার।

বিশ্বাস করে অশেষ, এই ত্রিদিব সরকার সব পারে। বিমান চৌধুরীর পা জড়িয়ে ধরতেও একটু দেরি করবে না। এবং বিমান চৌধুরীর মত নরম মানুষের মন জয় করে, তাঁকে সপরিবারে এই উৎসবের বাড়িতে নিয়ে আসতে ত্রিদিব সরকারের একটুও ভুগতে হবে না।

আসুক ওরা সবাই। বিমানবাবু আসুন, অলকার মা আসুন ও তিলকা আসুক। কিন্তু অলকা? অলকা এসে কী দেখবে এখানে? দেখবে যে তারই পাঁচবছরের ভালবাসার মানুষ শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে ত্রিদিব সরকারের মেয়ের বিয়ের উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে।

আসছে এক মূর্খ নারী, শিক্ষিত হয়েও মানুষ চিনতে যে একেবারে অক্ষম। অদ্ভুত রকম নরম মনের নারী এই অলকা। এখানে এসে দেখবে যে, শৈলেশ্বর ঘোষ অলকাকে একটা আবর্জনার মত তুচ্ছ করে দূরে ছুঁড়ে দিয়েছে।

এই অলকাকে কি চূড়ান্ত অপমান থেকে বাঁচানো যায় না? শাস্তি থেকে রক্ষা করা যায় না? শৈলেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে যে নিষ্ঠুর বঞ্চনার সত্য আজ মর্মে মর্মে বুঝে ফেলবে অলকা, সেই বঞ্চনার জ্বালা সহ্য করতে পারবে কি?

ভয় পায় অশেষ। অলকার কথার মধ্যে অনেক ভুল, অনেক লঘুতা, অনেক নির্লজ্জতা দেখেছে অশেষ। কিন্তু অবিশ্বাস করতে পারে না অশেষ, একটি বিষয়ে অলকা ভয়ানক কঠোর। শৈলেশ্বরকে মনে মনে ভালবাসার দেবতা করে আজও উপাসনা করছে অলকা।

কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকা চৌধুরীর একটা উপকার করতে চায় অশেষ। কিন্তু উপায় কই?

উপায় একই। যা হবার হোক। আসুক অলকা। নিজের চোখে নিজের মূর্খতা, মোহ আর ভুলের পরিণাম দেখে যাক। বুঝে নিক, পাঁচ বছরের মধ্যে যে শৈলেশ্বরকে এক উদার প্রেমের দেবতা বলে মনে করে আসছে অলকা, সে শৈলেশ্বর কেমন প্রেমিক আর কেমন উদার?

ক্ষোভে দুঃখে ও লজ্জায় আত্মহত্যা করবে অলকা? করতে পারে, আশ্চর্য, কিন্তু না করতেও পারে। তারপর একদিন, অনেক দিন পরে, এই অলকার ঘরের জানালার কাছে, অনেক রাতে একটি ক্ষণে চুপ করে যদি দাঁড়িয়ে থাকে অশেষ, তবে কি অলকাও চুপ করে থাকবে? ছুটে এসে অশেষেরই বুকের উপর মাথা রেখে কেঁদে উঠবে না কি?

সেদিন অনায়াসে সান্ত্বনা দিয়ে অলকা চৌধুরীর মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে পারবে অশেষ। এবং অলকাও সান্ত্বনা পেয়ে শান্ত হয়ে যাবে।

না, এমন কল্পনাকে নিতান্ত ভীরু মনের কল্পনা বলে মনে হয়। একটা মানুষকে পিপাসায় মর-মর হয়ে যাবার সুযোগ দিয়ে, তারপর তার হাতের কাছে ঠাণ্ডা জলের পাত্র এগিয়ে দেওয়া। সে অবস্থায়, একটা মর মর মানুষ তো লুব্ধ হয়ে সে উপহার গ্রহণ করে ফেলবেই। এমন উপহারের কি কোনও গৌরব আছে? এই জয় অলকা চৌধুরীর হৃদয় জয় করা নয়! হৃদয়হীন দুঃখের সুযোগ নিয়ে একটা

মানুষের আগ্রহ জয় করা। শূন্য ও রিক্ত মনের অলকাকে নয়, যদি আজকের এই পূর্ণ-গর্বের অলকাকে জয় করা যেত, তবে যে সত্যিই অলকার জীবনটা সব অশান্তির আঘাত থেকে বেঁচে যেত। শৈলেশ্বরকে দেখে তুচ্ছ করে হেসে উঠত অলকা।

চমকে ওঠে অশেষ। ত্রিদিব সরকারের গাড়ি ফটকে এসে থেমেছে। গাড়ি থেকে নামছেন ত্রিদিববাবু। শ্রদ্ধায় ও বিনয়ে অবনত হয়ে ত্রিদিব সরকার সাগ্রহে বিমানবাবুর একটি হাত ধরে রয়েছেন।

গাড়ি থেকে নামলেন অলকার মা এবং তিলকা। আর দেখতে পেয়ে অশেষের বুকের ভিতরে একটা চাপা আর্তনাদ গুমরে ওঠে। অলকাও এসেছে! একটা মূর্খ মেয়ে, এমন সুন্দর গম্ভীর মুখ নিয়ে একটা বধ্যভূমির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। জানে না অলকা, ওর শৈলেশ্বর এতক্ষণে বোধ হয় বাসর ঘরের ভিতরে ত্রিদিব সরকারের মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে...

আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অশেষ, আগে আগে চলে গেলেন ত্রিদিব সরকার ও বিমানবাবু, তারপর অলকার মা ও তিলকা। তারপর সবার পিছনে অলকা।

কী সুন্দর সেজেছে অলকা! কে বলবে ওর জীবন একটা ভয়ানক দুঃখ আর অপমানকর পরিণামের অপেক্ষায় আছে? কে বলবে, এই মেয়ে এত বোকাও হতে পারে? জ্বলজ্বল করছে অলকার চোখের তারা দুটো। যেন কল্পনায় নিজেরই জীবনের একটা উৎসবের ছবি দেখছে অলকা।

—অলকা!

অলকার কাছে এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে ডাক দেয় অশেষ।

চমকে উঠে আর মুখ ফিরিয়ে হেসে ওঠে অলকা।—তাই বলি! এখানে আবার অলকা বলে কে ডাকে।

অলকার কথাগুলি যেন একটা হাসি-হাসি অভিযোগ। মনে মনে লজ্জা পেয়ে একটু অপ্রস্তুত হয় অশেষ। অলকা বলে ডাকবার অধিকার নেই যেখানে, সেখানে নিতান্ত মনের ভুলে এবং অসাবধান ভাবনার ভুলে নাম ধরে ডেকে ফেলেছে অশেষ। তাই বোধ হয় একটু আশ্চর্য হয়ে চমকে উঠেছে অলকা।

অশেষ বলে—আমি আপনারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

খিলখিল করে হেসে ওঠে অলকা।—আপনারই? একবার অলকা, একবার আপনি।

অশেষ হাসে—বেশ তো, তোমারই অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

অলকা—কেন?

অশেষ—তোমাকে দেখবার জন্য।

অলকা—ঠাট্টা করছেন?

অশেষ—না।

অলকা—ঠাট্টা নয় তো কী? আপনি সব জেনে শুনেও একথা যদি আমাকে বলেন, তবে ঠাট্টা করা হয় না কি?

অশেষ—সব জেনে শুনেই বলেছি। কারণ, বিশ্বাস করি যে সত্যি কথা বললে তুমি রাগ করবে না।

অলকা—সত্যি কথা বললে সত্যিই রাগ করব না।

অশেষ—তবে এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। চলো, একটু ঘুরে আসি।

চমকে ওঠে অলকা।—আপনার সঙ্গে আমার একটু ঘুরে আসবার কোনও অর্থ হয় না। আমার লাভ নেই, আপনারও লাভ নেই। তবু আপনি একথা বলছেন?

অশেষ—আমার লাভ আছে।

অলকা—কিসের লাভ?

অশেষ—আমার গল্প তোমাকে শোনাইনি। শুধু তোমারই গল্প শুনলাম।

অলকা—গল্প শোনার এই কি সময়?

অশেষ—তা ছাড়া আর কখন সময় হবে বল ?

অলকা—আপনার গল্প আমাকে শুনিয়ে আপনারই বা লাভ কী ?

অশেষ—তুমিই বা কেন বলেছিলে ? কোন লাভের আশায় ?

অলকা—আমার গল্পের মধ্যে যে অনেক দুঃখ আছে, তাই বলে ফেলেছি। কিন্তু আপনার গল্পে কোনও দুঃখ নেই নিশ্চয়। আপনার মত মানুষের দুঃখ থাকবেই বা কেন ?

অশেষ—আছে।

অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে আরও আশ্চর্য হয়ে যায় অলকা। সত্যিই যে একটা বেদনার্ত মুখ। অশেষবাবুও কি কারও অপেক্ষায় রয়েছেন, এবং সেই অপেক্ষা সহ্য করতে পারছেন না ?

অলকা বলে—আপনি আমাকে সত্যিই একটু বিপদে ফেললেন।

অশেষ—আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে পারি কি ?

অলকা—না, সেকথা বলছি না। কিন্তু আপনার দুঃখের কথা শুনেই বা আমার কী লাভ হবে ? শুধু দুঃখিত হব। কোনও উপকার তো করতে পারব না...যাই হোক ..কোথায় যাবেন ?

অশেষ হাসে—এখানেই, এই রাস্তাতে, এই চেঁচামেচি ও আলোর ধাঁধা থেকে সামান্য একটু দূরে। তোমার ভয় করবার কিছুই নেই।

অলকা—আপনাকে ভয় করি না।

পুরনো বাগান স্ট্রিটের বাত্রির আলোছায়ার কাছে কাছে ঘুরে বেড়িয়ে গল্প করতে থাকে অশেষ আর অলকা।

অশেষ বলে—আমার দুঃখ এই যে আমি যাকে ভালবাসি সে আজও বুঝতে পারে না এবং বিশ্বাস করতে পারবে না যে, অকারণে একটা মানুষ কাউকে ভালবাসতে পারে।

অলকা—তার বোঝা উচিত।

অশেষ—তা হলে তো সমস্যাই ছিল না। তার বোঝবার সাধ্য নেই; কারণ সে অন্য একজনকে ভালবেসে বসে আছে।

অলকা—আপনার জন্য দুঃখ হয়।

অশেষ হেসে বলে—সত্যিই কি দুঃখ হয় ?

অলকা—নিশ্চয়।

অশেষ—আমি কিন্তু কোনও দাবি করি না যে, সে আমাকে ভালবাসুক।

অলকা—কেন ?

অশেষ—দাবি করলে তাকে দুঃখ দেওয়া হবে।

চমকে ওঠে অলকা বলে—আপনি যে এত মহৎ আমি জানতাম না, বরং আপনাকে দেখে প্রথমে, সত্যি কথা, কেমন যেন লেগেছিল।

অশেষ—সন্দেহ হয়েছিল ?

অলকা—হ্যাঁ।

অশেষ—কিসের সন্দেহ ?

অলকা—আপনি ভুল করে আমার ওপর একটা মায়ায় পড়ে যাবেন।

অশেষ—মায়ায় কি পড়িনি ?

অলকা—সে কথা সত্যি। তা না হলে, আমার এত অভদ্রতা কেন সেদিন, আজ আবার এখানে.. যাক সে কথা।

অশেষ—কিন্তু, তোমার কি খারাপ লাগছে না ?

অলকা—কেন ?

অশেষ—তোমার ওপর আমার মায়া পড়েছে, একথা শুনতে তোমার তো খারাপ লাগাই উচিত।

অলকা—না।

অশেষ—কেন ?

অলকা—মাপ করবেন, সত্যি কথা বলা উচিত নয় !

অশেষ—কেন ?

অলকা হাসে—বললে আপনার অহংকার বেড়ে যাবে ।

অশেষ—তার মানে ?

অলকা—এই প্রথম দেখলাম, আমার জীবনের দুর্ভাবনার কথা শুনে একজন অজানা ও অচেনা মানুষ দুঃখ বোধ করছে আর মায়ায় পড়ে গিয়েছে । কিন্তু তার মায়ার মধ্যে ভয় করবার কিছু নেই ।

অশেষ—বুঝলাম না ।

অলকা—আমি বিশ্বাস করি আপনি আমাকে এমন কোনও কথা বলতে পারেন না, বলবেন না, যে কথা বললে আমাকে অপমান করা হয় ।

অশেষ—কিছুই বুঝলাম না !

অলকা হেসে ফেলে—শৈলেশ্বরের আশা নষ্ট নয়, আপনি এমন কোনও দাবি আমার কাছে করবেন না জানি ।

অশেষ—এবার বুঝলাম ।

অলকার চোখ ছলছল করে ওঠে । —সত্যি কথা অশেষবাবু, শৈলেশ্বর যদি আমাকে ভুলেও যায়, তবু আমার মন ভুল করবে না । আমি তাকে ভুলতে পারব না ।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অলকা । অলকার ছলছলে চোখ দুটোও যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়েছে, একটু ভয়ও পেয়েছে যেন । —চলুন, এবার ফিরে যাই ।

অশেষ—কোথায় ?

অলকা—বিয়েবাড়িতে ।

অশেষ—না গেলে কি নয় ?

অলকার ছলছলে চোখ দুটো এইবার যেন হেসে ওঠে আর শুকনো খট্‌খটে হয়ে অশেষের মুখের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাতে চেষ্টা করে । —কী বললেন ?

অশেষ—আমার অনুরোধ, বিয়েবাড়িতে তোমার গিয়ে আর কাজ নেই । বরং...

অলকা—বলুন ।

অশেষ—বরং যদি কিছু মনে না করো, তবে চলো একটু দূরে বেড়িয়ে আসি ।

অলকার ভ্রূকুটি ধীরে ধীরে কঠোর হয়ে উঠতে থাকে । সন্দেহ করবার মত মানুষ নয় বলে যাকে মনে হয়েছিল, যার মায়ার মধ্যে ভয় করবার মত কিছু নেই বলে মনে হয়েছিল, সেই মানুষটা কি রকম অদ্ভুতভাবে অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ! অশেষের মুখটাকে নিদারুণ চক্রান্তের মত দেখাচ্ছে । বড়লোক মানুষ, বিলেত-ফেরত ডাক্তার, আলিপুরে বাড়ি, এই লোকটা বিমান চৌধুরীর মেয়েকে যেন রাত্রিবেলার আমোদের সঙ্গিনী বলে মনে করেছেন ! কত সহজে বলতে একটুও লজ্জা হল না, লোকটা মুখ খুলে একেবারে নির্ভয়ে ওর বুকের ভিতরের বিদ্‌ঘুটে ইচ্ছাটার কথা বলেই ফেলেছে ।

অনেক বই পড়ার অভ্যাস আছে যে মেয়ের, বিমান চৌধুরীর সেই মেয়ে অলকা চৌধুরীও একটা মনস্তত্ত্বের বই পড়তে পড়তে একদিন একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল । হিস্টিরিয়া নামে মনের রোগটার অদ্ভুত একটা চিকিৎসা আছে । সম্মোহিনী চিকিৎসা । ডাক্তার রোগীকে হিপ্নোটিক আবেশে অভিভূত করে তার মনের গোপন কথাগুলি জেনে নেয় ।

কিন্তু অশেষ ডাক্তারের মুখের ভাব দেখে মনে হয় না যে, সেরকম কোনও উপকারের ইচ্ছা নিয়ে ভদ্রলোক কথাটা বলে ফেলেছেন । কথাটাই বা কি কুৎসিত ! শুনে মাথাটা যে জ্বলতে শুরু করেছে ।

কিন্তু কে জানে, হয়ত সত্যিই কোনও উপকারের ইচ্ছা থেকে এরকম একটা বেহায়া ইচ্ছার কথা বলে ফেলেছেন ভদ্রলোক । কথা বলতে গিয়ে বিড়বিড় করে অলকা—আপনার ইচ্ছাটা কী ? আমার কোনও উপকার করবেন ?

অশেষ—হ্যাঁ !...তা আমাকে বিশ্বাস করে সত্যিই যদি এখন একটু দূরে বেড়িয়ে আসো, আর

বিয়ে-বাড়ির নিমন্ত্রণটা বাদ দাও তবে তোমার উপকারই হবে।

অলকা—আমাকে সত্যিই একটা হিস্টিরিয়ার রোগী বলে মনে করেছেন বোধ হয় ?

হেসে ফেলে অশেষ। —এখন সন্দেহ হচ্ছে, আমাকেই হিস্টিরিয়ায় ধরেছে।

অলকা—তার মানে ?

অশেষ—তা না হলে, তুমি সন্দেহ করবে, আশ্চর্য হবে, আর সন্দেহও বা করবে কেন ? কথাটা বলে ফেলবার সাহস পেলাম কী করে ?

অলকা রুক্ষস্বরে উত্তর দেয়। —সত্যিই বড় বেশি সাহস করে ফেলেছেন...যাক গে, সেজন্য কোনও দুঃখ নেই...এখন চলুন বিয়ে-বাড়িতে গিয়ে...

অশেষ—আমার অনুরোধ...।

অলকা—কী ?

অশেষ—চলো, একবার আমাদের বাড়িতে ঘুরে আসবে।

অলকা—আপনার বাড়ি বোধ হয় খুব বড় বাড়ি ?

অশেষ—নেহাত ছোট নয় !

অলকা—খুব সুন্দর বাড়ি নিশ্চয় ?

অশেষ—তা বলা যায়।

অলকা—অনেক দামি দামি আসবাবে সাজানো নিশ্চয়।

অশেষ—তা বটে।

অলকা—তাই ধারণা করেছেন যে বিমান চৌধুরীর মেয়ে আপনার বাড়ি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

অশেষ—একেবারেই না, অলকা চৌধুরীকে এত সাধারণ মেয়ে বলে আমি মনে করি না।

চমকে ওঠে অলকা চৌধুরীর নিঃশ্বাস। অশেষ ডাক্তারের কথার সুরের মধ্যে যেন একটা ভদ্রমনের, একটা সম্ভ্রমের দাবি মিষ্টি সুরে বেজে উঠেছে। অলকা চৌধুরীকে সাধারণ মেয়ে বলে মনে করে না, অলকা চৌধুরীর এতক্ষণের সন্দেহটাকেই লজ্জা দিয়ে কুণ্ঠিত করে দিচ্ছে অশেষ।

উত্তর দিতে গিয়ে এইবার অলকার নিঃশ্বাসের বাতাস যেন হাঁসফাস করে। —আপনি আমাকে বড় অসুবিধেয় ফেলেছেন অশেষবাবু।

অশেষ—কেন ?

অলকা—একদিনের আলাপের পর কোনও মেয়ে যদি কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে দূরে বেড়াতে চলে যায়, তবে...।

অশেষ—তবে কী ?

অলকা—তবে ভদ্রলোকই বা সেই মেয়ের সম্বন্ধে কী ধারণা করবেন আর সেই মেয়েই বা নিজের সম্বন্ধে কী ধারণা করবে ?

হেসে ফেলে অশেষ। —যদি সত্যিই বিশ্বাস কর যে, ভদ্রলোক কোনও খারাপ ধারণাই করবেন না, আর সেই মেয়েকে এমন কোনও কথা বলবেন না যাতে তার অপমান হতে পারে, তবে...।

অলকা হেসে ফেলে—তবে তো কোনও কথাই নেই। কিন্তু... তবু...মিছিমিছি বেড়াতে যাবার, আপনার বাড়িতে হোক কিংবা যেখানেই হোক, কোনও মানে হয় না।

অশেষ—মানে আছে। এখন বুঝতে না পার, পরে বুঝতে পারবে।

অলকা আশ্চর্য হয়ে তাকায়—মনে হচ্ছে, আমাকে সত্যিই কোনও নতুন খবর দিতে চান আপনি।

অশেষ—হ্যাঁ।

অলকা—শৈলেশ্বরের খবর ?

অশেষ—হ্যাঁ।

অলকার গলার স্বর কেঁপে ওঠে। —কোনও খারাপ খবর নয় তো অশেষবাবু ?

অশেষ—অ্যাঁ...না...খারাপ খবর কেন হবে ?

অলকা—শৈলেশ্বরের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে নিশ্চয়।

অশেষ—না।

অলকা—তবে!

অশেষ—তবু একটা খবর জানতে পেরেছি।

অলকা—তবে বলেই ফেলুন না।

অশেষ হাসে—না, এখানে বলব না। তুমি যদি আমার কথা না রাখো, তবে বলবই না।

অলকা বলে—চলুন তবে।

হ্যাঁ, খুবই বড় বাড়ি; আর সুখের বাড়িও বটে। কত দামি দামি শৌখিন আসবাবে সাজানো বাড়ি। আলিপুরের রাত্রিবেলার আলোছায়া বেশ সুন্দর। অশেষ ডাক্তারের বাড়ির যে ঘরের সোফার উপর বসেছে অলকা চৌধুরী সেই ঘরের ভেতরে চকচকে পিতলের টবের মধ্যে শখের ক্যাকটাস আর অর্কিডগুলিও চমৎকার।

কিন্তু বাড়িটা এত নীরব কেন? আধ ঘন্টার বেশি সময় পার হয়ে গিয়েছে, তবু এই বাড়ির বাতাসে মানুষের ভাষায় একটা ক্ষীণ কলরব, কিংবা কোনও হাসির সামান্য উচ্ছ্বাসও শুনতে পায়নি অলকা। বাড়িতে সত্যিই কি কেউ নেই? ভদ্রলোকই বা কোথায় গেলেন? এত আপ্যায়ন করে ঘরের ভিতরে নিয়ে এসে এই সোফার উপর অলকাকে বসিয়ে রেখে কোথায় সরে পড়লেন? এ কেমন ভদ্রতা?

ভদ্রলোক যে বলেছিলেন, তাঁর একটি বোন আছে। সেই বোনটিই বা কোথায়? কী যেন তার নাম? সুধা না সুমনা, এই রকম একটা নাম বলেছিলেন অশেষবাবু। আশ্চর্য, বাড়ির অন্য কোনও মহিলাও তো আসে না। সত্যিই এ বাড়িটা মহিলাবর্জিত কোনও বাড়ি নয় তো?

এই নীরবতা সহ্য হয় না। প্রথমে ঢুকতেই যে বাড়িকে বড় শান্ত বলে মনে হয়েছিল, এখন কেমন যেন সন্দেহ হয়, সেই শান্ততা একটা ছলনা, মনে হয় যেন একটা চক্রান্ত নীরব হয়ে রয়েছে।

চমকে ওঠে অলকা। চোখের চাহনি ভীরু হয়ে যায়, নিঃশ্বাসও এলোমেলো হয়ে বুকের ভিতরে যেন ফিসফিস করে—ভুল, ভয়ানক ভুল করে ফেলেছে চালাক-বোকা মেয়ে। অশেষ ডাক্তারের ইচ্ছা আর উদ্দেশ্যের কতটুকু খবর তুমি জান? অশেষ ডাক্তারকেই বা কতটুকু চেন? একজন অজানা-অচেনা ভদ্রলোকের মুখের কয়েকটি সহানুভূতির কথা শুনেই তাকে বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে একেবারে এক ট্যাক্সিতে চড়ে এই রাত্রিবেলায় ঢাকুরিয়ার সেই পুরনো বাগান স্ট্রিটের আলো-আঁধার থেকে এতদূরে আলিপুরে একটা বাগানবাড়িতে...।

হ্যাঁ, সন্দেহ হয়, এই বাড়ি এক শৌখিন বড়লোকের বাগানবাড়ি। ভদ্রলোকের মেয়ের সর্বনাশ করে সুখী হয়, সেইরকম এক ভয়ানক শৌখিনের রাত্রিবেলার বিলাসের স্বর্গ।

ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় অলকা। দরজার পরদা সরিয়ে বাইরের বাগানটার দিকে তাকায়। বারান্দায় চারটে বড় বড় আলোও যেন চোখ ঝলসানো চারটে বড় বড় চক্রান্তের ধাঁধাঁ। বুঝতে পারা যায় না সিঁড়িটা কোন দিকে।

এখনি ছুটে চলে যেতে পারা যায়। কিন্তু তারপর। ফটকটা কি বন্ধ করে রাখেনি অশেষ ডাক্তারের মত চতুর ডাকাত? এ ধরনের ভয়ানক মানুষের ও ধরনের ভুল হয় না। আটঘাট বেঁধে মানুষের সর্বনাশ করবার কায়দা ওদের অভ্যস্ত। এই তো কদিন হল, খবরের কাগজে এইরকমের একটা সর্বনাশের ব্যাপার নিয়ে একটা মামলার বিবরণ পড়েছে অলকা, ঠিক এই ধরনের কাণ্ড। এক ডাক্তার ভদ্রলোক এক বিবাহিতা মহিলাকে উপকারের প্রতিশ্রুতি, সহানুভূতি আর অতি ভদ্র-ব্যবহার দিয়ে মুগ্ধ করে নিয়ে, তারপর একদিন নেমন্তন্নের নাম করে এইরকম করে একটা বাগানবাড়িতে নিয়ে এসে...।

ছি-ছি, অলকা চৌধুরীর মত এত চালাক মেয়ে...যে মেয়ে তার জীবনের একমাত্র ভালবাসার মানুষ শৈলেশ্বরের সেই ইচ্ছার কথা শুনে চমকে উঠেছিল, ভয় পেয়েছিল, অস্বস্তি বোধ করেছিল, আর সরে গিয়েছিল, সেই মেয়ের প্রাণটা যে ভুল করে একটা মানুষখেকো বাঘের গ্রাসের কাছে এসে পড়েছে। অভিশাপ, নিতান্ত অভিশাপ।

অলকার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। মনে হয়, শৈলেশ্বরের সেদিনের দীর্ঘশ্বাসের ব্যথাটা অলকার

জীবনের অভিশাপ হয়ে আজ প্রতিশোধ নিতে চলেছে। ভালবাসার মানুষ শৈলেশ্বরও যে অলকার হাত ধরতে পারেনি, ধরতে দেয়নি অলকা, সেই অলকার হাত চেপে ধরবার জন্য একটা বর্বরের মতলব এখন বোধ হয় অন্য কোন ঘরে...কে জানে হয়ত ছাই-ভস্ম খেয়ে প্রচণ্ড মাতাল হয়ে গিয়েছে লোকটা।

অলকা চৌধুরীর চোখের করুণ চাহনিও যেন মাঝে হিংস্র হয়ে চিকচিকিয়ে ওঠে। অশেষ ডাক্তার নামে লোকটার কুমতলবের সব চেষ্টা কি আঁচড়ে কামড়ে আর খিমচে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া যায় না ? এরকম অসহায় অবস্থায় এ ছাড়া একটা মেয়ের পক্ষে আর কী করবারই বা সাধ্যি আছে ?

কিন্তু বর্বরটা কি এতই বোকা ? অলকা চৌধুরীর আঁচড়-কামড়কে ভয় পাবে, এরকম পশুই সে নয়। লোকটার হাতে ছুরি কিংবা পিস্তল থাকবে বোধ হয়। উপায় ? তবে কী উপায় হবে ?

অলকার চোখ দুটো অসহায় হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে। লোকটার মতলবের খপ্পর থেকে রক্ষা পাবার সহজ উপায় নেই।

কাঁদলে কোনও ফল হবে না। ভয় দেখালেও না। ছুরিবাজ একটা গণ্ডারের সঙ্গে হাতাহাতি করে বাধা দেওয়াও যে যায় না ! হ্যাঁ, মরে যাওয়া যায়। রাজি না হলে, লোকটা ছুরি মারবে, কিংবা গলা টিপে শ্বাস বন্ধ করে দিয়ে অলকার মূর্খ বিশ্বাসের পরিণাম পূর্ণ করে দেবে। অলকার লাস বাক্সোতে করে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে, যাক, তার বেশি তো আর কিছু হবে না।

কিন্তু এমন মরণ বড় ঘৃণ্য মরণ। মিছামিছি, একটা বাজে লোকের অনুরোধে ভুলে বিপদ ডেকে নিয়ে এসে শেষে আত্মহত্যা করা। ছিঃ ছিঃ, এ-কী হল !

কোনও ঘরে কি টেলিফোন নেই ? যদি থাকে তবে তো এখনি একবার শৈলেশ্বরকে এই বিপদের খবর জানিয়ে দেওয়া যায়। শৈলেশ্বর যদি গিরিডি বেড়াতে গিয়ে থাকে, তবে সোজা লালবাজারের পুলিশকে জানিয়ে দিতে পারা যায়।

এই তো পাশেই একটা ঘর, ঘরের ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু টেলিফোনের চিহ্ন নেই।

থাকবেই না তো ! লোকটা তো আর কাঁচা ক্রিমিন্যাল নয় ! এসব জঘন্য অপরাধ যাদের জীবনের মিশন, তারা ভাল করেই জানে যে,...।

না, আর দেরি করা উচিত নয়। ফটক বন্ধ আছে বলে মনে করে, এইরকম একটা অসহায় অবস্থা কল্পনায় বিশ্বাস করে নিয়ে একাকী এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনও অর্থ হয় না। এতক্ষণে চলে যাওয়া উচিত ছিল। ফটক যদি বন্ধ থাকে, থাকুক, অলকা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আর চিৎকার করে বাইরের মানুষকে ডাক দিয়ে...।

বাগানের শেষ প্রান্তের দিকে লক্ষ করে একটা দৌড় দিয়ে এগিয়ে যায় অলকা চৌধুরী, হ্যাঁ, এই তো নীচে নেমে যাবার সিঁড়িটা এখানে।

কিন্তু ও কী ! কিসের শব্দ ? যেন মানুষের ভাষায় একদল কলরব এই সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে আসছে।

দেখতেও পায় অলকা, চার-পাঁচ জনেরও বেশি হবে, হেসে হেসে কথা বলতে বলতে কতগুলি সুশ্রী মূর্তি উপরে উঠছে। চার-পাঁচ জন মহিলা বলে মনে হয়।

রুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে অলকা যেন নতুন একটা প্রহেলিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। আরও দেখতে পায়, অশেষ ডাক্তারও হেসে হেসে সবার পেছনে থেকে কী-যেন বলতে বলতে উপরে উঠছেন।

আগন্তুক ভিড় উপরে উঠে অলকা চৌধুরীর অপ্রস্তুত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে, পিছন থেকে আরও জোরে হেসে হেসে চেঁচিয়ে ওঠে অশেষ—আমি ঠিক সন্দেহ করেছিলাম কিনা, এখন স্বচক্ষে প্রমাণ দেখতে পেলেন তো মিনুদি ?

মিনুদি—তাই তো দেখছি। অলকার কাছে এগিয়ে এসে মিনুদি আস্তে আস্তে হাসেন—তুমি সত্যি একটু ভয় পেয়েছ বোধ হয় ?

অলকা বলে—আজ্ঞে।

মোটা-সোটা চেহারা, মাথার চুল সাদা-কালো, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া মিনুদি বলেন—হ্যাঁ,

একটু ভয় পাওয়াই তো উচিত। অশেষের খেয়ালের তো কোনও মাথামুণ্ডু নেই!

অশেষ—আপনি আরও একটু কষ্ট করুন মিনুদি।

মিনুদি—কী?

অশেষ—আপনি নিজের হাতে চা তৈরি করুন। আর...।

রমা, নমিতা আর বীণা একসঙ্গে প্রশ্ন করে।—আমরা কী করি বলুন তো অশেষদা?

অশেষ—রমা খাবার তৈরি করো। বীণা সেতার বাজাও, আর নমিতা গল্প করে করে অলকা চৌধুরীকে আশ্চর্য করে দাও।

—বহুত আচ্ছা। রমা নমিতা আর বীণা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে।

অলকা চৌধুরীর অপ্রস্তুত চোখের চাহনিটা যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছে। কে এরা? অশেষ ডাক্তারের এমন সুন্দর একটি দিদি, আর এতগুলি সুন্দর বোন এতক্ষণ কোথায় ছিল? কিন্তু... অশেষ ডাক্তার যেন বলেছিল, ওর একটি মাত্র বোন।

অলকা চৌধুরীর বিস্ময়ের নীরব প্রশ্নগুলি যেন শুনতে পেয়েছে অশেষ। অশেষ বলে—এতক্ষণ ধরে বোধ হয় আমার অভদ্রতার ব্যাপার দেখে তুমি খুবই আশ্চর্য হয়েছ?

অলকা—কিসের অভদ্রতা?

অশেষ—এই যে তোমাকে এখানে বসিয়ে রেখে এতক্ষণ পরে আসছি।

অলকা হাসতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। হাসবার সাহসটা যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। বার বার এতক্ষণের পঙ্কিল সন্দেহের কথাগুলি শুধু মনে পড়ে। এবং মনে পড়তেই লজ্জা পেয়ে যেন মুষড়ে যাচ্ছে অলকার কথা বলবার ভঙ্গিটাই।

অশেষ বলে—আমার দোষ নয়, এদের দোষ। এই যাচ্ছি এই যাচ্ছি করে এতক্ষণে উঠলেন। নমিতার তো মুখ মুছতে বিশ মিনিট সময় লেগেছে।

মিনুদি অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—কী করব বল? খিচুড়ি চাপিয়েছিলাম, আধসেদ্ধ করে নামিয়ে রেখে আসতে তো পারি না!

অশেষও এইবার অলকার বিস্ময়ের আর একটা নীরব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয়।—ইনি হলেন আমাদের মিনুদি। পাড়ার দিদি, কিন্তু আপন দিদির চেয়ে কম কিসে তা জানি না! আর...।

রমা, নমিতা ও বীণার দিকে তাকায় অশেষ—আর এরা হল, আমার পাড়াতুতো বোন। এরাও আমার আপন বোনের চেয়ে যে কোন হিসাবে কম...।

রমা বলে—এই হিসাবে কম যে, সুধার জন্যে ঝাল-বাদাম আনতে কোনও দিন আপনি ভুলে যান না; আর আমাদের জন্যে ভুলেও কোনও দিন...।

অশেষ—সুধা এখন এখানে থাকলে এর জবাব দিত।

বীণা—সুধা ফিরবে কখন?

অশেষ—আজ কি আর ফেরে? বিয়ে শেষ হতে হতে রাত এগারোটার কম হবে না। তারপর হেন-তেন আর কত মাতামাতি আছে। ওসব শেষ হতে হতে বোধ হয় রাত্রি শেষ হয়ে যাবে। কাজেই...।

নমিতা—আর বড় মাসিমা?

অশেষ—উনিও তো ভয়ানক ব্যস্ত। বিয়ের বাড়ির মিষ্টির ভাঁড়ারের চার্জ নিয়েছেন খুড়িমা। উনি বোধ হয় কাল বিকেলে ফিরবেন। মেয়ে বিদায়ের সময় পেট ভরে কেঁদে নেবার সুখটা ছেড়ে আসতে পারবেন কেন?

অলকা বলে—বড় মাসিমা কে?

অশেষ—আমারই বড় খুড়িমা। আমার বয়স যখন সাত বছর, তখন আমার মা মারা যান। আর, ঠিক সেই সময় বড় খুড়িমার পাঁচ বছর বয়সের ছেলেটি মারা যায়। তার পর থেকে আমিই বড় খুড়িমার ছেলে।

অলকা—আপনার বাবা?

অশেষ—আমার বয়স যখন তিন বছর, তখন তিনি মারা যান। তবু এখনও আমার মনের

ভেতরে একটা ঝাপসা ছবি দেখতে পাই। লাল ভেলভেটের টুপি মাথায় দিয়ে ছোট্ট একটা ছেলে একটা পনির পিঠের উপর বসে এক হাতে কার যেন গলা জড়িয়ে ধরে আছে। তার চোখে চশমা আছে।

মাথা হেঁট করে কী যেন ভাবতে থাকে অলকা। মিনুদি আবার হেসে ওঠেন—তুমি কিছু মনে করো না...কী-যেন তোমার নাম ?

অলকা—অলকা।

মিনুদি—কিছু মনে করো না অলকা।

অলকা—একথা কেন বলছেন ? মনে করবার কী আছে ?

মিনুদি—এই যে অশেষের কাণ্ড। তোমাকে নেমন্তন্ন করে বসে আছে, অথচ এদিকে কোনও ব্যবস্থাই নেই।

অলকা—উনি বুঝি এই কথা আপনাদের বলেছেন ?

অশেষ—হ্যাঁ, মিথ্যে কথা আর বলব না, আমি ঠিক এই কথাই মিনুদিকে বলেছি। . কিন্তু ...তুমিই বলো না, একেবারে মিথ্যে কথা বলেছি কি ?

হেসে ফেলে অলকা—না।

মিনুদি—হাসবারই কথা। অশেষের এইরকম এক একটা কাণ্ড করা অভ্যাস।

অলকার চোখের চাহনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়।—তার মানে ? এরকম আরও কাণ্ড বুঝি অনেকবার..।

মিনুদি—হ্যাঁ, এইতো গত মাঘ মাসে হঠাৎ বিকেল বেলা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এক বুড়ো ভদ্রলোক আর তাঁর মেয়েকে নিয়ে এসে..।

অলকা—কোথায় ?

মিনুদি—এখানে। বিকেল বেলা মেয়েটাকে নিয়ে এল। তার পরেই গাড়ি করে বেরিয়ে গেল। আর সন্ধ্যা হতেই এক পুরুত আর একরাশ দানসামগ্রী নিয়ে এল। তার পরেই আবার বের হয়ে গিয়ে এক ঘন্টার মধ্যে এক বর আর এক দল বরযাত্রী নিয়ে এল অশেষ। বিয়ে হয়ে গেল।

অলকা—ঠিক বুঝলাম না।

মিনুদি—ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য কলকাতায় এসে এক বড়লোক কুটুমবাড়িতে ঠাঁই নিয়েছিলেন। আশা ছিল বড়লোক কুটুম মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু সে তো দূরের কথা, এক মাস পরে ঘর থেকে সেই মেয়ে আর মেয়ের বাপকে তাড়িয়ে দিলেন। তার পর অশেষের সঙ্গে ওঁদের দেখা। শেয়ালদা স্টেশনে বসে মেয়ের বাপ কাঁদছিল।

এতক্ষণে বুঝতে পারে অলকা ; অশেষ ডাক্তারের খেয়ালটা হল মহত্ত্ব দেখাবার খেয়াল। অলকা চৌধুরীর বুকের ভিতরে একটা লজ্জার বেদনা মোচড় দিয়ে ওঠে। কোনও ভুল নেই, বিমান চৌধুরীর মেয়ে অলকা চৌধুরীকেও ঠিক এই ধরনের উপকার করবার জন্য অশেষ ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। শৈলেশ্বরের কথা শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অলকাকে এখানে নিয়ে এসেছে। অলকাও শৈলেশ্বরের খবর শোনবার পিপাসায় ব্যাকুল হয়ে অশেষ ডাক্তারের সঙ্গে এখানে এসেছে। জীবনের ভালবাসার সমস্যায় অশেষের কাছ থেকে একটা সাহায্য নেবে অলকা। সাহায্য করবে অশেষ। অশেষের খেয়ালের গর্ব ও গৌরব তৃপ্ত হবে।

অশেষ ডাক্তার বলেছেন, শৈলেশ্বরের ভাল খবর শোনাবেন। কিন্তু এখানে আসামাত্র সে খবর না শুনিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে একজন মহিলাকে ডেকে নিয়ে এসে এরকম একটা কপট নিমন্ত্রণের হুল্লোড় করবার কী দরকার ছিল ?

শুধু উপকার ! নিঃস্বার্থ মহত্ত্ব ! বাঃ, খুব উঁচুদরের অহংকারের মানুষ বলে মনে হয় ; এবং, এই অহংকারের সান্নিধ্য থেকে এই মুহূর্তে ছুটে চলে যেতেও ইচ্ছে হয়।

মিনুদি চা তৈরি করতে অন্য ঘরে চলে যান। রমা খাবার করবার জন্য আর একদিকে চলে যায়। বীণা সেতার খোঁজবার জন্য সুধার ঘরের ভিতরে ঢোকে। আর, নমিতা সেই সাজানো ঘরের ভিতরে ঢুকে সোফার উপরে বসে ডাকতে থাকে—এঘরে চলে আসুন অলকাদি, যদি গল্প শুনতে চান।

শুধু অশেষ আর অলকা, বারান্দার উপরে শুধু দু'জনের ছায়া তবু স্তব্ধ হয়ে থাকে।

অশেষ বলে—নমিতা তোমাকে ডাকছে।

অলকা—শুনেছি। হ্যাঁ একটা কথা...।

অশেষ—বলো।

অলকা—আপনি হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে এঁদের ডেকে আনলেন কেন ?

অশেষ—আনলাম এই কারণে যে, অর্থাৎ বাড়িটাকে এমন নির্জন দেখে তুমি হয়ত মনে করবে যে...তার মানে...।

অলকা—কী দরকার ছিল ?

অশেষ—কী বললে ?

ছোট একটা ভ্রূকুটির কাঁপুনি চাপা দিতে চেষ্টা করে অলকা—আপনি যে কথা বলার জন্যে এখানে আমাকে নিয়ে এসেছেন, সে কথা বলে দিলেই তো ঝঞ্ঝাট মিটে যেত।

অশেষ—বলবই তো। কিন্তু...একটু দেরি করে বলব, শুধু এই জন্যে...।

অলকা—এরকম শখের দেরির কোনও মানে হয় না !

অশেষ—তোমার কি সত্যিই খুব খারাপ লাগছে ?

অলকা—লাগছে বই কি !

অশেষ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকায়। কিন্তু অলকা চৌধুরীর ছায়াটা আবার বিব্রতভাবে চমকে ওঠে। আবার ডাক দিয়েছে নমিতা—গল্প শুনে যান অলকাদি।

অশেষ বিব্রতভাবে যেন কৈফিয়তের সুরে বলে—ব্যাপারটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। তুমি একটু বুঝে দেখো। আমি তোমার খুব বেশি পরিচিত নয় বলেই...।

অলকা—কী ?

অশেষ—তুমি আমার বাড়িতে এসেছ, অথচ বাড়িতে বড় খুড়িমা নেই, সুধাও নেই। সুতরাং, তুমি যাতে কোনও অস্বস্তি বোধ না করে কয়েকটা ঘন্টা এখানে থাকতে পারো, সেইজন্যেই মিনুদি আর ওদের ডেকে এনেছি।

হেসে ফেলে অলকা—আরও স্পষ্ট করে সত্যি কথাটা সোজা বলে ফেলুন না।

অশেষ—সত্যি কথা কি বলছি না ?

অলকা—না। আপনার অস্বস্তি হত বলেই আপনি বাইরে থেকে মহিলাদের ডেকে নিয়ে এসেছেন। আমার সামনে একা বসে থাকতে আপনার মনে নিশ্চয় ভয় আছে। আপনি মস্ত বড়...অতি মহৎ...বেশ বড় অহংকারের মানুষ। আপনি বোধ হয় সন্দেহ করেন যে, অলকা চৌধুরীর মত মেয়ে আপনার মত মানুষের কাছে একটা নির্জন বাড়িতে কিছুক্ষণ বসে থাকলেই আপনার কাছে একেবারে...ছিঃ।

বারান্দা ছেড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে সোফায় গিয়ে নমিতার পাশে বসে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে অলকা।

নমিতা বলে—এ বাড়িতে একবার বেশ কিছুদিন ধরে একটা ভৌতিক কাণ্ড হয়েছিল। ভৌতিক কাণ্ড সাধারণত রাতের বেলা হয় বলে শুনেছিলাম, কিন্তু এ বাড়িতে যেটা হয়েছিল সেটা সব সময়ের কাণ্ড ! সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত, নিঝুমরাত, শেষ রাত...সব সময়।

রুমাল দিয়ে কপাল মুছে নমিতার মুখের দিকে একবার তাকায় অলকা, এবং তারপরেই যেন আনমনা হয়ে যায়।

নমিতা—একটা করুণ কান্নার স্বর। অদ্ভুত রকমের করুণ। শুনলে মায়াও লাগে, আবার বেশ ভয় ভয় করে। দোতলার যেকোনও ঘরের ভিতর বসলেই একটা করুণ কান্নার স্বর শোনা যেত। স্বরটা যেন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, কাছে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে যেন ডুকরে উঠছে, উতলা হচ্ছে। অশেষদার এক সায়েনটিস্ট বন্ধু একদিন একটা টেপ-রেকর্ডার নিয়ে এসে সেই কান্নার স্বর রেকর্ড করে নিয়ে চলে গেলেন রিসার্চের জন্য। কত লোক এল, আর সেই কান্নার স্বর শুনে আশ্চর্য হয়ে চলে গেল। তারপর একদিন...আশ্চর্য ! একদিন সন্ধ্যাবেলা অশেষদা...।

অলকার চোখ দুটো যেন হঠাৎ আতঙ্কে শিউরে ওঠে,—কী হল আপনাদের অশেষদার ?

নমিতা—সন্ধ্যাবেলা ছাদে উঠেই চেঁচিয়ে উঠলেন অশেষদা, ইউরেকা, ইউরেকা। আমরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম ; এসে দেখলাম, অশেষদা ছাদের উপর একটা মোটা বাঁশের খুঁটোর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। কাপড় মেলবার জন্য দড়ি বাঁধা ছিল সেই খুঁটোতে।

অলকা—তা তো হল, কিন্তু এর জন্য ইউরেকা কেন ?

নমিতা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—সেই মোটা খুঁটোর বাঁশটা দু'তিন জায়গায় ফাটা-ফাটা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই বাঁশ হয়েছিল বাঁশি। একটু হাওয়া দিলে ফাটা বাঁশের ভিতর দিয়ে সেই হাওয়া কান্নার স্বর হয়ে কঁকিয়ে উঠত।

অলকা হাসে—বেশ গল্প !

নমিতা—আঃ, এখনই সব হাসি হেসে ফেলবেন না, গল্পের শেষ এখনও হয়নি, আরও আছে।

অলকা—বলুন।

নমিতা—বাঁশের কাণ্ড তো এদিকে ধরা পড়ে গেল, কিন্তু ওদিকে, তার মানে অশেষদার সেই সায়েনটিস্ট বন্ধুর একটা গবেষণার তত্ত্ব মস্ত বড় প্রবন্ধ আকারে একটা পত্রিকায় বের হয়ে গেল। সায়েনটিস্ট লিখেছিলেন, ব্যাপারটা পৃথিবীর নিকটস্থ কোনও গ্রহ থেকে পৃথিবীতে সাংকেতিক শব্দ পাঠাবার চেষ্টা বলে মনে হয়। সেই গ্রহে মানুষ আছে।

হাসির উচ্ছ্বাস থামাতে চেষ্টা করে অলকা বলে—সায়েনটিস্ট ভদ্রলোক পরে নিশ্চয় খুব লজ্জিত হয়েছিলেন।

নমিতা—তা জানি না, তবে অশেষদাকে সেদিন জিজ্ঞাসা কবেছিলাম, সাযেনটিস্ট বন্ধু এখন কিসেব গবেষণা করছেন ? অশেষদা বললেন, বন্ধু ভাল মাইনেতে সরকারেব একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কমিটির উপদেষ্টা হয়েছেন। হ্যাঁ...একবার অশেষদাব একটা গোপন ব্যাপার হাতে হাতে ধরে ফেলেছিলাম, কিন্তু শেষে হঠাৎ . ।

অলকা—কী বললেন ?

নমিতা বলে—গোপন প্রেমের ব্যাপার।

অলকার চোখ শিউরে ওঠে। — কী বললেন ?

একদিন আমি নমি বীণা আর রমা এখানে এসে দেখি, সুধা বাড়িতে নেই। অশেষদা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, তোমরা কিছুক্ষণ এখানে বসো, সুধা এখনি ফিরবে। বলেই কোথায় যেন চলে গেলেন অশেষদা ! রমা টেবিলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল। কী ব্যাপার ? দেখি, অশেষদার কাছে লেখা একখানা খামের চিঠি টেবিলের উপর পড়ে আছে, মেয়েলি হাতের লেখা ঠিকানা।

অলকা— বসুন, মেয়েলি হাতের লেখা বলে আপনাদের সন্দেহ হয়েছিল !

নমিতা— সন্দেহ কেন হবে ? খামটা খোলাই ছিল। বীণা খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে নিয়ে তখুনি পড়তে শুরু করে দিল। কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে লেখা এক মহিলার চিঠি, নাম পামেলা ডানকান। বেচারা লিখেছে, প্যারিসের সেই দু'বছরের স্মৃতি ভুলে যাবার সাধ্য আমার নেই। তাই ইন্ডিয়াতে এসেছি, শুধু তোমাকে একবার দেখে ফিরে চলে যাব। কাল বিকেলে ঠিক চারটে ত্রিশ মিনিটের সময় ইডেন বাগানের গেটের কাছে যেন তোমাকে দেখতে পাই। আমি তোমার কাছ যাব না, তোমাকে একটুও বিরক্ত করব না। শুধু দূর থেকে একবার দেখে নিয়ে, আমার তপ্ত চোখের জল নির্মম হাতে মুছে নিয়ে চলে যাব।

কপালটাকে একহাতে টিপে ধরে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে অলকা। মাথাটা বোধ হয় হঠাৎ ভার-ভার হয়ে ঝুঁকে পড়েছে।

নমিতা বলে— আমরা তিন জনে বিকেল তিনটে হতেই ইডেন গার্ডেনের গেট থেকে একটু দূরে গাছের আড়ালে লুকিয়ে আর জটলা করে বসে রইলাম। পামেলা ডানকানের মুখটা দেখবার জন্য সে যে কি-ভয়ানক লোভ মনের ভিতর ছটফট করছিল, আপনি ধারণা করতে পারবেন না অলকাদি। তা ছাড়া, অশেষদার মুখটাও দেখবার জন্য...কী বলব..যেমন লোভ হচ্ছিল, তেমনি ভয় হচ্ছিল, আবার মাঝে মাঝে হাসিও পাচ্ছিল। বিলাতের প্রিয়াকে মুখ দেখাবার জন্য অশেষদা গেটের

কাছে এসে দাঁড়াবেন। গম্ভীর হয়ে, হয়ত চোখ ছলছল করে এদিক-ওদিক তাকাবেন। অশেষদার জীবনের একটা গোপন রহস্যের ছবি স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া যাবে...উঃ, আমাদের আর তর সইছিল না।

অলকা—তারপর কী হল ?

নমিতা— আমাদের রাগ হতে শুরু হল। রেগে রেগে শেষে হতাশ হয়ে পড়লাম।

অলকা— কেন ?

নমিতা— না পামেলা ডানকান, না অশেষদা, কারও মুখ দেখবার সৌভাগ্য হলো না। হতাশ হয়ে যখন উঠব উঠব করছি, তখন একটা ভিখিরি গোছের ছেলে এসে রমার হাতে একটা চিঠি দিল— বাবু এই চিঠি আপনার হাতে দিতে বললেন।

রমা আশ্চর্য হয়— আমার হাতে ? কেন ? কোন বাবু ? তাঁর নাম কী ?

ভিখিরী গোছের ছেলেটা বলে— ওই যে...দেখুন না, ওই যে চটপট ভেগে যাচ্ছেন, ওই বাবু।

দেখলাম, হ্যাঁ অশেষদাই বটে। গার্ডেনের গেট থেকে বেশ কিছু দূরের রাস্তার কিনারা ধরে যেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলে যাচ্ছেন অশেষদা। আমি বললাম— চিঠিটা খুলে একবার পড়েই দেখ না রমা।

চিঠি খোলা হল। চিঠির ভিতরে এক টুকরো কাগজে শুধু ছোট্ট দুটি কথা বড় বড় হরপে লেখা— এপ্রিল ফুল।

অলকার চোখের চাহনিও যেন অপ্রস্তুত হয়ে ফ্যালফ্যাল করে। নমিতা হেসে ওঠে।— হ্যাঁ দিনটা পয়লা এপ্রিলই ছিল। কিন্তু আমাদের সেকথা মনেই পড়েনি। তা ছাড়া সন্দেহও করতে পারিনি যে, অশেষদা এত চমৎকার ফন্দি করে আমাদের জব্দ করবার মতলব করেছিলেন।

অলকা বিড়বিড় করে— তা হলে বলুন, পামেলা ডানকান টানকান একেবারে ভুয়ো ব্যাপার।

নমিতা আশ্চর্য হয়ে তাকায়— আপনি তা হলে এতক্ষণ শুনলেন কী ?

অলকা লজ্জিত হয়—শুনেছি, সব শুনেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, পামেলা ডানকানের চিঠিটা কোথা থেকে এল ?

নমিতা হেসে লুটিয়ে পড়ল— আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি, চিঠিটা অশেষদার নিজের হাতের লেখা ছিল ; একদিন আগে চিঠিটা লিখে ডাকে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন। ...আমরাও এত বোকা যে, অশেষদার হাতের লেখার চেহারা জানা থাকতেও বুঝতে পারিনি যে...।

অলকা হাসে— সন্দেহ ব্যাপারটাই এরকমের।

নমিতা—কী ?

অলকা—মানুষকে বোকা বানিয়ে ছাড়ে। একবার মনে সন্দেহ ঢুকলে বুদ্ধিসুদ্ধি এলোমেলো হয়ে যায়।

নমিতা— সত্যি কথা। গত বছর আমরা রাঁচি বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, তার পাশের বাড়িতেই এক ভদ্রলোক থাকতেন। বাড়িতে কোনও মহিলা ছিল না। শুনেছিলাম ও বাড়িতে ওই ভদ্রলোক ছাড়া শুধু একজন চাকর থাকে। ভদ্রলোক আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন।

অলকার চোখে আতঙ্কের ছায়া ছমছম্ করে।—কী বললেন !

নমিতা— ভদ্রলোক বলতে গেলে সারা দিনের মধ্যে পনেরো ঘণ্টা তাঁর ঘরের জানালার কাছে বসে আমার ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যায়...মাঝে মাঝে মাঝরাতেও ঘুম থেকে উঠে জানালার কাছে দাঁড়াতে গিয়েই দেখেছি, ভদ্রলোক আমার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। শেষে জানালা আর খোলা রাখতাম না।...দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা ! মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে জানালাটা খুলে দিতাম, কিন্তু কি আশ্চর্য ! দেখতাম, ভদ্রলোক ঠিক সেইভাবে একেবারে অপলক চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

অলকা— লোকটাকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিলেই পারতেন।

নমিতা— তা'ও চেষ্টা করেছিলাম ; কিন্তু চেঁচিয়ে কথা বলতে গিয়েই থমকে যেতাম। বিশ্রী

লজ্জা আর রাগ হত। কোথাকার কে একটা বেহায়া অভদ্র লোক, তার চোখের তাকানিকে এত পরোয়া করবারই বা কি আছে ? কিন্তু মাঝে মাঝে চোখ পাকিয়ে লোকটাকে শাসিয়ে দিতাম। কি আশ্চর্য, বেহায়া লোকটা হেসে ফেলত। শেষে একদিন......।

নমিতার মুখটা হঠাৎ যেমন লজ্জিত তেমনই করুণ হয়ে যায় ! অলকা ব্যস্ত হয়ে ওঠে !—শেষে একদিন কী হল, বলুন।

নমিতা— মেজদা একদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাশের সেই বাড়ির জানালার কাছে বসে থাকা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন— কী ট্র্যাজেডি ! আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম— তার মানে ? মেজদা বললেন, ভদ্রলোক অন্ধ। দুটো চোখই পাথরের চোখ।

নমিতার করুণ মুখ আরও করুণ হয়ে ওঠে। —ভেবে দেখুন অলকাদি, একটা মানুষকে মিছিমিছি সন্দেহ করে কত যাচ্ছেতাই কথাই না ভেবেছি।

অলকা— তা আপনারই বা দোষ কী ? আপনি জানতেন না বলেই না...।

নমিতা— কিন্তু আমি একটা কথা বেহায়ার মত আপনার কাছে বলে দিতে পারি অলকাদি।

অলকা— বলুন।

নমিতা— আসল ভুল কোথায় জানেন ? সন্দেহ করতে ভাল লাগে। ওটা আমাদের একটা অহংকারের ভাব।

নমিতার গল্প-বলা আসরের মনটা শেষের দিকে যেন মুষড়ে পড়েছে, বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যায় অলকা। নমিতার গল্পের শেষ কথাটা যেন অলকার বুকের ভিতরে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে।

অশেষ ডাক্তারকে সন্দেহ করবার পর এখন যে লজ্জা অনুভব করতে হচ্ছে, সে লজ্জার মধ্যে একটা জ্বালাও যেন আছে, কারণ সন্দেহটা ভয়ানকভাবে অপ্রস্তুত হয়েছে। আর, সেই সঙ্গে অলকার প্রাণটাও অপমানিত হয়েছে।

অপমান বৈকি ! দুটো ঘণ্টা এই বাড়িতে অলকার চোখের সামনে একা বসে থাকতে চায় না অশেষ, বড় বেশি সাবধান। তাই বাড়ির বাইরে গিয়ে পাড়ার দিদি বোনদের ডেকে নিয়ে এসেছে।

জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, এরকম একটা কাণ্ড করলেন কেন আপনি ? অশেষ ডাক্তারকে এখনি একবার আড়ালে পেতে ইচ্ছে করে, আর সোজা প্রশ্ন করতেও ইচ্ছা করে,— আমার সম্পর্কে আপনার মনে যখন এত ভয়, তখন আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন ? উপকার করতে চান, শৈলেশ্বরের খবর দিতে চান, সেটা তো পুরনো বাগান স্ট্রিটের সেই আলো-ছায়ার কাছেই বলে দিতে পারা যেত। এরকম একটা নাটকীয় কাণ্ড করবার কী দরকার ছিল ?

কিন্তু-আর যে কোনও কাণ্ডই করুন না কেন অশেষ ডাক্তার নামে এই ভদ্রলোক, এতক্ষণের মধ্যে একবারও এই ঘরের ভিতরে আসেননি। এখন তো নমিতা এখানে আছে ; চক্ষুলজ্জার কোনও কারণই নেই। অনায়াসে এখানে এসে ভদ্রতার খাতিরেও দুটো কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তা'ও না ! কোথায় সরে পড়েছেন কে জানে ?

অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে নমিতা বলে— আপনি কী-যেন ভাবছেন।

অলকা— না, তেমন কিছু না। ভাবছি, অশেষবাবু আবার খেয়ালের ঝোঁকে বাড়ির বাইরে কোথায় চলে গেলেন না তো ?

নমিতা হাসে— আশ্চর্য নয় !

বাড়ির বাইরে নয় ; নীচের তলায় একটি ঘরে চেয়ারের উপর চুপ করে বসে আছে অশেষ। মাঝে মাঝে যেন একটা অস্বস্তির জন্য ছটফট করে ওঠে, তারপরেই পায়চারি করে বেড়ায়।

এই প্রথম নিজের মনের সঙ্গে যেন একটা জেদাজেদি ঝগড়ার মধ্যে পড়েছে অশেষ। পুরনো বাগান স্ট্রিটের বিমান চৌধুরীর মেয়ের জীবনের সুখ-দুঃখের সমস্যা নিয়ে এত চিন্তা আর এরকম নির্লজ্জ ছুটোছুটির অর্থ কী ?

অলকা চৌধুরীকে ভাল লাগে কি ? লাগে বইকি ! অস্বীকার করার অর্থ হয় না। অলকা চৌধুরীকে বিয়ে করে চিরকালের জীবনসঙ্গিনী করে নিতে ইচ্ছে করে ? ইচ্ছে করলে দোষ কী ? মনে

মনে স্বীকার করে অশেষ, বিমান চৌধুরীর মেয়ের উপর এত বেশি মায়ায় পড়ে যাবার এই একটি অর্থ হতে পারে, অলকার ওই গম্ভীর সুন্দর মুখটাকে কাছে পাওয়ার জন্য অশেষের প্রাণটা লোভী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সেজন্য এত চিন্তিত হবার কী আছে ? এই মুহূর্তে অলকাকে একটি কথা শুনিয়ে দিতে পারে অশেষ, যে কথা শোনাবার পর অলকার ভালবাসার মানুষ শৈলেশ্বর অলকার কাছে ঘৃণ্যতম মানুষে পরিণত হয়ে যাবে। শৈলেশ্বরের কপট ভালবাসার ইতিহাস স্মরণ করে নিজের মূর্খতাকে ধিক্কার দেবে। হয়ত চেঁচিয়ে উঠবে, কেঁদে ফেলবে অলকা। শৈলেশ্বরের নিষ্ঠুরতার রকম দেখে অলকার বুকের সব নিঃশ্বাসের গর্ব লুটিয়ে পড়বে। তখন, অনায়াসে অলকার হাত ধরে অলকাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে অশেষ। আর, অলকা অনায়াসে অশেষের হাত ধরে শান্ত হতে চেষ্টা করবে। তারপর..তারপর অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে অশেষের আশার সংকেত বুঝে ফেলতে একটুও কি দেরি করবে অলকা ? খুশি হবে না কি অলকা ?

কিন্তু ঘটনাটা কল্পনা করতেই অশেষের মন যেন ছোট হয়ে যায়। এভাবে অলকার ভালবাসা পাওয়াতে কোনও গর্ব নেই, জয়ের আনন্দ নেই, তৃপ্তি নেই। জীবনে শৈলেশ্বরকে পাওয়া গেল না, অতএব অশেষ। নাঃ, অলকার ভালবাসার এরকম একটা কারবারি রূপ দেখবার জন্য অশেষের মনে কোনও লোভ নেই।

শুধু অলকা চৌধুরীর ভালবাসা নয় ! ভালবাসার গর্বও জয় না করতে পারলে যে কিছুই ভাল লাগবে না। শৈলেশ্বরের উপেক্ষায় ধুলোমাখা হয়ে অসহায় হয়ে যাবার পর অলকার মন অশেষকে যে ভালবাসা দিয়ে সুখী হতে চাইবে, সে ভালবাসা সত্যিই ভালবাসা কিনা সন্দেহ ! সে ভালবাসা অলকার নিজের উপর নিজের ভালবাসা। অশেষ নামে এই দু'দিনের পরিচিত মানুষের উপর ভালবাসার ব্যাপার নয়।

নিজের মনের এই অদ্ভুত সাধের ভাষা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে লজ্জিতও হয় অশেষ। বড় বেশি অহংকারের স্বরে কথা বলছে মনটা। কিন্তু তুমিও ভেবে দেখো অলকা...অশেষের মনের ভিতর যেন জটিল একটা তর্কের গুঞ্জন এলোমেলো হয়ে ছুটোছুটি করে...শৈলেশ্বরের অমানুষিক ব্যবহারের খবর শুনে দুঃখিত হয়ে, হতাশ হয়ে আর শূন্য হয়ে যাবার পর, আমার মুখের দিকে পিপাসিতের মত তাকিয়ে থাকা যে তোমারও গর্বের পরাজয়, তোমার অপমান। তোমাকেও কত ছোট মনে হবে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আরও একটা কথা, যেটা নিতান্ত মায়ার কথা। শৈলেশ্বরের সঙ্গে আজ ত্রিদিববাবুর মেয়ের বিয়ের খবরটা এখনই যদি অলকাকে বলে দেওয়া যায়, তবে বেচারা যে আশ্চর্য হয়ে বুকফাটা অপমানের আঘাতে এখনি আছড়ে পড়বে। নিজের ভুলের যন্ত্রণা, আর প্রতারকের নির্মমতার কথা ভেবে মনটাকে পোড়াবে। বেচারাকে এই অভিশাপের জ্বালা সহ্য করবার দুর্ভাগ্যে ফেলবার দরকার কী ?

এমন কি হয় না, শৈলেশ্বরের সঙ্গে ত্রিদিব বাবুর মেয়ের বিয়ের খবর শুনে হেসে উঠবে অলকা চৌধুরী ? একটুও দুঃখিত বা ব্যথিত হবে না ! বরং, সে খবর শুনে অলকা চৌধুরীর চোখে এক অদ্ভুত কৌতুকের আলো ঝিকমিক করে হেসে উঠবে।

অশেষের অদৃষ্টের একটা পরীক্ষা দেখা দিয়েছে মনে হয়। অলকা চৌধুরীর ভালবাসা জয় করতে গিয়ে যদি হার মানতে হয়, তবে সে অপমান চিরকালের ক্ষত হয়ে অশেষের বুকের ভিতর লুকিয়ে থাকবে। জীবনে কোনও নারীর মুখের দিকে তাকাবার সাহস আর হবে কি না সন্দেহ !

অশেষের অনেক রকমের খেয়ালের কাণ্ড দেখেছে মিনুদি, দেখেছে নমিতা, বীণা, আর রমা। কিন্তু অশেষের আজকের খেয়ালের কাণ্ডটাকে কেমন যেন সন্দেহ করছে ওরা সবাই। মিনুদি আশ্চর্য হয়ে বলেছে— সে কি ? এ কেমন অদ্ভুত নেমন্তন্ন। রমা অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মুখ টিপে হেসেও ফেলেছে— আঃ, বেচারা অলকা চৌধুরী যদি এরকম একটা হঠাৎ নেমন্তন্নে আসতে রাজি হয়ে যায়, তবে আমাদের আশ্চর্য হবার কী আছে ?

বীণা বলেছিল— মোট কথা, অশেষদা একটা সমস্যায় পড়েছেন, সে সমস্যায় উনি আমাদের সাহায্য চাইছেন।

এরা যা সন্দেহ করেছে, তা যদি পরিণামে সত্যি না হয়, তবে যে এতগুলি মানুষের চোখের কাছেও ছোট হয়ে যাবে অশেষ ? এই পাড়ার সব অন্তঃপুরের গল্পের একটা নতুন বিষয় হবে। অশেষের পৌরুষের গৌরবকে করুণা ক'রে আর মিষ্টি কথায় ঠাট্টা করে গল্পগুলি মুখর হয়ে ছুটোছুটি করবে ; অশেষ বেচারার তো খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অলকা চৌধুরীই রাজি হল না।

অশেষেরও উচিত হয়নি, সাত-তাড়াতাড়ি একটা অচেনা-অজানা মেয়ের জন্যে এরকম ছুটোছুটি করে শুধু যে নিজেকেও লঘু করে ফেলা হয়েছে তা নয়, নিজেকে বিপদে জড়িয়েও ফেলা হয়েছে।

এক কবি আছেন, কী-যেন তাঁর নাম যিনি কবিতায় একটি গল্প লিখে এই তো কিছুদিন আগে এক বেকুবের প্রেমিকতাকে ঠাট্টা করে অনেক হাসি হাসিয়েছেন। সে কবিতা পড়েছে অশেষ। বেশ মনে পড়ে, কবিতা পড়তে পড়তে কতবার অশেষও হেসে ফেলেছিল। দুর্লভ রূপের এক মেয়েকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছিল একটা লোক। লোকটা জানত না, সেই মেয়ের এক প্রণয়ী আছে এবং কত গভীর দু'জনের প্রণয় ! সেই মেয়ের চোখের চাহনি আর মুখের হাসিকে আহ্বানের সংকেত মনে করে লোকটা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে সেই মেয়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। মেয়েটি বাঁকা ঠোঁটের শ্লেষ চাপা রেখে আর নকল সোহাগের হাসি হেসে বলেছিল— এই ফুল নয় ! অন্য ফুল চাই।

—কোন ফুল ?

—রক্তকরবী।

লোকটা সারা শহরের সব বাজারে ঘুরে, ফুলের দোকান ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে, আর শহরের বাইরে এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরেও রক্তকরবী খুঁজে পেল না। কেমন ক'রে পাওয়া যাবে ? সে যে অসম্ভব। সে সময় রক্তকরবী ফোটে না। অগত্যা লোকটা হয়রান হয়ে একদিন সেই মেয়ের কাছে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছিল— কী সর্বনাশ, পৃথিবীতে যে রক্তকরবী আর ফোটে না !

মেয়েটি অট্টহাসি হেসে বলেছিল— তবে যাও ; এখানে আর এসো না। তোমার প্রেম প্রেমই নয় !

হ্যাঁ, এইরকম হয়রানির ভূতে বোধ হয় অশেষের প্রাণটাকেও পেয়ে বসেছে। শুধু হয়রানি নয়, বেশ নাকানি-চুবানিও কপালে আছে বোধ হয় ! পাঁকাল দীঘির পদ্ম তুলতে গিয়ে কারও কারও যে দশা হয়, সেই দশা। পদ্মের কাছে পৌঁছনো তো যায়ই না, শুধু পাঁক আর যত কিলবিলে জংলা জলজ লতায় পা জড়িয়ে যায়। নিজেকে উদ্ধার করাই তখন সমস্যা হয়ে ওঠে।

না, আর সমস্যার পাঁকের ভিতর এগিয়ে যাবার দরকার নেই ! এখনই সাবধান হয়ে যাওয়া ভাল। চা আর খাবার খেয়ে নিক অলকা। মিনুদি আর ওরা— বীণা, নমিতা আর রমা চলে যাক। তারপর একেবারে স্পষ্ট ভাবে আসল খবরটা, শৈলেশ্বরের বিয়ের খবরটা অলকাকে শুনিয়ে দিলেই হবে। তারপর অলকা কাঁদুক বা হাসুক, তা নিয়ে অশেষের আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

সত্যিই তো কী দরকার ? কে বলেছে, শৈলেশ্বরের নিষ্ঠুরতার খবর জানতে পেরে অলকা দুঃখের আঘাতে একেবারে ভেঙে যাবে, আর অশেষের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইবে ? এটা তো অশেষের লোভী আশার একটা অনুমান মাত্র। এমনও হতে পারে তো, সব খবর শুনেও চেঁচিয়ে হেসে উঠবে অলকা। চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের উগ্র আর উজ্জ্বল হয়ে ঝক্‌ঝক্ করবে। অশেষের সব উদ্বেগ করুণা আর উপকারের চেষ্টার এই দু'দিনের ইতিহাসকে ঠাট্টা করে, আরও কঠোর একটা হিস্টিরিয়ার আবেশে বলে দেবে অলকা— শুনে সুখী হ'লাম। সুখী হোক শৈলেশ্বর। আমি শৈলেশ্বরকে ভুলতে পারব না। জীবনে পর হয়ে গেলেও সে আমার মনের স্বপ্নে থাকবে।

মনে হয়, এই কথাই বলবে অলকা। বেশ তো, তারপর দেখা যাক, সে মনের জোর নিয়ে কতক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে আর অশেষের মুখের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে পারে অলকা। অশেষও দু'চোখের চাহনির যন্ত্রণা চেপে রেখে আর শান্ত হাসি হেসে বলে দিতে পারবে— তাই হোক, কিন্তু মনে রেখো, তুমি যদিও আমার জীবনে পর হয়ে রইলে, কিন্তু তবুও তুমি আমার মনের স্বপ্নে চিরকাল থাকবে, তোমাকে কখনও ভুলতে পারব না।

ওঘরের ভিতরে বেশ হাসিভরা চেঁচামিচির সাড়া শোনা যায়। কী হল ? বীণার সেতারের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। মিনুদির চা তৈরি করা বোধ হয় হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। রমার ডাক

শোনা যাচ্ছে— অশেষদ কোথায় ? এঘরে আসুন।

আর দ্বিধা করে না অশেষ হাসিমুখে ঘরের ভিতরে ঢুকেই দেখতে পায়, ডিসের উপর রুটি-মাখন আর কিসমিস ছড়ানো মোহনভোগ সাজিয়ে নিয়ে অলকার কাছে দাঁড়িয়ে আছে নমিতা মিনুদি পেয়ালায় চা ঢালছেন। আর, অলকার ঠোঁটে হাসি, চোখে ভয়, কপালে ঘাম।

অশেষকে দেখতে পেয়েই ভ্রূকুটি করে তীব্র একটা দৃষ্টি হেনেই মুখ ঘুরিয়ে নেয় অলকা।

কিন্তু তারপর আর দ্বিধা করে না। যেন একটা হাস্যাস্পদ চক্রান্তের চাপে পড়ে, আপত্তি করবার শক্তি হারিয়ে, আর লজ্জার সঙ্গে একটু রাগ মিশিয়ে দিয়ে খাবারে হাত দেয় অলকা। —বুঝতে পেরেছি, আমাকে খেতে বাধ্য করবার জন্য আপনারা তৈরি হয়েছেন।

মিনুদি— ছিঃ, বাধ্য করব কেন ? তোমাকে দেখে কত খুশি হলাম, তুমিও খুশি হয়ে আমাদের আদরের এই সামান্য উপদ্রব সহ্য করবে, এই তো চাই।

নমিতা বলে— উপদ্রবের আসল দিনগুলি তো এখনও বাকি আছে। তখন দেখবেন, উপদ্রব কাকে বলে ?

অলকা— কী বললেন ?

রমা নমিতাকে টেনে সরিয়ে দেয়—আঃ, এখনি সব বলে ফেলিস না নমি। সুদিন আসুক, তারপর।

সুদিন ? অলকার কানের কাছে একটা নির্মম বিস্ময় যেন ঠাট্টা করে বাজছে। সুদিন, কার সুদিন ? এই ঘরে আবার অলকা চৌধুরীর জীবনের সুদিন কেন দেখা দেবে ? এ রকম অসম্ভব কথা কেন ভাবছে এরা ? অলকা চৌধুরীর মত মেয়েকে কোনওদিন আবার এই ঘরে ফিরে এসে এরকম একটা উৎসবের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে তেমন সৌভাগ্য...

ছিঃ, ছিঃ মাথাটা কি খারাপ হ'য়ে গেল। অলকা চৌধুরীর মনের গর্ব কি এরই মধ্যে মিথ্যে লোভের বশে ক্ষুদ্র হয়ে একেবারে...ছিঃ।

মিনুদি অশেষের হাতের কাছে এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিলেন। তারপর নিজেও এক পেয়ালা চা পাঁচ চুমুকে শেষ করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন— বাস, আজ এই পর্যন্ত— চা ছাড়া আর কিছু নয়; মিষ্টি খাব সেদিন, যেদিন মিষ্টি খাবার সত্যিই দরকার হবে।

তারপর আর বেশিক্ষণ নয়। ঘরের মুখর উৎসব নীরব হয়ে গেল। মিনুদি চলে গেলেন। রমা, বীণা আর নমিতাও ব্যস্তভাবে চলে গেল। নীরব ঘরের ভিতরে চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অলকা যেন বিরক্তভাবে একটা ঝংকারের মত স্বরে বলে ওঠে—আমিও যাই।

অশেষ বলে— হ্যাঁ। একটু অপেক্ষা করো। আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি।

নিশ্চয় ঘর ছেড়ে চলে যেত অশেষ, কিন্তু যেতে পারল না অলকারই গলার স্বরের আর একটা উত্তপ্ত বিদ্রূপের জন্য। বাঃ— অদ্ভুত শ্লেষের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে অশেষের মুখের দিকে তাকিয়েছে অলকা।

অশেষ—তুমি কি আমার কোনও অন্যায় দেখলে ?

অলকা— আপনি দেখালে দেখতে পাব না কেন ?

অশেষ— কী অন্যায় দেখলে ?

অলকা— থাক, আপনার সঙ্গে তর্ক করবার কোনও ইচ্ছা আমার নেই।

অশেষ মৃদুভাবে হাসে— আমারও আর এরকমের তর্ক করবার কোনও ইচ্ছে নেই অলকা। যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তবে বলো, আমি সত্যিই কিছু মনে করব না।

অলকা— আপনার এখানে আসবার পর থেকে যেসব ব্যাপার হল, তার কোনওটাই আমার ভাল লাগেনি।

অশেষ— কী ব্যাপার হল ?

অলকা— এই যে ওঁরা, মিনুদি আর নমিতারা, ওঁদের কথাবার্তার রকম একটুও ভাল নয়।

অশেষ— কে জানে, ওদের কথাবার্তা তোমার কেন ভাল লাগল না। আমি তো জানি, আমাদের পাড়ায় ওদের চেয়ে ভদ্র আর সুন্দর স্বভাবের মানুষ আর নেই।

অলকা— না না, সে কথা বলছি না। ওদের অভদ্র বলব, এত বড় অভদ্র আমি নই। কী চমৎকার মানুষ মিনুদি। কিন্তু...

অশেষ— কী ?

অলকা— ওঁরা বোধ হয় আমাকে ভুল বুঝে চলে গেলেন।

অশেষ— কেন ভুল বুঝবেন, তাও তো বুঝতে পারছি না।

অলকা— যাক, যেতে দিন ওসব কথা। আমি শুধু ভাবছিলাম, ওঁরা যেন আপনাকেও ভুল না বুঝে বসেন।

অশেষ— তার মানে ?

অলকা— তার মানে, মিছিমিছি আপনার সম্বন্ধে যেন এমন ধারণা না করে বসেন যে, আপনি আমাকে আপনার একটা ইচ্ছের জন্য... ।

অশেষ— কী বললে ?

অলকা হেসে ফেলে— ওরা তো জানে না, আপনি কেন আর কী কথা বলবার জন্য আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। বেচারাদের দোষ কী, যদি ওরা আপনাকে সন্দেহ করে বসে।

অশেষ— তুমি সন্দেহ করনি তো ?

মাথা হেঁট করে অলকা— সত্যি ; খুবই লজ্জার কথা অশেষবাবু, আপনার মত মানুষকে ভুল বুঝে একটু ছোট করে সন্দেহ করে বসেছিলাম।

অশেষ হাসে— সেটা তোমার দোষ নয় অলকা। আমি কাল সন্ধ্যা থেকে যেরকমের কাণ্ড করছি, তাতে সন্দেহ করলে দোষ হবে কেন ? কে না সন্দেহ করে ? বরং আশ্চর্য এই যে, তোমার মত মেয়েও আমাকে বিশ্বাস করে আমার অনুরোধে আমার বাড়িতে এসেছে। এখন ভালয় ভালয়... ।

অলকা— কী ?

অশেষ দরজার দিকে তাকায়। অলকা গম্ভীর হয়ে বলে— ট্যাক্সি ডাকতে যাবেন ?

অশেষ— হ্যাঁ ।

অলকা— যান তা হলে। .. কিন্তু আমাকে এখানে একা রেখে আপনার বাইরে যাবার দরকার কী ? আমিও তো আপনার সঙ্গে যেতে পারি ট্যাক্সির জন্যে।

অশেষ— তাই ভাল।

অশেষ আর অলকা, দু'জনে নীরব হয়ে আলোকে উজ্জ্বল ঘরটাকে কিছুক্ষণের জন্য যেন একেবারে স্তব্ধ করে দেয়। যেন এই রাত্রির একটা আকুলতার নাটক হঠাৎ রবহারা হয়ে একেবারে রিক্ত শূন্য ও উদাস হয়ে যাচ্ছে। অশেষের জীবনে যেন আর কোনও কথা নেই, অলকার কথা বলবার পালা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। ঘরের নীরবতা যেন একটা বিদ্রূপ। ছিঃ, ছিঃ ! উৎসাহের অন্তর্ধান কি এত মূক আর এত শান্ত হতে পারে ?

মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল অলকা। আর, অশেষ যেন হঠাৎ বাইরের বাতাসকে সন্দেহ ক'রে দরজার পরদার গায়ে হাত দেয়। আর পরদা সরিয়ে দিয়েই দেখতে পায়, বাইরের বারান্দার এক কোণে যেন হতভম্ব আর আতঙ্কিতের মত দাঁড়িয়ে আছে নমিতা। এই ঘরেরই দরজার পরদার দিকে তাকিয়ে আছে নমিতা। মনে হয়, মেয়েটা ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়েই হঠাৎ একটা লজ্জার ভয়ে চমকে উঠে দূরে পালিয়ে গিয়েছে।

—কী ব্যাপার, নমিতা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

অশেষের ডাক শুনে নমিতার হতভম্বতা যেন সাহস পেয়ে হেসে ওঠে। —আমার স্কার্ফটা আপনার এই ঘরের ভিতর পড়ে আছে।

অশেষ— পড়ে আছে তো নিয়ে যাও।

হনহন্ করে হেঁটে এগিয়ে এসে আর ঘরের ভিতর ঢুকে স্কার্ফটা হাতে নিয়েই প্রায় ছুটে চলে যায় নমিতা। ঘরে অলকার মূর্তিটাকে এত স্পষ্ট করে চোখের সামনে দেখতে পেয়েও একবার থমকে দাঁড়ায় না নমিতা। যেন অলকার কাছে মস্ত বড় একটা অপরাধ ক'রে ফেলেছে, ভাবটা সেই রকমের।

না, এখন আর কেউ নেই। চলে গিয়েছে নমিতা। অলকার গলার স্বরে আবার একটা দুঃসহ আক্রোশ উথলে ওঠে। —আপনার জন্যে আমাকে বার বার যাচ্ছেতাই অপমান সহ্য করতে হচ্ছে।

অশেষ— কে অপমান করল ?

অলকা— এই যে, আপনার পাড়াতুতো বোন নমিতা।

অশেষ— কী করল নমিতা ?

অলকা— আমার সঙ্গে একটা কথাও না বলে, যেন আমি আপনার ঘরে চুরি করতে ঢুকেছি, এরকম একটা ভাব দেখিয়ে ছুটে চলে গেল কেন নমিতা ?

অশেষ ভ্রূকুটি করে। —নমিতার সঙ্গে যদি কোনওদিন তোমার দেখা হয়, তবে নমিতাকেই জিজ্ঞাসা করো। আমাকে বলে লাভ কী ?

অলকা— আপনাকে বলব না কেন ? আপনিই তো আমার এই সব অপমানের মূলে আছেন।

কথাগুলি অশেষের কানে যেন অপমানের কশাঘাতের মত বেজে ওঠে। শান্ত চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে আর বেশ একটু তীব্র হয়ে চমকে ওঠে। বিমান চৌধুরীর মেয়ে নিজেকে অপমানিত বোধ করছে। অপমান এই কারণে যে, নমিতা কী-যেন সন্দেহ করেছে। সন্দেহটাকেও অনুমান করা যায়। ঘরের নিভৃতে অশেষ আর অলকার এই সান্নিধ্য, চুপচাপ দু'জনের এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নমিতার চোখে সেই রহস্যের মত মনে হয়েছে, যে রহস্য শুধু দু'জন ভালবাসার মানুষকে এভাবে নীরব করিয়ে রাখে। কিন্তু অলকার গর্বের হিষ্টিরিয়ারও কত গর্ব! নমিতার সন্দেহটাকে কল্পনা করতেও ঘৃণা বোধ করছে অলকা। তার মানে, অলকার গা-ঘেঁষা অশেষের এই ছায়াটাকেই ঘৃণা করছে অলকা।

অশেষ বলে— আমিও তো বলতে পারি, আমার অপমানের মূলে তুমি আছ ?

—কী বললেন ? অলকার চোখের চাহনিও তীব্র হয়ে ওঠে।

অশেষ— বলছি, নমিতাই যদি একটা বাজে সন্দেহ করে থাকে, তবে সেজন্য শুধু নমিতা দায়ী নয় ; তুমিও।

অলকা— তার মানে ?

অশেষ— তার মানে তুমি এখানে না থাকলে নমিতার মনে কোনও বাজে সন্দেহ হবার কারণও হত না !

অলকা— আমি এখানে আসতে চাইনি। আপনি নিয়ে এসেছেন।

অশেষ— আমি নিয়ে এসেছি বলেই তুমি আসনি, তুমি নিজের গরজে এসেছ।

অলকা— কিসের গরজে।

অশেষ— নিজের গরজে। শৈলেশ্বর বাবুর খবর জানবার লোভে।

অলকা— সে লোভটা কি দোষের ?

অশেষ— একটুও দোষের নয় !

অলকা— তবে আমাকে বাজে কথা শোনাচ্ছেন কেন ?

অশেষ— না, আর কোনও কথা শোনাতে চাই না।

অলকা— তবে এইবার ব্যবস্থা করুন। আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাই না।

অশেষ— তবে চলো।

অলকা— চলুন।

আলিপুরের অশেষ ডাক্তারের বাড়ির এই ফটকে আলো জ্বলে। ফুটপাতের কিনারায় বকুল গাছের পাতার আড়ালে থোকা থোকা অন্ধকারের গায়ে সে আলোর ছোঁয়া লাগে না। শুধু দেখা যায় বকুলে কুঁড়ি ধরেছে।

অশেষের চাকর ট্যাক্সি ডাকতে চলে গিয়েছে। তাই ফটকের কাছে আবার একটা দুঃসহ নির্জনতা নীরব হয়ে দু'জনাকে আবার দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছে। অশেষের সিগারেটের ধোঁয়াও যেন

উদাস হয়ে গিয়েছে ; আর অলকা চৌধুরীর শাড়ির আঁচল রাতের মৃদু বাতাসে যেন উল্লাসের পতাকার মত আস্তে আস্তে দুলছে।

কী আশ্চর্য ! এত কাণ্ডের পরেও অলকা চৌধুরীর মন বোধ হয় বুঝতে পারছে না, কোথায় ভুল করছে তার মন। যে কথা জানবার জন্য বিপুল একটা কৌতূহলের আর আগ্রহের তাড়না নিয়ে অশেষ ডাক্তারের এই বাড়িতে এসেছে অলকা, সেই কথা জানবার দরকার যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। তা না হলে এখনও মুখ খুলে এই অভিযোগ কেন করতে পারছে না অলকা,—কই, আপনি তো এখনও আমাকে শৈলেশ্বরের কথাটা শোনালেন না ?

আঁচলটা এক হাতে চেপে ধরে কী-যেন ভাবতে থাকে অলকা। চোখের চেহারাও আস্তে আস্তে করুণ হয়ে উঠতে থাকে। বোধ হয় নিজের ভুলের কথাটা মনে পড়েছে। নিজের জীবনের স্বার্থের ছবিটা নয় বোধ হয় ! অন্য একজনের জীবনের সমস্যার কথাটা মনে পড়েছে। এই ভদ্রলোকের জীবনেও কোনও সমস্যা নেই কি ? কোনও দুঃখ, কোনও হতাশার বেদনা ?

হাসতে চেষ্টা করে অলকা— এতক্ষণ তো ঝগড়া করেই কেটে গেল। বেশ হল ; এখনও তো অন্য কথা দু'চারটে বলতে পাবেন।

অশেষ আশ্চর্য হয়ে তাকায়— কী কথা বলব, বলো।

অলকা— আমি বলে দেব ?

অশেষ হেসে ফেলে— তুমি বলে দিলেই ভাল ; নইলে আবার কোনও বাজে কথা হয়ত আমার মুখে এসে পড়বে।

অলকা— যদি কিছু না মনে করেন তবে একেবারে স্পষ্ট করে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি।

অশেষ— জিজ্ঞেস করো, আমি কিছু মনে করব না।

অলকা— আপনাব কি ইচ্ছে করে না যে...।

অশেষ— কী ?

অলকার মুখের বেহায়া প্রশ্নটা যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে ক্ষণেকের মত বোবা হয়ে যায়। চোখের পাতা শিউরে ওঠে। বুকের ভিতরের একটা কুণ্ঠার বাতাস যেন এক ঢোঁকে গিলে নিয়ে হাঁপ ছাড়ে অলকা। তার পরেই প্রশ্ন করে— মিনুদিরা এতদিন ধরে কী করছেন তা হলে ?

অশেষ— তার মানে ?

অলকা— আপনি এভাবে একা পড়ে আছেন দেখতে পেয়েও কী ওঁরা কোনও ব্যবস্থা করতে...।

অশেষ— ওঁরা এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না।

অলকা— আপনিও কি...

অশেষ— না, আমিও মাথা ঘামাই না।

অলকা— তার মানে ?

অশেষ— তার মানে, মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই।

অলকা— বুঝলাম না।

অশেষ— আমার ইচ্ছা থাকলেও তার ইচ্ছা নেই। অগত্যা...

অলকা— কী আশ্চর্য, তার ইচ্ছা হয় না কেন ?

হেসে ফেলে অশেষ— সে-ই জানে।

অলকার চোখ উদাস হতে গিয়ে কেমন যেন হয়ে যায় ; তার পরেই চিক্‌চিক্ করতে থাকে।

— সে মেয়ে কত বোকা, তাই ভাবছি।

অশেষ— তুমি মিছে কেন দুঃখ করছ অলকা ?

অলকা— দুঃখ হলে কী করব বলুন। আপনিও তো আমার আশার কথা ভেবে দুঃখ পেয়েছেন।

অশেষ— তা পেয়েছি বই কি ?

অলকা ছটফট ক'রে ওঠে। —আমিও কী আপনার কোনও উপকার করতে পারি না ?

অশেষ আশ্চর্য হয়ে তাকায়— উপকার করবে ? তুমি ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অলকা।

অলকা— আমি যদি সেই মেয়ের কাছে গিয়ে আপনার হয়ে দুটো কথা বলি, কিংবা, যদি তাকে বুঝিয়ে দিতে পারি যে, আপনাকে তুচ্ছ করা তার উচিত হচ্ছে না, তবে ?

সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটাকে রাস্তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর মাথা হেঁট করে, বোধ হয় চোখের একটা অদ্ভুত করুণ কৌতুকের দৃষ্টিটাকে লুকিয়ে রেখে অশেষ বলে— যদি কোনওদিন দরকার বোধ করি, তবে বলব। আপাতত আমার উপকার করার চেষ্টা করো না— কারণ...

ট্যাক্সি এসে পড়েছে। অশেষের যে কথার সুর দু'কান তৃষিত করে শুনছিল অলকা, সে কথার সবটা আর শুনতে পাওয়া গেল না। অশেষের কথা শেষ হল না। কিন্তু কী ভয়ানক দুর্বোধ্য এইসব কথা।

আর, ট্যাক্সিটা যেন প্রচণ্ড অভদ্রতার দূত ! এই তো কিছুক্ষণ আগে চাকরটা ট্যাক্সি ডাকতে গেল ; কত তাড়াতাড়ি চলে এল ট্যাক্সিটা।

বেশ হল। এতক্ষণে মনে পড়ে অলকার, শৈলেশ্বরের খবর শোনাবে বলে একটা নিষ্ঠুর অছিলা করে চতুর অহংকারের মানুষ এই অশেষ ডাক্তার অলকা চৌধুরীকে এখানে নিয়ে এসে নিজের মহত্ত্বের, এমন কী নিজের প্রেমিক জীবনের একটা আত্মত্যাগের যতসব বিবরণ জানিয়ে দিল। অলকা চৌধুরীর জীবনের যত গর্ব, বুদ্ধি আর জেদগুলিকে ঠাট্টা করে একেবারে ছোট করে দিয়ে, একটা খেয়ালের খেলার আনন্দে এখন অলকাকে একটা মূল্যহীন লোষ্ট্রখণ্ডের মত গাড়িতে তুলে নিয়ে আবার ঢাকুরিয়ার পুরনো বাগান স্ট্রিটের বুকের উপর ছেড়ে দিয়ে আসবার জন্য তৈরি হয়েছে।

ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয় অলকা। তার আগে অশেষের ছায়াটার দিকে একবার তাকায়। একটা নির্বিকার উপেক্ষার ছায়া। কথা বলতে গিয়ে অলকার গলার স্বর চিৎকারের শব্দের মত বেজে উঠে। — আপনার সঙ্গে কী শৈলেশ্বরের দেখা হয়েছে ?

অশেষ— হ্যাঁ।

অলকা— শৈলেশ্বরকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেছেন ?

অশেষ— না।

অলকা— তবে ? শৈলেশ্বরের কোন ভাল খবরটা আপনি আমাকে শোনাবেন ?

বিব্রত বোধ করে অশেষ। কুণ্ঠিতের মত চাপা স্বরে আস্তে আস্তে বলে— সন্দেহ করো না, আমি খুব একটা মিথ্যে কথা তোমাকে বলিনি। তবে...এর মধ্যে...একটু ফাঁকি অবিশ্যি...।

অলকা— বুঝেছি, শৈলেশ্বরকে আমার কথা বলতে আপনার মনে বোধ হয় একটা বাধা...।

অশেষ— না।

অলকা— লজ্জা।

অশেষ— না।

অলকা— একটু হিংসে...।

অশেষ— না।

কথাটা চেঁচিয়ে বলে দিয়েই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে অশেষ। অলকা মুখ ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু দেখে ফেলেছে অশেষ, অলকার চোখ ভিজে গিয়েছে।

অশেষ— ছিঃ ! তুমি আমার কতগুলি ঠাট্টার কথাকেও সত্যি মনে করে যদি...।

অলকা— মিথ্যে কথা বলবেন না। আপনি ঠাট্টা করেননি। আপনি আপনার মনের খাঁটি কথা বলেছেন। অলকা চৌধুরীর মত মেয়ের ভালবাসার কথা মনে করে আপনি পৃথিবীতে কাউকে হিংসে করবেন, এতটা বাজে মানুষ আপনি নন।

অশেষ— যদি বলি হিংসে হয় ?

অলকা— বলতে পারেন, কিন্তু সে কথার কোনও মানে হয় না।

অলকার কাছে এগিয়ে এসে চাপাস্বরে, অথচ নিবিড় আবেদনের মত সুরে অশেষ বলে— তুমি যে সব কথা বলছ, তার অর্থ কী হয় বুঝতে পারছ ?

অলকা— না।

অশেষ— তার অর্থ, তুমি নিজের ক্ষতি করছ।
অলকা— কী বললেন ?
অশেষ— শৈলেশ্বরকে সত্যিই কী ভুলে যেতে চাও ?
অলকা— আপনি এরকম বাজে কথা আমাকে বলবেন না।
অশেষ— তা হলে তো কথাই নেই।
অশেষ— তা হলে আর মিছিমিছি, কে জানে কিসের খেয়ালে ওভাবে চোখ ভিজিয়ে...।
অলকা— আপনাকে যে ভুলে যেতে হবে, একথা ভেবে আপনার মনে কী একটুও...।
অশেষ— আমার মনে যাই হোক, তুমি সেজন্য দুশ্চিন্তা করবে কেন ?
অলকা— আপনার কাছ থেকেও জানতে চাই ; আপনি দয়া করে স্পষ্ট করে বলুন অশেষবাবু, আমি যদি সত্যই আপনাকে ভুলে যেতে না পারি, তবে আমার কী উপায় হবে ?
অশেষ— তুমি দুঃখ পাবে, অথচ আমি তোমার সেই দুঃখের কোনও লাঘব করতে পারব না।
অলকা— তবে বলুন, শৈলেশ্বর ঘোষের স্ত্রীকে আপনি মনে মনে চিরকাল ভালবাসবেন।
অশেষ— একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ ?
অলকা— আমি আর ভাবতে পারছি না অশেষবাবু। কী ভুল করছি, কোথায় ভুল করছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। কোথায় অন্যায় হচ্ছে, তা'ও ধরতে পারছি না। কিন্তু বুঝতে পারছি, আপনার কাছ থেকে এই আশ্বাস না পেলে জীবনে সুখী হতে পারব না।
অশেষ— কিসের আশ্বাস ?
অলকা— আমাকে আর কত নির্লজ্জ হতে বলছেন ? আমাকে কথা দিন, আমাকে শৈলেশ্বরের স্ত্রী হতে দেখেও আপনি আমাকে ঘেন্না করবেন না ; বরং, মনে মনে একটু মায়া করবেন।
অশেষ— কিন্তু ভেবে দেখেছ কি, মায়া-টায়া করলে আমার কী দশা হবে ? আমি কী সুখী হতে পারব ?
অলকা— সুখী মনে করলেই সুখী হতে পারেন।
অশেষ— কেমন ক'রে নিজেকে সুখী মনে করব ?
নীরব হয়ে যায় অলকা। পথের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে অলকা। আঁচল তুলে কপালের ঘাম মোছে। তারপরে, যেন বুকের ভিতরের উতলা নিঃশ্বাসের একটা ঝড় কোনমতে চেপে রেখে বিড়বিড় করে। —আমি আপনাকে ভুলতে পারব না, পরের কাছে গিয়েও না, এই কথা ভেবে।
অশেষ— এ যে ভালবাসার কথা হয়ে গেল।
অলকা— হোক না কেন ?
অশেষ— তুমি কী তবে সত্যি...।
অলকা— না—না, আপনার পায়ে পড়ি, ও কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। দু'দিনের পরিচয়ে কেউ কাউকে ভালবেসে ফেলেছে মনে করলেও সেটা ভালবাসা নয় ! আমি বললেও ওকথা বিশ্বাস করবেন না।
উত্তর না দিয়ে শুধু অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অশেষ। অশেষের কল্পনা যেন এতক্ষণের প্রতীক্ষার বেদনা থেকে মুক্তি পেয়ে একটা বিস্ময়ের রূপ দেখতে পেয়েছে। এই তো সেই নারী, একজনের প্রেমে প্রায় পাগল হওয়া একটা সত্তা। সেই নারী কত স্পষ্ট ভাষায় অপরের ভালবাসার আশ্বাস চাইছে।
—বেশ, তাই হবে। আমি কথা দিলাম অলকা। অশেষও অলকার কাছে এগিয়ে যেয়ে যেন করুণ একটা প্রতিজ্ঞার ঘোষণার মত শান্ত অথচ শক্ত স্বরে কথাগুলো বলে দেয়।
অলকা হাঁপ ছাড়ে। —এবার চলুন অশেষবাবু।
অশেষ— আমারও একটা কথা ছিল।
অলকা— বলুন।
অশেষ— তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো, যদি দেখ যে...

অলকা— কী ?

অশেষ— যদি দেখ যে, আমি বিয়ে করেছি।

অলকা— না, ভুলে যাব কেন ? কিন্তু আপনি...আপনি বিয়ে করবেন কাকে ?

অশেষ— যে আমাকে এখনও ভালবাসতে পারেনি, অথচ যাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি...।

অলকা— কে সে ? যে ভাগ্যবতী হয়েও দুর্ভাগ্যবতী ?

অশেষ— একজন কেউ তো বটে ! সে যদি সত্যিই ভালবেসে আমার ঘরে আসতে চায়, তবে তাকে নিয়ে আসা তো উচিত।

অলকা—খুব নিয়ে আসবেন। খুব ভাল হবে। জাঁকিয়ে উৎসব করবেন। হাজার লোককে নেমন্তন্ন করবেন। সাতদিন সানাই বাজাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমাকে এ সব প্রশ্ন করবার কোনও মানে হয় না।

ট্যাক্সিটার চেহারাও যেন বদলে যাচ্ছে। কঠোর ঠাট্টার মত, কিন্তু নীরব ও শান্ত। আর দেরি করবারও কিছু নেই, এইবার রওনা হতেই হবে ! আর ট্যাক্সির ইঞ্জিনও সেই মুহূর্তে শব্দ করে যেন একটা ঠাট্টার হাসি হেসে ফেলবার চেষ্টা করবে, কিন্তু বুঝতে আর কিছুই বাকি থাকবে না। অশেষের একটা খেয়ালের চক্রান্তকে শেষ পর্যন্ত হয়রান হয়ে কেমন অপমানিত পরিণাম স্বীকার করে নিতে হল। বিমান চৌধুরীর মেয়ের উপকার করবার সাধ— নিজেই জব্দ হয়ে গেল। চলে যাবে অলকা ; আলিপুর থেকে ঢাকুরিয়া পর্যন্ত সারাটা পথ এই ট্যাক্সিতে অলকার পাশে বসেই এই ঠাট্টার কাঁটা মনে মনে সহ্য করতে হবে— কেমন জব্দ ! এভাবে চক্রান্ত করে কোনও মেয়ের ভালবাসা জয় করা যায় না। তা ছাড়া এই যে তোমার এত ছুটোছুটি আর অলকাকে কাছে পাওয়ার জন্য এত জল্পনা-কল্পনা, এসবও তোমার ভালবাসার লক্ষণ নয়।

তার চেয়ে ভাল, এখনই স্পষ্ট করে অলকাকে বলে দাও যে, শৈলেশ্বরের আশা ছেড়ে দাও অলকা, সে এতক্ষণে এক নম্বর পুরনো বাগান স্ট্রিটের ত্রিদিব বাবুর জামাই হয়ে গিয়েছে। তোমার প্রতীক্ষা আর ভালবাসা চুলোয় গিয়েছে। এইবার তুমি শুধু তোমার হিস্টিরিয়া নিয়ে সুখে থাক।

তা ছাড়া নিজেকেও একটা ধমক দিয়ে শাসিয়ে দিতে পারা যায়— ত্রিদিব বাবুর মেয়ের বিয়ের উৎসবের মধ্যে এই মেয়েকে এখনি ছেড়ে দিয়ে চলে এসো, আর নিজেও এই জীবনের মত সাবধান হয়ে যাও। খবরদার, কোনও মানুষের ভালবাসার নারীকে আশা করতে যেও না, সে ভালবাসাতে ভুল থাকুক বা না থাকুক। তোমার এত মাথাব্যাথা কেন ? তুমি তোমার ডাক্তারি নিয়ে আর তোমার খেয়াল নিয়ে যেমন ছিলে তেমনি থাক। যদি কোনও মেয়ে সত্যই নিজের থেকে তোমাকে কোনওদিন ভাল চোখে দেখে, তবে তাকে আপন করবার কথাটা ভেবে দেখো। সহজ সরল ও সাদাসিধে মানুষের মত একটা প্রাণ নিয়ে থাক।

অর্থাৎ অলকা তোমাকে ভুলে যাক, তুমিও অলকাকে ভুলে যাও। যদি ভবিষ্যতে কোনওদিন দু'জনের মুখোমুখি দেখা হয়, তবে শুধু সাধারণ সৌজন্যের কথা বলে দু'জনেই খুশি হতে পারবে— কেমন আছেন ? খবর ভাল তো !

ট্যাক্সির ড্রাইভার হর্ন বাজাচ্ছে। কর ত্বরা—এখানে কেউ অনন্ত কাল দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য আসেনি। ট্যাক্সিটা এমন ধারণাই বা কববে কেন যে, এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলার মনে এই ফটকের কাছে অনন্ত কাল দাঁড়িয়ে থাকবার কোনও সংকল্প আছে।

কিন্তু অলকার ব্যস্ততাও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। যেন ভাগ্যের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের ভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অলকা। চলে গেলেই বা কী, আর দাঁড়িয়ে থাকলেই বা কী ? অশেষ ডাক্তারের সঙ্গে তর্ক করবার, ঝগড়া করবার কিংবা হেসে কেঁদে বাতিক গোছের কাণ্ড করবার পালা এখানেই শেষ। ঢাকুরিয়ার পুরনো বাগান স্ট্রিটের একটা বাড়ির কাছে পৌঁছেই এই খেয়ালের নাটকের সব শেষ হয়ে যাবে, ফাঁকা হয়ে যাবে, শূন্য হয়ে যাবে।

তাই কি ? শুধু একটা ফাঁকি ? তা হলে বুকের ভিতরের বাতাসটাকে এত ভারি বলে মনে হয় কেন ? নিজের উপর রাগ হয় কেন ?

এই ভদ্রলোকের উপরই বা মাঝে মাঝে মনটা ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কেন ?

কী আশ্চর্য, কেন কিসের দাবিতে আর কী আশা করে, মনটা এত ছটফট করছে ?

ভাবতে গিয়ে চমকে ওঠে অলকা। চমকানিটা একেবারে বুকের ভিতর থেকে ছটফট করে অলকার শরীরটা কাঁপিয়ে দিয়েছে। আর কান দুটোও তেতে উঠেছে। ছিঃ, এ কী রকমের ইচ্ছা ? ট্যাক্সিটা এখনই চলে গেলে ভাল হয়, যেমন খালি হয়ে এসেছিল তেমনি হয়ে চলে যাক। ছিঃ ! এ কেমন সাধ। ট্যাক্সিটা এখনই এত তাড়াতাড়ি না এসে পড়লেই ভাল ছিল, অলকার মনের ভিতরে এ কী অদ্ভুত লজ্জাহীন ও অভদ্র খেয়াল ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে ?

ট্যাক্সির ড্রাইভারই চেঁচিয়ে কথা বলে— মনে হচ্ছে, আপনাদের বের হতে বেশ দেরি হবে।

অশেষ বিব্রতভাবে বলে— দেরি ? না দেরি কেন হবে ? তবে...তার মানে...।

ড্রাইভার— দেরি হবে বলে মনে হচ্ছে স্যার।

উত্তর দেয় না অশেষ। উত্তর দিতে গিয়ে শুধু নীরব হয়ে অলকার মুখের দিকে তাকায়। মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায় অলকা।

সেই মুহূর্তে স্টার্ট দিয়ে হর্ণ বাজিয়ে উধাও হয়ে যায়। চমকে ওঠে অলকা— বাঃ, এ কী কাণ্ড ? ট্যাক্সিটা চলে গেল কেন ?

উত্তর দেয় না অশেষ। অলকা আবার কথা বলে, কথাগুলি আতঙ্কের বিলাপের মত— এ কী করলেন আপনি, ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলেন কেন ?

অশেষ— কী বললে ?

অলকা— ট্যাক্সিটা চলে গেল কেন ?

অশেষ— তবে...ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে না দিলেই ভাল হত।

অলকা— এখন কী করবেন তা হলে ?

অশেষ—এখন...।

কিছুই যে আর বলবার নেই। এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার কী দরকার আছে, সে যে বিধাতাও বলতে পারেন না।

চাকরটাকে আর একবার ডাক দিয়ে বলতে পারা যায়, আর একটা ট্যাক্সি ডেকে আনবার জন্য। কিন্তু.. চাকরটাই বা কী ভাববে ?

অলকার গলার স্বরে আবার একটা আতঙ্কের ভাব যেন শিউরে ওঠে। — ভেবে চিন্তে যা হয় কিছু একটা করুন, আমার আর একটুও ভাল লাগছে না।

অশেষ— আমি বলি আর সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর চাকরটাকে আর একটা ট্যাক্সি ডাকবার জন্য বলে দিলেই হবে।

অলকা— বেশ, তাই যদি ভাল মনে করেন, তবে... ।

অশেস— কিন্তু ততক্ষণ, এখানে এরকম অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে, চলো বারান্দায় গিয়ে বসি।

অলকা— কোথায় বারান্দা ?

বারান্দার চেহারা অলকার চোখে পড়বার কথা নয়, কারণ বারান্দাটা এত কাছে থেকেও যেন গোপন হয়ে আছে। বারান্দায় আলো নেই, বারান্দায় কোনও চেয়ার বা কোচ আছে কিনা, তাও দেখা যায় না। বারান্দাটা কোন দিকে তাও যে জানে না অলকা।

অশেষ বলে— এই যে এদিকে, আমার সঙ্গে এসো।

অশেষের সঙ্গে এগিয়ে যাবার জন্য অশেষ অনুরোধ করেছে। চমকে ওঠে অলকা। অনুরোধ নয় ; যেন ভবিতব্যের আহ্বান।

অলকার প্রাণটা হঠাৎ ভীরু হয়ে গিয়ে মুষড়ে পড়ে। সত্যিই যে একটা অজানা অচেনা ও অন্ধকারময় অস্পষ্টতার দিকে এগিয়ে যেতে অলকাকে ডাক দিয়েছে দুদিনের চেনা এই ভদ্রলোক।

অশেষের সঙ্গে সঙ্গে কখন যে এগিয়ে গিয়েছে অলকা তাও বোধ হয় বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারে তখন, যখন অশেষ হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে,—আঃ। একটু সাবধানে হাঁটো, দু'পাশে ফুলের বন আছে আর ফুলগুলিতে কাঁটাও আছে।

তবু ফুলের টবে দু'বার হোঁচট খায় অলকা, আর শাড়িটা দু'বার ফুলের কাঁটায় ফেঁসে যায়।

—আঃ! অশেষও যেন বিব্রত হয়ে আক্ষেপ করে ওঠে। তার পরেই অলকার একটা হাত শক্ত করে ধরে ফেলে— আঃ, পড়ে যাবে নাকি ?

এতক্ষণে দু'বার হোঁচট খেয়েও পড়ে যায়নি যে অলকা, এইবার সেই অলকা বোধ হয় সত্যিই পড়ে যাবে। কত শক্ত করে অলকার হাত ধরে রয়েছে অশেষ, তবু অলকার শরীরটা থর থর করে কাঁপছে। উঃ, বারান্দাটা কোথায় কে জানে, আর কতদূর ? এভাবে এরকম ভয়ানক একটা নির্ভরতার উপর ভর রেখে হাঁটতে হবে ? কে জানে কোন বিপদের দিকে...ভগবান জানেন।

কিন্তু কেমন এই ভদ্রলোক ? একটুও লজ্জা বোধ করছে বলে মনে হয় না। অশেষের হাতটা একটুও কাঁপছে না। দু'দিনের জানা পরিচয়ের একটা মেয়ের হাতটা কত সহজে হাতে ধরে রেখেছে ভদ্রলোক ? এমন করে হাত ধরতে জানে যে, সে মানুষের জীবনটা এতদিন এভাবে একা হয়ে পড়ে আছেই বা কেমন করে ?

হ্যাঁ, এই যে, বারান্দার সিঁড়িটা পাওয়া গিয়েছে। আর এভাবে হাঁটতে হবে না। অশেষের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপ ছাড়ে অলকা। ভাগ্যি ভাল, খুব সহজে আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটা দুঃসহ অস্বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। অলকা বলে— বাস, আপনি আর...।

অশেষ— কী ?

বারান্দার অন্ধকারটাকে চোখ বড় করে দেখতে দেখতে চমকে ওঠে অলকা— এ কি ? ওদিকে কোথায় গিয়ে কী করছেন আপনি ?

অশেষ— দেখছি চেয়ারগুলো আছে কী না !

অলকা— চেয়ার থাকলেই বা কী ? এখানে আবার সাত ঘণ্টা বসে থাকবার জন্যে এসেছি নাকি ?

অশেষ বলে— তুমি এদিকে একটু এগিয়ে এসে এই চেয়ারে বসো।

অলকা— না।

অশেষ— আমি ততক্ষণ একবার..।

অলকা— কী বললেন ?

অশেষ—আমি একবার ঘুরে আসি।

অলকা রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনি বড় অবুঝের মত কথা বলেন। আপনি ঘুরে আসবার জন্য চলে যাবেন, আর আমি এখানে এই অন্ধকারের মধ্যে একা বসে থাকব, খুব সুন্দর ব্যবস্থা করতে জানেন আপনি।

অশেষও যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলে— ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি এতটা ভেবে দেখিনি। বাইরে না হয় নাই গেলাম।...কিন্তু এই সামান্য কথাটা বলতে তুমি কেন এত রাগ করছ. তুমি একটু ভেবে দেখো অলকা, আমি এমন কোনও অন্যায় ব্যবহার তোমার সঙ্গে করিনি যার জন্য তোমার মুখে যা আসছে তাই তুমি আমাকে শুনিয়ে দিচ্ছ।

অন্ধকারের মধ্যে অলকার ছায়াশরীরটাও যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে অলকা, কিংবা নিজের অভদ্রতার রকম দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। অশেষের অভিযোগের উত্তর দিতে পারে না অলকা।

অশেষও নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ; চোখে দেখতে না পেলেও নিজের এই স্তব্ধ শরীরের একটা হঠাৎ শিহরণের অনুভব নিয়ে বুঝতে পারে যে, টবের ফুলগুলি মৃদু বাতাসে দুলতে শুরু করেছে। বাতাসের একটা মৃদুল আবেশ যেন চোখের আর মুখের উপর ঢলে পড়ছে।

সেই সঙ্গে বুকের ভিতরে বাতাসও যে দুরন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে মনে হয়। ছি ছি! অলকা যে শুনে ফেলতে পারে এই গোপন নিঃশ্বাসের শব্দ। আর সেই মুহূর্তে অলকা যে ভয় পেয়েছে, অশেষের বাড়ির বারান্দায় এই অন্ধকারকে একটা চক্রান্ত বলে বুঝতে পেরে ছুটে চলে যাবে।

কিন্তু কে জানে কেন, এই সন্দেহের পীড়নের সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত আশ্বাসের গুঞ্জনও যেন কোথায় বেজে উঠছে। অলকা চৌধুরী এখন এই বিচিত্র অন্ধকারের নীড়ে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না। অলকার ভয়-ভাঙার বন্ধু হয়ে কেউ একজন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকুক, এই তো

অলকার দাবি। ভুল করে হোক বা রাগ করে হোক, অলকা চৌধুরী এখন অশেষের নিকট সান্নিধ্য কামনা করে ফেলেছে।

জানে না অশেষ, আর অলকাও নিশ্চয় হিসাব রাখেনি, কতক্ষণ ধরে এইভাবে নীরবতার প্রতীকের মত দু'জনে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অশেষের নিঃশ্বাসের বাতাস যেন হঠাৎ চমক লেগে দুলে ওঠে। কী-যেন বলেছে অলকা— অতি মৃদুস্বরে, অদ্ভুত এক নিবিড় আহ্বানের মত সুরে, যেন ভয় আর ভাবনা ভুলে গিয়ে, একেবারে অন্য একটি মানুষ হয়ে, একেবারে ভিন্ন একটি প্রাণ হয়ে গিয়ে একটা ডাক দিয়ে ফেলেছে— কোথায় আপনি ?

অশেষ— এই যে আমি, এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তুমিও কি...।

অলকা— কী ?

অশেষ— তুমিও কি দাঁড়িয়ে আছ ?

অলকা— হ্যাঁ।

অশেষ—কেন ? তোমার কাছেই বোধ হয় একটা চেয়ার আছে।

অলকা— হ্যাঁ আছে, তাতে কী ?

অশেষ—তুমি বসে পড়ো।

অলকা— না, আপনি এসে বসুন।

অশেষ হাসতে চেষ্টা করে— সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে তুমি আবার এতটা...।

বলতে বলতে এগিয়ে আসে অশেষ। হ্যাঁ, এই তো অলকা, আর অলকার পাশে এই তো একটা চেয়ার। হাত এগিয়ে দিয়ে চেয়ারের হাতলটা ধরে অশেষ।

কিন্তু অলকার কথার চাপে পড়ে এ কি-রকমের একটা অভদ্রতা করতে তৈরি হয়েছে অশেষ ? এই বাড়ি অশেষেরই বাড়ি, অলকা চৌধুরী আজ এই বাড়িতে এক অভ্যাগতা আগন্তুকা মাত্র। বয়সে ছেলেমানুষও নয়, মনে প্রাণেও ছেলেমানুষির চিহ্ন নেই। সেই অলকা দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তার পাশেই চেয়ারের উপর বসে থাকবে অশেষ ? বাঃ, অশেষ ডাক্তারের মাথাটা তো বেশ খারাপ হয়েছে আর কাণ্ডজ্ঞানও ঘুলিয়ে গিয়েছে।

—না, চেয়ারে বসে কাজ নেই। বিড়বিড় করে অশেষ।

অলকা— কী বললেন অশেষবাবু ?

অশেষ— বসতে হলে তুমিই বসো।

অলকা— না।

অশেষ—বসো অলকা।

কে জানে, হয়ত চেয়ারের হাতলটা ধরবার জন্য, আর চেয়ারটাকে অলকার আরও কাছে টেনে আনবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল অশেষ। কিন্তু কী আশ্চর্য, অশেষের হাতটা অলকারই একটা হাত ছুঁয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ ভুলে যখন অলকার হাত ছুঁয়েই ফেলেছে অশেষ, তখন হাতটা চট করে সরিয়ে নিলেই তো হয়। কিন্তু হাত সরিয়ে নিতে পারে না অশেষ। বোধ হয় এই ছোঁয়ারই আবেশে বিকল হয়ে গিয়েছে অশেষের হাতটার জোর। হাতটা তৃষ্ণার্ত হয়ে ছটফটও করছে মনে হয়।

অলকার হাতের কবজি আর চুড়িগুলির উপর অশেষের হাতের আঙুলগুলি ছোঁয়া দিয়ে অন্ধের মত ঘুরছে, যেন একটা আশা মত্ত হয়ে উঠতে চাইছে। কী যেন খুঁজছে অশেষের হাত।

অলকা চৌধুরী নয় ; ঢাকুরিয়ার পুরনো বাগান স্ট্রিটে থাকেন যে কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরী, তাঁর মেয়েও নয় ; এ যেন এই অন্ধকারের নীড়ে চঞ্চল হয়ে ওঠা একটা নিঃশ্বাসের ঝড়ের উপর লুটিয়ে পড়বার জন্য প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা এক নারী।

হ্যাঁ, তাই বই কি ! অলকার স্তব্ধ শরীর থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছে। আর সব সতর্কতা, সব ভয় কুণ্ঠা আর কাণ্ডজ্ঞান ভুলিয়ে দিয়ে অলকার হাতটা নিজের থেকেই অশেষের হাতের মুঠোর মধ্যে নিজেকে গুঁজে দেবার জন্য দুলে উঠেছে। পাঁচটি তপ্ত ও কোমল আঙুল দিয়ে গড়া অদ্ভুত এক মাংসল কুসুমের মত অলকার হাত, শক্ত ক'রে নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে অশেষ।

কী আশ্চর্য, এ রকম একটা লজ্জার মাথা খাওয়া কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু কেউ সত্যিই লজ্জিত হতে পারছে না। লজ্জা দূরে থাকুক, এই অন্ধকারের নীড়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা এক পুরুষ ও নারীর এই হাতে হাত দিয়ে আর শক্ত করে চেপে রাখা মিলনসন্ধি যেন ধীরে ধীরে দুঃসাহসী হয়ে উঠছে।

হাতের মুঠোয় বন্দি করা অলকার হাতটাকে আস্তে আস্তে যেন একটা উদাত্ত পরিণামের দিকে টেনে তুলছে অশেষ। কোনও আপত্তি কোনও বিদ্রোহ নেই অলকা চৌধুরীরও হাতে। যেন সমর্পণের জন্যই অদ্ভুত এক পিপাসার সুখে অলস হয়ে গিয়েছে চুড়ি পরা এই হাত। অলকার হাত তুলে নিয়ে নিজের বুকের উপর চেপে ধরে অশেষ।

বেশ কিছুক্ষণ ; অলকার নিঃশ্বাসের বাতাস একেবারে অশেষের মুখের উপর লুটিয়ে পড়ছে। কি অদ্ভুত নীরবতা, যেন না-বলা একটা মৃত্যু স্বীকার করে নিতে চায় অলকা আর অশেষের মনের যত ভাষা। কোনও কথা বলে ফেললে এই মুহূর্তেই সব মধুরতার বিপ্লব উদাস ও অসার হয়ে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ একটা আতঙ্কের চমক লেগে অশেষের নিঃশ্বাসের আবেশ ছিন্ন হয়ে যায়। অশেষের হাতের মুঠোয় বন্দি হয়ে অলকার যে হাত অশেষের বুক ছুঁয়ে রয়েছে, বুকের উপর শক্ত করে চেপে রেখেছে অশেষ, সেই হাত যেন সরে যাবার জন্য ছটফট করছে। ঠিকই তো, এইভাবে অনন্তকালের জন্য অশেষের বুকের উপর পড়ে থাকবে বলে কোনও প্রতিজ্ঞা করেনি অলকার এই হাতটা। তাই আপত্তি, তাই বোধ হয় হঠাৎ অপরাধীর লজ্জার মত বারবার কেঁপে উঠছে অলকার হাত।

না—বাধা দেবার কোনও অধিকার নেই অশেষের। একটা অদ্ভুত সুবিধার অন্ধকারে, অলকা চৌধুরী নামে এক নারীর শরীরের স্পর্শ চুরি করে সুখী হবার জন্য যে লোভে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে অশেষ ডাক্তারের অন্তরাত্মা, সেই লোভকে এখনি ধিক্কার দিয়ে সরে যাবে অলকার হাত, যদি ভালয় ভালয় নিজের থেকে সে হাত ছেড়ে দেওয়া না হয়। কিন্তু ছেড়ে দিতে যে ইচ্ছে করে না।

গ্রীষ্মের বাতাস যদি হঠাৎ স্নিগ্ধতার ঝড় হয়ে ওঠে, তবে মনের বিস্ময়ও ঝড় হয়ে উঠবে বই কি ! সেই রকমই এক বিস্ময়ের ঝড়ো বাতাস যেন পাগল হয়ে অশেষের বুকের ভিতর উতলা হয়ে ওঠে। আশা করেনি, কল্পনাও করেনি অশেষ যে, তার এই মুহূর্তের সব শঙ্কিত অনুমানগুলিকে মিথ্যে করে দেবে অলকা নিজেই। অশেষের হাতটাকে যে নিজের বুকের দিকে টেনে নিচ্ছে অলকা।

ভয় পেয়ে অলকার যে হাত ছেড়ে দিয়েছিল অশেষ, অলকার সেই হাত যেন অজস্র আদর ঢেলে দিয়ে অশেষের হাতটাকে মুঠো করে ধরেছে। অশেষকে যেন প্রাণের ছোঁয়া দিয়ে বরণ করতে চায় এক নারী, যার মুখের রক্তিমতা আর চোখের বিহ্বল দৃষ্টি এই অন্ধকারে চোখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

মৃদু অলস ও সুস্থির— অশেষের হাতটা। অশেষ ডাক্তারের জীবনের প্রথম লজ্জাহীনতার পাগলামিটা যেন সুস্থির হয়ে একটা নিবিড় স্বপ্নের সুখ খুঁজছে। কিন্তু ভুল বুঝেছে অশেষ। সুস্থিরতা নয়, শুধু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে এই অনুভবের আবেশ সহ্য করতে ইচ্ছে করে না। অস্থির হবার জন্যই আরও ভয়ানক একটা ব্যাকুলতা যেন অশেষের অন্তরাত্মাকে দুরন্ত করে তুলতে চাইছে। অলকা চৌধুরীর বুকের ভিতর থেকে যেন বিদ্যুতের ঝলক উথলে উঠে অশেষের সে ব্যাকুলতাকে মত্ত করে দিচ্ছে !

অলকার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, দু'হাতে অলকার গলা জড়িয়ে ধরে অশেষ। অলকা নয়, যেন একটা দুর্বার আগ্রহের উৎসর্গ অশেষের দু'হাতের আলিঙ্গনে অবিচল দুঃসাহসের মত সুস্থির হয়ে যায়। অশেষের মূর্খ মনটা, আর অন্ধ চোখ দুটো যেন এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে, অলকা চৌধুরী নামে এক নারীর যে চোখের গম্ভীর চাহনি আর যে ঠোঁটের অদ্ভুত গড়ন এই তো মাত্র গতকালের রাত্রিতে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, সেই চোখ আর ঠোঁট যে আজ তার মুখের কাছেই এই অন্ধকারে ভেসে রয়েছে। লোর্ড যখন আছে, তখন কুণ্ঠা কেন, লজ্জাই বা কেন ?

না, আপত্তি করবে না অলকা। আপত্তি করবার নারী নয় ; এই অলকা চৌধুরী যেন চোখ বুজে আর ছোট্ট একটা ঢোক গিলে এই অন্ধকারের অভিসন্ধিকে তৃপ্ত করবার জন্যেই তৈরি হয়েছে। নড়ে না, সরে যায় না অলকা। অলকার ঠোঁটের উপর যে অনুভবের ছাপ ভিজিয়ে দিতে চায় অশেষ, সে অনুভবের উপর অলকার মনে আর কোনও ধিক্কার নেই, ভয় নেই, অনিচ্ছা নেই।

কিন্তু হঠাৎ অশেষকে যেন একটা রূঢ় প্রত্যাখ্যানের মত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় অলকা। —ছিঃ।

চমকে ওঠে অশেষ—কী বললে?

অলকা— কে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

অশেষ—কই, কে আসছে?

চেঁচিয়ে ওঠে অলকা—জানি না, কোনও কথা বলবেন না। ... কি বিশ্রী অন্ধকার, আমার একটুও ভাল লাগছে না।

অশেষ—ভাল লাগছে না?

অলকা—কী আশ্চর্য, এ বারান্দাতে কি কখনও আলো জ্বালানো হয় না?

অশেষ—জ্বালানো হয় বই কি!

বলতে বলতে দেয়ালের কাছে এগিয়ে যেয়ে সুইচ দেয় টিপে অশেষ। ঝলক দিয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সুঙ্গে মাথা হেঁট করে নেয় অলকা। আর মুখটাকে শক্ত করে চেপে ধরবার জন্য, কিংবা বোধ হয় ঢাকা দেবার জন্য রুমাল তুলতে গিয়ে আবার রুক্ষ ঝংকার দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —এ কি রকমের চক্রান্ত, আলো থাকতে এতক্ষণ আলো জ্বালেননি।

—তুমি তো আলো জ্বালাবার কথা একবারও বলনি।

অলকা চোখ তুলে অশেষের দিকে কট্‌মট্ করে তাকায়। —বলতে ভুলে গিয়েছি, তারই সুযোগ নিয়ে আপনি কি আমার একটা সর্বনাশ করতে পারেন?

কেঁদে ফেলেছে অলকা। দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়া জলের ফোঁটাগুলিকে রুমাল ঢাকা দিয়ে লুকোতে গিয়ে রুমালই ভিজে যায়।

—অলকা। বেদনার্ত অপরাধীর মত যেন একটা দুঃসহ অনুতাপের জ্বালা নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অশেষ। কিন্তু কোনও কথা না বলে শুধু রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ফোঁপাতে থাকে অলকা।

অশেষ বলে—না, আর তোমার হাত ধরব না। কিন্তু অনুরোধ করব, তুমি মাপ করো।

—ছিঃ! ছোট্ট একটা ধিক্কারের ধ্বনি অলকার গলার স্বর আরও ফুঁপিয়ে দিয়ে ফুটে ওঠে। অশেষের বুকের ভিতরে যেন একটা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের খোঁচা লেগে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে; আর, একটা ক্ষতাক্ত অনুতাপও যেন জ্বলতে শুরু করে। অলকার এই ধিক্কার যেন এক অসহায় নারীর করুণ বেদনার ধিক্কার। অশেষের ইচ্ছার চক্রান্তটা কত নিষ্ঠুর, সেই সত্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এই ধিক্কার, অলকার এই আর্তনাদ—ছিঃ।

—আমাকে তুমি নিশ্চয় খুব ছোট মনের মানুষ বলে মনে করেছ অলকা। ...হতে পারে, তুমি ঠিকই মনে করেছ। কিন্তু আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি অলকা, তোমার মনে এতে আঘাত লাগবে। তা ছাড়া বললেও তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না যে, আমার মনে আর যে কোনও মতলব থাকুক না কেন, এ রকম কোনও মতলব আমার মনে ছিল না। নেহাতই ভুল, বড় ভুল হয়ে গিয়েছে অলকা।

অলকার বুকের ভিতরের কান্নাটা শান্ত হয়েছে কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু নিঃশ্বাসের ছোট ছোট শব্দগুলি যেন একটু শান্ত হয়েছে। তেমনই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে একটু শান্তস্বরে উত্তর দেয়। —আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আপনাকে ছিঃ করিনি!

তবে কাকে ছিঃ করল অলকা? কল্পনা করতে গিয়ে আরও এলোমেলো হয়ে যায় অশেষের চিন্তার যুক্তিগুলি! তবে কি নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছে অলকা? নিজেরই মনটাকে, সেই সঙ্গে নিজেরই গম্ভীর সুন্দর এই মুখটাকে অশুচি মনে করেছে অলকা?

যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তো অশেষের মনের ভিতরের ক্ষতটা আরও অনুতপ্ত হয়ে, আরও দুঃসহ হয়ে জ্বলতে শুরু করবে। আর, নিজেকে অপমানিত বোধ না করেও পারবে না। যাকেই ধিক্কার দিক না কেন অলকা, এ সত্য প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে, অশেষের অন্যায় সহ্য করতে গিয়ে জীবনের একটা ভুল বুঝে ফেলেছে অলকা। সে স্পর্শকে অশুচি স্পর্শ বলে মনে হয়েছে। অন্য এক পুরুষের প্রেমের জন্য উৎসর্গ হয়ে আছে যে মেয়ে, সে মেয়ে এমন ভুল করে ফেললে নিজেকে অপরাধিনী বলে না মনে করে পারবেই বা কেন? হ্যাঁ, অলকার কঠিন আত্মবিশ্বাসের অহংকার হঠাৎ

ভুলে, একটা ক্ষণিক লোভের মায়ায় পড়ে কি করুণ আত্মবিনাশ ডেকে এনেছিল। মাত্র একদিন আগে অদ্ভুতভাবে পরিচয় হয়েছে, এমনই এক ভদ্রলোকের কাছে নিজের চরিত্রটাকে নিতান্ত একটা লোলুপ মেয়েলিপনা বলে ধরিয়ে দিয়েছে।

অথচ, এই অলকা এখনও স্মরণ করতে পারে যে, শৈলেশ্বর নামে সে ভদ্রলোকের এই ধরনেরই একটা কামনার অনুরোধ সহ্য করতে না পেরে আর ভয় পেয়ে, প্রাণ মন আর শরীরটাকে সাবধানে বাঁচিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। কি আশ্চর্য, শৈলেশ্বরের কাছেও অলকার যে সাবধানতা হার মানেনি, একদিন আগের পরিচিত এই ভদ্রলোকের কাছে সেই সাবধানতা কেন মিথ্যে হয়ে গেল ?

অলকার চোখ দুটো শান্ত হতে হতে যেন একেবারে শুকনো খটখটে হয়ে যায়। আনমনার মত বাইরের বাগানের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অলকার চোখ দুটো যেন অন্য একটা ঘটনার উপর ভ্রূকুটি হেনে দপদপ করছে। ভয়ে ভয়ে আর কুণ্ঠিতভাবে ডাক দেয় অশেষ—তুমি মিছিমিছি... ।

অশেষের কথা হয়ত শুনতে পায়নি অলকা। অলকার মন যেন অন্য একটা অপমানের উপর রাগ করে একটা নতুন সত্যের বিস্ময় সহ্য করতে চেষ্টা করছে। শৈলেশ্বর, কিরকম একটা মন-ছাড়া মানুষের মত সে ভদ্রলোকের ব্যবহার। ভালবাসার কথা বলেও শুধু দিনের পর দিন কেমন বেদনাহীনভাবে অলকার জীবনের সবচেয়ে বড় আশার উৎসাহ ও ব্যস্ততাকে শুধু একটা খেলার মত দেখেছে। দিনের পর দিন শুধু একটি আশ্বাসের কথা দিয়ে বিদায় করে দিতে সত্যিই কি কোনও কষ্ট বোধ করেছিল ভদ্রলোক ? বোধ করলে কি...ছিঃ...সেই অনুরোধও কি ওরকম একটা হুকুমের মত ভাষায় কেউ করতে পারে ?

যাক যা হবার তা তো হয়েই গেল। শৈলেশ্বর যা-ই হোক, তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও মনে মনে আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না অলকা, এই রাত্রের এই অদ্ভুত একটা বাড়ির এই নিরালা বারান্দার অন্ধকার অলকার প্রাণে যে ঘটনার দাগ এঁকে দিয়েছে, সে ঘটনা চিরকাল শুধু গোপন করে চলতে হবে, এ ঘটনা অলকার জীবনে কোনওদিন গৌরবের ঘোষণা হয়ে মুখরিত হতে পারে না। অস্বীকার করতে পারে না অলকা, এই ঘটনাকে ঘৃণা করতে যে পারা যাচ্ছে না। সত্যিই যে অশেষ ডাক্তার নামে এই ভদ্রলোক... । ছিঃ ! যে মানুষ বিমান চৌধুরীর মেয়েকে একটা অন্ধকারের সুযোগে শুধু বুকে টেনে নিয়ে আমোদ পেতে চায়, সে মানুষ...না, কখনওই না, সে মানুষের মনে অলকার স্বামী হবার কোনও সাধ নেই, থাকতেও পারে না। সে জন্য ভদ্রলোককে দোষ দেবারও কোনও অধিকার নেই অলকার। অশেষ ডাক্তার তো ভুলেও এমন কোনও কথা বলেনি যে, তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে অলকা, তুমি যদি আমার আপন হয়ে যাও, তবে... ।

কিন্তু এই ভদ্রলোকের সম্পর্কে এসব কথা চিন্তা করে, আর এসব অভিযোগ আরোপ করেই বা লাভ কী ? অলকার সে অধিকার কোথায় ? অশেষও তো অলকাকে আজ এই মুহূর্তে সোজা সহজ ভাষায় এবং বেশ একটু কঠিন স্বরে প্রশ্ন করতে পারে, তুমি এই দুদিন ধরে আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছ ? কী কথা বলেছ ? ভুলেও কি এমন একটা কথা বলেছ যে তারপর তোমাকে ভালবাসার কথা আমার মনে হতে পারে ? বরং তোমার এমনই নির্লজ্জ দুঃসাহস যে আমাকে একটা পুরুষ বলেও মনে করতে পারনি, তা না হলে তোমার প্রেমের পুরুষকে তোমার জন্যে ডেকে আনার কাজে আমাকে হুকুম করতে তোমার একটু লজ্জা হত। হিস্টিরিয়াতেও কোনও মেয়ের মুখের ভাষা এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে যায় না।

অশেষের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবতে চেষ্টা করে অলকা। চোখ দুটো হঠাৎ বেদনার্ত হয়ে যেন বুজে যেতে চায়। কিংবা ভয়ানক লজ্জা পেয়েছে অলকার চোখ দুটো।

বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে, এতদিনের একটা ভুলের হিস্টিরিয়াটা। আর বুকের ভিতরেও যেন সেই লজ্জার একটা কঠোর কলরব শুনতে পায় অলকা। ছিঃ, কিসের এত অহংকার অলকা ? শৈলেশ্বরের উপর যে এত মোহ ছিল, এত যে সাধ নিয়ে তার কাছে ছুটোছুটি করতে আর তার আদেশের এত যে বাধ্যটি হয়ে কাজ করতে, সে কি বিমান চৌধুরীর মেয়ের অহংকারের প্রমাণ ? না, বড়লোকের বউ

হবার জন্য লোভী আকাঙ্ক্ষার একটা ব্যাকুলতার প্রমাণ ? তুমি নিজেও বুঝতে পারনি যে, শৈলেশ্বর তোমাকে মনে প্রাণে ভালবাসে না। তুমি নিজেও জানতে পারনি যে, শৈলেশ্বরকে তুমি মনে প্রাণে ভালবাসতে পারনি। যদি তাই হ্ত, তবে শৈলেশ্বরের সেই অনুরোধের কথায় তোমার ভয় পেতে হ্ত না।

অলকা বলে—আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তবে একটা কথা বলতে পারি।

অশেষ—আমি কিছুই মনে করব না।

অলকা—শৈলেশ্বরের কথা আপনার কাছে বলে আমি নিজে আপনার কাছে এমন একটা লজ্জাহীন কাণ্ড করেছি, যা কোনও মেয়ে মাথা খারাপ না হলে করতে পারে না।

অশেষ—ওসব কথা ভেবে তুমি আবার কেন...।

অলকা—আমাকে মিছে সান্ত্বনা দেবেন না। ভুল বুঝতে দিন, ভুল স্বীকার করতে দিন।

আশ্চর্য হয়ে অলকার মুখের দিকে তাকায় অশেষ। অলকা বলে—নিজেকে যা মনে করেছিলাম, তা যে আমি নই, সেটা বুঝতে পারিনি বলেই...।

অশেষ—মনের ওরকম অবস্থা কারও কারও হয়। সেটা খুব দোষেরও নয়! মনের একটা বিশ্বাস হঠাৎ বিনা দোষে আহত হ'লে...

হেসে ওঠে অলকা—হিস্টিরিয়া হয়, ডাক্তারিতে তাই বলে বোধ হয়।

অশেষও হাসে—ডাক্তারিতে একথাও বলে, হিস্টিরিয়ার কারণটা জানতে পারলে রোগীর রোগও সেরে যায়।

অলকা কুণ্ঠিতভাবে হাসে—আমিও সেরে গিয়েছি বলে মনে হচ্ছে।

অশেষ—ঠাট্টা করছ মনে হচ্ছে।

অলকা গম্ভীর হয়—একটুও ঠাট্টা করছি না অশেষবাবু। বরং...।

অশেষ—কী ?

অলকা মাথা হেঁট করে—আপনার কাছে অনুরোধ।

অশেষ—বলো।

অলকা—আপনি মাপ করুন।

অশেষ বিব্রতভাবে বলে—মাপ করব কেন ? তুমি কী দোষ করলে যে, মাপ করতে হবে ?

অলকার চোখ থেকে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে থাকে—আমি আপনাকে এমন অনেক কথা বলেছি, যা কখনও কোনও ভদ্রলোক সহ্য করে না।

অশেষ হেসে ওঠে !—কিন্তু আমি খুব খুশি হয়ে সহ্য করেছি। তুমি অনায়াসে ধরে নিতে পার যে আমি একটা অভদ্রলোক।

অলকার করুণ মুখটা যেন অশেষের এই মিষ্টি ঠাট্টার ভিতর থেকে একটা মিষ্টি সান্ত্বনার স্বাদ পেয়ে হেসে উঠতে চেষ্টা করে।

জোরে একটা হাঁফ ছাড়ে অলকা, যেন এতক্ষণে অলকার প্রাণটা নির্ভয় হতে পেরেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে একবার একটু চিন্তিত হয়ে ওঠে অলকা।—কথায় কথায় কতখানি সময় নষ্ট হল, ভেবে দেখুন।

অশেষ—তা অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।

অলকা—আর দেরি করবেন না অশেষবাবু। এইবার আমাদের ফিরে যাবার একটা ব্যবস্থা করুন। নইলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

অশেষ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে ডাক দেয়—রামলাল।

একটা চাকর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। অশেষ বলে—খুব তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসো।

রামলাল চলে যাবার পর আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। কিন্তু সেই নীরবতা ঠিক নিশ্চলতা নয়। বারান্দা থেকে নেমে ফুলের টবের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে অলকা। অশেষও ঘুরে বেড়ায়; যদিও অলকার পাশে পাশে নয়; কিন্তু নিকটেই।

অলকা বলে—নিশ্চয় আমার মাথায় একটা রোগ হয়েছিল অশেষবাবু। এখন মনে পড়েছে, কয়েকটা বছর যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। একটা ফুলের দিকেও ভাল করে তাকাইনি ! অথচ...।

অশেষ—কী !

অলকা—এই ফুলগুলিকে দেখতে কত ভাল লাগছে। মনেও পড়ছে, ছেলেবেলায় আমি ফুল কত ভালবাসতাম।

অশেষ—আমাকে আজকাল বেশ একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছে, আর এই ফুলগুলির জন্যেই ভাবনায় পড়তে হয়েছে।

অলকা—কী বললেন ?

অশেষ—আমি নিজের হাতেই এইসব ফুল এতদিন লালন-পালন করে এসেছি, কিন্তু আজকাল নিজের হাতে বলতে গেলে কিছুই করতে পারছি না। চাকরটাও ফাঁকি দেয়, কাজেই ভাবতে হচ্ছে...।

অলকা—কেন নিজের হাতে কিছু করতে পারেন না ?

অশেষ—পেটের জন্যে...।

অলকা—তার মানে ?

অশেষ—ডাক্তার হয়েও এতদিন নিষ্কর্মা ছিলাম। কোনও রোগীর ডাক আসত না, কোনও টাকাও পাইনি।

অলকা—তা হলে আজকাল খুব কাজের মানুষ হয়েছেন !

অশেষ—হ্যাঁ, দুটো হাসপাতালে চাকরি পেয়েছি, তাই কাজের ফাঁকে এমন একটুও সময় পাই না যে ফুলগুলিকে একটু...।

অলকা—কিন্তু বেশ তো এই দুটো দিন শুধু অকাজে—।

অশেষ—কী বললে ?

অলকা হাসে—না, না। অকাজে বলব কেন ? মাসতুতো বোনের বিয়েতে খাটতে হয়েছে, সেটা অকাজ কেন হবে ?

অশেষ—গতকাল আর আজ, শুধু এই দুটি দিন ছুটি নিয়েছি। বাস, আবার কাল থেকে কাজের তাড়াহুড়ো পড়ে যাবে।

অলকা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়।—বাস তারপর ঢাকুরিয়ার পুরনো বাগান স্ট্রিটের কোনও গাছের ছায়া মাড়াবার সুযোগও আর হবে না, কেমন ?

হঠাৎ যেন জীবনের একটা শাস্তির আদেশ অলকার মৃদু অনুযোগের ভাষার মধ্যে চিৎকার করে উঠেছে। না, আর সুযোগ হবে না। অলকা চৌধুরী চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে যাবে।

—সময় কত হল ? অলকার আচমকা প্রশ্নের শব্দ শুনে অশেষের নীরব ভাবনা যেন চমকে ওঠে। সত্যিই তো, কত সময় হল ? তার মানে কত রাত হল ? হাতের কব্জির সঙ্গে চেন-বাঁধা এমন একটা দামি ঘড়ি থাকতেও এতক্ষণের মধ্যে একবারও সময়টা জানবার চেষ্টা করেনি অশেষ। একা অশেষেরই বা দোষ হবে কেন ? অলকাও তো এতক্ষণের মধ্যে কোনও মুহূর্তে জানতে চায়নি, সত্যিই কত রাত হল ? অথচ রাত হয়ে যাওয়াটাই যে দু'জনের জীবনের সব চেয়ে বড় ভয়, সব চেয়ে বেশি লজ্জা।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় অশেষ—রাত ন'টা।

অলকার দুই চোখ ঝিক করে হেসে ওঠে, যেন দুর্বোধ্য একটা বিস্ময়ই ঝিক করে হেসে উঠল। মাত্র রাত ন'টা ? কী করে এমন অসম্ভব সম্ভব হল ? এতক্ষণ ধরে অলকার প্রাণটা যে এক যুগের অস্থিরতার মত একটা দশায় পড়ে হেসেছে কেঁদেছে আর ছটফট করেছে। মনের ভিতরে যে এতক্ষণ ধরে সমুদ্রের ঢেউ-এর মত চিন্তার পর চিন্তার অগুনতি ঢেউ বয়ে গিয়েছে।

এক একটা ভয়কে যে অনন্তকালের ভয় বলে মনে হয়েছে। যত কথা বুকের ভিতরটাকে নীরবে তোলপাড় করছে ; সেগুলি মুখের ভাষায় বর্ণনা করতে এক বছরের সময়েও কুলোবে কিনা সন্দেহ। সন্ধ্যা ছ'টার সময় ঢাকুরিয়া থেকে রওনা হবার পর থেকে আলিপুরের এই বাড়ির এতগুলি অদ্ভুত

ঘটনা ; সময় পার হয়েছে মাত্র তিন ঘন্টা।

অলকার চোখের বিস্ময়ই বা হাসি হয়ে ফুটে ওঠে কেন ? হাঁফ ছেড়ে অশেষও যেন একটা স্বস্তির হাসি হাসে। —মাত্র রাত ন'টা হয়েছে অলকা ? খুব বেশি সময় নষ্ট হয়নি !

অলকাও সায় দিয়ে বলে—না, এমন কিছু বেশি রাত নয় !

যেন দুজনের জীবনের ভয় দুটো এখন খুশি হয়ে হাসিমুখে স্বীকার করতে পারছে, না, বেশি সময় নষ্ট হয়নি !

কিন্তু এই খুশির স্বীকৃতির মধ্যে যেন একটা অপরাধের স্বীকৃতিও আছে। এমন কিছু বেশি সময় না হোক, মাত্র তিনটি ঘন্টা, তবু এই সামান্য তিনটি ঘন্টার সময় তো নষ্ট হয়েছে।

নিশ্চয় কোনও একটা চেষ্টা কিংবা আশা নষ্ট হয়েছে, নয়ত সময়টা নষ্ট হয়েছে বলে মনে হবে কেন ? অলকা গম্ভীর হয়। অশেষও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—যাকগে, এখন অন্তত আরও কিছুক্ষণ যদি... ।

অলকা—কী বলছেন ?

অশেষ—বলছি, এবার অন্তত আর বাজে কথা বলে সময় নষ্ট না করে শুধু... ।

অলকা—হ্যাঁ, পুরনো কথা না তুলে... ।

অশেষ হাসে—শুধু যদি মন খুলে চিনেবাদাম ভাজার গল্প করা যায়, তবে সময়টা সার্থক হয়।

অলকা হাসে—সার্থক হয় বইকি।

দুঃসহ পথক্লেশের পর শরীরের সঙ্গে প্রাণও যেমন একটা স্নিগ্ধতার স্নান খোঁজে, তেমনই এই ফুরফুরে হাওয়ার মধ্যে আর আধঘন্টাকে কাছে পাওয়ার এই ইচ্ছাটা যেন সেই রকমের ইচ্ছা। ভুল ভুলে যাওয়া, ক্ষত মুছে ফেলা, সব তর্কাতর্কির উপদ্রব দূরে সরিয়ে দেওয়া। পৃথিবীর কোনও পান্থশালায় হঠাৎ দেখা দুই মানুষের ক্ষণিক বন্ধুত্বের মত শুধু প্রসন্ন মনের বিনিময়। অভিযোগের কথা নয়, আক্ষেপের কথা নয়। হোক না চিনেবাদাম ভাজার গল্প ; লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

অলকা বলে—চিনেবাদাম ভাজা আমার দু'চক্ষের বিষ। ওটা তিলকার খুব পছন্দ। আমার বরং.. ।

অশেষ—তোমার বোধ হয় বেশ কড়া ঝাল মেশানো ঘুঘনি টুগনি... ।

অলকা—না, মোটেই না। বেশি মিষ্টি আমার পছন্দ নয়। আলুকে চিঁড়ের মত কুচোকুচো করে' সামান্য একটু ঘিয়ে সাঁতলে নিয়ে নুন আর আদাবাটা দিয়ে খেতে আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে।

অশেষ—আগে বললেই পারতে, তা হলে একটা বাজে মোহনভোগ তৈরির ঝামেলা না করে, রমাকে দিয়ে শুধু চাবটে আলু কুচিয়ে... ।

অলকা—রমার সাধ্যি কি ? ভাবতে যত সহজ, কাজটা করা তত সহজ নয় ! প্রত্যেকটা আলু-কুচো সমান সাইজের হবে। তার জন্যে রীতিমত সাধনা দরকার। আমার লেগেছে প্রায় তিন বছরের সাধনা।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অলকা। —এটা কী ব্যাপার ?

জায়গাটার উপর বাগানের মালী জল ঢেলে দিয়ে গিয়েছে, ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ তখনও ফিকে হয়ে যায়নি। জায়গাটার উপরে তারের জালের মস্তবড় একটা ঘেরাটোপ।

অশেষ বলে—ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়, রাক্ষুসে সূর্যমুখীর চারা বের হয়েছে। চড়ুইগুলো যখন-তখন এসে ঠুকরে ঠুকরে চারা ভেঙে দেয়, তাই জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

অলকা—গল্পটা কি সত্যি ?

অশেষ—কোন গল্পটা ?

অলকা—এই সূর্যমুখীর গল্প। সূর্য যেমন পুব থেকে পশ্চিমে সরে যায়, সূর্যমুখীও তেমনি সূর্যের দিকে তাকিয়ে থেকে পুব থেকে পশ্চিম দিকে মুখ ফেরায় ?

অশেষ—আমিও তো গল্পটা শুনেছিলাম। কিন্তু অন্তত আমার রাক্ষুসে সূর্যমুখীর কথা বলতে পারি, ওরা সূর্যকে খাতির করে না।

অলকা—সূর্যই বা ওদের কোন খাতির করে ?

অশেষ—মোটামুটি সমস্যাটা একই দাঁড়াল। কেউ কাউকে খাতির করে কিনা, সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

অলকা—আপনি সায়েন্স ভাল জানেন বলে মনে হচ্ছে।

অশেষ—কেন এমনটা মনে হচ্ছে ?

অলকা—আপনি ডাক্তার মানুষ।

অশেষ—ডাক্তারিতে এখনও যার একটুও পশার হল না, তার মনুষ্যত্বকে ডাক্তার বলে সন্দেহ করা উচিত হয় কি ?

অলকা হাসে—পশার হবেই একদিন।

অশেষ—হয়ত হবে, কিন্তু সেদিন কি কেউ আমাকে ডাক্তার মানুষ বলে মনে করতে পারবে ?

অলকা—তার মানে ?

অশেষ—সেদিন সত্যিই মানুষ হয়ে থাকা সম্ভব হবে কি ?

অলকা—খুব খাঁটি কথা না হলেও একেবারে বাজে কথা বলেননি। বড় ডাক্তার হলেই গলা-কাটা ফি কেন যে আদায় করেন বুঝতে পারি না। আমাদের পাড়াতেই...।

অশেষ—কী ?

অলকা—একটা রিক্সাওয়ালা একদিন রাস্তার উপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই সময় সেখান দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন ডাক্তার সিদ্ধার্থ চৌধুরী। নাম শুনেছেন নিশ্চয় ?

অশেষ—ওরে বাবা ! তাঁর নাম কি কারও অজানা ?

অলকা—বাবা তাঁকে অনুরোধ করলেন, দয়া করে একবার রিক্সাওয়ালাকে একটু দেখে যান। তিনি গাড়ি থেকে নামলেন, রিক্সাওয়ালাকে দেখলেন, একটা কাগজে ওষুধের নামও লিখে দিলেন। তারপরেই বাবার দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বললেন—জেন্টেলম্যান।

অশেষ—ফি চাইলেন বুঝি ?

অলকা—হ্যাঁ, পঁয়তাল্লিশ টাকা। ভাগ্যিস আমার পরীক্ষার ফি আগের দিন জমা দিয়ে ফেলিনি। বাবা তখুনি টাকা দিয়ে ডাক্তার সিদ্ধার্থ চৌধুরীর সেই লম্বা হাতের দাবি মিটিয়ে দিলেন।

অশেষ যেন লজ্জিত হয়। কুণ্ঠিতভাবে বলে—তোমাদের পাড়াতে কোনও গরিব মানুষের যদি কখনও ডাক্তার দরকার হয়, তবে আমাকে একবার টেলিফোনে খবর দিলেই আমি রুগি দেখে আসব।

অলকা—তা হলে সত্যিই ভাল হয় অশেষবাবু।

অশেষ—ফি অবশ্য নেব, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ টাকা নয়, পাঁচ টাকা নয় ! যে যা দিতে পারবে, তাই নেব।

অলকা—কেউ যদি শুধু শূন্য দিতে চায়, তবে ?

অশেষ—দিতে চাইলেই হবে না। দেবার কিছু না থাকলে তবেই শূন্য দিতে পারবে।

অলকা—বেশ তো, অতি উত্তম শর্ত। এখনি গিয়ে বাবাকে খবরটা জানাতে হবে।

অশেষ—বিমানবাবু শুনে খুব খুশি হবেন বোধ হয় ?

অলকা—শুধু কি খুশি ? আনন্দে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে কী যে কাণ্ড করবেন জানি না !...তার কারণ কী জানেন ?

অশেষ—কী ?

অলকা—রাধীর মা নামে এক বুড়ি আমাদের পাড়ার একটা বস্তিতে থাকে। রাধীর নিউমোনিয়া হয়েছিল। রাধীর মা এসে বাবাকে ধরলে, একজন ডাক্তার ডেকে দিন আর ওষুধ যোগাড় করে দিন বাবু। কিন্তু বাবার হাতে সেদিন দশ আনা পয়সাও ছিল না। কোনও ডাক্তারকে তিনি আনতে পারেননি। বিনা ফি-তে কেউ আসতে রাজি হননি।

অশেষ—তারপর ?

অলকা—তারপর আর কী ? রাধী মারা গেল। আর বুঝতেই পারছেন, বাবার অবস্থা কি

দাঁড়াল ? পুরো একটা মাস ছোট ছেলের মত ভেউ-ভেউ করে কাঁদলেন।

অশেষ কিছুক্ষণ আনমনার মত গম্ভীর হয়ে থাকে। বিমান চৌধুরী নামে এক বৃদ্ধ কম্পাউন্ডার ভদ্রলোকের এই কান্নার গল্পটা যেন অশেষ ডাক্তারের মনের কোন একটা অহংকারের উপর বিদ্রূপের আঘাতের মত আছড়ে পড়েছে। সেই অহংকারের ভাবটাও ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

অলকা—হঠাৎ চুপ করে গেলেন কেন ?

অশেষ—আমার মনে একটা অহংকার ছিল ; এখন বুঝতে পারছি...।

অলকা—অহংকার ?

অশেষ—হ্যাঁ, অনেক লোক আমাকে প্রশংসা করে, আমি নাকি লোকের উপকার করতে ভালবাসি। অর্থাৎ আমার মত বিনা পয়সায় এত রুগী দেখবার মত উদার মন নাকি কোনও ডাক্তারের নেই।

অলকা হাসে—সত্যি হয়ে থাকলে এমন অহংকারের কোনও দোষ নেই।

অশেষ—বিমানবাবুর এই কান্নার গল্পটা কিন্তু বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এসব নিতান্ত অসার অহংকার। আমি মানুষের উপকার করতে পেলে খুশি হই, কিন্তু উপকার না করতে পারলে তো আর কেঁদে আকুল হই না।

অলকা একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায়—কিন্তু...

অশেষ—কী ?

অলকা—আপনি আমার কথাগুলি ভাল করে শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি, আপনার কথাগুলিও যে বেশ কাঁদ কাঁদ হয়ে...।

অশেষ লজ্জা পেয়ে হাসতে চেষ্টা করে।—যাক, বাজে কথা বলবার নিয়ম করে নিয়ে আবার এসব কাজের কথা আর মনের কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।

অলকা—তা ছাড়া আমার কাছে মনের কথা বলে ফেলাও আপনার অহংকারের পক্ষে খুবই অন্যায়। কেমন ?

অলকার চোখে যেন একটা অভিমানের ভ্রূভঙ্গি। আশ্চর্য হয় অশেষ। এতক্ষণ পরে আবার যেন একটা অদৃশ্য আক্রোশ আড়াল থেকে দু'জনের কথা বলার আনন্দটাকে উত্যক্ত করবার চেষ্টা করছে। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও সেই আক্রোশের দাবিটাকে যেন এড়িয়ে যেতে পারা যাচ্ছে না। চাপা দিলেও চাপা পড়ছে না। দুজনে যেন আপোষে একটা ফাঁকি স্বীকার করে নেবার প্রতিজ্ঞা করছে, সেই ফাঁকিটাই ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞার সব জোর ভেঙ্গে দিচ্ছে।

অশেষ—আমি মনের কথা বলতে পারি না, তোমার কাছে বলতেও পারিনি। তা ছাড়া, তুমিও জানিয়ে দিয়েছ যে, মনের কথা বলবার কোনও মানে হয় না। সুতরাং...।

অলকা—কিন্তু খুব বুদ্ধি করে আমার মনের সব কথা তো বেশ ভাল করে শুনে নিয়েছেন। আমার উপকার করবার জন্যেও নাকি চেষ্টা করছেন।

অশেষ—না, আমি কথা দিচ্ছি, তোমার উপকার করবার কোন ইচ্ছে আমার নেই।

অলকা—খুব ভাল কথা শোনালেন।

অশেষ—না, ভাল কথা নয় ! খুব দুঃখের কথা, কষ্টের কথা, আমার জীবনে একটা অনর্থক শাস্তির কথা।

বলতে বলতে অশেষের চোখের চাহনিটা যেন তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। অলকা অপলক চোখে অশেষের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদুস্বরে বলে—আমার উপর অনর্থক রাগ করতে আপনার কেন এত ভাল লাগে, বুঝতে পারছি না।

অশেষ—তুমি কোনওদিন বুঝতে পারবে না।

অলকা—বুঝতে পারছি অশেষবাবু।

অশেষ—বিশ্বাস হয় না।

অলকা—বিশ্বাস করুন।

অশেষ—কী বিশ্বাস করব ?

অলকা—আমি আপনার একটা ইচ্ছার কাছে রাজি হইনি, তাই আপনার... ।

অশেষ—তার মানে ?

অলকা—তার মানে, আপনি বিমান চৌধুরীর মেয়েকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরে আর আপনার একটা অহংকারকে খুশি করে নিয়ে পরমুহূর্তে তাকে চিরকালের মত তাড়িয়ে দিতে চান ।

অশেষ ভ্রূকুটি করে—হ্যাঁ, তাই চেয়েছি। বাস, এরপর আর কোনও তর্ক করো না।

অলকা—ঠিক কথা, এমন অপমানের আর ঘৃণার কথা শোনবার পর কে আর তর্ক করতে পারবে বলুন ?

অলকার গলার স্বরে কোনও ক্ষোভ নেই, উত্তেজনা নেই। কত শান্ত স্বরে একটা অসহায় আত্মসমর্পণের মত করুণ হয়ে অলকার কথাগুলি গুনগুন করছে।

অশেষ—কিন্তু, তোমার মনে এই সত্যটুকুও স্বীকার করবার সাহস নেই যে, তুমিও প্রায় তাই ইচ্ছে করে ফেলেছিলে।

মাথা হেঁট করে অলকা। যেন বিনা প্রতিবাদে এই ভয়ংকর অভিযোগ স্বীকার করে নিচ্ছে অলকা। অদ্ভুত একটা মারাত্মক ভুলের কাছে লুটিয়ে পড়বার জন্য অলকার এত সাবধানী আত্মাটাই যেন হঠাৎ দুর্বল হয়ে...না অস্বীকার করে লাভ কী ?

অশেষ—যাক তুমি বেঁচে গিয়েছ, আমিও বেঁচে গিয়েছি।

অলকা—যদি বিশ্বাস করতে পারতাম যে, সত্যিই বেঁচে গিয়েছি, তবে না হয়... ।

অশেষ—একটা মাস বা দুটো মাস, কিংবা একটা বছর কেটে যাক, তখন বিশ্বাস করতে পারবে।

অলকা—কেন ?

অশেষ—তখন আজকের এই লজ্জার কষ্টটুকু কারও মনে আর থাকবে না। তুমি তোমার পড়া নিয়ে থাকবে, আমি আমার ডাক্তারি নিয়ে থাকব। জীবনে তোমার সঙ্গে আমার আর মুখোমুখি দেখা হবারও কোনও সম্ভাবনা নেই। কাজেই... ।

অলকা করুণভাবে হাসে—এই যে আপনি এখনই বললেন, আপনাকে একটা খবর দিলেই আপনি আমাদের পাড়াতে রুগি দেখতে যাবেন, তখন দেখা হয়ে যেতেও তো পারে !

অশেষ—হলে হবে। তবে সে দেখার মধ্যে কোনও ভয় আর থাকবে না।

অলকা—থাকবে।

অশেষ—কেন ?

আঁচল তুলে মুখটা যেন চাপা দিতে গিয়ে অলকা হঠাৎ বলে ওঠে,—আপনাকে দেখতে ভাল লাগবে, তাই।

স্তব্ধ হয়ে যায় অশেষের গলার স্বরের সব অভিযোগের ছন্নছাড়া চাঞ্চল্য। মনটাও যে সব ক্ষোভ হারিয়ে একটা সুস্থির প্রসন্নতার মধ্যে ডুবে যায়। এ কী বলছে অলকা চৌধুরী ?

অলকা—সত্যিই আমাকে একটা হিস্টিরিয়ার রোগিণী বলে মনে করবেন না, অশেষবাবু।

তীব্রভাবে তাকিয়ে অলকার মুখের এই নতুন চেহারাটার রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে অশেষ। —কিন্তু তোমার শৈলেশ্বর কি... ।

অলকার চোখ দুটো ধিক্ করে জ্বলে ওঠে। —ছিঃ।

অশেষ—তার মানে ?

অলকা—ওসব বাজে কথা নিয়ে আপনার আর কোনও মন্তব্য না করাই ভাল।

অশেষ—শৈলেশ্বর তোমার কাছে একটা বাজে কথা ? এ কি বলছ অলকা ?

অলকা—হ্যাঁ, সে নিজে হয়ত মস্ত বড় বিদ্যার আর মহৎ ইচ্ছার মানুষ ; হয়ত আমার উপকার করবার জন্য তার মনে একটা ইচ্ছাও ছিল ; যাই হোক না কেন, সেসব একটা অতীতের গল্প মাত্র। আমার কাছে এখন... ।

অশেষ—বর্তমানের গল্পটা তা হলে কী ?

অলকা—আমাকে জোর করে এতটা নির্লজ্জ হতে বলবেন না।

অশেষ—হ্যাঁ, জোর করতেই হচ্ছে। আমাকে শুনতেই হবে। কে আজ তোমার কাছে... ।

অলকা—আমার কাছে আজ এখন যে রয়েছে, সেই, কে আবার ?

অশেষ—তাকে তো ভাল করে এখনও চিনতে পারনি।

অলকা—সত্যি কথা, চিনতে পারিনি, তবু...।

অশেষ—তবু তাকে...।

অলকা—হ্যাঁ, ভালবাসতে মন চায়।

অলকার একটা হাতকে যেন লোভী লুণ্ঠকের মত শক্ত করে চেপে ধরে অশেষ—যদি সে তোমাকে ঠকায় ?

অলকা—ঠকালে ঠকবে। ঠকাবে মানেই বা কী ? ভালবাসবে না, এই তো ?

অশেষ—শুধু ভালবাসবে না নয় ; বিয়ে করতে যদি রাজি না হয় ?

অলকা—আমি তো এত বড় কোনও দাবি করছি না। ও দাবি করব, এত বড় মাথা খারাপ রোগিণী আমি নই।

অশেষ—তবে শুধু কি...।

অলকা—হ্যাঁ, যখন তাকে দেখতে ইচ্ছে করবে, তখন তাকে দেখতে পাব, এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করি না, দাবিও করি না।

বাগানের গাছের মাথাগুলি দুলতে শুরু করছে। মনে হয় একটা ঝোড়ো হাওয়া এসে বাগানে ঢুকেছে। গাছের আর লতাপাতার ছায়ার ভিড়ে অল্প আলোর আভা যেন ছোট ছোট হাসির উচ্ছ্বলতার মত ছটফটিয়ে উঠছে।

অশেষের দুই হাতের ব্যাকুল এক আগ্রহের মধ্যে অলকার শরীরটা বন্দি হয়ে গিয়েছে। কত ছোট্টটি হয়ে গিয়েছে অলকা। ফুলদলের ফুল্ল কোমলতা যেমন কাঠের চাপে পড়ে আর পিষ্ট হয়ে এতটুকু হয়ে যায়। অলকার আর কথা বলবার সাধ্যি নেই ; মুখ বন্ধ। অশেষের পিপাসিত মুখটাকে মুখের উপর বরণ করে নিয়ে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে অলকা।

প্রথম কথা বলে অশেষ—একটা অনুরোধ আছে।

অলকা—বলো।

অশেষ—যদি আপত্তি না করো, তবে বলতে পারি।

অলকা—কোনও আপত্তি করব না।

অশেষ—চলো, একবার ঘরের ভিতরে যাই।

চমকে ওঠে অলকা। আর, কি আশ্চর্য, দুচোখ থেকে টপ-টপ করে দুটো বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়লেও অলকা বলে—চলো।

অশেষের বুকের ভিতর থেকে যেন অদ্ভুত একটা কান্নার স্বর উথলে উঠতে চায়।—একি বলছ অলকা ?

অলকা—ঠিক বলছি।

অশেষ—তোমার ভয় নেই ?

অলকা—না, তুমি খুশি হলে আমার কোনও ভয় নেই।

অশেষ—যদি বলি, তোমাকে ভুল করে এরকম একটা পাপ কাজে রাজি হতে দেখলে আমি খুশি হব না।

অলকা—পাপ বল আর পুণ্য বল, আমি তো সব তোমারই উপর ছেড়ে দিয়েছি।

অলকার ভেজা চোখের উপর মুখ ঘষতে থাকে অশেষ—আমাকে তুমি ভয়ানক জব্দ করলে অলকা। আমি এতটা আশা করিনি!

অলকা—তবে কী আশা করেছিলে ?

অশেষ—আশা করেছিলাম তুমি নিশ্চয় আর শৈলেশ্বরকে বিয়ে করতে রাজি হবে না, কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে কিনা, সে বিষয়ে...।

অলকার ভেজা চোখ দুটো নতুন বিস্ময়ের আবেশে ছলছল করতে থাকে।—কী বলছ, বুঝতে পারছি না।

অশেষ—বিয়ের কথা বলছি।

অলকা—কে বিয়ে করবে কাকে ?

অশেষ—তুমি আমাকে বিয়ে করবে, তা না হলে...

অলকা হাসে—তা না হলে কী হবে ? আমাকে বাড়ি পৌঁছে আর দেবে না ?

অশেষ—না, তা নয়।

অলকা—তবে কী ? এখনই এক ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেবে ?

অশেষ—না, তাও নয়!

অলকা—তবে ?

অশেষ হাসে—তবে, অগত্যা, আমাকে তোমার চেয়ে অনেক সুন্দর একটি মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।

অলকা—ইস্! সাধ্যি কী ?

অশেষ—সাধ্যি থাকবে না কেন ?

অলকা—আমার চেয়ে সুন্দর হলেও তাকে তোমার ভাল লাগবে না। বিয়ে করতেই পারবে না।

অশেষ—কেন ?

অলকা—তোমার কথায় এত সহজে পাপ-টাপ করতে সে রাজি হবে না, কোনও মেয়েই রাজি হবে না। শুধু অলকা চৌধুরী একটা পাগল বলে, একটা হিস্টিরিয়ার রোগী বলে...।

অলকার মাথাটা কেঁপে কেঁপে অশেষের কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়ে। অলকার ভেজা চোখের বাষ্পও অশেষের কাঁধ ভিজিয়ে দেয়। অলকার মাথায় হাত বুলিয়ে অশেষ বলে—আমার মত পাগলের পক্ষে।

অলকা—তুমি পাগল হবে কেন ?

অশেষ হেসে ফেলে—তাই যদি না হই, তবে তোমার মুখের গালাগালি শুনে অশেষ ডাক্তারের মত ধূর্ত মানুষের প্রাণটাও তোমার প্রেমে পড়ে যাবে কেন ?

অলকা—সত্যিই কি তাই হয়েছিল ?

অশেষ—তখন বুঝতে পারিনি অলকা, কিন্তু বুঝতে বেশি দেরি হয়নি যে, অলকা চৌধুরীকে যদি ঘরে আনতে পারি, তবে জীবনটাকে বোধ হয় একরকম ভালই লাগবে।

অলকা—একরকম ভাল লাগা কি সত্যিই ভাল লাগা ?

অশেষ—ওর বেশি আশা করবার সাহস হয় না!

অলকা—ইচ্ছেও কি হয় না ?

অশেষ—হয় বইকি! তোমাকে ভালবাসতে গিয়ে অনেক কিছুই ভালবাসতে ইচ্ছে করবে, জীবনে এমন একটা অবস্থা দেখা দিলে মন্দ কী ?

অলকা—তা হলে বলো, শুধু একা অলকা চৌধুরীতেই কুলোবে না, তোমার আরও অনেক কিছু চাই।

অশেষ—নিশ্চয় চাই। বিশেষ করে...।

অলকা—কী ?

অশেষ—বলতে খুব ইচ্ছে করছে, না বলাই বোধ হয় ভাল।

অলকা—বলো, আমি কিছু মনে করব না। তা ছাড়া, কোন কথা আর না বলে ছেড়েছ যে...।

অশেষ—না থাক।

অলকা—তার মানে, এখনও আমার ওপর তোমার সন্দেহ আছে।

অশেষ—সন্দেহ নয়, তবে একটা ভয় অবিশ্যি আছে।

অলকা—ভয়!

অশেষ—হ্যাঁ, ভয় ছাড়া আর কী ? আমাকে বিয়ে করবার পর সত্যিই যে আমাকে তোমার ভাল লাগবে, তার নিশ্চয়তা কিছু আছে কি ?

অলকা ভ্রূকুটি করে—তবে কেন ওসব কথা বললে ?

অশেষ—কী কথা ?

অলকা—বিয়ের কথা, ভাললাগার কথা, ইচ্ছের কথা।

অশেষ—একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই।

অলকা—বলে ফেলো।

অশেষ—বিয়ের পর তুমি আমাকে ভালবাসতে পারবে না, এমন সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়েই আমি...।

অলকা মুখ ফেরায়—বুঝলাম, তুমি আমার উপকার করবার জন্য মস্ত একটা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছ।

অশেষ—ত্যাগ স্বীকার করবার প্রশ্ন নয়, মানুষের মন সম্পর্কে কোনও মোহ না রাখবার প্রশ্ন।

অলকার গলার স্বর যেন একটু তপ্ত হয়ে ওঠে।—এমন ধারণা তো আমিও করতে পারি। বিয়ের পর তুমি তো আমাকে...।

অশেষ—কী ?

অলকা—একটা গলগ্রহ বলে মনে করতে পার। দিনরাত শুধু একটা বাজে চেহারার মেয়েকে চোখে দেখা আর তার কথা শোনা, এমন একঘেয়েমি তোমার মত মানুষের পক্ষে সহ্য না করাই...।

অশেষ হাসে—খুব স্বাভাবিক, এই তো ?

অলকা—না, সহ্য না করাই উচিত। তার চেয়ে ভাল, যখন সত্যিই দেখতে ইচ্ছে করবে, তখন শুধু...।

অশেষ—সত্যি কথা অলকা, আমি এমন গর্ব করতে চাই না যে, আমার মনে কোনও গোলমাল কোনওদিন দেখা দেবে না।

অলকা—বেশ তো, সেজন্য এত ভয় করবার কী আছে ?

অলকার গলার স্বরে ক্ষোভের সুর যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। যেন একটা আশার, একটা কঠোর প্রতিশ্রুতি জানাবার মত মনের জোর পেতে চাইছে অলকা। ঝাপসা চোখ দুটোর উপর রুমাল বুলিয়ে আস্তে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। তার পরেই যেন সব ভাবনা আর আশার মোহ মনের ভেতর থেকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে একটা প্রতিজ্ঞা উচ্চারণের মত সুরে বলে ওঠে—আমারও সেজন্যে কোনও ভয় নেই। তুমি হয়ত অলকা চৌধুরীকে তোমার ঘরের জীবনে পেয়েও ভালবাসতে পারবে না। কিন্তু সেজন্যে দুঃখ করব না।

অশেষ—দুঃখ হয়ত করবে না, কিন্তু তবু কি আমাকে ভালবাসতে পারবে ?

অলকা—অন্তত চেষ্টা তো করব ?

অশেষ—তাতে তোমার লাভ ?

অলকা—আমার কোনও লাভ নেই, তবু।

অশেষ করুণভাবে হাসে—আমরা দুজনেই খুব মজার মজার কথা, অদ্ভুত কথা বলছি, যা কেউ বলে না।

অলকা—কী বললে ?

অশেষ—দু'জনের কেউ চিরকাল ভালবাসার প্রতিশ্রুতি না দিয়েও বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী হতে চাইছে, এমন ঘটনার খবর আমি তো কখনও শুনিনি।

অলকা—আমি অদ্ভুত বলেই বোধ হয় এরকম অদ্ভুত সব ইচ্ছের কথা, প্রতিজ্ঞার কথা...।

অশেষ—অশেষ ডাক্তারের মত শুকনো মনের মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত কথা...।

অলকা হঠাৎ সন্দিগ্ধভাবে অশেষের মুখের দিকে তাকায় আর আশ্চর্য হয়ে যায়। হ্যাঁ, সন্দেহ করবার দরকার নেই, অশেষের মুখটা হঠাৎ যেন অগাধ তৃপ্তিতে ভরে গিয়েছে। চোখের দৃষ্টিটা মুগ্ধ। অলকা চৌধুরীকে যেন এখনই হাত ধরে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য অশেষের বুকের ভিতরের নিঃশ্বাসগুলি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

অলকা—তুমি কি এতক্ষণ ধরে এই সব শক্ত-শক্ত বাজে কথা বলে আমাকে পরীক্ষা করে দেখছিলে ?

অশেষ—তাই যদি করে থাকি, তবে দোষ কিছু হয়েছে কি ?

—ছিঃ। মুখ ফেরায় অলকা।

অশেষ—কী হল ?

অলকা—একটা মেয়ের দুর্বল মনকে কাছে পেয়ে এত নিষ্ঠুরতা করতে নেই।

অশেষ—না, আর দরকারও নেই।

অলকা—তার মানে ?

অশেষ—আমার যা জানবার ছিল, তার সবই জানা হয়ে গেল।

অলকা—বেশ হল, এইবার তবে চলো।

হ্যাঁ, যেতে হবে, এতক্ষণে আবার একেবারে প্রথম সমস্যাটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। রামলাল এখনও ট্যাক্সি নিয়ে আসেনি। কিন্তু আর তো দেরি করা উচিত নয়!

অশেষ বলে—আর পাঁচটা মিনিট দেখি। যদি ট্যাক্সি না আসে তবে হেঁটেই রওনা হতে হবে, আর রাস্তায় গিয়ে যেখানে একটা ট্যাক্সি পাওয়া যাবে সেখান থেকে...হ্যাঁ, তাহলে সময় মত পৌঁছে যেতে পারা যাবে।

পাঁচটা মিনিট। আর কথা বলবার কিছু নেই বলে মনে করে চুপ করলেই কি মনটা চুপ হয় ? তবু ভাল, দুজনের এই পাঁচ মিনিটের মনের কথা দুজনের কেউ শুনতে পাবে না।

অশেষের মনের ভিতরে যেন একটা নতুন সংসারের কলরব বাজতে শুরু করেছে। ডাকাডাকি করে এই বাড়ির দিন, সন্ধ্যা ও রাতের যত সাধ আর ইচ্ছাকে কী অদ্ভুত ব্যস্ত করে তুলেছে অলকা। কি ভয়ানক খাটতে পারে অলকা। চাকর আসেনি, তবু বাড়ির কোনও ঘরের মেঝেতে আবর্জনার একটা কুটোও পড়ে নেই। অশেষের সকাল বেলায় চায়ে আর বেশি চিনি পড়ে না। ঠাকুরটা আর চা তৈরিই করে না। অলকা তার নিজের হাতের তৈরি চা ছাড়া কোনও চা অশেষকে খেতেই দেয় না। এ কি ? অশেষের জ্বর হয়েছে সন্দেহ করে, অশেষের ডাক্তারি অহংকারের সব কথা একেবারে তুচ্ছ করে, অলকাই পরীক্ষা করে দেখছে, অশেষের জ্বর হয়েছে কিনা ? অশেষের কপালের উপর গাল পেতে দিয়ে জ্বরের তাপ পরীক্ষা করছে অলকা, বাঃ। এরকম ভুয়ো জ্বর নিয়ে সাতটা দিন এভাবে অলকার ডাক্তারির স্বাদ কপাল ভরে অনুভব করলে মন্দ কি ?...যাঃ, অলকা এত করে বলে দিল, তবুও ভুল হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে রাত হয়েই গেল। বেচারা হয়ত রাগ করে...কি আশ্চর্য, এখনও ঘুমিয়ে পড়েনি অলকা...ওই তো দেখা যাচ্ছে, পুব দিকের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু, এই তো অলকা এখন দাঁড়িয়ে আছে, অপলক চোখে একটা ছোট ঝাউ-এর দিকে তাকিয়ে ; অশেষ যে তার এত কাছে, এই বোধই যেন নেই। যেন এখানে নয় ; এই খোলা হাওয়া আর বাগানের আলো-আঁধারি কুহকের জগতের মধ্যে নয় ; অলকা চৌধুরী যেন ছোট একটা ঘরের আলোর মধ্যে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। চিঠি লেখা শেষ হয়েছে। অশেষের মায়ের ফটোটার উপর বেশ ধুলো জমে ছিল, সে ধুলো মুছে ফেলতে হল। ভদ্রলোক বেশ চালাক। খরচের টাকা পয়সার হিসাব রাখার দায় অলকার উপর ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক যেন হাঁপ ছেড়েছেন। এখন সব ঝঞ্ঝাট অলকার। রামলালকে এক মাসের ছুটি দেওয়া হবে কিনা, এটাও অলকাকেই ভাবতে হচ্ছে। তবু...বড় বিশ্রী অভ্যাস অশেষের ; দিন রাতের এতখানি সময় যদি শুধু বাইরে বাইরে কাটিয়ে দেয়, তবে একা অলকার পক্ষে কি ঘরের এতসব ঝঞ্ঝাট সামলানো সম্ভব ? কিন্তু এই সামান্য কথাটা ওকে বোঝানো যায় না।... তবু... কি আশ্চর্য, শক্ত কথা বললেও মানুষটা হেসে ফেলে আর অলকাকে বুকে জড়াবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়।... কিন্তু এখনও বুঝতে পারছে না মানুষটা, অলকাও মুখ খুলে এখনও বলেনি, বলতে কী ভয়ানক লজ্জা করে...কিন্তু সেদিন আসতে যে খুব বেশি দেরি নেই... বড় জোর আর সাতটা মাস...ডাক্তার না ছাই, একেবারে অন্ধ। কিন্তু শিগগিরই দেখতে পাবে, তখন হিংসুটের মত তাকাতে হবে, আর লোভীর মত হাত বাড়িয়ে অলকার কোলের উপর থেকে একটা ছেলেকে বুকে নেবার জন্যে...না, বাধা দিতে পারবে না অলকা। নাও, নাও, এ তো তোমারই দয়া। কিন্তু ভুলে যেওনা, আমাকে ভালবেসেছ বলেই ওকে পেয়েছ। একে ভালবাসলে আমাকেও

ভালবাসা হয়।

ছোট ঝাউটা যেন গলে গিয়েছে, চোখে আর দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে না। অলকার বুকটা থর থর করে কাঁপছে ; বুকের ভেতরের এই থরথর অনুভব যে অলকার সারা শরীরটাকে একেবারে অলস করে এখানেই লুটিয়ে দিতে চাইছে। এ কী হল ? বুকের ভিতরে যেন একটা বন্ধ কপাটের আগল ভেঙে গেল। ঠোঁট দুটো পিপাসায় শুকিয়ে গিয়ে কাঁপছে। এ কেমন পিপাসা ? জীবনে তো কোনওদিন ভুলেও, কোনও স্বপ্নেও, কোনও কল্পনাতেও...তবে কি অলকা চৌধুরীর প্রাণটা এতদিন ধরে শুকনো গাছের ফুলের মত গন্ধ হারিয়ে শুধু একটা মেয়েমানুষের চেহারা ধরে... বুঝতেও পারেনি যে, শৈলেশ্বরের মত একটা রুক্ষ মানুষের মুখের কথাগুলি প্রেম নয় ; শৈলেশ্বরকে ভালবেসেছি বলে মনে করা যে একটা মিথ্যা বিশ্বাসের হিস্টিরিয়া, একটুও বুঝতে পারা যায়নি। কই, কোনওদিন তো কোনও কল্পনাতেও দেখতে পাওয়া যায়নি, শৈলেশ্বর দু'হাত বাড়িয়ে অলকার কোলের আদুরে জিনিসটাকে বুকে নেবার জন্য কাছে এগিয়ে আসছে। ছিঃ ! এমন কল্পনা যে সম্ভব হয়নি, তাই তো একটা সৌভাগ্য। কিন্তু...

চমকে ওঠে অশেষ। অলকা চৌধুরী যেন ফুঁপিয়ে উঠেছে বলে মনে হল। অশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে কাছে এগিয়ে এসেই অলকার হাত ধরে—আবার কি ভেবে এখানে কাঁদাকাটি শুরু করলে অলকা ?

অলকা—কাঁদছি না, তুমি কিছু মনে করো না।

অশেষ—কাঁদছ না তো এ কী করছ ?

অলকা– জীবনে এরকম জব্দ হব, কোনও দিন ভাবতেও পারিনি।

অশেষ সান্ত্বনার সুরে বলে—জব্দ ?

অলকা—হ্যাঁ, নিজের মনের কাছে জব্দ। আমি সত্যিই শৈলেশ্বরকে ভালবাসিনি, একথা তুমি হয়ত এখনও বিশ্বাস করবে না।

অশেষ—এখন বিশ্বাস করি ; কিন্তু তখন করিনি।

অলকা—তার মানে ?

অশেষ—তার মানে, দুদিন আগে তুমি শৈলেশ্বরের ভালবাসা পাওয়ার জন্যে যে মরতেও প্রস্তুত ছিলে, সেটা অবিশ্বাস করিনি।

অলকা—ছিঃ, কী বিশ্রী তোমার বিশ্বাস।

অশেষ—মেনে নিলাম, আমার বিশ্বাসটা বিশ্রী, কিন্তু মিথ্যে তো নয় !

অলকা—মিথ্যে।

অশেষ—বেশ তো, আমার বিশ্বাস আর তোমার বিশ্বাস না হয় মিথ্যে ; কিন্তু শৈলেশ্বরের বিশ্বাসটা যদি মিথ্যে না হয় ?

অলকা যেন আতঙ্কিতের মত আর্তনাদ করে ওঠে। —কী বললে ?

অশেষ—শৈলেশ্বর যদি সত্যিই তোমাকে ভালবেসে থাকে ? যদি তার মনে সত্যিই এই বিশ্বাস হয়ে থাকে যে, সে তোমাকে ভালবাসে আর তুমি তাকে ভালবাসো।

অলকা—তার ভুল হবে। এমন বিশ্বাস করবার কোনও অধিকার তার নেই।

অশেষ—তার প্রমাণ ?

কি ভয়ানক প্রশ্ন ? অলকার এই আতঙ্কিত প্রাণটার কোন শক্তি নেই যে, সত্যিই প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পারে যে, শৈলেশ্বরের মনে এমন বিশ্বাস থাকাটা অন্যায়। কেমন করে এরই মধ্যে ভুলতে পারবে অলকা, শৈলেশ্বরের লেখা যে চিঠিগুলি অলকার টেবিলের দেরাজের ভিতরে এখনও রয়েছে, সেগুলি কতগুলি প্রেমহীন মিথ্যা, ভালবাসার অস্বীকৃতি ? শৈলেশ্বরও যে ইচ্ছে করলে এখনও এক গাদা চিঠি তুলে নিয়ে এসে এখনই অলকার চোখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে প্রশ্ন করতে পারে—তোমার লেখা এই সব চিঠি কি মিথ্যা ? ভালবাসার স্বীকৃতি না অস্বীকৃতি ?

মাথা হেঁট করে ভীরু অপরাধীর মত বিড় বিড় করে করে অলকা—না, প্রমাণ করবার সাধ্যি নেই।

অশেষ—তবে ?

অশেষের এই প্রশ্নটাও কি নিজের ? কী বলতে চায় অশেষ ? তবে কি অলকা চৌধুরী অশেষের জীবনের কাছে অদৃশ্য হয়ে গেল ? পাঁচ মিনিট আগে যে সুরে কথা বলেছে অশেষ, সেই সুর কেমন করে এত সহজে পাল্টে যায় ? এই তো, এই কয়েকটি মুহূর্ত আগে, যা ছিল এত সরল ও কোমল একটা আগ্রহ, তাই একটা কঠিন সতর্কতা হয়ে গেল। নিজের মনের সাধ অসাধের খবর রাখে না, একটা হঠাৎ ইচ্ছার খেয়ালকে ভালবাসা বলে মনে করে আর একেবারে চিরপ্রেমের অঙ্গীকার করে ফেলতে পারে, এই ভদ্রলোকও কি সেই রকম এক দোমনা বাতিকের মানুষ ?

অলকা করুণভাবে তাকায়—প্রমাণটাকে এত বড় করে দেখছো কেন ? দলিলে ভালবাসার কথা লেখা থাকলেই কি বুঝতে হবে যে ভালবাসা ছিল ?

অশেষ—হয়ত ছিল না। কিন্তু..।

অলকা—কিন্তু আজ তো আর নেই।

অশেষ—তুমি এ কথা বলতে পার ; কারণ তোমার আজ মনে হচ্ছে যে, সত্যিই শৈলেশ্বরকে তুমি ভালবাসতে পারনি। কিন্তু তুমি কেমন করে অবিশ্বাস করবে যে, শৈলেশ্বর আজও তোমাকে ভালবাসে না ?

নীরব হয়ে, যেন একটা নিরুত্তর বোবা বেদনার ভারে নিঝুম হয়ে যায় অলকা। উত্তর দেবার কিছু নেই। সত্যিই তো ; শৈলেশ্বর যে অলকা চৌধুরীরকে ভালবাসে না, এর প্রমাণ নেই ! শুধু সন্দেহ করা যেতে পারে ; কিন্তু সন্দেহটা তো প্রমাণ নয় ! কালই যদি শৈলেশ্বর এসে ডাক দেয়—চলো অলকা, আমি এতদিন তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম। তবে ?

অশেষ—অত ভাবতে হচ্ছে কেন অলকা ? কিসের ভাবনা ?

অলকা ছটফট করে যেন অসহায় প্রাণটাকেই একটা নাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—না, কোনও ভাবনা নেই।

অশেষ—তার মানে ?

অলকা—শৈলেশ্বরকে বলে দিতে আমার একটুও বাধবে না।

অশেষ—কী ?

অলকা—বলে দিতে পারব, ভালবেসে লাভ নেই।

অশেষ—তারপর ?

অলকা—শৈলেশ্বর আশ্চর্য হয়ে চলে যাবে।

অশেষ—কিন্তু, তার মনে যে আঘাত দেওয়া হবে তাতে... !

অলকা—তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

অশেষ—কী ?

অলকা—জীবনে তোমার কাছেও আর মুখ দেখাব না।

অশেষ—কী বললে ?

অলকা—তোমার ভালর জন্যই বলছি। আমাকে বিশ্বাস করা তোমার আর উচিত হবে না। তা ছাড়া...।

অশেষ—বলো।

অলকা—তা ছাড়া, বুঝতে পারছি, নিজেকেও বিশ্বাস করা আমার আর উচিত হবে না। অলকা চৌধুরী বেঁচে থাকলে আরও ভয়ানক ভুল করবে, মানুষের জীবনের অনেক ক্ষতি করবে।

অশেষ—তার মানে, মরে যাবে তবু অশেষ ডাক্তারকে বিয়ে করবে না, এই তো ?

অলকা—হ্যাঁ, আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। এখানেই সব শেষ। এবার দয়া করে...।

কিন্তু অশেষের প্রাণের কৌতূহল যেন আরও নির্লজ্জ হয়ে অলকার এই কঠোর সংকল্পের মুখটার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।—তার মানে কি এই বুঝব যে, আমাকে তুমি ভালবাসতে পারলে না ?

অলকা উদাসভাবে তাকায়—আর এসব প্রশ্ন করো না। কোনও দরকার নেই।

অশেষ—কিন্তু আমার যে দরকার আছে। আমি যে তোমাকে ভালবাসি। অন্য কেউ তোমাকে

ভালবাসে কি ভালবাসে না, সেসব প্রশ্নের আমি ধার ধারি না।

অলকার চোখের দৃষ্টিটা যেন আবার নতুন বিস্ময়ের ছোঁয়ায় কেঁপে ওঠে। —বুঝতে পারছি না, তুমি কি তবু...।

অশেষ—হ্যাঁ, তবু তোমাকে আমার ঘরে আনতে চাই।

অলকা—আমাকে অস্পৃশ্য মনে হবে না ?

অশেষ—না।

অলকা—তুমি খুশি হবে ?

অশেষ—হব।

অলকা—আমার ওপর তোমার এত ক্ষমা, এত মায়া কেন ?

অশেষ—তোমাকে ভাল লাগে বলে।

অলাক—কেন ভাল লাগে ?

অশেষ—তুমি ভালবাসতে জান বলে।

অলকা—কিসে প্রমাণ পেলে ?

অশেষ—এই যে, শৈলেশ্বরের উপর তুমি রাগ করতে পারলে না, তাকে ঘেন্না করতে পারলে না।

আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে যায় অলকা। তারপরেই বিপন্নের মত মুখ করে অশেষের দিকে তাকায় ; —এমন কোনও উপায় কি নেই যাতে...।

অশেষ—কী বললে ?

অলকা—শৈলেশ্বর সত্যিই যাতে আমার কথা ভুলে যেতে পারে, এমন কোনও ব্যবস্থা কি সম্ভব নয় ?

অশেষ হেসে ফেলে—তার মানেটা কী ? শৈলেশ্বরকে বলে দিতে হবে যে, অলকা চৌধুরী এখন তার দুদিনের পরিচিত এক ডাক্তারকে ভালবেসে বসে আছে।

অলকা—সে কথা বললেও যে, তাকে কষ্ট দেওয়া হবে। শুনে সে হয়ত আমাকে ঘেন্না করবে কিন্তু একথাও তো তার মনে হবে যে, মানুষ মানুষকে কত ছলনা করতে পারে।

অশেষ—তা হলে আর কোন ব্যবস্থা হতে পারে ?

অলকা—শৈলেশ্বরের সঙ্গে যদি কোনও সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হয়ে যেত, তবে...।

অশেষ—তা হলে কী হত ?

অলকা—তা হলে আমি নিজেকে এত ছোট আর এত ভয়ানক বলে মনে করবার ভয় থেকে কিছুটা মুক্তি পেতাম।

অশেষ—আমার মাসতুতো বোনটি দেখতে বেশ ভালই।

অলকা—কে ?

অশেষ—এরই মধ্যে ভুলে গেলে ? তোমাদের পাড়ার ত্রিদিব বাবুর মেয়ে...।

অলকা—কিন্তু তার যে আজই বিয়ে হয়ে যাবে।

অশেষ—হয়ে যাবে কেন ? এতক্ষণে হয়েই গিয়েছে। ল্যাঠা চুকে গিয়েছে।

অলকা—তবে ?

অশেষ—তবে আবার কী ? তুমি কি আমাকে দিয়ে শৈলেশ্বরের বিয়ের ঘটকালির কাজে খাটাতে চাও ?

অলকা—আমার কথার দোষ ধরো না। আমি হয়ত তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। কিন্তু তুমি বুঝে নিয়ে ব্যবস্থা করো ; যেন...।

অশেষ—কী ?

অলকা—তোমাকে ভালবাসতে যেন আমি কোন বাধা না পাই। নিজেকে যেন দোষী বলে মনে না হয়।

অশেষ—আমার কাছে এতবড় দাবি কেন ?

অলকা—তুমি ছাড়া আমার আর কেই বা...।

অশেষ—তবু তুমি মুখে বলতে পারছ না যে, তুমি আমাকে ভালবাস বলেই এই দাবির অধিকার পেয়েছ।

আস্তে আস্তে হেঁটে অশেষের কাছে এসে দাঁড়ায় অলকা। আস্তে আস্তে মাথাটাকে অশেষের বুকের উপর পেতে দেয়।—আর ভাবতে পারি না, আর কিছু বলতে পারছি না। সব ভয় ভুল পাপ-তাপ নিয়ে তোমার কাছেই চলে এসেছি। ইচ্ছে করলে সরিয়ে দিতে পারো।

ফটকের কাছে গাড়ির হর্ন বাজছে। রামলাল কি তবে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছে?

অশেষ—একটি কথা বলতে চাই।

অলকা—বলো।

অশেষ—বিয়ের কথা কি বিমানবাবুকে বলব?

অলকা—হ্যাঁ।

অশেষ—অপেক্ষা করবার ইচ্ছে নেই।

অলকা—একটুও না।

ট্যাক্সিটা বড় উদ্দাম হয়ে ছুটে চলেছে। শহরের আলো-ছড়ানো রাস্তার ভিড় আর কোলাহল ভেদ করে অশেষ আর অলকার জীবনও যেন এই জগতের কোন পরম বিশ্রামের আশ্রয়ের দিকে ছুটে চলেছে।

অশেষ—এইবার মন খুলে আর একটি কথা বলো, শুনি।

অলকা—শোনবার আর কি কিছু বাকি আছে?

অশেষ—আছে।

অলকা—কী?

অশেষ—এই যে কাল রাত্রিতে ওরকম একটা অসময়ে হঠাৎ তোমাদের বাড়িতে গিয়ে...।

অলকা হাসে—তখন কি ছাই ভাবতে পেরেছিলাম যে, তুমি আমার এরকম সর্বনাশটি করবে?

অশেষ—সে কথা জিজ্ঞেস করছি না। আমাকে সন্দেহ হয়েছিল কি?

অলকা—হয়েছিল বইকি!

অশেষ—রাগও হয়েছিল?

অলকা—কী আশ্চর্য, এখনও বুঝতে পারছি না, কেন হঠাৎ এক অচেনা ভদ্রলোকের উপরে এত রাগ হল।

অশেষ—অথচ পরের দিনই আমার কাছে শৈলেশ্বরের কথা কত সহজে তুমি বলে দিলে।

অলকা—সেটাও বোধ হয় রাগের মাথায়। তোমাকে অপমান করে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে।

অশেষ—মনের এরকম একটা অদ্ভুত রাগের ভাবটাকে সন্দেহ হয়নি?

অলকা—সন্দেহ হয়নি, কিন্তু বিশ্বাস করতেই পারিনি যে, হঠাৎ এক ভদ্রলোককে শুধু চোখে দেখে মুখের কয়েকটা কথা শুনেই তাকে মনে-মনে ভাল লেগে যেতে পারে। আচ্ছা, এইবার তুমি বলো শুনি।

অশেষ—কী?

অলকা—আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়েছিল?

অশেষ—মনে হয়েছিল, বেশ ভাল মানুষ কিন্তু বেশ অহংকারের মানুষ।

অলকা—তাতে তো আমার ওপর রাগ হবারই কথা।

অশেষ—কথা তো তাই, কিন্তু রাগ হয়নি কেন সেটা তখনও বুঝতে পারিনি।

অলকা—আজ বুঝতে পারছ কি?

অশেষ—খুব বুঝেছি, একবারে হাড়ে হাড়ে।

অলকা—ছিঃ, এরকম করে বলো না।

অশেষ—একটা অচেনা মেয়ের অহংকারের ভঙ্গি দেখে আর ধমক-ধামক শুনে অপমানিত হয়েও

যে মানুষ রাগ না করে বরং লোভী হয়ে ওঠে...।

অলকা—এতটা বাড়িয়ে বলো না।

অশেষ—এতটুকুও বাড়িয়ে বলছি না। সত্যি লোভী হয়ে উঠেছিলাম।

অলকা—এ কি সম্ভব ?

অশেষ—আমি কবি-টবি নই, মনীষীও নই। আমার কাছ থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর তুমি পাবে না।

অলকা—আশ্চর্য।

অশেষ—যাক, এই আশ্চর্যটুকু স্বীকার করে নিলেই ভাল। কিসে ভালবাসা হয়, কেন হয় ; এসব তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা।

অলকা—একথা কেন বলছ ?

অশেষ—এ রোগের কারণ জানা শিবেরও অসাধ্য।

অলকা—থাক, আর এত জানাজানির দরকার নেই।

অশেষ—আমি তো তাই বলছি ; এবার থেকে...।

অলকা—কী ?

অশেষ—বই-টই পড়ে, বড় বড় বিদ্যার পরীক্ষায় পাশ করে বিদুষী হবার চেষ্টাটা যদি...।

অলকা হাসে—না, আর বোধ হয় সম্ভব হবে না।

অশেষ—কেন ?

অলকা—ইচ্ছেই হবে না, আর বই-টই কেন ? যা পাওয়ার ছিল পেয়েই গেছি।

অশেষ—কিন্তু একটা কাজ নিয়ে থাকতে হবে তো ?

অলকা—বুঝেছি।

অশেষ—এখনও বুঝতে পেরেছ কিনা সন্দেহ।

অলকা—আমার একটুও সন্দেহ নেই। তুমিই তো আমার কাজ।

অশেষ—তারপর ?

অলকা—তারপর আবার কি ? তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যেদিন মরে যাবার সুযোগ পাব, সেদিন বুঝব যে কাজ ফুরিয়েছে।

অশেষ—শুধু কি আমার মুখের দিকেই তাকাতে চাও ?

অলকা—ছিঃ, আমায় কোন বাজে সন্দেহের কথা বলো না লক্ষ্মীটি।

অশেষ—আমার কথাটা আর একটু ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করো।

ট্যাক্সির ড্রাইভারের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে অলকা ফিসফিস করে। —একটু আস্তে বলো।

অলকার কানের দিকে মুখ ফিরিয়ে অশেষ বলে—বেশ তো আস্তেই বলছি, জবাব দাও।

অলকা—জবাব শোনবার সময় পাবে।

অশেষ—এখন কি অসময় ?

অলকা—আমাকে কত নির্লজ্জ হতে বলছ, ভেবে দেখো।

অশেষ—বলতেই হবে। আমি না শুনে ছাড়ব না।

অলকা—কেন ?

অশেষ—তুমি কি-এমন কম লোভী সেটাও আমি একটু বুঝে নিতে চাই।

অলকা—আমি একটুও কম লোভী নই। তুমি একথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই সেটা বুঝে ফেলবার সৌভাগ্য হয়েছে।

অশেষ—কখন বুঝলে ?

অলকা—এইতো কিছুক্ষণ আগে। তোমার বাড়ির সেই অদ্ভুত আলো-আঁধারের চক্রান্তত আর বাগানের হাওয়ায়...যেন অদ্ভুত একটা ঘুমের স্বপ্ন নিয়ে মনটাকে...।

অশেষ—বলো।

অলকা—মনে হল, তোমার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। অলকার একটা হাত শক্ত করে ধরে অশেষের প্রাণের সব কৌতূহলও যেন নিঝুম হয়ে যায়।

ভালবাসা কি জীবনের নবজন্ম? তা না হলে হাজারবার দেখা যত পরিচিত ও পুরাতনের রূপগুলিও এত নতুন হয়ে যায় কেন? নিজের চেহারাটাকে দেখতে পাচ্ছে না অশেষ, কিন্তু কল্পনা করতে পারে, তার আজকের এই মুহূর্তের মুখটি বোধ হয় ঠিক সেই মুখ নয়। নতুন হয়ে গিয়েছে, হয়ত বেশ সুন্দরও হয়ে উঠেছে মুখটা। তা না হলে অলকা এভাবে এতক্ষণ ধরে দুই চোখ একেবারে অপলক করে অশেষের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কেন?

কালিদাসের কাব্যের একটা কথা নিয়ে কবি বন্ধুরা অনেকদিন আগে যে তর্কাতর্কি করেছিল তারই অর্থহীন কলরব যেন হঠাৎ একটা অর্থ হয়ে অশেষের কানের কাছে বাজছে। কবিরা বাড়িয়ে বলে; তবু মনে হচ্ছে বোধ হয় সত্য কথাটাকেই বাড়িয়ে বলে। শুধু মুখটি দেখে জন্মান্তরের সুহৃদ বলে মনে হয়, কথাটা মিথ্যে নয় বোধ হয়। অলকার শান্ত মুখটাকে যে জীবনের অনেককালের পরিচিত একটি ভালবাসার মুখ বলে মনে হয়। কে বলবে পরশু দিন এই মেয়ের সঙ্গে কোনও চেনা-শোনা ছিল না? এই মুখটি কোনও দিন চোখের সামনে থাকবে না, ভাবতে গেলেও যে বুকটা ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। অলকা-ছাড়া সে জীবন সহ্য করতে পারা যাবে কি?

গাড়ি ছুটছে, পথের দু'পাশের আলোর সারি যেন ছোট ছোট চাঁদের ঝাঁকের মত অশেষের চোখের উপর একটা অদ্ভুত ঝলমলে বিস্ময়ের আভা লুটিয়ে দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে। পথের সোরগোল কানে আসছে ঠিকই, কিন্তু সোরগোল বলে মনে হয় না। সত্যিই কি ভালবাসার মানুষ পাশে থাকলে পৃথিবীর সব কর্কশতার রবও মিষ্টি হয়ে যায়?

এঃ, অশেষের মনের এক কোণে একটা পুরনো ধারণাও যে লজ্জা পেয়ে ছটফট করে ওঠে। তার আজকের এই মনটার এইসব অনুভবের কথাগুলিকে কেউ যদি তিনদিন আগে একটা কাগজে লিখে অশেষকে শোনাত, তবে অশেষ যে তুচ্ছতার হাসি হেসে সেসব কথাকে একটা রোমান্টিক জঞ্জাল বলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিত।

হতে পারে জঞ্জাল, কিন্তু এখন যে সোনা বলে মনে হচ্ছে। বিশ্বাসও করতে হচ্ছে; এটুকু যদি অনুভবে না পাওয়া যেত, তবে জীবনে একটা মস্ত বড় ফাঁকিই থেকে যেত। মন্দ কি? অলকা চৌধুরীকে পুরনো বাগান স্ট্রিটের একটি বাড়ির একটি নারী বলে মনে হয় না। কিন্তু ঠিক যে কী, তাও বুঝতে পারা যায় না। জীবনের বহুদিনের একটা শূন্যতার ফাঁকি মিথ্যে করে দিয়ে অজস্র তৃপ্তিতে ভরে দেবে, এই রকম একটি উপহার যেন কোনও এক অদৃশ্য জগৎ থেকে বের হয়ে অশেষের বুকের কাছে চলে এসেছে।

চমকে ওঠে অশেষ। সত্যিই যে অন্য জগতের একটা স্বর অশেষের কানের কাছে ফিসফিস করে উঠেছে।...কী সুন্দর দেখতে তুমি! কথাটা বলেছে অলকা, কারণ, দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, অলকার ঠোঁট কাঁপছে।

অলকার চোখ দেখেও বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই, দুদিনের পরিচিত এই মানুষটাকে একটা বিস্ময় বলে মনে হয়েছে অলকার। কতকালের পরিচিত, তবু নতুন। বলতে গেলে মানুষটার জীবনের কোনও কিছুই জানে না, তবু মনে হয়, সবই জানা হয়ে গিয়েছে। একটুও লজ্জা করে না, ভয় করে না, সন্দেহ হয় না।

কি যেন বলতে চায় অলকা, কিন্তু বলতে পারছে না। কিন্তু অশেষ কি না শুনেও বুঝে নিতে পারবে না যে অলকা চৌধুরী এখন অনায়াসে এই অশেষ ডাক্তারেরই পা ছুঁয়ে বলে দিতে পারবে, সত্যই যে তুমি একটা মূর্খ মেয়েমানুষকে শিখিয়ে দিলে, কাকে ভালবাসা বলে। তোমার চেয়ে উপকারী আমার আর কেউ নেই। তুমি যদি সরে যাও, তবে দুঃখ হবে ঠিকই; কিন্তু তবু সেই দুঃখ সহ্য করে এই সত্য স্বীকার করব যে, তোমারই জন্যে আমি নিজের প্রাণটাকে চিনতে শিখেছি। তোমার কাছে আমার প্রাণ চিরঋণী হয়ে রইল।

গাড়িটা ডান দিকে মোড় ফিরে গিয়ে খুব জোরে একটা ঝাঁকনি খেল, তাই বোধ হয়, কিংবা কে

জানে কেন, অশেষ যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে গিয়ে বলে ওঠে—এখনও সময় আছে অলকা।

অলকা—কী বললে ?

অশেষ—এখনও সময় আছে ; ঢাকুরিয়া পৌঁছে যেতে এখনও বোধ হয় পনেরো মিনিট সময় লাগবে। এরই মধ্যে ভেবে নিতে পারো ; ভুল করছ কিনা, উচিত হচ্ছে কি না ?

অলকা—ভুল হয় হোক, তবু জানি, অনুচিত কিছু করছি না।

অশেষ—সত্যিই আমাকে বিয়ে করতে তোমার মনে কোনও বাধা নেই ?

অলকা—বাধা থাকবে কেন ?

অশেষ—তুমি যে সত্যিই আমাকে চেন না অলকা।

অলকা—চিনেছি।

অশেষ—কতটুকু চিনেছ ? তুমি কি ধারণা করতে পার যে, খুড়িমা এই বিয়ে একটুও পছন্দ করবেন না ?

অলকা—কেন ?

অশেষ—তাঁর ইচ্ছে, আমি একটা বড় ঘরের মেয়েকে বিয়ে করি। বড় ঘর বলতে খুড়িমা কী বোঝেন সেটা বোধ হয় তুমি বুঝতে পারবে।

অলকা—বুঝেছি, বড়লোকের মেয়ে।

অশেষ—হ্যাঁ, সুতরাং সমস্যাটা কী দাঁড়াবে একটু ভেবে দেখো।

অলকা—কী আর সমস্যা দাঁড়াবে ? কম্পাউন্ডার বিমান চৌধুরীর মেয়েকে দেখে খুড়িমা খুশি হবেন না, হয়ত ঘেন্না করবেন, এই তো।

অশেষ—হ্যাঁ, তার ফলে তোমার মনে যে অশান্তি দেখা দেবে...

অলকার চোখে যেন একটা দুঃসাহসের আনন্দ ঝিলিক দেয়। —অশান্তি দেখা দেবে বলে মনে হয় না।

অশেষ—কেন ?

অলকা—খুড়িমা কতদিন ঘেন্না করতে পারবেন ? এমনও হতে পারে তো, খুড়িমা একদিন নিজেই অলকা চৌধুরীকে ভালবেসে লজ্জা পেয়ে যাবেন।

অশেষ—এতটা শুধু আশা করা যায়, বিশ্বাস করা যায় না !

অলকা—কিন্তু, তাই বলে তুমি তো আমাকে ঘেন্না করবে না ?

অশেষ—আমি তো তাই জানি। কিন্তু এমন তো হতে পারে, আমার কোনও ব্যাপার দেখে তুমি একেবারে চমকে উঠে রাগ করে ঘেন্না করে...।

অলকা—কি ছাই আবোল তাবোল বলছ ? এমন কোনও ব্যাপার থাকতে পারে না, যা দেখে আমি একেবারে একটা পাগল হয়ে গিয়ে তোমাকে ছোট মনে করব।

অশেষ—যদি জানতে পার যে, আমি মদ খাই ?

অলকা—জানলামই বা ; মদ খাওয়া বন্ধ করিয়ে ছাড়ব।

অশেষ—পারবে ?

অলকা—বিশ্বাস তো করি ; পারব। ...এবার তুমি বলো।

অশেষ—কী ?

অলকা হাসে—যদি জানতে পার যে, আমি দিনে রাতে পাঁচবার স্নান করি ; ভাত খাওয়ার সঙ্গে চা খাই, আর মাঝরাতেও ঘুম বন্ধ করে সেলাই করি, তবে ?

অশেষ—তবে তো হাড়সুদ্ধ জ্বালাবে মনে হচ্ছে।

হাসতে গিয়েও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় অশেষ। —আমি কিন্তু ঠিক হাসাহাসির আর ঠাট্টার কোনও কথা বলছি না অলকা। সত্যি কথা, তোমার জীবনের কতটুকুই বা আমি জানি।

অলকা—সবই একদিন জানতে পারবে।

অশেষ—কিন্তু সে তো পরের কথা। তার আগে...।

অলকা—তার আগে কি জানা যায় ? আমার কথা দশ দিন ধরে তোমাকে শোনালেও কি তুমি বুঝতে পারবে, আমার মধ্যে কি আছে আর কি নেই !...তুমিই না এই কিছুক্ষণ আগে বললে যে, জানতে চেষ্টা করা বৃথা।

অশেষ—বলেছিলাম বটে !

অলকা—আর একটা কথা বলতে পারি ; যদি রাগ না কর।

অশেষ—বলো, মোটেই রাগ করব না।

অলকা—তুমি কি নিজেকেও চিনতে পেরেছ ? না, আমি নিজেকেও চিনি ?

অশেষের বুকের ভিতরের অস্থির নিঃশ্বাসটা এইবার হঠাৎ যেন সুস্থির হয়ে যায়।

অলকা বলে—নিজেকে একটুও চিনতে পারিনি। তা না হলে জীবনের এত বড় ভুলকেও ভুল বলে বুঝতে পারিনি কেন ? ভুল করে একটা মানুষের তুচ্ছতাকে ভালবাসা বলে যখন বুঝেছিলাম, তখন নিজেকে বড় চালাক বলেও মনে করেছিলাম।

অশেষ—যাক, আর ওসব কথা নয় অলকা।

অলকা—কতদূর এলাম ?

অশেষ—লেক এসে পড়েছে বোধ হয় !

অলকা—সর্বনাশ।

অশেষ—কী হল ?

অলকা—বড় ভয় করছে। তিলকা যদি জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? কী জবাব দেব ?

অশেষ—সত্যি কথাটা বলতে পারবে না ?

অলকা—পারব না। ভাবতে বড় ভয় করছে।

অশেষ—কিন্তু...।

অলকা—কী ?

অশেষ হেসে ফেলে—কিন্তু তিলকা কি না জিজ্ঞেস করে ছাড়বে ?

অলকা—শুধু তিলকা কেন ? বাবা আর মা কি না জিজ্ঞেস করে ছাড়বেন ?

অশেষ—একটা মিথ্যা কথা বলে দিও।

অলাক—মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

অশেষ—কেন ? সামান্য একটা মিছে কথা...।

অলকা—না, জীবনে এই প্রথম ভালবাসার স্বাদ পেয়েছি, এই সৌভাগ্য কি চুপ করে লুকিয়ে রাখতে পারি ? কিন্তু মিথ্যে কথা দিয়ে চাপা দিতে পারব না। বড় ভয় করবে। এর মধ্যে মিথ্যা কথা বলে একটা অলক্ষুণে কাণ্ড করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় !

অশেষ হাসে—তা হলে আমারই ওপরে একাজের দায় ছেড়ে দাও।

অলকা—কী কাজ ?

অশেষ—এই সব মিছে-টিছে বলবার কাজ।

অলকা—না না, তুমিই বা কেন আমার লজ্জা বাঁচাবার জন্যে একটা মিথ্যে কথা বলবে ? তোমার মনে কি কোনও ভয় নেই ?

অশেষ—খুব ভয় আছে। যদি কেউ কিছু সন্দেহ করে, তবে আমাকেই করবে।

অলকা—কেন ?

অশেষ—কেউ সহজে বিশ্বাসই করবে না যে, শুধু দুদিনের পরিচয়ে তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি ; আমি এত বড় একটা ভদ্রলোক।

অলকাও হেসে ফেলে—ভদ্রলোকেরা বুঝি দুদিনের পরিচয়েই ভালবেসে ফেলে ?

অশেষ—নিশ্চয়। ভালবাসতে হলে একদিনের পরিচয়েই ভালবাসতে পারা যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাজারটি ভাল-মন্দ বিচার করে আর সাবধানে যারা ভালবাসে, তারা সত্যই ভালবাসে বলে আমি মনে করি না।

অলকা—তবে আর তোমার মিছে কথা বলবার দরকার কী ? এইসব সত্যি কথাই বলে দিও।

অশেষ—আমি তো বলে দিতে পারব। তারপর...।

অলকা—তারপর আমার আর ভাবনা কিসের? আমাকে শুধু একটু মাথা নেড়ে জানিয়ে দিতে হবে, হ্যাঁ, সবই সত্যি।

অশেষ—কিন্তু...।

অলকা—বাবা আর মা মনে মনে আশ্চর্য হলেও কিছু বলবেন বলে মনে হয় না। তাঁরা তাঁদের মেয়েকে বোকা বলে মনে করবেন না।

অশেষ—এটাই আশ্চর্য। পৃথিবীর সবচেয়ে একটা বোকা মেয়েকে কেমন করে যে তাঁরা এত বুদ্ধিমতী বলে মনে করে...।

অলকা—এর চেয়েও আশ্চর্য, বাবা আর মা দুজনেই তিলকাকে খুব বোকা বলে মনে করেন। কিন্তু আমি তো জানি...

অশেষ—কী?

অলকা—কি ভয়ানক বুদ্ধি আছে তিলকার বোকা-বোকা চোখ দুটোতে। সেদিন কি অদ্ভুতভাবে আমার আর তোমার মুখের দিকে বার বার তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল তিলকা!

অশেষ—কবে?

অলকা—সেই যে, রাত্রিবেলা তুমি যখন আমাদের বাড়িতে চা খেলে।

অশেষ—তবে তো বুঝতে হয় যে, শেষ পর্যন্ত তিলকারই সন্দেহের জয় হল।

অলকা—তাই তো দেখছি। কিন্তু...।

অশেষ—আবার কিন্তু কিসের?

অলকা—তিলকা যদি ভয়ানক কিছু জিজ্ঞেস করে?

অশেষ—কী জিজ্ঞেস করবে?

অলকা—যদি প্রশ্ন করে বসে, কেন ভালবাসা হল?

অশেষ—উত্তর দিও।

অলকা—উত্তর যে জানি না।

অশেষ—তবে তাই বলে দিও।

অলকা—কী বলব?

অশেষ—যা বুঝেছ, যা বিশ্বাস কর; তাই বলে দিও। কেন ভালবাসা হয় কেউ বলতে পারে না, বলা যায় না। কারণ ভালবাসার মধ্যে কোনও কেন নেই, কারণ নেই।

এ কী? গাড়িটা যে আলোর মালা দিয়ে সাজানো একটা ফটকের তীব্র উজ্জ্বল চেহারার পাশ কাটিয়ে হু-হু করে ছুটে আরও দূরের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই তো পুরনো বাগান স্ট্রিট। আর ওই ফটকই যে এক নম্বর পুরনো বাগান স্ট্রিটের ত্রিদিববাবুর বাড়ির ফটক। ওখানেই যে থামবার কথা।

ট্যাক্সিটা যেখানে থামে, সেখানে চোখ-ধাঁধানো আলো নেই ঘুটঘুটে অন্ধকারও নেই। আলো-আঁধারে মেশামেশি হয়ে আছে, এইরকম একটা জায়গা। যেন একটা অভিসন্ধির ইচ্ছা আলো-আঁধার গায়ে জড়িয়ে চুপ করে রয়েছে।

ট্যাক্সিটা বিদায় নেবার পর, জায়গাটার নীরবতা যেন আরও গভীর একটা চক্রান্তের মত থমথম করে।

মনেও পড়ে অলকার; জায়গাটা অলকার অপরিচিত নয়। এই তো, আজই এই সড়কের এই আলো-আঁধারী কুহকের ভিতর থেকে অলকার জীবনটা যেন কিসের আহ্বানে কত দূরে চলে গিয়েছিল। কি মন নিয়ে যেতে হল, আর কি মন নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে? যে ছিল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক মাত্র, সে এখন অলকার পাশে চিরকালের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কী আশ্চর্য, এই রাত্রির মাত্র আর চারটি ঘন্টা আগে পথের উপর ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে এই অশেষ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বার বার যার কথা মনে পড়েছিল, তারই কথা আবার মনে পড়ছে। মাত্র চার ঘন্টা আগে যে ছিল এত সত্য; সে কি সত্যই এত মিথ্যে হয়ে গেল?

মিথ্যে হয়েই গিয়েছে মনে হয়। কিন্তু মনে হলেই কি বুঝতে হবে যে মনটা ঠিক সত্য বুঝতে পারছে ? স্বপ্নের ঘোরে স্বপ্নের সব কিছুই যে সত্য বলে মনে হয়। নিশির ডাকের ছলনায় ঘর ছেড়ে যে চলে যায়, তার চোখে রাতের আকাশকে ভোরের আকাশ বলেই মনে হয়। কিন্তু এমন মনে হওয়া যে নিতান্ত একটা মিথ্যা।

অলকা হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলে—এখানে গাড়িটাকে থামালে কেন ?

অশেষ—ভুল হয়েছে। বুঝতে পারিনি কখন বিয়ে বাড়ির ফটক পার হয়েছি।

অলকা—বিয়ে বাড়ির ফটক বিয়ে বাড়িতে থাকুক। আমার আর বিয়ে দেখে দরকার নেই। বাড়ি পৌঁছে যেতে পারলেই ভাল ছিল।

অশেষ—তবে চলো, তোমাকে বাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে আসি।

অলকা—না।

অশেষ—তবে ?

অলকা—আমি একাই বাড়ি চলে যাই। তুমি বরং...

অশেষ—কী ?

অলকা—বিয়ে বাড়িতে গিয়ে বাবাকে বলে দাও, আমি বাড়ি ফিরে গিয়েছি।

অশেষ—তা বলে দিতে পারি। কিন্তু কেন ?

অলকা—বলতে পারছি না। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

অশেষ—মনে হচ্ছে, যা বলতে চাইছ, ঠিক সেটা বলতে পারছ না।

অলকা—তার মানে ?

অশেষ—তার মানে, তোমার মনে আবার সেই ভয়ানক সন্দেহ দেখা দিয়েছে !

অলকা—সন্দেহ ?

অশেষ—হ্যাঁ, তোমার সন্দেহ হচ্ছে, এই চার ঘণ্টার জীবনটা যেন একটা হঠাৎ খেয়ালের ভুল।

অলকা—আমি এতটা সন্দেহ করিনি, কিন্তু তোমার কথাতে তুমিই বুঝিয়ে দিচ্ছ যে, তোমার মনে এ সন্দেহ বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

অশেষ চমকে ওঠে।—কী বললে ?

অলকা—তুমি নিশ্চয়ই সন্দেহ করছ যে, এরকম খেয়ালের কাণ্ডকে ভালবাসা বলে না।

অশেষ—যদি বলি যে, হ্যাঁ, ভালবাসা বলে না, তবে কি তুমি..

অলকা—তবে মাপ করবে, আমাকে ভাবতে হবে।

অশেষ—কী ভাববে ?

অলকা—ভুল করেছি কি না ? পাপ করলাম কি না, নিজের ক্ষতি কিংবা তোমারও ক্ষতি করলাম কি না ?

অশেষ—দয়া করে আমার ক্ষতির কথা ভেব না।

অলকা—ঠাট্টা করছ ?

অশেষ—তুমি কী আমাকে শাস্তি দিচ্ছ ?

অলকা—শাস্তি ?

অশেষ—হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি জেনেও বার বার পুরনো কথা স্মরণ করে...।

অলকা—তুমি ভুল বলনি।

চেঁচিয়ে ওঠে অশেষ—তার মানে, সব ভুলে যেতে চাও ?

অলকা—ভুলতে পারব কিনা জানি না।

অশেষ—কিন্তু আমার আপন হতে পারবে না, এই তো ?

হয় হঠাৎ বধির হয়ে গিয়েছে অলকা, অশেষের কথাগুলি শুনতে পাচ্ছে না, নয়, হঠাৎ বোবা হয়ে গিয়েছে, উত্তর দেবার শক্তি নেই। কিংবা একটা দুঃসহ আতঙ্ক, ভুলের ভয় থেকে সাবধান হবার জন্য তৈরি হয়েছে। নয় তো আত্মঘৃণা, অশেষ ডাক্তার নামে এক ভদ্রলোকের ভালবাসার ছোঁয়াটাকে একটা দুর্বল মনের ভয়ানক লোভের ব্যাভিচার বলে মনে করে প্রাণটা শিউরে উঠছে। না না, কখনও

না, ভালবাসা কখনও এরকম একটা একবাতের পাগলামি হতে পারে না।

—আমাকে ভাল মনে বিদায় দাও। বলতে গিয়ে অলকার গলার স্বর করুণ আর্তনাদের মত কেঁপে কেঁপে বেজে ওঠে।

অশেষ—বিদায় নেবে ?

অলকা—হ্যাঁ।

অশেষ—তারপর ?

অলকা—তারপর জানি না।

অশেষ—তুমি কী সুন্দর ফাঁকি দিতে জান অলকা !

অলকা—স্বীকার করছি।

অশেষ—আমাকে ফাঁকি ছাড়া আর কিছু দেবার উপায় নেই, কেমন ?

ফুঁপিয়ে ওঠে অলকা—উপায় নেই।

অশেষ—সে সাহসও তোমার নেই।

অলকা—নেই অশেষবাবু।

অশেষ—সেই মমতাও নেই।

অলকা—আছে। আমি যেখানেই থাকি, তুমি কাছে এলে আমাকে এরকমই দেখতে পাবে। তোমাকে পর মনে করব না।

অশেষ—তার মানে, আমাকে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে শুধু শাস্তি দেবে।

অলাক—শাস্তি ?

অশেষ—হ্যাঁ।

অলকা—শাস্তি কেন ? কিসের শাস্তি ?

অশেষ—যে শাস্তি এখন এখানেই দিচ্ছ। অন্তত এটুকুও বলতে পারছ না যে আমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

অলকা—বলতে ভয় করে।

অশেষ—তবে তুমিও একটা শাস্তি স্বীকার করো।

আর্তনাদ করে ওঠে অলকা। —কী শাস্তি ? বলো।

অশেষ—আজ তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাবার আগে...।

অলকা—বলো।

অশেষ—আর একবার তোমার হাত ধরব, আর তোমার কপালে...।

—উঃ, তুমি ভয়ানক নির্মম, ভয়ানক চালাক। অলকার বুক ঠেলে একটা যন্ত্রণাক্ত স্বর যেন উথলে উঠতে থাকে। —আমাকে বার বার দাগি করে দিয়ে তোমার লাভ কী অশেষবাবু ? তার চেয়ে যে অনেক ভাল ছিল, যদি আমি..।

অশেষ—কী ?

অলকা—তোমাকে এভাবে ঠকাবার আগে যদি মরে যেতে পারতাম।

রাস্তার ধারে সুন্দর একটু আলোছায়াময় নিভৃত। শাস্তি স্বীকার করে নেবার জন্যই অসহায়ের মত ছটফট করে একটা হাত এগিয়ে দেয় অলকা।

তারপর কপালের উপর একটা সিক্ত ও তপ্ত স্পর্শের অনুভব সহ্য করতে গিয়ে কাঁপতে থাকে অলকা। পরক্ষণেই কপালের উপর রুমাল চেপে আবার ফুঁপিয়ে ওঠে। —মানুষের এমন ক্ষতিও মানুষ করে ?

অশেষ—কী ক্ষতি অলকা ? এই সামান্য ক্ষতি রুমাল দিয়ে মুছে ফেললেই তো মিটে যায় ?

অলকা—আর মুছে ফেলেই বা কী লাভ ?

আস্তে আস্তে মাথা তুলে, অশেষের কানের কাছে যেন ফিস্‌ফিস্ করে অলকা—এই দাগই চিরকালের দাগ হয়ে থাকুক।

অলকার মূর্তিটা যেন একটা অসহায় স্তব্ধতা। আর বুকের ভিতরটা যেন একটা তন্দ্রার ভারে

অলস ও শিথিল হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার সংগ্রামে আহত একটা মেয়েলি আত্মা যেন মরণজলে ডুবতে গিয়ে হঠাৎ ভেসে উঠেছে আর সুস্থির হয়ে গিয়ে আকাশে চাঁদের উদয় দেখতে পেয়েছে।

অশেষ—সত্যি বলছ ?

অলকা—হ্যাঁ। এই দান হারিয়ে ফেলতে আর চাই না, যে যাই মনে করুক।

অশেষ—কিন্তু...।

অলকা—শৈলেশ্বরের কথা বলছ ?

অশেষ—হ্যাঁ, তোমার এই পাঁচ বছরের মনের কথা।

অলকা—সবই তো জান ; তোমার কাছে কিছুই গোপন করিনি।

অশেষ---কিন্তু শৈলেশ্বর যে তোমাকে ভালবাসে, সেটা ভুলে যাবে কেমন করে ?

অলকা—আমি ভুলে যেতে পারি। ভুলেই গেছি বোধ হয় ! ভুলে যেতে যদি কষ্ট হয়, তবু সে কষ্ট স্বীকার করব। কারণ, উপায় নেই ; তুমি না থাকলে যে আমার সব শূন্য। এইবার বলো, আমার এই দাগি মনের অন্যায়টাকে তুমি ভুলবে কেমন করে ?

অশেষ—আমি তোমার আগেই ভুলে গিয়েছি। আমি জানতাম শৈলেশ্বরের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না।

অলকা—কেমন করে ?

অশেষ হেসে ফেলে—শৈলেশ্বরের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

সামান্য একটু চমকে ওঠে অলকা। সেই সঙ্গে চোখের একটা ভ্রূকুটিও চমকে ওঠে।—কবে বিয়ে হল ?

অশেষ—আজ।

অলকা—কোথায় ?

অশেষ—এই ত্রিদিববাবুর বাড়িতে।

অলকা—কার সঙ্গে ?

অশেষ—ত্রিদিববাবুর মেয়ের সঙ্গে।

অলকার ভ্রূকুটির মেঘ যেন এইবার একটা বিদ্যুতের মত হাসির ঝিলিক লেগে চূর্ণ হয়ে যায়।

অশেষ---হাসছ কেন অলকা ?

অলকা—গল্পে পড়েছি, স্বাতী তারকা রাগ করে চোখের জল ফেলে, কিন্তু সেই জল ঝিনুকের বুকের ভিতরে গিয়ে মুক্তা হয়ে যায় !

অশেষ কী-যেন বলতে চায় ; কিন্তু বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অলকা—এইবার তোমার সঙ্গে একবার বিয়ে বাড়ির ভেতরে যাব। শৈলেশ্বরের চোখের সামনে একবার দাঁড়াব।

অশেষ—কেন ?

অলকা—শৈলেশ্বর একবার দেখুক ; দেখিয়ে দিতে চাই, তুমি আমার হাত ধরে রয়েছ।

অশেক---কেন ?

অলকা —আমার সৌভাগ্যের অহংকার আজ আর চেপে রাখবার সাধ্যি নেই।

অশেষ হাসে—চলো।

পুরনো বাগান স্ট্রিটের বিরাট এক নম্বর, ত্রিদিব সরকারের এই উৎসবাকুল বাড়িতে এরই মধ্যে দুই জায়গায় দুটো অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। এক জায়গায় একটা ভয়ের কান্না ; আর এক জায়গায় একটা হতাশাভীরু অপমান।

বাসরঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার এক কোণে আতঙ্কিতের মত কাঁপছে নমিতা, সেই সঙ্গে নমিতার গায়ের গয়নাগুলিও কাঁপছে। আর, নমিতার মা আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছেন—আর কী বললে শৈলেশ্বর ?

নমিতা—বলেছে, তোমার মত এই রকম একটা কচি বয়স আর তোমার বাবার মত এমন পয়সাওয়ালা একজন গুরুজন যখন পেয়েছি, তখন আমি সুখী হব নিশ্চয় !

আর এক জায়গায়, হলঘরের ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন মুখার্জিবাবু ; এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন ত্রিদিব সরকার।

মুখার্জি বলেন—না মশাই, আপনি ভয়ানক মিথ্যেবাদী। আপনার সঙ্গে আমার কোম্পানির পক্ষে আর কোনও সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। চুলোয় যাক আপনার টেণ্ডার।

এক নম্বর পুরনো বাগান স্ট্রিটের বিরাট বাড়িটার উৎসব যেন আতঙ্কে কেঁপে উঠেছে। চারদিকে একটা চাপা সোরগোল, যেন কতগুলি চাপা আর্তনাদের ছুটোছুটি। সোজা হেঁটে একেবারে বাসরঘরের খোলা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় অলকা আর অশেষ।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অলকা—কেমন আছেন ?

চমকে উঠে, আতঙ্কিত চোরের মত তাকিয়ে থাকে অতি বিদ্বান আর অতি বড়লোক শৈলেশ্বর।

অলকার হাত ধরে আস্তে একটা টান দিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করে অশেষ—চলো অলকা।

কান্তিধারা

অনেকেই বলছেন, হুড়রুর জলে এবার যেন একটু বেশি ফূর্তি দেখা যাচ্ছে।

যাঁরা ক্যামেরা হাতে দুলিয়ে বেড়াচ্ছেন আর ফটো তুলছেন তাঁরাও বলছেন, ঠিকই, গত বছর এদিকে পাথরের চটানটাকে একেবারে শুকনো খটখটে দেখেছিলাম। এবার দেখছি শ্যাওলায় সবুজ হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, এদিকে এরকম দুটো ধারাও ছিল না।

শ্রাবণের হুড়রুর সেই রুদ্রভৈরব রূপ অনেকেই দেখেননি ; কিন্তু শীতের হুড়রুকে অনেকেই দেখেছেন, এবং, কোনও সন্দেহও নেই, গত শীতের হুড়রুর চেয়ে এবারের শীতের হুড়রু যেন একটু বেশি মত্ত। জলের জটাগুলি যেন একটু বেশি ফুলে আর ফেঁপে উঠেছে।

এর কলনাদও যেন একটা তরল গর্জন ; বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সেই গর্জন আবার যেন ঝড়ো হাহাকারের মত শব্দ করে বনের বুক একটু বেশি উতলা করে দিচ্ছে। এত জলের তোড় গত শীতের হুড়রুতে দেখতে পাওয়া যায়নি। আছড়ে পড়া জলের ফেনাও যেন একটু বেশি সাদা হয়ে হাসছে। গত শীতের হুড়রুর জলের ফেনাতে একটু কাদাটে ভাব ছিল।

গত বর্ষাতে হুড়রুর জল যে একটু বেশি পাগলও হয়েছিল, তার প্রমাণও দেখতে পাওয়া যায়। যে বলাই মাস্টার তাঁর স্কুলের ছাত্রদলকে সঙ্গে নিয়ে পিকনিকে এসেছেন, তিনিই সবার আগে আশ্চর্য হয়ে বললেন—এখানে যে চমৎকার দুটো পিয়াল ছিল। কত কুঁড়ি ধরেছিল গাছ দুটোতে। কিন্তু কই ? আজ এখানে শুধু যত নুড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে।

কোনও সন্দেহ নেই, সেই কুঁড়িধরা পিয়াল দুটোকে গত বর্ষার হুড়রু ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

আর একটা পিকনিক পার্টি, যাদের মধ্যে চারজন তরুণী ছাড়া আর কেউ নেই, তাদেরই একজন খুশি হয়ে আর ব্যস্তভাবে বলে—চলো চলো, আমরা আর-একটু দূরে গিয়ে, ওই ওখানে, যেখানে এক গাদা জংলি কসমস ফুটে রয়েছে, সেখানে জায়গা দখল করি। নইলে...।

নইলে সত্যিই অন্য একটা পার্টি জায়গাটাকে দখল করে নেবে। পরিষ্কার আর প্রকাণ্ড একটা কালো পাথর শুধু তার চওড়া পিঠটুকু মাটির উপর ভাসিয়ে দিয়ে পড়ে আছে। তার চারদিকে আবার কসমসের জঙ্গল রঙিন হয়ে হাসছে। প্রকাণ্ড তিনটে শিশুগাছের ছায়াও সেখানে আছে। পিকনিকের ঠাঁই হিসাবে এর চেয়ে সুন্দর জায়গা আর কি হতে পারে ?

তরুণীদের পার্টিটা যেন একটা খুশির হাসির কলরোল তুলে কালো পাথরটার দিকে দৌড় দেয়।

কেদারবাবু, যিনি কম্ফর্টার দিয়ে মাথা আর দু'কান জড়িয়ে নিয়ে, আর স্ত্রী ও চারটি ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পিকনিকের জায়গা খুঁজছিলেন, তিনি এই তরুণীদলের দিকে তাকিয়ে যেন একটা ভ্রূকুটি চাপতে চেষ্টা করেই বিড়বিড় করে বলেন—এরা কলকাতা থেকে এসেছে মনে হচ্ছে। গত বছর তো এরকম কোনও স্বাধীন জেনানার দলকে এখানে দেখিনি।

সত্যিই, এবার পিকনিকের ভিড় একটু বেশি বলে মনে হয়। আমলকির জঙ্গলের ওপাশে গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজছে। বুঝতে অসুবিধে নেই, ওখানে একটা ফূর্তির আসর এরই মধ্যে জমে উঠেছে। এখন তো মাত্র সকাল নটা। এই তো ঘণ্টাখানেক আগে শীতের কুয়াশা সরেছে আর কাঁচা

রোদের আভা লেগে হুড্রুর জলের একটা ধারা একেবারে কাঁচা সোনার ধারা হয়ে গিয়েছে।

এ বছর বিলিতি টুরিস্টের আবির্ভাবও একটু বেশি হয়েছে বলে মনে হয়। কেদারবাবুর পারিবারিক পার্টির দিকে তাকিয়ে আর হেসে হেসে এক সাহেব ও এক মেম এগিয়ে গেলেন। কেদারবাবু বলেন—এরা লোক ভাল। এরা শুধু ঝর্নার শোভা দেখে আর ফটো তুলেই চলে যায়। আর ওরা...।

কেদারবাবু সেই তরুণীদলের দিকে লক্ষ করে কী-যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন।

কেদারবাবুর স্ত্রী হাসেন—তুমি ওদের ওপর এত বেশি চটে গেলে কেন ?

কেদারবাবু—ওরা এখানে আসে শুধু খেতে। গামলা ভরে চপ খাবে, কব্জি ডুবিয়ে মাংস খাবে। সিঙাড়া-সন্দেশ-কলা-পেয়ারা-তেলেভাজা সব খাবে। আমি এই দশ বছর ধরে এখানে পিকনিকে এসে এই কীর্তিই তো দেখে আসছি।

কেদারবাবুর স্ত্রী আবার হাসেন—বেচারাদের খাওয়ার ওপর তোমার হিংসে কেন ?

কেদারবাবু—একটুও হিংসে নয়। আমার ডিসপেপসিয়া আছে বলেই যে ওদের খাওয়ার ঘটা দেখতে আমার খারাপ লাগে, তোমার এই সন্দেহ ঠিক নয়। কথাটা হল, ওরা হুডরু দেখবার ছুতো করে এত খাবে কেন ? খাওয়াটাই যখন লক্ষ্য, তখন বাড়িতে বসেই অগস্ত্যের মত মাংসের ঝোলের সমুদ্দুর শুষে ফেলুক, আমার আপত্তি নেই।

—আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।

চমৎকার একটা মিষ্টি স্বরের গান যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়েছে। কেদারবাবু চমকে উঠে আবার তরুণীদের দলটার দিকে তাকালেন। কালো পাথরটার উপরে বসে আর হুড্রুর রোদের আভায় সোনা হয়ে যাওয়া ধারাটার দিকে তাকিয়ে ওই চারটি মেয়েই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরেছে।

কেদারবাবুর স্ত্রী বলেন—ওই তো জলের ধারার দিকে তাকিয়ে কত খুশি হয়ে গান গাইছে ওরা। মানুষকে তোমার একটু বেশি নিন্দে করা অভ্যেস।

কেদারবাবু—তোমারও মানুষকে একটু বেশি বিশ্বাস করা অভ্যেস। চোখ থাকলে আমার সঙ্গে এত তর্ক করতে না।

কেদারবাবুর স্ত্রী—চোখ আছে বলেই তো দেখতে পাচ্ছি ; মেয়েগুলো খুশি হয়ে বসে ঝর্নার শোভা দেখছে।

কেদারবাবু—আর, ওই যে, ওগুলো কী ?

—কী ?

—ওই যে ওদের এপাশে আর ওপাশে চারটে ধাড়ি-ধাড়ি টিফিন-কেরিয়ার আর চারটে ঝোলা। ওগুলোর ভেতরে বুঝি গাদা গাদা বকুলফুল আছে ? মালা গাঁথতে এসেছে ওরা ?

—জানি না। আমার কথা হল, ওদের ব্যাপার নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথার দরকার কী ?

—না, কোনও দরকার নেই। কেদারবাবু আস্তে একটা হাঁফ ছাড়েন।

এ বছরের শীতে, নতুন বছরের এই প্রথম দিনটিতে হুড্রুর জলপ্রপাতের আশে-পাশে পিকনিক করতে যারা এসেছে, তাদের অনেকেই কেদারবাবুর মত রাঁচি শহরের এপাড়ার আর ওপাড়ার মানুষ ; অনেকেই একেবারে দূরের কোনও শহরের মানুষ, বিশেষ করে কলকাতার মানুষ।

অনেকেই রান্না-করা খাবারের নানা রকমের বোঝা সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। অনেকে আবার রান্নার সব সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে ; ঝুড়িভরা কপি, হাঁড়িভরা মিষ্টি, টিনভরা ঘি আর বস্তাবন্দি চাল-ডাল নিয়ে এসেছেন। এঁদের ইচ্ছাটা, রান্না-বান্নারই একটা মহোৎসব ঘটিয়ে ভূরিভোজনের আনন্দ গ্রহণ করবেন।

কেদারবাবুর ক্ষোভের সবটাই অহেতুক বলা যায় না। সত্যিই দেখা গেল, সংখ্যায় দশ-বারোজন হবে, একটি বাঙালি পরিবার এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, মনের মত জায়গা খুঁজছে। দুটো চাকরের মাথায় আর কাঁধের উপর নানা রকমের খাদ্য-সম্ভারের বোঝা চাপানো ; সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্যান্ত পাঁঠা চলেছে ; এক ভদ্রলোক দড়ি ধরে পাঁঠাটাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

আজ ট্যাক্সির চার্জ চারগুণ, বাস রিজার্ভের দর তিনগুণ। কিন্তু সে জন্যে হুড্রুর আহ্বান মিথ্যে হয়ে যায়নি। অনেক পার্টি এসেছে। অনেক দম্পতি এসেছে। কিন্তু একা ? না, কেউ নয়। একা পিকনিক যে পিকনিকই নয়।

আবার চমকে উঠলেন কেদারবাবু—কী আশ্চর্য !

কেদারবাবুর স্ত্রী বলেন—কী হল ?

—এই দশ বছরের মধ্যে যা দেখিনি, তাই এবার দেখতে হচ্ছে।

—কী দেখতে পেলে ?

—ওই দেখো। এক ভদ্রলোক একাই পিকনিকে এসেছেন।

ভদ্রলোক ঠিকই, কিন্তু অল্প বয়সের এক ভদ্রলোক। দেখতে ধবধবে ফর্সা। রোগা নয় ; কিন্তু বেশ লম্বা বলেই বোধহয় রোগাটে বলে মনে হয়। ভুরু দুটো একটু বেশি ঘন আর বেশি কালো। ভদ্রলোকের হাতে মস্ত বড় একটা ঝোলা, আর কাঁধের সঙ্গেও ছোট একটা ঝোলা দুলছে।

ভদ্রলোক এদিকে আর এগিয়ে না এসে ওদিকেই ফিরে গেলেন। কোন দিকে গেলেন কে জানে ? মনে হল, যেন গানের শব্দটা শুনেই একটু আশ্চর্য হয়ে অন্য দিকে সরে গেলেন।

এবারের নতুন বছরের প্রথম দিনে হুড্রুর শোভার রাজ্যে পিকনিক করতে এসে যে দুটো নতুন কাণ্ড দেখলেন কেদারবাবু, সে দুটো নতুন কাণ্ডই বটে। সঙ্গে কোনও পুরুষ নেই, চারটে বয়স্ক মেয়ে দল বেঁধে পিকনিক করতে এসেছে, এরকম ব্যাপার আগে কখনও দেখা যায়নি। তা ছাড়া, ওই ভদ্রলোকের মত, একটা একলা যোগীর মত কেউ এখানে কোনওদিন পিকনিক করতে এসেছে, এমন ঘটনা এই দশ বছরেও কেদারবাবুর চোখে কখনও পড়েনি।

—আমাদের সঙ্গে কী কী আছে ? কেদারবাবু গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলেন।

কেদারবাবুর স্ত্রী বলেন—মিল্ক অব্ ম্যাগনেশিয়া আছে।

কেদারবাবু—না না, ঠাট্টার কথা নয়। তুমি তো জান, হুড্রুর জল পেটে পড়লে আমার কি ভয়ানক ক্ষিদে হয়।

শ্যামা আর রমা বলে—মুরগির মাংস আছে, বাবা।

পরেশ আর নরেশ বলে—সরু চালও আনা হয়েছে।

কেদারবাবুর স্ত্রী বলেন—ক্ষীরের সন্দেশও আছে। নিশ্চিন্ত হলে তো ?

কেদারবাবু—না না, ঠাট্টার কথা নয়। হুড্রুর জলের মত হজমি জল ভূভারতে কোথাও নেই। যাক...ভুলে যাওনি তা হলে।

ওখানে, কসমসের জঙ্গলের কাছে কালো পাথরের চটানের উপর চারটে খুশির ছবির মত বসে যারা পর পর তিনটে গান গেয়েছে, তাদের পরিচয় এতক্ষণে জানতে পেরেছেন কেদারবাবু। শ্যামা আর রমা ওদেরই হাতছানি দেখে ওদের কাছে গিয়েছিল। শ্যামাকে আর রমাকে ওরা কমলালেবু খেতে দিয়েছে ; আর অনেক গল্পও করেছে।

ওরা হল কলকাতার একটা মেয়ে-স্কুলের চার দিদিমণি।

রমা বলে—শুধু শীলাদি ছাড়া আর সবাই খুব সুন্দর, চমৎকার।

শ্যামা বলে—সবচেয়ে সুন্দর রেবাদি।

রমা—কখখনও না। ফার্স্ট সুন্দর হল নীহারদি, সেকেন্ড জয়াদি, থার্ড রেবাদি।

কেদারবাবু—ওদের সঙ্গে খাবার-টাবার কিরকম দেখলি ?

শ্যামা—কিছ্ছু না। শুধু কয়েকটা শুকনো পাঁউরুটি, চিনি, কমলালেবু আর মটরশুঁটির ঘুগনি।

—তবে অত বড় বড় ঝোলাতে আর টিফিন কেরিয়ারে কী নিয়ে এসেছে ওরা ?

রমা বলে—ঝোলাতে শুধু জামা-কাপড় আর বই আছে। আর টিফিন কেরিয়ারে ওই পাঁউরুটি চিনি...।

কেদারবাবু—বাস ; শুধু ঝনঝন ঠনঠন ?

রমা—আর কিছু নেই।

কেদারবাবু—কেন ?

রমা—কে জানে কেন ? সবাই একসঙ্গে কলকাতা থেকে আজ সকালে রাঁচিতে এসেছেন, আবার আজই রাতের ট্রেনে চলে যাবেন।

কেদারবাবুর স্ত্রী আবার মুখ টিপে হাসতে শুরু করেছিলেন বলেই কেদারবাবু দুঃখিতভাবে হাসতে থাকেন। —না, সত্যিই মেয়েগুলোকে ভাল বলেই মনে হচ্ছে। বুঝছ না, শুধু হুড্রু দেখবার জন্যেই এতদূরে ছুটে আসা, এটা চারটিখানি শখের ব্যাপার নয়। কিন্তু...

শ্যামার মা—কী ?

কেদারবাবু—তুমি এক ফাঁকে গিয়ে ওদের একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কথা বলে দিও।

—কী বলব ?

—কলকাতা থেকে সবে মাত্র এসেছে। ফুর্তির মাথায় হয়ত এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করবে ; খাড়াই পাথরের গায়ে উঠবে কিংবা জলে নামবে...তুমি ওদের জানিয়ে দিয়ে এসো, যেন ভুল করে এমন সাহস না করে।

—কেন ?

—তুমি কি জান না ? কখনও কি শোননি ?

—না।

—আমি জানি বলেই বলছি। হুড্রুর জল কিন্তু প্রতি বছর অন্তত একটি বলি আদায় না করে ছাড়ে না।

—বলি ?

—হ্যাঁ। মানুষের প্রাণবলি। থানার লোককে জিজ্ঞাসা করলেও ওরা ঠিক এই কথাই বলবে। কে জানে, ছায়া-ছায়া কি-যেন একটা এখানে ঘুরে বেড়ায়। গাইডরাও জানে ; ওরাও কেউ কেউ দেখেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে ওরা এখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না।

—সেটা জানোয়ারের ভয়ে।

—জানোয়ারের ভয় ওরা করে না। আসল ভয় হল, সেই ছায়া-ছায়া আত্মাটার ভয়। যাই হোক, কুসংস্কার মনে কর আর যা ই কর, মেয়েগুলোকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার।

আর একটা দল। দু'জন বাঙালি সাহেব আর দু'জন বাঙালি মহিলা, যাঁদের দেখলে বাঙালি মেম বলেই মনে করতে হয়। একজন সাহেবের হাতে রাইফেল, আর একজনের হাতে বাইনকুলার। দুই মহিলার হাতে দুটি ভ্যানিটি ব্যাগ। দলটা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে আর কেদারবাবুর পারিবারিক দলটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। রাইফেল-সাহেব বাংলাতেই বলেন—না না, এরা তো আমাদের কুলিদল নয়।

বাইনকুলার-সাহেব বলেন—তবে কোথায় গেল ওরা ?

—ডাউন স্ট্রিমের এরকম একটা বাজে জায়গায় তাঁবু ফেলার কথা তো নয় !

বাইনকুলার-সাহেব এইবার হাতের বাইনকুলার চোখের কাছে তুলে আপ-স্ট্রিমের দিকে তাকান। তার পরেই চেঁচিয়ে ওঠেন—ওই যে, ওই উঁচুতে একটা ইউক্যালিপটাসের কাছে তাঁবু দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই আমাদের তাঁবু।

দলটা চলে যেতেই কেদারবাবু যেন বিরক্ত হয়ে একটা হাঁপ ছাড়েন। —হুঁ।

কেদারবাবু স্ত্রী—কী হল ? ওদের ওপর আবার কিসের রাগ ?

কেদারবাবু—আমি ভেবে পাই না, লোকগুলো এখানে কোন সাহসে রাইফেল সঙ্গে নিয়ে আসে। হুড্রুর জল দেখতে এসেছিস, দেখে চলে যা ! রাইফেলের দরকারটাই বা কী ?

—শিকার-টিকার করতে চায় বোধহয়।

—সেই জন্যেই তো বলছি। শিকার বলতে তো কাঁচকলা ! যেন হাতি গণ্ডার আর বাঘ এখানে থই-থই করছে। দু'হাজার টাকা দামের রাইফেল কাঁধে নিয়ে যত ফড়িং-বীর এখানে শিকারিপনা দেখাতে এসেছেন।

কেদারবাবুর স্ত্রী এরই মধ্যে তিনটে বড় নুড়ি জড় করে পিকনিকের উনুন তৈরি করে ফেলেছেন।

পরেশ আর নরেশ মরা বনকুলের শুকনো একটা ঝোপ উপড়ে নিয়ে এসেছে। শুকনো কুলের ঝুরি উনুনে ঠেসে দিয়ে আর আগুন ধরিয়ে দিয়েই কেদারবাবুর স্ত্রী বলেন—তুমি কি এক বাটি চা খেয়ে নেবে ?

কেদারবাবু গরগর করেন—যা না, সোঁদরবনে যা, কালাহাণ্ডি যা, রাইফেলের দাপট দেখাতে এখানে আসিস কেন ?

হেসে ফেলেন কেদারাবুর স্ত্রী—তুমি দেখছি এখনও ওদের ছেড়ে দিতে পারনি।

—ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ইচ্ছে করছে ওদের একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আসি।

—কী বোঝাবে ?

—যেন ভুল করে ওই হরতকি জঙ্গলের হরিয়াল ঘুঘুর উপর গুলিটুলি না ছোঁড়ে।

—কেন ?

—ছুঁড়লেই ঠেলা বুঝবে।

—কেন ?

—ওরা জানে না, হুড়রুর হরতকি জঙ্গলের ঘুঘুকে মারলেও খেতে পারবে না। সে ঘুঘুর মাংস তেতো বিষ হয়ে যাবে।

—কে বললে ?

—আমি বলছি। গাইডরা বলবে। যারা এখানে পাঁচ-দশবার এসেছে, তারাও বলবে। হুড়রুর সেই ছায়া-ছায়া ডাইন এসব নষ্টামিকে ক্ষমা করে না।

—তবে যাও, বলে এসো গিয়ে।

—যেতাম ঠিকই, কিন্তু...এত আপ স্ট্রিমে খাড়াই ভেঙে হাঁটা-হাঁটি করা আমার পক্ষে...যাই হোক...তুমি আগে আমাকে এক বাটি চা আর এক ডজন পেঁয়াজ-বড়া দাও।

আগে এক ডজন পেঁয়াজ-বড়া ভেজে নিয়ে তারপর চা তৈরি করেন শ্যামার মা। কেদারবাবুও গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আর গরম পেঁয়াজ-বড়া চিবিয়ে কথা বলেন—যাকগে, খাকগে ওরা তেতো ঘুঘুর মাংস। জব্দ হোক একটু। ওদের কথা ভাবছি না। ভাবছি ওই মেয়েগুলো, যাদের সঙ্গে কোনও পুরুষ নেই, ওরা যেন ভুল করে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি না করে।

শ্যামার মা বলেন—আমি যাই তবে ; মেয়েগুলোর সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করে আসি...শ্যামা আর রমা, তোমরা দু'জনে মিলে আলুগুলো কুচিয়ে রাখো।

শীতের রোদ হলেও রোদটা এখন বেশ চনচন করছে। মাথায় জড়ানো কম্ফর্টার খুলে কেদারবাবু গুনগুন করে গান গাইতে থাকেন। তারপরেই দেখে চমকে ওঠেন। শ্যামার মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে ওই কসমসের জঙ্গলটা যেন খিলখিল করে হাসছে। শ্যামার মা-ও হাসছেন।

কিসের এত হাসি ? একটা ভয়ের গল্প শুনতে পেয়ে মেয়েগুলো এত হাসে কেন ? আর, শ্যামার মা-ও বা ভয়ের গল্পটা শুনিয়ে দিতে গিয়ে এত হাসে কেন ?

তারপরেই কেদারবাবুর চোখের দৃষ্টিটা ক্ষুব্ধ হয়ে যেন কটমট করতে থাকে। শ্যামার মা ফিরে আসছে, আর ওই চারটে মেয়েও যেন ধেই ধেই করে জঙ্গল বেড়াতে ছুটে চলে গেল।

কেদারবাবু রুষ্টস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—কী হল ? গল্পটা ওদের বলেছিলে ?

শ্যামার মা হাসতে থাকেন—বলেছি বইকি।

—কী বলে ওরা ?

—ওরা বলে, খুব ভাল হল। ওরা সেই ছায়া-ছায়া ভয়ের চেহারাটা দেখতে চায়।

—কী ? ভ্রূকুটি করেন কেদারবাবু।

শ্যামার মা আবার হাসেন—আমার দিকে মিছে কেন চোখ পাকিয়ে কথা বলছ ? আমি তো আর তোমার অবাধ্যতা করছি না। আমি তো একুশটা বছর ধরে ছায়া-ছায়া ভয়ের জ্বালায় ভুগছি।

কেদারবাবু—আজ আবার এত কথা শোনাচ্ছ কেন ? একটা আহা-আহা আনন্দকে বিয়ে করলেই পারতে। কে বাধা দিয়েছিল ? কে মানা করেছিল ?

শ্যামা আর রমা আলু কুচোনোর আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে, আর মুখ লুকিয়ে হাসে।

শ্যামার মা একবার ভ্রূকুটি করেন—ছিঃ !

কেদারবাবুও শান্ত স্বরে—হ্যাঁ, ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। জেনে রেখো, তোমার কথা অসাবধান হলে আমার কথাও অসাবধান হয়ে যাবে।

শ্যামার মা—খিচুড়িতে বাদাম দেব ?

কেদারবাবু—নিশ্চয়। এক মুঠো কিসমিসও দিও।

সুন্দর মুখ হিসাবে চারজনের মধ্যে যে শীলাদিকে ফোর্থ বলতেও পারেনি শ্যামা আর রমা, সেই শীলাদি এদের তিনজনেরও কাছে শীলাদি। বয়সের দিক দিয়ে রেবা, জয়া আর নীহারের চেয়ে শীলা অন্তত চার-পাঁচ বছরের বড়। কিন্তু লোকের চোখে শীলার এই বড়ত্বটুকু ধরা পড়বে কিনা সন্দেহ। বরং মনে হবে, শীলার কাছে ওরাই তিনজন হল দিদি-বয়সের মানুষ। শুধু ওরাই তিনজন জানে, শীলাদি ওদের চেয়ে পাঁচ বছরের সিনিয়র। শীলাদি যেদিন টিচার হয়ে স্কুলে কাজ নিয়েছে, ওরা তিনজন তার চার বছর পরে টিচার হয়ে স্কুলে এসেছে। এবং ওরা চারজনেই আজ এক হোস্টেলের বান্ধবী।

রেবার তো অভ্যাসটা একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। যখন তখন বাঁ দিকের কানটাকে হাত দিয়ে চেপে ঢেকে রাখতে চায়। কানটার কোনও দোষ নেই। বাইশ বছর বয়সেই রেবার বাঁ-কানের ওপরে মাথার বেশ বড় একটা জায়গা জুড়ে সব চুলগুলির প্রায় অর্ধেকই সাদা হয়ে গিয়েছে। নীহার একটু রোগাটে, গলাটা একটু বেশি সরু ; তাই হাইকলার জামা গায়ে দিতে হয় ; এবং নিজেও স্বীকার করে—হাইকলারে চেহারাটা যে আরও বুড়ি বুড়ি দেখাচ্ছে শীলাদি !

শীলা হাসে। জয়া বলে—এক বছর ধরে চিত হয়ে শোওয়া অভ্যেস করলাম, তবু তো কুঁজোত্বটা একটুও সারল না।

শীলা হাসে—বিয়ে হলেই সেরে যাবে।

জয়া—আর বিয়ে !

শীলা—তার মানে ? কটকের পাত্র কী বলে ?

জয়া—পাত্রের বাবা কাকাকে চিঠি দিয়েছেন, মেয়ের বয়স একটু বেশি বলেই...

শীলা—তার মানে ?

জয়া—তার মানে কাকার সত্যি কথাটাও বিশ্বাস করলেন না কটকের পাত্রের বাবা। কাকা বললেন তেইশ ; কটক বললে, হতেই পারে না। অন্তত ত্রিশের কম নয়।

অথচ শীলাদির বয়সটা ত্রিশের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েও যেন কুড়ি বছরটির হয়ে রয়েছে। গলার স্বরটা তো পনেরো বছর বয়সের মেয়ের গলার স্বরের মত ঝংকার দিয়ে বাজে। হাসলেও যেন একটা কাঁচা বয়সের খুশির ঝর্না কলকল করে বেজে ওঠে। আর, সারা শরীরের গড়নটাও কী চমৎকার। ঘাড় গলা কোমর ; হাতের আঙুলগুলিও, যেন কতগুলি নিখুঁত সৃষ্টির ছাঁদ।

জয়া বলে—আমার বিপদটাও কম যায় না।

শীলা—তোমার আবার বিপদ কিসের ? গায়ের রঙটি যার এমন দুধে-আলতা...

জয়া—থামো শীলাদি। দুধে-আলতা রঙ কি ধুয়ে খাব ?

শীলা—তুমি ধুয়ে খাবে কেন ? যার খাবার হবে সে খাবে।

জয়া—চুপ ! শাট-আপ ! মামার বড় ছেলে শশাঙ্কদার বিয়েতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলাম, সেটা তো জান না।

—কী ?

—শশাঙ্কদা আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। অথচ আমাকে দেখেই একেবারে দিদি বলে ডেকে আর হাত বাড়িয়ে পা ছোঁয়ার জন্য...আমি একলাফে সরে গিয়ে বাঁচি।

—এরকম ভুল করলেন কেন তোমার শশাঙ্কদা ? অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না বোধহয় ?

—তা বটে। কিন্তু তা ছাড়াও...

—কী ?

—মামী বললেন, শশাঙ্কর দোষ নেই। আমার চোখের চাউনিটাই নাকি বেশ বুড়োটে হয়ে গিয়েছে। কেউ ধারণাই করতে পারবে না, আমার বয়সটা তেইশের বেশি নয়। অথচ, তুমি শীলাদি সত্যি অদ্ভুত, তোমার চোখ দুটোও এত কাঁচা যে, তোমাকে আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

রেবা, জয়া আর নীহার তিনজনেই আর-একটা ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে শীলার সঙ্গে তর্ক করে; তর্কের রকমটা অনেক সময় ঝগড়ার মত ভঙ্গি ধরে বেশ তিক্তও হয়ে ওঠে। কারণটা শীলারই একটা বাতিকের ব্যাপার। আয়নার বিরুদ্ধে যেন ভয়ানক একটা রাগ, কিংবা অভিমানমাখা ঘৃণা আছে শীলার। আয়না ছুঁতেই চায় না শীলা। চুল বাঁধার সময়েও আয়নার কাছে দাঁড়ায় না।

নীহার বলে—এটা তোমার একটু বেশি রকমের ঢং হয়ে যাচ্ছে শীলাদি।

শীলা হাসে—পোড়া মুখের চেহারা আয়নাতে না দেখলেও চলবে।

শীলার রঙটা কালো; মুখের রঙ নীহারের দুধ-আলতা রং-এর মুখটার ঠিক উল্টোটি। কিন্তু শুধু সেজন্যেই বোধহয় নয়। যত নিখুঁত গড়ন আর ছাঁদ যেন শীলার মুখটাকে বাদ দিয়ে শুধু শরীরটাকেই জড়িয়ে ধরেছে। কপালটা, নাকটা আর থুতনিটা ওরকম ঢিবি-ঢিবি রকমের না হলে এ চারজনের মধ্যে ওকে ফোর্থ বলে মনে করবার সাধ্যি কারও হত না। শীলা বোধহয় তা হলে ওর ওই কালো রঙ নিয়েই একটা রূপের বিস্ময় হয়ে উঠত।

শীলার হাঁটবার ভঙ্গিটাও অদ্ভুত। শরীরটার যেন কোনও ভার নেই; তরতর করে যেন একটা ছবির শরীর হেঁটে চলে যায়।

পিছিয়ে পড়েছে নীহার। তাই চেঁচিয়ে ডাক দেয়।—একটু আস্তে চলো শীলাদি।

রেবা আর জয়াও অভিযোগ করে—শীলাদিকে আজ যেন বনহরিণীর ফুর্তিতে পেয়েছে। ওভাবে দৌড়ে দৌড়ে হাঁটলে তুমি একাই জঙ্গল বেড়িয়ে এসে শীলাদি। আমরা রইলাম।

শীলা হাসে—তোমরা হাঁটতে পারছ না কাঁটার ভয়ে। পায়ে কাঁটা ফুটবে, শাড়ি ফেঁসে যাবে, এমন ভয় থাকলে জঙ্গল বেড়ানো যায় না।

অভিযোগটা একেবারে মিথ্যে নয়। শীলার দিকে তাকিয়ে ওরা দেখতে পায়, এরই মধ্যে শীলার শাড়িটা তিন জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। পায়ের একটা আঙুলের ফাঁকে কাঁটা বিঁধেছে, রক্তের ছিটে ধুলোমাখা হয়েও লাল হয়ে রয়েছে। খোঁপাটা ভেঙে গিয়ে পিঠের উপর ঝুলে রয়েছে। আর, কে জানে কখন, এই হরতকি জঙ্গলের ভেতরেই কোন বুনো ফুলের গাছ থেকে মস্ত বড় একটা সাদা ফুল তুলে নিয়ে খোঁপায় গুঁজে দিয়েছে শীলা; দেখতে পায়নি নীহার, রেবা আর জয়া।

—আর কত নামবে, শীলাদি? আমার যে সত্যিই একটু ভয়-ভয় করছে। হেসে হেসে আর ক্লান্ত স্বরে প্রশ্ন করে রেবা।

সত্যিই একটা গড়ানো জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু হাঁটুরে পথ ধরে অনেক নীচে নেমে এসেছে ওরা। এখানে দাঁড়িয়ে আর ওপর দিকে তাকালে শ্যামা আর রমাদের খিচুড়ি রান্নার ধোঁয়াটা শুধু একটুখানি দেখা যায়।

নীহার বলে—আঃ, এখানেই বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।

জয়া বলে—ওদিকে গাছের মাথার উপর মাছরাঙা উড়ছে কেন?

শীলা বলে—কোনও ঝিল-টিল আছে বোধহয়।

রেবা আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে—না না, আর অতদূর নয়।

শীলা—অতদূরে কোথায়, এই তো কত কাছে। যেতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না।

রেবাকে আর অনুরোধ করতে হয় না। রেবা নিজেই যেন একটা দুরন্ত কৌতূহলের আবেগে গলা টান করে আর চোখ তুলে কচি শালের সেই ফাঁকা ফাঁকা জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। জঙ্গলটা যেন বিরাট আলো-ছায়া ভরা হলের মত। খাড়া খাড়া গাছ বড় বড় থামের মত দাঁড়িয়ে আছে, আর গাছেরই ছায়াগুলি টানা হয়ে মাটির উপর লুটিয়ে শুয়ে আছে। জঙ্গলের ভেতরে ছোট-ছোট ঝোপ আছে ঠিকই, কিন্তু ঝোপগুলির সারা গা যেন লাল প্রবালের গুটিতে ছেয়ে গেছে।

নীহার—সিংহীর মত ওভাবে ঘাড় গলা উঁচিয়ে কী দেখছ রেবা?

রেবা—বুনো কুল পেকেছে।

—কোথায় ?

—ওই যে, দেখতে পাচ্ছ না কেন ?

আর কোনও কথা নয়। তর্ক করবারও আর দরকার হয় না। চারজনেই একসঙ্গে বুনো কুলের কুঞ্জের দিকে যেন পাগলিনী অভিসারিকার মত আলুথালু হয়ে ছুটে যায়।

নীহার বলে—যদি আগে জানতাম, তবে এক ডিবে নুন সঙ্গে নিয়ে আসতাম।

বুনো কুল খাওয়ার পালা যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে, জয়া বলে—কুলুকুলু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে যেন।

ঠিকই, চারজনেই এগিয়ে যেয়ে দেখতে পায়, খুব রোগা একটা স্রোতের ধারা কলকল করে বালু আর নুড়ির উপর দিয়ে বয়ে চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এটা হুড়রুর ওই বড় ধারার নীচের খাতের গা থেকে বেরিয়ে আসা একটা একলা খুশির স্রোত।

—ইস, সত্যিই যে গা ছমছম করছে। ফিসফিস করে কথা বলে নীহার।

রোগা স্রোতের এই মৃদু কলকল শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ এখানে নেই। হুড়রুর ভয়াল গর্জনের প্রতিধ্বনিটা যেন দুপুরের বাতাসের ঝড়ের সঙ্গে ওদিকে উড়ে চলে গিয়েছে, এদিকে আসতেই পারেনি। এদিকে শুধু স্তব্ধতা। শালেব মাথাগুলি একটুও দোলে না।

জয়া বলে—এই সময় যদি সেই ছায়া-ছায়া জীবটা এখানে এসে দাঁড়ায় শীলাদি ?

বেবা—ঠাট্টা করেও ওভাবে কথা বলো না জয়া। আমার সত্যিই বিশ্রী লাগছে।

শীলা চেঁচিয়ে ওঠে—ওই যে, ওই ওখানে মাছরাঙা উড়ছে।

হ্যাঁ, আব একটু দূরে, এই গা-ছমছম নির্জনতার জগতের একটা গোপন নিভৃতে মাছরাঙা উড়ছে দেখা যায়।

শীলা বলে—মাছরাঙা যখন আছে, তখন ওখানে মাছও আছে নিশ্চয়। নিশ্চয় একটা ঝিল আছে।

জয়া—থাক ঝিল; ওদিকে আর এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

কিন্তু জয়ারই চোখ দুটো ওদিকের একটা বিস্ময়ের দিকে যেন লোভীর মত তাকিয়ে থাকে—ওগুলো আমলকি বলে মনে হচ্ছে!

নীহার—অ্যাঁ, কোথায় ?

রেবা—পাকা আমলকি নাকি অমৃতফল, খেলে মরণ হয় না।

শীলা বলে—হ্যাঁ, আমলকি। সত্যি আমলকি।

গাছভরা আমলকি যেন গাছভরা সুস্বাদুতার আঙুর। দৌড় দিয়ে ছুটে এগিয়ে যেতেও দেরি হয় না। দেখা যায়, এরকম লোভের প্রেরণা যেখানে থাকে, সেখানে রেবা নীহার আর জয়া শীলার চেয়েও বেপরোয়া দৌড় দিতে পারে।

হুটোপুটি করে এক গাদা আমলকি ছিঁড়ে কোঁচড়ে ভরতে ভরতে রেবা বলে—শীলাদি, এবার তুমি কিন্তু আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারনি।

শীলা—আমি তো আমলকির জন্যে ব্যস্ত নই।

জয়া—হঠাৎ এরকম অব্যস্ততা কেন ?

শীলা—আমি খুঁজছি ঝিলটাকে।

জয়া—কেন ?

শীলা—চান করব।

নীহার—সাবধান শীলাদি, এত সাহসের শখ ভাল নয়। বুড়ো মানুষের উপদেশ তুচ্ছ করো না।

শীলা হাসে—বল কী ? এরকম একটা নির্জন জায়গাতে একটা ঝিল পেলে গা ডুবিয়ে চান করব না ?

রেবা—কাজ নেই শীলাদি। ছায়া-ছায়া সেই মতলবটা নাকি জলের কাছাকাছি থাকে।

সত্যিই তো, আমলকির জঙ্গল যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে কাকচক্ষু জলের বেশ খোলামেলা

একটা দহ টলমল করছে। সাদা আর কালো পাথরের কাটা-কাটা খাঁজ দহটার দু'পাশে যেন ফ্রেমের মত আঁটা। বুঝতে পারা যায়, সেই রোগা স্রোতটাই গড়িয়ে গড়িয়ে এখানে এসে একটা দেহ হয়ে আবার ওদিকের পাথর ছাপিয়ে আর একটা ঝর্না হয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

কুচো কুচো রুপোর মত চেহারার মাছের ঝাঁক ছটফটিয়ে দহের কাকচক্ষু জল শিউরে দিয়ে আবার তলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে রঙিন মাছরাঙা। যেন বাতাসের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে মিশে থাকা একটা রঙিন উল্লাসের প্রাণ চোখের পলক না ফুরোতেই রুপোর কুচির মত সাদা মাছ ছোঁ মেরে লুটে নিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

নীহার বলে—মাছরাঙার কাণ্ড দেখেও যে আমার ভয় করছে শীলাদি।

শীলা—কিন্তু দহের হাঁস দুটোকে দেখে কেমন লাগছে ?

হাঁস ? হ্যাঁ, সত্যিই ছোট-ছোট রঙিন মাখনের ডেলার মত দুটো হাঁস দহের জলের মাঝখানে দুটো সাদা পাথরের গায়ের শেওলাতে ঠোঁট ঘষে ঘষে ভেসে বেড়াচ্ছে।

শীলা বলে—আমি জানি, এগুলো অনেক দূরের হাঁস। শীতকালে এখানে আসে।

রেবা বলে— হাঁস ধরবার জন্যে আবার যেন বায়না ধরো না শীলাদি।

শীলা—ধরতে পারলে ভাল ছিল।

জয়া—কখ্‌খনও না।

শীলা—একবার ধরে নিয়েই ছেড়ে দিতাম।

নীহার—না। ও রঙিন হাঁস কোলে করবার জন্যে লোভ না করে নিজেরই একটা..

চেঁচিয়ে উঠে রেবা—ওকি শীলাদি ? তোমার মতলব কী ?

জলের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শীলা। আর চোখের হাসিটা যেন দহের কাকচক্ষু জলের মত টলমল করছে।

জয়া—সত্যিই কি .

শীলা—হ্যাঁ, গা ডুবিয়ে একবার চান করবার এমন চান্স জীবনে আর পাওয়া যাবে না।

নীহার—আঃ, কী করছ শীলাদি ! জায়গাটাকে কি একটা বাথরুম মনে করলে ?

শীলা—যা-ই বল, আমি গা ডুবিয়ে চান করবই।

রেবা—শাড়ি ভেজাবে ?

শীলা—না।

জয়া—তবে ?

শীলা—শাড়ি না ভেজালেও চলবে ; কোনও অসুবিধে নেই।

নীহার রাগ করে—সত্যিই শীলাদির শখের মাথামুণ্ডু নেই।

শীলা—এই তো চমৎকার একটা পাথরের আড়াল রয়েছে। তোমাদের চোখ আমার মাথামুণ্ডু কিছুই দেখতে পাবে না। তোমরা চুপ করে ওখানেই বসে গান গাও।

ওদিকে পাথরটার আড়ালে কাকচক্ষু জল ছলছল করে। এদিকে নীহার রেবা আর জয়া মাঝে মাঝে গল্প থামিয়ে অস্বস্তিময় স্বরে ডাক দেয়—আর কতক্ষণ ! এবার উঠে এসো শীলাদি।

শীলার গলার স্বরও উচ্ছল হয়ে জবাব দেয়—এই হয়ে এল। যাচ্ছি।

রঙিন হাঁস দুটো অনেক দূরে চলে গিয়েছে। শীলাও উঠে এসেছে।

জলে ভিজে ভারী হয়ে গিয়েছে খোঁপাটা। সেই ভিজে খোঁপারই মধ্যে সাদা বুনো ফুলটাকে আবার গুঁজে দিয়ে শীলা বলে—চলো, এবার কোন দিকে যাবে ?

জয়া চমকে ওঠে—ওকি ? ওখানে ওসব কী পড়ে আছে ?

বাঘের থাবার চিহ্ন দেখলে চোখের বিস্ময় যেমন ভীরু-ভীরু হয়ে যায়, জয়ার চোখে যেন সেই রকমের একটা ভীরু বিস্ময় চমকে উঠেছে।

চমকে ওঠে সকলেই। নীহার আর রেবার চোখে যেন বিপন্ন মানুষের চোখের মত একটা আতঙ্কের ছায়া। আর, শীলার চোখে একটা দুরন্ত কৌতূহল। ওই ওখানে, যেখানে পাথরের ওপারের আড়ালে স্নান করেছে শীলা, সেখান থেকে একটু দূরে, একটা পিয়ালের ছায়াতে, দহের

কিনারায় একটা বড় পাথরের উপর কতগুলি কাগজ নুড়ি চাপা হয়ে পড়ে আছে। তার কাছেই চিনেমাটির ছোট ছোট কয়েকটা বাটি। একটা এনামেলের থালা, তার ওপরে তিন চারটে তুলি।

নীহার বলে—এখানে লোক আছে বলে মনে হচ্ছে।

রেবা—লোকটার বোধহয় ছবি আঁকার অভ্যেস।

জয়া—লোকটা আজই এসেছে বলে মনে হচ্ছে। সিগারেটের খালি বাক্স পড়ে আছে।

শীলা—চলো, এগিয়ে যেয়ে দেখি।

রেবা—না। বলতে তোমার একটুও ভয় করছে না শীলাদি ? আশ্চর্য !

জয়া—কখ্‌খনও না। তুমি সত্যিই খুব বিশ্রী একটা কাণ্ড করলে শীলাদি।

নীহার—কোনও দরকার নেই যেয়ে।

শীলা হাসে—শ্যামার মা তো এমন গল্প বলেননি যে, সেই ছায়া-ছায়া জীবটার ছবি-টবি আঁকা অভ্যেস আছে।

নীহার—বলতে বোধহয় ভুলে গিয়েছেন।

জয়া—ছায়া-ছায়া না হয়ে যদি কায়া-কায়া হয়, তাতেই বা কী ? আমার এখানে আর মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না।

রেবা—এদিকে আসা খুবই ভুল হয়েছে শীলাদি।

শীলা হাসে—তোমরা সবাই যদি রাজি হও, আমি তবে এখনি এক ঠেলা দিয়ে এসব কাগজ-টাগজ দহের জলে ফেলে দিয়ে আসতে পারি।

মস্ত বড় যে পাথরের চাঙড়টার আড়ালে স্নান করেছিল শীলা, সেই পাথরেরই কাছে শালের ছায়ার আড়াল থেকে যেন একটা কায়াহীন ছায়ার গলার স্বর বেজে ওঠে—ওগুলো আমিই ওখানে রেখেছি। জলে ফেলে দেবেন না।

রেবা নীহার আর জয়া একসঙ্গে শীলার একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কাঁপতে থাকে।—কী ভয়ানক কাণ্ড, কী উপায় হবে শীলাদি ?

নীহার, রেবা আর জয়ার হাত ছাড়িয়ে শীলা দু'পা এগিয়ে যেয়ে পাথরের চাঙড়ের ওদিকের একটা নিরালার দিকে তাকায় ; এক ভদ্রলোক হরিণের চামড়ার একটা আসনের উপর বসে, আর দুভাঁজ করা একটা সিল্কের চাদরের উপর চাল ডাল আর আলু সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। মাটির একটা সরার উপরে বেশ বড় একটা ছুরি আর চামচও আছে। তিনটে পাথর জড় করে একটা উনুনও তৈরি করেছে ভদ্রলোক। উনুনের একপাশে শুকনো কাঁটালতার একটা গাদাও পড়ে আছে।

শীলা ফিরে এসে বলে—তোমাদের ভয়টাকেই বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে রেবা।

রেবা—কী করব বলো ?

শীলা—সব চেয়ে ভাল হয়, ভদ্রলোকের সঙ্গে দুটো কথা বলে চলে যাই।

নীহার—তবে তাই করো। খুব তাড়াতাড়ি করো শীলাদি।

জয়া—আমি কিন্তু তোমাদের সবার পেছনে থাকব।

ছিপছিপে অথচ বেশ শক্ত চেহারার এক ভদ্রলোক। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা হয়েও কেমন যেন পোড়া-পোড়া ; যেন একটা কালচে ছায়া মাখানো ফর্সা চেহারা। চোখ দুটো খুব কালো ; আরও কালো আর ঘন হল চোখের ভুরু দুটো।

ভদ্রলোক যেন একটা শৌখিন দীনতার ছবি। ময়লা খাকি ট্রাউজারটা চোরকাঁটায় ভরে গিয়েছে, কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন একটা রঙিন সিল্কের তোয়ালে শক্ত করে কোমরে বেঁধেছেন ভদ্রলোক ; বেল্ট নেই বোধহয়। দেখতে অদ্ভুত লাগে। কয়েক মুঠো চাল ডাল আর কয়েকটা আলুকে কত পরিপাটি করে একটা দোভাঁজ সিল্কের চাদরের উপর সাজিয়ে রেখেছেন ভদ্রলোক। ভদ্রলোককে একটু সিল্ক-পাগল বলে মনে হয়।

উনুনের পাথর তিনটেও কী চমৎকার ভঙ্গিতে বসানো হয়েছে। আর শুকনো কাঁটালতার ডাঁটিগুলিকেও যেন বেশ যত্ন করে সমান সাইজে ভেঙে ভেঙে রেখেছেন ভদ্রলোক। এখুনি উনুনের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে যে বস্তু, সে বস্তুকেও কত পরিপাটি করে একপাশে সাজিয়ে

রেখেছেন। হোমের আগুনের কাঠকেও যে এরকমের সুদৃশ্য চেহারা দিয়ে আর গুছিয়ে কেউ সাজিয়ে রাখে না। পাগলের শখ, না, শখের পাগলামি ?

ভদ্রলোকের ওই সামান্য অথচ শৌখিন পিকনিকের ঠাঁইটার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েই চারটে কৌতূহলের মূর্তি যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে থেমে যায়। কথা বলছেন ভদ্রলোক। বেশ শান্ত স্বরে বেশ অভদ্রতার কয়েকটা কথা।—কিছু মনে করবেন না। আপনাদের সঙ্গে বেশি কথা বলবার সময় আমার নেই।

নীহার, রেবা আর জয়া একসঙ্গে চাপা-গলায় ফিসফিসিয়ে ওঠে—ওরে বাবা ! কথার কী ছিরি !

এমন লোকের সঙ্গে কথা বলবার দরকারই বা কী ? কিন্তু কী আশ্চর্য, শীলাদির চোখে যেন একটুও বিরক্তি নেই। এরকম একটা ভদ্রভাষার অভদ্র ধমক খেয়েও কী শীলাদি ওই অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে কথা বলতে চায় ?

ঠিকই সন্দেহ করেছে নীহার, জয়া আর রেবা। শীলা বলে—আপনি কেমন করে বুঝলেন যে, আপনার সঙ্গে বেশি কথা বলবার কোনও গরজ আছে আমাদের ?

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে, আর ট্রাউজারের পকেট থেকে চকচকে কালো একটা পাইপ বের করে মুখের কাছে তুলে ধরেন। পাইপটাকে দাঁতে কামড়ে ধরেই কথা বলেন ভদ্রলোক—আমার কথায় আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ভুল করেছেন। অন্য সময় হলে আমি নিজেই যেচে আপনাদের কাছে অনেক কথা অনেক গল্প বলতে পারতাম। কিন্তু আজ, সময় বেশি নেই বলে, আর বিকেল ফুরোবার আগে আমাকে অনেকগুলি স্কেচ সারতে হবে বলেই আপনাদের বলতে হয়েছে..

শীলা—আপনি ছবি আঁকুন না। আমরা তো বাধা দিতে আসিনি।

ভদ্রলোক হাসেন—আপনারা এখানে থাকলেই সেটা আমার পক্ষে বেশ বাধা হবে। তার মানে, আমার একটা খুব নিরিবিলি জায়গা দরকার। সেই জন্যেই ওদিকের পিকনিকের ভিড় থেকে এদিকে সরে এসেছি।

এর পর আর এখানে এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। ভদ্রলোকের মুখের ভাষাটা যেন হেসে হেসে চারজনকে এই মুহূর্তে খেদিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু...তবু...নীহার ফিসফিস করে রেবার কানের কাছে কথা বলে—কিন্তু শীলাদি সত্যিই বড় বেহায়াপনা শুরু করে দিয়েছে। আবার কথা বলবে বলে মনে হচ্ছে।

শীলা বলে—কিন্তু আপনি ছবি আঁকবেন কখন ?

—এখনি।

—রান্না শেষ হবে কখন ?

—এই, কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

—কী রান্না করবেন ?

—খিচুড়ি।

—কিসে রান্না করবেন ?

—কেন ? এই উনুনে।

—উনুন না হয় হল। কিন্তু খিচুড়ি ফুটবে কোথায়, কোন হাঁড়িতে ?

—কী বললেন ?

—হাঁড়ি-টাড়ি সঙ্গে এনেছেন ?

—হাঁড়ি-টাড়ি ?

—হ্যাঁ।

—না।

—কোনও ডেকচি কিংবা প্যান ?

—না।

—তবে খিচুড়ি কী হাওয়ার উপর ভাসবে আর টগবগ করে ফুটবে ?

—তাই তো। একটা পাত্র, অন্তত একটা কলসি সঙ্গে আনা উচিত ছিল।

রেবা, নীহার আর জয়া হাসি লুকোতে গিয়ে মুখ লুকোতে চেষ্টা করে। শীলা বলে—কলসি না আনলেও চলত, যদি একটা ছোট বালতি সঙ্গে আনতেন।

—ছোট বালতি ?

—হ্যাঁ। এনেছেন নাকি ?

—না। তবে একটা...

—কী ?

—টিনের মস্ত বড় একটা কৌটো আছে।

নীহার, জয়া আর রেবা এবার হাসি চাপতে গিয়ে কাশতে শুরু করে।

শীলা বলে—মস্ত বড় মানে কত বড় ?

ভদ্রলোক—দু'সের ঘি ধরে।

শীলা—ঘি এনেছেন সঙ্গে ?

—না। আমি ঘি খাই না।

—শুধু কৌটোটা এনেছেন ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কই, এরকম কোনও কৌটো তো দেখছি না।

—এখানে নয়, কৌটোটা ওখানে আছে। ওটা আমার তুলি রাখবার কৌটো।

—তা হলে নিয়ে আসুন।

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে চলে যায়। নীহার বলে—আর ভাল লাগছে না শীলাদি।

রেবা—অচেনা-অজানা একজন লোকের সঙ্গে বেশি হাসি-তামাশা ভাল নয় শীলাদি।

শীলা হাসে—ভদ্রলোকের হেড-অফিসে বেশ গোলমাল আছে মনে হচ্ছে।

জয়া—চাল-ডাল পুড়িয়ে খাক হাফ-পাগলটা। চলো, এবার আমরা সরে পড়ি।

কিন্তু ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে কৌটোটা হাতে নিয়ে ফিরেছেন।

শীলা বলে—এবার এই কৌটোটাকে ভাল করে একবার ধুয়ে নিন। তারপর উনুন ধরান।

—আজ্ঞে ?

—উনুন ধরলে এই কৌটোটার অর্ধেকটা জলে ভরে উনুনের ওপর চাপিয়ে দিন।

—শুধু জল ?

—হ্যাঁ। জল ফুটলে এক মুঠো চাল আর দু'মুঠো ডাল ছেড়ে দেবেন। তারপর...

—জল ফুটবে তো ?

ভদ্রলোক অদ্ভুত রকমের একটা দৃষ্টি তুলে শীলার মুখের দিকে তাকিয়েছে, যেন একটা বিষণ্ণ মূঢ়তার করুণ দৃষ্টি। শীলার চোখ দুটোও যেন বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

জয়ার কানের কাছে ফিসফিস করে রেবা—লক্ষণ ভাল নয় জয়া। আমার কিন্তু দেখতে খুব খারাপ লাগছে।

জয়া—কী ?

রেবা—শীলাদি শেষে একটা কাণ্ড না করে বসে।

জয়া—কিসের কাণ্ড ?

রেবা—এবার হয়ত টিনের কৌটোতে খিচুড়ি রাঁধতে বসে যাবে শীলাদি।

জয়া—সর্বনাশ !

ভদ্রলোক এবার সত্যি হাফ-পাগলের মত লজ্জিতভাবে হেসে কথা বলেন। —সত্যিই, কিছু ভেবে পাচ্ছি না...তার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না...

শীলা—এর আগে কখনও রান্না-টান্না করেছেন ?

—আজ্ঞে না।

—রান্না-টান্না দেখেনওনি ?

—দেখেছি ; কিন্তু মনে করতে পারছি না, ঠিক কেমন করে... কিভাবে....
—তা হলে একটা কাজ করুন।
—বলুন।
—আপনি ওদিকে গিয়ে বসুন।
—আজ্ঞে।
—আমি রেঁধেই দেখিয়ে দিচ্ছি।
চমকে উঠে নীহারের গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বিড়বিড় করে জয়া—সর্বনাশ ! মিথ্যে সন্দেহ করনি নীহার।
ভদ্রলোক এরই মধ্যে ওপাশের পলাশটার কাছে সরে গিয়ে গাছের ছায়ার সঙ্গে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছেন, আর মুখ ভরে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করেছেন।
নীহার চাপা গলায় বলে—বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে শীলাদি।
শীলা হাসে—কেন ?
জয়া—ভদ্রলোক রান্না করতে জানেন না ; শুধু রান্নার নিয়মটা বলে দিয়ে চলে গেলেই হত।
রেবা—তা ছাড়া, এসব কাণ্ড করলে এখানেই যে দুপুর পার হয়ে যাবে ; সেটা ভেবে দেখেছ ?
শীলা হাসে—সত্যি কথা, আমার কিন্তু বেশ একটু মজাই লাগছে নীহার।
নীহার—আমার বিশ্রী লাগছে।
শীলা—বিশ্রী লাগবার কী আছে ? একটা খামখেয়ালি আর্টিস্ট মানুষ, রান্না-টান্না করবার নিয়মই জানে না ; এ ছাড়া বেচারার আর কী দোষ দেখলে বলো ?
রেবা মুখ টিপে হেসে ফেলে—এই সেরেছে !
শীলা—কী হল ?
রেবা—এরই মধ্যে লোকটা তোমার কাছে বেচারা হয়ে গেল।
জয়াও হাসে—তোমার বেচারা কিন্তু বেশ জ্বালাবে বলে মনে হচ্ছে শীলাদি।
শীলা—কেন ?
জয়া—দেখছ না, তোমার হাতের খিচুড়ি খাবে বলে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে পাইপ টানছে।
শীলা—সত্যিই ভাবতে একটু মায়া লাগছে জয়া।
জয়া—লাগুক ; কিন্তু তুমি এখন চলো।
নীহার আর রেবাও বলে—চলো শীলাদি।
শীলা—আর একটু থেকে যাও নীহার।
নীহার রেবা আর জয়া গম্ভীর হয়ে একসঙ্গেই বলে—না।
শীলা—কিন্তু. .
শীলার মুখের দিকে কঠোর ভ্রূকুটি তুলে তাকায় নীহার—কিন্তু আবার কী ? তুমি খুব সাহসী জানি, এত সাহস দেখিও না শীলাদি।
হঠাৎ চমকে ওঠে শীলা, সেই নীহার রেবা আর জয়াও। ভদ্রলোক উঠে এসেছেন।
ভদ্রলোক বলেন—আমার মনে হচ্ছে, আমি ভুল করছি। আপনাদের দিয়ে এসব কাজ করানো আমার খুব অন্যায় হচ্ছে। আপনারা না হয় ভদ্রতা করছেন, কিন্তু আমার পক্ষে নিতান্ত অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে।
শীলা হাসে—তা হলে রান্না-টান্না এখন...
—আজ্ঞে না। কোনও দরকার নেই। আমি চলেই যাই।
শীলা—কোথায় যাবেন ?
—টাউনে ফিরে যাই। এবার আর ছবি আঁকা সম্ভব হবে না। দেখি, আসছে বছর আবার যদি আসতে পারি।
শীলা—একেবারে না খেয়ে-দেয়েই চলে যাবেন ?
—হ্যাঁ ; কোনও অসুবিধে নেই। ওসব আমার খুব অভ্যাস আছে।

ভদ্রলোক সত্যিই ব্যস্তভাবে এগিয়ে যেয়ে, আর সেই কাকচক্ষু জলের দহটার কাছে গিয়ে ছবি আঁকবার যত কাগজ আর সাজসরঞ্জাম ঝোলার মধ্যে ভরতে থাকেন।

শীলা গম্ভীর হয়ে বলে—আমরাই ভদ্রলোককে তাড়িয়ে ছাড়লাম।

নীহার—ভগবান জানেন ; আমরা কী অপরাধ করলাম ?

রেবা—ভদ্রলোক কিন্তু অভদ্র নয় বলেই মনে হচ্ছে।

জয়া—ওরকম লোককে ভয় করে না ঠিকই, তবু..

শীলা—আমি কিন্তু একটা কাণ্ড করব।

নীহার—কী ?

শীলা—রান্নাটা করেই দিয়ে যাব। এই তো এক কৌটো খিচুড়ি, রাঁধতে কতক্ষণই বা লাগবে ?

জয়া—তবে আমরা কী করি ?

শীলা—তোমরা ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প-টল্প করো।

জয়া—অসম্ভব।

নীহার আর রেবা বলে—আমরা কিন্তু চলে যাব শীলাদি। তুমি আর একবার ভেবে দেখো।

শীলা—কী ভাবব ?

রেবা—এখানে তোমার একা-একা থাকা উচিত হবে কিনা।

শীলা— উচিত নয় জানি, কিন্তু ভয়ও নেই জানি।

নীহার, রেবা আর জয়া আবার গম্ভীর হয়ে যায়। ওই ভদ্রলোককে ভয়ানক বলে মনে হয় না ঠিকই, কিন্তু শীলার চোখ দুটোকে দেখতে ভয়-ভয় করছে। যে মেয়ের আর ক-দিন পরেই অমন একজন সুন্দর কৃতী আর গুণী মানুষের সঙ্গে বিয়ে হবে, শীলার মত চেহারার মেয়ের পক্ষে যেটা স্বপ্নেরও অগোচর একটা সৌভাগ্য, সে মেয়ে এখানে এরকম একটা জংলি নিরিবিলির মধ্যে একটা অচেনা-অজানা হাফ-পাগল মানুষের জন্য খিচুড়ি রাঁধবে, এরকম অনিয়মের যে কোনও মানেই হয় না। এটা সম্ভবই বা হয় কেমন করে ? শীলাদি যে সবসময় হেসে হেসে নিজের মুখটাকে পোড়ামুখ বলে গাল দেয়, সেটা যে শুধু অভিমানের ভাষা নয়, একটা অহংকারেরও ভাষা। শীলার সঙ্গে চার বছর ধরে ভালবাসার সম্পর্কে শীলার জীবনের বান্ধব হয়ে গিয়েছেন যে ভদ্রলোক, সে ভদ্রলোককে নীহার, রেবা আর জয়াও দেখেছে। নিজেরই ওপরে ভয়ানক অন্যায় করছে শীলা। আর যে-ই হোক, শীলার অন্তত আর কোনও ভদ্রলোকের জন্য মায়া দেখাবার কোনও মানে হয় না, উচিতও নয়।

কাকচক্ষু জলের দহটার দিকে তাকিয়ে শীলা হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাক দেয়—যাবেন না।

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে আর বেশ আশ্চর্য হয়ে তাকায়। —কেন ?

শীলা—আপনি বসুন। আমি আপনার খিচুড়ি রেঁধে দিচ্ছি।

নীহার, রেবা আর জয়া বলে—আমরা তবে যাই।

শীলা—হ্যাঁ, আমিও যত তাড়াতাড়ি পারি, যাচ্ছি।

নীহার, রেবা আর জয়া খুব বেশি গম্ভীর হয়ে আর, যেন একটা আতঙ্কময় লজ্জার ভয়ে ভীরু হয়ে তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে যায়।

কেদারবাবু বলেন—আমার যে আর এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না।

শ্যামার মা বলেন—তবে একটু ঘুরে এসো।

কেদারবাবু—হ্যাঁ ভাবছি, ওই রাইফেল-সাহেবের কাছে গিয়ে একটু গল্প করে আসি।

শ্যামার মা—এতটা খাড়াই উঠতে পারবে ?

কেদারবাবু—পারব না বলেই জানতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে পারব।

—কেন ?

—ওই যে রাইফেলার-সাহেব, তাঁকে একটু চেনা-চেনা মনে হল। মনে হচ্ছে, রেল অফিসে ওঁকে একবার দেখেছি। বোধহয় ডি টি এস।

—তাতে তোমার কী ?

—যদি একটু ভাব-সাব জমাতে পারি, তবে পাঁচুকে রেলের একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবার সুবিধে হবে। ডি টি এস পেছনে থাকলে একটা চাকরি হবেই হবে।

—তাই বলো।

—বলবার আবার কী আছে ? চাকরির জন্যে বাঙালি যে গন্ধমাদন ঘাড়ে করে সাগর ডিঙোতে পারে তা জান না ?

—হনুমান যে বাঙালি ছিলেন তা জানতাম না।

—ঠাট্টার কথা নয়। সামান্য একটা খাড়াই ডিঙিয়ে যদি পাঁচুর চাকরিটার ব্যবস্থা করতে পারি, তবে...

শ্যামার মা—ব্যবস্থা করে এসো, আমি তো আপত্তি করছি না।

লাঠিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে চললেন কেদারবাবু। আর, হাঁপিয়ে পড়বার আগেই ছোট একটা তাবুর কাছে এসেই বুঝতে পারলেন, গন্ধটা মুরগির কারি রান্নার গন্ধ।

বাইনকুলার-সাহেব আর তাঁর বাঙালিনী মেম দু'জনেই কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে পাশাপাশি বসে আছেন। রাইফেল-সাহেব আর তাঁর বাঙালিনী মেম...না, এ দুজনকে তো ঠিক স্বামী-স্ত্রী বলে মনে হচ্ছে না। এ দুজনের বিয়েটা বোধহয় হব-হব হয়েছে :

—গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং স্যার। দুই সাহেবকেই হেসে হেসে অভিনন্দিত করে এগিয়ে যান কেদারবাবু।

বাইনকুলার-সাহেব ও তাঁর স্ত্রী কেদারবাবুকে দেখে অপ্রসন্ন হয়েছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু রাইফেল-সাহেব আর তাঁর, তাঁর ওই আসন্না স্ত্রী বেশ অপ্রসন্ন হয়েছেন বলেই মনে হচ্ছে। তা না হলে, দুজনে ওভাবে ভ্রূকুটি তুলে কেদারবাবুর দিকে তাকাবেন কেন ?

কেদারবাবু বলেন—ট্রেসপাস করলাম স্যার, কিছু মনে করবেন না। একা একা আর বসে থাকতে ভাল লাগছিল না বলেই ইচ্ছে হল, যাই, সাহেবদের সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি।

বাইনকুলার-সাহেব বলেন—আলাপ করুন তা হলে।

—আপনি তো স্যার রেলের সাহেব।

—আজ্ঞে না। আমি একটা কোলিয়ারির সাহেব, দেখছেন না আমার গায়ের রঙ ?

—ওটা তো কালো রঙ নয় স্যার, ওটা হল—যাকে বলে শ্যামল রঙ।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন বাইনকুলার-সাহেব। —এবার নিজের কানে শুনে নাও অরুণা। আমার গায়ের রঙ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আর সাহস করো না।

অরুণা মুখ টিপে হাসে। অরুণার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে একটা নমস্কারের ভঙ্গি ঠুকে দিয়েই প্রশ্ন করেন কেদারবাবু—আপনি হলেন গিয়ে...

বাইনকুলার-সাহেব বলেন—উনিই হলেন এই দীনহীনের জীবনের অধীশ্বরী।

কেদারবাবু—সে কী আর আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে স্যার ? এক নজরেই দেখে বুঝে নিয়েছি।

বাইনকুলার-সাহেব—তবে বরুণার দিকে এক নজরে তাকিয়ে বলে দিন দেখি, বরুণা কার জীবনের অধীশ্বরী।

হ্যাঁ, বোঝা গেল, এ মহিলা, যিনি একটু আগে ভ্রূকুটি করেই কেদারবাবুর দিকে তাকিয়েছিলেন, তাঁরই নাম বরুণা। বরুণার দিকে তাকিয়ে কেদারবাবু যেন একগাল লজ্জার হাসি হাসেন—উনি এখনও কারও অধীশ্বরী হননি।

বাইনকুলার-সাহেব চেঁচিয়ে ওঠেন—একদিন হবেন তো নিশ্চয় ?

—তা হবেন বইকি।

—কবে হবেন ?

—সেটা কি স্যার চোখে দেখে বলা যায় ?

—কুমুদকে চোখে দেখেও কি আপনার চোখে কোনও সন্দেহ দেখা দিচ্ছে না ?

বোঝা গেল, রাইফেল-সাহেবের নাম কুমুদ, যিনি কেদারবাবুকে দেখা মাত্র বিশ্রী রকমের ভ্রূকুটি

করেছিলেন।

কেদারবাবু কুমুদের দিকে তাকিয়ে বলেন, না স্যার ; সন্দেহ করতে সাহস পাচ্ছি না স্যার।

বাইনকুলার-সাহেব—কেন ?

কেদারবাবু—ওঁর হাতের রাইফেলটাকে দেখতে আমার একটুও ভাল লাগছে না স্যার।

বাইনকুলার-সাহেব—আঃ, আপনি অন্য কথায় চলে যাচ্ছেন কেন ?

কুমুদ যেন একটা বিরক্তির ভাব চেপে দিয়ে হাসতে চেষ্টা করে—আপনি একজন বাইরের লোকের সঙ্গে এত কথা বলতে শুরু করলেন কেন শঙ্করদা ?

বোঝা গেল, বাইনকুলার-সাহেবের নাম শঙ্কর। শঙ্কর ও অরুণা, আর কুমুদ ও বরুণা।

কেদারবাবু হাসেন—অরুণা বরুণা নিশ্চই দুই বোন, স্যার ?

শঙ্কর বলে—এটা বুঝতে আপনার এত দেরি হল ?

—একটু ভেবে-চিন্তে বুঝতে হচ্ছে স্যার।

—তবে একটু ভেবে-চিন্তে বলুন, কুমুদ আর বরুণাকে একসঙ্গে দেখলে আপনার কী মনে হবে ?

—কিছুই মনে হবে না, আমি তো কবি নই স্যার।

—কিন্তু আমার বেলায় তো খুব কবিত্ব করলেন !

—তা করেছি বটে।

কুমুদ ব্যস্তভাবে বলে—আমি আর বরুণা ওদিকে একটু ঘুরে আসি শঙ্করদা।

শঙ্কর—কোন দিকে ?

কুমুদ—ওই যে, বুড়ো বটগাছটার কাছে। দু'চারটে হরিয়াল পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।

কেদারবাবু চমকে ওঠেন—মানা করুন স্যার :

শঙ্কর—কেন ?

কেদারবাবু—এখানকার হরিয়াল ঘুঘু কিংবা অন্য কোনও পাখি মারলে বড়ই বিপদে পড়তে হয় স্যার।

শঙ্কর—কেন ? কে বাধা দেবে ?

কেদারবাবু—যে বাধা দেবে, তাকে চোখে দেখতে পাবেন না। সেটা একটা ছায়া-ছায়া চেহারার জীব, একটা ডাইন। বিশ্বাস না হয়, থানাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

—পুঃ ; কেদারবাবুর দিকে তাকিয়ে যেন তীব্র একটা তুচ্ছতার শব্দ ছেড়ে দিয়ে ব্যস্তভাবে ডাক দেয় কুমুদ—চলো বরুণা।

ছোট তাঁবুর ভিতর থেকে বয় বের হয়ে এসে কেদারবাবুর হাতের কাছে একটা পেয়ালা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অরুণা বলে—নিন, কফি খান।

কেদারবাবু—হ্যাঁ, বছর পাঁচ আগে একদিন কফি খেয়েছিলাম বটে। কিন্তু স্বাদটা ভুলেই গিয়েছি।

শঙ্কর—আপনি কী করেন ?

কেদারবাবু—আমি রাঁচির আগরওয়ালা কোম্পানির ক্যাশিয়ার।

কুমুদ বলে—আমার মনে হয়েছিল, আপনি রাঁচির সেই পাগল হাসপাতালের একজন মেম্বার।

কেদারবাবু—আমাকে দেখে তাই মনে হয় বটে ; কিন্তু আমি তা নই স্যার।

কুমুদ আর বরুণা হাসতে হাসতে চলে যায়। অরুণা বলে—আপনি মুরগি খান ?

কেদারবাবু—খুব খাই।

অরুণা—তবে খেয়ে যান।

কেদারবাবু—দিন তা হলে। কিন্তু স্যার...আমি সত্যিই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলাম।

শঙ্কর—বলুন।

কেদারবাবু—আমার ভাইপো পাঁচুকে আপনার কোলিয়ারির কোনও একটা কাজে লাগিয়ে দিন স্যার।

শঙ্কর—পাঁচুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

—তেঁতুলপুরা কোলিয়ারি, কাতরাসগড়।

—সহস্র ধন্যবাদ স্যার।

চমকে ওঠেন কেদারবাবু। ওই বটগাছের কাছে বন্দুকের শব্দ গর্জে উঠেছে। শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্নভাবে কথা বলেন কেদারবাবু—বুড়ো মানুষের কথাটা তুচ্ছ করে কুমুদবাবু শেষে হরিয়াল মারলেন বলে মনে হচ্ছে। উনি খুব ভুল করলেন স্যার।

শীলা হেসে হেসে বলে—আমি শুধু একবার এই এক কৌটো খিচুড়ি রেঁধে দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপর...

ভদ্রলোক বলে—তারপর আর আপনাকে কিছু করতে হবে না।

—বুঝলাম ; কিন্তু, তারপর আরও বার দুই আপনাকে কষ্ট করতে হবে। এই ছোট্ট এক কৌটো খিচুড়িতে তো আপনার পেট ভরবে না।

—তা...না ভরুক ; ওতেই হয়ে যাবে। আধপেটা খাওয়া আমার অভ্যেস আছে।

—ভাল অভ্যেস নয়।

—কী করব বলুন ? যা রোজগার, তাতে আধপেটা খাওয়া অভ্যেস থাকাই ভাল।

—কেন ? আপনার ছবি বিক্রী হয় না ?

—ছবি বিক্রী হবে ? এদেশে ? আপনি যে অদ্ভুত কথা বলছেন।

—কী করেন আপনি ?

—আমি এক সাহেবের বাগানের বড় মালী।

—কী বললেন ?

—গার্ডেন-ইন-চার্জ। কথাটা শুনতে যেমন মনে হয়, আসলে কিন্তু তা নয়। কাজটা ভাল। কিন্তু মাইনেটা মোটেই ভাল নয়।

—তবে অন্য একটা ভাল মাইনের কাজ ধরেন না কেন ?

—মাঝে মাঝে যে ইচ্ছে করে না, তা নয়। কিন্তু ইচ্ছেটাই যেন শেষে বেঁকে বসে। যাই হোক, চলে তো যাচ্ছে।

—আপনার বাড়ির মানুষেরা কি এটা পছন্দ করেন ?

—বাড়ির মানুষ বলতে কেউ নেই। সেদিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান।

উনুনে আগুন জ্বলছে। টিনের কৌটোর জলও ফুটছে। কিন্তু, বুঝতে পারে না শীলা, হঠাৎ মনটা এমন অস্বস্তিতে ভরে উঠল কেন ? মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক যেন তাঁর দু'চোখের সেই ঘন-কালো দুটো ভ্রু টান করে শীলাকে দেখছে। দেখছে তো বয়ে গেছে ; কিন্তু হঠাৎ এভাবে মনের অদ্ভুত একটা রাগ চেপে এখুনি চলে যেতে ইচ্ছে করছে কেন ?

ভদ্রলোক বলে—আপনি কিন্তু আমাকে একেবারে আশ্চর্য করে দিয়েছেন।

চমকে ওঠে শীলা। আর চোখ তুলেই দেখতে পায় ; ঠিকই, ভদ্রলোক অদ্ভুতভাবে শীলার দিকে তাকিয়ে আছে।

শীলা—আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আপনি আলুগুলো ধুয়ে নিয়ে আসুন।

—আমাকে দিয়ে আর কাজটাজ করাবেন না। যা হচ্ছে ওতেই হবে। আলুটালু টানাটানি করবার দরকার নেই।

কৌটোর ভিতরে ফুটন্ত জলের মধ্যে দু'মুঠো চাল আর দু'মুঠো ভাত ছেড়ে দিয়েই শীলা বলে—আমি চলি। চাল-ডাল ফুটলেই নামিয়ে নেবেন।

—আপনি এখনি চলে যাবেন ?

—যা বলেছি, শুনতে পেয়েছেন নিশ্চয়।

—আপনি আর একটু থেকে যান না।

শীলার শান্ত চোখ দুটো হঠাৎ কেঁপে ওঠে—কেন ?

—আমি আমার ছবির জন্যে দু-চারটে কথা বলতে চাই।

—ছবির জন্যে ?

—হ্যাঁ।

—তার মানে ?

—তার মানে, আপনি যদি কিছুক্ষণ ঠিক এভাবেই এখানে চুপ করে বসতেন, তবে আমি ততক্ষণ...

—কী বললেন ?

—আমি একটা স্কেচ করে নিতে পারতাম।

শীলার বুকের ভিতর যেন দুঃসহ একটা ভয় এইবার ঢিপ ঢিপ করে বাজতে শুরু করে। লোকটা মানুষ নয় ; সেই ছায়া-ছায়া ভয়টাই যেন মানুষের ছদ্মবেশ ধরে আর একজোড়া ঘন-কালো ভুরু তুলে শীলার মুখের দিকে একটা পিপাসিত লোভের মত তাকিয়ে আছে। কী ভয়ানক ভুল ! একটা খেয়ালের দুঃসাহসে এই লোকটাকে একটা নির্দোষ বস্তু মাত্র মনে করে, এখানে থেকে গেছে শীলা। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত দেখা দিতে যে দশটা মিনিটও সময় লাগল না।

লোকটা কিন্তু একটুও লজ্জিত না হয়ে, শীলার চোখের তীব্র দৃষ্টিটাকে একটুও গ্রাহ্য না করে আবার একটা অদ্ভুত কথা বলে।

—বললে আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আজ যদি আমার হাতে এখন একটা ক্যামেরা থাকত. .

—সাবধানে কথা বলুন। ঠোঁটে দাঁত চেপে আর চোখের তারা থেকে যেন আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে কথা বলে শীলা।

লোকটা বলে—তা হলে আপনার ফটো তুলতে চাইতাম না ; ফটো তুলতে ইচ্ছেও করত না ; ফটো তুলতামও না।

নতুন রকমের একটা প্রলাপ। খুব চালাক প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এমন প্রলাপ বকে লোকটা কোন মতলবের জাল পাততে চাইছে ?

প্রলাপের দাবিটাকেই আবার কেমন কায়দা করে আর নতুন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলছে লোকটা।—আপনার চেহারাটাকে আঁকবার জন্যে আমার চোখের কিংবা আমার তুলির কোনও গরজ নেই। আপনার এই চেহারার মত...

লোকটার কুৎসিত দাবিটার ভাষাও কত কুৎসিত, কত অভদ্র ! যেন শীলার চেহারাটাকেই কুৎসিত বলে গালি দিয়ে লোকটা...

লোকটা বলে—আপনার এই সুন্দর চেহারাটাকে আমি আঁকতে চাইছি না। চাইছি আপনার মনের ছবিটাকে আঁকতে।

—কী বললেন ?

—আমার মনে হয়েছে, আপনার চেহারার এই নিখুঁত ছাঁদ যেন একটা নিখুঁত মনের ছাঁদ। চমৎকার একটি অকপট মন, আর একটু বেশি রকমের মায়াময় মন।

লোকটা যেন কথার কারিগর। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে নেই, কসাই যেমন ছুরি চালাবার আগে আদরের কথা বলে বধ্য প্রাণীটাকে ছলনা করে ভোলায়, লোকটাও ঠিক সেইরকমের আদুরে ভাষায় কথা বলছে।

—আমি আমার ছবি আঁকার গুরুর কাছ থেকে যে কথা শিখেছি আর নিজেও বিশ্বাস করেছি, সে কথাই বলছি। এসব আমার বানানো-কথা নয় ; আর, কোনও মতলব নিয়েও আমি এসব কথা বলছি না ; আপনি বিশ্বাস করুন।

বিশ্বাস করলেই বা কী ? লোকটার আশার দুঃসাহস দেখে আশ্চর্য হতে হয়। বিশ্বাস করলেই কি শীলা একেবারে একটা নির্লজ্জ পাগলামি হয়ে এই লোকটার চোখের সামনে তার এই শরীরটাকে একটা বস্তুপিণ্ডের মত রেখে দেবে, আর লোকটার চোখ ও তুলি খুশির মাতাল হয়ে সে শরীরের ছাঁদ এঁকে নেবে ?

কলকাতার রাস্তা হলে এই লোকটার এই আহ্লাদের দাবির জবাব ভালভাবে দিতে পারা যেত ; পা থেকে শ্লিপারটা খুলে নিয়ে...

লোকটা তাকিয়েও আছে অদ্ভুতভাবে। দু'চোখে যেন বুনো লোভের সাধ চিকচিক করছে। যেন একটা ব্যাধ বনের ভেতরে একটা একলা হরিণীকে দেখতে পেয়ে, তার আহ্লাদের সব হিংস্রতা নিয়ে আর শক্ত হয়ে পথ রুখে দাঁড়িয়েছে।

লোকটা বলে—আমার গুরু একটি অদ্ভুত কথা বলতেন ; মুখের সুন্দরতা যে মনেরও সুন্দরতার ছবি, এটা সব সময় সত্য নয়। বরং উল্টোটাই অনেক সময় সত্য হয়। মন আর চরিত্র কুৎসিত, অথচ মুখটা সুন্দর। আমার গুরু বলতেন, তিনি এইসব কপট সুন্দরতার মুখ মাত্র একবার দেখেই বুঝে ফেলতে পারেন। কিন্তু...।

লোকটা ফিলসফারের ভাষায় কথা বলছে। কথাগুলি তো শুনতে খারাপ নয়, শুনতে খারাপ লাগছেও না। কিন্তু বলবার দরকার কী ? একটা অচেনা-অজানা মেয়ের কাছে এত মুখর হয়ে এসব ফিলসফির কথা বলাও যে একটা মতলবের ব্যাপার।

লোকটা এইবার অদ্ভুতভাবে হেসে ফেলে, আর ফিলসফি ছেড়ে দিয়ে একেবারে অন্য রকমের কথা বলতে শুরু করে। —আপনার কাছে মন খুলে এত কথা বলবার সাহস পেতাম না, ইচ্ছেও হত না, যদি আপনি আজ হঠাৎ এখানে এভাবে এসে...

শীলা ভ্রূকুটি করে—কী ?

—যদি আপনি সাহস না দিতেন।

শীলা—আমি কোন দুঃখে আপনাকে সাহস দেব ? কী সাহস দিলাম ?

—এই যে, খিচুড়ি রাঁধলেন। এরকম একটা জায়গায়, যেখানে শুধু কতগুলো মাছরাঙা ছাড়া আর কোনও প্রাণী নেই, এরকম একটা নির্জনতার মধ্যেও আপনি এখানে রইলেন, আমাকে একটুও সন্দেহ করলেন না। আপনার মত এমন সুন্দর সাহস আর কোনও মেয়ের পক্ষে সম্ভব কিনা জানি না।

প্রশস্তির কবিতার মত ভাষায় কথা বলছে লোকটা। কিন্তু সত্যিই কি কথাগুলি নিতান্ত মিথ্যে কবিত্বের কথা ? লোকটা ভণ্ডামি করে কথা বলছে ? শীলার আজকের এই সাহসটাকে সুন্দর সাহস বলে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে এই লোকটা ; অথচ নীহার রেবা আর জয়া আজ শীলার এই সাহসটাকে যেন নীরবে ধিক্কার দিয়ে চলে গিয়েছে।

বোধহয় শীলার নীরব মুখ আর শান্ত চোখের দৃষ্টিটার মধ্যে একটা সান্ত্বনার ছায়া দেখতে পেয়েছে লোকটা। তা না হলে এইবার একেবারে নিজের জীবনের কথা নিয়ে মুখর হয়ে উঠবে কেন ?

—আমি জীবনে এই প্রথম বিশ্বাস করবার প্রমাণ পেলাম, মেয়ে মাত্রই হৃদয়হীন নয়।

—আপনি এসব কথা বলবেন না।

—বলতে দিন। আমি কাউকে অপমান করবার জন্য এ কথা বলছি না। আমার একটা ধারণাই হয়ে গিয়েছিল যে, সব মেয়েই বুঝি শক্ত মনের মানুষ। কিন্তু ধারণাটা যে ভুল, সেটা তো আপনিই প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন। আমার মত ভ্যাগাবণ্ডের জীবনে আপনি একটা অদ্ভুত ঘটনা। আমার ঘর-সংসার নেই ; কিন্তু এখানে এই জঙ্গলের এক কোণে পিকনিকের চাল-ডাল আপনি ছুঁয়ে দিয়ে যেন একটা ঘরের মায়ার ছবি তৈরি করে দিলেন। হোক না আধঘণ্টার ছবি, তবু তো ছবি। আর, আমিও ছবি পেয়েই ধন্য। ওর বেশি কিছু দরকার নেই।

শীলার মনের ভিতরে যেন একটা কাকচক্ষু জলের দহ টলমল করে উঠেছে। লোকটার মুখের দিকে তাকালে চোখ দুটোও কেমন যেন টলমল করে উঠতে চায়। এ কী অদ্ভুত অস্বস্তি ! লোকটার জন্য যে মায়া হয়। কেন ভ্যাগাবণ্ড হয়ে গেল লোকটার অদৃষ্ট ? লোকটার অদৃষ্টের দুঃখটাকে দু'চারটে সহানুভূতির কথা বলে দিয়ে চলে যেতে পারা যায়। আর বেশি শক্ত কথা না বললেও চলবে।

শীলা বলে—যাক, কী আর করবেন ! দুঃখ পেয়েছেন, দুঃখটা ভুলে থাকতে চেষ্টা করুন।

—ভুলেই তো আছি। আর আপনার একটি ছবি এঁকে নিতে পারলে, সে দুঃখটা বোধহয় চিরকালের মতই ভুলে যাব।

—আপনি আবার আজে-বাজে কথা বলতে শুরু করলেন। আমি চলি।

—কিন্তু...। লোকটা হঠাৎ কথা থামিয়ে আর, যেন বোবা হয়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। অদৃষ্টটা যেন চিরকালের মত হতাশ হয়ে গিয়েছে।

শীলা—আর কথা বাড়াবেন না।

—তা হলে সত্যিই আমার ছবি আঁকবার ইচ্ছেটা...

—না।

—কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করেছিলাম...

—কী ?

—বিশ্বাস করেছিলাম, আপনার ছবি আঁকব, আপনি আপত্তি করবেন না, আপনার সে সাহস আছে।

—সাহস ?

—হ্যাঁ, আমার ইচ্ছেটাকে একটু দয়া করবার সাহস।

—না, আমার ওরকম কোনও বাজে সাহস নেই। আর...

—বলুন।

—আপনারও আর সাহস করা উচিত নয়।

—কী বললেন ?

—আমার ছবিকে আপনার চিরকালের ছবি-টবি মনে করা উচিত নয়।

—কেন ?

—আমি যে অন্য কারও জীবনের...

—কী বললেন ?

—যাকগে ; আপনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমারই ভুল হয়েছে।

—ভুল ?

—আজ বাদে কাল একজনের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে, তার পক্ষে অন্য একজনের কাছ থেকে এসব কথা শুনতে পাওয়া একটা দুর্ভাগ্য।

লোকটা অদ্ভুতভাবে হাসে—তাই বলুন। কিন্তু এ কথা জেনে আমার কোনও লাভ হল না, ক্ষতিও হল না।

—কী বললেন ?

— আমি তো এমন পাগল নই যে, আপনাকে ভালবাসার কথা বলব। কিংবা আশা করব যে, আপনি আমাকে দয়া করে ভালবেসে ফেলবেন।

—আপনি খুবই অভদ্রভাবে কথা বলছেন।

—আচ্ছা চলে যান। বুঝলাম, আপনি আমাকে একটুও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে এগিয়ে যায় শীলা। কিন্তু চমকে উঠেই মুখ ফিরিয়ে তাকায়। লোকটা নিজের মনে, যেন একলা খুশির মাতালের মত হেসে উঠেছে।

—আমার অবশ্য আপনার ছবি আঁকতে একটুও অসুবিধা হবে না।

—কী বললেন ?

—আপনি চলে গেলেই বা কি আসে যায় ? সবই তো দেখেছি ; দু'চোখ ভরে দেখে নিয়েছি। আপনার ছবিটা তো মনের মধ্যে রয়েই গেল।

—আপনি একটা পাগল।

—মিছে কথা নয়। শুধু আপনার ওই খোঁপা আর খোঁপার ওই সাদা বুনো ফুল নয়, আপনাকেই আমি এঁকে নিতে পারব।

—আপনি একটা বুনো অসভ্যতা।

—মিথ্যে কথা নয়। আমার তুলি কোনও সভ্যতার, কোনও আবর্জনার, কোনও শাড়ি-সায়া জামা-টামার ধার ধারে না।

—এখানে পুলিস থাকলে আজ আপনাকে কোমরে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যেত।

—যেত বোধহয়। কিন্তু তাতে আমি ভয় পেতাম না।

কটমট করে তাকায় শীলা। —খুব কৃতজ্ঞতা দেখালেন! একটা মেয়েকে একলা পেয়ে অকারণে খুব অপমান করে নিলেন। আপনি মানুষ বটে!

লোকটার দু'চোখের ঘন-কালো ভুরু যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে। ছুটে এসে শীলার কাছে দাঁড়িয়ে আর মাথা হেঁট করে বলে—মাপ করুন। আপনাকে একটুও অপমান করতে চাইনি। আপনাকে...কী জানি কেন...হঠাৎ বড় বেশি ভাল লেগেছিল বলেই বোধহয়—কিংবা হঠাৎ আপনজন বলে মনে হয়ে গিয়েছিল বলেই বোধহয়, বড় বেশি দাবি করে ফেলেছিলাম।

যেন স্বপ্নে-পাওয়া একটা ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে লোকটা, কে জানে কোথাকার আর্টিস্ট! কিন্তু চোখ দুটোতে যে সত্যই একটা মুগ্ধতা থমথম করছে। শালবনের এক টুকরো নিরিবিলি, সামনে কাকচক্ষু জলের দহ, সাদা পাথরের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে কলকল স্বরের ঝর্না; এখানে লোকটাকেও একটা অপার্থিব আবির্ভাবের মায়া-চেহারা বলে মনে হয়। গাদা গাদা কথা বলে, কিন্তু যেন গুছিয়ে বলতে পারে না; চোখের এই মুগ্ধতাকে বুঝিয়ে দেবার নিয়মটা জানে না। অচেনা-অজানা মেয়ের সঙ্গে কথা বলবার রীতিও জানে না।

ভদ্রলোক কুণ্ঠিতভাবে বলে—আমি শিক্ষিত মানুষ নই; লেখাপড়া সামান্যই করেছি। তাই আপনাকে আর্ট বোঝাতে গিয়ে এমন অনেক কথা বলে ফেলেছি, যেগুলি মিথ্যে কথা যদিও নয়...

—বাজে কথা।

—জানি না; আমার গুরু বলতেন, বিবসনা শরীরের ছবিতেই মনের খাঁটি রূপ ফুটিয়ে তোলা যায়। আমারও মনে হয়েছে, আপনার এই চমৎকার শরীরের একটা খাঁটি ছবি, হুড়রুর ধারার চেয়ে অনেক সুন্দর একটা কান্তিধারার ছবি...

—চুপ করুন।

—আপনি বিশ্বাস করুন; আপনাকে একটুও অসম্মান করবার জন্যে নয়; সত্যি কথা বলতে গেলে, বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি...সত্যিই তো, কী চমৎকার একটা অবঞ্চনার ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়।

—কী বললেন?

—অবঞ্চনা। আপনার এই শরীরের ছাঁদটাই বলছে, আপনি আর যা-ই করুন, কারও ভালবাসাকে ঠকাতে পারেন না। সেই জন্যেই আপনাকে দেখে ছবি আঁকবার জন্য হাত নিসপিস করেছে, যদিও জানতাম, খুব অন্যায় করা হচ্ছে।

ঘন-কালো ভুরু দুটো যেন একটা আনমনা ধ্যানের আবেশে নিবিড় হয়ে যায়; ভদ্রলোক কি-যেন ভাবছেন।

শীলাও হঠাৎ হাঁপ ছেড়ে, যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভয় থেকে ছাড়া-পাওয়া নিঃশ্বাসের ভার মুক্ত করে দিয়ে কথা বলতে গিয়ে হাসতে চেষ্টা করে। —যাকগে, এসব কথা ছেড়ে দিয়ে, এখন খেয়ে নিন।

ভদ্রলোক—খাব বইকি। এই দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম একটা নতুন স্বাদের খাবার খাব।

—কী বললেন?

—হোটেলের রান্না কিংবা চাকরের রান্না, এই খেয়েই তো দুটো বছর পার হয়েছে। আজ একটি অদ্ভুত ভাল-মেয়ের হাতের রান্না খেয়ে...। বলতে বলতে ভদ্রলোক নিজেও অদ্ভুত ভাবে হাসতে থাকে। —দেশে ফিরে আসার পর এই দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম একজন মেয়ের হাতের রান্না...

শীলার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ যেন চমকে ওঠে। —দেশে ফিরে আসার পর?

—হ্যাঁ।

—দেশের বাইরে ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—যুদ্ধে। চন্দননগর ব্যাটেলিয়নের হাবিলদার হয়ে তিন বছর ফ্রান্সে ছিলাম।

শীলার চোখ দুটো কাঁপতে কাঁপতে মুমূর্ষু মানুষের চোখের মত নিভু-নিভু হয়ে আসতে থাকে।

ভদ্রলোক বলে—ভার্দুনের ব্যাট্‌ল্‌ শুরু হবার আগে একটা অ্যাকশনে হটে আসবার সময় জার্মানদের হাতে বন্দি হতে হয়েছিল।

দুই চোখ বন্ধ করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শীলা, যেন হৃৎপিণ্ডটাই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

ভদ্রলোক যেন নিজের মনের খুশিতে গড়গড় করে একটা ইতিহাসের বৃত্তান্ত আউড়ে চলেছে—জার্মানদের বন্দি ক্যাম্পে থাকবার সময়েই শুরু পেয়েছিলাম। একজন ফরাসি বন্দি সোলজার ; নাম মার্তিনিয়ে। খুব ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। ক্যাম্পের এক কোণে সেই মার্তিনিয়ের সঙ্গে বসে দিন-রাত ছবি আঁকতাম। সেই ফরাসি আর্টিস্টই একদিন বললেন, সুন্দর মুখের রূপেতে অনেক সময় বঞ্চনা থাকে, সুন্দর মুখের ছবি এঁকো না। শুধু সুন্দর দেহের রূপ আঁকতে শেখো, যদি আমার মত ঠকতে না চাও, অবনীশ।

শীলার মাথার উপর যেন অদৃশ্য এক জল্লাদের খড়্গ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখনই দু'টুকরো হয়ে যাবে শীলার শরীরটা।

অবনীশ! আর কেউ নয় ; সেই অবনীশ। এর চেয়ে ভাল ছিল, যদি সেই ভয়াল ছায়া-ছায়া জীবটা তার যত হিংস্রতার নখর তুলে শীলার চোখের সামনে এসে দাঁড়াত। এত ভয় পেত না শীলা। শীলার হৃৎপিণ্ডের ভিতর তা হলে এরকম ভয়ানক একটা আর্তনাদ ছুটোছুটি করত না।

আর্টিস্ট ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—একী ? আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি ?...ওকী, ওদিকে কেন ছুটে যাচ্ছেন ? ওদিকে যে ভয়ানক একটা খাদ আছে।

পিছু ফিরে তাকাবারও সাহস নেই শীলার। শীলার অন্তরাত্মা যেন মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছে। জঙ্গল হোক, ঝোপঝাপ হোক, পাথরের গুহা হোক, কিংবা গাছের কোটর হোক, কোথাও গিয়ে লুকিয়ে পড়তে চায় শীলা। অবনীশের ছায়া যদি চিতে বাঘের মত ধাওয়া করে ছুটেও আসে, তবু যেন শীলার নাগাল না পায়।

অবনীশও ডাক দিতে দিতে এগিয়ে যেতে থাকে—ওদিকে যাবেন না। ওদিকের নালাতে চোরাবালি আছে।...কিন্তু কী হল আপনার ? এভাবে পালাতে শুরু করলেন কেন ?

কিন্তু থামে না শীলা। যেন অবনীশ নামে একটা প্রতিহিংসা উতলা হয়ে শীলাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে আসছে। তুলি নয়, বোধহয় ছুরি হাতে নিয়েই অবনীশ আসছে। শীলার এই সুন্দর ছাঁদের চেহারাটার ছবি আঁকবার জন্য নয় ; এই চেহারাকে একেবারে নিরাবরণ করে রক্তমাংস লুট করে খাবার জন্য ছুটে আসছে একটা প্রতিশোধ। গুরুর কাছ থেকে এই মন্ত্র নিয়ে দেশে ফিরেছে অবনীশ। চার বছরের বঞ্চনা সহ্য করেছে অবনীশ, এতদিনের পর এমন একটা সুযোগ পেয়ে সে আজ প্রতিশোধ নিতে ছেড়ে দেবে কেন ?

অবনীশ হঠাৎ যেন একটা সন্দেহময় বিস্ময়ে পাগলের মত চেঁচিয়ে ওঠে—শীলা।

থমকে দাঁড়ায় শীলা। চকিতে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। অবনীশের চোখের দৃষ্টিটা এবার যেন মাতালের চোখের দৃষ্টির মত টলতে থাকে ; যেন একটা বুক-ফাটা বিস্ময় সহ্য করতে চেষ্টা করছে অবনীশ—তুমি শীলা ? সত্যিই তুমি শীলা ?

পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে অবনীশ, শীলা নেই।

কিন্তু কোথায় যাবে ? এই খাড়াই ধরে ওপরে উঠে গেছে ? না, আরও নীচে নেমে গিয়েছে ? কিংবা, কোথাও লুকিয়ে পড়েছে ?

এরই মধ্যে কোথায় লুকোবে, আর কত দূরেই বা চলে যেতে পারবে শীলা ?

অবনীশ এগিয়ে যায়।

হারানো সোনা খুঁজে খুঁজে হয়রান আর হতাশ হয়ে যাবার পর যদি কেউ হঠাৎ দেখতে পায় যে, সেই সোনা হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়েছে, তখন তার নিশ্চিন্ত তৃপ্তির হাসির সঙ্গে একটা লজ্জাও ফুটে ওঠে।

অবনীশের চোখে কিন্তু করুণ বিস্ময়, আর মুখে বেদনা। অবনীশের জীবনের প্রথম প্রীতির

পিপাসা, স্বপ্নের প্রথম আশা, সেই শীলা কি সত্যিই এতক্ষণ ধরে অবনীশের চোখের এত কাছে ছিল ? ছিল যদি, তবে পালিয়ে গেল কেন ? এত ভয় পেল কেন ?

ভাবতে একটু আশ্চর্যই লাগে ; অবনীশ আর শীলা, দুই জীবনের মধ্যে একটা চোখে-দেখার সম্পর্কও দেখা দিতে পারেনি ; কিন্তু মনে মনে যে একটা গিঁট পড়েছিল , শান্ত অঙ্গীকারের গিঁট । যুদ্ধের কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে অবনীশ দেশে ফিরে এলেই শীলার বিয়ে হয়ে যাবে ।

চন্দননগরে সামান্য একটা চায়ের দোকান করে সামান্য একটা একলা জীবনকে আশাহীন করে দিয়ে অবনীশের দিনগুলি একরকম কেটেই যাচ্ছিল । কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই, পরেশবাবু হঠাৎ এসে অবনীশের মনের সেই আশাহীন কুঠুরীটার ভেতর যেন একটা দীপ জ্বেলে দিলেন । —আমার এক ভাইঝি আছে, অবনীশ । এখন জামসেদপুরে ওর এক মামার কাছে আছে, ম্যাট্রিক পাশ করে বসে আছে । কিন্তু...একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে অবনীশ ।

—সমস্যা ?

—হ্যাঁ । শীলার, তার মানে আমার ওই ভাইঝির মামা মারা গেছেন । শীলার বিধবা মামি অগত্যা তার ছেলেপুলে নিয়ে তার এক ভাইয়ের কাছে চলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে । কিন্তু মামির ভাই তার টানাটুনির সংসারে শীলার মত একটা গলগ্রহ সহ্য করতে রাজি নয় । কে ই বা রাজি হয় বলো, অবনীশ ?

অবনীশ—হ্যাঁ, ভদ্রলোক না হয় নিজের বিধবা বোন আর ভাগে-ভাগ্নীর বোঝা ঘাড়ে নিলেন, কিন্তু বোনাইয়ের ভাগ্নিকেও ঘাড়ে বইতে রাজি হবেন কেন ? রাজি হলে অবশ্য ভাল ছিল !

পরেশবাবু—অগত্যা ।

অবনীশ—বুঝেছি, অগত্যা আপনারই ঘাড়ে তা আপনার তো রাজি হওয়া উচিত ; আপনি হলেন কাকা ।

পরেশবাবু—অসম্ভব অবনীশ । আমার নিজেরই ঘরের উনুনে কোনওদিন দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে কিনা সন্দেহ । আমি কি ওরকম একটা ধিঙ্গি মেয়ের জীবনের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিতে পারি ?

অবনীশ—নিলে ভাল ছিল ।

পরেশবাবু হঠাৎ বলে ওঠেন—তুমিই নাও না অবনীশ ?

অবনীশ—আমার মত মানুষের পক্ষে ওসব ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে না নেওয়াই উচিত ।

—কেন ?

—একটা মেয়েকে বিয়ে করে আনব কি তাকে শুধু কষ্ট দেবার জন্যে ? চায়ের দোকান করে যা রোজগার হয়, তাতে আমার নিজেরও যে দিন ভাল চলে না ।

—ভেবে দেখো অবনীশ । মেয়েটি দেখতেও ভাল ।

—কী বললেন ?

পরেশবাবু দু'চোখ কুঁচকে আর চোখের তারা দুটোকে তীব্র করে নিয়ে অবনীশের মুখটার দিকে তাকান ; যেন অবনীশের বুকের ভিতরে ছটফটিয়ে ওঠা একটা লোভী পিপাসাকে দেখছেন ।

মেয়েটি দেখতে ভাল , এই একটি কথার আবেদন যেন এরই মধ্যে ছেলেটার মনে রঙ ধরিয়ে দিয়েছে ; নিঃশ্বাসগুলিকে এলোমেলো করে দিয়েছে ।

উপায় নেই পরেশবাবুর । অবনীশকে রাজি করানোই পরেশবাবুর আজকের এই ব্যস্ততার আসল ইচ্ছা । কোনও মতে রাজি করাতেই হবে, তা ছাড়া যে আর কোনও উপায়ই নেই পরেশবাবু জানেন, শীলা আর ক'দিন পরে পরেশবাবুরই এই ভয়ানক অভাবের জীবনের উপর দুর্ভর একটা বোঝা হয়ে বসবার জন্য জামসেদপুর থেকে চলে আসবে । চিঠি দিয়েছে শীলা । এ মেয়ের খাওয়া-পরা যোগাবেন কেমন করে পরেশবাবু ? তা ছাড়া, এ মেয়ের বিয়ে ? ওরকম একটা ধিঙ্গি কালো মেয়েকে বিয়ে করবেই বা কে ? টাকা খরচ করলে হয়ত সাধারণ একটা কেরানি ছেলের কাছে গছিয়ে দিতে পারা যেত । কিন্তু টাকা কই ? দপ্তরির কাজ করে পরেশবাবুর যে মাসে দশ টাকাও হয় না । শীলার খুড়ি অনেকদিন আগেই মরে বেঁচেছে ; আর পরেশবাবুকেও অনেকটা বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়েছে ; একটাও ছেলে-পুলে রেখে যায়নি শীলার খুড়ি ।

অবনীশকে রাজি করাতেই হবে। কোনও মতে বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে। তারপর বুঝবে ওরা আর ওদের ভাগ্য। সুতরাং যদি সামান্য একটা মিথ্যে কথাকে একটু সুন্দর করে বলে দিয়ে, শীলার মত কুরূপা মেয়েকে বেশ সুরূপা বলে ব্যাখ্যা করে যদি অবনীশের মনে একটা লোভের হাওয়া বইয়ে দিতে পারা যায় ; তবে...তা ছাড়া যে কোনও উপায়ও নেই।

পরেশবাবু বলেন—মেয়েটি যেমন স্বাস্থ্যবতী, তেমনি সুন্দর গড়ন, আর মুখটিও তেমনি, চমৎকার একটি ঢলঢলে মুখ।

অবনীশ—কিন্তু আমার যে সাহস হয় না পরেশকাকা !

—কেন ?

—এ মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন কেন ? আমার সঙ্গে যে একটুও মানাবে না।

—কেন ? তুমি তো দেখতে একটুও খারাপ নও।

—সে কথা নয় কাকাবাবু। আপনার ভাইঝিকে খুশি হয়ে বিয়ে করতে আমার চেয়ে শতগুণ ভাল অবস্থার ছেলেও যে রাজি হয়ে যাবে।

—হতে পারে। কিন্তু আমি যে তাতে রাজি নই।

—কেন ?

—আমার যে তোমাকেই পছন্দ। তোমার জন্য আমার মনে, কে জানে কেন, কেমন একটা মায়া আছে অবনীশ।

—তা হলে...

—আর অত ভেব না অবনীশ। রাজি হয়ে যাও।

—আমি রাজি আছি পরেশকাকা। কিন্তু...

—আবার কিন্তু কেন ?

—আগে আমি একটা চাকরি-টাকরি ধরি।

—তা হলেই হয়েছে। চাকরির আশায় বসে থাক।

—না কাকাবাবু, আশা আছে, কিন্তু বসে থাকতে হবে না।

—কী চাকরি ?

—যুদ্ধের চাকরি।

—অ্যাঁ ?

—চাকরির চিঠি পেয়েছি, কিন্তু ভাবছিলাম, নেব কি না। এখন তো দেখছি...

—যুদ্ধের চাকরি মানে তো বিদেশে যেতে হবে।

—হবে নিশ্চয়।

—তা হলে তো সেই অবস্থাই দাঁড়াল। তুমি বিদেশে গিয়ে বন্দুক চালাবে, আর মেয়েটা ততদিন আমারই ঘাড়ে বোঝা হয়ে...

—না না, আমার স্ত্রী আপনার ঘাড়ের বোঝা হবে কেন ? আমি টাকা পাঠাব। যতদিন না দেশে ফিরে আসি ততদিন...

—হ্যাঁ, ততদিন একেবারে নিয়ম করে টাকা পাঠাবে তো অবনীশ ?

—নিশ্চয়।

—বিয়েটা তবে...এটা হল ভাদ্র। কাজেই এ কটা মাস বাদ দাও। অঘ্রাণে তো হতে পারে।

—হ্যাঁ।

ঠিকই, চাকরিটা পেতে অসুবিধা হয়নি অবনীশের। আগেই খবর পেয়েছিল অবনীশ ; এ যুদ্ধে বাঙালিকেও সোলজার করে নিতে চাইছে গভর্নমেন্ট। প্রথম বাঙালি রেজিমেন্ট যেদিন মেসোপটেমিয়া রওনা হয়ে গেল, সেদিন স্টেশনে গিয়ে বাঙালি সোলজারের সেই ট্রেনও দেখে এসেছিল অবনীশ। চন্দননগর থেকেও একটা বাঙালি ব্যাটালিয়ন ফ্রান্সে পাঠাবার আয়োজন চলছে। রিক্রুটিং শুরু হয়েছে। দরখাস্ত করেছিল অবনীশ। আর চিঠি পেতেও দেরি হয়নি, এখনি ভর্তি হও।

কিন্তু হাবিলদার হয়ে ব্যাটালিয়নে ভর্তি হয়েই চন্দননগর ছাড়তে হল। পণ্ডিচেরিতে গিয়ে ছ'মাসের ট্রেনিং ; তারপরেই ফ্রান্সের ডাক। ব্যান্ড বাজিয়ে জাহাজটা যখন ছাড়ছে, তখন অবনীশের মুখে বিষাদের ছায়া নয়, বরং একটা তৃপ্তির সুখ যেন ঝলমল করে ওঠে।

বিয়ে হয়নি ; বিয়ে হতে পারল না ; বিয়ের সুযোগই হয়নি। ছুটি পায়নি, ছুটি পাওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু পরেশবাবুকে চিঠি দিয়েছে অবনীশ ; আর প্রতিশ্রুতিও রেখেছে। ফ্রান্সে রওনা হবার আগের মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে ত্রিশটি টাকা পরেশবাবুর নামে পাঠিয়েছে অবনীশ। পণ্ডিচেরিতে থাকতেই পরেশবাবুর চিঠি পেয়েছে অবনীশ, শীলা এসেছে। জামসেদপুর থেকে চন্দননগরে এসে এখন পরেশবাবুর কাছেই আছে শীলা। আর, বেশ মন দিয়ে লেখাপড়া করছে ; আই-এ পরীক্ষা দিতে চায় শীলা।

অবনীশও একটি চিঠিতে পরেশবাবুকে তার খুশি মনের ব্যাকুলতার কথাগুলিকেও স্পষ্ট করে লিখে দিতে পেরেছে, দেখবেন, শীলা যেন কোনও কষ্ট না পায় পরেশকাকা। পড়ার খরচের জন্য যদি আরও টাকা দরকার হয়, তবে আপনি ধার-টার করে চালিয়ে দেবেন। আমি আশা করছি, ফ্রান্সে পৌঁছে প্রতি মাসে অন্তত একশো টাকা পাঠাতে পারব।

ফ্ল্যান্ডার্সের সেনাবারিক, কিংবা ফ্রন্ট লাইনের ট্রেঞ্চ, কিংবা জার্মানির বন্দি-শিবির—যেভাবে আর যেমন করেই দিনগুলি কেটে যাক না, অবনীশ যেন জাগা চোখেও স্বপ্ন দেখেছে, একটি ঢলঢলে সুন্দর মুখের ছবি যেন দিগন্তের বুকে এক নিরালায় অবনীশের অপেক্ষায় জেগে বসে আছে। জার্মানদের হাতে বন্দি হবার আগের মাস পর্যন্ত, তিন বছর ধরে প্রতি মাসে চন্দননগরের একটা ক্ষুদ্র সংসারের কাছে টাকা পাঠিয়েছে অবনীশ। তার মানে টাকা এসেছে ; ফর্ম সই করে কম্যান্ড অফিসে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল অবনীশ ; তার প্রাপ্য সব টাকা যেন চন্দননগরের পরেশবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে চিঠিও দিয়েছে অবনীশ—আশা করি আপনি ভাল আছেন, আর শীলার কোনও কষ্ট হচ্ছে না নিশ্চয়।

এ যুদ্ধ থামবে কবে ? মনটা মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এ বন্দি-শিবির থেকে ছাড়া পাব কবে ? প্রাণটা মাঝে মাঝে ছটফটিয়ে উঠেছে। দেশে ফিরে যাবার পর আর দেরি করবার দরকার হবে না। চন্দননগরের একটি ঘরের নিভৃতে একটা শুভ উৎসবের প্রাণ এখনও আরও কিছুদিন অপেক্ষার দুঃখ সহ্য করবে ; অবনীশ দেশে ফিরে গেলেই সেই উৎসবের প্রাণ শাঁখ বাজিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে ; সুন্দর একটি ঢলঢলে মুখকে নিজেরই বুকের কাছে দেখতে পাবে অবনীশ।

দেশে ফিরে এসে কিন্তু সেই সুন্দর ঢলঢলে মুখটিব কোনও খোঁজ পায়নি অবনীশ। পরেশবাবু মারা গিয়েছেন। আর, তাঁর ভাইঝি কলকাতায় চলে গিয়েছে।

বন্দি-শিবিরের ছ'টা মাসের জীবনটা প্রচণ্ড এক অবরোধ আর নির্বাসনের বেড়ার আড়ালে পড়েছিল। ঠিকই, চিঠি দিতে পারেনি অবনীশ, কোনও চিঠিও পায়নি অবনীশ। কল্পনাও করতে পারেনি যে, চন্দননগরের সেই ঘরের বুকটা খালি হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয় চিঠি লিখেছিল শীলা ; আমি যে আজ একলা হয়ে গেলাম ; কোথায় তুমি ? কবে আসবে ? জানিয়ে দাও, এখন কোথায় যাব আমি। সে চিঠি বোধহয় বারুদের ধোঁয়ায় হারিয়ে গিয়েছিল, কিংবা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। পরেশবাবুর তালাবন্ধ ছোট্ট মাটির ঘরটার দিকে তাকিয়ে এই কথাই ভেবেছিল অবনীশ।

কিন্তু কোথায় গেল শীলা ? কলকাতার পথে পথে ঘুরে কত সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়েছে অবনীশ। ঢলঢলে সুন্দর মুখ খুব কমই চোখে পড়েছে। খোঁজ করে তাদের পরিচয়ও জেনেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ শীলা নয়। তারা হল যত শিপ্রা হিমানী অপর্ণা আর মাধুরী। উকিলের মেয়ে, ডাক্তারের মেয়ে, প্রফেসরের ভাগ্নি আর থিয়েটারের অভিনেত্রী।

খবরেব কাগজে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়েছিল অবনীশ—তুমি কোথায় আছ জানি না। আমি ফ্রান্স থেকে ফিরেছি। খোঁজ দাও।

বিজ্ঞাপনে শীলার নামটা দিতে গিয়েও কি-যেন ভেবেছিল অবনীশ। সারা মুখে একটা যন্ত্রণার জ্বালাও যেন ফুটে উঠেছিল। ভাবতেও যে বুকটা চমকে ওঠে। তবু নামটা না দেওয়াই ভাল। হতেও পারে, শীলা আজ এক ভদ্রলোকের ঘরের আনন্দ হয়ে, স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা

বলছে আর হাসছে। শীলাকে নাম ধরে ডাকা উচিত নয়। বিজ্ঞাপন পড়ে শীলার স্বামী বেচারা হয়ত সন্দেহ করে চমকে উঠবে, আর শীলার অবস্থাটাও বিপদে পড়বে।

যুদ্ধ থেমে যাবার পর মোট তিনটে বছর পার হয়েছে। পল্টনের চাকরিও আর নেই ; সেই পল্টনও ভেঙে গেছে। চাকরিহীন জীবনটা একেবারে নিরর্থক হয়ে গিয়ে আর উপোস করে এই তিন বছরের মধ্যেই বোধহয় শেষ হয়ে যেত, যদি সাহেবের বাগানের মালীর কাজটা না পাওয়া যেত।

শীলার খোঁজ পাওয়া গেল না। আর পাওয়া যাবেও না। হয় শীলা মরে গেছে, নয় কারও ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু শীলা যে মরে যায়নি, হঠাৎ এ খবরটা একদিন জানতে পারে অবনীশ। শীলার মামির ভাই, জামসেদপুরের জিতেনবাবু জানিয়েছেন ; তিন মাস আগেও কলকাতার রাস্তায় শীলার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। শীলা কলকাতারই একটা মেয়ে-স্কুলের টিচার। কিন্তু কোন স্কুল, কেমন স্কুল, আর কোথায় যে সেই স্কুল, সেসব কিছুই জানেন না জিতেনবাবু।

কিন্তু জানতে কি আর কিছু বাকি রইল ? অবনীশের বিজ্ঞাপনের ব্যাকুলতার কাছে ধরা দিতে চায় না শীলা। শীলার কাছে অবনীশ আজ নিতান্ত একটা মিথ্যা।

কিন্তু ঢলঢলে সুন্দর মুখটা যে একটা নির্মম বঞ্চনা। মানুষের আশাকে এত অপমান করতে পারে, এত ঠকাতে পারে যে, তাকে সেই ভীরু গরিব পরেশ দপ্তরির ভাইঝি বলেও বিশ্বাস করতে পারা যায় না। সেই আধ-পাগলা ফরাসি সোলজার, সেই আর্টিস্ট মার্তিনিয়ে বলেছিল—সুন্দর মুখকে বিশ্বাস করো না অবনীশ। সুন্দর মুখ মানেই বঞ্চনা। ভালবাসতে যদি চাও, তবে সুন্দর শরীরকে ভালবাসবে। তবে ঠকতে হবে না।

তখন হেসে ফেলেছিল অবনীশ। আধ-পাগলা মার্তিনিয়ের কথাগুলিকে পুরো পাগলের কথা বলে মনে হয়েছিল। মনে হবেই বা না কেন ? অবনীশের বুকের ভিতরে তখন যে সুন্দর একটি মুখের ছবিই ঢলঢল করছে।

পঞ্চাশ টাকা মাইনে. শৌখিন সাহেবের গার্ডেনার অবনীশ ফুল ফোটাতে জানে, ফুল ফোটাতে ভালবাসে। কিন্তু অবনীশের ভালবাসার চোখ দুটোও বদলে গিয়েছে। ফুলগুলি সুন্দর মুখ নয়, সুন্দর শরীর। ছবি আঁকতে হাতের তুলি ব্যাকুল হয়ে শুধু শরীরের ছবি আঁকে ; সুন্দর শরীরের ছবি। শৌখিন সাহেবও হেসে হেসে ধমক দিয়েছেন—তুমি একটু বেশি অশ্লীল ছবি আঁকছ গার্ডেনার। এ ছবি আমাদের ক্লাবের কোনও মেম্বার কিনতে রাজি হবেন না।

অবনীশ বলে—আমি কিন্তু বিক্রি করবার জন্যে ছবি আঁকি না স্যার।

—তবে ? কিসের জন্যে ?

—এটা স্যার আমার একটা সান্ত্বনা। শুধু এঁকেই খুশি হই।

সাহেব হাসেন—তুমি হয় লুনাটিক, নয় লাভার।

অবনীশ—আই অ্যাম বোথ, স্যার !

কিন্তু যে মেয়ে এরকম দুটো আতঙ্কের চোখ তুলে একবার তাকিয়ে নিয়েই ছুটে পালিয়ে গেল, সে মেয়ে কোনও শীলা হলেও সেই শীলা হবে কেমন করে ? ওই মুখ তো সুন্দর ঢলঢলে মুখ নয়।

তার চেয়ে বেশি আশ্চর্যের কথা ; ওই মেয়েকে হঠাৎ শীলা বলে চেঁচিয়ে ডাক দিল কেন অবনীশ ? কী দেখে ? কী মনে করে ? কী সন্দেহ করে ? কোন প্রমাণ পেয়ে ? ডাকটা যে বুকের ভিতর থেকে একটা মূর্খ ব্যাকুলতার মত আপনি উথলে উঠেছে ?

কিন্তু কোথায় গেল ওই মেয়ে ?

অনেক দূর চলে এসেছে শীলা। হাঁপ ছেড়ে একটু জিরিয়ে নেয়। এখানে দাঁড়িয়ে ওদিকে তাকালে শুধু একটা-দুটো মাছরাঙাকে উড়তে দেখা যায় ; আর কিছুই দেখা যায় না।

কিন্তু ভুল করে একটা অন্য পথে চলে এসেছে শীলা। এটা একটা খাড়াই পথ। নীহার জয়া আর রেবা যেখানে আছে, সেই কালো পাথর, শিশুগাছের ছায়া আর কসমসের ঝোপগুলিকে এদিকে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে না।

ছায়া-ছায়া যে ভয়টা পিছু পিছু তাড়া করে আসছিল, সে কি থেমেছে ? সে কি সত্যিই কিছু বুঝতে পেরেছে ? বুঝতে পারলে সে আর থেমে থাকবে না। তুলি হাতে নিয়ে নয়, সেই কাঠি-কাটা বড় ছুরিটাকে হাতে নিয়েই ছুটে এসে শীলার কাছে কৈফিয়ত চাইবে।

কী কৈফিয়ত দেবে শীলা ? কী বলেই বা এই প্রতিহিংসাকে বোঝাবে ? বোঝাতে না পারলে সে আজ শীলাকে ক্ষমা করবেই বা কেন ?

কাকার সঙ্গে একদিন ঝগড়া করেছিল শীলা—তুমি ভদ্রলোককে মিথ্যে কথা কেন বললে কাকা ?

পরেশবাবু—মিথ্যে কথা না বললে অবনীশ তোকে বিয়ে করতে রাজিই হত না।

শীলা—কিন্তু এর পর কী হতে পারে ভেবে দেখেছ ?

—কী হতে পারে ?

—দেশে ফিরে এসে যখন দেখবে ভদ্রলোক, আমার চেহারাটা এত কুৎসিত, তখন কি সে আর আমাকে বিয়ে করবে ? আর তুমিই বা তাকে কী বলে বোঝাবে ? তোমাকে যে একটা ঠগ জোচ্চোর বলে গাল দেবে।

পরেশকাকা হাসেন—শুধু আমাকে কেন, তোকেও কি কিছু বলতে ছেড়ে দেবে অবনীশ ?

কেঁদে ফেলে শীলা—তবে এ কাণ্ড করলে কেন ?

পরেশবাবু—এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না শীলা। তোকে তো বাঁচাতে হবে।

শীলা—বেঁচে তো আছি ঠিকই ! ভদ্রলোকের টাকায় বেঁচে আছি। কিন্তু...

পরেশবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন—এর পর আর কিন্তু-টিন্তু করবার কোনও মানে হয় না। অবনীশ দেশে ফিরে এসে যদি তোকে বিয়ে করতে রাজি না হয়, তবেই বা ভয় কিসের ? তুই একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে নিবি। আর আমিও তার মধ্যে এক ফাঁকে পটল তুলে ফেলব। অবনীশের রাগ কারও কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।

হঠাৎ চুপ করে আর মুখটাকে একেবারে করুণ করে নিয়ে কাকা আরও একটা কথা বলেছিলেন—খুবই ভাল হয়, যদি অবনীশ দেশে ফিরে এসে তোকে খুশি হয়ে, না হয় অন্তত দয়া করে, বিয়ে করে। কে জানে, ভগবান কী ঘটাবেন !

অবনীশের দয়া মায়া আর আশার প্রতিনিধি হয়ে প্রতি মাসে টাকা আসছে। দিন চলে যাচ্ছে। এক একটি স্বাচ্ছন্দ্যের দিন। কিন্তু শীলার প্রাণটা যেন একটা আতঙ্কের ছায়া দেখছে। প্রচণ্ড এক কৈফিয়তের দিকে শীলার জীবনের মুহূর্তগুলি যেন এগিয়ে চলেছে। সে একদিন আসবে, আর এসেই দেখবে যে, এই শীলা তার কল্পনার সেই ঢলঢলে সুন্দর মুখের শীলা নয়। সে তখন শীলার কাছ থেকে ফুলের মালা দাবি করবে না, দাবি করবে টাকা। অবনীশ নামে একটা নিদারুণ হতাশা গর্জন করে উঠবে—আমাকে ঠকালে কেন তুমি ? তুমি যে এত কুৎসিত, সেকথা পরেশবাবু মিথ্যা-কথা বলে চাপা দিলেও তুমি চাপা দিলে কেন ? তুমি তো একটি চিঠিতে শুধু একটি কথায় আমাকে জানিয়ে দিতে পারতে যে, তুমি কুৎসিত। না, পরেশবাবুর ভাইঝিকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। আমি সুদ সমেত প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব।

ভাগ্যটাকে এই পরিণামের জন্য তৈরি করে রাখবার মত শক্তি পেতে চায় শীলা। যেন সেই কৈফিয়তের দিনে একটুও বিচলিত না হয়ে বলতে পারে শীলা, নাও প্রতিশোধ।

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে সুন্দর একটি মিষ্টি-হাসির মূর্তি এসে যেন শীলার সেই আতঙ্ক, সেই অপমানের ভয়, আর কুরূপ হওয়ার এই ভীরুতার গ্লানি সব ধুয়ে-মুছে দিয়ে শীলার বিষণ্ণ প্রাণটাকেই নতুন আশ্বাসের বাতাস দিয়ে হাসিয়ে দিল।

আজও ভুলতে পারা যায় না, প্রথম দিনের সেই বিস্ময়, নিতান্ত এক আকস্মিকের উপহারের মত যে বিস্ময় শীলার চোখের কাছে একটা মুক্তির ছবি তুলে ধরেছিল।

দরজার বাইরে কাকার সঙ্গে কে-যেন কথা বলছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিল শীলা ; চমৎকার একটি মিষ্টি-হাসির চেহারা, মুখটা যেন অদ্ভুত রকমের করুণ, কাকার সঙ্গে কথা বলছে।

কাকা ঘরের ভিতরে এসে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন—পোড়াকপাল আর কাকে বলে !

—কী হল ?

—তা না হলে আমার মত মানুষের কাছেও টাকা ধার করতে কি কেউ আসতে পারে ?

—ভদ্রলোক টাকা ধার চাইছেন ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—কলেজের মাইনে দিতে হবে, তা না হলে লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হবে।

—কী পড়েন ভদ্রলোক ?

—বললে তো এম-এ পড়ে ; কলকাতায় একটা মেসে থাকে।

—তোমার কাছে এলেন কেন ?

—ঠিক আমার কাছে আসেনি ; এসেছিল ওই...ও বাড়িতে, ওর মামা জগৎবাবুর কাছে। কিন্তু মামা টাকা দেননি।

—কিন্তু তোমার কাছে কেন ?

—জগৎবাবু বলেছেন, আমি নাকি হঠাৎ গুপ্তধন পেয়েছি। সুতরাং, আমার কাছে এসে টাকা চাইতে পরামর্শ দিয়েছেন জগৎবাবু।

—ছিঃ !

—যাই হোক। ছেলেটি বলছে, গোটা তিরিশ টাকা যদি...

—না না ; তুমি বাজে লোকের কথায় কান দিও না কাকা।

—ঠিক কথা। কিন্তু কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

—বলে দাও, টাকা দিতে পারব না।

—তুই বলে দে শীলা। স্পষ্ট করে বলে দে। আমি ভিতু মানুষ, আমার পক্ষে এখন আর...

দরজার কাছে এগিয়ে যেয়ে শীলা বলে—আপনি টাকা চেয়েছেন ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু...হঠাৎ নীরব হয়ে যায় শীলা। কে যেন শীলার মুখের উপর হাত চেপে দিয়ে বলছে, ছিঃ, এত নিষ্ঠুর ভাবে কথা বলতে নেই। অভাবের মানুষের আশার সঙ্গে এত কঠোর আচরণ অন্তত তোমাকে মানায় না।

শীলা বলে—খুব দরকার ?

—হ্যাঁ।

ফিরে এসে বাক্স খুলে তিরিশটা টাকা কাকার হাতে তুলে দিয়ে শীলা বলে—দিয়ে দাও।

একটা মাসও পার হয়নি, চন্দননগরের স্টেশনেই সেই মিষ্টি-হাসির মানুষটির সঙ্গে হঠাৎ আবার দেখা হয়েছিল শীলার। শীলাকে দেখতে পেয়েই সে-মূর্তির চোখ দুটো যেন হঠাৎ বিস্ময়ে নিবিড় হয়ে গিয়েছিল

স্টেশনের সেই ভিড়ের মধ্যেই শীলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কত স্পষ্ট স্বরে, একটুও কুণ্ঠা না রেখে, শীলাকে যেন বন্দনা করে বলে গেল সেই মিষ্টি চেহারার মানুষটা।—তোমাকে ভুলে থাকতে পারছি না। কোনওদিন ভুলে যেতে পারব না। তোমার প্রাণটা কত সুন্দর সেটা তো সেদিনই দেখেছি। তারপর বুঝেছি, তার চেয়ে বেশি সুন্দর তুমি।

শীলার মত একটা বাজে চেহারার মেয়েকে একটা সুস্বপ্নের ছবির মত সুন্দর বলে মনে করেছে অমন একটি মিষ্টি-হাসির অব সুন্দর চেহারার মানুষ ? ভদ্রলোক সত্যিই কি ইচ্ছে করে কতগুলো মিথ্যে কথার তামাশা দেখিয়ে গেল ? জগৎবাবুর ভাগ্নে কি একটা মিথ্যে স্তাবকতার প্রাণ ? ওর চোখ দুটো কি দুটো কপটতার চোখ ? বিশ্বাস করতে পারে না শীলা। বিশ্বাস করতে ভাল লাগে না।

কিন্তু কলকাতা থেকে দিনের পর দিন এতগুলি যে চিঠি এল, সেগুলি শীলার কানের কাছে কী কথা বলেছিল ?

সব কথার মধ্যে এই সত্যই ফুটে উঠেছে ; শীলার জীবনের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে বসে আছে একটা দাবি। ভালবাসার দাবি। শীলার কথা জীবনে ভুলতে পারবে না একটা

কৃতজ্ঞতা। এম-এ পাশ করে একটা কাজ ধরতে পারলেই শীলাকে আর চন্দননগরের ওবাড়িতে পড়ে থাকতে দেবে না একটা উৎসব। শীলার মত মেয়ে স্ত্রী হবে যার, সে স্বামী যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী স্বামী হবে! জগৎবাবুর ভাগ্নে পরেশবাবুর ভাইঝির কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, বিনিময়ে নিজের অদৃষ্টটাকেই উপহার দিয়ে ফেলেছে।

এক-মাস দু'মাস নয়, প্রতিমাসেই কলকাতার মেসের ঠিকানায় টাকা পাঠিয়ে শীলা যেন তার সৌভাগ্যের এই সুন্দর ছবিটারই সব ক্ষুধা-তৃষ্ণার দাবিকে সাহায্য করেছে। বছরের পর বছর পার হয়েছে। কাকাও জগৎবাবুর কাছে শুনেছেন, তাঁর ভাগ্নে এম-এ পাস করেছে। কিন্তু এখনও কোনও ভাল কাজ জোগাড় করতে পারেনি।

কাকা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, জগৎবাবুর ভাগ্নের কাছে শীলা কেন টাকা পাঠায়। প্রতিবাদ করেন না কাকা। শুধু একদিন যেন আতঙ্কিতের মত দুটো ম্লান চোখের দৃষ্টি তুলে বললেন—আমার কেন যেন বেশ ভয়-ভয় করছে শীলা।

কাকার মনের ভয় ভেঙেছিল কিনা কে জানে। কাকা তো পৃথিবীর সব ভয়ের ওপারে চলে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু শীলার প্রাণটা যে ভয়ের ছায়া দেখে চমকে ওঠে। আর কতদিন। কবে একটা চাকরি পাবে জগৎবাবুর ভাগ্নে; আর শীলার জীবনটা ভয়ের ছায়ার গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে নিরাপদ হয়ে যাবে।

কাকা মরে যাবার ঠিক দুটো মাস আগে যুদ্ধ-অফিস থেকে শীলার নামে কোনও মনি-অর্ডার আসেনি। আশ্চর্য হয়েছিল শীলা; কিন্তু আরও আশ্চর্য, শীলার বুকের ভিতর থেকে যেন একটা বদ্ধ দীর্ঘশ্বাসেব ভীরু বাতাস মুক্ত হয়ে গিয়ে শীলার সব আতঙ্কের জঞ্জাল উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

যুদ্ধ-অফিস থেকে আর কোনও চিঠিও আসে না। না আসুক, বুঝতে অসুবিধে নেই, অবনীশ আর টাকা পাঠাবে না। অবনীশই বোধহয় নেই। মানুষটা বোধহয় ফ্রান্সের বারুদের ধোঁয়ার মধ্যেই মিলিয়ে গিয়েছে।

ঘটনাকে বুঝতে গিয়ে বুকের সব নিঃশ্বাসকে যেন পাথর করে নিয়ে ভাবতে হয়েছিল। চোখ ফেটে দরদর্ করে একটা যন্ত্রণাক্লিষ্ট অপরাধের কান্নার জলও ঝরে পড়েছিল। কিন্তু উপায় নেই। অবনীশ বেঁচে থাকলেও যে সে আজ শীলার জীবনের আশা নয়। অবনীশ শীলাকে বিয়ে করতে চাইলেও যে শীলা রাজি হতে পারবে না।

কলকাতার মেয়ে-স্কুলের চাকরিটাও যেন শীলার ভাগ্যের এই সন্ধিক্ষণে বন্ধুর মতো হাত এগিয়ে দিয়ে ডাক দিল। না, আর ভয় নেই। অবনীশের প্রেতচ্ছায়াও প্রতিশোধ নেবার জন্য শীলাকে খুঁজে পাবে না। চন্দননগর থেকে কলকাতার মেয়ে-স্কুলের হোস্টেলে এসে ঠাঁই নিয়ে যেদিন হাঁপ ছাড়ে শীলা, সেদিনই দেখা করতে এসেছিল সে, যে আজ শীলার অদৃষ্টের সৌভাগ্য, শীলার আশার প্রতিশ্রুতি; শীলার ভালবাসা।

স্কুলের মেয়ে-পড়ানো একটা চাকরির কতই বা মাইনে; কিন্তু প্রতি মাসে সে মাইনের চার ভাগের তিন ভাগ এখনও মেসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হয়। তা না হলে শীলারই ভালবাসার মানুষ যে কষ্ট পাবে। এখনও যে সে কোনও চাকরি জোগাড় কবতে পারেনি। সকাল-বিকেল চা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে শীলা; সেজন্য ভুলেও শীলার মনে কোনও মুহূর্তে একটা আক্ষেপও বাজে না। সে মানুষ যেন চা-খাবার খেতে পায়। প্রতি মাসে আরও পাঁচ টাকা পাঠাতে হবে, সে মানুষ যেন হেঁটে-হেঁটে হয়রান না হয়; ট্রামে-বাসে যাওয়া-আসা করতে পারে।

হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট করুণা মাসিমা জানেন, কার কাছে টাকা পাঠায় শীলা। কেন পাঠায়?

মাঝে মাঝে আক্ষেপ করেন করুণা মাসিমা—ভালয় ভালয় ছেলেটির এখন একটি ভাল চাকরি হয়ে যায়, তবেই ভাল। তোমার অবস্থা দেখতে আমার একটুও ভাল লাগছে না শীলা।

শীলা চুপ করে হাসে। করুণা মাসিমা বলেন—আমি বলি বিয়েটা হয়েই যাক না শীলা। চাকরি-টাকরি তো একদিন হবেই।

শীলা—শুধু আমার ইচ্ছেতেই তো হবে না মাসিমা। তার ইচ্ছে, আগে চাকরি হোক, তারপর

বিয়ে।

করুণা মাসিমা—সেটা মন্দ ইচ্ছে নয়। তবে...কথাটা কী জান ? বেশি দেরি ভাল দেখায় না।

যে বছর রেবা, নীহার আর জয়া—তিন নতুন টিচার এসে হোস্টেলে ঠাঁই নিল, সে বছরে শীলা কিন্তু মাত্র দু'বার সেই মিষ্টি-হাসির মানুষটাকে চোখে দেখেছে আর কথা বলেছে। পুজোর ছুটির প্রথম দিনে একবার, আর গুডফ্রাইডের ছুটির দিনে একটিবার। নীহার, রেবা আর জয়া করুণা মাসিমার ধমক খেয়েও চুপ করে বসে থাকতে পারেনি ; ভিজিটার্স রুমের দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে শীলাদির জীবনের বাঞ্ছিত সেই চমৎকার হাসির মানুষটিকে দেখেছে। সত্যি চমৎকার চেহারা।

কিন্তু...যেমন করুণা মাসিমা, তেমনিই নীহার, রেবা আর জয়াও আশ্চর্য হয়, এখন তবে আর দেরি করছেন কেন ভদ্রলোক ? শীলাদি তো কিছুই চাপা রাখেননি। সেদিনও স্পষ্ট করে বলেছে, হ্যাঁ, বেশ ভাল একটা কাজ পেয়েছেন ভদ্রলোক, যে কাজ এতদিন শুধু ইংরেজ সাহেবরাই পেয়ে এসেছে, সে কাজে এই প্রথম ইন্ডিয়ান অফিসার হলেন শীলাদির উনি, যিনি একদিন শীলাদির স্বামী হবেন।

শীলাদির ধৈর্য আছে বলতে হবে। পুরো একটি বছর পার হয়ে গেল, সে ভদ্রলোক এর মধ্যে একটি দিনও শীলাদির সঙ্গে আর দেখা করতে আসেননি। বোধহয় দু-তিনটে চিঠি শুধু এসেছিল। কিন্তু গত ছ'মাসের মধ্যে কোনও চিঠিও আসেনি।

তবু শীলাদি বেশ আছে। সব চেয়ে বেশি হাসে শীলাদি, সব চেয়ে বেশি দুরন্তপনা করে শীলাদি। শীলাদির কল্পনায় যেন এখনও একটা গর্ব হেসে রয়েছে ; শীলাদি দেখতে যা-ই হোক, শীলাদির ভালবাসার মানুষ যে যেমন দেখতে চমৎকার তেমনিই মানে-সম্মানে আর টাকা-পয়সায় চমৎকার। সাতশো টাকা মাইনে পান ভদ্রলোক। তবে শীলাদির মনে একটু গর্ব থাকবেই বা না কেন ? আয়নাতে মুখ দেখতে চায় না শীলাদি, ওটাও যে একটা গর্ব ; যেন বলতে চায় শীলাদি, যে মুখটাকে আয়নাতে দেখতে ইচ্ছে করে না, সেই মুখই তো অমন চমৎকার একটি মানুষের ভালবাসা জয় করে বসে আছে ; সে মুখে এখন স্নো-পাউডার না মাখলেও চলে।

কোনও মুহূর্তেও কি শীলার মনে নতুন করে কোনও ভয়ের ছায়া দেখা দেয় না ? কলকাতার মেস থেকে আর চিঠি আসবার কথা নেই। সে এখন মেসে থাকে না। সে এখন ফোর্টের একটি নিভৃতের একটি ঘরে থাকে। আর ফোর্টেরই ভিতরে একটি অফিসে কাজ করে। যুদ্ধের প্রকাণ্ড একটা রিপোর্ট লেখা শুরু হয়েছে। ইন্ডিয়ান আর্মি কোথায় কোন কোন দেশে, কীভাবে কত যুদ্ধ আর কীর্তি করেছে, তারই বিবরণ। বিশ ভল্যুমে সমাপ্ত হবে এই বিবরণ। শেষ চিঠিতে শুধু এইটুকু জেনেছে শীলা, সে এখন চিফ কমপাইলারের ফার্স্ট অ্যাসিট্যান্ট হয়ে কাজ করছে। কিন্তু...কিন্তু এত বড় সৌভাগ্যের লিপিটাকে হাতে পেয়েও যেন বিশ্রী একটা প্রশ্ন শীলার মনের ভিতরে ঘুর ঘুর করে। কেন এতদিনের অপেক্ষা আর ধৈর্যের প্রাণটা তবু খুশি হয়ে হেসে উঠতে পারছে না ?

না, সন্দেহটাকেই বিশ্বাস করতে পারে না শীলা। অসম্ভব ! ওই চমৎকার মিষ্টি-হাসির মধ্যে কোনও ছলনা থাকতে পারে না। চন্দননগরের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সেই অদ্ভুত রকমের করুণ-সুন্দর মুখের ছবিতে কোনও স্বার্থের চক্রান্ত ছিল না।

হ্যাঁ, শেষ চিঠিতে স্পষ্ট করে একটা আশ্বাসের কথাও যে ছিল, তুমি ব্যস্ত হয়ো না শীলা ; ঠিক সময় বুঝে আমি নিজেই যাব। চিঠি যদি না পাও, তবে জানবে আমি খুবই ব্যস্ত আছি।

না, আর কিছু বলবার নেই। আর কিছু করবারও নেই। ওই ব্যস্ততা যেদিন নিজেই ইচ্ছে করে ফুরিয়ে যাবে, সেদিন যদি...হ্যাঁ, তার আগে ভিজিটার্স রুমে গিয়ে কোনও অপেক্ষার মানুষকে দেখবার সুযোগ আর দেখা দেবে না। দেখাই যাক, ওই ব্যস্ততার অবসান কবে হয় ?

শুকনো ঘাসের উপর মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে হরিয়াল ঘুঘুটা। বটের পাতার আড়ালে যে একজোড়া হরিয়াল বসে ছিল, তারই একটা হল এটা। আর একটা মরেছে কিনা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কারণ সেটা যে কোন দিকে উড়ে চলে গেল, কতদূরে গেল, আর কোথাও ঝুপ করে লুটিয়ে

পড়ল কিনা, দেখতে পায়নি কুমুদ।

হরিয়ালটার গায়ের কাঁচা রক্ত ভাল করে শুকোয়নি, কিন্তু যেন বেতারে খবর পেয়ে দশ মিনিটের মধ্যে তিন সারি কালো পিঁপড়ে পৌঁছে গিয়েছে। আরও আসছে। মরা হরিয়ালটার গা বেয়ে অনেক পিঁপড়ে উঠছে আর নামছে।

কুমুদ বলে—শঙ্করদা একটু বেশি ক্যাবলা মানুষ। প্রেস্টিজ সম্বন্ধে সামান্য একটা হুঁশও নেই।

বরুণা বলে—জামাইবাবু বরাবরই ওই রকমের। যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে, আর এক মিনিটের মধ্যেই একেবারে গলাগলি ভাব জমিয়ে বসেন।

কুমুদ—সেই কথাই তো বলছি। এতে অসুবিধা হয় আমার। আমাকে আমার প্রেস্টিজের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়। একটু এদিক ওদিক হলে দুর্নাম রটে যেতে পারে।

বরুণা হাসে—জামাইবাবুর মনে কিন্তু এসব ভয়ের বালাই নেই। তা না হলে চাপরাসির মেয়ের বিয়েতে গিয়ে

আশ্চর্য হয়ে তাকায় কুমুদ—চাপরাসির মেয়ের বিয়েতে ?

বরুণা—হ্যাঁ, বিয়ে দেখতে গেলেন আর একগাদা গোলা লোকের সঙ্গে এক লাইনে বসে ভাত খেয়েও এলেন।

কুমুদ—এর পর কি চাপরাসির কাছে শঙ্করদার প্রেস্টিজ বলতে কিছু থাকতে পারে ?

—তা জানি না। কিন্তু ওভাবেই তো বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন দেখছি।

—একদিন ঠেকে যেতে হবে।

—সেদিন বোধহয় ভুল বুঝবেন।

—তবে একটা কথা, শঙ্করদার একটা সুবিধে আছে, যে জন্য এসব কাণ্ড করে উনি সেরে যেতে পারছেন।

—কিসের সুবিধে ?

—উনি হলেন ব্যবসায়ী মানুষ। যদি আমাব মত অফিসাব হতেন, তবে বুঝতেন, প্রেস্টিজের ব্যাপারে এত ক্যাবলা হলে চলে না।

—যাকগে ওসব কথা।

—হ্যাঁ, ...ঠিক কথা, আমি এসব কথা নিয়ে আজ আর এখানে বসে মাথা ঘামাতাম না; কিন্তু...আমার ভাবতে খুব খারাপ লাগছে যে, শঙ্করদা এখনও একটা বাজে লোককে তাঁবুর কাছে বসিয়ে গল্প করছেন।

বরুণা হাসে—এতক্ষণে হয়ত মুরগির কারি-টারি খাইয়ে লোকটাকে তোয়াজ করতে শুরু করে দিয়েছেন।

—আশ্চর্য নয়। আর, শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে জান ?

—কী ?

—শঙ্করদার পকেট থেকে কিছু খসবে !

—কেন ?

—এ ক্লাসের লোক এসে যখন স্যার-স্যার করে, তখনই বুঝতে হবে যে, কিছু টাকা আদায় করবার মতলবে এসেছে।

—তা অভাবের মানুষদের স্বভাবে ওরকম একটু-আধটু...

—না বরুণা। অভাব থাকলেই যে স্বভাবটাকে ভিখারি করে তুলতে হবে, এটা মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। তা যদি হত তবে আমি আর...।

—কী ?

—আমার জীবনের সব গল্পই তো তোমাকে মুক্তকণ্ঠে বলে দিয়েছি বরুণা। আমিও একদিন অভাবের মানুষ ছিলাম কিন্তু কোনও দিন ভুলেও কারও কাছে হাত পাতিনি। নিজের মনের জোরে আর প্রাণের জোরে খেটেছি আর লেখাপড়া শিখেছি।

বরুণাও খুশি হয়ে হাসে। —বাবা তো এই জন্যেই তোমাকে এত...

বরুণার একটা হাত ধরে বরুণাকে যেন বুকের কাছে টানতে চায় কুমুদ—বলো বরুণা, থামলে কেন ?

—এই জন্যেই তোমাকে এত পছন্দ করেন বাবা।

ঠিকই বলেছে বরুণা ; একটুও বাড়িয়ে বলেনি। রামদয়ালবাবু, ছোটনাগপুরের প্রায় প্রত্যেক শহরে যাঁর সাতটি-আটটি বাড়ি আছে, বাড়িওয়ালা বিত্তবানদের মধ্যে বলতে গেলে যিনি অদ্বিতীয়, তাঁর দুই মেয়ে অরুণা আর বরুণাকে তিনি তাঁর সম্পত্তি সমান দু'ভাগে ভাগ করে দান করে দিয়ে যাবেন। কারণ, তাঁর ছেলে নেই। তিনি শুধু চান যে, জামাইরা যেন এই দানের সম্মান রাখতে পারে। রামদয়ালবাবু তাঁর এই প্রবীণ জীবনের অভিজ্ঞতায় অনেক কিছু দেখেছেন, এবং এই শিক্ষাও পেয়েছেন যে, জামাই যদি একটু শক্ত চরিত্রের মানুষ না হয়, তবে মেয়েকে দেওয়া সম্পত্তি দু'দিনে উচ্ছন্ন হয়ে যায়। যতীনবাবুর, সাতকড়িবাবুর এমন কি মিস্টার কাইজারেরও সম্পত্তি এই ভুলে নষ্ট হয়ে গেছে। ওঁদের মেয়েরা অবশ্য খুবই সাবধান ছিল ; কিন্তু হলে হবে কী ? জামাইগুলো ছিল মেরুদণ্ডহীন অথচ লোভী। মেয়েগুলোকে নানাভাবে বিরক্ত করে, নানা কারসাজি করে, কেঁদে সেধে অভিমান করে, শেষে সব সম্পত্তি এলোমেলো করে আর উড়িয়ে দিয়ে হতচ্ছাড়া হয়ে গেল। নিজেদের সম্বন্ধে যদি একটা সম্মানবোধ থাকত, তবে শ্বশুরের দেওয়া স্ত্রী-সম্পত্তিকে ওভাবে লুটেপুটে খেতে ওরা লজ্জা বোধ করত।

কুমুদ ছেলেটি কিন্তু বেশ শক্ত মেরুদণ্ডের মানুষ। দেখে শুনে আর জেনে খুশি হয়েছেন রামদয়ালবাবু। মনে হয়, কুমুদ ছেলেটি বড় জামাই শঙ্করের চেয়েও স্বভাবে বেশি সাবধান, আর মনের দিক দিয়েও বেশি মজবুত। কেউ এসে হাত পাতলেই মন গলে যাবে আর পকেট থেকে কিছু বের করে দেবে, এটা কুমুদের স্বভাব নয়। কুমুদের মুখ থেকেই শুনেছেন রামদয়ালবাবু—আমি ওভাবে চ্যারিটি করে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দিই না। আমি আমার ছেলেবেলার জীবনে শত অভাবেও কোনওদিন এক মুহূর্তের জন্যও কারও কাছে মাথা নিচু করিনি। সাহায্যের জন্য কারও কাছে হাত পাতিনি। আমি এম-এ পড়বার সময় হাওড়া স্টেশনে খবর-কাগজ ফিরি করেছি, আর তিনটে ছাত্র পড়িয়েছি। আমি নিজের ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়ে নিয়েছি। কোনও কাকা-মামা-পিসে-মেসোর দয়ার ধার ধারিনি।

এই তো চাই, এই তো চাই ! খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন রামদয়ালবাবু। আর বরুণা, ভিতরের ঘরের একটি সোফার উপর বসে সেকথা শুনতে পেয়ে একটা নিশ্চিন্ত আনন্দের উথলে পড়া হাসি চাপতে গিয়ে ছটফটিয়ে হেসে উঠেছিল। না, এরপর আর ভাবনা করবার কোনও মানে হয় না। এর চেয়ে আর বেশি স্পষ্ট করে কী-ই বা বলবেন বাবা ! কুমুদকে মনে ধরেছে ; বরুণা আর কুমুদের মেলামেশাকে এখন আর কোনও সমস্যা বলে মনে করবেন না বাবা।

কোথায় যেন একটা হরিয়াল ঘুঘু ডাকছে। যেন একটা ভীরু দীর্ঘশ্বাসের কূজন। কুমুদ বলে—তোমার বাবা তো আমাকে পছন্দ করেছেন, আর, কেন যে পছন্দ করেছেন, তাও বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, তুমি কেন আমাকে এত ভালবেসে ফেললে বরুণা ? আমি সত্যিই...।

বরুণা—কী ?

কুমুদ—আমি যে ভাবতেই পারিনি, তুমি আমাকে এত ভালবেসে ফেলবে।

বরুণা হাসে—তুমি যে আমারই মনের কথাটা বলে ফেললে।

কুমুদ—অ্যাঁ ?

বরুণা—সত্যি, আমিও বুঝতে পারিনি কুমু, এত শিগগির...

কুমুদ—এত শিগগির ? এ কথাটা কিন্তু ঠিক কথা হল না বরুণা। পুরো দুটো বছর কি একটা শিগগির ব্যাপার হল ?...ওঃ, আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম বরুণা।

—কেন ?

—এই দু'বছরের মধ্যে এই সেদিন তার মানে, তোমার বাবার সেই প্রথম স্ট্রোকের দিনে সন্ধ্যাবেলাতে তোমার মুখ থেকে প্রথম একটি ছোট্ট কথায় বুঝতে হল যে, না, আমার স্বপ্ন ব্যর্থ

হয়নি।

ঠিকই, রামদয়ালবাবুর হার্টের কষ্টটাও সেদিন যেন হঠাৎ নিঝুম হয়ে গেল। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিছানার উপর নীরব ও নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন রামদয়ালবাবু। কুমুদকে দেখতে পেয়েই ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছিল বরুণা—কী হবে ? কী হবে কুমু ?

কুমুদ—সেরে উঠবেন তোমার বাবা, নিশ্চয় সেরে উঠবেন।

বরুণা—আমার হাত ধরে বলো কুমু।

কুমুদ সাগ্রহে বরুণার একটা হাত ধরে বলেছিল—নিশ্চয়ই, আমি বলছি, আমার বিশ্বাস, তোমার বাবা সেরে উঠবেনই।

হরিয়ালের সেই চাপা দীর্ঘশ্বাসের কূজন আর শোনা যায় না। বরুণা বলে—মনের সন্দেহটা চলে গিয়েছিল, তাই সেদিন হাত ধরতে পেরেছিলাম।

—সন্দেহ ?

বরুণা হাসে—না, ঠিক সন্দেহ নয়। প্রশ্ন।

—কিসের প্রশ্ন ?

—মনে হয়েছিল, তোমার মনে কি কোনও মেয়ের স্মৃতির ছায়া নেই ? তুমি কি এতই সাদা ?

—ছি ছি ছি ! এত অদ্ভুত প্রশ্নও তোমার মত মেয়ের মনে...তা ছাড়া, আমার মত একটা মনখোলা মুখখোলা মানুষকে দু'বছর ধরে চোখে দেখেও যদি...

—না, আর কোনও প্রশ্ন নেই।

—তুমি আর একবার আমার বুকে হাত রেখে বলো বরুণা ; এরকম বাজে বিশ্রী মিথ্যে অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার মনে আর নেই।

কুমুদের বুকের উপর মাথাটাকে হেলিয়ে দিয়ে আর নরম রঙিন ঠোঁট দুটোকে যেন নিবিড় এক পিপাসায় কাঁপিয়ে দিয়ে বরুণা বলে—না, সে প্রশ্নই মিথ্যে হয়ে গেছে।

কুমুদ বলে—আমারও মন থেকে একটা দুঃস্বপ্নকে তুমি মুছে দিলে বরুণা। আমার ভালবাসা যদি তোমার একটা মিথ্যে প্রশ্নের কাছে অপমানিত হত, তবে আমাকে বোধহয় দেশছাড়া হয়ে কোথাও চলেই যেতে হত। কিন্তু...

বরুণা—কী ?

কুমুদ—তোমার সেই মিথ্যে প্রশ্নটা কিন্তু তোমার মনেব একটা ভীরুতা।

বরুণা—ভীরুতা কেন হবে ?

কুমুদ—তুমি কেন ওসব কথা ভাববে ? তুমি যদি আমাকে ভালবেসে থাক, আর আমি যদি তোমাকে ভালবেসে থাকি, তবে সেটাই তো প্রশ্নের শেষ। তারপর আর আমার মনে এমন প্রশ্ন দেখা দেবেই বা কেন, তোমার জীবনে কোনওদিন কারও জন্য কোনও আশার ছায়া পড়েছিল কি না...

বরুণা—না।

চমকে ওঠে কুমুদ ; বরুণা যেন একটা উদ্ধত দর্পের মত বেশ শক্ত স্বরে কথাটা বলেছে।

বরুণা—না ; আমার জীবনে যদি কারও ভালবাসার কোনও দাগ থাকত, তবে আমি তোমার মুখের দিকে ভুলেও তাকাতাম না। সে অহংকার আমার আছে।

বরুণার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে কুমুদ। —আমারও মনে সে অহংকার যথেষ্ট আছে বরুণা।

বরুণা হঠাৎ যেন কুণ্ঠিত হয়ে হাসে—সেই জন্যেই তো তোমার সঙ্গে ভাগ্যটাকে মিলিয়ে দিতে চাই কুমু। জেদ বল, কুসংস্কার বল, আর ভীরুতাই বল, ওটা আমার আছে। আমি এমন কাউকে ভালবাসতে পারি না, যার মনে অন্য কোনও মেয়ের ভালবাসার স্মৃতির ছাপ আছে ; এমন কি...

কুমুদের অপলক চোখ দুটো যেন থেমে থেমে শিউরে উঠতে থাকে। —কী ?

বরুণা—এমন কি, যদি এমন হত যে, তুমি কোনও মেয়েকে সত্যিই ভালবাসনি, অথচ সে মেয়ে তোমাকে ভালবেসেছে, তবু...

—অ্যাঁ ?

—তবু আমার পক্ষে আপস করা সম্ভব হত না কুমু।

—কী বললে ?

—তুমি বলবে ভীরুতা ; কিন্তু আমি বলব সাবধানতা। দরকার কী, এমন কোনও মানুষের ভালবাসা পেয়ে, যাকে অন্য মেয়ে ভালবেসেছে ? এতটা অসাবধান হতে পারলে দু'বছর আগে মিরাটের পরাগ সেনের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়ে যেত। তুমি কি জান...।

—বেশি কিছু জানি না, পরাগ সেন তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এটুকু জানি। কিন্তু তুমি যে...

বরুণা হাসে—ভয় নেই ; মিথ্যে কথা বলব না। পরাগ সেনকে পছন্দ বা অপছন্দ কিছুই করিনি। কিন্তু বাবা খুব পছন্দ করেছিলেন।

কুমুদ—কিন্তু, তবু কেন...।

বরুণা—তবু আমিই বিয়ে করতে রাজি হইনি। কারণ, আমি শুনেছিলাম, একটি গুজরাটি মেয়ে নাকি পরাগ সেনকে ভালবাসে। আর পরাগ সেন বেচারা সে মেয়েকে একটুও পছন্দ করে না।

কুমুদ—পরাগ সেন বোধহয় ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছিল।

বরুণা—মোটেই নয়। জামাইবাবুর কাছে নিজেই গল্প করে সব বলে দিয়েছিল পরাগ সেন। ভদ্রলোক মিথ্যে কথা বলবার মত ভীরু মানুষ নন।

কুমুদ চেঁচিয়ে ওঠে—আমিও...একটি কথা তোমাকে আমি বেশ গর্ব করে জানিয়ে দিতে পারি বরুণা, আমি মিথ্যে কথার মানুষ নই ! আমি পাগল হয়ে গেলে হয়ত মানুষ খুন করতে পারব, কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

বরুণা—আমি বিশ্বাস করি কুমু ; এই বিশ্বাস আছে বলেই তো আমি দিদি আর জামাইবাবুর চোখের সামনেই হেঁটে হেঁটে তোমার সঙ্গে এখানে চলে আসতে পেরেছি। আর কিসের চক্ষুলজ্জা ? বাবাও এখন দেওঘরের বাড়ির বারান্দায় বসে হয়ত ভাবছেন, কবে বিয়েটা হবে।

কুমুদ—হ্যাঁ, আমিও তো ভাবছি।

বরুণা—আমিও।

কুমুদ—এ মাসেই তো হতে পারে।

বরুণা—হতে পারে। বাবারও বোধহয় তাই ইচ্ছে।

কুমুদ—কেমন করে জানলে ?

বরুণার মুখের উপর যেন একটা চকিত বিদ্যুতের হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। হাতের ব্যাগটা খুলে একটা চিঠি বের করে কুমুদের হাতের কাছে এগিয়ে দেয় বরুণা—পড়ে দেখো। তোমাকে দেখাবার জন্যই এ চিঠিকে সঙ্গে রেখেছি।

বরুণার কাছে লেখা চিঠি নয়। রামদয়ালবাবু অরুণার কাছে লিখেছেন—এইবার কুমুদের সঙ্গে বরুণার বিয়েটা হয়ে গেলেই ভাল হয়। এ মাসে হলেই ভাল। আমারও আর এভাবে অনিশ্চিত হয়ে থাকা উচিত নয় ; শরীরের যা অবস্থা, কখন ডাক এসে পড়বে বলা যায় না। কুমুদের সম্পর্কে আমার আর কিছু বলবার নেই। কুমুদকেও আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি এবার আমার সম্পত্তি দু'ভাগ করে তোমাদের দু'বোনের নামে লিখে দেবার ব্যবস্থা করছি ! নিশ্চিন্ত হয়েছি, কুমুদ ছেলেটি যেমন শক্ত মেরুদণ্ডের মানুষ, তেমনই সত্যবাদী। আমার বিশ্বাস আছে, বরুণার সম্মান আর সম্পত্তি দুইই কুমুদের হাতে নিরাপদ থাকবে।

চিঠিটাকে বেশ শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে চাইছে কুমুদ, হাতটা অদ্ভুতভাবে কাঁপছে। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে কুমুদ—আমার ইচ্ছে করছে বরুণা, তোমার বাবাকে এখনই টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিই, কুমুদ ছেলেটাকে তিনি আর যাই ভাবুন, যেন কোনও ভুলেও, পাগল হয়ে গেলেও, কুমুদকে মিথ্যেবাদী বলে না মনে করেন।

বরুণা হাত বাড়িয়ে চিঠিটাকে কুমুদের হাত থেকে তুলে নিয়ে আবার ব্যাগের ভিতরে রাখে। —তোমাকে আর এত ব্যস্ত হয়ে ওরকম অহংকারের টেলিগ্রাম করতে হবে না।...চলো, ওই

পাথরটার কাছে গিয়ে একটু বসি।

অদৃশ্য হরিয়ালের দীর্ঘশ্বাসের সেই চাপা-চাপা কূজন আবার বাজতে শুরু করেছে। এগিয়ে যেতে থাকে কুমুদ আর বরুণা।

চমকে ওঠে বরুণা—দেখো দেখো!

কুমুদ—কী ? কোথায় ?

বরুণা—ওই যে! কী চমৎকার একটা মেয়ে ? সাঁওতাল মেয়ে বোধহয়। কত বড় একটা সাদা বুনো ফুল খোঁপাতে ঝুলছে।

কুমুদের হাতের রাইফেল থরথর করে কাঁপতে থাকে।

বরুণা বলে—কী আশ্চর্য, মেয়েটা কিরকম অদ্ভুতভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, দেখছ ?

কুমুদ বিড়বিড় করে—তুমি ওর দিকে তাকিয়ো না বরুণা ?

বরুণা—কেন ? কিসের ভয় ?

কুমুদ—ভয় মানে এই যে...কে জানে কেন...কোনও মতলব করে হঠাৎ এভাবে...জঙ্গলের একটা প্রেতিনীর মত...

বরুণা খিলখিল করে হেসে ওঠে—কী ছাইপাঁশ বকছ। সত্যিই ভয় পেলে নাকি ? এতবড় পদস্থ অফিসার—হাতে আবার রাইফেলও আছে, সে মানুষ হঠাৎ এসব আবার কী বলতে শুরু করল ?

কুমুদ হাসতে চেষ্টা করে।—তা নয়, ওসব কিছু নয় ; কিন্তু ভয়ানক একটা মিসচিফ তো হতে পারে।

বরুণা—কখ্খনও না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি...

কুমুদের গলার স্বর শিউরে ওঠে—কী, কী বললে ? তুমি স্পষ্ট করে আবার কী দেখতে পেলে ?

বরুণা—আমার মনে হয়, মেয়েটা একটা শিক্ষিতা মেয়ে।

চমকে ওঠে কুমুদ—অ্যাঁ ? তুমি ভয়ানক বাজে কথা বলছ বরুণা।

বরুণা—না। আমার মনে হয়, একজন আদিবাসী খ্রিস্টান মেয়ে। দেখছ না, কিরকম চমৎকার স্টাইলে শাড়ি পরেছে ?

একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে হাঁপ ছাড়ে কুমুদ—তা হতে পারে। হতে পারে কেন, ঠিকই বলেছ। কোনও খ্রিষ্টান ওরাওঁ মহিলা।

বরুণা—উনিও বোধহয় পিকনিকে এসেছেন।

কুমুদ—তাই তো মনে হয়। যাই হোক, তুমি এখন তা হলে তাঁবুতে ফিরে গিয়ে...

বরুণা—তুমি কোথায় যাবে ?

কুমুদ—আমি একটু ওদিকে ঘুরে আসি ; জঙ্গলের ভেতরের দিকে। হয়ত খরগোস-টরগোস পাওয়া যেতে পারে।

বরুণা—দরকার নেই।

কুমুদ—কিন্তু আমার দরকার আছে। শুধু ছোট্ট একটা হরিয়াল মেরে আমার রাইফেলের ক্ষিদে মিটছে না। একটু বড়গোছের প্রাণী, একটু বেশি রক্ত, একটু বেশি...

কুমুদের চোখমুখ যেন একটা দুরন্ত শিকারের পিপাসায় ছটফট করছে ; যেন চোখেমুখে কাঁচা রক্ত মাখতে চাইছে ফোর্টের অফিসার কুমুদবন্ধু।

বরুণা—এরকম করছ কেন ? সামান্য একটা খরগোস শিকার করবার জন্য একেবারে বাঘের মত একটা আক্রোশ নিয়ে...

বলতে বলতে হেসে ফেলে বরুণা—তোমাকে বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে কুমু।...ও কী ? মহিলা কোথায় চলে গেলেন ? •

হ্যাঁ, সেই মহিলা, শিক্ষিতা আদিবাসী মহিলার মত দেখতে সেই হঠাৎ-আবির্ভাবের মূর্তিটা যেন অতিকায় পাথরটাকে আড়ালে রেখে আর শুকনো পাতা মাড়িয়ে হুড়মুড় করে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। চকিতে একবার দেখতে পাওয়া গেল, খোঁপাতে একটা সাদা ফুল নিয়ে একটা মাথা যেন শালের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বরুণা—মহিলা ওভাবে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে কেন ?

কুমুদের দু'চোখের ভুরু দুটো আরও কুঁচকে গিয়ে দুটো শিশু কালো-সাপের কুণ্ডলির মত আস্তে আস্তে কাঁপতে থাকে। চেঁচিয়ে ওঠে কুমুদ—তুমি তাঁবুতে চলে যাও বরুণা।

বরুণা—তুমি ?

কুমুদ—আমি ওদিকে একবার যাব।

বরুণা—কোন দিকে ?

কুমুদ—ওই যে, ওই মহিলা যেদিকে গেলেন।

বরুণা—কেন ?

কুমুদ—মনে হচ্ছে, ভয়ানক কোনও রহস্য আছে।... আমার একটা কর্তব্য আছে বরুণা। আমি যাই...এখনি তাঁবুতে ফিরে আসব।

বলতে বলতে রাইফেলটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড একটা কৌতূহলের বাঘের মত ছুটে চলে যায় কুমুদ।

কৌতূহলের বাঘ একেবারে নিথর হয়ে একটা বুক-উঁচু পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আর শুধু মাথাটাকে উপরে তুলে রেখে, আর দু'চোখ অপলক করে দেখতে থাকে।

পাথরটার উপর নিকটের চারটে শালের ছায়া লুটিয়ে পড়ছে; তাই সেই ছায়ার সঙ্গে চোরা শরীরটাকে লুকিয়ে রাখবার সুযোগটাও বেশ ছায়া-ছায়া হয়ে আছে। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কুমুদ। ওই তো, কেমন শান্ত আর সুস্থির হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে শীলা। শীলার চোখের সামনে শ্যাওলা-মাখা নুড়ি পাথরগুলি ছড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে আছে। তার পরেই প্রপাতের ধারা। গুঁড়ো গুঁড়ো জল ছিটকে পড়ছে; বাতাসে ছুটোছুটি করছে সেই গুঁড়ো জলের কণা। কী ভয়ানক জলের তোড়! যেন কোথাও একটা পাথুরে দানবের ফাটা বুকের গহ্বর থেকে একটা গলগলে বন্যার রাগ উথলে উঠেছে; প্রচণ্ড আক্রোশেব শব্দ তুলে নীচের পাথরের উপর আছড়ে পড়ছে প্রপাতের সেই পাগল জলের ধারা।

ভাল, দেখতে ভালই লাগে। আত্মহত্যা করবার জন্য প্রপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে শীলা। কুমুদের চোখ দুটো যেন একটা আশ্বাসের দৃশ্য দেখছে। ওই ভয়ংকর প্রতিশোধের নারী এখন যদি ভালয়-ভালয় ওই পাগল-জলের প্রপাতের উপর একটা মরণ-ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে কুমুদের জীবনের শত্রু একটা ভয়ানক অন্ধকারেই অদৃশ্য হয়ে যাবে।

কোনও সন্দেহ নেই, ওই কুৎসিত মুখের মানুষ, একটা টিচার নারী আজ ইচ্ছে করলে কুমুদের জীবনের আশার কুঞ্জটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। বেশি কিছু নয়, শুধু বরুণার কাছে যদি একটা চিঠি লিখে দেয়, যদি কুমুদের পুরনো চিঠিগুলির ভেতর থেকে যেকোনও একটা চিঠিকে তুলে নিয়ে বরুণার কাছে পাঠিয়ে দেয়, তবেই কুমুদের ভরসার পৃথিবীটা এক নিমেষেই মিথ্যে হয়ে যাবে। কুমুদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে সেই মুহূর্তে সরে যাবে ওই বরুণা, ভেনাসের মুখের ছাঁচের মত যার মুখের ছাঁদ; আর, ফোটা গোলাপের পাপড়ির মত যার ঠোঁটের রঙ। আর, সম্পত্তিময় একটা প্রতিশ্রুতিও যে ছাই হয়ে যাবে। রামদয়ালবাবুর হাউস প্রপার্টির অর্ধেক অংশ শুধু নিদারুণ একটা ভ্রূকুটির ছায়াকে কুমুদের অদৃষ্টের কাছে রেখে দিয়ে চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে যাবে। কুমুদের জীবনটা যে একটা আবর্জনা হয়ে যাবে।

শীলাকে একবার ডাক দিয়ে বলে দিতে পারা যায়, যাক, তোমার আর ওভাবে ওই হুড়রুর জলে মরণ বরণ করবার দরকার নেই। চার বছর ধরে যত টাকা তুমি আমাকে দিয়েছ, তার একটা হিসাব দাও। আমি সে টাকার ডবল টাকা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান; আমার ক্ষতি করবে না। প্রতিজ্ঞা করো, আমার ক্ষতি করবে না। প্রতিজ্ঞা করো, বরুণার কানে কোনওদিন সেই চার বছরের ঘটনার একটা গল্পও পৌঁছবে না।

না, ওই ভয়ানক নারীর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেলেই বা কী ? তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারা যাবে না। কুমুদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত আতঙ্কে ভরে থাকবে। শীলার হাতে যতদিন কুমুদের একটি চিঠিও থাকবে, ততদিন শীলার হাতে কুমুদের জীবনকাঠি থেকে যাবে। তার চেয়ে ভাল...হ্যাঁ

খুব ভাল, এভাবে চুপচাপ হুড়রুর জলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে শেষ হয়ে যাক কুমুদের জীবনের ওই ভয়।

ও কী ! হাসছে কেন শীলা ? শীলা কি ওর পায়ের কাছের ছোট্ট জলকুণ্ডটার বুকের আয়নাতে ওর মুখের হাসির ছবিটাকে একবার দেখে নিচ্ছে ? দেখে নিক তা হলে ; মরে যাবার আগে ওর ভয়ানক ভুলটাকে একবার বুঝে নিক। কুমুদের মত মানুষ ওর মত ওরকম একটা বাজে চেহারার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, এরকম একটা বাজে সুস্বপ্ন দেখা যে কত বড় ভুল করা হয়েছে, সেটা আজ বুঝে ফেলুক। সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করুক। কুমুদকে অকৃতজ্ঞ বলে মনে করবার দুঃসাহস যেন আর না হয়।

কিন্তু না, ফিরে আসছে শীলা। পাগল জলের বুকে মরণ-ঝাঁপ দিল না ! আস্তে আস্তে হেঁটে, আর কুৎসিত মুখের উপর সেই অদ্ভুত হাসিটাকে যেন আরও জ্বলজ্বলে করে নিয়ে কুমুদের অদৃষ্টের ভয়টা এদিকেই আসছে।

আসুক তা হলে। কুমুদের রাইফেল-ধরা হাতের হাড় যেন কড়কড় করে বাজতে থাকে। বাঘের কৌতূহলটা এবার যেন সাপের আক্রোশের মত ফণা তুলে কাঁপছে ; কাঁপতে থাকে কুমুদের চোখ। না, উপায় নেই ; হরিয়াল ঘুঘুর চেয়েও দুর্বল ওই মেয়ের প্রাণ যেন আর ডাক ছাড়তে না পারে, এখনই ওকে চিরকালের মত নীরব করে দেওয়াই ভাল।

—শীলা !

শালের ছায়ার আড়াল থেকে পাথরটা যেন গর্জন করে উঠেছে। থমকে দাঁড়ায় শীলা। আর, কুমুদের হাতের রাইফেলটা যেন একটা দুর্বার পিপাসা চাপতে গিয়ে মাঝে মাঝে ছটফটিয়ে কেঁপে উঠতে থাকে।

শীলা বলে—বলো।

উত্তর দেয় না কুমুদ। কুমুদের বুকের ভিতরে যেন একটা সাপের নিঃশ্বাস দুলছে।

হেসে ফেলে শীলা। —ভুল করছ। তোমার হাতের রাইফেলকে শান্ত করো।

—কী ? কুমুদের গলার স্বরটা যেন একটা ক্ষিপ্ত হিংস্র প্রতিধ্বনির টুকরোর মত বেজে ওঠে।

শীলা—ধরা পড়ে যাবে। রাইফেলের শব্দ সকলেই শুনতে পাবে।

—কী ? আবার ক্ষিপ্তস্বরে প্রশ্ন করে কুমুদ।

শীলা—আজ এখানে তুমি ছাড়া আর কারও হাতে বোধহয় বন্দুক নেই। কাজেই বন্দুকের শব্দ হবে, গুলি খেয়ে মরা একটা মেয়েমানুষের লাসও পাওয়া যাবে ; তখন তুমি পার পাবে কেমন করে ? তোমারই কাছে যে কৈফিয়ত চাইবে পুলিশ।

কুমুদের হাতের মুঠোটা হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়, রাইফেলটাও এলিয়ে পড়ে।

শীলা হাসে। —তার চেয়ে ভাল, চুপচাপ চলে যাও।

কুমুদ—যেতে পারি, যদি তুমি নিশ্চিন্ত করে দাও। তোমাকে প্রতিজ্ঞা করে বলতে হবে, তুমি আমার ক্ষতি করবে না !

—ক্ষতি ?

—হ্যাঁ। তুমি আমার আর বরুণার মধ্যে কোনও বিচ্ছেদ বাধাবে না।

—আমার কোনও গরজ নেই।

—কী বললে ?

—ও কাজ করবার আগে যে আমি ঘেন্নায় মরে যাব।

—এটা ভাল কথা। কিন্তু...

—কী ?

—আমি বলতে চাই...

—বলো।

—কথা হচ্ছে...সব চেয়ে ভাল হত...অর্থাৎ তোমার এখন উচিত ছিল...

হেসে ফেলে শীলা। —কথাটা স্পষ্ট করে বলে ফেলতে পারছ না কেন ? আমার পক্ষে আজ

হুড়রুর পাগল জলে একটা মরণ-ঝাঁপ দিয়ে ফুরিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল, এই তো ?

—তুমি ভেবে দেখো।

—তুমি বলো, তা হলে তুমি নিশ্চিন্ত হবে তো ?

—হ্যাঁ।

—তবে তাই হবে।

—তোমার কথায় কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

কুমুদের চোখের দৃষ্টিটা যেন একটা চোর নেকড়ের অভিসন্ধির আবেদন। শীলার জীবন্ত চেহারাটাকে যেমন সহ্য করতে পারছে না কুমুদ, তেমনই শীলার এই ভয়ানক অঙ্গীকারকেও নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করতে পারছে না।

শীলা—কেন নিশ্চিন্ত হতে পারছ না ?

কুমুদ—হুড়রুর এই পাগল-জলে ঝাঁপ দিয়ে মরলেও তোমার লাসটা আমাকে বিপদে ফেলতে পারে ?

শীলা—তার মানে ?

কুমুদ—ধরো, কেউ যদি সন্দেহ করে, আমিই তোমাকে জলে ঠেলে দিয়েছি, তবে ?

—এই কথা ! হেসে ফেলে শীলা।

চোর নেকড়ের হিংস্র চোখের মত কুমুদের চোখেও একটা অভিসন্ধির আবেদন জ্বলতে থাকে। কুমুদ বলে—তবে তুমি একটা কাগজে লিখে দাও যে, তোমার মৃত্যুর জন্য তুমি নিজে দায়ী ; তুমি নিজেই ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করেছ।

—কাগজ দাও, লিখছি।

পকেট হাতড়ে কাগজ আর পেন্সিল বের করে কুমুদ। লিখে দেয় শীলা—হুড়রুর পাগল জল দেখতে বড় সুন্দর। দেখে বড় লোভ হচ্ছে। বুঝতে পেরেছি, সুন্দর মরণ এতদিনে দয়া করে আমাকে ডাক দিয়েছে। কাজেই, থাকতে পারছি না। আমার আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয় ; দায়ী আমি ; আমি খুশি হয়ে নিজের ইচ্ছায় মরছি।

লেখাটা হাতে তুলে নিয়েই কুমুদের চোখ দুটো হেসে ওঠে। হেসে উঠেছে চোর নেকড়ের খুশি অন্তরাত্মা।

কিন্তু পরমুহূর্তেই হঠাৎ খট্‌কা লেগে কুমুদের চোখে একটা সন্দেহ চমকে ওঠে। এ কীরকমের অদ্ভুত হাসি কাঁপছে শীলার কালো মুখে ? একটা কৌতুকের হাসি বলেই যে মনে হয়। মতলবটা কী ? তবে কি আত্মহত্যার এমন একটা অঙ্গীকার নিজের হাতে লিখে দিয়েও বেশ খুশি হয়ে বেঁচে থাকবে শীলা ? সাংঘাতিক কুৎসিত একটা ধূর্ততা আজ কুমুদকে শুধু একটা কপট আশ্বাস দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইছে ?

—মনে হচ্ছে তুমি একটা তামাশা করছ। বলতে গিয়ে কুমুদের হতাশা-ভীরু চোখ দুটো যেন ধিকিধিকি আগুনের জ্বালার মত কাঁপতে থাকে।

শীলা—তোমার সঙ্গে তামাশাই করছি।

—কী বললে ?

—এত ভয় পেও না। মরব ঠিকই ; কিন্তু তোমার জন্যে নয়।

—তার মানে ?

শীলার কালো চোখের তারা দুটো যেন দুটো শাণিত ছুরির মুখের মত চিকচিক করে জ্বলতে থাকে।—তোমাকে ঘেন্না করতে হচ্ছে বলে নয় ; একজনের ঘেন্না সহ্য করতে পারব না বলেই মরতে হচ্ছে।

—সে আবার কে ?

—আছে। সে আগেও ছিল।

—সে মূর্খটাকে তবে তুমি আগেই কেন বিয়ে...

—চুপ ! অবনীশের মত মানুষের পায়ের জুতো ছুঁতে পেলে তোমার মত বিদ্বান ধন্য হয়ে যাবে।

—ননসেন্স !

—সেন্স এই যে আমি সেই অবনীশের দানের টাকার এঁটো তোমাকে খাইয়েছি ; তাই তুমি চারটে বছর বেঁচেছ আর এম-এ পাস করেছ।

—তুমিও তা হলে অবনীশের এঁটো ?

—হ্যাঁ।

—তবে তো মনে হচ্ছে, অবনীশের লাথির ভয়ে মরবে বলে ঠিক করেছ ?

—না, অবনীশের পায়ের ধুলো কপালে জুটল না বলে মরে যাচ্ছি।

—খুব ভাল কথা। যে কারণেই হোক, তোমার পক্ষে এখন মরে যাওয়াই ভাল। অপমান থেকে বাঁচতে হলে তোমার মরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

—সে কথা তুমি না বললেও চলবে। .

—কিন্তু...

—আর কোনও কথা নয়। তুমি সরে যাও। আমাকে দেরি করিয়ে দিও না। তুমি সামনে থাকলে আমার মরতেও গা ঘিনঘিন করবে।

—ঠিক কথা। কুমুদের চোখের হতাশ আগুনটা আশ্বস্ত হয়ে আবার জ্বলতে থাকে। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে, হনহন করে হেঁটে তারপর প্রায় দৌড়ে দৌড়ে ছুটে চলে যায় কুমুদ।

নীহার, রেবা আব জয়া, কালো পাথরের উপর যেন তিনটে রঙিন পাথর নিথর হয়ে বসে আছে। আকাশ-পাতাল ভেবে-ভেবে আর ভয় পেয়ে-পেয়ে তিনটে হৃৎপিণ্ড যেন একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শীলাদি কি সত্যিই একটা সর্বনাশের কাণ্ড করে বসে রইল ? তা না হলে, এতক্ষণ হয়ে গেল, বিকেল ফুরিয়ে যেতে আর কতক্ষণই বা বাকি আছে, তবু শীলাদি ফিরে এল না কেন ? হুড়রুর সেই ছায়া-ছায়া ভয়ের দুটো হিংস্র হাতের থাবা কি শীলাদিকে সত্যিই গলা টিপে, জ্ঞানহারা করে, আর...। ভাবতে গিয়ে তিনজনেরই বুক কেঁপে ওঠে। নীহারের দুই চোখ মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যায়। রেবা হাঁসফাঁস করে, আর জয়া আতঙ্কিতের মত কসমসের জঙ্গলের কাছে উড়ন্ত ফড়িংগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে !

নীহার বলে—আর দেরি করা উচিত নয় জয়া। অন্তত শ্যামার বাবার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া উচিত।

জয়া বলে—আর একটু দেখে নাও।

রেবা—শীলাদিকে একা রেখে আসাই আমাদের খুব ভুল হয়েছে।

নীহার—ভুল তো হয়েইছে। এখন বিপদ না হলে হয়।

রেবা—বিপদ হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। শীলাদি তো খুব বোকা নয়।

জয়া রাগ করে কথা বলে—তোমাদের তাই ধারণা। কিন্তু আমার মনে হয়, শীলাদির চেয়ে বোকা মেয়ে খুব কমই আছে।

নীহার—তর্ক-টর্ক করতে আমার একটুও ভাল লাগছে না জয়া। কী উপায় করি, তাই বলো।

রেবা—শ্যামার বাবাকে খবর দাও।

জয়া—আর পাঁচ মিনিট দেখে নাও।

কেদারবাবুও ওখান থেকে বার বার এদিকে তাকিয়ে দেখেছেন, আর একটু আশ্চর্যও হয়েছেন। ওরা তো সবসুদ্ধ চারজন ছিল, কিন্তু একজন কোথায় গেল ? শুধু তিনজন চুপটি করে, যেন তিনটে নির্জীব মূর্তি হয়ে বসে আছে। এত গান গাইছিল, এত হুটোপাটি করছিল যারা, তারা এত স্তব্ধ হয়ে গেল কেন ? আর, ওদের মধ্যে একজন গেলই বা কোথায় ? শখ করে ধারার কাছে গিয়ে জলে নামেনি তো ?

—শুনছ ? শ্যামার , মা-কে যেন একটু উদ্বিগ্ন স্বরে ডাক দিয়ে কথা বলেন কেদারবাবু—মেয়েগুলোর মধ্যে একজন গেল কোথায় ?

শ্যামা আর রমা, ব্যস্তভাবে একবার ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে একসঙ্গে বলে—নীহারদি প্রেজেন্ট ; রেবাদি, হ্যাঁ রেবাদি প্রেজেন্ট ; জয়াদিও প্রেজেন্ট...কিন্তু শুধু শীলাদিই অ্যাবসেন্ট, বাবা।

—সেরেছে ! বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করেন কেদারবাবু ।

কিন্তু পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকালে আরও উদ্বিগ্ন হতে হয়। বেলা পড়ে গিয়েছে। এদিকে-ওদিকে যত দৃশ্য আর অদৃশ্য পিকনিকের আসরের অন্তরাত্মা উঠি-উঠি করছে। উনুনের ধোঁয়া আর কোথাও দেখা যায় না। কোনও সন্দেহ নেই, পাঁঠা সঙ্গে নিয়ে যে পার্টিটা এসেছিল, এতক্ষণে তারা মাংসের ডেকচি মাজতে শুরু করেছে। গ্রামাফোন বাজছিল যেদিকে, সেদিকে এখন শুধু একটা হল্লা শোনা যায় ; বোধহয় তাসের শেষ জুয়ার উল্লাস হইহই করে উঠেছে। আর ওই উঁচুতে শঙ্করবাবুদের সেই তাঁবুটাও আর দেখা যায় না। এতক্ষণে বোধহয় তাঁবু গোটানো হয়ে গিয়েছে।

কেদারবাবুও উঠবেন। কিন্তু ওঠবার আগে, পিকনিকের শেষ অধ্যায়ে জিলিপি দিয়ে এক বাটি চা খাওয়া তাঁর অভ্যাস। এটা দশ বছরের ঐতিহ্য। সুতরাং, শুধু এক কেদারবাবুর পিকনিকের আসর থেকে উনুনের ধোঁয়া এখনও উঠছে, জল ফুটছে।

—ওকী ? ওকী ? ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন কেদারবাবু।—ওরা তিনজন যে এদিকে ছুটে আসছে।

নীহার, রেবা আর জয়া, ঝোলাঝুলি আর টিফিন কেরিয়ার হাতে তুলে নিয়ে তিনজনেই আতঙ্কিতের মত ব্যস্তভাবে হেঁটে হেঁটে, আর একেবারে কেদারবাবুর কাছে এসে হাঁপাতে থাকে।

শ্যামার মা—তোমরা চললে বুঝি ?

নীহার—না। একজনকে খুঁজে পাচ্ছি না।

চমকে ওঠেন শ্যামার মা।—খুঁজে পাচ্ছি না ? তার মানে ? কোথায় গিয়েছিলে তোমরা ?

কেদারবাবু—চান টান করতে এদিকে-ওদিকে গিয়েছিলেন নাকি আপনারা ?

রেবা—না। আমরা চান-টান করিনি ; তবে এদিকে-ওদিকে বেড়িয়েছি।

কেদারবাবু—তাতেই আপনাদের একজন সঙ্গিনী হারিয়ে গেল ?

জয়া—না, ঠিক হারায়নি। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে...

—ভদ্রলোক ? চোখ বড় করে চেঁচিয়ে ওঠেন কেদারবাবু—কোথায় দেখলেন ভদ্রলোক ? কেমন ভদ্রলোক ?

নীহার—ওদিকে একটা জলের দহের কাছে বসে এক ভদ্রলোক ছবি আঁকছিলেন। শীলাদিও সেখানে বসে...

কেদারবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—শীলাদিও বুঝি সেখানে ছবি আঁকতে বসে গেলেন।

জয়া—না। ভদ্রলোক রাঁধতে জানেন না ; শীলাদি তাই রান্না দেখিয়ে দেবার জন্য..

—হুঁ। কেদারবাবুর গলার স্বর গরগর করে ওঠে।—এই জন্যে, হুড্রু ঝর্না দেখবার ছুতো করে কলকাতা থেকে আসা হয়েছে।

শ্যামার মা পাল্টা চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করেন।—ছিঃ, মানুষের একটা বিপদের কথা শুনে এভাবে গালমন্দ করতে পারে, সে কি মানুষ ?

কেদারবাবু—আমি বলেছিলাম কিনা ? এঁদের একটু সাবধান করে দেবার জন্য আমি তোমাকে বলেছিলাম কিনা ?

—বলেছিলে তো। আর, আমিও ওদের বলেছি। তাতে কী হল ? এখন মেয়েটা গেল কোথায়, সেটা ভাববে ? না, তোমার যত জেদের কথা তুলে তর্ক করবে ?

নীহারের মুখের দিকে তাকিয়ে কেদারবাবু এবার যেন একটু সহানুভূতির স্বরে কথা বলেন—একটা কথা। ভদ্রলোক কী ভাষায় কথা বলছিলেন ?

নীহার—বাংলা।

কেদারবাবু—পোশাক ?

জয়া—ট্রাউজার আর শার্ট, গলায় একটা রঙিন টাই।

কেদারবাবু—বয়স ?

রেবা—বয়স, এই ধরুন, কতই বা হবে...মোট কথা...।

কেদারবাবু—আপনাদের শীলাদির সঙ্গে মানায় ; এই রকম বয়স বটে কিনা ?

—ছি, ছি, তুমি কি ভদ্রলোক ? রুষ্টস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন শ্যামার মা।

কেদারবাবু—চুপ করো। আমাকে ফ্যাক্ট জানতে দাও।...হ্যাঁ, ভদ্রলোক যাকে বলছেন আপনারা, তার গায়ের রঙ কীরকম ?

রেবা—ফর্সা বলতে পারেন।

কেদারবাবু—আমি আবার কী বলব ? আপনারা বলুন।...আচ্ছা, যাকে ভদ্রলোক বলছেন আপনারা, তার ভুরু দুটো খুব ঘন আর কালো ?

নীহার—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্যামার মা—কেন ? এর মানে কী ?

কেদারবাবু—বুঝতে পারা গেল, ছায়া-ছায়া কেউ নয় ; একজন ফর্সা ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়েছেন এঁদের শীলাদি। এবং, সেজন্যেই ভরসা হচ্ছে, এঁদের শীলাদিকে পাওয়া যাবে।

শ্যামার মা—তোমার পায়ে পড়ি, বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে মেয়েটাকে আগে খুঁজে বের করো।

কেদারবাবু—তুমি বাজে উদ্বেগ ছেড়ে দাও।

নীহার, জয়া আর রেবার দিকে তাকিয়ে কেদারবাবু বলেন—আপনারাও বাজে ভয় ছেড়ে দিন।

রেবা বিষণ্ণভাবে বলে—আপনি আমাদের অবস্থাটা একটু ভেবে দেখুন, যদি কোনও বিপদ-আপদ হয়ে থাকে.. ।

কেদারবাবু—বিপদ হয়ে থাকলে হয়ে গেছে, তবে শীলাদিকে পাবেন।

—ছিঃ, আবার ভ্রূকুটি করে কেদারবাবুর দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন শ্যামার মা।

খাড়াইটার দিকে তাকিয়ে আবার ব্যস্তভাবে কথা বলেন কেদারবাবু—ওঁরাও দেখছি, কেমন-যেন বেশ চঞ্চল হয়ে নেমে আসছেন।

হ্যাঁ, নেমে আসছেন শঙ্কর আর কুমুদ ; অরুণা আর বরুণা ; ছোট তাঁবুটাকে গুটিয়ে-পাকিয়ে একটা প্রকাণ্ড পোঁটলার মত করে ঘাড়ে বয়ে নিয়ে একটা ওরাওঁ কুলি, আর সেই সঙ্গে খানসামাও পিছু পিছু আসছে। শঙ্করবাবুর হাতে সেই বাইনাকুলার এখন নেই, কুমুদবাবুর হাতে সেই রাইফেলও নেই। অরুণা আর বরুণা, দুই মহিলার চোখেও একটা করুণ আতঙ্কের ছায়া ছমছম করছে।

শঙ্করবাবু হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে ওঠেন—দুঃসংবাদ, একটা বিশ্রী দুঃসংবাদ কেদারবাবু।

শ্যামার মা চমকে ওঠেন ; আর নীহার, রেবা ও জয়া শ্যামার মা-র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চমকে উঠতে থাকে।

—কী ব্যাপার ? কেদারবাবু ব্যস্তভাবে মাথায় কম্ফর্টার জড়াতে থাকেন।

শঙ্করবাবু—এখুনি একবার পুলিস ফাঁড়িতে খবর দিতে হয়। সার্চ করবার একটা ব্যবস্থা যাতে তাড়াতাড়ি হয়।

কেদারবাবু—সার্চ ?

শঙ্কর—হ্যাঁ। এক মহিলা সুইসাইড করেছেন। জীবন্ত উদ্ধার করা আর সম্ভব হবে না মনে হয় ; তবে, যাতে অন্তত ডেড বডিটা পাওয়া যায়—।

কেদারবাবু—সুইসাইড করেছে মানে ? প্রপাতের জলে লাফিয়ে পড়ে সুইসাইড করেছে ?

শঙ্কর—হ্যাঁ।

কেদারবাবু—তবে..তবে তো এখন ভগবানই বলতে পারবেন...ছি ছি, কি বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেল !

শঙ্কর—খুবই বিশ্রী। খুবই দুঃখের।

কেদারবাবু—আমি তো জানি মশাই ; এই দশ বছর ধরে দেখে আসছি ; হুড়রুর সেই ছায়া-ছায়া চেহারার ভয়ানক ক্ষুধাটা প্রতি বছর একটি করে প্রাণ আদায় করে ছাড়বেই।

শঙ্করবাবু— ওসব কুসংস্কারের কথা ছেড়ে দিন. এখন চলুন সবাই মিলে যদি পুলিসকে বলে-কয়ে একটু ব্যবস্থা করতে পারি।

—আগে এদের একটু শান্ত করো। এরা যে গেল ! শ্যামার মা'র আতঙ্কটা যেন আর্তনাদ করে

উঠেছে।

—কী হল ? বিচলিত স্বরে প্রশ্ন করেন কেদারবাবু ; আর, তখুনি দেখতে পেয়েই চমকে ওঠেন, নীহার, রেবা আর জয়া তিনজনেই মাথা হেঁট করে ফোঁপাতে শুরু করেছে।

—তাই তো ! কেদারবাবুর কঠোর পরিহাসের বুকটাও যেন এইবার ভয় পেয়ে করুণ হয়ে যায়। তাঁর কথার মধ্যে একটা আতঙ্কের সুর বেজে উঠেছে।

নীহার, জয়া আর রেবার দিকে তাকিয়ে কেদারবাবু বলেন— না না, আপনারা মিথ্যে দুশ্চিন্তা করছেন কেন ? সুইসাইডের মহিলা যে আপনাদেরই সেই বান্ধবী, এতটা বাড়িয়ে ভাবছেন কেন ?

শঙ্করবাবু বলেন—কী ব্যাপার কেদারবাবু ? এঁদের কোনও বান্ধবী কি...

কেদারবাবু— এঁদের এক বান্ধবীর অবশ্য এখনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ; তবে মনে হয়...

শঙ্কর— এঁদের বান্ধবীর চেহারাটা কেমন ? কালো ?

নীহার— হ্যাঁ।

শঙ্করবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কুমুদ, শোনো তো এঁরা কী বলছেন। তুমিও বলো তো, কী দেখেছ ?

কুমুদ বলে— আমি অনেক চেষ্টা করলাম, তবু মহিলাকে বাঁচাতে পারলাম না। আমি দৌড় দিয়ে এগিয়ে যেয়ে জায়গাটার কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই মহিলা জলে ঝাঁপ দিলেন। আমি অবশ্য জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া আর সব চেষ্টা করেছি, একঘণ্টা ধরে ছুটেছি, দৌড়েছি, খুঁজেছি, যদি ধারার কিনারায় কোনও পাথরে আটকে গিয়ে, কিংবা ছিটকে গিয়ে কোথাও পড়ে থাকে বডিটা ; কিন্তু কোনও ট্রেসই পেলাম না।

বরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে কুমুদের গল্পটা যেন আরও গভীর আক্ষেপে করুণ হয়ে ওঠে। —তোমাকে তো আমি তখনই আমার সন্দেহের কথাটা বলেছিলাম বরুণা। তুমি বোধহয় তখন আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারনি। মহিলাকে দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল, যেন একটা রহস্য বলে মনে হয়েছিল।

কেদারবাবু— আপনিও কি মহিলাকে দেখেছিলেন ?

বরুণা— হ্যাঁ। তবে মহিলার মনে যে ওরকম কোনও সাংঘাতিক উদ্দেশ্য আছে, সেটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু, উনি সেই মুহূর্তেই বুঝে ফেলেছিলেন ; আর আমার কোনও আপত্তি না শুনে তখনই রাইফেল হাতে নিয়ে ছুটেছিলেন।

কুমুদ— মহিলা যদি অন্য কোনও বিপদে পড়তেন, কোনও ডাকাতের বা বদমাসের হাতে, কিংবা কোনও সাংঘাতিক বাঘ-ভালুকের মুখে, তবে অবশ্য আমি আমার রাইফেলের কাজ একবার দেখিয়ে দিতে পারতাম। মহিলার কোনও বিপদই ঘটতে দিতাম না। কিন্তু এটা তো নিছক আত্মহত্যা, আমি বাধা দেবার সময়ই পেলাম না।

পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ বের করে আর অদ্ভুত রকমের বেদনার্ত ও বিষণ্ণ স্বরে কথা বলতে থাকে কুমুদ। —মনে হয়, মহিলার জীবনেই কোনও রহস্যের ব্যাপার আছে।

—ওটা কী ? কিসেব লেখা ? কুমুদের কাছে এগিয়ে গিয়ে লেখাটার ওপর ঝুঁকে পড়েন কেদারবাবু।

কুমুদ— হঠাৎ চোখে পড়ল, এক জায়গায় পাথর-চাপা দেওয়া এই লেখাটা পড়ে আছে। মহিলা লিখে রেখে গেছেন যে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন ; এবং তাঁর মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী।

লেখাটা হাতে নিয়ে নীহারের কাছে এসে কেদারবাবু ভয়ে-ভয়ে বলেন— এ লেখা নিশ্চয়ই আপনাদের বান্ধবীর হাতের লেখা নয়।

চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে নীহার— এ তো শীলাদির হাতের লেখা।

রেবা আর জয়া শ্যামার মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে— এ কী সর্বনাশ হল, মাসিমা।

বরুণার চোখ দুটো ছলছল ক'রে নীহার, রেবা আর জয়ার সেই আর্তনাদ-মুখর ও করুণ তিনটে উতলা মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে। আর, শোকার্তের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কুমুদ। শঙ্করবাবু হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকেন। শ্যামা আর রমাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

অরুণাও রুমাল তুলে চোখ মুছে নিয়ে আর শঙ্করের দিকে তাকিয়ে যেন একটা করুণ আক্ষেপ

চাপতে চেষ্টা করে— কুমুদ যদি আর আধ মিনিট সময়ও পেত, তা হলে একটা মানুষের প্রাণ বোধহয় এভাবে নষ্ট হতে পারত না।

কুমুদের বুকের ভেতর থেকে যেন একটা উদ্ধত আক্ষেপ ফুলে ফুলে ঠেলে উঠতে থাকে। —নাঃ, দুর্ভাগ্য ; আধ মিনিটও সময় পেলাম না। জঙ্গলের বাঘও ওভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে পারবে না, আমি যে ভাবে ছুটেছি। কিন্তু বৃথা, মহিলাকে ধরে ফেলতে পারলাম না।

কেদারবাবু বলেন— আপনাদের সবারই কাছে আমার একটা অনুরোধ ; আপনারা সবাই আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে এখানে অপেক্ষা করুন। একটু ভাবুন। তারপর যা হয় একটা কিছু করতেই হবে। পুলিসে যদি খবর দেওয়াই ঠিক হয়, তবে দিতেই হবে।

শঙ্করবাবু বলেন— বেশ তো, একটু ভেবে দেখাই যাক।

শীলার দু'চোখের হাসিটা তবু জ্বলজ্বল করে। যেন ভাগ্যের একটা সুবিচারের বিস্ময়কে দেখতে পেয়েছে শীলা। উঃ, জীবনের এত চমৎকার একটা সত্য না জেনে মরে গেলে কত বড় ভুল করা হত। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ, খুশি হয়ে মরবার কী সুন্দর সুযোগ এনে দিয়েছে, এই অদৃষ্ট। কুমুদ যদি সত্যিই আজ বুকভরা ভালবাসার উপহার নিয়ে দেখা দিত, শীলার জন্য কাঁদত, তবে বোধহয় এ জগতের সব আলো-ছায়া ঘেন্না পেয়ে কালো হয়ে যেত। বঞ্চনা যদি বঞ্চিত না হয়, তবে পৃথিবীটা বেঁচে থাকবে কী করে ? শীলাকে যদি ভালবাসত কুমুদ, তবে বুঝতে হত, ভগবান নেই।

কুমুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যে সুন্দরী মহিলা, তার মুখটা মনে পড়লে করুণা হয়। বেচারা বুঝতে পারছে না, শীলার অদৃষ্টের কত বড় একটা অভিশাপকে ভুল করে নিজের প্রাণের উপর চাপিয়ে দিতে চলেছেন ওই মহিলা। না...ভাবতে বোধহয় ভুল হচ্ছে। শীলার অভিশাপ সে মহিলার জীবনেও অভিশাপ হবে কেন ? সে মহিলা তো একটা নিরীহ মানুষের আশাকে চুপে চুপে বিষ খাইয়ে অন্য কারও কাছে আপন হবার জন্য চার বছর ধরে চেষ্টা করেনি। মহিলার ভাগ্য হেসে উঠুক। একটা গল্পে পড়েছিল শীলা, কোনও এক পিশাচি স্বভাবের মেয়ে বাসরঘরে ঘুমন্ত স্বামীর মুখে বিষ পুরে দিয়েই পালিয়ে গিয়ে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে ছুটে গিয়ে তার এক চেনা মানুষের হাত ধরেছিল। শীলা নামে যে নারী এখানে শালের ছায়ার কাছে এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, সে নারীই বা কী কম পিশাচি ?

কিন্তু পিশাচির ভালবাসা ভাঙিয়ে, পিশাচির দানের টাকা-পয়সায় এম-এ পড়ে আর ভাত খেয়ে যে লোকটা আজ এক সুন্দরী মানবীর ভালবাসা পাওয়ার সৌভাগ্য তৈরি করে নিতে পেরেছে, সে লোকটা খুব ভুল একটা ধারণা নিয়ে চলে যেত, যদি সত্য কথাটা অত স্পষ্ট করে না বলে দিত শীলা। মনে করেছিল কুমুদ, কুমুদের উপেক্ষার দুঃখ সহ্য করতে না পেরে শীলা আজ আত্মহত্যা করবে। কী-ভয়ানক একটা মিথ্যেকে সত্য বলে মনে করে চলে যেত ওই ভয়ংকর বুদ্ধিমান আত্মাটা। আরও স্পষ্ট করে বলে দিলেই ভাল ছিল, তোমার মত একটা চমৎকার বুদ্ধিমানের জন্য নয়, চমৎকার এক পাগলের জন্যই আজ শীলাকে মরে যেতে হবে। আবোল-তাবোল কথা বলে, ছবি আঁকে, চালে-ডালে মিশিয়ে খিচুড়ি রাঁধতেও জানে না, এক সাহেবের বাগানে মালীর কাজ করে জীবনটাকে ব্যস্ত করে রেখেছে যে, তার চোখের কাছে ধরা দেবার লজ্জা আর বিভীষিকা থেকে চিরকালের মত পালিয়ে যেতে চায় শীলা।

ঠিকই তো, পালিয়ে যেতে হত না, যদি সে পাগল আজ তুলি হাতে না নিয়ে সত্যিই ছুরি হাতে নিয়ে শীলার কাছে এগিয়ে আসত।

শীলার চোখের জ্বলজ্বলে হাসির ছবিটা যেন দুঃসহ একটা আর্তনাদ চাপতে গিয়ে ডুকরে ওঠে। দু'চোখ থেকে যেন ফুটন্ত জলের ধারা উথলে উঠে শীলার কালো মুখটাকে ভাসিয়ে দিয়ে ছাপিয়ে পড়তে থাকে। উঃ, তাই যে-সব চেয়ে ভাল ছিল, যদি তাই হত। অবনীশ আজ যদি ছুরি চালিয়ে শীলার বঞ্চনাভরা ফুসফুসটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিত, তবে বোধহয় হেসে উঠতে পারত শীলা। খুশি হয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে, একটা পরম মুক্তি আর সম্মানের আনন্দে অবনীশের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে মরে যেতে পারত। কিন্তু...অবনীশ যে শীলার এই কুৎসিত মুখের মধ্যে চমৎকার সুন্দরতা দেখতে

পেয়েছে। শীলার এই শরীরের ছাঁদের মধ্যে সুন্দর মমতার ছন্দ দেখতে পেয়েছে। যার ভালবাসা আর আশাকে বিষ খাইয়েছে শীলা, সে মানুষ আজ শীলার মুখের ছবি এঁকে ধন্য হতে চেয়েছে। ভাগ্যের কী চমৎকার বিদ্রূপ !

হুড়রুর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পাথরে-পাথরে মাথা-ছেঁচা হয়ে, ভেসে গড়িয়ে আর আছড়ে আছড়ে শীলার এই চেহারাটা একটা লাস হয়ে কোথায় কত দূরে গিয়ে কোন পাথরে কিংবা গহ্বরে গিয়ে ঠেকে থাকবে, কে জানে। কিন্তু সে লাসের পরিচয় জানতে পুলিসের দেরি হবে না। জানতে পারবে অবনীশও। আরও জানবে, এই কুৎসিত লাসটাই হল চন্দননগরের পরেশবাবুর ভাইঝির লাস। অবনীশের জীবনের স্বপ্নকে অপমান করে এতদিন ধরে এই পৃথিবীরই এক কোণে লুকিয়েছিল আর বেঁচেছিল। বড় ভাল হয়, অবনীশ যদি শীলার সেই মরা মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে, আর খুশি হয়ে চলে যায়।

কী আশ্চর্য, জীবনে যাকে চোখে দেখেনি, অবনীশ, তাকেই নাম ধরে ডাক দিয়েছে। অবনীশের আশার শীলা তো একটা ঢলঢলে সুন্দর মুখ। কিন্তু এই কুৎসিত মুখটাকে তবু শীলা বলে সন্দেহ করে ফেলতে পেরেছে অবনীশ। কী-ভয়ানক চোখ ! কিন্তু মানুষটার চোখ দুটোরই বা কী-ভয়ানক দুর্ভাগ্য। শীলার এই মুখটাকে অবঞ্চনার ছবি বলে মনে হয়েছে। মানুষটার আশার স্বপ্ন বিনা-দোষে ছিন্নভিন্ন হয়ে মানুষটাকে পাগল করে দিয়েছে। নইলে ওর চোখ দুটো এত বড় ভুল করবে কেন ?

হাতের কাছে কাগজ নেই, কলম নেই। নইলে আজ এখনি ছোট্ট একটি স্বীকৃতি লিখে রেখে, আর সেই স্বীকৃতির লেখাটাকে বুকে চেপে আর চুমো খেয়ে এই প্রপাতের জলে ঝাঁপ দিতে পারত শীলা— ক্ষমা করো না অবনীশ ; কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে আজ মনে-প্রাণে ভালবেসে ফেলেছি বলেই আমি মরে গেলাম।

না, কী দরকার ? শীলার মরণের সঙ্গে ও মানুষটার নামটাকে জড়িয়ে দিয়ে যাবার কোনও অধিকার শীলার নেই। কোনও লাভ হবে না। শীলার পচা লাস মর্গে পাঠিয়ে দিয়ে পুলিস শুধু বারবার ওই মানুষটাকে প্রশ্ন করে করে হয়রান করবে, আপনাকে ভালবাসে যে মেয়ে, সে মেয়ে আত্মহত্যা করে কেন ? পুলিসের প্রশ্নটা যে নিরীহ মানুষটাকে ভয়ানক অপমান করবে। মুখে কিছু না বলুক, অন্তত মনে মনে বলবে, কী ভয়ানক হিংস্র তুমি শীলা, বেঁচে থাকতে যাকে ভালবাসতে পারলে না আর এত অপমান করলে, মরে গিয়েও তার ক্ষতি করছ ?

দূরের শ্যাওলামাখা পাথরগুলির দিকে তাকিয়ে আর তারই আড়ালের এক মরণ-যমুনার উচ্ছল হর্ষের শব্দের দিকে কান পেতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শীলা। তারপরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। হাসতে থাকে শীলার চোখের তারা। যেন লগ্ন দেখা দিয়েছে ; যেন চাঁদ উঠেছে আকাশে ; আর, অভিসারিকার প্রাণে আর তর সইছে না। শক্ত করে খোঁপাটা বেঁধে নিয়ে, আর শাড়ির আঁচলটাকেও শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে তৈরি হয় শীলা।

এক পা এগিয়ে যেয়েই থমকে দাঁড়ায় শীলা। পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। কাঁটাটা তুলে নিয়ে আর ফেলে দিয়েই একটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে। নিয়তির এই লগ্নক্ষণে আর শুভযাত্রার পথে কোনও বাধার কাঁটাকে পায়ে বিঁধে থাকতে দেবে কেন শীলা ? আজ যে স্বচ্ছন্দে হেঁটে হেঁটে চলে যেতে হবে। বিকেলের রোদের লালচে আলো শালের ছায়ার এক ফাঁকে শীলার মুখের উপর পড়েছে। শালের মাথায় একটা কাক ছটফটিয়ে উঠেছে। এগিয়ে যায় শীলা।

—শীলা !

একটা আহ্বানের স্বর। যেন বনভূমির বুকটাকেই শিউরে দিয়ে ছোট্ট একটা আহ্বানের ভাষা শিউরে উঠেছে। ছটফট করে উড়ে পালিয়ে গেল শালের মাথার কাকটা।

কে ডেকেছে ? অবনীশ ? কিংবা একটা অপার্থিব ছায়া-ছায়া সত্তা শীলাকে এই মরণযাত্রার লগ্নমুহূর্তে ডেকে ফেলেছে ?

ডাক শুনে একবার চমকে ওঠে শীলা, কিন্তু তারপর আর নয়। মুখ ফিরিয়ে তাকায় শীলা। আর অপলক চোখ তুলে যেন একটা বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এ কেমন আর্টিস্ট ? কোথায় গেল সেই আবোল-তাবোল কথার মানুষটা আর স্নিগ্ধ চেহারাটা ?

কামিজের আস্তিন গোটানো, হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা একটা প্রকাণ্ড ছুরি, আর চোয়াল দুটো যেন বজ্র-পাথরের তৈরি। দুটো শক্ত চোয়াল আস্তে আস্তে কাঁপছে ; দু'চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি ঝরছে। অবনীশ ডাকে— চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো শীলা।

চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল শীলা। কিন্তু শান্ত চোখ দুটো এইবার আবার হাসতে শুরু করে। যেন, একটা বাঞ্ছিত আনন্দের ছবিকে দেখতে পেয়েছে শীলার চোখ। অবনীশের তুলির সামনেও বোধহয় এমন সুন্দর ভঙ্গি ধরে দাঁড়াতে পারত না শীলা। তুলি দিয়ে কি-ছাই কিসের রূপ আঁকবে অবনীশ ? তার চেয়ে এই ছুরি অনেক ভাল। শীলার বঞ্চনাভরা হৃৎপিণ্ডটার সব রক্তের রঙ এখুনি দেখে ফেলতে পারবে। দেখুক অবনীশ।

অবনীশ বলে— লোকটা খুব বেঁচে গেল শীলা।

কিছু বুঝতে পারে না বলেই বোধহয় শীলার চোখের তারা দুটো তেমনই নিশ্চল হয়ে ভেসে থাকে।

অবনীশ বলে— তোমাকে খুন করতে পারত না লোকটা, বরং নিজেই খুন হত। আমি যে এখানেই লোকটার ঠিক পেছনে, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম।

মাথাটা দুলিয়ে কপালের উপর ছড়িয়ে পড়া একগুচ্ছ চুল হাতের এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে অবনীশ বলে— কিন্তু তুমি লোকটাকে ওসব বাজে কথা কেন লিখে দিলে ? ওর সুবিধার জন্য তুমি মরবে, বাঃ, তোমার মাথা যে আমার মাথার চেয়েও খারাপ হয়েছে, দেখছি।

ছুরিটাকে একপাশে ঘাসের উপর ফেলে দিয়ে ঘাসেরই উপর লুটিয়ে বসে পড়ে অবনীশ ; আর যেন অদ্ভুত এক খুশির পাগলের মত বিড়বিড় করে কথা বলে— আঃ, এমন করেও মানুষের স্বপ্ন সত্যি হয় ! আমি যে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, শীলা।

শীলার চোখের তারা দুটোর বোধহয় আর কেঁপে কেঁপে শিউরে ওঠবারও শক্তি নেই। দু'চোখ বন্ধ করে, আর, যেন একটা স্তব্ধ পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শীলা।

অবনীশ বলে— বসো শীলা। আর এখন কিসের ভয় ? আমাদের সৌভাগ্যের ব্যাপারটা একবার চিন্তা করে দেখো শীলা, কী অদ্ভুত। তোমাকে যে হঠাৎ এভাবে আর এত স্পষ্ট করে পেয়ে যাব...

শীলা দু'হাত তুলে চোখ দুটোকে চেপে ধরে। অবনীশ ব্যস্তভাবে বলে— ওকী ? ওকী ? ছি ছি ; যখন সব সমস্যা মিটে গিয়েছে, তখন আবার কান্না কিসের ? আমিও তো ওরকম করে অনেক কেঁদেছি...কিন্তু সেসব তো পুরনো ব্যাপার ; সব ঝঞ্ঝাট চুকে গিয়েছে।

হঠাৎ যেন ডানাভাঙা পাখির মত ছটফটিয়ে বসে পড়ে শীলা, তারপরেই ঘাসের উপর মাথা উপুড় করে দিয়ে লুটিয়ে পড়ে।

অবনীশ বলে— তুমি ওরকম করো না শীলা ; খুব অন্যায় করা হবে। আমি যখন কোনও বাজে কথা ভাবছি না, তুমিই বা তখন কেন যত আজে-বাজে কথা ভাববে ?

শীলা— আপনি আমাকে বাধা দেবেন না।

—কিসের বাধা ?

—আমাকে যেতে দিন।

—কোথায় ? তোমার বান্ধবীদের কাছে ?

উত্তর দেয় না শীলা। আস্তে আস্তে মুখ তুলে অবনীশের সেই মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে, যে মুখটা এখনও অবাধে আবোল-তাবোল কথা বলে চলেছে।

অবনীশ বলে— সত্যি কথা কী জান ? যদি দেখতাম, লোকটা তোমাকে ভালবাসার কথা বলছে, তবে, বিশ্বাস করো শীলা, আমি চুপচাপ চলে যেতাম। তুমি আমাকে দেখতেই পেতে না।

শীলা—এখন তো যেতে পারেন।

—বাঃ, এখন কেন যাব ? এখন আর বাধা কোথায় ? ও ভদ্রলোক তোমাকে ভালবাসে না ; আর, তুমিও ও ভদ্রলোককে ভালবাস না।

—কে বললে ?

—কে আর বলবে ? তোমার কথা শুনেই বুঝলাম।

—কী বুঝলেন ?

—বুঝতে কোনও অসুবিধে নেই। তুমি ভদ্রলোককে ভালবেসেছিলে, ভদ্রলোকও তোমাকে ভালবাসার ভাব দেখিয়েছিল ; কিন্তু এখন অন্য একজনকে ভালবেসেছে, এই তো ব্যাপার।

—কিন্তু তার আগে যেসব ব্যাপার হয়েছে, সেসব কিছু কি বুঝছেন ?

—কী ব্যাপার ?

—আপনি যে টাকা পাঠাতেন, সেই টাকাতে শুধু যে আমি লেখাপড়া শিখেছি, তা নয়, ওই ভদ্রলোককেও...

—তার মানে ?

—তার মানে আমি ভদ্রলোককে যে টাকা দিতাম, সে টাকা আপনারই টাকা।

—তুমি একটা কাণ্ডই করেছিলে শীলা। যাক, এরকম হয়েই থাকে। সে জন্য কিছু মনে করো না।

—আমি না হয় কিছু মনে করছি না। কিন্তু আপনি মনে করতে ছেড়ে দিচ্ছেন কেন ?

—আমি আবার কী মনে করব ? আমি আশা করে তোমাকে টাকা দিতাম, তুমি আবার নিজের জন্য একটা আশা করে আর একজনকে টাকা দিতে। এর মধ্যে আমার তো বলবার কিছু নেই।

—কিন্তু আপনার আশা যে মিথ্যে হল।

—মিথ্যে ? কেন ? তুমি কি আজও আমাকে ভালবাসতে পারবে না ? না হয় আমার মাথাটা একটু খারাপই হয়েছে।

দু'হাতে অবনীশের মাথাটা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে শীলা।

—আমাকে তুমি ক্ষমা করো না, অবনীশ। কখ্খনও না, কিছুতেই না। এক ফোঁটা বিশ্বাস করো না।

অবনীশ হাসে— এভাবে মাথা জড়িয়ে ধরে আর আরও পাগল করে দিলে শেষে আমি কিন্তু ক্ষমা-টমা চেয়েই ফেলব শীলা।

অবনীশের কপালে আস্তে আস্তে হাত বোলায় শীলা— আমার মত একটা বাজে মেয়ের কাছ থেকে বঞ্চনা পেয়ে তুমি কেন এত ভাবলে, কষ্ট পেলে, আর...

অবনীশ হাসে— আর পাগল হয়ে গেলে ! এই তো ?...না শীলা, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার মনে হচ্ছে, আমি এখন... ।

শীলা—কী ?

অবনীশ—সত্যিই মনে হচ্ছে...আমার আর কোনও দুঃখ থাকবে না।

শীলা— নিশ্চয় থাকবে না ; আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তোমার আর কোনও দুঃখ থাকবে না।

অবনীশ— তা হলে এবার স্বীকার করো, আমার চোখ খাঁটি আর্টিস্টের চোখ। তোমাকে যে একটা মমতা, একটা অবঞ্চনা বলে আমার মনে হয়েছিল, সেটা তো প্রমাণিত হয়ে গেল।

শীলা—একটা কথার উত্তর দেবে ?

—বলো।

—তোমার তো বিশ্বাস ছিল, আমি দেখতে খুব সুন্দর।

—ছিল কেন ? এখনও আছে।

—না না, ঠিক করে কথা বলো।

কয়েক মুহূর্ত কী-যেন ভাবে অবনীশ। তারপরেই যেন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে হাসতে থাকে। —জার্মানির প্রিজন্ ক্যাম্পে একদিন অনেক রাতে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কারণ, স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেলাম, চন্দননগরের শীলার মুখটা ঢলঢলে সুন্দর নয়, হতেই পারে না। নিশ্চয় দেখতে অন্যরকমের ; তাই লজ্জা পেয়ে কিংবা ভয় পেয়ে আমাকে চিঠি দেয় না। কিন্তু শীলার মুখটা তবে কিরকম ? এই কথা ভাবতে ভাবতে...

হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়ে আবার কি-যেন ভাবতে থাকে অবনীশ। শীলা বলে— কী ভাবছ ?

অবনীশ— তখন কী ভেবেছিলাম, সেটা এখন ঠিক ভাবতে পারছি না। যাই হোক, দেশে ফিরে

আসবার পর অনেক খোঁজ করেও তোমাকে যখন পেলাম না, তখন মনে হল, শীলা বোধহয় নেই, কিংবা থেকেও নেই। কিন্তু অনেক ভেবে ভেবেও কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না, ও মেয়ের মুখটা দেখতে কেমন ? তখন কোথাও কোনও সুন্দর মুখ দেখতে সত্যিই ভয় করত শীলা। —কিন্তু আজ এই প্রথম তোমাকে দেখতে পেয়ে এই মনে হয়েছিল, এই মুখ হল সেই মুখ, যে মুখ দেখলে ভয় করে না। আর, তোমার এই শরীর হল সেই মায়ার ছাঁদে গড়া শরীর, যে শরীরের সঙ্গে শাড়ি-টাড়ি জামা-টামাকে একটা আবর্জনার ভার বলে মনে হয়। মার্তিনিয়ে বলত, মুখের রূপ তবু ছলনা করতে পারে অবনীশ, কিন্তু শরীরের রূপ কখনও না। তোমার শরীরটা যে সত্যিই...যাকে বলে...একটা কান্তিধারা, এই হুড্রুর ধারার চেয়েও চমৎকার আনন্দের...।

হাত তুলে অবনীশের মুখটা আস্তে চেপে দিয়ে আর মাথা হেঁট করে ফুঁপিয়ে ওঠে শীলা—চুপ। আমি তোমার ছবি নই অবনীশ।

—কেন ?

—আমি তোমার সব।

—অ্যাঁ ?

—আমি যে তোমার স্ত্রী।

স্তব্ধ হয়ে, অনেকক্ষণ ধরে, আর চোখের তারা দুটোকে অপলক করে শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অবনীশ। যেন বারুদের ধোঁয়ার একটা আবরণ ভেদ করে কাউকে দেখবার চেষ্টা করছে একটা আহত সোল্‌জারের ঘরকুনো আত্মার আশা।

শীলা বলে— ভুলে যাচ্ছ কেন, তুমি আমাকে কেন টাকা পাঠাতে ?

বিড়বিড় করে কথা বলে অবনীশ—কেন ?

শীলা—তুমি দেশে ফিরে এলেই যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, কথাটা কি মনে নেই ?

অবনীশের বুকের ভিতরে একটা এলোমেলো নিঃশ্বাস যেন ছটফটিয়ে ছুটোছুটি করছে। কপালটাকে এক হাতে টিপে ধরে অবনীশ। যেন মাথার ভিতরে একটা বদ্ধ বাষ্পের গুমোট চুরমার হয়ে যাচ্ছে। —শীলা ! অদ্ভুতভাবে ডাক দিয়ে শীলার একটা হাত চেপে ধরে অবনীশ।

শীলা—বলো ?

অবনীশ— আমার সেই চাকরিটা তো আর নেই। যুদ্ধ থেমে গিয়েছে।

শীলা-– তাতে কী হয়েছে ? আমি আছি।

অবনীশ—তা হলে আমি এখন কোথায় যাব ?

শীলা—আমার সঙ্গে যাবে।

অবনীশ উঠে দাঁড়ায়—চলো।

এতক্ষণের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলা উচিত ছিল। একটি মেয়ে আত্মহত্যা করবার জন্য প্রপাতের জলে ঝাঁপ দিয়েছে ; তার ভয়ানক ইচ্ছার কথাটা নিজেরই হাতে কাগজে লিখে রেখে গিয়েছে। সুতরাং, আর ভেবে দেখবার কিংবা বুঝে দেখবারই বা কী আছে ? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ঘটনার কথাটা পুলিশের কাছে জানিয়ে দেওয়াই উচিত।

কিন্তু কেদারবাবু যেন ইচ্ছা করে সব ব্যস্ততাকে এখানে এই পথের মাঝখানে থামিয়ে রেখেছেন। ভদ্রলোক সত্যিই যেন নিদারুণ একটা আলস্যের প্রাণী। গলায় কম্ফর্টার জড়াতে পাঁচ মিনিট সময় লাগে, গলার স্বরও অলস ; ব্যস্তভাবে একটা কথা বলতে পারেন না। ভদ্রলোকের মনের আতঙ্কটাও যেন হদ্দ কুঁড়ে। ছটফটিয়ে উঠতে পারে না।

এতক্ষণ ধরে কেদারবাবু শুধু বার তিনেক অলসভাবে আস্তে ঘাড়টা ফিরিয়ে আর চোখ তুলে কুমুদের মুখের দিকে তাকিয়েছেন। আর কুমুদও যেন অসহ একটা অস্বস্তিকে কোনওমতে সহ্য করবার জন্য বার তিনেক কেদারবাবুর মুখের দিকে রুক্ষ চোখ তুলে তাকিয়েছে।

কিন্তু আর বোধহয় এভাবে এখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয় কুমুদ। চেঁচিয়ে ওঠে কুমুদ —এখানে এই ভদ্রলোকের একটা বাজে কথার পরামর্শে আমাদের আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনও

মানে হয় না।

কেদারবাবু করুণভাবে তাকিয়ে কথা বলেন—তবে কী করলে বেশ ভাল মানে হবে স্যার ?

কুমুদ— আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি না। কাজেই আপনি অনর্থক আমাকে কোনও প্রশ্ন করবেন না।

কেদারবাবু—মিছিমিছি আমার ওপর আপনার এত বিরক্ত হওয়ার কোনও মানে হয় না স্যার।

কুমুদ—আমরা চললাম। চলুন শংকরদা।

কেদাববাবু—সেটা সম্ভব নয় ; কোনওমতেই সম্ভব নয়।

কুমুদ—কেন ?

কেদারবাবু— মেয়েটির আত্মহত্যার আপনিই একমাত্র সাক্ষি। আপনি একেবারে সচাক্ষুষ ঘটনাটাকে দেখেছেন। আপনি চলে গেলে চলবে কেন ? আপনাকে চলে যেতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবই বা হবে কেন ?

—কী বললেন ? চেঁচিয়ে ওঠে কুমুদ।

—আমার ওপর এত ক্রোধ প্রকাশ করলে আমার ওপর বড়ই অবিচার করা হয় স্যার। বিনীতভাবে আর অতি কোমল স্বরে যেন আবেদন করেন কেদারবাবু।

শংকরবাবু বলেন— আহা, এ ব্যাপার নিয়ে আমাদের কথা কাটাকাটির কোনও মানে হয় না। এখন আমাদের কাজ হল...।

কেদারবাবু— আমাদের কাজ হলো, আরও একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা।

—তাব মানে ? ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে কুমুদ।

কেদারবাবু— আপনার এত রাগ কববার কোনও মানে হয় না স্যার।

শংকরবাবু বলেন— থামুন থামুন। তুমি চুপ করো কুমুদ।

কেদারবাবু যেন একটু লজ্জিত হয়ে শংকরবাবুর মুখের দিকে তাকালেন— বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই চুপ করে একটু ভাবতে চেষ্টা করছি স্যার।

কী আশ্চর্য, রেবা, নীহার আর জয়াও চুপ করে কী যেন ভাবতে চেষ্টা করছে। তিন জনেই একসঙ্গে তিন জোড়া বিস্ময়ের চক্ষু তুলে কুমুদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপরেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন আলোচনা করে। মনে হয় ; ওদের তিন জনের মনের তিনটি অদ্ভুত বিস্ময় যেন কানাকানি করে কথা বলছে।

কেদারবাবু একবার হাই তোলেন ; তার পরেই রেবা জয়া আর নীহারের কাছে এসে এসে আনমনার মত পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপরেই যেন চমকে ওঠেন কেদারবাবু ; কেদারবাবুর মুখের প্রশ্নের ভাষাটাও রেবাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে। —কী ? কী ? কী যেন বলাবলি করছেন আপনারা।

জয়া বলে— কিছু না।

নীহার বলে—সামান্য একটা কথা, এমন কোনও অদ্ভুত কথা নয়।

রেবা বলে— একটা পুরনো কথা।

কেদারবাবু— কিন্তু এত ভয়ে ভয়ে আর এত আস্তে কথা বলছেন কেন আপনারা ?

রেবা— ঠিক বুঝতে পারছি না, তাই জোর করে বলতে পারছি না।

কেদারবাবু—কী ?

রেবা—ওই ভদ্রলোক, যাঁর হাতে বন্দুক রয়েছে...।

কেদারবাবু—কুমুদ যার নাম ?

রেবা—হতে পারে। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের শীলাদির চেনা-শোনা ছিল বলে মনে হচ্ছে।

কেদারবাবুর বুকের ভিতর থেকে যেন প্রচণ্ড একটা কৌতূহলের স্বর উথলে ওঠে। —কী বললেন ?

রেবা ফিসফিস করে যেন ভয়াতুর স্বরে কথা বলে। —তার মানে, শীলাদির সঙ্গে যে ভদ্রলোকের

চেনা-শোনা ছিল, সে ভদ্রলোককে দেখতে ঠিক এই ভদ্রলোকের মত।

কেদারবাবু— আপনাদের শীলাদির সেই ভদ্রলোকের নামও কি কুমুদ ?

জয়া—সেটা বলতে পারছি না। শীলাদি আমাদের কাছে বলেনি।

নীহার— আমরা শুধু একদিন আড়াল থেকে ভদ্রলোককে দেখেছিলাম।

কেদারবাবু খুব আস্তে কথা বলেন— যাক, যাক, যথেষ্ট। আমার পক্ষে এটুকু জানতে পারাই যথেষ্ট। মনে হচ্ছে, হেঁয়ালিটা যেন একটু পরিষ্কার হচ্ছে।

রেবা—হেঁয়ালি বলছেন কেন ?

কেদারবাবু আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেন।—চমৎকার হেঁয়ালি।

নীহার— চিঠিটা কিন্তু শীলাদির হাতের লেখা। কোনও সন্দেহ নেই।

কেদারবাবু— তাই তো বলছি. চমৎকার হেঁয়ালি। আচ্ছা, আপনারাও একটু ভাবুন। আমি ততক্ষণ...।

এগিয়ে যান কেদারবাবু। শংকরবাবুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আর কুমুদের হাতের বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে কেদারবাবুর চোখের দৃষ্টিটা যেন অলসভাবে দুলতে থাকে। কেদারবাবু বলেন— আমার একটা জিজ্ঞাস্য ছিল ?

শংকরবাবু— বলুন।

কেদারবাবু— বন্দুকের গুলির যে আওয়াজটা সবাই শুনতে পেয়েছে, সেটা কি আমাদের কুমুদবাবুর বন্দুকের গুলির আওয়াজ নয় ?

শংকরবাবু— হ্যাঁ, কুমুদেরই রাইফেলের আওয়াজ। কিন্তু তাতে হয়েছে কী ?

কেদারবাবু— আওয়াজটা কেন হল স্যার ?

শংকরবাবু জবাব দেবার আগেই বরুণা ভ্রূকুটি করে কথা বলে। —একটা হরিয়াল ঘুঘু মারা হয়েছে।

কেদাববাবু— আপনি তো তাই বলবেন , আমিও বিশ্বাস করতে চাইছি ; কিন্তু লোকে যদি বিশ্বাস না করে...।

কুমুদ—লোকে আপনার মত নয়।

বরুণা— কী আশ্চর্য, এ ভদ্রলোক কিরকম মিসচিভাস কথাবার্তা শুরু করলেন !

কেদারবাবু— মাপ করবেন, কেন যেন আমার মনটা বারবার মিসচিভাস হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, আপনি নিশ্চয় গুলি করে মারা ঘুঘুটাকে দেখেছেন !

বরুণা—দেখেছি বইকি।

কেদারবাবু— যাক ; আমি বিশ্বাস করছি। আপনার কথাকে আমি একটুও সন্দেহ করতে চাই না। কিন্তু. ।

শংকরবাবু—আবার কিন্তু কিসের ? আপনি উকিলের মত জেরা শুরু করলেন কেন ?

কেদারবাবু— আমি একবার আত্মহত্যার চিঠিটাকে একটু ভাল করে দেখতে চাই স্যার।

চিঠিটা শংকরবাবুর হাতেই ছিল। চিঠিটাকে কেদারবাবুর চোখের দিকে এগিয়ে দিয়ে অপ্রসন্ন স্বরে কথা বলেন শংকরবাবু—দেখুন, কী দেখতে চাইছেন।

চিঠিটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই কেদারবাবু বলেন— বেশ বেশ, এমন কিছু দেখবার নেই। শুধু জানতে চাই, আমাদের কুমুদবাবুর পকেটে কোনও নোটবুক আর সবুজ কালির পেন নেই তো ?

চমকে ওঠে বরুণা ! চমকে ওঠে কুমুদের চোখ। কুমুদেরই মুখের দিকে তাকিয়ে বরুণা বিড়বিড় করে।—একটা নোটবুক দেখেছিলাম বলে মনে হচ্ছে। তোমার পেনের কালিটা তো সবুজ কালি বলেই মনে হচ্ছে।

কেদারবাবু— থাক, থাক, এতেই হবে, আমি শুধু একবার ওঁর নোটবুকটা আর কলমটা দেখতে চাই।

কুমুদের পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে বরুণাই ব্যস্তভাবে টেনে বার করে, হ্যাঁ, সত্যিই একটা

নোটবুক আর একটা পেন। পেনের কালিও সবুজ।

বরুণার প্রাণটা যেন কেদারবাবুর জঘন্য সন্দেহের নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরে ছটফটিয়ে উঠেছে। লোকটা কুমুদের গম্ভীরতাকে কি-ভয়ানক প্রশ্ন দিয়ে জেরা করছে ? চেঁচিয়ে ওঠে বরুণা-- এই তো নোটবুক, আর এই তো পেন। বলুন, কী বলতে চান আপনি।

নোটবুক আর পেনটাকে হাতে তুলে একবার দেখে নিয়েই কেদারবাবু দুই চোখ বড় করে বরুণার রুষ্ট মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। —আপনিই বলুন ম্যাডাম, এ কেমন বিচিত্র ব্যাপার ? আমাদের কুমুদবাবুর নোটবুকের কাগজটা যেমন রুলটানা, আত্মহত্যার চিঠিটাও তেমনই রুলটানা কাগজে লেখা। চিঠির কাগজের সাইজটাও নোটবুকের একটা পাতার সাইজের মত। আত্মহত্যার লেখাটাও সবুজ কালির লেখা। বাঃ, ভগবান এমন চমৎকার মিল কেন যে সৃষ্টি করলেন, তা কে বুঝবে বলুন ?

শংকরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বরুণার দুই চোখ থরথর করে কাঁপতে থাকে। —আপনি বলুন শংকরদা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

কেদারবাবু বলেন— আপনি শান্ত হোন ম্যাডাম। তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। একটু ভেবেচিন্তে বুঝতে চেষ্টা করুন।

কুমুদ বলে— কোনও দরকার নেই।

কেদারবাবু—কেন ?

কুমুদ— যা বুঝতে হয় তা আমরা নিজেরাই বুঝে নেব। কেন আর কিসের জন্য এরকম ব্যাপার হয়েছে, সেটা আমি জানি।

কেদারবাবু— আমাকেও একটু জানিয়ে দিন না স্যার।

কুমুদ—আপনি কে ? আপনাকে জানাতে আমি বাধ্য নই।

কেদারবাবু—আমি কিন্তু জানতে বাধ্য স্যার। পুলিশকেও এসব কথা জানাতে আমি বাধ্য।

কুমুদের চোখের তারা দপ করে জ্বলে উঠে। —পুলিশকে জানাবেন ?

কেদারবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হো হো করে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে কুমুদ। — যাক, আপনার বেশ গোঁ আছে দেখছি। কিন্তু পুলিশেব কাছে এসব কথা বলবার কোনও দরকার নেই।

কেদারবাবু—কেন দরকার নেই ?

কুমুদ হাসে— আসল ব্যাপারটা আপনি জানেন না, তাই ভাবছেন যে...।

কেদারবাবু— তবু আসল ব্যাপারটাই একটু ভেঙে বলুন, শুনে কৃতার্থ হই।

কুমুদ— ওই মহিলা আমারই কাছ থেকে কাগজ আর কলম নিয়েছিলেন।

কেদারবাবু— নতুন কথা কেন বলছেন স্যার !

কুমুদ—না, এটাই আসল কথা।

বরুণা ভ্রূকুটি করে। —কী বললে ?

কুমুদ হাসে— ঠিকই বলছি। শুধু ইচ্ছে করে ওকথাটা তোমাকে বলিনি ; চেপে গিয়েছি। কারণ...।

কেদারবাবু— কী কারণ ?

কুমুদ— কারণ এই যে...।

কুমুদের ব্যস্ত কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন বোবা হয়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে কুমুদ। শুধু বরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শংকরবাবু বলেন— লজ্জাটজ্জা না করে তুমি কথাটা একেবারে স্পষ্ট করে বলে দাও কুমুদ। ঝঞ্ঝাট চুকে যাক। আমারও আর এইসব বিশ্রী কথা-কাটাকাটি ভাল লাগছে না। সত্যি কথা, আমি বেশ উদ্বেগ বোধ করছি।

কুমুদ বলে— কারণ এই যে, বরুণা হয়ত মনে করত যে, ওই মহিলার সঙ্গে আমার কোনওদিন চেনা-শোনা ছিল ; তাই আমি...।

বরুণা—কী ?

কুমুদ— যাতে তোমার মনে কোনও বাজে প্রশ্ন দেখা না দেয় ; সেই জন্যেই আমি কথাটা চেপে গিয়েছি। আমি সন্দেহই করতে পারিনি যে, মহিলা এসব ভয়ানক কথা লেখার জন্যেই আমার কাছে কাগজ আর কলম চাইলেন।

বরুণা—তারপর ?

কুমুদ— তারপর আর যা হল সবই বলেছি, সবই শুনেছ। মহিলা আত্মহত্যার চিঠিটা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

কেদারবাবু— কোথায় গেলেন ?

কুমুদ— প্রপাতের দিকে।

কেদারবাবু আস্তে একটা হাঁফ ছাড়েন। —তাই বলুন।

কুমুদ— অগত্যা, কাজেই, আমার পক্ষে তখন...তার মানে...।

কেদারবাবু— বাস্তবিক, আপনি যথেষ্ট করেছেন। আত্মহত্যার মহিলাটাকে বাধা দেবার জন্যে...।

কুমুদ— হ্যাঁ, বাধা দেবার আর সুযোগই পাওয়া গেল না। যাই হোক, এখন আমাদের কর্তব্য হল...।

কেদারবাবু— বলুন।

কুমুদ—এসব ব্যাপার নিয়ে আর আমাদের মাথা না ঘামানোই ভাল।

কেদারবাবু— তার মানে ?

কুমুদ— পুলিশকে এবিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া ঠিক হবে না। উল্টে আমাদেরই যত হয়রানি ভুগতে হবে। তদন্তের কাছে আর আদালতের কাছে দশবার ছুটোছুটি করতে হবে।

কেদারবাবু— তার চেয়ে ভাল হয় ; যদি...।

কুমুদ— কী ?

কেদারবাবু— যদি আর একটু ভেবে-চিন্তে, আরও একটু বুঝে-সুঝে পুলিশকে খবরটা জানাই, তবে বোধহয়...

কুমুদ ব্যস্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—শংকরদা, আমি আর এই মিসচিভাস লোকটার কথায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। আপনারা যদি না যান, তবে আমি একাই চলে যাব।

—ছিঃ, কুমুদের দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে যেন একটা করুণ অনুযোগ নিক্ষেপ করেন কেদারবাবু। —আমাদের দশজনকে এখানে অসহায় করে ফেলে রেখে আপনার একা-একা চলে যাওয়া কি উচিত হবে স্যার ?

কুমুদ— বাজে কথা রাখুন।

কেদারবাবু—আমরাই বা আপনাকে একা-একা চলে যেতে দেব কেন স্যার ?

কুমুদ— কী বললেন ?

কেদারবাবু— আমি বলি, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। আর একটু ভেবে দেখা যাক।

শংকরবাবু বলেন— তুমি ব্যস্ত হয়ো না কুমুদ। আমার মনে হয়, পুলিশে খবর না দেওয়া উচিত হবে না।

কুমুদ—কিন্তু পুলিশকে কী কথা বলবেন আপনারা ?

কেদারবাবু— সেই কথাটাই তো ভাল করে, একটু তলিয়ে ভাবতে আর বুঝতে হবে স্যার। এত অশান্ত হলে তো চলবে না। এই দেখুন না, ওই তিন মহিলা, যাঁরা তাঁদের বান্ধবীর নিয়তির কথা শুনে এতক্ষণ কেঁদেছেন, তাঁরাও এখন কেমন শান্ত হয়ে বুঝতে চেষ্টা করছেন।

এতক্ষণ কুমুদেরই পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল বরুণা ; কুমুদেরই ছায়ার সঙ্গে বরুণার ছায়া মেশামেশি হয়ে শুকনো পাতা ছড়ানো বনপথের উপর শান্তভাবে লুটিয়ে ছিল। কিন্তু মেশামেশি সেই দুই ছায়া এইবার যেন কেঁপে উঠেছে। মেশামেশি ছায়াটা এইবার যেন দু'ভাগ হয়ে যেতে চাইছে। ছটফট করছে বরুণা। কুমুদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য চেষ্টা করছে। বরুণার চোখেও যেন দুঃসহ একটা প্রশ্নের আগুন এই শীতের বিকালের অতিমৃদু ঘনবাতাসের ছোঁয়া লেগে ধিকি-ধিকি করে জ্বলছে।

সত্যিই সরে যায় বরুণা, সরে গিয়ে শংকরবাবু আর অরুণার মাঝখানের ছোট পাথরটার উপর চুপ করে বসে পড়ে। মাথা হেঁট করে নিকটের একটা কন্টিকারির ঝোপের দিকে অপলক চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বরুণার সুন্দর মুখের আভা যেন এরই মধ্যে পুড়ে গিয়ে আর ছাই হয়ে ঝরে পড়েছে। কন্টিকারির কাঁটাগুলি যেন বরুণার দুই চোখে বিঁধছে। তা না হলে, ওরকম লালচে হয়ে উঠবে কেন বরুণার কালো চোখ!

বরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়াতুর গুঞ্জনের মত স্বরে কথা বলেন অরুণা।—তুই এরকম করছিস কেন? কুমুদ না হয়...।

বরুণা—কী?

অরুণা—একটা সাংঘাতিক বিশ্রী ঘটনার কথা বলতে গিয়ে না হয় দুটো কথা চেপে গিয়েছে। তাতে...।

বরুণা— তাতে মিথ্যা কথাই বলা হল।

অরুণা— কী বললি?

বরুণা—মিথ্যে কথা। কুমুদ একটি ভয়ানক মিথ্যুক।

অরুণা— ছিঃ, আস্তে কথা বল।

বরুণা— আস্তে কথা বলতে পারি, ঠিকই, কিন্তু আস্তে ভাবতে পারছি না। তোমাদের এই কুমুদের মুখের হাসির শব্দ শুনতে আমার ভয় করছে। আমার আর এখানে এক মিনিটও থাকতে ইচ্ছে করছে না।

কাছে এগিয়ে আসেন শংকরবাবু। —কী হল? কী বলছে বরুণা?

অরুণা— কী হয়েছে, বরুণাই জানে। আমিও আর কিছু ভাবতে পারছি না। আমারও বড় বিশ্রী লাগছে।

শংকরবাবু— আমারও। কিন্তু. ।

অরুণা—কী?

কেদারবাবুর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে শংকরবাবু বলেন— এ ভদ্রলোকের পরামর্শ তুচ্ছ করে চলে যাবার সাহস পাচ্ছি না।

কেদারবাবু যেন নিজেরই মনের একটা ভরসার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে চেঁচিয়ে ওঠেন।—এখনও বিকেলের আলো মরেনি, এখনও সময় আছে স্যার। অন্তত সন্ধ্যেটা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত বলে মনে করি।

শংকরবাবু আশ্চর্য হন—অপেক্ষা? কিসের অপেক্ষা?

কেদারবাবু—এই ..অর্থাৎ...রহস্যটার একটা হদিস পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা।

রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কুমুদ—কিসের রহস্য?

কেদারবাবু— আপনি একটু শান্ত হয়ে কথা বলুন স্যার। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন।

মুখ ফিরিয়ে তাকায় বরুণা। দেখতে পায়, কুমুদ একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বরুণার চোখে যেন একটা বহ্নিজ্বালা জ্বলতে শুরু করেছে।

অবনীশ বলে—এখানে একটু বসো, শীলা।

এটা হল সেই জায়গাটা; সেই কাকচক্ষু জলের ঝিল। দুটো রঙিন পানকৌড়ি এখনও একসঙ্গে ভেসে ভেসে কালো পাথরের শেওলা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। মাছরাঙারা চলে গিয়েছে বলে মনে হয়। পশ্চিমের আকাশের কোলে ক্লান্ত সূর্যের হাসি লালচে হয়ে উঠেছে।

অবনীশ আবার বলে— এখানে একটু বসো শীলা।

শীলা হাসে— আর এখানে কেন?

অবনীশ হাসে— এ জায়গাটাকে কি জীবনে কখনও ভুলতে পারবে? আমি তো ভুলতে পারব না।

শীলার চোখ ছলছল করে। অবনীশ বলে— আসল কথা হল, আমার ছবি-আঁকার সব সরঞ্জাম

এখানে পড়ে আছে। সেগুলো ফেলে রেখে চলে যাওয়া উচিত নয়।

কথা বলে না শীলা। অবনীশই হেসে হেসে বলে— ওসব এখানে ফেলে রেখে চলে গেলে পুলিশের মনে একটা সন্দেহ দেখা দেবে।

শীলা—সন্দেহ ?

অবনীশ—হ্যাঁ, পুলিশ মনে করবে, আর্টিস্টটা নিশ্চয় জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে, কিংবা বাঘের পেটে গিয়েছে।...হ্যাঁ, একটা কথা ; ওই সাংঘাতিক ভদ্রলোক তোমাকে দিয়ে আত্মহত্যার কথা কাগজে লিখিয়ে নিয়ে চলে গেল কেন ? ওর মতলবটা কী ?

শীলা হাসে— ওর বিশ্বাস, আমি সত্যিই আত্মহত্যা করব।

অঅবনীশ— তাতে ভদ্রলোকের ভয় কিসের ?

শীলা—কৈফিয়ত দেবার ভয়।

অবনীশ—কার কাছে কৈফিয়ত ?

শীলা—তাকে আজ দেখেছি। এক সুন্দরী মহিলা।

অবনীশ—বুঝলাম না।

শীলা—মহিলাও আমাকে দেখেছেন।

অবনীশ—বুঝলাম তা।

শীলা—কুমুদ যে আমার খোঁজ করবার জন্যে ছুটে এসেছিল, সে ব্যাপার মহিলা নিজের চোখেই দেখেছেন।

অবনীশ—তার মানে...।

শীলা হাসে— তার মানে, কুমুদ ওই মহিলার কাছে প্রমাণ করতে চায় যে, আমি নিজেই ইচ্ছে করে মরেছি ; আমার মরণের সঙ্গে কুমুদের কোনও সম্পর্ক নেই।

অবনীশ— ভদ্রলোক বোধহয় মহিলাকে ভালবাসেন ; আর মহিলাও..।

শীলা—তাই তো মনে হয়।

অবনীশ— ভালই হল।

শীলার দুই চোখের দৃষ্টি আরও নিবিড় হয়ে অবনীশের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে। —একটা কথা বলবে ?

অবনীশ— বলো।

শীলা— আমাকে সত্যিই ঘেন্না করতে পারছ না ?

অবনীশ— বাজে প্রশ্ন। আমি শুধু ভাবছি, এ কী করে সম্ভব হল ? চিরকালের মত হারিয়ে গিয়েছে বলে যাকে মনে করেছিলাম, তাকে এমন করে পেয়ে যাব, এমন অসম্ভব যে স্বপ্নেও সম্ভব হয় না।

শীলা— কিন্তু আমি যে ইচ্ছে করেই তোমাকে মিথ্যে করে দিয়েছিলাম।

অবনীশ হাসে— বেশ করেছিলে।

এদিকে ওদিকে ঘুরে, ছবি আঁকার যত সরঞ্জাম ঝোলাতে ভরতে থাকে অবনীশ। কিন্তু শীলার প্রাণটা যেন এরই মধ্যে আনমনা হয়ে গিয়েছে। ঝিলের কাকচক্ষু জলের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে শীলা। ঝিলের এই জলের বুকের গভীরে যেন একটা কল্লোল ঘুরে বেড়াচ্ছে ; তারই শব্দ শুনতে পেয়েছে শীলা। মনে হয়, এই তো ঠিক জায়গা, যেখানে চিরকালের মত মিলিয়ে গেলে শীলার জীবনের যত ভুলের জ্বালা চিরস্নিগ্ধ বিরাম পেয়ে যাবে।

নিজেরই হৃৎপিণ্ডটাকে ঘৃণা করতে হচ্ছে। ভালবাসার প্রতীক্ষা নিয়ে নয়, নিতান্ত একটা অপমানময় প্রত্যাখ্যানের আঘাতে বিতাড়িত হয়ে, বড়লোকের বাড়ির ফটক থেকে নিরাশ ভিক্ষুকের মত ফিরে এসে আজ অবনীশের কাছে দাঁড়িয়েছে যে নারী, সে নারীকে শীলাও যে মনে-প্রাণে ক্ষমা করতে পারবে না। অবনীশ ক্ষমা করলেই বা কী ?

না, অবনীশকে বলে দেওয়াই ভাল। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ, কিন্তু আমি যে আমাকে ক্ষমা করতে পারছি না। তুমি আমাকে ঘেন্না করতে পারছ না, আমি যে নিজেকে ঘেন্না করেই মরে যেতে

চাই। এখানে, এই ঝিলের জলে ডুবে মরে গেলে লাভ আছে। এই বিশ্বাস নিয়ে মরতে পারব যে, তোমার ভালবাসা পেয়েছি।

রেবা, জয়া আর নীহার ; ওরা কিছুই জানে না। ওরা যদি আজ সব জানতে পারে, আর তোমার পাশে আমাকে দেখতে পায় ; তবুও ওদের চোখে একটা ঠাট্টার ছায়া ভেসে উঠবে। ওরাও বলবে, শীলাদি তো বেশ ভাল করেই পাপ করেছে ; নিজের গুণে কোনও প্রায়শ্চিত্ত করে পাপ কাটাতে পারেনি ; নিজের প্রাণের জোরে অবনীশকে ফিরে পায়নি। নিতান্ত একটা দৈবের দয়াতে অবনীশকে পেয়েছে শীলাদি। শেষ পর্যন্ত ভালই হল ; কিন্তু শীলাদির জীবনের এই ভালর মধ্যে কোনও গৌরব নেই।

আজ মনে হয়, পরেশকাকার প্রাণটা যেন অবনীশকে ঠকাবার দুঃখটাকে সহ্য করতে না পেরে, আর অবনীশের চোখের সামনে দাঁড়াবার ভয় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই সময় মত সরে পড়েছিল।

ফিরে আসে অবনীশ ; ব্যস্তভাবে বলে— চলো শীলা।

শীলা বলে— না।

অবনীশ— কী বললে ?

শীলা— তুমি যাও। আমি এখন এখানেই কিছুক্ষণ থাকব।

অবনীশ হাসে— মিছিমিছি এসব কথা বলছ শীলা। আমি যে কখনওই তোমাকে এখানে একা রেখে চলে যাব না, এটা তুমি এখনও বুঝতে পারছ না কেন ?

শীলা— তুমি ভুল করছ।

অবনীশ— কিসের ভুল ?

শীলা— আমাকে বিশ্বাস করা তোমার উচিত নয়।

অবনীশ— যেদিন অবিশ্বাস করতে পারব, সেদিন অবিশ্বাস করব। এখন তো ওসব কথার কোনও মানে হয় না।

শীলা— না।

দু'হাতে শীলার স্তব্ধ-গম্ভীর শরীরটাকে শক্ত করে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে অবনীশ— শীলা। আমাকে জীবনে অনেক ভোগালে, অনেক কষ্ট দিলে ; কিন্তু আর তো উচিত নয়।

শীলার স্তব্ধ চোখ দুটো থরথর করে কাঁপে। অবনীশ বলে— আমি একটু পাগল বলেই তোমাকে এমন করে ভালবাসতে পেরেছি ! কিন্তু তুমি একটুও পাগল হতে পারছ না কেন শীলা ?

অবনীশের মুখের দিকে তাকিয়ে শীলার চোখের দৃষ্টি যেন একটা স্বপ্নের আবেশের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। অবনীশ হাসে— মরতে চাও ?

শীলা— হ্যাঁ।

অবনীশ— তাতে তোমার কী সুবিধে হবে বলো ? কিছুই না। শুধু আমার জীবনে একটা যন্ত্রণা ছেড়ে দিয়ে যাবে, এই তো ?

শীলার চোখ দুটো যেন দুর্বার একটা মূর্ছার আবেশে বন্ধ হয়ে যায়। অবনীশ বলে— তার চেয়ে ভাল হয় না কি, যদি তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পার !

—কী বললে ? চেঁচিয়ে ওঠে শীলা।

অবনীশ— আমি আর চাকরি-টাকরির ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে পারব না। পেটের ভাতের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারব না ! আমি শুধু তোমার ছবি আঁকব।

অবনীশের বুকের উপর শীলার মাথাটা অলস হয়ে এলিয়ে পড়ে। কাকচক্ষু জলের ঝিলের গভীরের কল্লোলটা যেন নতুন স্বরে আর নতুন ভাষায় কথা বলছে। শুনতে পাচ্ছে শীলা, বনের বাতাসে যেন একটা ক্ষমার গানের গুঞ্জন ছুটে বেড়াচ্ছে। অবনীশকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই তো তোমার বেঁচে থাকা উচিত শীলা। যাকে অনেক ঠকিয়েছ, তাকে এখন একটু লাভ করতে দাও। যাকে অনেক হয়রান করেছ, তাকে একটু শান্তিতে জিরোতে দাও। অবনীশ শুধু ছবি আঁকুক, তুমি অবনীশের শ্রান্তি ক্লান্তি পিপাসার আর ক্ষুধার সব দাবি মিটিয়ে দেবার ভার নাও।

হেসে ওঠে শীলা— আমি বলছিলাম...।

অবনীশ— বলো।

শীলা— আমি তো এখন কলকাতায় চলে যাব। কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—যাব।

—কলকাতায় পৌঁছেই একটা মেস খুঁজে নিতে পারবে তো ?

—তা পারব।

—আজে-বাজে কোনও মেস হলে কিন্তু চলবে না। টাকার জন্যে চিন্তা করো না।

—বেশ তো, টাকার জন্যে চিন্তা না হয় না-ই করলাম। কিন্তু...

—কী ?

—আমি কি চিরকাল মেসেই থাকব ?

শীলা হেসে ফেলে— এবার তো বেশ বুদ্ধি রেখে কথা বলতে পেরেছে।

অবনীশ— সোজা কথাটা স্পষ্ট করে বলছি।

শীলা— মেসে থাকতে হলে বড় জোর এক মাস থাকব তারপর দেখি করুণাদি কী বলেন ?

অবনীশ— করুণাদি কে ?

শীলা— আমাদের হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

অবনীশ— তার মানে, করুণাদি বললে তবেই তুমি...।

শীলা— না ; আমিই করুণাদিকে বলব। তারপর তিনি...।

অবনীশ— কী ?

শীলা মুখ ঘুরিয়ে যেন দু'চোখের তারার ঝিকিমিকি হাসিটাকে লাজুক করে দিয়ে লুকিয়ে ফেলতে চায়। —তিনিই বলে দিতে পারবেন, কবে আমাকে ছুটি দিতে পারবেন।

অবনীশ—ছুটি কেন ?

শীলা হাসে— বিয়ে করতে হলে ছুটি দরকার। তা ছাড়া...।

অবনীশ— বলো।

শীলা— হোস্টেল থেকে বিদায় নেওয়া দরকার।

অবনীশ— কেন ?

শীলা— জান না ?

অবনীশ— না।

শীলা— একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকবার দরকার।

অবনীশ— কেন ?

শীলা— তা'ও জান না ?

অবনীশ— ঠিক বুঝতে পারছি না।

শীলা— স্বামীর কাছে থাকা দরকার। তা না হলে...।

অবনীশ— কী ?

শীলা— তা না হলে স্বামী ভদ্রলোকের যত্ন হবে কেমন করে ? তা না হলে বেচারা স্বামীর জন্যে বেঁধেই বা দেবে কে ? টিনের কৌটাতে চাল-ডাল সেদ্ধ করলেই তো...!

অবনীশের চোখের একটা অদ্ভুত হাসি এতক্ষণ ধরে যেন একটা ছল-গম্ভীরতার আড়ালে লুকিয়েছিল। সে হাসি এইবার এক ঝলক উজ্জ্বলতার মত উথলে ওঠে। অবনীশ বলে— বুঝেছি শীলা, আমি আগেই বুঝেছি। তবু তোমার মুখ থেকে শোনবার জন্যে...।

শীলা— কী বললে ? ইচ্ছে করে ; চালাকি করে...।

—হ্যাঁ, না বোঝবার ভান করে, বোকার মত চোখ করে, বেশ একটু গম্ভীর হয়ে...।

—তুমি সাংঘাতিক...।

—কী ? সাংঘাতিক পাগল ?

—সেয়ানা পাগল।

শীলার হাত ধরে টান দেয় অবনীশ— চলো, আর এখানে দেরি করা উচিত নয়। তোমার বান্ধবীরা হয়ত মনে করছে যে, ধূর্ত আর্টিস্টটা ওদের শীলাদিকে এতক্ষণে...।

শীলা— সন্দেহটা তো ভুল সন্দেহ নয়।

অবনীশ— কিন্তু আরও একটু সন্দেহ করা উচিত ছিল।

শীলা— কিসের সন্দেহ ?

অবনীশ— ওঁদের সন্দেহ করা উচিত ছিল যে, বেচারা আর্টিস্টটা এতক্ষণে বোধহয় শীলাদির পাল্লায় পড়ে...।

শীলা হাসে— আমি তো চাই, ওরা এই সন্দেহই করুক।

ঝিলের জলের ওপর বনের ছায়ার রং লালচে হয়ে দুলছে। রঙিন পানকৌড়ি দুটো কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। শীলা বলে— চলো।

ছায়াময় বনপথ ধরে এইবার দুজনে বেশ একটু ব্যস্তভাবে হাঁটতে থাকে। যেন এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের স্বপ্নলোকের পথ পার হয়ে বাইরের বাস্তব জগৎটার কাছে পৌঁছে যাবার কর্তব্যটা এইবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখন শুধু ভাবতে হচ্ছে, বাইরের এ জগৎটা কত রকমের কত কঠোর সন্দেহ উদ্বেগ আর আতঙ্ক নিয়ে শীলা আর অবনীশের এই সুখী অদৃষ্টটাকে প্রশ্ন করবার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। কারণ রেবা, জয়া আর নীহার আছে। শ্যামা আর রমা আছে ; ছোট্ট হলেও ওরাও কি জিজ্ঞেস করতে ছেড়ে দেবে, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন শীলাদি ? এই ভদ্রলোকই বা কে ? শ্যামার মা আর শ্যামার বাবাও কি ভ্রূকুটি করে না তাকিয়ে পারবেন ? তাঁরা হয়ত একেবারে স্পষ্ট করে বলেই ফেলবেন—এই কেলেঙ্কারি করবার জন্যেই বুঝি কলকাতা থেকে হুড্রু দেখতে আসা হয়েছিল ?

শীলা বলে— না, আর এত ভয় করতে পারব না।

অবনীশ— কিসের ভয় ?

শীলা— কোনও কথা আর লুকিয়ে রাখতে পারব না। সবারই কাছে সব কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়ে হালকা হয়ে যাব।

অবনীশ— কী বলবে ?

শীলা— বলব, যে মানুষ আমাকে কিনে নিয়েছিল, আমি এতদিনে তারই কাছে এসেছি।

অবনীশ হাসে— সে মানুষ কি তোমাকে টাকা দিয়ে কিনেছিল ?

শীলা— না !

অবনীশ—তবে ?

শীলা— ভালবাসা দিয়ে।

শীলার একটা হাত আগ্রহে বুকের কাছে তুলে নিয়ে কথা বলে অবনীশ।—খুব সত্যি কথা। কিন্তু আমাকে কেউ প্রশ্ন করলে কী বলব ?

শীলা— তুমি বলবে, যে মেয়ে তোমাকে ঠকাতে চেয়েছিল, তোমার ভালবাসার অপমান করেছিল, শেষে তুমিই এসে তার হাত ধরেছ।

অবনীশ— এত মিথ্যে বলতে পারব না।

শীলা— মিথ্যে যে নয়, সেটা তুমিও জান।

অবনীশ— কিন্তু...।

শীলা— কী ?

অবনীশ— ভালবাসার মধ্যে একটু ভুল-টুল থাকাই ভাল। তা না হলে ভালবাসার স্বাদ পাওয়া যায় না।

অবনীশের কথাটা যেন শীলার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে গিয়ে একটা প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলেছে ; চমকে ওঠে শীলা। শীলার চোখে অদ্ভুত এক তৃপ্তিময় নিবিড়তা থমথম করে। সত্যিই যে এই মুহূর্তের নিঃশ্বাসগুলি, এই বুকটা আর মনটা, অদ্ভুত এক স্বাদে ও সৌরভে ভরে-যাওয়া এই শরীরটাও বলছে, ভুল করেছিলে বলেই তো ভালবাসাকে আজ এত মধুর বলে মনে হচ্ছে। সাজ লাজের সব

আবরণ সরিয়ে ফেলে এই বনপথের বিকেলের আলোতেই, আর চোখ বন্ধ না করে অবনীশ নামে এই আর্টিস্ট মানুষটার বুকের উপর লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় শীলা। অবনীশের হাতটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। —থামো।

শীলার জীবনের ভুলের ক্ষতটা কি নতুন আশায় পাগল হয়ে উঠল ? কিংবা, শীলার নিঃশ্বাসে একটা কৃতজ্ঞতার পিপাসা উতলা হয়ে উঠেছে ? করুণাদি কবে দিন ঠিক করবেন, তার অপেক্ষায় থাকলেও আজ এখন এই মুহূর্তে একটা নতুন ভুল করে জীবনের গোপন-করা সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলতে আর নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে দোষ কী ?

অবনীশ বলে— বাঃ কী চমৎকার কসমস ফুটেছে !

হেসে ওঠে শীলা— কোথায় ?

অবনীশ— ওই যে, ওদিকে ওই উঁচুতে ; একটা মস্তবড় পাথর আর গাছের ছায়ার মাঝখানে...।

না, এটা সত্যিই স্বপ্নলোকের গহন বন নয়, এটা বাস্তবতার জগৎ। অবনীশের হাত ছেড়ে দেয় শীলা— কিন্তু ওরা কোথায় ? ওদের কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

অবনীশ বলে— আছে নিশ্চয়, হয়ত এখানেই কাছাকাছি কোথাও বসে আছে।

শীলা— চলো।

অবনীশ— চলো।

কী আশ্চর্য, এই বিষণ্ণ করুণ ও শোকাতুর পরিবেশের মধ্যে থেকেও কেদারবাবু যেন নির্লিপ্ত। কেদারবাবুর মুখে কোনও করুণতা কিংবা চোখে কোনও আতঙ্ক আর নেই। বেশ জোরে জোরে গলা কেশে বুকটাকে হালকা করে দিচ্ছেন কেদারবাবু। সব চেয়ে আশ্চর্য, এবং শ্যামার মা দেখতে পেয়ে যেন দুঃসহ লজ্জায় ছটফটিয়ে ওঠেন, কেদারবাবু এক হাতে চায়ের বাটি, আর, আর এক হাতে জিলিপি তুলে নিলেন।

জিলিপিতে কামড় দিলেন, চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন কেদারবাবু। তার পরেই গলা কেশে নিয়ে কথা বললেন— একটা ফ্যাক্ট বোঝা গেল, সেই ভদ্রলোক আত্মহত্যা করেনি।

ভ্রূকুটি করে কেদারবাবুর দিকে তাকায় কুমুদ—ভদ্রলোক ! ভদ্রলোক আবার কে ?

কেদারবাবু— আজ্ঞে, ওই মহিলার সঙ্গে এক ভদ্রলোক আছেন।

কুমুদ— ননসেন্স ! কোনও ভদ্রলোক নেই ; আমি মহিলাকে ছাড়া আর কোনও লোককে সেখানে দেখতে পাইনি।

কেদারবাবু— আহা ! আপনি আবার কেন এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন ?

কুমুদ— আপনি পাগলের মত কথা বলছেন বলেই উত্তেজিত হতে হচ্ছে।

কেদারবাবু— পাগলের কথা শুনে উত্তেজিত হওয়া তো অপাগলের লক্ষণ নয় স্যার।

কুমুদ— দেখলেন তো শংকরদা, এ ভদ্রলোকের কথাবার্তায় ব্যালেন্স বলে কোনও পদার্থ নেই। আমি তখনই সন্দেহ করেছিলাম...

কেদারবাবু জিলিপিতে আর একটা কামড় বসিয়ে হাসতে চেষ্টা করেন— আমাকে দেখে ওরকম সন্দেহ হয় স্যার, শ্যামার মা-ও আমাকে প্রথমে দেখে সেই সন্দেহ করেছিল। কিন্তু...

কুমুদ যেন একটা হুংকার চাপতে চেষ্টা করে— কিন্তু কী ?

কেদারবাবু— আমি তা নই স্যার। মোট কথা হল, সেই ভদ্রলোকের ট্রেস না পাওয়া পর্যন্ত মহিলার আত্মহত্যাটাকে একটা ফ্যাক্ট বলে মেনে নিতে আমি পারব না। আমি দশ বছর ধরে এই হুড়রুতে প্রতি বছর পিকনিক করে আসছি স্যার। আমিও...শ্যামার মা যদি এক্সকিউজ করে...তবে বলতে পারি...একবার ওরকম চিঠি লিখে আত্মহত্যা খেলেছিলাম, শ্যামার মা-কে একটু বৈধব্যের টেস্ট পাইয়ে দেবার জন্যে।

শংকরবাবু বলেন— থামুন মশাই ; আপনার রসিকতা এ সময় উপভোগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কেদারবাবু— আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার ; আপনার পক্ষে বিরক্ত হওয়াই উচিত। আপনার

সাদা মনে কাদা নেই ; তাই আপনার পক্ষে এসব আজে-বাজে কথা খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু ইনি কেন এত রাগ করে কথা বলছেন, সেটা আপনি আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন কি স্যার ?

শংকরবাবু বলেন— সত্যি কুমুদ, তুমি এরকম অদ্ভুতরকমের মেজাজ করে কথা বলছ কেন ? এটা একটুও শোভন হচ্ছে না।

কেদারবাবু— তা ছাড়া, উনি আর যেসব কথা বললেন, সেগুলোও নিছক গল্প কিনা, সেটাও একটু বুঝে দেখা দরকার।

কুমুদ— কী বললেন ?

কেদারবাবু— ওই যে, আপনি বললেন, আপনি আত্মহত্যার মহিলাকে ধরবার জন্যে কত চেষ্টা করেছেন, ছুটেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যিই ছুটেছিলেন তো স্যার ?

কুমুদের চোখের তারা দুটো হঠাৎ সুস্থির হয়ে যায়। কেদারবাবুর প্রশ্নটা যেন ভয়ানক একটা ধূর্ত প্রগলভতাব আবদার। কুমুদের অদৃষ্টটাকে যেন জেরা করেছে কেদারবাবু নামে এই দেখতে হাবাগবা অথচ ভয়ানক বাচাল লোকটা। কুমুদ যেন একটা উত্তর দেবার শক্তি পাওয়ার জন্যেই সিগারেট ধরায়। তারপরেই, সত্যিই বোধহয় শক্তি পেয়ে হো হো করে হেসে ওঠে। আর, বরুণার দিকে তাকিয়ে উচ্ছল স্বরে বলতে থাকে— ওগুলো অবশ্য আমার ইচ্ছে করে তৈরি একটা রসিকতার গল্প। বরুণাকে একটু আশ্চর্য করে দিয়ে মজা দেখবার জন্যেই বলেছিলাম। মহিলা কখন ডুবল আর মরল সেটা দেখবার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি।

পাথরটার উপর বরুণা যেন একটা পাথর হয়ে বসে আছে। কুমুদের উচ্ছল হাসির শব্দ দিয়ে তরল করা এই রসিকতার কৈফিয়তটাকেও যেন কানে শুনতে পায়নি বরুণা।

কেদারবাবু বলেন— তা হলে মনে হচ্ছে, মহিলা আত্মহত্যা করেননি। তিনিও আপনার সঙ্গে রসিকতা করেছেন।

কুমুদ— রসিকতার কোনও ধার-টার ধারে না সে মহিলা। সে এক ভয়ানক একরোখা মেয়েলোক ; সে যে আত্মহত্যা করেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে মেয়ে কথার নড়চড় করবার মত মানুষ নয়।

শংকরবাবু আশ্চর্য হয়ে কুমুদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কুমুদ কি স্বপ্নের ঘোরে, কিংবা একটা জ্বরবিকারের ঘোরে কথা বলছে ? আত্মহত্যার সেই মহিলার সব মনস্তত্ত্ব যেন কুমুদের কাছে অনেককালের জানা একটা সত্য।

কেদারবাবু বিনীত ভঙ্গিতে হাসলেন। —মহিলার মনটাকে আপনি এত ভাল করে চিনলেন কেমন করে স্যার ? কবে চিনলেন ?

চমকে ওঠে কুমুদ। কুমুদের হাসিটাও চমকে উঠে অদ্ভুত স্বরে কাঁপতে থাকে। —আমি চিনি না। আজ একটা দুর্ভাগ্য হল বলেই, মহিলার মুখের ভাবের রকমসকম চোখে পড়তেই মনে হল যে, মহিলা ঠিক সুস্থ স্বভাবের মানুষ নয়। খুব সম্ভব কোনও কেলেঙ্কারী করে লোকলজ্জা এড়াবার জন্যেই আত্মহত্যা করেছে।

কেদারবাবু— কেলেঙ্কারী করলেই কি আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হয় ?

কুমুদ— আপনার মত মানুষের ইচ্ছে হবে না ঠিকই ; কিন্তু যার লোকলজ্জার ভয় আছে, তার ইচ্ছে হবে।

কেদারবাবু— আপনি সত্যিই একটা খাঁটি কথা বলেছেন স্যার। শ্যামার মা জানেন, আমার লোকলজ্জার ভয় থাকলে বাসরঘরেই আফিম গিলতাম। কারণ, বাসরঘরে গান গাইবার জন্য তিনিও উপস্থিত ছিলেন, কৈলাস দারোগার থার্ড ডটার সুমোহিনী, যাকে বিয়ে করবার জন্য আমি কত কবিতাই না লিখেছিলাম।

শংকরবাবু হেসে ফেলেন— থামুন।

কেদারবাবু— এখন আর থামা না থামার প্রশ্ন নেই স্যার। কিন্তু সেদিন সেই বাসরঘরেই শ্যামার মা'র কাছে ধরা পড়ে গিয়ে থেমে যেতে হয়েছিল।

শংকরবাবু— কী হয়েছিল ?

কেদারবাবু— কোনও এক উদারবতী মহিলা শ্যামার মা'র ঘোমটার কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে কথাটা বলে দিয়ে গেল।

শংকরবাবু— কী বলে দিয়ে গেল ?

কেদারবাবু— ওই সুমোহিনীর কথা, যার জন্যে আমি...হেঁ হেঁ...। তবু তো আমি আত্মহত্যা করিনি স্যার।

শংকরবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে আর যেন আনমনার মত বিড়বিড় করে। —যাকগে, আপনার এসব গল্প এখন কারও ভাল লাগবে না।

কেদারবাবু দেখতে পান, শ্যামার মা তাঁর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন। আর, কলকাতার মেয়ে তিনটিও বেশ গম্ভীর আর ভীরু-ভীরু চোখ উদাস করে দিয়ে বসে আছে।

কেদারবাবু বলেন— আমার মনে হচ্ছে, আপনারা সবাই আমাকে সন্দেহ করছেন। ভাবছেন, এরকম একটা সাংঘাতিক ঘটনার দুঃখের মধ্যে লোকটা এরকম ফষ্টিনষ্টি করছে কেন ? সত্যি কি না ?

শংকরবাবু বলেন— মিথ্যে নয়। আপনি কিন্তু কোনও সুপরামর্শ এখনও দিতে পারছেন না।

কেদারবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন। —সুপরামর্শ আর না দিলেও চলবে স্যার।

শংকরবাবু— থামুন। চেঁচাবেন না।

কেদারবাবু হঠাৎ একগাল হেসে আর মাথা দুলিয়ে যেন দু'খানা হয়ে যান। —তা হলে ওদিক পানে একবার লক্ষ করুন স্যার।

—কোন দিকে ?

—ওই দিকে।

ঠিক ওই কসমসের ছোট্ট জঙ্গলটার দিকে, যেখানে একগাদা শিশু গাছের ছায়া এখন বেশ কালো হয়ে এসেছে, সেদিক থেকে একসঙ্গে হেঁটে আর ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছে দুটি মূর্তি, এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা।

নীহার, রেবা, জয়া, শ্যামা আর রমা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে— শীলাদি। শীলাদি !

কেদারবাবু একেবারে কুমুদের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যেন প্রচণ্ড ধূর্ত একটা বিদ্রূপের শান্ত-সংযত হাসি দিয়ে চোখমুখ ভরে নিয়ে শুধু কুমুদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বরুণার দু'চোখে যেন একটা বিদ্যুতের জ্বালা এইবার দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। পাথরটার উপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, আর মুখ ঘুরিয়ে কুমুদকে দেখছে বরুণা। যেন একটা ক্ষমাহীন জিজ্ঞাসা তাকিয়ে আছে।

কেদারবাবু মাথা দোলাতে থাকেন— এ তো বড় চমৎকার ম্যাজিক স্যার ! যে মহিলা প্রপাতের জলে মরণ-ঝাঁপ দিলেন, সে মহিলা দিব্যি শুকনো চেহারাটি নিয়ে আর গটগট করে হেঁটে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। জামা-কাপড়ের একটা সুতোও ভিজেছে বলে মনে হচ্ছে না। অ্যাঁ ?

নীহার বলে— খুব ভয় পেয়েছিলাম বলে, একটা কথা আমরা এতক্ষণ বলতে পারিনি।

শংকরবাবু— কী কথা ?

রেবা আর জয়া একসঙ্গে বলে ওঠে— উনি শীলাদিকে চেনেন।

— কে ? কে-আপনাদের শীলাদিকে চেনেন ? ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে প্রশ্ন করে বরুণা।

নীহার কুমুদকে দেখিয়ে দিয়ে বলে— উনি, মনে হচ্ছে, উনিই তিনি।

বরুণা-- কবে থেকে চেনেন ?

রেবার আর জয়া— তিন চার পাঁচ বছর বোধহয়।

নীহার—শীলাদি টাকা দিতেন বলেই উনি এম-এ পড়তে পেরেছিলেন আর মেসের খরচ চালিয়েছিলেন।

বরুণা—আর কী জানেন বলুন ?

নীহার—আমাদের কেন জিজ্ঞেস করছেন। ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন।

বরুণা— শীলাদির সঙ্গে এঁর বিয়ের কথা ছিল না ?

নীহার— ছিল বলেই তো শুনেছিলাম।
অবনীশ আর শীলা দু'জনেই কেদারবাবুর পিকনিকের আসরের কাছে এসে হাসতে থাকে।
শ্যামার মা রাগ করে কথা বলেন— তুমি এ কীরকমের কাণ্ড করলে গো মেয়ে ? কিসের জন্য মিছিমিছি আত্মহত্যার কথা লিখে কার সঙ্গে খেলা করলে ?
অবনীশকে দেখিয়ে দিয়ে শীলা বলে— এর সঙ্গে।
শ্যামার মা চোখ বড় করে তাকান— সে কি ? এ আবার কেমন কথা ?
শীলা হাসে— অনেকদিনের কথা মাসিমা। অবনীশ আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে, তবে আমি লেখা-পড়া শিখেছি। শুধু তাই কেন, ভাত খেতে পেয়ে বেঁচেছি।
শ্যামার মা—কেন ? অবনীশ তোমাকে টাকা দিত কেন ?
শীলা হাসে— ওকেই তবে জিজ্ঞেস করুন।
অবনীশ নিজেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। —হঠাৎ যুদ্ধে চলে যেতে হল বলে বিয়েটা হতে পারেনি। তা না হলে অনেকদিন আগেই বিয়ে হয়ে যেত।
শীলার দিকে তাকিয়ে আর গলার স্বর চেপে কথা বলেন কেদারবাবু— জলে নেমেছিলেন ?
শীলা হাসে— হ্যাঁ।
কেদারবাবু মাথা নাড়েন। —বোঝ এবার ; ডুবতে হল কিনা ?
শীলা বলে— হ্যাঁ।
শ্যামার মা ভ্রুকুটি করে চেঁচিয়ে ওঠেন— ছিঃ, বাপের বয়সী একটা মানুষ হয়েও মেয়েটার সঙ্গে তুমি এসব কী কথা বলছ ? হাড়ে-মাংসে লজ্জা বলে কোনও বস্তু নেই ?
নীহার, রেবা আর জয়া, তিনটে হতভম্ব বিস্ময় যেন একটা রূপকথা শুনছে। শীলাদি আজ যেন একটা ভয়ানক লজ্জাহীন মুখরতা ; শীলাদির চোখ দুটোকে এভাবে জ্বলজ্বল করতে কোনওদিন দেখেনি নীহার, জয়া আর রেবা।
কেদারবাবুর গলা এইবার যেন দুরন্ত একটা আহ্লাদ চাপতে গিয়ে ঘড়ঘড় করে। —তা হলে ফ্যাক্ট হল, এবার তোমাদের বিয়ে হবে।
অবনীশ— আজ্ঞে হ্যাঁ।
কেদারবাবু— নেমন্তন্নটা তা হলে প্রাপ্য রইল।
অবনীশ— নিশ্চয়।
কেদারবাবু— অদ্য তা হলে এইস্থানে বেদব্যাসের বিশ্রাম। এবার তা হলে আসর ভঙ্গ হোক, রওনা হওয়া যাক।
চেঁচিয়ে ওঠে বরুণা— শংকরদা !
শংকর বিব্রতভাবে বলে— কী ?
বরুণা— এই লোকটি যদি আপনাদের সঙ্গে থাকে, তবে আমি আপনাদের সঙ্গে যাব না।
শংকরবাবু— অ্যাঁ ?
অরুণা— তুই এখন চুপ করে থাক, বরুণা।
বরুণা— না। তা হয় না। অসম্ভব।
শংকরবাবু— বেশ তো, চলো আমরা তিনজন এগিয়ে যাই।
শংকর, অরুণা আর বরুণা এগিয়ে যায়।
কেদারবাবু বলেন— আচ্ছা, এবার তোমরা দু'জন এগিয়ে যাও।
শীলা আর অবনীশ রওনা হয়।
কেদারবাবু বলেন— এবার তোমরা তিন বান্ধবী যাও।
নীহার, রেবা আর জয়া হেসে হেসে চলতে থাকে।
কেদারবাবু— শ্যামা আর রমা, পরেশ আর নরেশ, এবার তোমরা চলতে থাকো।
এইবার শ্যামার মা-র দিকে তাকিয়ে কেদারবাবু বলেন— চলো, এবার আমরা দু'জন।
দু'পা এগিয়ে যেয়েই থমকে দাঁড়ান কেদারবাবু। কুমুদের স্তব্ধ নীরব ও নিথর মূর্তিটার দিকে

তাকিয়ে বলেন— বুড়ো মানুষের সামান্য একটা অনুরোধ তুচ্ছ করে হরিয়াল শিকার করা আপনার খুবই ভুল হয়েছে স্যার। দেখলেন তো, হুড়রুর ডাইন আপনার মত অফিসারকেও ছেড়ে কথা কয় না। তা ছাড়া...

শ্যামার মা এগিয়ে গিয়েছেন। কেদারবাবুও দু'পা এগিয়ে যেয়েই আবার থমকে দাঁড়ান। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন— তা ছাড়া, আমারও একটা দুর্নাম আছে স্যার। গোবর্ধনবাবু বলেন, আমিই নাকি এই হুড়রুর সেই ছায়া-ছায়া চেহারার ইচ্ছেটা।

বন্ধু গোলাপ

চিনতে কোনও অসুবিধে নেই। এটা হল সেই রঘুনাথবাবুর বাড়ি, যিনি মহেশ পাহাড়ের কাছে দিনের বেলাতে ধানক্ষেতের উপর বাঘ মেরেছিলেন। ওই তো, সেই বাঘের চামড়াটা এ বাড়ির দোতলাব একটা ঘবের দরজাতে পর্দা হয়ে ঝুলছে। এক-আধ বছরের কথা নয়, হিসেব করলে বোঝা যায়, আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে রঘুনাথবাবু ওই বাঘেব চামড়াটাকে দরজার পর্দা করে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। পর্দাটাকে দেখে মনে হয়, সাত বছর আগে রঘুনাথবাবু যেমনটি ছিলেন, আজও ঠিক তেমনটি আছেন। কিন্তু তা নয়। সেই শক্তপোক্ত শরীর নেই। ছোট করে ছাঁটা সেই কাঁচাপাকা চুল নেই।

মাত্র ভোর হয়েছে। পুবের আকাশের আভা পর্দার উপরে পড়েছে। পর্দার বড় বড় হলদে ডোরা চকচক করছে।

রঘুনাথবাবু কি আজও সেই আগের মত বুরুশ করে আর পালিশ লাগিয়ে বাঘেব চামড়ার পর্দাটার পরিচর্যা করেন ? সত্যি কথা, পর্দাটাকে মাঝে মাঝে ঠিক পর্দা বলে মনে হয় না, নিতান্ত একটা চামড়া বলেও মনে হয় না। মনে হয়, একটা জ্যান্ত বাঘ বুঝি দু'পায়ে খাড়া হয়ে, আর দুটো থাবা তুলে দরজাটাকে আটক করে দাঁড়িয়ে আছে। তিন বছর আগে জগেশপুর থেকে কলকাতা রওনা হবার দিনে এই রকমই একটি ঘুমন্ত ভোরবেলার আলোতে এই পর্দাটাকে শেষবারের মত দেখে গিয়েছিল মণীশ। তারপর, এই আজ।

বুঝতে পারা যায়, এ বাড়ির ঘুম এখনও ভাঙেনি। তা একরকম ভালই হয়েছে বলতে হবে। রঘুনাথবাবু যদি এখন ওই পর্দা ঠেলে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ান, তবে একেবারে স্পষ্ট করেই দেখতে পাবেন আর বুঝতে পারবেন, কে এখন ফটকের সামনে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এ বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। নিশ্চয় চমকে উঠবেন রঘুনাথবাবু,—এ কী ! তুমি মণীশ ! কবে দেশে ফিরলে ?

জবাব দিতে বিশেষ কোনও অসুবিধে নেই। বলে দিতে পারবে মণীশ,— এই তো সাত দিন হল। কিন্তু যদি ব্যস্ত হয়ে হাঁক-ডাক করেন রঘুকাকা,—এসো, এসো, চা খাও ; তবে বেশ একটু অসুবিধেয় পড়তে হবে। চা খেতে কোনও অসুবিধে হবে না নিশ্চয়। ভুলে যায়নি মণীশ, রঘুকাকার এক বন্ধু দার্জিলিংয়ের তাঁর নিজের বাগানের চা মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন। এই পাঁচ বছর ধরে জার্মানিতে থাকা জীবনের প্রত্যেকটি সকালবেলাতেই চা খেতে হয়েছে। ভাল চা বটে, কিন্তু কত আর ভাল ? সেই চা খেতে গিয়ে প্রায় রোজই মনে পড়েছে রঘুকাকার বাড়ির চায়ের কথা। কী চমৎকার একটি মিষ্টি সৌরভে স্বাদু হয়ে থাকে রঘুকাকার বাড়ির চা।

হয়ত, মীরা কাকিমা একবার ডাক দেবেন,— কই মণীশ, এখানে এসে একটু বসো। তেমন কিছু অসুবিধের ব্যাপার হবে না। মীরা কাকিমা হলেন বিছানাতে শোয়ানো একটি রুগ্ন মানুষ। ডান হাত আর ডান পা পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোমরেও জোর নেই, বসে থাকতে পারেন না। বড় বড় বালিশ ঠেকা দিয়ে মাঝে মাঝে বিছানার উপর তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয় বটে ; কিন্তু বড় জোর দুটি বা তিনটি মিনিট। এর বেশি বসে থাকতে পারেন না মীরা কাকিমা। আবার শুয়ে পড়েন।

মীরা কাকিমার ঘরে তাঁর কাছে কিছুক্ষণ বসে কিংবা দাঁড়িয়ে গল্প করলে তিনি খুবই খুশি হন।

ভুলে যায়নি মণীশ, একদিন মীরা কাকিমা বলেছিলেন,—তোমাকে দেখলে কষ্ট ভুলে যাই মণীশ। আর জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার ছেলে ছিলে।

তিন বছর ধরে একটানা বিদেশে পড়ে থাকলেও সেদিনের কথা কিছুই ভুলে যায়নি মণীশ। মণীশও খুশি হয়ে হেসেছিল আর বলেছিল,—আপনি যে কথা বললেন কাকিমা, করুণা মাসিও ঠিক সেই কথা বলে।

—তাই নাকি ! তাই নাকি ! করুণাও ওই কথা বলে ? মীরা কাকিমার বুকের ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা খুশির কলরব যেন উথলে উঠেছিল। চোখ দুটোও হেসে উঠেছিল।

মণীশের যিনি মা, যিনি করুণা মাসির মেজদি, তিনি আজ আর এই পৃথিবীতে নেই। মণীশের মনেও মা-র কোনও স্মৃতি নেই। শুধু জানে যে, সে যখন এইটুকু একটা শিশু ছিল, তখন তার মা হঠাৎ একদিন মরে গেলেন। করুণা মাসি গল্প করে বলেন,—ওই মীরাদি আর মেজদির মধ্যে কী গভীর ভালবাসাই না ছিল। আমার কোল থেকে তোকে নেবার জন্য মেজদি আর মীরাদি দু'জনেই একসঙ্গে হাত বাড়ত ; কিন্তু তুই মীরাদির কোলে যাবার জন্য হাত বাড়াতিস। আমি তাই দেখে বলতাম, তুই আগের জন্মে নিশ্চয় মীরাদির ছেলে হয়ে জন্মেছিলি।

হিরুদা, যিনি রঘুকাকা আর মীরা কাকিমার একমাত্র ছেলে, তিনিও মাঝে মাঝে হঠাৎ খুশির আবেগে চেঁচিয়ে উঠে মন্তব্য করেছেন,— এটা আগের জন্মে তোমার ছেলে হয়ে জন্মেছিল কিনা, সেটা তর্কের বিষয়। কিন্তু মা, এটা যে আমার একটা ভাই ছিল, তাতে একটুও সন্দেহ নেই।

রঘুকাকার এই বাড়িটাকে কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলে, বাতিকের বাড়ি। কেউ বা বলে, বাঘছালের বাড়ি। কেউ কেউ দুঃখ করে বলে, রোগের বাড়ি। ভোলাবাবু একটা অদ্ভুত কথা বলেন, স্বপ্নের বাড়ি।

রোগের বাড়ি তো বটেই। সেই শক্তপোক্ত চেহারার শিকারি মানুষটি এখন অস্থিসার একটা শীর্ণতাব মূর্তি। খুব কম কথা বলেন, কারণ, কথা বললেই হাঁপ ধরে যায়, গলার শিরাগুলি ফুলে ওঠে আর কাঁপে। হিরুদার কোনও রোগ-বালাই আছে কি না, তা কেউ জানে না। কিন্তু কোনও রোগ যদি না থাকে, তবে এই বয়সের চেহারাটি ওরকম অদ্ভুত ডিগডিগেটি হবে কেন ? মীরা কাকিমা তো মূর্তিমতী রুগ্নতা। কিন্তু কী আশ্চর্য, দেয়ালের গায়ে যে ফটো ঝুলছে, সেটা কী এই তিনটি মানুষের চেহারার ছবি ? একজন বলিষ্ঠ রূপবান যুবক কী চমৎকার এক রূপসী যুবতীর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের মাঝখানে সাত-আট বছর বয়সের একটি ছেলে, নধর নাদুস নুদুস চেহারা, ফোলা ফোলা গাল। ওই ছেলেটিই নাকি এই হিরুদা ! আর ওই যুবক ও যুবতী নাকি এই রঘুকাকা আর মীরা কাকিমা।

কিন্তু বাড়িটাকে কেউ কেউ বাতিকের বাড়ি বলে কেন ? মণীশ জানে, এটাও একটা দুঃখের মন্তব্য, ঠিক নিন্দের মন্তব্য নয়। শিকার নিয়ে আর কারবার নিয়ে বেশ ছিলেন রঘুকাকা। লোকে বলে, একদিন মধুপুরের আদালতে সেই যে শুনলেন, ভগবানের নামে শপথ করে সাক্ষি বিষ্টুবাবু বললেন, তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, রতনবাবু গুনে গুনে পুরো পাঁচটি হাজার টাকা রঘুনাথবাবুকে দিয়ে দিলেন, পুরো দুই ওয়াগন বাঁশের দাম, রতনবাবুর কাছে রঘুনাথবাবুর একটি পয়সাও পাওনা নেই ; সেই থেকে রঘুনাথবাবু কেমন যেন হয়ে গেলেন। এই সেই বিষ্টুবাবু, টাকা আদায়ের মামলাতে যাঁকে প্রধান সাক্ষি মেনেছিলেন রঘুনাথবাবু। কারণ, বিষ্টুবাবুরই অনুরোধে নগদ টাকা হাতে না নিয়ে রতনবাবুকে তিনি মাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিষ্টুবাবু জোরগলায় বলেছিলেন,—আমি গ্যারান্টি রইলাম। তা ছাড়া, রতনবাবু নাকি খুব খাঁটি মানুষ। তাই কোনও লেখালেখির ব্যাপার না করে, একটা চিরকুট কাগজেও সই না করিয়ে, শুধু মুখের কথায় আর বিশ্বাসের উপর পাঁচ হাজার টাকার মাল ছেড়ে দিয়েছিলেন রঘুনাথবাবু। সেই বিষ্টুবাবু ভগবানের নামে শপথ করে হাকিমের সামনে বলছেন, এ কী অদ্ভুত কথা ! সেই যে ফ্যাল ফ্যাল করে বিষ্টুবাবুর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সর্বক্ষণ, যেন ঠিক ওইরকম ফ্যালফেলে চোখ নিয়ে এই পৃথিবীর সব কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। কী ভয়ানক বাতিক !

ভুল কথা বলেননি ভোলাবাবু। এটা স্বপ্নের বাড়িও বটে। যেমন রঘুকাকা, তেমনই মীরা

কাকিমা, আর এই হিরুদাও কিছু কম যান না, সবাই স্বপ্নে-দেখা ঘটনার সব কিছুর মধ্যে বাস্তব সত্যের সঙ্কেত দেখতে পান। মীরা কাকিমা বলেন,— স্বপ্নে তবু বেশ একটা স্বস্তি পাওয়া যায়, মণীশ। কিন্তু ঘুম কই ? যদি একটু ভাল ঘুম হত, তবে আরও ভাল স্বস্তির স্বপ্ন দেখতে পেতাম।

একদিন সত্যিই শুনতে পেয়েছিল মণীশ, রঘুকাকা বলছেন, —একটা চাঁদ ছিল শালজঙ্গলের মাথার উপরে ; আর একটা চাঁদ ঠিক মহেশ পাহাড়ের মাথার উপরে। হঠাৎ দেখলাম, শালজঙ্গলের চাঁদটা উড়ে এসে শর্মাজিদের মন্দিরের মাথাটাকে ছুঁয়ে দিয়েই আবার ওদিকে চলে গেল।

মীরা কাকিমা বলছেন,—বৃষ্টি আর বৃষ্টি। আকাশটা যেন গলে পড়ছে। তুমি হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দৌড়তে শুরু করলে। আমি কত ডাকলাম, ও কী, তুমি আমাকে একা ফেলে রেখে পালিয়ে যাচ্ছ কেন ? কিন্তু, কী আশ্চর্য, তুমি বলে উঠলে, এই তো আমি তোমার কাছেই আছি। তাই তো, এরকম ভুল দেখলাম কেন ? তুমি হেসে ফেললে, কোথায় বৃষ্টি ? আমি দেখলাম, তাই তো, আমার গায়ে বেনারসিটা একেবারে শুকনো, একটুও ভিজে যায়নি।

বুঝতে পারে মণীশ, স্বামী-স্ত্রীতে গত রাত্রির স্বপ্নের কথা বলাবলি করছেন। বোঝা গেল, গত রাত্রিতে দুজনের ঘুম একটু ভাল হয়েছিল।

মীরা কাকিমাকে যে স্বপ্নটা সবচেয়ে বেশি স্বস্তি দেয়, তার কথাও শুনেছে মণীশ। মীরা কাকিমা বার বার অনেকবার সেই স্বপ্নের কথা বলেছেন। মণীশের বউ হল যে মেয়েটি, তার মুখটা বড় সুন্দর। আরও সুন্দর চোখ দুটো। স্বপ্নে দেখেছেন মীরা কাকিমা, মণীশের বউ এসে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হেসে চেঁচিয়ে উঠেছেন মীরা কাকিমা,—হবেই হবে, এ স্বপ্ন সত্যি না হয়ে যায় না।

হিরুদা বলেন,—তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর, যে মেয়ের সঙ্গে মণীশ নামক এই বালকটির বিয়ে হবে, সে এসে তোমার মাথায় হাত বোলাবে ?

মীরা কাকিমা,—নিশ্চয় বিশ্বাস করি।

হিরুদা,— আমি কিন্তু অন্যরকম স্বপ্ন দেখি।

মণীশ হাসে,— অদ্ভুত রকম নিশ্চয় ?

হিরুদা,— না। আমার স্বপ্ন হল : যে মেয়ে আমার এই মা-র মত মানুষের মাথায় হাত বোলাতে পারে, সেই মেয়ের সঙ্গে মণীশের বিয়ে হবে। ...কিন্তু হবে কি ?

এ আবার কী রকমের প্রশ্ন ? একটা সন্দেহের প্রশ্ন বলেই তো মনে হয়। কী যে বলতে চান হিরুদা, স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যায় না। হিরুদার স্বপ্নটাকে একটা কঠোর অবিশ্বাসী বাতিকের স্বপ্ন বলে মনে হয়। সিনিয়র কেমব্রিজ পাস করেছে, কনভেন্টে থেকে লেখাপড়া করেছে, পিয়ানো বাজাতে পারে, এমন মেয়ে কি মীরা কাকিমার মাথাতে কখনও হাত বোলাতে চাইবে না, কিংবা পারবে না ?

না, এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। রঘুকাকার বাড়িতে দেখা করতে তো আসতেই হবে একদিন। আজকের দিনটা শুধু খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবার পর, সন্ধ্যার দিকে এ বাড়িতে এসে সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে গেলেই চলবে। কিন্তু ভয় হয়, রিণি আবার ব্যস্ত হয়ে না বলে ওঠে,— না দাদা, আজ ওখানে নয়, ও বাড়িতে কাল যেও। আজ এখনই একবার সে বাড়িতে যাও। কল্পনা করতে পারে মণীশ, এই সামান্য কয়েকটা কথা বলতে গিয়ে রিণির চোখ দুটো ঝিক ঝিক করে হাসতে থাকবে।

তিন বছর আগে এই রিণি, যখন ওর বয়স দশ বছর, যখন ডবল বেণী দুলিয়ে বাগানে ছুটোছুটি করত আর কাঠবিড়ালি ধরবার চেষ্টা করত, তখন একদিন একটা কাণ্ড করে ফেলেছিল রিণি। করুণা মাসির একমাত্র মেয়ে, আদুরে মেয়ে রিণি।

করুণা মাসিদের নার্সারির খুব সুনাম আছে। পাটনাতে ফুলের এগজিবিশনে বার বার অনেকবার প্রাইজ পেয়েছিল করুণা মাসিদের অলকা নার্সারির রক্তগোলাপ। সেই রক্তগোলাপের একটা তোড়া বেঁধে নিয়ে এসে রিণি বলেছিল,—বাণীদিকে দেবে।

—কেন ? বাণীদি চেয়েছে নাকি ?

—না।

—তবে ?

—তবে আবার কি ? চাইবে কেন ? বাণীদি না চাইলেও দিতে হয়।

খুব সন্দেহ হয়েছিল মণীশের, রিণির ওই সহজ-সরল ভাষার মধ্যে কোনও জটিল বুদ্ধি লুকিয়ে নেই তো !

যাই হোক, রঘুকাকার বাড়িতে আরও তো একজন আছেন, যাঁর নাম হিরুদা। রঘুকাকার ছেলে হিরন্ময়। ভয় হয়, হিরুদা বোধ হয় এই ভোরেই জেগে বসে আছেন।

না, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। জগেশপুরের ভোরবেলার এই মৌনতা আর বেশিক্ষণ থাকবে না। দেখতে পাওয়া যায়, হিতেশবাবুর বাড়ির ইউকালিপটাসের মাথাতে এরই মধ্যে রোদ লেগেছে। গোলাপের মিষ্টি গন্ধও বাতাসে ছড়াতে শুরু করেছে। নিশ্চয় করুণা মাসিদের অলকা নার্সারির গোলাপের গন্ধ। এখান থেকে তাড়াতাড়ি পা ফেলে আরও দশ-বারোটা বাড়ির ফটক পার হয়ে, তারপর বাঁয়ের রাস্তায় ঘুরে-ফিরে, মাত্র পাঁচ মিনিট হাঁটা দিলেই করুণা মাসির বাড়ি।

শেষরাতের ট্রেনটা জগেশপুর স্টেশনে মাত্র এক মিনিট থামে আর চলে যায়। কিন্তু কী আশ্চর্য, লোকেও বলে যে, শেষ রাতের গাড়িটা এত শব্দ করে ছুটে গেলেও জগেশপুরের ঘুম ভাঙে না। মনে হয়, জগেশপুরের শেষ রাতের ঘুমটা আরও জমাট হয়ে ওঠে। সত্যি কথা, শেষরাতের ট্রেন যখন মহেশ পাহাড়ের গা-ঘেঁষা শালবনের ভিতর দিয়ে ছুটে যায়, তখন ট্রেনের একটানা গুরগুর শব্দটা যেন ঘুমপাড়ানি মায়ার শব্দ হয়ে ওঠে। বেশ বেলা হয়, তখন জগেশপুরের ঘুম ভাঙে। রঘুনাথবাবু বলেন, জগেশপুরের কাকের ঘুমও দেরিতে ভাঙে। মণীশ কিন্তু জানে, হিরুদার ঘুম কাকের ঘুম ভাঙবার আগেই ভাঙে। অতএব, যদি হিরুদার অদ্ভুত হাসি আর যতসব অদ্ভুত কথার হল্লা থেকে বাঁচতে হয়, তবে এখুনি সরে পড়া ভাল।

অসম্ভব নয়, হিরুদা হয়ত আজই এবং এই মুহূর্তে এমন একটি কথা জিজ্ঞাসা করে বসবেন, যে কথা হিরুদার মত একজন চল্লিশ বছর বয়সের জ্যেষ্ঠ মানুষের পক্ষে মণীশের মত একজন ত্রিশ বছর বয়সের কনিষ্ঠ মানুষকে না বললেই ভাল হয়। হিরুদা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছেন যে, আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে, মণীশের বয়স যখন দশ বছর, তখন স্টেশনের চায়ের দোকানে মণীশকে সিগারেট খেতে দেখে ওই হিরুদা দুই চোখ কটমট করে তাকিয়ে ছিলেন, আর ছুটে এসে মণীশের একটা কান ধরেছিলেন,—কি রে ছোঁড়া, সিগারেট বানান করে বল তো একবার, শুনি ! সেই হিরুদা সেদিন, অর্থাৎ জার্মানিতে যাবার জন্যে কলকাতা রওনা হবার আগের দিন মণীশকে বললেন,—যাচ্ছিস তো, কিন্তু যাবার আগে বেশ একটু জুতসই বিদায় নিয়েছিস তো ?

—কিসের বিদায় ?

—তা জানি না। কিন্তু বিদায় নেবার সময় বিদায়ের স্বাদটা একটু ভাল করে চেখে নিয়েছিস তো ?

—কিছুই বুঝলাম না।

—অর্থাৎ, ঠিক সন্ধ্যাবেলাটিতে, ঘরের ভিতরে যখন আলো আর বারান্দাতে আধো-আলো আধো-ছায়া, তখন তাকে কাছে ডেকে নিয়ে একটি হাত ধরে...কিংবা ধরো, বাড়ির গেটের কাছে যে লতাকুঞ্জটা আছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে, তার কানের কাছে একটা কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ ভুল করে একেবারে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে...

নাম-ধামের কোনও কথা না বলে হিরুদা যা বলছেন, সেটা তো অস্পষ্টতার একটা হেঁয়ালি। কিন্তু মণীশ স্পষ্ট করেই বুঝতে পারে, কী বলছেন হিরুদা। কিন্তু জানেন না হিরুদা, ওরকম কোনও ব্যাপারই হয়নি। হিরুদা বাণীকে চিনতে ও বুঝতে ভুল করেছেন। মণীশকেও চিনতে ভুল করেছেন বৈকি। বাণীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়, সে শুধু একটি কথাই বলেছিল,— এখন শুধু অপেক্ষা। মণীশ বলেছিল,—মাত্র তিনটি বছর।

ঘরের বাইরে নয়, ভিতরে। ঘরের ভিতরে আলোও ছিল। কী অদ্ভুত রকমের একটা দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল বাণীর দুই চোখে। যেন দুঃসহ একটা বিষাদ জোর করে হাসতে চেষ্টা করছে বাণীর

দু'চোখের সেই জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে।

হিরুদার প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি মণীশ। হিরুদা চেঁচিয়ে হেসে উঠলেন, মণীশের পিঠের উপর জোরে একটা চাপড় মারলেন, বললেন,—এঃ, তুই সত্যিই একটা পিটার প্যান। তোর বয়স বেড়েছে, কিন্তু তুই বাড়িসনি।

মীরা কাকিমার পায়ের পাতার এক জায়গায় হাড়ে একটা ব্যথা আছে। আজও মনে পড়ে, ভুলে যায়নি মণীশ, সে আজ প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা, একদিন বাঘের চামড়ার এই বাড়িতে এসে দেখতে পেয়েছিল মণীশ, মীরা কাকিমা পায়ের ব্যথায় কাঁদছেন। তেল-ওষুধটা টেবিলের উপরেই ছিল। মণীশ তখুনি সেই তেল-ওষুধ নিয়ে মীরা কাকিমার পায়ে মালিশ করে দিয়েছিল। মীরা কাকিমা হেসে হেসে কেঁদেছিলেন আর বলেছিলেন,—তুমি মণীশ সত্যিই আমার আর জন্মের ছেলে।

সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন হিরন্ময়,—কী বললে মা ?

মণীশ হেসে ওঠে,— আমি আর জন্মে মীরা কাকিমার ছেলে ছিলাম।

হিরণ্ময়,—খুব ভাল কথা। আমি বলি, এ জন্মেও মীরা কাকিমার ছেলেটি হয়ে যাও না কেন ? আমি তা হলে রক্ষা পাই।

মণীশ,—তাব মানে ?

হিরণ্ময়,—তার মানে, রঘুনাথ সরকার তা হলে একজন খাঁটি পুত্র নিয়ে আর পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনী ইত্যাদি নিয়ে সুখের জীবন উপভোগ করতে করতে আর শান্তি শান্তি বলে পটল তোলবার সৌভাগ্য লাভ করবেন।

মণীশ জানে, মীরা কাকিমা আর রঘুকাকার জীবনেও এটা একটা বড় দুঃখ, হিরুদা বিয়ে করতে চান না, করবেনও না। পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে রঘুকাকার একটা বেশ বড় বাঁশের জঙ্গল লিজ নেওয়া আছে। আগে সেই জঙ্গলের আয় খুব ভালই ছিল। এখন আর তেমন নয়। বয়সের ভারে হোক, কিংবা মন প্রাণেরই কোনও একটা আলস্যের ভারে রঘুকাকা এখন আর বাঁশের কারবারের কাজে তেমন কোনও উৎসাহ বোধ করেন না। সমস্যা এই যে, হিরুদারও তেমন কোনও উৎসাহ নেই। জঙ্গলের কাজ দেখাশোনা করেন একজন পাঁচুবাবু। প্রতিমাসে একবার করে জগেশপুরে আসেন ; আর হিসেব দেখিয়ে যে টাকা রঘুকাকার হাতে তুলে দিয়ে যান, সেটাই কারবারের লাভ বলে মেনে নিতে হয়।

হিরুদা বলেন,— আমি যদি একটু কর্মিষ্ঠ হয়ে জঙ্গলেব কারবারের তদারকি করি, তবে ফল খারাপ হবে। পাঁচুবাবুর চুরির প্যাঁচ ভাঙতে গিয়ে শুধু আমার রক্তই জল হবে। আর কোনও লাভ হবে না। পাঁচবাবু তাঁর উদরপূর্তি করে নিয়ে ঝড়তি-পড়তি যতটুকু দিয়ে যান, তাই লাভ।

হিরুদার বিছানাতে গল্প আর উপন্যাসের বই ছড়িয়ে পড়ে থাকে। বইগুলিকে ঠেলে-ঠুলে মাঝখানে একটুখানি জায়গা করে নিয়ে তার মধ্যে নিদ্রাযাপন করেন হিরুদা। হিরুদা বলেন,—সবই রাবিশ, তবে সুবিধে এই যে, এগুলোকে ইচ্ছে করলেই এক লাথি মেরে সরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু একবার এই সব কাববার-টারবারের মধ্যে পড়লে নিজেও রাবিশ হয়ে যাব। উঃ, পাঁচুবাবুকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ বছর কত টাকার বাঁশ বিক্রি হল ? পাঁচবাবু মুখ টিপে একটু হেসে নিয়ে কী জবাব দিলেন শুনবে ?

—কী ?

—পাঁচুবাবু বললেন, কোলিয়ারির এক সাহেব আমাদের জঙ্গলের কুঠিতে দশ বোতল স্কচ-হুইস্কির একটা কেস ফেলে রেখে বিলেতে চলে গিয়েছে। কী যে করব বুঝতে পারছি না। আপনাকে পাঠিয়ে দেব ছোটবাবু ?

কিন্তু বিয়ে করেননি কেন, বিয়ে করবেন না কেন হিরুদা ? মীরা কাকিমা বলেন,— ভগবান জানেন। রঘুকাকা বলেন,— ওর মাথায় ছিট আছে। হিরুদা কিন্তু বেশ মুক্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন,— বুড়ো-বুড়ির সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে। কোথাকার কোন এক মহীয়সী এসে নাক সিঁটকোবেন আর সবাইকে ঘেন্না করবেন, কী আশ্চর্য, এঁরা তাই চাইছেন মণীশ।

মণীশ হাসে। রঘুকাকা আর মীরা কাকিমাও হাসেন। হিরুদা কিন্তু উত্তেজিত স্বরে বলতেই থাকেন,— আমি একটু বাড়িয়ে সন্দেহ করছি না মণীশ। তুই জানিস না, বাবার গায়ের গেঞ্জিতে কী বিশ্রী ঘামের গন্ধ। আর, মা-র ওষুধগুলোতে তাব চেয়েও বিশ্রী গন্ধ। এসব সহ্য করবেন কোনও মেয়ে সহ্যাদ্রি ? অসম্ভব।

মীরা কাকিমার খাটের পাশে আর একটি খাট আছে। এই খাটেই হিরুদার বিছানা। সারা রাতের মধ্যে দু'বার মীরা কাকিমার মাথায় একটা তেল মালিশ করতে হয়, আর পায়ে সেই হাড়ের ব্যথার তেল! মাঝরাতে শ্বাসকষ্ট একটু বাড়ে, হাঁসফাঁস করেন মীরা কাকিমা। তখন তাঁকে তুলে ধরে বিছানার উপর বসিয়ে দিতে হয়। হিরুদা যদি সারারাত কাছে না থাকেন, তবে কেমন করে এরকম একজন রোগিনীর ওরকম সেবা হবে ?

হিরুদা চেঁচিয়ে ওঠেন,—লজ্জার কথা, লজ্জার কথা।

সত্যি, যে কথাটা চেঁচিয়ে বলে ওঠেন হিরুদা, সেটা সকলকে লজ্জা পাইয়ে দেবার মত কথাই বটে। হিরুদা বলেন,—স্ত্রী নামক মেয়েমানুষটি কি আমাকে এখানে মা-র কাছের খাটে শুয়ে থাকতে দেবে ? কী লজ্জার কথা, আমি ওদিকের ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে শুযে থাকব, আর বুড়ি মা এ ঘরে পক্ষাঘাতের শরীর আর হাড়ের ব্যথা নিয়ে একা পড়ে থাকবে, তা হয় না মণীশ।

—কিন্তু উল্টোটাও তো হতে পারে !

—কী রকম ?

—আমাদের বৌদিই এ ঘরে কাকিমার কাছের খাটে ..

—বুঝেছি বুঝেছি। তুমি বলতে চাইছ, পৃথিবীতে এমন নারীও আছেন, যিনি স্বামীকে সব ঝঞ্ঝাটের দায় থেকে মুক্ত করে দিয়ে, স্বামীকে ওদিকের ঘরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবার সুযোগ করে দিয়ে, নিজে এ ঘরে থাকবেন, রাত জাগবেন আর শাশুড়ি নামে একটা মানুষের সেবা করবেন।

—থাকতে পারে। অসম্ভব নয়।

হিরুদা,—তা হলে সে অসম্ভব সম্ভব করবাব দায়িত্বটা তুমি নিলেই তো পার।

সেদিন মীরা কাকিমার ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে যখন সিগারেট ধরাবার জন্যে একটু দাঁড়িয়েছিল মণীশ, তখন হিরুদাও ঘরের বাইরে এসে মণীশের কাছে দাঁড়িয়েছিল। মণীশ কোনও কথা বলেনি, কিন্তু হিরুদা নিজেই, যেন আনমনার মত বিড়বিড় করে কয়েকটা কথা বলেছিলেন,--শুধু এক আমাকে ভালবাসলেই কোনও মেয়েকে আমি বউ করে ফেলতে পারি না। আমার বাড়ির মানুষগুলোকেও তার ভালবাসতে পারা চাই।

ভাষা শুনে মনে হয়, হিরুদা যেন তাঁর একটা প্রিয় থিওরির কথা বলছেন। কিন্তু যেভাবে বলছেন, তাতে মনে হয়, তাঁর বুকের ভিতর থেকে একটা আশার কথা উথলে উঠছে। নাম-ধাম স্পষ্ট করে কিছুই বলছেন না। একটা হেঁয়ালি বলেই মনে হয় ; কিন্তু নিতান্ত মিথ্যে হেঁয়ালি বোধ হয় নয়।

হিরুদা আবাব বলেন,— আমি কিন্তু আমার কথা বলছি না মণীশ, বলছি আর একজনের কথা। জানি না, সে এসব কথার মানেটা ঠিক বুঝতে পারছে কি পারছে না।

মণীশের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে, দোতলা থেকে নেমে নীচের তলায় সেদিন এসেছিলেন হিরুদা। তারপর আরও একটু এগিয়ে এলেন ; একেবারে ফটক পর্যন্ত। সড়কের উপর দাঁড়িয়ে আর একবার কথা বললেন,—হিতেশবাবু খুব ভাল একটা কনট্রাক্ট পেয়েছেন। নতুন রেল লাইনে মোট এগারোটা ছোট-বড় কালভার্ট তৈরি করবার কনট্রাক্ট। তিনি নিজেই বললেন,—হেলাফেলা করে কাজ করলেও বিশ-বাইশ হাজার টাকা লাভ হবে।

শন শন করে ঝড় বইতে শুরু করেছে। আকাশেও তারা নেই। পুবদিকের মেঘে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর, হিতেশবাবুর বাড়ির ইউকালিপটাসের শুকনো পাতা মরা ফড়িংয়ের ঝাঁকের মত সড়ক ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে।

মণীশ বলে,—চলি হিরুদা।

সেই হিরুদা আজ এখন হয়ত জেগে উঠে ঘরের ভিতরই বসে আছেন। যাই হোক, আর এখানে

দাঁড়িয়ে থাকার কোনও অর্থ হয় না। হিতেশবাবুদের ইউকালিপটাসের মাথায় রোদের আলোর মধ্যে বসে একজোড়া পায়রা এখন ঠোঁট দিয়ে গায়ের পালক খুঁটছে।

॥ ২ ॥

হিতেশবাবু যদি এখন জেগে উঠে বাড়ির বাইরে আসতেন, কিংবা জানালা খুলে সড়কের দিকে তাকাতেন, তবে মণীশকে দেখতে পেয়ে তিনিও নিশ্চয় খুশি হয়ে একটা ডাক দিতেন,— কবে দেশে ফিরলে মণীশ ?

কিন্তু জানা আছে, এ সময়ে জেগে ওঠা এ বাড়ির কারও জীবনের নিয়ম নয়। করুণা মাসি বলেছেন,—এ বাড়িতে চারবেলা ভাত রান্না হয়। সকাল ন'টার সময় গরম ফেনভাত, আলুর একটা তরকারি আর ডিমভাজা। যতক্ষণ প্রথম দফার এই রান্না শেষ না হয়, ততক্ষণ বাড়ির কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠে না। জেগে উঠলেও বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকে। মেজবাবু ক্ষিতীশ বিছানাতে শুয়ে শুয়েই গান করেন। মেজবউ নলিনী বিছানার উপরে বসেই রুমাল সেলাই করেন। ছেলেরা বিছানাতে শুয়ে-গড়িয়ে খেলা করে, মারামারি করে। হিতেশবাবুর স্ত্রী, অর্থাৎ বাড়ির বড়গিন্নি রেণুকণা বিছানাতে বসে বাজারের ফর্দ আর হিসেব লেখেন। রেণুকণার এক জেঠিমা, বয়স যাঁর বিরানব্বুই বছর, তিনিও এই সংসারে থাকেন। তাঁর বিছানাতে অয়েলক্লথ চব্বিশ ঘণ্টা পাতাই থাকে। চোখে দেখেন না, কানে শোনেন না, প্রশ্ন করলে জবাব দেন না। জবাব দিলেও ভুল বলেন। নিজের নামটাও বলতে পারেন না। ডাক্তার বলেন,— দিদিমার স্মৃতিশক্তি বলে কোনও বস্তু আর নেই। এ হেন দিদিমার বিছানার ভিজে অয়েলক্লথের সঙ্গে দিদিমাও সকাল ন'টা পর্যন্ত ভিজে চবচবে হয়ে পড়ে থাকেন। ক্লথ বদলানো হয়, দিদিমাকেও ধোওয়ানো-মোছানো হয় বেলা ন'টার পর।

সকালবেলার রান্নার কাজ শেষ করবে সুধা, তারপর তো দিদিমার ঘরের কাজ হবে ! নইলে কে আর করবে ? এ বাড়ির সব কাজই সুধার কাজ। হিতেশবাবু শেষরাতে চারটের সময় একবার জেগে উঠে যখন মিছরির জল পান করেন, তখন জেগে উঠে ঘরের কাজে হাত দেয় ওই সুধা, যে মেয়ে এ বাড়ির ঠিক আপনজন নয় বটে, কিন্তু একটা সম্পর্কের জন ; মেজবউ নলিনীর মামাতো বোন, যাঁর নাম মনোরমা, যিনি পূর্ণিয়ার উকিল গুরুদাস দত্তের স্ত্রী, তাঁরই মেয়ে সুধা।

মণীশের মেসোমশাই, জগেশপুরের অলকা নার্সারির ভবতোষবাবু একদিন করুণা মাসির কাছে গল্প করে বলেছিলেন, তাই জানতে পেরেছিল মণীশ ; শুধু মণীশ কেন, রঘুনাথবাবু, জয়ন্তবাবুও জানেন, এমন কি শর্মাজিও জানেন যে, সুধা নামে এই মেয়েটি হল হিতেশবাবুদের অতি দূর সম্পর্কের একজন কুটুম্ব মানুষের মেয়ে। সুধার বাবা গুরুদাস দত্তকে ভবতোষবাবু চিনতেন। তাই ভবতোষবাবু একটু বেশি করে জানেন যে, মানুষের ভাগ্যের সাজানো বাগান শুধু শুকিয়ে যায় না, পুড়েও যায়। গুরুদাসবাবুর সাজানো বাগান সত্যি একদিন পুড়েই গিয়েছিল। অনেক টাকা দেনা করে পাটের কারবার শুরু করেছিলেন উকিল গুরুদাসবাবু। লোকে বলে, উকিল লক্ষ্মীশ্বরবাবু লোক লাগিয়ে গুরুদাসবাবুর পাটের গুদামে আগুন লাগিয়েছিলেন। পুলিস বলে, একটা পোড়া বিড়ির আগুন থেকে বড় অগ্নিকাণ্ড হয়ে ওই পাটের গুদাম পুড়ে ছাই হয়েছিল। গুরুদাসবাবু এই দুর্ঘটনার তিনমাস পরে আত্মহত্যা করলেন, স্ত্রী মনোরমা আর একটা বছর পরে নিউমোনিয়াতে মারা গেলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়ে-স্কুলে পড়াবার একটা চাকরি নিয়েছিলেন মনোরমা। কিন্তু ওই, মাত্র একটি বছর চাকরি করতে পেরেছিলেন। ষোল বছর বয়সের মেয়ে সুধা, সেই বছরেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা ছিল যার, সেই মেয়ে তারপর থেকে জগেশপুরের এই হিতেশবাবুর বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে ও আছে।

ঘটনাচক্র বলে একটা কথা আছে। ঠিকই, ঘটনাচক্রই বটে। মেজবউ নলিনী সেদিন তাঁর মেজভাইয়ের বিয়েতে বরযাত্রিণী হয়ে পূর্ণিয়াতে এসেছিলেন, আর খোঁজ করেছিলেন, উকিল গুরুদাস দত্তের বাড়িটা কোথায়।

প্রশ্ন শুনে মেয়ের বাড়ির তিন মহিলা ও এক ভদ্রলোক চমকে উঠলেন, যেন একটা আশার চমক। সবাই যেন এরকম একটা প্রশ্নের কথা শোনবার আশায় কান পেতে ছিলেন।

না, সেই গুরুদাস দত্ত নেই। তাঁর স্ত্রী মনোরমাও নেই। আজই শেষরাতের একটি মুহূর্তে, পূর্ণিয়া জেলের বিউগল যখন ঘুমভাঙানি সুর বাজাতে শুরু করেছে, তখন স্কুলের টিচারদিদি মনোরমা তাঁর মেয়ের একটা হাত ধরে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়লেন। মনোরমার দুঃখের জীবনের নিশিভোর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এঁরা ভাবছেন, মেয়েটার জীবনে দুঃখের দিন এইবার একেবারে সব রোদের জ্বালা নিয়ে দেখা দিল। এই মেয়েকে দেখবে কে ? থাকবে কোথায় মেয়ে ? পৃথিবীতে ওর আপনজন কে আছেন, কোথায় আছেন ? চারুদি বলেছেন, অন্তত ম্যাট্রিকটা পাস করা থাকলে সুধাকে তিনি এই স্কুলেরই টিচার করে নিতে পারতেন। স্কুলের সেক্রেটারি হৃদয়বাবুও তাই বলেন। কিন্তু...সেটা যখন হবার নয়, তখন সুধার পক্ষে এখন ওর কোনও আপনজনের আশ্রয়ে থাকা উচিত। মেয়েটা দেখতে সুন্দর, স্বভাবে অত্যন্ত শান্ত নিরীহ। এমন মেয়েকে শুধু চেনা-জানা কোনও সদয় ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় দিলেও সমস্যার ভয় থেকে যায়।

সেদিন যার বাড়িতে ছিল সুধা, সেই চারুদি খবর পেয়ে একেবারে সুধাকে সঙ্গে নিয়ে নলিনীর কাছে এসে খুবই করুণ অনুরোধের কথা নিবেদন করলেন,—আপনি যখন সুধার আপনজন তখন আপনিই সুধাকে নিয়ে যান, নিজের কাছে রাখুন। এখানে কোনও পরের বাড়িতে মেয়েটার পড়ে থাকা ওর ভবিষ্যতের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়। সবই বুঝতে পারেন আপনি।

নলিনী বলেন,— কী আশ্চর্য, আমার মামাতো বোনের মেয়ে, তাকে একেবারে আমার একটি আপনজন বলে মনে করছেন কেন আপনারা ?

বিধুবাবু বলেন,— ঠিক কথা, সুধা আপনার খুব নিকট সম্পর্কের কেউ নয়। যাকে বলে আপনজন, ঠিক তা নয়। কিন্তু আমরা তো জানি না, ওর সত্যিকারের আপনজন বলতে কে কে আছেন, কোথায়ই বা আছেন ! আমরা শুধু জানি, গুরুদাসবাবুর দেশ হল বৈদ্যবাটি। এর বেশি কোনও খবর এ শহরের কোনও ভদ্রলোক বোধ হয় জানেন না। গুরুদাসবাবু তো তেমন একজন মিশুকে স্বভাবের মানুষ ছিলেন না। পুরো পাঁচটা বছর এখানে থেকে ওকালতি আর পাটের কারবার করলেও তিনি তাঁর নিজের কথা কারও কাছে কখনও গল্প করেও বলেননি। তাঁর স্ত্রী মনোরমাও বিধবা হবার পর কোনও আপনজনের কাছে চলে যাবার ইচ্ছে করেননি। তিনি বলতেন,— ভগবান ছাড়া আমার কোনও আপনজন নেই। এখন আপনিই দয়া করে সুধাকে কোনও আপনজনের কাছে পাঠিয়ে দেবার দায়িত্বটা নিন।

বিধুবাবুর অনুরোধের কথা শুনেও নলিনীর চোখ-মুখের সেই গম্ভীর ভাবের ছায়াটা সরে না। কথা বলেন না, জগেশপুরের ক্ষিতিশবাবুর স্ত্রী নলিনী। সুধার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেনও নলিনী। কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে, এলোমেলো চুল ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। এই বয়সের মেয়ের মাথায় এত চমৎকার কালো কুচকুচে চুলের বোঝা ! নলিনী বোধ হয় একটু আশ্চর্য হয়ে সুধার মাথার ওই চুলের বোঝাটাকে দেখেছিলেন।

চারুদি বললেন,—সুধা খুব শান্ত মেয়ে, খুব কাজের মেয়ে।

নলিনী,— কী বললেন ?

চারুদি,—পড়াশোনার চেয়ে কাজ বেশি ভালবাসে এই মেয়ে। রান্না বলুন, ঘর সাজানো বলুন, সেলাই বলুন, সবই পারে সুধা। চমৎকার ফুলবাগান করতেও জানে। পাখি পুষতেও জানে। কোথা থেকে একবার একটা পাহাড়ি ময়না উড়ে এসে বসেছিল ওদের বাড়ির উঠোনের লেবুগাছে। বাজে ঠুকরে দিয়ে ময়নাটাকে জখম করে দিয়েছিল। মরেই যেতে বসেছিল পাখিটা। কী আশ্চর্য, সুধার হাতের সেবা যত্নের গুণ। প্রায়-মরা পাখিটাকে সত্যিই বাঁচিয়ে তুলল সুধা। বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন চারুদি,—সেই পাখি শেষে ছড়া কাটতেও শিখেছিল, খুকুমণির বিয়ে হবে সঙ্গে যাবে কে ?

হেসে ফেলেন নলিনী। খুবই স্বচ্ছ আর মুক্তকণ্ঠ হাসি। সেই সঙ্গে দু' চোখের এতক্ষণের গুমোট ভাবটাও ফিকে হয়ে যায়। নলিনী বলেন,— সত্যিই তো, খুব কাজের মেয়ে বলতে হবে।

এরপর আর কোনও আপত্তি করেননি নলিনী। সুধাকে সঙ্গে নিয়েই চলে এলেন। পূর্ণিয়া থেকে

প্রথমে রায়গঞ্জ, তারপর জগেশপুর।

আগন্তুকা সুধাকে দেখে এই ইউকালিপটাসের বাড়ির সব মানুষ সেদিন বেশ আশ্চর্য হয়ে, আর হিতেশবাবু বিশেষ একটু চিন্তিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন,—কে এই মেয়ে ?

নলিনী বললেন,— খুব কাজের মেয়ে।

হিতেশবাবু,—অ্যাঁ, কাজের মেয়ে, সব কাজ জানে ?

নলিনী,—হ্যাঁ।

অনেকেই এসব বিশেষ তথ্যের অনেক কিছুই জানে না। সবাই জানে, সেই যে সুধা নামে মেয়েটি একদিন ঘটনাচক্রে এ বাড়িতে চলে এল, সেই থেকে এ বাড়িতেই রয়ে গিয়েছে। সেদিন যদি সুধার বয়স ষোল বছর হয়ে থাকে, তবে আজ সুধার বয়স অন্তত চব্বিশ-পঁচিশ হবে।

তিন বছর আগে, জার্মানিতে যাবার জন্য কলকাতা রওনা হবার আগের দিন একটা সাধারণ ভদ্রতার দেখা দিয়ে যাবার জন্যে মণীশ হিতেশবাবুর বাড়িতে এসেছিল। মেসো ভবতোষ বার বার বলেছিল,—যাও মণীশ, হিতেশবাবুর সঙ্গেও একবার দেখা করে এসো। নইলে ভাল দেখায় না। রঘুনাথবাবুর বাড়িতে তিনবার দেখা করতে যাবে, আর পাশের বাড়িতে একবারও যাবে না, এটা উচিত নয়।

খুব ভদ্রতা করেছিলেন হিতেশবাবু। প্রায় দুটি ঘণ্টা মণীশকে বসিয়ে রেখে অনেক গল্প করলেন। কেন যাচ্ছ জার্মানিতে ? কী শিখতে ? কোনও স্টেট স্কলারশিপ পেয়েছ বুঝি ? পাওনি ? তবে ভবতোষবাবু নিজেই সব খরচ দিচ্ছেন ? ফুলের ব্যবসা বোধ হয় আবার ভাল জমেছে ! তাই না ?

খুব ভদ্রতা, মানে এক কাপ চা খাইয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন হিতেশবাবু। সেই প্রথম একটু বেশি স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছিল মণীশ, কে ওই মেয়ে সুধা, যার কথা করুণা মাসি গল্প করে বলেছেন। বুঝতে দেরি হয়নি মণীশের, করুণা মাসি সুধার নামে আরও যেসব কথা বলেন, তার সবই মোটামুটি সত্যি।

হ্যাঁ, খুবই কাজের মেয়ে ওই সুধা। হিতেশবাবুর ঘরের ভিতরে বসে খোলা জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেয়েছিল মণীশ. উঠোনের কুয়োর কাছে বসে এঁটো বাসন মাজা-ধোয়া করছে যে মেয়ে, তার কুচকুচে কালো চুলের একটা মস্তবড় খোঁপা কেঁপে-কেঁপে ভাঙছে আর ঘাড়ের উপর নামছে।

বাড়ির এঘর আর ওঘর থেকে অবিরাম ডাক শোনা যায়, ব্যস্ত ও বিরক্ত এক একটা ডাক,— কই গো মেয়ে, কুয়োতলাতেই সন্ধ্যা করে দেবে নাকি ? আর কাজ নেই ?

এই ডাক আর এই অভিযোগের তপ্ত ভাষাটা যে হিতেশবাবুর স্ত্রীর ডাক আর ভাষা, বুঝতে পারে মণীশ। হিতেশবাবুর স্ত্রীর গলাভাঙা কণ্ঠস্বর এই জগেশপুরের সবাই একদিন না একদিন শুনেছে, মাঝে মাঝে শুনেও থাকে। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে জিনিস কিনে নিয়ে ওই গলাভাঙা স্বরেই যেসব ধমক-ধামক দেন আর বকাবকি করেন বড়গিন্নি, তার শব্দ সড়কের মানুষও শুনতে পায়। জিনিস আগে ঘরে তুলে নিয়ে তারপর ফেরিওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করেন বড়গিন্নি। ফেরিওয়ালা বলে,— জিনিস ফেরত দিন, আমি ও দামে জিনিস বেচব না। বড়গিন্নি বলেন,— একবার ঘরে তুললে জিনিস কি কেউ ছেড়ে দিতে পারে ? অলক্ষ্মীর ভয় নেই ? আমি দেড় টাকার বেশি দেব না বাপু।

—সাড়ে তিন টাকার তোয়ালেটা আপনি দেড় টাকায় নেবেন ?

—বাজে কথা বলো না বাপু। সাড়ে তিন টাকা দাম হতেই পাবে না।

—আপনি জিনিসটা ফেরত দিন।

—তা হয় না। বড় জোর দু'টাকা দিতে পারি।

—দু'টাকায় হবে না মাঈজি। আমার কেনা-দাম আড়াই টাকা।

—তা হলে আজ দু'টাকা নিয়ে যাও, আসছে মাসে এসে আট আনা নিয়ে যেও।

—তাই দিন।

টাকাটা হাতে তুলে নিয়ে ফেরিওয়ালা বলে,—আসছে মাসে বাকি আট আনা নিতে আমি আর আসব না। ওই আট আনা আপনাকে জিলিপি খেতে দিয়ে গেলাম।

চেঁচিয়ে ওঠেন বড়গিন্নি, গলাভাঙা স্বরের একটা ক্রুদ্ধ চিৎকার। — ছোট মুখে এত বড় কথা। হতভাগা, অসভ্য ফেরিওয়ালা ! জানিস তুই, তোর মত তিনশো হা-ভাতে আমার ওঁর কারবারে কুলি খেটে পেট চালায় ?

এটা কোনও নিন্দুকের প্রচারিত মিথ্যে অপবাদেব গল্প নয়। মণীশ নিজেও একদিন প্রায় এই রকমের একটি ঘটনাকে এই সড়কে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছিল। শুধু মণীশ নয়, আরও অনেকে বুঝে উঠতে পারে না, মাসে অন্তত দু'তিন হাজার টাকা যাঁর রোজগার, সেই হিতেশবাবুর স্ত্রী এরকম কাণ্ড করেন কেন ?

একটা কথা, সেটা একটা রাগী ঠাট্টার কথা নিশ্চয়। ভোলাবাবু বলেন,— আমি বলছি মণীশ, তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পারো, হিতেশবাবুর বাড়ির ওই প্রকাণ্ড ইউকালিপটাস গাছের ছায়া নেই, ছায়া হয় না।

কোনও সন্দেহ নেই, ওটা একটা ঠাট্টার গল্প। কিন্তু হিতেশবাবুর ঘরের ভিতরে বসে খোলা-জানালার দিকে তাকাতে গিয়ে যে দৃশ্যটা দেখতে পায় মণীশ, সেটা ঠাট্টার দৃশ্য নয়। সত্যিই ছায়া নেই। কুয়োতলাতে কড়া রোদের ঝাঁঝের মধ্যে এঁটোলোভী কোনও কাকও উড়ে এসে বসছে না। কিন্তু বাসন মাজছে সুধা। সুডৌল সুগৌর দুটো হাত একের পর এক বাসন তুলছে আর মাজছে। থালা বাটি গেলাস ডেকচি, কড়াই তাওয়া হাতা খুন্তি, আরও কত কী !

—কই সুধা, আমার তোয়ালেটা কখন কেচে দেবে ? সুধাদি তুমি কোথায়, কানে শুনতে পাচ্ছ না, আমার ফ্রকের ছেঁড়াটা সেলাই করে দাওনি কেন ? সারা বাড়িটা যেন হরেক রকমের দরকারের তাড়নাতে ছটফট করে চিৎকার করছে। তারই মধ্যে খুব চাপা গলার একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বরের তাড়না বেজে ওঠে,— চারটে বাজতে চলেছে, আমার খই-দুধ কোথায় ? সুধা তুমি কোথায় ? বুঝতে অসুবিধে নেই, এটা ক্ষিতীশবাবুব কণ্ঠস্বর।

কুয়োতলার কাছে যখন কোনও কাজের আত্মা আব ব্যস্ত হয়ে কাজ করে না, রোদের ঝাঁঝ নরম হয়ে এসেছে, দু'চারটে কাকও উঠে এসে কুয়োতলার কাছে হুটোপুটি করতে শুরু করেছে, তখন ডাক দিলেন স্বয়ং হিতেশবাবু,—কই সুধা, এ ঘরে এক কাপ চা দিয়ে যাও।

দেখে আশ্চর্য হয় মণীশ, সুধা শুধু কাজেব একটা অবিরাম ব্যস্ততা নয়, বেশ একটা দক্ষতাও বটে। পাঁচ মিনিটও পার হয়নি, এক পেয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল সুধা।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন হিতেশবাবু,—এ কী ব্যাপার ? তুমি চা তৈরি করতে এত এক্সপার্ট কবে হলে, সুধা ? চা'টা কি আগেই তৈরি করে রেখেছিলে ?

সুধার সারা মুখটা হঠাৎ বড় বেশি লাজুক হয়ে হেসে ওঠে। — না, জল আগেই চড়িয়ে রেখেছিলাম।

—সে কী ! সে কী ! এত ব্যস্ততা কিসেব ? কারণটা কী ? আবার চেঁচিয়ে হাসতে গিয়ে অদ্ভুত রকমের গম্ভীর হয়ে গেলেন হিতেশবাবু।

মণীশের সামনে ছোট টেবিলের উপর চায়ের কাপ রেখে দিয়ে চলে গেল সুধা। হিতেশবাবু আবার হাসতে থাকেন, খুবই স্নিগ্ধ করুণতার হাসি। —এ এক দায়িত্ব ইচ্ছে করেই মাথায় চাপিয়েছি, মণীশ। কী করব বলো ? সম্পর্কের দিক দিয়ে তেমন কিছু না থাকলেও একটা ভদ্রলোকের মেয়ে তো বটে ! মন বলল, মেয়েটাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, তাই দিলাম। আমার সান্ত্বনা এই যে, সুধা এখন এ বাড়ির মেয়ে হয়ে গিয়েছে। আনন্দে, খুব আনন্দে আছে সুধা।

আনন্দে তো আছে, কিন্তু করুণা মাসি বলেন পুজোর দিনে একটু বাইরে বেড়িয়ে মেয়েটাকে একটু আনন্দ করতে দেন না কেন বড়গিন্নি ? হিতেশবাবুর বাড়ির সবাই মধুপুরে থিয়েটার দেখতে যায়, শুধু একা সুধাই বাড়িতে পড়ে থাকে। ভোলাবাবুর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্নের হই-হল্লার মধ্যে জগেশপুরের সব বাঙালি বাড়ির মেয়েদের কলরব শোনা গিয়েছিল। শুধু ওই এক সুধাকে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়নি। অথচ ভোলাবাবু বার বার নাম করে আর চেঁচিয়ে বলেছিলেন,— আপনারা

সবাই যাবেন হিতেশবাবু, সুধাও যেন অবিশ্যি যায়। ও সুধা মা, তুমি কোথায় ? নীপুর বিয়েতে তোমার আসা চাই-ই চাই। তুমিই নীপুকে সাজাবে।

কিন্তু নীপুর বিয়েতে যায়নি সুধা। বড়গিন্নি বললেন,—বিশ্বেস করো নীপু, আমি অনেক করে বোঝালাম, তবু আসতে রাজি হল না সুধা। আমি আর কী করতে পারি, বলো ? আসল কথাটা কী জান ? সুধার যত আনন্দ সবই ওই বাড়ির মধ্যে। কাউকে একবার পাঠিয়ে, আর খোঁজ নিয়ে দেখো, সুধা এখন বাড়িতে গ্রামোফোন বাজিয়ে ফুর্তি করছে।

বড়গিন্নি যে ঠিক কথা বলেননি, বরং খুবই একটা ভুল কথা বলেছিলেন, সেটা আর কেউ না জানুক, মণীশ খুব ভাল করেই জানে। নীপুর বিয়ের দিনে রাত্রিবেলা স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার সময় মণীশ নিজের চোখেই দেখেছিল, নীরব নির্জন বাড়ির একটা খোলা জানালার কাছে চুপ করে বসে আছে সুধা। মনে হল, যেন আকাশের তারা গুনছে।

ভোলাবাবু বলেন,—মেয়েটা এ বাড়িতে বিনে মাইনের একটা দাসী ছাড়া আর কিছু নয়। আর খোরাক ? সেই খোরাক ওই ভিক্ষুক বুড়ি চুমকির খোরাকের তুলনায় এমন কিছু ভাল নয়। আমি খবর রাখি মণীশ, সকাল ন'টার সময় ওরা সবাই যখন গরম ফেনভাত ডিমভাজা আর ঘি খায়, তখন সুধা একবাটি পান্তা ভাত খায়। আগের রাতের বাসি ভাতের পান্তা।

তিন বছর পরে, বিদেশ থেকে ফিরে এসে আবার এই জগেশপুরের নীরব নির্জন ভোরবেলার চেহারাটাকে দেখতে যে এত ভাল লাগবে, সেটা আগে কখনও কল্পনা করে দেখেনি মণীশ। ইউকালিপটাসের মাথায় ভোরের আলোর ওই প্রলেপ যেন এক ঝলক নতুন সুখের ছোঁয়াচ। মনে হয়, না, হিতেশবাবুর বাড়ির ভিতরে আর বোধ হয় সেই গলাভাঙা স্বরের চিৎকার নেই। বৈশাখের বিকেলের কড়া রোদের মধ্যে কুয়োতলার কাছে বসে কেউ আর বাসন মাজে না। এতদিনে সুধার নিশ্চয় বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ভোলাবাবু বলেছিলেন,—স্টেশন-মাস্টার তাঁর এক শ্যালকের সঙ্গে সুধার বিয়ে ঘটাবার চেষ্টায় আছেন। পাটনাতে ওষুধের দোকানে কাজ করে স্টেশনমাস্টারের সেই শ্যালক।

মনে পড়লে বেশ একটু খারাপই লাগে। হিতেশবাবুরা প্রায় সাত বছর হল জগেশপুরের এরকম একটি ভাল জায়গাতে এরকম একটি ভাল বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন, তবু জগেশপুরকে ভাল চোখে দেখতে পারলেন না। এখানে আসার পর হিতেশবাবুর রোজগারের ভাগ্যি অনেক ভাল হয়ে গিয়েছে। তবু বড়গিন্নি বলেন,—এ অভাগা জগেশপুরে কি মানুষ বাস করতে পারে ? এ বাড়ির কোনও ক্রিয়াকর্মে জগেশপুরের কোনও বাড়ির কারও নেমন্তন্ন হয়নি, হয়ও না। ভোলাবাবুর মেয়ে নীপুর বিয়েতে এ বাড়ির সবাই নেমন্তন্ন খেয়েছেন বটে, কিন্তু এ বাড়ির মন্দিরার বিয়েতে ভোলাবাবুর নেমন্তন্ন হয়নি। নিয়োগীবাবুর মা একদিন এ বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেয়েছিলেন। ক্ষিতুবাবু বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে খুব স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন,—ভেতরে যাবেন না।—কেন গো ছেলে ? কী ভাবলে আমাকে ? আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন নিয়োগীবাবুর মা। ক্ষিতুবাবু বললেন,— আপনাদের জগেশপুরে বারো মাস হাম আর বসন্ত লেগেই রয়েছে। কাজেই, আমরা সাবধানে থাকি। বাইরের লোকের ছোঁয়াচকে ভয় করি। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার ; হিতেশবাবু সারা জগেশপুরকে তৃণবৎ তুচ্ছ বলে মনে করলেও মণীশকে তুচ্ছ করেন না। দেখা হলে অনেকবার বলেছেন, মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে এসো, মণীশ।

হাতে শুধু একটা ছোট ব্যাগ, আর কোনও বোঝা নেই। কুয়াশা নেই, তাই মহেশ পাহাড়ের চেহারাটা খুব স্পষ্ট করে দেখা যায়। পাহাড়ের গায়ে বর্ষাকালের জলের ধারার দাগটা শুকনো ক্ষতের দাগের মত দেখায়। তবু কালো মহেশ পাহাড়কে বেশ সবুজ দেখাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলটা যেন নরম শ্যাওলার একটা প্রলেপ। ঠিক ওইরকম একটি পাহাড় ছিল সেখানে, জার্মানির স্টুটগার্ট থেকে কিছু দূরে, যেখানে কারখানায় কাজ শিখত মণীশ। স্টুটগার্টে থাকতে কতবার মনে পড়েছে এই মহেশ পাহাড়কে ; কী অদ্ভুত একটা মায়ার লোভানি হয়ে মণীশের প্রাণটাকে কাছে ডাকত মনের ভিতর আঁকা ওই মহেশ পাহাড়ের ছবি।

ওই মহেশ পাহাড়ের কাছে শালবনের ভিতরে একটা ঝর্নার কাছে পিকনিক করতে গিয়ে যার সঙ্গে

প্রথম আলাপ হল, তারই নাম বাণী। মাসতুতো বোন রিণির জন্মদিনে, ফাল্গুন মাসের শেষ দিনে, যখন মহেশ পাহাড়ের কাছে পলাশের জঙ্গলের মাথাতে ফোটা ফুলের শোভা টকটকে লাল আগুনের আভার মত জ্বলতে থাকে, তখন পিকনিক করতে এসেছিল আর একটি পরিবার, বাপ মা ও মেয়ে। দেখেই বুঝতে পারা যায়, এ এক খুবই সুশ্রী পরিবার। এরা সবাই দেখতে সুন্দর, শুধু সেজন্যে নয়। ওই তিনটি মানুষ ওদের ভাষাতে কথাতে ও ভাবেও কত সুন্দর।

প্রথম দেখে যাদের অচেনা বলে মনে হয়েছিল, আলাপের এক মুহূর্ত পরেই বোঝা গেল, তারা ঠিক অজানা নয়। এক বছর হল তৈরি হয়ে জগেশপুরের সবচেয়ে নতুন যে বাড়িটা এতদিন খালি পড়ে ছিল, সেই বাড়িতে ওঁরা এসেছেন। করুণা মাসি বলেছিলেন, মণীশও অনেকদিন আগেই শুনেছিল, ও বাড়ি হল দার্জিলিংয়ের ডি. এম. দত্তের বাড়ি। রিটায়ার্ড সাবজজ ধরণীমোহন দত্ত।

কিন্তু ধরণী দত্ত বলেন,—আমি রিটায়ার্ড সাবজজ নই। সরকারি চাকরি করবার অভিশাপ আমাদের তিনপুরুষের কোনও মানুষকে স্পর্শ করতে পারেনি। এস্টেটের লক্ষ্মীঠাকরুণ অবশ্য আগের তুলনায় অধুনা অনেক গরিব হয়ে গিয়েছেন, তবু গোপালপুরের তিন শরিকের সব দত্তকে খাইয়ে-পরিয়ে সুখেই রেখেছেন। লোকে শুনলে হাসে, তবু আমি বেশ গর্ব করেই বলি, আমি একজন রিটায়ার্ড ল্যান্ডহোল্ডার।

ধরণী দত্ত, অণিমা দত্ত আর বাণী—বাপ মা ও মেয়ে। সাদা ব্যাক-ব্রাশ চুল, হাতে পাইপ, সাদা শার্ট আর সাদা ট্রাউজার ; ধরণী দত্তের চেহারাতে ও সাজে এরকম একটা পরিপাটি বিলিতিয়ানা থাকলেও দেখতে একটুও খারাপ লাগে না। তার কারণ বোধ হয় তাঁর মুখের ওই স্নিগ্ধ হাসিটা। অণিমা দত্তের সাজ-পোশাকও একটা রঙিন আড়ম্বর বলে মনে হতে পারে। গলাতে পাউডারের দাগটা খুব স্পষ্ট, ঠোঁটে লালচে প্রলেপের ছাপটা একটু অস্পষ্ট। কিন্তু দু' চোখে কী চমৎকার একটি শান্ত কমনীয়তা! ভবতোষবাবু যখন অপরিচিতা অণিমা দত্তকে নমস্কার জানালেন, তখন ভবতোষের দিকে না তাকিয়েই হাত তুলে নমস্কার করলেন অণিমা। সন্দেহ হতে পারে, এটা বুঝি চমৎকার তুচ্ছতা দেখাবার স্টাইল। কিন্তু মণীশের মনে সেরকম কোনও সন্দেহ দেখা দেয়নি। এ তো সহজ ও অভ্যস্ত সৌজন্য। এ ধরনের বেশভূষার মানুষের আচরণে এত সম্ভ্রম ও নম্রতা মণীশ কোনওদিনও কোথাও দেখেনি।

বাণী দত্তের হাতে একটা ক্যামেরা। কিন্তু দেখলে কারও মনে হবে না যে, ওটা একজন আধুনিকার নিতান্ত একটা স্টাইলের হাতিয়ার। সিল্কের শাড়িতে চেরিফুলের ছবি ছাপা, গায়ে সাদা জালির ব্লাইজ, ফাঁপানো চুলের স্তবকটা শুধু একপাক লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। এই বাণী দত্তের মুখে যেন মিষ্টি হাসির একটা সৌরভ ছড়িয়ে আছে। কবি বন্ধু অনিমেষ যদি একবার এই বাণী দত্তকে দেখত, তবে নিশ্চয় স্বীকার করত আর বলত,—না হে মণীশ, প্রাচীন কবিরা খুব মিথ্যে কল্পনা করেননি। সত্যি, এ ধরনের মুখশ্রীকে ফোটা কমলশোভা বলে মনে করে পদ্মবনের ভৃঙ্গ।

মণীশের সঙ্গে আলাপ করলেন ধরণী দত্ত।—তুমি কী এই জগেশপুরেই কোনও ইয়ে অর্থাৎ কোনও কাজ-টাজ...

মণীশ,—আজ্ঞে না। আমি কলকাতাতে একটা কারখানাতে কাজ করি।

ধরণী দত্ত,—কিসের কারখানা ?

—ইলেকটিক কেবল্স্।

—কারখানার নাম ?

—জনস্টন ব্রাদার্স।

—তুমি সেখানে, অনুমান করছি, তুমি একজন মেকানিক ?

—আজ্ঞে না।

—ফোরম্যান ?

—আজ্ঞে না।

—তবে ?

—সুপারভাইজিং এঞ্জিনিয়ার।

—তার মানে, তুমি তা হলে শিবপুর থেকে...

—আজ্ঞে না, আমি রুড়কি থেকে পাস করেছি।

—আই সি, তুমি একজন বি-ই।

—সে বছর আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম।

—তাই নাকি ? তাই তো ! বেশ ভাল খবর শোনালে। শুনছ অণিমা...একবার এখানে এসে শুনে যাও, মণীশ কী বলছে ?

অণিমা কাছে এসে দাঁড়াতেই ধরণী দত্ত আবার মণীশকে প্রশ্ন করেন ও হাসেন,—এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করছি সুপারভাইজিং এঞ্জিনিয়ার, জবাব দিতে কোনও সঙ্কোচ করো না।

—বলুন !

—কত মাইনে পাচ্ছ ?

মণীশ হাসে,—সাতশো টাকা। মাত্র দু'বছর হল কাজ করছি। কাজেই...কিন্তু আর বেশি দিন নয়।

—তার মানে ?

—এই বছরের শেষেই জার্মানিতে যাচ্ছি। স্টুটগার্টে থাকতে হবে তিনটি বছর। কাজ শেখা শেষ হয়ে যাবার পর যদি দেশে কোনও ভাল কাজ পাই তবে ফিরে আসব, নইলে ওদিকেই থেকে যাব।

—ভাল কাজ মানে, কত টাকা মাইনের কাজ ?

—ধরুন, অন্তত হাজার দুয়েক।

—দেশে কোথাও এরকম কাজ পাওয়ার আশা রাখ ?

—রাখি। দেরাদুনের কাছে জার্মানির কোলাবোরেশনে একটা নতুন কেবল্ কারখানা স্থাপন করা হবে বলে শুনছি। সেখানে কাজ পাওয়ার সুযোগ আছে।

চেঁচিয়ে ডাক দিলেন ধরণী দত্ত,—বাণী, একবার এদিকে এসো।

বাণী কাছে এসে দাঁড়ায়। বাণী হেসে হেসে মাথা দোলায় ; বাণীর হাতের ক্যামেরাও দুলতে থাকে। অণিমা বলেন,—এবার আর ওই দুঃখের কথাটা তুমি বলতে পারবে না, বাণী।

বাণী,—কী ? কিসের দুঃখের কথা ?

অণিমা,—জগেশপুরে এসেই রোজই যে আক্ষেপ করছ। জগেশপুরের সব গল্প তোমাকে শোনাতে পারে, এমন একটা মানুষও নেই জগেশপুরে ; খুব ভুল, খুব মিথ্যে ধারণা করেছ তুমি।

বাণী মুখ ফিরিয়ে হাসতে থাকে,—কী করে বুঝব যে, ভুল ধারণা করেছি ?

ধরণী দত্ত হেসে ওঠেন,—মণীশ, এই মণীশই তোমাকে জগেশপুরের সব গল্প শুনিয়ে দিতে পারবে।

মণীশের দিকে তাকায় বাণী,—কবে বলবেন ?

অণিমা,—আঃ, ওরকম করে জিজ্ঞেস করতে নেই, আগে তুমি বলো, কবে মণীশ আমাদের ওখানে যাবে আর চা খাবে ?

ধরণী দত্ত,—আগে জিজ্ঞেস করো, কী শুনতে ভালবাসে মণীশ ; এসরাজ না পিয়ানো ? রবীন্দ্রসঙ্গীত, না অতুলপ্রসাদ ? কিংবা, কী যেন সেই গানটা, ডোরা ডানকান ওর শেষ ছবিতে যে গানটা গেয়েছিল ?

বাণী,—রেড রোজ মাই রেড হার্ট !

সেদিন বাণীকে কথা দিতে হয়েছিল, হ্যাঁ, জগেশপুরের সব গল্প মণীশ নিশ্চয় একদিন গিয়ে বাণীকে শুনিয়ে আসবে। নিশ্চয় একদিন গিয়ে চা খেয়ে আসবে।

অণিমা দত্ত বললেন,—আমাদের এই মেয়েটি হলেন রিটায়ার্ড ছাত্রী। কার্সিয়ং-এর কনভেন্ট স্কুলে পড়েছেন। পাঁচ বছর হল সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করে বসে আছেন। কিন্তু কী যে অদ্ভুত মেজাজ, কোনও মানে হয় না। কলেজে পড়তে কিছুতেই মেয়েকে রাজি করানো গেল না। বলে কিনা, কলেজে পড়ুক মিনার্ভা দেবীরা, আমার পড়ে দরকার নেই।

ওই তো, ওই সেই আশাবরী, বাণীদের বাড়ি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, শ্বেতপাথরের তৈরি

একটি বাড়ি। সবুজ ঘাসে ঢাকা মেঠো জমির উপর ছোট্ট চেহারার ওই একতলা আশাবরীও একটি স্নিগ্ধতার ছবি। তিন বছর পরে আজ সেই আশাবরীকে চোখে পড়তেই মনে হয়, আশাবরী যেন শান্ত অপেক্ষারও একটি ছবি। সত্যিই তো, সাদা ধবধবে আশাবরীর গায়ে ধুলো আছে বলে মনে হয় না। অথচ পাশের বাড়িটা, যেটা ভোলাবাবুর হরধাম, সে বাড়ির সাদা চেহারাটাকে আর সাদা বলে মনে হয় না। শুকনো শ্যাওলার ছোপ হরধামের চেহারার সব সাদার দফারফা করে দিয়েছে। কিন্তু আশাবরী? কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে আশাবরীকে! ভোরের পূরবী রোদের আভা ছড়িয়ে পড়েছে সাদা আশাবরীর গায়ে। বাণী জানে না, বাণীর বাবা ও মা জানেন না যে মণীশ আজ সাত দিন হল দেশে ফিরেছে। এই সাতটা দিন কলকাতাতে নানা ব্যস্ততায় কাটাতে হয়েছে। দেশে ফিরে আসার খবরটা বাণীকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও চিঠি দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলে মণীশ, সত্যি ইচ্ছে থাকলে কি একটা চিঠি দিতে পারা যেত না? অভাবিত আবির্ভাবের মত হঠাৎ দেখা দিয়ে বাণীকে চমকে দিতে, বিস্ময়ে ও আনন্দে বাণীর চোখ দুটোকে হাসিয়ে দেবার একটা লোভ মনের মধ্যে ছিল বইকি!

জার্মানিতে যাবার আগের পুরো তিনটি মাসের মধ্যে অন্তত ত্রিশটা দিন সন্ধ্যাবেলাটা এই আশাবরীর আহ্বান আর সমাদরের মধ্যে কাটিয়ে দিতে হয়েছিল। ধরণী দত্ত বলেছিলেন,—মাঝে মাঝে এসে চা খেয়ে যেতে তো তোমার কোনও অসুবিধে নেই মণীশ? অণিমা বলেছিলেন,—সপ্তাহে অন্তত একটি দিন। বাণী বলেছিল,—রোজ আসতে হবে, রোজ। শত কাজ থাকুক, শত অনিচ্ছা থাকুক, তবু আসতে হবে।

মহেশ পাহাড়ের কাছে শালবনে হঠাৎ একবার ময়ূর দেখা দিয়েছিল। একটা দুটো নয়, প্রায় বিশ-ত্রিশটা ময়ূরের একটা ঝাঁক। ওই আশাবরীর ওই বারান্দাতে বাণীর চোখের সামনে একটা চেয়ারে বসে জগেশপুরের কত বিস্ময় আর কত রহস্যের গল্পই না বলতে হয়েছিল। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার রাতে সেই ময়ূরের ঝাঁক মহেশ পাহাড়ের শালবন থেকে উড়ে এসে করুণা মাসিদের গোলাপবাগানের পাঁচিলের উপর বসেছিল। সারারাত ধরে ময়ূরগুলোর সে কী ডাক!—আমরা কেউই সে রাতে ঘুমোতে পারিনি। ময়ূরের ডাকের স্বরে একটুও মিউজিক নেই, বাণী। তুমি কখনও শুনেছ?

—না।

—মিউজিক না থাকুক, অদ্ভুত একটা বুদ্ধি আছে বোধ হয়!

—কী রকম?

—সকাল হলেই শুনতে পেলাম, সে রাতে একটা বাঘ এসে ঠাকুরবাবুদের গালাকুঠির ভাঙা দালানের ভিতরে ঢুকেছিল। ময়ূরের ডাক শুনে সে রাতে জগেশপুরের সবাই যখন শুধু আশ্চর্য হচ্ছিল, তখন একজন শুধু বুঝতে পেরেছিল, আসল ব্যাপারটা কী। তুমি কি জগেশপুরের রঘুনাথবাবুদের কথা শুনেছ?

—না।

—আমাদের ওই রঘুকাকা বুঝতে পেরেছিলেন, কেন এসেছে ময়ূর, কেন এত ডাকছে ময়ূর। ময়ূরদের নাকি এটা একটা অভ্যাস। লুকিয়ে থাকা কিংবা লুকিয়ে চলা বাঘকে ধরিয়ে দিতে ওরা ভালবাসে। তাই ডেকে ডেকে জানিয়ে দেয় ময়ূর; বাঘ কাছেই আছে। সেই রাতেই বন্দুক হাতে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন রঘুকাকা। করুণা মাসিদের গোয়ালঘরের চালার উপর ঘণ্টা তিনচার বসে থাকার পর দেখতে পেলেন, ঠাকুরবাবুদের গালাকুঠির ভাঙা দালানের ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে একজোড়া চোখ জ্বলছে। চালা থেকে নেমে মাত্র দশ পা এগিয়েছেন রঘুকাকা, অমনি বাঘটা তিন লাফে ভাঙা দালানের ইটের স্তূপের উপর দিয়ে ছুটে উধাও হয়ে গেল।

—চেষ্টা ব্যর্থ?

—না না, রঘুকাকা সহজে চেষ্টা ছেড়ে দেবার মানুষ নন। দুপুর হতেই জগেশপুরের সবাই খবর জানতে পেল, মহেশ পাহাড়ের কাছে মাঠের উপর সেই বাঘকে মেরেছেন রঘুকাকা। রঘুকাকা খুব সাহসী শিকারি। বাঘ ছাড়া অন্য কোনও জন্তু শিকার করেন না। কিন্তু অনেক দিন হল শিকার

একেবারে ছেড়েই দিয়েছেন।

—কেন ?

—তা ঠিক জানি না। ভোলাবাবু বলেন,—শিকার করতে গিয়ে সেই যে একটা ঘা খেলেন রঘুকাকা, তারপর আর শিকার করেননি। একটা বাঘিনীকে গুলি করে মারবার পর দেখতে পেলেন রঘুকাকা, বাঘিনীর দুটো বাচ্চা গুট গুট করে রক্তমাখা ঘাসের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর, বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন, রঘুকাকার স্ত্রী মীরা কাকিমা তাঁর ছেলে হিরুর গলা জড়িয়ে ঘুমোচ্ছেন। শুনতে পাই, সেদিন ভয়ানক কেঁদেছিলেন রঘুকাকা। হিরুদার বয়স তখন বছর চৌদ্দ-পনেরো হবে। আমার থেকে দশ বছরের বড়। এই হিরুদা একটি অদ্ভুত মানুষ। ঘরের বাইরে একটু উঁকি দিয়ে দেখতেও যেন ভয় পান, অথচ আমাকে নিতান্ত একটা নাবালক বলে সব সময় ঠাট্টা করেন।

কত রকমের কত গল্পই না বাণীকে শোনাতে হয়েছে। ট্রেনে কাটা পড়ে মরেছে যে লাইনস্ম্যান জানকিরাম, সে এখনও মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে লালবাতি হাতে ঝুলিয়ে রেল লাইনের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। বছর পাঁচেক আগে একটা পাগল সাহেবকে দেখা গিয়েছিল। মহেশ পাহাড়ের কাছে যত ঝোপ-জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর একদিন বুঝতে পারা গেল, ওটা পাগলামির ব্যাপার নয়। সেই সাহেব ছিল একজন বোটানিস্ট, ফ্রান্স থেকে এখানে এসেছিল। মহেশ পাহাড়ের কাছে ওই ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যেই একটা দুর্লভ অর্কিড খুঁজে পেয়েছিল, পঁচিশ হাজার ফ্রাঙ্ক দামে সেই অর্কিড বিক্রি হয়েছিল।

বাণী হাসে,—তুমিও ওরকম দুর্লভ অর্কিড খুঁজে পাবার চেষ্টা করলে না কেন ?

—চেষ্টা না করেও পেয়ে গিয়েছি।

—কী বললে ?

—পেয়েছি।

—সত্যি করে বলো, তাই মনে হয় ?

—হয়। আমি তো কখনও কোনও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি যে, তোমার মত মেয়ে আমাকে একদিন ভালবেসে ফেলবে।

—আর তোমার মত ছেলে...

—হ্যাঁ, আমিও কখনও কল্পনা করতে পারিনি যে, আমার মত মানুষ একদিন কাউকে ভালবেসে ফেলবে।

যে সন্ধ্যায় সাঁওতালদের একটা উৎসবের মিছিল মশাল জ্বালিয়ে আর মাদল বাজিয়ে এই রাস্তার উপর দিয়ে চলে গেল, সেই সন্ধ্যায় মণীশের কত কাছে এসে দাঁড়িয়ে সেই উৎসবের মিছিল দেখেছিল বাণী। সেদিনই বুঝেছিল মণীশ, জার্মানিতে তিনটি বছর কাটিয়ে দেবার জীবনটাকে বেশ দুঃসহ একটা পরীক্ষার জীবন বলেই মনে হবে। তিনটি বছর বাণীকে চোখে দেখতে পাওয়া যাবে না, সত্যিই যে একটা শাস্তি বলে মনে হয়। সেই বিষাদ বাণীরই কথার সান্ত্বনাতে মুছে গিয়েছিল। বাণী সেদিন মণীশের হঠাৎ নীরবতার অর্থটা কত সহজে বুঝে ফেলেছিল। নইলে তখনি বলতে পারত না বাণী,—মাসে আমার অন্তত একটি চিঠি পাবে।

ঠিকই, ভুলে যায়নি বাণী। জার্মানিতে থাকতে তিন বছরের প্রতি মাসেই বাণীর একটি চিঠি পেয়েছে মণীশ। সেসব চিঠির জন্যেই প্রবাসী মণীশের একলা জীবনটা এক মুহূর্তেরও শূন্যতা বোধ করতে পারেনি। ওই আশাবরী পূরবী রোদের আভা মাখানো একটা অপেক্ষা। শেষ চিঠিতে বাণী লিখেছিল, ভালবাসার কাছে অপেক্ষা খুবই কষ্টকর বটে, কিন্তু সহ্য করতেও যে ভাল লাগে। মনে হয়, তোমার জন্যে আমি তিন বছর কেন, চিরকাল অপেক্ষা করতে পারি।

ভোলাবাবুর হরধামের কুয়োর কাছে শব্দ হয়, কেউ যেন জল তুলছে। না, এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। ভোলাবাবু হয়ত জেগেছেন। সত্যি যদি ভোলাবাবু এ সময়ে মণীশকে দেখে ফেলেন, তবে তাঁর উল্লাস আর প্রশ্নের অন্ত থাকবে না। এই ভোলাবাবু বলেছিলেন,—পারো তো একটি মেম বিয়ে করে আর সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরে এসো, মণীশ।

সত্যি ভোলাবাবু জেগেছেন। ভোলাবাবুর স্নানের মন্তর শোনা যায়। এগিয়ে যায় মণীশ।

এখান থেকে রাস্তার দু'পাশে দু'সারি সেগুনের মাথায় পাখির দলের ছুটোপুটি আর ডাকাডাকি শুরু হয়ে গিয়েছে। আর মাত্র আধ মাইল দূর, অলকা নার্সারির পাঁচিলের কাছে ধোঁয়া দেখা যায়। চাকর বৈজু বোধ হয় জেগে উঠে শুকনো পাতার জঙ্গলে আগুন ধরিয়েছে।

॥ ৩ ॥

লোকে বলে, এই জগেশপুরে একদিন শালজঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কেউ কেউ বলে, এখানে সাঁওতালদের একটা ডিহি ছিল। মধুপুরে নতুন রেল লাইন পাতার কাজ শুরু হতেই, আর কাঠের স্লিপার যোগান দিতে দিতে জগেশপুরের শালজঙ্গল উজাড় হয়ে গিয়েছিল। সেই নেড়াডাঙার জগেশপুরে প্রথম যে বাড়িটি তৈরি হয়েছিল, সেটি হল ঠাকুরবাবুদের ওই গালাকুঠি। সে তো বলতে গেলে প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। দ্বিতীয় বাড়ি হল ভবতোষ সরকারের ওই বাড়ি, তৈরি করিয়েছিলেন ভবতোষের বাবা শচীনাথ সরকার। ভোলাবাবু বলেন, বাঙালিদের মধ্যে ফুলের নার্সারি প্রতিষ্ঠার পাইওনিয়ার হলেন ভবতোষের বাবা সেই শচীনাথ। তাঁরই কীর্তি এই অলকা নার্সারি। লোকে বলে,—ফুলবাড়ি; যদিও বাড়ির ফটকের থামের গায়ে নাম লেখা আছে—অলকা। মধুপুরে রেলওয়ের কেরানিগিরির কাজ ছেড়ে দেবার পর শচীনাথ আর দেশের বাড়িতে ফিরে যাননি; তিনি খবর শুনেছিলেন, পুষ্করা লেগে গাঁয়ের প্রাণ উজাড় হয়ে গিয়েছে। বাড়ির ছাদ পড়ে গিয়েছে, দেয়াল ধসেছে, উঠানে আলোকলতা আর বিছুটির ঝোপ। বাড়ির দরজা-জানালার সব কাঠ চুরি হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে জ্ঞাতি জীবনকাকা আবার সদরে গিয়ে একটা মামলা করে শচীনদের বাড়ির ওই ভিটা ও পুকুরটার মালিকানা আর দখল নেবার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন।

জগেশপুরে এসে একটা মাটির ঘর তুলে নিয়ে যেদিন ছোট্ট একটি সংসার সাজালেন শচীনাথ, সেদিন ভবতোষের মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু গর্ব করেই বলেছিলেন শচীনাথ,—এই কুঁড়েঘরই হল আমার অলকা, যদিও আমি কুবের নই।

শচীনাথের অনেক চিন্তা চেষ্টা ও পরিশ্রমের সৃষ্টি সেই ছোট্ট অলকা নার্সারি ভবতোষের চেষ্টায় ও যত্নে আজ অনেক বড় হয়ে অনেক সুনাম অর্জন করেছে। পর পর দু'বছর পাটনার এগজিবিশনে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল অলকা নার্সারির গোলাপ—অলকা প্রাইমা। পর পর তিনবার ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে মণি ডার্লিং। তারপর এই পাঁচ বছর আগে প্রাইজ পেয়েছে—রিণি সুইট।

সেই জগেশপুরে এখন অনেক ভবন ভিলা আর নিবাস। সবই পাকা দালানবাড়ি। এমন কি ম্যানসনও আছে, আগরওয়ালাদের লছমি ম্যানসন। পাকা সড়কও আছে। তবু এই জগেশপুর আজও ঠিক শহর হয়ে উঠতে পারেনি। জগেশপুর ঠিক কর্মজীবনের কোনও উপনিবেশ নয়, কর্মবিরামের উপনিবেশ। কাজের জীবনের ঝঞ্ঝাট থেকে যাঁরা ছুটি পেয়েছেন, যাঁরা অবসর পেয়েছেন, তাঁরাই এখানে বাড়ি করেছেন। যাঁদের জীবনে এখনও কাজ-কারবারের ব্যস্ততা আছে, তাঁরাও এখানে নিষ্কর্মা। তাঁদের কাজ-কারবারের ব্যস্ততার জায়গাগুলি সবই জগেশপুরের বাইরে। কারও আছে কোলিয়ারি, কারও বা চা-বাগান, কারও কারও আড়ত ও দোকান। কিন্তু সবই জগেশপুরের বাইরে,—ঝরিয়া দার্জিলিং কলকাতা ও মধুপুর। কাজ-কারবারের মধ্যে অলকা নার্সারির মত আরও কয়েকটা ছোট-বড় নার্সারি কিংবা ভোলাবাবুর করাতকলের মত আরও দুয়েকটা করাতকাল। জগেশপুরের বাতাসে যেন অদ্ভুত একটা আলস্য থমথম করে। বাড়িগুলিকে দিবানিদ্রার এক একটা শিবির বলে মনে হয়।

মনে হয় তাঁদেরই, যাঁরা হঠাৎ স্বাস্থ্য সঞ্চয় করার ইচ্ছায় এখানে দু-এক মাসের জন্য কিংবা শিকারের উদ্দেশ্যে যাঁরা দু'চার দিনের জন্য এখানে আসেন থাকেন আর চলে যান। শীতকালে শুধু শিকারিরাই আগন্তুক নয়, কিছু ট্যুরিস্টও আসেন আর ডাকবাংলোতে থাকেন। তাঁরা শুধু জগেশপুরের বাইরের এই চেহারাটা দেখেই চলে যান। কিছুই বুঝতে পারেন না, জগেশপুরের এই ঘুমন্ত চেহারাটার মধ্যে জীবনের কী ধরনের আর কত রকমের হাসি-কান্না আছে। আছেন এক সলিল

সেন, তিনি গত পাঁচ বছরের মধ্যে জগেশপুরের কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে পাঁচবার কথা বলেছেন কিনা সন্দেহ। সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা ও রাত, তাঁর হাতের কাছে টেবিলের উপর একটি গেলাস আর হুইস্কির বোতল থাকেই থাকে। বাইরে থেকে দু'চার মাসের জন্য বেড়াতে আসা কোনও মানুষ খোঁজ পায় না আর বুঝতেও পারে না যে, এই সলিল সেন হলেন কলকাতার ব্যারিস্টার সেই সলিল সেন, সপরিবারে বিলেতে বেড়াতে যাবার সময় জাহাজডুবি হয়ে যাঁর স্ত্রী আর তিনটি ছেলেমেয়ে সমুদ্রের জলে চিরকালের মত হারিয়ে গেল। সলিল সেনের বাড়িতে শুধু একা সলিল সেন, আর একটা চাকর। সলিল সেনের মদ খাওয়ার বিরাম নেই।—এত মদ খেলে আপনি যে মরেই যাবেন সেনসাহেব। একদিন অনুযোগ করেছিলেন ভোলাবাবু। সলিল সেনের টলমলে মাথাটা আরও টলমল করে, হাসতে গিয়ে ভ্রূকুটি করেন সলিল সেন,—মানুষ তো সমুদ্রের জলেও ডুবে মরে। আমি না হয় মদের জলে...ওয়েল ভোলাবাবু, আপনি এখন যদি একগ্লাস হুইস্কি পান করেন তো করুন, নইলে চলে যান।

আছেন এক সত্যনাথ রায় আর তাঁর স্ত্রী। স্ত্রী ঠিকই, মাথায় সিঁদুর আছে, লালপাড় গরদের শাড়ি পরেন। দু'বেলা বাগানের টাটকা ফুল তুলে নিয়ে রাম-সীতার ছবি পুজো করেন। ভোলাবাবু জানেন, রঘুনাথবাবু আর ভবতোষবাবুও জানেন, সত্যনাথ রায়ের ওই তথাকথিত স্ত্রী হলেন বাঁকুড়ার সেই ভয়ানক হত্যা-মামলার আসামী, স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার অভিযোগে দায়রা আদালতে বিচার হয়েছিল যাঁর, বাঁকুড়ার গ্রামের জমিদার-পত্নী সেই সুমিত্রা চৌধুরী। রেহাই অবশ্য পেয়েছিলেন সুমিত্রা চৌধুরী, কিন্তু এক বছর ধরে জেল-হাজতে থাকার পর। ছাড়া পেয়েই সেই যে উধাও হলেন, তারপর তাঁকে কেউ আর কোথাও দেখতে পায়নি ; লোকের ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন সত্যনাথ রায় কিন্তু ভোলাবাবুদের কাছে স্বচ্ছন্দ ও শান্তহাসি হেসে বলেই দিলেন,—না না, সেই সুমিত্রা চৌধুরী মরেননি ; তিনিই হলেন আমার ইনি।

বেশ তো সুখেই সংসার করছিলেন জগেশপুরের হেমন্ত ঘোষ। সপ্তাহের পাঁচটা দিন গিরিডিতে থাকতেন, অভ্র কেনা-বেচার কাজ করতেন। সপ্তাহের শেষে দুটো দিন জগেশপুরের বাড়িতে এসে থাকতেন। কিন্তু কী যে কারণ ছিল তা কেউ অনুমান করতে পারে না। একদিন মাঝরাতে যখন সাত বছর বয়সের একটি মেয়ে আর দু' বছর বয়সের একটি ছেলেকে নিয়ে এক বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন হেমন্তবাবুর স্ত্রী, তখন কপিলাবস্তুর সিদ্ধার্থের মত ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন হেমন্তবাবু। এক বছর পর খবর পাওয়া গেল, হৃষিকেশের একটি আশ্রমে থাকেন হেমন্তবাবু, অর্থাৎ সন্ন্যাসী হেমন্ত। বর্ধমান থেকে হেমন্তবাবুর শ্বশুর আর তিন শ্যালকের সবাই এক এক করে চারবার হৃষিকেশ গিয়ে কত না অনুরোধ করলেন আর বোঝাবার চেষ্টা করলেন ; কিন্তু সন্ন্যাসী হেমন্তর মন টলাতে পারলেন না। সন্ন্যাসীকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার সাধ্য কারও হল না। নির্বিকার সন্ন্যাসী বেশ শান্ত স্বরে তাঁর একটা প্রতিজ্ঞার কথাও শুনিয়ে দিয়েছিলেন,—আমাকে এভাবে বিরক্ত করলে আমি সেখানে চলে যাব, যেখানে থাকলে আমার নাগাল পাওয়া আপনাদের কারও পক্ষেই সম্ভব হবে না।

হেমন্তবাবুর স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের জীবন কী কষ্টেই না দিন পার করেছে। শ্যালকেরা টাকা পাঠিয়ে সাহায্য করেছে তাই ওরা বেঁচেছে। কী আশ্চর্য, সেই সন্ন্যাসী আট বছর পরে হঠাৎ বাড়ি ফিরে এলেন, মেয়ের বিয়ের ঠিক আগের দিন, গেরুয়া বসন ছেড়ে আর ধুতি পরে মেয়েকে সম্প্রদান করলেন। আবার অভ্র কেনাবেচার কাজ ধরেছেন হেমন্তবাবু। একতলা বাড়ির ওপর নতুন একটা ঘরও উঠেছে। হেমন্তবাবুর নতুন গার্হস্থ্য-জীবন ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রত্যাগমনের দু'বছর পরে একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেছে।

ভবতোষ সরকার আর করুণা সরকার, মণীশের মাসি আর মেসোর ছেলে নেই বটে, কিন্তু আছে বললেও ভুল বলা হয় না। করুণার মেজদির ছেলে ওই মণীশ। মেজদি জ্বরের ঘোরে পুরো তিনটি দিন অচেতন হয়ে থাকার পর, শেষরাতে হঠাৎ ডাক দিয়ে উঠলেন,—করুণা, তুই কোথায় ?

—এই যে আমি।

—ওকে তুই কোলে তুলে নে।

মেজদি তাঁর ছ'মাসের শিশু ছেলেটার ঘুমন্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন। করুণাও

ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে কথা বলেন,—এই দেখো মেজদি, কোলে নিয়েছি।

মেজদি শুধু একবার দেখে নিয়েই চোখ বন্ধ করলেন, আর কথা বললেন না। বুঝতে পারেন করুণা, কথা বলার সব দায় থেকে মুক্ত হয়ে মেজদির প্রাণ চিরকালের ছুটি নিয়েছে। ভবতোষবাবু চোখ মুছতে মুছতে, একটা টেলিগ্রামের চিঠিকে মেজদির মাথার কাছে রেখে দিলেন। সেইদিনই দুপুরবেলাতে এসেছিল সেই টেলিগ্রাম, পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্ট থেকে মেজদির স্বামী ক্যাপ্টেন রমেশ ঘোষের মৃত্যু-সংবাদ। তিনি শিখ রেজিমেন্টের ডাক্তার ছিলেন। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত করুণাকেই মা বলত মণীশ ; কিন্তু ভবতোষবাবু একদিন কে জানে কী মনে করলেন, মেজদির ফটোটার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর মেজদি আর রমেশ ঘোষের ফটো দেখিয়ে দিয়ে মণীশকে বললেন,—মণি, এরা হল তোর মা আর বাবা, আর ও হল মাসি, আমি মেসো। এবার থেকে আমাদের মাসি আর মেসো বলবি, কেমন ?

—কেন ?

—বলতে হয়।

মণীশকে বলেননি ভবতোষবাবু, কিন্তু করুণাকে বলেছিলেন,—আমি স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু...যদিও স্বপ্ন, তবু মনটা কেমন একটু অশান্ত হয়ে গেল। দেখলাম, মেজদি আর রমেশদা মণীশকে বলছেন, আমরা যে তোর মা আর বাবা, সেটা কি কোনওদিনই বুঝতে শিখবি না, মণি ?

কেঁদে ফেলেন করুণা,—ঠিকই তো। মেজদির ছেলেকে কোলে তুলে নিয়েছি বলে কি মেজদির আশাটাকেও কেড়ে নেব ?

বিশ্বাস করেন করুণা, ভবতোষবাবুও প্রায় বিশ্বাসই করেন, মেজদির আত্মাটা তাঁর ছেলের 'মা' ডাক শোনার আশায় পিপাসিতের মত ছটফট করেছে। ভুলে যাননি করুণা, মেজদি একদিন ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন,—এটা কবে কথা বলতে শিখবে রে করুণা ? মা বলে ডাক দেওয়া শিখতে কতদিন লাগে ?

ফটোর মেজদিকে দেখিয়ে দিয়ে মণীশের কাছে কত গল্পই না করেছেন করুণা।—ওই তোর মা একদিন কোলে নিয়ে এই ঘরের ভেতর সুর করে কত গান গেয়েছিল। তোর মা কী চমৎকার ক্ষীরের নাড়ু তৈরি করতে পারত। তোর মা একদিন...

মণীশ কিন্তু সেই পাঁচ বছর বয়সেই একবার বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল,—বুঝলাম, তুমি মা নও, তুমি মাসি, তাতে হয়েছে কী ?

জগেশপুরের কোনও ছেলের লেখা-পড়ার জীবন হাই স্কুলের চেয়ে বেশি দূরে আর পৌঁছয় না। এই লাইনের ট্রেনের মত লেখা-পড়ার দৌড় মধুপুর কিংবা গিরিডি গিয়ে শেষ হয়ে যায়। একমাত্র এই মণীশ একটি ব্যতিক্রম। ভোলাবাবু বলেন,—মণীশ আমাদের আকাট জগেশপুরের আকাশে একটি মাত্র চকমকে তারা। মধুপুরের হাই স্কুল, তারপর কলকাতার কলেজ, তারপর রুড়কির কলেজ—হোস্টেলে থেকে মণীশের পড়াশুনার সব খরচ যোগাতে গিয়ে অলকা নার্সারির লাভের সব টাকা নিঃশেষ হয়ে যেত ; তবু কোনও কুণ্ঠা বোধ করেননি ভবতোষ। ধার করে মণীশের পড়ার খরচ যুগিয়েছেন। কিন্তু চেষ্টা সার্থক। আশা সফল। ভবতোষের আনন্দের সীমা নেই। রুড়কির ফাইনাল পরীক্ষায় মণীশের পাসের খবর যেদিন এল, সেদিন জগেশপুরের সব বাড়িতে মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন, আর একশো কাঙালিকে খিচুড়ি খাইয়েছিলেন ভবতোষ।

এই তো ছেলেবেলার সেই হা-ডু-ডু-র মাঠ। না, মাঠের উপর চোরাকাঁটা ঘাসের কোনও চিহ্ন নেই। দেখেই বুঝতে পারে মণীশ, এই মাঠে হা-ডু-ডু খেলা এখনও চলে। পাকুড়গাছের ডালে একটা ঘুড়ি আটকে রয়েছে।

ও কী ? দৌড়ে দৌড়ে ছুটে আসছে কে ওই মেয়েটা ? রিনি নাকি ? সত্যিই তো রিণি।

—দাদা। রিণি ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে মণীশের গলা জড়িয়ে ধরে। রিণি হাঁপায়,—আমি ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি না তো। তারপর বুঝলাম, না, স্বপ্ন নয়, সত্যিই দাদা আসছে।

রিণির পিঠে হাত বোলায় মণীশ,—তুই এত ভোরে জেগে উঠেছিস কেন ? ভাল ঘুম হয়নি বুঝি ?

—না, সেজন্য নয়।

—তবে ? মাঠে ঘুরে মখমল পোকা ধরবার জন্যে ?

—দেখছ না, আমি কত বড় হয়েছি। মখমল পোকা ধরার বয়স পেরিয়ে গেছে।

—তাই নাকি ? তবে তো মনে হচ্ছে, ভাগবত পাঠ করার জন্য এত ভোরে উঠেছিস।

—না, ধবধবে সাদা একটা লক্ষ্মীপেঁচা কাল রাত্তিরে এসে ঠাকুরঘরের চালার ওপর বসেছিল। তাই দেখতে উঠেছি, লক্ষ্মীপেঁচাটা আছে, না, চলে গিয়েছে।

—আছে ?

—আছে, আছে, কাল রাত্তিরেই আমার মনে হয়েছে, নিশ্চয় দাদা আসবে, নইলে লক্ষ্মীপেঁচা হঠাৎ এসে দেখা দেবে কেন ?

এগিয়ে এলেন ভবতোষ, এগিয়ে এলেন করুণা। দু'জনেই হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। শুধু প্রাণ খুলে আর ছটফট করে হাসতে থাকে রিণি। এই তো সেই রিণি, মণীশের চলে যাবার সময় কেঁদে একেবারে লুটিয়ে পড়েছিল যে মেয়ে। কিন্তু ও কী ? মাসি আর মেসোর ভিজে চোখ দুটো হঠাৎ চমকে উঠে শুকনো হয়ে গেল কেন ? যেন হঠাৎ ভয়ে অপলক হয়ে যাওয়া দু'জোড়া চোখ। মুখের হাসিটাও যেন হঠাৎ উবে গিয়ে বাতাসে মিশে গিয়েছে। মাসি আর মেসো যেন একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আছেন।

হাসতে চেষ্টা করে মণীশ,—কী হল ? তোমরা দুজন কি নিরম্বু উপোস-টুপোস করে আবার শরীর খারাপ করেছ ?

ভবতোষ বলেন—কোনও খবর নেই, হঠাৎ এভাবে এখন কোথা থেকে আসছিস ?

—সাতদিন হল কলকাতাতে এসেছি। স্টুটগার্টে থাকতেই একটা কাজের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। চিঠি গেল, সাতদিনের মধ্যে এসে সাক্ষাৎ করো। সাক্ষাৎ করা হয়েছে।

ভবতোষ,—এরোপ্লেনে এসেছিস ?

—হ্যাঁ, আমার সব জিনিসপত্র জাহাজেই আসছে, ভরদ্বাজের সঙ্গে। বুঝতে পারছ তো, চিঠিতে যার কথা লিখেছিলাম, স্টুটগার্টে আমার সঙ্গে একই কারখানাতে কাজ শিখেছে যে ভরদ্বাজ। ভরদ্বাজকে বলেছি, কলকাতায় পৌঁছে দু'-একদিন রেস্ট নিয়ে তারপর যেন আমার জিনিসপত্র নিয়ে সোজা জগেশপুরে চলে আসে।

ভবতোষ আর করুণা একই সঙ্গে একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়েন, যেন বুকের ভেতরে এতক্ষণের একটা গুমোট ফাঁকা হয়ে গেল। রিণি বলে,—আমার জন্যে কী যে একটা অদ্ভুত চমৎকার জিনিস কিনে রেখেছ বলে লিখেছিলে, সেটা—

মণীশ,—আছে আছে, আসছে।

॥ ৪ ॥

চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই চেঁচিয়ে ডাক দেয় মণীশ,—মেসো, তুমি কোথায় ?

—এই যে এখানে।

—এখানে এসো।

ভবতোষ এসে কাছে দাঁড়াতেই বেশ উৎফুল্ল হয়ে কথা বলে মণীশ,—তিন মাস পরে দেরাদুন অফিস থেকে খবর আসবে, কাজটা হল, কী হল না। মনে হয়, হয়েই যাবে।

ভবতোষ,—ভগবানের ইচ্ছে। আশা করা যায়, হয়েই যাবে।

আশার কথা বলতে হলে কি এ রকম একটা চাপা হতাশার স্বরে কথা বলতে হয় ? মেসোর মুখের কথাগুলো যেন একটা উদাস আবৃত্তি। মণীশের পাসের খবর শুনে একশো কাঙালিকে ভোজন করিয়েছিলেন যে মানুষ, তিনি মণীশের কাজের একটা আশার খবর শুনে এ কিরকম স্বরে কথা বললেন ? মনের খুশির ভাবটাকে এত উদাস করে দিলেন কেন ?

কী হল ? এই তিন বছরের মধ্যে জগেশপুরের সবচেয়ে বড় গোলাপ-বাগানের বুকের কাছে

বসানো এই বাড়ি, যার নাম ফুলবাড়ি, যার গোয়ালঘরও গোলাপের হাওয়ার গন্ধে ভরে আছে বলে একটা সুখ্যাতির গল্প জগেশপুরের লোকের মুখে শোনা যায়, তার প্রাণের ভিতরে কোথাও কী কোনও গোলাপ শুকিয়ে গেল ? রিণির হাসি বেড়েছে, এই পরিবর্তন ভাল। কিন্তু মাসি আর মেসোর মুখের হাসি উদাস হয়ে গেল, এ কেমন পরিবর্তন ?

মণীশের চোখে ঠেকছে আর মনেও ঠেকছে, এই সব কেমন যেন এক একটা বদলে যাওয়া ভাষা আর ভাব। এমন কি মেসো আর মাসির পায়ের শব্দও যেন বদলে গিয়েছে বলে মনে হয়। ঘরে ঢুকে মেসো আর মাসিকে প্রণাম করতে গিয়ে অদ্ভুত একটা বাধা পেয়েছে মণীশ। করুণা হেসে হেসে বললেন,—আগে বাবা আর মাকে প্রণাম। তারপর মেসো আর মাসিকে। হাত তুলে ফটোটাকে দেখিয়ে দিলেন করুণা।

ফটোকে প্রণাম করে তারপর ভবতোষ আর করুণাকে প্রণাম করে মণীশ। কিন্তু বেশ একটু গম্ভীর স্বরে কথা বলে,—ঠিকই, বুঝতে পারিনি যে, তোমাদের মেজদি আর রমেশদাকে আগে প্রণাম করতে হবে।

মণীশের মাথায় হাত বুলিয়ে করুণা আদর করেন,—ওরকম করে বলতে নেই, মণি।

চা আর খাবার খেতে গিয়েও হঠাৎ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে মণীশ। করুণা বললেন,—আরও দুটো লুচি দিই !

মণীশ,—জিজ্ঞেস করছ ? বাঃ, কোনওদিনও তো এ রকম জিজ্ঞাসা করে লুচি দিতে তোমাকে দেখিনি ?

করুণা হাসতে থাকেন,—রাগ করিসনি বাবা।

মণীশ,—নিশ্চয় রাগ করব। তুমি তোমার ইচ্ছেমত লুচি দিতে থাকবে, আর আমি খেতে থাকব, এই তো নিয়ম—তিন বছর জার্মানিতে মিস্তিরিগিরি করে এসেছি বলেই আমি একটা সাহেব হয়ে গিয়েছি বলে তুমি ঠাউরে নিয়েছ ?

করুণা হাসেন,—না রে বাবা, না। সাহেব হবি কোন দুঃখে ?

শুনতে পেয়েছে মণীশ, বাগানের ফটকের কাছে ঘুরেফিরে গান গাইছেন মেসো,—'মন চল নিজ নিকেতনে'। কিন্তু গানটাকে যেন চাপা গলার স্বরে চেপে চেপে ভয় দেখাচ্ছেন মেসো। হেসে ফেলে মণীশ। এরকম চাপা গলার গান গাওয়া নয়, চেঁচিয়ে গান গাওয়াই মেসোর অভ্যাস। সে অভ্যাসও কী শুকিয়ে গিয়েছে ?

ভবতোষ ডাকলেন,—শুনছ ?

করুণা,—হ্যাঁ।

ভবতোষ,—আমি যাই একবার স্টেশনে। আজ তো মঙ্গলবার ; কলকাতা থেকে গলদা চিংড়ির চালান আসবার কথা।

করুণা,—চিংড়ি যদি না পাও তবে রামকুমারের আড়তে গিয়ে একবার খোঁজ করবে। বৈজু বললে, রামকুমার মাঝে মাঝে বরাকরের দহ থেকে মাছ ধরিয়ে আনে আর বিক্রি করে ; রুই পেলে অন্য কোনও মাছ কিনবে না।

দেখতে পায় মণীশ, মেসো বেশ আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছেন। এত আস্তে হাঁটা মেসোর অভ্যাস নয়। কী হয়েছে মেসোর ? হার্ট দুর্বল হয়েছে ? কিংবা পায়েতে বাতের ভাব ?

চেঁচিয়ে ওঠে মণীশ—মাসি ?

—কী ?

—কী হয়েছে বলো তো ? এসব কী দেখছি ?

—কী দেখছিস ?

—তোমরা দুজনেই বেশ নির্জীব হয়ে পড়েছ বলে মনে হচ্ছে। কেন ? কোনও অসুখে ভুগেছ ?

—না

—মুখে তো না না করছ, কিন্তু কাজে দেখছি সবই হ্যাঁ হ্যাঁ।

—কিছু হয়নি রে বাবা। কারও কোনও অসুখ-বিসুখ হয়নি। আমরা সবাই এতদিন ভালই

ছিলাম, ভালই আছি। তুই মিছিমিছি ভাবছিস।

—মেসো কি আবার ধার-কর্জ করেছে ?

—না, ধার-কর্জ করবার দরকার কী। তুই যে টাকা পাঠিয়েছিস, তাতে সব দেনা মিটে গিয়েছে। আর তো কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

—দুশ্চিন্তা যদি না থাকে, তবে মেসো ওরকম নির্জীবের মত হাঁটে কেন ? জগেশপুরে আবার কি কোনও বাঘ এসেছিল ? বাঘের ডাক শুনে ভয় পেয়েছে মেসো ?

করুণা হাসেন,—না ; তবে মনে হয় যে, তিন বছরের কোনও বছরে নার্সারির গোলাপ পাটনার এগজিবিশনে প্রাইজ পায়নি বলে তোর মেসোর মনটা একটু মুষড়ে গিয়েছে।

মণীশ হাসে,—মেসোকে বলবে, স্টুটগার্টে আমি টেনিস খেলে সবাইকে হারিয়ে দিয়েছি আর প্রাইজ পেয়েছি।

—বলব।

—শুনে মেসোর মুষড়ে পড়া মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে তো ?

—হবে বোধ হয়।

—বোধ হয় নয়, হতে হবে। রিণি, এদিকে আয়।

রিণি কাছে আসতেই রিণির গাল টিপে ধরে মণীশ।—জার্মানিতে থাকতে একদিন দূরের একটা লেকের কাছে অনেক কালের পুরনো একটা গির্জা দেখতে গিয়ে একটা বিয়ের ব্যাপার দেখেছিলাম। ঠিক এই রকম গালফোলা একটা মেয়ের বিয়ে হল।

গল্প করে মণীশ,—সেই লেকের নাম হল লেক মারিয়া। ওই লেক হল লক্ষ বছর আগের একটা মরা অগ্নিগিরির মুখ।

রিণি,—লেকটা কি আমাদের তোপচাঁচি লেকের চেয়েও দেখতে ভাল ?

ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, সেই টেবিলের উপর বেতের মাদুরের একটা চৌকোনা টুকরো পাতা। তার ওপর গোলাপের পাপড়ি পুরু করে ছড়ানো। মাদুরের সেই চৌকোনা টুকরোটার আবার চমৎকার ঝালরও আছে। সবুজ রেশমি সুতো দিয়ে বোনা গোলাপ-পাতার ঝালর। টেবিলের মাঝখানে, সাদা গোলাপের ছড়ানো পাপড়ির উপর সাজির মত দেখতে পাঁচ খোপের একটা বস্তু। পাঁচটি খোপের চারটিতে চারটি ফটো, একটি খোপ ফাঁকা।

চোখ বড় করে বস্তুটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে মণীশ। বাঃ, বলতে গিয়ে মণীশের দুই চোখ হেসে ওঠে,—হস্তশিল্প বলে মনে হচ্ছে ?

রিণি,—হ্যাঁ।

মণীশ,—জিনিসটা কী দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

রিণি হাসে,—ঘাস দিয়ে তৈরি। স্টুটগার্টে কোথাও দেখেছিলে এরকম একটি জিনিস ?

মণীশ,—না।

রিণি,—এরকম জিনিস তৈরি করবার সাধ্যি আছে স্টুটগার্টের ?

মণীশ,—না। সেখানে আর্ট করতে হলে ঘাস-টাস কেউ খোঁজে না। সেখানে সবই ইস্পাত।

রিণি,—সেখানে এরকম ঘাস আছে ?

মণীশ,—জানি না। কিন্তু এখানেও তো কোনওদিন এরকম লতার মত ঘাস কখনও দেখিনি।

রিণি,—কেউই কখনও দেখেনি। এই ঘাসলতা আবিষ্কার করেছে সুধাদি।

—কে ?

—সুধাদি।

—হিতেশবাবুদের বাড়িতে থাকে আর খুব কাজ-টাজ করে যে মেয়ে ?

—হ্যাঁ, সেই মেয়ে। কিন্তু সুধাদি এখন ভোলাকাকার বাড়িতে থাকে।

—হস্তশিল্পটা তা হলে তোর সুধাদির কাজ ?

—হ্যাঁ। সুধাদি পূর্ণিয়াতে থাকতে ওদের স্কুলের শান্তিদির কাছ থেকে এই কাজটা শিখেছিল। সুধাদি নিজেই একদিন আমাদের নার্সারির পাঁচিলের কাছে এই ঘাসলতা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে

উঠল,—ও রিনি, রিনি, এই তো এখানে কত হেমঘাস।

—কী ?

—হেমঘাস।

হেসে ফেলে মণীশ,—তারপর ?

—সুধাদি তো খুশিতে একেবারে আত্মহারা। একগাদা হেমঘাস তুলে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। তারপর একটা মাসও পার হয়নি, সুধাদি এসে এই জিনিসটা আমাকে উপহার দিল। বললে,—এক-একটি খোপের মধ্যে তোমাদের বাড়ির এক-একজনের ফটো থাকবে। ওই দেখো, চারটে খোপের মধ্যে আমাদের চারজনের ফটো, বাবা মা তুমি আর আমি।

—একটা খোপ ফাঁকা !

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—সুধাদি বললে, ওই খোপে মণিদার বউয়ের ফটো থাকবে।

মণীশ হাসে,—আইডিয়া মন্দ নয়, ডিজাইন ভাল।

রিণি,—সবাই বলে, ভাল। যে দেখেছে, সে-ই প্রশংসা করেছে।

যে ছোট ব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে আজ কলকাতা থেকে জগেশপুরে এসেছে মণীশ, সেই ব্যাগের ভিতরে মণীশের ডায়েরি বইয়ের পাতার ভাঁজের মধ্যে একটি ফটো আছে। ভাবতে গিয়ে একটু আশ্চর্য বোধ করে মণীশ, বাণীর ওই ফটোটা হেমঘাসের সাজির ওই খোপের সঙ্গে মাপে মাপে একেবারে সমান। একটুও ছোট নয়, একটুও বড় নয়। রিণি ঘরে না থাকলে বাণীর ফটোটাকে নিশ্চয় একবার ওই শূন্য খোপের মধ্যে পরিয়ে দিয়ে দেখত মণীশ। তবু ফাঁকা খোপটাকে একটা শূন্যতা বলে মনে হয় না। ওটা তো পূর্ণ হবার জন্য আশার একটা অপেক্ষা।

রিণি,—কী যেন জার্মানির লেকটার নাম ?

মণীশ,—লেক মারিয়া, প্রকাণ্ড লেক।

রিণি,—হোক প্রকাণ্ড, আমাদের তোপচাঁচির মত সুন্দর তো নয় !

মণীশ,—ঠিক ধরেছিস, আমাদের ওই তোপচাঁচি লেকটার চেহারা সত্যিই খুবই মিষ্টি।

রিণি মুখ টিপে হাসে,—শুনে সুখী হলাম।

—তার মানে ? এরকম পাকা পাকা কথা কবে শিখলি ?

—বুঝতে পারছি, তুমি সাহেব হয়ে যাওনি।

—দু' চারবছর বিলেতে থাকলে কেউ সাহেব হয়ে যায় না, হতে পারে না। শুধু চাকরি-বাকরির সুবিধের জন্য সাহেব সাহেব ভাব দেখায়।

—মুস্তফিমশাই ঠিক এই কথাই বলেন।

—কে ? মুস্তফিমশাই, কে সে ?

—খুব ভালমানুষ। ইয়া লম্বা সাদা দাড়ি, আর ইয়া লম্বা চেহারা। বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। পনেরো বছর আমেরিকাতে কলেজের প্রফেসর ছিলেন। নিগ্রোদের সঙ্গে মিছিল করে জেলে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসে এখন কলকাতাতে থাকেন। মাত্র একটি মাস জগেশপুরে ছিলেন। মহিম নিবাসে থাকতেন।

—হাওয়াখেগো রুগি মানুষ ?

—মোটেই না। রোজ এক ডজন ডিম, এক সের দুধ আর দুটো বড় বড় পেঁপে খেতেন। জীবন ময়রার দোকান থেকে রোজ আমার জন্য রাবড়ি কিনে নিয়ে আসতেন।

মণীশ,—এইবার বুঝতে পারছি, তুই কেমন করে আর কেন মোটা হয়ে গিয়েছিস !

রিণি,—মুস্তফিমশাই হলেন আশাবরীর দত্তসাহেবের আত্মীয়।

—আশাবরীর কেউ এখানে আসেনি ?

—না।

—তুই কোনওদিন আশাবরীতে গিয়েছিলি ?

—না।

—জগেশপুরের আকাশে এই তিন বছরে কোনও রাতে একটা চাঁদ উঠেছিল তো ? না, তাও না ?

—স্টুটগার্টের আকাশে এই তিন বছরে কোনওদিন একটা সূর্য উঠেছিল তো ? না, তাও না ?

—উঠেছিল, মস্ত বড় সূর্য।

—এখানেও চাঁদ উঠেছিল, মস্ত বড় চাঁদ।

—স্টুটগার্টে একদিন কী চমৎকার ফুল-উৎসব হল !

—জগেশপুরেও একদিন কী সুন্দর মাঘোৎসব হল ! ঠাকুরবাবুদের গালাকুঠির মাঠের ওপর মস্ত বড় সামিয়ানা। কলকাতা থেকে অনেক অনেক লোক এসেছিল। কত গান আর উপাসনা হল ! সবচেয়ে ভাল গান গেয়েছিল যে, তার নাম বীথিকাদি ; তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে। এই তো সেদিনও বীথিকাদির চিঠি এসেছে, আমার বিয়েতে তোমাকে আসতেই হবে, রিণি।

—আর কী খবর আছে বল ?

—বৈজু গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

—কেন ?

—বৈজু আজকাল সব সময় রাম-নাম করে। বৈজু বলে, সেরা নেশা হল রাম-নামের নেশা। এ নেশার কাছে গাঁজার নেশা কিছুই নয়।

—তোর সেই চন্দনা টিয়েটাকে দেখছি না কেন ?

—পালিয়েছে।

—কেমন করে ?

—রোজ দেখতাম, আর একটা চন্দনা টিয়ে কোথা থেকে উড়ে এসে খাঁচার কাছে ঘুর-ঘুর করছে। আমার পাখিটার সঙ্গে ভাব করবার জন্যে চেষ্টা করছে। বার বার ছটফট করে উড়ে পড়ছে খাঁচার ওপর। তাই দেখে আমি একদিন খাঁচার ঝাঁপ খুলে দিলাম। ভেবেছিলাম, বাইরের পাখিটা খাঁচার ভেতর ঢুকবে। ও হবি, যেই না খাঁচার ঝাঁপ খুলেছি, অমনি আমার পাখিটা বের হয়ে এসে ফুরুত করে উড়ে বাইরের পাখিটার সঙ্গে পালিয়ে গেল।

রিণির সঙ্গে গল্প করতে করতে দুপুর হয়। তারপর খাওয়া সেরে নিয়ে আর ঘুম সেরে নিয়ে উঠতে উঠতে বিকেল। তারপর সন্ধ্যা।

সাজ সেরে নিয়ে মণীশও তৈরি হয়। চা খায় মণীশ, যদিও জানে, আশাবরীতে গিয়ে আবার চা খেতে হবে।

রিণি ঘরে নেই। তাই রিণির গলার গুনগুনে গানের শব্দও নেই। দেখতে পাওয়া যায়, গোয়ালঘরের কাছে কুমড়োমাচার কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে রিণি। কিন্তু সেই জন্যে কি এত স্তব্ধ হয়ে যাবে বাড়িটা ?

মেসো আর মাসি এই ঘরের জানালার কাছে দুটো মোড়ার উপর এত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে কেন ? এ বাড়ির কে না জানে যে, মণীশের এখন কোথায় কাদের কাছে গিয়ে দেখা করবার কথা। আশাবরীর কথা মেসো জানে, মাসি জানে। এমন কি বৈজুও জানে।

বাণীকে দেবার জন্য রিণি যেদিন রক্তগোলাপের একটা তোড়া মণীশের হাতে তুলে দিয়েছিল, সেদিন মাসি তো কাছে দাঁড়িয়ে নিজের চোখেই সে দৃশ্য দেখেছিল আর হেসেছিল। তবে আজ এরকম করে মুখ ফিরিয়ে থাকা, সরে থাকা কেন ? দেখলে মনে হবে, মেসো আর মাসি যেন ভয় পেয়ে ওই ঘরের ভিতর লুকিয়ে আছে। রিণিও কি ইচ্ছে করে সরে গিয়ে ওখানে ঘুর ঘুর করছে ?

তবে কি সেই মুস্তফিমশাইয়ের কাছ থেকে কোনও ভয়ের গল্প শুনেছে মাসি আর মেসো ? হতে পারে, মুস্তফিমশাই হলেন আশাবীর একজন আত্মীয়। সুতরাং, নিশ্চয় আত্মীয়োচিত একটা কর্তব্য করে গেছেন মুস্তফিমশাই। আশাবরীর সুখ-শান্তির যাতে বেশ একটু ক্ষতি হয়, তারই জন্য মিথ্যে গল্পের একটা রটনা। ভোলাবাবুর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ যখন পাকা হয়ে গেল, তখন কী সুন্দর একটি আত্মীয়োচিত কর্তব্য পালন করেছিলেন ভোলাবাবুর বড়মামার বড়ছেলে বিনয় সামন্ত, মধুপুরে যিনি সোডা-লেমনেডের কারখানা করে লাখটাকা রোজগার করেছেন। পাত্রকে আশীর্বাদ করবার জন্য

জলপাইগুড়ি যাচ্ছিলেন ভোলাবাবু। মধুপুরের স্টেশনে ভোলাবাবুকে দেখে আর সব খবর শুনে নিয়ে বিনয়বাবু আতঙ্কিতের মত চমকে আর কঁকিয়ে প্রায় কেঁদে ফেললেন,—এমন সর্বনেশে ভুল করো না ভোলাদা।

—কেন ?

—ওই ছেলের টি-বি আছে। চুপ করে থাকো, সম্বন্ধ ভেঙে যাক। ভেঙেই গিয়েছিল বিয়েব সম্বন্ধ। এক বছর পরে ভোলাবাবু যখন একদিন জামসেদপুরে নিজের চোখে দেখলেন রেলওয়ের বক্সিং টিমের একজন হয়ে এয়ারফোর্সের একজন গেন্দা সিংকে ঘুষিয়ে ঘায়েল করে ট্রফি পেল ওই ছেলে, জলপাইগুড়ির অতুল হাজরার ছেলে প্রতুল হাজরা, তখন আবার অনেক চিঠি লেখালেখি করে, অতুল হাজরাকে অনেক সাধাসাধি করে, বার বার ক্ষমা চেয়ে, সেই প্রতুলের সঙ্গে মেয়েব বিয়ে দিলেন ভোলাবাবু।

দেখতে পায় মণীশ, মেসো আর মাসি যে ঘরের ভিতর একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, সেই ঘরের দরজাটা এখন আর খোলা নয়। দরজার কপাট ভেজিয়ে দেওয়া হয়েছে। মণীশের চোখের দৃষ্টিটা ভয়ানক একটা সন্দেহ সহ্য করতে গিয়ে করুণ হয়ে যায়। আবার তীব্র হয়েও ওঠে। মেসো আর মাসি কি তবে দু'হাতে কান চেপে বসে আছে, যেন মণীশের পায়ের শব্দটা শুনতে না হয় ?

চেঁচিয়ে ওঠে মণীশ,—মাসি।

—কী ?

—তোমরা ওঘরের ভেতরে এখন ধ্যান করছ নাকি ?

ঘরের ভিতর ঢুকে আবার চেঁচিয়ে ওঠে মণীশ,—মেসো।

—কী ?

—এ সময়ে বাইরে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আসলে কি তোমার স্বাস্থ্যের খুবই ক্ষতি হবে ?

ভবতোষ হাসেন,—রোজই তো এই সময় ঘরের বাইরে থাকি আর হেঁটে বেড়াই।

—আজ তবে এখানে এমন ঘনতমসাবৃত হয়ে বসে আছ কেন ?

—আচ্ছা আচ্ছা, আমি উঠছি। দেখি একবার খোঁজ করে, স্টেশন থেকে ফিরতে বৈজু এত দেরি করছে কেন ?

দু'হাত দিয়ে দরজার পথ আটক করে রেখে মণীশ বলে, —না, যেতে পাবে না।

ভবতোষ,—পাগলামি করিস না।

এইবার ভবতোষকে দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মণীশ,—বলো, কী ব্যাপার ?

ভবতোষ,—আরে, কোনও ব্যাপারই নয়। ছাড়, আমাকে বাইরে যেতে দে !

—না।

—ছাড়, বলছি।

—না, বলো, বলতেই হবে।

—কী বলব ?

—মুস্তফিমশাই কি তোমাদের কাছে কোনও অদ্ভুত কথা বলেছেন ?

চমকে ওঠেন ভবতোষ। মণীশ বলে,—এই তো, ধরা পড়ে গিয়েছ।

ভবতোষ,—হ্যাঁ, একটু অদ্ভুত কথা বটে ; কিন্তু তাতে কী আসে যায় ? মুস্তফি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। মুস্তফি নিতান্ত একটা ভালমানুষ, স্বভাবটা ছেলেমানুষের মত সরল।

—ছেলেমানুষের স্বভাব একটুও সরল নয়।

—যা-ই হোক। কত কথাই না মনে পড়ে। কেষ্টনগরে কলেজে পড়ার সময়, দুই বন্ধুতে মাঝরাতে চুপি চুপি হোস্টেল থেকে বের হয়ে আর নদীতে গিয়ে জেলেডিঙি নিয়ে ভোর পর্যন্ত ভেসে বেড়িয়েছি। কিন্তু কাক ডাকবার আগেই—

—তোমার ওসব গল্প রাখো এখন। বলো, মুস্তফিমশাই কী গল্প বলেছেন ?

এগিয়ে আসেন করুণা,—গল্প বলেই তো মনে হয় রে বাবা। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

—কিন্তু বিশ্বাস করে বসে আছ বলেই তো মনে হচ্ছে !

করুণা,—না রে, না। ভাবতে একটু খারাপ লাগে এই যা। বিশ্বাস করতে পারি না। বিশ্বাস করা উচিত নয়।

ভবতোষ,—মুস্তফি বললে, দত্তসাহেব তাকে বলেছেন যে, তাঁর মেয়ের বিয়ে হবে কলকাতায়, আর, বিয়ের পরে মেয়ে-জামাই সোজা দার্জিলিংয়ে গিয়ে কিছুদিন থাকবে, তারপর সোজা একেবারে জামাইয়ের কর্মস্থলে ; পুণা নাসিক দেরাদুন কি কানপুর, যেখানে জামাইয়ের কাজ হবে, সেখানে।

মণীশ ভ্রূকুটি করে,—এর মধ্যে জগেশপুর নেই ?

ভবতোষ,—না, দত্তসাহেব নাকি জগেশপুরের নামও সহ্য করতে পারেন না।

মণীশ,—তবে জগেশপুরে বাড়ি করলেন কেন ?

ভবতোষ,—বলছেন, বাড়ি বিক্রি করে দেবেন।

মণীশ,—এসব কথার মানে কী ?

—তুই বল, এসব কথার কী মানে হতে পারে ?

—কোনও মানেই হতে পারে না। তোমার বন্ধু মুস্তফিমশাই একেবারে বাজে আর মিথ্যে একটা গল্প বলেছেন। খুব ভাল হত, বঙ্কিমচন্দ্র যদি লিখতেন, বন্ধুকে বন্ধু না মারিলে কে আর মারিবে ?

ভবতোষ হাসেন। করুণার চোখদুটো ফুল্ল হয়ে হাসে আব ছলছল করে। যেন একটা মিথ্যে দুঃস্বপ্নেব গুমোট ভেঙে গিয়েছে, স্বস্তিতে ভরে গিয়েছে বুক। করুণা বলেন,—তুই বললেই হল। আর কারও কথা শুনতে চাই না।

ভবতোষ হাঁফ ছাড়েন,—হ্যাঁ, তোর মুখ থেকে শোনাই তো আসল শোনা।

মণীশ,—হ্যাঁ, আমিই বলছি। এখনই বলছি, ফিরে এসে আবার বলব, মুস্তফিমশাই মিথ্যে কথা বলেছেন।

॥ ৫ ॥

আশাবরীর মাঝঘরেব দরজা খোলা। ঘবে আলো। ঘরেব মাঝের টেবিলের উপর রঙিন কাচের মস্তবড় ফুলদান, তার মধ্যে রঙিন ফুলেব মস্তবড় একটা গুচ্ছ। দত্তসাহেব অনেকবার বলেছেন, এটা হল ইকেবানা স্টাইলে সাজানো ফুলের গুচ্ছ।—আমাদের বাণী কার্সিয়ং-এর কনভেন্টে থাকতে ওর এক জাপানি বান্ধবীব কাছ থেকে ইকেবানা শিখেছিল। আমাব তো মনে হয়, আমাদের বাণী ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনও মেয়ে ইকেবানা জানে না।

ঘবের একদিকে, যেদিকে জানালাতে সবুজ লেসের পর্দা আছে, সেদিকে দেয়াল-ঘেঁষা কোচের উপব বসে আছে বাণী, সেই শান্ত ও সেইরকমই উজ্জ্বল দুটি চোখ। হাতে গল্পের বই। তিন বছর আগে এই ঘব থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময়, যেখানে যা দেখেছিল মণীশ, সেখানে সবই ঠিক তেমনই আছে। কিছুই বদলায়নি।

দেখতে পায় মণীশ, বারান্দাতে পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠেছে বাণী। চমকে ওঠায় আরও সুন্দর হয়ে গেল বাণীর মুখটা। দেখতে পেয়ে মণীশের চোখও উজ্জ্বল হয়ে হেসে ওঠে। একটুও বদলায়নি বাণী, ঠিক সেইবকমই চমকে উঠেছে বাণী।

—বাণী।

মণীশের ডাক শুনে আবার চমকে ওঠে বাণী। উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে আসে, হাত বাড়িয়ে দেয়। পরমুহূর্তে হাত সরিয়ে নিয়ে আর মাথাটাকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। দেখতে পায় মণীশ, চোখের জল লুকোবার চেষ্টা করছে বাণী।

মুখ তোলে বাণী,—কী আশ্চর্য, তুমি ? তুমি এসেছ !

মণীশ,—বিশ্বাস হচ্ছে না ?

—হচ্ছে বইকি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, কোনও খবর না দিয়ে হঠাৎ এইভাবে—

—তোমাকে একটু আশ্চর্য করে দেব বলে ইচ্ছে করেই খবর দিইনি।

—বাবা আর মা একথা শুনলে কিন্তু বেশ দুঃখিত হবেন।

—কেন ?

—এখানে ঠিক ছিল, তুমি যেদিন কলকাতাতে ফিরবে সেদিন আমরাও সবাই কলকাতাতে থাকব।

—তাতে কী আর হয়েছে ? তোমাদের সঙ্গে আমার কলকাতাতে দেখা হোক, কিংবা জগেশপুরে দেখা হোক, দুই-ই সমান।

—একটা কথা বলব ?

—বলো।

—শুনলে তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না তো, মন ?

—না।

—এই জগেশপুর আমাদের আর ভাল লাগছে না, সহ্যও হচ্ছে না। বাবা আর মা দুজনেই যেন হাঁপাচ্ছেন, পালাতে পারলে বাঁচেন।

—কেন ?

—এখানকার মানুষগুলোকেই আসল ভয়। মহেশ পাহাড়কে নয়, পলাশের জঙ্গলকেও নয়, ভয় করে এখানকার মানুষকে।

— ভয়ের কোনও মানে হয় না।

—হয়, খুব হয়।

—তোমার বাবা আর মা এখন বাড়িতে নেই বলে মনে হচ্ছে !

—নেই। স্টেশন গিয়েছেন।

—সেই পুরনো অভ্যেস বোধ হয় ?

—কিসের অভ্যেস ?

—বরফ কিনতে গিয়েছেন ?

—না, আজকের সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতায় চলে যাবেন এক ভদ্রলোক, তাঁকেই একটু ভদ্রতার বিদায় জানাবার জন্য বাবা আর মাকে স্টেশনে যেতে হয়েছে।

—চেনা ভদ্রলোক ?

—হ্যাঁ। জগেশপুরে এসে তিনদিন ডাকবাংলোতে ছিলেন শিলিগুড়ির সুকান্ত চৌধুরী। মোতিয়া চা-বাগানের সুকান্ত।

—বাগানের মালিক ?

হেসে ফেলে বাণী,—না, ম্যানেজার। ভদ্রলোকের জীবনটা কিন্তু তোমারই মত করুণ। আপন বলতে কেউ নেই।

চমকে ওঠে মণীশ,—আমার আপন বলতে তো সবই আছে।

বাণী,—সবই আছে ?

মণীশ,—হ্যাঁ।

—বুঝতে পারছি না, কেন এরকম অদ্ভুত কথা বলছ ?

—আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি কী বলছ ?

আবার মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে আর বই দিয়ে চোখ দুটোকে ঢাকতে চেষ্টা করে বাণী। অদ্ভুত রকমের করুণ হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে বাণীর গলার স্বর,—তোমাকে বোঝাবার সাধ্যি আমার নেই, যদি তুমি নিজে না বুঝতে পার। যাই হোক, এখনও কি একটা অচেনা মানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকবে ? আমি বসতে না বললে কি বসবে না ?

ঘরের ভিতরে এই জানালারই কাছের আর একটি কোচের উপর বসে পড়ে মণীশ। আশাবরীর এই ঘরটিকে একটা কুহেলিকার ঘর বলে মনে হয়। ঘরের ভিতরে যেন অদ্ভুত সব ভাষা দুরন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। আলোর উপর যেন কুয়াশার প্রলেপ পড়েছে। ধুপ করে একটা টিকটিকি পড়ল মেঝের মোজাইকের উপর। এর মধ্যে শুধু স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে বাণীর মুখটা। বাণীর চোখের পাতা ভিজে ভারি হয়ে গিয়েছে, চিকচিক করছে। ভোরের শিশির কাঁদছে।

আনমনা বাণীর সেই উদাস আর করুণ মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে মণীশ। বুঝতে পারে, ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাসের চাপা শব্দ বাণীর বুকের ভিতর থেকে যেন উপছে পড়েছে। ছটফট করে মণীশের নিঃশ্বাসের বাতাস। মণীশ ডাকে,—বাণী।

—বলো ?

—তুমি দুঃখিত ?

—দুঃখিত হই আর না হই, আমি তো তোমার সেই বাণী। তোমার দুঃখিত হবার কোনও কারণ নেই ; দুঃখিত হবার কোনও অর্থ হয় না।

—কিন্তু তুমি দুঃখিত হলে যে আমার সব আনন্দ মাটি হয়ে যায়।

হেসে ওঠে বাণী,—না, একটুও দুঃখিত নই। তুমি প্রতিজ্ঞা করে বলো, তুমি কোনওদিনও আর এরকম দুঃখিতের মত কথা বলবে না।

—প্রতিজ্ঞা তো কবেই করেছি। কিন্তু—

—না, কোনও কিন্তু নেই। আমি তিন বছর ধরে তোমার অপেক্ষায় আছি। যতদিন তুমি আমাকে এই রকম করে অপেক্ষার মধ্যে রেখে দেবে, ততদিন থাকব। মরে যাবার দিন পর্যন্ত তোমার অপেক্ষায় থাকব, থাকতে পারব এ বিশ্বাস আমার আছে, সে শক্তিও আমার আছে।

হাসতে গিয়ে মণীশের গলার স্বর নিবিড় হয়ে যায়,—চিরদিন মানে, আসছে তিন মাসের মধ্যে কোনও একটি দিন।

—কী বললে ?

—তিন মাস জগেশপুরে আছি। কাজের চিঠি এই তিনমাসের মধ্যে যেকোনও একদিন চলে আসবে। তারপর...

—শোনো !

—তার আগেই যেকোনও একটি দিনে...

—শোনো, বিয়ের দিন-ক্ষণ নিয়ে তুমি কোনও ভাবনা করো না। এ বিষয়ে যাঁরা সবচেয়ে ভাল বোঝেন, তাঁরা সব ভাবনা ভেবে রেখেছেন।

—কাদের কথা বলছ তুমি ? তোমার বাবা আর মা ?

—হ্যাঁ।...এখন ওসব আলোচনা শুনতে একটুও ভাল লাগছে না। বলো, এই তিনটি বছর কেমন করে কাটিয়েছিলে ? কোনওদিন কি একটুও কষ্ট হয়নি ?

—হয়েছে। তবে যখনই মনে হয়েছে, আমার জন্যে একজন আশায় আর অপেক্ষায় রয়েছে, তখনই মন ভাল হয়ে গিয়েছে। খুব মন লাগিয়ে কাজ করতে পেরেছি, একটুও বিমনা হয়নি।

—হঠাৎ দেশে ফিরে এলে কেন ?

—চাকরির খোঁজ পেলাম। তাড়াতাড়ি দরখাস্ত আর সাক্ষাৎ, তাই আর দেরি না করে একেবারে উড়েই চলে এলাম। এয়ার ইণ্ডিয়ার ব্যোয়িং হামবুর্গ থেকে দশ ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছে গেল।

—কবে চাকরির কাজে লাগতে হবে ?

—আগে হোক চাকরি। দেরাদুন অফিস থেকে চিঠি আসুক। তারপর বুঝতে পারা যাবে, কবে !

—কত মাইনে হবে ?

—সতেরো শো, প্লাস সাড়ে তিনশো, প্লাস দু'শো।

হেসে ওঠে বাণী,—বেচারা !

—কী বললে ? কাকে বলছ ?

—বেচারা সুকান্ত। চা-বাগানের ম্যানেজার, মাইনে আর অ্যালাউন্স নিয়ে মোট ছ'শো টাকা। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবে না, মন। মাইনে ছোট হলেই মানুষ ছোট হয়ে যায় না, আর মাইনে বড় হলেই মানুষ বড় হয়ে যায় না।

—খুব সত্যি কথা। তোমাকে আমি একটুও ভুল বুঝিনি।

—দু'বছর আগে সুকান্তের সঙ্গে বাবার হঠাৎ পরিচয়। কলকাতা থেকে আসবার সময় আসানসোলে হল্ট করে স্টেশনেই আর একজন ম্যানেজারের সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন বাবা, তখন

ওই সুকান্ত চৌধুরী এগিয়ে এসে বললেন,—আপনি তো আমার সেজমামার বন্ধু ডি.এম. দত্ত ? কোলিয়ারির ম্যানেজার বিকাশ ঘোষের সঙ্গে কাজের কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ-গতিকে সুকান্ত চৌধুরীর সঙ্গে বাবার পরিচয় হয়ে গেল। দু'জনেরই বাবার ওপর অগাধ শ্রদ্ধা। গত বছর বিকাশবাবুও এখানে দু'বার এসেছিলেন। একবার জানুয়ারিতে, আর-একবার অক্টোবরে। ডাকবাংলোতেই থাকতেন, রোজ সকালে তিতির শিকার করতে মহেশ পাহাড়ের বাঁশের জঙ্গলের কাছে জিপ নিয়ে ছুটোছুটি করতেন।

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে দুটো মানুষের কথাবার্তার ভাসা ভাসা স্বর। লালচে হয়ে যায় বাণীর মুখ। ব্যস্তভাবে আর চাপাস্বরে কথা বলে বাণী,—আমি সরে যাচ্ছি, মন। কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি। খুব লজ্জা করছে আমার। বাবা আর মা-র সঙ্গে তুমি এখন মন খুলে গল্প করো।

ঘরের ভিতরে ঢুকে ধরণী দত্ত আর অণিমা দত্ত চমকে ওঠেন। ধরণী দত্তর চশমা কেঁপে ওঠে, অণিমার হাতের ব্যাগ হাত থেকে ফসকে পড়-পড় হয়ে ঝুলে পড়ে। বেশি আশ্চর্য হয়েছেন, তাই বোধ হয় ওঁরা খুব বেশি চমকে উঠেছেন।

ধরণী দত্ত এক মুহূর্তে এবং একটি হাসিতে নিজেকে সহজ ও শান্ত করে নিলেন,—কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য, জীবনে এরকম আর এত আনন্দজনক আশ্চর্য, আমি কোনওদিনই বোধ করিনি, মণীশ।

অণিমা হাসেন, —কী সৌভাগ্য! তুমি সুস্থ মনে আর সুস্থ দেহে আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছ!...কিন্তু তুমি কি এতক্ষণ এখানে একলাই চুপ করে বসে আছ?

মণীশ,—না, বাণী ছিল।

অণিমা,—তাই বলো!

ধরণী দত্ত,—আশা করি সবই ভাল খবর ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কাজ ?

—শিগগিরই হয়ে যাবে আশা করছি।

—কোন কাজ ? দেরাদুনের সেই—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মাইনে সেই আড়াই হাজার টাকার মত ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি এখানে এসে উঠেছ কোথায় ?

—কেন ? আমাদেরই বাড়িতে।

—বলো, তোমার মেসোর বাড়িতে।

—একই কথা।

—না মণীশ, একই কথা নয়। আমরা আশা করেছিলাম, তুমি জার্মানি থেকে ফিরে আমাদেরই এখানে এসে উঠবে।

—এরকম আশা করলেন কেন ?

—তোমারই ভালর জন্য এরকম আশা করেছিলাম। তোমার মত ছেলের বিদ্যা, শিক্ষা, রুচি আর পার্সোনিলিটি ; তোমার কোনও কিছুই এই অদ্ভুত জগেশপুরের সঙ্গে খাপ খায় না। আমি জোর গলায় বলব, এই বাড়ি ছাড়া তোমাকে জগেশপুরের কোনও বাড়িতে মানায় না।...কিন্তু এ বাড়িও আমরা বেচে দিয়ে চলে যাব, মণীশ। তবে, তার আগে, তোমার প্রতি আমাদের মায়া ও মমতার যে বিশেষ একটি দায়িত্ব আছে, সেটা পালন করে যেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

মণীশ,—এসব কী কথা বলছেন ? বাড়ি বেচে দেবেন কেন, আর জগেশপুর ছেড়ে চলে যাবেনই বা কেন ?

ধরণী দত্ত,—দুঃসহ এই জগেশপুর। বিশেষ করে, দুঃসহ হল পাশের বাড়ির এই ভদ্রলোক, হরধামের ভোলানাথ সামন্ত।

মণীশ,—আমরা তো ছেলেবেলা থেকে ভোলাবাবুকে দেখছি। জগেশপুরের প্রায় সকলেই দেখছে। কিন্তু ভোলাবাবুকে কখনও খারাপ মানুষ বলে তো কেউ মনে করতে পারেনি !

—পরের ধারণার কথা আমি জানি না, মণীশ। আমি আমার ধারণাতেই থাকব। এই ভোলানাথ সামন্ত একটি ভয়ানক মানুষ।

ধরণী দত্তের মুখে সত্যই দুঃসহ একটা উদ্বেগের ছায়া থর থর করে কাঁপছে। ভোলাবাবুর অনেক কথা বলতে থাকেন ধরণী দত্ত। কথাগুলিকে ভয়ানক এক অভিযোগের রিপোর্টের মত শোনায়।

কথা বলতে চাননি ধরণী দত্ত, তবু বার বার অনেকবার গায়ে পড়ে কথা বলেছেন ভোলাবাবু,—আপনি বোধ হয় জগেশপুরকে চিনতে বুঝতে একটু ভুল করেছেন, স্যার। আপনি সরল মনের মানুষ, তাই মনে করেছেন, এই জগেশপুরের প্রাণও খুব সরল। হঠাৎ দেখলে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু...ক'বছর আগের একটা ঘটনার কথা বলি। কলকাতা থেকে গানের স্কুলের তিনটি যুবক ছেলে এখানে এসে কিছুদিন ছিল। ভৈরবদার মেয়ে মিনু, একেবারেই হাঁদা আর ভিতু একটা মেয়ে, রোজই জংলি কসমস ফুল কুড়োবার জন্যে মাঠে একবার ঘুরতে যেত। গানের ছেলে তিনটি মিনুকে দেখে রোজই প্রেমের গান গাইত। মিনুও একদিন হেসে হেসে আর ইশারা করে একটা পোড়োবাড়িকে দেখিয়ে দিল, আর বলল, আসুন ! তিনজনেই, অভিসারের তিন নায়কের মত উৎফুল্ল হয়ে সেই পোড়োবাড়ির ভেতর গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, নায়িকা এখনই আসবেন। এই আসছেন, এই আসছেন। হ্যাঁ এল ঠিকই, কিন্তু নায়িকা নয়। পোড়োবাড়ির গর্তের ভেতর থেকে তিন-চারটে ফণা ধরা গোখরো। বাপরে-মারে করে চেঁচিয়ে যখন তিন নায়ক পোড়োবাড়ির ভেতর থেকে বের হলেন আব দৌড় দিলেন, মিনু তখন অজয়বাবুর বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখছে আর হাসছে। বলুন দত্তসাহেব, এ কী রকম কাণ্ড ! খবরের কাগজে যাকে বলে অন্তর্ঘাত, তাই নয় কী ?

আরও গল্প বলেছেন ভোলাবাবু, একবার একটা গরুচোর ঘোড়ায় চড়ে দিনদুপুরে জগেশপুরে ঢুকেছিল। ইচ্ছে ছিল, শশী সরকারের গরুগুলোকে হাঁকিয়ে আর তাড়িয়ে নিয়ে পালাবে। শশী সরকাবের পাঁচটা গরু, খোলা মাঠের মধ্যে পড়ে পড়ে সারা দুপুরটা ঝিমোয়। কাজেই, চোর বোধ হয় মনে করেছিল যে, খুব সুযোগ। কিন্তু শুনলে আপনি হেসে ফেলবেন দত্তসাহেব, চোরকে দেখে ওই ঝিমোনো পাঁচটা গরুই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চোরকে ঘিরে ধরল। চোর পালাল, কিন্তু চোরের ঘোড়াটি পাঁচ গরুর সেই ব্যূহের মধ্যে আটক হয়ে রইল। সেই ঘোড়াকে বাজাবে নিয়ে বিক্রি করে দিয়ে বৈজুর দল পেট ভরে মদ আর দম ভোর গাঁজা খেয়েছিল। এই রকমই হয় দত্তসাহেব, অনেকে মনে করে যে, জগেশপুর বুঝি শুধু ঝিমোয় আর ঘুমোয়। না, তা নয় স্যার। কোনও বুদ্ধিমান এখানে এসে খুব সহজে চুরি হাসিল করে সরে পড়বে, তা হয় না। হতে পারে না।

গায়ে পড়ে উপদেশ দিয়েছেন ভোলাবাবু। সত্যি কথা, আপনার মত মানুষকে এই জগেশপুরে মানায় না, স্যার। আপনার উচিত ছিল, এখানে বাড়ি না করে শিলং সিমলা শ্রীনগর উতকামণ্ড...

—আপনি থামুন। বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়েছিলেন ধরণী দত্ত।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে আর মাথার চকচকে সাদা ব্যাকব্রাশ চুলের ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে ধরণী দত্ত বলেন,—ভোলা সামন্তকে না হয় ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলাম। কিন্তু আমি এখানে সত্যিই স্বস্তি বোধ করতে পারছি না, মণীশ।

মণীশ,—আপনি ভোলাবাবুর এই সব গল্পের কথাগুলিকে এত বড় করে ভাবছেন কেন ? আপনাদের এখান থেকে চলে যাবার কোনও অর্থ হয় না।

—চলে আমারা যাবই, মণীশ। আমাদের ইচ্ছা, তোমাদের বিয়ে হবে কলকাতায়। বিয়ের পর তোমরা দুজনে দার্জিলিংয়ে থাকবে। আমার বন্ধু স্যামুয়েলের কটেজে তোমরা স্বচ্ছন্দে অন্তত একটা মাস থাকতে পারবে। তারপর চলে যাবে তোমার কর্মস্থলে।

অনিমা বলেন,—আমাদের ছেলে নেই, মণীশ। তোমাকে আমরা আমাদের ছেলের মতই আপনজন বলে মনে করি।

ধরণী দত্ত,—হিন্দু ঐতিহ্যে স্ত্রীর পিতা ও মাতাকে পিতা আর মাতা বলে সম্বোধন করা একটি

প্রথা। কী সুন্দর প্রথা! মেসো আর মাসিকে কেউ পিতার তুল্য আর মাতার তুল্য বলে মনে করে না।...কিন্তু আমি ওসব যুক্তি আর তর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না, মণীশ। আমি আমাদের স্নেহের দাবিতেই তোমাকে ছেলের মত আপনজন বলে মনে করি, ভালবাসি।

অণিমা,—তা ছাড়া, তুমিই বলো মণীশ, একমাত্র মেয়েকে কাছ ছাড়া করে আমরা কেমন করে আর নিয়ে থাকব? তুমি যেখানে থাকবে, বাকি জীবন আমাদের সেখানেই থাকতে হবে। আরও একটা কথা, যে ছেলে জীবনে বাপের আদর আর মায়ের যত্ন পায়নি, তাকেই বা আমরা কী করে কাছ ছাড়া হয়ে থাকতে দেব?

ঘরে ঢোকে বাণী। হাতে চায়ের ট্রে। অণিমা রাগ করে কথা বলেন,—মণীশকে চা দিসনি, এতক্ষণ করছিলি কী?

ধরণী দত্ত—থাক, ওকে আর বকাবকি করো না। ওর মনের অবস্থাটা একটু কল্পনা করো।...আচ্ছা তুমি চা খাও মণীশ, আমরা এখন—

ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে যান ধরণী দত্ত আর অণিমা দত্ত। আর ট্রে থেকে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়েও চুপ করে বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মণীশ।

সাজ বদলেছে বাণী। চেরিফুল ছাপের সেই শাড়ি, গায়ে সেই নেটের ব্লাউজ। দুই ঠোঁটে অদ্ভুত এক রক্তোচ্ছ্বাস, চোখের দৃষ্টিটা যেন ভরা নদীর জলের মত টলমল করছে।

বাণী আস্তে আস্তে ডাকে,—মন।

মণীশ,—বলো।

—চা খাও।

—খাচ্ছি।

—আমার দিকে আর একবার তাকাও।

—হ্যাঁ, তাকিয়েছি।

—বলো, দেখতে ভয় করে?

—না।

—সন্দেহ হয়?

—না।

—আমাকে ভুলে থাকতে পারবে?

—না।

—চিঠিতে অনেকবার লিখেছ, আমার ভালবাসার জন্যে তুমি সব সহ্য করতে পার, কোনও দুঃখ কিংবা শাস্তিকেও গ্রাহ্য করবে না।

—লিখেছি।

—তবে?

—কী?

—তবে আবার এত কী কথা ভাবছ?

—ভাবতে পারলে ভাল ছিল, কিন্তু কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না।

—বেশ তো, সেজন্য দুঃখ কিসের? আমি আছি, চিরকাল তোমারই জন্য আছি। যদি হাত ধরে কাছে ডাক, কাছে যাব। যদি কাছে ডেকে নিতে না পার, তবু মনে-প্রাণে তোমারই বাণী হয়ে থাকব। কোনও দুঃখ আমাকে টলাতে পারবে না, মন।

চা খাওয়া শেষ হতেই উঠে দাঁড়ায় মণীশ,—আজ তবে আসি, রাত হয়েছে।

বাণী হাসে,—এসো। কিন্তু...

মণীশ,—কী?

বাণী,—স্বপ্নেও আমাকে কিন্তু বকবে না। তা হলে খুব ভুল হবে।

মণীশও হাসে,—আর তুমি? আমাকে যত খুশি বকবে, কেমন?

বাণী,—আমার ভাগ্যে আজ ঘুমই নেই, স্বপ্ন তো দূরের কথা। আচ্ছা এসো।

॥ ৬ ॥

চাঁদটা অলকা নার্সারির ফটকের দুই তালগাছের মাঝখানে বাতাসে ভেসে রয়েছে। বাড়ির বারান্দায় দুই চেয়ারে বসে গল্প করেন ভবতোষ আর করুণা। দুজনের মনের আকাশেও বোধ হয় একটা চাঁদ ভেসে রয়েছে। তাঁরা হাসছেন আর গল্প করছেন। পুরনো স্বপ্নের গল্প, নতুন আশার গল্প। আজ কোট-প্যান্ট পরে আর গলায় টাই বেঁধে মণীশ একটা জবরদস্ত এঞ্জিনিয়ার অফিসার সেজে ঘুরে বেড়ালে কি হবে, ওর প্রাণটা যেন সেই বারো বছর বয়সেই রয়ে গেছে। করুণা হাসেন,—দেখলে তো, তোমাকে আজ কি রকম করে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

হ্যাঁ, ঠিক ওইরকমই করে দুহাতে ভবতোষের গলা জড়িয়ে ধরেছিল মণীশ, পুজোর ছুটির সময় যেদিন মণীশকে মধুপুরের স্কুলের হোস্টেল থেকে নিয়ে আসার জন্যে হোস্টেলের অফিসঘরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ভবতোষ। —মেসো এসেছ ! বলেই চেঁচিয়ে উঠে আর ছুটে এসে হেডমাস্টারের চোখের সামনেই ভবতোষের গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল মণীশ।

ভবতোষ বললেন,—মন দুর্বল হলে মানুষের চোখও দুর্বল হয়ে যায়। যা হয়নি, যা নেই, যা হতে পারে না, চোখে তাই দেখতে হয়। চোখে ভুল দেখে—

করুণা,—কানেও ভুল শোনে।

ভবতোষ,—হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়। মুস্তফির কথাগুলোকে একটু বেশি ভুল শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। কিংবা মুস্তফি নিজেই বোধ হয়—

করুণা,—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। মুস্তফিমশাই নিজেই একটু ভুল শুনেছেন।

ভবতোষ,—বাবা বলতেন, সন্দেহ জিনিসটা হল কার্তিক মাসের কুয়াশা। নদীর চর কুয়াশায় ঢাকা পড়ে, তখন দেখলে মনে হবে যে, চরটা নদীর জলে ডুবে গিয়েছে।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় ভবতোষ আর করুণার মনের চাঁদ-দেখা আশার এই কলরব। মণীশ এসেছে। বাড়ির ভিতর চলেও গেল মণীশ। কিন্তু যেন একটা বোবা মানুষ বাড়ির ভিতরে চলে গেল। যেন চোখে দেখতেই পেল না মণীশ, বারান্দার উপরে দুটি জীবন্ত মানুষ বসে আছে।

খেতে বসেও কোনও কথা বলে না মণীশ। খাওয়ার রকমটা বা কী ? এলোমেলো করে আর অলসভাবে হাত চালিয়ে শুধু খেয়ে চলেছে ! কী খাচ্ছে, বোধ হয় তাও দেখতে পাচ্ছে না। করুণা বলেন,—দুধটা আগেই খেয়ে ফেললি কেন ?

ভবতোষ একবার এসে খাবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ান, আর সেই মুহূর্তেই আবার চলে যান।

খাওয়া শেষ করেও কারও দিকে তাকায় না মণীশ, কোনও কথাও বলে না। যেন শরীরের হাড় আর হাড়ের গিঁটগুলি একটা দুর্ঘটনার ধাক্কা খেয়ে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে, সেই রকমই একটা জখম রুগি মানুষের মত বাতাস হাতড়ে হাতড়ে কোনওমতে হেঁটে গিয়ে বিছানাতে শুয়ে পড়ে।

ভবতোষ আবার খাবার ঘরের কাছে এসে করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। করুণা চোখ মুছে নিয়ে ভবতোষের মুখের দিকে তাকান। তারপর দুজনেই আবার বাইরের বারান্দায় এসে দুই চেয়ারে বসেন।

দুই তালগাছের মাঝখানের আকাশ থেকে সেই চাঁদ সরে গিয়েছে। ভবতোষ বলেন,—চর বোধ হয় নদীর জলে ডুবেই গিয়েছে, করুণা।

করুণা,—আমার কিন্তু এখনও শুধু সন্দেহ হয়, বিশ্বাস হয় না।

ভবতোষ,—কী বিশ্বাস হয় না ?

করুণা,—মুস্তফিমশাই হয়ত ঠিক যা শুনেছেন, তাই বলেছেন। মণিও আজ হয়ত তাই শুনেছে। কিন্তু শুনলেই কী মেনে নেওয়া হয় ? অসম্ভব, খুব অসম্ভব, মণি কখনও ওসব কথা মেনে নেবে না। সব মিথ্যে করে দিয়ে মণি শুধু আশাবরীর দত্তসাহেবের ইচ্ছের পুতুল হয়ে যাবে, অসম্ভব, খুব অসম্ভব !

চমকে ওঠেন ভবতোষ,—কী রে ? শরীরটা ভাল বোধ করছিস না ? উঠে এলি কেন ?

মণীশ বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বারান্দাতে দাঁড়িয়েছে। করুণার চেয়ারের কাঁধটার উপর হাতের

ভর দিতে গিয়ে করুণারই কাঁধের উপর হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে মণীশ,—মাসি !

করুণা,—বল ।

মণীশ হাসতে চেষ্টা করে,—এই যে আমি পুরো তিনটে বছর জার্মানিতে ছিলাম, তাতে আমি কি তোমাদের পর হয়ে গিয়েছি ?

করুণা,—শত্তুরেও একথা বলবে না । ষাট, পর হবি কেন ? কেমন করে পর হবি ? হওয়া কি সম্ভব ?

মণীশ,—তুমি কি মনে কর যে, বাণীব সঙ্গে আমার বিয়ে হলে, আব বিয়ে হবাব পর আমি তোমাদেব পব হয়ে যাব ?

করুণা,—না ।

মণীশ,—বিয়ের পর আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোমাদের কাছে যদি সব ছুটিতেই আসি, তবুও কি মনে কববে যে, আমি পর হয়ে গিয়েছি ?

করুণা,—না ।

মণীশ,—বাণী যদি এ বাড়িতে আসতে না চায়, যদি শুধু আমি একাই—

করুণা,—বিয়ের পরেও বাণী এ বাড়িতে আসবে না ?

মণীশ,—না ।

করুণা,—কী অদ্ভুত কথা বলছিস ?

মণীশ,—হ্যাঁ, অদ্ভুতই বটে ।

করুণা,—তবে কি কলকাতাতে তোর বিয়ে হবে ।

মণীশ,—হ্যাঁ, ও বাড়ির সবারই তাই ইচ্ছে ।

করুণা,—এ বাড়ির কি কোনও ইচ্ছে থাকতে পারে না ?

মণীশ,—পারে বই কি ! কিন্তু উপায় নেই মাসি । তোমাদের ইচ্ছের কথাটা জোর করে ভুলেই যাও ।

করুণা ফুঁপিয়ে ওঠেন,—ভগবান !

—চুপ ! ভবতোষ চেঁচিয়ে ওঠেন ।

মণীশ,—মেসো তুমি মাসিকে একটু বুঝিয়ে বলো ।

ভবতোষ,—কী বলব, কী বুঝিয়ে দেব, তুই বল শুনি !

মণীশ,—আমার পক্ষে যে বাণীকে অস্বীকার করা কখনওই সম্ভব নয়, অস্বীকার করা উচিত নয়, এই সত্যটা মাসিব একটু বুঝে দেখা উচিত ।

ভবতোষ,—নিশ্চয় উচিত ।

মণীশ,—তুমিও কি দেখলে খুশি হবে যে, যে মানুষ আমার আশায় তিনটি বছর ধরে অপেক্ষায় রয়েছে, যাকে আমি স্পষ্ট করে কথা দিয়েছি, তাকে আমি আজ অস্বীকার করছি ?

ভবতোষ,—কখনও না, একটুও খুশি হব না ।

মণীশ,—মেসো !

ভবতোষ,—বল ।

মণীশ,—তোমরা বোধ হয় আশাবরীর দত্তসাহেবকেও একটু বেশি ভুল বুঝেছ ।

ভবতোষ,—যা দেখছি আর শুনছি, তাই বুঝেছি । তাব বেশি কিছু নয় ।

মণীশ,—না, অনেক কিছুই শুনতে পাওনি । যেমন তোমরা, তেমনি ওঁরাও আমাকে আপনজনের মত—

ভবতোষ,—আর বলতে হবে না ।

মণীশ,—আমি জানি মেসো, বিয়েটা জগেশপুরে হলেই ভাল হত, কিন্তু—

ভবতোষ হাসেন,—আর বলতে হবে না ।

মণীশ,—আমার এখনও বিশ্বাস আছে, বাণী নিজেই একদিন এখানে আসতে চাইবে, আসবে । জগেশপুর সম্পর্কে ওদেরও মিথ্যে ভয় একদিন কেটে যাবে ।

ভবতোষ,—হয়ত তাই হবে।

মণীশ,—তা হলে স্পষ্ট করে বলো, একটুও রাগ না করে বলো মেসো, বলো মাসি, তোমাদের কোনও আপত্তি নেই!

ভবতোষ বলেন,—আপত্তি নেই। করুণা বলেন,—আপত্তি নেই।

ভবতোষ,—যা, এবার গিয়ে শুয়ে পড়, ঘুম নষ্ট করিস না।

করুণা,—টেবিলে মিছরির জলের গেলাস রেখে দিয়েছি। তেষ্টা যদি পায় তবে খাবি।

চলে গেল মণীশ। চাঁদটা ডুবেই গিয়েছে। বেশ অন্ধকার, উড়ে যাচ্ছে বাদুড়ের ঝাঁক।

ভবতোষ,—তোমার মনে আছে কি করুণা, অনেকদিন আগে স্বপ্নেতে মেজদি আর রমেশদা দেখা দিয়ে কী কথা বলেছিল?

করুণা,—মনে আছে।

ভবতোষ,—মেসো আর মাসিকে বাবা আর মা বলে ডাকতে নেই, মনে করতে নেই, এটাই বোধ হয় সেই স্বপ্নের আসল অর্থ। কিন্তু মেজদি আর রমেশদা তো এমন কথা বলেনি যে, মেসো আর মাসি যেন তাঁদের ছেলেকে আপন ছেলে বলে মনে না করে!

করুণা,—থামো তুমি।

ভবতোষ,—আমি ফুলের ব্যবসা করি বটে, কিন্তু ভগবানও আমার এমন দোষ খুঁজে পাবেন না যে, আমি কখনও মায়ার ব্যবসা করেছি। মণি একদিন মস্ত রোজগেরে হয়ে আমাকেও বড়লোক করে দেবে, কোনওদিন ভুলেও তো এ রকম কোনও আশা বা ইচ্ছের লোভ আমার মনে—

করুণা,—থামো!

ভবতোষ,—তখন ওর বয়স কত, চার বছর বোধ হয়। হলদে হয়ে গিয়েছিল চোখদুটো। মধু ডাক্তার বললেন, রিকেট হবার ভয় আছে। ওষুধ খাইয়ে নিয়ে ওকে রোজ সকালবেলাতে কোলে করে মাঠে মাঠে হেঁটে পাঁচ মাইল দূরের সিরসিরা নদীটা পর্যন্ত চলে যেতাম আর ফিরে আসতাম। কই, ভুলেও তো কোনওদিন মনে হয়নি যে, মেজদির ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুরছি! তাই—

হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে নীরব হয়ে যান ভবতোষ। তারপরে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন,—সেই তো ভুল হয়েছিল, ভয়ানক ভুল। শিক্ষা বাকি ছিল, সেই শিক্ষা পেয়ে গেলাম। আশাবরীর দত্তসাহেবকে ধন্যবাদ; উনি যেন বিধিলিপির আদেশে হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমাকে সেই শিক্ষা পাইয়ে দিলেন।

করুণা,—শুধু একা দত্তসাহেবকে দূষছ কেন?

ভবতোষ,—হতে পারে, অণিমা দত্তও এর মধ্যে আছেন।

করুণা,—এঁরা ছাড়া কি আর কেউ নেই?

ভবতোষ,—তুমি মেয়েটিকেই নিন্দে করতে চাইছ বোধ হয়?

করুণা,—না, একটুও না।

ভবতোষ,—তবে কে?

প্রশ্নের উত্তর দেন না করুণা। স্পষ্ট করে উত্তরটা দিয়ে ফেললে যেন তাঁর জীবনের সব বিশ্বাসের জগৎটাই ধিক্কৃত হয়ে আর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

ভবতোষ,—তুমি বোধ হয় বলতে চাও যে, আসল দোষ মণির!

করুণা,—না, দোষ নয়। দোষ বলব কেন?

ভবতোষ,—দোষ না হোক ভুল, এই তো বলতে চাও?

—হ্যাঁ।

—তুমি মনে করেছ, মণি যদি দত্তসাহেবের মেয়েকে একেবারে মনে-প্রাণে পছন্দ না করে ফেলত, তবে সে নিশ্চয় দত্তসাহেবের ইচ্ছে আর উপদেশের মায়াতে এমন করে জড়িয়ে পড়ত না।

—তাই তো মনে হয়।

হাসতে থাকেন ভবতোষ,—ও কথা মনে করে কোনও লাভ নেই করুণা। তুমি কি মণিকে বলতে পারবে যে, ওই মেয়েকে ছেড়ে দে? ভুলেই গিয়েছ বোধ হয় সেই খুকুবউয়ের কথা?

—কী বললে ?

—মেলাতে সাঁওতাল মান্‌ঝির পসরা থেকে যে পুতুলটা কিনেছিলে মণির জন্যে। কালো চোখ, লাল ঠোঁট, আর সবুজ রঙের খোঁপা, একটা নেকড়ার পুতুল, দশ পয়সা দাম।

করুণা,—কোন যুগের কথা বলছ তুমি ?

ভবতোষ,—সেই যুগের কথা, মণির বয়স যখন তিন বছর, মণি যখন নেকড়ার খুকুবউ পুতুলটাকে সর্বক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরে রাখত, ঘুমোবার সময়েও ছাড়ত না।

হেসে ফেলেন করুণা,—মনে পড়েছে।

ভবতোষ,—ছেলেকে চান করাবার সময় পুতুলটাকে ওর হাত থেকে সরিয়ে নিতে গেলে ছেলে কী রকম চেঁচিয়ে কেঁদে উঠত, মনে আছে ?

—সবই মনে আছে।

—কিন্তু কোনওদিনও পুতুলটাকে ওর হাত থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে সরিয়ে দিতে পেরেছিলে কি ? সে সাধ্যি হয়েছিল ?

করুণা,—না।

ভবতোষ,—তবে ? তবে আজই বা পারবে কেন ?

পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠেন ভবতোষ। করুণা চেঁচিয়ে ওঠেন,—এ কী ? তুই উঠে এলি কেন ? ঘুমোসনি তুই ?

মণীশ,—ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল।

করুণা,—মিছরির জলটা খেয়েছিস ?

মণীশ,—না।

করুণা,—তবে এখনি গিয়ে খেয়ে নে।

মণীশ,—কিন্তু তোমরা দুজনে এখানে বসে আছ কেন ?

করুণা,—সংসারের দু-চারটে কথা বলাবলি করছি। কিন্তু সেজন্যে তুই...

মণীশ,—বাজে কথা বলবে না। যাও, এই মুহূর্তে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো !

আরও এগিয়ে এসে ভবতোষের একটা হাত ধরে টানতে থাকে মণীশ,—তুমি শেষরাতে উঠবে আর বাগানে ঘুরে দেখবে, নতুন গোলাপের চারা কেমন হিম খেয়েছে, তাই না ?

ভবতোষ,—পুরনো অভ্যেস, কী করব বল ?

মণীশ,—তবে আর ঘুমোবে কখন ? রাত দুটো যে পার হয়ে গিয়েছে।

ভবতোষ,—যাচ্ছি, যাচ্ছি, তুই হাত ছাড় !

—আগে ওঠো, তারপর হাত ছাড়ব।

উঠে দাঁড়ান ভবতোষ। মণীশ তাঁর হাতটা ছেড়ে দিতেই বুঝতে পারেন, কত শক্ত করে তাঁর হাতটাকে ধরেছিল মণীশ।

অন্ধকারে স্পষ্ট করে না দেখতে পেলেও মনে হয়, মণীশ যেন বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গলার স্বরও বেশ শক্ত বলে মনে হয়।

মণীশ বলে,—শোনো মেসো, শোনো মাসি, তোমরা যা চাও, তাই হবে।

করুণা,—কী বললি ?

মণীশ,—জগেশপুরেই বিয়ে হবে, আর, বিয়ের পর বাণী এই বাড়িতে আসবে।

॥ ৭ ॥

আশাবরীর ঘরের কোণে কোচের উপর বসা ধরণী দত্তের শান্ত মূর্তিটা নড়ে ওঠে। বারান্দার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনেছেন ধরণী দত্ত। ডাক দিলেন ধরণী দত্ত,—কে ? কে ওখানে হাঁটাহাঁটি করছে ?

অণিমা জবাব দেন,—আমি, ডাকপিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেল।

দুটো চিঠি হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকেন অণিমা,—দুটোই তোমার চিঠি, লিখেছে সুকান্ত আর বিকাশ।

ধরণী দত্ত হাসেন,—অর্থাৎ, মোতিয়া টি-এস্টেট আর মানুড়ি কোলিয়ারি।

অণিমা,—অর্থাৎ, দুই ম্যানেজার।

ধরণী দত্ত,—একজন সাড়ে ছ'শো, একজন সাড়ে আটশো।

অণিমা,—তবে দুজনই বেশ সরল মনের মানুষ।

ধরণী দত্ত,—তবে সুকান্তর স্বভাবে একটু প্রখরতা আছে, যেটা আমার একটুও ভাল লাগে না। খুব সরল মেজাজের মানুষ হল বিকাশ। মণীশও সরল মনের মানুষ।

অণিমা,—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ধরণী দত্ত,—কৃতিত্বে, তার মানে কেরিয়ারে আর সাকসেসে মণীশের সঙ্গে কিন্তু দুজনের কেউই কোনও তুলনাতে আসতে পারে না।

অণিমা,—আমি বলি, এই দুই চিঠির কোনও জবাব এখন না দেওয়াই ভাল।

ধরণী দত্ত,—না না। জবাব দিতেই হবে। জবাব দেওয়া উচিত। এরাও তো আমাকে কারও চেয়ে কম শ্রদ্ধা করে না। তা ছাড়া, তুমি তো এদেরও যথেষ্ট স্নেহ কর!

অণিমা,—নিশ্চয়। স্নেহ করাই উচিত। বিকাশ বলেছে, জগেশপুর ছেড়ে আপনারা সবাই চলে আসুন, আমার মানুড়িতে যতদিন ইচ্ছে থাকুন, চিরকাল থাকুন। আমার চমৎকার বাংলো একেবারে খালি পড়ে আছে।...বলো, আমাদের সবাইকে এতটা আপনজন বলে বুঝতে ও জানতে কে আর চায়?

ধরণী দত্ত,—সুকান্তও তো এই কথা বলে। সুকান্তর মোতিয়া চা-বাগানে আগেকার ইংরেজ ম্যানেজারের পুরনো বাংলোটা খালি পড়ে আছে। শুধু একটু মেরামত দরকার। সুকান্ত বলছিল, শীতের চারটে মাস ছাড়া বাকি আট মাস ওই বাংলোতে আপনারা থাকতে পারেন, সুখ-সুবিধার কোনও ত্রুটি হবে না।

অণিমা,—আমার কিন্তু এরকম দুদিনের সুখের ক্যাম্প-লাইফ পছন্দ নয়। যেখানে থাকব সেখানে শান্তিতে থাকব, চিরকাল থাকব।

ধরণী দত্ত,—ঠিকই বলেছ। আশার কথা এই যে, মণীশের কাছ থেকে আমরা যে ধরনের শ্রদ্ধা পেতে চাই, মণীশ ঠিক সেই ধরনের শ্রদ্ধা দিতে...

ঘরে ঢুকল মণীশ। ধরণী দত্তের মুখের স্নিগ্ধ হাসিটা আরও স্নিগ্ধ হয়,—এসো মণীশ।

অণিমা,—আশাবীরতে সকালবেলার চা তুমি কি আগে কখনও খেয়েছ?

মণীশ,—না।

অণিমা,—তবে? এটা যে আমাদের একটা দুঃখের অভিযোগ, সেটা কি তুমি জানতে?

মণীশ হাসে,—না।

অণিমা,—খুব খুশি হয়েছি মণীশ, আজ তুমি সকালবেলাতে এসেছ। চা খাও মণীশ।

মণীশ,—দিন।

অণিমা ডাক দেন,—চা নিয়ে আয় বাণী, মণীশ এসেছে।

ধরণী দত্ত,—কাল তুমি কী যেন বললে? তিন মাসের মধ্যেই দেরাদুন অফিস থেকে তোমার কাজের খবর এসে যাবে, যেন এই রকম একটা কথা—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিন মাসের মধ্যেই কাজের চিঠি এসে যাবে।

—খুব ভাল কথা। খুব সুখের কথা। কামনা করি, তোমার সুখ শান্তি আরও বাড়ুক, আরও বড় হও।

—আমার কিছু বলবার ছিল।

—বলো, বলো।

—বিয়ের অনুষ্ঠান কলকাতাতে না হয়ে জগেশপুরে হওয়া উচিত।

—কেন উচিত?

—উচিত বলেই উচিত। আর, বিয়ের পর বাণীর পক্ষে আমাদের ওই বাড়িতেই থাকা উচিত।

চমকে ওঠেন অণিমা,—কেন বাবা, কী হল বাবা মণীশ? আজ হঠাৎ তুমি কী ভেবে এত শক্ত ভাষায় এরকম ভয়ানক শক্ত কথা বলছ?

ধরণী দত্ত চমকে ওঠেন না, তাঁর চোখের দৃষ্টি বরং আরও নিবিড় হয়ে, যেন মমতায় ভরে গিয়ে টলমল করে,—তোমাদের বাড়ি মানে কোন বাড়ি আর কার বাড়ি? তোমার মেসোর বাড়ি নিশ্চয়?

—হ্যাঁ।

—তোমার মেসো আর মাসি তোমাকে খুবই ভালবাসেন নিশ্চয়?

—নিশ্চয়।

—কিন্তু, প্রশ্নটা শুনে আশ্চর্য হয়ো না মণীশ, সে ভালবাসার মধ্যে কি কোনও স্বার্থ?

—আছে হয়ত।

—হয়ত নয়, আছে, খুব বেশি আছে।

অণিমা বলে ওঠেন,—থাকা স্বাভাবিক।

ধরণী,—আমিও তাই বলি, খুব স্বাভাবিক। তাঁদের সেই স্বার্থকে তুষ্ট করাও একটি বড় কর্তব্য।

অণিমা,—আমরা বিশ্বাস করি মণীশ, তুমি কোনওদিনও মেসো আর মাসিকে সাহায্য করতে ভুলে যাবে না।

ছলছল করে কেঁপে ওঠে ধরণী দত্তের গম্ভীর গলার স্বর,—কিন্তু তোমার জন্য আমাদের যে ভালবাসা, তার মধ্যে স্বার্থের সামান্য একটা কণাও নেই।

অণিমা,—কিন্তু ভাবনা আছে।

ধরণী দত্ত,—তুমি যেন সুখী হও, শুধু এই ভাবনাই আমাদের ভাবনা।

বার বার হাত তুলে চোখ মোছেন অণিমা,—বাণী আমাদের মেয়ে, কিন্তু তুমি বোধ হয় বিশ্বাস করবে না মণীশ, তোমার জন্য আমরা যত মায়া বোধ করি, তত মায়া বাণীর জন্যও বোধ করি না।

ধরণী দত্ত,—তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি, এই জগেশপুর তোমার জীবনের সব আনন্দ নষ্ট করে দেবে। মেসোর বাড়ি তোমার পক্ষে যত আদরের বাড়ি হোক না কেন, আসলে সেটা একটা স্বার্থের বাড়ি। তুমি আর বাণী সে বাড়ির ছোঁয়াচ থেকে দূরে থাকলেই তোমাদের মঙ্গল।

অণিমা,—মনে কর, বাণী নামে কেউ নেই। তবু কি তোমাকে আমরা কোনওদিনও পর বলে মনে করতে পারব?

ধরণী দত্ত,—অসম্ভব।...হ্যাঁ, চা খাও মণীশ।

চায়ের ট্রে হাতে করে বাণীকে ঢুকতে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন ধরণী দত্ত আর অণিমা। দু'জনেই মণীশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অণিমা বলেন,—ধন্যি জগেশপুরের বাতাস। একদিনেই ছেলের মুখটি কত শুকিয়ে গিয়েছে।

ধরণী দত্ত নিজেরই কপালে হাত ছুঁইয়ে, আর, যেন জোর করে একটা দীর্ঘশ্বাসের কষ্ট চেপে দিয়ে কথা বলেন,—ছেলে বোধ হয় ভুল বুঝবে, নইলে এখনই জোর করে বলতাম, তোমাকে ধরে রাখলাম। কোনওদিনও চলে যেতে দেব না।

ভিতরের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ধরণী দত্ত আর অণিমা। চায়ের ট্রে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বাণী আনমনার মত দূরের আকাশের এক টুকরো সাদা মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাণীর সাজের সবই সাদা। কানের দুলের পাথরটাও সাদা, গলাতে সাদা পাথরের দানার মালা। বাণীর মুখটা কিন্তু অদ্ভুত এক রঙিন বিহ্বলতার ছবি।

বাণী হাসে,—বলো, কী স্বপ্ন দেখেছ?

মণীশও হাসতে চেষ্টা করে,—কোনও স্বপ্ন দেখিনি।

বাণী,—দেখেছ, নিশ্চয় দেখেছ। দেখেছ, বাণী মরে যাচ্ছে, আর তাই দেখে তুমি হাসছ, হেসেই চলেছ।

ট্রে থেকে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে আর মণীশের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়

বাণী। দেখতে পায় মণীশ, বাণীর চোখের পাতা জলে ভিজে ভারি হয়ে গিয়েছে।

চমকে ওঠে মণীশ। শুধু চোখ দুটো নয়, মণীশের বুকটাও কেঁপে ওঠে। মণীশ ডাকে,—এ কী, বাণী ? কী হল ?

বাণী,—তুমি আমাকে যত ইচ্ছে হয় দুঃখ দাও। সে অধিকার তোমার আছে। কিন্তু আমার বাবা আর মাকে দুঃখ দিও না।

মণীশ,—তুমি আমাকে বুঝতে ভুল করছ, আমি শুধু এইটুকু চেয়েছি যে...

বাণী,—ওইটুকু চাওয়াই যে বাবা আর মাকে ভয়ানক দুঃখ দেওয়া ! পৃথিবীতে যাঁরা দু'জন তোমার ভাল সবচেয়ে বেশি বোঝেন, তাঁদেরই ইচ্ছার কথাটাকে তুচ্ছ করলে তাঁদের ওপর কি খুব নিষ্ঠুর একটা আঘাত করা হয় না ?

বাণীর হাত ধরবার জন্য হাত বাড়ায় মণীশ। হাত সরিয়ে নিয়ে বাণী আবার সেই দূর আকাশের সাদা মেঘের টুকরোটার দিকে আনমনার মত তাকিয়ে থাকে,—আমাকে যদি তুচ্ছ কর, কোনও অভিযোগ করব না। কিন্তু বাবা আর মাকে তুচ্ছ করলে একশো বার অভিযোগ করে বলব, তুমি অন্যায় করছ।

বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মণীশ। ঠোঁট কাঁপে কিন্তু কোনও কথা বলতে পারে না। বুকের ভিতরটা হঠাৎ বুঝি শূন্য হয়ে গেল। তিন বছরের আর চোখের কাছের চেনা জ্যোৎস্নার ছবিটা যেন সাদা মেঘ হয়ে দূরের আকাশে চলে গিয়েছে, তারই দুঃখের ভাষাটা শুনছে মণীশ।

উঠে দাঁড়ায় মণীশ। কী আশ্চর্য, বাণী তবু মুখ ফিরিয়ে তাকায় না। দেখবার চেষ্টাও করে না, চলে যাবার জন্যে কার উদাস মূর্তিটা উঠে দাঁড়িয়েছে।

মণীশ বলে,—আমি চলি।

—না, মুখ ফিরিয়ে মণীশের মুখের দিকে তাকায়। বাণীর সেই চোখে অদ্ভুত একটা আভা জ্বলছে, সিরসিরা নদীর বালুতে দুপুর রোদে পুড়ে অভ্রের কুচিগুলি যেমন করে জ্বলে।

মণীশ,—আজ এখন যাই।

বাণী,—আমার এই সাদা সাজের ওপর কাদা আর কালি ছিটিয়ে দাও, তারপর যাও।

হাত তুলে চোখ ঢাকে বাণী। কোচের উপর আবার বসে পড়ে মণীশ। কিন্তু বার বার উতলা হয়ে উঠছে একটা কষ্টের নিঃশ্বাস। কোনওদিনও এত স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি মণীশ, আজ বুঝতে পারে, বাণী যদি এইভাবে হাতে তুলে মুখ ঢাকে আর নীরব হয়ে যায়, তবে মণীশের জীবনের সব কলরব স্তব্ধ হয়ে যাবে।

—ছিঃ, এ কী করছি আমি ! মুখঢাকা হাত দুটোকে হঠাৎ সরিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে বাণী। ফুল্ল জ্যোৎস্নারই হাসি। বাণীর ভিজে চোখের পাতাতেও সেই জ্যোৎস্না হাসছে।

মণীশ,—আমিও তাই ভাবছিলাম, এ কী করছে বাণী ?

বাণী,—আবার কখন আসছ ?

মণীশ,—সন্ধ্যাবেলা।

বাণী,—না, আজ বিকেল হলেই চলে এসো।

মণীশ,—আসব।

বাণী,—কিন্তু দোহাই তোমার, তোমাদের জগেশপুরের ওই লাল গোলাপ আর নিয়ে এসো না।

মণীশ,—কেন ?

বাণী,—দেখতে কেমন যেন ভয়-ভয় করে, মন। হয়ত এটা আমার একটা মিথ্যে ভয়। তবু, আমার এই মিথ্যে ভয়টাকে একটু মান্য করলে তোমার মান ছোট হয়ে যাবে না। তুমি...প্লিজ...দয়া করে—

মণীশ,—বেশ তো, আনব না।

বাণীর গলার স্বরটা উচ্ছল হয়ে উঠতে গিয়ে নিবিড় হয়ে যায়। ভিতরের ঘরের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে মণীশের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে বলে,—তুমিই তো উপহার, আর কোনও উপহার চাই না...আচ্ছা, এসো।

—আসি।

আশাবরীর ফটক পার হয়ে যখন সড়কের উপর এসে দাঁড়ায় মণীশ, তখন দেখতে পায় ভোলাবাবুর হরধামের বেড়ার ওপাশে কৃষ্ণচূড়ার একটা ডালের উপর একটা বনময়ূর বসে আছে। ছোটছেলের দল সড়কের উপর দাঁড়িয়ে, আর আশ্চর্য হয়ে বনময়ূর দেখছে। ভোলাবাবুকে নিকটে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। থাকলে, আর মণীশকে দেখতে পেলে নিশ্চয় এখনই ছুটে আসতেন. আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যতসব অদ্ভুত কথা বলে একটা রহস্যের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন, কেন জগেশপুরের গাছে এরকম একটা একলা ময়ূর হঠাৎ দেখা দিল ? এ কিসের লক্ষণ ? জগেশপুরের ভাগ্যের একটা নতুন সংকেত নয় কি ?

রোদের তেজ আছে বেশ, পথ হাঁটতে তবু কোনও ক্লেশ নেই। কপালটা ঘামে ভিজে যায়, কিন্তু নিঃশ্বাসের বাতাসটা তবু ক্লান্ত হয় না। বাণীর মুখের কথাটাই যেন সুরের গুঞ্জন হয়ে মণীশের বুকের ভিতরে ঘুরছে। বাণীকে আজ যেমন ভাল লেগেছে, তেমন ভাল আগে কোনওদিনও লাগেনি। বন্ধু অনিমেষ কী যেন একটা কাব্যিক কথা বলত, সোনার কাঠির ছোঁয়া। সে ছোঁয়াতে মরণঘুম ভেঙে যায়, ভুলের ঘুমও নিশ্চয় ভাঙে।

পথে রোদ থাকুক, মণীশের মনের ভিতরে এখন সেই জ্যোৎস্না, যে জ্যোৎস্নাতে বনের পাখির প্রাণও ডাক দিয়ে জেগে ওঠে।

বাড়ির বারান্দায় রোদে মাদুর মেলে দিয়ে পুরনো তেঁতুল শুকোতে দিয়েছে মাসি। আর, ছিপিখোলা যত আচারের শিশি। মাসি তো জানে, আচার খেতে মণীশের কোনওদিনও ভাল লাগেনি। তবু মাসির ওই এক জেদ, গাদা গাদা আচার তৈরি করবে আর মণীশকে খাওয়াতে চেষ্টা করবে।

ঘরের ভিতর আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে মেসো ; হাতে একটা অনেকদিনের পুরনো ছেঁড়া-ময়লা বই, খুকুমণির ছড়া, ছড়া পড়ে রিণির মতই হেসে আকুল হচ্ছে মেসো।

কিন্তু বাড়ির এই ভিতরের ঘরেও যে গোয়ালঘরের গন্ধটা ভেসে আসছে, সেটা যেন ফুলের কারবারি এই মেসোর নাকে একটুও লাগছে না, আশ্চর্য !

—রিণি, ডাক দেয় মণীশ।

ভবতোষ বলেন,—রিণি গিয়েছে বনময়ূর দেখতে।

মণীশ,—কই ? আমি তো সেখানে রিণিকে দেখলাম না ?

ভবতোষ,—তবে হয়ত এদিকেই কোথাও আছে।

উঠোনের এক কোণে জ্বলন্ত উনুনের উপর একটা ডেকচি চাপিয়ে কী করছে মাসি ? জিজ্ঞাসা করবার আগেই মণীশের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠেন করুণা,—কী বলব বল, বৈজু আজকাল রাম-নাম জপ করে। মুরগি রাঁধতে চায় না। কাজেই আমি রাঁধছি, তুই বিদেশে চলে যাবার পর আজ এই প্রথম, সকালবেলাতেই হেদায়েত মিঞার বাড়িতে গিয়ে মুরগি কিনে নিয়ে এসেছে তোর মেসো।

মণীশ,—কী শুরু করেছ তোমরা ? আমি যেন অফিসের বড়বাবু, হঠাৎ কেরানিবাবুর বাড়িতে এসে পড়েছি, কেরানিবাবুর বাড়িটা তাই বড়বাবুকে তোয়াজ করবার জন্য মুরগির মাংস রাঁধতে শুরু করে দিয়েছে।

করুণা হাসেন,—এ বাড়িতে তুই বড়বাবু বইকি ! একটা পেটুক লোভী বড়বাবু।

মণীশও হাসে,—তা তো বটে। কিন্তু আর সবাই যেন একেবারে নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ এক একটি তপস্যা।

মণীশের কথার শব্দটা যেন করুণার কানে খট্ করে বেজেছে। মণীশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন করুণা, তারপর নিজেই আবার হাসতে চেষ্টা করেন,—ঝাল ভালবাসিস তো, না সে অভ্যেস বদলে গিয়েছে ?

—না, মাংসে একটুও ঝাল দিও না।

ঘরের ভিতরে ভবতোষও বোধ হয় মণীশের ওই হাসি-মাখানো ঠাট্টার কথাগুলো শুনতে

পেয়েছেন, নইলে হঠাৎ ওরকম করে চমকে উঠবেন কেন, আর ছড়ার বইটাকে বন্ধ করে রেখে দেবেনই বা কেন ?

রিণি এ সময়ে বাড়িতে থাকলে মণীশকে পাল্টা ঠাট্টা করে একটা তর্কাতর্কি বাধিয়ে তুলত। কিন্তু রিণি নেই, সারা বাড়িটা যেন কথা ভুলে গিয়ে আর শব্দ হারিয়ে একেবারে বোবা হয়ে যায়।

অনেক বেলা করে বাড়ি ফিরে এল রিণি। মণীশ তখন ঘুমিয়ে, খাওয়া সারা হয়ে গিয়েছে আগেই।

অলস চেহারার জগেশপুরের বিকেলবেলাকে আরও অলস দেখায়। ব্যস্ততার ঘন্টা বাজে শুধু একটি স্থানে, শর্মাজির বাবার স্থাপিত একটি মন্দিরে। মন্দিরের বিগ্রহ হলেন কৃষ্ণ মুরলীমনোহর, কালো পাথরের কৃষ্ণ, রুপোর চোখ, হাতে সোনার বাঁশি। শর্মাজির বাবা সংসারের যন্ত্রণার চেহারা দেখে ভয় পেতে পেতে শেষে একেবারে উদাস হয়ে গিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল, ঘরের জীবনে শান্তি থাকে না। সন্ধ্যা হলেই সবার অগোচরে ঘর ছেড়ে চলে যাবেন, শান্তির ঠাঁই খুঁজে বের করবেন, এই প্রতিজ্ঞা করে আর তৈরি হয়ে, সকাল থেকে উপোস করে বাগানের গাছতলায় ঘাসের উপর শুয়ে রইলেন শর্মাজির বাবা। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ চমকে জেগে উঠলেন। তখন বিকাল হয়েছে, বাঁশি বাজছে, মধুর মধুর মধুর বাঁশির স্বর বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। শান্তিতে ভরে গেল শর্মাজির বাবার মনটা। তারপর তৈরি করালেন ওই মন্দির। নিয়ম করা হয়েছে, বিকেলবেলাতে মুরলীমনোহরের পুজো হবে। পুজোর ঘন্টার শব্দ দূরের ওই শালবনের কাছে দাঁড়িয়েও শুনতে পাওয়া যায়।

আজ ভবতোষের বাড়িতেও যেন একটা বৈকালি ব্যস্ততার সাড়া জেগেছে। আশাবরীতে যেতে হবে, মণীশ তাই ব্যস্ত। শর্মাজিদের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে হবে, করুণা তাই ব্যস্ত। ডালাতে বাতাসা, সন্দেশ আর ফুল সাজিয়ে রেখেছেন করুণা। ভবতোষও করুণার সঙ্গে যাবেন ; আদুড় গায়ের উপর সাদা চাদর জড়িয়েছেন ভবতোষ।

দেখে খুশি হয় মণীশ, টেবিলের উপর আজ আর সেই বস্তুটা নেই। ভালই হয়েছে, থাকলেও আজ আর বস্তুটার কোনও দরকার হত না। টেবিলের উপর লাল গোলাপের তোড়া রেখে দেওয়া রিণির সন্ধ্যাকালীন ব্যস্ততার কীর্তি। এখনও সন্ধ্যা হয়নি, রিণির বিকেলবেলার ঘুমও ভাঙেনি। তাই লাল গোলাপের তোড়াও টেবিলের উপর নেই।

বাইরের বারান্দাতে এসে হাতের ঘড়ির দিকে একবার তাকায় মণীশ। ব্যস্ত হয়ে দু'পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়, পিছু থেকে ডাক দিয়েছেন করুণা,—কোথায় যাচ্ছিস, মণি ?

করুণা, তাঁর সঙ্গে ভবতোষও ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বাইরের বারান্দাতে দাঁড়ালেন। করুণা আবার জিজ্ঞাসা করেন,—মীরাদিকে দেখতে যাচ্ছিস বুঝি ?

মণীশ—না।

করুণা—তবে ?

—যাচ্ছি আশাবরীতে।

—এসময়ে কেন ?

—ওঁদের ইচ্ছে, তাই এসময়ে যাচ্ছি।

—ওঁরাই বা এরকম একটা ইচ্ছা করে বসেন কেন ?

—কথাটার কি কোনও মানে হল মাসি ?

—মানে টানে কী হল বা না-হল, বুঝি না বাবা। কোনওদিনও বিকেলবেলাতে ও বাড়িতে তোকে যেতে দেখিনি, আজ দেখছি, তাই বলছি।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, মাসি ?

—বাজে কথা হলে জিজ্ঞাসা করবি না।

—বাজে কথা নয়, খুব কাজের কথা।

—বলো।

—তোমরা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ কি আমার জন্য কোনও মায়া বোধ করতে পারে না ?

—পারে।
—তোমাদের চেয়েও বেশি ?
—হ্যাঁ, তাও হতে পারে।
—তবে আমাকে তাদের একটা ইচ্ছার কথা বলবারও অধিকার কি তাদের থাকবে না ?
—খুব থাকবে।
—তবে ? আশাবরীর সামান্য একটা ইচ্ছার কথাতে তোমাদের এত আপত্তি কেন ?
—সামান্য ইচ্ছার কথা হলে আপত্তি নেই।
—কী এমন অসামান্য ইচ্ছার কথা ওঁরা বলেছেন ? জগেশপুরের জীবনের সঙ্গে ওঁদের জীবনের কোনও মিল নেই। সেটা তো তোমরাও দেখে বুঝতে পারছ। কাজেই ওঁরা চান না যে, বিয়ে জগেশপুরে হয়।
—বেশ তো, তাই নয় হল। কিন্তু বিয়ের পর বাণী এখানে আসবে না কেন ?
—বাণীর রুচি, বাণীর ইচ্ছে।
ভবতোষ হেসে ওঠেন। যেন মুখ ঢাকা দিয়ে ভয়ানক একটা আর্তনাদ হেসে উঠেছে,—ঠিক, ঠিক বলেছে মণি। না, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। আপত্তি করা উচিত নয়।
করুণার স্তব্ধ মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে ভবতোষ আবার হেসে ওঠেন,—চলো, কোথায় যে যাবে বলেছিলে, পুজো দিতে ?
করুণা,—হ্যাঁ, চলো।
ভবতোষ আর করুণা চলে গেলেন, অলকা নার্সারির পাঁচিলের ছায়া ধরে ধরে, হেম নিয়োগীর মরকত কুটিরের নোনা আতার বাগান পার হয়ে, ছোট মাঠটার দিকে, যেখান থেকে শর্মাজিদের মন্দিরের খোলা দরজা স্পষ্ট দেখা যায়।
লাল কাঁকরের সড়কটা এবাড়ির ফটকের কাছ থেকেই দক্ষিণে ঘুরে সোজা একেবারে আশাবরীর দিকে চলে গিয়েছে। আশাবরীতে পৌঁছতে বিশ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। কিন্তু ব্যস্ত হয়ে চলতে শুরু করেই থেমে যায় মণীশ। এদিকে এগিয়ে আসছে যে মেয়ে, তাকে চেনাচেনা মনে হয়। আগন্তুকও কাছে এসে দাঁড়ায় আর হাসতে থাকে,—আমি জানি, আপনি দেশে ফিরেছেন। আমাকে চিনলেন তো ?
মণীশ,—হ্যাঁ, চিনেছি। আপনি তো এখন ভোলাকাকার বাড়িতে থাকেন।
আগন্তুক চোখ টান করে তাকায়,—ও কী কথা ? আমাকে 'আপনি' করে বলছেন কেন ? আমি রিণির চেয়ে বয়সে অনেক বড় ঠিকই, কিন্তু আপনার চেয়ে তো ছোট।
মণীশ—রিণি বলেছিল বটে, তবু ঠিক মনে পড়ছে না। কী যেন তোমার নামটা ?
—সুধা।
—তুমি কী করে জানলে যে, আমি দেশে ফিরেছি ? রিণি বলেছে ?
—রিণি বলবে কেন ? আমিই তো সবার আগে আপনাকে দেখেছি। জগেশপুরের কেউ তখনও জাগেনি, কিন্তু আমি জেগেছিলাম, জানালা দিয়ে দেখলাম, আপনি হেঁটে চলে যাচ্ছেন।
—রিণি এখনও ঘুমোচ্ছে।
—ঘুমোলে চলবে না, আমি ওকে চিমটি কেটে জাগিয়ে তুলব।
—কেন ? কী দোষ করেছে রিণি ?
—আমাকে না বলে আমার খাতা নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ওর সঙ্গে আজ আমার ঝগড়া আছে।
মণীশ—কিসের খাতা ?
সুধা—জিজ্ঞেস করবেন না।
মণীশ—কেন ?
সুধা—বলতে পারব না, সত্যি কথাও না, মিথ্যে কথাও না।
মণীশ—তা হলে যাও, দেখো চেষ্টা করে, রিণির ঘুম ভাঙাতে পার কিনা।

হঠাৎ খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল ; সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা। লম্বা ইউকালিপটাস কাত হয়ে নুয়ে পড়ছে, আবার খাড়া হয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। ইচ্ছে ছিল মণীশের, আগে রঘুকাকার বাড়িতে এসে দেখা দিয়ে হিরুদার সঙ্গে গল্প করবে। যদি রাত বেশি না হয়ে যায়, তবে একবার হিতেশবাবুর সঙ্গেও দেখা করে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। রুড়কিতে পড়বার সময় প্রতি ছুটিতে যখন জগেশপুরে ফিরতে হত, তখন মধুপুরের স্টেশনে হিতেশবাবুর সঙ্গে দেখা হতই হত। ট্রেন থেকে নামতেই দেখতে পেত মণীশ, হিতেশবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। মণীশকে দেখতে পেয়েই তিনি এগিয়ে আসতেন, আর প্রত্যেকবার সেই একই কথা বলতেন,—সব খবর ভাল তো, মণীশ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পড়াশুনা খুব ভালই চলছে, নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ।

—রেণুর ছোট বোন, শিপ্রাও কলকাতার কলেজে পড়ছে। জানই তো, রেণুরা সাত বোন ; সব চেয়ে ছোটটি হল এই শিপ্রা।

—রেণু কে ?

—রেণু, আমার স্ত্রী রেণু।

—আপনি ভাল আছে ?

—বড় ভাল মেয়ে শিপ্রা। রূপে গুণে শিক্ষায় স্বভাবে, সব রকমে ভাল। যাই হোক, তোমার ভাল খবর শুনতে পেলে আমরা খুবই খুশি হই।

এই হঠাৎ-বৃষ্টিটা একটা বাধা। তাই রঘুকাকার বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে যাবার চেষ্টা না করে হিতেশবাবুর বাড়ির বারান্দাতে এসে দাঁড়ায় মণীশ।

বাড়ির সব দরজা আর জানালা বন্ধ। বার বার দরজার কড়া নাড়ে আর ডাক দেয় মণীশ,—হিতেশবাবু আছেন ?

কোনও সাড়া না পেয়ে আবার ডাক দেয়,—ক্ষিতীশবাবু আছেন ?

বাড়ির ভিতরে আলো জ্বলছে বোঝা যায়। কথার শব্দও শোনা যায়। বাড়ির লোক হাঁটাহাঁটি করছে, থালা বাটি নাড়ানাড়ি হচ্ছে ; সব ব্যস্ততার শব্দই শুনতে পাওয়া যায়। তবে ওরাই বা মণীশের গলার আওয়াজ আর কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাবে না কেন ?

ভাগ্য ভাল মণীশের, বৃষ্টিটা হঠাৎ থেমে গেল। মিথ্যে ডাকাডাকির হয়রানি থেকে মুক্তিও পেয়ে গেল মণীশ। না, এখন আর ইউকালিপটাসের বাড়িতে নয়। একটানা হাঁটা দিয়ে বাঘছালের বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ায় মণীশ। তারপর সিঁড়ি ধরে দোতলায়।

হিরুদার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পায় মণীশ, হিরুদা মেয়েলি গলার স্বর নকল করে বলছেন,—যেমতি দীপিকা, উজরে অধিকা, ভিতরে অনল শিখা।

আর একজন কে যেন নাকি সুরে বলছেন,—পতঙ্গ না বুঝিয়া, পড়য়ে উড়িয়া, পুড়িয়া মরয়ে পাখা।

স্বর শুনে ভোলাকাকার গলা বলে মনে হচ্ছে। আশ্চর্য নয়, আগেও কতবার দেখেছে মণীশ, হিরুদার সঙ্গে গল্প করবার সময় সাদামাথা ভোলাকাকা তাঁর বয়স ভুলে যান। পৃথিবীতে বোধ হয় ওই একটি মানুষ, ভোলাকাকা, যার সঙ্গে হিরুদার প্রাণের মিল আর ভাবের মিল আছে। কিন্তু দু'জনের স্বভাবে কোনও মিল নেই, সবটাই অমিল। মণীশ ঠাট্টা করে বলত, পজিটিভ আর নেগেটিভ। দু'জনে কাছাকাছি হলে কিন্তু কোনও অগ্ন্যুৎপাত ঘটে না, এই রকম রগড় উথলে ওঠে।

হিরুদা এখনও সেইরকমই একজন হিরুদা, একটুও বদলাননি বলে মনে হয়। কিন্তু রঘুকাকা আর মীরা কাকিমা কেমন আছেন ?

হিরুদার ঘরে না ঢুকে মীরা কাকিমার ঘরে ঢোকে মণীশ। বিছানার উপরে বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন মীরা কাকিমা। ঘরের কোণে বেতের মোড়ার উপরে বসে আর মীরা কাকিমার মুখের

দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছেন, যেন ধুঁকছেন রঘুকাকা। মীরা কাকিমার সেই পঙ্গু আর রোগা শরীরটা কী ভয়ানক শুকিয়ে গিয়েছে, যেন হাড়ের কাঠি দিয়ে তৈরি একটা খেলনা পুতুলের শরীর। রঘুকাকার চেহারার দশাও প্রায় একটা যা-দশা। বুকটা চুপসে গিয়েছে।

মীরা কাকিমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায় মণীশ—কেমন আছেন কাকিমা ?

মীরা কাকিমার চোখ দুটো কিন্তু সেই আগের মতই ঝিক করে হেসে ওঠে,—ভালই আছি, মণীশ। তুমি কেমন ?

—ভাল। আপনি কেমন আছেন কাকা ?

রঘুকাকার মাথাটা খুশি হয়ে দুলে ওঠে—ভাল আছি, কিন্তু...কথা থামিয়ে আর হেসে নিয়ে রঘুকাকা বলেন,—কিন্তু আর ভাল থেকেই বা লাভ কী ?

পাশের ঘরে চেঁচিয়ে উঠলেন হিরুদা,—কে ? কে ওখানে কথা বলছে ? নিশ্চয় মণীশ এসেছে !

মণীশ—হ্যাঁ।

হিরুদা—আমিও ভাল আছি।

হিরুদার ঘরে ঢুকেই চমকে ওঠে মণীশ—এ কী, আপনি যে আরও রোগা হয়ে গিয়েছেন, হিরুদা।

—হ্যাঁ রে ভাই, ছিলাম লিকলিকে, হয়েছি ডিগডিগে ! ভগবান যেমনটি রাখবেন, তেমনটি তো থাকতে হবে ! ভগবান আজকাল দু'মাস অন্তর একবার আসেন, আর মাত্র দু'শো টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যান। তাতে তো আর মাখন কেনা সম্ভব হয় না ! তোমার মীরা কাকিমা আর রঘুকাকার ওষুধ কেনাও হয় না।

—ঠিক বুঝলাম না, হিরুদা।

—আমাদের জঙ্গলকুঠির সরকার পাঁচুবাবু, উনিই তো ভগবান। কিংবা ভগবানই বোধ হয় একটি পাঁচুবাবু।

—ভোলাকাকা, আপনি কেমন আছেন ?

—আমি ভাল আছি বাবা। আমাদের কোনও রোগ নেই, কিন্তু আমার করাত-কল একটি বছর ধরে গেঁটে বাতে ভুগেছে। কিন্তু সেরে উঠেছে। আমি যেমন চলছি, আমার করাত-কলও তেমনি চলছে।

চেঁচিয়ে ওঠেন হিরুদা,—কিন্তু আমি আর চলতে চাই না, মণীশ। আমাকে দেখেই বুঝতে পারছিস, আমার আর বেশি দেরি নেই, হয়ে এসেছে। আমি শুধু এই চাই যে, বুড়ো-বুড়ি আমার আগেই কেটে পড়ুক। ...কী হল, তুই ওভাবে চোখ দুটোকে করুণ করে তাকাচ্ছিস কেন ?

মণীশ,—যত বাজে কথা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার অভ্যেস আজও গেল না, হিরুদা।

হিরুদা—তবে একটা কাজের কথা নিয়ে মাথা ঘামাই।

ভোলাবাবু হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে হাসেন,—বলো হিরু, কাজের কথাটা বলে ফেলো।

হিরুদা,—কাজের কথাটা হল একটা ইচ্ছের কথা। ইচ্ছে ছিল, কেটে পড়বার আগে তোর বিয়েটা যেন দেখতে পাই !

মণীশ—এরকম একটা পরস্মৈপদী সাধ হল কেন ?

হিরুদা—তোর বিয়ে মানেই আমার বিয়ে।

মণীশ—চমৎকার ধারণা !

হিরুদা—তার মানে, তুই যাকে পছন্দ করে বিয়ে করবি, তাকে যদি আমার পছন্দ হয়, তবে আমারও বিয়ে করা হয়ে গেল।

মণীশ—চমৎকার থিওরি !

হিরুদা—শুধু আমার থিওরি নয় ; তোর মীরা কাকিমা আর রঘুকাকারও ওই থিওরি। একবার জিজ্ঞেস করে দেখ গিয়ে।

ভোলাবাবু—হ্যাঁ, ওঁরাও এই কথা বলেন। চলে যাবার আগে মণীশের বিয়েটা দেখা যেতে পারলে ভাল ছিল।

কোনও কথা না বলে এইবার খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে আকাশের একটুকরো মেঘের দিকে তাকায় মণীশ। সাদা মেঘ যদিও নয়, তবুও সাদা মেঘের কথাই মনে পড়ে। মণীশের চোখের সেই দৃষ্টিতে বেশ স্পষ্ট করে একটা বিরক্ত অপ্রসন্ন ও অখুশি ভাব ফুটে ওঠে। যেমন অদ্ভুত এই জগেশপুর, তেমনই অদ্ভুত জগেশপুরের এই সব সাধের থিওরি।

ভোলাবাবু বলেন—মণীশ কী যেন ভাবছে।

হিরুদা—কী ? আমার কথা শুনে রাগ করলি নাকি, মণীশ ?

মণীশ হাসে—না, রাগ নয়, তবে একটু আক্ষেপ না করেও পারি না।

হিরুদা—আক্ষেপ কেন ?

মণীশ—মীরা কাকিমা আর রঘুকাকা ওরকম একটা ইচ্ছের কথা বলে ভুল করেছেন।

হিরুদা—কেন ?

মণীশ—ইচ্ছে হয়ত সফল হবে না, শুধু একটা দুঃখ পেতে হবে।

হিরুদা—তা তো পেতেই হবে। যাকগে, ওসব কথা এখন থাকুক। বল, কেমন লাগল জার্মানি ?

মণীশ—খুব ভাল, আপনি যাবেন ?

হিরুদা—এ জন্মে নয়, আর জন্মে যেতে পারি।

মণীশ—যাবেন তবে।

হিরুদা—কিন্তু আমারও কি ভাল লাগবে ?

মণীশ—লাগবে।

হিরুদা—জার্মানিতে কি এইরকম একটা জগেশপুর আছে ?

মণীশ—না, এরকম ঘুঁটের ধোঁয়ার জগেশপুর সেখানে নেই।

হিরুদা—তা হলে সেখানে আমার গিয়ে লাভ নেই। নারদ মুনি এক বরাহকে বর দিতে চেয়েছিলেন, স্বর্গে যাবে বরাহ ? বরাহ বললে, স্বর্গ কি খুব সুখের ধাম ? নারদ বললেন, হ্যাঁ। বরাহ জিজ্ঞাসা করলে, সেখানে খুব ইয়ে পাওয়া যায় ? নারদ বললেন, না, একটুও না। তখন বরাহ বললে, তা হলে আর স্বর্গে থেকে কি সুখ হবে আমার ? স্বর্গে যেতে চাই না।

মণীশ—তা হলে যাবেন না। ...কিন্তু পাশের বাড়ির হিতেশবাবু গেলেন কোথায় ?

হিরুদা—কেন ? বাড়িতেই তো আছেন !

মণীশ—ডেকে ডেকে কোনও সাড়া পেলাম না, তাই মনে হল, হিতেশবাবু এখন হয়ত বাড়িতে নেই।

হিরুদা—হিতুবাবু, ক্ষিতুবাবু সবাই আছেন, গিন্নিরা আছেন। বুড়িরা, বাচ্চা-কাচ্চারা সবাই আছে, তবে বাড়িটার দরজা-জানালা সব সময় বন্ধ থাকে। কেউ ডাকলে কোনও সাড়া দেয় না ওই বাড়ি।

মণীশ—কেন ?

হিরুদা—ভয়। ওবাড়ির প্রাণে অদ্ভুত একটা ভয় ঢুকেছে, দরজা-জানালা খোলা দেখতে পেলেই আমি নাকি ওদের গুলি করে মারব।

মণীশ—এরকম অদ্ভুত আর মিথ্যে ভয়ের কারণ কী ?

হিরুদা হাসেন—খুব মিথ্যে ভয় বলা চলে না, মণীশ। সত্যি, এই তিন বছরে আমাকে তিনবার গুলি চালাতে হয়েছে।

চমকে ওঠে মণীশ—সে কী !

হিরুদা—কিন্তু ওদের মাথার ওপর নয়, আকাশে গুলি ছুঁড়েছি। তাতেই কাজ হয়েছে। ...ব্যাপারটা মণীশকে একটু বুঝিয়ে বলে দিন না, ভোলাকাকা।

ভোলাকাকা—তুমিই বলো।

হিরুদা—ওই যে, জার্মানি যাবার জন্য কলকাতা রওনা হবার আগের দিনে তুমি হিতেশবাবুর বাড়িতে একটা ভদ্রতার দেখা দিতে এসেছিলে, ঠিক সেদিনই রাত্রিবেলা আমি এই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আর উঁকি দিয়ে দেখলাম, ওই বাড়ির উঠোনের ওপর কর্তারা, গিন্নিরা আর ছেলেমেয়েরা

সবাই মিলে অসহায় মেয়েটাকে ঘিরে ধরেছে। বড়গিন্নি একটা হাতপাখা দিয়ে মেয়েটাকে পিটছে। আমি তখনই রাস্তার একটা ছোকরাকে ধরে বললাম, যা ভাই, এখুনি একবার গিয়ে ভোলাবাবুকে খবরটা দিয়ে দে ; খুব দরকার, এখুনি আসতে হবে। বলবি, হিরুবাবু ডাকছেন।

ভোলাবাবু—আমিও তখুনি ছুটে এসে এই জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দৃশ্যটা দেখলাম। হিতু গর্জন করে মেয়েটাকে বলছে—বলতেই হবে। মেয়েটা বলছে,—বলব না। ক্ষিতু একটা বেত হাতে তুলে নিয়ে হুংকার দিচ্ছে,—না বললে মেরে ফেলব, বলতেই হবে। মেয়েটা বলছে,—মেরে ফেললেও বলব না। হিতু তখনই মেয়েটার গলা টিপে ধরল। ক্ষিতুর ছোট ছেলেটাও ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়েটার গায়ে লাথি মারতে শুরু করে দিল।

মণীশ—মেয়েটা কে ?

ভোলাবাবু—নেহাতই অল্পবয়সের একটা মেয়ে, পরের মেয়ে, যাকে ওরা দুটো ভাত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে দিবারাত্রি দাসীর মত খাটাত।

হিরুদা—অল্পবয়সের মেয়ে নয়, যথেষ্ট যুবতী মেয়ে।

ভোলাবাবু—আহা, আমি বলতে চাইছি স্বভাবটা অল্পবয়সের একটা মেয়ের মত।

হিরুদা—প্রায় তোরই মত। বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি।

মণীশ—তারপর কী হল ?

ভোলাবাবু—অনেক কিছু হল। আমি দৌড়ে গিয়ে ওবাড়ির দরজাতে বার বার ধাক্কা দিলাম, ডাক দিলাম—কী হচ্ছে ভেতরে ? শিগ্‌গির দরজা খুলুন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। অগত্যা...

হিরুদা—অগত্যা আমি বাবার বন্দুকটা তুলে নিয়ে এসে আকাশে ফায়ার করলাম, বার বার তিনবার।

ভোলাবাবু—সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে সবাই দুড়দাড় করে ছুটে পালিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

মণীশ—এই মেয়েই তো সুধা, এখন আপনার বাড়িতে থাকে।

ভোলাবাবু—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নামটা তোমার মনে আছে দেখছি। কিছু খবরও শুনেছ মনে হচ্ছে !

মণীশ—হ্যাঁ, রিণির সঙ্গে সুধার ভাবসাব আছে।...রিণি বললে, সুধা এখন আপনার বাড়িতে থাকে।

ভোলাবাবু—সুধার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি ?

মণীশ—হ্যাঁ, হয়েছে। কিন্তু সুধাকে এরকম মারধোর করবার কারণটা কী ?

ভোলাবাবু—ওই যে, সুধার মুখের ওই একরোখা কথা, কখখনও বলব না। আমরা অবিশ্যি জানতে পেরেছিলাম, কী বলবে না বলে ওরকম জেদ দেখিয়েছিল সুধা।

মণীশ—কী ?

ভোলাবাবু—সেটা একটা লজ্জার কথা। তোমার সেকথা না-শোনাই ভাল। যাই হোক, আমাদের মনে হয়েছিল যে, মেয়েটার ওপর আর কোনওদিন ওরা মারধোর করতে সাহস করবে না। কিন্তু আবার একদিন...

হিরুদা—তখন দুপুরবেলা, চৈত্র মাসের দুপুর, তবু বেশ মিষ্টি ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। আর নবীনবাবুর বাড়ির কেষ্টচূড়ার মাথায় বসে একটা কোকিল ডাকছিল। দেখলাম, তোদের চাকর বৈজু তখন চেঁচিয়ে রাম-নাম গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর, ওবাড়ির বাইরের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে সুধা হাত তুলে আর ইশারা করে বৈজুকে ডাকছে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, মোটা সোনার বালা পরা একটা হাত, নিশ্চয় বড়গিন্নির হাত, হঠাৎ পেছন থেকে সুধার খোঁপাটাকে খিমচে ধরে সুধাকে টেনে নিয়ে গেল। তারপর আর কিছু দেখা গেল না। শুধু শোনা গেল চড়-চাপড়ের শব্দ আর সুধার কান্নার শব্দ। কান্নাটাও যেন বার বার মুখ থুবড়ে পড়ছে আর উঠে দাঁড়াচ্ছে। আর, সুধার মুখে ওই একটি কথা—না, বলব না, মেরে ফেললেও বলব না। কাজেই, আমি আবার বন্দুক তুলে তিনবার ছিটে গুলি ছুঁড়ে ঢ্যাঙা ইউকালিপটাসের মাথাটাকে কাঁপিয়ে দিলাম। ইউকালিপটাসের মাথা থেকে একটা কাকের পালক খসে পড়ল আর উড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সুধার কান্নার শব্দও বন্ধ হয়ে

গেল।

মণীশ—বৈজুকে ডেকেছিল কেন সুধা ?

ভোলাবাবু—জিজ্ঞাসা করো না। সেটা একটা লজ্জার কথা।

হিরুদা—তৃতীয়বার, আবার একদিন দেখলাম, বেত হাতে নিয়ে ক্ষিতুবাবু নেকড়ে বাঘের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে গিয়ে রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকলেন।

ভোলাবাবু—হিরু তখনই আমাকে খবর দিয়ে ডেকে পাঠাল, আর, আমিও ছুটে এলাম।

হিরুদা—দেখলাম, বড়গিন্নি চোখ পাকিয়ে বলছেন,—আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। আজ সব্বনাশী মেয়ে না বললে পার পাবে না, এসব লেখাজোখার মানে কী ? কান পেতে শুনলাম, রান্নাঘরের ভেতর বেতের শব্দ ছুটোছুটি করছে, হাঁড়ি-কলসী-বালতি হুড়মুড় করে পড়ছে আর গড়াচ্ছে, আর সুধার কান্নার শব্দটা যেন দেয়ালে দেয়ালে গুঁতো খেয়ে খেয়ে ঘুরছে, একবার এদিকে, একবার ওদিকে। কিন্তু সুধার মুখে সেই কথা,—বলব না, কখখনও বলব না। অগত্যা আবার বন্দুক হাতে তুলতে হল আর ওদের উঠোনের কলার ঝাড়ের ওপর তাক করে তিনবার ফায়ার করতে হল। সেদিন আমার মাথার ভেতরে রাগটাও একেবারে আগুন হয়ে জ্বলছিল।

ভোলবাবু—আমিও সেদিন আর রাগ সামলাতে পারলাম না। হিতুবাবুর বাড়ির খিড়কির দরজাটাকে লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ডাক দিলাম—কোথায় গো মেয়ে, সুধা তুমি কোথায় ? শেষে একেবারে রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে সুধার হাত ধরে টান দিলাম,—চলো, এখনই এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।

হিরুদা—সুধাকে সঙ্গে নিয়েই বের হয়ে এলেন ভোলাকাকা।

ভোলাবাবু—ক্ষিতুবাবু শাসালেন,—মনে রাখবেন আপনি পরের বাড়ির মেয়ে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছেন।

হিরুদা—ভোলাকাকা একগাল হেসে সুধাকে জিজ্ঞেস করলেন,—তোমার এখন বয়স কত, সুধা ? সুধা বললে—চব্বিশ বছর।

ভোলাবাবু—আমি ক্ষিতুকে বললাম, সাবালিকা মেয়ে নিজের ইচ্ছাতে আমার সঙ্গে যাচ্ছে। তাই না, কী বলো সুধা ?

হিরুদা—সুধা বললে, হ্যাঁ,—আমি ইচ্ছে করেই যাচ্ছি।

ভোলাবাবু—ব্যস, খেল খতম, পয়সা হজম।

মণীশ—ওরা আর কোনও গোলমাল করেনি ?

ভোলাবাবু—হ্যাঁ, হিতুবাবু গিয়েছিলেন মধুপুরে এস-ডি-ও'র কাছে, ওঁদের কেমন-যেন কুটুম হন এস-ডি-ও। আর, আমি গিয়েছিলাম, সোজা একেবারে দুমকাতে, এস-পি'র কাছে। এস-পি এসে একদিন ওই ইউকালিপটাসের কাছে দাঁড়িয়ে হিতুবাবুকে বেশ কড়া একটি ধমক দিলেন। ব্যস, গোলমালের মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

মণীশ—কিন্তু সুধার লেখা-জোখার ব্যাপারটা কী ব্যাপার ? সেটাও একটা অপরাধ নাকি ?

ভোলাবাবু আবার মাথা দুলিয়ে আর লাজুকভাবে হাসতে চেষ্টা করেন—জিজ্ঞেস করো না, মণীশ। সেটাও একটা লজ্জার কথা।

হিরুদার শীর্ণ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে আর নীরব হয়ে বসে থাকে মণীশ। চোখ দুটো যেন বিস্মিত হয়েও বেশ বিষণ্ণ।

হিরুদা—আমাকে দেখছিস বুঝি ?

মণীশ—হ্যাঁ।

হিরুদা—কী মনে হচ্ছে ?

—ভাবছি, আপনি ওই শরীরের দুটো হাত দিয়ে বন্দুক ধরলেন কী করে ?

—জীবনে আমার দ্বারা তো কোনও সুকাজ হল না, তাই ভাবলাম অন্তত একটা সুকাজ করে যাই, অন্তত একটা মানুষের কিছু উপকার করা হোক।

—তা ভালই করেছেন। কিন্তু চেষ্টা করে এবার নিজের একটু উপকার করুন।

—কী রকম উপকার ?

—জঙ্গলকুঠিতে একবার যান, কারবারের অবস্থাটার একটু খোঁজ-খবর নিন। পাঁচুবাবুর লুঠ বন্ধ করুন। চেষ্টা করে রোজগার বাড়িয়ে তুলুন। ইচ্ছে করে নিজেকে মারছেন, এ আপনার কী সাংঘাতিক বাতিক ! কী ভয়ানক মনের রোগ !

—চেষ্টা কখনই করব না, মণীশ।

—কেন ?

—সুকাজের চেষ্টা সফল হয় না।

—কী বললেন ?

—কুকাজের চেষ্টাই সফল হয়।

—তার মানে ?

—তার মানে, ভবকাকার ফুলের ব্যবসা বার বার লোকসান খায়, কিংবা কোনওমতে চলে। আর শম্ভু সাহুর ভেজাল তেলের ব্যবসা একবছরে ফেঁপে ওঠে। তার মানে, হেমবাবুর ছেলে বিজয় এম-এ ইকনমিকসে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েও জামালপুর কলেজে প্রফেসর হতে পারল না, হল গিয়ে ডি-আই-জি যদুবাবুর ছেলে সত্যনাথ, সেকেণ্ড ক্লাস টেন্‌থ্। চোরেরা বড়লোক হয়, আর বড়লোকেরা চোর। রেলওয়ের জন্য স্লিপার সাপ্লাইয়ের সবচেয়ে কম দর দিয়েছিলেন ভোলাকাকা, কিন্তু ভোলাকাকার টেণ্ডার ঠেলে ফেলে দিয়ে গুরুবক্স সিংয়ের টেণ্ডার মঞ্জুর করা হল। নন্দীবাবুর মেয়ে মালতী লেখাপড়াতে এত ভাল হয়েও স্কুল ফাইনালের পরীক্ষাতে পেয়েছে থার্ড ডিভিশন মার্ক, আর ওই যে মেয়ে, হরেন মিস্তিরের মেয়ে রেখা, স্কুলের দিদিমণিরা যাকে বলেন একটা নিরেট গবেট মেয়ে, অঙ্ক কষতে গিয়ে তিন থেকে তেরো বাদ দিয়ে তিনশো তেরো লিখেছিল যে-মেয়ে, সে পেয়েছে ফার্স্ট ডিভিশন মার্ক।

মণীশ—এর ঠিক উল্টোটিও তো হয় !

হিরুদা—হতে পারে। আমার জানা নেই। হ্যাঁ, যদি দৈব কোনওদিন সত্যিই আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, সুকাজের চেষ্টা সফল হয়েছে, যার যা পাওয়া উচিত ছিল, সে তাই পেয়েছে, তবে আমিও চেষ্টা শুরু করে দেব, নিশ্চয় করব। কিন্তু তার আগে নয়।...কী, কথাগুলি শুনতে তোর বোধ হয় খুব খারাপ লাগছে ?

—খুব আশ্চর্য হচ্ছি।

—কেন ?

—দেখছি, এই তিন বছরের মধ্যে আপনারা সবাই যেন কী রকম হয়ে গিয়েছেন।

—বদলে গিয়েছি ?

—হ্যাঁ, যাকে যেরকম দেখে গিয়েছিলাম, তাকে আর ঠিক সেরকম দেখছি না। শুধু এক...

—আশাবরীতে গিয়েছিলি ?

—হ্যাঁ।

—কেমন আছে আশাবরী ?

—ঠিক সেরকমই আছে ; একটুও বদলায়নি।

—শুনে খুব খুশি হলাম মণীশ। আমার ভয় ছিল, তুই হয়ত অন্যরকমের কোনও কথা বলবি।

ভোলাবাবুর দুই চোখ খুশির পুলক লেগে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে,—উৎসবটা কবে ?

মণীশ—কী বললেন ?

হিরুদা—আরে তোর বিয়েটা কবে ?

মণীশ—তিন মাসের মধ্যে যে কোনও একটি দিনে। তিন মাসের মধ্যেই আমার কাজের খবর এসে যাবে, কাজেই...

হিরুদা চেঁচিয়ে ওঠেন—হুররে, হুররে ! একবার কল্পনা করুন ভোলাকাকা, আশাবরীর মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর কুমারসাহেবের লাল মখমলের সেই দরবারি সামিয়ানা, তার ওপর...ভোলাকাকা, আপনি একবার বললে কুমারসাহেব ওই সামিয়ানা নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন।

মণীশ হেসে ফেলে—বিয়ে হবে কলকাতাতে, এখানে নয়।

হিরুদা—বেশ তো, তাই না হয় হল। কিন্তু বউভাতের উৎসবটা তো এখানেই হবে, কুমারসাহেবের দরবারি সামিয়ানার দরকার হবেই হবে।

মণীশ—না হিরুদা। এখানে ওসব কিছুই হবে না। ওরকম উৎসব ওঁরা পছন্দ করেন না। ...আচ্ছা, আমি এখন চলি।

চলে গেল মণীশ। কিন্তু হিরুদা আর ভোলাবাবু যেন হঠাৎ পাথর হয়ে-যাওয়া দুটি মানুষের নির্জীব মূর্তি। দু'জনারই মুখের হাসি হঠাৎ পুড়ে গিয়ে আর ছাই হয়ে যেন দু'জনার পাথরের চোখের সামনে উড়ছে।

অনেকক্ষণ পরে ভোলাকাকা কথা বলেন—সেদিন যা সন্দেহ হয়েছিল হিরু, তাই সত্য হল দেখছি। পতঙ্গের পাখা পুড়েছে।

হিরুদা বেশ আস্তে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন, কিন্তু তাতেই তাঁর ডিগডিগে শরীরের সব হাড় যেন যন্ত্রণা পেয়ে কেঁপে ওঠে—ব্যাপারটা শুধু তাই নয়, ভোলাকাকা। তার চেয়েও খারাপ আর জটিল।

ভোলাকাকা—হ্যাঁ, সে দৃশ্যটা তুমি দেখনি, আমি দেখেছিলাম, হিরু। কোথা থেকে এক হনুমান এসে স্টেশনের জমাদারনির বাচ্চাটাকে ঘরের ভেতর থেকে তুলে নিয়ে পাকুড়গাছটার একেবারে মগডালে উঠে বসে রইল। গাছতলায় একগাদা মর্তমান কলা রাখা হল, কিন্তু হনুমান তবু নেমে এল না। পুলিস এল, কিন্তু পুলিসও হতাশ হয়ে বললে,—কোনও চেষ্টা করাই যে সম্ভব হচ্ছে না। হনুমানকে গুলি করলে যে বাচ্চাটাও পড়ে যাবে আর মরে যাবে। ...কাজেই আমাদের চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই, হিরু।

হিরুদা—ঠিকই বলেছেন।

ভোলাকাকা—আচ্ছা, এখন চলি।

হিরুদা—আসুন!

॥ ৯ ॥

তিন মাসের মাত্র পনেরো দিন পার হয়েছে। শীতের মাস আসতে অনেক দেরি। তবু এক একদিন মনে হয়, যেন পৌষের হাওয়া অকালে এসে পড়েছে, জগেশপুরের গাছপালা শিউরে উঠছে। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, মাঝে মাঝে পাহাড় পরেশনাথের মাথার উপর প্রবল শিলাবৃষ্টি হয়; হাওয়াটা হঠাৎ একটা কনকনে ঠাণ্ডার আমেজ নিয়ে জগেশপুরের দিকে ছুটে আসে। ভোলাবাবু সেদিন গলাতে পশমি কম্ফর্টার জড়িয়ে তাঁর করাত-কলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন।

আজ এই রকমই একটি ঠাণ্ডা লাগা শিউরে-ওঠা দিন। আজ অলকাতে সত্যিই সব ব্যস্ততা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। স্টেশনে গিয়ে আজ খোঁজ করবার দরকার নেই, কলকাতা থেকে রামকুমারের মাছের চালান আজ এসেছে কি না। উনানে আগুন দিতে আজ অনেক দেরি করছেন করুণা। রিণি রাগ করে বলেছে,—আমি নুন দিয়ে ভাত খাব। ভাল হবে না মা, যদি আমার পাতে ডাল কিংবা তরকারি দাও। সাবধান।

আজ থেকে দুপুরের খাওয়াটা আশাবরীতেই খাবে মণীশ; কোনও কুণ্ঠা না করে করুণাকে ইচ্ছার কথাটা বলেই দিয়েছে। কারণ, ধরণী দত্ত আর অনিমার খুব ইচ্ছা, মণীশ যেন অন্তত দুপুরের খাওয়াটা আশাবরীতে এসে খেয়ে যায়। অণিমা বলেছেন—লোকে কি ভাববে, কি না-ভাববে, সেকথা একটুও ভাবি না। তুমি হয়ত ভাবতে পার যে, আমরা একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছি; তাই তোমাকে দু'বেলা এসে খেয়ে যেতে না বলে শুধু একবেলার, শুধু দুপুরের খাওয়াটা এখানে এসে খেয়ে যেতে বলছি। ধরণী দত্ত বলেছেন,—আইনের চোখে তুমি এখনও আমাদের আপনজন হয়ে যাওনি। কিন্তু মণীশ, মায়া কি আইনের ভয় কিংবা লোকচক্ষুর ভয় করে?

সকালবেলাতেই আশাবরীতে এসেছে মণীশ, এখন দুপুর। মণীশের গায়ে মিহি আদ্দির জামা। আশাবরীর মাঝের ঘরের সব জানালা বন্ধ। ঘরে আলো। কোচের উপর বসে, পাশের কোচের

পালিশ-করা কাঠের হাতের উপর হাতটা রেখে বাণীর সঙ্গে কথা বলছে মণীশ। খুব মৃদুস্বরে বলা কথা, কিন্তু প্রাণের কথা নিশ্চয়। তবু, যেন মণীশের হাতের ছোঁয়াচ থেকে একটু আলগা হয়ে, শান্ত ও সুন্দর একটা সঙ্কোচ হয়ে কোচের ওদিক ঘেঁষে বসে আছে বাণী।

ঘরে ঢোকেন অণিমা। আক্ষেপ করেন—আজ ওরকম মিহি আদ্দি গায়ে না দিলেই ভাল করতে, মণীশ।

মণীশ—ভরদ্বাজ এখনও কলকাতায় পৌঁছয়নি, আমার গরম জামাকাপড় সবই এখনও বোধ হয় ভরদ্বাজের সঙ্গে জাহাজেই আছে।

অণিমা—কিন্তু অলকাতে কি একটা আলোয়ানও নেই?

মণীশ—আছে নিশ্চয়।

অণিমা—মাসি আর মেসো তবে ভুলে যান কেন? আলোয়ানটা তোমার হাতে তুলে দিতে পারলেন না কেন?

বলতে বলতে ঘরের ভিতর চলে যান অণিমা, আর, একটি কাশ্মীরি শাল হাতে নিয়ে আবার ঘরে ঢোকেন—নাও মণীশ, এখনি গায়ে জড়িয়ে নাও।

কাশ্মীরি শাল গায়ে জড়ায় মণীশ। সময়ের এক একটি ঘন্টা যেন এক মিনিটে ফুরিয়ে যাচ্ছে।

বাণী হাসে—এখন আর শীত করছে না তো, মন?

মণীশ—না।

বাণী—তুমি রোজ দুপুরে এখানে খাবে, বাবা আর মা যে কী খুশি হয়েছেন, তা আর বলে বোঝানো যাবে না।

মণীশ—তুমি খুশি হয়েছ কি না?

বাণী—বৃথা প্রশ্ন।

মণীশ—তুমি কিন্তু এখন বৃথা এরকম সঙ্কোচ করে, একেবারে ওদিক হয়ে বসে রয়েছ!

বাণী—কী বললে?

মণীশ—কাছে সরে এসো। হাতটা দাও।

হাত দুটোকে বুকের উপর তুলে আর গুটিয়ে নিয়ে, চকিত ভয়ের হরিণীর মত চোখ তুলে তাকায় বাণী—ছি, এখনই ব্যস্ত হয়ো না মন। তিন মাসের মধ্যে আমি মরে যাব না।

ঘরে ঢোকেন ধরণী দত্ত। পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলেন—খানসামা রাখতে আমার কোনও আপত্তি ছিল না মণীশ, আপত্তি হল বাণীর মা এই অণিমার, যিনি তোমারও মা। বড় বড় কুক-বুক পড়ে পড়ে বহুরকম বিচিত্র বিচিত্র রান্না শিখে ফেলেছেন তোমার মা। কিন্তু এই অদ্ভুত জগেশপুরে থাকতে ভাল রান্না আর শখের রান্নার সব জিনিস পাওয়া তো সম্ভব নয়। কাজেই, যথা সম্ভব...। হ্যাঁ, ভেতরে চলো। খাওয়ার ঝঞ্ঝাট এখন চুকিয়ে ফেলা যাক।

সুপ ফ্রাই স্টু, সেই সঙ্গে ডাল তরকারি আর ভাজাভুজিও আছে। ধরণী দত্ত বলেন—এটা হল চাইনিজ, ওটা ফ্রেঞ্চ, আর...এই যে আমাদের দেশি বড়ার মত দেখতে ছেঁচা মিট-বল, এটা হল...এটা কী অণিমা?

অণিমা হাসেন—এটা স্প্যানিশ।

ধরণী দত্ত—আর পুডিংটা হল পুরোপুরি ইংলিশ পুডিং।

অণিমা—মণীশকে আবার এসব বুঝিয়ে বলবার কী আছে, তিন বছর জার্মানিতে কাটিয়ে এল, মণীশ কী কিছু বোঝে না?

মণীশ—আমি সত্যিই বুঝি না। আমার তো সবই জার্মান রান্না বলে মনে হচ্ছে।

সবাই হাসে। হাসি শেষ হবার পর খাওয়া শেষ হয়। খাওয়ার আসরের পরিতৃপ্তিটা উঠে এসে মাঝের ঘরের ভিতরে বসেও হাসতে থাকে। ধরণী দত্ত বলেন—দেরাদুন জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়।

অণিমা—বাণীরও খুব পছন্দ।

ধরণী দত্ত—কোম্পানি থেকে মণীশকে কোনও কোয়ার্টার দেওয়া হবে কি না জানি না, তবে...

মণীশ—কোয়ার্টার না দিক, বাড়ির ভাড়া হিসাবে কিছু টাকা দেবে।

—আন্দাজ কত ?

—তিনশো কিংবা চারশো।

—বেশ তো, তিন চারশো টাকা ভাড়াতে কি ইংলিশ কটেজ ধরনের কোনও বাড়ি পাওয়া যাবে না ? আমি তো মনে করি, পাওয়া যাবে।

অণিমা—গাড়িও দেবে নিশ্চয় ?

মণীশ—তা ঠিক জানি না, তবে গাড়ির খরচ হিসেবেও কিছু টাকা দেবে।

ধরণী দত্ত—তা হলেই হল। দেরাদুনের ভেতরে কাছে আর দূরে দেখবার মত অনেক জায়গা আছে ; একটু বেড়াতে পারলে বাণীর মনে সুখ আর ধরবে না।

বাণীর মুখের দিকে সস্নেহ চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে মণীশের দিকে তাকান ধরণী দত্ত—আমাদের দুজনের স্নেহ আর যত্নের মধ্যেই তোমরা দু'জনে থাকবে। ঘর আগলাবার কোনও দায়-ঝামেলা তোমাদের সইতে হবে না।

অণিমা—কিন্তু খানসামা রাখা চলবে না। আমি থাকতে ওরা পরের হাতের রান্না খাবে কোন দুঃখে ?

ধরণী দত্ত—না হয় রইল একটা খানসামা। খানসামা তোমার মতেই রাঁধবে ; তুমিই সব দেখিয়ে দেবে।

অণিমা—সেটা অবশ্য, হ্যাঁ, তাতে আমার আপত্তি নেই।

ধরণী দত্ত—এই তো সত্যিকারের জীবন, সুখী জীবন। এই তো সুইট হোম।...আমি জগেশপুরের এই আশাবরীকে বিক্রি করে দেবার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছি, মণীশ। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। আশা করছি, সাতদিনের মধ্যেই সাড়া পাওয়া যাবে।

মণীশ—কিন্তু...

ধরণী দত্ত—বুঝেছি, তুমি যা বলতে চাও। আমি ভেবে রেখেছি, যদি কোনও খরিদ্দার কিংবা দালাল চিঠি দেয়, কিংবা এসেই পড়ে, তবে এই শর্তে বাড়ি বিক্রি করব যে, বিক্রির পরেও অন্তত তিনমাস আমাদের এবাড়িতে বাস করবার অধিকার থাকবে।

মণীশ লজ্জিতভাবে হাসে—আমিও এই কথাই বলতে চাইছিলাম।

ধরণী দত্ত—কন্ট্রাক্টর ভাদুড়ী আমাকে ঠকিয়েছে। বাড়ি তৈরির খরচ দেখিয়ে বাইশ হাজার টাকার বিল করেছে। অথচ, এরই মধ্যে ছাদের তিন জায়গায় ফাটল ধরেছে, ভেতরের বারান্দার মোজেয়িক চার জায়গায় ফেঁপে উঠে টিপ টিপ করছে। তিনটে জানালা ভাল বন্ধ হয় না, কী ভয়ানক কাঁচা কাঠ চালিয়ে দিয়েছে !

অণিমা—অথচ ভাদুড়ীর বিল একটু কাটাছাঁটা করতে তোমার বিবেকে বাধছে।

ধরণী দত্ত—হ্যাঁ, বাধছে। দশ হাজার টাকা তো দিয়েই দিয়েছি, তার ওপর একথাও জানিয়ে দিয়েছি যে, বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার পর বাকি বারো হাজার টাকাও দিয়ে দেব। একটি পয়সাও কম করব না।

অণিমা—তুমি কি শুধু ওই ভাদুড়ীর ঠগপনার জন্য রাগ করে...

ধরণী দত্ত—না, শুধু সেজন্যে নয়। কিন্তু মিথ্যে কেন জিজ্ঞেস করছ ? তুমি তো জান, আর মণীশও ভালই বোঝে, কেন জগেশপুর ছেড়ে চলে যেতে চাই।

উঠে দাঁড়ান ধরণী দত্ত, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান অণিমা। ভিতরের ঘরের দিকে চলে যাবার আগে আর একবার মণীশের মুখের দিকে নিবিড় চোখে তাকিয়ে ধরণী দত্ত তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পরিতৃপ্তির কথাটি প্রকাশ করে দিলেন—আমার মেয়ের জীবন সুখে থাকবে, সেজন্য নয়। আমার মণীশের জীবনটা সুখী হবে, সেইজন্য।

ধরণী দত্ত আর অণিমা ভিতরের ঘরের দিকে চলে যাবার পর, অনেকক্ষণ ধরে নীরব হয়ে, আর বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মণীশও বুঝতে পারে, হ্যাঁ সুখী হবে মণীশের জীবন। দেরাদুনেও মণীশের জীবনের ঘর এই রকম একটি পরিতৃপ্তিতে ভরে থাকবে। শুধু এই বাণীই সুন্দর নয়, বাণীর

বাবা আর মা-র প্রাণটাও কত সুন্দর।

বাণীর কালো চোখ দুটো কত বিহ্বল হয়ে মণীশকে দেখছে, যেন আজকের এই পরিতৃপ্তিকে বিহ্বল করে দেবার জন্যে একটি আমন্ত্রণের সঙ্কেত। বাণীর হেয়ারক্রিমের ছোঁয়া পেয়ে ঘরের যে হাওয়াটা সুরভিত হয়েছে, সে হাওয়া যেন মণীশের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতরে ঢুকছে আর উতলা হয়ে উঠছে। তিন বছরের অপেক্ষাটা আর শান্ত হয়ে থাকতে চাইছে না, উতলা পিপাসা হয়ে বাণীর মাথাটাকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর চেপে রাখতে চাইছে। অনেকবার অনেক স্বপ্নে যার মুখের উপর মুখ লুটিয়ে দিয়ে নরম ঠোঁটের তপ্ত মধুরতার স্বাদ পেয়েছে মণীশ, সেই মুখ হল এই মুখ। আজ এই সত্যিকারের পরিতৃপ্তির ঘরেও স্বপ্নের ছবি হয়ে থাকবে কেন এই মুখ ?

উঠে দাঁড়ায় মণীশ, বাণীর গলা জড়িয়ে ধরবার জন্যে হাত বাড়ায়।

দুই হাত জোড় করে বাণী। গলার স্বরে ভীরু মিনতির সুর করুণ হয়ে কেঁপে ওঠে,—আজ নয়, মন। ক্ষমা করো, মন।

মণীশ—না। আজ আর ওকথা বলো না, কোনও মানে হয় না।

বাণী—আমি তোমার কেনা জিনিস ; তোমারই কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি। তবু, আমার কথা শোনো, জোর করো না।

মণীশ—আমি কি সত্যিই জোর করছি ?

বাণী—হ্যাঁ, তুমি বুঝতে পারছ না, তোমার ওই চোখের দৃষ্টিটা কত বড় জোর। তোমার ওই হাত বাড়ানো ইচ্ছেটা যে আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। তবু অনুরোধ করছি, তুমি আজই, এখনই ওরকম করে আমাকে ডেকো না।

—কেন ? কিসের ভয় ?

—ভালবাসাকে অকালে সস্তা করে দিতে নেই, মন। তাতে দু'জনের কারও কোনও লাভ হতে পারে না।

—বুঝলাম না, অকাল বলতে তুমি কী বলছ ?

—আগে বিয়ে হোক !

—সেটা তো...বলতে গেলে একটা ফর্মালিটি ছাড়া আর কিছু নয়।

—ঠিক কথা। কিন্তু একটা উৎসব তো বটে।

—হ্যাঁ।

—সেই উৎসবকে অসময়ে পুরনো করে দিয়ে লাভ কী ?

সরে যায় মণীশ। আবার কোচের উপর বসে, আর শান্ত হয়ে যায়—ঠিক কথাই বলেছ।

বাণীর ভীরু চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—সত্যি করে বলো, আমার কথা শুনে কোনও দুঃখ পেলে না তো ?

—না। কিন্তু...

—বলো।

—সে উৎসবের জন্য তিনটে মাস অপেক্ষা করবার কি কোনও দরকার আছে ?

—আছে বোধ হয়, নইলে বাবা আরও তিন মাস এখানে থাকতে চাইবেন কেন ?

—বিয়ে তো কলকাতাতে হবে ?

—হ্যাঁ।

—তবে আর দেরি না করে, তোমরা কলকাতাতে চলে যাও না কেন ? তারপর আমিও যাই।

নীরব হয়ে, আর একহাতে কপাল টিপে ধরে বাণী কী যেন ভাবতে থাকে। বোধ হয় নিজেরই মনের একটা ভাবনার সঙ্গে নীরবে কথা বলছে বাণী।

মণীশ—মিছিমিছি আরও তিনটে মাস তুমি আমার চোখের সামনে থেকেও কেন একটা আলেয়া হয়ে...

—ছি ছি ! চমকে ওঠে বাণী। মুখ তুলে তাকায়। বাণীর দুই চোখ জলে ভরে গিয়েছে।

—এ কী ? মণীশের বিস্ময়টাও যেন চমকে ওঠে, আর করুণ হয়ে যায়।

—আমাকে আলেয়া বলছ ? ওকথা মুখে আনতে পারলে তুমি ?

—ওটা নিতান্ত একটা কথার কথা। সত্যিই বুঝতে পারিনি, কথাটা তোমাকে এতটা আঘাত দেবে।

—ভুলেও কোনওদিন আমাকে আলেয়া-টালেয়া মনে করবে না। আলেয়া কখনও তিন বছর ধরে অপেক্ষা করে না।

—সেটা কী আমি অস্বীকার করি, বাণী ? তোমার অপেক্ষাই তো আমার কাছে একটা আশ্চর্য সত্য।

বাণী হাসে—নাও, এবার চুপ করো। নয়ত অন্য কথা বলো।

মণীশ—সেইজন্যেই বলছি, আর মিছে কেন তিন মাসের অপেক্ষা ?

বাণীর চোখ দুটো হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। যেন বলবার মত আর মনের মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না বাণী। মণীশও বুঝতে পারে না, আবার কোন আকাশের সাদা মেঘ চোখে পড়েছে বাণীর, যে জন্যে কথা না বলে এরকম উদাস চোখে শুধু তাকিয়ে আছে। ঘরের সব দরজা আর জানালা তো বন্ধ, আকাশ তো দেখতে পাওয়া যায় না!

মণীশ—তোমারও কি আরও তিনটে মাস অপেক্ষা করে থাকতে ভাল লাগছে ?

বাণী—ভাল না লাগুক, সহ্য করতে ইচ্ছে করছে।

মণীশ—কেন ?

বাণী—তোমারই ভালর জন্য।

মণীশ হাসে—এরকম হেঁয়ালির মত করে কথা বললে আমি কী বুঝব, বলো ?

বাণীর চোখের পাতা কেঁপে ওঠে, আর ভিজে যায়—আমাকে কি সত্যিই একটা হেঁয়ালি বলে মনে করো ?

মণীশ—একটুও না। কিন্তু বুঝতে পারছি না, বিয়ের জন্য আরও তিনটে মাস অপেক্ষা করলে আমার কী আর কিসের ভাল হবে!

বাণী হাসে—আমাকে এখন পাঁচ মিনিটের জন্য রেহাই দেবে ?

—কী বললে ?

—চোখ-মুখ একটু ধুয়ে আসি।

—এসো।

বাণী ভিতরের ঘরে চলে যাবার একটু পরেই মাঝের ঘরের ভিতরে ঢুকলেন ধরণী দত্ত আর অণিমা। দু'জনেরই চোখ-মুখ যেন হঠাৎ আনন্দের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত।

কোচের উপর বসে নিয়ে ধরণী দত্ত বলেন—শুনছি, তুমি আর অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করো না ?

মণীশ লজ্জা পায়, সে লজ্জা লালচে হয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে—আপনাদের কী ইচ্ছে ? আরও তিনটে মাস অপেক্ষা করা ?

ধরণী দত্ত—তিনটে দিনও অপেক্ষা করে কাটিয়ে দিতে আমাদের ইচ্ছে করে না।

অণিমা—আমি তো বলি, এই আষাঢ়েই বিয়ে হোক।

ধরণী দত্ত—তুমি যেদিন চাইবে, মণীশ, সেদিনই বিয়ে হবে।

মণীশ—এই মাসেই হোক।

ধরণী দত্ত—মাসেব আর কতদিন আছে ?

অণিমা—আজ হল মাসের দশ তারিখ।

ধরণী দত্ত—তা হলে আরও কুড়িটা দিন আছে। যথেষ্ট যথেষ্ট। কলকাতাতে বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে একটা দিন লাগে।...তবে তাই হবে, মণীশ। আশা করছি, দিন পনেরোর মধ্যে দেরাদুন থেকে তোমার কাজের চিঠিটা এসেই যাবে।

মণীশ—হয়ত এসে যাবে।

ধরণী দত্ত—হয়ত নয়, আমি বিশ্বাস করি, আমার মন বলছে, তোমার কাজের চিঠি বড়জোর আর দশ কিংবা বারো দিনের মধ্যে এসে যাবে।

মণীশ—আজ তবে, আমি এখন চলি।

ধরণী দত্ত—এসো বাবা, এসো।

ঘরের বাইরে এসে দেখতে পায় মণীশ, বাণী দাঁড়িয়ে আছে। চোখ-মুখ ধুয়েছে বাণী। বর্ষাকালের টগরের মত ধবধবে ধোওয়া হাসি ফুটে রয়েছে বাণীর মুখে। শুধু কালো ভুরু দুটি ভিজে রয়েছে, কালো প্রজাপতির দুটি ভিজে ডানার মত।

মণীশের পাশে পাশে হেঁটে সিঁড়ির ধাপ পর্যন্ত এগিয়ে আসে বাণী। মণীশের চলে যাবার পথটুকু ছেড়ে দিয়ে থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। বাণী বলে,—কেমন জব্দ!

মণীশ—কে জব্দ? তুমি, না আমি?

বাণী—তুমি।

মণীশ—তা হলে তাই।

গায়ের কাশ্মীরি শাল নামিযে বারান্দার একটা চেয়ারের উপর রেখে দেয় মণীশ,—আচ্ছা, আমি যাই এবার!

বাণী—যাই নয়, আসি।

মণীশ—একই কথা।

সিঁড়ি ধরে নেমে আনমনার মত একবার থমকে দাঁড়ায় মণীশ। কুয়াশা নেই, গুঁড়ো বৃষ্টি নেই। চোখের সামনে হেঁয়ালির মত কোনও কিছুই নেই।

আশাবরীর ফটকের দু'দিকে বেড়ার মেহেদির পাতার ফাঁকে ফাঁকে দপ্‌দপ্‌ করছে ওগুলো কী? যেন ছোট ছোট আলোর বুদ্বুদ জাগছে, আর ফেটে ফেটে নিভে যাচ্ছে। ওগুলো জোনাকি, হেঁয়ালি নয়। নিজের মনের মধ্যে হেঁয়ালি থাকলে মানুষের চোখে মাঝদুপুরের সূর্যটাকেও হেঁয়ালি বলে বোধ হয়।

ফটক পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় মণীশ, যদিও পায়ে কোনও হোঁচট লাগেনি। দুঃসহ একটা অস্বস্তি যেন আবছায়ার পর্দার মত চোখের সামনে ঝুলছে। ভাবতে সত্যিই বেশ অদ্ভুত লাগে। মণীশের ভালবাসার কাছে তিন বছর ধরে মন-প্রাণ হারিয়ে বসে আছে যে মেয়ে, তার হাত মুখ ঠোঁট আর গলাটা কত সাবধান হয়ে এখনও দূরে সরে আছে; মণীশের একটা ব্যাকুল ইচ্ছের সামান্য ছোঁয়াচও সহ্য করতে চাইল না। বার বার নিজেরই মনটাকে একটা যুক্তির কথা শুনিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে মণীশ, ওটা সত্যিই একটা দরকারি সাবধানতা, একটা স্বাভাবিক মেয়েলি ভয়। মণীশের ইচ্ছেটাকে সত্যিই তুচ্ছ করেনি বাণী। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, মণীশের মনটা যেন বুঝতেই চায় না। তিন বছরের ভালবাসার গর্ব আর বিশ্বাস যেন ওই সামান্য তুচ্ছতার ভীরু-ভীরু হাসিটাকেও সহ্য করতে পারছে না। বাণীর ভাষাতে তো আত্মনিবেদনের কোনও কিছুই বাকি থাকে না, তবে মণীশের হাতের কাছে হাতটাকে এগিয়ে দিতে বাণীর এত লজ্জা কুণ্ঠা আর আপত্তি কেন?

দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে মণীশ, যার কুণ্ঠার কাণ্ডটাকে সহ্য করতে না পেরে মণীশের মন এত অস্বস্তি বোধ করছে, সেই মেয়ে অকুণ্ঠ হাসিতে সারা মুখ ভরে দিয়ে মণীশের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বাণী বলে,—কী ব্যাপার? যেতে যেতে আবার এখানে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

মণীশ হাসে,—আমার এক বন্ধু আছে, কলকাতাতে কলেজের প্রফেসর, অনিমেষ। অনিমেষ একদিন একটা গল্প শুনিয়েছিল, গল্পটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

বাণী—কী অদ্ভুত কাণ্ড! সেই জন্যে তুমি এখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছ?

মণীশ—না, থমকে পড়েছি বলেই অনিমেষের কাছ থেকে শোনা সেই গল্পটা মনে পড়ে গেল। গ্রিসের পৌরাণিক গল্প। অভিশাপ ছিল, তাই টান্টালাস জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকত। চমৎকার জল, টান্টালাসের থুতনি পর্যন্ত ঠেকে রয়েছে, আর টলমল করছে। কিন্তু তৃষ্ণার্ত হয়ে টান্টালাস যখনই জল পান করবার জন্য মুখ নামায়, তখনই জল সরে যায়।

বাণী—তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ বলে মনে হচ্ছে?

মণীশ—তোমাকে নয়, আমি আমাকেই ঠাট্টা করছি।

হেসে হেসে যেন লুটিয়ে পড়তে চায় বাণী,—বুঝেছি, হাত সরিয়ে নিয়েছি বলে তোমার মনে খুব

লেগেছে। কিন্তু...

মণীশ—কী ?

বাণী—জল তো চিরকাল সরে যাবে না, একদিন মুখের কাছেই আসবে। তেষ্টা বাড়িয়ে রাখা ভাল, যদি ভাল স্বাদ পেতে হয়।

মণীশ—তুমি কি তবে সেই জন্যেই, ইচ্ছে করে...

বাণী—হ্যাঁ। তা ছাড়া আর কী ?

মণীশ—তুমি তা হলে একজন ভাল আর্টিস্ট।

বাণী—নিশ্চয়।

মণীশ—কিন্তু বেশ হিসেবি আর্টিস্ট।

বাণী—তার মানে ?

মণীশ—তার মানে, দিনক্ষণের হিসাবটাও ভাল বুঝতে পার।

বাণী—এ কথারই বা মানে কী ?

মণীশ হেসে ফেলে,—তার মানে, বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমাকে টান্টালাস করে রাখতে চাও।

বাণী হাত তুলে ছোট্ট একটা ঘুষির ভঙ্গি দুলিয়ে হাসতে থাকে,—রাখবই তো, সে অধিকার আমার আছে।

মণীশ—বিয়েটাও টান্টালাস হয়ে শুধু আশায় আশায় ছটফট করবে, আমার চাকরির চিঠিটা এসে পড়ল কিনা।

বাণীর চোখে একটা বিস্ময়ের ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে,—তুমি আবার সেই বাজে কথাটাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছ বলে মনে হচ্ছে।

মণীশ—বাজে কথা বলছ কেন ? ওটাই তো সবচেয়ে কাজের কথা। তোমার বাবা যা বললেন, তার মানে ওই দাঁড়ায়, ওটাই কাজের কথা।

বাণী—কিন্তু তার মানে এই নয় যে...

মণীশ—বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

ফটক পার হয়ে রাস্তার উপর এসে দাঁড়ায় মণীশ। জোরে একটা নিঃশ্বাসও ছাড়ে। কিন্তু সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে আজকের অদ্ভুত অস্বস্তিটার ভার ঝরে পড়ে যায় না। হেঁয়ালিটা থেকেই গেল বলে মনে হয়। আরও একটু স্পষ্ট করে, আরও একটু ভাল করে বুঝতে ইচ্ছে করে। রঙিন ছবিটা ফিকে হয়ে গিয়েছে ঠিকই, তবু এখনি ভয়ানক কিছু সন্দেহ করে সে ছবিকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে না।

॥ ১০ ॥

অলকাতে করুণার রান্নাঘরের অবস্থাটা সকালে আর দুপুরে রোজই যেমন সাড়া হারিয়ে উদাস হয়ে যায়, তেমনি রোজই সন্ধ্যায় আর রাতে অনেক ব্যস্ততায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাচান থেকে কুমড়ো পেড়ে আনেন ভবতোষ, রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে আর বঁটি নিয়ে নিজেই কুমড়ো কাটেন। করুণা আপত্তি করলে পাল্টা আপত্তি করেন ভবতোষ,—তুমি এদিকে এসো না, তুমি বরং আদাটাকে আর একটু মিহি করে বেটে ফেলো।

দুপুরবেলা তো মণীশ আর এখানে খায় না, শুধু রাত্রিতে খায়। কাজেই, রাতের রান্নার ঝাল-ঝোল আর ডালনা যেন স্বাদে-গন্ধে একটু ভাল হয়। শম্ভু সাহুর সরষের তেলে ভেজাল আছে, সিদ্ধেশ্বরের ঘানি থেকে খাঁটি সরষের তেল কিনে আনেন ভবতোষ।

মোচা কুটে গামলার জলে ভিজিয়ে রেখেছেন করুণা। গামলাটাকে টান দিয়ে কাছে এনে কী যেন দেখতে থাকেন ভবতোষ। তারপর গামলার জল থেকে মোচার কুচি হাত দিয়ে ছেঁকে-ছেঁকে তুলতে, আর চিপসোতে থাকেন।

করুণা বিরক্ত হন,—আঃ, কী যে কর !

—কী করলাম ?

—মিছিমিছি আমার কাজ বাড়িয়ে তুলছ।

—তার মানে ?

—মোচা আরও ভিজবে। নইলে একগাদা ঘি ঢেলে রান্না করলেও তেতো লাগবে।

—কিন্তু ছোলা ভিজিয়েছ ?

—হ্যাঁ। তুমি বরং ঘরের বাইরে গিয়ে বৈজুকে বলো, কিছু কয়লা ছোট করে ভেঙে নিয়ে আসুক।

নিজের ঘরের চেয়ারের উপর বসে, আর, একটা বই হাতে নিয়েও মণীশ যেন একটা শান্ত অব্যস্ততার মূর্তি। এই রাত ফুরোবে, আবার সকাল হবে, তারপর দুপুর হবে। আশাবরীতে যাবার মুহূর্তটি এগিয়ে এলে তবেই ব্যস্ত হয়ে উঠবে মণীশ।

শব্দ শুনে চমকে ওঠে মণীশ। এ সময় রিণির ঘরে এ কোন রকমের ব্যস্ততার হুটোপুটি ?—রিণি ! ডাক দেয় মণীশ। সাড়া না পেয়ে, আর, বেশ-একটু উদ্বিগ্ন বিস্ময় নিয়ে ছুটে যায়, রিণির ঘরের ভিতরে ঢোকে।

কী আশ্চর্য, সেই মেয়ে, যার নাম সুধা, হিরুদা যাকে যথেষ্ট যুবতী বলে ধারণা করেন, যার বয়স চব্বিশ বছরেরও বেশি, সে ওই তেরো বছর বয়সের রিণির সঙ্গে সমানে হুটোপুটি করে কী যেন কাড়াকাড়ি করছে।

মণীশকে দেখতে পেয়েই শান্ত হয়, কিন্তু হাঁপাতে থাকে সুধা। রিণি কোনও কথা বলবার আগেই সুধা বলে ওঠে,—দেখুন না, রিণি আমার খাতা দিচ্ছে না !

মণীশ—কিসের খাতা ?

রিণি মুখ টিপে হাসে—বলুন না সুধাদি, কিসের খাতা ?

সুধা—গানের খাতা।

মণীশ হাসে—তুমি গান গাইতে পার ?

সুধা—একটুও পারি না।

মণীশ—তা হলে গানের খাতা মানে কী ?

সুধা—যে সব গানের মানে আমার ভাল লাগে, সে সব গান টুকে রেখেছি।

মণীশ—সুধাকে ওর গানের খাতা ফিরিয়ে দে রিণি, এখুনি দে !

বিছানার তোষকের তলা থেকে খাতাটা বের করে সুধার হাতে দিয়ে দেয় রিণি। সুধাও সেই মুহূর্তে চলে যাবার জন্যে দু'পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়, হাসে আর বলে—রাগ করো না রিণি, আমি তোমাকে খুব ভাল একটা জিনিস দেব। যেও কিন্তু !

মণীশ—ও ঘরের টেবিলের ওপর ঘাসলতার যে সাজিটা রয়েছে, ফটো রাখবার সাজি, সেটা তো তোমারই হাতের কাজ ?

সুধা—হ্যাঁ, রিণিকে কতবার বলেছি, শুধু গল্প করে সময় নষ্ট না করে আমার কাছ থেকে কাজটা শিখে নাও, কিন্তু রিণির কোনও গরজ নেই।

মণীশ—কেন রে রিণি, কাজটা শিখে নিচ্ছিস না কেন ?

রিণি—সুধাদি থাকতে আমার আবার ওসব কাজ শেখবার দরকার কী ?

সুধা—আমি তো চিরকাল এখানে থাকছি না। হয় মরে যাব, নয় চলে যাব।

মণীশ হেসে ফেলে—না, মরবে না। কিন্তু চলে যাবে কোথায় ?

সুধা—পূর্ণিয়াতে, চারুমাসির কাছে। মা মরে যাবার পর, আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চারুমাসি কী কান্নাই না কেঁদেছিলেন !

মণীশ—তুমি তো এখন ভোলাকাকার বাড়িতে থাক !

সুধা—হ্যাঁ। কিন্তু ভোলাকাকার রোজগারের এখন যা অবস্থা, তা আর বলবার নয়। সামান্য একটু ডাল দিয়ে সব ভাত খেয়ে নিয়ে ভোলাকাকা যখন হাসতে থাকেন, তখন আমার কান্না পায়।

ভোলাকাকার ভাগ্যের এই দীনদশার ওপর আমি আবার একটা ফালতু ভার।

কথা থামিয়ে হেসে ফেলে সুধা,—আমার খোরাকেরও বেশ ভার আছে। ভোলাকাকা যতখানি ভাত খান, আমি খাই তার দ্বিগুণ।

মণীশ—ভোলাকাকা কি তোমাকে চলে যেতে বলেছেন ?

—ভগবান, রক্ষে করুন ! সুধা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, ভোলাকাকা আমাকে চলে যেতে বলবেন, তা হলেই হয়েছে ! গঙ্গা তা হলে সমুদ্রের দিকে না গিয়ে হিমালয়ের দিকে চলে যাবে।

মণীশ—তবে, কে বলেছে ?

সুধা—কেউ বলেনি, শুধু আমি বলেছি। তাই শুনে অতসী কাকিমা আমার মুখ চেপে ধরেছেন। বলেছেন, আর কোনওদিন ওকথা বললে আমার জিভ কেটে ফেলবেন। বলুন তো, আমি এখন কী করি ? ওদিক থেকে চারুমাসি ডাকছেন, চলে এসো। এদিকে অতসী কাকিমা বলছেন, যাবে না, কখখনও না। কী যেন কথাটা, হ্যাঁ উভয়-সঙ্কট, তাই না ?

মণীশ—চারুমাসি কে ?

সুধা—পূর্ণিয়াতে আমার মা যে স্কুলে পড়াতেন, সেই স্কুলের বড়দিদি।

মণীশ—উনি এতদিন পরে তোমাকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে বলছেন কেন ?

সুধা—এখান থেকেই কে যেন চারুমাসিকে চিঠি দিয়েছে, ভোলাকাকার বাড়িতে আমি খুব কষ্টে আছি, আমাকে সবাই নির্যাতন করে, খেতে দেয় না, আরও কত কী ! বলুন তো, এরকম মিথ্যে কথা কি ধর্মে সয় ?

মণীশ—তুমি তো চারুমাসিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেই পারো যে, ওসব নিতান্ত মিথ্যে কথা !

সুধা—কতবার লিখেছি। কিন্তু চারুমাসি কিছুই বুঝতে চান না।

মণীশ—কিন্তু কেন ?

সুধা—ঠিক বুঝতে পারি না। একা থাকেন চারুমাসি, আমাকে নিজের মেয়ের মত মনে করেন, তাই বোধ হয়...

মণীশ হাসে—বোধ হয় একটু সেবা-টেবা পেতে চান।

সুধা—হবে। সে সব করতে তো আমি হাত বাড়িয়েই আছি। আমি তো এখনও বলি, হিতুকাকার বাড়িতে আমি রোজই একবার যাব, কেউ যেন আমাকে গাল-মন্দ না করে, আমি শুধু বুড়ো দিদাকে ধুয়ে-মুছে আর খাইয়ে দিয়ে চলে আসব। ও বাড়ির বুড়ো দিদাকে আপনি বোধ হয় কখনও দেখেননি। অন্ধ মানুষ, অসাড়, বোবা, বুড়ো দিদার দিনরাত্রির বোধটুকুও নেই। মনে পড়লেই ভয়ানক খারাপ লাগে। জানি না, বুড়ো দিদা এখন কী দশায় আছেন !

মণীশ—ওরা তোমাকে মারধোর করেছিল কেন ?

সুধা—ওই যে একদিন আপনার জন্য খুব তাড়াতাড়ি চা নিয়ে এসে বললাম, চায়ের জল আগেই চড়িয়ে রেখেছিলাম। সেই হল আমার অপরাধ। ওরা বললে, কেন আগে থেকে চায়ের জল চড়িয়ে রেখেছিলি, বল ? আমি বললাম, বলব না।

মণীশ—আর একদিনও তো এই ব্যাপার হয়েছিল ?

সুধা—হ্যাঁ। আপনাদের বৈজুকে পথ দিয়ে যেতে দেখে ডেকেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, জিজ্ঞেস করব, আপনি কবে দেশে ফিরবেন। ওরা বললে, কেন বৈজুকে ডেকেছিলি, বল ? আমি বললাম, বলব না।

মণীশ—শুনেছি, আরও একবার...

সুধা হেসে ফেলে,—হ্যাঁ, সেটা ছিল এই খাতাটার অপরাধের বিচার আর শাস্তি। রেণু কাকিমা বললেন, এসব কী লিখেছিস, এর মানে কী, বলতেই হবে। আমি বললাম, বলব না।

মণীশ—খাতাটা আমাকে একবার দেখতে দিতে পার ?

সুধা—খুব পারি। কিন্তু কী আর দেখবেন। নতুন কথা কিছুই নেই। আপনি বিদ্বান মানুষ, এই খাতার সব গান আপনার চেনা গান নিশ্চয়।

মণীশ—তবু দাও একবার, একটু দেখি।

মণীশের হাতে খাতাটা তুলে দিয়ে, আর, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুধা। একের পর এক খাতার পাতা উল্টিয়ে গানগুলি পড়তে থাকে মণীশ। ঠিকই বলেছে সুধা, এই সব গানের কোনটাই মণীশের অ-শোনা কিংবা অচেনা নয়। সবই টোকা গান, নিজের প্রাণের কবিত্ব আর গুণিত্বের একটিও কথা নেই। ঘাসলতার সাজিটার মত এটাও সুধার একটা হাতের কাজ মাত্র।

পড়া শেষ হয়, কিন্তু আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে খাতাটাকে হাতে ধরে রাখে মণীশ। তারপর, হঠাৎ-চকিত মানুষের মত দুই চোখ অপলক করে সুধার মুখের দিকে তাকায়। মণীশের হাতটাও একটু অলস হয়ে, আর, আস্তে আস্তে সুধার হাতের কাছে খাতাটাকে এগিয়ে দেয়।

খাতা হাতে তুলে নিয়েই সুধা বলে,—চলি রিণি, তুমি যেও কিন্তু!

॥ ১১ ॥

অনেক রাত, কালো আকাশে অনেক তারা, আর, ঘুমন্ত জগেশপুরের স্তব্ধতা যেন কালো অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা পাথর হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, বিছানা থেকে উঠে এসে খোলা জানালার কাছে দাঁড়ায় মণীশ। ঠিকই, একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিরেট স্তব্ধতার বুকের উপর দিয়ে ঝিরিঝিরি শব্দের একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারে মণীশ, এটা দূরের সিরসিরা নদীর একটা ঝর্নার শব্দ।

ঝিরঝির করে এইরকম একটা মুখরতার ঝর্নাধারা যেন মণীশের ঘুমের বুকের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। বড় বেশি কথা বলে সুধা। একটা কথার জবাব দিতে গিয়ে একশো কথা বলে ফেলে। কথা বলতে একটুও বাধে না। কত সহজে কত অদ্ভুত কথাই না অবাধ স্রোতের ভাষার মত শুনিয়ে দিয়ে চলে গেল সুধা।

এই সুধার শাড়িতে যদি চেরিফুলের ছবি থাকত, তবে কেমন দেখাত সুধাকে? এমন কিছু বেশি ভাল দেখাত না। শাড়ির গুণে চেহারা ভাল দেখায় বটে, কিন্তু চেহারার গুণে শাড়িকেও ভাল দেখায়। বেগুনি রঙের একটা তাঁতের শাড়ি, সস্তা ধনেখালি বলে মনে হয়, কিন্তু দেখে মনে হয়েছিল, সুধা বুঝি শখ করে সিল্কের দামি শাড়ি পরেছে আর রিণির সঙ্গে হুটোপুটি করছে। শাড়ির আঁচলটা সুধার গা থেকে খসে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছিল। মণীশকে দেখতে পেয়ে এক নিমেষে আঁচলটাকে তুলে নিয়ে আর গায়ে জড়িয়ে, অবারিত শোভাটাকে ঢেকে দিল সুধা। মোটা তাঁতের শাড়িটা কত সহজে সুধাকে গায়ে গায়ে জড়িয়ে ধরে, আর, নরম হয়ে সেই শোভাকে যেন একটা ফুলেলা লতার শোভা করে ধরে রাখল।

বুঝতে পারে মণীশ, শুধু সেই অবিরল কথার ঝর্নার শব্দটা নয়, এই শোভাটাও স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে, বুকের ভিতরে ছটফটে একটা তেষ্টা ছড়িয়ে দিয়ে, শেষে মণীশের ঘুমটাকেই ভেঙে দিয়েছে। লজ্জা বোধ করে মণীশ। ছোট মন, নিতান্ত চোরা স্বভাবের মনই তো এরকমের স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। কই, কোনওদিনও তো কোনও শোভা দেখে এ ধরনের লোভের রাক্কুসেপনা মণীশের জাগা প্রাণের কিংবা ঘুমিয়ে-পড়া প্রাণের ইচ্ছাতে ছটফটিয়ে ওঠেনি! পরের বাড়ির দয়ার আশ্রয়ে বেঁচে থাকা একটা ভাগ্যহীন মেয়ে, দেখতে বেশ ভাল, তাই বলেই সে মেয়ে কি সিরসিরা নদীর সেই ঝর্নাটা, যে কোনও নেকড়ে এসে যার জল অবাধে আর ইচ্ছামত খেয়ে নিয়ে চলে যাবে?

একটা গানের খাতা। বেছে বেছে যত গান টুকে রেখেছে সুধা। কিন্তু খাতাটা যেন সুধার একটা গুপ্তরত্ন। তাই যদি না হয়, তবে হুটোপুটি করে রিণির হাত থেকে খাতাটাকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করবে কেন সুধা?

ভাল হত, স্বপ্নটা যদি ওরকম একটা শোভাকে না দেখিয়ে দিয়ে ওই গানের কথাগুলিকে সুর করে শুনিয়ে দিত, তা হলে ঘুমটা বরং আরও ভাল ঘনিয়ে উঠত, ভাঙত না। সুধার সঙ্গে আবার দেখা হলে ঠাট্টা করে সুধাকে একটা মিষ্টি কথা শুনিয়ে দিতেও পারা যেত, তোমার খাতাটা জাদু জানে, সুধা। আমাকে ঘুমের মধ্যেও গান শুনিয়েছে।

আমি কান পেতে রই। দাঁড়াও আমার আঁখির আগে। আমার কণ্ঠ তারে ডাকে। সবই পুরনো

গান, চেনা গান, অনেকেই অনেকবার শুনেছে যেসব গান। আশা আর আকুলতার মানুষ এই সব গান গাইতে ভালবাসে।

গানের ভাষাতে কোনও হেঁয়ালি নেই, গানের খাতাটাকেও কোনও হেঁয়ালি বলে মনে হয় না।

আর কতকাল রইব বসে ; খাতার শেষ দিকের পাতায় লেখা এই গান তো করুণ অভিমানের গান, অপেক্ষার প্রাণটা আর কোনও আশা ধরে রাখতে পারছে না। পরবাসী চলে এস ঘরে ; গানটাকে এরকম এলোমেলো করে লিখেছে কেন সুধা ? সন্দেহ হয়, লিখতে গিয়ে কলমটা খুব ছটফট করেছে। কোন শুভক্ষণে উদিবে নয়নে, বাঃ, এ যে খুব খুশি একটা জিজ্ঞাসা। খাতার শেষ গানটা হল, মীরার একটা ভজন—আজ মেরে প্রীতম ঘর আয়ে।

চমকে ওঠে মণীশের মন, কোনও জানান না দিয়ে হঠাৎ কোথা থেকে একটা সন্দেহ মণীশের নিঃশ্বাস শিউরে দিয়েছে। গানের খাতাটা বোধ হয় সুধার প্রাণেরই একটা খাতা। আশা করেছে, বার বার ডেকেছে, অনেক আকুল হয়েছে, অনেক অপেক্ষা করেছে সুধা। তারপর, সব অপেক্ষা ধন্য করে দিয়ে প্রীতম মানুষটা সুধার ঘরে এসে গিয়েছে। সত্যিই তো, এই খাতা যে বেশ চমৎকার একটি হেঁয়ালি। সন্দেহ করতে ইচ্ছে করে, প্রীতম ভদ্রলোক বোধ হয় পূর্ণিয়াতে চারুমাসির ঘরে এসে বসে আছেন। চারুমাসিও তাই বার বার চিঠি দিয়ে সুধাকে ডাকছেন।

সন্দেহটাকে সহ্য করতে একটুও ভাল লাগে না। সন্দেহটা যেন মনের মধ্যে কাঁটার মত খোঁচা দিয়ে ঘুরছে। আর শুয়ে পড়তেও ইচ্ছে করে না। খোলা জানালার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, শেষ রাতের ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস মাথায় লাগলে সন্দেহটাও একটা ফুরফুরে মিথ্যে হয়ে পালিয়ে যাবে।

শুয়ে পড়লেও ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করে না মণীশ। আর, ভোরের কাক ডেকে উঠতেই বিছানা ছেড়ে, একেবারে বাড়ির বাইরে এসে নার্সারির গা-ঘেঁষা সেই ঘেসো মাঠের উপর ঘুরে বেড়ায়। শিশিরে ভিজে গিয়েছে সবুজ ঘাস। রিণি যদি এখন ঘুমিয়ে না থেকে একবার উঠে আসত, তবে দেখতে পেত, কত মখমল পোকা ঘাসের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নার্সারির ইটের পাঁচিলটা এক জায়গায় ধসে পড়ে গিয়েছে। সেখানে বাঁশের বেড়া তুলে দেওয়া হয়েছে। উঁকি দিয়ে দেখতে পায় মণীশ, অনেকখানি জায়গা জুড়ে গোলাপের কলম করা হয়েছে। মেসো কি আবার নতুন রকমের কোনও গোলাপ ফোটাবার পরীক্ষা শুরু করেছে ?

কী আশ্চর্য, এত ভোরে কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে আছে কে ? মাসি ? দড়িতে তামার ঘটি ঝুলিয়ে কুয়ো থেকে পুজোর জল তুলতে হবে, তার আগে স্নান করে নিতে হবে, মাসির সেই পুরনো অভ্যেস একটুও বদলায়নি। সর্দিকাশিতে প্রায়ই কাবু হয় মাসি, তবু ঠাণ্ডা লাগাবার একগুঁয়ে অভ্যেসটি আজও ছাড়তে পারল না।

কলার কাঁদির সঙ্গে মোচা ঝুলে রয়েছে। মেসোর কি চোখে পড়েনি যে, কাঁদিটা হলদে হতে চলেছে ? এই মোচা এখন তুলে নেওয়াই তো উচিত। দেখতে পেলে মাসি হয়ত ডাক দিয়ে বাধা দেবে, এত ভোরে গাছের মোচা ছিঁড়তে নেই, এসময় গাছেরা ঘুমোয়। তবু, মাসিও কিছু দেখতে পাচ্ছে না ; মোচাটাকে মোচড় দিয়ে তুলে ফেলে মণীশ।

আজ আবার মোচা রাঁধতে বললে খুশি হবে মাসি। বললে আরও খুশি হবে, কাল রাতে মোচার রান্নাটার স্বাদ খুব ভাল হয়েছিল। আরও একটা কথা মাসিকে স্পষ্ট করে বলে দিলেই হবে, আজ দুপুরে আমি এখানেই খাব।

সময়ের হিসেব রাখেনি মণীশ, তাই বুঝতে পারে না, কতক্ষণ ধরে সে এই ঘেসো মাঠের এদিকে-সেদিকে মিছিমিছি ঘুরে বেড়িয়েছে। দেখতে পায়, বারান্দাতে দাঁড়িয়ে, চায়ের পেয়ালা এক হাতে ধরে, আর এক হাত তুলে মাসি ডাকছেন। মাসি কি আজ চা তৈরি করবার তাড়ায় পুজোর স্তবটাকেও তাড়াতাড়ি সেরে দিয়েছে ?

আশাবরীতে তো একবার যেতেই হবে। দুপুরে যখন যাওয়া হবে না, তখন এই সকালেই একবার যাওয়া উচিত।

ফিরে এসে চা খায় মণীশ। সাজও সেরে নেয়। তারপর, চুপ করে বারান্দার চেয়ারে বসে মাত্র

একটি ঘণ্টা অপেক্ষা। ডাকপিয়ন তড়বড় করে হেঁটে এসে মণীশের হাতেরই উপর একটা চিঠি ফেলে দিয়ে চলে গেল। চিঠির চেহারা দেখেই বুঝতে পারে মণীশ, এটা দেরাদুনের চিঠি। এতদিনে কাজের দরখাস্তের জবাব এসে পৌঁছেছে। খাম খুলে চিঠিটা বার করে দু'বার পড়ে মণীশ। তারপর চিঠিটাকে হাতেই ধরে রেখে অনেকক্ষণ বসে থাকে। চিঠি-ধরা হাতটাও কেমন একটু অলস হয়ে নেতিয়ে পড়ে।

আর দেরি করে লাভ নেই। কিন্তু ডাকপিয়নের মত তড়বড় করে হাঁটতে পারে না মণীশ। আজ কোনও আশার বার্তাবহ হয়ে আশাবরীর কাছে যাচ্ছে না। ক্লান্ত নয়, কিন্তু কুণ্ঠিত; আস্তে আস্তে হাঁটে মণীশ।

মণীশ আসছে, দেখতে পেয়ে আশাবরীর বাপ মা আর মেয়ে, তিনটি পুলকিত মূর্তি মাঝঘরের ভিতর থেকে একসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে বাইরের বারান্দাতে এসে দাঁড়ায়। ধরণী দত্ত বলেন,—বুঝতে পেরেছি।

অণিমা বলেন,—আমি এই একটু আগে এই কথা বলেছি, সুখবর নিয়ে মণীশ আজ সকালবেলাতেই এখানে এসে দেখা দেবে।

বাণী কোনও কথা বলে না। কিন্তু বাণীর মুখে লজ্জা আর আনন্দ মেশানো একটা রক্তিম উচ্ছ্বাস। মাথাটাকে নুইয়ে দিয়ে মুখ লুকোতে চেষ্টা করে বাণী।

মণীশ বলে—দেরাদুন থেকে চিঠি এসেছে।

ধরণী দত্ত—তারপর ? বলো, কী খবর ?

অণিমা—তুমি ওরকম করে ওদিকে তাকাচ্ছ কেন, মণীশ ? তুমি এত গম্ভীর কেন ? চুপ করে রইলে কেন ?

মণীশ—ওরা লিখেছে, এখনও কোনও ডিসিশন হয়নি। তবে শিগগিরই হবে আর আমাকে জানিয়ে দেবে।

বাণী মুখ তুলে তাকায়। সে মুখের রক্তিম উচ্ছ্বাস হঠাৎ ফিকে হয়ে গিয়ে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। অণিমা স্তব্ধ, গলার ভিতরে যেন কী-একটা বস্তু তাঁর শ্বাস আটক করে রেখেছে। ধরণী দত্তের হাতের পাইপ কেঁপে উঠেছে। মুখের স্নিগ্ধ হাসিটা ঝরে পড়ে গিয়েছে।

কিন্তু পরমুহূর্তে হেসে ওঠেন ধরণী দত্ত। স্নেহাক্ত স্বরে ডাক দেন,—ভেতরে এসে বসো, মণীশ।

আবার মাঝঘরের ভিতরে সেই সমাবেশ। তিনটি কোচে আশাবরীর বাবা মা আর মেয়ে। একটি কোচে আশাবরীর প্রাণেরই আকাঙ্ক্ষিত এক প্রিয়জন, মণীশ।

ধরণী দত্ত—আজও তোমার কাজের চিঠিটা এল না বটে, কিন্তু তাই বলে আমি বিশ্বাস করি না যে, চিঠি আসতে খুব বেশি দেরি হবে। তুমি কী মনে কর, মণীশ ?

মণীশ—আমারও তাই মনে হয়।

ধরণী দত্ত—তবে আর নতুন করে চিন্তা করবার কী আছে ? সবই ঠিক আছে।

মণীশ—আমার মনে হয়, ভরদ্বাজ এখন কলকাতাতে পৌঁছে গিয়েছে। আমার একবার কলকাতা যাওয়া দরকার।

ধরণী দত্ত—যাও, ঘুরে এসো।

মণীশ—আপনারা কবে যাবেন ?

ধরণী দত্ত—সে তো তোমার ইচ্ছের কথা। যেদিন বলবে, সেদিনই আমরা যাব।

মণীশ—এখন আমি যখন কলকাতাতে যাচ্ছি, আর, সেখানে থাকতেও হবে কিছুদিন, তখন আপনারাও চলুন !

ধরণী দত্ত—কেন বলো তো ?

বাণীর মুখের দিকে মণীশ একবার তাকাতেই ভিতরের ঘরে চলে যায় বাণী। মণীশ বলে—আমার ইচ্ছে, বিয়েটা এবার হয়ে যাক। আর দেরি করবার বিশেষ কোনও মানে হয় না।

ধরণী দত্ত হাসেন—আর একটু দেরি করাই উচিত, মণীশ। তোমার মত শিক্ষিত ছেলে কোনও

ইচ্ছের কাজ করবার আগে সেই ইচ্ছের দায়িত্বটা একটু ভাল করে বুঝে নেবে নিশ্চয় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একটু নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে চাইবে, নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ।

—কাজের চিঠি আসবার আগেই বিয়ের উৎসবটা কি খুব শোভন ব্যাপার হবে ?

—না।

—বুঝতে পারছ তো, আমি তোমাকে ঠিক কী বলতে চাইছি ?

—হ্যাঁ, আগে কাজের চিঠিটা আসবে, তারপর বিয়ে।

—ঠিক কথা। জীবনের সব ঘটনার একটা পরম্পরা থাকে। যেটা আগে সেটা আগে। যেটা পরে সেটা পরে।

—আমি আজ উঠি। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় আব চলতে থাকে মণীশ। কিন্তু বারান্দার সিঁড়ির কাছে এসেই থমকে দাঁড়ায়। পিছনে না তাকিয়েও যেন অনুমানের চোখ দিয়ে বাণীর ছায়াটাকে দেখতে পেয়েছে মণীশ।

ভুল করেনি মণীশের অনুমানের চোখ। বাণী এসে সিঁড়ির উপর মণীশের পাশেই দাঁড়িয়েছে। মণীশ বলে—তুমি কী মনে কর, বাণী ?

—কী ?

—আগে কাজের চিঠি আসুক, তারপর বিয়ে ?

—হ্যাঁ। একটা সত্যি কথা কিন্তু তোমাকে এখনও বলিনি !

—এখন বলবে ?

—এখন বলতে আপত্তি নেই, কারণ, তুমি নিজেই যখন বুঝেছ। সত্যি কথা, কাজের চিঠি আসবার আগেই বিয়ে করবার কথা যখন তুমি বাবা আর মা-র কাছে বলেছিলে, তখন আমি খুব লজ্জা পেয়েছিলাম, মন। তাই আমি তোমাকে স্পষ্ট করে কিছু বুঝিয়ে বলতে পারিনি।

—না, তা নয়। বলেও বোঝাতে পারনি।

মণীশের চোখে যেন একটা আলো হাসছে। প্রশান্ত মুখের চেহারাটাও হাসছে। যেন সব সন্দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছে মণীশের আশার আত্মাটা।

বাণী—দুপুরে আসছ তো ?

মণীশ—না।

বাণী—কেন ?

মণীশ—সত্যি কথা বলব ? তোমার কাছে অবশ্য সত্যি কথা বলতে আমার একটুও কুণ্ঠা নেই।

বাণী হাসে—আমি তো তাই জানি।

মণীশ—কাজের চিঠিটা আসবার আগে তোমাদের এখানে খেতে আসতে বেশ লজ্জা বোধ করছি।

বাণীর চোখে-মুখে যেন করুণ আতঙ্কের ছায়া কাঁপতে থাকে—তুমি তবে কি এখানে একটা দেখা দিয়ে যেতেও আসবে না ?

মণীশ—আসব বইকি। যখনই ইচ্ছে হবে, দরকার হবে কিংবা সুযোগ হবে, আমি আসব।

বাণী—আমি কিন্তু রোজই তোমার আশায় থাকব !

মণীশ হাসে—আমি জানি।

কত তাড়াতাড়ি হাঁটছে মণীশ। ছুট-কাবাডির মাঠের দিক থেকে একটা দমকা হাওয়া ছুটে এসে মণীশের গায়ের উপর দিয়ে বয়ে চলে গেল। উড়ে গেল খড়কুটো, ছেঁড়া কাগজ, শুকনো পাতা, আরও কত কী। মণীশের মনে হয়, দমকা বাতাস যেন ঠাট্টা করে গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে চলে গেল।

আশাবরীর বারান্দায় সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে এখনও নিশ্চয় তাকিয়ে আছে বাণী। কে জানে কী ভাবছে বাণী। কিন্তু কাছে এসে দেখলে বুঝে ফেলতে পারত, টলে টলে হাঁটছে না মণীশ। দমকা

বাতাসের ঠেলা মণীশকে একটুও টলিয়ে দিতে পারছে না।

বাড়িতে ঢুকেই ডাক দেয় মণীশ—রিণি, মেসো কোথায় গেল রে ?

সাড়া দিলেন করুণা—স্টেশনে গিয়েছে।

মণীশ বিরক্ত হয়,—এই রোদের মধ্যে বুড়োমানুষটাকে তুমি পাঠিয়েছ, মাছের খোঁজ করতে ?

করুণা—তোর মেসো কি আমার কথা শুনে চলবার মানুষ ! আমি পাঠাব কেন ? নিজেই গিয়েছে।

রিণিকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাসা করে মণীশ—গিয়েছিলি ?

রিণি—কোথায় ?

মণীশ—অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ! মনে নেই, তোর সুধাদি যে তোকে এত করে বলে গেল,—যেও কিন্তু !

রিণি—কাল রাত্তিরে বলেছে, আজ এই তো এখনও দুপুর হয়নি। এর মধ্যে মানুষ যায় কী করে বলো ? যাবার সময় এলেই যাব।

মণীশ—আজই দুপুরে একবার ঘুরে আয় না !

করুণার চোখ দুটো যেন একটা অসম্ভব বিস্ময়ের শালবনি ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে। বোধ হয় সেই চমক সামলে নেবার জন্যই বলে ওঠেন,—এখন আবার চা খাবি কিনা, বল !

—খাব।

করুণা চলে যেতেই রিণির হাতে-ধরা একটা জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকে মণীশ। চটের একটা টুকরোকে মেহেদি পাতার রঙ দিয়ে রঙিন করা হয়েছে, তার উপর পেনসিল দিয়ে আঁকা রেখার উপর সোনালি পুঁতি বসিয়ে ময়ূর তৈরি করা হয়েছে। ময়ূরের একটা পা এখনও তৈরি হয়নি।

মণীশ—আমি এতদিনের মধ্যে একটি দিনও তো তোকে বই ছুঁতে দেখলাম না, রিণি। তোর পড়াশুনো বোধ হয় চুলোয় গিয়েছে। সেদিন দেখলাম, তোর বই পড়ছে মেসো।

রিণি—তোমার মাসিকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, আজ সকালে পড়াশুনা করেছি কিনা !

মণীশ—কিন্তু এতদিন করিসনি কেন ?

রিণি—কিন্তু তুমিই বা এতদিন দেখনি কেন, পড়তে বলনি কেন ?

মণীশ—আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

রিণি—আমিও অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

মণীশ—কী কাজ ?

রিণি—তোমারই বা কী কাজ ?

মণীশ—আমাকে বার বার আশবরীতে যেতে হয়েছে।

রিণি—আমাকে বার বার হরধামে যেতে হয়েছে।

—থামলি রিণি ! রান্নাঘরের ভিতর থেকে ধমক দিয়ে কথা বলেন করুণা। ধমকটা যেন সুরেলা হাসির একটা ঝঙ্কার।

রিণি হাসে—আমি আজ সত্যিই গিয়েছিলাম, দাদা।

—কোথায় ?

—হরধামে।

—কখন ?

—আজই সকালবেলাতে। সুধাদিকে দিয়ে ময়ূরের পেখমটা আঁকিয়ে নিলাম।

—কিন্তু সুধাদিকে কী বললি ?

—আমি কিছু বলিনি, সুধাদি নিজেই বললেন, এখন আর সুধাদি আমাদের এখানে আসবেন না। পরে একদিন আসবেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভরদ্বাজকে নিয়ে গল্প তর্ক হাসি-হল্লা আর ঘুরে বেড়াবার ব্যস্ততার মধ্যে সময়টা বেশ ভালই কেটে গেল। আজই সকালবেলা মণীশের সব জিনিসপত্র নিয়ে জগেশপুর এসেছে ভরদ্বাজ। সকাল থেকে জগেশপুরের এই অলকাতে আজ একটা কোকিল ঠিক এক ঘণ্টা পর-পর ডেকে উঠছে। এ গাছ আর সে গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে কোকিলটাকে খুঁজে দেখতে চেষ্টা করছে বৈজু, কিন্তু দেখতে পায়নি। বুঝতে পারেনি যে, কোনও কোকিল ডাকছে না। ডাকছে একটা কোকিল-ঘড়ি। ওটাই হল সেই বস্তুটা, রিণির জন্যে একটা আদুরে উপহার, যেটা দেশে ফিরবার আগে হামবুর্গের এক দোকান থেকে কিনে রেখেছিল মণীশ।

জগেশপুরকে দেখে খুব খুশি হয়েছে ভরদ্বাজ। মাছের ঝোল খেয়ে আরও খুশি। যাবার আগে করুণার কাছে এসে হাতজোড় করে একটা অনুরোধের কথা বলেছে,—দয়া করে একবার আমার দেশের বাড়িতে আসুন, মাসিমা। বাড়ির কাছেই সরযূ নদী, সুন্দর স্নানের ঘাটও আছে। খুব ভাল লাগবে আপনার।

রাত্রির ট্রেনে চলে গেল ভরদ্বাজ। স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে এসেই হেসে ফেলে, আর ডাক দেয় মণীশ—রিণি, তোর কোকিল-ঘড়ি কি এখনও ডাকা বন্ধ করবে না ? রাত যে এখন দশটারও বেশি।

রিণি—রাত্রিবেলা কি কোকিল ডাকে না ?

মণীশ—প্লিজ, রিণিদিদি, প্লিজ ! এখন বন্ধ করে দে ; নইলে ঘুমোতে পারব না।

একটা একটা করে দিনগুলি কোকিল-ঘড়ির ডাক শুনে, আর, রাতগুলি বেশ ভাল করে ঘুমিয়ে পার করে দিয়েও বুঝতে পারে মণীশ, এ যেন একটা অলস অচল অবস্থা। সচল হবার জন্যে চেষ্টা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে ফুলবাগানের ভিতরে ঢুকে ঘোরাঘুরি করে ; গাছের পাতা কাটবার কাঁচিটা হাতে নিয়ে কাজও করে। দেখে খুশি হন আর হাসতে থাকেন ভবতোষ,—ডগার পাতাগুলোকে ওরকম করে একেবারে মুড়িয়ে কাটতে নেই, মণি।

মণীশ—তবে কীরকম করে কাটব, একটু বুঝিয়ে দাও !

ভবতোষ—বুঝিয়ে দিলেও পারবি না। তুই ছেলেবেলায় এরকম করে পাতা কেটে আমার গাছের কত ক্ষতি করতিস, মনে নেই ? যা, কাঁচি রেখে দিয়ে এদিকে ওদিকে একটু বেড়িয়ে আয়।

মণীশ—না, তুমি বুঝিয়ে দাও, দেখি কেমন না পারি !

ভবতোষ—এত বয়স হল, তবু তোর ছেলেমানুষি গেল না ! যা, তুই যা।

একদিন সকালবেলাতে বারান্দায় চেয়ারের উপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর হঠাৎ যখন হেসে উঠল মণীশ, তখন রিণি আশ্চর্য হয়ে মণীশের কাছে এসে দাঁড়ায়,—কী হল দাদা ? তুমি পাগলা বকুবাবুর মত একা একা হাসছ কেন ?

মণীশ—হিরুদা বলেন, মেসোও বলে, আমি নাকি এখনও একটা ছেলেমানুষ।

রিণি হাসে—তার মানে, তুমি একটি বোকা।

মণীশ—হ্যাঁ, আমি সেই কথাই ভাবছি আর হাসছি...যা তুই, পড়তে বস গিয়ে।

রিণি চলে যেতেই ডাকপিয়ন এসে একটা চিঠি দিয়ে যায়। ঠিকই দেরাদুন অফিসের চিঠি। খাম খুলে চিঠির লেখাগুলি পড়ে নিয়েই আনমনার মত দুই চোখের দৃষ্টি একেবারে নিথর করে দিয়ে সামনের ঝাউয়ের মাথার দিকে তাকিয়ে থাকে মণীশ। ভাবলে হাসি পায়, দেরাদুন অফিসের একটা চিঠি নাকি ভালবাসারও ভাগ্যের বিধিলিপি। চিঠিটাকে তাই ভয়ানক একটা কৌতুকের ছাড়পত্র বলে মনে হয়।

ঘরের ভিতরে ঢুকে চিঠিটাকে টেবিলের উপর ফেলে দিয়েই বের হয়ে যায় মণীশ।

আশাবরীর ফটকের কাছে এসে পৌঁছেই থমকে দাঁড়ায় মণীশ। কারণ, মণীশকে দেখতে পেয়ে হরধামের ভোলাবাবুও তাঁর পথ চলার ব্যস্ততা হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছেন।

মণীশ—আপনি কেমন আছেন, ভোলাকাকা ?

ভোলাবাবু—খুব ভাল।

মণীশ—কিন্তু আপনাকে বেশ একটু রোগা দেখছি। অসুখ হয়নি তো ?

ভোলাবাবু—আমার অসুখ-টসুখ হয় না, মণীশ। নিয়োগী বলে, আমি নাকি শুধু দেখতেই মানুষের মত, আসলে একটা কচ্ছপ, কোনও রোগ-বালাই নেই।...যাই হোক, অনুমান করছি তুমি এখন...

মণীশ—আমি এখন এই আশাবরীতে যাচ্ছি।

ভোলাবাবু—কোনও কাজ আছে বোধ হয় ?

মণীশ—কথা আছে।

ভোলাবাবু—হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু সেটা নিশ্চয় কোনও একটা কাজেরই কথা ?

মণীশ—হ্যাঁ, আমার একটা ইচ্ছের কথা।

ভোলাবাবু—কী বললে ?

মণীশ—আমি ওঁদের বলতে এসেছি, ওঁরা যেন আর দেরি না করে আজকালের মধ্যে কলকাতা চলে যান।

ভোলাবাবু—মনে হচ্ছে, এটা এবাড়ির মেয়ের বিয়ের একটা ব্যাপারের কথা !

মণীশ—হ্যাঁ।

ভোলাবাবু—তোমার ইচ্ছে তোমারই ইচ্ছে ; কারও কিছু বলবার নেই। কিন্তু...কিন্তু...

কী যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন ভোলাবাবু। মণীশের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে তাঁর রগুড়ে হাসির চোখ দুটোও করুণ বিষাদে ভরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে যায়। সাদা মাথাটাও কেঁপে ওঠে, যেন কপালের উপর একটা দুঃসহ যন্ত্রণার টোকা পড়েছে।

তবু হাসতে চেষ্টা করেন ভোলাবাবু। একটা হাত তুলে আশাবরীকে দেখিয়ে দিয়ে বলতে থাকেন,—কিন্তু, ওই যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ তো মণীশ ?

মণীশ—কী ?

ভোলাবাবু—ওই যে ঘরের ভিতরে টেবিলের উপরে একটা ফুলদানের মধ্যে নানা রঙের ফুলের মস্ত বড় একটা তোড়া, ওগুলো কি সত্যিই গাছের ফুল ? না, রঙিন কাগজের ফুল ?

মণীশ—তা তো জানি না !

ভোলাবাবু—কেন জানতে পারলে না, বাবা ? আমি তো এতদূর থেকে দেখেও বুঝতে পেরেছি, ওগুলো রঙিন কাগজের ফুল। কিন্তু তুমি এত কাছে গিয়ে দেখেও বুঝতে পারলে না ? এটা কিন্তু বেশ একটা আশ্চর্যের ব্যাপার।

বলতে বলতে ভোলাবাবুর সাদা মাথাটা যেন চরম ক্লান্তির ভারে ভারি হয়ে ঝুঁকে পড়ে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেলেন ভোলাবাবু।

মণীশের থমকে দাঁড়ানো মূর্তিটা আবার সচল হয়ে ওঠে, বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যায়। আশাবরীর বারান্দাতে এসে উঠতেই চোখে পড়ে মণীশের, বুঝতেও পারে, সত্যিই তো, ভুল কথা বলেননি ভোলাকাকা। ওগুলো রঙিন কাগজেরই ফুল।

—এসো মণীশ। ঘরের ভিতর থেকে ডাক দিলেন ধরণী দত্ত। দরজার দিকে এগিয়ে এসে হাসতে থাকেন অণিমা দত্ত,—এসো। বাণী শুধু নীরব হয়ে হাসে।

ঘরের ভিতরে ঢুকেই মণীশের ব্যস্ত মূর্তিটা যেন শ্রান্ত ক্লান্ত ও অলস একটা অস্তিত্ব হয়ে, শুধু চুপ করে, একটা চেয়ারের কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ধরণী দত্ত—বলো, কী খবর ?

মণীশ—দেরাদুন অফিসের চিঠি এসেছে।

অণিমা দত্ত—কী খবর ?

ধরণী দত্ত চেঁচিয়ে ওঠেন—কী খবর ?

মণীশ—জিজ্ঞেস করবেন না।

আশাবরীর ঘরের সব বাতাস যেন পালিয়ে গেল। ঘরের সাড়া-শব্দ সব কিছুই এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু দেয়ালের ঘড়িটা টিক-টিক করে বাজে। অনেকক্ষণ পরে কথা বললেন ধরণী

দত্ত—শুনে সুখী হলাম।

আরও কিছুক্ষণ পরে কথা বলেন অণিমা দত্ত—হাসতে ইচ্ছে করছে।

ধরণী দত্ত—কাগজে একটা কর্মখালি বিজ্ঞাপন দেখলাম, জামালপুর কারখানাতে মেকানিকের চাকরি, দেড়শো টাকা মাইনে। দরখাস্ত করবে ?

মণীশ—বলেন তো করি !

ধরণী দত্ত—তাই করো।

মণীশ—আমার ইচ্ছে...

ধরণী দত্ত—কিসের ইচ্ছে ? কী বলতে চাও ?

মণীশ—আর তো দেরি করবার কোনও দরকার নেই।

অণিমা—কী অদ্ভুত কথা ! কিসের দেরি ?

মণীশ—আপনারা আজকালের মধ্যেই কলকাতা চলে যান। আর আমিও...

ধরণী দত্ত—চুপ করো। ওসব আর আলোচনা করবার কোনও দরকারই নেই।

মণীশ—একথা কেন বলছেন ? আপনাদের কি কোনও অনিচ্ছা আছে ?

ধরণী দত্ত—আমি আবার বলছি, চুপ করো।

মণীশ—বুঝতে পারছি না, কেন চুপ করতে বলছেন। কথা ছিল, আপনারা কলকাতাতে যাবেন, সেখানেই বিয়ের অনুষ্ঠান হবে।

অণিমা দত্ত ভ্রূকুটি করেন,—কী ভয়ানক নির্লজ্জ কথা !

ধরণী দত্ত তাঁর পাইপটাকে শক্ত করে ধরে হাত দোলাতে থাকেন,—তবে শোনো ; যা কথা ছিল তাই হবে। আমরা কলকাতাতে যাচ্ছি, আজকালের মধ্যেই যাব। কিন্তু তোমার যাবার দরকার নেই।

মণীশ—এ কথার মানে ?

ধরণী দত্ত—বুঝতে পারছ না ?

মণীশ—না।

ধরণী দত্ত—তা হলে বলতে হয়, তুমি নেহাতই অল্পশিক্ষিত। তোমার অনেক শিক্ষা এখনও বাকি আছে।

মণীশ—কিন্তু আমি তো মনে করি...

ধরণী দত্ত—চুপ করো। তোমার মনে করবার কিছুই নেই।

মণীশ—আপনার কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারছি না।

ধরণী দত্ত—বুঝতে যদি চাও, তবে, আর কিছু দিন পরে, হ্যাঁ, এবাড়ির ভিতরে এসে নয়, ওই ফটকের কাছে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে এদিকে একবার তাকিয়ে দেখবে, তা হলেই বুঝতে পারবে, শিক্ষা পেয়ে যাবে।...নাঃ, আর কোনও কথা নয়।

মণীশ—মনে হচ্ছে, আপনারা খুব বিরক্ত হয়েছেন।

অণিমা—হতে বাধ্য। কখনও সন্দেহ হয়নি যে, তুমি এরকম একটি অভাগা ব্লাফ।

মণীশ—বাণীও কি তাই মনে করে ?

এতক্ষণ ধরে একটা রঙিন রুমাল দিয়ে দুই ঠোঁট চেপে রেখে, আর ঢাকা দিয়ে বোবা ছবির মত দাঁড়িয়েছিল যে বাণী, সেই বাণী এইবার রুমালটাকে কোচের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মণীশের দিকে তাকায়,—এসব কথা বলতে তোমার একটুও লজ্জা করছে না ?

আর কোনও কথা বলে না বাণী। মণীশ শুধু দেখতে পায়, বাণীর দুই রঙিন ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একসারি সাদা দাঁতের ধারালো শোভা ঝকঝক করছে। দরজার দিকে একবার তাকায় মণীশ। পরমুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

আশাবরীর মাঝঘরের টেবিলের ফুলদানের উপর রঙিন কাগজের ফুলের তোড়াটা আবার খোলা বাতাসের ছোঁয়া খেয়ে খেয়ে কাঁপতে থাকে। ধরণী দত্ত বলেন—ঠিক আছে ; আমরা আজই কলকাতা রওনা হব, অণিমা।

অনিমা—আমিও তাই বলি।

ধরণী দত্ত—তবে এখনই একটা চিঠি লিখে ফেলো।

অনিমা—কাকে লিখব, বলো ! বিকাশকে, না সুকান্তকে ?

ধরণী দত্ত—আমি বলি, বিকাশকেই চিঠি দাও।

॥ ১৩ ॥

অলকার ঝাউয়ের ছায়া পার হয়ে বাড়ির বারান্দাতে উঠতেই শুনতে পায় মণীশ, কোকিল-ঘড়িটা দশটা ডাক ডেকে নিয়ে চুপ হয়ে গেল।

—রিণি, তুই কোথায় ? বার বার ডাকতে থাকে মণীশ।

করুণা সাড়া দিলেন—রিণি বাড়িতে নেই।

মণীশ—এই রোদের মধ্যে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি ? কোথায় গিয়েছেন ?

করুণা—বোধ হয় হরধামে গিয়েছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর হঠাৎ চোখে পড়ে, টেবিলের উপর সেই বিচিত্র জিনিসটি বেশ সুস্থির হয়ে পড়ে আছে। ঘাসলতা দিয়ে ওই ফটোর সাজি তৈরি করেছে অদ্ভুত এক খেয়ালের মেয়ে। দেখতে ভাল লাগে, আবার খারাপও লাগে। মণীশের সর্বক্ষণের ভাবনায় কী জটিল একটা সমস্যা বাধিয়ে রেখেছে এই সাজিটা।

রিণি ঘরে ঢুকতেই চমকে ওঠে আনমনা মণীশ—কী রে ? হরধামে গিয়েছিলি বুঝি ?

রিণি—হ্যাঁ।

মণীশ—তারপর ? এতক্ষণ ধরে কী করলি সেখানে ?

রিণি—জেঠিমা নিমকি খাওয়ালেন।

মণীশ—তোর সুধাদি কী বললেন ?

রিণি—সুধাদি বললেন, আজ বিকালে তোমাদের বাড়িতে যাব।

আনজনের বন্ধুয়া আনবাড়ি যাবে, তার নিজেরই আঙিনা দিয়া তাতে মণীশের এত ভাবনা করে উতলা হবার কি কোনও যুক্তি আছে ? মণীশের মনটা নিজেই বিচার করে বুঝতে পারে, কোনও যুক্তি নেই। সুধা নামে ওই মেয়ে একদিন জগেশপুর ছেড়ে দিয়ে পূর্ণিয়াতে চারুমাসির কাছে চলে যাবে, তারপর একদিন চারুমাসির বাড়ির আঙিনা দিয়া, বাসি আলপনা পিছনে রাখিয়া, আর একজনের সঙ্গে আর এক বাড়িতে চলে যাবে, সেজন্য মণীশের ব্যথিত হবার তো কোনও অধিকার নেই !

কেন আসছে সুধা ? বিকেল না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নটা যেন মুখ লুকিয়ে মণীশের মনের শান্ত উল্লাসের নেপথ্যে, একটা গোপন মায়ার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে যখন দেখতে পায় মণীশ, চারটে বেজে গিয়েছে, তখন জানালা দিয়ে তাকিয়েও দেখতে পায়, গাছের গায়ে বিকালের রোদ এলিয়ে পড়েছে। ঠিক তখনই প্রশ্নটা সরব হয়ে মণীশের মনের সামনে এসে দাঁড়ায়, কেন আসছে সুধা ? কী কথা বলতে ? অসম্ভব নয়, বিদায় নেবার শেষ কথাটি বলে দেবার জন্যই আজ এখানে আসবে সুধা।

কিন্তু মণীশেরও যে একটা জিজ্ঞাসার শেষ কথা বলবার ছিল। সেকথা বলবার কোনও সুযোগ কি পাওয়া যাবে ? ওঘরে মাসি, সেঘরে মেসো, আর পাশের ঘরে রিণি ; কথা বলবার এতগুলি ঘর থাকতে এই ঘরের ভিতরে আসবার কোনও দরকারই হবে না সুধার। আসবেই বা কেন ? রিণির সঙ্গে হুটোপুটি করে খুশি হয়ে যায় যে, এই ঘরে এসে মণীশের সঙ্গে কথা বলবার কোনও চেষ্টা সে করবে কেন ?

একটা সন্দেহ করতে বেশ লোভ হয়। কিন্তু লোভ হলেই তো সন্দেহটা সত্য হয়ে যাবে না ! তবে, একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে দোষ কী ?

কোনও আনমনা আবেশের সঙ্কেতে নয়, নিশির ডাকের মত কোনও বিহ্বলতার ডাক শুনেও নয়, ইচ্ছে করে, আর খুব সাবধানে যুক্তিবুদ্ধির প্রশ্নগুলিকে মনের ভিতরে সাজিয়ে নিয়ে, ঘর থেকে বের

হয়ে, শেষ বারান্দাও পার হয়ে চলে যায় মণীশ। যেন অসম্ভব একটা বিস্ময়কে আবিষ্কার করবার চেষ্টা। অলকার ঝাউয়ের ছায়া পার হয়ে আরও দূরে এগিয়ে যায় মণীশ।

নিয়োগীবাবুদের বাড়িতে এখন আর কেউ থাকে না। জনশূন্য ফাঁকা বাড়িতে শুধু একা একজন মালী থাকে। এবাড়ির কাছাকাছি অন্য কোনও বাড়িও নেই। রাস্তার উপর দু'পাশের দু'সারি আকাশনিম ছায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, নিরালা বইকি। সুধা যদি এখন অলকাতে যায়, তবে এই নিরালা পার হয়ে যেতে হবে, যাবার অন্য পথ নেই।

কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে না থেকে ঘুরে বেড়ায় মণীশ। মনের ভিতরে দুরন্ত একটা ঠাট্টাও কথা বলে বলে বাজতে থাকে, বাঃ, আবার কি নতুন করে আলেয়া-ধরা খেলা শুরু হল ? যুক্তি-বুদ্ধির মানুষটার আবার এরকম একটা চোর-চোর দশা হল কেন ? লজ্জা পেয়ে এখন সরে পড়াই তো উচিত।

লজ্জা পায় মণীশ, কিন্তু সরে যেতে পারে না। কারণ, সুধা একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

চমকে ওঠে না সুধা। হঠাৎ-বিস্ময়ের কোনও প্রশ্ন সুধার মুখে বেজে ওঠে না। আপনি এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন, এরকম একটা সামান্য জিজ্ঞাসাও যেন সুধার মনের ভিতরে নেই। আস্তে আস্তে হেঁটে মণীশের কাছে এসে দাঁড়ায়। নতুন কোনও ঘটনার কাছে নয়, যেন অনেক বিকালের রৌদ্র-ছায়ার পথে এইভাবে হেঁটে এইরকমই একটি নিরালাতে মণীশের কাছে এসে অনেক অনেকবার দাঁড়িয়েছে সুধা।

মণীশও সুধার কাছে এগিয়ে যায়। কিন্তু কথাটা বলতে ভুলেই যায় যে, আমি তোমারই অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি। একথা আর বলবার দরকার কী ? এই নিরালা আর এই ছায়া যেন মণীশের বুকের ভিতরেও আছে। আর, সুধা সেখানে কবে থেকেই এসে দাঁড়িয়ে আছে। নইলে এত নীরব হয়ে থাকে কেন মণীশ ? মনে হয় না মণীশের, এই সুধার সঙ্গে মাত্র এই ক'দিন হল সে প্রথম কথা বলেছে। সুধা সত্যিই যে মণীশের জীবনের অনেকদিনের চেনা জানা অনেক কালের সঙ্গিনী। কোনও কথা আর বাকি নেই, তাকে সব কথা বলা হয়ে গিয়েছে। নতুন করে বলবার মত আর কী কথা ও কোন কথা থাকতে পারে, বুঝতে পারে না মণীশ।

রাস্তার পাশে একটা ছায়ার মধ্যে ঘাসের উপর শিরীষের শুকনো শুঁটি ছড়িয়ে পড়ে আছে। সুধার বোধ হয় হুঁশ নেই, কতক্ষণ ধরে সে মাথাটাকে এত ঝুঁকিয়ে দিয়ে, আর চোখ নামিয়ে শিরীষের ওই শুঁটিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। জানে বোধ হয় সুধা, মণীশের একটা হাত এখুনি সুধার চিবুক ছুঁয়ে ঝুঁকে-পড়া মাথাটাকে তুলে সোজা করে দেবে। তখন তো মণীশের মুখের দিকে দু'চোখ তুলে তাকাতেই হবে।

বুঝতে পারেনি মণীশ, কখন মুখ তুলেছে সুধা, আর কতক্ষণ ধরে মণীশের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু হঠাৎ দুই চোখ বন্ধ করে ফেলে কেন সুধা ? সারা মুখটাই বা ওভাবে ফোটা শিরীষের রক্তের আভায় ভরে গেল কেন ? সুধার তো হাত ধরেনি মণীশ, গলা জড়িয়েও ধরেনি, সুধার মুখের খুব কাছেও মুখ এগিয়ে দেয়নি !

তবু, যেন একটা চুমোর ছোঁয়া লুটিয়ে পড়েছে সুধার প্রাণের ওপর। তারই স্বাদ বরণ করতে গিয়ে দুই চোখ বন্ধ করে ফেলেছে সুধা।

মণীশের দুই চোখ বিহ্বল হয়ে নিজেরই বুকের কাছে বাতাসের মধ্যে কী যেন দেখছে। সুধা তো সত্যিই মণীশের বুক ঘেঁষে দাঁড়ায়নি। তবু মণীশের বুকটা বোধ হয় সব নিঃশ্বাস দিয়ে সুধার মাথা আর খোঁপার স্পর্শটা পিপাসিতের মত পান করছে। তা না হলে ওরকম বিহ্বল হয়ে যাবে কেন মণীশের চোখ ?

কত কথা তার ছিল বলিতে, কিন্তু হল না বলা ! না মণীশ, না সুধা, দু'জনের কেউই নিশ্চয় বুঝতে পারে না যে, পথের উপর দু'জনে কত কাছাকাছি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ দু'জনের কারও মুখে কোনও কথা নেই।

কিন্তু এই বৈকালি নিরালা তো আর বেশিক্ষণ শব্দহীন হয়ে থাকতে পারে না। শুকনো পাতার উপর শব্দ বাজিয়ে দিয়ে কাঠবিড়ালি ছুটে যায়। গাছের ডালের উপর একটা একলা শালিক হঠাৎ

উড়ে এসে বসে, আর ফরফর করে ডানার ধুলো ঝাড়তে থাকে। ঘুড়ি ওড়াবার ছেলের দলের একটা হল্লার শিহর বাতাসে ভেসে আসছে।

মণীশ বলে—তুমি নিশ্চয় এখন রিণির সঙ্গে গল্প করবার জন্যে আমাদের বাড়িতে...

সুধা বলে—না। গল্প করবার জন্যে নয়।

মণীশ—তবে ?

সুধা—করুণা কাকিমাকে একটা কথা বলবার জন্যে।

—কী কথা ?

—আমি আজই রাত্রির ট্রেনে পূর্ণিয়াতে চলে যাচ্ছি।

চমকে ওঠে মণীশ। কী আশ্চর্য, কত সহজে আর কত শান্ত স্বরে এমন অদ্ভুত কথাটাকে বলে দিল সুধা ! বলতে গিয়ে সুধার স্বর একটুও কাঁপল না।

একটা ধোঁয়াটে বিস্ময় বটে, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত জ্বালাও আছে। কিন্তু মণীশের চোখে সে জ্বালার আঁচ লাগে না। শুধু গলার স্বরটা ভারি হয়ে টলমল করে—কেন যাচ্ছ ?

সুধা—ভোলাকাকা বললেন, আর তোমার এখানে থাকা উচিত নয়, তুমি আজই পূর্ণিয়াতে চলে যাও।

—তাই বলো ! বলতে গিয়ে হেসে ফেলে মণীশ।

সুধার চোখ জলে ভরে গিয়ে ছলছল করে—ভোলাকাকা কেঁদে ফেলেছেন। আমাকে চলে যেতে দিতে একটুও ইচ্ছে নেই, তবু না যেতে দিয়ে পারছেন না। আমি জানি, ভোলাকাকার অনেক টাকা ধার হয়েছে।

মণীশ—তুমি বাড়ি ফিরে গিয়ে ভোলাকাকাকে বলো যে, আমি বলেছি, তোমার এখন পূর্ণিয়াতে চলে যাওয়া উচিত নয়।

সুধা—আপনি একথা বলবেন না।

মণীশ—কেন ?

সুধা—ভোলাকাকাকে একথা বলতে আমার খুব খারাপ লাগবে।

মণীশ—কেন ?

সুধা—বললে ভোলাকাকা খুব অসুবিধেয় পড়বেন।

মণীশ—তবু, একটু বলে দেখো।

সুধা—তবে যাই ?

মণীশ—হ্যাঁ।

সুধা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ আনমনার মত এই নিরালার ভিতরে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে মণীশ। কাঠবিড়ালিটা নিজের মনের সুখে ছুটে ছুটে একেবারে সেই হা-ডু-ডু'র মাঠের উপর গিয়ে পড়েছে। ওই মাঠ পার হয়ে আরও একটু দূর এগিয়ে গেলে কালো পাথরের সেই টিলার কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়, যার উপরে উঠে বিদেশি ট্যুরিস্ট কতবার সিরসিরা নদীর একটা ঝর্নার অনেক ছবি তুলেছে। কিন্তু জগেশপুরের মণীশ তিন বছর পরে বিদেশ থেকে ফিরে আসবার পর সেই ঝর্নাকে একটিবার দেখতে যেতেও ভুলে গিয়েছে। চোখ দুটোকে সত্যিই একটা রোগে ধরেছিল বোধ হয়। তাই দেখবার সাধ-অসাধ দুই-ই ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল। সব দেখেও চিনতে না-পারা, আর, সব চিনেও দেখতে না-পাওয়া, ভয়ানক চক্ষুরোগী ছাড়া কে আর এমন ভুল করতে পারে ?

বিকালের রোদ এখন অনেক মিইয়ে গিয়ে আর লালচে হয়ে হা-ডু-ডু মাঠের ঘাসের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। এখনই বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। শালবনের কাছে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, তিতিরের ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে কি না। এটা কি শালফুল ফোটবার সময় ? তাই তো মনে হয়। সিরসিরা নদীর ঝর্নাতে আজও নিশ্চয় সেইরকম পাঁচটা ধারা জড়াজড়ি করে ঝরে পড়ছে।

চলতে থাকে মণীশ। বেড়িয়ে ফিরতে হয়ত সন্ধ্যা হয়ে যাবে। হয় যদি, হোক।

রোজ যেমন, আজও তেমনি সন্ধ্যার অলকাতে বারান্দার বাতিটা জ্বলছে। জানে মণীশ, ওটা সেই পুরনো বাতি, বার বার বললেও বৈজু যে বাতির কাঁচের ধুলো একটু ভাল করে মুছে দিতে ভুলে যায়। লজ্জা পেলেও মণীশের প্রাণটা অস্বীকার করে না, তার নিজেরই চোখে আজ একটা নতুন আলো আছে বলে পুরনো বাতিটাকে বেশ ঝকঝকে আলোর বাতি বলে মনে হচ্ছে।

মেসো তো এখনও কিছু জানতে পারেনি, স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে পেরেছে বলেও মনে হয় না। কিন্তু রিণির আবোল-তাবোল চেঁচামেচির ভাষা শুনতে পেয়েও কি কোনও সন্দেহ করতে পারেনি ? পারেনি বোধ হয়, নইলে বারান্দার ওদিকে একটা থামের পাশে এরকম একটা আবছায়া হয়ে, আর, একেবারে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন মেসো ?

বেড়িয়ে ফিরে, অলকার বারান্দার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এসেই একটা হাঁপ ছাড়ে, আর ডাক দেয় মণীশ—মেসো, তুমি বৈজুকে একটু বলে দাও, যেন এখুনি একবার গিয়ে ভোলাকাকাকে এখানে ডেকে নিয়ে আসে।

—আমি ভোলাকাকা। আমি এসেই গিয়েছি। চেঁচিয়ে উঠল সেই আবছায়া। আর, একেবারে দীপ্ত উল্লাসের একটা চেহারা হয়ে, দুই হাত বাড়িয়ে মণীশের কাছে ছুটে এসে, যেন মণীশের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চান ভোলাবাবু। সত্তর বছর বয়সের সাদা মাথাটা ঝড়ের আমডালের মত দুলতে থাকে, যদিও ঝড় কোথাও নেই, জগেশপুরের সন্ধ্যার বাতাসটা খুবই ফুরফুরে।

দু'হাতে মণীশের দু'হাত চেপে ধরেন ভোলাবাবু—বলো মণীশ, একটু ভাল করে বলো, কী ব্যাপাব ?

মণীশ—কী শুনতে চান, বলুন ?

ভোলাবাবু—কথাটার মানে কী ?

মণীশ—কোন কথা ?

ভোলাবাবু—এই যে, সুধা যে কথাটা বললে। তুমি নাকি বলেছ যে, সুধার এখন পূর্ণিয়াতে চলে যাওয়া একটুও উচিত নয় !

মণীশ—হ্যাঁ, বলেছি।

ছটফট করেন ভোলাবাবু—বলো বাবা, একটু ভাল করে, আর স্পষ্ট করে বলো, কেন বললে একথা ? এটা কিসের কথা ?

হেসে ফেলে মণীশ—লজ্জার কথা।

ভোলাবাবু—কার লজ্জার কথা।

মণীশ—আমার।

মণীশের হাত ছেড়ে দিয়ে, বারান্দার এদিকে ওদিকে সত্যি লাফালাফি করে ঘুরতে থাকেন, আর ডাক দিতে থাকেন ভোলাবাবু—ভবতোষ তুমি কোথায় ? মণীশের মাসি, ও বউমা তুমিই বা কোথায় ? কী আশ্চর্য, মেয়েটাই বা কোথায় গেল ? রিণি, ও রিণি !

সাড়া না পেয়ে খুব রাগ করেন ভোলাবাবু—কেউ নেই বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু চাকরটারই বা গেল কোথায় ? কী যেন নাম, ওরে ও বৈজু !

বৈজু এসে বলে—সবাই শর্মাজির মন্দিরে পাঠ শুনতে গিয়েছে।

ভোলাবাবু—আসবে কখন ?

বৈজু—সে আমি জানে না।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকেন ভোলাবাবু—কিন্তু হিরু আসতে এত দেরি করছে কেন ?

মণীশ—সে কী ? হিরুদা কেমন করে...

ভোলাবাবু—আমি নিজে গিয়ে হিরুকে খবরটা শুনিয়েছি।

মণীশ—কিন্তু...

ভোলাবাবু—কোনও কিন্তু-টিন্তু নেই, মণীশ। যা হবার ছিল তাই হয়েছে, তাই হয়। তাই হবে।

হিরু আসছে। 'কালেন সর্বং বিহিতং বিধাত্রা, পর্যায়যোগেন লভতে মনুষ্যঃ।'

সিঁড়ির কাছে একটা আবছায়া চেঁচিয়ে ওঠে—দৈব দৈব। আমিও বেরিয়ে পড়েছি মণীশ, ঘরে আর থাকতে পারলাম না।

গায়ে একটা সিল্কের চাদর জড়িয়েছেন হিরুদা। হাতে চন্দনকাঠের ছড়ি। শুকনো লতার গায়ে পাতা ধরলে যেমন দেখায়, হিরুদার রোগা ডিগডিগে চেহারাটা সেইরকমই দেখাচ্ছে। দুলছে হিরুদার শরীরটা, কিন্তু নুয়ে পড়ছে না।

যেন বুকের ভিতর থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস উথলে দিয়ে কথা বলেন হিরুদা—তুই আমার মহা উপকার করলি, মণীশ। তুই মানে দৈব।...নাঃ, আব ঘরে বসে থাকব না, মণীশ। শিগ্‌গিরই দেখবি, হিরুদা আব সেই হিরুদা নেই।

মণীশ হাসে—এবার কাজেব চেষ্টায় বের হবেন নিশ্চয় ?

হিরুদা—নিশ্চয়। দেখবি, আমি কেমন করে এই চন্দনকাঠের লাঠি দিয়ে জোচ্চোর পাঁচুকে পিটিয়ে দূর করে দিচ্ছি। আপনি কী বলেন ভোলাকাকা ? বেঁচে থাকতে হলে একটু সংগ্রাম করতে হয় কি না ?

ভোলাকাকা—খুব করতে হয়, বাবা। তুমি যে সেটা এতদিনে বুঝেছ, তাই আমাদের ভাগ্যি।

হিরুদা—এই যে বললাম, দৈব এতদিনে বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল বলেই তো বুঝতে পেরেছি।

বৈজু এসে বারান্দার মেঝের উপর একটা বিরাট সতরঞ্চিকে দু'ভাঁজ করে পেতে দেয়। ভোলাকাকা বৈজুর দিকে কটমট করে তাকান—এই দরকারটুকু বুঝতে তোমার এত দেরি হল ?

মণীশ—আমাকে এখন একটু রেহাই দিন, হিরুদা। আপনারা দু'জনে বসে গল্প করুন।

হিরুদা—তা হয় না, মণীশ। যদি বলি, তোমাকে এখন গান গাইতে হবে, তবে গাইতেই হবে। ভোলাকাকাকে যদি বলি, আপনাকে এখন নাচতে হবে, তবে...

ভোলাবাবু—তবে নাচব। বয়সের লজ্জাবালাই আমার নেই।

হিরুদা—ভয় নেই মণীশ, ভবকাকা আসলেই তোকে রেহাই দেব, তোকে নির্লজ্জ হয়ে এখানে আর বসে থাকতে হবে না...কিন্তু আমি একটু বেশি কবে বুঝতে চাই। একটু বুঝিয়ে বলুন, ভোলাকাকা।

ভোলাকাকা—আর বুঝিয়ে বলবার কিছু নেই।

হিরুদা—কুমারসাহেবের লাল মখমলের দরবারি সামিয়ানা তা হলে আনাতেই হবে ?

ভোলাবাবু—হ্যাঁ।

হিরুদা—তা হলে হবধামের সামনের মাঠে সেই সামিয়ানা টাঙাতে হবে ?

ভোলাবাবু—হ্যাঁ।

মণীশের মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন হিরুদা—তা হলে সত্যিই সাবালক হয়েছিস এতদিনে ?

মণীশ—হ্যাঁ।

হিরুদা—কিন্তু কী করে কী হল, কেমন করে হল, সেটাও তো একটু বুঝিয়ে বলবি ?

মণীশ—না।

হিরুদা—ছায়া দেখতে পেয়ে রোদ্দুর থেকে সরে এলি ? না, রোদ্দুর থেকে সরে এলি বলে ছায়া দেখতে পেলি ? কোনটা সত্য ?

মণীশ—দুই-ই সত্য।

হিরুদা—বাঃ,...শুনছেন তো ভোলাকাকা ?

ভোলাবাবু—সব শুনছি।

হিরুদা—যেমতি দীপিকা, উজরে অধিকা, ভিতরে অনল শিখা।

ভোলাবাবু—কিন্তু পতঙ্গ তাহা বুঝিয়া, পড়য়ে সরিয়া, না পুড়ে তাহার পাখা। কিছু মনে করিস না বাবা, মণীশ।

হিরুদা—এই হল, একটা সত্য। দ্বিতীয়টা কী ?

মণীশ—আপনি বলুন !

হিরুদা—শোন কলি করাল কৌতুকী, আর নাহি ডরি কুহকে তোমার। পারিজাত হেরিল যে-জন তাহারে ছলিতে পারে কি কভু কণ্টককেতকী ? ঠিক কিনা, ভোলাকাকা ?

ভোলবাবু—খুব ঠিক। কিন্তু আর ওসব কথার তো কোনও দরকার নেই, হিরু। না বলাই ভাল।

হিরুদা—আমি কি আপত্তিকর কোনও কথা বললাম ?

ভোলাবাবু—ছেড়ে দাও ওসব কথা। যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। এখন কাউকে অনল শিখা-টিখা কিংবা কণ্টককেতকীটেতকী বলতে আর ভাল লাগে না। সবারই ভাল হোক।

হিরুদা—আপনি তো গলার স্বর করুণ করে ফেললেন। কিন্তু দৈব কি এমনিতেই, আর এত সহজে করুণ হয়ে কাউকে ছেড়ে দেয় ? কখখনও দেয় না। ভুল হলে অন্য কথা ; কিন্তু পাপ করলে পুড়তেই হবে, সেই পাপ যতই রঙিন আর যতই চালাক হোক না কেন !

ভোলাবাবু—ভবতোষ এবার এসে পড়লেই তো পারে ! এত দেরি করছে কেন ?...হ্যাঁ, তোমার কি বিশেষ করে কিছু বলবাব আছে মণীশ, মেসো-মাসির কাছে যেটা বলতে তোমার লজ্জা করবে ?

মণীশ—হ্যাঁ।

ভোলাবাবু—আমাকে বলো !

মণীশ—আর দেরি করতে চই না।

ভোলাবাবু—বড়জোর এক মাস ?

মণীশ—না ভোলাকাকা, বড়জোর সাত দিন।

হিরুদা—শুভ কাজ বটে, কিন্তু এত বেশি শীঘ্রং করবার মানে কী ?

মণীশ—মানে আছে, কিন্তু আপনাদের জেনে কোনও লাভ নেই।

হিরুদা—তার মানে, আত্মাটার দু'কষ বেয়ে লালা ঝরতে শুরু করেছে, তর সইছে না !

ভোলাবাবু—আঃ, তুমি আমাকে উঠিয়ে ছাড়বে, হিরু। দোহাই তোমার, দু'চারটে কাজের কথা বলো !

হিরুদা—তোর কী গণ, মণীশ ?

মণীশ—রাক্ষস গণ।

হিরুদা—আমি ঠিকই অনুমান করেছি। সুধার গণটা কী, ভোলাকাকা ?

ভোলাবাবু—দেবগণ।

হিরুদা—যাক, রাক্ষসটা ইচ্ছে করলেও সুধার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

মণীশ উঠে দাঁড়ায়—আমি যাই হিরুদা।

হিরুদা—আর একটু বস, ভাই।

মণীশ—না, ওই দেখুন, ওরা এসেছে।

এসে পড়েছে তিন জোড়া চোখের থমথমে বিস্ময়। ভবতোষ আর করুণা, সেই সঙ্গে রিণিও যেন এই সন্ধ্যাতে সূর্যোদয়ের মত একটা ছবিকে দেখছে।

ভোলাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—আমি অনেকক্ষণ হল এসেছি, ভবতোষ।

হিরুদা—আমিও।

ভবতোষ হাসেন—তা হলে তো আমরা আসতে দেরি করে খুব অন্যায় করে ফেলেছি !

হিরুদা—খুব অন্যায় ভবকাকা, এত দেরি করা উচিত ছিল না।

ভবতোষ—খুব সত্যি কথা।

হিরুদা—মুরলীমনোহর যে আবার বাঁশি বাজিয়েছেন, সে খবর কি শুনেছেন কাকিমা ?

চমকে উঠলেন করুণা—কে বললে ?

হিরুদা—আমি বলছি।

ভবতোষ—কী ব্যাপার, হিরু ?

হিরুদা—জানতে চাই, এ বছরে নতুন গোলাপ ফোটাতে কোনও চেষ্টা করেছেন কি ?

ভবতোষ—করেছি।

হিরুদা—কোনও নাম দিয়েছেন ?

ভবতোষ—না।

হিরুদা—তবে দিয়ে ফেলুন নাম, সুধা গুডলাক।

ভবতোষ আর করুণার অপলক চোখের বিস্ময়টা গলে গিয়ে হাসতে থাকে। রিণি এক হাতে মুখ টিপে ধরে, আর শিউরে শিউরে হাসে।

চেঁচিয়ে ওঠেন ভোলাবাবু—বউমা, চা দাও।

হিরুদা—চায়ের সঙ্গে আমাকে দু'মুঠো মুড়ি দেবেন, কাকিমা।...এই মেয়ে, এই রিণিঝিনি, তুই কী বুঝেছিস যে এত হাসছিস ?

রিণি—সব বুঝেছি। সুধাদির বিয়ে।

হিরুদা—কার সঙ্গে ?

রিণি—দাদার সঙ্গে।

হিরুদা—তা হলে যা এখন, সরে পড়।

ঘরের ভিতরে রিণির ছুটোছুটির শব্দ মাঝে মাঝে চমকে ওঠে, আর, রান্নাঘরে করুণার ব্যস্ত হাতের ছোঁয়া লেগে চায়ের বাসন টুং-টুং করে বাজে। কিন্তু বারান্দাটা এবার হল্লা থামিয়ে শুধু কাজের কথা বলে। ভোলাবাবু বলেন—মণীশের ইচ্ছে, এই সাতদিনের মধ্যেই কোনও একটি দিনে বিয়েটা হয়ে যাক।

ভবতোষ—তাই হোক !

ভোলাবাবু—সম্প্রদান কি আমিই করব ?

ভবতোষ—নিশ্চয়।

হিরুদা—বলেন তো, আমিই করি।

ভবতোষ—না হিরু, সকাল থেকে উপোস করে থাকতে হয়, তোমার এই শরীরে ওসব ঝঞ্ঝাট সইবে না।

ভোলাবাবু—ব্যস, আর তো কিছু আলোচনা করবার কথা মনে পড়ছে না !

ভবতোষ—বিয়ের খরচের দিকটা আপনার একটু ভেবে দেখা উচিত, ভোলাদা।

ভোলাবাবু—তার মানে ?

ভবতোষ—আপনার একার পক্ষে...

ভোলাবাবু—থাক ভবতোষ, আর কিছু বলো না।

হিরুদা—আমার দুটো সোনার মেডেল, আর বেশ ভারি একটা সোনার চেন আছে। বেচে দিলে অন্তত শ' পাঁচেক টাকা পাওয়া যাবে।

ভোলাবাবু—আমাকে ওরকম করে সাহায্য করো না, হিরু। জীবনে কখনও গর্ব করবার সুযোগ পাইনি, এইবার পেয়েছি। সে জন্যে না হয় কিছু টাকা ধারই করলাম।

হিরুদা—কিন্তু মণীশের বউকে কেউ কি কোনও উপহারও দিতে পারবে না ?

ভোলাবাবু—তা পারবে না কেন ?

হিরুদা—আমার বাড়ির যে বুড়ো আর বুড়ি মণীশের বউকে দেখবার আশায় বেঁচে আছে, তাদের একটা উপহার আপনি তা হলে মেনে নেবেন নিশ্চয় ?

ভোলাবাবু—নিশ্চয়।

হিরুদা—বুড়ি তার সব গয়না মণীশের বউকে দেবার জন্য সঙ্কল্প করে তুলে রেখে দিয়েছে। গয়নার জন্যে আপনি টাকা খরচ করবেন না, ভোলাকাকা।

চোখ মোছেন ভোলাবাবু—মেনে নিলাম।

করুণা চা নিয়ে আসতেই হেসে উঠলেন ভোলবাবু—তোমাকে এত খুশি হতে দেখে আমার কী মনে হচ্ছে বলব, বউমা ? মনে হচ্ছে, আমাদের জগেশপুরের সব গাছপালাও খুশি হয়েছে।

চা খাওয়া যখন শেষ হয়, তখন সত্যিই গাছপালার খুশির হাওয়াটা উতলা হয়ে ঝড়ের মত বইতে শুরু করেছে। —চলুন ভোলাকাকা। আসি কাকিমা। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান হিরুদা।

চলে চলে হরধামের কাছের রাস্তাটার উপর এসেই দু'জনে প্রায় একসঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দু'জনেরই চোখে পড়েছে, আশাবরীর ফটকের সামনে ঝড়ো হাওয়ার একটা ঘূর্ণি যেন দাঁড়িয়ে আছে। কী আশ্চর্য, সরে যায় না কেন অন্ধকারের ধুলো-বালি মাখানো ভুতুড়ে চেহারার এই খাড়া ঘূর্ণিটা ?

ভোলাবাবু বলেন—এটা একটা লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে, হিরু ?

হিরুদা—বাড়িতে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

ভোলাবাবু—না, কেউ নেই। ওরা বিকেলে চলে গিয়েছে।

হিরুদা—কোথায় গিয়েছে ?

ভোলাবাবু—টিকেট-ঘরের কৈলাস বললে, কলকাতা।

হিরুদা—ভাল কথা।

ভোলাবাবু—কিন্তু লক্ষণটা কি ভাল কথা বলছে ?

হেসে ফেলেন হিরুদা—যা-ই বলুক না কেন, আমাদের তো কিছু বলছে না ! বলছে ওই আশাবরীকে।

ভোলাবাবু—কিন্তু সেটাই বা কী ?

ভোলাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে, আর চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ ঘূর্ণিটার দিকে তাকিয়ে থাকেন হিরুদা। ভোলাবাবু আবার জিজ্ঞাসা করেন,—কী মনে হয় ?

হিরুদা—হ্যাঁ, আপনি সেই যে একটা গল্প সেদিন আধখানা শুনিয়ে দিয়ে চলে গেলেন, তার বাকি আধখানা তো শোনালেন না ?

ভোলাবাবু—কোন গল্প ?

হিরুদা—হনুমানের গল্প।

ভোলাবাবু—সেটা তো গল্প নয় ; চোখে দেখা ঘটনা।

হিরুদা—বেশ তো, সমস্যাটার কোনও সমাধান হয়েছিল, না হয়নি ?

ভোলাবাবু—হয়েছিল।

হিরুদা—কী করে ?

ভোলবাবু—পুলিস তো এসেই বললে, উপায় নেই। হনুমানটাকে গুলি করলে জমাদারনির বাচ্চাটার গায়ে লাগতে পারে। তা ছাড়া, বাচ্চাটা ওই উঁচু মগডালের হনুমানের হাত থেকে পড়ে গিয়ে মাটিতে আছাড় খাবে ও মরে যাবে নির্ঘাত। অগত্যা, সবাই যখন হতাশ হয়ে হায়-হায় করছে, তখন কোথা থেকে হঠাৎ হাজির হলেন ফিরিঙ্গি সাহেব রোজারিও।

হিরুদা—তাই বলুন ! হঠাৎই আসে।

ভোলাবাবু—বেণী শেঠের মালবহা লরি চালাবার ড্রাইভার রোজারিও, সব ব্যাপার বুঝে নিয়ে, জমাদারনির ঘরে ঢুকে, চটপট হাত চালিয়ে, দড়ি ন্যাকড়া আর ভুসোর কালি দিয়ে একটা হনুমানের বাচ্চা তৈরি করে ফেলল। যেই না ন্যাকড়ার তৈরি হনুমানের বাচ্চাটাকে গাছতলায় রাখা, অমনি হনুমানটা মগডাল থেকে নেমে এসে জমাদারনির বাচ্চাটাকে মাটির ওপর শুইয়ে দিল, আর ন্যাকড়ার তৈরি হনুমানের বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল।

হিরুদা—বাঃ !

ভোলাবাবু—তারপর আরও একটা ব্যাপার হল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। দেখা গেল, হনুমানটা নেয়ামত আলির ঘরের চালার ওপর ন্যাকড়ার তৈরি হনুমানের বাচ্চাকে রেখে সেটাকে হাতের খোঁচা দিয়ে বার বার নাড়ছে, খিমচে ধরছে আর দেখছে।

হিরুদা—এই তো, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কর্মফল কাকে বলে ! দৈব যদি না মানবেন, কর্মফল তো মানবেন না ? নাঃ, ঘূর্ণিটা এখনও সরছে না। চলুন, আমরা একটু ওদিক ঘুরে চলে যাই।

॥ ১৫ ॥

হরধামের সামনের মাঠে যেদিন কুমারসাহেবের দরবারি সামিয়ানার লাল মখমলের ঝালর রাতের বাতির আলোতে ঝলমলিয়ে দুলে উঠল, তার দু'দিন পরে অলকার পুরনো বারান্দার কার্ণিশ ছুঁয়ে আমপাতার ঝালরও দুলে উঠল। সে রাতের উৎসবটা যেন পুরনো জগেশপুরের মনমাতানো একটা খুশির উৎসব। সব কিছুতে একটা লক্ষণ না দেখে যিনি পারেন না, সেই ভোলাবাবু বলে উঠলেন—নিশ্চয় এর একটা মানে আছে, ভবতোষ। তোমার নার্সারির বাতাস আগে কোনওদিনও এত মেতে ওঠেনি ; তাতে এত সুবাসও ছিল না। নবীনবাবুর গৃহিণী, যিনি শর্মাজির স্ত্রীর মুখে করুণার অনেক গুণপনার ও রিণির চেহারার অনেক প্রশংসার কথা শুনে খুব অখুশি হয়ে এই তিন বছরের মধ্যে একদিনও অলকাতে আসেননি, তিনিও এসেছেন, হেসে হেসে ফুলশয্যার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন।

শেখরের বউ মালতী, রেল আপিসের সদানন্দের বোন সুরধুনী, মধুপুরের মেয়ে-ইস্কুলের ছোটদির্দি উজ্জ্বলা, আর ওদেরই মত বয়সের আরও তিন-চারজন অভ্যাগতা নবীনা, যাঁরা ফুলশয্যার ঘরের দরজার কপাটে আড়ি পেতেছিলেন, তাঁদেরই সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে হেমবাবুর বাড়ির বর্ষীয়সী নিরুপিসিও ঘরের ভিতরের মৃদু গুঞ্জনের কিছু ভাষা বেশ স্পষ্ট করে শুনে নিয়েছেন। অজানা বিস্ময়ের একটি গোপন কথাও শুনেছেন ; শুনে আরও বিস্মিত হয়েছেন। খুশি আর হাসির উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে, হুড়মুড় করে ছুটে সরে গিয়েছেন।

বেশ একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছে সুধা—বন্ধু গোলাপ।

সুরধুনী হাঁপ ছেড়ে হাসতে থাকে—উঃ, পারবে তুমি উজ্জ্বলা, এরকম একটি কথা তৈরি করতে ?

না বলে উপায় ছিল না সুধার। মণীশ যে বার বার সুধাকে ওই একটি কথাই জিজ্ঞেস করেছে—মনে যখন এতই ছিল, তবে আমাকে একবার সামান্য একটা চিঠিও লেখনি কেন ?

সুধা—একবার লিখেছিলাম।

মণীশ—কী লিখেছিলে ?

সুধা—লিখেছিলাম, বন্ধু গোলাপ, তুমি কবে ফিরে আসবে ? আমি তোমাকে একবার দেখে নিয়ে পূর্ণিয়াতে চলে যাব।

মণীশ—কী আশ্চর্য, সে চিঠি তো আমি পাইনি !

সুধা—না পাওয়ারই কথা।

মণীশ—কেন ?

হেসে ফেলে সুধা,—চিঠিটা মনে মনে লিখেছিলাম, আর মনে মনেই ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েছিলাম।

মণীশও হাসে—বেশ অদ্ভুত একটি মন বটে !

সুধা—কী করব বলো ? সব সময় ভয় করত, যেন ধরা না পড়ে যাই।

মণীশ—কিসের ভয় ?

সুধা—ধরা পড়ে গেলে লোকে যে আমাকে একটা আস্ত পাগল বলে মনে করে ফেলত। তার চেয়েও খারাপ কিছু মনে করত। লোকে সন্দেহ করত, একটা মেঠো রাত-ফড়িং আকাশের তারা ধরবার মতলব এঁটেছে।...অ্যাঁ, ও কী ? কে হেসে উঠল ? কারা যেন দরজার কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল ?

মণীশ—হ্যাঁ, বেশ ভাল হল।

সুধা—তার মানে ?

মণীশ—বেশ ভাল করে ধরা পড়ে গেলে।

অলকার সেই উৎসবের রাত ফুরিয়ে গিয়ে যখন ভোর হয়, তখন ওদিকে হরধামের কুয়োতলার কাছে দাঁড়িয়ে ভোলাবাবুর স্নানের গঙ্গাস্তোত্র হঠাৎ একবার নীরব হয়ে, আবার সরব হয়ে ওঠে। দেখতে পেয়েছেন ভোলাবাবু, ওরা ফিরে এসেছে। নিশ্চয় শেষরাত্রির ট্রেনেই ওরা এসেছেন।

আশাবরীর বারান্দাতে তিন চেয়ারে বসে আছে তিনজন, বাপ মা ও মেয়ে। হ্যাঁ, আরও একটি চেয়ার আছে। সেই চেয়ারে আর একজন। ইনিও ভোলাবাবুর চোখের খুব অচেনা ও অজানা কেউ নন। ইনিই তো অনেকবার জগেশপুরে এসেছেন, ডাকবাংলোতে থেকেছেন, আশাবরীর বাপ মা ও মেয়ের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে শালবনের আশেপাশে বেড়িয়েছেন। ডাকবাংলোর নেয়ামত মিঞা বলেছিল, ইনি একজন মানিজার সাহেব, মানুডি কোলিয়ারির মানিজার বিকাশচন্দর ঘোষ।

আশাবরীর চাকর জগু বার বার চা নিয়ে আসছে। বার বার চা খাচ্ছেন আর হাসছেন আশাবরীর ধরণী দত্ত, অণিমা আর বাণী ; আর সেই বিকাশ ঘোষ। মনে তো হয়, লক্ষণ দেখে সন্দেহ করেন ভোলাবাবু, ওই ম্যানেজার বিকাশ ঘোষ আজ বোধ হয় আশাবরীর জামাই বিকাশ ঘোষ।

ভুল সন্দেহ করেননি ভোলাবাবু। ধরণী দত্ত তাঁর ইচ্ছার অনুষ্ঠান সুসমাপ্ত করে কলকাতা থেকে আজই ভোরের ট্রেনে ফিরেছেন। হরধামের কুয়োতলার দিকে চোখ পড়তেই মাথা দুলিয়ে হেসে উঠলেন ধরণী দত্ত। তারপর হাতের পাইপ তুলে, যেন জগেশপুরের আকাশটাকেই তাক করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—অপদার্থ !

অণিমা—খুব ভাল হত, যদি এই অপদার্থ জগেশপুরে আবার একবার আসবার কোনও দরকার না থাকত।

ধরণী দত্ত—তাই তো আমি বলছি, ওসব শালবন আর ঝর্না-টর্না দেখতে বাণী আর বিকাশের একটুও ভাল লাগবে না। যদি বেড়াবার ও বের হবার খুব ইচ্ছে হয়, তবে না হয় মতিলালের দোকানে গিয়ে কিছু কেনা-কাটা করে আসবে।

আবার আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ধরণী দত্ত ; তারপর হেসে ওঠেন—বিকাশ আর বাণী, তোমরা দু'জন এই বারান্দাতে বসে এখন গল্প করো। দেখতে পাবে, একটি অদ্ভুত বস্তু এসে গেটের কাছে থমকে দাঁড়িয়েছে, আর এদিকে তাকিয়ে আছে। দেখে তোমার হাসি পাবে ঠিকই, তবু বলছি, বেশি হেসো না।

অণিমা—বিকাশের আঙুলে বিয়ের আংটিটা কী চমৎকার মানিয়েছে, দেখছ ?

ধরণী দত্ত একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চেষ্টা করেন—কী আর দেখব বলো ? আংটির পাথরটা তো হীরে নয়, পোখরাজ। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হাতে সময় পাওয়া গেল না, নইলে ধরণী দত্ত কি তার কোনও আপনজনকে পোখরাজের আংটি দেয় ?

বিকাশ—আমার কিন্তু কোনও অসুবিধা হয়নি। বাণীর জন্যে হীরের আংটি কিনে ফেলতে আমার বড়জোর একঘণ্টা সময় লেগেছিল।

বাণীর চোখের মিষ্টি ভ্রূকুটি লজ্জা পেয়ে কেঁপে ওঠে। কী যেন বলতে চায় বাণী। শেষে বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত মিষ্টি ভ্রূকুটির কথাটা বলেই ফেলে—চুপ করো।

অণিমা—এখানে আমাদের আর কতদিন থাকতে হবে বলে মনে করছ ?

ধরণী দত্ত—বলেছি তো, বড়জোর আর দুটো কি তিনটে দিন। আজই কন্ট্রাক্টর ভাদুড়ী এসে পড়বে। বাড়ি কেনবার পার্টি, যার নাম অযোধ্যাপ্রসাদ, তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবে ভাদুড়ী। ভাদুড়ী লিখেছেন, খুব ভাল পার্টি, খুব সরল প্রাণের মানুষ। সব ব্যবস্থা একরকম হয়েই যাচ্ছে, হতেই হবে। ধরণী দত্তের প্ল্যানে কোনও খুঁত থাকে না।

বাণী হাত তুলে মুখের হাসি চেপে কথা বলে—জগুর দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখো, মা !

জগুর দিকে তাকিয়ে সত্যি একটু আশ্চর্য হন অণিমা। অণিমার যে দুই চোখ জগুর গায়ে ছেঁড়া জামা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, সেই দুই চোখই দেখছে, জগুর গায়ে গোলাপি রঙের একটা নতুন গেঞ্জি।

অণিমা—কী ব্যাপার জগু? এই সাতদিনের মধ্যেই যেন একটু মোটা হয়েছিস, আর, একটু চকচকিয়ে গিয়েছিস ! জুয়ো খেলে খুব পয়সা পেয়েছিস বোধ হয় ?

জগু—না, মা।

অণিমা—দু'বেলা খুব ঘি-খিচুড়ি রেঁধেছিস আর খেয়েছিস, তাই না ? এই সাতদিন ভাঁড়ারঘর তো

তোরই রাজত্বে ছিল !

জগু লজ্জিত হয়ে হাসে—না মা, দুই বাড়িতে দুটো নেমন্তন্ন খেয়েছি।

অণিমা—বলিস কী ?

জগু—হ্যাঁ মা। একদিন খেলাম এই ভোলাবাবুর বাড়িতে, একদিন হোই ভবতোষবাবুর বাড়িতে। গেঞ্জিটা দিলেন ভোলাবাবু।

অণিমার চোখের দৃষ্টি বেশ রুক্ষ হয়ে ওঠে—কেন ?

জগু—এই বাড়ির দিদির সঙ্গে হোই বাড়ির দাদাবাবুর বিয়ে হয়ে গেল।

ধরণী দত্তের দিকে তাকান অণিমা—শুনছ ? জগু কী বলছে, অপদার্থটার সঙ্গে দাসী মেয়েটার বিয়ে হয়ে গিয়েছে !

জগু—না মা, মণিদাদার সঙ্গে সুধাদিদির বিয়ে হয়েছে।

অণিমা—আরে হ্যাঁ, বুঝেছি, তুই ওদিকে যা।

জগু চলে যায়। আশাবরীর বাপ মা ও মেয়ে একসঙ্গে গলার স্বর মিলিয়ে হাসতে থাকে। জগুর গোলাপি গেঞ্জিটা যেন হা-ভাতে তামাসার একটা নিশান। গেঁয়ো মেলাতে সার্কাসের ছেঁড়া তাঁবুর উপর যেরকম রঙিন নিশান দেখা যায়, সেই রকম।

ধরণী দত্ত বলেন—হাসবারই কথা। কে না হেসে পারবে ? ঈশপের গল্পে এক ময়ূরপুচ্ছ কাকের কথা পড়েছিলাম। আর এই দেখলাম, দ্বিতীয় এক ময়ূরপুচ্ছ কাক।

অণিমা—ভাগ্যি ভাল, সেটাকে চিনতে ও বুঝে ফেলতে খুব বেশি দেরি হয়নি।

বাণী—আমি চিনেছিলাম তোমাদেরও আগে।

ধরণী দত্ত—যাক, বুঝতে পারা গেল, অপদার্থটা শিক্ষা পেয়ে গিয়েছে।

অণিমা—মনে হচ্ছে, আজে-বাজে কোনও লোক এখানে আর কাঁদুনি গাইতে আসবে না। না এলেই ভাল।

বাণী—কিন্তু একটা ড্রামা দেখবার মজা হারাতে হল।

ধরণী দত্ত—ব্যাপারটা কী রকম হল জান ? এই সেদিন স্টেশনে যা দেখেছিলে, সেইরকম। ট্যুরিস্ট সাহেবটার কাছে হাত পেতে ভিক্ষুকটা কত না মিনতি করলে, একটা সিগারেট দাও সাহেব। না পেয়ে তখুনি একটা পোড়া বিড়ির টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে, আর, মুখে দিয়ে হাসতে শুরু করে দিল ভিক্ষুকটা, ট্যুরিস্ট সাহেবকে যেন কতই জব্দ করা হল !

অণিমা—বিকাশ বেচারা বোধ হয় আমাদের গল্পের কিছুই বুঝতে পারছে না, তাই হাসতে পারছে না।

হেসে ওঠে বিকাশ—এটুকু বুঝেছি যে, এখানে একটা হাস্যকর বিয়ের ব্যাপার হয়ে গিয়েছে।

ধরণী দত্ত—ঠিক বুঝেছ। একটা পোকার সঙ্গে একটা মাকড়ের বিয়ে। পোকাটা হল এই কদর্য জগেশপুরের একটি খাঁটি সুসন্তান, একটা অপদার্থ নির্বোধ ইয়ংম্যান, নামটা হল...কী যেন নামটা অণিমা ?

অণিমা—মণীশ সরকার।

ধরণী দত্ত—নির্বোধটাকে কত করে বুঝিয়েছি, ওহে, একটু মানুষ হতে চেষ্টা করো, একটু...

বিকাশ—কী আশ্চর্য ! এখানে এসে শুনছি অপদার্থ একজন মণীশ সরকারের কথা ; আর, ওখানে শুনে এলাম অতি সপদার্থ একজন মণীশ সরকারের কথা। তার কেরিয়ার আর সাকসেস, দুই-ই গ্লোরিয়াস।

অণিমা—এটা আর এমন কী আশ্চর্যের কথা। রাণীর নাম মেরী হয়, আবার বাণীদের কনভেন্ট স্কুলের হোস্টেলে বাসন মাজে যে বুড়িটা, তারও নাম মেরী।

বিকাশ—হ্যাঁ, ভাবতে তবু একটু আশ্চর্য লাগে, দেরাদুনের কাছে ইলেকট্রিক কেবল্‌সের যে নতুন কারখানা চালু হয়েছে, যেটা একটা বিরাট ইণ্ডো-জার্মান ভেনচার, তার চিফ সুপারভাইজার হয়ে গেল একজন ছোকরা মণীশ সরকার। এরকম সাকসেসের নমুনা বড় একটা দেখা যায় না। মাইনেটা প্রায় আড়াই হাজারের কাছাকাছি।

চমকে উঠলেন ধরণী দত্ত। শিউরে উঠলেন অণিমা। কাগজের মত সাদা হয়ে যায় বাণীর লালচে ঠোঁট, যেন সারা গায়ের রক্ত এক মুহূর্তে শুকিয়ে ঝরে গিয়েছে।

বিকাশ—আমাদের কোলিয়ারির ডিরেক্টর কাপাডিয়া দেরাদুনে গিয়ে ওই কারখানায় কাজের জন্য এক নম্বর কয়লার সবটাই সাপ্লাই করবার একটা চুক্তি করেছেন। তিনিই বললেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তাঁকে বলেছেন যে, একজন ইয়ং বেঙ্গলি, তার নাম মণীশ সরকার, স্টুটগার্টে গিয়ে প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং নিয়েছে, আর স্পেশালাইজ করেছে যে, তাকেই বেস্ট ম্যান বলে সুপারিশ করেছেন জার্মান অ্যাডভাইজার ব্রোখমান।

—অণিমা! ডাকতে গিয়ে ধরণী দত্তের গলার স্বর থর থর করে কাঁপে, যেন তাঁর হৃৎপিণ্ডটা বুকের ভিতর থেকে হঠাৎ খসে পড়ে আর ধুলোমাখা হয়ে জগেশপুরের মাটি কাঁকর আর কাঁটাঘাসের উপর গড়াতে শুরু করেছে।

বিকাশের সহাস্য মুখটার দিকে ভয়ানক কঠোর একটা ভ্রূকুটি তুলে তাকিয়ে থাকেন অণিমা। লোকটা যেন হেসে হেসে একটা রাক্ষুসে উপকথা শোনাচ্ছে। মুখ ফাঁক করে যেন একটু বাতাস গিলে নিলেন অণিমা। চেঁচিয়ে উঠলেন—অদ্ভুত অসম্ভব গল্পটা তুমি কবে শুনলে?

বিকাশ—এই তো সেদিন, যেদিন বাণীর শেষ চিঠিটা পেলাম।

ধরণী দত্ত—তুমি একটু হিসেব করে বলো অণিমা। রহস্যটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

বিকাশ—আপনি কী হিসেব করতে আর, বুঝতে চাইছেন?

ধরণী দত্ত—বুঝতে চাই, ওই মণীশ সরকার তার কাজের চিঠিটা কবে পেল?

বিকাশ—শুনেছি, আসছে মাসের পয়লা তারিখে কাজে জয়েন করবেন ওই চিফ সুপারভাইজার।

ধরণী দত্ত—তবে তো এই দাঁড়ায় যে, এই মাসেরই কোনও একটা তারিখে কাজের চিঠিটা তার হাতে এসেছে।

বিকাশ—নিশ্চয়। অন্তত দিন দশেক আগে তো এসে থাকবেই।

অণিমা মনে মনে হিসাব করে নিয়ে বলেন—তার মানে...শুনছ তুমি? একটু ভাল করে শোনো সেই যে শিলাবৃষ্টি হল, সেই দিনই কিংবা তার একটা-দুটো দিন পরে কাজের চিঠি এসেছে।

ধরণী দত্ত—মোট কথা, আমাদের কলকাতা রওনা হবার আগেই কোনও-একটা দিনে।

বাণী—মা!

অণিমা—কী রে?

বাণী—আমার মাথার ভেতরটা কেমন-যেন বিশ্রী রকম জ্বলছে। বসে থাকতে পারছি না।

ধরণী দত্ত—তুমি ভেতরে গিয়ে এখন শুয়ে থাকো, বাণী।

উঠে দাঁড়ায় বাণী। চেয়াটাকে জোরে একটা ঠেলা দিয়ে সরে যায়। বিকাশের হাঁটুতে ঠোকর খেয়ে চেয়ারটা খট্ করে বেজে ওঠে। ঘরের ভিতর গিয়ে বিছানাতে লুটিয়ে পড়ে বাণী।

ধরণী দত্ত নীরব, অণিমা দত্ত নিশ্চল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দুই জোড়া নিষ্পলক চোখের তারা শুধু ছটফট করছে। কোনও মেঘ নেই আকাশে, তবু যে কড়কড় করে একটা ঠাঠার বাজ ফেটে পড়েছে। তারই শব্দ শুনছেন দু'জনে। কী নিখুঁত ধোঁকা! কোনও দিনও তো সন্দেহ হয়নি যে, দেখতে গবেট এই জগেশপুরের প্রাণে এরকম কঠিন একটা চতুরতা থাকতে পারে!

কিন্তু ধরণী দত্তের শিরদাঁড়াতে যে ইস্পাত আছে, সেটা বোধ হয় ওই কঠিন চতুরতাও বুঝতে পারেনি, বুঝতে পারবেও না। পাইপটাকে বুকে ঠেকিয়ে, আর, বেশ শক্ত ভঙ্গিতে জোরে জোরে পা ফেলে বারান্দার এদিকে ওদিকে কিছুক্ষণ হেঁটে নিলেন ধরণী দত্ত। চকিত চোখে একবার বিকাশের দিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর ডাক দিলেন—অণিমা, আমার কাছ থেকে একটা কাজের কথা শুনতে হলে তোমাকে এখন একটু ওদিকে যেতে হবে, ওই ঘরে।

ডাক শুনে চমকে উঠলেন অণিমা। এ তো বিড়ালের ডাক নয়, সিংহেরই ডাক। অণিমার চুপসে-যাওয়া আত্মাটা যেন সেই মুহূর্তে সিংহিনী হয়ে সাড়া দেয়—চলো।

ওদিকের ঘরের ভিতরে এসে, আর, গলার স্বর শক্ত করে চেপে দিয়ে ফুঁসে উঠলেন ধরণী দত্ত—দমে গেলে চলবে না, অণিমা।

অণিমা—আমিও তাই বলি। কিন্তু কী করতে চাও ?

ধরণী দত্ত—যেমন করেই হোক, মণীশকে একবার এখানে আনতে হবে।

অণিমা—না হয় এল, কিন্তু তারপর ?

ধরণী দত্ত—তারপর যা দরকার হয়, সবই করতে হবে। কই, কলমটা কোথায় ?

ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে একটা চিঠি লিখে ফেললেন ধরণী দত্ত—আমরা বিপন্ন। বাণী শয্যা নিয়েছে। তোমাকে একবার দেখতে চায় বাণী। বোধ হয় শেষ দেখা। আমাদের যদি ভুল বুঝেও থাকো, তবু একবার এসো মণীশ।

চিঠি হাতে নিয়ে, আর, দৌড় দিয়ে চলে গেল জগু। ধরণী দত্ত আর অণিমা, দু'জনে ঘর থেকে বের হয়ে, বারান্দা থেকে নেমে, ফটকের দিকে অর্ধেক পথের উপর এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। পথ-পানে চাওয়া দুটি উৎসুক মূর্তি।

ফিরে আসতে খুব বেশি দেরি করে না জগু। ডাকবাংলোর বেয়ারা এসে যখন খবর দিয়ে চলে গেল, ভাদুড়ীবাবু পৌঁছে গিয়েছেন, তখন জগুও দৌড়ে এসে হাঁপাতে থাকে।

ধরণী দত্ত—কী রে ? জবাবের চিঠি কই ?

জগু—চিঠি দিলেন না দাদাবাবু।

অণিমা—কিছু বললেন তো ?

জগু—না।

ধরণী দত্ত—একটা কথাও বললেন না ?

জগু—না। শুধু হাসলেন।

ধরণী দত্ত—আচ্ছা, তুই যা।

ধরণী দত্তের চোখের তারা দুটো জ্বলছে, তবু একটু হেসে নিতে পারলেন—শুনছ অণিমা ?

অণিমা—বলো !

ধরণী দত্ত—রাগ করলে কিংবা হতাশ হয়ে পড়লে ভুল হবে।

অণিমা—হ্যাঁ। কিন্তু কী করতে চাও ?

ধরণী দত্ত—বাণী যদি নিজেই একবার মণীশের কাছে গিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, সব ভুলে গেলে ? বলতে গিয়ে বাণীও নিশ্চয় চোখের জল সামলাতে পারবে না। তা হলে কেমন হয় ?

অণিমা—বুঝতে পারছি না।

ধরণী দত্ত—ভোলাবাবুর হাতে হাজার দুয়েক টাকা ধরিয়ে দিলে কেমন হয় ?

অণিমা—তাতে কী হবে ?

ধরণী দত্ত—ভোলাবাবু এই মেয়েটাকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে আর সরিয়ে নিয়ে এসে, অন্য কোনও পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবেন।

অণিমা—কিন্তু এই বিয়েটা মিথ্যে হয়ে যাবে কেমন করে ?

ধরণী দত্ত—মন ভেঙে দিতে পারলেই হবে। বিয়ে মিথ্যে করে দেবার আইনও আছে।

অণিমা—তবু, ঠিক বুঝতে পারছি না।

জগু হঠাৎ এসে দাঁড়ায়। জগুর হাতে একটা চিঠি। জগু বলে—দিদি এই চিঠি নিয়ে যেতে বলছেন। নিয়ে যাব ?

মণীশের কাছে লেখা বাণীর একটা চিঠি। খামে বন্ধ চিঠি। বেশ ভারী চিঠি। নিশ্চয় অনেক কথা লিখেছে বাণী। অণিমা ব্যস্তভাবে বলেন—যা জগু, এখুনি যা।

ধরণী দত্ত—কী কথা লিখল বাণী, কিছু আন্দাজ করতে পার ?

অণিমা—যাই লিখে থাকুক, সেটা বাজে কথা নয় নিশ্চয়।

ধরণী দত্ত আর অণিমা এইবার উৎসুক হয়ে, ফটকের দিকে আরও এগিয়ে গিয়ে, বুড়ো সেগুনের ছায়াটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেগুনের আধমরা পাতাগুলো খস্‌খস্ শব্দ করে, আশাবরীর বাপ ও মা-র মনের ভিতরেও তেমনিই একটা আশার সাড়া খস্‌খস্ করে বাজতে থাকে। বাণীর এই চিঠি মণীশকে আবার বুঝিয়ে দিতে পারবে না, এবাড়ির কাছে তুমিই একমাত্র আপনজন ? তুমি আগে যা

ছিলে, আজও তাই আছ ?

ধরণী দত্ত বলেন—নিশ্চয় পারবে।

অণিমা বলেন—পারবে বোধ হয়।

দৌড়ে দৌড়ে নয়, বেশ আস্তে আস্তে হেঁটে, যেন একটু ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে জগু। হাতে বাণীর লেখা সেই চিঠি। বন্ধ খাম বন্ধ হয়েই আছে।

জগু হাঁপ ছাড়ে—দাদাবাবু চিঠি নিলেন না।

হাত বাড়িয়ে বুড়ো সেগুনের ধড়টা আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেন ধরণী দত্ত। টলছে পা দুটো। ক্লান্ত ধরণী দত্ত, হতাশ উদাস আর অবসন্ন ধরণী দত্ত।

অণিমা বলেন—ঘরে চলো।

দুপুরের আশাবরী একেবারে নীরব। বিকালের আশাবরীও একেবারে নীরব। কাক আর শালিক বার বার উড়ে এসে জানালার কাচ ঠুকরে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তবু কারও ঘুম ভাঙে না। সন্ধ্যার আশাবরীতেও আলো জ্বলে উঠল না। মাঝঘরের ভিতরে কোনও গল্পমুখর বৈঠকি হর্ষের সাড়াও জাগল না।

বারান্দার শেষপ্রান্তে অন্ধকারের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে আছে শুধু একটি নীরব ছায়াদেহ, আশাবরীর আপনজন, বিকাশ ঘোষ।

আলো জ্বালতে ভুলে গিয়েছে জগু, বিকাশ ঘোষকে চা দিতেও ভুলে গিয়েছে।

ঘরের ভিতরে আলো জলে উঠল যখন, ঠিক তখন কন্ট্রাক্টর ভাদুড়ী এসে ডাক দিলেন—আমি এসেছি স্যার !

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন ধরণী দত্ত আর অণিমা।

ভাদুড়ী—আমি একাই এলাম, স্যার। অযোধ্যাপ্রসাদ এল না।

ধরণী দত্ত—কেন ?

ভাদুড়ী—জিজ্ঞেস করবেন না, সে একটা অদ্ভুত অছিলার কথা।

ধরণী দত্ত—একটু স্পষ্ট করে কথা বলুন !

ভাদুড়ী—সবই ঠিক ছিল। অযোধ্যাপ্রসাদ আজ সকালে এসেছে, ধর্মশালার ঘরে বসে বাড়ি কেনবার টাকা গুণেছে, সবই দেখেছি। কিন্তু এখন ডাকতে গিয়ে দেখি, ধর্মশালার ঘরে খাটিয়ার ওপর গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রয়েছে লোকটা। বললে, এবাড়ি সে কিনবে না।

ধরণী দত্ত—বাড়ির অপরাধ ?

ভাদুড়ী—অযোধ্যাপ্রসাদ এই কিছুক্ষণ আগে একবার এদিকে এসে ঘুরে গিয়েছে। বাড়িটাকে দেখেছে। লোকটার ধারণা হয়েছে যে, এবাড়ির ওপর ভূতের ভর আছে।

ধরণী দত্ত—ননসেন্স !

ভাদুড়ী—কুসংস্কার। কিন্তু কী আর করা যায় বলুন ! অনেক বোঝালাম, তবু বুঝল না।

ধরণী দত্ত—তা হলে আপনাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

ভাদুড়ী—কিন্তু আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। একটু স্পষ্ট করেই বলি, আমার পাওনা এবার মিটিয়ে দিন, নইলে বাধ্য হয়ে আমাকে আদালতে যেতে হবে।

ধরণী দত্ত—যান তবে !

ভাদুড়ী—তবু আপনাকে অনুরোধ করছি, আর একবার ভেবে দেখুন !

ধরণী দত্ত—তা হলে আপনিই বাড়িটা কিনে নিন !

ভাদুড়ী—সেটা সম্ভব নয়।

ধরণী দত্ত—কিন্তু বাড়ি বিক্রি না হলে তো আপনার পাওনা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় ?

ভাদুড়ী—তা হলে আসি, নমস্কার !

মাঝঘরের ভিতরে আলো, বারান্দাতে সে আলোর ছোঁয়াচ একটু লেগেছে বলেই বারান্দার অন্ধকারটা তেমন কিছু কালো নয়। তাই বারান্দার এই প্রান্তের এক কোণে চেয়ারের উপর নীরব হয়ে বসে আছে যে বিকাশ ঘোষ, সে একটা আবছায়া। ধরণী দত্ত আর অণিমা বোধ হয় ভুলেই

গিয়েছেন যে, ওই আবছায়া হল এবাড়িব একজন আপনজন।

বিকাশ হঠাৎ বলে ওঠে—আমি বলছিলাম।

ধরণী দত্ত—কে ? কে তুমি ? ও, তুমি !

অণিমা—কী বলতে চাও ?

বিকাশ—আমি বলছিলাম, বাড়িটা এখন বিক্রি করে দিলে আপনাদের খুব অসুবিধে হবে।

ধরণী দত্ত—কেন ? কিসের অসুবিধে ?

বিকাশ—কোথায় থাকবেন আপনারা ?

ধরণী দত্ত—সে ব্যবস্থা তো তুমি করেই রেখেছ !

বিকাশ—আমাদের কোলিয়ারির নতুন বাংলোটার কথা বলছেন ?

ধরণী দত্ত—হ্যাঁ।

বিকাশ—ঠিকই, সে ব্যবস্থা একরকম ঠিকই ছিল। কিন্তু হঠাৎ বেঠিক হয়ে গেল। কথা হয়েছে, ডিরেক্টর কাপাডিয়া এখন আর কলকাতাতে থাকবেন না ; তিনি ওই বাংলোতে তাঁর কলকাতার অফিস তুলে নিয়ে আসবেন। তা ছাড়া...

অণিমা—তা ছাড়া, কী ?

বিকাশ—কোলিয়ারির এলাকার মধ্যে বা কাছে থাকা তো সুখের থাকা নয়। সব সময় পোড়া কয়লার ধোঁয়া আর গন্ধ। সব সময় ট্রাক আর ট্রলির ঘড় ঘড় শব্দ। মজদুরদের স্ট্রাইক, হল্লাহুল্লোড়, মাতালদের মারামারি লেগেই আছে। লতা-পাতা-ফুল, সবই গুঁড়ো কয়লার কালো ধুলোতে ঢাকা, বুঝতেই পারা যায় না, কোনটা জবা আর কোনটা কলকে ? এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে আপনাদের থাকা উচিত নয়। থাকলে শান্তি পাবেন না। ওরকম পরিবেশ আপনাদের রুচিতে বাধবে।

বারান্দার মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে বিকাশের কাছে এগিয়ে যান ধরণী দত্ত—একথাটা আগে বলনি কেন ?

বিকাশ—আগে বলিনি বলেই তো এখন বলছি। তা ছাড়া...

অণিমা—তা ছাড়া কী ? আর কী বলতে চাও তুমি ? অণিমা যেন ঝড়ের হাওয়ার একটা ঝাপটার মত বিকাশের কাছে এসে দাঁড়ায়।

বিকাশ—তা ছাড়া, আমার কাজটারও একটা বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। কাপাডিয়ার এক খুড়তুতো ভাইকে ম্যানেজার করা হবে বোধ হয়। আমিও তাই অন্যত্র কাজ পাওয়ার চেষ্টায় আছি। খুব সম্ভব ঝরিয়াতে, নইলে চিরিমিরিতে, খুব ভাল না হোক, অন্তত মাঝারি ভাল কোনও কোলিয়ারির ম্যানেজারের কাজ পেয়েই যাব।

ধরণী দত্ত পাইপটাকে কামড়ে কামড়ে কথা বলেন—আটশো কিংবা সাড়ে আটশো, এই তো ?

বিকাশ—প্রথম দিকে তা হয় তো হবে না।

অণিমা—তবে চারশো কিংবা পাঁচশো ?

বিকাশ হাসে—না, তার চেয়ে অবশ্য কিছু বেশি।

চেঁচিয়ে ওঠেন অণিমা—বাণী, এদিকে আয় !

বাণী আসে। শাড়ির আঁচলটা শক্ত করে কামড়ে ধরে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অণিমা বলেন—শোন, বিকাশ ঘোষ কী বলছেন ?

বিকাশ—আমার বর্তমান দু'একটা অসুবিধার কথা বলছি, বাণী।

ধরণী দত্ত—জিজ্ঞেস করি, অসুবিধের কথাটা আমাদের না জানিয়ে তুমি কলকাতাতে দৌড় দিলে কেন ?

অণিমা—কলকাতাতে গিয়েও সব কথার আগে এই সব অুসবিধের কথা আমাদের কাছে বলে নিলে না কেন ? কেন এত ব্যস্ত হয়ে সাত-তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেললে ?

বিকাশ—আমার তো মনেই হয়নি যে, এসব কথা আপনাদের আগে বলে নেবার কোনও দরকার আছে !

অণিমা—কেন মনে হয়নি ?

বিকাশ যেন হঠাৎ-লজ্জায় একটু অভিভূত হয়ে, গলার স্বরেও একটু বিনম্রতা ভরে দিয়ে, আর বেশ-একটু কুণ্ঠিত ভাবে কথা বলে—বাণী ওর চিঠিতে যেকথাটা অনেকবার লিখেছে, সেকথার মানে তো এই যে, আমার অবস্থার এসব খবর আপনাদের কাউকে আর বলবার দরকার হয় না।

জ্বলে ওঠে বাণীর গলার স্বর, কিন্তু শক্ত করে বাঁধা খোঁপাটা ঘাড়ের উপর নেতিয়ে পড়ে—কী অদ্ভুত এই ভদ্রলোক !

ধরণী দত্ত—খুব বাজে কথা।

অণিমা—বাণীর নামে কোনও বাজে কথা বলবে না, বিকাশ।

লাজুক বিকাশ আরও লজ্জিত হয়ে কথা বলে—না না, একটুও বাজে কথা নয়। বাণী আমাকে অনেকবার লিখেছে, বাণীর ভালবাসা শুধু আমাকে চায়। আমিই বাণীর স্বপ্ন। আমার টাকাপয়সা আর পদ-প্রতিষ্ঠা কী আছে বা না-আছে, সেটা বাণীর মনের কাছে কোনও প্রশ্নই নয়।

আশাবরীর বাপ মা ও মেয়ে, তিনজন একই ভঙ্গিতে বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে ছটফট করে। তিন ছায়া জড়াজড়ি করে, যেন একটা সিংহ-সিংহ ছায়া হয়ে সামনের রক্তহীন খরগোশটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে, কিন্তু পারছে না। বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছে না কেউ-ই, এই বিকাশ ঘোষ সত্যি একটা বিনয়ী সরলপ্রাণ অভিশাপ, না খুব চতুর একটা বুদ্ধিমান অভিশাপ ?

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, তিন ছায়ার ছটফটে চেহারা শেষে নিথর হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। নড়ে না, সরেও যায় না।

রাতের জগেশপুরের হাওয়াটা কিন্তু একটুও নিথর নয়। উড়ছে ফুরফুরে হাওয়া, ঝিরঝির করে শব্দ করছে শাল শিরীষ আর সেগুনের পাতা।

হরধামের খোলা দরজার সামনে চাতালের উপর দাঁড়িয়ে, আর, আশাবরীর বারান্দার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন দৈব-বাতিক ডিগডিগে হিরুদা ; গায়ে সিল্কের চাদর, হাতে চন্দনকাঠের ছড়ি। ভোলাবাবু বাধা দিয়ে বলেন—না না, এখন আর হাসতে নেই, হিরু।

হিরুদা—কিন্তু সে দৃশ্যটা দেখে আপনি তো খুব হেসেছিলেন।

ভোলাবাবু—কোন দৃশ্য ?

হিরুদা—নেয়ামত মিঞার ঘরের চালার ওপর বসে হতাশ হনুমানটা ন্যাকড়ার হনুমান-বাচ্চাকে খিম্‌চে ধরছে, খোঁচা দিচ্ছে আর দেখছে।

ভোলাবাবু—না না, বিশ্বাস করো হিরু, আমি হাসিনি। সেটাও তো একটা দুঃখের দৃশ্য !

এসো পথিক

আজ এই মানুষটিকে দেখে কেউ কি বিশ্বাস করতে পারবে যে, ইনিই এককালে আট ক্রোশ পথ একটানা হেঁটে পার করে দিতে পারতেন ? বললেও কি কেউ বিশ্বাস করবে যে, ইনিই একদিন রাগ করে রেল-লাইনের একটা লেভেল ক্রসিং-এর তালাবন্ধ বেড়া-গেট এক লাথিতে ভেঙে খুলে দিয়েছিলেন। গেট বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল গেটম্যান ; এদিকে আষাঢ় মাসের ঝিঁঝিঁডাকা সন্ধ্যাটাও ঘনিয়ে উঠেছিল। দুটো গরুর গাড়িতে বসে বর ও বরযাত্রী আট-দশটি মানুষ ছটফট করছিল। এখনও যদি গেট না খোলে, যদি ক্রসিং পার হয়ে ওদিকের পথে উঠতে না পারা যায়, তবে শীতলদীঘির নন্দীবাড়িতে ওরা পৌঁছবে কখন ? মাঝ রাতে ? না শেষ রাতে ? কিন্তু বিয়ের শেষ লগ্ন যে রাত ন'টার মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। আর, এই একুশে আষাঢ়ই তো এই মাসের মধ্যে শুভবিবাহের শেষ দিন।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ ছটফট করেনি বর ও বরযাত্রীর দল। দুই গরুর গাড়িকেও আর বেশিক্ষণ হতাশ হয়ে থমকে থাকতে হয়নি। হঠাৎ চমকে উঠেছিল আর খুশির চোখে হেসেও ফেলেছিল বর ও বরযাত্রীর দল। কে এক ভদ্রলোক, বছর ত্রিশ বয়স হবে, সাইকেল থেকে নামলেন। বন্ধ গেটের দিকে কটমট করে তাকালেন। তারপর গেটের গায়ে একটা লাথি মারলেন। তালাটা খুলে গিয়ে পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেল ! সেই গেট পার হয়ে, আবার ওদিকের গেটের কাছে গিয়ে ঠিক এইরকমই একটা কাণ্ড করলেন সেই ভদ্রলোক, গেটের গায়ে নিদারুণ এক পদাঘাত। ঝিঁঝিঁডাকা আষাঢ়-সন্ধ্যার অন্ধকার আরও বেশি ঘনিয়ে ওঠবার আগেই তরতর করে খোলা গেট পার হয়ে চলে গেল দুই গরুর গাড়ি, আর বরযাত্রীর খুশির হল্লা। তখন নয়, সেদিনও নয়, অনেকদিন পরে জানতে পেরেছিল শিমুলডাঙ্গার বর ও বরযাত্রীর দল, আর শীতলদীঘির নন্দীবাড়ি, ওই ভদ্রলোকের নাম লোকনাথ রায়, রায়গঞ্জ হাই স্কুলের মাস্টার। কিন্তু ভদ্রলোকের পা দুটো কি লোহার পা ?

সেই লোকনাথ রায়, সেদিন যাঁর বয়স ছিল তিরিশ, আজ তিনি পঞ্চান্ন বছর বয়সের একটি অনড় ও অক্ষম দেহ। দুই পায়ে বাত, একটি পঙ্গু মানুষ। মালিশের তেল খেয়ে খেয়ে পা দুটো যেমন চকচকে, তেমনিই কালো হয়ে গিয়েছে।

লোকনাথ রায়ের জীবনে আজ আর সেই রায়গঞ্জ নেই, সেই মাস্টারিও নেই। পঁচিশ বছর আগের সেই জীবনের ঠিকানা যেন ক্ষয়ে মুছে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রায়গঞ্জ, রায়গঞ্জের সেই বাড়ি, রায়গঞ্জের ধানক্ষেত আর কেশে ঘাসের সেই জংলা মাঠ, তাঁর কাছে একটা স্মৃতি মাত্র, একটা পুরনো স্বপ্নের ছায়াও বলা যায়।

কলকাতার ভবানীপুরের গলিতে ছোট একটি দোতলা বাড়ি। সাত নম্বর হরি দত্ত লেন। নীচে দুটো, উপরে একটি ঘর। উপরে সেই ঘরের কোণে একটা খাটের উপর শুয়ে পড়ে থাকা এই জীবন যে একটা আধা-কবর, কিংবা জীবন্ত সমাধির মত একটা জীবন, সেটা খুবই বোঝেন লোকনাথ রায়। কারণ, বুঝিয়ে দেবার মত একটা প্রাণের নিঃশ্বাস এখনও তাঁর এই জিরজিরে বুকের ভিতরে ছটফট করে। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকবার পর বুকের ভিতরে সেই নিঃশ্বাস যখন একটু বেশি ছটফট করে, তখন হাতের উপর ভর দিয়ে ও কোমরটাকে শক্ত করে থিতিয়ে দিয়ে শরীরের ওপর অর্ধেকটাকে

কোনওমতে খাড়া করে খাটেরই উপর বসিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন, মাঝে মাঝে বসিয়ে রাখতে পারেনও। তারপর হাত দিয়ে পা দুটো টিপে টিপে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করেন।

কী ছাই আর বুঝবেন। শুধু মনে পড়ে যায়, এই তো সেই দুটি পা। রায়গঞ্জ থেকে সদরের কাছারিতে বেলা দশটার সময় পৌঁছতে হলে সূর্য ওঠবার আগে শেষরাতে রওনা হওয়া উচিত। লোকনাথ রায় কিন্তু সূর্য ওঠবার পর, জবাকুসুম সঙ্কাশ ক'রে স্নান সেরে নিয়ে, পাঁচটি পাকা কলা দিয়ে দুধ-মুড়ি খেয়ে নিয়ে তারপর রওনা হতেন।

পথে যেতে বুড়ো বুড়ো কত বটের ছায়া পাওয়া যেত। কিন্তু কোনও ছায়াতে এক মিনিটের জন্যও জিরোতেন না লোকনাথ রায়, জিরোবার কোনও দরকার আছে বলে বোধ করতেন না। কারণ, সেই দুই পায়ে কোনও ক্লান্তি কিংবা অবসাদ ছিল না। মরা নদীটার কাছে পৌঁছতেই দেখতে পাওয়া যেত, শিবমন্দিরের সামনের চাতালের উপর শুয়ে পড়ে আর গা এলিয়ে দিয়ে পথহাঁটা ক্লান্তির আরাম সেরে নিচ্ছে হাটে যাবার হাটুরে মানুষগুলিও ; চোখে পড়তেই হেসে ফেলতেন লোকনাথ রায়, আর ডাক দিয়ে বলতেন, কী ব্যাপার হে কৈলাসচন্দ্র, এক ক্রোশ পথ হেঁটেই পা ধরে গেল নাকি ?

সেই কৈলাস আজ এখন কোথায় ? সে কি এখন সেই শিবমন্দিরের চাতালের উপর গা এলিয়ে দিয়ে দুই পা দুলিয়ে দুলিয়ে পথচলা ক্লান্তির আরাম সেরে নিচ্ছে ? শিবমন্দিরটাও কি আছে ? বুনো কাঁটালতায় মন্দিরের সারা গা ছেয়ে গিয়েছিল, আর মস্তবড় ফাটলের ভিতরে শুকনো ঘাস-পাতা দিয়ে বাসা বেঁধেছিল দুটো বড় বড় পাখি। লোকে বলত, ওরা ধনঞ্জয় পাখি। ওদের মধ্যে পুরুষ পাখিটা একেবারেই অন্ধ, সেটা বাসাতেই থাকে। শুধু মাদি পাখিটা উড়ে উড়ে বাইরে যায় আর আসে।

দুই হাতে কিছুক্ষণ দুই পা টিপে নেবার পর, আর ছোট জানালা দিয়ে পাশের পড়ো বাড়িটার আঙিনাতে জংলা সূর্যমুখীর ঝোপের উপর নতুন ফড়িং-এর ফূর্তির খেলা দেখতে দেখতে পঙ্গু লোকনাথ রায়ের দুই চোখ যখন অদ্ভুত হয়ে চক চক করে ওঠে, তখন একবার ভিতরের দরজার দিকে তাকান। শিবমন্দিরেব গায়ের ফাটলের বাসিন্দা সেই পুরুষ পাখিটা, সেই অন্ধ ধনঞ্জয়টা চোখে দেখতে পেত না। কিন্তু লোকনাথ রায়ের চোখে তো এখনও দৃষ্টি আছে। জীবন্ত দৃষ্টি। সেই চোখে দেখবার আশাটাও তো জীবন্ত। তাই আশা করেন, তাই দরজার দিকে মাঝে মাঝে তাকাতেও ইচ্ছা করেন। আর মনে হয়, হ্যাঁ, এইবার বোধ হয় নীরজা আসবে। কোনও কাজ না থাকুক, দরকার না থাকুক, তবু এঘরে একবার আসবার কথা কি ভুলেই যাবে নীরজা ?

ঘুম ভেঙেছে ভোর পাঁচটায় ; তারপর পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে লোকনাথ রায়ের এই পঙ্গু শরীরটা যে কাণ্ড করেছে, সে কাণ্ড চোখে দেখতে পেলে দেহতত্ত্বের বড় ডাক্তার চমকে উঠবেন, আর কসরতের পাকা মানুষেরও দুই চোখ কুঁচকিয়ে করুণ হয়ে যাবে। খাটের পাশের দেয়ালের গায়ে লোহার গজালের সঙ্গে বাঁধা একটা দড়ি ছাদের ওইদিকের একটা ছোট্ট ঘরের ভাঙা দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পায়ের জোর তো প্রায় মিথ্যে হয়েই গিয়েছে, কিন্তু হাতের জোর আছে। রামদয়ালবাবু বলেন—লোকনাথের হাত দুটো কিন্তু এখনও লোহার হাত। প্রায় ঝুলে ঝুলে, হাতেরই জোরে পঙ্গু শরীরটাকে গড়িয়ে সরিয়ে ও টেনে-টেনে ছাদের ওই জায়গাটাতে ওই ঘরের ভিতরে নিয়ে যেতে পারেন লোকনাথ রায়। তারপর ফিরে এসে যদি দেখতে পান যে, ঘরের ভিতরে ও দরজার কাছেই রাখা বালতিটাতে জল আছে ; তার মানে, বুড়ি ঝি সময়মত মনে করে আর কষ্ট করে জল রেখে দিয়ে গিয়েছে, তবে ঘটি দিয়ে সেই জল মাথাতে ও গায়ে ঢালেন। আকাশে সূর্য না থাকুক, তবু বিড় বিড় করে জবাকুসুম সঙ্কাশ করেন। আর ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড়ও পরেন। কারণ, হাতে জোর আছে।

কে রেখে দিয়ে গিয়েছে এই জল ? নীরজা ? না ; নীরজা নয়। নীরজা যদি এঘরে জল রেখে দিয়ে যেত, তবে তো বুঝতেই পারতেন লোকনাথ। নীরজার হাতের চুড়ির শব্দটা টুং টাং করে বুঝিয়ে দিত, আর কেউ নয় ; সেই নীরজা এসেছে। যন্ত্রণাটা যত দুঃসহ হোক না কেন, চোখ দুটো বন্ধ হয়ে থাকলেই বা কি ? আর ঘরে আলো না থাকলেও কিবা আসে যায় ? নীরজার চুড়ির শব্দ শুনতে পাবে না লোকনাথ, এমন ব্যাপার হতেই পারে না। কিন্তু না, নীরজা আসে না। বুড়ি ঝি,

যার নাম রাজুর মা, সে-ই জল রেখে যায়। ভাতের থালাও পৌঁছে দিয়ে যায় রাজুর মা।

আজ থেকে দশ বছর আগে, যেদিন রায়গঞ্জ ছেড়ে কলকাতার ভবানীপুরের এই বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়ে ছিলেন লোকনাথ রায়, সেই দিন এরা সবাই তো, বলতে গেলে, নিতান্ত ছেলেমানুষ আর শিশু ছিল। বড় ছেলে সুকুর বয়স তখন পনেরো বছর, বড় মেয়ে টুনির তেরো বছর, আর ছোট মেয়ে টুসির এগারো।

রায়গঞ্জ হাই স্কুলের মাস্টারি, জীবনটা খুব সুখের না হলেও কম আনন্দের জীবন ছিল না। মাস্টারির মাইনের পঞ্চাশটা টাকা খুব বড় সম্বল নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু সেজন্য খুব দুশ্চিন্তা করবার তেমন কোনও ভয় ছিল না। বাড়িটা তো নিজেরই বাড়ি। তিন পুরুষ বাস করেছে যে বাড়িতে সেই বাড়ির ঠাকুর ঘরের ভিতের গায়ে সাদা পাথরের ফলকে কালো অক্ষরে তিন পুরুষ আগের শ্রীরঘুনাথ রায় দাসস্য একটি আশার নিবেদনও সংস্কৃত ভাষার শ্লোকে লেখা আছে, যার অর্থ : পণ্ডিতেরা বলেন লক্ষ্মী চঞ্চলা ; কিন্তু নারায়ণের ইচ্ছায় এই গৃহে লক্ষ্মী অচলা হয়ে বিরাজ করবেন।

বাড়িটা খুব বড় নয় ; কিন্তু বাগানটা আর পুকুরটা বেশ বড়। কলকাতার পাইকার এসে সেই বাগানের জামরুল আর বাতাবি লেবু গো-গাড়িতে বোঝাই করে দেবীনগরে রেল স্টেশনে নিয়ে যেত আর কলকাতায় চালান দিত। ওই নন্দীগ্রামের জমিদার বাড়ির এক বিয়েতে কাজের জন্য লোকনাথ রায়ের সেই পুকুর থেকে একবার একুশটি আধমনী চিতল তোলা হয়েছিল। কাজেই সেই লোকনাথ রায় যখন জগদ্ধাত্রী পূজোতে অনেক ঘটা করতেন, আর গাঁয়ের সব মানুষকে কাঁচা-পাকা দুরকমের প্রসাদ পেট ভরে খাওয়াতেন, তখন তাঁকে টাকা ধার করতে হত না। ধানজমির আয় ; আর ওই বাগান ও পুকুরের আয়ের টাকায় জগদ্ধাত্রী পূজোর ঘটা খুব ভাল করেই কেটে যেত।

হ্যাঁ, সেসব দিনের ছবি যেন কুয়াশার সঙ্গে উবে যাওয়া একটা জীবনের ছবি। দশ বছর আগে যেদিন নিজেই শখ করে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে ঘরে ফিরলেন লোকনাথ স্যার, সেদিন হঠাৎ বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কোমরে যেন অদ্ভুত রকমের একটা ব্যথা সিরসির করে কাঁপছে। একদিন দু'দিন তারপর তিন মাসের মধ্যেও যখন ব্যথাটা একটুও সারল না, বরং আরও কনকনে হয়ে কষ্ট দিতে শুরু করল, তখন ওই নীরজাই খুব রাগ করে একদিন ঝগড়া করেছিল—না, তোমার আপত্তির কোনও কথা আর শুনব না।

হেসেছিলেন লোকনাথ রায়—কোনও আপত্তি করছি না। তবু আর একটা-দুটো মাস একটু ধৈর্য ধরে...।

নীরজা—না ; যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে।

তার মানে, কলকাতায় যেতে হবে। কলকাতায় গিয়ে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। নিতাই কবরেজের ওই ছাই পাঁচন আর বেশি খেলে, আর ওই কালো ঘি আর বেশি মাখলে পঙ্গু হয়ে যেতে হবে। যাদবপুরের সুধাদি বার বার অনেক চিঠিতে বেশ কড়া করে অনেক কথা লিখেছেন। কলকাতায় এসে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করালে এক মাসের মধ্যেই ওই রোগ একেবারে সেরে যাবে। কিন্তু দুটো পয়সার মায়া করে যদি তোমরা গাঁয়ের কবরেজি খপ্পরে পড়ে থাকতে চাও, তবে তাই করো। আমি আর তোমাদের ভালর জন্যে চিন্তা করতে পারব না।

রায়গঞ্জ থেকে চলে আসবার দিন নিতাই কবরেজও দেখা করতে এসেছিল। কেঁদে ফেলেছিল নিতাই কবিরাজ। আজও নিতাই কবিরাজের মুখের সেই চেহারাটা লোকনাথ রায়ের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নিতাই কবিরাজের আদুড় গায়ের উপর একটা ময়লা উড়ুনি ; সেই উড়ুনির খুঁট দিয়ে চোখ মুছছে নিতাই কবিরাজ—আমি আবারও বলছি, কলকাতায় যাবেন না রায় মশাই। আমি আবার বলছি, আর বড় জোর তিনটে চারটে মাস লাগবে, আমার ওষুধেই আপনার কোমর-ব্যথা চিরকালের মত সেরে যাবে।

কলকাতায় এসে থাকবার ও চিকিৎসা করবার জন্য কিছু টাকা চাই। ত্রিশ বিঘে ধানজমি বেচে দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় করা হয়েও গেল। কিন্তু তখন কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন লোকনাথ যে, সব ধান জমি বেচে দেবার দরকার হবে? পারেননি। সব ধানজমি বিকিয়ে যাবার পরও কি সামান্য একটু সন্দেহ করতে পেরেছিলেন যে, পুকুর আর বাগানটাকেও বেচে দিতে হবে?

পাবেননি। ভবানীপুরের সেই বাসাবাড়িতে একটানা দশটা বছর পার হয়ে যাবার পর একদিন ভয়ানক কর্কশস্বরের একটা ধমকের ভাষা চিৎকার করে বুঝিয়ে দিল এই রোগটা ঠিক পায়ের বাত ব্যথার রোগ নয়, এটা তাঁর ভাগ্যেরই একটা ক্ষয় রোগ। সাত মাসের বাড়িভাড়া বাকি, তাই বাড়িওয়ালা চৌধুরীবাবুর দারোয়ান এসে চিৎকার করছে—হয় এখনি বকেয়া ভাড়ার সব টাকা মিটিয়ে দাও, নয় এখনই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।

সেদিন মনে মনে একটা হিসাবও করেছিলেন লোকনাথ। কলকাতার এই দশ বছরের জীবনটাকে পুষতে গিয়ে মোট ছাপ্পান্ন হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে শুধু এক তারক ডাক্তারকেই প্রায় সাতটি হাজার টাকা দিতে হয়েছে। খুব ভাল ও খুব নাম করা ডাক্তার তারক সেন, নীরজার ওই সুধাদির কেমন যেন দেবর হয়। আর, সুধাদির দেবর বলেই, কুটুম্বিতার একটা সম্পর্ক আছে বলেই, তা ছাড়া সুধাদি একটু বলে দিয়েছিলেন বলেই, তারক ডাক্তার নাকি তাঁর প্রাপ্য ফি-এর মাত্র অর্ধেকটুকু নিয়েছেন।

আরও একটা হিসাব করেছিলেন লোকনাথ। রাগয়ঞ্জে থাকতে তিন বছরে নিতাই কবিরাজের পাঁচন কিনতে খরচ পড়েছিল একুশ টাকা। ঠিক কথা, কোমরের কনকনে ব্যথাটা সারাতে পারেনি নিতাই কবিরাজের সেই একুশ টাকার পাঁচন; কিন্তু তবু তো সেদিন এই দুই পায়েরই জোরে পথ হেঁটেছিলেন লোকনাথ। স্টেশন যাবার পথে শিবমন্দির পর্যন্ত হেঁটেই চলেছিলেন, তারপর গো-গাড়িতে উঠেছিলেন। আজ কোথায় গেল সেই পাঁচন খাওয়া শরীরের দুটি খোঁড়া পায়ের সেই জোর? দেখলে আজ নিতাই কবিরাজ বোধ হয় ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলবে, এ কী হল রায় মশাই? আপনার পা দুটো যে শুকিয়ে সরু লাঠির মত হয়ে গিয়েছে।

সুধাদি বলেন, গাঁয়ের কবরেজ আপনাকে কবেই মেরে ফেলত রায় মশাই। আজও যে আপনি বেঁচে আছেন, সেটা আমাদের তারক ডাক্তারের চিকিৎসার দয়া বলে জানবেন।

—হতে পারে। বলতে গিয়ে সুধাদির সামনে সেদিন যেমন হেসেছিলেন লোকনাথ, তেমনই আরও অনেকবার হেসেছেন, যখনই মনে পড়েছে, তখনই।

কিন্তু তারপরে? চৌধুরীবাবুর দারোয়ানের ধমক স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে, আর কলকাতায় থাকা চলবে না। থাকতে হলে আরও টাকা চাই। কোথা থেকে আসবে টাকা? এখন তো সেই রায়গঞ্জে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বাড়িটা অবশ্য এখনও আছে; কিন্তু সেই বাড়ির অন্তঃসারহীন শূন্যতার মধ্যে বেঁচে থাকার অনেক অসুবিধেও আছে। তবু চৌধুরীবাবুর দারোয়ানের তো সেখানে গিয়ে ধমক দেবার আর চিৎকার করবার ক্ষমতা নেই।

হঠাৎ সুধাদি এসে, আর সত্যিই যেন চিৎকার করে হেসে উঠলেন—ওরে নীরু, তোদের রায়গঞ্জের বাড়িটার ভিতের গায়ে সংস্কৃত ভাষায় কী যেন লেখা আছে? লক্ষ্মী নাকি সে বাড়িতে চিরকাল অচলা হয়ে বাস করবেন?

নীরজা হাসে—হ্যাঁ, বড়দি। সত্যি তাই লেখা আছে।

সুধাদি আরও হাসেন—কী চমৎকার সত্যি কথাই না লেখা আছে। যাক সেসব কথা, এখন আসল কথা হল, বাড়িটাকে শিগগির বেচে দেবার ব্যবস্থা কর।

নীরজা—আমি তো তাই ভাবছি।

লোকনাথের দুই চোখে যেন একটা জ্বলজ্বলে আভা দপ্ করে চমকে ওঠে। প্রদীপে তেল নেই, পলতেও পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু যেন একটা জ্বালা জ্বলছে, সেই রকম বাতির মত চোখ। লোকনাথ বলেন—না, তা নয় না। কখ্খনও না।

সুধাদি—কেন?

লোকনাথ—আমি জানি, আমাকে দেশের বাড়িতে ফিরে যেতেই হবে।

সুধাদি হাসেন—আপনি তা হলে স্বপ্নই দেখছেন।

হাসতে হাসতে চলে গেলেন সুধাদি।

॥ ২ ॥

ঠাট্টা করে কথাটা বলেছেন সুধাদি, কথাটা যেন ধারালো ছুরির মত লোকনাথের বুকের ভিতরে একটা খোঁচাও দিয়েছে। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে, আমি স্বপ্ন দেখছি না, সুধাদি।

রায়গঞ্জের রামদয়ালবাবুকে কবেই চিঠি দিয়ে জানিয়ে রেখেছেন, হ্যাঁ, বাড়ির নীচের তলার বারান্দা আর তিনটে ঘর জেলা বোর্ডের প্রাইমারি স্কুলের জন্য ভাড়া দিতে পারি। আর, পুবদিকের দালানে যদি আলুর হিমঘর করবার জন্য দাসবাবু ভাড়া নিতে চান তবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আর কোনও ঘর নয়। আমি শিগগির দেশে ফিরব।

হ্যাঁ, রায়গঞ্জের সেই মরা নদী, বোশেখ মাসে যার পাঁক শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়, আর আষাঢ়ের প্রথম জলের ঢল গড়িয়ে যেতেই যার উপর ডিঙি ভাসিয়ে মালোপাড়ার ছেলের দল কাছিম শিকার করে বেড়ায়, তারই ভাঙা ঘাটের চাতালের উপর বসে আজও কি গান গায় না শীতলদীঘির বিশু বৈরাগী? উপরতলার দক্ষিণদিকের ঘরের জানালার কাছে রাতের বেলায় দাঁড়ালে আর মাঠের দিকে তাকালে সেই ভোলা ভাগ্নের মত দুঃসাহসী ছেলের গা'ও ছমছম করত; মাঠের উপর আলেয়া দৌড়চ্ছে। রামদয়ালবাবুর বাড়ির বকুলবাগান নিশ্চয় এখনও আছে; সেই বকুলের বাতাস মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে একেবারে হর্ষনগর পর্যন্ত চলে যায়। রাজেশ্বর ঘোষের পুকুরকিনারার সেই জবাগাছ, বারোমাস যার গায়ে শুধু পাতা ধরে আর ঝরে, তার একটি ডালে শুধু একটি ফুল ফুটবে ঠিক সেদিন, যেদিন শ্যামাপূজা। সেই বছর একবার যে রাতে হৃদয় সরকারের বাড়িতে অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তন চলছিল, ফাল্গুন পূর্ণিমার সেই রাতে স্কুলবাড়ির খেলার মাঠের পাশে সেই কদম গাছের কাছে কী দেখেছিলেন রতনমণির মা? চুপটি করে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, তার গলায় বনফুলের মালা। কিন্তু শুধু একটি মুহূর্ত মাত্র, আর তাকে দেখা গেল না। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

বুঝতে পারেন, লোকনাথ, একা তিনি ছাড়া এ বাড়ির আর কেউ দেশে ফিরে যেতে রাজি নয়। ভবানীপুরের এই বাসাবাড়ির জীবনটারও স্বপ্ন আছে, আর সে যে কী চমৎকার একটি রঙিন স্বপ্ন, তা'ও জানেন লোকনাথ। ধানজমি-বেচা, পুকুর-বেচা আর বাগানবেচা ছাপ্পান্ন হাজার টাকার মাত্র সাত হাজার টাকা তারক ডাক্তারের চিকিৎসার দয়া কিনতে খরচ হয়েছে, কিন্তু বাকি উনপঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে, এই দশ বছর ধরে সত্যিই একটা স্বপ্ন কেনবার চেষ্টা হয়েছে। সুখে থাকবার স্বপ্ন। কলকাতার জীবনের যত চমৎকার ব্যস্ততার সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে আর রঙিন হয়ে থাকবার স্বপ্ন। সাজে আর আসবাবে এই বাসাবাড়ির একটা ঘর যেন সুধাদি'র যাদবপুরের বাড়ির নীচতলার ছোট ঘরটার একেবারে ট্রু-কপি। সোফাতে ঠিক সেইরকম চকচকে কালো পালিশ আর লাল ভেলভেটের গদি। জানালাতে লেসের পর্দার রঙও ঠিক তেমনই আসমানি নীল। এবাড়ির ঘরে যে রেডিও বাজে, তার গড়ন আর চেহারাও ঠিক সুধাদির বাড়ির জাপানি রেডিওটার মত, যেন ছোট্ট একটি খেলনা জাহাজ নীল সাগরের জলের উপর ভেসে রয়েছে। খাঁটি বর্মা সেগুনের একটা আলমারি এবাড়ির এই ঘরেও আছে। সুধাদি বলেছিলেন, তিনি ওই আলমারি পার্ক স্ট্রিটের যে দোকান থেকে কিনেছিলেন, তার নাম নিউ মডার্ন ফার্নিশার্স; নীরজাও একদিন সেই নিউ মডার্ন ফার্নিশার্সের দোকানে গিয়ে আর বেছে-বেছে ঠিক ওই রকমের এই আলমারি কিনেছিলেন। ছেলে আর দুই মেয়েও নীরজার সঙ্গে গিয়েছিল। এই আলমারিতে যে সব খেলনা আর পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সে সব সুধাদির বাড়ির ওই আলমারির পুতুল আর খেলনাগুলির মত। রঙিন ঝিনুক দিয়ে তৈরি একজোড়া ফুলদান, কাশ্মীরের আখরোট কাঠের পাখি, স্পঞ্জের কুকুরছানা, সাদা পাথরের হাত-কাটা ভেনাস আর প্লাস্টিকের আঙুর-থোকা। সুধাদির বাড়ির ড্রেসিং টেবিলের মত এবাড়ির এই ঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার বর্ডারিও পল-তোলা।

এই দশ বছরের মধ্যে রায়গঞ্জের কোনও আলো-বাতাসের ছোঁয়া অবশ্য লোকনাথের এই জীবনের গায়ে লাগেনি, কিন্তু রায়গঞ্জের রামদয়ালবাবুর সঙ্গে অনেকবার কথা বলবার সুযোগ হয়েছে। রামদয়ালবাবু তাঁর কারবারের দরকারে মাঝে-মাঝে যখন কলকাতায় আসেন, তখন পুরনো বন্ধু লোকনাথের সঙ্গে একবার দেখা করে যান। যেদিন আসেন রামদয়াল সেদিন লোকনাথের প্রাণে

যেন রায়গঞ্জের আলো-বাতাসের উৎসব মেতে ওঠে। কত গল্প, কত হাসি, পুরনো ঘটনার কথা নিয়ে কত তর্ক আর মন কষাকষি। রামদয়াল বলেন, না তুমি খুব ভুল বুঝেছ লোকনাথ, আসল দোষ গগন সামন্তের নয়, ওর দ্বিতীয় পক্ষের মানুষটির। লোকনাথ বলেন, আমি জোর করে বলতে পারি, আর একশোবার বলব, গগন সামন্ত মিথ্যে সন্দেহের বাতিকে বউটার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল বলেই...। রামদয়াল চেঁচিয়ে ওঠেন—ভুল ভুল, তুমি বুঝতে খুব ভুল করেছ।

রায়গঞ্জের জীবনের প্রায় কুড়ি বছর আগের একটি জীর্ণ-পুরাতন ঘটনার কথা, কিন্তু দুই বন্ধুর বাদ-প্রতিবাদের শব্দ শুনে মনে হবে, যেন আজই এই কিছুক্ষণ আগে গগন সামন্তের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ি চলে গেল। গগন সামন্তের উপর লোকনাথের মনের সব রাগ বিরক্তি আর তিক্ততা যেন টাটকা ক্ষতের জ্বালার মত কটকট করে জ্বলে উঠেছে।

রামদয়াল বলেন—কিন্তু তুমি দেশে ফিরছ কবে ?

লোকনাথ—এই এবার ; আর তো এখানে পড়ে থাকবার কোনও মানে হয় না। কোনও দরকারও নেই।

রামদয়াল—হ্যাঁ, যে জন্যে এখানে আসা, সেটাই যখন একটা...।

লোকনাথ—কী ?

রামদয়াল—একটা প্রবঞ্চনা হয়ে গেল ; তখন আর এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না।

লোকনাথ—ঠিকই বলেছ রাম , আজ বুঝতে পারছি, সেদিন নিতাই কেন কেঁদেছিল।

রামদয়াল—সে প্রবঞ্চনা তো আছেই, কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রবঞ্চনা বোধ হয় তোমার এই...। হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে রামদয়াল বলেন—ওই ঘরে এখন এত জোরে রেডিও বাজাচ্ছে কারা ?

লোকনাথ হাসেন—যারা বাজায় তারাই বাজাচ্ছে। ওরা আছে ওদের স্বপ্ন নিয়ে।

রামদয়াল—তোমার জমিবেচা বাগানবেচা আর পুকুরবেচা টাকার সবই কি তা হলে...।

লোকনাথ—না সব নয়। বেশির ভাগ, ওদের ওই স্বপ্নের দরকারে খরচ হয়েছে।

রামদয়াল এইবার ভ্রূকুটি করে কথা বলেন—খুবই অদ্ভুত কাণ্ড বলতে হবে। এরকমটি কখনও দেখিনি। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না যে, এরকমটি কখনও হতে পারে। আমার সন্দেহ হয় লোকনাথ, তুমি যদি আরও দু'এক বছর চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় থাক, তবে তোমার এই বাড়ির ওই ঘরে হয়ত একটা টেলিভিশন সেট এসে পড়বে।

লোকনাথ—অন্তত একটা রেফ্রিজারেটর যে আসবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রায়ই শুনছি, ওরা বলাবলি করছে, আর যাদবপুরের সুধাদিও এসে অভিযোগ করছেন, একটা রেফ্রিজারেটর না হলে আর মানায় না। যাই হোক, আমি কিন্তু তৈরি হয়েই আছি রামদয়াল। আর এখানে নয়। এবার সন্ধ্যাবেলা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব !

প্রবঞ্চনার চেহারা দেখে ভয় পেয়েছেন লোকনাথ। সুধাদির গাড়ির হর্নের শব্দ শুনলেই তাঁর বুকটাও ভয় পেয়ে দুরদুর কর। তারক ডাক্তারের নাম শুনলেই চোখের তারা দুটো যেন সাদা হয়ে যায়। কিন্তু তবু এই দশ বছরের মধ্যে দশবার প্রতিজ্ঞা করেও শেষ পর্যন্ত রায়গঞ্জের আলো-বাতাসের কাছে চলে যেতে পারেননি লোকনাথ। কারণ, ওই একটি বাধা। নীরজার দুই চোখের অদ্ভুত সেই ছলছল সজলতা। নীরজার সেই চোখের জল বড় বড় ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে না ; চোখের কোণে লেগেই থাকে আর চিকচিক করে। মনে হয়, নীরজার বুকের ভিতরে একটা স্তব্ধ দীর্ঘশ্বাস যেন পাথর হয়ে আটকে রয়েছে ; তাই কোনও কথা বলতে পারে না নীরজা ; শুধু লোকনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকেন লোকনাথ, যেন তাঁর প্রতিজ্ঞার সব কঠোরতা এক মুহূর্তে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেল। নীরজাকে অসুখী করে, নীরজার দুই চোখ জলে ভরিয়ে দিয়ে রায়গঞ্জে ফিরে গেলেই বা কী হবে ? লোকনাথ কী সুখী হতে পারবেন ? অসম্ভব।

কিন্তু মাঝরাতে আবার ঘুম ভেঙে যায়। যেন হঠাৎ একটা ঢিল কোথা থেকে ছুটে এসে আচমকা তাঁর বুকের পাঁজরের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছে। স্বপ্নের মধ্যে রামদয়ালবাবুর সঙ্গে তর্কাতর্কি

করেছেন লোকনাথ ; তাই ঘুম ভেঙে গিয়েছে। রামদয়াল বলছেন, তুমি এত জোরগলায় আমাকে যে কথাটা শুনিয়ে দিয়েছিলে, সে কথা তবে নিতান্ত একটা কথার কথা।

—কী বলেছি তোমাকে ?

—বলেছ, যদি রাধানাথের ভোগের একবাটি খিচুড়ি রোজ জুটে যায়, তবে তোমার বাকি জীবনটা সুখেই কেটে যাবে। তোমার কাছে নাকি রাধানাথের প্রসাদের চেয়ে বড় সুখ কিছু নেই।

—হ্যাঁ, তা তো বলেছি।

—ঠিক বিশ্বাস করে বলেছ কি ?

—নিশ্চয়, ওই বিশ্বাসটুকু ছাড়া আমার জীবনে এখন তো আর কোনও সম্বলও নেই। ওই বিশ্বাসের জোরেই তো বেঁচে আছি।

—তবে তোমার নীরজার চোখের জলের মায়া ছেড়ে দিয়ে রাধানাথের কাছে আজও চলে আসতে পারছ না কেন ? কাজের বেলায় তো দেখা যাচ্ছে যে, তোমার কাছে নীরজার মুখের হাসিই তোমার সব চেয়ে বড় সুখ।

নিতান্তই তর্ক, তা'ও আবার স্বপ্নের মধ্যে। তবু বুকের ভিতরটা এমন করে চমকে আর ছটফটিয়ে ওঠে কেন ? ঘুম ভেঙে যায় কেন ? রোগে ভুগে ভুগে, আর নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে মনটা খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছে, তাই কি ? কিন্তু খুব সত্যি কথা, দেবতার কাছে মনের ফাঁকি লুকিয়ে রাখা যায় না। রায়গঞ্জের মন্দিরের রাধানাথ, যাঁর শাসনে দামোদরের পাগল বেনোজল রায়গঞ্জের ক্ষেতের ধান ভাসিয়ে ও পচিয়ে দিতে পারে না, তাঁর কাছে তো কিছুই অজানা নেই। কলকাতায় আসবার পর, এই দশ বছরের মধ্যে নীরজা বোধ হয় একটি দিনও ঠিক লোকনাথের কথা মনে করে লোকনাথের কাছে এসে বসেননি। হ্যাঁ, কতবার এসেছেন বসেছেন ও কত কথা বলে চলে গিয়েছেন নীরজা ; কিন্তু সবই তো এই কলকাতার জীবনের যত দরকারের কথা। সুধাদি বলে দিয়েছেন, কোন দোকানে শাড়ি কেনা উচিত ; এ সপ্তাহে কোন ছবি দেখা উচিত ; আর মেয়েদের বাড়িতে পড়াবার জন্য একজন গ্র্যাজুয়েট মাস্টার চাই। দরকারের কথা বলে দিয়েই ব্যস্ত হয়ে চলে যান নীরজা। ব্যস্ত না হয়ে আর ওভাবে চলে না গেলেই বা চলে কী করে ? নীরজাকেই তো দরকারের সব দাবি সামলাতে আর মেটাতে হয়।

॥ ৩ ॥

পাশের ঘরে বসে কথা বলছেন যাদবপুরের সুধাদি : যে সংসারের পুরুষ মানুষ পঙ্গু আর অকর্মণ্য, সে সংসারে মেয়ে-মানুষকেই সাহস করে সব দায় নিতে হয়। তোর জামাইবাবুর বন্ধু প্রফেসর শশীবাবু বলেন ; এ যুগ আর আগামী যুগটাও মেয়ের যুগ, বউদি। সে কথা তো বাড়িয়ে বলা কথা নয়। এই ধর আমারই কথা ; আমি যদি নিজের হাতে না চালাতুম, তবে কি তোর ওই জামাইবাবুর বিদ্যে-বুদ্ধিতে তিনতলা বাড়ি আর দুটো গাড়ি করা সম্ভব হত।

ঠিক কথা ; নীরজাও সেসব কথা জানেন, ছোট মামার বড় মেয়ে সুধাদি, তাঁর স্বামী কমলবাবু কখনও কলেজে পড়েননি, কোনও পাস-টাস করেননি। কোনওদিন কোথাও বড়-রকমের কোনও চাকরি-বাকরি করেছেন, এ কথাও কখনও শোনা যায়নি। সুধাদির শ্বশুরবাড়ি বলতে মানকরে যে বাড়িটার অনেক কথা অনেকদিন আগেই শুনেছিলেন নীরজা, সে বাড়িকে কোনও বড়লোকের বাড়ি বলে মনে করাই যায় না ; বরং বেশ খারাপ রকমের একটা গরিব বাড়ি বলে মনে করতে হয়। টিনের চালা আর মাটির দেয়াল, সেই বাড়ির কর্তা তাঁর বড় ছেলের বিয়ে দেবার এক মাস পরে সাপের কামড়ে মারা গেলেন। পুরো পাঁচটি বছর মানকরে ওই বাড়িতে দুঃখের নরকযন্ত্রণা সহ্য করবার পর, সুধাদি একদিন নিজের বুদ্ধিতে কমলাবাবুকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। হ্যাঁ, সুধাদিই কমলাবাবুকে নিয়ে এসেছিলেন। কমলবাবু তো ওই টিনের চালার বাড়ি থেকে নড়তেও চাননি। সুধাদির অনেক অনুরোধ, অনেক সাধাসাধি বকাবকি ও ধমক-ধামকেও কোনও ফল হয়নি। তারপর, সুধাদি যখন একাই হাঁটা দিলেন, তখন কমলবাবুও পিছু পিছু চলে এলেন।

সকলেই জানেন, নীরজাও জানে, সুধাদিই কমলাবাবুকে শিখিয়ে বুঝিয়ে আর বুদ্ধি দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন। কমলবাবুর সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্সের সাত-আট জন অফিসারের অন্তরঙ্গ মেলামেশা আছে। অন্তত সাত-আটটা সরকারি হেড অফিসে কমলবাবুর যাতায়াত আছে। নিজে কোনও অফিসের কেষ্ট-বিষ্টু অবিশ্যি হতে পারেননি কমলবাবু, কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধে হয়নি। তাঁর ভাগ্যটা সাত-আট বছরের মধ্যেই সুখের তিনতলায় উঠে গিয়েছে। আজ আর শুধু একা সুধাদির হাতের আঙুলে নয়, তাঁর তিন মেয়ের আঙুলেও হীরের আংটি ঝিকঝিক করে হাসে। সুধাদি, এই সেদিনও হাসতে হাসতে বলেছেন—ভদ্রলোককে একবার জিজ্ঞেস কর তো নীরু, কে প্রথম বুদ্ধিটা দিয়েছিল ? কে প্রথম বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, দু'চার জন বড় মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, বড়-বড় অফিসে যাওয়া-আসা করতে হয়। তা না হ'লে ভাগ্যি খোলে না। মানুষটাকে শুধু এইটুকু বোঝাতেই আমার ছ'মাস লেগেছিল, এমনই অদ্ভুত নিরেট মানুষ।

সুধাদির ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যটার তুলনা করতে গিয়ে অনেকবার মনে মনে কেঁদেও ফেলেছেন নীরজা। আবার ফিরে যেতে হবে সেই রায়গঞ্জে, যেখানে সন্ধ্যা হতেই শেয়াল ডাকে, আর কালাচাঁদের বউ বিশ্রী একটা ছেঁড়া-ময়লা কাপড় পরে যখন-তখন এসে ছাইভস্ম যত বাজে ব্যাপারের খবর শোনায়। ভট্টাচার্যের মেয়ের নাকি এরই মধ্যে সাত মাস ; অঘ্রাণে যার বিয়ে, বোশেখ না পেরোতেই তার সাত মাস হয় কী করে ? হয় হিসেবের ভুল, না হয় মেয়েরই ভুল। দেখা যাক, আর দু'টো মাস পার হলেই যা বোঝবার তা ঠিকই বোঝা যাবে।

এমন এক রায়গঞ্জের জন্য কেন যে ছটফট করছেন ভদ্রলোক, সত্যি কিছু বুঝে উঠতে পারেন না নীরজা। আজ না হয় কাল, সুকুর একটা চাকরি হয়েই যাবে। তিনবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে পারেনি সুকু ; দোষই বটে। আজ ওর বয়স পঁচিশ বছর ; কিন্তু সেজন্যে তো একেবারে হতাশ হয়ে পড়বার কোনও মানে হয় না। সুকু গাইতে পারে ভাল। সুধাদি বলেছেন, আজ না হয় কাল, না হয় আরও কিছুদিন লাগবে, সুকু কি কোনও ছবিতে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে যাবে না ? আর একটু নাম করে নিতেও পারবে না ? এই তো, এই পাড়াতেই থাকে ছেলেটি, যার নাম মনু, কেরানি বলাইবাবুর ছেলে। মনুও লেখাপড়া তেমন কিছু শেখেনি। কিন্তু কে না জানে, সিনেমা-ছবির মনু এখন মাসে অন্তত তিন-চার হাজার টাকা রোজগার করে।

লোকনাথ কোনও খোঁজ খবরের ধার ধারেন না, তাই জানেন না যে, টুনি আর টুসি, দুই মেয়ের নামও বদলে গিয়েছে। টুসির নাম এখন আর প্রতিভা নয়, মিতালী রায়। টুসির নামও এখন আর বিজয়া নয়, পিয়ালী রায়। কলকাতার জীবনে যে নাম মানায়, সেইরকমই দুটি নাম নিয়েছে ওরা। সুধাদি বলেন—খুব সুন্দর নাম হয়েছে। আর একটা বছর পার হলেই মিতুর বি-এ পরীক্ষা। আর পিয়ার হবে ক্লাস টেন। কিন্তু ছেলে আর মেয়েদের জীবনের জন্য বাপের মনে সত্যিই কোনও দরদ আছে কি ? দরদ থাকলে কি রায়গঞ্জে ফিরে যাবার কথা কেউ বলতে পারে ? কী আশ্চর্য, দশবছর ধরে চোখের সামনে এত স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েও ভবানীপুরের এই বাসাবাড়ির জন্য সামান্য একটু মায়া করতে পারলেন না ভদ্রলোক ! সত্যিই খাঁটি রায়গঞ্জের মানুষ বটে। দেখে কতবার আশ্চর্য হয়েছেন, নীরজা, মিতু আর পিয়ার খোঁপার দিকে কী বিশ্রী রকমের চোখ ক'রে তাকিয়ে দেখছেন ভদ্রলোক। উনি চান, ওরা যেন কালাচাঁদের বউ-এর মত বিঁড়ে খোঁপা বেঁধে চিরটাকাল রায়গঞ্জের টুনি আর টুসি হয়েই থাকে।

সুকু, মিতু আর পিয়া অবশ্য নীরজাকে অনেকবার বলেছে—তুমি মিছিমিছি কেন এত আশ্চর্য হও, আর কেনই বা বিরক্ত হও, মা ? বাবাকে বাবার যুগে পড়ে থাকতে দাও। বাবার কোনও কথা কানে তোলবার দরকার নেই।

নীরজা হাসেন—কিন্তু তোমাদের বাবা যে রায়গঞ্জের বাড়ি বিক্রি করে দিতে রাজি নন।

সুকু চেঁচিয়ে ওঠে—তার মানে ?

নীরজা—তার মানে, কলকাতার এই বাসা ভেঙে দিয়ে সবাইকে আবার সেই রায়গঞ্জে ফিরে যেতে হবে।

মিতু হেসে ফেলে—সবাইকে যেতে হবে কেন ? আমরা যে এখানেই থাকব, সেকথা কি বাবা

জানেন না ?

যেন সৌভাগ্যের একটা নতুন সঙ্কেতের দিকে তাকিয়ে আর হাস্যময়ী হয়ে কথা বলছে মিতু। নীরজাও সেটা বুঝতে পারেন। তাই নীরজাও হাসেন—না, জানেন না।

পিয়া হাসে—বাবা কি শোনেননি যে, আমি নাচের স্কুলে ভর্তি হয়েছি।

নীরজা—না, শোনেননি।

দাদা আর দুই বোন এইবার একসঙ্গে হাসে—বাবাকে কিছুই বলবার দরকার নেই।

সুধাদির গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা যায়। সুকু বলে—বড় মাসি অনেকদিন পরে দয়া করলেন।

নীরজা—হ্যাঁ, কে জানে, কিসের জন্য এতদিন আসতে পারেননি।

মিতু বলে—বড় মাসিকে আমাদের ঘরের আসল কথাটা এখনই বলবার দরকার নেই।

পিয়া বলে—হ্যাঁ, বড় মাসির সব ভাল, কিন্তু কেমন-যেন একটু...।

মিতু হাসে—বলেই ফেল না।

পিয়া—বড় মাসির ধারণা, উনি অনেক বড়, আর আমরা কিছুই নই।

মিতু—হ্যাঁ, বড় মাসির ধারণা, শেষ পর্যন্ত আমাদের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে ; আর আমাদের আবার বনের পাখি হয়ে রায়গঞ্জের বনে ফিরে যেতে হবে।

নীরজা হাসেন—চুপ কর।

—দার্জিলিং-এ একটা বাড়ি কিনতে হল, নীরু। তাই এই একটা মাস বড় ব্যস্ত ছিলাম। বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন সুধাদি।

আস্তে একটা হাঁপ ছেড়ে দিয়ে সুধাদি একটু অদ্ভুত ভাবে সবারই মুখের দিকে তাকান।—কী খবর ? রায়মশাই কী বলেন ?

নীরজা—যা বলবার, তা তো সেদিনই বলে দিয়েছেন।

সুধাদি—বললেই হল ! রায়গঞ্জের বাড়ি বিক্রি না করে এখন উপায় কী ?

বলতে বলতে উঠে গিয়ে দোতলায় গেলেন সুধাদি।—আয় নীরু, আর একবার বলে দেখি।

লোকনাথের ঘরে ঢুকেই বেশ চমৎকার ঝংকারের মত স্বরে গলা বাজিয়ে প্রশ্ন করেন সুধাদি—আপনার রায়গঞ্জের ওই অদ্ভুত লক্ষ্মীমন্ত বাড়িটাকে কি আপনি সত্যিই বিক্রি করবেন না বলে ঠিক করেছেন ?

লোকনাথ—আমি এ বিষয়ে আপনাদের কাছে আর কোনও কথা বলতেই চাই না ; মাপ করবেন। দুই চোখ বন্ধ ক'রে পাশবালিশটাকে জড়িয়ে ধরেন লোকনাথ : আর কোনও কথা বলেন না।

এই নীরবতাও যেন একটা কঠোর অবজ্ঞা, সুধাদির পাউডার-মাখা মুখের অদ্ভুত হাসিটাকে এখনি এখান থেকে সরে যেতে বলছে। ঠিক কথা, সুধাদির এই পাউডার-মাখা মুখের হাসিটাকে শুধু ভয় করেন না লোকনাথ, ঘেন্নাও করেন। ষাট বছর বয়স হয়েছে, তবু কী আশ্চর্য। তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য, নীরজাও মুখে পাউডার মাখবার অভ্যাস ধরেছে। দেখতে পেয়ে সেদিন কী লজ্জাই না পেয়েছিলেন লোকনাথ, যেদিন নীরজা একটা ঝলমলে রঙিন শাড়ি পরে আর মুখে পাউডার মেখে ওইখানে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, আর রামদয়ালের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভুলতে পারেন না লোকনাথ, রামদয়ালের দুই চোখ যেন কাঁটার খোঁচা লেগে কুঁচকে গিয়েছিল। রামদয়াল তো কখনও স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারে না যে, রায়গঞ্জের লোকনাথ রায়ের স্ত্রী, যার বয়স হয়েছে পঁয়তাল্লিশ, সে মানুষ কখনও মুখে পাউডার মাখতে আর রঙিন সাজে সাজতে পারে। সুধাদি সত্যিই একটি অঘটনঘটন পটীয়সী মায়া।

দুই চোখ বন্ধ করে আর বালিস আঁকড়ে এইভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকতেই বুঝতে পারেন লোকনাথ, সুধাদি চলে গেলেন। সুতরাং, এই ঘরের ভিতরে এখন একমাত্র যে-জন বসে আছে, সে হল লোকনাথ রায়ের জীবনের সেই নীরজা, যার চোখে জল দেখলে লোকনাথ রায়ের বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাসের বাতাস যেন ব্যথা পেয়ে উতলা হয়ে যায়। নীরজা যদি অসুখী হয়, তবে লোকনাথ রায় কিসের স্বামী ? কিসের পুরুষ ? পঁচিশ বছর আগের রাজপুরের একটি উৎসবের ঘরে, বাসরজাগা

বাতির আলোতে যে মেয়ের ভিজে চোখ দেখতে পেয়ে লোকনাথের বুকটা ব্যথায় ভরে গিয়েছিল, সেই বিশ বছর বয়সের মেয়েটিই তো আজকের ওই নীরজা। সেই ভিজে চোখ চুমো দিয়ে মুছে দিতে গিয়ে যে লোনা স্বাদের মায়া লেগেছিল আর ভিজে গিয়েছিল লোকনাথেরই ঠোঁট, সেই স্বাদ যে আজও বুকের ভিতরে তিনি অনুভব করতে পারেন। যে বাতের রোগে পঙ্গু হয়েছে তাঁর দুই পা, সেই রোগের উপর তাঁর রাগের কারণ শুধু এই নয় যে, রোগটা বড়ই কষ্ট দেয় ; নীরজা হতাশ হয়, নীরজার জীবনটা অসুখী হয়ে গিয়েছে, নীরজার চোখে দুশ্চিন্তার কষ্ট মাঝে মাঝে ছলছল করে কাঁপে, তাই রোগটার উপর এত বেশি রাগ হয়।

ঘরে এখন আর কেউ নেই, শুধু একা নীরজা। কিন্তু চোখ খুলে নীরজার দিকে একবার তাকিয়ে দেখতেও পারছেন না লোকনাথ। ভয় হয়, সেই ভয়। নীরজার চোখে সেই করুণ অভিমান বোধহয় আবার ছলছল করে কাঁপছে। সেদিন রাজপুরের সেই উৎসবের রাতে সেই বাসর ঘরে নীরজা স্বীকার করেনি, আজও নিশ্চয় স্বীকার করবে না, এই অভিমান হল ভাগ্যেরই সঙ্গে একটা অভিযোগের নীরব বিলাপ। ত্রিশ বছর বয়সের স্বামী, গাঁয়ের স্কুলের মাস্টার সেদিন চন্দনের লবঙ্গ-ছাপ দিয়ে আঁকা একটি মুখের সুন্দর ছবির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, সত্যি করে বলবে, তোমার চোখে জল কেন ? আমাকে খুবই গরিব ঘরের মানুষ বলে মনে হয়েছে, তাই কি ? নীরজা বলেছিল—না। কথা শুনে সেদিনের লোকনাথের ত্রিশ বছর বয়সের বুকটা খুশিতে ভরে গিয়েছিল, চোখ দুটো হেসে উঠেছিল। বলেছিলেন লোকনাথ—তবে আমিও বলছি, আমি প্রাণ থাকতে তোমাকে অসুখী হতে দেব না।

তাই ভয়, চোখ মেলে তাকালেই হয়ত দেখতে পাবেন লোকনাথ, নীরজার দুই চোখ ভিজে গিয়েছে। সেই ভিজে চোখ যেন হতাশায় অপলক হয়ে দুঃসহ একটা দুর্ভাগ্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—নীরু। ডাক দিয়ে মুখ ফেরান আর চোখ খোলেন লোকনাথ।

—নীরু তুমি দুঃখ করো না। বিশ্বাস করো, এখন রায়গঞ্জে ফিরে গেলে আমাদের সবারই ভাল হবে।

চমকে ওঠেন লোকনাথ। কই ? নীরজার চোখে তো কোনও করুণ অভিযোগ নেই, অভিমানও নেই। ভিজে চোখ নয়, শুকনো খটখটে চোখ। বরং মনে হয় নীরজার এই চোখ খুবই উজ্জ্বল হয়ে হাসছে।

লোকনাথের মুখের দিকে নয়, দরজার পর্দাটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে নীরজা তাকিয়ে আছে নীচের তলার ঘরের কোনও একটা চমৎকার বস্তু কিংবা ঘটনার দিকে ; তা না হলে অমন করে উজ্জ্বল হয়ে হাসবে কেন নীরজার দুই চোখ ?

—কী হল ? কী দেখছ নীরু ? লোকনাথের মুখের ভিতরটা যেন দুঃসহ একটা বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু নীরজা কি শুনতে পেল সেই মুখরতার কোনও শব্দ ?

না, নীরজার কানে বোধ হয় লোকনাথের এত ব্যস্ত জিজ্ঞাসার কোনও শব্দ পৌঁছয়নি। জবাব দেন না নীরজা। চুপ করে শুধু দাঁড়িয়ে থাকেন আর নীচের ঘরের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন। সে হাসির সঙ্গেও অদ্ভুত একটা মায়াময় তৃপ্তির ঝংকার। এমন ক'রে, এত অদ্ভুত সুরেলা শব্দ করে নীরজাকে কোনওদিন হাসতে দেখেননি লোকনাথ।

রায়গঞ্জে কতবার দেখেছেন লোকনাথ, রাতের আকাশের মেঘ হঠাৎ কেটে গিয়ে যখন আধখানা চাঁদের আভা ফুটে উঠত, তখন রাধানাথের মন্দিরের কাছে কদম গাছের মাথায় ঘুমন্ত কাক উসখুস ক'রে জেগে উঠে ডাক শুরু করে দিত। কী অদ্ভুত খুশির ডাক, যেন ভোর হয়েছে !

নীরজার প্রাণটাও কি তেমনি কোনও আধখানা চাঁদ হঠাৎ দেখতে পেয়ে হঠাৎ ডেকে উঠেছে ? হাতের জোরে শরীরটাকে হঠাৎ টান ক'রে আর কোমরে ভর দিয়ে উঠে বসেন লোকনাথ। ডাক দেন—একটা কথা শোনো, নীরু।

আবার চমকে ওঠেন লোকনাথ। শূন্য গুহার কাছে কথা বললেও সাড়া পাওয়া যায়, প্রতিধ্বনি বাজে। কিন্তু লোকনাথ যেন নিতান্ত একটা শূন্যতার কাছে কথা বলছেন। নীরজা কোনও সাড়া

দিলেন না। আরও আশ্চর্য হয়ে, আর চোখ বড় করে তাকাতে গিয়ে শুধু দেখতে পেলেন লোকনাথ, নীরজা ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

কিসের ব্যস্ততা ?

॥ ৪ ॥

ভিতরে ঘরের ওদিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল যে আগন্তুক, যার সঙ্গে আস্তে-আস্তে হেসে হেসে কথা বলছিল বড় মেয়ে মিতালী রায়, তারই দিকে তাকিয়েছিলেন নীরজা। এবং তাই তাঁর চোখ দুটো এত উজ্জ্বল হয়ে হাসছিল।

মিতালী আর সেই আগন্তুক ছেলেটি, দু'জনে কথা বলতে বলতে পাশের ঘরে চলে গেল, আর রেডিওর গানের শব্দটা আরও জোরালো হয়ে উঠল ; তাই এবার ঘরের ভিতর এগিয়ে গেলেন নীরজা। তখনই ডাক দিলেন—পিয়ালী, তুই কোথায় ?

—আমি এখানে আছি।

—না, এখানে চলে আয়।

পিয়ালীর হাতে রঙিন কাগজের একটা বাক্স, তার মধ্যে এক ডজন রুমাল। চৌরঙ্গির এক কাশ্মীরি দোকান থেকে কেনা কাশ্মিরি রেশমের রুমাল। রুমালের গায়ে ডাল হ্রদের একটি পদ্মবন, তার গায়ে লেগে ভেসে রয়েছে লাল রঙের শিকারা। পিয়ালী বলে—সত্যি কথা, দেবুদা কোনও কথা একটুও ভুলে যায় না। কবে বলেছিলাম, নতুন রকমের রুমাল এনে দিতে পারেন ? সে কথা দেবুদার ঠিক মনে আছে। এই দেখো, কী সুন্দর ছবিতোলা কাশ্মীরি রুমাল।

পিয়ালী বোধ হয় বুঝতে পারেনি যে, এই ঘরের ভিতরে একটা খাটের উপরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে এই বিকালে এখনও শুয়ে রয়েছে যে, সে সত্যি ঘুমিয়ে পড়েনি। বুঝতে পারলে এত চেঁচিয়ে কথা বলত না পিয়ালী।

মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে আর একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুকুমার কথা বলে—গোটা তিনেক রুমাল আমাকে দে।

চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে পিয়ালী—দাদাকে একটু লোভ সামলাতে বলো, মা। আমি এই রুমালের একটাও কাউকে দেব না।

সুকুমার হাসে—একটা অন্তত দে।

পিয়ালী—কেন ?

সুকুমার—দরকার আছে।

পিয়ালী হাসে—সত্যি করে বলো তো, কার জন্যে দরকার ? তোমার নিজের জন্যে, না তাঁর জন্যে ?

লজ্জা পেয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করে সুকুমার—মিছিমিছি কথা বাড়াচ্ছিস কেন ? যখন সন্দেহ করেই ফেলেছিস, তখন আর।

ঠিক কথা। যাকে এইরকম একটি রুমাল উপহার দিতে পারলে সুখী হবে সুকুমার, তারই জন্য অন্তত একটি রুমাল সে পেতে চায়। নীরজা জানেন, মিতালী আর পিয়ালীও জানে, সুধাদি তো জানেনই, শুধু এক লোকনাথ জানেন না, কার দরকারের জন্য এইরকম একটি কাশ্মীরি রুমাল আজ সুকুমারের দরকার হয়েছে।

বড় শান্ত ও লাজুক স্বভাবের মেয়েটি, নাম তার বীণা, সুধাদিরই এক দেবরের মেয়ে। সুধাদি বলেন, মেয়েটার বয়স যখন মাত্র সাত বছর ; তখন ওর মা ইচ্ছে করে বিষবড়ি খায়। আত্মহত্যার কারণ, স্বামীর উপর রাগ। সেই যে সাত বছর আগে, মেয়েটার জন্মের ঠিক এক মাস আগে কাউকে না বলে-কয়ে উধাও হয়ে গেল তাঁর সেই দেবর, তার পর আর ফিরে এল না। এক বছর পরে খবর পাওয়া গেল, জার্মানিতে আছে বীণার বাবা, সুধাদির সেই দেবর শ্রীঅমল সেন। ঠিকানাও পাওয়া

গেল। সাত বছরে কম করেও তিনশো চিঠি লিখেছিল বীণার মা, ফিরে আসবার জন্য কত অনুনয় আর আবেদন। জবাবে মাত্র সাতটি চিঠি এসেছিল ; অমল সেন শুধু একটি কথাই বার বার লিখে জানিয়ে দিয়েছিল, এ জীবনে সে আর দেশে ফিরবে না। সেই অমল সেন এখনও জার্মানিতেই আছে, কিন্তু জানে না বোধ হয় যে তার স্ত্রী আর এ জগতে নেই। কিন্তু বীণা নামে তার যে একটি মেয়ে এ জগতেই আছে, সেকথাও বোধ হয় জানে না। কারণ, চিঠি দিয়ে মেয়ের সামান্য একটু খোঁজখবরও করেনি অমল সেন ; জানেও না যে, ওই মেয়ের বয়স এখন কুড়ি বছর পার হতে চলল, আর বিয়ে দিয়ে দেবার দরকারও হয়েছে।

সুধাদিরই বাড়িতে, সুধাদির কাছে থেকে বড় হয়েছে, বীণা ; কিন্তু শুধু চেহারাতেই বড় হয়েছে ; শিক্ষাতে নয়। সুধাদির তিন মেয়েই শিক্ষিতা। বড় মেয়ে অঞ্জলি, মেয়ে স্কুলের টিচার, চিরকুমারী হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে বলে পণ করেছে, কে জানে কেন এমন পণ ; তাই সে সুধাদিরই কাছে থাকে। কিন্তু বিয়ে হয়েছে যে দুই মেয়ের, তারাও সুধাদির কাছে থাকে। এক জামাই থাকেন হার্ভার্ডে, আর এক জামাই গ্লাসগোতে। পড়া আর ট্রেনিং শেষ করে জামাইদের দেশে ফিরতে নাকি এখনও ছয়-সাত বছর বাকি।

সুধাদি বলেন—বীণার জন্যেও যে বিলাত-ফেরত বর তিনি আনতে পারেন না, তা নয়। কিন্তু ভালবাসার দামটাও তো তুচ্ছ করা উচিত নয়। বীণা যখন সুকুকে ভালবাসে, আর সুকুও বীণাকে ভালবাসে, তখন সুকুর সঙ্গেই বীণার বিয়ে হলে তিনি সুখী হবেন।

কিন্তু...নীরজার এই কিন্তু কিন্তু ভাবের আসল কারণটা কী, তাও জানেন সুধাদি। জানা কথা, আপত্তি করবেন লোকনাথ। তিনি বলবেন, যে ছেলে পঁচিশ বছর বয়সের একটা জোয়ান হয়েও এখনও রোজগারের কোনও কাজ ধরতে পারল না, তার কি বিয়ে করা উচিত ? কখনই নয়। তা ছাড়া, এমন নিরোজগেরে ছেলের সঙ্গে কোনও ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন ? কেউ না। সুধাদি কিন্তু বলেছেন ; সব সময়েই বলেন : আমি কিন্তু সব জেনে শুনেও তোমাদের ঘরে আমার বীণাকে দিতে চাই, নীরু। আমার কোনও আপত্তি নাই। সুকু এখনও রোজগারের কোনও কাজ ধরতে পারল না ঠিকই, লেখাপড়াও শিখল না, কিন্তু তবু মানুষ তো, আর মানুষের ভালবাসার কি কোনও দাম নেই ?

আজ কিন্তু নীরজার মনে কোনও কিন্তু নেই। আজ তিনি আশা করতে পারছেন, এইবার সুকুর বিয়ে হয়ে যাবে, মিতুর কলেজে পড়া চলতেই থাকবে, আর পিয়ার অনেক দিনের ইচ্ছার সেই বস্তুটা, একটি গিটারও এসে যাবে।

সুকু বলেছে, দেবু আমার একটা কাজ যোগাড় করবার জন্যে ভয়ানক চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে, মা। পিয়া বলেছে, দেবুদা আমার গিটার শেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, মা। শেখাবেন ধরণীবাবু, সেই ধরণীবাবু, কালীঘাটের জলসাতে সেদিন যাঁর গিটার শুনেছিলে। সপ্তাহে একদিন আসবেন, মাসিক মাইনে নেবেন মাত্র পঞ্চাশ টাকা। দেবুদা বলেছে, সে টাকার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আর, মিতু বলেছে যে কথা, সেটাই সবচেয়ে সুন্দর বিস্ময়ের কথা। কথাটার সবটুকু ঠিক ভাল করে আর স্পষ্ট করে বলতেও পারেনি মিতু। বলতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে মুখ রাঙাও করেছে। দেবু বলেছে, আমি থাকতে তোমাদের রায়গঞ্জে চলে যেতে হবে না।

—আর কী বলেছে ? প্রশ্ন করতে গিয়ে নীরজার দুই চোখের তারা যেন আশ্চর্য হবার সুখে চিকচিক করে।

মিতু—আর কী বলবে ? যা বলবার ছিল সবই বলেছে।

—তুই কী বললি ?

—আমি বললাম, পরীক্ষাটা হয়ে যাক, পাস করি, তারপর যেদিন ইচ্ছে...।

—তারপরে ? দেবু কী বললে ?

—দেবু বলেছে ; তাই ভাল। আর একটা বছর অপেক্ষা করতে তার একটুও আপত্তি নেই।

সুকু আর পিয়া রুমাল নিয়ে বকাবকি আর হাতাহাতি করতে থাকে। আর নীরজা টেবিলের কাছে এগিয়ে যেয়ে স্টোভ ধরান। চা করতে হবে। নীরজা জানেন, দেবু যখন-তখন চা খায়। চায়ে দুধ

ভালবাসে না দেবু ; দেবুর চায়ে লেবুর রস দিতে হয়। নীরজা বলেন—বকাবকি রেখে এখন একটা লেবু কেটে দে, পিয়া।

॥ ৫ ॥

পাশের ঘরের দরজার পর্দাটা দুলছে, তার দিকে তাকিয়ে থাকেন নীরজা। পাশের ঘরে এখন মিতুর সঙ্গে কথা বলছে যে দেবু, সে দেবু সত্যিই একটি বিস্ময়। এতটা আশা করেননি নীরজা। দেবু যেন এবাড়ির ভাগ্যের মেঘলা আকাশে একটি জ্বলজ্বলে তারা হয়ে দেখা দিয়েছে। এই তো, মাত্র তিন মাস আগে, কোথায় যেন ক্রিকেট খেলতে গিয়ে দেবুর সঙ্গে প্রথম দেখা আর আলাপ হল সুকুর, আর চা খাওয়াবার জন্যে দেবুকে এবাড়িতে নিয়ে এল। তখন তো একটুও বুঝতেও পারেননি নীরজা যে, দেবু নামে সেই ছেলেটির প্রাণের ভিতরে এত মায়া আছে। ইচ্ছে করে, আজ এখনই একবার দেবুকে নিয়ে গিয়ে রায়গঞ্জের ভদ্রলোকের চোখের সামনে একবার দাঁড় করিয়ে দিতে। আর শুনিয়েও দিতে, দেখে নাও, তোমার রায়গঞ্জ সাতজন্ম তপস্যা করলেও যে ছেলে পাবে না, সে হল এই দেবু, এই কলকাতারই ছেলে। দশ টাকা ধার দিলে এক বছরে আট টাকা সুদ নিয়ে থাকেন তোমারই বন্ধু, রায়গঞ্জের রতনবাবু, যিনি তমসুকের বোঁচকা বুকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমোতে পারেন না। আর, কলকাতার এই দেবু তার সামান্য ক'দিনের চেনা এক বন্ধুর বাপ-মা-বোন সবাইকে সুখী করে বাঁচিয়ে রাখবার সব খরচের দায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। তোমার রায়গঞ্জের একশো আষাঢ়ে গল্পের মধ্যেও কি দেবুর মত একটি মাণিক খুঁজে পাওয়া যাবে ?

কিন্তু লোকনাথের কাছে গিয়ে এই শুভ বিস্ময়ের কোনও কথা নিয়ে আলোচনা করতে চান না নীরজা। আলোচনা করে কোনও লাভ হবে না। দেবুর কথা তাঁকে আজ এখনই জানিয়ে কিংবা শুনিয়ে দেবারও কোনও দরকার নেই। তাঁকে শুধু এটুকু জানিয়ে দিলেই হবে যে, রায়গঞ্জে এখন আর ফিরে যাওয়া হচ্ছে না ; কোনওদিন ফিরে যেতে হবেও না। রায়গঞ্জের বাড়ি বিক্রি করা হোক বা না হোক, সেজন্য এবাড়ির সুখশান্তির কোনও সমস্যা আর হবে না।

ভাবতে বেশ আশ্চর্যই বোধ করতে হয়, রায়গঞ্জ বলতে কিংবা দেশের বাড়ির কথা বলতে গিয়ে বাত-পঙ্গু মানুষটির মনে যেন দশ ভাবের দশা দেখা দেয়। কখনও হেসে ফেলেন, কখনও চেঁচিয়ে ওঠেন, কখনও বা চোখ মুছে মুছে বিড়বিড় করেন। কখনও বা রাগ ক'রে অভিযোগ করেন, কলকাতার নাম করতে তুমি তো ভাবে বিভোর হয়ে যাও নীরু। কিন্তু কী আছে কলকাতায় ? বড় বড় চমৎকার ফাঁকি ছাড়া আর কিছু আছে কি ? মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করেন, তোমার কাছে কলকাতা মানে সুধাদি, আর সুধাদি মানে কলকাতা। নীরজা ভাবছেন, আজ কিন্তু এখনি রায়গঞ্জের মানুষটিকে শুনিয়ে দিতে পারা যায় ; শুধু এক সুধাদিকে দেখছ কেন, দেবু নামে একটি ছেলেকেও দেখতে পাবে, সে ছেলে এই কলকাতারই ছেলে।

দোষ ধরলে আর খুঁত বের করতে হলে তোমার রায়গঞ্জেই বা কোন মহিমার পরিচয় পাওয়া যাবে ? মিথ্যে মামলা করে তোমারই রাজেন কাকা যে তোমার ত্রিশ বিঘে ধান জমি কেড়ে নিয়েছেন, সেকথা কি ভুলে গিয়েছ ? সেকেন্ড মাস্টার অনাদিবাবু কী নীচতার কাণ্ড করেছিলেন, তাও কি মনে নেই ? ইন্সপেক্টরের কাছে তোমার নামে মিথ্যে অপবাদের কথা বলে তোমার কী ক্ষতি করেছেন অনাদিবাবু, সেকথা তুমি তো সেদিনও রামদয়ালবাবুর কাছে বলছিলে। তবে আর কলকাতার নামে এত ভয় আর ঘেন্না কেন ? রামদয়ালবাবুও বলেছেন, অনাদিবাবু ওই নীচতার কাণ্ডটি না করলে তুমিই হেডমাস্টার হতে। তোমার ওই রায়গঞ্জের কাঁকড়া বিছার কামড়ে তোমার সবচেয়ে আদুরে গরুটি মরে গেল, মনে আছে কি ? রায়গঞ্জের নাম করে গর্ব করবার কিছুই নেই। আর খুশি হবারই বা কী আছে ? আশা করবারই'বা কী আছে ? রায়গঞ্জে থাকলে কি তোমার ছেলের জন্য বীণার মত মেয়ে তুমি পেতে ? না, তোমার মেয়ের জন্যে দেবুর মত ছেলে পাওয়া যেত ? সুকুর অবিশ্যি ভাগ্য খারাপ, কলকাতায় থেকেও লেখাপড়া ভাল শিখল না।

রায়গঞ্জে থাকতেই বা লেখাপড়ার কোন উন্নতি দেখাতে পেরেছিল সুকু ? তুমিই জান, তোমার

ছেলে বলেই সুকুকে পর-পর তিন বছর প্রমোশন দিয়েছিলেন হেডমাস্টার ; পরীক্ষায় ফেল করাই তো সুকুর নিয়ম ছিল।

রায়গঞ্জে থাকলে মিতু আর পিয়ারও বা কী দশা হত ? দুই মেয়ের কারও কপালে কলেজে পড়বার সৌভাগ্য হত না। আজও স্মরণ করতে পারেন নীরজা, রায়গঞ্জে থাকতে লোকনাথ প্রায়ই তাঁর এক ভাল ছাত্রের কথা বলতেন। সে ছাত্রের নাম সুদেব। সুদেবের বাবা সনাতন সরকার শহরে মোক্তারি করেন। মিতুর বয়স তখন দশ বছরও হয়নি। লোকনাথ তখনই সুদেবের সঙ্গে মিতুর বিয়ের কথা কল্পনা করতে শুরু করেছিলেন। বার বার বলতেন, আমি ভাবছি নীরু, সনাতনবাবুর সঙ্গে কথাটা এখনই একটু আলোচনা করে রেখে দিই।

ওই তো, ওই সুদেব, রায়গঞ্জে থাকলে মিতুর জীবনের ভাগ্যটা ওই সুদেব পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারত, তার বেশি নয়। রায়গঞ্জের লোকনাথ রায়ের কল্পনা করবার, আশা করবার, কিংবা বিশ্বাস করবার শক্তিও ছিল না যে, তাঁর মেয়ে মিতুর সঙ্গে দেবুর মত ছেলের বিয়ে হতে পারে।

রামদয়ালবাবুর সঙ্গে গল্প করবার সময় কথায় কথায় অদ্ভুত রকমের একটা অহংকারের কথাও বলেন লোকনাথ। সে কথা শুনে নীরজার হাসি পায়, দুঃখও হয়। 'রোগে আমার পা দুটো পঙ্গু ক'রে দিয়েছে রামদয়াল, কিন্তু আমি পঙ্গু হইনি।' রামদয়াল বলেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়, খুব ঠিক কথা। লোকনাথের অহংকার এইবার যেন হেসে হেসে ঝলসে ওঠে।—লোহারামের ব্যাকরণ পড়ে মানুষ হয়েছি, রাম, প্রাণের মধ্যে সেই লোহার কিছুটা আজও আছে।

পাশের ঘরে বসে আর শুনতে পেয়ে হেসে ফেলেছিল সুকু—বাবা যে একজন লৌহমানব, সে কথা কি তুমিও জানতে, মা ?

নীরজা হাসেন—চুপ কর। রোগী মানুষ, অনেক দুঃখে মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই ওরকম অদ্ভুত কথা বলেন।

হেসে হেসে সুকুকে চুপ করিয়ে দিলেও মনে মনে স্বীকার করেন নীরজা, মানুষটার প্রাণে সত্যি লোহার মত কোনও বস্তু আছে। ভয়ানক শক্ত একটা বিশ্বাসের লোহা। বিশ্বাস করেন লোকনাথ, রায়গঞ্জে ফিরে গিয়ে রাধানাথের প্রসাদ খেতে পারলে এক মাসের মধ্যেই তাঁর ভাগ্যের সব দুঃখ ঘুচে যাবে। বিশ্বাস করেন, নিতাই কবিরাজের পাঁচন খেয়েই তাঁর রোগ সেরে যাবে। বিশ্বাস করেন, রাধানাথ শিগগিরই তাঁকে কাছে ডেকে নেবেন। বিশ্বাস করেন, তাঁর স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সবাই সুখী হবে, যদি এখনও কলকাতা ছেড়ে রায়গঞ্জে গিয়ে আবার সেই পুরনো বাড়িতে ঠাঁই নেওয়া হয়। বিশ্বাস করেন, মোক্তার সনাতন সরকারের ছেলে সুদেবের সঙ্গে মিতুর বিয়ে হলে খুব ভাল হয়।

কিন্তু এই অদ্ভুত বিশ্বাসের লোহা যে কোনও কাজের বস্তু নয়, এই সত্যটি তাঁকে বুঝিয়ে দেবে কার সাধ্যি ? উনি বলবেন, পরের কাছ থেকে উপকার নেবার লোভ হল ভয়ানক লোভী একটা পাপ। উনি বলবেন, তার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। উনি বলবেন, কলকাতাতে সুধাদির মত মানুষকেই ভাল মানায়, তোমাদের একটুও মানায় না।

কাজেই, এমন মানুষের সঙ্গে তর্ক করে বোঝাবুঝির চেষ্টা করবার আর কোনও অর্থ হয় না। উনি ওঁর প্রাণের লোহা নিয়ে পড়ে থাকুন। কিন্তু...।

চায়ের জল ফুটতে শুরু করেছে, কেটলিটাকে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করেন নীরজা—কিন্তু সুকু, তোর বাবা যদি জেদ না ছাড়ে, যদি রায়গঞ্জে ফিরে যাবার কথা আবার তোলে, তবে কী হবে ?

সুকু বলে—তা হলে বলতে হবে, তুমি একাই রায়গঞ্জের বাড়িতে থাকো। আমাদের পক্ষে এখন রায়গঞ্জে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

নীরজা—কিন্তু সেটা কি ভাল দেখাবে ?

সুকু—ভাল দেখাবে না ঠিকই, কিন্তু উপায় কী ? বাবা যে আমাদের ভাল কিসে, সেটা একটুও বুঝতে পারছেন না।

নীরজা—সেই তো আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ।

পাশের ঘর থেকে ডাক দেয় মিতালী—চা হয়েছে নাকি, পিয়ালী ?

—হ্যাঁ, হয়েছে। চেঁচিয়ে জবাব দেয় পিয়ালী।

তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে চা তৈরি করে নীরজা। সঙ্গে সঙ্গে নীরজার সেই ক্ষণিক বিষাদের চোখ দুটো আবার উজ্জ্বল হয়ে হেসে ওঠে। হ্যাঁ, দুঃখ বটে, সে দুঃখের জন্য মনের ভিতরে একটা অস্বস্তিও বোধ করতে হয় বটে। কিন্তু আর তো ভয় করবার কিছু নেই। রায়গঞ্জে ফিরে যেতে হবে না, দৈববাণীর মত একটা আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে দিয়েছে ওই দেবু, দেবকুমার দত্ত, কলকাতার কলেজের প্রফেসর, বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, শ্যামবাজারে যার বাড়ি ; নিজেরই বাড়ি।

নীরজা বলেন—তুই ওখানে চা পৌঁছে দিয়েই চলে আসবি, পিয়ালী। একটুও দেরি করবি না, বুঝলি ?

পিয়ালী হাসে—হ্যাঁ মা বুঝেছি ; আর বেশি বলতে হবে না।

॥ ৬ ॥

এত গরম চা, তবু তিন চুমুকেই সেই চা খেয়ে ফেলে আবার উঠে দাঁড়ায় দেবু—আমি এবার যাই মিতু।

মিতালী আশ্চর্য হয়ে তাকায়—কেন ? কিসের এত তাড়া ?

দেবু—সত্যি, আমার খুব লজ্জা করে, মিতু।

মিতালী—কিসের লজ্জা ?

—সবাই দেখছেন, আমি এঘরে তোমার কাছে এতক্ষণ বসে আছি।

—কেন বসে আছ ; সেটা তো সকলেই জানে।

—হ্যাঁ ; সেই জন্যেই তো বেশ অস্বস্তি বোধ করতে হয়।

মিতালী হাসে—তোমার মা জানেন তো ?

—নিশ্চয়। আমি নিজেই তোমার ফটো মা'কে দেখিয়েছি, তোমাদের সব কথা বলেছি।

—কী বললেন, মা ?

—বললেন, খুব ভাল মেয়ে ; খুব সুন্দর মেয়ে।

—আর কিছু বলেননি ?

—বলেছেন, তবে আর দেরি কেন ? বিয়েটা হয়েই গেলেই তো হয়।

—তুমি কী বললে ?

—তুমি যা বলেছ, তাই বললাম। আর একটা বছর পরে ; তোমার বি-এ পরীক্ষা হয়ে যাবার পর বিয়ে হবে।

—মা কী বলেন ?

—মা বলেন, তবে তাই হোক, ভালই তো।

—অ্যাঁ ? তবে তো বলতে হয়, তোমার মা সত্যিই খুব সাধাসিধে সরল মনের মানুষ।

—হ্যাঁ, মিতু। আমার মা'র মত শান্ত মানুষ আমি কখনও দেখিনি। একটা মজার গল্প শুনবে ?

—বলো।

—একদিন দুপুর বেলায় একটা চোর ঘরে ঢুকে মা'র একটা কাপড় চুরি করে পালিয়েছিল। পাশের বাড়ির ঝি চেঁচিয়ে উঠেছিল, ও মা, দেখতে পাচ্ছ না, চোর যে তোমার কাপড় নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মা শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তারপর দুঃখ করলেন, চোরটা একটা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে চলে গেল রে, দেবু।

—তার মানে ?

—তার মানে, মা বলতে চান, চোর একটা ভাল কাপড় নিয়ে পালিয়ে গেলে ভাল হত।

হেসে ফেলে মিতালী। —অদ্ভুত মায়ার মানুষ।

দেবু—হ্যাঁ। একটা কথা, তুমি আমাকে একটা ভুল বুঝলে না তো ?

—কেন, কিসের জন্য কী ভুল বুঝব ?

—এই যে আমি বলেছি যে, তোমাদের বাড়ির দরকারের সব খরচের দায় আমি নিলাম,

তোমাদের রায়গঞ্জে চলে যেতে হবে না।

—এ কী কথা বলছ তুমি ? তুমি আমাদের যে উপকার করলে, সে উপকার এ পৃথিবীতে কে কার জন্যে করতে পারে ?

—তোমার বাবা আর মা জানেন ?

—হ্যাঁ। আমি সব বলে দিয়েছি। বাবা অবিশ্যি কিছুই জানেন না, বাবাকে কিছু বলবার দরকারও হয় না।

—ওঁরা কেউ ভুল বুঝলেন না তো ?

—কেউ না। মা বরং বলেছেন, দেবু আমাদের সৌভাগ্য।

—তবে আমার সঙ্গে একটু এসো।

—কোথায় ?

—চলো, তোমার বাবা আর মাকে প্রণাম করে আসি।

হেসে ওঠে মিতালী—এঃ, তুমি দেখছি তোমার মা'র মত নিতান্ত সাধাসিধে মানুষ।

—না মিতালী, আমি ওঁদের বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি বাইরের মানুষ নই, আমি এবাড়ির একজন আপন মানুষ।

—একথা এবাড়ির কে না বুঝেছে ?

—তবু...।

—তবে, চলো।

ঘর থেকে বের হয়ে এগিয়ে আসে মিতালী ; হাসতে গিয়ে মাথা হেঁট করে।—শোনো মা, দেবু কী বলছে।

ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যান নীরজা—কী ?

মিতালী—দেবু তোমাকে আজ প্রণাম করতে চায়।

প্রণাম করে দেবু। নীরজা যেন হঠাৎ এক অদ্ভুত মুগ্ধতার আবেশে অভিভূত হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন—বেঁচে থাকো, সুখে থাকো, বাবা।

মিতালী—বাবাকে প্রণাম করবে দেবু।

চমকে ওঠেন নীরজা—অ্যাঁ, উনি তো খুবই অসুস্থ, হয়ত এখন ঘুমিয়ে আছেন। আজ বরং...।

দেবুর মুখের লাজুক হাসিটা আরও নিবিড় হয়ে যেন থমথম করে।—ঘুমিয়ে থাকলে আমি না হয় কিছুক্ষণ বসে থাকব। যখন জাগবেন, তখন...।

নীরজা—তা হয়ত হতে পারে ; কিন্তু, আচ্ছা এসো তবে।

ঘুমিয়ে নয়, জেগেই বসেছিলেন লোকনাথ। নীরজা বলেন—সুকুর বন্ধু দেবু তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

—অ্যাঁ ? সুকুর বন্ধু ? আমাকে প্রণাম করতে চায়। লোকনাথের গলার স্বরে যেমন বিস্ময়, দুই চোখেও তেমনই একটা বিস্ময় উথলে ওঠে। কলকাতার এই দশ বছরের জীবনে কেউ কোনওদিন লোকনাথকে প্রণাম করতে আসেনি। এমন কি সুধাদির তিন মেয়ের কোনও মেয়েও না। লোকনাথ শুধু জানেন, রায়গঞ্জের এক পঙ্গুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে, এমন মানুষ এই কলকাতাতে থাকে না, থাকতে পারে না।

প্রণাম করে দেবু। দেবুর মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করেন লোকনাথ—সুখে থাকো, বেঁচে থাকো।

দেবু বলে—আজ এখন চলি। আমার আবার একটা কলেজে সন্ধ্যায় ক্লাশ করতে হয়।

নীরজা বলে—দেবু হল কলেজের প্রফেসর। এম-এ পরীক্ষাতে সোনার মেডেল পেয়েছিল।

লোকনাথ—বাঃ, সুন্দর। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ, তোমার সবরকম কল্যাণ হোক, বাবা। এসো।

নীরজা হাসতে হাসতে ডাকেন—এসো, দেবু। ওরা সবাই তোমাকে কী যেন বলবার জন্যে মতলব এঁটেছে ; তোমাকে আটক করে ধরবে বলে সবাই নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

—হ্যাঁ, চলুন। দেবুও এগিয়ে আসে, আর নীরজার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে নেমে

যায়।

দেবু ? কে এই দেবু ? দেবুর পায়ের শব্দ শুনতে থাকেন লোকনাথ, আর দুঃসহ একটা বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা যেন তাঁর দুই চোখের সুস্থির দৃষ্টিটাকে কাঁপিয়ে দিতে থাকে। ইচ্ছা করে, ডাক দিয়ে এখনই জিজ্ঞাসা করেন, কী দেবু ? সুকু কী করে তোমার মত সোনার মেডেল এম-এ ছেলের বন্ধু হয় ? সুকু যে ক্লাশ নাইন থেকে ক্লাশ টেনে উঠতে পারেনি।

কিন্তু দেবু এখন সত্যিই নীচের তলার বাইরের বারান্দায় যেন মায়াবন্দি মুগ্ধ হরিণের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে সুকু, হাসছে পিয়ালী, একটা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে মিতালীও হাসছে। নীরজা বলেন—ওরা আজ তোমাকে এখনই ছেড়ে দেবে না, দেবু।

—কেন ?

নীরজা—ওদের ইচ্ছে, তুমি এবেলা এখানেই থাকবে, খাবে, বিকাল হবার পর যাবে।

ঠিকই, নীচের তলার বাইরে বারান্দাটাকে এখন সিনেমা-ছবি তোলবার একটা ফ্লোর বলে মনে হবে। কিন্তু মুগ্ধ হরিণকে যারা ঘিরে ধরেছে, তাদের দেখে কারও মনে হবে না যে, ওদের মুখের হাসিতে ব্যাধ-ব্যাধিনীর উল্লাস আছে। বরং মনে হবে, সুন্দর-সুন্দর কৃতজ্ঞতা যেন পরম এক উপকারের চারদিকে দাঁড়িয়ে প্রাণের অভ্যর্থনা নিবেদন করতে চাইছে।

নীরজা বলেন—সুধাদির বাড়িতে সেদিন কোন হোটেল থেকে খাবার কিনে আনা হয়েছিল, নামটা কি মনে আছে, সুকু ?

পিয়ালী বলে—হ্যাঁ ; পার্ক স্ট্রিটে মিসেস কার্ভালো'স কিচেন।

মিতালী—হ্যাঁ, চিনে রান্নার চেয়ে গোয়ানিজ রান্না অনেক অনেক ভাল।

নীরজা—তবে তাই কর, সুকু। কার্ভালোর কিচেন থেকে খাবার নিয়ে আয়।

দেবু যেন চমকে ওঠে, কিন্তু গলার স্বর তবু একটু ভীত হয়ে আপত্তি জানায়—না, না, মাপ করবেন। আমি ওসব খাবার খাই না, খেতে ভাল লাগে না।

সুকু—এঃ, তুমি দেখছি নেহাতই অর্থডক্স।

মিতালী মুখ টিপে হাসে—একেবারে পরমার্থডক্স। ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যেতে না পারলে মনে করেন যে, দিনটা বৃথাই গেল।

দেবু কুণ্ঠিতভাবে হাসে—না, না, সেরকম কিছু নয়।

পিয়ালী—দেবুদার লজ্জাটা কিন্তু সত্যই পরমার্থডক্স। দিদির সঙ্গে সিনেমাতে যেতে লজ্জা, জাহাজঘাটায় বেড়াতে যেতে লজ্জা, একসঙ্গে ফটো তোলাতে লজ্জা।

নীরজা—কিন্তু তুমি কথা দিয়ে যাও দেবু, মাঝে মাঝে নিজেই আসবে, মনে করিয়ে দিতে হবে না।

দেবু—নিশ্চয়।

শব্দ করে ছুটে আসে একটা স্কুটার। বারান্দার কাছে এসে থেমেই হাত তুলে একটা আবছা প্রীতির সঙ্কেত জানায়। পিয়ালীর সারা শরীরটা দুলে ওঠে। চেঁচিয়ে ডাক দেয়—চলে এসো, মোহন।

ছেলেটি বলে—না, এখন সময় নেই। কাল সকালে আসব ; যদি ডায়মন্ডহারবারের হাওয়া খেতে চাও, তবে তৈরি থেকো।

শব্দ করে চলে যায় স্কুটার। দেবুর দিকে তাকিয়ে নীরজা বলেন—কার সাধ্যি বলবে, ছেলেটা বাঙালি নয়।

দেবু—বাঙালি নয় ?

নীরজা—না। ওর নাম মোহন খোসলা। ওর বাবার মেশিন টুলের কারখানা আছে। শিগগির বিলেত যাবে মোহন, নতুন মেশিনের কাজ শিখতে।

সুকু বলে—বেচারা দেবুকে এখন তবে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

ঘরের ভিতরে চলে যান নীরজা আর সুকু। পিয়ালীও দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভিতরে রেডিওর চাবি আঁকড়ে ধরে। চলে যাবার জন্য বারান্দার সিঁড়িতে একটা পা নামিয়ে দিয়েই থমকে যায়, আর মুখ

ফিরিয়ে তাকায় দেবু। শুনতে পেয়েছে দেবু ; দরজার কাছে যেন একটা অভিমানী নিঃশ্বাসের ব্যথার শব্দ করুণ হয়ে ডুকরে উঠছে। ঠিকই ছলছল করছে, মিতালীর চোখ। কী অদ্ভুত মায়া প্রীতি আর ভালবাসা দিয়ে আঁকা দুটি চোখ। ওই মিতালী যে সেদিনও দেবুর হাত ধরে বলেছে ; তুমি আমাকে ভালবাস, এ সৌভাগ্য যে আমি স্বপ্নেও আশা করতে পারিনি।

দেবু বলেছিল—ও কথা বলো না। আমি জানি, তুমি আমার কে ? তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।

হেসে ওঠে মিতালীর ভিজে চোখ। —একথা আমি বিশ্বাস করি।

মিতালীর দুই চোখে আর কোনও ব্যথা কিংবা অভিমানের ছায়া নেই। টলমল করছে মিতালীর কালো চোখের মাযা ; তার উপর যেন ভোরের আলোর আভাও ছড়িয়ে পড়েছে। দেবু বলে, আমি স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবিনি যে, তোমার মত এত সুন্দর মেয়ে আমার মত মানুষকে এত ভালবাসবে।...আচ্ছা, আসি।

॥ ৭ ॥

প্রশ্নটা লোকনাথের বুকের ভিতরে তখনও ছটফট করছে।—কে এই দেবু ? ডাক দিলেন লোকনাথ—নীরু, একবার ওপরে এসো।

নীরজা আসেন। মুখে সেই অদ্ভুত উজ্জ্বলতার হাসি, কিন্তু তারই মধ্যে যেন একটা বিরক্ত অস্বস্তির ছায়া ছটফট করছে। নীরজা বলেন—আমার কাজের সময়ে এত ডাকাডাকি করো না।

লোকনাথ—কাজ ?

নীরজা—হ্যাঁ, অনেক কাজ।

—কিসের কাজ ?

—মার্কেটে যেতে হবে। দরকারের অনেক জিনিসপত্তর কিনতে হবে।

—টাকা ?

—টাকা আছে। তোমাকে ভাবতে হবে না।

—কে দিল টাকা ?

—দেবু।

—কেন ?

—দেবু আমাদের পর নয়। দেবু এখন আমাদেরই ছেলের মত।

—তার মানে ?

— দেবুর সঙ্গে মিতুর বিয়ে হবে।

—কিন্তু দেবু টাকা দেয় কেন ?

—দেবে না কেন ? দেবু তো তোমার সনাতন সরকারের ছেলেটির মত একটা সেকেলে সামান্য মানুষ নয়।

—দেবুর টাকা নিও না।

—কেন ?

—এরকম টাকা নেওয়া পাপ।

—তোমার মতে, তাই।

—আমার মতে নয়, নীরু। এই সংসারের নিয়মের মতে, মানুষের জীবনের মতে ওটা পাপ।

—তুমি রুগি মানুষ ; কেন এসব কথা নিয়ে মিথ্যে চিন্তা করছ।

—আমার প্রাণটাও কি রুগি হয়ে গিয়েছে।

নীরজা হাসি চাপতে চেষ্টা করেন—সেটা তুমি বুঝে দেখ।

—কিন্তু জেনে রাখ নীরু। বলতে বলতে বিছানার ওপর উঠে বসেন লোকনাথ। হ্যাঁ, উঠে বসবার ভঙ্গি দেখলে মনে হবে, রায়গঞ্জের লোকনাথের শুধু হাত দুটোতে নয় বুকের ভিতরেও লোহা

আছে। —খুব ভুল করছ, নীরু।

নীরজা—তুমি কী করে একথা বলতে পার, আশ্চর্য।

—তার মানে ?

—তুমিই তো সারাটা জীবন ভুল ক'রে সবাইকে দুঃখ দিলে। এখনও রায়গঞ্জে ফিরে গিয়ে সবাইকে আরও দুঃখের মধ্যে ফেলতে চাইছ। এতদিন তোমার ইচ্ছেয় সব হয়েছে ; কিন্তু আর নয়।

—এবার থেকে তবে তোমারই ইচ্ছায় সব চলবে ?

—অগত্যা, তোমার যখন কিছু করবার ক্ষমতাই নেই ; তখন তোমার এত কথা আর এসব কথা শোনাবার কোনও মানে হয় না।

লোকনাথ—ভাল কথা। তবে আমাকে একাই রায়গঞ্জে চলে যেতে হয়।

নীরজা—তোমার ইচ্ছা। আমি হ্যাঁ বলব না, না'ও বলব না।

চমকে উঠলেন লোকনাথ। যেন তাঁর ফুসফুসটা হঠাৎ একটা ছুরির খোঁচা হয়ে ফুটো হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর আর কেউ নয়, সেই নীরজাই কথা বলছে। নীরজার জীবনে রায়গঞ্জের লোকনাথ আজ আর কোনও সত্য নয়। লোকনাথ কাছে না থাকলেও নীরজার জীবনের কোনও ভয় আর নেই। এ কেমন করে সম্ভব ?

বুঝতে পারেননি লোকনাথ, কখন চলে গিয়েছেন নীরজা। ভবানীপুরের সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের বাড়িটার নীচের তলায় যেন খুশি কলরবের ঝড় ছুটোছুটি করছে। সবই শুনতে পাচ্ছেন লোকনাথ। কিন্তু মনে হয়, যেন ভয়ানক এক কালবোশেখী পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে : গাছ-পালা, ঘরের চালা, বাগানের গাছ ; সবই উপড়ে ও ছিঁড়ে লুটিয়ে দিচ্ছে। শুনতে পাওয়া যায়, বাড়িওয়ালা চৌধুরীবাবুর দারোয়ানকে ধমক দিচ্ছে সুকু—বাজে কথা বলবে তো চাবুক মেরে তোমার চামড়া ফাটিয়ে দেব। দাও তোমার বিল, আর টাকা নিয়ে সেলাম করে চলে যাও।

বাঃ, এ যে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প। শ্বেতহস্তী হঠাৎ এসে এ বাড়ির ভাগ্যটাকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। বিছানার ওপর স্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকতে অনেক চেষ্টা করেন লোকনাথ, কিন্তু মাঝে মাঝে ছটফট করে এপাশ-ওপাশ করেন, যেন তাঁর বুকের পাঁজরগুলো আগুনের আঁচ লেগে পুড়ছে।

নীরজার চোখে-মুখে ওই উজ্জ্বলতার হাসি ; এর চেয়ে দুঃসহ ভয়ের ছবি কোনও দুঃস্বপ্নেও দেখেননি লোকনাথ। না, এ জীবনে নীরজার আর সেই ছলছল ভিজে চোখ দেখতে পাবেন না লোকনাথ, যে চোখের মায়া তুচ্ছ করে আজও তিনি চলে যেতে পারেননি, রায়গঞ্জের রাধানাথের বিগ্রহের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়তে পারেননি।

কিন্তু আর তো দেরি করবার কোনও মানে হয় না। শুধু একবার রায়গঞ্জকে একটা খবর দেওয়া, যেন কাউকে পাঠিয়ে দেয়। লোকনাথকে রায়গঞ্জে নিয়ে যায়।

রায়গঞ্জের বাড়ি আর রাধানাথের মন্দির,. মাঝখানে শুধু বাঁশের একটি বেড়া। সেই বেড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সেই কদম, যার ছায়ার মত মিষ্টি ছায়া এ পৃথিবীর কোনও গাছতলায় আছে কিনা সন্দেহ। সেই ছায়াতে একটি মাদুর পেতে সকল-সন্ধ্যা গড়িয়ে পড়ে থাকলে মন্দ কী ? সেইখানে বসে রাধানাথের প্রসাদ খেয়ে প্রাণটাও কি জুড়িয়ে যাবে না ? তারপর, যেদিন রাধানাথের ইচ্ছা হবে, সেদিন ওই কদমতলাতেই শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়লেই হল।

সিঁড়ি ধরে পায়ের শব্দ উপরে উঠছে। চমকে ওঠেন, কান পেতে শুনতে থাকেন লোকনাথ। কী আশ্চর্য, সত্যিই যে রামদয়াল এসেছে।

—আমি একাই রায়গঞ্জে চলে যাব, রাম। তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও।

রামদয়াল—কেন ?

সব কথা শোনার পর রামদয়ালও স্বীকার করেন—হ্যাঁ, অগত্যা তোমার এখানে আর না থাকাই ভাল।

আরও আশ্বাসের কথা বলেন রামদয়াল—রায়গঞ্জে থাকতে তোমার এখন তেমন কিছু অসুবিধে হবে না। নীচের তিন চারটি ঘর ভাড়া দিলে আশি-পঁচাশি টাকা পাওয়া যাবে। তা ছাড়া কালাচাঁদ

আছে ; সে তোমার সব রকম যত্ন নেবে। তার উপর, নিতাই কবিরাজ আছে। রতন ভট্চায আছে, বীরু আর হর্ষনাথ আছে। সবাই, সবাই তোমার দেখা শোনা করবে। চিন্তা করবার কিছু নেই, কোনও অসুবিধে নেই।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন রামদয়াল।—আমি আজই রায়গঞ্জে গিয়ে হর্ষনাথ আর বীরুকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তোমার হাতে এখন টাকা না থাকলেও ভেবো না। আমি দেব টাকা। পরে শোধ করে দিও।

সিঁড়ির কাছে এসেই লোকনাথের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় রামদয়াল।—কী বলছ ?

লোকনাথ—সত্যিই কি আমার এখন রায়গঞ্জে চলে যাওয়াই ভাল ?

রামদয়াল তাঁর সাদা মাথাটাতে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন, তারপর হাসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাসিটাও যেন করুণ হয়ে গিয়ে ছল-ছল করে—যেতে ইচ্ছে করছে না, না ?

লোকনাথ—না।

রামদায়—কেন আর কিসের জন্য, লোকনাথ ?

কথা বলেন না লোকনাথ। দুই চোখ বন্ধ করে যেন নিজেই একটা অন্ধকারের মধ্যে রহস্যটাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন।

লোকনাথের গায়ে হাত বুলিয়ে লোকনাথের একটা হাত ধরে রামদয়াল আবার প্রশ্ন করেন—কার জন্য মন কাঁদে, লোকনাথ ?

লোকনাথ—বুঝতেই তো পারছ।

রামদয়াল—নীরজার জন্য।

লোকনাথ—হ্যাঁ। সংসারের বিপদ-আপদের হাজার উৎপাতের মধ্যে ওকে এখানে ফেলে রেখে, আমি যে রায়গঞ্জের রাধানাথের কদমতলাতে পড়ে থেকেও কোনও শান্তি পাব না, রাম।

রামদয়াল—তা হলে থাক, রাধানাথের যা ইচ্ছে, তাই হবে।

॥ ৮ ॥

পাড়ার লোকে বলে, সাত নম্বরের গা ঘেঁষে ওই যে পুরনো পড়ো বাড়িটা, যার ছাদ দেয়াল ফুঁড়ে ছোট ছোট অশ্বত্থের শিকড় ঝুলছে, অনেক রাতে সেই বাড়ির উপরতলার ঘরের ভাঙা জানালাতে ছায়া-ছায়া চেহারা কাদের যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। শব্দ করে না, খুব বেশি নড়া-চড়া করে না, শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। ভোরের কাক ডেকে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ওইসব ছায়াশরীর যেন ওই পড়ো বাড়ির বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

সাত নম্বরের লোকনাথ রায় যখন মাঝরাত পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে শুয়ে থেকেও ঘুমোতে পারেন না, বিছানার উপর উঠে বসেন, আর জানালা দিয়ে পড়ো বাড়ির ছাদের দিকে তাকান, তখন তাঁরও মনে হয়, ওই তো ওরা দাঁড়িয়ে আছে, আর আশ্চর্য হয়ে বিছানায় বসা এই লোকনাথ রায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকনাথের তখন নিজেকে ওদেরই জগতের একটি ছায়া-মানুষ বলে মনে হয়।

পঞ্জিকা দেখে হিসেব করলে বোঝা যায়, একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চোখ বন্ধ করে আর কপালে হাত বুলিয়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করলে মনে হয়, এক বছর হতে পারে, আবার পাঁচ বছরও হতে পারে। পা দুটো আরও সরু হয়েছে, মাথার চুল আরও সাদা হয়েছে। রামদয়াল কি বেঁচে আছে ? বেঁচে থাকলে এই এক বছরের মধ্যে তার একটা চিঠিও এল না কেন ?

নীচের তলার দুটো ঘরের জীবন যে এই এক বছরে কত রঙিন হয়ে গিয়েছে, সে সত্য চোখে দেখে জানবার কিংবা বুঝবার চেষ্টা করেননি লোকনাথ। চেষ্টা করবার কথাও নেই। সে সংসারে নীরজাই রাজেশ্বরী। তাঁর এক ছেলে আর দুই মেয়ের জীবন রায়গঞ্জের অভিশাপ কাটিয়ে সুখে থাকবার এক অদ্ভুত সৌভাগ্যের নাগাল পেয়েছে, সে তো নীরজারই প্রতিজ্ঞার জয়। সুধাদিকে আজ-কাল প্রায়ই একটা কথা শুনিয়ে দেন নীরজা—আমার অন্য এক জামাই যে বিলেতে যাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, সুধাদি।

সুধাদি হাসেন—যাবেই তো ; যদি বুদ্ধি ঠিক রেখে চলতে পারিস, তবে আমার মত তোরও দুই জামাই বিলেত যাবে।

হ্যাঁ, একটি রেফ্রিজারেটর কিনে ফেলা হয়েছে। সুধাদির বাড়িতে যে রেফ্রিজারেটর আছে, ঠিক তেমনটি। সুকু বলেছিল—দেবু কিন্তু আপত্তির একটিও কথা বলেনি, মা। একটা রেফ্রিজারেটর কেনা দরকার, শুধু এইটুকু বলেছি : অমনি দেড় হাজার টাকার একটা চেক লিখে আমার হাতে তুলে দিল।

সুধাদি একবার একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কারণ মিতু আর পিয়া দুজনে সেদিন সুধাদির দুই মেয়ে জনা আর লীনার সঙ্গে তর্ক বাধিয়েছিল। মিতু বলেছিল, যাই বলুন জনাদি, আপনার ওই খোঁপার স্টাইল কিন্তু খুবই সেকেলে।

—তার মানে ?

প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেয় পিয়া—আপনার ওই খোঁপাটা হল, জারিনা খোঁপা। ওটা আজকাল কেউ পছন্দ করে না।

লীনা—আজকালের পছন্দটা কী ?

পিয়া—এই যে, আমার খোঁপা ; ক্যাথরিন হেপবার্ন স্টাইল।

জনা—কোথায় শিখলে এই স্টাইল ?

মিতু—রীতিমত টাকা খরচ করে শিখতে হয়েছে। পার্ক স্ট্রিটের বিউটিসিয়ান পামেলা হ্যারিসনের নাম শোনেননি ?

জনা—না।

মিতু—তারই সেলুনে গিয়ে হেপবার্ন স্টাইলের খোঁপার কাজটা শিখে নিয়েছি।

সুধাদি হঠাৎ এসে দুই চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন, আর বেশ একটু ঝংকার দিয়ে কথা বলেন—ঠিকই তো, নীরুর হাতে যখন এত টাকা এসেছে, তখন মেয়েদের শখের জন্যে এরকম দু চারটে বড়-খরচ তো হবেই। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, টাকা এল কোথা থেকে ?

মিতু—সে কথা জিজ্ঞেস করবার কোনও মানে হয় না, মাসিমা।

সুধাদি—কেন ?

পিয়া—আমরা তো কোনওদিন জিজ্ঞাসা করিনি, আপনার হাতে এত টাকা এল কোথা থেকে ?

সুধাদি ভ্রূকুটি করে হাসতে থাকেন—সত্যি, এই এক বছরে তোরা খুব কথা বলতে শিখেছিস। ভাল।

মাস ছয় আগে হঠাৎ এক সন্ধ্যাবেলায় এই ঘরের ভিতরে তন্দ্রার মধ্যে নীরজার গলার স্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিল লোকনাথ। নীরজা ডাকছেন—এই দেখো, কে এসেছে।

—কে ? কে ? দুই চোখ টান করে দেখতে থাকেন লোকনাথ। লোকনাথের বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে একটি মেয়ে। টুনি আর টুসির সঙ্গে তুলনাই চলে না, রূপসী মেয়ে নয়, নিতান্ত সামান্য সাধারণ চেহারার একটি মেয়ে। মুখে কিন্তু বেশ শান্ত একটি হাসি ; আর চোখের তারা দুটোও খুব কালো।

নীরজা বলেন—ওর নাম বীণা, সুধাদির এক দেবরের মেয়ে ; সেই দেবর জার্মানিতে থাকে। তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

—প্রণাম ? আমাকে ? বলতে বলতে আশ্চর্য হয়ে উঠে বসেন লোকনাথ।

নীরজা হাসেন—হ্যাঁ, ও যে আমাদের সুকুর বউ।

লোকনাথের দুই চোখে যেন একটা জ্বালার শিখা ধিকধিক করে কাঁপে—কবে সুকুর বিয়ে হল ?

নীরজা—আজ।

—কেমন বিয়ে ?

—আজকাল যেমন হয়, রেজিস্টারি করে।

—হোক, কিন্তু আজকাল কি বিয়েতে শাঁখ বাজে না ?

নীরজা মুখে আঁচল দিয়ে হাসেন—হ্যাঁ, রায়গঞ্জের বিয়ের মত বিয়ে হলে শাঁখ বাজে।

—তবে রায়গঞ্জের মত প্রণাম করাবার জন্য এই মেয়েকে এখানে নিয়ে আসা উচিত ছিল না।

নীরজা—ঠিক, যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। সুকুও ঠিক বুঝেছে, তুমি এসব কথা বলবে বলেই সুকু এখানে আসতে চাইল না।

লোকনাথ—ভালোই করেছে। বুঝতে পারছি না, সুকুর বউ বা কেন আসে ? আমাকে প্রণাম না করলেও তো বেশ চলে যাবে, চলে যাচ্ছেও।

বীণা কিন্তু তখনি লোকনাথের দুই সরু পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটা প্রণাম করে ফেলে। লোকনাথ বলেন—কী বলব, বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, সুখে থাকো।

চলে যায় বীণা। নীরজাও তখনি চলে যেতেন, কিন্তু কথা বলে বাধা দিলেন লোকনাথ—সুকু বিয়ে করল কেন ?

নীরজা—এ আবার কেমন কথা ? বিয়ের বয়স হয়েছে। একটি মেয়েকে ভাল লেগেছে। তাই তাকে বিয়ে করেছে। এর মধ্যে আবার কেন কিসের ?

লোকনাথ— সুকু কি কোনও কাজর্ম করে ?

—হ্যাঁ।

—কিসের কাজ ?

—একটা কারখানায় কাজ করে, দেবু পাইয়ে দিয়েছে এই কাজ। মাইনে সামান্য, একশো দশ টাকা মাত্র।

—সুকুর এখন বিয়ে না করাই ভাল হত।

—কেন ?

—কলকাতার মত জায়গায় ওই রোজগারের ভরসায় কারও বিয়ে করা উচিত নয়।

—শুধু রোজগারটাই বড় করে দেখছ কেন ? একটা ছেলের জীবনে ভালবাসার কি কোনও দাম নেই ?

—আছে নিশ্চয়, কিন্তু সত্যিই যদি ভালবাসা হয়।

—এসব কথা, রামদয়ালবাবুকে শোনাবে ; আমাকে শোনাবার কোনও মানে হয় না।

—তোমাকেও শোনাবার দরকার আছে, নীরু, তোমারও শোনবার দরকার আছে।

—আমার তো মনে হয়, কোনও দরকার নেই।

—তুমি একটু একলা মন নিয়ে, সুধাদির বাড়িতে যাওয়া একটা মাস বন্ধ রেখে, আর পার যদি, রায়গঞ্জের রাধানাথের মূর্তিটাকে একটু স্মরণ করে একবার ভেবে দেখো, তবেই বুঝতে পারবে, এমন করে সব কিছু উল্টে-পাল্টে দিতে নেই।

নীরজা— এই জন্যেই সুকু তোমার কাছে আসতে চাইল না।

—কী জন্যে ?

—যা বোঝ না, তাই নিয়ে খামকা যত আপত্তির ধর্মকথা বলো না। তুমি তো কাউকে সুখে রাখতে পারলে না, আমরা যা-হোক নিজের বুদ্ধিতে আর চেষ্টাতে সুখে থাকবার একটু চেষ্টা করছি। এর মধ্যে তুমি যে কী ভুল দেখলে, কী অন্যায় দেখলে, তা তুমি জান, আর তোমার রায়গঞ্জের রাধানাথ জানেন।

—নীরু ! চেঁচিয়ে ওঠেন লোকনাথ।

—কী বলো ? চেঁচিয়ে ওঠেন নীরজা।

—রাধানাথ সত্যই জানেন। বলতে গিয়ে পঙ্গু লোকনাথের গলার স্বর যেন একটা গর্জন হয়ে বেজে ওঠে। কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে হাসতে থাকে নীরজার দুই চোখ। আমি আসছি, বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে নেমে যান নীরজা।

এই রকম এক-একটি ঘটনা ; এই এক বছরের এক একটি আচমকা বিস্ময়ের মত লোকনাথের পঙ্গু জীবনের অনেক মুহূর্তকে চমকে দিয়েছে, কখনও ব্যথা দিয়ে, কখনও বা ভয় পাইয়ে দিয়ে। সবচেয়ে বেশি উল্লাস নিয়ে যে কথাটা বলেন নীরজা, সেটা হল দেবু নামে সৌভাগ্যের কথা। দেবু আমার ছেলের মত নয়, ছেলের চেয়েও আপনজন। দেবু থাকতে আমার কোনও চিন্তা নেই। দেবু ছিল

বলেই তো মিতু আর পিয়া দুই বোনে শখ করে একবার শিলং বেড়িয়ে আসতে পেরেছে। শিলং-এ যাবার প্লেনের ভাড়া, শিলং-এর হোটেলে এক সপ্তাহ থাকবার খরচ, সবই দেবু দিয়েছে।

একদিন পিয়ালীর গলার স্বর শুনে লোকনাথের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। পিয়ালী এসে বলে গেল, আমি নাচের ডিপ্লোমা পেয়েছি, বাবা। মণিপুরি আর কথাকলি খুব ভাল শিখেছি। মোহনের বোন রেণু খোসলা বলেছে, এইবার, পোলকা আর বুগি-উগি শিখিয়ে দেবে।

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন লোকনাথ।

মিতু এসে একদিন বলে গিয়েছে— আমি পাস করেছি, বাবা। ডমেস্টিক সায়েন্সে আর-একটু হলে লেটার পেয়ে যেতাম। ভাবছি, এম-এ পড়ব কিনা।

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন লোকনাথ। এসব যেন এক অকল্প জগতের যত কলরব, তার অর্থ কিছুই স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন না লোকনাথ। শুধু বুঝতে পারেন, তিনি হার মেনে যেখানে একবার থেমে গিয়েছেন, সেখানে এরা কেউ হার মানেনি, থেমেও যায়নি, সবাই চলেছে, এগিয়ে যাচ্ছে। রায়গঞ্জ ওদের কাছে এখন একটা মিথ্যা বিভীষিকা মাত্র।

আজ সকাল থেকে এই সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের নীচের তলার দুটি ঘরে যে উৎসবের মুখরতা উতরোল হয়ে বাজছে, সে উৎসবেরও কোনও খবর রাখেন না লোকনাথ। শুধু জানেন, ওদের জীবনে নিশ্চয় কোনও নতুন সুখের হাসি ফুটে উঠেছে। তাই এই উৎসব।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বীণা সেদিন এসে বলে গিয়েছিল, মিতুর চাকরি হয়েছে, বেশ ভাল চাকরি। মাইনে প্রায় তিনশো টাকা। সেই জন্য শিগগির একদিন খাওয়া-দাওয়ার একটা উৎসব করা হবে।

ঠিকই বুঝেছেন লোকনাথ। আজ এই বাড়ির জীবনে একটা নতুন উৎসবের সাড়া জেগেছে। মিসেস কার্ভালোর কিচেন থেকে অনেক খাবার এসেছে। শুধু জানেন না যে, যাকে প্রীতি আর কৃতজ্ঞতার ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা করবার কথা, সে মানুষটি এরই মধ্যে এই সকালেই এসে নীচের তলার একটি ঘরে বসে আছে।

দুপুর হল, উৎসবের হর্ষ মৃদু হতে হতে নীরবও হয়ে গেল। বোঝা যায় না, নীচের তলার ঘরে কেউ আছে কিনা। কিন্তু সিঁড়িতে আগন্তুক পায়ের মৃদু শব্দ বাজে। দেবু উঠে এসে লোকনাথের ঘরে ঢোকে, আর বিছানার কাছে গিয়ে ডাক দেয়— কেমন আছেন ?

—কে তুমি ? ও তুমি ! তাই বলো ! চমকে উঠলেও বেশ উদাস স্বরে, যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথা বলেন লোকনাথ।

—হ্যাঁ, আমি। হাসতে থাকে দেবু। —ওরা আমাকে নেমন্তন্ন করেনি, তবু আমি এসেছি। শুধু আপনাকে একটু দেখে যাবার জন্য।

লোকনাথ— তোমাকে নেমন্তন্ন করেনি ; তবে কাকে নেমন্তন্ন করল ?

দেবু হাসে— সুললিতের নেমন্তন্ন ছিল। সে-ই এসেছিল।

—সুললিত ? সে কে ?

দেবু— সুকুর বন্ধু সুললিত সরকার। চমৎকার মানুষ। সুললিতের বাবা খুব বড় অ্যাটর্নি, চারটে চা-বাগান আছে। বাপের একমাত্র ছেলে সুললিত। কাজেই, সুললিতের জীবনে টাকা-পয়সার কোনও অভাব নেই।

লোকনাথ— বুঝলাম। কিন্তু সুললিতের নেমন্তন্ন কেন ?

দেবু— সুললিতের সঙ্গে আপনাদের মেয়ে মিতালীর বিয়ে হবে। সুললিতই চেষ্টা করে মিতালীর চাকরি যোগাড় করে দিয়েছে।

—তুমি মিথ্যে কথা বলছ দেবু। হতে পারে না ; অসম্ভব। তুমি ভুল করে এসব কথা বলছ।

দেবু— না, ভুল করে নয়। আপনি সুকুকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখবেন।

দেবুর মুখের দিকে দুই চোখের স্তব্ধ সাদাটে দৃষ্টিটাকে মেলে দিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকেন লোকনাথ। দেবু বলে— আপনি কিন্তু দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি অভিযোগ করতে আসিনি।

—তোমার কোনও অভিযোগ নেই ?

—না।
—তুমি কি এই একটা বছর এই বাড়ির সব দরকারের টাকা যোগাওনি ?
—হ্যাঁ, টাকা দিয়েছি। কিন্তু তাতে কী হয়েছে ?
—তোমার সঙ্গেই তো মিতুর বিয়ে হবে বলে কথা ছিল।
—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু সেসব কথা আমি এখন মনে আনি না।
—এজন্য তোমার মনে কোনও রাগ নেই ?
—না।
—এদের ওপর একটু ঘৃণা হয় না ?
—না।
—কেন ?
—মিতালী সুখী হয়েছে, ব্যস, আমার তো আর কিছু জানবার দরকার হয় না।
—তার মানে ?
—মিতালী সুখী হলেই, আমি সুখী।

দুই হাত দিয়ে দেবুর একটা হাত আঁকড়ে ধরেন লোকনাথ।— তোমাকে চিনলাম দেবু। রাধানাথ তোমাকে সুখে রাখুন।

দেবু— নিশ্চয়, আপনার আশীর্বাদ যখন আছে, তখন আমি সুখে থাকবই।
লোকনাথ— তুমি তো এই কলকাতার ছেলে ? শ্যামবাজারে থাক ?
—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আর শ্যামবাজারে থাকব না।
—কেন ?
—বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছে।
—এ বাড়ির সুখের দাবি মেটাবার দায়ে ? তাই না ?
—এসব কথা তুলবেন না। যা হল ভালই হল ; এ বিশ্বাস আমার আছে।
চোখে হাত বুলিয়ে চোখ মোছেন লোকনাথ। —দেবু ?
—বলুন।
—তুমি এর পর কোথায় থাকবে ? আমাকে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাও।
—যে আজ্ঞে।

পকেট থেকে কাগজ বের করে ঠিকানা লেখে দেবু।—যাচ্ছি দমদমের বসাকবাগানে একটি ভাড়া-বাড়িতে। মন্দ নয় বাড়িটা। আশি টাকা ভাড়া।

লোকনাথ— আমাকে একটা কথা দিয়ে যাও, দেবু।
—বলুন।
—আমি যদি কখনও তোমাকে ডাকি, তবে তুমি আসবে ?
—নিশ্চয় আসব। সে কথা কি বলতে হবে ?

লোকনাথ— এসো তবে। তুমি যদি বয়সে আমার চেয়ে এত ছোট না হতে, তবে আমি আজ তোমার পা ছুঁয়ে...।

—ছি-ছি ! ও কথা বলতে নেই। বলতে বলতে লোকনাথের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে দেবু। চলে যায় দেবু।

॥ ৯ ॥

নীরজা বলে— কী হয়েছে ? তখন থেকে এত চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করছ কেন ?
লোকনাথ বলেন— একটা কথা বলবার জন্যে ডেকেছি।
নীরজা— বলো।
লোকনাথ— দেবুর ঠিকানা আমার কাছে আছে। হয় তুমি, নয় সুকু, কিংবা টুনি একবার দেবুর

কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে এসো।

নীরজা— কেন ? কী অপরাধ করলাম যে মাপ চাইতে হবে ?

লোকনাথ— ফুলকে ছিঁড়লেও পূজোর থালায় রাখতে হয়, কাদার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয় না।

—একথার মানে ?

—দেবুকে তুচ্ছ করো না।

—তুচ্ছ তো করছি না। মিতু বলেছে, দেবুর উপকারের সব টাকা একদিন শোধ করে দেওয়া হবে।

—টাকা শোধ হতে পারে বটে ; কিন্তু দেবুর উপকার শোধ করা সম্ভব নয়।

নীরজা হাসেন— মানুষের মন কি লোহা, যে বদলাবে না ?

—কী বলছ তুমি ? বুঝতে পারছি না।

—মিতুর যদি মনে হয় যে, দেবুর চেয়ে ললি অনেক—

লোকনাথ— ললি কে ?

নীরজা— আমাদের সুললিত। মিতু যদি বিশ্বাস করে যে, ললির সঙ্গে বিয়ে হলেই সুখী হবে মিতু ; তবু কি দেবুকেই বিয়ে করবে মিতু ? এটা কি আত্মবঞ্চনা নয় ? শুধু এক বছর আগের একটা কথার জন্য নিজের জীবনটাকে ঠকাবে মেয়েটা ? ছি ছি, এমন কথা বলতে তোমার একটু লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।

লোকনাথ— লজ্জা পাচ্ছি না ; কিন্তু বেশ একটু ভয় পাচ্ছি, নীরু। এরকম করে সব উল্টে-পাল্টে দিও না।

নীরজা— এই জন্যেই সুকু আগে থেকে সাবধান করে দিয়েছে ; বাবাকে কোনও কথা বলো না, মা। বাবা শুধু বাধা দিতে আর আপত্তি করতে জানে। আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

লোকনাথ— ঠিক কথা। ঠিকই বলেছে সুকু। তবু আমি বলছি, দেবুকে তুচ্ছ করো না।

নীরজা— দেবুকে তুচ্ছ করবার কোনও কথাই নেই। দেবুও ভালই জানে, ললির তুলনায় সে কিছুই নয়।

লোকনাথ—কিন্তু এই সুললিত কি দেবুর মত মায়া নিয়ে...।

—তার চেয়ে বেশি মায়া নিয়ে ললি আমাদের কাছে এসেছে ! দেবু তো তোমার মেয়েকে বিয়ে করে নিজের ঘরে নিয়ে যেত।

—সেটাই তো নিয়ম। তাতে রাগ করবার কী আছে ?

—মানুষ কি নিয়মের চাকর ? না, নিয়ম হল মানুষের চাকর ?

—দুইই সত্যি।

—না, আমাদের দরকারে যে নিয়ম সাজে, আমরা সেই নিয়ম মানব !

—তার মানে, সুললিত তোমাদের ঘরজামাই হবে।

—রায়গঞ্জের ভাষায় কথা বলতে হলে, তাই বলতে হয়। কিন্তু ঘরজামাই নয়, ললি আমার কাছে ছেলের মত। তাই বা বলি কেন ? ছেলের চেয়েও বেশি। নিজের ছেলে তো আজ পর্যন্ত নিজের টাকায় নতুন বউকে একটা শাড়ি কিনে দিতেও পারল না। কিন্তু ললি এরই মধ্যে তোমার ছেলের বউকে সোনার হার দিয়েছে।

লোকনাথ— আর শুনতে চাই না।

নীরজা হাসেন— তবে চুপ করে শুয়ে থাক আর ঘুমোও।

—ললিদা ! ললিদা এসেছে। শুনতে পেয়েছেন নীরজা, চেঁচিয়ে কথা বলছে পিয়া। ললির গাড়ির হর্নের শব্দও বেজে উঠল।

নীরজা ব্যস্ত হয়ে নীচে নেমে আসেন। আর পিয়া ব্যস্ত হয়ে সুললিতের গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে, পিয়ার দুরন্ত উল্লাসের শরীরটাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ; হাসতে হাসতে, আর আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ির বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায় সুললিত।

নীরজা হাসেন, সুকুও হাসে, আর পিয়াও ছটফট করে হাসে— আমাকে ছেড়ে দিন, ওই ঘরের ভিতরে যান।

এই তো মাত্র তিন মাস আগে, দেবুর কলেজের কমনরুমে সুকুর সঙ্গে এই সুললিতের প্রথম দেখা আর আলাপ। এক বন্ধুর ছোট ভাইকে কলেজে ভর্তি করবার জন্য এসেছে সুললিত, দেবুরই ছাত্র জীবনের বন্ধু সুললিত। সুকুর সঙ্গে সুললিতের পরিচয় তো দেবুই করিয়ে দিয়েছিল। আর সুকু নিজেই উৎসাহিত হয়ে সুললিতকে তখন চা খেতে নেমন্তন্ন করে সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। আর মিতুও নিজেই চা নিয়ে সুললিতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

মিতুর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে অপলক হয়ে গিয়েছিল সুললিতের দুই চোখ। যেন অনেকদিনের হারানো একটা সুস্বপ্নকে আজ হঠাৎ ভাগ্যক্রমে আবিষ্কার করতে পেরেছে সুললিত। সুললিতের চোখে বিস্ময়, আর বিস্ময়ের মধ্যেও অদ্ভুত একটা মুগ্ধতা।

চা খাওয়া শেষ হতেই সুললিত বলে— ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রথম যখন মেরিকে দেখলেন, তখন তাঁর কী মনে হয়েছিল, জানেন তো ?

মিতু হাসে— জানি না। আমি ইংলিশে অনার্স নিইনি।

সুললিত— ওয়ার্ডসোয়ার্থের মনে হয়েছিল, মেরি যেন ফ্যান্টম অব ডিলাইট।

মিতু— আমাকে দেখে কোনও বোকা ওয়ার্ডসোয়ার্থের মনেও এরকম কোনও ধারণা হবে না।

সুললিত— জানি না ; তবে আপনার সঙ্গে আমি কোনও তর্ক করব না।

সুকু— ওকে আপনি আবার আপনি করে বলছেন কেন ?

সুললিত— বেশ তো, আর কখনও বলব না।

সেদিনই সুললিতের চলে যাবার সময় মিতু বলেছিল— আবার কবে আসছেন ?

সুললিত— আমাকে ওরকম আপনি করে বললে কোনওদিনও আসব না।

মিতু সঙ্গে সঙ্গে বলে— কবে আসবে বলো ?

সুললিত— তুমি আসতে বলছ ?

মিতু— হ্যাঁ।

সুললিত— তবে, কালই একবার আসব।

সুললিত চলে যাবার পরে সেদিনই এ বাড়ির সবাই বুঝতে পারে, এই সুললিত যেন একটি আশ্চর্যের রূপকথা। শুধু চা বাগান থেকেই বছরে আয় হয় প্রায় এক লাখ টাকা। সুকু বলে— দেবু নিজেই সুললিতের অবস্থার অনেক কথা বলেছিল। ওই সুললিত বাপের একমাত্র ছেলে। বেহালাতে তিনতলা বাড়ি আছে। শুধু হাত খরচের জন্য বাপের কাছ থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা পায় সুললিত। কিন্তু বেঁচে থাকতে ছেলের প্রতি এর চেয়ে বেশি কোনও উদারতা আর দেখাবেন না অ্যাটর্নি পিতা, পি এন সরকার, প্রিয়নাথ সরকার। বাপের সঙ্গে ছেলের একটা মন-কষাকষির ব্যাপার আছে। পি এন সরকারের ইচ্ছা, তাঁর কুটুম্ববন্ধু নরেন দত্তের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হোক। কিন্তু সে মেয়ে সুললিতের একটুও পছন্দ নয়। সে মেয়ে দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু গ্ল্যামার বলে কিছু নেই। সে মেয়ে রাঁধে ভাল, গান করে ভাল, এম-এ পড়ে ; কিন্তু সকাল-সন্ধ্যা আবার গীতা পড়ে।

হেসে ফেলেন নীরজা। মিতু আর পিয়াও হাসে। সুকু বলে— আমার ধারণা, মিতুকে সুললিতের চোখে খুবই চার্মিং বলে বোধ হয়েছে।

ভুল ধারণা করেনি সুকু। দশটি দিন এ বাড়িতে যাওয়া-আসা করবার পর সুললিত নিজেই একদিন বুঝিয়ে দিল যে, মিতুকে সুললিত ভালবেসেছে। দরজার পর্দা সরিয়ে দিতে গিয়ে সে দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল পিয়া ; ওই ঘরের ভিতরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর মিতুকে দুই হাতে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে রেখে, মিতুর কপালে চোখে ও মুখে চুমোর বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়েছিল সুললিত। ফুঁপিয়ে উঠেছিল মিতু, তোমার পায়ে পড়ি ললি, আর আমাকে মিথ্যে স্বপ্ন দিয়ে ভুলিয়ে রেখো না।

—মিথ্যে ? সুললিত আশ্চর্য হয়ে তাকায়।

মিতু— তবে এখনও স্পষ্ট করে বলছ না কেন ?

—এই কথা। হেসে ফেলে সুললিত, আর মিতুর হেপবার্ন খোঁপার সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে দিয়ে প্রাণের ভিতরে চাপা একটা স্বপ্নের ভাষা উথলে দেয়— তবে মিতু ; আমার সবার আগের কাজ হবে, বাবাকে জিজ্ঞেস করা, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে বাবা রাজি আছে কিনা। যদি তিনি রাজি না হন, তোমাকে যদি আমি বেহালার বাড়িতে নিয়ে যেতে না পারি, তবে আমাকেই তোমাদের এই বাড়িতে এসে থাকতে হবে।

মিতু— আসল কথাটাই তো বাদ দিলে।

সুললিত— বিয়ে ? সে তো এর মধ্যে যে কোনও একটি দিনে হয়ে যেতে পারে। যেদিন বলবে, সেদিনই।

সুললিতের পকেট থেকে রুমাল বের করে নিয়ে, এক হাতে সুললিতের কপালে রুমাল বুলিয়ে দিতে থাকে মিতু। সত্যিই যে ললির নিঃশ্বাসটা বড় উষ্ণ, কপালে কুচি-কুচি ঘামের ফোঁটাও চিকচিক করছে। মিতু বলে— কিন্তু তোমার বাবা যদি রাগ করেন, তবে তোমাকে তো দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে।

—কিসের দুশ্চিন্তা ?

—দার্জিলিংয়ের চা বাগান, বেহালার বাড়ি, তোমার বাবা তাঁর এসব সম্পত্তি কি কোনওদিন তোমার হাতে ছেড়ে দিতে চাইবেন ?

—এই কথা ! হেসে ফেলে সুললিত। —সে জন্যে আমার কোনও ভাবনা নেই, মিতু। আমি জানি, উইল করে সব সম্পত্তি আমাকেই দিয়েছেন, বাবা ; কোনও দাতব্য সেবার মিশনকে দেননি ; তা ছাড়া, বাবার রাগ। সে তো পদ্মপত্রনীর। রাগের পরে দু'চার দিন মেজাজ গরম করে রাখবেন, তার পর একদিন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়বেন, তার পর সেই রাগ টুপ করে ঝরে পড়ে যাবে।

ভাগ্যিস এসব কথা কান পেতে শুনতে পেয়েছিল পিয়া ; তাই নীরজা আর সুকুও জানতে পেরেছে। কিন্তু এ ছাড়া আর যা দেখেছিল, এবং আর যে কথা শুনেছিল পিয়া, তার সবই একটা নতুন প্রাণের জগতের বিস্ময় হয়ে পিয়ার চোখ দুটোতে চমৎকার একটা সুখের বেদনা ভরে দিয়ে নিবিড় করে দিয়েছিল। জানালার ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারেনি পিয়া। সত্যি, এই ললিদা যেন চুমো-খাওয়া আর জড়াজড়ি করা একটা উৎসবের হিরো। ভালবাসার অনেক নাটক-নভেল পড়েছে পিয়া কিন্তু তার মধ্যে ললিদা'র মত কোনও হিরোর সাক্ষাৎ পায়নি। সেই গোবেচারা দেবুদা, মিতুদির সঙ্গে এক সোফায় বসতে যার শরীরটা লজ্জায় কুঁকড়ে যেত, তার সঙ্গে এই ললিদার কত তফাত। টিপ টিপ করছে পিয়ার বুকটা, তবু জানালার ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারেনি। কী আশ্চর্য, মিতুদি যে একটি বারও 'না' বলে সামান্য একটা আপত্তিও করল না। হেপবার্ন খোঁপার ছাদ খুলে গিয়েছে ; যেন এলোমেলো ফুলের গুচ্ছের মত ভাঙা-ভাঙা হয়ে সোফার উপর পড়ে গেল মিতুদি। কী অদ্ভুতভাবে আর কত শক্ত ক'রে মিতুদির ওই নরম শরীরটাকে আঁকড়ে ধরলেন ললিদা। না, ললিদা সত্যিই অদ্ভুত চমৎকার সুন্দর সাহসের আর আনন্দের মানুষ।

সেদিন শুধু একা পিয়ালীই বুঝতে পেরেছিল, ললিদার সঙ্গে মিতুদির বিয়ে তো হয়েই গিয়েছে, বাকি কিছু নেই, শুধু বাকি আছে একদিন বিয়ের রেজিস্টারের কাছে যাওয়া, আর খাতায় সই করা।

আর তিনমাস পরে, যেদিন মিতালীর পাশের খবর বের হল, সেদিন নয়। আরও একমাস পরে, যেদিন মিতালীর একটা চাকরি হল, সেদিনই বিয়ে হয়ে গেল। রেজিস্টারের সামনে যখন দু'জনে বসেছিল, তখন সুললিতের জামার বুকের বোতামঘরে মস্তবড় একটি লাল গোলাপ পরানো ছিল ; আর মিতালীর হেপবার্ন খোঁপার সঙ্গে একটি হলদে গোলাপ।

শাঁখ বাজেনি, তবে রায়গঞ্জের মানুষটি বুঝবেন কী করে যে, এবাড়িতে দুই-জীবনের মিলনের উৎসব হয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যার পর পুত্রবধূ সেই বীণা, যার মুখে সদা-সর্বদা একটা অদ্ভুত শান্তির হাসি লেগে থাকে, সেই উপরেতলার ঘরে এসে রায়গঞ্জের রুগ্ন মানুষটিকে জানিয়ে দিল, সুললিতবাবুর সঙ্গে আজ মিতুর বিয়ে হয়ে গেল।

চমকে উঠলেন না লোকনাথ ; বন্ধ চোখ দুটোকে খুলে একবার তাকালেনও না ; একটি কথাও বললেন না।

হ্যাঁ, মিতু আর সুললিত একবার উপরতলার ঘরে এসে লোকনাথের খাটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই আগমন আর উপস্থিতির কোনও সাড়া লোকনাথের গভীর ঘুমটাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিতে পারেনি। মিতু শুধু বলে— বাবা ঘুমোচ্ছেন, ভালই। ঘুম ভাঙিয়ে লাভ নেই।

মিতু আর সুললিত চলে যাবার পর চমকে ওঠেন, ধড়ফড় করেন, আর চোখ মেলে তাকান লোকনাথ। বোধ হয়, কোনও দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন। ঠিকই, অনেকদিন পরে পুত্রবধূ বীণার কাছে একটা স্বপ্নের গল্প বলেন লোকনাথ। স্বপ্নে দেখা গেল, একটা শ্মশানের মাঠ, রাতের অন্ধকারে সেই মাঠের বুকে অনেক আলেয়া দৌড়চ্ছে। আলেয়াগুলো যেন ঝকঝকে ও সুন্দর এক-একটা হাসিমুখের জ্বলন্ত ছবি। শ্মশানের মাঠ থেকে ছুটতে ছুটতে আলেয়াগুলো যেন কাণা নদীর একটা কাদাড়ের উপরে গিয়ে আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়ল।

বীণা বলেছে, তাই জানতে পেরেছেন লোকনাথ, টুনি এখন চাকরি করছে। আর টুনির স্বামী সুললিত এখন এই বাড়িতেই থাকে।

নীরজা কি উপরতলার এই ঘরে আজকাল আর আসেন না ? আসেন বইকি। মাঝে মাঝে আসেন। একদিন এসে খুশির আবেগে নিজেই বলে গিয়েছেন— ললির চেষ্টাতেই মিতুর চাকরিটা হয়েছে। ললির এক সিন্ধি বন্ধুর কারবারের অফিসে কাজ পেয়েছে মিতু। অফিসের গাড়ি মিতুকে নিয়ে যায়, আবার অফিসের গাড়ি এসে মিতুকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। মিতু বলে— কাজ বলতে তো ওই কাজ, দুটো-তিনটে যোগ আর বিয়োগ, বাস্। বস মিষ্টার বাসবানি বলেন, মিতালী সরকার আমার অফিসের শুধু একজন অ্যাসিস্টেন্ট নন, উনি আমার অফিসের নতুন চার্ম অ্যাণ্ড বিউটি।

শুনতে শুনতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন লোকনাথ ; তাই কোনও কথা বলেননি। আর নীরজাও সেই অদ্ভুত অসাড়তার কাছে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থেকে চলে গিয়েছিলেন। অনেক কাজ বেড়েছে নীরজার। বীণা অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারে না কিংবা ভুলেই যায় যে, সকাল দশটায় ললিকে আর একবার কফি দেওয়া দরকার। সকাল ন'টার সময় কারখানার কাজে যায় সুকু ; তারপরেই যেন আনমনা হয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে বীণা। হুঁস থাকে না যে, দশটা বাজতে চলেছে। নীরজা তাই মাঝে মাঝে বেশ জোর গলায় চেঁচিয়ে বীণাকে ডাক দেন— কী গো মেয়ে, সুকুর লুচি তৈরি করে দিয়েই কি সব কাজ হয়ে গেল, মনে কর ? ললির জন্য কফি তৈরি করতে হবে না ?

ঠিকই বলেছেন নীরজা। সুকুর কারখানার কাজে যাবার আগে, ঠিক সকাল ন'টার সময় সুকুর জন্য আট-দশটা লুচি ভেজে দেবার পরেই যেন হাঁপিয়ে পড়ে বীণা। হঠাৎ উদাস হয়ে যায় ; চুপ করে বসে থাকে।

নীরজা মাঝে মাঝে আরও স্পষ্ট করে এ বাড়ির জীবনের বাস্তব সত্যটাকেও বুঝিয়ে দেন— যার জন্যে এ বাড়ির সবাই সুখে আছে, তারই কথা ওরকম করে ভুলে গেলে চলবে কেন, বীণা ? বুঝতে পেরে বীণা সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে সুললিতের জন্য কফি তৈরি করতে থাকে।

অনেকদিন পরে একদিন, সেদিন সকাল থেকেই ঝুরঝুর করে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সে বৃষ্টি আর থামছে না। লোকনাথের ঘুমের ঘোর আর স্বপ্নের ঘোর দুইই যেন একটা শব্দের আঘাত পেয়ে ভেঙে গেল। নড়ে উঠেছে লোকনাথের খাট, খাটের নড়বড়ে পায়াটাও ঘষা খেয়ে বিশ্রী একটা শব্দ করেছে।

—কে ? কে ? চমকে ওঠেন, আর প্রশ্ন করেন লোকনাথ।

বীণা বলে— ছাদের ফাটল দিয়ে জল ঢুকে আপনার বিছানাটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, তাই খাটটাকে টেনে একটু সরিয়ে দিলাম।

শুধু ঝরু ঝরু বৃষ্টির শব্দ। বাড়িটার কোনও ব্যস্ততার সাড়া-শব্দ শোনা যায় না। বীণা বলে —আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

লোকনাথ— বলো।

বীণা—আমি আর এ বাড়িতে থাকতে পারব না, থাকব না।

—কেন ?

—আপনাদের জামাই আমাকে তাঁর একজন সেবাদাসী বলে মনে করেন।

—তার মানে ?

—মিতু যখন অফিসে যায় ; পিয়া কলেজে যায় ; আর মা যাদবপুরে বেড়াতে যান, যখন বাড়িতে কেউ থাকে না, তখনই সুললিতবাবু আমাকে তাঁর ঘরে যেতে ডাক দেন।

—কেন ?

—তাঁর মাথায় পাখার বাতাস দিতে বলেন।

—তুমি কী বল ?

—আমি বলেছি, আমার দ্বারা ওরকম ছোটলোকের কাজ সম্ভব নয়।

—সুকুর মা কি এসব কথা জানে ; তাকে বলেছ ?

—জানেন, বলেছি।

—কী বলেন সুকুর মা ?

—উনি আমারই ওপর রাগ করেন। উনি বলেন, আমারই মনটা ছোটলোকের মন হয়ে গিয়েছে।

—হ্যাঁ হয়েছে। সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলেন নীরজা। চমকে ওঠে বীণা ; কে জানে কখন, বোধ হয় এই মাত্র যাদবপুর থেকে উনি ফিরেছেন।

বীণা বলে— তাই যদি মনে করেন, তবে আমাকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলুন।

নীরজা— হ্যাঁ, তাই বলছি। তুমি ললিকে যদি অপমান কর, তবে এ বাড়িতে তোমার ঠাঁই হতে পারে না।

বীণা— তবে তাই হোক, আমি আজ এখনই চলে যাব।

লোকনাথের ধোঁয়াটে চোখের চাহনিটা জ্বলজ্বল করে, আর নীরজার দুই চোখের তারা যেন রুষ্ট হয়ে ছটফট করতে থাকে। কারণ, দুজনেই দেখতে পেয়েছেন, বীণার মুখের ওই শান্ত হাসিটা যেন আগুনের শিখা হয়ে দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

সুকুমার আসে, আশ্চর্য হয়ে তাকায়— এখানে কিসের এত হল্লা ?

নীরজা বলেন— তোমার বউ আর এ বাড়িতে থাকবে না। এখনই চলে যাবে। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তবে তুমিও...।

সুকু— তুমি আমাকেও চলে যেতে বলছ ?

নীরজা— তোমাদের মনে যদি ললির মান-সম্মানের জন্য কোনও দরদ না থাকে, তবে তোমাদের এখানে থেকে লাভ কী ?

সুকুর ভীরু চোখ দুটো অদ্ভুত হয়ে কাঁপতে থাকে। —আমি তো তোমারই দলে, তবু আমাকেও চলে যেতে বলছ ?

নীরজা— আপন ছেলে হয়েও তুমি আজ পর্যন্ত মা বাপ বোনের জন্য কোন সুখের কাজটা করতে পেরেছ ? আপন ছেলেও আপন নয়, যদি সে সংসারের কোনও কাজে না আসে। আর পরের ছেলেও আপন হয়, যদি সে আপনজনের মত কাজ করে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে সুকু— এরপর আমি আর কী বলতে পারি ?

সুকুর গলার স্বরে যেন জলে ডুবে যাওয়া মানুষের আর্তনাদের বুদ্বুদের মত মৃদু-করুণ শব্দ। বীণা এগিয়ে এসে সুকুর হাত ধরে টান দেয়— চলো।

সুকু ফ্যালফ্যাল করে তাকায়— অ্যাঁ ? সত্যিই যাবে ?

—হ্যাঁ।

বৃষ্টি থামেনি ; কিন্তু আর দেরি করে না বীণা। সুকুর একটা হাত ধরে রেখে আর টান দিয়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যায়। তারপর ওদের আর দেখা যায় না।

বিদ্যুৎ চমকে উঠেছে। নীরজার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন লোকনাথ— এইবার একটা বাজ পড়লেই ভাল হয়।

নীরজা— তুমি যেন আমাকে ঠাট্টা করছ বলে মনে হচ্ছে ?

লোকনাথ— ঠাট্টা নয় ; ঠাট্টা করবারও শক্তি আমার নেই। আমি শুধু তোমাকে বলতে চাই...।

—কী ?

—শত হোক, সুকু তোমারই ছেলে। পাগল হোক ছাগল হোক, ওকে এভাবে তাড়িয়ে দিও না।

—কিন্তু ললি কি আমার কাছে ওই ছেলের চেয়েও বেশি আপন ছেলে নয় ?

—রাধানাথ জানেন।

—তবে তুমি আর কথা বাড়িয়ো না।

॥ ১০ ॥

অনেক শিখিয়ে আর বুঝিয়ে দিলেও রান্নার কানা ঠাকুরটা কফি তৈরি করতে পারে না। অগত্যা নীরজা নিজেই সকাল দশটার কফি নিজের হাতে তৈরি করেন।

সারাদিন ঘরেই থাকে ললি, শুধু সন্ধ্যা হলে এক-একদিন বালিগঞ্জের ক্লাবে তাস খেলতে যায়।

ললির বাড়ির গাড়ি এ বাড়িতে আর আসে না। কারণ, বিয়ের পর যেদিন এ বাড়িতে এসে নতুন জীবনের নীড় বেঁধে ফেলেছে ললি, সেদিন থেকে বেহালার বাড়ি থেকে গাড়ি আসা বন্ধ হয়েছে।

ললির বাবা অ্যাটর্নি প্রিয়নাথ রায়, সত্যিই একটু বেশি কড়া স্বভাবের মানুষ ; তা না হলে এরকম কাণ্ড করবেন কেন ? ভাবতে গিয়ে নীরজা প্রায়ই মাঝে মাঝে বেশ অপ্রসন্ন হয়ে যান।

ললির মনে কিন্তু বাপের উপর একটুও অপ্রসন্নতা নেই। নীরজা কথাটা ওঠালেই হেসে ফেলে সুললিত। —আর কটা দিন একটু ধৈর্য ধরুন। দেখতেই পাবেন, বাবার চিঠি এসে আমাকে ডাকছে। সত্যি, বাবার বাইরেটা যতই কঠোর হোক ; ভেতরটা খুবই নরম। আমাদের বাড়িতে আমার বাবা-মা'র যত ফটো আছে, তার সবগুলিতেই দেখতে পাবেন, আমি মায়ের কোলে নয়, বাবার কোলে বসে আছি।

বাবার কাছ থেকে প্রতিমাসে যে একটি হাজার টাকা সুললিত তার হাত খরচের জন্য পেত, সে টাকাও আর সুললিতের হাতে আসে না। টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন প্রিয়নাথবাবু।

—কিন্তু আর কতদিন ? বলতে গিয়ে হেসে ফেলে সুললিত। বিশ্বাস করুন, একদিন মা-মরা ছেলের জন্যে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলবেন পিতা, আর লোকের হাত দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

নীরজা হাসেন— সে কথা আমি খুব বিশ্বাস করি।

মিতুও একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে আর ঘরের ভিতরে ঢুকে চমকে ওঠে। সুললিতের মুখের দিকে বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায় মিতু, আর হাসতে থাকে।

সুললিত— হাসছ কেন ?

মিতু— একটা ম্যাজিক বলে মনে হচ্ছে, তাই হাসছি।

সুললিত— কিসের ম্যাজিক ?

মিতু— আমি তো স্মিথের ক্যান্থারাইডিন ব্যবহার করি, কোনও দেশি তেল আমি মাথায় মাখি না।

সুললিত— তার মানে ?

মিতু— তার মানে, আমার বালিশে চামেলি আতরের গন্ধ এল কি করে ? মোহন খোসলা তো পিয়াকে চামেলি তেল উপহার দিয়েছে ; পিয়া আজকাল ওই তেলই মাথায় মাখে।

সুললিত হাসে— হ্যাঁ, ম্যাজিক বটে। তবু মনে হয়, আমি যখন পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম, তখন বোধহয় তোমার ছটফটে স্বভাবের বোনটি এই ঘরে এসে আর বিছানায় গড়িয়ে পড়ে তোমার বালিশে মাথা রেখেছিল।

মিতু— তাই হবে।

সন্ধ্যা হতেই যখন তাস খেলতে বালিগঞ্জের ক্লাবে চলে যায় সুললিত, তখন চেঁচিয়ে ডাক দেয় মিতু— ওরে পিয়া, একবার এঘরে আসবি ?

—যাই।

পিয়ালী ঘরে ঢুকতেই এক হাত দিয়ে মুখের হাসিটাকে চাপা দিয়ে কথা বলে মিতু— কী করছিলি ?

—শুয়েছিলাম।

—কেন ?

—খুব ক্লান্ত, তাই।

—ক্লান্তই বা কেন ? আজ তো কোনও জলসাতে তোর নাচের প্রোগ্রাম ছিল না ?

—না।

—তবে ?

—এমনি।

—না, এমনি নয়। নিশ্চয় ললির সঙ্গে অনেক গল্প করেছিস।

—হ্যাঁ।

—তাই আমার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলি।

—অ্যাঁ ? হ্যাঁ।

—তাই তোর ললিদা খুব মায়া করে তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

—হ্যাঁ।

—তাই তোর ঠোঁটের কোণটা এখনও লালচে হয়ে ফুলে রয়েছে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, তাই তোর ঘাড়ের ওখানে দাঁতের মত একটা দাগ এখনও বসে আছে।

—কী যে বলছ, কিছু বুঝতে পারছি না।

—তোর ললিদার অভ্যেসটা তো আমার জানতে বাকি নেই। এইবার তুইও জানলি, তাই না ?

মুখ ফিরিয়ে আর বিড়বিড় করে কথা বলে পিয়া— হ্যাঁ, ললিদা বার বার ডাকেন, না গিয়ে উপায় কী ?

মিতু— আজ প্রথম ডেকেছিল ?

পিয়া— না, আরও অনেকবার ডেকেছে। কিন্তু তুমি আমার ওপর রাগ করছ কেন ?

মিতু— তোর ওপর একটুও রাগ করছি না। শুধু জেনে নিলাম।

জেনে নেবার পর মিতালীর দুই চোখের হাসি আরও দুরন্ত হয়ে ছটফট করে। আজ মাইনে পেয়েছে মিতালী। নীরজার কাছে গিয়ে, নীরজার হাতের কাছে মাইনের টাকার প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে— আমি এখনই একবার বের হব, মা ?

—কেন ? কোথায় যাবি ?

—একটা পার্টি আছে। তাতে আমারও নেমন্তন্ন আছে। মিস্টার বাসবানি আমাকে অনেক করে বলেছেন, আমি যেন অবশ্যই যাই।

নীরজা হাসেন— তবে যা, এ তো ভাল খবর। শুনতে পেয়ে কত খুশি হবে ললি।

সন্ধ্যাবেলা তাসের ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে খবরটা শোনবার পর সত্যিই খুশি হয় ললি। কী আশ্চর্য, রাত বারোটার পর যখন বাসবানির গাড়ি মিতালীকে পৌঁছে দিয়ে গেল, তখনও খুশি হল ললি। গাড়ি থেকে নেমে মিতালী বাড়ির বারান্দাতে উঠতেই ললি যেন নতুন সুরে ও স্বরে একটা স্বাগত সম্ভাষণের বাণী শোনায়— ওয়েল ডান ; আমি জানতাম, বাসবানি একদিন তোমাকে পার্টিতে ডাকবেনই ; আর তুমিও কোনও আপত্তি করবে না।

নীরজা বলেন— কিন্তু পিয়াটা কোথায় গেল ?

মিতু— পিয়া বাড়িতে নেই ?

নীরজা— না।

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে আর প্রশ্ন করে সুললিত— মোহন খোসলার স্কুটারের শব্দ শোনেননি ?

নীরজা— হ্যাঁ, শুনেছি।

সুললিত— তবে তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে, মোহনের সঙ্গে বের হয়েছে পিয়া।

নীরজা— কিন্তু কোথায় ?

সুললিত— পিয়ারও নিশ্চয় একটা প্রোগ্রাম আছে!

নীরজা— কিসেব প্রোগ্রাম ?

সুললিত— কোনও অনুষ্ঠানে কিছুক্ষণ নাচতে গাইতে হবে, এই আর কী !

না, বাড়ি ফিরতে খুব দেরি করেনি পিয়া। মোহনের স্কুটার বাড়ির সামনে এসে থামে আর চলে যায়। পিয়া এসে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে। —উঃ, পুলিশ সার্জেন্টটা কী বদমাস ! প্রায় একটি ঘণ্টা পথের উপর আটক করে রাখল, আর পুরো দশটি টাকা ঘুষ নিয়ে তারপর ছেড়ে দিল। নইলে, আরও কত আগে বাড়ি পৌঁছে যেতাম।

না, আর বেশিক্ষণ নয়। সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের বারান্দা নীরব হয়ে যায়। শুধু শোনা যায়, দোতলার ঘরে একজন ঘুমন্ত মানুষের নাক-ডাকার শব্দ, আর পাশের পড়ো বাড়ির আঙ্গিনাতে নিমগাছের মাথায় পেঁচার ডাকের শব্দ।

॥ ১১ ॥

রিকসা থেকে নামলেন যে মহিলা, তাঁর দিকে নীরজার দুই চোখ যেন একটু অখুশি হয়ে তাকিয়ে থাকে। মহিলাকে দেখে চিনি-চিনি মনে হয়, কিন্তু ঠিক স্পষ্ট করে নিতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে, এই মহিলা কলকাতায় সুখী জীবনের কেউ নন। খুব সম্ভব, ইনি কলকাতারই কেউ নন। শাড়ির চেহারা ও শাড়ি পরবার ভঙ্গি দেখে বরং মনে হয়, ইনি বোধ হয় রায়গঞ্জের কেউ হবেন। তা না হলে, দুই পায়ে অন্ততঃ ছেঁড়া-ময়লা একজোড়া সস্তা জাতের চটিজুতো থাকত।

আগন্তুক মহিলার হাতে অ্যালুমিনিয়ামের একটা টিফিন-ডিবে। কে জানে, কী বস্তু আছে ওই ডিবের মধ্যে ! রিকসাওয়ালার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে মহিলা নীরজার দিকে তাকালেন। হেসে উঠলেন, যেন জীবনের একজন অন্তরঙ্গ বান্ধবীকে দেখতে পেয়ে আনন্দের ও তৃপ্তির হাসি হাসছেন।

মহিলা এগিয়ে এসে বললেন— কেমন আছ গো বড় বউ ?

চমকে উঠলেন নীরজা। রায়গঞ্জের মুখের ভাষা দিয়ে কথা বলছে, কে এই মহিলা ! বড়-বউ বলে ডাক দিয়ে কথা বলত যে জগতের মেটে ঘরের যত মোটা-সোটা শাঁখাপরা বটার-মা ও ছকুর-পিসি, তাদের চেহারার ছবি নীরজার স্মৃতি থেকে একরকম মুছেই গিয়েছে। স্পষ্ট করে মনে পড়লেও তারা আজ নীরজার কাছে নিতান্ত অর্থহীন স্মৃতির ছায়াজীব বলে বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু, কী আশ্চর্য, সেইরকম কোনও ছায়াজীব আজ নীরজার নতুন জীবনের ঘরের রঙিন পর্দাওয়ালা দরজার কাছে এসে দাঁড়াবে কেন ? কী উদ্দেশ্য ?

সন্দেহ হয় নীরজার, এই মহিলা নিশ্চয় পুরনো কোনও সম্পর্কের ছুতো করে বিশ-পঁচিশ টাকার সাহায্য চাইতে এসেছে। নীরজার গলার নতুন সোনার-চেনের ঝকঝকে লকেটের দিকে তাকিয়ে হয়ত একশো টাকার সাহায্য চেয়ে বসবে। নীরজার দুই চোখের ভুরু বেশ অপ্রসন্ন হয়ে একবার শিউরে ওঠে আর কুঁচকে যায়।

আগন্তুক মহিলা বলেন— কী ভাগ্যি, কী ভাগ্যির কথা, রায়গঞ্জের মামাবাবুর লেখা একটা চিঠি পেয়ে জানতে পারলাম, তোমরা এই ঠিকানাতে এখানে আছ। ওঃ, সেই কবে, সেই ভয়ানক আশ্বিনে ঝড়ের বোধ হয় দু'তিন বছর আগে তোমাদের মায়া কাটিয়ে রায়গঞ্জ থেকে কলকাতায় চলে এলাম।

নীরজা— আপনাকে তো চিনতে পারছি না।

মহিলা— আমাকে চিনতে পারছ না। সে কী গো! আমি যে তোমাদের রায়গঞ্জের মাসি, বোসবাড়ির মেয়ে।

হেসে ফেলেন মহিলা— তবে আর একটু খুলেই বলি। —আমি হলাম লোকনাথের পুঁটুমাসি। লোকনাথের মা আমাকে পুঁটু বলে ডাকতেন। ওঃ, তোমার শাশুড়ি আমাকে কী ভালই না বাসতেন। আমার বিয়ের সময় তোমার শাশুড়ি, আমার সেই পারুলদি, একা একশো জনের রান্না রেঁধে দিয়েছিলেন। তুমি তো দেখনি, আমি দেখেছি, তোমার শাশুড়ীর চোখ দুটো ছিল ঠিক যেন মা-দুর্গার চোখ। তাই...।

মহিলা বলেন— তাই তোমাদের একবার দেখতে এলাম। রক্তের সম্পর্ক নাই বা থাক, তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হল প্রাণের সম্পর্ক। বিয়ের পর সেই যে কলকাতা চলে এলাম, তারপর আর রায়গঞ্জ যাবার ভাগ্যি হয়নি, এমনই অদ্ভুত ভাগ্যি! চিঠি পড়ে একদিন জানতে পেলাম, লোকনাথের বিয়ে হবে। দু'দিন দু'রাত কেঁদেছিলাম। যেমনই তোমাদের মেসোটি তেমনই তাঁর খুড়ি, দু'জনেই আপত্তি করলেন, না এ মাসে ঘরের বউয়ের পক্ষে বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাওয়া নিয়ম নয়; শাস্ত্রে নিষেধ আছে, পঞ্জিকাতেও নিষেধ আছে। তাই লোকনাথের বিয়ে দেখবার ভাগ্যি আর হয়নি। শুনেছিলাম, লোকনাথের বউ খুবই সুন্দর। তাই তো দেখছি। আহা, তুমি দেখতে বড়ই সুন্দর গো বড়-বউ।

মহিলার মাথার সাদা চুলের মধ্যে সিঁথির রেখাটা সিঁদুরের মোটা প্রলেপ নিয়ে যেন রঙিন হাসি হ'েসছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে, লোকনাথের অদ্ভুত মেসোটি বেঁচে আছেন।

লোকনাথের অদ্ভুত মাসি এই পুঁটুমাসি এইবার একটু কুণ্ঠিত ভাবে হাসেন— কথাটা বলতে আমার একটু ভুল হয়ে গিয়েছে বড়-বউ?

নীরজা— কী বললেন?

পুঁটুমাসি— তোমাকে আগে কখনও দেখিনি, অথচ জিজ্ঞাসা করে বসলাম যে, আমাকে চিনতে পারছ কিনা। দুঃখু পেয়ে পেয়ে আর হাজার রকমের যত জ্বালা সয়ে সয়ে আমার মাথার বুদ্ধিসুদ্ধিও গোলমেলে হয়ে গিয়েছে।

মনে মনে একটু সাবধান হতে থাকেন নীরজা। ইচ্ছে করে তাঁর চোখের দৃষ্টিটাকে আরও উদাস করে দিলেন। সন্দেহ হয় নীরজার, এই অদ্ভুত পুঁটুমাসির দুঃখ আর জ্বালার কারণটা নিশ্চয় টাকার অভাব, বিদঘুটে একটা দারিদ্র্য। সন্দেহ হয়, এইবার টাকার সাহায্য প্রার্থনা করে বসবেন পুঁটুমাসি।

ঠিক সন্দেহ। পুঁটুমাসি বলেন— একযুগ ধরে এই কলকাতাতে চাকরি করছেন তোমার মেসো। মাইনে সেই শুরুর ত্রিশ টাকা থেকে এখন তেষট্টি টাকায় পৌঁছেছে। তোমার মেসো বলেন, তেষট্টি টাকার খোরাকে তিনটে কুকুরের পেট চলে না, তিনটে মানুষের পেট চলবে কেমন করে? কাজেই...।

নীরজা— আপনার খুড়শাশুড়ি কি এখনও বেঁচে আছেন?

পুঁটুমাসি— হ্যাঁ গো, বয়স হয়েছে ছিয়ানব্বই। তবু দরিদ্র সংসারটার জন্যে এখনও কী খাটুনিই না খাটেন আমার এই খুড়শাশুড়ি। তোমাদের মেসো এখন আর আপিস-খাটুনি খাটতে পারেন না। শুধু দু' বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে পঞ্চাশ টাকা পান। এদিকে আমরা দু'জনে, ছিয়ানব্বই বছর বয়সের ওই বুড়ি আর সত্তর বছর বয়সের এই পুঁটুবুড়ি, দু'জনে মিলে ঠোঙা তৈরি করে মাসের মধ্যে আরও বিশ-পঁচিশ টাকা পাই। খুড়শাশুড়ি রাত জেগে ঠোঙা তৈরি করেন, আর আমাকে ধমক দিয়ে বলেন— খবরদার, তোমাকে রাত জেগে ঠোঙা তৈরি করতে হবে না, কখ্‌খনও না। আমি কত করে বলি— আপনি এই বয়সে রাত জেগে কাজ করবেন না। উনি বলেন— কেন? তাতে ভয় কিসের? আমি বলি— তা হলে আপনার এই রোগা শরীর আর টিকবে কতদিন? উনি বলেন— আর না টিকলেই তো ভাল। কিন্তু সত্যি কথাটা তুমি জান না তো বড়-বউ, উনি মরতে চান না। উনি বলেন, ইচ্ছে করলে তো নারায়ণের নাম করে সাতটা দিন উপোস দিয়ে মরে যেতে পারি। কিন্তু তোমাদের সংসারের বিশ-পঁচিশ টাকার আয়ও যে আমার চিতেটার মত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সেটা কী ভাল হবে?

নীরজা বলেন— আচ্ছা, এখন দয়া করে আমাকে একটু রেহাই দিন। আমার কাজ আছে। ইচ্ছে করেন আর একদিন আসবেন।

পুঁটুমাসি চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন-- কেন তোমাকে রেহাই দেব ? আমার সামনে বসে তোমরা দু'জনে খাবে। তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখবার ভাগ্যি কখনও হয়নি। আশা ছিল তোমাদের বিয়েব সময় রায়গঞ্জে যেতে পারব, কিন্তু কপালে তা লেখা ছিল না।

পুঁটুমাসি তাঁর হাতের ডিবের ঢাকনি খুলে ভিতরের বস্তুগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন আর কথা বলেন— নারকেল পুলি। আজই সকালবেলাতে অনেক তাড়াহুড়ো করে করেছি। ভাল হয়েছে কি না জানি না। যাই হোক...চলো বড়-বউ, ভেতরে যাই।

নীরজার সঙ্গে আস্তে আস্তে হেঁটে আর সাদা মাথাটাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উপরলতলার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন পুঁটুমাসি। ডাক দিলেন— ওরে লোকু, তাকিয়ে দেখ, কে এসেছে।

—কে ? দবজাব দিকে তাকিয়ে উৎসুকভাবে প্রশ্ন করেন লোকনাথ।

—আমি তোর পুঁটুমাসি এসেছি।

চেঁচিয়ে ওঠেন লোকনাথ। —কাছে এসো পুঁটুমাসি, বিছানার উপর উঠে বসো।

বিছানার উপর উঠে বসতেই পুঁটুমাসির পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন লোকনাথ। লোকনাথের গলার স্বরে যেন নিবিড় এক মায়ার আর আনন্দের আবেশ টলমল করে।

—আমি, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো পুঁটুমাসি ? তুমি কি সত্যিই এসেছ পুঁটুমাসি ?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। এসেছি বৈকি। ঠিকানা পেলাম, তাই দেখা করতে চলে এলাম।

এইবার লোকনাথের মাথায় হাত বুলিয়ে কথা বলেন পুঁটুমাসি— তোর সংসার বড় সুখের সংসাব হয়ে উঠেছে লোকু। দেখে প্রাণটা আনন্দে ভরে গেল। শুধু তোকে দেখতে বেশ একটু কষ্ট হচ্ছে। ভাবতে পারিনি যে, আমাদেব সেই ডানপিটে লোকুর শরীর কোনওদিন এরকম পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। ও বড়-বউ, কাছে এসো, এই নাও, দুটো পুলি তুমি হাতে তুলে নিয়ে খাও ; লোকু, তুমি দুটো পুলি তুলে নিয়ে খাও।

নীরজা— আমি খাব না।

পুঁটুমাসি— সে কী ? খেয়ে দেখ, খেতে একটুও খারাপ লাগবে না।

নীরজা— না।

নীরজার সন্দেহ, দরিদ্র সংসারের পুঁটুমাসির বুদ্ধিটা একটুও দরিদ্র নয়। টাকা বাগাতে হবে, তার আগে একটা অন্তরঙ্গতার হাওয়া তৈরি করে নিচ্ছে এই পুঁটুমাসি। এই নারকেল পুলি হল পুঁটুমাসিব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিব আঁচলে বাধা ঘুষ।

লোকনাথের চোখে যেন অদ্ভুত এক স্বপ্নের আবেশ থমথম করছে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন পুরনো রায়গঞ্জের মায়া এসে লোকনাথ আর নীরজার মাথার কাছে কুলোর প্রদীপ দুলিয়ে দিয়ে হাসছে। কবেকার সেই পুঁটুমাসি, যে মানুষ আজ লোকনাথের কাছে অতীতের একটা হাসিখুশিব গল্প মাত্র, তাকেই কাছে দেখতে পেয়ে লোকনাথের প্রাণটা বিহ্বল হয়ে গিয়েছে।

পুঁটুমাসি বলেন— হলামই বা মাসি। আমার মতলব ছিল, লোকুর বিয়েতে যদি রায়গঞ্জে যেতে পারি, তবে ফুলশয্যাব ঘরে আমিও রগড় মাতিয়ে তুলব। মতলব করেছিলাম, নতুন বউকে জোর করে ঠেলেঠুলে বরের কোলে বসিয়ে দেব। কিন্তু শুধু মতলব করাই সার হল। চেঁচিয়ে হাসতে থাকেন পুঁটুমাসি।

পুঁটুমাসির হাতের ডিবে থেকে দুটি পুলি তুলে নিয়ে খেতে থাকেন লোকনাথ। তাকের উপরে রাখা একটা বাটিকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন— পুঁটুমাসি তুমি এখন বাকি পুলি দুটোকে এই বাটিতে রেখে দাও। ওর যখন ইচ্ছে হয় খেয়ে নেবে।

—তাই ভাল, তাই ভাল ! তাকের বাটিতে দুটো পুলি রেখে দিয়ে পুঁটুমাসি যেন একটা খুশিভরা নিঃশ্বাস ছাড়েন। —রায়গঞ্জের বোসবাড়ির কেউ আজ আর বেঁচে নেই। এদিকেও মেসোর গুষ্টির কেউ কোথাও নেই। কী চমৎকার ভস্মমাখা কপাল, এমন কপাল বোধ হয় বনবাসী সাধু-সন্ন্যাসীরও হয় না। এদিকে আমি কারও মা নই, খুড়ি নই, জেঠি নই, পিসি নই। ওদিকে আমি রায়গঞ্জের কারও দিদি নই, মাসি নই। আমাকে মাসি বলে ডাকতে শুধু একজনই আছে, সে হল তুমি। নারায়ণ বোধ হয় আর বেশিদিন আমাকে এ সংসারে রাখবেন না। তাই ইচ্ছে হল, লোকু যখন

কলকাতাতে আছে, তখন একবার তার মুখের পুঁটুমাসি ডাক শুনে আসি।

নীরজা বলেন— আমি যাই, আমার অনেক কাজ আছে।

পুঁটুমাসি বলেন— আমিও যাই। যদি বেঁচে থাকি তবে আবার আসব রে লোকু।

কেঁদে ফেলেন লোকনাথ, পুঁটুমাসি বলেন— ষাট, কাঁদিস কেন? কাঁদতে নেই। ...চলি বড়-বউ।

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন পুঁটুমাসি। তার পর সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে নেমে গেলেন।

লোকনাথ এইবার নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকেন। না ভর্ৎসনা নয়। লোকনাথের ভিজে চোখের তারা দুটো আর জ্বলে উঠতে চায় না।

নীরজা বলেন— যাক, বাঁচা গেল। তোমার পুঁটুমাসি সত্যি টাকা চেয়ে বসলেন না। তবু মনে হচ্ছে, রিকসা-ভাড়াটা দিয়ে দিলে ভাল হত।

লোকনাথ— না, তুমি বরং আমার ইচ্ছের একটা কথা শোনো।

নীরজা— বলো।

লোকনাথ— তুমি এখনই যাও, নীচে গিয়ে পুঁটুমাসিকে প্রণাম করেক।

নীরজা— প্রণাম করবার কোনও দরকার তো নেই।

লোকনাথ— দরকারের জন্যে প্রণাম নয়, প্রণামই একটা দরকার। যাও, শিগগির যাও, পুঁটুমাসি বোধ হয় এখনও রিকসার আশায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

নীরজা— আছেন, কিন্তু তুমিই বল না কেন, পুঁটুমাসির মত মানুষকে প্রণাম করে আমার মত মানুষের কী লাভ হবে?

লোকনাথ— লাভ হবে। মস্ত বড় লাভ। সে লাভ আজই চোখে দেখতে তুমি পাবে না বটে, কিন্তু একদিন দেখতে পাবে।

নীরজা হাসেন। —পুণ্যি হবে বোধহয়?

লোকনাথ— হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস, সে পুণ্যির জোরে তুমি তোমার জীবনের কোনও মহাভয় হতে রক্ষা পেয়ে যাবে।

নীরজা— আমার আবার ভয় কিসের?

লোকনাথ— সাপের কামড়ের ভয়।

নীরজা— বুঝলাম না। আমি তো আর বায়গঞ্জে ফিরে যাচ্ছি না। আমাকে কোন বনবাদাড়ের সাপে কামড়াবে?

লোকনাথ— কলকাতাতেও সাপ থাকে।

নীরজা— হেঁয়ালি করে কথা বলছ কেন? স্পষ্ট করে বলো।

লোকনাথ— আর বেশি বলব না। তুমি পুঁটুমাসিকে একবার প্রণাম করো।

নীরজা— বেশ, তাই করব। কিন্তু এরপর পুঁটুমাসি যেন আর আমার এখানে না আসেন।

নীচে চলে গেলেন নীরজা, লোকনাথ কান পেতে শুনতে থাকেন, নীরজা ডাক দিয়ে বলছে।

—একটু থামুন পুঁটুমাসি। আপনাকে প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছি। একটু থামুন।

এরপর শুধু একটা নিরেট স্তব্ধতার গুমোট। আর কোনও কথা শুনতে পান না লোকনাথ।

টুং টুং টুং? একটা রিকসা চলে গেল। দুই হাত দিয়ে ঘষে ঘষে চোখ মোছেন লোকনাথ, যেন একটা সুস্বপ্নের ছবিকে ইচ্ছে করে মুছে দিচ্ছেন লোকনাথ।

॥ ১২ ॥

কী আশ্চর্য, পড়ো বাড়ির আঙিনাতে সেই নিমগাছের পাতার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আজ একটা কোকিল ডাকছে। পঞ্জিকা হাতের কাছে না থাকলেও বুঝতে পারেন লোকনাথ, সেই যে কবে, রামদয়াল যেদিন শুকনো মুখ নিয়ে আর দুঃখিত হয়ে চলে গেল, তারপর প্রায় দুটো বছর কেটে

গেল। বেঁচে আছে কী রামদয়াল ? বেঁচে থাকলে একটা চিঠিও দেয় না কেন ?

বীণা চলে যাবার পর থেকে এই বাড়ির নীচের তলার দুটি ঘরের কোনও নতুন খবর শুনতে পাননি লোকনাথ। আর নতুন করে জানবারই বা কী দরকার আছে! বুঝতেই পারা যায়, আজ এই সকালবেলাতে নীচের তলার ঘরে যে উচ্ছল হাসি আর কলরব এখন উথলে উঠছে, সেটা নীরজারই স্বপ্নের জয়ধ্বনি। তবে সত্যিই কি নীরজার চোখের জল আর কোনওদিনও দেখতে পাওয়া যাবে না ? অদ্ভুত আশা, অদ্ভুত কল্পনা। লোকনাথ মনে করেন, অভিশাপে জ্বলে যাওয়া জীবনের আশা আর কল্পনা এরকমই হয়ে থাকে।

নীচের তলার ঘরে চায়ের টেবিল ঘিরে তর্ক গল্প আর ঠাট্টার যে হর্ষ মেতে উঠেছে, সে হর্ষের ভাষা লোকনাথের কানে পৌঁছয় না ঠিকই, তবু বুঝতে পারেন, এটা নীরজার নিজের হাতে গড়া একটি সুখী সংসারের হর্ষ!

আনন্দের কথাটা বলতে গিয়ে হেসে ফিরলেন নীরজা— শত্তুরে কী না বলে ? যত ছাই আবোলতাবোল মিথ্যে কথা।

হ্যাঁ, কে এক ক্ষিতীশ বিশ্বাস নীরজার কাছে একটি চিঠি লিখেছেন : খুব জানবেন, অ্যাটর্নি প্রিয়নাথ রায় তাঁর একমাত্র ছেলেকে তাঁর বাড়ি গাড়ি ও টাকার কিছুই দেবেন না। হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই যে, তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর সব সম্পত্তি তাঁর ছেলে সুললিতই পাবে।

নীরজা বলেন— মিথ্যুকের হাতের লেখাটা, কী আশ্চর্য, অনেকটা ললির হাতের লেখার মত।

সুললিত— এই ক্ষিতীশ বিশ্বাস হলেন আমার আপন মামা। কিন্তু এরকম একটি হিংসুকে শত্রুমামা বোধ হয় পৃথিবীর কোনও ভাগনের নেই।

নীরজা— চিঠিটাকে আমি ঘেন্না করে আর একেবারে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

হাসে সুললিত— চিঠিটার উপর এত রাগ করবার কোনও মানে হয় না। যাই হোক, তবু আসল সত্যটা তো আর লুকোয়নি। বাবার সব সম্পত্তি একদিন যে আমি পাব, ভাবতে গিয়ে বুক ফেটে গেলেও সত্য কথাটা স্বীকার করেছেন মামা।

পিয়ালীর কানের কাছে মুখ নিয়ে আব ফিসফিস করে কী যেন বলে সুললিত। পিয়ালী ভ্রূকুটি করে হাসে আর সুললিতের পিঠের উপরে আস্তে একটা চাপড় মারে। —দুষ্টু!

—কী হল ? নীরজা প্রশ্ন করতে গিয়ে হেসে ফেলেন।

সুললিত— পিয়ালীকে ওব গ্র্যাণ্ড সাকসেসের জন্য কনগ্র্যাচুলেশন জানালাম।

উঠে দাঁড়ান নীরজা— আমি হলাম রায়গঞ্জের সেকেলে গেঁয়ো মানুষ। তোমাদের এত ইংরেজি কথার মানে বুঝি না। দেখি, কানা ঠাকুরটা আবার পাতি লেবুর চচ্চড়ি চড়িয়ে দিল বোধ হয়।

চলে যান নীরজা। মিতালী আরও চা খায় ; মিতালীর কপালের উপর আস্তে আস্তে দুলছে আর কাঁপছে চুলের যে কার্ল, সেটাকে হাতের আঙুল দিয়ে টানে আর ছাড়ে, ছাড়ে আর টানে মিতালী। কী যেন ভাবছে মিতালী।

সুললিত বলে— মিতু, বাসবানির ওই পার্টিতে কি কোনও দেশি মানুষ ছিল ?

মিতালী— মাত্র একজন, আর সবই বিদেশি।

সুললিত— তাদের সঙ্গে নিশ্চয় তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, বাসবানি ?

মিতালী— হ্যাঁ।

সুললিত— ওদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয় তোমাকে নেমন্তন্নও করে রেখেছে।

—হ্যাঁ।

—কবে ?

—এ মাসের শেষে গ্লাসগো থেকে মেশিন টুল ইণ্ডাস্ট্রির এজেন্ট হয়ে এসেছেন যে মিস্টার ডেভিস, তিনি এ মাসের শেষে বোম্বে থেকে কলকাতা ফিরবেন। তখন বাসবানি আমাকে জানিয়ে দেবে, কবে নেমন্তন্ন হবে।

পিয়ালীর পিঠে একটা চিমটি কাটে সুললিত— তুমি তা হলে কলেজে আর যাবে না বলেই ঠিক করেছ ?

পিয়ালী—হ্যাঁ।

সুললিত— কেন ?

পিয়ালী—বাংলার কৃষ্ণাদি রোজই খোঁটা দিয়ে একটা কথা শোনাচ্ছেন। কাজেই...।

সুললিত— কী কথা ?

পিয়ালী— কৃষ্ণাদি বলেন, আমার সাজ দেখে ক্লাসের মেয়েরা সবাই নাকি মুগ্ধ হয়ে শুধু আমারই দিকে তাকিয়ে থাকে ; কৃষ্ণাদির লেকচারে কেউ কানও পাতে না, শোনেও না।

মিতালী— ওই খোঁটা আমাকেও কত শুনতে হয়েছিল।

সুললিত— কোথায় আর কিসের প্রোগ্রাম তোমার ছিল, পিয়ালী ?

পিয়ালী হাসে— বলব না।

সুললিত— বলো না। তবে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। বেশ গোল-গাল মোটা-সোটা চেহারার এক গোয়ানিজ কালো-সাহেব, চমৎকার বেহালা বাজাতে পারেন। একটা হোটেলের তিনতলায় একটা ঘরের ভিতরে স্টেজের এককোণে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছেন ওই কালো সাহেব ডিক্রুজ ; আর কারা যেন স্টেজের উপর দুলে দুলে নাচছে। আর...।

—তোমার স্বপ্নের নিকুচি করি। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, আর লাফিয়ে চলে যায় পিয়ালী।

মিতালী বলে— তুমি দেখছি, সব খবরের রয়টার।

সুললিত— তা বলতে পারো।

মিতালী— পিয়ালীর প্রোগ্রামের এই খবরগুলো কোথায় পেলে ?

সুললিত হাসে— স্বয়ং ডিক্রুজই আমাকে বলেছে। একেবারে স্পষ্ট করেই বলেছে, ওর নাইট ক্লাবের আসরে এখন সব চেয়ে চমৎকার স্ট্রিপ করতে পারে একটি নতুন রিক্রুট, একটি বাঙালি মেয়ে, নাম তার পিয়ালী রায়। ফিরিঙ্গি মেয়েগুলো ওদের শেষ পোজে তবু একটু ঢাকাঢুকির বালাই রাখে, ছোট্ট প্যান্টিটা থাকে। কিন্তু নতুন রিক্রুট নাকি তার শেষ পোজে ছবির ভেনাসের চেয়েও বেশি আদুড় হয়ে, শুধু ছোট্ট একটি জাপানি পাখার ছায়া দিয়ে কায়ার মায়াটিকে সামান্য একটু রাখেন।

—আমি যাই। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় মিতালী। —এখন আমি অন্তত পুরো পাঁচটি ঘণ্টা ঘুমোব।

সুললিত— ঘুমোও। হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি। তুমি আব পিয়ালী, দুজনে কখনও একই দিনে কোনও পার্টি বা প্রোগ্রাম রাখবে না।

মিতালী— কেন ?

সুললিতের দুই চোখে একটা কঠোর দাবির জ্বালা জ্বলজ্বল করে। —আমার বড় অসুবিধে হয়। একেবারে একলা হয়ে পড়ে থাকতে আমার বেশ কষ্ট হয়।

একদিন খাবার টেবিলের কাছে এসেই নীরজাকে আরও একটা কষ্টের কথা বলেছিল সুললিত। —অন্তত দুপুরের খাওয়াটার এমন দুর্দশা হলে তো চলবে না।

নীবজা— আঁ ! দুর্দশা ?

সুললিত— হ্যাঁ, না আছে চিকেন, না আছে পুডিং, না আছে এক-আধটুকু বিরিয়ানি পোলাউ।

নীরজা লজ্জিত হয়ে হাসেন— ঠিকই বলেছ। কিন্তু।..

সুললিত— আর তো কোনও কিন্তু নেই। আপনাদের তো এখন টাকার কোনও অভাব নেই !

নীরজা— অভাব আছে বৈকি। হ্যাঁ, ভাগ্যের জোরে আর নিজের গুণে মেয়ে দুটো মাঝে মাঝে এক আধটা প্রোগ্রাম পায়, তাই চলে যাচ্ছে।

সুললিত— আপনি তো জানেন, মিতু খাঁটি পার্লের দুটো নেকলেস কিনেছে। পিয়ালীও আধ ডজন বালুচর কিনে ফেলেছে।

নীরজার গলার স্বর এইবার বেশ মৃদু হয়ে ও কুণ্ঠিত হয়ে যেন মার্জনা চায়— আমি খুব বুঝতে পারছি বাবা, তোমার মত মানুষের এ রকম কাণা ঠাকুরের রান্না খুবই খারাপ লাগে।

গম্ভীর সুললিতের খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন নীরজার গলার স্বরটা যেন একটু সাহস পেয়ে কথা বলে— তোমার বাবাব কাছ থেকে কোনও সাড়া তো এখনও পাওয়া গেল না,

ললি।

—কিসের সাড়া ?

—তোমাকে আর টাকা পাঠালেন না, নিজের কাছে ডাকলেনও না, একবার তাঁর গাড়িটাকেও এখানে পাঠালেন না।

—সে জন্য আপনার দুশ্চিন্তা কেন ? যখন সময় হবে, তখন সবই হবে। অন্তত এটুকু বিশ্বাস করতে তো কোনও অসুবিধে নেই যে, বাবার মৃত্যুর পর তাঁর সব সম্পত্তি আমিই পাব। মামার লেখা চিঠিটা তো পড়েছেন। তবু—

—না না, কোনও সন্দেহ করছি না।

—মামার হাতের লেখা ঠিক আমারই হাতের লেখার মত। কিন্তু সেজন্যে যদি সন্দেহ করেন যে...

—না, না, একটুও সন্দেহ নেই।

—তবে বিশ্বাস করুন, বাবার সব সম্পত্তি আমিই পাব।

—তাই তো বিশ্বাস করতে চাই।

—বিশ্বাস করতে চাই নয়, বিশ্বাস করতে হবে।

—তুমি বাবা একদিন নিজেই যাও।

—কোথায় ?

—তোমার বাবার কাছে যাও, সব কথা তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলো।

—সেটা সম্ভব নয়।

—কেন ?

—আমার অসম্মান।

—সেটা বুঝি। তবু...।

—আবার তবু কিসের ?

—তবু, তোমার সম্মানের কথাটাই ধর না কেন, তোমার তো তবে একটা ভাল রোজগারের কাজ ধরা উচিত।

—না।

—বাবার কাছে যাবে না, কোনও কাজও ধরবে না ; এটা কি একটা কথা হল।

—ওরকম তর্ক আমার সঙ্গে করবেন না। শুনে নিন তবে, আমি যেমন আছি, তেমনিই থাকব। আমি নড়ব না।

পাশের ঘর থেকে মিতালী আর পিয়ালী দু'জনেই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে, যেন ভীরু দুটি গুঞ্জনের স্বর চেপে দিয়ে আর জোর ক'রে হেসে-হেসে কথা বলে— তুমি মিথ্যে কেন এসব তর্ক করছ, মা। কোনও দরকার নেই। মিস্টার সুললিত সরকার হলেন কড়া মেজাজের একটি ঔরঙ্গজেব।

সুললিতের হাতের কাছে ক্ষীরের বাটি এগিয়ে দিয়ে নীরজা আবার হাসতে চেষ্টা করেন— বেশ তো, আর তর্ক করব না। কিন্তু কী এমন বাজে কথা বলেছি যে, ললি এত রাগ করবে।

সুললিতও এইবার হাসে— এই তো আবার তর্ক শুরু করলেন।

পাশের ঘরে মিতালী আর পিয়ালী দুজনে একসঙ্গে এইবার খিলখিল করে হেসে ওঠে। —ড্রপ সিন ! ড্রপ সিন নামাও এবার।

হ্যাঁ, ড্রপ সিনই পড়ে গেল। নীরজার হাত থেকে ক্ষীর তোলবার চামচটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে আর কাচের গেলাসে লেগে ঝনঝনে আর্তনাদের মত অদ্ভুত একটা শব্দ করে বেজে উঠল। আর কোনও কথা বলেন না নীরজা।

॥ ১৩ ॥

রাত কত ? দশটারও বেশি হবে। কী সাংঘাতিক ঝড় বৃষ্টিও চলছে। হাওয়ার ঝাপ্‌টা লেগে সাত

নম্বর হরি দত্ত লেনের সব জানালা কাঁপছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, তবু ঘরের একটা দরজা খোলা রেখে, আর দরজার কাছে বারান্দার উপর একটা চেয়ার রেখে, তার উপর বসে আছে সুললিত। কত শক্ত হয়ে, যেন পাথরের মূর্তিটি হয়ে বসে আছে সুললিত।

নীরজা এসে বার বার তিনবার জিজ্ঞাসা করেছেন, কফি তৈরি করে দেব ?

সাড়া দেয়নি সুললিত। তবু আবার এসে জিজ্ঞাসা করেন নীরজা— কফি খাবে ?

সুললিত— না। কফির চেয়ে ভাল জল খেয়েছি। কফির দরকার নেই।

চমকে ওঠেন নীরজা। —তবে এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

সুললিত— না।

সুললিতের গলায় এই 'না' শব্দটা যেন একটা গর্জন।

নীরজা— তুমি রাগ করেছ, মনে হচ্ছে।

সুললিত— কেন রাগ করব না ? আমি ওদের বলেছিলাম, তোমরা দুজনে কখনও একই দিনে কোনও প্রোগ্রাম রাখবে না। তবু আমার কথা অমান্য করে আজ ওরা দুজনেই বাইরে বের হয়েছে।

নীরজা— একটু পরে ওরা তো বাড়িতে ফিরবেই ; তোমার কথার অমান্য কেন হবে ?

সুললিত— না, ওরা আজ ফিরবে না।

নীরজা— ফিরবে না ? এ কি রকমের কথা।

সুললিত— হ্যাঁ, এই রকমই কথা। একজন গিয়েছেন ডেভিসের সঙ্গে টাটানগর। আর একজন গিয়েছে মোহন খোসলার সঙ্গে দিঘা।

নীরজা— এ তো বড় বেশি দুঃসাহসের কথা।

সুললিত— কল গার্ল দুঃসাহসী হবে না তো কি ঝি রামুর মা দুঃসাহসী হবে ?

নীরজা— কল গার্ল ? তার মানে ?

সুললিত— কল গার্ল মানে কল গার্ল। তারা রূপসী মডার্নিটি হয়ে পয়সাওয়ালা মানুষের ফূর্তির সহচরী হয়, তার সঙ্গে রাত কাটায়, আর টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

সুললিতের মুখে হাসি। বার বার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বলেই সুললিতের মুখের হাসিটাকে দেখতে পাচ্ছেন নীরজা। কিন্তু দেখতে পেয়েও যেন অন্ধের মত তাকিয়ে থাকেন।

হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে নীরজার কাছে এগিয়ে আসে সুললিত। নীরজার একটা হাতও ধরে ফেলে। আর এক হাতে নীরজার গলাটাকে জড়িয়ে ধরে। —এসো, আমার ঘরে এসো।

—এ কী সর্বনেশে কথা। চেঁচিয়ে ওঠেন নীরজা ; যেন অজগরের পাকে জড়ানো একটা ভীরু হরিণের যন্ত্রণার চিৎকার।

পাশের পড়ো বাড়ির আঙিনার নিমগাছে কোনও পেঁচা আর ডাকে না। ঝড়ের ভয়ে নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের দোতলায় ওঠবার পুরনো সিঁড়ি ধরে দুড়দাড় একটা শব্দের আছাড় যেন মরিয়া হয়ে উপরে উঠতে থাকে। অনেক চেষ্টা ক'রে অজগরের পাক থেকে শরীরটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিয়েছেন নীরজা।

—কে ? কেন ? শব্দ শুনে চমকে উঠলেন পঙ্গু রোগী লোকনাথ রায়। সত্যিই যে খুবই অদ্ভুত শব্দ। কে যেন দৌড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল, আর লোকনাথের রোগশয্যার খাটটাকে ছুঁয়ে লোকনাথের মাথার কাছে ঘরের মেঝের উপর ধুপ করে বসে পড়ল।

—কে তুমি ? আবার ডাক দিলেন লোকনাথ।

—আমি। যেন হাঁসফাঁস করে, একটা বোবা নিশ্বাস কোনও মতে কথা বলে জবাব দেয়।

—তুমি নীরু ?

—হ্যাঁ।

—কী ব্যাপার ?

—ভয় পেয়েছি।

—ভয় ?

—হ্যাঁ।

—তবে শিগগির আলো জ্বালো, তোমার হাতের কাছেই দেয়ালে সুইচ আছে।

আলো জ্বেলে দিয়ে আবার লোকনাথের খাট ছুঁয়ে মেঝের উপর ধুপ করে বসে পড়েন নীরজা।

—কিন্তু, কিসের ভয় নীরু ? খাটের উপর উঠে বসেন, আর নীরজার সেই যন্ত্রণাভীরু মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকেন লোকনাথ।

নীরজার চোখে জল, কিন্তু চোখ লুকোন না নীরজা, চোখের জলও মোছেন না। নীরজার হাতটা থরথরিয়ে কাঁপছে, যদিও নীরজার সেই হাত খাটটাকে খুব শক্ত করে ধরে রয়েছে।

—সর্বনাশ। আবার চমকে ওঠেন আর ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন নীরজা। এই ঘরেরই ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে সুললিত। কী শান্ত, কত শক্ত, আর কী দুঃসাহসী সুললিত। পঙ্গু রোগী লোকনাথ রায়কে বোধ হয় একটা মরা টিকটিকির চেয়েও নির্জীব অস্তিত্ব বলে মনে করে সুললিত। শুধু একা সুললিত কেন ? নীরজাও জানেন, রায়গঞ্জের এই লোকনাথ রায় আজ একটি পঙ্গু অক্ষম ও অশক্ত রোগী মাত্র। নইলে এঘরে এসে, লোকনাথ রায়েরই শিয়রের কাছে মেঝের উপর বসে, আর লোকনাথের খাট এত শক্ত করে ধরে থেকেও এত ভয় পাবেন কেন নীরজা ?

নীরজার দিকে তাকিয়ে আর হাত তুলে ইশারায় ডাক দেয় সুললিত— চলে এসো। ঘরের দেয়ালের গায়ে সেই ইশারার ছায়াটা নড়ছে ও দুলছে ; যেন অতিকায় এক দানবের হাতের ছায়া।

নীরব স্তব্ধ ও নিঃসাড় লোকনাথ। লোকনাথ তাঁর খাটের উপব বসে শুধু দেখছেন, নীরজার চোখে জল। কিন্তু কী আশ্চর্য, পঙ্গু লোকনাথের দুই অপলক চোখে যেন খুশি জ্যোৎস্নার আভা চিকচিক করছে।

দুই পা এগিয়ে আসে সুললিত। এইবার শুধু হাতের ইশারাতে নয়, চাপা ধমকের মত ভঙ্গিতে গলার স্বর বেশ তীব্র করে নিয়ে ডাক দেয়— চলে এসো বলছি।

দুই চোখ বন্ধ করে মাথাটাকেও খাটের শক্ত কাঠের উপর নামিয়ে দিয়ে কাঁপতে থাকেন নীরজা।

—মনে হচ্ছে, হাত ধরে টেনে নিয়ে না গেলে, তুমি আসবে না। বলতে বলতে নীরজার কাছে এসে শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায় সুললিত, আর পকেট থেকে সিগারেট বের করে নিজেবই হাতের পাঞ্জার উপর ঠুকতে থাকে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সুললিতের হাত থেকে খসে পড়ে গেল সিগারেট। পঙ্গু লোকনাথের দুটি হাত, কী ভয়ানক শক্ত হাত, সত্যি যেন লোহা আছে সেই হাতে, সুললিতের গলা টিপে ধরেছে। দুই হাত ছুঁড়ে, বার বার লোকনাথের বুকটাকে ধাক্কা দিয়ে, লোকনাথের হাতের সাঁড়াশি থেকে গলাটাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে সুললিত। লোকনাথের সাঁড়াশি হাত কিন্তু একটুও কাঁপে না। লোকনাথের মুখে কী ভয়ানক এক সুখের উল্লাস কাঁপছে ! লোকনাথের দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতের সাদাটা ঠিকরে পড়ছে, যেন একটা জন্তুর হিংস্রতা ঝকঝক করছে।

সুললিতের দুই চোখের তারা উল্টে গিয়েছে। মুখের দুই কষ বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা লালচে লালা ঝরে পড়ছে। এইবার খাটেরই কাঠের উপর সুললিতের মাথাটাকে চেপে ধরেন, আবার ঠুকতেও থাকেন লোনাথ। সুললিতের গোঙানির শব্দটা এইবার আরও অদ্ভুত হয়ে যায়। যেন মাথা ঠুকছে একটা বোবার আর্তনাদ।

হঠাৎ ঝুপ ক'রে মেঝের উপর পড়ে গেল সুললিতের শরীর। লোকনাথের সাঁড়াশি হাতের পেষণ থেকে হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গেল সুললিতের গলা। বোধ হয় সুললিতের গলার ঘামে পিছল হয়ে গিয়েছে লোকনাথের হাত ; তাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুললিতের সেই পতিত দেহটার একটা হাত শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরেন লোকনাথ। —জানোয়ারের সব পাঁজরা গুঁড়ো করে দেব।

সুললিত হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে— আমাকে ছেড়ে দিন ; আমি এখনই এবাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

সুললিতের হাত ছেড়ে দিলেন লোকনাথ। খুব জোর একটা হাঁপ ছাড়লেন। তারপর শুয়ে পড়লেন।

আর ঝড় নেই, বৃষ্টিও নেই। হরি দত্ত লেনের রাত একটার অন্ধকারের গায়ে তবু করুণ গুঞ্জনের মত একটা শব্দ কোথা থেকে এসে যেন লুটিয়ে পড়ছে আর ছড়িয়ে যাচ্ছে।

কে কাঁদে ? দরজা খুলে বাড়ির বাইরে এসে আর রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে প্রথম যিনি একটা বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা চিৎকার করে শোনালেন ও পাড়া জাগিয়ে তুললেন, তিনি হলেন অন্নপূর্ণার বাবা, অর্থাৎ সামনের বাড়ির মহীতোষ বাবু।

ওদিকের বাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলেন রমেশবাবু—কী ব্যাপার, মহীদা ?

মহীতোষ— এই সাত নম্বর বাড়িতে একটা ব্যাপার হয়েছে। মনে হচ্ছে, একজন মহিলা কাঁদছেন।

পাড়ার জিতেন একটা টর্চ হাতে নিয়ে ছুটে আসে— হ্যাঁ, মহীকাকা, আমিও শুনেছি।

মহীতোষ— কিন্তু কিছু দেখেছ কি ?

জিতেন— না।

মহীতোষ— আমি দেখেছি। একে তো আমার চোখে অনিদ্রা রোগ, তার ওপর রাতের অন্ধকারেও চোখের দৃষ্টি বেশ ভালই চলে। তার ওপর কানেও একটু বেশি শুনি। রাতের বেলা পাড়ার ভেতরে একটা বিড়াল দৌড়ে গেলেও আমি শব্দ শুনতে পাই।

জিতেন— কী দেখেছেন বলেই ফেলুন না।

মহীতোষ— তখন থেকে দেখছি আর শুনছি, এই সাত নম্বরের ভেতরে যেন একটা ভূতের কাণ্ড ছুটোছুটি করছে। এই কিছুক্ষণ আগে এই বাড়ির জামাইবাবু একটা বাক্স হাতে নিয়ে আর হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন।

একে একে আরও অনেকে আসেন। প্রদীপবাবু, জয়ন্তবাবু, আর হেম বিনয় ও চারু সরকার। সাত নম্বরের বাড়ির সামনে সাত-আট জন প্রতিবেশী মানুষের উৎকণ্ঠ ভিড়টা এইবার বেশ আশ্চর্য হয়, বাড়ির তিনটি দরজাই খোলা। জিতেন বলে— ডাকাতি।

চারু সরকার— পারিবারিক কলহ।

প্রদীপ বাবু— শোকের ব্যাপারও হতে পারে।

বলতে বলতে সকলেই একটু ব্যস্ত হয়ে সাত নম্বর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দোতলার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

প্রদীপ বাবু— আমি ঠিকই অনুমান করেছি, শোকের ব্যাপার।

মহীতোষ বাবু— আমার সন্দেহ হয়, ফাউল প্লে।

হেম— তবে তো পুলিশে খবর দিতে হয়।

বিনয়— একটু সবুর করো।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন নীরজা, সেই সঙ্গে কান্নার সব শব্দও স্তব্ধ হয়ে যায়।

মহীতোষ বাবু এইবার নীরজার স্তব্ধ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে এবং বেশি বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন-- আপনার তো চুপ করে থাকলে চলবে না।

নীরজা— বলুন, কী বলব ?

মহীতোষ— এই রুগি ভদ্রলোক কি জ্ঞান হারিয়েছেন, না মরেই গিয়েছেন ?

নীরজা— দেখুন আপনারা।

জিতেন খাটের কাছে এগিয়ে যায়, আর লোকনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে— এঃ মরেই গিয়েছেন।

মহীতোষ আবার চেঁচিয়ে উঠলেন— মনে হয় এ নিশ্চয়ই মার্ডার, প্রদীপবাবু ? রুগি ভদ্রলোককে কেউ খুন করেছে। কিন্তু খুন করবে কে ?

প্রদীপবাবু— মহিলাকেই জিজ্ঞাসা করুন না, কেন।

নীরজার দিকে হাত তুলে আর কড়া শাসানির একটা ভঙ্গি থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেন

মহীতোষ— আপনি বলুন, কে খুন করেছে ? আপনি ?

নীরজা— হ্যাঁ।

চমকে ওঠে পাড়ার মানুষের সেই উৎকণ্ঠ ভিড় ; প্রদীপবাবু সেই মুহূর্তে কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি ধরে নেমেই চলে যান।

মহীতোষ ছটফট করেন— আপনারা সবাই এবার বলুন তা হলে, অগত্যা কী করা উচিত। পুলিশ ডাকবেন ?

হেম হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে— এই মহিলার কথাই বা চট করে বিশ্বাস করে ফেলতে হবে কেন ? হতে পারে শোকে মাথা খারাপ হয়েছে, তাই ওরকম একটা সাংঘাতিক বাজে কথা বলছেন।

বিনয়— আমারও তাই মনে হচ্ছে।

জয়ন্তবাবু— সবার আগে একজন ডাক্তার ডেকে আনা উচিত।

হেম— আমি যাচ্ছি, আমাদের পাড়াতেই থাকেন, ডাক্তার সুমন্তদা। ডাকলেই আসবেন, যত রাত হোক না কেন।

হেমের পায়ের শব্দ সিঁড়ি ধরে দুমদাম করে নীচে নেমে যায়। মহীতোষ আবার চেঁচিয়ে ওঠেন— শুনছেন আপনি ?

নীরজা— হ্যাঁ।

মহীতোষ— আমাদের কথার জবাব দিন।

নীরজা— বলুন।

মহীতোষ—আপনার ছেলে কোথায় ?

—জানি না।

মহীতোষ— আপনার জামাই বা এই রাতে হঠাৎ ওভাবে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলে গেল ?

—জানি না।

—আপনার মেয়েরা কোথায় ?

—জানি না।

জয়ন্তবাবু বলেন— থামো মহীদা, আর জেরা করে লাভ নেই। আমি বলি, মহিলার কেউই যখন এখানে এখন নেই, তখন সৎকারের ব্যবস্থা আমরাই করি। চাঁদা করে সকলেই কিছু কিছু দিলে...।

বিনয়— তুমি একবার দেখো তো জিতেন, ভদ্রলোকের বিছানার ওপর ওই পঞ্জিকাটার ভেতরে কারও ঠিকানার কাগজ-টাগজ আছে কিনা।

পঞ্জিকা হাতে তুলে নিয়েই জিতেন বলে— আছে। দেবকুমার দত্ত, বসাক বাগান লেন, দমদম। অ্যাঁ ! এসব আবার কী লেখা রয়েছে : যদি খবর পাও তবে অবশ্যই তুমি একবার আসিবে, দেবু। অনুরোধ, তুমি আমাকে লইয়া গিয়া রাধানাথের চোখের কাছে কদমকুঞ্জের ছায়াতে রাখিয়া দিবে।

জয়ন্ত বাবু— বাঃ, চমৎকার। এ যে খুব ধার্মিক মানুষের কথা বলে মনে হচ্ছে।

মহীতোষ বলেন— এঁদের আর একজন কুটুম্ব আছেন, যাঁর গাড়ি এ বাড়িতে প্রায়ই আসত।

জয়ন্তবাবু— কে ?

মহীতোষ— যাদবপুরের কমল সেন।

বিনয় হাসে— বলুন, কমল দালাল।

জয়ন্তবাবু— তবে আমার বাড়িতে গিয়ে তুমি এখনই ফোন করে কমলবাবুকে চলে আসতে বলো। আর, আমারই গাড়ি নিয়ে বসাক বাগান চলে যাও। কুইক ; দেরি করো না।

বিনয়ের পায়ের শব্দ দুড়দাড় করে বাজতে বাজতে আর সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যায়।

ভোর হয়ে এসেছে। পড়ো বাড়ির আঙিনার নিমগাছে ঘুম ভাঙা কাক আস্তে আস্তে একটা ডাক ছেড়েছে। ডাক্তার এসে মৃত্যুর সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছেন— হঠাৎ হার্ট ফেল ক'রে মৃত্যু।

পাড়ার মানুষেরা এখন আর উপরতলার ঘরে নয় ; নীচের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে যেমন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি, তেমনই একটা অদ্ভুত ক্লান্তিও বোধ করছেন।

আবার সাড়া জাগে। পরপর দুটো গাড়ি এসে সাত নম্বর বাড়ির স্তব্ধতার কাছে থামতে গিয়ে মিছামিছি গজরাতে থাকে। হ্যাঁ, দেবু দত্ত এসেছে, যাদবপুরের সুধাদি ও তাঁর স্বামী কমল সেনও এসেছেন।

দেবু বলে— সব খরচ আমার, আমিই ওঁকে ওঁর দেশে রায়গঞ্জে নিয়ে যাব। আপনারা শুধু তাড়াতাড়ি একটা লরি যোগাড় করে দিন।

দশ মিনিটের মধ্যে লরি নিয়ে আসে হেম। কে জানে পাড়ার কোন ঘুমন্ত বাড়ির বাগান ভেঙে দশ মিনিটের মধ্যে একঝুড়ি টগর নিয়ে আসে বিনয়। আর, অন্নপূর্ণার মা পনেরো মিনিটের মধ্যে চন্দন আর তুলসীপাতা পাঠিয়ে দিলেন।

—এইবার লরিতে একটা ধোওয়া সাদা চাদর বিছিয়ে দাও। ওরে অন্নপূর্ণা, মা'কে বল একটা সাদা চাদর এখুনি পাঠিয়ে দিক। চেঁচিয়ে হাঁক দিলেন মহীতোষ।

তারপর আর পাঁচ মিনিটও দেরি নয়। রায়গঞ্জের পঙ্গু লোকনাথের দেহটাকে ধরাধরি করে নামিয়ে নিয়ে এসে লরির উপর তুলে দিল, হেম বিনয় আর জিতেন।

—চলুন। লরির ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে কথা বলে দেবু। জয়ন্তবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন— আরে আরে, ও কী ? থামুন একটু। মহিলাকে আসতে দিন।

দেবু—মহিলা আসবেন না। তাঁর আসবার কোনও কথাও নেই।

জয়ন্তবাবু— তার মানে ? উনি কি তা হলে এখানেই একা একা...।

উচ্চকিত শব্দ তুলে, লরিটা যেন জয়ন্তবাবুর বিস্ময়ের প্রশ্নটাকে হঠাৎ ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

হাঁফ ছাড়েন জয়ন্তবাবু— মহীদা, আমি এবার চলি।

হেম— আমিও যাই।

জিতেন— আমিও।

কিন্তু ও কী, কখন নেমে এসেছেন মহিলা ? বারান্দার লাগা ঘরের দরজার কাছে বসে কপাটের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাকিয়ে দেখছেন না কিছু ; চোখ বন্ধ করে রয়েছেন।

সুধাদির দিকে তাকিয়ে মহীতোষ চেঁচিয়ে ওঠেন— এই যে, আপনি এসেছেন। আপনি তো এ বাড়ির একজন আত্মীয় মহিলা !

সুধাদি— হুঁ।

মহীতোষ— তবে এতক্ষণ শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? কিছু বলছেন না কেন।

সুধাদি— কী বলব ?

মহীতোষ— এই মহিলা কি এখানেই এভাবে পড়ে থাকবেন ?

কমল সেনের মুখের দিকে তাকান সুধাদি। কমল সেন তখনই সুধাদির একেবারে কাছে এসে আর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে আস্তে ফিসফিস করে কথা বলেন— তোমার রান্নার লোকটার কী যেন নাম ?

সুধাদি— গুরুচরণের মা।

কমল সেন— তিন মাস হল সে তার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছে, সে কি আর আসবে ?

সুধাদি— না। চিঠি লিখেছে তার শরীর একটুও ভাল নয়। আর কাজ করতে পারবে না।

কমল সেন— তবে ?

সুধাদি মাথা নাড়েন— হ্যাঁ।

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে আর ব্যস্তস্বরে ডাক দেন সুধাদি— চলে আয় নীরু। আমার সঙ্গে চল।

উঠে দাঁড়ালেন নীরজা। সুধাদির পিছু-পিছু হেঁটে গাড়ির ভিতরে উঠলেন ও বসলেন।

যাদবপুরের সুধাদির গাড়িটা ছুটে চলে যেতেই মহীতোষ একটা হাঁফ ছাড়লেন— এর পর আর কী করবার আছে রে জিতেন ?

জিতেন— কিছুছু না। শুধু ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটাকে বাড়িওয়ালা চৌধুরীবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিন।

দুই গন্ধর্ব

কেলি গন্ধর্ব

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরেই নরু মামা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—ভাগ্য ভাল বলতে হবে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গেই রানুর বিয়ে হবে।

সীতারামপুরের যে নরেশ সেন আজ পনেরো বছর ধরে ডাক্তার যতীন গুপ্তের ফার্মেসিতে কম্পাউন্ডারের কাজ করছেন তিনিই হলেন রানুর নরু মামা। আপন মামা নন, রানুর ছোট মামির বড়দা নরেশ সেন, তাই তিনি নরু মামা। খুবই রোগা ও শুকনো চেহারা, চোখের দুই কোণ দিয়ে সব সময় জল গড়িয়ে পড়ছে, চোখে বোধ হয় কোনও রোগ আছে নরু মামার। দেখলে মনে হবে, নরু মামা যেন এই পৃথিবীর সব আলোছায়াকে ছলছল চোখে তাকিয়ে দেখছেন। একটি মেয়ে ও দুটি ছেলে, আর গৃহিণী ; নরু মামার সংসারের সকলেই যেন এক একটি জীর্ণ-করুণ অস্তিত্বের চেহারা। বড় মেয়েটির বয়স সাত বছর ; ছোট ছেলেটির বয়স দু'বছর ; দু'জনের মাঝখানে যেটি আছে তার বয়স পাঁচ বছর। অর্থাৎ মিনু, টুলু আর ভুলু। ছাপান্ন টাকা মাইনে পান নরু মামা, আর বাসা ভাড়া বারো টাকা ; কাজেই নরু মামার সংসারটি হল বারোমেসে দুর্দশার একটি ছবি। এমন দিন যায়, যেদিন দু'বেলার কোনও বেলাতেই উনানে হাঁড়ি চড়ে না। সেদিন দু'বছর বয়সের ওই শিশুটাও পর্যন্ত পান্তা খায় ; কেউ বা শুধু দু'মুঠো আটা গুলে নিয়ে, তার মধ্যে এক টুকরো গুড় ঘষে দিয়ে তিন চুমুকে খেয়ে ফেলে আর ঢেঁকুর তোলে। আর নরু মামা ? জ্যোৎস্না মামি অনেক করে আর দিব্যি দিয়ে অনুরোধ করেন ; তাই নরু মামা কাজে যাবার পথে নুটুর তেলেভাজার দোকান থেকে চার পয়সার ফুলুরি খেয়ে নেন।

সেদিনটা একেবারে খাঁটি উপোস করে, সজলা উপোস বটে, বাড়ির শুধু দুটি প্রাণ। এক জ্যোৎস্না মামি, দুই রানু। মামি কিছু খান না বলেই রানু কিছু খায় না। কিংবা রানু কিছুই খেতে চায় না বলে মামি খান না।

রানু তো আর কচি মেয়েটি নয়। রানুর বয়স সতেরো পার হয়ে আঠারোয় পড়েছে। সবচেয়ে কঠোর ও বাস্তব সত্য হল, নরু মামার এই সংসারে রানু একটি অতিরিক্ত আবির্ভাব। মা মরে গেছে কবেই, বাবাও মরে গিয়েছে প্রায় সাত বছর আগে। দশ বছর বয়সের রানুকে ঠাঁই দেবার মত একটা ঘর কোথাও পাওয়া গেল না। অনেক খুঁজেছিলেন বিধুবাবু, রানুর বাবার বন্ধু, একই জুটমিলের কেরানি। ভাটপাড়া, কলকাতা, হরিপাল, মন্তেশ্বর, ক্যানিং আর গিরিডি ; কত জায়গায় কত ভদ্রলোকের কাছেই না চিঠি দিয়েছিলেন বিধুবাবু। রানুর কাছ থেকে নাম শুনে যাঁদেরই রানুর কোনও আত্মীয় কিংবা কুটুম্ব ধরনের মানুষ বলে বুঝেছিলেন বিধুবাবু, তাঁদেরই কাছে চিঠি দিয়েছিলেন : বাপ নেই, মা নেই এই মেয়েটাকে আপনি একটু আশ্রয় দিন। ষোলোটি চিঠির মধ্যে দশটি চিঠির কোনও জবাবই তিনি পাননি ; পাঁচটি চিঠির জবাবে ছিল প্রায় একই সুর আর ভাষা—খুবই দুঃখিত ; কিন্তু ক্ষমা করবেন, আমার পক্ষে কিশোর ঘোষের এই মেয়েকে এখন আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয় ; কারণ আমি নিজেই অভাবগ্রস্ত, আমার নিজেরই সংসার কোনওমতে কায়ক্লেশে চলে, চলে না বললেই চলে।

জবাব দিয়েছিলেন শুধু এই নরু মামা। ছোট মামা তো কবেই ট্রেনে কাটা পড়ে মরেছেন।

বিধবা ছোট মামিও নেই, তিনি পুরীতে তীর্থ করতে গিয়ে কলেরায় মরেছিলেন। তাঁরই বড়দা নরু মামাকে জীবনে শুধু একদিন দেখেছিল রানু। বাবা তখন ছিলেন। কি যেন একটা কাজের জন্য ভাটপাড়াতে এসেছিলেন নরু মামা। খুবই আদর করে রানুর পিঠে হাত বুলিয়ে নরু মামা বলেছিলেন—আপনার এই মেয়েকে খুব ইন্‌টেলিজেন্ট বলে মনে হচ্ছে, কিশোরদা। ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন। এইটুকু মেয়ের হাতের লেখা কী সুন্দর!

বিধুবাবুর কাছে চিঠি দিয়েছিলেন সীতারামপুরের নরু মামা : আমার হল নিত্য অভাবের সংসার। তারই মধ্যে যদি কিশোরদার মেয়েকে রাখতে চান তবে পাঠিয়ে দিন।

শত ধন্যবাদ দিয়ে নরু মামাকে চিঠি লিখেছিলেন বিধুবাবু। আর সাতটি দিনও দেরি না করে, হরি মাস্টারমশাইকে সঙ্গে দিয়ে রানুকে সীতারামপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

নরু মামা বোধ হয় ভুলতে পারেননি, সাত বছর বয়সের সেই মেয়ের সেই সুন্দর হাতের লেখার ছবিটি। ইনটেলিজেন্ট মেয়েকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করতেন যিনি, সেই কিশোরদাও আর নেই। কাজেই নরু মামা আর দেরি না করে রানুকে সীতারামপুরের মেয়ে-স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। জ্যোৎস্না মামি বলেছিলেন—ভালই হল! যদি আত্মা বলে কিছু থাকে, তবে কিশোরবাবু এখন দেখে সুখী হবেন যে, তাঁর মেয়ে স্কুলে পড়ছে।

পাড়ার লোকে অবশ্য নিন্দা করে : নরেশ কম্পাউন্ডার লোকটা, তার চেয়ে বেশি তাঁর গিন্নিটি, বেশ একটু নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ বলতে হবে। হলই বা কোনও এক কুটুম্বের একটা অনাথা মেয়ে, তাই বলে কি তাকে দিয়ে দু'বেলা রান্না করাতে আর বাসন মাজাতে হবে?

জ্যোৎস্না মামি বলেন—শুনেছ?

নরু মামা—কী?

—নলিন দারোগার বউ কী বলেছে?

—নরু মামা হাসেন—কুটুমের মেয়েকে আমরা খাটিয়ে মারছি, এই তো কথা?

—হ্যাঁ।

—তাতে কী আসে যায়?

—কিছু না। আমি ভাবি, এ রকম একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলে ওরা কী সুখ পায়?

—ভেবে লাভ নেই!

—কিন্তু কথাটা রানুর কানে গেলে মেয়েটা কী ভাববে?

ও ঘরের ভিতরে রানুর হাসির শব্দ কলকল করে বেজে ওঠে—আমি কিছুই ভাবছি না মামি। রাসুর মা সকাল বেলাতে পাঁচটি মিথ্যে কথা না বলে জল খান না।

জ্যোৎস্না মামি চমকে ওঠেন—ছি, ওকথা বলতে নেই, রানু।

রানু—স্কুলে আমাদের ক্লাসের সব মেয়েই ওকথা বলে। আজই জয়ন্তীকে বলেছেন রাসুর মা : আমাদের দেশে এক একটা পটোল একমণ ওজনের হয়, আর তোদের এই সীতারামপুরে এক সেরে পঁচিশটা সিড়িঙ্গে পটোল লিকলিক করে।

নরু মামা হাসেন, জ্যোৎস্না মামি হাসেন। রাসুর মা অর্থাৎ নলিন দারোগার স্ত্রীর রটনা যেন একটা মজার ঠাট্টার ধুলো হয়ে উড়ে যায়।

জোর করে কাজ করতে চেষ্টা না করলে রানুকে ঘরের কোনও কাজই করতে দেন না হাঁপানি রোগের ওই রোগা মানুষটি, জ্যোৎস্না মামি। চাল-বাড়ন্ত অরন্ধনের দিনে রানু জোর করে উপবাসী হয় বলেই চুপ করে বসে থাকেন জ্যোৎস্না মামি, আর আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন। রানুর একবার চার মাসের স্কুলের মাইনে বাকি পড়েছিল, তাই সারারাত ঘুমোতে পারেননি নরু মামা।

হ্যাঁ, পরের দিন সকাল বেলা এক বুড়ো ভদ্রলোক, স্কুলের দপ্তরি জনার্দনের বাবা, রানু যাকে নন্দ দাদু বলে ডাকে, তিনি কম্পাউন্ডার নরেশ সেনের বাড়িতে বৈদ্যনাথের প্রসাদ দিতে এসে চেঁচিয়ে ডাক দিলেন—কই গো, মহারানী কোথায়?

রানু বের হয়ে আসে—এই তো।

—বৈদ্যনাথের প্রসাদ নাও। জনার্দন কাল দেওঘর থেকে ফিরেছে। কিন্তু হ্যাঁ, তোমাকে

আজকাল স্কুলে যেতে দেখি না কেন ?

—আমি আর স্কুলে পড়ব না।

—কেন ?

—ইচ্ছে করে না।

—সে কী কথা ! নরু বাড়িতে আছ নাকি হে ? কী ব্যাপার, এসব কী কথা বলছে মহারানী ! এর মানে কী ?

পিঠছেঁড়া আর বুকছেঁড়া গেঞ্জিটার গলার ফাঁকে মাথা গলিয়ে আর টানাটানি করে পরতে পরতে ঘরের বাইরে আসেন নরেশ সেন—হ্যাঁ, নন্দকাকা। চার মাসের মাইনে বাকি, স্কুলে এবার মেয়ের নাম কেটে দেবে।

—কত মাইনে ?

—চার মাসের ছ' টাকা।

—আমি দিচ্ছি টাকা।

রানুর চার মাসের স্কুলের মাইনের টাকা তক্ষুনি দিয়ে দিলেন নন্দ দাদু ; আর বলেছিলেন—কিন্তু ভাল করে পাশ করা চাই, মহারানী।

কে জানে কেন ? নলিন দারোগার স্ত্রী একদিন খুবই বিরক্ত হয়ে আর মেজাজ উষ্ণ করে পাশের বাড়ির শোভনার মার কাছে অভিযোগ করেছিল—তোমাদের মেয়ে স্কুলের দপ্তরি জনার্দনের বাপ, ওই নন্দ বুড়ো খুবই অধার্মিক একটা লোক।

—একথা কেন বলছেন, দিদি ?

—চোখের উপরে কাণ্ডটা দেখলুম বলেই চোখ জ্বলছে, তাই বলছি। বৈদ্যনাথের প্রসাদ বলে আধখানা একটা পেঁড়া-সন্দেশকে ওই গরীব নরু কম্পাউন্ডারের কাছে ছ'টাকায় বিক্রি করে চলে গেল গো !

যাই হোক, ওই নলিন দারোগার স্ত্রীর চোখের উপরে দিয়েই রোজ স্কুলে গিয়েছে রানু, বছরের পর বছর পার হয়েছে, আর ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছে !

—শুনছ শোভনার মা ! আবার একদিন পাশের বাড়ির জানালার দিকে তাকিয়ে ডাক দিয়েছেন নলিনবাবুর স্ত্রী।

—কি দিদি ?

—রানু তো ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠল। খুবই ভাল কথা। কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করো সত্যি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারবে রানু ?

—একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন দিদি ?

—আমার তো মনে হয় না যে, পাশ করতে পারবে।

ভগবান জানেন, পরীক্ষা দিতে পারলে ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারবে কি পারবে না ওই মেয়ে, যার নাম রানু, যার বয়স আজ সতেরো পার হয়ে আঠারোতে পড়েছে। কিন্তু ভগবান বোধ হয় চান যে, রানুর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া যেন না হয়। তা না হলে আজ হঠাৎ বাড়িতে এসেই এত চেঁচিয়ে কথাটা বলে উঠবেন কেন নরু মামা—রাজা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গেই রানুর বিয়ে হবে ? শুনছ জ্যোৎস্না ?

সাধে কি নন্দ দাদু নাম দিয়েছেন, মহারানী ! নন্দ দাদুর দেওয়া এই নামটা যেন রানুর ওই চমৎকার আর সুন্দর রূপেরই একটা প্রশস্তি। ওই যে শোভনার মা, যিনি প্রতি রবিবার সাবান দিয়ে মাথা ঘষেন আর জানালার কাছে বসে চুল এলিয়ে দিয়ে বসে থাকেন, রোদে শুকিয়ে যাঁর চুলের গোছা ফুলে ফেঁপে একটা স্তবক হয়ে ওঠে, তিনিও রানুকে মাঝে মাঝে ডাক দেন—ও রানু শুনছিস, একবার কাছে আয় তো, দেখি !

রানু—কী দেখবেন ?

—আয় দেখি, কী রকম চুল করেছিস !

কোনওদিন রানুর বেণীতে হাত বুলিয়ে, কোনওদিন রানুর এলোচুলের গোছা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে কথা বলেন শোভনার মা—অ্যাঁ ? হ্যাঁ রে মেয়ে, কী করে এমন চুল

করলি বল তো ? আমলকির তেল মাখিস বুঝি ?

—না না।

—তবে ?

—সরষের তেল।

—কী আশ্চর্য, মুদির দোকানের ওই ছাই সরষের তেল।

—হ্যাঁ।

—তবে তো আমি আজ থেকে কেরোসিন তেল মাথায় মাখব, তোর চেয়েও আমার ভাল চুল হবে, কী বলিস ?

কিছু বলে না রানু। শুধু হাসে আর চলে যায়।

সত্যি কথা, রানুর ম্যাট্রিক পাশ করার কথাটার চেয়ে রানুর বিয়ের কথাটাই এই তিন মাস ধরে সব চেয়ে বেশি চিন্তা করেছেন নরেশ সেন। খুব বেশি কথা বলেন যে নরেশ সেন, তিনি এই তিন মাস হল খুবই গম্ভীর। যখন-তখন এক হাতের পাঁচটি আঙুলকেই কপালের উপর যেন ঠুকে ঠুকে আর চেপে চেপে একটা যন্ত্রণাকে চাপা দিতে চেষ্টা করছেন। উঠানের পেঁপে গাছে একটাও পেঁপে ফলেনি, পেঁপে গাছের ডালে বসে কোনও শালিকও ডাকে না ; শুধু দুই চোখের তারা একেবারে নিশ্চল করে দিয়ে ওই পেঁপে গাছেরই দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তাই আজ একটু আশ্চর্য হবারই কথা। আর রানুর জ্যোৎস্না মামি সত্যি আশ্চর্য হয়েছেন ; তিন মাস ধরে গম্ভীর হয়ে আছে যে মানুষটা, সে আজ যেন অদ্ভুত একটা উৎসাহে পাগল হয়ে উঠেছে।

জ্যোৎস্না বলেন—কী যে বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—যা বলছি একেবারে জেনে-শুনে আর নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়ে বলছি। রানুর বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

—জ্যোৎস্না—পাত্র কোথায় পেলে ?

—ওই যে, রাজা হরিশ্চন্দর।

জ্যোৎস্না—তার মানে ?

—ওই যে, নবমীর রাত্রিতে বারোয়ারি তলার যাত্রাতে যাকে হরিশ্চন্দ্রের পার্ট করতে দেখলে !

জ্যোৎস্না—সে কী ? জটপাকানো চুল, মুখ ভরা দাড়ি, সে তো বেশ বয়স্ক একটা মানুষ !

—নিতান্ত অল্প বয়স্ক মানুষ। তুমি যা দেখেছ সে সব হল শনের চুল আর দাড়ি। সে ছেলের মাথায় কালো কুচকুচে চুল আর মুখে কোনও দাড়িই নেই।

জ্যোৎস্না—তোমার চেনা ছেলে ?

—একরকম চেনা ছেলেই বলা যায়। ওর বাবা চরণ বসু আর আমি কাঞ্চননগর হাইস্কুলের একই ক্লাসের ছাত্র ছিলাম। ওরা হল সেই মালাধর বসুর বংশ। নদীর এপারে বীরপুরের মালাধরী গোষ্ঠীর একটি শাখা থেকে ওরা হল মাত্র ছয় পুরুষ।

জ্যোৎস্না—বুঝলাম ; কিন্তু ছেলে কী করে ?

—ছেলে এখন বর্ধমানে মোক্তারি পড়ছে। ছেলের বয়স হবে সাতাশ-আটাশ। ছেলে খুব ফর্সা, যদিও একটু বেশি ছিপছিপে। ছেলের নাকটি কিন্তু বাঁশির মতন, বেড়ে নাক।

জ্যোৎস্না—ছেলের আপন বলতে কে কে আছে ? ঘর-বাড়ির অবস্থা কেমন ?

—ঠিক আপন বলতে কেউ নেই। তিন শরিকের খুড়ো-জেঠারা আছেন। নিজের ঘর-বাড়ি নেই বটে ; তাই বলে অবস্থাটা তোমার সীতারামপুরী সংসারের অবস্থা নয়। জমি আছে ছেলের, ভাগচাষে যা পাওয়া যায়, তাতে একটি ছোট সংসারের ভাত-কাপড়ের কোনও অভাব হতে পারে না। মোট কথা, মোটা ভাত-কাপড়ে রানুর জীবনটা একরকম ভালই থাকবে।

জ্যোৎস্না—কিন্তু আর অন্তত সাত-আট মাস দেরি করলে ভাল হত না কি। মেয়েটা ম্যাট্রিক পাশ করে নিত, তার পর এর চেয়ে আর একটু ভাল অবস্থার ছেলের সঙ্গে, না হয় এই হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গেই...।

—ছেলের নাম হরিশ্চন্দ্র নয়। কান্তিনাথ বসু।

জ্যোৎস্না—বেশ তো, না হয় এই কান্তিনাথ বসুরই সঙ্গে রানুর বিয়ে হবে। কিন্তু ম্যাট্রিকটা পাশ করুক রানু।

—না, আর দেরি করা চলে না।

জ্যোৎস্না—লোকে বলবে, খরচের ভয়ে মেয়েটার পড়া বন্ধ করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে নরেশ সেন।

—তা তো বলবেই।

জ্যোৎস্না—কিন্তু বিয়ে দিতেও তো খরচ আছে ?

—কোনও খরচ নেই। ছেলের দিক থেকে কোনও দাবি-দাওয়া নেই।

জ্যোৎস্না—ছেলে কি রানুকে দেখেছে ?

—হ্যাঁ। নন্দ কাকা একদিন কান্তিকে সঙ্গে নিয়ে বাজার যাবার পথে রানুকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছে, ওই, ওটি হল আমাদের মহারানী।

জ্যোৎস্না—তাতে হল কী ?

—তাতে এই ফল হল যে, নন্দ কাকার কাছে একেবারে মুখ খুলে অনুরোধ করে ফেলেছে কান্তি, আপনার এই মহারানীর সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। আর, নন্দ কাকাও বলছেন, যদি তোমাদের কোনও আপত্তি না থাকে নরু, তবে ওই কান্তির সঙ্গে মহারানীর বিয়েটা ঘটিয়ে দাও।

নরেশ সেনের এই খুব খুশি ও বাচাল উৎসাহে সায় দিয়ে ঘরের মেটে পিদিমের মৃদু শিখাও যেন ছটফট করে আর জ্বলজ্বলিয়ে কেঁপে উঠল। আর, তারপর আর মাত্র সাতদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল।

কান্তিনাথের দেশ থেকে মাত্র দু'জন মানুষ সীতারামপুরে এসেছে, একজন পুরোহিত, আর দক্ষিণ শরিকের বড় কাকা, শ্রীনটেশ্বর বসু। নন্দ কাকা একটা গ্যাস-বাতি পাঠিয়ে দিলেন, সেই বাতির আলোতে আঙিনার আলপনাতে আঁকা পদ্মকলি আর চমক-তারা বেশ ভালই দেখতে পাওয়া গেল। শোভনার মা দিয়েছেন যে চাঁপা রঙের ধনেখালি, তাই পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসল রানু, সেই সাজেই বাসরঘরে গেল। ওই তো বাসরঘর, যে ঘরের বেড়ার ফাঁক আর ফাটলগুলি ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। টিনের একটি ছোট তোরঙ্গ, তার মধ্যে এক শিশি আলতা আর সিঁদুরের একটা মোড়ক, এই হল রানুর বিয়ের উৎসবের সব-চাওয়া ও সব-পাওয়া।

বিয়ের অনুষ্ঠানের সবই যখন শেষ হল, শোভনার মা'ও বাড়ি চলে গেলেন, তখন খুব জোরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন নরেশ সেন—আঃ, এইবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

জ্যোৎস্না চোখ মোছেন—তুমি কেমন যেন শক্ত মন নিয়ে কথা বলছ।

গলার স্বর চেপে কথা বলেন, যেন নিঃশ্বাসের শব্দটাকেও লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেন নরেশ সেন—বিশ্বাস করো জ্যোৎস্না, তোমাদের রানু বেঁচে গেল।

ও কী ? আর একটু হলে বোধ হয় চেঁচিয়ে উঠতেন জ্যোৎস্না। কত শক্ত করে জ্যোৎস্নার একটা হাত চেপে ধরলেন নরেশ সেন, আর চোখ দুটোও কেমন জ্বলজ্বল করছে। ঠিকই, হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছেন জ্যোৎস্না।

আর, ওদিকে বাসরঘরের ভিতরে মেটে পিদিমের আলোতে কান্তিনাথের মুখটাকে হাসতে দেখে চমকে উঠেছে রানু। এ কী। এ যে একটা চেনামুখ বলেই মনে হচ্ছে। ওই নাক আর ওই চোখ যেন কোথায় একদিন দেখেছিল রানু। হারাণবাবুর দোকানের সামনে নন্দ দাদুর কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ভদ্রলোক, সে-ই কী এই ? কিংবা নবমীর রাত্রিতে বারোয়ারি তলার যাত্রাতে শৈব্যা শৈব্যা বলে করুণ গলার স্বরে ডাক দিয়ে দিয়ে কাঁদছিল যে, সেই...।

কান্তিনাথ বলে—চিনতে পারছ ?

কোনও কথা বলে না রানু।' কান্তি বলে—যাত্রা পার্টির সঙ্গে আমিও এসেছিলাম তোমাদের এই সীতারামপুরে। তুমি সেই যাত্রা দেখেছ ?

রানু মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

কান্তি হাসে—তবে আমাকে চিনতে পারছ না কেন ?

মুখ তুলে আর দুই চোখ বড় করে কান্তিনাথের মুখের দিকে তাকায় রানু।
কান্তি বলে—হ্যাঁ, আমিই সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র।

॥ ২ ॥

যে ট্রেনের ঠিক মাঝরাতে এসে এই বীরপুর স্টেশনে থামবার কথা, সেই ট্রেন এসে যখন থামল, তখন ভোর হয়ে গিয়েছে। রানুর স্বামী কান্তিনাথ তখনও রানুর পাশে বসে আর মাথাটাকে ভাঙা গাছের ডালের মত একেবারে ঝুলিয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওদিকে জেগে বসে আছেন দক্ষিণ শরিকের বড় কাকা, যাঁর চোখ দুটো ঘুমোতে না পেরে লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

রানুও ঘুমোয়নি। মাথায় আধ-ঘোমটার মত টেনে দেওয়া ধনেখালির আঁচলের লালচে পাড়ের নক্সাটা যেন একটু কুঁকড়ে গিয়েছে। জানালার কাঠের উপর দুই হাত পেতে তার উপর থুতনিটাকে অলস করে পেতে দিয়ে, সারারাত যেমন বসেছিল রানু, তেমনই বসে থেকে ভোরের বীরপুর স্টেশনের একটা গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওটা নিশ্চয় একটা কচি কৃষ্ণচূড়া, তাই এখনও ফুল ধরেনি। রাতজাগা ক্লান্তির প্রলেপ মেখে রানুর চোখের কাজল আরও কালো হয়ে উঠেছে।

কী আশ্চর্য, এখনও ভাল করে জেগে ওঠেনি বীরপুরের যে স্টেশন, তারই প্লাটফর্মের কাঁকরের উপর দিয়ে তড়বড় করে লাঠি ঠুকে ঠুকে একটা ভিখারী এসে রানুর চোখের সামনে দাঁড়ায় আর গান গায়, ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান। গানের সঙ্গে ভিখারীর ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটো যেন ঠিকরে বের হয়ে আসছে। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি—গানের চিৎকারে ভিখারীর গলার শিরাও ফুলে উঠে কাঁপছে।

কোথায় গেল সেই পণ্ডিতদা, বরপক্ষের সেই পুরুতমশাই? সীতারামপুর থেকে ট্রেন ছাড়তেই একটা হল্লা শুনে চমকে উঠেছিল রানু। স্টেশনের কোনও হল্লা নয়, ট্রেনের এই কামরার ভিতরে একটা তর্ক ও ঝগড়ার হল্লা।

চা আর বিড়ির জন্য আরও আট আনা দাবি করে কান্তিনাথের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু করেছেন পণ্ডিতদা। পুরো একটি ঘণ্টা লেগেছিল সেই ঝগড়া থামতে, তারপর আরও আধঘণ্টা পরে পাঁচদীঘি নামে একটা স্টেশনে যখন নেমে পড়লেন পণ্ডিতদা, তখন শুনতে পেয়েছিল রানু, গরগর করছে কান্তিনাথের মুখে একটা রাগের ভাষা—ছোটলোকটাকে না নিয়ে এলেই ভাল হত।

অন্ধ ভিখারীর গানটা শুনতে একটুও ভাল লাগে না। তাই চোখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায়, আর মাথা কাত করে একটা কান হাতের পাতার উপর রেখে, আর এক হাতে কপালটাকে বোলাতে থাকে রানু। ভোরের বাতাসে কপালের একপাশে ফরফর করছে সরষের তেলে চিকনকরা সেই চুলের একটা ভাঙা গুচ্ছ। সুড়সুড় করছে কপালটা।

তারপর আর বেশি দেরি হয়নি। স্টেশনের কাছের সেই কচি কৃষ্ণচূড়ার পাশের রাস্তা ধরে চলে গেল গো-গাড়ি, তার মধ্যে আবার কান্তিনাথের পাশে, কুঁকড়ে একেবারে ছোট্ট এইটুকু একটা শরীর হয়ে বসে থাকে রানু। দক্ষিণ শরিকের বড় কাকার জন্য সাইকেল এসেছিল। গো-গাড়ি চলবার আগেই তিনি চলে গেলেন, কে জানে কোন পথে আর কোন দিকে।

বুঝতে পারেনি রানু, কতক্ষণ ধরে পথ চলেছে এই গো-গাড়ি, আর কখনই বা থেমে গিয়েছে। দক্ষিণ শরিকের বড় কাকিমা যখন গো-গাড়ির কাছে এসে রানুর কপালে বরণডালা ঠেকালেন, তখন দুপুর হয়ে গিয়েছে। গো-গাড়ির কাছে একটা ভিড় জমেছে। অনেক বউ-মানুষ আর অনেক মেয়ে। সবাই শরিকের কাকা আর জেঠাদের বাড়ির মানুষ নয়, বাগদি পাড়ার বউ-ঝিও আছে। দুই চোখ বন্ধ করেছে রানু তাই দেখতে পায় না, কে আশ্চর্য হয়ে দুই চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে, কে তার চোখের দুটি ভুরুকে কুঁচকিয়ে একেবারে কেঁচোর মত পাকিয়ে দিয়ে তাকাচ্ছে, আর কে-ই বা মুখ টিপে হাসছে।

বড় কাকিমার বরণডালা চলল আগে আগে, পিছনে নতুন বউ রানু, তার পিছনে কান্তিনাথ। বরবধূকে একটা ঘরের ভিতরে নিয়ে এসে একটা হাঁপ ছাড়লেন বড় কাকিমা, তার পরেই চলে

গেলেন।

কেমন ঘর ? দক্ষিণ শরিকের আমবাগান পার হয়ে একটা ডোবার ধারে মস্ত বড় একটা চালতে গাছের পাশে একটি ঘর। মাটির মেঝে, কঞ্চি বাখারির বেড়া আর টিনের চালা। ওই চালতে গাছ হল দক্ষিণ শরিকের আমবাগানের সীমানার চিহ্ন, তার ওদিকে শুধু ওই ঘরটিই হল চরণ বসুর সম্পত্তির অবশেষ, পুত্র কান্তিনাথ বসুর আপন ঘর।

দক্ষিণ শরিকের বড় কাকিমা তাঁর বাড়ির ঝি বেনুর মাকে দিয়ে দু'থালা ভাত পাঠিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে দু'টুকরো মাছ-ভাজা, দু'বাটি ডাল আর দু'ছিটে শাক-ঘণ্ট। দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে নতুন বউ রানু যখন মেটে মেঝের উপর একটা মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে, তখন দুই চোখ ভরে যেমন গভীর ঘুম, তেমনই স্বপ্নও নিবিড় হয়ে নেমে আসে।

কিন্তু মাঝে মাঝে এমন গভীর ঘুম আর নিবিড় স্বপ্নও ভেঙে যায়। কারণ, একের পর এক অদ্ভুত কৌতূহল আর কলরব এসে ঘরের দরজার কাছে ভিড় করছে আর চলে যাচ্ছে। বেজে উঠছে এক একটা দমকা হাসি, আর চমকা মন্তব্যের শব্দ। কে যেন বলতে বলতে চলে গেল—চুরি করেনি কান্তি, ডাকাতি করেছে। তা না হলে এমন জিনিস...।

কে যেন বলছেন—কী মেয়ে কী ঘরেই না এল!

কিন্তু রানুর স্বামী কান্তিনাথ এখন এই বিকেলে ঘর থেকে বের হয়ে কোথায় গেল ? ঘুমোবে, না জেগে বসে থাকবে, নতুন বউ-এর শ্বশুরবাড়িতে আসা জীবনের প্রথম দিনের নিয়মটা কী ? কে বলে দেবে, কাকেই বা সে-কথা জিজ্ঞেস করবে রানু ? এই বীরপুরে কি কোনও শোভনার মা নেই ? নন্দ দাদু নেই ? জ্যোৎস্না মামির মত পিঠে হাত বুলিয়ে দেন, সেরকম একটি মানুষ কি নেই ?

সন্ধ্যা হলে ওই দক্ষিণ শরিকের বড় কাকিমা আর একবার এসে ঘরে ঢুকলেন—কান্তি বুঝি ঘরে নেই ?

এইবার কথা বলে রানু—না।

—কোথায় গেল ?

রানু—জানি না।

—বুঝেছি।

নতুন বউ রানুর বুকের ভিতরে দুরু দুরু ভাবনার ভয়টাও এবার আর মনের প্রশ্নটাকে চেপে রাখতে পারে না। জিজ্ঞাসা করেই ফেলে—কী ?

বড় কাকিমা—নিশ্চয় আবার সেই পুবের বাড়ির হাড়-কিপ্‌টে মতি বোসের কাছে গিয়ে হাত পেতে ধার চাইছে কান্তি। মতি বোসেরই বা দোষ কী বলো ? কত ধার দেবে ? ধার যে কখনও শোধ করে না কান্তি।

—ঘরে বাতি আছে তো ? এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন বড় কাকিমা—হ্যাঁ, একটা বাতি আছে দেখছি।

না, তার পর আর বেশিক্ষণ নয়। বাতিটাকে জ্বেলে দিয়েই চলে গেলেন দক্ষিণ শরিকের বড় কাকিমা, কারণ তাঁর ঠাকুর-ঘরে এখন ঘণ্টা বাজছে, আরতি শুরু করে দিয়েছে বিশু ভট্টাচার্য।

মাদুরের উপর চুপ করে আর অনড় হয়ে বসে শুনতে থাকে রানু, দূরে কোথায় যেন শিয়াল ডাকছে। বোধ হয় নদীর কিনারায় সেই কাশ ঘাসের বনে। গো-গাড়িতে বসে দেখতে পেয়েছিল রানু, সকালবেলার রোদে কত সাদা হয়ে দুলছে আর কাঁপছে সেই কাশবন।

আমবাগানের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা চাপা গলার গানের গুঞ্জন ভেসে আসছে। ওই ভদ্রলোকই কি আসছেন, না অন্য কেউ ? দরজার কপাটে খিল এঁটে দেওয়া উচিত। কিন্তু রানুর মনের ভয়টা আর সাহস হয়ে উঠতে পারে না। চুপ করে বসেই থাকে রানু। ঘরে ঢোকে কান্তিনাথ।

রানু—কোথায় ছিলে তুমি ? আমার যে একা থাকতে খুব ভয় করেছে!

কান্তিনাথ হাসে—তা একটু-আধটু ভয় তো করতেই হবে। এ তো আর সীতারামপুর নয়, এ হল বীরপুর।

কান্তিনাথের হাতে ছোট্ট একটা চাঙারি। সেই চাঙারিতে গোটা দশ পরোটা, কিছু আলুর তরকারি, আর চারটে জিলিপি।

কান্তিনাথ বলে—মধু ময়রা পরোটা করে ভাল। বাদাম তেলে ভাজা নয়। ঘিয়ে ভাজা এরকম পরোটা তোমাদের সীতারামপুরে পাওয়া যায় না। গাঁ-দেশে এখনও খাঁটি জিনিস আছে। আমরাও এখনও এই গাঁ-দেশে আছি বলেই একটু খাঁটি আছি।

রানুর দু'চোখ ভাসিয়ে দিয়ে জল ঝরে পড়তে থাকে। কান্তিনাথ হাসে—মিছে কাঁদছ কেন ? কেঁদে কোনও লাভ নেই। এখানে শত কাঁদলেও সীতারামপুরের বায়োস্কোপের মত কোনও মজা তোমার চোখের কাছে এসে পড়বে না। বীরপুর হল বীরপুর।

চোখ মুছতে খুব দেরি করে না রানু। আর সোজা দৃষ্টি তুলে দুই চোখ অপলক করে কান্তিনাথের মুখের দিকে তাকায়। —তুমি তো শিগ্‌গির বর্ধমানে গিয়ে মোক্তারি পরীক্ষা দেবে !

—ইচ্ছে আছে। তবে ঠিক বুঝতে পারছি না ; শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাটা দেওয়া হবে কি হবে না।

রানু—তোমার তো অনেক জমি আছে ; সে জমিতে অনেক ধানও হয় !

—হ্যাঁ হয় ; কিন্তু জমিটা দু'বছর হল বন্ধক হয়ে পরের হাতে আছে। তাই সে জমির ধান-টান এখন আর আমার হাতে আসে না।

রানু—তবে তো তুমি খুবই কষ্টে আছ মনে হচ্ছে ?

—কষ্টে আছি বইকি !

বলতে ইচ্ছে করে, তবে বিয়ে করলে কেন, আমাকেই বা এখানে নিয়ে এলে কেন ? বেশ তো ছিলাম সেখানে ; যখন ইচ্ছে হয় আটা গুলে খেয়ে নিতাম ; জ্যোৎস্না মামি তাড়াতাড়ি এসে এক-টুকরো গুড়ও সেই আটাগোলার মধ্যে ফেলে দিয়ে যেতেন। না, আমি তোমার এই পরোটা আর জিলিপি খেতে পারব না। খেতে একটুও ভাল লাগবে না।

কিন্তু ইচ্ছেটা শুধু ইচ্ছে হয়েই মনের ভিতরে যেন গুন্‌গুন্ করে কাঁদে ; বলা আর হয় না।

কান্তি বলে—নাও, খেয়ে নাও এবার।

খায় রানু। খাওয়ার শেষে মাটির হাঁড়ি থেকে জল গড়িয়ে খায়। তারপর আনমনার মত হাত চালিয়ে খোঁপাটাকে খুলতে গিয়ে মনের আর একটা প্রশ্নের কথা বলেও ফেলে—কিন্তু তোমার. এরকম কষ্ট করলে চলবে কেন ?

—তা তো চলবেই না।

রানু—তবে ?

—তবে চেষ্টা করে একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় করতেই হবে।

রানু—চাকরি পাওয়া যাবে তো ?

—যখন পুরুষ মানুষ হয়েছি, তখন একটা চাকরি পেয়েই ছাড়ব নিশ্চয়ই, সেজন্য কোনও চিন্তা করি না। কিন্তু তুমিই বা এরই মধ্যে এত চিন্তা শুরু করে দিলে কেন ? না, কখ্‌খনও না, কোনও চিন্তা করবে না বলে দিচ্ছি।

কান্তিনাথের কথা বলবার ভঙ্গিটা রাজা হরিশ্চন্দ্রের সেই প্রতিজ্ঞার ভঙ্গিটার মত শোনায়। শুনতে মন্দ লাগে না। কিন্তু বুঝতে পারে না রানু, প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বুকের ভেতরে দুরু দুরু ভাবটা দূর হয়ে গেল কিনা।

পুরুষ মানুষ কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে, এরই মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। কী আশ্চর্য, এরকম এক মুহূর্তের মধ্যে এমন করে ঘুমিয়ে পড়তে পারে মানুষ। আগে কখনও এরকম ঘুমের মানুষ দেখেনি রানু।

পুরুষ মানুষ তো বটেই, কিন্তু খুবই আশ্চর্যের পুরুষ মানুষ বলতে হবে। শোভনা ওর বিয়ের পরের দিনেই রানুকে ডেকে নিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল : খুব ভাল লোক, আমার একটুও ভয় করেনি। খুব ভাব করে কত গল্পই না বলল, তারপর সত্যিই বিশ্বাস কর রানু, হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরে ফেলল।

রানু—ভয় করেনি তোর ? লজ্জা করেনি তোর ?

শোভনা—দূর পাগল ! বরের কাছে আবার কিসের ভয়, আর কিসের লজ্জা ?

রানুর বর কান্তিনাথ কিন্তু রানুর হাত ধরেনি, সে দিনও না, আজও না। কে জানে, এটাই বোধ হয় বীরপুরের নিয়ম। কিন্তু ভালই হয়েছে, ভাল করে একটিও গল্প করল না যে মানুষ, সে হঠাৎ হাত ধরে ফেললে বুকটা যে সত্যি ভয় পেয়ে কেঁপে উঠত।

কিন্তু রানু যে ঘুমোতেই পারে না। ছোট ছোট কিন্তু বড় দুরন্ত এক একটা স্বপ্ন এসে ঘুমটাকে যেন আচমকা ঠেলা দিয়ে দিয়ে ভেঙে দেয়।

নরু মামা বলছেন—কী রে মেয়ে ; কেমন তোদের বীরপুর ?

রানু বলে—তুমি এ কী কাণ্ড করে বসলে মামা ? কেন আমাকে এমন করে সাত তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দিলে ?

শোভনা বলে—কী হল, সব কথা খুলে বল, একটুও লুকোতে পারবি না।

রানু—কিচ্ছু না। চুপ কর, কোনও কথা বলবি না।

জ্যোৎস্না মামি বলেন—খুড়ি-শাশুড়ি আর জেঠি-শাশুড়িরা কে কেমন আদর করল বল ? প্রথম কে তোর মুখে পায়েস দিল ?

রানু—কেউ না, কেউ না। তুমি চুপ করো মামি।

- রাগ করেছিস, মনে হচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

—কার উপর রাগ ?

—মামার উপর।

—কেন ?

—মামা কেন এত ব্যস্ত হয়ে আমায় দিয়ে দিলেন ?

—তোর ভালর জন্যই রে ! বুঝিস না, এখানে কী কষ্টে তোকে থাকতে হচ্ছে ! এখন তবু মোটা ভাত-কাপড়ের সুখটুকু পাবি।

—ভুল, তুমি ভয়ানক ভুল বুঝেছ মামি। মোটা ভাত-কাপড়ের কোনও ভরসার চিহ্নও সেখানে দেখলাম না।

—বলিস কী ? বলিস কী ? জ্যোৎস্না মামি কেঁদে ফেললেন।

মিনু টুলু আর ভুলু এসে রানুর হাত ধরে টানাটানি করে—কই দিদি, তোমার হাতে সোনার চুড়ি নেই কেন ?

রানু হাসে—কে দেবে সোনার চুড়ি ?

—তোমার বর।

রানু—না, দেবে না।

—কেন ?

—বরের টাকা নেই। বর এখন শুধু পুবের বাড়ির কাকার কাছে গিয়ে হাত পাতে আর ধার চায়।

মিনু টুলু আর ভুলুর মুখ শুকিয়ে যায়। রানুর হাত ছেড়ে দিয়ে রানুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

ঘুম ভেঙে যায় রানুর। সবই স্বপ্ন, মজার স্বপ্ন। তবু ভাল, সত্যি হলে খুব খারাপ হত। ওরকম শক্ত কথা শুনিয়ে দিলে কী দুঃখই না পেতেন নরু মামা। এখানেও ভাত-কাপড়ের কষ্ট ; জানতে পারলে যে নরু মামার বুকটা আক্ষেপ করতে করতে ভেঙে যাবে।

না, আর পরোটা জিলিপি নয়। পরের দিন ঝুড়ি-ভর্তি করে চাল ডাল আটা নিয়ে আসে কান্তিনাথ। রান্না-টান্না না করে, শুধু একবাটি আটা গুলে আজ খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু ওই মানুষটি তো রান্না করে ভাত-ডালই খাবে। কাজেই রান্না করতেও হয়।

স্বামীর ঘরে নিজের হাতে রান্না করে ডাল-ভাত খেয়ে যখন মেঝের মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে রানু, তখন ঘরের দরজার কাছে বসে ঢেঁকুর তোলে, পান চিবোয়, আর মাঝে মাঝে সেই বাঁশির মত

নাকেতে নস্যিও দেয় কান্তি।

—কান্তি আছ হে ? এদিকে এসো একবার ; দেখে যাও, এ কী ব্যাপার ! একটা হল্লা যেন ব্যস্ত হয়ে এই ঘরের দিকে ছুটে আসছে। কান্তি ছুটে যায়।

চমকে ওঠে রানু ; উঠে এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়। আর অদ্ভুত একটা দৃশ্যও দেখতে পায়। একজনের হাতে একটা খবরের কাগজ। পাঁচজনে বার বার যেন থাবা দিয়ে সেই কাগজ কাড়ছে আর পড়ছে।

হল্লার লোকগুলি চলে গেল। কান্তিনাথ সেই খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে—সীতারামপুর সংবাদ ! কী বিশ্রী কাণ্ড !

রানুর চোখের তারা দুটো ছটফট করতে থাকে—অ্যাঁ। সীতারামপুরের সংবাদ। কিসের সংবাদ ? কী হয়েছে সীতারামপুরে ?

কান্তিনাথের হাত থেকে কাগজটাকে হাতে তুলে নিয়ে নিজেই খবরটাকে পড়তে থাকে রানু। খবর এই যে, নরেশচন্দ্র সেন নামক জনৈক কম্পাউন্ডার নিজেই ভাতের সহিত উগ্র বিষ মিশাইয়া দিয়া স্বয়ং নিজে খাইয়াছেন, স্ত্রী এবং তিনটি ছেলে-মেয়েকে খাওয়াইয়াছেন। সকলেরই মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত নরেশচন্দ্র একটি চিঠিতে স্বীকারোক্তি করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় সপরিবারে আত্মহত্যা করিলেন। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

নরু মামা, তুমি কী ভয়ানক মানুষ। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার আগে শুধু এই একটি কথাই বলে রানু।

চালতে গাছের পাশে ডোবার ধারে এই ঘরটা যেন একটা কান্নাঘর। মাঝরাতে কিংবা শেষরাতে যে-ই আমবাগানের ওদিকের সড়ক ধরে যাওয়া-আসা করে, সেই শুনতে পায়, কে যেন কাঁদছে। যারা ঘটনার কথা জানে, তারা বোঝে, কাঁদছে চরণ বোসের ছেলে কান্তিনাথের বউ। যারা ঘটনার কোনও কথাই শোনেনি, তারা শুধু আশ্চর্য হয়ে ভাবে, কে কাঁদে ? কেউ বা ভয় পায়, মেয়েমানুষের কান্না বলেই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যিই কি কোনও মেয়েমানুষ এত করুণ সুরের কান্না কাঁদতে পারে ! সেই রকম কোনও মেয়েমানুষের কান্না নয় তো, যাদের কায়াও নেই ছায়াও নেই, গত জন্মের একটা প্রতিহিংসার তৃপ্তির জন্যে অন্ধকারের মধ্যে মিশে ভয়ানক করুণ কান্না ছড়িয়ে দিয়ে সারা গাঁয়ের অমঙ্গল করে ? কেউ কেউ জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটে, কেউ বা দৌড় দিয়ে পালায়।

কিন্তু এই চালতে গাছের কাছে এসে দাঁড়ালেই শোনা যায়, ঘরের ভিতরে ওই কান্নাটার পাশে একজন ঘুমন্ত মানুষের নাক ডাকার শব্দও একটানা বেজে চলেছে। ঠিকই, চরণ বোসের ছেলে কান্তিনাথের ঘুমের কোনও ব্যাঘাত নেই, তার নতুন বউটি ঘুমিয়ে পড়ুক বা না পড়ুক।

বিছানার উপর বসে আর জেগে জেগেই শুনতে পায় রানু, নরু মামা কেঁদে কেঁদে বলছেন, রানু খুব বেঁচে গেল, জ্যোৎস্না !

বুঝতে পেরেছি মামা, তুমি কেন সাত তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিলে ! ওই রকম ভয়ানক কাজটি করবার জন্যে, ভাতে বিষ ঢালবার আগেই আমাকে সরিয়ে দিলে ! তুমি তোমার কিশোরদার মেয়েকে মেরে ফেলতে পারবে না বলেই এই ব্যবস্থা করেছিলে, কেমন ? তাই না ? সত্যি করে বলো, মামা। আমিও না হয় তোমাদের সঙ্গে চলে যেতাম। তাতে দোষ কী হত ? কে তোমাকে দোষী করত ? তোমাকে দোষী করতে পারে, এরকম কোনও মানুষ নেই এই পৃথিবীতে। কার এত সাহস আছে যে, তোমাকে দোষী করবে ?

মাত্র একটি মাসও পার হয়নি, সীতারামপুর থেকে রানুর নামে আর বীরপুরের ঠিকানায় একটি চিঠি আসে। চিঠিটাকে বুকের উপর চেপে ধরে অনেকক্ষণ কেঁদে নেয় রানু, যদিও চিঠিটা হল শোভনার লেখা ছোট্ট একটি চিঠি : কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না রানু, নরু কাকা কেন এমন ভয়ানক কাণ্ড করলেন। হ্যাঁ, চন্দর মুদি সেদিন বাবার কাছে এসে একটা চিঠি দেখিয়ে গিয়েছে, নরু কাকারই হাতের লেখা একটা পোস্টকার্ড। মরে যাবার দিনে লেখা একটি চিঠি ; ভাই চন্দর পাওনা টাকা আর দিয়ে যেতে পারলাম না, কিছু মনে করো না।

কিন্তু যাবার আগে জ্যোৎস্না মামি কী বলে গেল ? মিনু আর টুলুটা ও ভুলুটাও কি কোনও কথা

বলেছিল ? সীতারামপুর থেকে আসবার দিনে ভুলুর প্যান্টের ছেঁড়াটাকে সেলাই করে দিয়েছিল রানু। ভুলু কি সেই প্যান্ট পরে চলে গেল ?

রানুর বুকের ভিতরের এইসব নীরব প্রশ্নের আর্তনাদ কে-ই বা শুনবে, আর জবাবই বা দেবে কে ? কাজেই আর চুপ করে দাঁড়িয়ে না থেকে এঁটো বাসনগুলিকে তুলে ডোবাটার জলের কাছে গিয়ে দুটো ইটের উপর উবু হয়ে বসে আর বাসন মাজে রানু।

কিন্তু হাত জ্বলে, হাতের আঙুল দুমড়ে যায়, আর এঁটো থালাটা হাত থেকে ফস্‌কে পড়েও যায়। কিন্তু আবার হাত বাড়িয়ে সেই এঁটো থালা তুলে নেয় রানু। চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। না, এ জীবনে আর কোনও দিনও না, জ্যোৎস্না মামি ছুটে এসে আর ধমক দেবেন না : এ কী হচ্ছে রানু, ওঠ বলছি শিগগিরি, ওঠ বলছি।

কেউ এসে রাগ করে রানুর এই বাসন-মাজা হাত দুটোকে নিজের হাতে ধুয়ে দিয়ে, আর একটা ঠেলা দিয়ে রানুকে সরিয়ে দেবে, সে সৌভাগ্য বিষ খেয়ে মরেই গিয়েছে।

কিন্তু আমবাগানের ভিতরে একটা গণ্ডগোল কেন ? দক্ষিণ শরিকের বড় কাকার গলার স্বর বলেই তো মনে হয় ; সেই সঙ্গে বড় কাকিমারও গলার একটা করুণস্বর—আরো দুটো দিন যেতে দাও। হতচ্ছাড়ার জন্য বলছি না, বলছি বউটার জন্য।

ধোওয়া বাসন হাতে নিয়ে আর ঘরের ভিতরে ঢুকেই দেখতে পায় রানু, কান্তিনাথের নাক-ডাকা ঘুম ভেঙে গিয়েছে, আর মাদুরের উপর চুপ করে বসে আছে কান্তি।

বড় কাকা বলছেন—আমি জিজ্ঞেস করি, জুয়ো খেলে আর লোকের কাছে হাত পেতে টাকা ধার করেই কী তোমার সংসার চলবে ?

গা-মোড়া দিয়ে এদিক-ওদিক তাকায় কান্তি, কোনও কথা বলে না।

বড় কাকা—আমি জানি, তুমি কোনওদিন মোক্তারি পরীক্ষা দেবে না। মোক্তারি পড়বার নাম করে তুমি আমার কাছ থেকে এই চার বছরে যত টাকা নিয়েছ, তার সবই জুয়ো খেলে ফুরিয়ে দিয়েছ। কিন্তু আর নয়। এবার...

বড় কাকিমা বাধা দিয়ে বলেন—না না, এখনই নয়, আজও নয় কালও নয় ; অন্তত...

বড় কাকা—বেশ তো, না হয় আরও তিন-চার দিন এখানে থাকুক ! কিন্তু তার পর আমি এই ঘরের দখল নেবই নেব।

বড় কাকিমা—ঘরটা যখন তোমার কাছে বন্ধক আছে, তখন তো যখন ইচ্ছে হয় দখল নিতে পারবে। কিন্তু...

বড় কাকা—না, আর নয়। ঠিক তিনটে দিন পরে আমি গো-গাড়ি পাঠিয়ে দেব। তখন যেন তৈরি হয়ে থাকে।

বড় কাকিমা—কোথায় যাবে ওরা ?

—স্টেশনে। স্টেশনে ওদের পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে গো-গাড়ি।

বড় কাকিমা—আমি এবার জিজ্ঞাসা করি, তুমিই বা বরকর্তা হয়ে সীতারামপুর গিয়েছিলে কেন ? ওর বিয়েটা তুমি সেদিনই ভেঙে দিয়ে চলে এলে না কেন ? সব জেনেশুনেও তুমি সেখানে চুপ করে বসে ছিলে কেন ?

চোখ পাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন বড় কাকা—বীরপুরের বসুদের অসম্মান হবে বলেই বিয়ে ভেঙে দিইনি।

বড় কাকিমা—বুঝলাম না !

—তুমি কেমন করে বুঝবে ? তুমি হলে হাটনগরের দত্তদের মেয়ে। তুমি বীরপুরের বসুদের মান-সম্মানের কোনও তত্ত্বই বুঝবে না।

চলে গেলেন বড় কাকা আর বড় কাকিমা। কান্তিনাথ আবার মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে। রানু বলে—এসব কী কথা বলে গেলেন বড় কাকা ?

কান্তিনাথ—যা বলে গেলেন, তাই বলে গেলেন।

রানু—তার মানে ?

কান্তিনাথ—তার মানে বড় কাকার গো-গাড়ি আসবে, আর, আমাদের চলে যেতে হবে।
রানু—কোথায় ?
কান্তিনাথ—ওই যে বললেন বড় কাকা, স্টেশনে।
রানু—তার পর কোথায় যাবে ?
কান্তিনাথ—জানি না।
রানু—তবে, কে জানে ?
কান্তিনাথ—স্টেশন জানে।

॥ ৩ ॥

রত্না সিমেন্ট লিমিটেড। এদিকে শালবন আর পাহাড়, ওদিকেও শালবন আর পাহাড়। শুধু একদিকে একটি নদী, যে নদীর নাম কোয়েল।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর পালামউ ভ্রমণের কাহিনীতে যে লাতেহারের কথা লিখেছেন, সেই লাতেহার থেকে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কোয়েল নদীর ধারে মস্ত বড় যে নতুন কারখানাটি দেখা যায়, ওই সেটিই হল রত্না সিমেন্টের কারখানা। জায়গাটার আগে নাম ছিল ভুঁইসিয়া। সে নাম আজ আর নেই। নতুন কারখানার ধোঁয়া লেগে সেই নামও ধোঁয়া হয়ে উড়ে গিয়েছে। স্টেশনটারও নাম, রত্না।

এই রত্না সিমেন্টের ওয়ে-ব্রিজের কাছে খাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে-ই বীরপুরের স্বর্গত জমিদার চরণ বসুর ছেলে কান্তিনাথ বসু। মাইনে ষাট টাকা, আর কোয়ার্টার পেয়েছে; কান্তিনাথ এখন রত্না সিমেন্টের একজন ওজন-সরকার। ট্রলিতে বোঝাই করে পাথর আসে; মোটর ট্রাকে বোঝাই হয়ে সিমেন্টের থলে-ভরা স্তূপ আসে। খাতাতে ওজনের হিসাব লিখে রাখে কান্তিনাথ।

ঠিকই, বীরপুরের সেই স্টেশনই শুধু জানত যে, কান্তিনাথ আর রানু সেদিন বিনা-টিকিটের যাত্রী আর যাত্রিণী হয়ে একটা ট্রেনে উঠে পড়লে, অনেক রাত্রে এক টিকিট-চেকার এসে আর বেশ বিরক্ত হয়ে দু'জনকে অনেক দূরের একটি স্টেশনে নামিয়ে দেয়। সেই স্টেশনের নাম গোমো জংশন।

বিরক্ত চেকার জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় যেতে চান আপনারা ?
কান্তিনাথ—ঠিক বুঝতে পারছি না।
চেকার—এ কী রকমের কথা ! আপনি অসুস্থ !
রানু বলে—না।
চেকার—তবে ওরকমের অদ্ভুত কথা উনি বলছেন কেন ?
রানু—যেখানে চাকরি পাওয়া যাবে, সেখানে যেতে চাই।

রানুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে, তারপর বেশ শক্ত একটা ভ্রূকুটি করে কথা বললেন চেকার—এ যে আরও অদ্ভুত কথা বললেন ! সত্যি করে বলুন তো কে আপনি ? ওঁর স্ত্রী ?

চমকে ওঠে রানু। ভয় পায়; আর বোবার মত শুধু তাকিয়ে থাকে।
চেকার—সত্যি করে বলুন, আপনাদের বিয়ে হয়েছে ?
রানু মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।
চেকার—এরকম অবস্থা কেন ?
রানু—আমাদের হাতে এখন টাকা-পয়সা কিছুই নেই, তাই...।

বিরক্ত চেকার এইবার একটু নরম স্বরে কথা বলেন—ছি ছি ! যাই হোক, এই দশ টাকা নিন। আর, চাকরি পেতে হয় তো উঠে পড়ুন ওই ট্রেনে। লাতেহারে নামবেন, তার পর আবার ট্রেনে মাত্র আধঘণ্টা পথ, রত্না স্টেশনে নেমে পড়বেন। সেখানে রত্না সিমেন্টের কারখানা। সেখানে এখন চাকরি পাওয়া যায় বলে শুনেছি।

রানুর হাতে দশ টাকার একটা নোট ফেলে দিয়েই চলে যায় চেকার।

ওই ওজন-সরকার কান্তিনাথ কি রত্নাতে এসে নিজের চেষ্টাতে চাকরিটা পেয়েছিল ? না; চেষ্টা

করার মানুষই সে নয়, সে কোনও চেষ্টাও করেনি। কারখানার স্টাফের বাঙালি ভদ্রলোকেরা ম্যানেজারকে ধরে পড়ে আর অনেক অনুরোধ করে কান্তিনাথের এই চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

ওজন-সরকার কান্তিনাথ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ওয়ে-ব্রিজের কাছেই কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে কাছের একটা দোকানের টিনের শেডের তলায় বসে চা আর পকোড়ি খায়। আর, রানু তখন একটি এক-ঘর কোয়ার্টারের ভিতর ঘুমিয়ে থাকে, কিংবা রান্না করে, নয়ত একেবারে ধীর স্থির ও স্তব্ধ হয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কোয়েল নদীর বালিয়াড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই এক-ঘর কোয়ার্টারের দরজার ঠিক সামনে যে কুল গাছটা আজ এত বড় ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা সেদিন কত ছোট ছিল। এই সাত বছরের মধ্যে কত বড় হয়ে গিয়েছে গাছটা। কিন্তু কিশোর ঘোষের মেয়ে রানু তো আর গাছ নয়, তাই বোধ হয় ভাগ্যটাও কোনও সুখে বড় হয়ে উঠতে পারেনি। একটুও না, কিছুই না, এই সাত বছরে প্রাণটা নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, কোনও মুহূর্তে কোনও সুখের কোনও স্বাদও পায়নি। চাল-ডাল আজ থাকে তো কাল থাকে না। ছেঁড়া শাড়ি সেলাই করবার ছুঁচ থাকে তো সুতো থাকে না। এবেলা যদি গরম ভাত খাওয়া হয়, ওবেলা শুধু পান্তা ভাত, কিংবা ঠাণ্ডা বা গরম কোনও ভাতই না। অ্যাকাউন্টেন্ট মিত্তিরবাবুর স্ত্রী একদিন দেখেছেন, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পাকা ডুমুর খাচ্ছে ওজনের বউ; জংলি মেয়েরা যে ডুমুর বিক্রি করতে নিয়ে আসে, সেই ডুমুর।

ভাল শুধু ওই, রানুর বয়সটাই ভাল বেড়েছে। সীতারামপুরের মেয়ে-স্কুলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার বছরে যে মেয়ের বয়স ছিল আঠারো, সে আজ পঁচিশ বছর বয়সের এক নারী। উপোস পান্তাভাত আর পাকা ডুমুরও তার বয়সের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। রানু আজ ভরাট যৌবনের ছবি, পলাশের ফোটা ফুলের মত একটি পূর্ণা নারী। শুধু একা মিত্তিরবাবুর স্ত্রী বলেন না, রত্না সিমেন্টের বাঙালি অবাঙালি সব বাবুরই স্ত্রীরা বলেন ও দুঃখ করেন—ওজনের বউকে দেখলে গল্পের কথা মনে পড়ে যায়, অভিশাপ ছিল বলে রাজকুমারীকে বনবাসিনী হতে হয়েছিল।

বয়লার মিস্তিরি গিরিধারীলালের স্ত্রী তো রাগ করেই মন্তব্য করেছে—বাঁদরের গলায় মোতির মালা! কোন কশাই বাপ এমন মেয়েকে ওই ওজনের সাথে বিয়ে দিয়েছিল?

স্টোরের জয়ন্তবাবুর স্ত্রী বলেন—খারাপ কথা মুখে আনতে নেই, তবু বলতেই হবে, কী আশ্চর্য, ওই মেয়ে কেমন চুপটি করে আর সব সহ্য করে ওজনের মত একটা অমানুষের ঘর করছে, একটুও ইদিক উদিক করছে না।

রত্না সিমেন্টের এঁরা, তা ছাড়া মোহিনী মাসি, চারুদি আর ডাক্তার-গিন্নি নয়নতারা, আরও অনেক নবীন ও প্রবীণা, আগে যাঁরা বেড়াতে বের হয়ে মাঝে-মাঝে কুল গাছটার কাছে দাঁড়াতেন আর রানুর সঙ্গে দু'চারটে কথাও বলতেন, তাঁরা কেউ আজকাল আর এ পথে আসেনই না। তাঁরা এই পথে যেতে বেশ একটু ভয় পান আর ঘেন্নাও করেন। পাগলের মত চেঁচাচ্ছে আর বউটাকে গালিগালাজ করছে ওজন। সেটা কি ভাল লাগে শুনতে?

ওজন কান্তিনাথ আজও সেই কান্তিনাথ। সপ্তাহের অন্তত পাঁচটি দিন নেপালি দরোয়ানদের আড্ডাতে গিয়ে জুয়ো খেলবে, আর মাঝরাতে ঘরে ফিরে আসবে। যেদিন জুয়াতে দু'তিনটে জিত হয়, সেদিন একটি-দুটি আবগারি মদের পাঁইট-বোতল বুকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে ব্যস্তভাবে ঘরে ফিরবে। এক পাঁইট আবগারি চার চুমুকে খেয়ে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠবে—শিগ্‌গির করো, চটপট দুটো আলু ভেজে দাও।

রানু বলে—আলু নেই।

খালি বোতলটাকে মেঝের উপর আছড়ে দিয়ে আবার চেঁচিয়ে ওঠে ওই জির-জিরে চেহারা ওজন-সরকারের মস্ত নেশার রাগ—তবে তোর ইয়ে দুটো ভেজে দে, হতচ্ছাড়ি।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রানু। কান্তিনাথের মাতাল হুল্লোড় আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। ঘরের কোণ থেকে একটা ভাঙা বঁটি তুলে নিয়ে লাফিয়ে ওঠে কান্তি—তবে আমি নিজেই তোর ইয়ে দুটো কাটব আর ভাজব।

বাইরে পথের উপর দাঁড়িয়ে আর ধমক দিয়ে হাঁকডাক করে মিস্তিরি গিরিধারীলাল—আরে, এ কান্তিবাবু, এ কেয়া হোতা হ্যায় ? আপনি ভদ্দর মানুষ আছেন না কী আছেন ?

ভাঙা বটিকে রানুর বুকেরই দিকে ছুঁড়ে মারে কান্তিনাথ। রানুর বুকের উপর পড়ে বঁটিটা, তার পর ঝুপ করে মেঝের উপরে পড়ে যায়। রানু তার বুকের দিকে তাকায়ও না। শুধু অচল অনড় একটা পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বমি করছে কান্তিনাথ। বাইরে দাঁড়িয়ে গিরিধারীলাল সেই বমির শব্দও শোনে। তার পর আক্ষেপ করে। হায় ভগবান ! কিন্তু বাপের বাড়ি চলে যায় না কেন ওজনবাবুর বউ ?

বলতে বলতে চলে যায় গিরিধারীলাল।

এত কাছে শালবন, তবু শেয়াল ডাকে না। স্তব্ধ রাত, বাতাসও বোধ হয় স্তব্ধ। ঝাঁকড়া-মাথা কুল গাছ একটুও কাঁপে না। শুধু ওজনসরকার কান্তিনাথের নাক-ডাকার শব্দ বাজে।

জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় রানু। এইবার শুনতে পাওয়া যায়, কলকল শব্দ করে গড়িয়ে যাচ্ছে কোয়েল নদীর স্রোতে জল।

রাস্তার অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে একটি ছায়া, আর এই জানালারই কাছে দাঁড়ায়। কিন্তু চমকে ওঠে না রানু। রানু বলে—আবার তুমি এসেছ কেন ? বলেছি না, কখ্‌খনও আসবে না !

—কিন্তু না এসে যে পারি না !

—না, ওরকম করে কথা বলো না।

—কিন্তু তুমি বলো।

—কী বলব ?

—তুমি যদি বলো, তবে...

—তবে কী ?

—তবে আমি এখনই গলা টিপে ওই নাক-ডাকার শব্দ চিরকালের মত থামিয়ে দিই।

—যাও, চলে যাও, কখ্‌খনও আর এখানে আসবে না, বলে দিচ্ছি !

—যাচ্ছি। কিন্তু তুমি খেয়েছ কি না ?

—কোনও কথা নয়, তুমি যাও।

—কী খেয়েছ, ভাত না রুটি ?

—চুপ। তুমি চলে যাও।

—দশটা টাকা নাও।

—না।

—কী আশ্চর্য, ট্রেনের টিকেট চেকারের কাছ থেকে দশটা টাকা নিতে পার, কিন্তু আমার কাছ থেকে দশটা টাকা নিতে পার না ?

—না।

—তুমি কিন্তু খুব অন্যায় করছ। মিথ্যে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ।

—বলছি, তুমি এখন চলে যাও।

—আচ্ছা যাচ্ছি।

চলে যায় ছায়াটা। কিন্তু রানু ভালই জানে, দু'চার দিন পরে আবার আসবে ওই ছায়া।

কোয়েল নদীর জলের শব্দ ফুরোয় না। কোয়েলের স্রোতে ক্লান্তি নেই। রানুরও অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে কোনও ক্লান্তি নেই। শেষরাতের তারা যখন নিবু নিবু হয়, কুল গাছের পাতা নতুন বাতাস পেয়ে সির সির করে, তখন বিছানা পাতে রানু। মাদুরের উপর একটি চাদর, তার উপরে একটি বালিশ। সেই বালিশের ঢাকার উপর লাল সুতো দিয়ে লেখা তুলেছে রানু—জ্যোৎস্না মামি। আর ওই চাদরের মাথার এক কোণে লাল সুতোর লেখা তোলা হয়েছে—নরু মামা। যেন শূন্য জীবনের সঙ্গে একটা ঘরের শান্তির স্মৃতি ছুঁইয়ে রেখেছে রানু। রানু বোধ হয় এই পঁচিশ বছর বয়সেও একেবারে ছোট্ট একটি মেয়ে হয়ে নরু মামা আর জ্যোৎস্না মামির বুকের কাছে শুয়ে থাকবার

একটা কায়দা তৈরি করে নিয়েছে।

রানু বোধ হয় তার এই পঁচিশ বছরের বয়সটাকে ভয় করে। নিজের এই চেহারাটাকে, এই শরীরের রক্ত-মাংসের দুরন্ত একটা স্বপ্নকেও ভয় পায়। তাই বোধ হয় চেষ্টা করে দশ বছর বয়সের প্রাণটাকে ফিরে পেতে চায়।

ওই ছায়া তো সত্যিই ছায়া নয়। ওর নাম মানিক রায় ; ক্যাশ অফিসের একজন কনিষ্ঠ কেরানি। মাইনে পায় আশি টাকা। সাত বছর আগে এই মানিকই রত্না স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কান্তিনাথ আর রানুকে দেখতে পেয়ে খোঁজ নিয়েছিল—আপনারা কোথায় যাবেন ?

এই মানিকই সেদিন মিত্তিরবাবুর কাছে গিয়ে প্রথম খবর দিয়েছিল। এক বাঙালি ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছেন, স্টেশনে বসে আছেন, চাকরি খুঁজছেন ভদ্রলোক। ইচ্ছে করলে আপনি সে ভদ্রলোককে একটা চাকরি পাইয়ে দিতে পারেন, কাকা।

মানিক তো সেদিনই জানতে পেরেছিল যে, এক টিকিট-চেকার যে দশটা টাকা দিয়েছেন, সে টাকা ছাড়া আর একটি পয়সাও ওদের হাতে নেই। রানুর মুখের দিকে তাকিয়ে মানিক রায়ের চোখের চাহনিটা করুণ হয়ে গিয়েও বিস্ময়ে ভরে গিয়েছিল। কতই বা বয়েস হবে মানিকের ; ওই ভদ্রলোকের স্ত্রীর চেয়ে বড় জোর দু'তিন বছর বড় হবে মানিক, কুড়ি কিংবা একুশ। ভাল ফুটবল খেলতে পারে বলে মিত্তিরবাবু ওদের দেশের গাঁ থেকে ওকে এখানে আনিয়েছেন, আর একটা চাকরিও করে দিয়েছেন।

সেই মানিকও তো এখন আর কুড়ি-একুশ বছর বয়সের ছোকরাটি নয়। সাতাশ কিংবা আঠাশ বছর বয়সের একটা হট্টা কট্টা জোয়ান। রং ময়লা, ঠাসা কোঁকড়ান চুল, ছোট কপাল আর নাকের হাড়ের উপর একটা জখমের দাগ, তবু দেখতে মন্দ নয় মানিক। মিত্তিরবাবু বলেন—মানিকের চাকরিটা যদি আর একটু ভাল হত, তবে নিতাইয়ের মেয়ে পুঁটির সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। পুঁটির সঙ্গে মানিককে ভালই মানাত।

এই মানিকই আজ তিনটি বছর ধরে রানুর জীবনের একটা সমস্যা। রানুর মিনতি ভ্রূকুটি ও ধমক, কিছুই গ্রাহ্য করে না মানিক। রোজ না হোক, সপ্তাহের অন্তত দুটি দিন এই পথে একবার আসবেই, দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াবে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখবে। তার পর, হয় রানুর সঙ্গে কথা বলবে, না হয় চুপচাপ চলে যাবে।

খুব সুবিধা পেয়েছে মানিক ; ওজন-সরকারের এই কোয়ার্টারের চারদিকটা বেশ নিরালা। পিয়ন লছমনের কোয়ার্টার ছাড়া ধারে-কাছে আর কোনও ঘর-বাড়ি নেই। এই লছমনই বা কতটুকু সময় ঘরে থাকে ! সারাদিনের পর বিকেল-বেলা ঘরে ফেরে, উনুন ধরায়, রুটি বানায়, খায়, আর সন্ধ্যে হতেই তিনবার চেঁচিয়ে রাম নাম করে ঘুমিয়ে পড়ে।

জুয়াখেলার আসর থেকে বিদায় নিয়ে কান্তিনাথ তো মাঝরাতের আগে কখনও ঘরে ফেরে না। কাজেই কুল গাছের কাছে দাঁড়িয়ে, কিংবা একেবারে দরজারই কাছে এসে রানুর সঙ্গে কথা বলতে মানিকের কোনও অসুবিধে নেই। অসুবিধে হত ঠিকই, যদি তিন বছর আগের সেই সন্ধ্যাতে শক্ত কথা বলে আর ভর্ৎসনা করে মানিকের দুঃসাহসের ভাষা থামিয়ে দিত রানু।

সেই সন্ধ্যাতে দূরের পাহাড়ের গুহার পাশে একফালি চাঁদ যখন কুয়াশার উপর ভেসে উঠেছিল, আর কোয়েলের স্রোতের জলের শব্দটা আরও কলকলে হয়ে উঠেছিল, তখন ঘরের দরজার কাছে ছায়া দেখে চমকে উঠেছিল রানু। —কে ?

—আমি, আমি মানিক ! এই এমনিই এলাম। ইচ্ছে হল, আপনাকে একবার দেখে যাই।

রানু হাসে—আপনাকে তো প্রায়ই দেখতে পাই, সাইকেলে চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ, মিত্তির কাকা যখন-তখন বলেন, যাও মানিক, ভাল ঘি কোথাও পাওয়া যায় কি না, একটু খোঁজ করে এসো। কোনওদিন বলেন, যাও মানিকচাঁদ, খোঁজ করে দেখো তো, কোথাও সজনে ডাঁটা পাওয়া যায় কি না ! তাই এদিকে-ওদিকে দৌড়তে হয়। কিন্তু...

রানু—কী ?

—আপনি তো কোনওদিন ডাক দিয়ে বললেন না, আপনার দরকারের কী জিনিস চাই !

রানু হাসে—কিছু চাই না। ঘি খেতে আমার একটুও ভাল লাগে না, আর সজনে ডাঁটা অনেক খেয়েছি।

—কিন্তু আপনি এরকম একটা ছেঁড়া শাড়ি পরে রয়েছেন কেন ?

—সেকথা আপনি জানতে চান কেন ? জেনে দরকার কী আপনার ?

—বেশ তো, জেনে দরকার নেই। কিন্তু আমি যদি আপনাকে একটা ভাল শাড়ি এনে দিই, তবে নেবেন তো, পরবেন তো ?

—না।

—তবে কী আর বলব !

এখনই মানিককে বলে দিতে পারা যায়, তবে এখন চলে যান, সন্ধ্যেবেলাতে ঘরের দরজার কাছে এসে এরকম উপকার করবার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু বলতে পারে না রানু, বলতে পারবে কেন রানু ? তিন বছর আগে এই মানিকই যে একদিন রানুর উপকার করবার জন্যে ছুটোছুটি করেছিল। কান্তিনাথকে মিত্তিরবাবুর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, চাকরির কাজে বহাল করিয়ে দিয়ে তার পর স্টেশন গিয়ে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একলা বসে থাকা রানুকে ডেকে নিয়ে এই কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল মানিক।

রানু বলে—কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাকে বসতে বলতে পারব না, চা খাওয়াতেও পারব না।

মানিক—না না, আমি কিছুই মনে করব না। কিন্তু...

রানু—কী ? বলুন ?

মানিক হঠাৎ এগিয়ে এসে রানুর একটা হাত ধরে ফেলে—কিন্তু একটা চুমো দিতে তো পার !

মানিকের হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় রানু—আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন ?

মানিক—হয়েছি বোধ হয়। আমি সব সময় তোমারই কথা ভাবি। স্বপ্নে তোমার সঙ্গে কত কথা বলি ! বিশ্বাস করো রানু, আমি তোমার জন্যে সব করতে পারি।

মানিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রানু। রানুর চোখে নিবিড় বিস্ময়, আরও নিবিড় রানুর সারা মুখে চমকে ওঠা একঝলক রক্তের রাঙা আভা।

দু' পা পিছিয়ে সরে গিয়ে রানু বলে—আপনি সুবিধা পেয়ে আমাকে অনেক বাজে কথা শুনিয়ে দিলেন। খুব অন্যায় করলেন।

মাথা হেঁট করে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মানিক। রানুও কোনও কথা আর বলে না। অনেক দূরের বাতাসে শিউরে ওঠে ছুটেচলা একটা ইঞ্জিনের বাষ্পভরা শিস। ট্রেন যায়, ছুটে চলে যাচ্ছে সেই একলা পাইলট ইঞ্জিন, যেটা রোজই ঠিক রাত আটটায় লাতেহার যায়।

চলে যায় মানিক। রানু কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকে, ঘরের ভিতরে যে কেরোসিন বাতিটা জ্বলছে, তারই দিকে তাকায়। সারা মুখটা রাঙা হয়েই আছে। মানিক যেন একরাশ গোলাপ ফুল রানুর বুকের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বুঝতে পারছে না যে, সে গোলাপের সঙ্গে কাঁটাও আছে।

এই তিন বছরের মধ্যে এমন একটিও দিন যায়নি, যেদিনের সন্ধ্যাবেলায় ভেবে ভয় পায়নি রানু, মানিক আসবে। তাই দরজার কপাট আর খোলা রাখে না রানু।

কিন্তু সেজন্য মানিকের মনে কোনও দুঃখ নেই। আসবেই মানিক। জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে আর রানুর সঙ্গে কথা বলবে। রানু কতবার ধমক দিয়েছে, সাবধান, ওসব কথা বলবে না। কিন্তু রানুর এই ধমকও যেন মানিকের জীবনে একটা মস্ত বড় প্রাপ্তি, একটা প্রিয় উপহার।

যেদিন ভুল করে রানু দরজার কপাট বন্ধ করে রাখতে ভুলে যায়, সেদিন রানুকে কী দুঃসহ একটা অবস্থাই না সহ্য করতে হয়। ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে মানিক, আর যেন মন্ত্রপাঠ করতে থাকে : তোমাকে একটি বারও বুকে জড়িয়ে ধরা হল না। থাকগে, সে জন্যেও কোনও দুঃখ নেই। আসছে জন্মে নিশ্চয় তোমাকে পাব, আর এমন করে বুকে জড়িয়ে ধরব যে, তুমি তখন চুমো দিয়ে দিয়ে আমাকে মেরেই ফেলবে।

রানু বলে—আজ কী খেয়েছ ?

মানিক—ভাত আর ডিমের ঝোল।
রানু—কে রান্না করেছিল ?
মানিক—আমিই রান্না করলাম ; আমি ছাড়া এখন আর কে আছে আমার ?
রানু হাসে—নিশ্চয় খুব খারাপ রান্না !
মানিক—একটুও খারাপ নয়। খাবে আমার রান্না ? এনে দেব ভাত আর ডিমের ঝোল ?
রানু—না।
মানিক—কিন্তু তুমি আজ কী খেলে ?
রানু—বলব না।
মানিক—আমি জানি, তুমি আজ একগাদা পাকা ডুমুর খেয়েছ। চার পয়সায় একগাদা পাকা ডুমুর পাওয়া যায়।
রানু দরজার বাইরের দিকে চোখ তুলে আর দুই ভুরু কুঁচকে দিয়ে তাকায়—কী আশ্চর্য, কী ওটা এখানে পড়ে আছে !
—কী ? মানিক একটা লাফ দিয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়।
দরজার কপাট বন্ধ করে দেয় রানু। বোকা মানিক চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তার পর ব্যস্তভাবে পা চালিয়ে চলে যায়।
বন্ধ কপাটের উপর মাথা ঠেকিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রানু। আর আঁচল তুলে বার বার দুই চোখ মুছতে থাকে।
একদিন, যেদিন তুফান উঠল ঠিক সন্ধ্যাবেলাতেই, সেদিন বার বার জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় রানু। পর পর পাঁচটা দিন কেটে গেল, কিন্তু মানিক একদিনও এল না কেন, আজও তো আসবে না বলেই মনে হচ্ছে।
তুফানের পর বৃষ্টি। কী তুমুল বৃষ্টি ! এ বৃষ্টি যেন বন-পাহাড় আর কারখানা সব কিছুই গলিয়ে দেবে। না, আজ আর আসবে না মানিক। কী করে আসবে ? আসা যে অসম্ভব !
কিন্তু দেখতে পেয়েই চমকে ওঠে আর হেসেও ওঠে রানু ; জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মানিক। ভিজে গিয়েছে, আরও ভিজছে মানিক, কিন্তু সেজন্য মানিকের মনে প্রাণে ও শরীরে যেন কোনও অস্বস্তি নেই।
রানু—বৃষ্টিতে ভিজতে বুঝি খুব ভাল লাগছে ?
মানিক—মিছে জিজ্ঞাসা করছ কেন ? তুমি তো আর দরজা খুলে দেবে না, আর ঘরের ভিতরে একটু দাঁড়াতেও দেবে না !
বুকের ভিতরে যেন একটা যন্ত্রণা গুমরে উঠেছে, তাই রানুর চোখ দুটো থরথর করে কেঁপে ওঠে—না, দরজা খুলে দিতে পারব না ; কিন্তু সেজন্য কিছু মনে করো না।
মানিক হাসে—না।
রানু—কোথায় ছিলে এই ক'দিন ?
মানিক—ক্যাশ আনতে গোমো গিয়েছিলাম। মাসে অন্তত একটি বার গোমো যেতেই হয়। বলরাজ সাহেব আমাকেই সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেন, তাই উনি বলেছেন, মানিক যায়েগা ক্যাশ লানেকে লিয়ে, দুসরা কোই নেহি। গোমোর ব্যাঙ্কে গিয়ে আমি ক্যাশ তুলি, আমার সঙ্গে বন্দুক নিয়ে রণবাহাদুর থাকে, ব্যস।
মানিকের এরকম আসা-যাওয়ার উৎপাত এখন রানুর একরকম মন-সহা হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু গা-সহা হতে পারেনি। ভাবতে গেলে রানুর পঁচিশ বছর বয়সের ওই ভরাট বুক আর নিবিড় চোখ কেঁপে ওঠে। না, অসম্ভব, দরজা খুলে দিতে পারবে না রানু। মানিকের পাগলামির বুকটার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে গিয়ে সুখের মরণকে ও গা-সহা করে দিতে পারবে না। তার চেয়ে ভাল কোয়েলের বর্ষার ঢলের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হারিয়ে যাওয়া আর মরে যাওয়া।
কিন্তু ভুল তো শাসন মানতে ভালবাসে না। সব সময়ের কঠিন সাবধানের নিষেধও যেন ভুলেরই এক অদ্ভুত জাদুর কৌশলে মিথ্যে হয়ে যায়। রানুর ভাগ্যটা যখন নির্ভুল নয়, তখন

জীবনটাই বা নির্ভুল হবে কেমন করে ?

ইচ্ছে করে নয়, ভুল করে। শীতের দুপুরে খোলা দরজা দিয়ে ঘরের মেঝের উপরে যে রোদ ছড়িয়ে পড়ে, সেই মাদুরের উপর শুয়ে পড়ে থাকতে বেশ ভাল লাগে, আর বেশ ভাল ঘুমোতেও পারা যায়, তাই দরজা খোলা ছিল। সন্ধ্যা হয়নি, বিকেলও ফুরিয়ে যায়নি, রানুর মাদুরের উপর তখন ছড়িয়ে পড়েছিল ঠাণ্ডা রাঙা রোদের আবির। হঠাৎ চমকে ওঠে আর জেগে ওঠে রানু। মাদুরেরই উপর বসে থেকে পায়ের একটা পাতার দিকে তাকায়। যেন একটা সূঁচ ফুটেছে, জ্বলছে পায়ের পাতা। হ্যাঁ, সত্যিই তো, সেই জ্বালার ছোট্ট একটা রক্তিম বিন্দু পায়ের পাতার মাঝখানে ফুটে উঠেছে।

কিসে কামড়াল ? ঘরের চারদিকে তাকায় রানু। হ্যাঁ, ওই তো সেই অদ্ভুত পাহাড়ি পোকা, রোগা লম্বা ভোমরার মত দেখতে, কালো আর শক্ত সূঁচের মত ছোট্ট একটা কাঁটা আছে সেই পোকার দুই চোখের মাঝখানে।

দরজাটা খোলা। কিন্তু আর বেশি সময় নেই। দরজার কপাট বন্ধ করে দিতে হবে। পায়ের পাতার সেই লালচে জ্বালার বিন্দুটার উপর হাত বোলায় রানু। একটু নুন ঘষে দিলে জ্বালাটা বোধ হয় কমবে।

চমকে ওঠে রানু। ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে মানিক। হাঁটুর উপরে তোলা কাপড়টা নামিয়ে দিয়ে আর চাপা যন্ত্রণার একটা দৃষ্টি তুলে মানিকের মুখের দিকে তাকায় রানু—এ কী ! তুমি আজ হঠাৎ এরকম অসময়ে এসে পড়লে কেন ?

—দেখি, কী হয়েছে তোমার পায়ে ? এগিয়ে আসে মানিক। এক হাতে পায়ের পাতা চেপে রাখে রানু, আর এক হাত তুলে মানিককে সরে যেতে বলে—কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, সরে যাও।

রানুর সেই হাতনাড়া নিষেধের বাধা এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে রানুর পায়ের কাছে একেবারে লুটিয়ে বসে পড়ে মানিক। দু'হাত দিয়ে রানুর পায়ের পাতা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আর চেঁচিয়ে ওঠে—কী সর্বনাশ ! সাপে কামড়েছে বলে মনে হচ্ছে !

—না না, সাপ নয়। তুমি সরে যাও। তুমি এরকম বিচ্ছিরি বাড়াবাড়ি করো না, সাবধান।

দুর্দান্ত লোভীর মত রানুর পায়ের পাতার আরও কাছে মাথাটাকে একেবারে ঝুঁকিয়ে দিয়ে কথা বলে মানিক—জোরে একটু চুষে দিলে সাপের বিষ বেরিয়ে আসবে।

মানিকের মাথাটাকে সব শক্তি দিয়ে ঠেলে দিতে থাকে—না না, সাপের কামড় নয়, তুমি জান না, এটা একটা নচ্ছার পাহাড়ি পোকার কামড়। তুমি সরে যাও।

কিন্তু কী ভয়ানক শক্ত মানিকের এই ঠাসা কোঁকড়ান চুলে ভরা মাথাটা ! একটুও নড়ানো যায় না। কেঁদে ফেলে রানু—তোমার পায়ে পড়ি মানিক, তুমি সরো।

সরে গিয়ে হাসতে থাকে মানিক—তাই বলো, পোকার কামড়। আমার সন্দেহ হয়েছিল, চিতি সাপের কামড়। কিছুদিন হল চিতি সাপের খুব উপদ্রব শুরু হয়েছে। গিরিধারীলালের ছেলেটাকে কামড়েছে। কিন্তু... !

রানু—কোনও কথা বলো না, তুমি এখন যাও।

মানিক—কিন্তু পোকার কামড়ের জ্বালাটাকেও তো সারাতে হয় !

রানু—একটু নুন ঘষে দিলে সেরে যাবে।

মানিক—তবে নুন ঘষে দাও।

রানু—আগে তুমি যাও, তার পর।

মানিক—আচ্ছা, যাই তবে।

নুন ঘষতে হয়নি। জ্বালাটাও কখন সেরে গিয়েছে, জানতে পারেনি রানু। খোলা দরজার বাইরে, পথ ঘাট বন আর পাহাড়ের চেহারা ঢেকে দিয়ে আর নিরেট হয়ে জমে উঠেছে যে ভয়ানক কালো অন্ধকার, তারই দিকে তাকিয়ে থাকে রানু। বোধ হয় জাগা চোখে ঘুমিয়ে পড়েছে রানু। বোধ হয় নয়, সত্যিই ঘুমের মত একটা আবেশে পড়েছে রানু। বোধ হয় নয়, সত্যিই ঘুমের মত একটা আবেশে ভরে গিয়েছে রানুর সেই জাগা চোখ আর স্বপ্নও দেখেছে রানু, সে অন্ধকারে একটা অদ্ভুত

তারা হঠাৎ এক একবার ফুটে উঠছে, আবার নিভে যাচ্ছে।

দূর ছাই, স্বপ্ন। নিজের মনে বিড় বিড় করে রানু। উঠে দাঁড়ায়, আলো জ্বালে, আর হাঁড়ির মুখের সরা তুলে দিয়ে দেখতে থাকে, কতটুকু চাল আছে, কিংবা সত্যিই আছে কিনা।

কিন্তু আর তো সহ্য হয় না মানিকের এই উপদ্রব। বুঝতে পারছে, মানিক এবার আর সময়-অসময়ের ধার ধারবে না। সকালে দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায় রাতে আর মাঝরাতে, শেষরাতেও হতে পারে, যখন ইচ্ছা হবে তখনই চলে আসবে মানিক। তবে কি সব সময় দরজা বন্ধ করে রাখতে হবে?

দরজার কপাট বন্ধ করে দেয় রানু, উনুন ধরায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজার বন্ধ কপাট বাইরে থেকে একটা লাথির আঘাতে ঝনঝনিয়ে শব্দ করে কেঁপে উঠে। বুঝতে দেরি হয় না রানুর, রাজা হরিশ্চন্দ্র আজ জুয়োতে হেরেছেন।

তার পর যা হবার ছিল তাও হয়ে গেল। মানুষ নয়, পুরুষও নয়, যে আজ রত্না সিমেন্টের ওজনবাবু, সে আজ চিতি সাপের বিষের চেয়েও বেশি বিষময় ভাষায় গালিগালাজ করে, বঁটি ছুঁড়ে, তার পর নাক-ডাকা কবরের গর্তে পড়ে ঘুমোতে শুরু করে। না, আর সহ্য করা উচিত নয়, সহ্য করবার কোনও মানে হয় না। রানুর মূক ধৈর্য আর সহ্যের জীবনটা মিথ্যে এই চিতি সাপের ঘরে পড়ে আছে।

কিন্তু মানিকের ওই ইচ্ছার ভাষাটাও কত ভয়ানক! চিতি সাপকে মেরে ফেলতে মানিকের প্রাণে কোনও আপত্তি নেই। অন্ধকারের কী ভয়ানক জ্বলছিল মানিকের চোখ দুটো। না না, মানিক যেন আর কোনওদিনও এখানে আসে না। যদি আবার আসে তবে স্পষ্ট করে বলে দিলেই হবে—তুমি আর এসো না। কোয়েল নদীর জল যখন আসছে বর্ষার ঢলে দুরন্ত হয়ে উঠবে, তখন রাতের অন্ধকারের একটি মুহূর্তে আমি নিজেই চলে যাব।

কিন্তু বর্ষা আসতে কত দেরি? এটা এখন বোশেখ মাস, তার মানে আর মাত্র দুটি মাস বাকি। তার পরেও মানিক যদি এখানে আসে, তবে ভুল করবে, ভয়ানক বোকা হয়ে ফিরে যাবে মানিক। এই ঘরের জানালাতে রানুকে আর দেখতে পাবে না। চেঁচিয়ে ডাক দিলেও রানু নামে কোনও ছায়াও আর এই ঘরের ভিতর থেকে সাড়া দেবে না।

ঘরের মেঝের উপর পাতা আর একটা ছেঁড়া মাদুর, যে মাদুরটা রাজা হরিশ্চন্দ্রের মাদুরটাকে একটুও স্পর্শ না করে, বরং ঘেন্না করে বেশ দূরে সরে রয়েছে, সেই মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে আর ঘুমোতে চেষ্টা করে রানু। কিন্তু চেষ্টা করলেও কি ঘুম আসে? রানুর সারা শরীরটা যখন রত্না সিমেন্টের ওই ওজনবাবুর নাক-ডাকার শব্দে ঘেন্না পেয়ে শিউরে উঠছে, তখন ঘুমোবার চেষ্টা করাই বা কী করে সম্ভব?

ওই তো, নিবিড় ঘুমের ঘোরে নিশ্চিন্ত হয়ে যার নাক-ডাকার শব্দ ঘড়ঘড় করছে, যিনি হলেন নিদারুণ এক ওজনবাবু, তিনি নিজেই এই ঘরের ভিতরে পয়সাওয়ালা বাবুকে ডেকে এনে ও বসিয়ে রাখতে কতবার কত চেষ্টাই না করেছেন। মনে করতে পারে রানু, কবে প্রথম রানুর মাথা লক্ষ করে বঁটি ছুঁড়েছিলেন এই ওজনবাবু। একবার দুবার ও তিনবার, তিনদিনের তিন ঘটনায় আগন্তুক নতুন এক বাবুকে ওজনবাবুর সঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকতে দেখে রানু সেই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল, আবার দৌড়ে গিয়ে গিরিধারীলালের ঘরের দরজার কাছে এসে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। তার পর আর একদিন যখন নতুন বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ওই ওজনবাবু; যার নিজের শরীরের রক্ত আর নিঃশ্বাস হল শূন্যতার আবর্জনা, সেদিন তখনই বঁটি-দা হাতে তুলে নিয়ে এই ঘরের মেঝের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল রানু। আগন্তুক বাবু ভয় পেয়ে তখনই ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। সেদিনই যখন হাতে তোলা বঁটিটাকে মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর জানালার কাছে গিয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল রানু, তখন হিংস্রস্বরের একটা চিৎকার ছেড়ে আর রানুর মাথা লক্ষ করে সেই বঁটি ছুঁড়েছিলেন এই ওজনবাবু।

ভালই হয়েছে। সাপটা সত্যিকারের পুরুষ হলেই বা কি আসে যায়? মানুষের ঘরের মেয়ের পক্ষে তার সঙ্গিনী হওয়া সম্ভব নয়। এটা একরকমের ভাল ভাগ্যি বলে মনে করতে হয় যে, সাপটা

পুরুষই নয়। ওর ছায়া সহ্য করতে হয়নি, রানুর শরীরটা দূষিত হবার দুর্ভাগ্য থেকে বেঁচে গিয়েছে।

না, মানিকের চোখের ওই পুরুষ-চাহনিব জন্যেও মায়া করবার কোনও মানে হয় না। আরও বড় সত্য, দু'চোখে ওরকম শুধু একটা জ্বলজ্বলে পুরুষ-চাহনি থাকলেই তো চলে না। মানিকের সামান্য মাইনের চাকরিটা তো ভাল করে খেয়ে-পরে থাকবার একটা করুণ অক্ষমতার চেহারা। মানিকও একরকমের চোরাবালি। ওর কাছে নিশ্চিন্ত হতে পারা যাবে না, প্রায় এইরকমই উপোস-করা দুর্ভাগ্যের ভিতরে তলিয়ে যেতে হবে। উনিশের চেয়ে বিশ একটু বেশি বটে, কিন্তু এমন-কিছু বেশি নয় যে, তার জন্য লোভ করে তার হাত ধরতে হবে।

না, আসছে বর্ষার কোয়েল নদীর পাগল ঢলের জলের স্রোতটাকেই বরণ করে নেওয়া ভাল। রানুর জীবনের সব তেষ্টা তখন পেট ভরে জল খেয়ে খেয়ে ভেসে যাবে, ডুবে যাবে, তলিয়ে যাবে।

॥ ৪ ॥

কোথায় যাচ্ছে গিরিধারীর বউ আর ছেলেমেয়েরা ? সবাই হলুদ ছোপানো কাপড় পরেছে। একটা ঢাকি ঢাক বাজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। গিরিধারীর বউয়ের মাথায় মস্ত বড় একটা ডালা, তার মধ্যে ফুল ফল বাতাসা লাড্ডু ; আরও কত কী ! দরজার কাছে সিঁড়িটার উপর দাঁড়িয়ে আছে আর দেখছে রানু।

গিরিধারী বউ ডাক দিয়ে বলে—চলো না, এ বাঙ্গালিন বহু, লছমিজির পূজা দেখবে চলো।

বুঝতে পারে রানু, ঠিকই বলেছিল মানিক, এখান থেকে কিছু দূরে বনের ভিতরে একটা ভাঙা মন্দিরে খুব পুরনো কালের পাথরের একটি লক্ষ্মীমূর্তি আছে। সেবাইত নেই, তাই রোজ ধূপ-দীপ জ্বলে না, আরতিও হয় না। মাঝে মাঝে এদিক-সেদিক থেকে নানারকম মানত নিয়ে লোক আসে ; লক্ষ্মীর মূর্তির পায়ে সিঁদুর মাখায়, ফুল ছোঁয়ায়, ফল কিংবা বাতাসা নিবেদন করে। একবার একটা পাগল এসে বিস্কুট নিবেদন করেছিল !

গিরিধারীর বউ আবার ডাক দেয়—যেতে চাও তো চলো। ঢের দূর নয়।

রানু—কত দূর ?

—এই তো এখান থেকে হেঁটে বড় রাস্তায় উঠবে, দেখবে একটা ডাকবাংলো আছে। সেখান থেকে একটু দূরে জঙ্গলের ছোট রাস্তা ধরে হাঁটবে। দশ মিনিটের মধ্যে লছমিথানে পৌঁছে যাবে।

রানু বলে—যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আজ যাব না।

ঢাক বাজে, সকালবেলার রোদ গায়ে মেখে চলে যায় সেই হলুদ ছোপানো মিছিল।

কিন্তু আজ গেলেই তো ভাল হত। বর্ষা আসতে আর ক'টা দিনই বা বাকি আছে ? বোশেখ ফুরিয়েছে, আজ জষ্ঠির পাঁচ কিংবা ছয় হবে। বর্ষা আসতে তো খুব বেশি দেরি নেই। লক্ষ্মীমূর্তির কাছে গিয়ে পুজো দিয়ে আসবার ভাল সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে ?

হ্যাঁ, ফুল-বাতাসা নিয়ে একটা পুজো তো দিতেই হবে, কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করতেও হবে, হ্যাঁ গো লক্ষ্মী ঠাকুরুন, আমার এই সাত বছরের জীবনে তুমি কোন সুখটা দিয়েছ, বলো তো ? আমি কার কাছে কোন অপরাধ আর কিসের অপরাধ করেছি, বলতে পার ?

না না, চলেই যাচ্ছি যখন তখন আর তোমাকে ওসব কথা শুনিয়ে দিয়ে কোনও লাভ নেই। তুমি আমার পুজো নাও, আর খুশি হও।

ওই যে, মানিক আসছে। আসুক। কিন্তু কী আশ্চর্য, মানিকের চোখ দুটো কি দূরবীনের চোখ ! নইলে বুঝতে পারল কী করে যে, আজ এই সকালবেলায় দরজা খুলে একেবারে বাইরে এসে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েছে রানু। না, মানিককে আজ আর ঘরের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। যা বলতে চায় মানিক, এখানে এই বাইরেই দাঁড়িয়ে বলে দিয়ে চলে যাক।

মানিক বলে—রোদ খুব গরম, তবু চলে এলাম।

রানু—ভাল কথা।

—আজ কিন্তু একেবারে স্পষ্ট করে বলতেই হবে, রানু।

—কী বলব ?
—তুমি কবে আমার কাছে আসবে বলো ?
—তার মানে ?
—কবে আমাদের বিয়ে হবে ?
—তুমি আবোল-তাবোল কথা বলবে না। বিয়ে হবে না, বিয়ে হতে পারে না।
—হতে পারে রানু। দুজনে কালীঘাটে গিয়ে মালা-বদল করলেই বিয়ে হয়ে যাবে। তার পর দুজনে এখান থেকে অনেক দূরে কোথাও চলে যাব। বিশ্বাস করো রানু, আমার ঘরে তুমি কোনও কষ্ট পাবে না।
—তুমি কত টাকা মাইনে পাও ?
—আশি টাকা।
—মিত্তিরবাবু আছেন বলে তোমার আশি টাকা মাইনে হয়েছে ; সত্যি কিনা ?
—নিশ্চয় সত্যি। মিত্তির কাকা না থাকলে কে আর আমাকে আশি টাকা মাইনের চাকরি পাইয়ে দিত।
—গিরিধারীর বউ বলেছে, তুমি শুধু নামেই কেরানি ; আসলে পিয়নের কাজ কর।
—কথাটা খুব মিথ্যা নয়। লেখাপড়া তো তেমন কিছু শিখিনি, অফিসের লেখা-জোখার কাজটা ভাল করে করতে পারি না। কাজেই...
—তবে, যেখানে মিত্তির কাকা নেই, সেখানে গিয়ে কত টাকা মাইনের কাজ পাবে ?
—কত আর পাব ? পঞ্চাশ-ষাটের বেশি তো নয়।
—এই তো তোমার মুরোদ।
—তা বলতে পারো।
—এই মুরোদ নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে মালা-বদল করতে চাও ?
—অ্যাঁ ?
—বলছি ; ঘর করবার এত সাহস কেন ? ঘরের মানুষকে খাওয়াতে পরাতে পারবে ? পঞ্চাশ টাকা রোজগারের মুরোদে এত বড় সুখের সাধ থাকে কেন ?
—তুমি শুধু টাকার মুরোদই দেখছ, আর কিছু দেখতে পাও না ?
—আর কী দেখব ?
—আমার কি আর কোনও গুণই নেই ?
—দেখছি না তো।
—আমার কি হার্টও নেই ?
—থাকতে পারে ; কিন্তু তাতে কী আসে যায়। কিচ্ছু না। তাতে ভাত হয় না।
স্তব্ধ হয়ে শুধু রানুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মানিক। ধুলো হয়ে ঝরে পড়ছে মানিক রায়ের সাত বছরের স্বপ্ন। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে এই তিন বছরের আশার ফুলবাগান। চুপসে যাচ্ছে বুকের ভিতরের ফুসফুসটা।
মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দূরের নেড়া পাহাড়ের মাথাটার দিকে তাকায় মানিক। তার পর, যেন বহু দূর পথ হেঁটে ক্লান্ত হওয়া গরুর মত আস্তে আস্তে চলতে থাকে।
চলেই গেল মানিক। রানুর দুচোখের দৃষ্টি তবু জ্বলতেই থাকে। চিতি সাপের কাছ থেকে সরে গিয়ে ঢোঁড়া সাপের কাছে চলে এসো। উঃ, কী মস্ত স্বর্গসুখের প্রস্তাব! শৈব্যা শৈব্যা বলে চেঁচিয়ে কাঁদছেন যাত্রা নাটকের আর এক রাজা হরিশ্চন্দ্র। বুকের ভেতরে কড়মড় করে দাঁত চিবিয়ে কথা বলছে একটা রাক্ষুসে ঠাট্টা। আহা, কী কথাই না বলছেন!
মানিক আর আসবে না। খুব শান্তি, খুব শান্তি। এখন ভালয় ভালয় কয়েকটা দিন শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকতে হবে, একবার লছমিথানে যেতে হবে, তার পর একদিন খোঁপাটা খুব শক্ত করে বাঁধতে হবে, জলের তোড়ে যেন এলো হয়ে ছড়িয়ে না পড়ে এই একরাশ চুলের বোঝা। শাড়িটাকেও খুব খাটো করে পরতে হবে, আঁচলটাকে শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে একটা গিঁটও দিয়ে

দিতে হবে। ডুবো কাঁটাঝোপের সঙ্গে চুল আর শাড়ি আটকে গিয়ে ধড়টাকে যেন আটক করে না রাখতে পারে। ঢলের জলের স্রোত এক নিমেষে ধড়টাকে টেনে নিয়ে, পাথরের উপর আছড়ে দিয়ে, তার পর একটা দহের গভীরে তলিয়ে দেবে।

কিন্তু কবে আবার লছমিথানে যাবে গিরিধারীর বউ ; কোনও ঠিক তো নেই। লছমিথানে পুজোটা সেরে দিয়ে আসতে হলে গিরিধারীর বউয়ের সঙ্গ নেবার আশায় বসে থাকলে চলবে না। একা যাবার বাধা কোথায় ? একা যেতে অসুবিধেই বা কী আছে ? সকালে গেলে দুপুরেই ফিরে আসা যাবে। আজকের রাতটা শেষ হয়ে যাক।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রানুর মনটা ছটফট করে, সন্ধ্যা হবে কখন ; আবার সন্ধ্যা হতেই ছটফট করে মন, রাত হবে কখন ? মাঝরাত হলে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চোখদুটো আকাশের দিকে তাকিয়ে ছটফট করে, রাত শেষ হবে কখন ? ঘরের ভিতরে মাদুরের উপর শব্দ করে উথলে পড়ে মাতালের বমি। সে শব্দ শুনতে পায় না রানু।

ভোর হতেই স্নান করে রানু। আর সকাল হতেই ওজনবাবু যখন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বাইরে বের হয়ে যায়, তখন তৈরি হয় রানু। পুজোর কাজের সময় মাথাতে খোঁপা মানায় না। তাই চুলের গোছা পিঠের উপর এলিয়ে ছড়িয়ে দেয়। পুজোতে ছেঁড়া শাড়ি পরলে মানায় না। তাই তোরঙ্গ থেকে একটি অছেঁড়া আস্ত শাড়ি বের করে রানু। হায় ভগবান, এটা যে জ্যোৎস্না মামির দেওয়া সেই ধনেখালি !

কিন্তু পুজোর জিনিসও তো চাই ! কী জিনিস নিবেদন করলে ভাল হয় ?

উঠোনের এককোণের সূর্যমুখীটার গাছ থেকে কিছু ফুল ছিঁড়ে নিয়ে বাঁশের কাঠির একটা সাজির ভিতরে রাখে রানু। আর সিঁদুরের ডিবেটা। এই সিঁদুর-ডিবে লক্ষ্মীমূর্তির পায়ের কাছে রেখে দিয়ে চলে আসতে হবে ; ফিরিয়ে নিয়ে আসবার কোনও দরকার নেই, কোনও মানেও হয় না। সিঁথিতে সিঁদুর দেবার অভ্যাস কবেই তো ছেড়ে দিয়েছে রানু।

মাঠের উপর দিয়ে লাল কাঁকরের সরু পথ এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে। চলতে ভালই লাগে। মাঠের একটা শিমুল গাছের ডালের উপর বসে ডাকছে একটা পাখি, ওটা নিশ্চয় দুর্গা টুনটুনি।

বড় রাস্তার উপরে উঠেই বুঝতে পারে রানু, ওই বাড়িটাই হল ডাকবাংলা। ফটকের সামনে একটা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু লছমিথানে যাবার ছোট রাস্তাটা কোথায় ? কত দূর ? এগিয়ে যায় রানু।

ডাকবাংলার ফটকের মোটর গাড়ির কাছে এসেই চমকে ওঠে রানু। কে যেন জিজ্ঞাসা করছে—কে আপনি ? কোথায় যাচ্ছেন ?

গাড়ির ভিতর থেকে নেমে এলেন এক ভদ্রলোক। সাহেব মানুষের মত ফর্সা রঙের চেহারা, গায়ে কিন্তু সিল্কের কামিজ আর জড়ি-পেড়ে ধুতির সাজ।

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি ? আবার জিজ্ঞাসা করেন ভদ্রলোক।

রানু বলে—লছমিথানে পুজো দিতে যাচ্ছি।

—তার মানে ওই জঙ্গলের এক ক্রোশ ভিতরে সেই সাত শো বছরের পুরনো একটা প'ড়ো মন্দিরে, যেখানে দিনের বেলাতে হায়েনা ঢুকে বসে থাকে আর খরগোসের হাড় চিবোয়।

—তা তো জানি না !

—খবরদার, একা একা কক্ষনও ওই জঙ্গলের ভিতরে ঢুকবেন না। পাহাড়ি মেয়ে-ছেলেরা ঢাকের বাদ্যি সঙ্গে নিয়ে আর দলবেঁধে ওই মন্দিরে পুজো দিতে যায়। তার একটা মানে হয়। ঢাকের শব্দে হায়েনা পালিয়ে যায়। কিন্তু আপনার তো এভাবে একা-একা ওখানে যাওয়া কোনওমতেই উচিত নয়।

—তা হলে উপায় ! এখন কী করি আমি ?

—বাড়ি ফিরে যান। জঙ্গলের এই সরু রাস্তাতে আমার গাড়ি চলবে না। নইলে আমিই আপনাকে আমার গাড়িতে করে মন্দির দেখিয়ে নিয়ে আসতাম। তা ছাড়া...।

হেসে ফেলেন ভদ্রলোক—তা ছাড়া, আমি হায়েনার ভয় করি না, আমার সঙ্গে বন্দুক থাকে, আমি

শিকারি।

—আচ্ছা, তবে আমি ফিরেই যাই।

—কোথায় থাকেন, কতদূরে ?

—ওই তো ওখানে।

—রত্না সিমেন্টের স্টাফ কলোনিতে ?

—হ্যাঁ।

—বলেন তো, আমার গাড়িতেই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

—হ্যাঁ।

—আপনার মাথায় সিঁদুর নেই, তবু সিঁদুর-ডিবে হাতে নিয়ে পুজো দিতে চলেছেন, এ কেমন ব্যাপার ?

চমকে ওঠে রানু। চোখ দুটো ভীরু হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে।

—কথা বলছেন না কেন ? আমি তো পুলিশ নই, এত ভয়ই বা পাচ্ছেন কেন ?

রানু বলে—আমি যাই।

ভদ্রলোক এইবার রানুর খুব কাছে এগিয়ে এসে আর গলার স্বর খুব নরম করে নিয়ে প্রশ্ন করেন—সত্যিই করে বলুন তো, আপনার স্বামী আছে কি নেই ?

জবাব দেয় না রানু।

ভদ্রলোক—কেউ একজন আছেন নিশ্চয় !

তবু নিরুত্তর রানু। রানুর চোখ দুটো এই জষ্ঠি মাসের আকাশটারই মত রুক্ষ ও উদাস। হয়ত জবাব দেবার ভাষা পাচ্ছে না রানু। নয়ত কথা বলার ইচ্ছে নেই। কিংবা জিভটাই আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি এবার বেশ তীব্র হয়ে ওঠে।—আমার সন্দেহ, কেউ একজন আছেন নিশ্চয় ; তবে তিনি থেকেও নেই।

রানুর রুক্ষ-উদাস চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যায়।

চমকে ওঠেন ভদ্রলোক—এ কী ; আপনি কেঁদে ফেললেন কেন ?

রানু—আমি এবার যাই।

ভদ্রলোক—আপনি আগে কোথায় ছিলেন ? কলকাতায় ?

—না।

—তবে ?

—সীতারামপুরে।

—সীতারামপুরের নন্দবাবুকে চেনেন ? নন্দকিশোর দত্ত। বুড়ো মানুষ, মাথায় টাক আর ঘাড়ের কাছে সাদা চুলের দু'চারটে বাবরি।

—কে ? আমাদের নন্দদাদু ? খুব চিনি। চেঁচিয়ে ওঠে রানু।

—তাঁর ছেলে হল সীতারামপুরের মেয়ে-স্কুলের দপ্তরি।

—হ্যাঁ, নন্দদাদুর ছেলে, জনার্দন।

—ছেলের উপর রাগ করে বুড়ো বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। আমারই কোলিয়ারিতে হাজিরা কুলির কাজ করত। কিন্তু বেশি দিন টিকলো না বুড়ো। হঠাৎ একদিন মরে গেল।

কেঁদে ফেলে রানু—ওই নন্দদাদু আমাকে খুব ভালবাসতেন।

—কিন্তু এখানে, জষ্ঠি মাসের এই রোদের মধ্যে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করা কি ভাল ?

—না। আচ্ছা আমি এখন যাই।

—আমি বলি একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর যাবেন।

—না, আর জিরিয়ে নিতে চাই না।

—এ যে খুব জটিল একটা রহস্যের কথা বলে মনে হচ্ছে। আমি তো সব কথা না শুনে আপনাকে ছেড়ে দেব না। আমার কথা শুনুন, কোনও ভয় করবেন না। আসুন।

ভদ্রলোকের অনুরোধের কথাগুলি যেন মায়াময় সোনার শিকল। অদৃশ্য একটা পাক দিয়ে রানুর প্রাণটাকে এরই মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলতে থাকে রানু।

বারান্দায় উঠে ডাক দেন ভদ্রলোক—খানসামা, এক গেলাস জল নিয়ে এসো।

খানসামা জল নিয়ে আসতেই ভদ্রলোক তাঁর গলার স্বর খুব নরম করে রানুকে অনুরোধ করেন—এইবার শান্ত সুবোধ লক্ষ্মী মেয়েটির মত চোখ-মুখ ধুয়ে নিন। হ্যাঁ, এবার বলুন শুনি।

—কী বলব ?

—ওই চেয়ারে আগে বসুন, তারপর কথা বলুন। আপনি ওই জংলি লক্ষ্মী-মন্দিরে কেন যাচ্ছিলেন ?

—সিঁদুর-ডিবে নিবেদন করতে।

—তার মানে, লক্ষ্মীর পায়ে ওই ডিবে ঠেকিয়ে দিয়ে, সিঁদুরটাকে খুব পবিত্র করে নিতে ?

—না, ওখানেই রেখে দিয়ে আসতে।

—রেখে দিয়ে চলে আসতেন ? এ কেমন কথা হল ! এই সিঁদুর কি আর কাজে লাগবে না ?

—না।

—কেন ?

—আমি সিঁদুর ছেড়েই দিয়েছি।

—কেন ? আপনার স্বামী নেই ?

—থেকেও নেই।

—তার মানে, আপনাকে খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ?

—হ্যাঁ।

—খুব অপমান করে ?

—হ্যাঁ।

—মারধোর করে ?

—হ্যাঁ।

—আর কী কষ্ট দেয় ?

—সব রকম কষ্ট।

—তার মানে, ভাল করে খেতে দেয় না, উপোস করিয়ে রাখে ?

—হ্যাঁ।

—লোকটা চাকরি করে না ?

—করে ; কিন্তু জুয়ো খেলে ফতুর হয়।

—নেশা-টেশাও করে ?

—হ্যাঁ।

—মদ খায় ?

—হ্যাঁ।

—দেশি মদ ?

—জানি না।

—বমি-টমি করে ?

—হ্যাঁ।

—স্বাস্থ্য ভাল নয় ?

—একটুও না।

—রোগা রুগ্ন ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আপনি এখন একটু চুপ করে বসে থাকুন। বড্ড হাঁপাচ্ছেন আর হাঁসফাঁস করছেন আপনি।

চুপ করে বসে থাকে রানু। আর ভদ্রলোকও চুপ করে অপলক চোখে রানুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রানু যেন ভদ্রলোকের চোখের কাছে একটা অকল্প্য হঠাৎ-আবিষ্কার।

ঠিক কথা ; অমিত চৌধুরী সেদিনও প্রায় এই রকমেরই একটা বিস্ময়ের হঠাৎ আবিষ্কারে বিস্মিত হয়েছিলেন, যেদিন তাঁর নিতান্ত জঘন্য একটা কয়লা খাদের ভেতর থেকে একেবারে খাঁটি এক নম্বর কোয়ালিটি কয়লা উঠেছিল। সেই ছোট কয়লা খাদই হল তাঁর আজকের রিঠুয়া কোলিয়ারি। চারদিকে ছোট-বড় রিঠা গাছের অনেক বন ; নামটা তাই রিঠুয়া। যে শালজঙ্গলটা বেরমোর কাছে গিয়ে প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, সেই জঙ্গলটাই এদিকে এসে বেশ ঘন হয়েছে। এককালে এই জঙ্গলের প্রায় অর্ধেকটাই অমিত চৌধুরীর বাবার জমিদারি ছিল। জমিদারি তো উঠেই যাবে, তাই সময় থাকতে, বাবা মাত্র উনিশ হাজার টাকায় রাজগোলার জমিদার লালাবাবুর কাছে জমিদারি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অমিত চৌধুরীর বাপ আজ আর বেঁচেও নেই যে, তাঁর ওকালতির উপার্জনের সব টাকা ছেলের শখ আর সুখের জন্য খরচ করবেন।

কলকাতার বড়লোক বাবুদের বাগানবাড়ি থাকে। অমিত চৌধুরীর বাবা একজন বড়লোক বাবু হয়েও একটা বাগানবাড়ি রাখবার শখ করেননি। তিনি শখ করে তৈরি করেছিলেন একটি জঙ্গলবাড়ি, সে বাড়ি আজও আছে, ওই রিঠাবনের ছায়া থেকে বেশ দূরে, শাল জঙ্গলের আরও ভিতরে যেখানে ওরাওঁদের একটি গাঁ আছে। আজ সেই জঙ্গলবাড়ির নাম বনবিহার, অমিতেরই দেওয়া নাম।

অজিতবিক্রম চৌধুরী, যাঁর ছেলের পুরো নামটি হল অমিতবিক্রম চৌধুরী, তিনি একটা আক্ষেপের কথা বার লাইব্রেরিতে সবার কাছে বলতেন। তাঁরা নাকি সাত-আট পুরুষ আগে ক্ষত্রিয় ছিলেন, দেশ ছিল সিরোহি, রাজপুতানা। খুব দুঃখ করতেন উকিল অজিত চৌধুরী, বাঙালি ভটচাযেরা ষড় করে সিরোহির রাজপুতকে একেবারে বাঙালি কায়স্থ করে ছেড়েছে। এই দুঃখের ব্যাপারটা আদৌ হত না, যদি তাঁর পূর্বপুরুষদের একটি পরিবার সিরোহি থেকে চলে এসে নদে জেলার একটা গাঁয়ে ঠাঁই না নিতেন। নদে জেলার ওই গাঁয়ের নামটাও অদ্ভুত ; হেড়োডাঙা। লোকে বলে, হেড়োডাঙার চৌধুরী।

রাঁচির বার লাইব্রেরির দত্ত, মিত্র আর বাঁড়ুজ্জেরা মাঝে মাঝে এক আধটু হাসাহাসি করেন বটে, কিন্তু অজিত চৌধুরীর ওই আক্ষেপটাকে খুব বেশি অবিশ্বাস্য বলে মনে করেন না। যেমন বাপ, তেমনিই ছেলে ; অন্তত চেহারাতে ক্ষত্রিয়তার অনেক কিছু আছে। গায়ের রং খুব ফর্সা, তার মধ্যে একটা লালচে আমেজও আছে। চওড়া বুক, লম্বা হাত, খাড়া নাক। হরেনবাবু বলতেন, হাতে একটা তরবারি ধরিয়ে দিলেই অজিতদাকে সেকেলে বীরত্বের একটি রণসিংহ বলে মনে হবে।

তরবারি নেই বটে, কিন্তু বন্দুক আছে। পিতা ও পুত্র, দুজনেই বন্দুক ভালবাসেন। দুজনের শিকারশখের রকম-সকম দেখলে সত্যিই সন্দেহ হতে পারে, এ বুঝি সেই সেকেলে ক্ষত্রিয়ের মৃগয়াবিলাসের একেলে মেজাজ। উকিল অজিত চৌধুরী আদালতের ছুটির দিনে তাঁর জঙ্গলবাড়িতে এসে একটি-দুটি দিন থাকতেন, আর শুধু পাখি শিকার করে চলে যেতেন। কিন্তু ছেলে অমিত চৌধুরী তার বনবিহারেই থাকে, আর শুধু পাখি শিকার করে নয়, হরিণ শুয়োর বাঘ আর ভালুক শিকার করে জীবনের দিন মাস আর বছরগুলিকে সুখেই কাটিয়ে দেয়।

অজিত চৌধুরীর মারা যাবার বছরে পরীক্ষা দিয়ে আর ভাল নম্বর নিয়ে পাশ করে বি-এ ডিগ্রি পেয়েছিল যে অমিত, সে কিন্তু উকিল হবার জন্য আইন পড়তে পারেনি। কারণ উকিল হবার জন্য অমিত চৌধুরীর মনে কিংবা প্রাণে কিছুমাত্র ইচ্ছারও চাড় ছিল না। শুধু শিকার, বনচর যত পাশব হিংস্রতাকে গুলি মেরে মেরে রক্তাক্ত করাই যেন অমিতের একমাত্র আনন্দ।

ছেলে অমিতের ভাগ্য ভাল, রিঠাবনের কাছে কয়লার খাদ করবার জন্য অমিতের নামে মাইনিং লাইসেন্স করিয়ে রেখেছিলেন পিতা অজিত চৌধুরী। সেই খাদই হল আজকের রিঠুয়া কোলিয়ারি, যার লাভের টাকাতে অমিত চৌধুরীর বনবিহারের আর শিকারের সব সুখের দাবি মিটে যায়।

বনবিহারের এই অমিত চৌধুরী বিয়ে করেনি, কিন্তু সে জন্য তার প্রাণে ও মনে কোনও শূন্যতার

আক্ষেপ নেই। অনেকদিন আগে রামগড়ের বাজারে রাঁচির ট্রেজারির কেরানি সদানন্দের কাছ থেকে শহুরে ভয়ের একটা গল্প শুনেছিল অমিত। উকিল চন্দ্রনাথবাবু বলেছেন, ডাক্তার বরেন পালিতের মেয়ে বনলতার সঙ্গে অমিতের বিয়ে হলে বোধ হয় মন্দ হবে না। মেয়েটিও তো বেশ ফর্সা লম্বা চেহারা, ম্যাট্রিক পাশও করেছে। শুনে চমকে উঠেছেন বরেন পালিত। মেয়েকে জঙ্গলে পাঠাতে তিনি রাজি নন। মেয়েও ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে। গল্প শুনে হেসে ফেলেছিল অমিত, সুতীব্র তুচ্ছতা ও ঠাট্টার হাসি—কিন্তু আমি যে সত্যিই একটি লম্বা ফর্সা আর ম্যাট্রিক পাশ মিনমিনে লজ্জার লতাকে বিয়ে করতে পারি, একথা ওদের কে বললে ?

ডাকবাংলার চাকর এসে বারান্দাতে ঘাসের পর্দা ঝুলিয়ে দেয় ও জল ছিটোতে থাকে। কারণ, জষ্ঠি মাসের দুপুরের যত উত্তপ্ত পাহাড়ের জ্বালা নিয়ে গরম বাতাস বইতে শুরু করেছে। এতক্ষণ ধরে রানুর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকেও অমিত চৌধুরীর চোখের সাধ যেন মিটে যেতে পারছে না। কিন্তু চাকরটা বেয়াড়াভাবে ঘাসের পর্দার গায়ে জল ছিটোচ্ছে, রানুর এলো চুলের উপর সেই জল ছিটকে পড়ছে। দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে আর ধমক দেয় অমিত—এই মালি, একটু আস্তে করো।

চাকরটা চলে যেতেই রানুকে আবার প্রশ্ন করে অমিত—এবার বলুন, একেবারে মন খুলে আর একটুও সঙ্কোচ না রেখে বলুন, এরকম একটা অমানুষের ঘর আর সহ্য করতে পারবেন, নাকি, পারবেন না !

রানু—আর পারব না।

অমিত—তারপর ? কী করবেন ? কোথায় যাবেন ?

রানু—জানি না।

অমিত—খুব জানেন, শুধু আমার কাছে বলতে ইচ্ছে করছে না বলেই বলছেন না।

রানুর মাথাটা হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে। চোখ লুকোতে চেষ্টা করছে রানু। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বুকের ভিতরের একটা ঝড়ের কান্নাকে আটক করে রাখতে চাইছে।

অমিত—বুঝতে পারছি, আমি আপনার কাছে নেহাতই অচেনা মানুষ বলে আপনি আমাকে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চান না। আমি আপনার একজন চেনাজন কিংবা আপনজন হলে কিন্তু নিশ্চয়ই বলতেন।

রানুর ঝুঁকে-পড়া মাথাটা একটু কেঁপে ওঠে। রানুর দুই চোখ জলে ভরে গিয়ে ছলছল করে, সেই জলের দু'চারটে ফোঁটা মেঝের উপরেও ঝরে পড়ে। অচেনা অজানা একটি মানুষের মুখের ওই কথা যেন মায়ালোকের সোনার কাঠির মত রানুর প্রাণের গোপন দুঃখটাকে ছুঁয়ে ফেলেছে। চুপ করে থাকবার যেটুকু শক্তি শেষ পর্যন্ত ছিল, তাও গলে গিয়েছে।

দেখতে পায় অমিত, বারান্দার ধারে-কাছে কোথাও কেউ নেই। চেয়ার থেকে উঠে এসে রানুর সেই হেঁট-মাথার উপরে হাত রাখে—বলো আমাকে ; আমি তো তোমার কোনও শত্রুমানুষ নই !

মাথা তুলে আর দুচোখ বন্ধ করে কথা বলে রানু—আমি আর এই জগতেই থাকব না।

কী ? অমিত চৌধুরীর চওড়া বুকটা যেন গুমরে ওঠে।—আত্মহত্যা করবে তুমি ? রানুর মাথাটাকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে ধমক দেয় অমিত।—কিন্তু তোমার সাধ্যি কী ? আমি থাকতে তোমার আত্মহত্যা করবার সাধ্যি হবে না। আমি বরং গুলি করে তোমাকে মেরে ফেলব, তবু আত্মহত্যা করতে দেব না।

চমকে ওঠে রানুর জলভরা চোখ—কে আপনি ?

অমিত—যে-ই হই না কেন, কিন্তু তোমার একটা শত্রুমানুষ যে হতে পারি না, সেটা বিশ্বাস হয় না, কি বলো ?

—হয়।

অমিত আবার নিজের চেয়ারে বসে।—যদি বিশ্বাস হয়, তবে এ জগৎ থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছে-টিচ্ছে ছেড়ে দাও। একটুও দুশ্চিন্তা করো না। আর, চুপ করে এখানে বসে থাকো।

—অনেকক্ষণ তো বসেছি !

—ঠিক কথা। এবার চা আর খাবার খাও।
—আমি চা খাই না। আর, খাবার খেতে এখন একটুও ভাল লাগবে না।
—ভাল লাগাতেই হবে।
—মাপ করবেন।
—তবে একটু সরবত খাও।—ওহে খানসামা, এক গেলাস সরবত নিয়ে এসো।
—আপনি খাবেন না ?
—হ্যাঁ, ওহে খানসামা, দু গেলাস সরবত নিয়ে এসো।

রানুর চোখে আর জল নেই। অমিত চৌধুরীর দুর্দান্ত ভাষা শুনে ভয় পেয়ে, কিংবা মায়ার কথা শুনে একটু স্বস্তি পেয়ে, নয়ত একটা আশ্চর্য-মানুষকে দেখতে পেয়ে রানুর চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে।

অমিত বলে—আমি হলাম অমিত চৌধুরী, যাকে জঙ্গলের মানুষ বলে রাঁচির অনেক ভদ্রলোক ঠাট্টা করে। সত্যি কথা, আমি জঙ্গলেই থাকি। গাছের কোটরে অবিশ্যি থাকি না। জঙ্গলের ভিতরে একটি গাঁয়ের কাছে আমার সেই বাড়ি, এই ডাকবাংলার চেয়ে ঢের বেশি আরামের বাড়ি। সে বাড়িতে একাই থাকি, কারণ আমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তুমি নিশ্চয় কিছু লেখা-পড়া শিখেছ।

রানু—ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত, পরীক্ষা দেওয়া আর হয়নি।

অমিত—খুব ভাল হয়েছে। ম্যাট্রিক পাশ করলে মেয়েরা ভয়ানক অহংকারী হয়ে যায়।

হেসে ফেলে রানু।—আমার বন্ধু শোভনা ম্যাট্রিক পাশ করেছে, কিন্তু সে একটুও অহংকারী নয়।

অমিতও হাসে—বুঝেছি, কিন্তু আমার কথার অর্থটা তুমি বুঝতে পারনি। যা-ই হোক, আমার অহংকার হল আমার একটি কয়লাখনি, আর আমার এই বন্দুক। কয়লাখনি আমাকে সুখে রেখেছে, ভাত-কাপড়ের কোনও অভাব ভুগতে হয় না। আর বন্দুকটি আমাকে সারা বছর আনন্দ যোগায়। মাচানে বসে, গভীর রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে, শুকনো পাতার উপর বাঘের পায়ের শুধু একটু খুস্‌খাস্ শব্দ শুনেই আমি এক গুলিতে সেই বাঘকে ঘায়েল করে দিতে পারি, এমনই পয়া আমার বন্দুকটি।

দু গেলাস সরবত নিয়ে আসে খানসামা। রানু হাত তুলে আপত্তি করে।—না না, আমি খাব না।

অমিত—কেন ? এই যে বললে... !

রানু হাসে—আমি তো আপনার কথামত চুপ করে আপনার কথা শুনছি।

অমিত—শুনছ বটে, কিন্তু একটুও মানছ না।

রানু—তবে একটুখানি খাই।

অমিত—না, সবটুকু খেতে হবে।

সরবত খায় রানু। কিন্তু কী একটা আতঙ্ক রানুর চোখের পাতায় থরথর করে কেঁপে উঠেছে। ঘাসের পর্দা থেকে টুপটুপ শব্দ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে। কিন্তু রানু যেন সন্দেহ করছে, টুপটুপ শব্দ করে ওরই বুকের রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ছে!

অমিত চৌধুরীর দুই চোখ আবার অপলক। নীরব হয়ে শুধু দেখতে থাকে রানুর ওই আতঙ্ক-রক্তিম মুখের ছবি। দেখছে অমিত, বার বার ডাকবাংলার ফটকের দিকে তাকাতে চেষ্টা করছে রানু। রানুর মাথার কাপড় সরে গিয়েছে। এলোচুলের গোছা দুহাত দিয়ে ঘাড়ের কাছে তুলে নিয়ে এবার শক্ত করে একটা খোঁপা বাঁধতে চেষ্টা করছে, কিন্তু বার বার খুলে যাচ্ছে খোঁপাটা। হাত দুটো কাঁপছে, তবু আবার খোঁপা বাঁধতে চেষ্টা করছে।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলে অমিত—বুঝতে পারছ, বিকেল হয়েছে ?

রানু—বিকেল হয়েছে ? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

অমিত হাসে—কিন্তু আমার যে দুপুরের খাওয়াটা বাদ গেল, সেটা কি বুঝতে পেরেছ ?

চমকে ওঠে রানু—অ্যাঁ, ছি, এ কী কাণ্ড করলেন আপনি।

অমিত—আমি করলাম, না তুমি করিয়ে ছাড়লে ?

রানু—আমার একটা কথা রাখবেন ?

অমিত—বলো।

রানু—আপনি খেয়ে নিন।

অমিত—তুমি ?

রানু—আমি শুধু এক গেলাস জল খাব। আপনি একটুও ভাববেন না, এক বেলা উপোসে আমি কাহিল হব না, মরেও যাব না। ওটা আমার খুব অভ্যেস আছে।

অমিত—তা হলে আমিও আজ ওটা অভ্যাস করি।

রানু—তার মানে ? আপনি খাবেন না ?

অমিত—না।

রানু—কেন ?

অমিত—ভাল দেখায় না।

স্তব্ধ হয়ে যায় রানুর সারা শরীর। শুধু দুই চোখে একটা জীবন্ত দৃষ্টি টলমল করতে থাকে। আশ্চর্য-মানুষকে রানু যেন প্রাণের ভিতরের দুটো চোখ দিয়ে দেখতে আর বুঝতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু অমিত চৌধুরীও যেন এক আশ্চর্য-নারীকে দেখছে, মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে তার অপলক চোখের দৃষ্টি। অমিত বলে—কার দেখা পাব বলে এখানে এলাম, আর কার দেখা পেয়ে গেলাম ! একেই বলে দৈব।

রানুর মুখে একটা কুণ্ঠিত ও মৃদু জিজ্ঞাসা বিড় বিড় করে—কার দেখা পাবেন বলে এসেছিলেন ?

হেসে ওঠে অমিত—একটা লেপার্ডের দেখা। সাতদিন আগে সেই লেপার্ড আমারই গুলিতে জখম হয়েছে, একটা পা-ও ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু পালিয়েছে। সাতদিন ধরে ওটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভেলেয়ারা জঙ্গলে ওটাকে শুট করেছিলাম। খবর পাওয়া গেল, পালিয়ে গিয়ে দানুয়া জঙ্গলে ঢুকেছে। দানুয়াতেও দেখা পাওয়া গেল না, শুনলাম, চাতরা জঙ্গলে পালিয়েছে। এইভাবে ওই মরীচিকা লেপার্ডের পিছু ধাওয়া করে ছুটেছি। কাল খবর পেলাম, এই ভঁইসার শাল-জঙ্গলের ভিতরে ঢুকেছে সেই লেপার্ড। চৌকিদার থানাতে রিপোর্ট করেছে, একটা খোঁড়া লেপার্ড গাঁয়ের তিনটে বাছুরকে মেরে আর খেয়ে পুরনো সড়কের একটা ভাঙা কালভার্টের তলায় ঢুকেছে। সে কালভার্ট ওই লছমিথান থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে। আজই দুপুরে সেখানে যাবার কথা ছিল। খুব আশা করেছিলাম, এবার ওটাকে দেখতে পাব আর সাবড়ে দেব। কিন্তু হল না। কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ যে, তুমি আর একটা ভুল করেছ ?

—না, কী ভুল করেছি বলুন।

—একবার ভুলেও নিজের নামটি মুখে আনলে না।

রানু হাসে—আপনিও তো জিজ্ঞেস করেননি।

অমিত—ঠিক কথা। তা হলে বলো, আমিই ভুল করেছি।

রানু—হ্যাঁ। আমার নাম রানু।

অমিত—বেশ নাম। আমার ভয় ছিল, নামটা বুঝি বনলতা-টতা হবে।

রানু—সীতারামপুরের মেয়ে বনলতা হতে যাব কেন ?

অমিত—তুমি হওনি, কিন্তু অনেকেই হয়ে থাকে।

আবার নীরব হয় ডাকবাংলোর বারান্দা। না অমিত, না রানু, দুজনের কারও মুখে কোনও কথা নেই। দুজনের কেউই বোধহয় বুঝতে পারছে না, আর কী বলবার আছে ? আর, এই চুপ করে বসে থাকার পালা ফুরোবেই না কখন ? এ যেন একটা সন্ধ্যার অপেক্ষায় বসে থাকা।

বুঝতে পারা যায়, বিকেলের আলো লালচে হয়ে এসেছে। ঘাসের পর্দার ফুটোগুলো যেন লালচে রঙের বুটি। পর্দাটাকে এখন একটা উৎসবের আসরের ঝালর বলে মনে হয়।

রানুর হাতে এখনও সেই সিঁদুর-ডিবে। লক্ষ্মীর পায়ের কাছে ফেলে রেখে আসবার সুযোগ

পাওয়া গেল না। সেই সিঁদুর-ডিবেটাকে, রানুর জীবনের সেই ভয়ানক মিথ্যেটাকে বস্তুটাকে এখনও কেন হাতে ধরে রেখেছে রানু ?

অমি—সিঁদুর-ডিবেটার কী গতি করবে ? লছমিথানে যাওয়া তো হল না।

রানু—আর একদিন যাওয়ার চেষ্টা করব।

অমিত—যদি যেতে না পার ? তবে কী করবে ?

রানুর দুচোখ ঝাপসা হয়ে যায়।—কুঁয়োর জলে ফেলে দেব। আর বলব, তোমার জিনিস তোমাকেই ফেরত দিলাম, লক্ষ্মী-ঠাকরুন, কিছু মনে করো না।

—না, কুঁয়োর জলে ফেলে দেওয়া হবে না, ফেলে দিতে পারবে না। বলতে বলতে চেয়ার থেকে উঠে আসে অমিত। হাতের একটানে সিঁদুর-ডিবেটাকে রানুর হাত থেকে তুলে নেয়। তার পর আর দশটি মুহূর্তও লাগে না। এক টিপ সিঁদুর তুলে নিয়ে রানুর সাদা সিঁথিতে ঘষে দেয় অমিত।

—এ কী ? আপনি এ কী অদ্ভুত, ভয়ানক, অসম্ভব, অসহ্য কাণ্ড করলেন ! চেঁচিয়ে ওঠে রানু।

—স্বামীর মত কাণ্ড করেছি। তুমি চিরকাল আমার ঘরে আর আমার কাছে থাকবে।

ফুঁপিয়ে ওঠে রানু—সর্বনাশ !

রানুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে অমিত।—একটুও সর্বনাশ নয়। তোমাকে সুখী করে রাখার সব দায় আমার।

রানুর মাথাটা ছটফট করতে থাকে। কিন্তু অমিতের মুখটা ছটফট করে না। রানুর কপালটাকে নিবিড় উষ্ণ একটি স্পর্শ দিয়ে চেপে ধরে। ধীর স্থির শান্ত ও অনড় একটি লুটিয়ে-পড়া স্পর্শ।

রানুর মাথা আর ছটফট করে না। কিন্তু গলার স্বরের সঙ্গে যেন খুব শান্ত একটা নিঃশ্বাসের মৃদু বাতাস মিশিয়ে দিয়ে কথা বলে রানু—ছেড়ে দাও এখন, একটু বসতে দাও। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

কত ব্যস্ত হয়ে, আর কত শক্ত করে দুহাতে রানুর অলস দেহভার ধরে নিয়ে রানুকে চেয়ারের উপরে বসিয়ে দিল অমিত।

রানু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়তে চায়। বার বার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে বার বার ঝুঁকে পড়ছে মাথাটা। আর মনটাও যেন ইচ্ছে করে একটা স্বপ্নের ঘোর পেতে চাইছে।

অমিত ডাকে—রানু !

মাথা তুলে চোখ মেলে তাকায় রানু—কী ?

অমিত—আর মিছে এখানে সময় নষ্ট না করে এখনই রওনা হয়ে যাওয়া ভাল।

রানু আর চমকে ওঠে না। চুপ করে কী যেন ভাবে। তারপর বেশ শান্ত স্বরে কথা বলে—কিন্তু...

অমিত—কী ? কিসের কিন্তু ?

রানু—এখনই নয়, আজও নয়, কাল সকালে, কিংবা খুব ভোরে।

অমিত—কেন ?

রানু—ওখানে একবার যেতে হবে।

অমিত—কী আছে ওখানে ? কোনও ধন-রত্ন ?

রানু হাসে—আছে।

অমিত—কী বললে ? আছে ?

রানু—হ্যাঁ। আমার একটি ছোট বাক্স আছে। সেই বাক্সের মধ্যে নরু মামা আর জ্যোৎস্না মামির ফটো আছে। মিনু টুলু আর ভুলুর ফটো আছে। শোভনার একটা চিঠি আছে।

অমিত—তবে যাও, জিনিসগুলো নিয়ে চলে এসো।

—এখনই চলে আসতে ভয় করবে।

—কিসের ভয় ?

—গিরিধারীর বউ যদি দেখে ফেলে আর জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ ? তবে কী বলব ?

—বলবে... ।

—না না, কী দরকার। মিথ্যে কথা কিংবা সত্যি কথা, কিছুই কাউকে না বলে চুপ করে চলে আসাই ভাল।

—তবে চলো, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি!

—না, আমি একাই যেতে পারব। ওই তো ছোট্ট মাঠ, আর ওই তো সেই শিমুল গাছ।

—আচ্ছা, মনে থাকে যেন, আমি খুব ভোরেই গাড়ি নিয়ে তৈরি হয়ে ফটকের সামনে এই সড়কে তোমার অপেক্ষায় থাকব।

—মনে থাকবে।

—রানু!

—কী?

—আর একটা ভুল করেছ তুমি। ভুলেই গিয়েছ।

বুঝতে আর ভুল করে না রানু। শাঁখ না বাজুক, রানুর জীবনের মিথ্যে সিঁদুরকে সত্যি সিঁদুর করে দিয়েছে যে আশ্চর্য মানুষটি, তার এই অভিযোগ যে পুরুষমানুষের সত্যি ভালবাসার একটি দাবির আহ্বান।

বুঝতে একটুও দেরি হয় না রানুর। রানু বলে—কাছে এসো।

ঘাসের পর্দার ফাঁকে ফাঁকে ঝিলমিল করে বুটি-বুটি লালচে রোদের আভা। রানু বলে—আসি এখন!

অমিত—এসো।

বারান্দার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অমিত, তার একলা জীবনের স্বপ্নটা যাকে আর যেমনটি পেলে সবচেয়ে বেশি সুখী হবে, ঠিক তেমনটি একজন চলে যাচ্ছে। মাঠের শিমুল গাছের ছায়া পার হচ্ছে।

আর, শিমুল গাছের ছায়া পার হয়েই একবার থমকে দাঁড়ায়, মুখ ফিরিয়ে ডাকবাংলার দিকে তাকায় রানু। হ্যাঁ, যা ভেবেছে রানু তাই হয়েছে। আশ্চর্য-মানুষটি তখনও সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু ওই ঘেন্নার ঘরে ঢুকতে যে একটুও ইচ্ছে করে না। কিন্তু উপায় নেই। ফটোগুলি নিতে হবে, আর রাতটাও কাটাতে হবে।

কখন সন্ধ্যে হল আর ঘনিয়ে গেল বুঝতে পারে না রানু। কখন ঘরের ভিতরে নাকডাকা শব্দটা ঘনিয়ে উঠেছে, তাও জানে না। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রানু, যদিও মাঝরাতের আকাশের তারা গুনে গুনে জেগে থাকবার কোনও ইচ্ছা নেই রানুর মনে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বারও কোনও ইচ্ছে নেই। শুধু ভাবতে ভাল লাগে আর জানতে ইচ্ছে করে, আশ্চর্য-মানুষটি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে, না চেয়ারে বসেই রাত জাগছে। ভুল হয়েছে, বিচ্ছিরি ভুল, আসবার আগে একটু বলে আসা উচিত ছিল, তুমি কিন্তু রাত জেগে বসে থাকবে না।

জানালার কাছে, বাইরের অন্ধকারের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে একটা পথ হারানো গরু বোধ হয় ধুঁকছে। একটা অদ্ভুত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে ওঠে রানু। কী এটা? মানুষ বলে তো মনে হয় না।

রানু বলে—কে?

মানিক বলে—আমি।

রানু—শিগ্‌গির চলে যাও।

মানিক—তুমিও চলো।

রানু—সাবধান, বাজে কথা বলবে না।

মানিক—কোনও ভাবনা করো না, তোমার কোনও কষ্ট হবে না। এই দেখো।

রানু—কী দেখাচ্ছ?

মানিক—টাকা।

হাতে ধরা একটা ব্যাগের মুখ খুলে সত্যিই কি যে দেখাচ্ছে মানিক, কিছুই বুঝতে পারে না রানু।

রানু বলে—টাকা ? না, একগাদা ছেঁড়া কাগজ ?

মানিক—তবে ভাল করে দেখো। পকেট থেকে একটা টর্চ বার করে নিয়ে খোলা ব্যাগের ভিতরে আলো ফেলে আর ফিস ফিস করে মানিক—ছত্রিশ হাজার টাকা। আজই গোমোর ব্যাঙ্ক থেকে ক্যাশ নিয়ে ফিরেছি, কিন্তু অফিসে আর যাইনি। তোমারই জন্যে নিয়ে এসেছি এই টাকা।

—সরে যাও, এখনই চলে যাও। তুমি একটা ডাকাত, তুমি একটা মুখ্‌খু, তুমি একটা ভয়ানক সর্বনেশে, তুমি একটা হিংসুটে ছল। বুক-ফাটানো একটা রাগ যেন পটপট করে রানুর এক-একটা পাঁজর ভেঙে দিচ্ছে।

মানিক আবার বলে—রানু !

রানু—ভাল চাও তো, অফিসের টাকা অফিসে জমা করে দিয়ে আর ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে থাক। যাও, যাও, যাও। আর একটাও কথা নয়।

জানালা বন্ধ করে দেয় রানু।

॥ ৫ ॥

কোয়েল নদীর ঢলের জলে ঝাঁপ দিলে ভাল হত কি হত না, রানুর প্রাণে এ প্রশ্ন আর নেই। কিন্তু স্বপ্নে যার ঢেউ দেখা যায়, চোখ বন্ধ করে সেই নদীর জলে ডুব দিয়ে স্নান করেছে রানু, আর চোখ মেলতেই দেখতে পেয়েছে, একটা নতুন পৃথিবীর মাটি আর আকাশে নতুন ফুল ও নতুন তারা হাসছে।

ভালই হল, পুরনো পৃথিবীর মাটিতে গিয়ে আর দাঁড়াতে হবে না। সে পৃথিবীতে শোভনা আছে, শোভনার মত আরও কত মেয়ে আছে, যারা একজনের হাত ধরে নিশ্চিন্ত হয়ে তারই কাছে থাকে। থাকুক। রানুর জন্য সে পৃথিবী শুধু ধুলো আর কাঁটা রেখেছিল। ধুলোতে ক্ষুধার জ্বালা, কাঁটাতে বিষের জ্বালা। কারও হাত ধরে নিশ্চিন্ত হবার সুখটুকু রানুর জন্য রাখেনি। পোড়া কপালটা সামান্য একটু ভাত-কাপড়ের জন্য ভেবে ভেবে আরও পুড়েছে। কারও কাছে শান্ত হয়ে আর শান্তিতে মরে পড়ে থাকবার আশাও ছিল না।

অমিত একটু বেশি স্পষ্ট করে রানুর এই নতুন জীবনের দুটি প্রাপ্তির কথা বলে, দুটি সুখের কথা। অস্বীকার করে না রানু, অস্বীকার করে কিছু বললে যে খুব মিথ্যা বলা হবে। এ জীবনে যে দুটি সুখের কোনওটিই ছিল না, এ জীবনে অমিত চৌধুরীর ভালবাসার এই ঘরে সে দুটি সুখকে আশার চেয়েও বেশি করে পেয়েছে রানু।

যেদিন কোলিয়ারি দেখতে যায়, কিংবা রামগড়ের ব্যাঙ্ক বাজার কিংবা ডাকঘরে যায় অমিত, সেদিনের একটা-দুটো বেলা অবশ্য রানুকে একলা থাকতে হয়। কিন্তু তা ছাড়া কোনওদিন আর কোনও বেলাও না। অমিতের সঙ্গে প্রায় সারাক্ষণ এক হয়ে মিশে থাকতে হয়। একটি মুহূর্তও রানুকে কাছ ছাড়া করতে কিংবা চোখের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চায় না অমিত।

দেখতে খুব সুন্দর এই বনবিহার। রঙিন কাঠ আর কাচের জানালা। ছোট-বড় সাতটা ঘর। মাঝের ঘরটি সব চেয়ে বড়। সে ঘরে শুধু একটি খাট আর দেয়াল ঘেঁষে একটা মিরর। সামনের দিকের ঘরে অনেক আসবাব, সোফা কোচ আর চেয়ার। কিন্তু তার পাশের ঘরটা হল একটা বোঁটকা দুর্গন্ধের ঘর, দরজা বন্ধ থাকলেও সেই দুর্গন্ধের আভাস নাকে এসে লাগে। ঘরের ভিতরে বাঘ ভালুক ও হরিণের যত চামড়া আর শিং ডাঁই হয়ে আর ছড়িয়ে পড়ে আছে। রানু কতবার বলেছে, ওগুলোকে ওই খেজুর গাছের কাছে মাটির ঘরে সরিয়ে দিলেই তো ভাল হয়।

অমিত বলে—থাকুক না। তুমি বরং ওই ঘরটার কাছে যেও না।

রান্না করার লোক আছে, পাঁড়েজি। বনবিহারের কাজের উপযুক্ত মানুষ। পৈতে আছে পাঁড়েজির ; সেই পৈতে ভাল করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে যখন মুরগি কাটে পাঁড়েজি, তখন দৃশ্যটা রানুকে হাসিয়ে দেয় বটে, কিন্তু সরেও যায় রানু। দেখতে কেমন যেন লাগে, কিংবা ভাল লাগে না।

ঘরদোর পরিচ্ছন্ন করবার জন্য ঝাড়ুদার এক চাকর আছে। এই চাকরটাকে জমাদার বলে ডাক দেয় অমিত। যে ঝাড়ু দিয়ে বাড়ির ড্রেনের জল টানে জমাদার, সেই ঝাড়ুটাকে হাতে নিয়ে ঘরের মেঝের ধুলো সরায়। রানু বলে, ওকে আর ডেকো না, ঘরদোর পরিষ্কার করতে হলে আমিই করব।

অমিত বলে—না, ওটা তোমার কাজ নয়। তোমার কাজ হল...।

ঘরের ভিতরে ঢুকে মেঝের উপর ঝাড়ু চালায় জমাদার, দেখতে ভাল লাগে না রানুর। কিন্তু অমিতের কথা শুনে রানুর চোখ দুটো হেসে ওঠে। একটা দুটো ঘণ্টা কেন, দশটা মিনিটও রানুর সঙ্গ ছাড়া হতে চায় না অমিত। বনবিহারে থাকা রানুর এই জীবন যেন অমিত চৌধুরীর বুকেরই ভিতরে একটি কুঠুরিতে থাকা একটা নিশ্চিন্ততা।

সেদিন প্রথম যেদিন রানুকে নিয়ে অমিত চৌধুরীর গাড়ি জঙ্গলের রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেদিন বুকের ভিতরে ছোট্ট একটু ভয়ের ছায়া শিউরে উঠতে থাকলেও, কী ভালই না লেগেছিল রাস্তাটাকে দেখতে। শাল-জঙ্গলের মাথার উপর ভোরের আলোর আভা লেগেছে, তিতির ডাকছে, অমিতের একটা হাত রানুর কাঁধের উপর পড়ে আছে, আর-এক হাত গাড়ি চালাবার চাকাটার উপর। রাস্তাটা যেন রানুর নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত জীবনের একটা শান্ত নীরব অভ্যর্থনার পথ।

কুঁয়ো থেকে জল তোলবারও চাকর আছে, তাকে তিন-নম্বর বলে ডাক দেয় অমিত। পাঁড়েজি বোধ হয় এক-নম্বর, জমাদার দু-নম্বর। এই তিনটি নম্বর মানুষেরও থাকবার ঘর আছে, বনবিহারের কাঠের ফটক থেকে একটু দূরে। অমিত যেদিন বাইরে যায়, সেদিন ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আর এই ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে কতবার দেখতে পেয়েছে রানু, ওই তিনজন নম্বর-মানুষের তিনটি মাটির ঘরের সামনে খোলা আঙিনার উপর ছুটে ছুটে খেলা করছে তিন-চারটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে। আঙনাতে বাঁশের খুঁটো আছে, এক খুঁটোর মাথা থেকে আর এক খুঁটোর মাথার সঙ্গে বাঁধা হয়ে দড়ি ঝুলছে। সে দড়িতে ছেঁড়া শাড়ি আর আস্ত শাড়িও ঝুলে দুলে শুকোচ্ছে। বুড়িটি কে? জমাদারের মা বোধ হয়। ওই কালো মেয়েটি কে? তিন-নম্বরের বউ বোধ হয়। আর হেসে ঢলে পড়ছে, হাত তুলে কাকে যেন ডাকছে, যার কানে মস্ত বড় ঝুমকো দুলছে, সে মেয়ে নিশ্চয় জমাদারের বউ।

পাঁড়েজি কী শুধু মুরগি কাটে আর রাঁধে? তা তো নয়। আজ হরিণের মাংস, কাল খরগোসের মাংস। এবেলা যদি তিতিরের মাংস রাঁধে তো ওবেলা হরিয়ালের মাংস রাঁধে। বনবিহারের রান্নাঘরের আঙিনাতে পাখির পালক জমে জমে একটা টিবি হয়ে উঠেছে। বাতাস বইলে ফুরফুর করে, কিংবা ছটফটিয়ে উড়তে থাকে নানা রঙের পালক। মাংসের কিছু না-কিছু, অন্তত দু'চার টুকরো কাঁচা-কাঁচা ভাজা না থাকলে অমিত চৌধুরী ভাত মুখে তুলতে পারে না। ভাতই বা কতটুকু খায় অমিত? বড় চামচের বড় জোর তিন-চার চামচ। ডাল-তরকারি দরকার হয় না, শুধু তেল ঝাল আর পেঁয়াজ দিয়ে কষা এক বড় বাটি মাংস খেতে পেলেই সবচেয়ে খুশি হয়। অমিত বলে—এই এত বেশি কষা মাংসকে তুমি কাঁচা মাংস বলছ, রানু? কিন্তু ইংলিশ স্টেক কখনও দেখেছ কি? সে তো বলতে গেলে, শুধু একটু তাতিয়ে নেওয়া মাংস, আধকাঁচারও বেশি কাঁচা।

এক একদিন শুনতে পায় রানু, পাঁড়েজির সঙ্গে কথা বলছে তিন-নম্বর—আজ হাঁকোয়া আসবে।

ওরাওঁদের গাঁ থেকে লোকজন আসে। জঙ্গলের কোথায় যেন মাচান বাঁধা হয়েছে। লোকগুলো জঙ্গল ঘিরে হল্লা করবে আর জানোয়ার খেদাবে। জানোয়ারগুলো কোনওদিকে পালাবার পথ না পেয়ে মাচানের কাছের খোলা পথ ধরে ছুটে পালাবে। মাচানে বসে বন্দুক তুলে গুলি করবে অমিত, আর অন্তত একটা-দুটো চিতল হরিণকে রক্তে রাঙিয়ে দিয়ে পথের উপর লুটিয়ে দেবে।

শিকার থেকে যখন ফিরে আসে অমিত, হাঁকোয়াদের কাঁধের বাঁশের সঙ্গে দড়িবাঁধা হয়ে ঝুলতে ঝুলতে মরা জানোয়ারও আসে। অমিত ডাক দেয়—এসে দেখে যাও, রানু। কী চমৎকার একটা চৌশিঙ্গা।

ঘরের ভিতর থেকে রানু সাড়া দেয়—তুমি দেখ।

শুধুই কি চৌশিঙ্গা? এইভাবে হাঁকোয়াদের কাঁধের বাঁশে ঝুলে ঝুলে অমিতের শিকার-করা কত জন্তুই তো এল। অমিত রানুকে ডেকে ডেকে আর বলে বলে বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনটা আসল চিতল

হরিণ, কোনটা নেহাতই একটা বুড়ো সম্বর, আর কোনটা একেবারে কচি একটা কাকর হরিণ। চেঁচিয়ে ওঠে অমিত—এটা বনছাগল নয়, রানু। এটা হল কাকর, রামায়ণে যাকে মায়ামৃগ বলা হয়েছে।

পায়ে বুট জুতো, শক্ত খাকি জিনের ব্রিচেস আর চিমড়ে কাপড়ের কামিজ, অমিত চৌধুরীর শিকারি চেহারাটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে রানু, ভিন্ন সাজ পরলে মানুষের চেহারাও এত ভিন্ন হয়ে যায় কেন ?

রানুর নিজের সাজও তো আর সেই সাজ নয়। কখনও কি বুঝতে চেষ্টা করেছে রানু, এই ভিন্ন সাজে তারও চেহারাটা ভিন্ন হয়ে গিয়েছে কিনা ?

বুঝতে চেষ্টা করেনি রানু, মিররের সামনে দাঁড়িয়ে একদিন বুঝেই ফেলেছে। রানুকে এই সাজে আজ দেখতে পেলে শোভনা কি রানুকে চিনতে পারবে ? না, বিশ্বাস করতেই পারবে না যে, রানুর আবার এরকম একটা চেহারা হতে পারে।

কিন্তু সত্যিই যে হয়েছে। রানু যদি দু'হাত দিয়ে চোখ-মুখ ঢেকে আর আঙুলের ফাঁক দিয়ে মিররের দিকে তাকায়, তবে নিজেই নিজেকে চিনতে পারবে না। গায়ে খুব ছোট চোলির মত একটা ব্লাউজ, যার হাতও নেই ঝুলও নেই। বুকের শুধু মাঝটুকু ছাড়া গায়ের আর সবই খোলা। পেট কাঁধ পিঠের প্রায় সবই খালি। রানুর গায়ে বাজে লজ্জার কোনও রাখা-ঢাকা সাজ পছন্দ করে না অমিত। শাড়িটাও খুব মিহি সুতোর জালির মত একটি ফিনফিনে আবরণ, যেন গায়ের রঙের আভার সঙ্গে গায়ের গড়ন-ধরনের আভাসও দেখতে পাওয়া যায়, দেখতে ভালবাসে অমিত। অমিতের পছন্দের প্রায় সবই মেনে নিয়েছে রানু। সায়া হবে খুব খাটো। খোঁপা কিংবা বেণী না বাঁধলেই ভাল। শ্যাম্পু করে ফোলানো আর ফাঁপানো চুলের নরম চিকণ বোঝাটাকে শুধু এক পাক দিয়ে একটু গুটিয়ে নিয়ে আর তুলে নিয়ে কাঁধের একদিকে ফেলে রেখে দিতে হবে। আলগা চুলের সেই গোছা ঘাঁটতে আর মুঠো করে ধরতে ভালবাসে অমিত। যা বলেছে অমিত, তাই করেছে রানু।

কিন্তু এর মধ্যে ভাবনা করবার কী আছে ? আলমারির ভেতরে স্তর করে সাজানো আছে কত ঢাকাই, টাঙ্গাইল, শান্তিপুরি আর বিষ্ণুপুরি। রঙিন তাঁতের শাড়ি, রঙিন সিল্কের শাড়ি। পুরো বারো হাত দীর্ঘ মাদ্রাজি শাড়ি। অমিত যখন বাড়িতে থাকে না, তখন শাড়িগুলি যত ইচ্ছে তত পরতে পারা যায়। দশ মাসের মধ্যে যত শাড়ি কিনে এনেছে অমিত, তত শাড়ি দশ বছর ধরে যখন-তখন পরেও ফুরিয়ে দিতে পারা যায় না।

অমিতের পছন্দের যেন অন্ত নেই, সেই পছন্দের বিচিত্রতারও অন্ত নেই। পছন্দটা বোধ হয় অমিতের রক্তেরই একটা তৃষ্ণার অভিরুচি। সেই তৃষ্ণাকে সুখী করে দিয়ে সুখী হয় রানুর প্রাণ, শরীরটাও নিশ্চয়। ভুলতে পারে না রানু, এই সেদিনও, যেদিন বিকাল হতেই শিকারে বের হয়ে গেল অমিত, সেদিন মাঝঘরের বিছানাতে শুয়ে এই ঘরেরই প্রথম রাত্রিটার কথা মনে পড়েছিল। অমিতের মুখের ভাষাটা একটু বেশি স্পষ্ট, শুনতে একটু কেমন যেন লেগেছিল, এই মাত্র। কিন্তু একটুও তো কেমন-যেন বলে মনে হয়নি অমিতের সেই দুই হাতের সেই আদর।

রানুর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কী যেন ভেবে নিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছিল অমিত—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, রানু ?

রানু—বলো।

—তোমার কী ছেলেপুলে কখনও হয়েছিল ?

—না।

—কেন ?

—হওয়া অসম্ভব, তাই হয়নি।

—এই বয়েস পর্যন্ত তা হলে শুধু এমনিতেই...

—হ্যাঁ।

—একটা দাগও পড়েনি ?

—না।

অমিতের হাত দুটো হঠাৎ দুরন্ত আবেগে ব্যাকুল হয়ে রানুকে জড়িয়ে ধরে ; রানু যেন কুড়িয়ে-পাওয়া একটি খাঁটি মানিক। আর, বেশ অদ্ভুত একটা কথাও বলে অমিত—ওসব ম্যাট্রিক পাশ লতা-টতার চেয়ে তুমি অনেক খাঁটি। অনেক অনেক।

অমিতের পছন্দের উৎসবটাও শ্রান্ত কিংবা ক্লান্ত হয়নি। শেষরাতের দিকে শুধু একটু ঘুমিয়ে নেবার সময় পেয়েছিল রানু। আর সকাল বেলা ঘুম ভাঙবার পর বিছানার চাদরে রানুর এই পঁচিশ বছর বয়সের শরীরটারই প্রথম কষ্টের একটা ছাপ দেখতে পেয়েছিল। চাদরটাকে তখনি গুটিয়ে পাকিয়ে খাটের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল রানু। কিন্তু তবু তো একটুও খারাপ লাগেনি, বরং ভালই লেগেছিল।

এই দশ মাসের মধ্যে আরও ভাল লেগেছে কতবার। দিনে রাতে সন্ধ্যায় ও সকালে, অনেকবার। কিন্তু সময়ের চেয়ে অসময়ই যেন অমিতের বেশি পছন্দ।

সেদিনের পর আজ, দশটি মাস পারো হয়ে গিয়েছে, অমিতের আদরের ভালবাসা আর ভালবাসার পছন্দ বরং আরও বেড়েছে একটুও কমেনি। অমিত নিজেই স্বীকার করে আর বলে—এখন আমার জীবনের ভালবাসার বস্তু বলতে শুধু দুটি বস্তু নয়, তিনটি।

রানু—তার মানে ?

অমিত—তার মানে, আমার রিঠুয়া কোলিয়ারি, আমার এই দোনলা ম্যানটন, আর তুমি। আমার কোলিয়ারি আর বন্দুক যেমন পয়া, তুমিও তেমনি পয়া।

রানু হাসে—তোমার ভালবাসার আরও একটা বস্তু আছে।

অমিত—কী ?

রানু—মনে করে দেখো।

অমিত—মনে করতে তো পারছি না !

রানু—আধা-কষা মাংস।

হেসে ফেলে অমিত—তা বলতে পারো।

রানু—তোমার আর একটিও ভালবাসার বস্তু আছে।

অমিত—আর একটিও না, অসম্ভব, থাকতেই পারে না।

রানু—আছে।

অমিত—মনে তো পড়ছে না !

রানু—ব্র্যান্ডি।

অমিত—ওটা তো বস্তু নয় রানু, ওটা ওষুধ। তোমারও মাঝে মাঝে ওষুধটা একটু-আধটু...

রানু—ওষুধের পায়ে নমস্কার, আমার কোনও দরকার নেই।

অমিত—কিন্তু ওষুধ খেয়ে কি আমি চেঁচাই আর লাফাই ?

রানু—না।

অমিত—তোমাকে কোনওদিন কোনও মুহূর্তে একটুও তুচ্ছ করেছি ?

রানু—না।

অমিত—তবে কেন ঠাট্টা করছ রানু ? খিদে বাড়ায়, খেতে ভাল লাগে, তাই ওই ওষুধ খাই।

রানুর খুব কাছে এগিয়ে আসে অমিত, বেশ গম্ভীর হয়ে আর একটা কথা বলে—বিশ্বাস করো, ওই ওষুধ তোমাকে আদর করবার খিদেও বাড়িয়ে দেয়।

হাসতে চেষ্টা করে রানু—ওষুধের গুণ ভালই বলতে হবে।

রানুও কী কোনও ওষুধ খায় না ? খায়, খেতে হয়, না খেয়ে উপায় নেই। অমিত বলেছে, ও বিষয়ে তোমার সাবধান থাকতেই হবে, রানু। আমার বনবিহারকে একটা পোলট্রি করে তুলতে পারব না। তাতে যেমন আমার, তেমনই তোমারও জীবনের কোনও সুখ বাড়বে না।

এই দশ মাসের মধ্যে দু'বার সেই ওষুধ খেয়েছে রানু। ওষুধের বড়ি মুখের কাছে তুলতে গিয়ে হাত কেঁপেছে, দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছে, বুকের ভেতর থেকে উথলে উঠেছে একটা শুকনো নিঃশ্বাস। যাকগে, খাওয়াই ভাল। বেশি স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। অমিতের আদরের জগতে থেকে

সুখী হতে হলে, অমিত যা চায় তাই করতে হবে। অমিত যাতে সুখী নয়, তাতে রানুর সুখী হবার কোনও অর্থ হয় না। কোনও ভয় নেই, ভাবনা নেই, খেয়ে পরে নিশ্চিন্ত হয়ে অমিতের ভালবাসার কাছে জীবনের দিনগুলি পার হয়ে যাচ্ছে। পার হতে থাকুক।

এই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে একটু অস্বস্তি বোধ করতে হবে, একটু চমকে উঠতে হবে, অমিতের দু'একটা অদ্ভুত কথার মানেও হয়ত বুঝতে পারা যাবে না। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? রানুর ভাগ্যটাকে তো আর একেবারে নিঃসহায় হয়ে আর চারদিকের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে কোনও জ্বালা সহ্য করতে হবে না।

পাঁড়েজি জানে, জমাদার জানে, চাকর তিন-নম্বরও জানে, বাবু শিকার করবার জন্যে কোথায় যেন গিয়েছিলেন, সাতদিন বাড়িতে ছিলেন না, তারই মধ্যে একদিন কোনও এক বাবুর বাড়িতে খুব সুন্দর একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে বিয়ে করে আবার ফিরে এসেছেন।

পাঁড়েজি জিজ্ঞাসা করেছে—মাঈজি, আপনাদের দেশ কোথায়?

রানু বলে—সীতারামপুর।

পাঁড়েজির মা জিজ্ঞাসা করে—বহুজি, তোমার বাবা আছেন? মা আছেন?

রানু বলে—না।

পাঁড়েজির মা চোখ টান করে বলে—তাই তো!

বুঝতে পারে রানু, কী বলতে চায় পাঁড়েজির মা। বাপ-মা থাকলে কি তারা মেয়েকে এই জঙ্গলে পাঠাতে রাজি হত? কখ্খনও না। বুড়ি তো জানে না যে, এই জঙ্গলই হল রানুর জীবনের একমাত্র নির্ভয় নিরাপদ আশ্রয়। এক নতুন জগৎ। পুরনো জগতের ধুলোতে দমবন্ধ হয়ে মরে গিয়ে রানুর জীবনটা এই নতুন জগতে এসে পুনর্জন্ম লাভ করেছে।

আশ্চর্য-মানুষটির ওই চওড়া বুকের ভিতরে তো কোনও ফাঁকি নেই। রানুকে নিতান্ত একটি প্রিয় সঙ্গিনী বলে মনে করে না অমিত, ঘরণী স্ত্রী বলেই মনে হয়। একদিন একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে কোলিয়ারির কম্পাসবাবু এসেছিলেন। অমিতের কাছে কাগজ-পত্র রেখে দিয়ে চলে গেলেন, ফটকের দিকে সাইকেলটার কাছে। অমিতই হঠাৎ একটা ডাক দেয়—কম্পাসবাবু, একবার এদিকে আসুন। ছুটে আসেন কম্পাসবাবু—আজ্ঞে, বলুন স্যার!

অমিত বলে—আমার স্ত্রীর জন্যে কয়েকটা জিনিস কেনবার দরকার আছে। আপনি আজই একবার রামগড় বাজারে গিয়ে চক্রবর্তীর দোকান থেকে কিছু কসমেটিক্স্ কিনে আজই পাঠিয়ে দিন।

কম্পাসবাবুর হাতের কাছে ফর্দ-লেখা একটা কাগজ এগিয়ে দেয় অমিত—আজই পাঠাতে অসুবিধে থাকলে কাল পাঠিয়ে দেবেন...হ্যাঁ, চক্রবর্তীকে বলবেন, আমার স্ত্রীর জন্য কিছু বই চাই, অর্থাৎ নভেল-টভেল, যে বই মেয়েরা পড়তে বেশি ভালবাসে।

সেদিনই দুপুরবেলা, যখন ঘরের ভিতরে একটা চৌকির উপর বসে অমিত তার প্রিয় পয়া দোনলা ম্যানটনের কলকব্জা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, তখন অমিতের কাছে এসে অমিতের গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রানু।

অমিত বলে—এই তো চাই।

রানু হাসে—আমিও তো চাই; কিন্তু কেন, তা বলব না।

আমার স্ত্রীর জন্যে; অমিতের মুখের এই কথাটি যে রানুর জীবনের একটি সফল স্বপ্নের কলরব। কোনও কুণ্ঠা না রেখে, একেবারে মুক্তকণ্ঠে বলে দিয়েছে অমিত, জঙ্গলবাড়ি এই বনবিহার এখন স্বামী-স্ত্রীর জীবনের ঘর। নিশ্চয় সবারই কাছে ওকথা বলে অমিত, বলেছে অমিত। তা না হলে পাঁড়েজির মা কেন জিজ্ঞাসা করবে, বহুজি, তোমার দেশ কোথায়? আর জমাদারের বউ বা কেন এসে বলবে, যেমন তোমার স্বামী, তেমনই তুমি, দুজনেই বড় সুন্দর। তিন নম্বরের বউ মুখে টিপে হাসে—আমি বলব, বাবুর চেয়ে বাবুর বউ ঢের সুন্দর।

মাঝে মাঝে নয়, ক্বচিৎ ও কদাচিৎ কখনও সকালে দুপুরে কিংবা বিকালে অমিত যদি বা এদিকে-ওদিকে শুধু একটু বেড়িয়ে আসবার জন্য গাড়ি নিয়ে বের হয়; তবে একাই যায়। রানু তখন

অমিতের সঙ্গিনী হয় না। বাইরের চোখের কাছে গিয়ে দেখা দিতে রানু চায় না। কিন্তু গোপন হয়ে থাকবার এই দুঃখটাকে একটা দুঃখ বলেই মনে করে না রানু। অমিতও জানে, এই সতর্কতাটুকু মেনে নিতেই হবে, বাইরের আইন আর নীতি যেন বনবিহারের ঘরের সুখটাকে টানা-ছেঁড়া করবার কোনও সুযোগ না পায়। অমিত বলে—আমি কোনও ভয়ের পরোয়া করি না রানু। শুধু একটু সাবধান থাকতে চাই, যেন তোমার গায়ে বাইরের কোনও ইতরতার কামড় না লাগে।

আকাশে চাঁদ থাকুক বা না থাকুক, এক-একদিন সন্ধ্যা হবার পর গাড়িতেই অমিতের সঙ্গে বাইরে বেড়িয়ে আসে রানু। বলে—চলো না, জঙ্গলের বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

অমিত বলে—চলো!

কখনও রামগড়ের স্টেশন পর্যন্ত, কখনও বা কোলিয়ারির অফিসের সামনের রাস্তা পার হয়ে বস্তির কাছে গিয়ে গাড়িটা থামে। বস্তিতে কিসের যেন উৎসব, খোলা মাঠের নাচ আর গান চলেছে, মাদল বাজছে।

গাড়ির ভিতরে অমিতের পাশে বসে সে উৎসবের আলো-ছায়ার খেলা দেখতে থাকে রানু। ফোলানো-ফাঁপানো চুলের স্তবক চেপে দিয়ে রঙিন সিল্কের রুমাল মাথাতে বেঁধেছে রানু। কে চিনবে নতুন জীবনের এই রানুকে? গাড়ির ভিতরটাও তো বেশ ছায়া-ছায়া। একটা গোপন নিরালা। রানুর মুখটাকে এখন স্পষ্ট করে দেখে ফেলবে, এত দৃষ্টিশক্তি কারই বা চোখে আছে? উৎসবের আলোর এত কাছে এসেও গাড়ি থেকে নামতে পারে না রানু, কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ নেই রানুর মনে। গাড়ির ভিতরের ওই ছায়া-ছায়া গোপন নিরালা তো অমিতের চওড়া বুকের কাছেরই একটি নিরালা।

কিন্তু জঙ্গলের শাল-মহুয়ার ভিড়ের মধ্যে একটু ঘুরে বেড়াতে অসুবিধা কোথায়? কোনও অসুবিধা নেই। এই জঙ্গলই একটি চমৎকার গোপন নিরালা। রাতের অন্ধকারটা অবশ্য একটা বাধা। কিন্তু রাতের বেলা না বেড়ালেই হল।

এই দশ মাসের মধ্যে অন্তত দশবার একটা অদ্ভুত কথা বলেছে অমিত—না, ঘরের ভিতরে আর ভাল লাগে না।

ঠিক বুঝতে পারে না রানু। কিন্তু মনে হয়েছে, এটাও বোধ হয় অমিতের একটা পছন্দের কথা। কিন্তু ভাবতে পারেনি রানু, আজই বুঝতে হবে, আর এমন করে বুঝতে হবে।

আজ তারিখটা কত? দুপুর বেলা গল্পের একটা বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়বার আগে পঞ্জিকাটাকে একবার দেখে নেয় রানু। আজ চৈত্রমাসের পয়লা।

কিন্তু হঠাৎ ঘরে ঢুকে অমিত রানুর হাত থেকে বইটাকে হেসে হেসে ছাড়িয়ে নেয়।—চলো, একটু বেড়িয়ে আসি!

রানু—এখন, এই অসময়ে?

অমিত—শালবনে একটু ঘুরে বেড়াতে আবার অসময় কিসের? সব সময়ই সময়।

সত্যিই তো, ঠিক কথাই বলেছে অমিত। বনঘুঘু ডাকছে, শালবনের মাথা দুলিয়ে দিয়ে দুপুরের চৈতী হাওয়া ছুটছে। শুকনো ঝরাপাতা উড়ছে, শালফুলের গন্ধও উড়ছে। কোথাও রোদ, কোথাও ছায়া।

বনপথ খুব সরু হয়ে আর ঢালু হয়ে যেখানে আবার ঘুরে গিয়েছে, সেখানে আমলকির ঝোপ, তারই পাশে আবার একটি আমলকির ঝোপ। দুই ঝোপের মাঝখানে ঘাসে-ঢাকা ছোট্ট একটি জায়গা।

থমকে দাঁড়ায় অমিত—চমৎকার জায়গা। রোদ আছে, ছায়া আছে, ঘাস আছে। চুপ করে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে আর আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে রানু। ঘামে ভিজে গিয়েছে কপালটা। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছবার জন্যে রানু হাত তুলতে গিয়ে আর তুলতে পারে না। রানুর হাত ধরেছে অমিত।

চমকে ওঠে রানু। অমিতের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কোনও কথা বলে না। কিন্তু কোনও আপত্তিও করে না।

আবার যখন হাত তুলে রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে চেষ্টা করে রানু, তখন বুঝতে পারে, মাথা থেকে না হোক চুলের গোছা থেকে ঘাসের শিসের দানাগুলিকে ছাড়াতে হবে।

এইবার বুঝতে পারে রানু, এটা হল অমিতের পছন্দের জায়গা।

অমিত ডাকে—শুনছ ?

রানু—বলো !

অমিত—কী এত ভাবছ, বলো তো ?

রানু—ভাবছি, আশ্চর্য-মানুষটির সবই একটু বেশি আশ্চর্য !

অমিত হাসে—সেকথা বলতে পারো।

কিন্তু কথা বলতে গিয়ে রানুর গলার স্বর হঠাৎ একটু অশান্ত হয়ে ছটফটিয়ে ওঠে।—কিন্তু এত বেশি আশ্চর্য সহ্য করতে ভাল লাগে না।

অমিতের গলার স্বর খুব শান্ত—ভাল না লাগলে চলবে কেন, রানু ?

॥ ৬ ॥

ভাল না লাগলেও চলতেই হয়। একটি চৈত্র পার হওয়ার পর আরও চৈত্র পার হয়েছে, আশ্চর্য-মানুষটির পছন্দের সঙ্গে ছন্দ রেখে রানুর জীবনও চলছে। বেশ কয়েকটা বছর কেটে গিয়েছে।

শাল জঙ্গলের ভিতরে, এদিক আর ওদিকে, কত জায়গায় কত নিরালার কাছেই না রানুকে যেতে হল, আর লুটিয়ে পড়তে হল, সেখানে সবুজ ঘাস থাকুক বা না থাকুক। একটা স্রোতের নালার বাঁক, যেখানে পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে স্রোতের জল কলকল করে, সেখানে ভিজে পাথরের পাশে শুকনো বালুর গাদার উপর কোনও ছায়া নেই, আবছায়াও নেই। এটাও আশ্চর্য-মানুষ অমিত চৌধুরীর পছন্দের জায়গা। শালবনের আরও ভিতরে শিয়ালকাঁটার অনেক ঝোপের কাছে শুধু একটা বুড়ো শাল, যার গোড়াতে মস্ত বড় একটা উইঢিপি আর পাথরের একটা চটান। এটাও একটা পছন্দের জায়গা। পাথরের চটানের কাছে দাঁড়িয়ে শুধু একটি কথাই বলেছে রানু—বড্ড ধুলো। তখনি পকেট থেকে রুমাল বের করে পাথরের চটানের ধুলো মুছে দিয়েছে অমিত।

এইভাবেই চলতে চলতে একটানা জীবনের ক্লান্তির মধ্যে আবার একদিন চমকে উঠতে হয়, বুঝতে পারে রানু, জঙ্গলের গভীর রাতের অন্ধকারটাও অমিতের প্রাণের একটি প্রিয় পছন্দ। শিকারের জন্য জঙ্গলের কোথায় যেন মাচান বাঁধা হয়েছে। মাচানের তলায় একটা রোগা মহিষ বাচ্চাকে টোপ করা হয়েছে। অমিত বলে—বেশ ভাল একটা কিল রাখা হয়েছে।

রানু—কী ?

অমিত—একটা রোগা বাচ্চা-মহিষ। ভয় পেয়ে যতই ছটফটিয়ে উঠুক না কেন, দড়ি ছিঁড়ে পালাতে পারবে না।

কথা বলে না রানু। অমিতই রানুর নীরব চেহারার দিকে তাকিয়ে কথা বলে—আজ তো হাঁকোয়ার হল্লা নেই, দরকারও নেই, তুমিও চলো।

চমকে ওঠে রানু—আমি আবার কোথায় যাব ?

অমিত—মাচানে তুমিও থাকবে আমার পাশে।

রানু—অদ্ভুত কথা !

রানুর হাত ধরে অমিত।—ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাচানে একেবারে একা হয়ে বসে থাকতে আর ভাল লাগে না। তুমি থাকলে বেশ লাগবে। তুমিও দেখতে পাবে জঙ্গলের গভীর রাতের অন্ধকারের চেহারা কষ্টিপাথরের চেয়েও কত কালো আর কত ভাল।

কষ্টিপাথরের চেয়েও কালো আর ভাল অন্ধকারের মধ্যে, মাচানের ভিতরে খড়ের পুরু ঠাসের উপর বসে রানু নিজেও ছোট্ট এক টুকরো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

মাচানের কাছে একটা গাছের গোড়ার সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা মহিষ-বাচ্চা বাঘের

ভয়ে ছটফট করছে, শব্দ শুনতে পেয়েছে রানু। কিন্তু সেই মুহূর্তে, একটা শক্ত অন্ধকার যখন রানুকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, তখন রানু ওই ভিতু মহিষ-বাচ্চাটার মত ছটফট করে না।

আশ্চর্য-মানুষটির পছন্দের হাত থেকে জঙ্গলের মাঝরাতের অন্ধকারটাও রেহাই পেল না, এ যে বনের চেয়েও বেশি বুনো পছন্দ! মুখে কোনও কথা না বললেও রানুর বুকের ভিতরে একটা জ্বালা যেন কথা বলে।

শিকারির জীবনসঙ্গিনী হতে হলে জঙ্গলের মাঝরাতের অন্ধকারে মাচানের উপর বসে থাকতে হবে, এটাই কি নিয়ম! মাচানটা কি কোনও ভদ্রলোকের জীবনের ঘর হতে পারে? অমিত চৌধুরীর জীবনের সবই কি শিকার? কিন্তু না, আজ আর এই জিজ্ঞাসার কোনও অর্থ হয় না। মনের জিজ্ঞাসা মনের ভিতরে শক্ত করে চেপে রেখে দেওয়াই ভাল।

আজ এক মাচান, দশটা দিন যেতে-না-যেতে আবার এক মাঝরাতের জঙ্গলের গভীরে আর একটি মাচান। শিকারি অমিত চৌধুরীর জীবনের সঙ্গে মিল রেখে চলতেই থাকে রানুর জীবন। সেই সঙ্গে বুকের ভিতরে জ্বালাটাও চলেছে, যদিও সে জ্বালা কোনও কথা বলেনি, বলেও না।

পাঁড়েজি বলে—আরও একটু ডাল দেব মাঈজি? কথা বলে না রানু, আর বুঝতেও পারে না যে, অলস হাতের আলগা মুঠোতে শুধু ভাত তুলে নিয়ে মুখে দিচ্ছে। দৃশ্যটা পাঁড়েজির চোখে ঠেকেছে।

পাঁড়েজি বলে—একটু মাংস দিই, মাঈজি? সাদা কবুতরের মাংস?

রানু বলে—না।

পাঁড়েজি—আপনার শরীর ভাল আছে তো? জ্বর-টর হয়নি তো মাঈজি?

রানু—না।

কিন্তু না বুঝে একটা কথা ভুল বলে ফেলেছে রানু। কারণ, আজ ভোরে মাচান থেকে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়বার পর কখন যে জ্বর এল আর গা গরম করে দিল, বুঝতেই পারেনি রানু। শুধু বুঝতে পারে, অমিত বাড়িতে নেই, বোধ হয় কোলিয়ারি দেখতে গিয়েছে। আর সাদা কুয়াশার ঘোর ভেঙে দিয়ে রোদের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

সন্ধ্যা হবার পর বাড়িতে আসে অমিত—এ কী? এখনও বিছানাতে কেন? সকালবেলা দেখে গেলাম, ঘুমিয়ে আছ। এখন আবার দেখছি, ঘুমিয়ে আছ!

রানু—জ্বর।

রানুর বিছানার কাছে এগিয়ে আসে অমিত—হঠাৎ জ্বর হল কেন? ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়! কার্তিক মাসের এই কুয়াশাটা হল জ্বরের ওস্তাদ।

রানুর কপালে হাত রাখে অমিত।—সত্যিই তো, বেশ গরম!

রানুর বিছানারই একপাশে বসে রানুর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে অমিত। গলায় ও গালে। বিছানার উপর অলস হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে রানুর যে হাতটা, রানুর হাতেও হাত বোলায় অমিত।

একবার চমকে ওঠে আর চোখ খোলে রানু। তারপরই চোখ বন্ধ করে। চোখ আর খোলে না রানু, খুলতে পারেও না। রানুর প্রাণ যে সত্যিই একটা নতুন অনুভবের আবেশে ভরে গিয়েছে? লজ্জা পেয়ে মরে গিয়েছে বিশ্রী সেই সন্দেহ। স্বপ্নে পাওয়া একটা মমতার নরম হাত রানুর গা বুলিয়ে দিচ্ছে, রানুর প্রাণের সেই জ্বালাও মুছে যাচ্ছে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বুঝতে পারে রানু, মিথ্যে একটা স্বপ্ন। জ্বরের ঘোরে কাহিল হয়ে পড়ে-থাকা রানুর এই গরম গা'টাকেও রেহাই দেবে না আশ্চর্য-মানুষের পছন্দের সাধ।

কী তুমি! হাত দিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে অমিতকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে রানু। গায়ে জ্বালা, বুকে জ্বালা, রানুর চোখেও দুরন্ত জ্বালা।

অমিত বলে—জানই তো!

দু'চোখ বন্ধ করে রানু যেন মন প্রাণ ও শরীরটার সব সাড়া স্তব্ধ করে দেয়। আশ্চর্য-মানুষের আশ্চর্য-সাধও তৃপ্ত হয়।

কার্তিক, অঘ্রাণ, পৌষ সবই চলে চলে ফুরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রানুর জীবনও কি এইভাবে চলে চলে ফুরিয়ে যেতে পারবে ? সেই অবসানের লগ্নটির অপেক্ষায় শান্ত হয়ে পড়ে থাকতে পারা যাবে তো ?

পাঁড়েজি আর জমাদারের গলার স্বরের একটা হল্লা শোনা যায়। ঘরের বাইরে এসে দেখতে পায় রানু, পাঁড়েজি আর জমাদার বার বার ঢিল তুলে নিয়ে নিমগাছের মাথার উপর ছুঁড়ছে। নিমগাছের ডালে বাবুই পাখির একটা বাসা দুলছে। একটি সাপ সেই বাসা জড়িয়ে ধরে ঝুলছে।

সরে যায় রানু। এ দৃশ্য আর বেশিক্ষণ দেখে কোনও লাভ নেই। বাসার ভিতরের পাখিটা তো পালিয়ে যেতে পারবে না। এখন আর পালিয়ে যাবার সাধ্যিও নেই। বাসার ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে দিয়েছে সাপটা।

আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে আয়নাটার কাছে এসেও আনমনা হয়ে যায় রানু। চিরুনিটা হাতে তুলে নিতে ভুলে যায়।

ওদিকে সীতারামপুর পর্যন্ত আঠারো বছর, এদিকে পাঁচটা বছর, মাঝে রত্না সিমেন্টের একটা এক-ঘরের নরকের মধ্যে সাতটা বছর, তবে কত হল বয়সটা ? ত্রিশ হয়েই গিয়েছে। কিন্তু আর কী দরকার ? বয়সটাকে আর একত্রিশ করে কোনও লাভ নেই।

শুনেছে রানু, এখান থেকে বেশ দূরে কোথায় যেন দামোদর আছে। বোধ হয় দূর বলেই বর্ষার দামোদরের জলের শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু সেই জল নিশ্চয় একটা জ্বালার মানুষকে ভাসিয়ে ডুবিয়ে আর পাথরের উপর আছড়ে দিয়ে ভাল মরণসুখ দিতে পারে।

কিন্তু রেল-লাইনও কি খুব বেশি দূরে ? মাঝে মাঝে জঙ্গলের বাতাসে ট্রেনের চলার যে শব্দ ভেসে আসে, সে তো ট্রেনের চাকার শব্দ। খুব শক্ত চাকা, তার ভারও আছে ধারও আছে। পিষে দিতে পারে, কেটে দু' টুকরো করে দিতেও পারে।

ঘরের ভিতরে খাটে শুয়ে নয়, বাইরে বারান্দাতে চেয়ারে বসে নয়, রানুর এখন জানালারই কাছে দাঁড়িয়ে মনে মনে নিজের সঙ্গে এইসব প্রাণের কথা বলাবলি করতে ভাল লাগে।

রানুকে একটা অদ্ভুত অভ্যাসেও পেয়েছে। প্রাণের কথাটা মনের সঙ্গে বলাবলি করবার ইচ্ছে হলেই জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়।

আজ সকালে ঘরের ভিতরে অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করেছে রানু, জানালার কাছে দাঁড়াতে পারছে না। বার বার দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে, কম্পাসবাবু চলে গেলেন কিনা ? গাড়ির চাকা মেরামত করতে কোলিয়ারি থেকে যে মিস্তিরি এসেছে, সে-ই বা চলে যাবে কখন ? ওরা না চলে গেলে তো জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারা যাচ্ছে না ! আজ যে বার বার শুধু ওই দুটি কথা মনে পড়ছে ; দামোদর কত দূরে ? আর রেল-লাইন কত দূরে ? সুখে মরে যাওয়ার চেয়ে মরে সুখী হওয়াই কি অনেক ভাল নয় ?

না, আর বেশিক্ষণ ঘরের ভিতরে বসে ছটফট করতে হল না। দেখতে পায় রানু, চলে গেলেন কম্পাসবাবু আর মিস্তিরি। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় রানু, আর এতক্ষণের ছটফটে অস্থিরতাও একেবারে শান্ত হয়ে যায়।

কিন্তু ও কী ! কে ও ? কে ওরকম করে কথা বলছে ?

নিমগাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে একটা পাখি ডাকছে, একটা পাহাড়ি ময়না।

হাসতে হাসতে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় অমিত—ভয় পেলে নাকি, রানু ?

রানু—না।

অমিত—কিছু বুঝতে পারলে, কী বলছে পাখিটা ?

রানু—না।

অমিত—পাখিটা বলছে, হায়, মার দিয়া !

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অমিত। কিন্তু রানুর বুকটা দুরুদুরু করে।

অমিত বলে—ওটা একটা মজার পাখি। কিছুদিন আগে দেখেছিলাম, রিঠুয়ার রাস্তার পাশে একটা ছাতিম গাছের ডালে বসে ডাকছে। স্টোরবাবু বলেন,—ওটা হল একটা খুনের সাক্ষি পাখি।

চমকে ওঠে রানু। অমিত আবার হাসে।—তবে শোনো। শুনলে মনে হবে, এ যেন একটা

বানানো গল্প। কিন্তু তা নয়। রামগড়ের থানার এস-আই শিউপ্রসাদ আমাকে বলেছে। প্রায় বছর-দুই আগে, রামগড়ের বস্তিতে একটা লোক ছিল, কাঠ-কাটা মজুর। এই ময়নাটাই ছিল সেই লোকটার পোষা ময়না। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসেই দেখতে পেল, সুন্দরী বউটার রক্তমাখা ধড়টা মেঝের মাটির উপর পড়ে ছটফট করছে। কাটা গলাটা প্রায় দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

রানু—লোকটা, না বউটা ?

অমিত—লোকটা। হায় মার দিয়া, হায় মার দিয়া, চিৎকার করতে করতে লোকটা থানাতে ছুটে এল। কিন্তু তার পর লোকটা যে কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। চলে যাবার আগেই বোধ হয় ময়নাটাকে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। ...আচ্ছা, আমি চলি, একবার রিঠুয়া ঘুরে আসি।

চলে গেল অমিত। পাখিটা তখনও ডাকছে। ঝুপ্ করে একটা ঢিল এসে নিম গাছের ডালে লাগতেই উড়ে গেল পাখিটা। কে ছুঁড়েছে ঢিল ? দেখতে পায় রানু, চাকর তিন-নম্বর তখনও ঢিল ছুঁড়ছে। ময়নাটাকে বোধ হয় একটা অলক্ষুণে পাখি বলে মনে করেছে, আর ভয় পেয়েছে চাকরটা।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আর অনেকক্ষণ ধরে পাখিটারই কথা ভাবতে থাকে রানু। মজার পাখিই বটে। নানা রকম স্বরে কথা বলে পাখিটা। কখনও মনে হয়, পাখিটা বুঝি হাসছে। আবার মনে হবে, বুঝি ঠাট্টা করছে। এক-এক সময় মনে হবে, কাঁদছে।

বুঝতে পারেনি রানু, হঠাৎ এত ভয় পেয়ে আর এমন করে ছটফটিয়ে উঠবে রানুর নিজেরই মনটা ! কী অদ্ভুত ভয়, এত ভয় পেলে যে রানুর সব হাড়মাংসও কেঁদে ফেলবে !

নিমগাছের এই ছায়াটাকে দেখতে ভয় করে। কাঁপছে পেঁপে গাছের পাতা, দেখতে ভয় করে। যেমন চোখে ভয়, তেমনিই বোধ হয় মনেও ভয়। রান্নাঘরের দরজার কাছে বসে মিউ-মিউ করছে সাদা একটা বিড়াল, শুনে ভয় পায় রানু, যেন কথা বলছে বিড়ালটা। জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে পাঁড়েজির মা ; দেখতে ভয় করে।

—কে ? কী চাই তোমার ?

পাঁড়েজির মা আসে—কিছু না, বহুজি। তুমাকে একটু দেখছি।

রানুর মনে ছটফটে ভয়টা তখনও বোধ হয় মিটে যায়নি। বিড় বিড় করে কথা বলে রানু—পাখি কথা বলে, তুমি কখনও শুনেছ ?

পাঁড়েজির মা—শুনেছি। শুধু পাখি কেন, গাছও কথা বলে।

রানু—তুমি কখনও শুনেছ ?

—হ্যাঁ, তিনবার শুনেছি।

—শুনে ভয় করে না ?

—ভয় করবে কেন ? ভাল কথা শুনলে কি কারও ভয় হয় ?

—ভাল কথা ?

—হ্যাঁ। গাছই বলে দিবে, কবে ছেলে হবে। বেটা হবে, না বেটি হবে তাও বলে দিবে। পাপ কেটে গেল, ভূত-প্রেত দূরে গেল, গরু এবার দুধ দিবে ভাল, সব বলে দিবে।

—কোন গাছ ? কেমন গাছ ?

—একটি পিপুল গাছ। সে গাছ তুমি কি কখনও দেখ নাই ?

—না।

—তবে যাও, একদিন গিয়ে দেখে এসো।

—কোথায় যাব ?

—ঢের দূর নয় ; এই জঙ্গলেরই ভিতরে, একটা গুপ্তগঙ্গা আছে।

—ধ্যেৎ !

—আছে বহুজি, আছে। কয়লাখাদের বাঙালি বাবুদের বহু-বেটিরাও সেখানে যায়, আর পূজা দিয়ে চলে আসে। সেখানেই আছে ওই গাছ। তুমি মানত করে পূজা দিলেই শুনতে পাবে, কথা বলছে পিপুলদেব।

চলে গেল পাঁড়েজির মা। রানুর মনও আর ছটফট করে না, ভয়টা বোধ হয় রানুর প্রাণের একটা ছটফটে বিস্ময়ের বাতাসে শুকনো ধুলোর মত এককানাচে সরে গিয়েছে। জানালা থেকে সরে গিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, আর ফটক পর্যন্ত এগিয়ে আসে রানু। আবার ফিরে গিয়ে আলমারির ভিতর থেকে শাড়ির থাকের অনেক নীচে চাপা পড়া একটা লালপেড়ে শান্তিপুরিকে টেনে বার করে।

দুপুর হতে এখনও বেশ দেরি আছে। যদি এরই মধ্যে কোলিয়ারি থেকে ফিরে আসে অমিত, তবে বলতে হবে, এখনই চলো। আর যদি ফিরতে দেরি করে, দুপুর হয়ে যায়, তবে বলতে হবে, এই বিকেলেই চলো। আশ্চর্য-মানুষ পেট ভরে ভাত-মাংস খেয়ে নিক, কিন্তু রানু কিছুই খাবে না। এবেলাটা উপোস করে থাকাই উচিত। গুপ্তগঙ্গা দেখে ফিরে আসবার পর যদি দরকার হয়, তবে না হয় কিছু মুখে দেওয়া যাবে। দিতেই তো হবে। মানুষের পেটের মত দুর্ভাগা জন্তু তো পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

অমিতের ফিরতে দেরি হয়নি। ঘরে ঢুকেই হেসে ওঠে অমিত। অ্যাঁ! এ কী! এ যে একেবারে পূজারিণীর সাজ!

ছটফট করে রানু—চলো।

অমিত—কোথায়? কিসের এত ব্যস্ততা!

রানু—এখানে এই জঙ্গলেই কোথায় যেন একটা গুপ্তগঙ্গা আছে!

অমিত—গুপ্তগঙ্গা-টঙ্গা আছে কিনা জানি না।

রানু—পাঁড়েজির মা বললেন, আছে।

অমিত—ওরা তো যে কোনও নালা-টালাকেও গুপ্তগঙ্গা বলে।

রানু—কোলিয়ারির বাবুদের বউরাও তো সেখানে যায় আর পুজো দিয়ে চলে আসে।

অমিত হেসে ওঠে। এইবার বুঝলাম। হ্যাঁ, এক জায়গায় একটা পিপুল গাছের শিকড় ধুয়ে দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে একটা নালা হয়েছে, সেই নালার জল একটা পাথরের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে। বেলে পাঁকের রঙ বেশ লাল। তাই জলের রঙও লাল বলে মনে হয়। স্টোরবাবু কাব্যি করে এর নাম দিয়েছে, ঝরনা চন্দনা।

রানু—বেশ সুন্দর নাম!

অমিত—ওখানে কুলের ঝোপঝাপের মধ্যে যে সব খরগোস আসে সেগুলোও খুব সুন্দর। চোখগুলো যেন লাল টুকটুকে রুবি। আমি একবার পেয়েছিলাম। চারটে নধর সাদা খরগোস এসে নালার জল খাচ্ছিল। আমি ছেড়ে দিলাম এক নম্বরের ছর্‌রা, তাতেই ওই চারটে খরগোস ছিটকে গিয়ে জলের উপর পড়েছিল।

রানুর মুখে ওই এক কথা—চলো।

অমিত বলে—যেতে একটু অসুবিধে হবে। রাস্তাটা বেশ সরু। গাড়িটা হয়ত কোনওমতে...আচ্ছা চলো।

ঝরনা চন্দনা। স্টোর বাবু কাব্যি করে নামটা দিয়েছেন বটে, কিন্তু একটুও মিথ্যে নাম নয়। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে রানু, ঝরনা চন্দনা যেন একলা খুশির একটা স্রোত; লালচে পাথরের গা উপচে ঝরে ঝরে পড়ছে। স্রোতের জল গড়িয়ে এসে একটা দহের মধ্যে পড়ছে। দহের জল কিন্তু একেবারে কাকচক্ষু জল। বড় জোড় একহাঁটু গভীর হবে এই দহ, তলায় বালু আর কাঁকর চোখে দেখা যায়। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে পিপুল গাছটা, যার শিকড় পুজোর সিঁদুর মেখে রঙিন হয়ে রয়েছে। জানে রানু, মনে মনে তৈরি হয়েই আছে, পিপুলদেবের কাছে কী মানত করতে হবে। ছাড়া পেতে চাই, আর কিছু চাই না। পিপুলদেবের শিকড়-ধোওয়া ঝরনা চন্দনার জল মাথায় ছিটিয়ে চলে যায় রানু। তারপর দেখা যাবে, পিপুলদেব সত্যিই কিছু বলেন কিনা। যদি এখনই না বলেন, তবে স্বপ্নে যেন বলে দেন।

ঝরনা চন্দনার কাছে আজ কোনও খরগোস জল খেতে আসেনি; এসেছে রানু। আর অমিত চৌধুরীর হাতে সেই বন্দুকও নেই। তাই রানুর ছায়াটার কাছে আস্তে আস্তে আর ঘুরে-ফিরে বেড়াতে

থাকে অমিত। একটু থামে, গায়ের কামিজ খুলে নিয়ে একটা ঝোপের মাথার উপর রাখে। তারপর আবার গায়ের গেঞ্জি ও সাদা জিনের প্যান্টও খুলে ফেলে। সাজ শুধু ছোট্ট একটি জাঙ্গিয়া।

ঝরনার দহের কাকচক্ষু জলের কাছে এসে দাঁড়ায় রানু। দুটি আঙুল ডুবিয়ে দিয়ে দু'চার ফোঁটা জল তুলে নিয়ে মাথায় ছিটিয়ে দেয় রানু। চুপ করে দাঁড়িয়ে ঝরনার জলের শব্দ শুনতে থাকে। কী মিষ্টি শব্দ, গুপ্তগঙ্গারই জলের স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

আনমনা রানু চমকে ওঠে। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অমিত। এত কাছে যে, অমিতের নিঃশ্বাসের বাতাসটা রানুর গায়ে এসে লাগছে।

অমিত বলে—দহের জল, বড় চমৎকার জল।

কথা বলে না রানু। কিন্তু অমিত বলে—জলে নামতে হবে রানু। তুমিও আমিও। তোমার শান্তিপুরি এখানে এই শুকনো বালুর উপরেই থাকুক।

রানুর চোখ জ্বলে ওঠে, দাঁতেও একটা শব্দ হয়। —না। তুমি সরো।

রানুর হাত ধরে অমিত। জোরে টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয় রানু—তুমি সরো।

রানুর হাত আবার ধরে অমিত। বুঝতে পারে রানু, এইবার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলে অমিতের হাতের মুঠোর চাপে গুঁড়ো হয়ে যাবে রানুর হাত। রানু বলে—হাত ছেড়ে দাও।

অমিত—আগে বলো, তবে ছাড়ব।

রানু—বলছি।

অমিত—কী ?

রানু—তুমি যা বলছ, তাই হবে।

আশ্চর্য-মানুষের পছন্দের উৎসাহটা রানুকে দহের জলে চুবিয়ে খুন করছে, তবু লাল হয়ে যায় না দহের কাকচক্ষু জল। কিন্তু জল খাবার জন্য কুলের ঝোপের একটা খরগোস ছুটে এসেই থমকে দাঁড়ায়, ভয় পায় আর পালিয়ে যায়।

॥ ৭ ॥

বারান্দার একদিকে একটা চেয়ারের উপর বসে, আর যে গল্পের বইটাকে শুধু পঁচিশ বার পড়া হয়েছে, সেটাকেই হাতে ধরে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে রানু। খুব নীল আকাশ, কিন্তু হাজার হাজার পঙ্গপালের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আনমনা রানুর চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে কিনা সন্দেহ, আকাশটা কত নীল আর কত পঙ্গপাল উড়ছে।

অমিত এসে বারান্দার আর-এক দিকে একটা ক্যাম্প-চেয়ারে বসে, আর পা দুটোকে বারান্দার কাঠের রেলিঙের মাথার ওপর তুলে দেয়।

কিন্তু ক্যাম্প-চেয়ারের পায়া মেঝের সঙ্গে খুব জোরে একটা ঘষা খেয়ে যে বিশ্রী শব্দটা করেছে, তাও কী শুনতে পায়নি রানু ? খুব শুনতে পেয়েছে। ভয়ানক বিশ্রী একটা বুনো শব্দ। শুনলে ঘেন্না হয়। মুখ ফেরায় না, অমিতের দিকে একবার তাকায়ও না রানু। কথা বলতে তো ইচ্ছেই হয় না, কথা বলবার কোনও দরকারও নেই। তা ছাড়া, এখন তো কোনও কথা বলা উচিতও নয়। রানু জানে, আজ খুব বেশি ওষুধ খেয়েছে জঙ্গলের ওই অমিত চৌধুরী।

অদ্ভুত এক-একটা রাগের গর্বের ও ঘৃণার ভাষা যেন অমিত চৌধুরীর নেশায় ভরা নিঃশ্বাসের বাতাসের সঙ্গে উথলে উঠছে। ছেঁড়া ছেঁড়া প্রলাপের ভাষা বলে মনে হয়। তবু উৎকর্ণ হয়ে শুনতে ও বুঝতে চেষ্টা করে রানু।

অমিত বলে—দপ্তুরি রঘুনাথ নাকি বড়ই ভালমানুষ। স্টোর কম্পাস, আর আরও অনেকে এই কথা বলে। কিন্তু ব্যাটা রঘুনাথ তো মানুষই নয়। গায়ের রক্ত-মাংসের কোনও জোর নেই, তবু বিয়ে করেছে। ননসেন্স ! যুবতী বউটাও যে কী সুখে ওরকম একটা কাপুরুষের ঘরে পড়ে আছে বুঝি না...হুঁ, রঘুনাথ লোকটা নাকি বড়ই হৃদয়বান মানুষ। ওরে ইডিয়েট, হৃদয় তো স্পঞ্জের মত একটা তুলতুলে বস্তু মাত্র। ওটা থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী ? পুরুষমানুষ হবে পুরুষমানুষ ;

অমিত চৌধুরীর মতো পুরুষমানুষ এই বিশ্বজগতে ক'টা আছে ?

অমিত হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে রানুর মুখের দিকে তাকায়, আর গলার স্বর বেশ চড়িয়ে দিয়ে কথা বলে—খুব দুঃখের কথা রানু, তুমি বেশ অনেকদিন ধরে বড় বেশি অভিমান দেখাচ্ছ, যেন সত্যি তুমি আমার বিশুদ্ধ একটি স্ত্রী। তোমার ভাব দেখে আরও মনে হচ্ছে, যেন তুমিই আমাকে রেখেছ, আমি তোমাকে রাখিনি। তোমার আপত্তির সঙ্গে রোজই আমাকে একটা যুদ্ধ করতে হবে, এটা ভাল নয়, একটুও ভাল নয়।

সিগারেট ধরায় অমিত—সবাই অবিশ্যি জানে যে, আমার বিয়ে হয়েছে, স্ত্রী হয়েছে। আমি নিজেই সবাইকে তাই বলেছি। কিন্তু তাতেই কী তুমি আমার স্ত্রী হয়ে গেলে ?

মুখ ফিরিয়ে কথা বলে রানু—সবার কাছে একথা বললে কেন ?

অমিত—বলেছি আমার নিজের প্রেস্টিজের জন্য আর তোমার একটা সুবিধের জন্য।

রানু—তার মানে ?

অমিত—আমার প্রেস্টিজ মানে আমার প্রেস্টিজ। আর, তোমার সুবিধে মানে, চাকর-বাকরগুলো তোমাকে নিতান্ত একটা মেয়েমানুষ বলে মনে করবে না, তুচ্ছও করবে না।

যেন একটা হঠাৎ রাগের ঝোঁকে ছটফট করে ওঠে অমিত, আর হাতের সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটাকে মেঝের উপর আছড়ে দেয়। তারপরই হঠাৎ আবার একটু নিঝুম হয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে।—আমার প্রেস্টিজের মানে তুমি কী বুঝবে! বরেন উকিল হাসবে, আরও হরেন নরেন অনেকেই হাসবে, কোলিয়ারির স্টাফ আর চাকর-বাকরগুলো মুখ টিপে হাসবে, তা না হলে...।

চেঁচিয়ে ওঠে রানু—তা না হলে কী ? স্পষ্ট করে বলো!

অমিত—তা না হলে এখনই তোমাকে বলে দিতাম, চলে যেতে পারো।

রানু—চলে যেতেই চাই।

অমিত—না, যেতে দেওয়া হবে না। এখানেই থাকতে হবে।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় অমিত। রানুর কাছে এগিয়ে এসে, আর এক হাতের থাবা দিয়ে রানুর কাঁধটাকে আঁকড়ে ধরে।—যদি সত্যিই চলে যাও, তবে যাবার আগে বলবে, কোন চুলোতে যেতে চাও! আমি নিজে তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে চলে আসব। আর তুমিও মাসখানেক পরে একটা টেলিগ্রামে আমাকে জানিয়ে দেবে যে, তুমি কলেরায় মরে গিয়েছ। লোকে যেন বলতে না পারে, রিঠুয়া কোলিয়ারির মালিক অমিত চৌধুরীর স্ত্রী ভেগেছে।

রানুর কাঁধের উপর থেকে হাতের থাবা সরিয়ে নিয়ে অমিত নিজেও সরে যায়। তবু বিড়বিড় করতেই থাকে।—তুমি না বলে কয়ে চলে গেলে যে নিন্দে রটবে, সে নিন্দে তোমার ধরাছোঁয়া পাবে না, শুধু আমাকেই পাবে। লোকে শুধু আমাকেই দেখতে পাবে আর মুখ টিপে হাসবে। এটা শুধু আমারই প্রেস্টিজের ভয়, তোমার কোনও কিছুরই ভয় নয়।

আবার ক্যাম্প-চেয়ারে বসতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে ফটকের দিকে তাকায় অমিত। কাঠবোঝাই একটা মোটর লরি হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলতে চলতে ঠিক ফটকের কাছে এসেই থেমে গিয়েছে। চেঁচিয়ে ওঠে আর এগিয়ে যায় অমিত—এত আপত্তি করেছি, তবু তুমি এপথে গাড়ি নিয়ে এলে কেন, এই ড্রাইভার ?

ড্রাইভার বলে—পারমিট আছে।

অমিত—পারমিট থাকলেই বা কী ? তোমার গাড়ি যে হুমড়ি খেয়ে পড়বে আর মরবে, সেই সঙ্গে তুমিও।

ড্রাইভার—কপালে যদি তাই থাকে তো হবে।

ফিরে এসে আবার বারান্দার ক্যাম্প-চেয়ারে বসে পড়ে অমিত। রাগী আপত্তিটা তবু গজগজ করতে থাকে।—কোথা থেকে এক ব্যাটা নতুন ঠিকেদার এসেছে, মনোহরলাল। জঙ্গলের চারটে বড় বড় কূপ নিলামে ডেকে নিয়েছে। রেঞ্জারের ন্যাওটা ঠিকেদার। যেমন ঠিকেদার নিজে, তেমনই ওর ওই ড্রাইভারটা, দুটোই ত্যাঁদোড়।

বারান্দায় কাঠের রেলিঙের উপর আবার পা তুলে দেয় অমিত।—জানে আমি আপত্তি করেছি,

তবু ইচ্ছে করেই আমার বাড়ির ফটকের কাছে গাড়ি থামিয়েছে। এ শুধু আমাকে একটা ঠাট্টা করবার জন্য। বহুত আচ্ছা, আমিও একদিন দেখে নেব!

অমিতই জানে, কী সে দেখে নেবে একদিন! কিন্তু এখন শুধু দেখতে থাকে, নচ্ছার কাঠবোঝাই লরিটা দাঁড়িয়েই আছে। নড়েও না, চলেও যায় না। ড্রাইভারটার রস খুব বেশি বলে মনে হচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে এই বারান্দার দিকে, রানুরই দিকে তাকিয়ে আছে।

রানুর হাত থেকে বইটা ঝুপ্ করে মেঝের উপর পড়ে যায়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রানু। বারান্দার রেলিঙের কাছে এগিয়ে যায়। কী যেন কী দেখে, রানুর দুই চোখ এই দিনের বেলাতেই চাঁদের আলোতে ভরে গিয়ে হেসে উঠেছে। কাঁপছে হাত, কাঁপছে মাথা, কিন্তু অপলক চোখের আলো একটুও কাঁপে না।

অমিত—তোমার আবার কী হল ? তুমি কী জীবনে একটা মোটর লরিও কখনও দেখনি ?

চলে গেল মোটর লরি, আর রানুও ঘরের ভিতরে গিয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে। ঘুম আসে না, কিন্তু না এলেই বা কী আসে যায়! রানুর প্রাণের ভিতরে একটা স্বপ্ন ঢুকে কথা বলছে, কত অদ্ভুত কথা। পিপুলদেবের কাছে মানত করা হয়নি, কিন্তু পিপুলদেব যে রানুর মনের ও প্রাণের কথাটা শুনে ফেলেছে। ছাড়া পেতে চাই। হ্যাঁ, পাবে। হাত ধরে নিয়ে যাবার মানুষ এসে গিয়েছে। সেই ময়না পাখিটা তো একটা পাখি ছিল না। মানিকের আত্মাটাই রানুকে খুঁজে খুঁজে উড়েছে আর হায় হায় করে কেঁদেছে। না, আর কাঁদতে হবে না। রানু খুন হয়ে গেলেও মরেনি, রানু আজও আছে।

হেসে ফেলে রানু, কিন্তু চোখদুটো জলে ভরে যায়। কী যেন সেদিন বলেছিল মানিক, হ্যাঁ, আমার কোনও গুণ না থাকুক, হার্টও কি নেই রানু! আছে আছে, খুব আছে। মানিকের চেয়ে বড়লোক আর কে আছে ? নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বার ঘর পেতে হলে তোমারই ঘরে যেতে হবে। হার্ট ধোওয়া জল খেয়েই তো মানুষ বাঁচে, অন্য কোনও জল খেয়ে নয়।

মানিক একটু রোগা হয়ে গিয়েছে বলে মনে হল। কিন্তু সেই চোখ আর সেই মুখ। এখনই জানতে ইচ্ছে করে, একটা স্বপ্ন দিয়ে পিপুলদেব বলে দিন না কেন, এতদিন কোথায় ছিল মানিক! কী করে এতগুলি বছরকে সহ্য করতে পেরেছে, আর কেমন করে এই জঙ্গলের ভিতরে একটা কাঁচাখেগো বুনো ঘরে, শুধু মাংসের হরিণ হয়ে পড়ে-থাকা রানুকে খুঁজে বের করেছে। হ্যাঁ, মানিক নিশ্চয় ভুলেও কখনও জিজ্ঞাসা করবে না, কিন্তু রানু নিজেই বলবে, জীবনে কোনও পাপই করেনি রানু, শুধু একটি পাপই করেছিল, তোমাকে দুঃখ দিয়েছিল।

উঠে বসে রানু। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সন্ধ্যা হয়েছে। আকাশে তারা উঠেছে। আর, ফুরফুরে বাতাসও বইছে। ভাবতে ভাল লাগে, এ বুঝি মানিকেরই নিঃশ্বাসের বাতাস।

মানিকের কাছে আর ক্ষমা চাইতে হবে না। ক্ষমা চাইলে রাগ করে হেসেই ফেলবে মানিক। কিন্তু ঝরনা চন্দনা, তুমি যে সত্যিই গুপ্তগঙ্গা, তুমি ক্ষমা করো। আমি ইচ্ছে করে তোমার জল ঘোলা করিনি। একটা রাক্ষুসে অভিশাপ জোর করে আমাকে তোমার জলে নামিয়ে দিয়েছিল।

আবার কবে আসবে মানিক ? কাল আসবে কি ? আসুক না, যখন ইচ্ছে হয় তখনই আসুক। সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা আর রাত, একবার এসে পড়লেই হল।

বুঝতে পারেনি রানু, কখন এই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে অমিত। একটা বাতিকেও হাতে করে নিয়ে এসেছে। ওষুধের একটি বোতলও নিয়ে এসেছে।

বাতি আর বোতল, দুটি বস্তুকেই মেঝের উপর রেখে দিয়ে চেয়ারের উপর শক্ত হয়ে বসে অমিত। ডাক দেয়—কাছে এসো।

রানু—না।

অমিত—যদি জোর করে টেনে নিয়ে এসে কাছে বসাই ?

রানু—চিৎকার করব।

অমিত—যদি গলা টিপে ধরি ?

রানু—তার আগে তোমার হাত কামড়ে ছিঁড়ে দেব।

অমিত—পারবে ?

রানু—না পারি দম বন্ধ হয়ে মরে যাব।

অমিত—তবু কাছে আসবে না ?

রানু—না।

বাতিটার আলো বাড়িয়ে দিয়ে ব্র্যান্ডির বোতল তোলে অমিত। এক দুই তিন, তিনবার তিন ঢোঁক ব্র্যান্ডি গিলে নিয়ে ঢেঁকুর তোলে। দশ মিনিট বিরাম। তারপর আবার।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখতে থাকে রানু, আর অমিত চৌধুরী যেন সন্ধ্যারাতের ফুরিয়ে যাওয়া এক-একটি মুহূর্তকে গুনতে থাকে। কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে অমিত চৌধুরী ? অমিত ডাকে—কাছে এসো।

রানু—না।

অমিত—আসতেই হবে।

রানু—কখ্খনও না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অমিত—তা হলে আমাকেই কাছে যেতে হবে।

ঘুরে দাঁড়ায় রানু—তা হলে আমাকেও সরে যেতে হবে।

অমিত—আমি তোমার মাথাটাকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে দিয়ে ধরে রাখব।

রানু—পারবে না।

অমিত—কেন পারব না ?

রানু—তার আগে আমি এই রাতের অন্ধকারের মধ্যে ছুটে গিয়ে রাস্তা ধরব আর চলে যাব।

অমিত—কোথায় পালিয়ে যাবে ?

রানু—যেখানে ইচ্ছে সেখানে।

অমিত—বাঘের মুখে ?

রানু—বাঘ তো ভাল জন্তু।

অমিত—তার মানে, আমার চেয়ে ভাল জন্তু ?

রানু—সেটা তুমি বুঝে দেখো।

চেয়ারে বসে অমিত। ব্র্যান্ডির বোতল হাতে তুলে নেয়। আবার, এক দুই তিন। আবার ঘরের ভিতরে দুটি ঘণ্টার একটি নিরেট স্তব্ধতা। মাঝরাতের শিয়াল যেন ডেকে ওঠে, তখন আবার বোতল হাতে নেয় অমিত। আর, রানুর সেই তারা-দেখা স্তব্ধ মূর্তির দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—কাছে এসো।

রানু—না।

অমিতের হাত কাঁপে, হাতের বোতলও কাঁপে, সেই সঙ্গে দু'চোখের দৃষ্টিতে কাঁপতে থাকে দুঃসহ একটা আক্রোশ। হঠাৎ মত্ত হয়ে একেবারে জানালার কাছে গিয়ে রানুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সরে যায় রানু, অমিতের মূর্তিটা দেয়ালের সঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে, আবার শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তারপর, আবার এসে চেয়ারের উপর বসে।

শিয়ালডাকা মাঝরাতও ফুরিয়ে যাচ্ছে। ঘরজোড়া একটা স্তব্ধতার দু'দিকে শুধু দুটি রাতজাগা মূর্তি, একজন জানালার কাছে, আর একজন চেয়ারে।

ব্র্যান্ডির বোতল তুলে নিয়ে মুখের উপর উপুড় করে দেয় অমিত। শেষ ঢোঁক গিলে নিয়ে বাতিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার রানুর দিকে। ডাক দেয় অমিত—রাত প্রায় ফুরিয়ে এল। এখনও বলছি, কাছে এসো!

রানু—না।

অমিত—তবে তো তোমাকে এখুনি ফুরিয়ে দিতে হয়!

রানু—শক্তি থাকে তো, ফুরিয়ে দাও।

অমিত—ভুলে যাচ্ছ কেন যে, পাশের ঘরেই আমার দোনলা ম্যানটন ব্র্যাকেটে ঝুলছে ?

রানু—হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছি।

অমিত—তবে নিয়েই আসি।

রানু—নিয়ে এসো।

অমিত—আনছি, এখনই আনছি। একটি গুলিতে বেইমান মেয়েমানুষের এই বড়াই রক্তে ভাসিয়ে দেব। অমিত চৌধুরীর বুকটা ফুলে ফুলে গুমরে উঠতে থাকে। নিঃশ্বাসও ঘড়ঘড় করে।

কিন্তু কাক ডেকে উঠেছে। বাতিটার উপর একটা লাথি ছুঁড়ে দিয়েই ঘর ছেড়ে চলে যায় অমিত।

শেষরাতের সব তারা নিভে গিয়েছে। রানুও ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দাতে এসে দাঁড়ায়। এখন রানুর জীবনের আর তো কোনও কাজ-অকাজ কিছুই নেই। এখন রানুর প্রতীক্ষার চোখ দুটো শুধু ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। কখন আসবে সেই লক্কর মোটর লরি ? রানুর প্রতীক্ষার চোখ দুটো যেন নীরব হয়ে বসে-থাকা একটা ধ্যানেরও চোখ।

বুঝতে পারেনি রানু, কখন এত রোদ আর আলো ফুটে উঠে জঙ্গলের সকালবেলাকে এত ঝলমলিয়ে দিয়েছে।

আর শুনতেও পায়নি, এই সকালে এরই মধ্যে এত কলরব আর এত সাড়াই বা কখন জেগে উঠেছে। ওরাওঁ গাঁয়ের একদল লোক এসে ফটকের কাছে বসেছে আর হাসাহাসি করে গল্প করছে। ওরা বোধ হয় একটা হাঁকোয়া দল। কোথাও বোধ হয় মাচান বাঁধা হয়েছে। শিকারে যাবে শিকারি। রাস্তার ওপারে, ফটকেরই কাছে, গাছের তলায় এসে ভিড় করেছে যারা তাদেরও চিনতে পারে রানু।

এই তো সেদিন, দু'দিন আগে পাঁড়েজির মা এসে রানুকে একটা খুশির খবর শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আর মাত্র দুটি দিন বাকি,—বহুজি, তোমাদের পাঁড়েজির মেয়ে বাপের বাড়িতে আসবে। আহা, মা-মরা মেয়ে, সেই যে চার বছর আগে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল, তারপর আর কোনওদিন বাপের বাড়িতে আসেনি।

নাতনিকে কোলে তুলে নেবার জন্য পাঁড়েজির মা সেই সকালেই গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু কি একা পাঁড়েজির মা ? তিন নম্বরের বউ আছে। জমাদারের বউও আছে, যার হাতে একটা ঢোলক, আর কানে ঝুমকো দুলছে। বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল আছে।

দুটি সাইকেল এসে ফটকের কাছে থামে। কোলিয়ারির দুই ভদ্রলোক এসেছেন। খাতাপত্র হাতে নিয়ে স্টোরবাবু আর কম্পাসবাবু। চেঁচিয়ে হেসে কথা বলছেন কম্পাসবাবু—স্টোরদা, আজ বোধ হয়, একটা খুব ভাল লগনসার দিন।

কী আশ্চর্য, দু'বছর আগে একবার এসেছিলেন যে ফরেস্ট রেঞ্জার, যাঁর নাম বিনয় সান্যাল, তিনিও সাইকেল থেকে নামলেন। আর স্টোরবাবুকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন—অমিতবাবু বলেছেন, এ রাস্তায় মোটরগাড়ি চলতে পারে না। আমি তো দেখছি, বেশ চলতে পারে। এখান-ওখানে একটু বেশি সরু, গাছের একটু গা ঘেঁষে যেতে হবে, এই যা। বুঝি না, অমিতবাবুর কেন এত আপত্তি।

কোলিয়ারির বাবুরা এলে যে-রানু ঘরের ভিতরেই থাকে, সে-রানু আজ কত স্বচ্ছন্দ হয়ে বাইরের এতগুলি দৃষ্টির কাছে নিজেকে প্রকাশ করে দিয়েছে। রানু আজ যেন কোনও চক্ষুলজ্জারও ধার ধারে না।

ভদ্রলোকেরা কিন্তু বেশ একটু সঙ্কোচ বোধ করছেন। রানু বারান্দাতে বসে আছে বলেই এখানে আসতে চাইছেন না। কিন্তু ওঁরা জানেন না, যার কাছে ওঁদের কাজ আছে সে এখনও ঘরের ভিতরে খাটের উপরে একটা পিণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায় সেই লক্কর মোটর লরি। আর সেই মুহূর্তে রানুর সেই ধ্যানের চোখে একটা বিদ্যুতের ঝিলিক হেসে ওঠে।

শুধু একবার ঘরের ভিতরে যায় আর চলে আসে রানু। তিনটি মিনিটও সময় লাগে না। ফটকের কাছে ভিড়-করা সব মানুষের চোখ আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে। হাতে একটা ছোট তোরঙ্গ, গায়ে একটা ছেঁড়া-ছেঁড়া ধনেখালি, কে ইনি ?

ফটকের কাছে এসে মোটর লরির মানুষটির দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়েই ডুকরে ওঠে রানু—কেমন আছ ?

মানিক বলে—ভাল।
রানু—আমি যাব।
মানিক—চলো।
রানু—এখনই যাব।
মানিক—এখনই চলো।
ঘরের ভিতরে খাটের উপরে পিণ্ড হয়ে পড়ে ছিল, যে, সে হঠাৎ জেগে ওঠে, আর দোনলা ম্যানটন হাতে নিয়ে, দুর্দান্ত এক আক্রোশে বাঘের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ফটকের দিকে ছুটে আসে।
স্টোরবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—একী ! কী হল ? কী ব্যাপার ?
সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, সবাই ভয় পায়। কিন্তু রুষ্ট মত্ত আর দুর্দান্ত অমিত চৌধুরীর দোনলা ম্যানটনের সর্বনেশে আঘাত থেকে মেয়েটাকে রক্ষা করতেও তো হবে। স্টোরবাবু, কম্পাসবাবু আর ফরেস্ট রেঞ্জার বিনয়বাবু, সেই সঙ্গে পাঁড়েজিও ব্যস্ত হয়ে রানুর চারদিকে দাঁড়িয়ে রানুকে ঘিরে রাখে। আর, একটা ওরাওঁ হাঁকোয়া একলাফে উঠে এসে অমিতের হাতের বন্দুক চেপে ধরে।
স্টোরবাবু হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আর গলা চেপে চেপে কথা বলেন—আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?
রানু হেসে হেসে আর গলা খুলে কথা বলে—ওর কাছে যাচ্ছি।
চমকে ওঠেন কম্পাসবাবু—তার মানে ? মোটর লরির ওই লোকটির কাছে ?
রানু—হ্যাঁ।
আশ্চর্য হয়ে আর দুই চোখ টান করে কথা বলেন রেঞ্জার বিনয়বাবু—উনি আপনার কে ?
রানু—আমার স্বামী।
আবার চমকে ওঠেন কম্পাসবাবু—তবে আমাদের স্যার আপনার কে হন ?
রানু—কেউ না, কিচ্ছু না। এবার আমাকে যেতে দিন।
রানুকে পথ ছেড়ে দিয়ে সবাই একদিকে সরে যায়। সেই মুহূর্তে ওরাওঁ হাঁকোয়াকে একটা ধাক্কা দিয়ে বন্দুকটা ছাড়িয়ে নিয়ে, পেট ভরে মহুয়া খাওয়া মাতাল ভালুকের মত টলতে টলতে রানুর কাছে এসে দাঁড়ায় অমিত—খবরদার !
গাড়ি থেকে নামে মানিক, আর এগিয়ে এসে অমিতেরই চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।—বন্দুক ফেলে দিন। আর, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকুন।
রানুর হাত ধরে মানিক বলে—চলো। রানুও সেই মুহূর্তে মানিকের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে এগিয়ে যায়, মোটর লরিতে উঠে মানিকেরই পাশে বসে পড়ে।
মোটর লরির ইঞ্জিন শব্দ করে বেজে ওঠে। একটুও হোঁচট খায় না লরি। হেলে-দুলে চলতে থাকে, তারপর একেবারে ছুটে চলে যায়।
স্টোরবাবু, কম্পাসবাবু, রেঞ্জার বিনয়বাবু আর পাঁড়েজি আবার চেঁচিয়ে ওঠেন—এ কী ? এ কী ? কী হল ?
অমিত চৌধুরীর হাতের বন্দুক ধুপ্ করে মাটির উপর পড়ে গিয়েছে। আর অমিত চৌধুরী নিজেও মুখ থুবড়ে রাস্তার কাঁকরের উপর পড়ে গিয়েছে। হুঁস নেই, বোধশক্তিও নেই, অমিত চৌধুরী যেন একটা অসাড় শরীরের পিণ্ড।
ওঠাও ! তুলে ধরো। টেনে তোলো ! কত রকমেরই না কথার চিৎকার বাজতে থাকে। পাঁড়েজি চেঁচিয়ে ওঠে—এই হাঁকোয়া, তুমলোগভি আও, হাত লাগাও, উঠাও।
স্টোরবাবু বলেন—আপনি একটু শক্ত করে পা দুটো ধরুন, কম্পাসবাবু।
রেঞ্জার বিনয়বাবু বলেন—আমি পিঠটাকে টেনে তুলছি মশাই, আপনি ঘাড়টাকে একটু শক্ত করে টেনে তুলুন। স্টোরবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—মাথাটা যে ঝুলে পড়েছে, দেখতে পাচ্ছেন না ?
খুব বেশি দেরি হল না। অমিত চৌধুরীকে তুলে ধরাই হল। কিন্তু বিনয়বাবুর হাতে যেন কোনও জোর নেই, ঠিকমত শক্ত করে ঘাড়টাকে ধরতে পারলেন না। অমিত চৌধুরীর মাথাটা ঝুলে রইল। মুখেও নিশ্চয় বেশ শক্ত একটা চোট লেগেছে, অমিত চৌধুরীর দু' ঠোঁটের ফাঁকের ভিতর দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

স্টোরবাবু এইবার ধমক দিয়ে ওঠেন—আঃ, একটা মরা বাঘ পেয়েছেন নাকি কম্পাসবাবু ? পা দুটোকে অমন করে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কেন ? আর একটু তুলে ধরুন।

অমিত চৌধুরীকে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে খাটের উপরে শুইয়ে দেওয়া হল। কী আশ্চর্য, এত বলিষ্ঠ একটা পুরুষ, খবরদার বলে একটা হাঁক দিয়েও শুধু দাঁড়িয়ে রইল, শুধু তাকিয়ে দেখল আর ভয় পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর খবরদার। কপালের ঘাম মুছে স্টোরবাবু হাঁপাতে থাকেন—এইবার শুধু রামগড়ে একটা লোক পাঠিয়ে ডাক্তার লাহিড়ীকে একটা খবর দিতে হয়।

কম্পাসবাবু বলেন—আমি থাকি, আপনি যান।

স্টোরবাবু বলেন—আপনি যান, আমি থাকি।

বিনয়বাবু বলেন—আমিই যাচ্ছি।

কোলিয়ারির দুই বাবু থেকে গেলেন। অমিত চৌধুরীর মাথায় জল ঢেলে ঢেলে আর পাখার বাতাস দিয়ে দিয়ে দু'জনেই যখন বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন, যখন দুপুর ফুরিয়ে বিকেল এসে পড়ে, তখন চোখ মেলে তাকায় অমিত চৌধুরী। রিঠৃয়া কোলিয়ারির দুই বাবু তখনই ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান।

বারান্দাতে দুই চেয়ারে বসে দু'জনেই ঢুলে ঢুলে যখন আরো ক্লান্ত হন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। আর ডাক্তার লাহিড়ীর গাড়িও এসে ফটকের কাছে থামে।

ডাক্তার লাহিড়ী এসে মুখ টিপে হাসেন—কী খবর ?

কম্পাসবাবু চোখ টিপে হাসেন—ভাল খবর।

তারপর এখানে আর কী খবর আশা করতে পারেন এঁরা, এই তিন ভদ্রলোক। না, এখানে নয়। এখানে আর কোনও খবর থাকতে পারে না।

স্টোরবাবু বলেন—চলুন এবার।

কম্পাসবাবু বলেন—কিন্তু সবাইকে তো ডাক্তার লাহিড়ীর বাড়িতে যেতে হয়। ঘোর সন্ধ্যার জঙ্গলে সাইকেল চলবে না।

স্টোরবাবু—চালাবার মত বুকের পাটাও আমার নেই।

কিন্তু এসব কথা তো কোনও খবরের কথা নয়। সেই রাত্রিতেই রিঠৃয়া কোলিয়ারিতে এসে পৌঁছবার পর একটা খবর পাওয়া গেল। একটা খবরের মত খবর। ঠিকাদার মনোহরলালের ড্রাইভার মানিক রায় মোটর লরিটাকে রামগড় স্টেশনের কাছে রেখে দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে।

ডাক্তার লাহিড়ী হাসেন—এরপর কি আরও কোনও খবর আশা করেন, স্টোরবাবু ?

স্টোরবাবু হেসে হেসে মাথা নাড়েন—না।

চিত্র গন্ধর্ব

কলকাতার থিয়েটার রোডের ওই যে বাড়ির গেটের মুখোমুখি হয়ে ফুটপাথের কিনারায় দুটো ছোট ছোট গুলমোর দাঁড়িয়ে আছে, সে বাড়িতে পাশাপাশি দুটি দুই-কামরা ফ্ল্যাট। একটি ফ্ল্যাটে থাকেন নাগপুরের ডাক্তার গুপ্তের স্ত্রী সৌদামিনী। ডাক্তার গুপ্তে এখন আর বেঁচে নেই। প্রায় সত্তর বছর বয়স, আর বয়সের চেয়ে রোগের কারণেই বেশি স্থবিরা এই সৌদামিনীর একমাত্র ছেলে বিনায়ক গুপ্তে এই কলকাতারই একটি কেমিক্যাল কারখানার ইঞ্জিনিয়ার ছিল। কিন্তু বিনায়ক এখন তার স্ত্রী ও একটি ছেলেকে নিয়ে জার্মানির হামবুর্গে আছে। কারখানারই ইচ্ছায় ও অনুমতিতে, এক বছরের জন্য জার্মানিতে থেকে ওই কাজের আরও বড় কিছু ও নতুন কিছু শেখবার জন্য সেই যে চলে গিয়েছে বিনায়ক, তারপর পুরো তিনটি বছর পার হয়ে গেলেও ফিরে আর আসেনি। বুড়ি সৌদামিনী ছেলের আসার আশায় দিন গুনছেন। কিন্তু বিনায়কের চিঠি বার বার পড়েও ঠিক বুঝতে পারেন না, কবে ফিরে আসবে তাঁর ছেলে বিনায়ক। শুধু একটা অপেক্ষায় অলস হয়ে পড়ে-থাকা

সৌদামিনীর এই জীবনের দেখা-শোনার কাজটুকু করে দেয়, তাঁরই নাগপুরের পুরনো আয়া।

সৌদামিনীর ফ্ল্যাটের একটি ঘর সত্যিই একটি ছবিঘর। শুধু ফটো আর ফটো, চার দেয়াল ফটোতে প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। সবই ছেলে বিনায়কের ফটো। একমাস বয়সের বিনায়ক, প্রথম স্কুলে যাচ্ছে বিনায়ক, বল খেলছে কিশোর বিনায়ক, গণপতি উৎসবের দিনে ঘোড়ায় চড়ে আর পতাকা হাতে নিয়ে মিছিলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে ষোল বছর বয়সের বিনায়ক, কত ফটো না আছে। বিদেশে যাবার এরোপ্লেনের অপেক্ষায় দমদমের এয়ারপোর্টে এসেছে ছেলে, ছেলের বউ আর নাতি, সেই ফটোও আছে।

পাশের ফ্ল্যাটে যিনি থাকেন, তিনিও বলতে গেলে নাগপুরের মেয়ে। ডাক্তার গুপ্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাক্তার রাধামাধব নাগের মেয়ে পূরবী নাগ। ডাক্তার নাগও আজ আর বেঁচে নেই। মারা যাবার আগে বন্ধু-পত্নী সৌদামিনীকে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলেন ডাক্তার নাগ, যেন তিনি পূরবীকে অন্তত তাঁর চোখের কাছে রাখতে চেষ্টা করেন। সেই কবে, প্রায় পাঁচ বছর আগে ডাক্তার নাগের মৃত্যুর খবর পেয়ে পূরবীকে চিঠি দিয়েছিলেন সৌদামিনী, চলে এসো, আমার চোখের কাছে থাকবে, আমার ফ্ল্যাটের পাশে একটি ফ্ল্যাট খালি আছে। বাংলাদেশের এই কলকাতা তো তোমারই দেশের শহর। তা ছাড়া, তোমাকে তোমার দশ বছর বয়স থেকে যারা চেনে ও জানে, সেই আমি এখানে আছি, সেই আয়া জগমায়াও এখানে আছে। এখানে থাকতে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না পূরবী।

সৌদামিনীর সেই চিঠি পেয়ে পূরবী সেদিনই নাগপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেনি। অনেক টাকা রেখে গিয়েছেন ডাক্তার নাগ, পূরবীর জীবনে অন্নচিন্তা বলে কোনও সমস্যা নেই, থাকতেও পারে না। পূরবী যদি তার কোনও শখের জন্য এক লক্ষ টাকাও খরচ করে ফেলে, তবুও তাতে পূরবীর জীবনের কোনও সুখ অন্তত দেনার দায়ে কিংবা অভাবে পড়বে না।

সৌদামিনীর চিঠির জবাব দিয়েছিল পূরবী : আমি এখানে আমার মাসিমার বাড়িতে আছি। আমি এখন ইন্দুমতী কলেজের লেকচারার। আমার পড়াবার সাবজেক্ট হিস্ট্রি অব আর্ট। আমার এই মাসিমাকে আপনি বোধ হয় চেনেন। আমার মায়ের খুড়তুতো বোন। তাঁর স্বামী, আমার মেসোমশাই এম. এন. রায় হলেন, সিটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। কাজেই আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। শুনে সুখী হবেন, সারস্বত সোসাইটি আমাকে একটি সোনার মেডেল দিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের প্রত্ন সম্বন্ধে আমার যে লেখা ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়িটি কাগজে বের হয়েছিল, সেই লেখা সোসাইটির খুবই ভাল লেগেছে।

পূরবীর চিঠি পড়ে খুশি হয়েছেন সৌদামিনী। তবু আরও অনেকবার একই ইচ্ছার কথা জানিয়ে পূরবীকে অনুরোধ করেছেন : কলকাতার মেয়ে-কলেজেও তো তোমার কাজ হতে পারে। চলে এসো পূরবী। কতদিন তোমাকে দেখিনি, দেখতে বড় ইচ্ছে করে।

এরকম অনুরোধের চিঠি অন্তত এই পাঁচ বছরে দশবার লিখেছেন সৌদামিনী। পূরবীও জবাব দিয়েছে : আমি খুবই দুঃখিত। কলকাতায় যাবার কোনও সুযোগই পাচ্ছি না। চালুক্য গুহা-মন্দিরের স্টাইল নিয়ে এখন রিসার্চ করছি। এটা ঠিক হিস্ট্রির বিষয় নয়। এটা হল স্টাডি অব আর্ট। খুবই খাটতে হচ্ছে। অনেক জায়গায় যেতেও হচ্ছে। মেসোমশাই খুব সাহায্য করছেন। গত মাসে নাগার্জুন কোণ্ডা ঘুরে এসেছি। আর দু' মাস পরে, শীত পড়লে, পুরনো বিজয়নগরের কয়েকটা ভাঙা মন্দিরের অবশেষ দেখতে যেতে হবে। তার পর হয়ত আরও দক্ষিণে, আরও কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে। আপনি ভাল আছেন জেনে সুখী হলাম।

সৌদামিনীর আহ্বান আর আমন্ত্রণের আরও কত মিষ্টি চিঠি, মাঝে মাঝে বেশ করুণ চিঠিও নাগপুরের পূরবীর কাছে গিয়েছে। সৌদামিনী যেন স্নেহে বিহ্বল হয়ে লিখেছেন...কী আনন্দের কথা, সেই ছোট্ট দুষ্টু মেয়েটি আজ বড় একজন স্কলার হয়েছে! যে মেয়ে একদিন আমার বাগানের সব ফুল ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যেত, মানা করলেও শুনত না, সে মেয়ে আজ কেমন করে আর কত গম্ভীর হয়ে বড়-বড় বই পড়ছে, আমার যে খুবই দেখতে ইচ্ছে করে!

সৌদামিনীর এই চিঠি পেয়েও কলকাতাতে এসে সৌদামিনীর চোখের কাছে দেখা দিতে পারেনি

পূরবী। পূরবী শুধু লিখেছিল : আমারও ইচ্ছা, আর সোসাইটিও আমাকে একটা স্টাইপেণ্ড দিয়েছে, তাই আমি খুব শিগ্‌গিব লণ্ডন যাচ্ছি। লণ্ডনের, আর সম্ভব হয় তো রোম আর প্যারিসেরও বড় বড় মিউজিয়ামে ভারতীয় আর্ট ও ক্র্যাফ্‌টের দুর্লভ নমুনাগুলিকে একবার নিজের চোখে দেখে আসতে। সোসাইটির স্টাইপেণ্ড মানে, মোট তিন হাজার টাকা। ও টাকা আমার না পেলেও চলত। কিন্তু ওটা ঠিক সাহায্যের টাকা নয়, সম্মানী দক্ষিণা।

জবাব দিয়েছিলেন সৌদামিনী : তোমার সম্মান আরও বাড়ুক। কামনা করি, সুস্থ থেকে তুমি আবার দেশে ফিরে এসো।

এরপর আর সৌদামিনীর চিঠিতে আমন্ত্রণ ও আহ্বানের কোনও কথা ছিল না। কিন্তু, কী আশ্চর্য, যে পূরবী পাঁচ বছরের মধ্যেও নাগপুর থেকে একবার কলকাতায় আসবার সুযোগ পায়নি, সে ছ' মাস আগে নিজেই লণ্ডন থেকে টেলিগ্রাম করে সৌদামিনীকে অনুরোধ করেছিল : দশদিনের মধ্যে আমি দেশে ফিরছি। কিন্তু নাগপুরে যাব না ; আমি এখন কলকাতাতেই থাকব। আমার থাকবার একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করে রাখবেন।

খুশি হয়েছেন সৌদামিনী, আর ভাগ্য ভালও বলতে হবে, পাশের ফ্ল্যাট একমাস হল খালি হয়েও গিয়েছিল। দেখে আরও খুশি হয়েছেন সৌদামিনী, সেই ছোট্ট মেয়ে পূরবী আজ এত বড় স্কলার হয়েও আন্টি সৌদামিনীর গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে ভুলে যায়নি।

না, আর নাগপুর নয়। কলকাতার থিয়েটার রোডের ওই বাড়ির ওই ফ্ল্যাটই এখন পূরবী নাগের জীবনের নীড়। সেই চেনা মানুষটি, সেই পুরনো আয়া জগমায়াও এখানে আছে, কাজেই পূরবীর কোনও অসুবিধে নেই। ঠিক সকাল আটটায় সেই বহু দিনের চেনা মিসিবাবা পূরবীর ঘরের টেবিলে চা আর খাবার পৌঁছে দিয়ে যেতে কোনওদিনও ভুলে যায় না, ভুলও করে না আয়া জগমায়া।

পূরবী নাগের ফ্ল্যাটের একটি ঘরে শুধু বই আর বই। নাগপুর থেকে পূরবীর সব বই দশটি বড় বড় কাঠের বাক্সে ভরতি হয়ে চলে এসেছে। পাঠিয়ে দিয়েছেন মেসোমশাই এম. এন রায়। মাসিমা একটি চিঠিতে লিখেছেন, ভালই হল পূরবী। আমাদেরও ইচ্ছে আছে, এবার কলকাতাতে চলে যাব। তোমার মেসো শিগ্‌গির রিটায়ার করবেন। হ্যাঁ, তোমার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট কলকাতার ব্যাঙ্কে ট্র্যান্সফার করবার সব ব্যবস্থা উনি করে দিয়েছেন।

বই আর বই। ইতিহাস আর আর্ট আলোচনার বই। কুমারস্বামীর যে সব বই এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না, সেসব বইও পূরবীর এই সংগ্রহের মধ্যে আছে। ইয়াজদানির অজন্তা আছে। রাজপুত আর কাংড়া পেন্টিং-এর অন্তত ত্রিশটি বিরাট আকারের অ্যালবাম আছে। সংস্কৃত প্রতিমালক্ষণম্-এর সাতটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশনার সাতটি বই আছে। তা ছাড়া আর্ট আলোচনার আধুনিক পণ্ডিতদের লেখা আরও কত বই— উলডারিং, মাউন্টফোর্ড, মলিয়ের, উলি, সেকেল, গোয়েৎস্‌ ও আরও কত পণ্ডিতের লেখা বই। লণ্ডনে থাকতেই পিকাসোর কড়া সমালোচনা করে 'দি আর্টিস্ট' পত্রিকাতে যে লেখা পাঠিয়েছিল পূরবী, সে লেখা পত্রিকার গত মাসের সংখ্যায় বের হয়েছে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, পূরবীর সেই লেখার প্রশংসা করেছেন হারবার্ট রিড, একটি চিঠিতে পূরবীকে সে কথা জানিয়েছেন সম্পাদক।

আন্টি সৌদামিনী তো তাঁর ছেলের আসার আশায় অপেক্ষা করে করে দিন পার করে দিচ্ছেন, কিন্তু পাশের ফ্ল্যাটের পূরবী নাগের প্রাণেও কি কোনও প্রতীক্ষা আছে ? দেখে তো মনে হয় না। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা আর হাতেও শুধু সরু সোনার চেন দিয়ে বাঁধা একটি ছোট্ট ঘড়ি ; এ ছাড়া আর তো কোনও আভরণ পূরবীব গায়ে নেই ! হ্যাঁ, আরও একটি আভরণ আছে, যা ওই ঘড়ি ও চশমারই মত আভরণ, গয়না নয়। পুরনো বিজয়নগরে বেড়াতে গিয়ে একটা ভাঙা মন্দিরের চাতালের কাছে তারার মত আকারের ছয়-কোণা একটা খুব ছোট্ট শ্বেতপাথর পড়ে ছিল। বুঝতে অসুবিধে নেই, এটা হল সেই কৃষ্ণরায়ের যুগের কোনও নারীর গলার হারের লকেট। পূরবী নাগের গলাতে যে সব সোনার চেন হারের মত দোলে, তারই লকেট হয়ে ওই ছোট্ট পাথরটিও দোলে। গলার শোভা বাড়ায়, নিশ্চয়ই সেজন্য নয়। পূরবীর গলার ওই সোনা আর পাথর-লকেট হল পূরবীর স্কলার প্রাণেরই একটি তৃপ্তির শোভা।

কিন্তু পূরবীর মাথায় ওই একরাশ কালো চুলের খোঁপা আর ঠোঁট দুটিকেও চমৎকার আভরণ বলে মনে হতে পারে। লিপস্টিক কখনও ছোঁয়ও না পূরবী। পূরবীর দুটি ঠোঁট যেন আপনি রঙিন। বড় চমৎকার লালচে ঠোঁট। গম্ভীর ও শান্ত মুখ, বইয়ের পাতার উপর দুই চোখের সব আগ্রহের দৃষ্টি ঢেলে দিয়ে যখন বই পড়ে পূরবী, তখন বোধ হয় পূরবীর প্রাণটাও ইতিহাসের কোনও মন্দিরের পথে ঘুরে বেড়ায়। তখন পূরবী যেন অন্য এক জগতের মানুষ ; শুধু ওই লালচে ঠোঁট দুটিকে এ জগতের বস্তু বলে মনে হবে।

রাস্তার উপরে ওই জোড়া গুলমোরের একটা অদ্ভুত অভ্যাস আছে। সামান্য ঝড়ের বাতাসেও উতলা হয়ে মাথা দোলাতে থাকে। বই বন্ধ করে জানালার পর্দা সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকায় পূরবী। হ্যাঁ, এইবার মনে হবে, পূরবী নাগের জীবনেও প্রতীক্ষা আছে। কেউ আসবে বোধ হয়, কেউ এল কি না, কিংবা সত্যিই এসেছে কি ? পূরবীর সেই হঠাৎ-উৎসুক দুই চোখের দৃষ্টিতে যেন অনেকক্ষণের শান্ত প্রতীক্ষা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পূরবী নাগের সঙ্গে দেখা করতে যে এখন আসবে, এই ছ'মাসের মধ্যে সে আরও অনেকবার এসে দেখা করে গিয়েছে। সে-ও একজন স্কলার মানুষ। আর, কী অদ্ভুত মিল ! সে-ও আর্টের ইতিহাস নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছে। সে-ও ইতিহাসের এম-এ। অরেল স্টাইনের অনেক ধারণা ও বিশ্বাসের ভুল ধরে দিয়ে মধ্য এশিয়াতে ভারতীয় আর্টের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য দিয়ে একটি বই লিখেছে যে, সে। তার নাম সুমোহন দত্ত। সুমোহনের সেই বই লন্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক হোয়াইট অ্যান্ড হ্যামণ্ড প্রকাশ করেছে। ফয়েলের কাউন্টারে সেই বই দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল পূরবী। কে এই লেখক ? কাউন্টারের মেয়েটি হেসে হেসে বলেছিল—চিনি না ; তবে বইটি ভাল বিক্রি হয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে বইটার পাতা উল্‌টিয়ে আর পড়ে পড়ে যখন পূরবীর চোখের চাহনি নিবিড় হয়ে যায়, তখন কাউন্টারের মেয়েটি মুখ টিপে হাসে— আপনি চেনেন নাকি ?

—না না, আমি চিনি না। আমি চিনব কেমন করে ? আমি আগে কখনও এর নামও শুনিনি।

কিন্তু চিনতে আর খুব বেশি দেরি হয়নি। লণ্ডনের মেঘলা আকাশ সেদিন বিকেলে বড় বেশি দুরন্ত হয়ে উঠেছিল। ঝরঝর বৃষ্টির ধারা আর থামতেই চাইছে না। ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাইরের বারান্দার একটা থামের পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পূরবী।

হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে আর হেসে হেসে পূরবীর কাছে দাঁড়ায় বিজয়, নাগপুরের সেই বিজয় কুলকার্নি। —আপনি কি কারও অপেক্ষা করছেন ?

পূরবী— না।

বিজয়—তবে তো বাড়ি ফিরতে চান ?

পূরবী— হ্যাঁ।

বিজয়—তবে চলুন ; আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, আমার অফিসের গাড়ি।

পূরবী বলে— না, ধন্যবাদ।

ব্যস্ত হয়ে আর তেমনই হেসে হেসে চলে যায় বিজয় কুলকার্নি, অদ্ভুত ছটফটে স্বভাবের এই বিজয়। কে জানে কিসের মেশিনের কাজ শিখতে ও বুঝতে দু বছর ধরে লণ্ডনে দিন কাটাচ্ছে বিজয়।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আর সিঁড়ি ধরে নেমে যাচ্ছিল বিজয়, কিন্তু ওদিক থেকে আগন্তুক কে একজন বিজয়কে দেখতে পেয়েই বিজয়ের হাত চেপে ধরে— কী ব্যাপার ? তুমি কী মনে করে ?

বিজয়—আরে ভাই, হাম আয়েঁথে সির্‌ফ্ আনেকে লিয়ে, তুমহারে অ্যায়সা বুদ্ধমূর্তি দেখনেকে লিয়ে নেহি।

শুধু এখানে আসবার জন্যেই এসেছে বিজয়, বুদ্ধমূর্তি দেখবার জন্যে নয়।

—চলো আজ তোমাকে বুদ্ধমূর্তি দেখিয়ে ছাড়ব। ছটফটে বিজয়কে হাত ধরে টেনে নিয়ে

আগন্তুক মানুষটি উঠে আসে ও বারান্দার ঠিক সেইখানেই এসে দাঁড়ায়, যেখানে থামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে পূরবী।

ছটফটে বিজয় আবার সেইরকম হেসে পূরবীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে— আপনি বাঙালি, আমার এই বন্ধুটিও বাঙালি, সুমোহন দত্ত।

চমকে ওঠে পূরবী। বিজয় বলে— আপনাদের দুজনের মধ্যে একটা মিল আছে। যেমন আপনি, তেমনি আমার এই বন্ধুটিও এখানে বুদ্ধমূর্তি দেখতে আসে।

সুমোহনের দিকে তাকিয়ে হাঁক দেয় বিজয়— জেরা ইধর আও না ভাই সুমোহন !...হাঁ, বহুত আচ্ছা, ইনি হলেন আমাদের নাগপুরের পূর্বী। নাগপুরের যে বাড়িতে পূর্বীর বাবার ক্লিনিক ছিল, সেটা আমাদেরই বাড়ি। সে বাড়ির ভাড়া প্রথমে ছিল মাত্র দেড়শো টাকা, কিন্তু পূর্বীর বাবা এমনই মহাশয় মানুষ ছিলেন যে, নিজেই ইচ্ছে করে তিনশো টাকা ভাড়া দিতে শুরু করলেন। আমার বাবা বলেন, ডাক্তার আর. এম. নাগের মত উদার মানুষ তিনি কখনও দেখেননি।

পূরবী বলে— আপনার বই আমি দেখেছি।

সুমোহন হাসে— শুধু দেখছেন, পড়েননি নিশ্চয় ?

পূরবী— সত্যি কথা বললে বলতে হয়, সামান্য একটু পড়েছি, না-পড়ারই মত।

সুমোহন— ঠিক আছে। বলুন, কবে আবার এখানে আসবেন ?

পূরবী— কেন ?

সুমোহন—আমার সেই বই একখানা আমি নিজেই এনে আপনাকে দিয়ে যাব।

পূরবী— কাল আমার দিনটা শুধু এক ন্যাশনাল গ্যালারিতে কেটে যাবে। আমি পরশু আবার এখানে আসব।

সুমোহন— আচ্ছা, ধন্যবাদ ! বিজয়কে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেল সুমোহন। একবার তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করেও দেখতে পায় না পূরবী, কোন দিকে ওরা দুজনে চলে গেল।

আজ ভাবতে গেলে হাসি পায়। কারণ আর কল্পনা করে বুঝবার দরকার হয় না, সেদিনের একটা ঘটনাকে যেন চোখেই দেখতে পায় পূরবী। চলে যাবার সময় বিজয়কেও হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেল কেন সুমোহন ? বিজয় তো মধ্য এশিয়ার পুরনো বৌদ্ধমঠের কোনও দেয়াল-চিত্রের রূপ আর ভঙ্গি আর চমৎকারিতার ধার ধারে না। বিজয়ের সঙ্গে কী কথা নিয়ে আলোচনা করবে সুমোহন, পূরবী নাগের কথা ছাড়া !

কোনও সন্দেহ নেই, পরদিনই বিজয়ের কাছ থেকে পূরবী নাগের জীবনের অনেক পরিচয় জেনে নিয়েছিল সুমোহন। আর সেই জন্যই তো বিজয়কে ওভাবে হাত ধরে অন্য দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া !

পরশুদিন পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারেনি সুমোহন। পরের দিন ন্যাশনাল গ্যালারিতে পৌঁছেই দেখতে পায় পূরবী, উপহারের বইটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুমোহন দত্ত।

সুমোহন হাসে— কাল আমি থাকছি না, কাল একবার অক্সফোর্ড যেতেই হবে। ইন্দোনেশিয়ার আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন ডক্টর ভার্গনার। সে বক্তৃতা আমার শোনা দরকার।

উপহারের বইটি হাতে তুলে নেয় পূরবী— তবে যান, বক্তৃতা শুনেই আসুন।

সুমোহন— আমি শুধু এই একটি দিন অক্সফোর্ডে থাকব, পরের দিনই আবার ফিরে আসব। কিন্তু আবার যদি কখনও...

পূরবী হাসে— আমার ঠিকানা জানতে চান ?

সুমোহন হেসে ফেলে— না, কারণ, জানা হয়ে গিয়েছে।

পূরবী— কে বলে দিলে আমার ঠিকানা ? বিজয় কুলকার্নি বোধ হয় !

সুমোহন— হ্যাঁ। বিজয় একটা হঠাৎ ঘটনায় আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছে। পিকাডিলিতে রাস্তা পার হতে গিয়ে একটা গাড়ির ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। পায়ে বেশ চোট লেগেছিল, খুব সাংঘাতিক অবিশ্যি নয়। কিন্তু এই বিজয় হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমাকে হাত ধরে ওঠাল, ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। আর হোটেলে পৌঁছে দিয়েও গেল। পর-পর প্রায় পনেরো দিন ধরে রোজই একবার

আমার হোটেলে এসে, আমার সঙ্গে দেখা করে, আমার দরকারের সব খবর জেনে যেত বিজয়। বিজয় একদিন আমার মাথা টিপেও দিয়েছিল, সেদিন আমার জ্বর হয়েছিল।

পূরবী— তাই বলুন ! আমি ভাবছিলাম, আপনার মত একজন স্কলারের পক্ষে বিজয়ের বন্ধু হবার কী দরকার থাকতে পারে ?

সুমোহন—আচ্ছা, আমি তবে চলি।

পূরবী—আসুন !

সেদিন কি পূরবীও বুঝতে পেরেছিল যে, ভদ্রতার এই সামান্য আহ্বান একদিন পূরবীর প্রাণেরই একটি আহ্বান হয়ে উঠবে। সুমোহনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই দুটি ঘটনার পর আরও যে সাতটি মাস লন্ডনে ছিল পূরবী, সেই সাত মাসের মধ্যে অন্তত একশো সাত দিন সুমোহনের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কিন্তু শুধু কি দেখার জন্যই দেখা ; না, তা নয়। কে কী নতুন বই পড়ল, কে কী নতুন লেখা লিখল, তারই খবর বিনিময় করে দুজনে কত খুশি হয়। মাঝে মাঝে তর্কও মন্দ জমে না। সুমোহন বলে— আমাদের কালীঘাটের পট নিয়ে যে কেউ কেউ প্রশংসার গলাবাজি করেছেন, সেটা আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি তো মনে করি, কালীঘাটের পট হল ভালগারিটি, প্রতিভা ফুরিয়ে গেলে যা হয়।

প্রতিবাদ করে পূরবী— না, আমি তা মনে করি না। আমি বলব, কালীঘাটের পট হল খুব সরল রীতির একটি সুন্দর পরিণতি।

মার্বেল আর্চের কাছে পার্কের বেঞ্চিতে বসে আর গল্প করে করে দুজনে বুঝতেও পারে না, কত ঘণ্টা সময় কেটে গেল। গল্প তো নয়, যেন দুজন সন্ধানী অভিযাত্রীর বিচরণ, এক-একটি যুগের রূপকলার ইতিহাসের পথে ঘুরে-ফিরে মঠ মন্দির ও মূর্তি দেখে দুজনের শিক্ষিত প্রাণের পিপাসা মিটে যায়।

মেজর বর্ধন, যিনি ভারত সরকারের সার্ভিস থেকে অবসর নিয়ে এখন লণ্ডনে থাকেন, তিনি হলেন পূরবীর ছোট মেসোমশাই, সরযূ মাসির স্বামী। সুমোহন জানে, মিটাফোর্ড স্ট্রিটের কোনও বাড়ির কোনও ফ্ল্যাটে সরযূ মাসির দেখাশোনার অধীন হয়ে পূরবীর লন্ডন জীবনের দিনগুলি পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কী অদ্ভুত সেকেলে সন্দেহ ও আপত্তির মানুষ এই সরযূ মাসি ! পূরবীর সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিল সুমোহন, সরযূ মাসি খুশি হননি, বরং একটু অসন্তুষ্টই হয়েছেন। পড়াশোনা রিসার্চ থিসিস আর আর্ট স্টাডি, যা কিছুই বলা হোক না কেন, আর ব্যাপারটা যত নির্দোষই হোক না কেন, তা নিয়ে পূরবীর সঙ্গে কোনও ছেলের মেলামেশা তিনি একটুও পছন্দ করেন না। তাঁর ইচ্ছা, দেশের মেয়ে যেমন একলাটি হয়ে বিদেশে এসেছে, তেমনিই আবার একলাটি হয়ে ভালয় ভালয় দেশে ফিরে যাক।

সরযূ মাসির আপত্তির আভাসটা একটু অস্পষ্ট হলেও বুঝে নিতে পূরবীর একটুও দেরি হয়নি। দুঃখিত হয়নি পূরবী, কিন্তু খুশিও হয়নি। এই সত্য তো বুঝতেই হবে যে, যারা সাধারণ মানুষ, যারা বিদ্যাচর্চার ধারে-কাছেও থাকে না, তাদের পক্ষে বুঝে ওঠা আর বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে, বিদ্যার চর্চাও দুজনের নির্দোষ বন্ধুত্বের সহজ বন্ধন হতে পারে ; তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী হলেই বা কি এসে যায় ?

আজ ভাবতে একটু লজ্জাই বোধ করে পূরবী, সরযূ মাসির আপত্তির বিরুদ্ধে পূরবীর মনের সেই যুক্তির মধ্যে কী অদ্ভুত একটা ফাঁকি ছিল। সেই বন্ধুত্ব কত সহজে দুজনের ভালবাসার ফুলডোর হয়ে গেল।

মনে হচ্ছে রাস্তার জোড়া গুলমোর উতলা হয়ে মাথা দোলাচ্ছে। সুমোহন এল বোধ হয়। গেটের দিকে তাকিয়ে থাকে পূরবী।

না, কেউ এল না। কী আশ্চর্য, আজ সাতদিনের মধ্যেও সুমোহনের একবার আসবার সুযোগ হল না ?

॥ ২ ॥

সুমোহনের ভুল নয়, দোষও নয়, ভুলে যাওয়াও নয়। এই সাত দিনের প্রত্যেকটি দিনে, যখনই সন্ধ্যা হয়েছে, তখনই পূরবীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে সুমোহন। কিন্তু ব্যস্ততাই সার। কারণ হল একটি বাধা, একটি উতলা প্রশ্নের কণ্ঠস্বর— তুমি এখন বাইরে যাচ্ছ কেন ? কিসের দরকার ?

আর কেউ নয়, সুমোহন দত্তের স্ত্রী হিমানীই এই প্রশ্ন করেছে। হিমানীর চোখ দুটোর, সেই সঙ্গে প্রাণটারও অদ্ভুত কোনও শক্তি আছে বলতে হবে। তা না হলে এই ঘরে একটি বিছানার উপর জ্বরের ঘোরে নিঝুম হয়ে পড়ে-থাকা একটা মানুষ কেমন করে বুঝতে পারে যে, ও ঘরের ভেতরের মানুষটি এখন বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে ?

পাটনার অ্যাডভোকেট হরিবিলাস দত্ত তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর হৃষীকেশের এক আশ্রমে চলে গিয়েছেন। স্ত্রীর নামে কলকাতার নিউ আলিপুরে যে বাড়িটি করেছিলেন, সেই বাড়িই হল আজকের সুমোহন দত্তের এই বাড়ি, যেখানে শুধু সুমোহন ও তাঁর স্ত্রী হিমানী ছাড়া আর কেউ থাকে না।

মাঝে মাঝে অবশ্য সুমোহনকে একাই থাকতে হয়, যখন হিমানী তার বাবা আর মায়ের কাছে পাঁচ-দশটি দিন কাটিয়ে আসবার জন্য চলে যায়। যে দেড়বছর লণ্ডনে ছিল সুমোহন, সে দেড়বছরে অবশ্য এই বাড়িতেই মাঝে মাঝে পাঁচ-দশটি দিন থেকে আবার যসিডিতে চলে যেত হিমানী। কে জানে কিসের টানে এই শূন্য বাড়িতেই এসে কয়েকটা দিন থেকে যাবার জন্য যসিডির মেয়ে হিমানীর প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠত !

টানের কথা নিয়ে যসিডির বাড়ির কেউ কোনও আলোচনা করে না, কিন্তু অনেক কথা নিয়ে হাসাহাসি করে। বড়দা হাসেন— কে না জানে তুই ওই শূন্য বাড়িতে গিয়ে কী করিস ?

হিমানী— কী আবার করি ? খাই দাই আর ঘুমোই।

বড়দা— তুই তো দুকাপ চা তৈরি করে টেবিলের উপর রাখিস, আর শুধু এককাপ চা খেয়ে গুনগুন করে গান করিস !

হিমানী হাসে— তাতে কী হয়েছে ?

বড়দা— কিছুই হয়নি, সবাই শুধু বুঝতে পেরেছে যে, এককাপ চা সুমোহনের নামে নিবেদন করা হয়।

হিমানী— ওই একটি দিন ওরকম করেছিলাম।

বড়দা— সেদিন মনটা খুব খারাপ হয়েছিল, তাই না ?

হিমানী— হ্যাঁ।

বড়দা— কেন ?

হিমানী— কী অদ্ভুত মানুষ ; একটি চিঠি দিয়ে তার পর একমাস চুপ। কী যে এমন ব্যস্ত, বুঝি না ছাই !

যসিডির বিধু সরকারের মেয়ে এই হিমানী পাটনাতে মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়েছে আর বি-এ পাশ করেছে। বিয়ে হবার আগে পাটনার ছেলে সুমোহনের কাছে যসিডির মেয়ে হিমানীও নিতান্ত অচেনা ও অজানা একটি মেয়ে ছিল না। তার কারণ, যসিডির বিধু সরকার পাটনার হরিবিলাসবাবুর কাছেও নিতান্ত অচেনা ও অজানা কোনও মানুষ ছিলেন না। যসিডির বিধু সরকারের গ্রেট নার্সারির গোলাপ কতবার উপহার হয়ে হরিবিলাসবাবুর বাড়িতে এসেছে। বুঝতে অসুবিধে হয়নি হরিবিলাসবাবুর—বিধু সরকারের কী ইচ্ছা। সুমোহনের সঙ্গে হিমানীর বিয়ে হোক, এই তো ইচ্ছেটা ! বেশ তো, ছেলে যদি রাজি থাকে, ছেলের যদি আগ্রহ থাকে, তবে হরিবিলাসবাবুর কোনও আপত্তি নেই।

হরিবিলাসবাবুর চিঠির জবাবে চিঠি দিলেন বিধু সরকার— ছেলের আগ্রহ আছে বলেই তো আপনার কাছে আমার ইচ্ছার কথাটা জানিয়েছি।

কী বলে বিধু সরকার ? একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন আর একটু খোঁজখবরও করেছিলেন

হরিবিলাসবাবু, সত্যিই কি বিধুর মেয়ে হিমানীর জন্য তাঁর ছেলে সুমোহনের মনে কোনও অনুরাগের ভাব দেখা দিয়েছে ?

হিমানীর মামা হেমেনবাবু একেবারে স্পষ্ট করে হরিবিলাসবাবুকে বলে দিয়েছিলেন— হ্যাঁ, তাই। তা না হলে প্রতি রবিবারে হিমানীর গান শোনার জন্যে আমার ওখানে আসত না সুমোহন।

সবই শুনলেন হরিবিলাসবাবু, হরিবিলাসবাবুর স্ত্রীও শুনলেন— একদিন হিমানীর মামিকে অনুরোধ করেছে সুমোহন— আপনি কি আপত্তি করবেন মাসিমা, যদি হিমানীকে সঙ্গে নিয়ে লেকের দিকে একটু বেড়িয়ে আসি ? আপত্তি করেননি হিমানীর মামি। হিমানীকেও একদিন বলেছে সুমোহন— তুমি একদিন নিজের হাতে মুরগি কারি রেঁধে আমাকে নেমন্তন্ন করো। খোঁজ নিয়ে, হিমানীর জন্মদিন কবে জেনে নিয়েছে সুমোহন, আর জন্মদিনে সুন্দর ছবির একটি অ্যালবাম হিমানীকে উপহার দিয়েছে, মোলারামের আঁকা রাগ-রাগিণীর ছবি। হিমানীকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন মামি, কি রে তোদের দুজনের ইচ্ছে কী ? হিমানীর সারা মুখ রাঙা হয়ে যায়। হিমানী বলে— আমি আবার কী বলব ?

রূপের ইন্দ্রাণী নয় হিমানী, সুন্দরীও বলা চলে না। কিন্তু এমন কিছু অসুন্দরীও নয়। নিন্দে করলে বলা চলে, গায়ের রং ময়লা। আর শরীরটাও একটু বেশি ছিপছিপে, রোগাটে ধরনের। তা ছাড়া আর কিছুই তো নিন্দে করবার মত নয়। চোখ সুন্দর, চোখের ভঙ্গিও সুন্দর, আর ঠোঁট দুটোকেও খুব নরম বলে মনে হয়। মুখে সব সময় একটা মিষ্টি হাসি লেগে আছে, হয়ত সেই জন্যেই মামি যখন রাগ করে বকেন, তখন হিমানীর এই মিষ্টি নরম ঠোঁট দুটোকে চিমটি দিয়ে ধরেন— আবার যদি কখনও যসিডিতে চিঠি দিতে দেরি কর, আর যা-তা খেয়ে পেট-কামড়ের কষ্টে কান্নাকাটি কর, তবে তোমাকে যসিডি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পড়াশোনা যদি চুলোয় যায় তো যাক।

পড়াশোনা চুলোয় যায়নি। বি-এ পরীক্ষা ব্যর্থ হল না, পাসই করল হিমানী। আর হরিবিলাসবাবুও যসিডিতে চিঠি দিলেন, এইবার মেয়ের বিয়ে দিতে পারো, বিধু।

বিয়ের পর প্রথম যখন যসিডিতে এসে কয়েকদিন ছিল সুমোহন, তখন একদিন একটা কাণ্ডও করেছিল হিমানী। কাণ্ডটা আড়াল থেকে দেখে ফেলেছিলেন বউদি। ঘরের ভেতরে সুমোহনের কাছে বসেছিল হিমানী ; আর মন দিয়ে বই পড়ছিল সুমোহন। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আর একটানে বইটাকে সুমোহনের হাত থেকে কেড়ে নিল হিমানী— এখন আবার বই কেন ?

সুমোহন— তার মানে ?

হিমানী— আমি যখন আছি, তখন আমার সঙ্গে গল্প করো। এখন বই পড়া চলবে না।

সুমোহন হাসে। সেদিন বোধ হয় খুশি হয়েই হেসেছিল সুমোহন। কিন্তু আজ ?

আজ শত চেষ্টা করেও মনটাকে খুশি করতে ও হাসাতে পারে না সুমোহন, যদিও দুচোখে স্পষ্ট করে দেখতে পায় যে, কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে আর একটা পালক-ঝাড়ু হাতে নিয়ে সুমোহনের বই-এর ঘরে ঢুকে বই-এর ধুলো ঝাড়ছে হিমানী, অগোছালো বইগুলোকে গুছিয়ে র‍্যাকের উপর সাজিয়ে রাখছে।

এ তো সুমোহন দত্তের জীবনের ঘরে একটা দাসীপনার কাজ ; সে কাজ যে কোনও একটা চাকরও করতে পারে। কিন্তু যে কাজটা সুমোহনের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ও সাধনা ; সে কাজে কি কোনও সাহায্য করতে পারে হিমানী ? পারে না, পারবেও না। হিমানী কোনওদিনও তিব্বতের বৌদ্ধ তান্ত্রিকের বজ্রযানের রহস্য ব্যাখ্যা করে সুমোহনকে আশ্চর্য করে দিতে পারবে না। আর, সুমোহনও কোনওদিন অ্যাফ্রিকান নিগ্রো আর্টের মর্মটি বুঝিয়ে দিয়ে হিমানীকে মুগ্ধ করে দিতে পারবে না।

বিয়ের পর একটি বছরও পার হতে না হতেই মা মারা গেলেন। তারপর একটি বছর পার হতে না হতে বাবা হৃষীকেশের আশ্রমে চলে গেলেন। এর পর আর পাটনাতে থাকতে সুমোহনের একটুও ভাল লাগেনি, যদিও খোদাবক্স লাইব্রেরিতে গিয়ে মোগল মিনিয়েচারের চমৎকার সংগ্রহ দেখতে খুবই ভাল লাগত। মাত্র একদিন, সুমোহনের অনেক অনুরোধের পর সুমোহনের সঙ্গে খোদাবক্স লাইব্রেরি দেখতে গিয়েছিল হিমানী। কিন্তু আর নয়। পনেরো আর ষোলো শতকের মোগল মিনিয়েচার—

রঙিন বিস্ময়ের সেই চিত্রাবলির দিকে ভাল করে তাকায়ওনি হিমানী।

তবু সেদিন সুমোহন দত্তের প্রাণে তেমন কোনও বিষাদ দেখা দেয়নি। কারণ, সেদিন কল্পনাও করতে পারেনি সুমোহন, পাঁচ বছর পরে একদিন তারই পাশে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়মের এলগিন মার্বেলস্ দেখবে এক নারী, যার শিক্ষা বিদ্যা আর প্রতিভার আভা তার দুই চোখে শুকতারার আলোর মত জ্বলজ্বল করে, যার গলাতে প্রাচীন বিজয়নগরের ছোট্ট একটি সাদা তারা-পাথর দোলে। মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে আছে পূরবী, অথচ কত সহজে আর কত তাড়াতাড়ি হাতে-ধরা একটি খাতায় নোট লিখেও ফেলছে।

কোনও সারস্বত সোসাইটির নয়, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টেরও নয়, কারও দাতব্যের স্টাইপেণ্ড পায়নি সুমোহন। স্টাইপেণ্ড পেতে সুমোহনের মনে কোনও উৎসাহ, লোভ, কিংবা আগ্রহ, কিছুই ছিল না। একবার পাটনাতে, একবার কলকাতাতে, কলেজের অধ্যাপনার কাজে আহ্বান পেয়েও উৎসাহবোধ করেনি সুমোহন। চাকরি করবার দরকার হয় না যার, যার বেঁচে থাকবার আর সারাজীবন নিজের সাধের মত পড়াশোনা করে আর রিসার্চ করে সুখী হবার জন্য যথেষ্ট টাকার সঞ্চয় রেখে গিয়েছেন বাপ, তার পক্ষে কলেজের একজন প্রফেসর হবার সুযোগ তুচ্ছ করা কিছুই কঠিন নয়। তুচ্ছ করেও ছিল সুমোহন।

তার চেয়েও ভাল, কলকাতাতে থেকে নিজের মনের মত করে পড়াশোনা করা, ন্যাশনাল লাইব্রেরির আর্ট-সাহিত্যের সঞ্চয় থেকে সব সাহায্য নেওয়া, মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে নিজের চোখে দেখে নিয়ে বিচিত্র শিল্প-জগতের শতযুগের যত রূপভঙ্গি আর শীলতার কিছু নতুন তথ্য সঞ্চয় করে করে আনা। সুমোহনের জীবনে এর চেয়ে বড় তৃপ্তি আর কী হতে পারে?

ইচ্ছে ছিল, ইতিহাসের এম-এ'র ছাত্র ছিল যখন, তখন থেকেই একবার দেশের বাইরে গিয়ে, অন্তত লণ্ডন প্যারিস রোম আর বার্লিনের মিউজিয়মগুলিকে একবার দেখে আসা। নিগ্রো আর্টের রূপ দেখবার জন্য আফ্রিকাতে, আর পলিনেশিয়ার মূর্তিকলার রূপ দেখবার জন্য ইস্টার আইল্যাণ্ডে ছুটে যাওয়া সম্ভব না হতেও পারে। কিন্তু সেজন্য হতাশ হবার কোনও দরকার নেই। সব দেশের সব জাতির শিল্পকলার সাক্ষ্য ওই কয়েকটি শহরের মিউজিয়মেই পাওয়া যায়।

হিমানী খুব আপত্তি করেছিল, হিমানীর বাবা বিধু সরকারও অনুরোধের ভাষায় সুমোহনকে একটু বুঝিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন।— হিমির শরীরটা তো এখন ভাল যাচ্ছে না। ঘুরে-ফিরে জ্বরটা বার বার আসছে। এই অবস্থায় তোমার এখন লণ্ডন না গেলেও চলতে পারে। ইচ্ছে যখন হয়েছে, তোমার মতন স্কলার ছেলের পক্ষে এমন ইচ্ছে হবারই কথা, তখন যেও একদিন, যাবে নিশ্চয়, কিন্তু এখন না গেলেই ভাল।

হিমানীর জ্বর? কী এমন সাংঘাতিক জ্বর? ডাক্তার বলেছেন, ও জ্বরে ভয় করবার কিছু নেই। খোলা মাঠের রোদে ও বাতাসে রোজ একটু বেশি করে বেড়ালেই ওই জ্বর আর দেখা দেবে না।

—তবে তুমি এত আপত্তি করছ কেন, হিমানী?

—তোমার এখন বিদেশে যাবার এমন কী দরকার হল?

—তুমি ঠিক বুঝবে না, কী দরকার।

—আমার বুঝে কাজ নেই। আমি একা থাকতে পারব না।

—কী আশ্চর্য, মাত্র একটি বছর, বড় জোর দেড়বছর, এটুকু সময় তুমি একা থাকতে পারবে না? তোমার বড়দার মেয়ে নমিতার স্বামী যখন যুদ্ধে গিয়েছিল, তখন নমিতা কী পুরো তিনটি বছর একা থাকেনি? তা ছাড়া একা থাকবার কথাই বা তুলছ কেন? যসিডিতে থাকবে; বাবা, মা, দাদা, বউদি সবাই কাছে থাকবে, খোলা মাঠের রোদে আর বাতাসে বেড়াবারও অনেক সময় পাবে, একে কি একা থাকা বলে?

চুপ করে অনেকক্ষণ ধরে শুধু কাঁদে আর চোখ মোছে হিমানী। তারপর বলে— আচ্ছা, তবে যাও।

হিমানীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে সুমোহন— এই তো, চমৎকার একটি সবুঝ মেয়ের মত কথা!

কিন্তু আজ সুমোহনের মুখে সেই হাসি আর নেই। হিমানীর পিঠে হাত বুলিয়ে দেবার জন্য সুমোহনের প্রাণে কিংবা হাতে, কোথাও কোনও আগ্রহের সাড়াও নেই।

কোথায় যাচ্ছ ? কী ভয়ানক তীব্র আর তীক্ষ্ণ, হিমানীর মুখের ওই উদ্বিগ্ন প্রশ্নটার শব্দ। শুনতে পেলেই সুমোহনের কপালের একটা রগ দপ্ করে ফুলে ওঠে। প্রশ্ন তো নয়, যেন একটা অবুঝ দাবির শাণিত ছুরি, সুমোহনের পিঠে বসিয়ে দিয়ে খুশি হয় হিমানী। তা না হলে ঠিক সন্ধ্যা হলেই আর সুমোহন বাইরে যাবার জন্য তৈরি হলেই জ্বর গায়ে ও ঘরে বিছানার উপর পড়ে থেকেও হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন করে বাধা দেয় কেন হিমানী ?

বাধা পেয়ে আর বাইরে বের হয় না সুমোহন। চুপ করে ঘরের সোফার উপর বসে থাকে। কিন্তু বুঝতেও পারে সুমোহন, এ বাধা সহ্য করতে আর ইচ্ছে করে না, সহ্য করবার শক্তিও আর নেই। সোফার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে থেকে সুমোহনের অলস নিঃশ্বাসের ভেতর থেকেও যেন একটা যন্ত্রণা উথলে ওঠে।

হঠাৎ উঠে এসে হিমানীর ঘরের ভেতরে ঢোকে সুমোহন।—তুমি কি মনে কর যে, আমি বাইরে বের হলেই ট্রামের চাকায় কাটা পড়ে মরে যাব।

হিমানী হাসে— তা মনে করব কেন ? তুমি তো নিজের গাড়িতে বেড়াতে বের হও ; ট্রামের চাকা তোমার ক্ষতি করবে কেন ?

—বেশ তো ঠাট্টা করতে পার, তবে আবার অবুঝের মত ডাকাডাকি করে বাধা দাও কেন ?

—বাধা ? বাধা দিলাম কোথায় ? শুধু জিজ্ঞেস করেছি, কোথায় যাচ্ছ !

—জিজ্ঞেস করবারও তো কোনও মানে হয় না।

—এ আবার কেমন কথা হল ? বাইরে যাচ্ছ, বাড়ির মানুষটাকে একটু বলে যাবে না, কোথায় যাচ্ছ ?

—না বললে দোষ কী ?

—বললেই বা দোষ কী ?

—এত ডাকাডাকি না করে চুপ করে শুয়ে থাকলেই তো পার !

—তুমিও বলে ফেললেই তো পার !

—কী ?

—কোথায় যাচ্ছ ?

—না, কোথাও যাচ্ছি না, কোথাও যাব না। ঘরের ভেতরে বসে শুধু তোমার জ্বরের কাতরানি শব্দ শুনব।

দপ্ করে ফুলে উঠেছে সুমোহনের কপালের রগ। হিমানী বলে— ছিঃ, এত রাগ করতে নেই। তুমি কোথায় যাচ্ছ জানতে পেলে আমার মনটা একটু নিশ্চিন্ত হবে, ভালও লাগবে, জ্বরের জ্বালা নিয়েও ঘুমোতে পারব।

বলতে বলতে সুমোহনের হাতের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেয় হিমানী। একটা রোগা হাত, সে হাতের চুড়িগুলি ঢলঢল করে।

না, হিমানীর সেই হাত আর ধরে না সুমোহন। ধরতে ভুলেই যায় বোধ হয়। কিংবা, আনমনা হয়ে কি যেন ভাবছে সুমোহন, সেইজন্য।

সুমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হিমানী। হিমানীর চোখের তারা দুটো যেন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে মিটমিট করে। হিমানী বলে— আচ্ছা, এসো তবে। ফিরতে খুব বেশি দেরি করো না।

এইভাবেই সুমোহনের মনটাকে তাক্ত করে দিয়ে, বাইরে বের হবার আনন্দটাকে তেতো করে দিয়ে তারপর এক কথায় সুমোহনকে মুক্তি দেয় হিমানী, আচ্ছা, এসো তবে।

যসিডির খোলা মাঠের রোদ আর বাতাসে বেড়িয়ে হিমানীর সেই বেয়াড়া জ্বরটা সেরে যায়নি ? সেরে গিয়েছিল বইকি ! হিমানীর সেই রোগা শরীরটা যেন যসিডির বাড়ির বাগানের মাধবীলতার মত ফুলেলা রসে ভরাট হয়ে গিয়েছিল। সেই চেহারার একটি ফটো লণ্ডনের সুমোহনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বউদি, যদিও খুব আপত্তি করেছিল হিমানী। কিন্তু সেই ফটো পেয়ে খুব যে খুশি

হয়েছিল সুমোহন, তা নয়।

একদিন উইণ্ডসর প্রাসাদ দেখে ফিরবার পথে, ট্যাক্সিতে পূরবীর পাশে বসে হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল সুমোহন— ওই যে, দূরে মাঠে সবুজ ঘাসের ছোট গুমটির মত একটা স্ট্রাকচার দেখছ, ওটা হল সেই জায়গা, যেখানে ম্যাগনা কার্টাতে সই দিয়েছিলেন রাজা জন।

—তাই নাকি ? ভাল করে দেখবার জন্য উঁকি দিতে গিয়ে পূরবীর মাথাটা সুমোহনের বুকে ঠেকে যায়। সুমোহনের চোখের কত কাছে ফুটে রয়েছে পূরবীর সেই আপনি রাঙা ফুল্ল ঠোঁট।

ঠিক সেইদিনই হোটেলের ঘরে ফিরে এসে যসিডির একটি বড় খামের চিঠি খুলতেই হিমানীর এই নতুন ফটো যেন জীবন্ত দুটো চোখ নিয়ে সুমোহনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। চমকে ওঠে সুমোহন। চোখে দীপ্তি নেই, মুখে হাসি নেই, গম্ভীর সুমোহন অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে থাকে, আর ফটোটাকে টেবিলের দেরাজের ভেতরে রেখে দেয়।

পাটনার একটা সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে কী যেন হয়েছে, তাই চিঠি লিখেছিলেন উকিল সান্যালমশাই, তুমি কবে দেশে ফিরবে, সুমোহন ? ভাল হয়, যদি এই মাসের শেষের দিকে ফিরে আসতে পার। দেরি হলে কিছু ক্ষতি হতে পারে।

সেদিন আর কোনও মিউজিয়মের গ্যালারির কাছে নয়, জোয়ারে উচ্ছল টেমসের তটে ছোট একটি পার্কের বেঞ্চের উপর বসে কালো রাজহাঁসের সুখের সাঁতার দেখতে থাকে সুমোহন দত্ত আর পূরবী নাগ। সুমোহনের কোলের উপর একটি উপহারের বস্তু, একটি চমৎকার জাপানি ক্যামেরা। উপহার দিয়েছে পূরবী।

পূরবী বলে— তুমি যখন পাটনা যাবে, তখন কলকাতায় ফেরার আগে একবার রাজগিরে আর নালন্দাতে যাবে আর জৈন মূর্তিকলার যা-কিছু দেখতে পাবে, সবারই ফটো তুলে নেবে।

সুমোহন— কেন ? কিসের জন্য ?

পূরবী হাসে— আমার জন্য।

সুমোহন— তাই বলো ! আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না !

পূরবী—বলো।

সুমোহন— তুমি আর আমি, দুজনেই খেটেখুটে জৈন মূর্তিকলা সম্বন্ধে একটা বড় বই লিখলে কেমন হয় ? হোয়াইট অ্যাণ্ড হ্যামণ্ড যখন খুশি আছে, তখন এই বই প্রকাশ করতেও কোনও অসুবিধে হবে না।

পূরবী— বইয়ের লেখকের কী নাম হবে ?

সুমোহন— কেন ? দুজনেরই নাম। সুমোহন দত্ত অ্যাণ্ড পূরবী নাগ।

বলতে গিয়ে সুমোহনের মুখের শেষ কথাটা কেমন যেন শব্দহীন হয়ে মিইয়ে গেল।

দুজনেই নীরব হয়ে যায়। সেই নীরবতার নেপথ্যে যেন অদ্ভুত একটা বেদনার ছায়া ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। সত্যিই কি একেবারেই অসম্ভব ? সেই বই-এর অথরশিপ কি দুটি নামের মিলন হয়ে দেখা দিতে পারে না, সুমোহন দত্ত অ্যাণ্ড পূরবী দত্ত ?

অনেকক্ষণ পরে কথা বলে পূরবী— কলকাতা যাবার দিন তো ঠিক করেই ফেলেছ।

সুমোহন— হ্যাঁ, পরশু দিন।

পূরবী— যাও, আমার অবিশ্যি এ মাসের মধ্যেই যাওয়া সম্ভব হবে না। একটু দেরি করতেই হবে।

সুমোহন— কেন ?

পূরবী— সরযূ মাসি দুঃখিত হবেন, যদি মেসোমশাইয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের আগেই চলে যাই।

সুমোহন— জন্মদিন কবে ?

পূরবী— আর তিনমাস পরে।

সুমোহন হাসে— সে যে অনেকদিন !

পূরবী হাসে— এত অধীর হলে চলবে কেন ?

সুমোহন— নাগপুরে পৌঁছেই কিন্তু আমাকে টেলিগ্রাম করে পৌঁছ-খবর জানাবে।
পূরবী— নাগপুর ? আর নাগপুরে থাকব কেন ?
সুমোহন— তবে কি কলকাতাতেই থাকবে ?
পূরবী হাসে— নিশ্চয়।
পূরবীর একটা হাত টেনে নিয়ে বুকের উপর ধরে রাখে সুমোহন। পূরবীর সেই লালচে ঠোঁটের উপর সুমোহনের মুখটাও লোলুপ হয়ে ঝুঁকে পড়ে।
আশ্বস্ত হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে সুমোহন। স্কলার সুমোহনের জীবনে পূরবীর মত স্কলার সঙ্গিনীর আবির্ভাব যে দুজনের আত্মারই একটা পরিতৃপ্তির অঙ্গীকার। যার সঙ্গে যাকে সবচেয়ে ভাল মানায়, তারই সঙ্গে তার ভালবাসার বন্ধন সত্য হয়ে উঠেছে।
কিন্তু দমদম এয়ারপোর্টে নেমে আর কাস্টম-বেড়া পার হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল সুমোহন, তার সঙ্গে যাকে একটুও মানায় না, সেই নারী হেসে হেসে এগিয়ে আসছে। কী ভয়ানক উৎফুল্ল হয়ে হাসছে হিমানীর সেই কালো চোখ, যে চোখে শুধু একটা মেয়েলিপনা চঞ্চল হয়ে কাঁপে, কিন্তু শিক্ষা বিদ্যা ও প্রতিভার কোনও দীপ্তি ঝিকমিক করে না।
খুব চেষ্টা করে একটা শুকনো হাসি হাসতে পারে সুমোহন, কিন্তু আর কিছুই পারে না। হিমানীর হাত ধরা দূরে থাকুক, হিমানীর সামান্য একটু গা-ঘেঁষে দাঁড়াতেও পারে না।
হিমানী বলে— তুমি আশ্চর্য।
সুমোহন— কী বললে ?
হিমানী— মাসে অন্তত একটা চিঠিও তো দিতে হয় !
সুমোহন—খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, তাই...।
হিমানী হাসে— তাই শুধু আমাকে একটা চিঠি লিখতে ব্যস্ত হতে পারনি।
সুমোহন— গাড়ি এসেছে ?
হিমানী— হ্যাঁ।
সুমোহন— আর কেউ এসেছে নাকি ?
হিমানী— না।
সুমোহন— তবে চলো, এখানে দাঁড়িয়ে ডিবেট করলে কোনও লাভ হবে না।
বাড়ি ফিরে এসে স্নান করে আর চা-খাবার খেয়েই বই-এর ঘরে ঢুকে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সুমোহন। জানতে হবে, জৈন মূর্তিকলা সম্পর্কে স্মিথ কী বলেছেন, মার্শালই বা কী বলেছেন। মনে হয়, ফার্গুসনও জৈন মূর্তি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন।
দুপুরবেলা খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আর হিমানীর দিকে না তাকিয়ে অদ্ভুত একটা কথা বলে সুমোহন— যসিডির খোলা মাঠের রোদে-বাতাসে এত বেড়ালে, তবু শরীরটা তো একটুও ভাল হল না !
হিমানী— কিন্তু সবাই তো বলছে, ভাল হয়েছে।
রাত্রিবেলা খাবার টেবিলের কাছে এসে আরও অদ্ভুত একটা কথা বলে সুমোহন— তোমার গায়ের ওই জ্বর বোধ হয় কোনও কালেও সারবে না।
চমকে ওঠে হিমানী— আমার তো এখন জ্বর-টর নেই, সেরেই গিয়েছে।
কিন্তু রাত্রি যখন গভীর হয়, যখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আর বুঝতে পারে হিমানী, সুমোহন এখনও তার পড়ার ঘরে বসে আছে, তখন বিছানা থেকে নেমে জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় হিমানী। আকাশে তারা আছে কিনা, ঝাপসা চোখে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু বুঝতে পারে, কপালটা বেশ গরম, নিঃশ্বাসেও একটা জ্বালা। জ্বর এসেছে নিশ্চয়।
তিনমাসের মধ্যে প্রায় দেড়টা মাস পাটনাতে রাজগিরে আর নালন্দাতে কাটিয়ে দিয়ে আবার যেদিন কলকাতায় ফিরে আসে সুমোহন, সেদিন থিয়েটার রোড়ের এক বাড়ি থেকে এক মহিলার টেলিফোনের বার্তা শুনে সুমোহনের বুকের ভেতরে নিঃশ্বাসের সব বাতাস যেন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। সৌদামিনী গুপ্তে বলছেন— আপনাকে জানাতে লিখেছে পূরবী, সে আর এক-দেড় মাস

পরে কলকাতাতে এসে আমারই পাশের ফ্ল্যাটে থাকবে।

ঠিক দেড়মাস পরে আবার একদিন ঠিক সন্ধ্যা হতেই টেলিফোনে বার্তা শোনে সুমোহন, সেটা পূরবীরই আগমনী বার্তা— আমি এসেছি।

গায়ে তসরের পাঞ্জাবি আর সাদা সুতির ঢিলে পায়জামা, আর পায়ে এক জোড়া বাঘ-ছাল চটি, এই সাজে বই-এর ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সুমোহন। এখনই একবার গিয়ে দেখা দিয়ে এলে মন্দ কী ?

জ্বরে কাতর শরীরটাকে নিয়ে এতক্ষণ ধরে ওঘরে বিছানার উপর শুয়ে ছিল যে হিমানী, সে হঠাৎ উঠে বসে আর ডাক দেয়— শুনছ ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় যাচ্ছ ?

—বাইরে।

—কেন ?

—কাজে।

ব্যস্তভাবে গ্যারেজের দিকে চলে যায় সুমোহন।

যেমন সেদিন তেমনই আজও ওই ভয়ানক কোথায় যাচ্ছ প্রশ্ন করে সুমোহনের বাইরে যাবার ব্যস্ততাকে বাধা দিয়েছে হিমানী, আর শেষ পর্যন্ত নিজেই সে বাধা সরিয়ে দিয়ে সুমোহনের পথ মুক্ত করে দিয়েছে, আচ্ছা, এসো তবে।

নিউ আলিপুরের সন্ধ্যার উতলা বাতাসে শিহর জাগিয়ে দিয়ে ছুটে চলে যায় সুমোহনের গাড়ি। সুমোহনের গাড়ির হর্নে সেই হর্ষ আজও আছে।

কিন্তু সুমোহনের বুকের ভেতরে সেই হর্ষ আজ আর নেই। মেঘলা আকাশের মত মনটা যেন মেদুর হয়ে রয়েছে। বুকের ভেতর ছমছম করছে দুঃসহ একটা ভয়। কারণ, যে কথা আজও বলা হয়নি সে কথা আজ পূরবীকে বলবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে সুমোহন। শুনে যদি শিউরে ওঠে, হঠাৎ আহত মানুষের মত আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, আর সুমোহনকে একটা অধম প্রবঞ্চক বলে ভর্ৎসনা করে পূরবী, তবে করুক। কিন্তু পূরবীর কাছে কপট হতে পারবে না সুমোহন। আর গোপন করে রাখা সম্ভব নয়, উচিতও নয় যে, হিমানী নামে অতি বাস্তব একটি কঠোর সমস্যা সুমোহনের কাছেই থাকে।

॥ ৩ ॥

হাতের ব্যাগের ভেতর থেকে একগাদা ফটো বের করে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে দেয় সুমোহন। পূরবীর চোখের সোনার ফ্রেম আর চোখ, দুই-ই যেন একসঙ্গে ঝিক করে হেসে ওঠে— এত ফটো তুলে ফেলেছ ?

সুমোহন— ফটো তুলতে বেশ ঝঞ্ঝাট ভুগতে হয়েছে। কোনও কোনও মন্দিরের কর্তারা তো মন্দিরের ভেতর ঢুকতেই দিল না। কিন্তু তোমার উপহার ওই জাপানি ক্যামেরা সত্যিই একটি ওয়াণ্ডার। অত্যন্ত পাওয়ারফুল ক্যামেরা। আমি মন্দিরের পাঁচিলের বাইরেই ঘুরে ফিরে আর তোমার উপহারের ওই ক্যামেরা দিয়ে মন্দিরের গায়ের অনেক হাফ-রিলিফ ছবি তুলে নিয়েছি। তা ছাড়া আরও একটা সমস্যা। এক একটি তীর্থংকরের মূর্তিকে সিঁদুর মাখিয়ে কেউ বা সূয্যি ঠাকুর, কেউ বা আবার বিষ্ণু ঠাকুর করে ফেলেছে। গাঁয়ের মানুষকে কত অনুরোধ করা হল, ওরে বাবা, একবার এই সিঁদুর একটু মুছে দে রে বাবা, মূর্তিটার ফটো তুলে নিই ; কিন্তু অনুরোধের মর্ম বোঝবার মানুষ নয় ওরা। টাকা দেওয়া হল, তবে কাজ হল। কিন্তু তুমি কতদূর কী করলে ?

পূরবী— আমার প্রায় দেড় শো পৃষ্ঠা নোট লেখা হয়ে গিয়েছে। রিভাইজ করব পরে। আমার মনে হয়, আমার ধারণার অনেক কিছুই ডক্টর খাণ্ডেলওয়ালার পছন্দ হবে না ; জোর প্রতিবাদ করে শেষে একটা তুমুল কন্ট্রোভার্সি বাধিয়ে তুলবেন।

সুমোহন— তুলুন না কেন ? তাতে ভয় পাই না।
পূরবী— তোমাকে আজ কেমন যেন ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে।
সুমোহন— না, ক্লান্ত হবার তো কারণ নেই।
পূরবী—আমি মনে করলাম, আজও বুঝি তুমি এলে না।
—আসতাম ঠিকই, কিন্তু আসতে একটু দেরি হত, এই যা।
—কেন ?
—তোমার এখানে আসবার জন্য ঠিক রওনা হবার সময়ে রোজই একটা বাধা পাই। সে বাধা আজ একটু বেশি ভয়ানক হয়ে উঠেছিল।
—কিসের বাধা ?
সুমোহনের মুখের চেহারাটা করুণ হতে হতে একেবারে সাদাটে হয়ে যায়— যে কথা তোমাকে কোনওদিনও বলা হয়নি, সে কথা আজ তোমাকে না বলে আর থাকতে পারছি না।
—বলো।
—তুমি নিশ্চয় জান না, অনেকদিন আগেই আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।
—নিশ্চয় জানি না। কিন্তু তাতে কী আসে যায় ?
চমকে ওঠে সুমোহন— কী বললে ?
পূরবী— একথা যদি সেদিন বলতে, তবে হয়ত কিছু আসত যেত।
—কোন দিনের কথা বলছ ?
গলার হারের লকেট, ইতিহাসের যাদু-মাখানো পুরনো বিজয়নগরের সেই পাথুরে তারা, যে তারা পূরবীর বুকের সুগন্ধে মোদিত হয়ে আছে, সেই তারাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কথা বলে পূরবী ; আর বলতে গিয়ে পূরবীর আপনি-রঙিন লালচে ঠোঁট আরও ফুল্ল হয়ে ওঠে।— টেমসের জোয়ার ; কালো রাজহাঁস সাঁতার দিয়ে খেলা করছে, পার্কের মাটিতে অনেক ডাফোডিল...।
—আর বলতে হবে না পূরবী। সেদিনই, সবকিছুর আগে তোমাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।
—হ্যাঁ, কিন্তু আমারও তো একটু জেনে নেওয়া উচিত ছিল।
—কী বললে ?
—আর বেশি ভাল করে বলবার কিছু নেই, সুমোহন। কী উচিত কী অনুচিত, সে কথা আজ আর ভেবে লাভ নেই।
ব্যাকুল হয়ে পূরবীর একটা হাত চেপে ধরে সুমোহন— আমি স্বপ্নেও আশা করিনি পূরবী, তুমি একথা বলবে। তুমি আমার একটা দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণা শান্ত করে দিলে।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে পূরবী— আমি তোমাকে আর একটা অনুরোধের কথা বলব।
—বলো।
—তুমি নিজেও শান্ত হয়ে যাও।
—কী বললে ?
—আমার হাত আর ধরো না। আমিও তোমার হাত আর ধরব না ; আমিও একেবারে শান্ত হয়ে যাব।
হাত তুলে খোঁপাটাকে একটু তুলে দিতে গিয়ে হাত দিয়ে চোখ দুটোকেই ঢেকে ফেলে পূরবী— তুমি আর আমি, দুজনে মিলে একটি বই লিখব, এই সম্পর্কই চিরকাল অটুট থাকুক।
—শুধু, এই সম্পর্ক ?
—হ্যাঁ। এ ছাড়া তো আর কোনও সম্পর্ক হতে পারে না!
—খুব পারে।
—কেমন করে ? তোমার সঙ্গে তো আমার বিয়ে হতে পারে না।
—হতে পারে, পূরবী।
—যিনি তোমার ঘরে এখন আছেন, তাঁকে কি মামলা করে সরাবে ?

—না, ছাড়াছাড়ির মামলার মধ্যে আমি যাব না।

—তবে ?

চেয়ার থেকে উঠে এসে পূরবীর মাথাটা বুকের উপর টেনে নিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সুমোহন— শুধু একটু অপেক্ষা করতে হবে পূরবী। আমি বলছি, আমার মন বলছে, আমাদের বিয়ে হবে।

পূরবী— তোমার কথার মানে তবে কি এই যে, তোমার ঘরের মহিলা নিজেই সরে যাবেন ?

সুমোহন— আমার তো তাই মনে হয়।

পূরবীর চোখ দুটো এখন আর হাতে ঢাকা নেই। খুব শান্ত আর খুব উজ্জ্বল দুটি চোখ। সুমোহনের মুখেও সেই সাদাটে করুণতা আর নেই। রুমাল দিয়ে কপালটাকে মুছে দিয়েছে সুমোহন, কপালে কোন যন্ত্রণার রেখাও আর নেই।

পূরবী— বাড়ি থেকে বের হবার আগে চা খেয়েছিলে ?

সুমোকহন— হ্যাঁ।

পূরবী— তুমি কি গোমতেশ্বর যাবে বলে একেবারে ঠিক করে ফেলেছ ?

সুমোহন— যাব ঠিকই, তবে খুব শিগগির যাওয়া সম্ভব হবে না। যদি পারি তো, একবার হাজারিবাগে গিয়ে বুড়ো আচার্য হরি শাস্ত্রীর কাছে গিয়ে আর আলোচনা করে কিছু তথ্য জেনে আসব।

পূরবী— কে হরি শাস্ত্রী ?

সুমোহন— ইওরোপের ইণ্ডোলজিস্ট মশাইরা যাঁর কাছে চিঠি লিখে ভূরি ভূরি তথ্য জেনে নেন, তিনিই হলেন হরি শাস্ত্রী।

পূরবী— আমাব খুব ইচ্ছে ছিল দেশে ফিরে আসবার আগে লণ্ডন থেকে একবার হামবুর্গে গিয়ে ডক্টর আল্ডশ্রফের সঙ্গে দেখা করে আসি।

সুমোহন— আমারও খুব ইচ্ছে ছিল।

পূরবী— দুজনেই যদি আরও কিছুদিন বিদেশে থাকতাম, তবে খুব ভাল হত।

সুমোহন— ঠিকই, একটা প্ল্যান করে দুজনে একসঙ্গে আরও কয়েকটা দেশের মিউজিয়ম দেখলে খুব উপকার হত।

পূবরী— আমার আর প্যারিসের লুভর্ দেখা হল না।

সুমোহন হাসে— কিসের জন্যে ? মিলোর হাতকাটা ভেনাসকে দেখতে ?

পূরবী—. নিশ্চয় দেখতাম।

সুমোহন— কী স্টাডি করতে ? ভেনাসেব বডি-বিউটিফুল ? গড়নের ধাঁচ আর স্টাইল ?

পূরবী— তা তো করবেই আর্ট-ক্রিটিক।

—তুমি নিজেও তো একটি বডি-বিউটিফুল। কিন্তু তোমার নিজের গড়নটিকে কখনও কি স্টাডি করেছ, অয়ি আর্ট-ক্রিটিকে !

—করেছি।

—কিন্তু বুঝতে পেরেছ কি ভেনাসের গড়নের সঙ্গে তোমার কোনও মিল আছে কিনা ?

—খুব বুঝেছি, কোনও মিল নেই।

—আমি কিন্তু বুঝেছি, কার সঙ্গে তোমার খুব মিল আছে ?

—কার সঙ্গে ?

—খাজুরাহোর গন্ধর্ববধূর সঙ্গে।

—চুপ করো। বুঝতেই পারছ না বোধ হয়, কত রাত হয়েছে।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকায় আর উঠে দাঁড়ায় সুমোহন— অ্যাঁ ? তাই তো ?—এগারোটা !...আচ্ছা, আসি তবে। ইণ্ডিয়ান আইভরি সম্বন্ধে কিছু রেফারেন্স আমার চাই, আমার খুব দরকার। কষ্ট করে একটু খোঁজখবর করবে ?

—বেশ তো, কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে সম্ভব হবে না। অন্তত দুটো সপ্তাহ লাগবে ?

—তা লাগুক। তাতে আমার অসুবিধে হবে না।

হর্ন বাজিয়ে, রাতের থিয়েটার রোডের বাতাস শিউরে দিয়ে চলে যায় সুমোহনের গাড়ি। আর, পূরবী হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—আয়া! জগমায়া, কোথায় তুমি? ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

॥ ৪ ॥

চমকে ওঠে সুমোহন, বই বন্ধ করে আর তীব্র একটা দৃষ্টি তুলে হিমানীর দিকে তাকায়। হিমানীর হাতে একটা তোয়ালে, কোমরেও একটা তোয়ালে জড়ানো, সুমোহনের বই-এর ঘরে ঢুকে বই-এর ধুলো ঝাড়ছে হিমানী।

সুমোহনের ওই দৃষ্টিতে দুঃসহ একটা বিস্ময় আছে। হিমানীর হাত দুটো তো সেরকম রোগা হাত নয়, বেশ পুষ্ট দুটি চটপটে হাত। সুমোহন বলে— কী ব্যাপার? জ্বরের মানুষ হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে, আর এখানে এসে এরকম ছুটোপুটি করছ কেন?

হিমানী হাসে— ছুটোপুটি করছি না, কাজ করছি। আর, আমার গায়ে জ্বরও নেই।

—নেই? প্রশ্ন করতে গিয়ে সুমোহনের দুই ভুরু কুঁচকে যায়।

—জান না?

—না।

—আজ একুশ দিন হল আমার জ্বর নেই। ডাক্তার বলেছেন, জ্বর আসবার ভয়ও আর নেই। ভাত ডাল মাছ পেঁয়াজ-ভাজা, সব কিছুই খাচ্ছি।

—এ যে দেখছি অদ্ভুত জ্বর। আর, ডাক্তারও বেশ অদ্ভুত কথা বলে!

কথা বলতে গিয়ে নিজের গলার স্বর যে কী অদ্ভুত হয়ে গেল, সেটা বোধ হয় বুঝতে পারে না সুমোহন।

হিমানী— আমি এখন এখানে কাজ করলে, তোমার পড়ার কি কোনও অসুবিধে হবে?

সুমোহন—হ্যাঁ, হবে।

হিমানী—তবে আমি এখন যাই?

সুমোহন— যাও।

হিমানী তো গেল, কিন্তু কতদূর গেল? এই পড়ার ঘর থেকে ওই ঘরে কিংবা ওদিকের ঘরে। এখানে বই-এর ধুলো ঝাড়তে এসেছিল হিমানী, এখন ওদিকের ঘরে গিয়ে মিররের ধুলো ঝাড়বে, কিংবা এক টুকরো শামোয়া-লেদার দিয়ে মিনে-করা জয়পুরি পেতলের টেবিল টপের ময়লা মুছে চকচকে করবে। জ্বর সেরে গিয়েছে যার, সে তো এই কাণ্ডই করবে। শুধু এ ঘর থেকে ও ঘরে, তারপর আবার ওদিকের ঘরে, ওর কাজ আর থামবে না।

বই খুলে আবার পড়তে চেষ্টা করলেও পড়তে পারে না সুমোহন। মনের ভেতরে একটা আশাভঙ্গ স্বপ্নের চাপা-যন্ত্রণার গুঞ্জন শুনতে হচ্ছে, বই পড়া অসম্ভব।

কালই তো, অনেক রাত পর্যন্ত আইনের একটা বই পড়তে হয়েছে। কিন্তু সেই বইয়েও সেরকম কোনও স্পষ্ট আশার অঙ্গীকার নেই। আদালতের কাছে ছাড়াছাড়ির দরখাস্ত করতে, সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করাতে অনেক অসুবিধে আছে। আরও জটিল বিপদের জালে জড়িয়ে পড়বার, তা ছাড়া, আরও বেশি ঠকে যাবার ভয় আছে।

বই বন্ধ কবে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুমোহন। দুই চোখ অপলক। নিঃশ্বাসও মন্থর। সুমোহনের প্রাণটা যেন একটা শূন্যতার গভীরে ডুব দিয়ে ডুবুরির মত সন্ধান করে দেখছে, সেখানে আইনের অক্টোপাস ছাড়া কোনও মুক্তা-ঝিনুক আছে কি না। সত্যিই কি কোনও উপায় নেই?

কলিং-বেল বাজে। কে এল? চাকরটা শুনতে পেল কি? বাইরে গিয়ে একবার দেখতে হবে তো, কে এসেছে। ঘরের দরজার দিকে তাকায় সুমোহন। বুঝতে চায়, চাকরটা সত্যিই বাইরে গেল কি গেল না।

চাকর এসে একটা চিঠি দিয়ে যায়। সেই ডাকপিয়ন বোধ হয় এসেছিল, যার এক চোখ কানা। চিঠির বাক্সটাকে দেখতেই পায় না কানা ডাকপিয়ন, বার বার কলিং-বেল বাজায়।

চিঠির কভার দেখেই বুঝতে পারে সুমোহন, হাজারিবাগ থেকে চিঠি দিয়েছেন আচার্য হরি শাস্ত্রী। চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে দেয় সুমোহন। এমনই অলস হয়ে গিয়েছে সুমোহনের হাত যে, হরি শাস্ত্রীর চিঠিকেও লুফে নিতে পারে না, ব্যস্ত হয়ে খুলতেও পারে না। এ ঘরে এমন কেউ নেই যে, হরি শাস্ত্রীর ওই চিঠি দেখে, সেই মুহূর্তে উৎসুক হয়ে, ব্যস্ত হয়ে চিঠি খুলবে আর পড়বে। উৎসুক হতে পারে যে, ব্যস্ত হয়ে এই চিঠি খুলে ফেলতে আর পড়ে ফেলতে পারে যে, সে এখানে থাকে না।

কিন্তু সে কি কোনওদিন এখানে আসতেই পারবে না? এই বই-এর ঘরে, এই সোফাতে সুমোহনের পাশে বসে কথা বলবে না? এই তো এই সেদিনও, দুপুরবেলাতে এই সোফাতে বসে বই পড়ে পড়ে যখন সুমোহনের ক্লান্ত চোখে একটা তন্দ্রা এসেছিল, তখন তো মনেই হয়েছিল, পাশে বসে আছে পূরবী ; ইস্টার্ন আর্ট জার্নালে পূরবীর যে লেখা বের হয়েছে, সেই লেখাটা সুমোহনকে পড়ে শোনাচ্ছে। তবে কি শুধু এরকম একটা নিছক তন্দ্রাসার জীবন নিয়ে পড়ে থাকতে হবে?

কলিং-বেল বাজে। কে এল আবার? চাকরটা বাইরে গেল কি?

হিমানী এসে বই-এর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়। —বিকাশদা এসেছেন।

সুমোহন— কে বিকাশদা?

হিমানী—মনে পড়ছে না?

সুমোহন— না।

হিমানী—তোমারই শুভা বউদির মেজদা। পাটনাতে একদিন যাকে টেনিসে চ্যালেঞ্জ করে তুমি পাঁচবার হেরে গিয়েছিলে।

সুমোহন— হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভাগলপুরের শুভা বউদির দাদা, বিকাশ। কিন্তু এতদিন পরে আজ হঠাৎ...জিজ্ঞাসা করেছ, কিসের দরকারে এসেছে?

হিমানী— আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি। নিজেই বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বাইরের ঘরে বসে আছেন।

সুমোহন— এখানেই নিয়ে এসো।

বিকাশকে ডেকে আনতে চলে যায় হিমানী। আর, সেই মুহূর্তে সুমোহনের চোখে যেন একটা বিদ্যুতের আভা ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে। প্রবল আশার আবেগে ভরা বিদ্যুৎ।

বিকাশ এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াতেই হেসে ওঠে সুমোহন—এসো বিকাশ।

বিকাশও খুব খুশি হয়ে হাসে। —চিনতে পারছ তাহলে। ভয় ছিল, ভুলেই গিয়েছ বোধ হয়। সত্যিই তো, ভুলে যাবারই কথা। সেই কবে, প্রায় দশ বছর আগে পাটনাতে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। তা-ও বা কটা দিন? দুটি কি তিনটি। শুভা বললে, তুমি বিলেত থেকে ফিরে এসেছ, তোমার এই ঠিকানাও শুভার কাছে পেলাম।

সুমোহন— তুমি এখন কোথায় আছ?

বিকাশ— এই কলকাতাতেই।

—কিছু একটা করছ নিশ্চয়!

—হ্যাঁ, এখন একটা ক্লথ মিলের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আছি। ডিরেক্টর নই, নিতান্ত অফিসার।

—তা মন্দ কী? সবাই তো আর সুমোহন দত্তের মত কুঁড়ে হয়ে দিন কাটাতে পারে না। কাজ করতেই হয়।

—ও কথাটি বলো না, সুমোহন। মনে করেছ আমি বুঝি কিছুই জানি না। শুভার কাছ থেকে সবই শুনেছি। লেখাপড়া তোমার ধ্যান ভজন প্রাণ। এ কি চারটিখানি কথা! কতজনেই তো বিপুল পৈতৃক সম্পত্তি পাচ্ছে, কিন্তু শুধু ফূর্তি করে দিন কাটালে। তোমার মত কজন আছে যে, অনেক টাকার মানুষ হয়েও শুধু বিদ্যাচর্চাকেই জীবনের ব্রত করে নিয়েছে?

—তুমি কলকাতার কোন পাড়াতে থাক?

—এখান থেকে খুব দূরে নয় ; টালিগঞ্জে।
—বাড়িতে আর কে আছেন ?
—কেউ না।
—কেন ? বিয়ে করনি ?
—না।
—কেন ?
—বিয়ে করবার কথা মনে করবারও সময় পাইনি। বিশ্বাস করো সুমোহন, চাকরির জন্য স্ট্রাগল্ করতে করতে আমার সাত-আটটা বছর কেটেছে। এখন যা-হোক তবু একটা স্থিতি পেয়েছি। মন্দ নয় চাকরিটা।
—এবার তবে আরও একটু স্থিতি লাভ করে ফেল।
—কীভাবে ?
—বিয়ে করো।
—করে ফেলব হয়ত ; কিন্তু সেজন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠতে আমার ইচ্ছে করে না।
—শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে কত বয়স হল তোমার ?
—বত্রিশ।
—তুমি তা হলে আমার চেয়ে মাত্র তিন বছরের ছোট ? আমি মনে করেছিলাম, তুমি বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি খোকা।
—অফিসের স্টাফের লোকেরা তাই মনে করে। সে জন্যে বেশ অসুবিধেও ভুগতে হয়।
—কী রকম ?
—এই ধরো, অ্যাকাউন্টসের সত্যেন, যার বয়স তেইশ বছরও হবে কিনা সন্দেহ, সে একটা সিনেমা-ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে এসে একটা অভিনেত্রীর ছবি দেখায় আর জিজ্ঞেস করে— চেহারাটা কেমন মনে হয় স্যার ? পছন্দ হয় স্যার ? বুড়োরা তো তুচ্ছ করেনই ; আড়ালে বলাবলি করেন, কাজের কী বোঝে এই ছোকরা ?
—টেনিস খেলবার নেশা এখনও আছে, না ছেড়ে দিয়েছ ?
—ছেড়েই দিয়েছি। ভুলেও গিয়েছি।
—তা হলে সময় কাটাও কি করে ?
—ওই বাড়ি থেকে অফিস, আর অফিস থেকে বাড়ি।
—তারপর ?
—তারপর বিছানায় পড়ে হয় রেডিও শুনি, নয় ঘুমোই।
—ছুটির দিনে ?
—ছুটির দিনে দু-চারটে চিঠিপত্র লিখি, আর কুকুরটাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।
—আমার এখানে বেড়িয়ে গেলেই তো পারো।
—পারি বইকি ! কিন্তু সেটা তোমার পড়াশোনার মস্ত ব্যাঘাত হবে।
—একটুও ব্যাঘাত হবে না। তুমি যখনই সময় পাবে, তখনই একটু কষ্ট করে এখানে চলে এসো।
—না না, কষ্ট করবার কিছুই নেই। বরং...
ঘরে ঢোকে হিমানী— বিকাশদা'র চা কি এখানেই নিয়ে আসব।
সুমোহন— হ্যাঁ, এখানেই নিয়ে এসো, কিন্তু শুধু কি চা ?
হিমানী হাসে— না, শুধু চা কেন ? খাবারও আছে। নিয়ে আসি।
আবার ঘরে ঢুকে, বিকাশের হাতের কাছের টেবিলের উপর চা-খাবারের ট্রে নামিয়ে রেখে, নিজেও একটা কোচের উপর বসে পড়ে হিমানী— বিকাশদাকে সাত বছর আগে পাটনাতে যেমনটি দেখেছিলাম, আজও তেমনটি দেখছি।
সুমোহনের চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটা প্রসন্নতা। সুমোহনের ডুবুরী প্রাণ যেন এতক্ষণে একটা

মুক্তা-ঝিনুক দেখতে পেয়েছে।

বিকাশের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে হিমানী। কত কথাই না জিজ্ঞেস করছে হিমানী— ভাগলপুরে কবে গিয়েছিলেন ?

বিকাশ— এই তো, গত মাসে। তাই তো তোমাদের ঠিকানা পেলাম।

হিমানী— শুভাদির মেয়ে সেই টুটু এখন নিশ্চয় খুব বড় হয়েছে ?

বিকাশ— হ্যাঁ, স্কুলে পড়ছে।

হিমানী— আমার সঙ্গে আপনার প্রথম কবে দেখা হয়েছিল, বলুন তো ?

বিকাশ— ভাগলপুরে, শুভার বাড়িতে। তুমি তো তখন মাত্র ফার্স্ট ইয়ার ; নয় কি ?

হিমানী— ঠিক।

বিকাশ— সেদিন শুভাদের বাড়িতে কী যেন একটা ব্যাপার ছিল ?

হিমানী— টুটুর অন্নপ্রাশন। সেই জন্যই তো বাবার সঙ্গে আমিও ভাগলপুরে গিয়েছিলাম। শুভাদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো শুধু এদের দিক দিয়ে নয় ; ওদিক দিয়েও আছে। শুভাদি হলেন আমার বাবার এক মামাতো ভাইয়ের মেয়ে, নশু কাকার মেয়ে। নশু কাকা অনেকদিন আমাদের যসিডির নার্সারির এজেন্ট ছিলেন।

বিকাশের চা খাওয়া তো শেষ হয়েই গিয়েছে। এইবার সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়ায় বিকাশ— আচ্ছা, আমি আজ তবে চলি, হিমানী, চলি সুমোহন।

সুমোহন— হ্যাঁ, এস। আবার এস, শিগ্‌গিরই এস। ভুলে যেও না যেন !

—না না, ভুলে যাব কেন ?

॥ ৫ ॥

টালিগঞ্জ থেকে নিউ আলিপুর কতই বা দূর ! কিন্তু তিনমাসের মধ্যে মাত্র তিনদিন সুমোহনের বাড়িতে এসে চা খেয়ে গিয়েছে বিকাশ। তবু বিকাশের উপর বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে সুমোহন।

কিন্তু তার পরের মাসে সপ্তাহের প্রতি রবিবারেই এসেছে বিকাশ। অনেকক্ষণ বসে হিমানীর সঙ্গে গল্প করেছে, চা খেয়েছে আর চলে গিয়েছে। শুনে খুব সন্তুষ্ট হয়েছে সুমোহন।

সুমোহন শুধু শুনতেই পায়, দেখতে পায় না, কবে কখন বিকাশ এল আর গেল। হিমানী বলে, তাই শুনতে পায়, বিকাশদা এসেছিলেন। সারা দিনমান পড়ার ঘরে বসে থেকেও প্রাণটা যার আপনি-রঙিন দুটি ফুল্ল ঠোঁটের রক্তিমার কাছে পড়ে থাকে, সে তো সন্ধ্যা হলে নিজেই সশরীরে সেই রক্তিমার কাছে গিয়ে বিহ্বল হয়ে যায়। বিকাশ এসে সুমোহনের দেখা পাবে কেমন করে ? বিকাশও যে সন্ধ্যাবেলাতেই আসে।

হঠাৎ কোনওদিন যদি সকালবেলাতে চলে আসে বিকাশ, শুধু তবেই সুমোহনের সঙ্গে অনেক গল্প করে, অফিসের যত কাহিনী শুনিয়ে, তারপর চলে যায়।

একদিন আচমকা সুমোহনের পড়ার ঘরে ঢুকে একটা তর্ক বাধিয়ে তোলে হিমানী— আমাকে সিনেমা হাউসে ছবি দেখাতে নিয়ে যাবার জন্য তুমি বিকাশদাকে বলেছ কেন ?

সুমোহন— বলেছি, তোমারই ভালর জন্য। তোমার তো আর আমার মত লেখাপড়ার কোনও কাজ নেই। ঘরের কাজও নেই বললেই চলে। তোমার সময় কাটবে কী করে ? তাই বিকাশকে বলেছি...

হিমানী—না, আমি ছবি দেখতে যাব না। আমাকে ছবি দেখাবার জন্য তোমাব এতই ইচ্ছে যদি হয়ে থাকে, তবে নিজেই তো আমাকে নিয়ে যেতে পার !

—আমার সময় কোথায় ?

—ইচ্ছে থাকলে সময় করে নিতে পার।

—না।

—তবে আমার ছবি দেখে দরকার নেই।

হিমানীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই চোখ ফেরায় সুমোহন। চোখে যেন শুকনো বাতাসের একটা ঝাপটা এসে লেগেছে। হিমানীর ওই মুখে সুমোহনের আশার কোনও ছাপ নেই। হিমানীর এই ভাষাও যেন অচল-অনড় একটা প্রতিজ্ঞার ভাষা। কপাট খুলে দেওয়া হয়েছে, পথও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু সরে পড়তে চায় না কয়েদি ; এ প্রায় সেইরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

আশা বলতে এই আশা যে, বিকাশ আসে। একদিন হিমানীর মুখের একটা কথা শুনে খুশিই হল সুমোহন— বিকাশদার কি কাজকর্ম নেই ? আজকাল রোজই আসছেন। গল্প করবার কিছু নেই, তবু বিকাশদা গল্প করতে চেষ্টা করেন। এত সময় নষ্ট করতে পারে মানুষ !

আবার একদিন তর্ক। হিমানীর চোখে-মুখে দুঃসহ একটা জ্বালা ছটফট করছে। হিমানী বলে— আমি কি একটা অন্ধ, না খোঁড়া ?

সুমোহন— ঝগড়া করতে তৈরি হয়েছ বুঝি ?

হিমানী— আমি তো নিজেই মার্কেটে যাই, কেনাকাটা করে ফিরে আসি। কোনওদিন তো কারও সঙ্গে যাবার দরকার হয়নি !

সুমোহন— তা তো জানি।

হিমানী— তবে তুমি বিকাশদা'কে এত ধরি-পড়ি করে অনুরোধ করেছ কেন, আমার মার্কেটে যাবার সময় আমার সঙ্গে থাকতে ?

সুমোহন— তোমার একটু সাহায্য হবে, তাই বলেছি।

হিমানী—না, আমার কারও সাহায্যের দরকার নেই।

সুমোহন— দরকার আছে, তুমি বুঝতে পারছ না, তাই ওকথা বলছ।

আর কোনও কথা না বলে, চোখে-মুখে সেই জ্বালা নিয়েই বই-এর ঘর থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে চলে যায় হিমানী। হ্যাঁ, এখন এই ঘরটাকে হিমানীর নিজের ঘর বলতে হয়। কারণ, ওটা এখন হিমানীর নিতান্ত একলা দরকারের ঘর। সকাল, দুপুর, রাত, এ ঘরের ভেতরে শুধু একা হিমানীরই ছায়া পড়ে। বিছানার খাটের কাছে সেই ছোট টেবিলটাও আর নেই, যে টেবিলের উপর এক গেলাস জল থাকত। মাঝরাতে তৃষ্ণার্ত মানুষটা, ক্লান্ত সুমোহন সেই জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ত। বিছানাতে শুয়ে পড়বার আগে সেই এক গেলাস জল রেখে দিত হিমানী। কোনওদিনও ভুলে যায়নি, ভুল হয়নি। কিন্তু আজ আর ভুলে যাবার কিংবা ভুল করবারও উপায় নেই। সেই যে বিলেতে গেল আর ফিরে এল সুমোহন, তারপর আর খাটের কাছে টেবিলের উপর এক গেলাস জল রাখবার দরকার বোধ করেনি হিমানী। সুমোহন তার বই-এর ঘরেই ছোট একটা খাট রেখেছে, সেই খাটের বিছানাতে ঘুমিয়ে জীবনের এক-একটি রাত্রি ভোর করে দেয় সুমোহন।

কী আশ্চর্য, একমাসের ছুটি পেয়েছেন বিকাশদা, ট্রেনে ফার্স্টক্লাসে যাওয়া-আসা করবার একটা পাশও পেয়েছেন, তবু কলকাতা থেকে নড়লেন না। আগে তো গল্প করে কতবার বলেছেন, দিন পনেরোর ছুটি পেলে অন্তত আগ্রা গিয়ে তাজমহলটা একবার দেখে আসব। কিন্তু কই ? আগ্রা যাওয়ার যে নামও করেন না বিকাশদা ! জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলেন— আর তাজমহল ! বাদ দাও তাজমহল।

আর একদিন ঠিক আবার এই রকমই কথা বলে ফেলে বিকাশ—পি. সরকারের ম্যাজিক দেখব বলে টিকিট কিনেছিলাম, কিন্তু নাঃ, ইচ্ছে করেই আর দেখলাম না।

বুঝতে পারে না হিমানী, মানুষের শখের মনটাও এত সহজে দু-দিনের মধ্যে উল্টে-পাল্টে একেবারে অন্যরকম হয়ে যায় কেন ? যা-ই হোক, বিকাশদার এই নিত্য-নিয়মিত আগমন এখন একটু থামলে ভাল হয়।

বিকাশের এই নিত্য-নিয়মিত আগমন কিন্তু একটুও থামে না। দেখে আরও অদ্ভুত লাগে হিমানীর, বাইরের ঘরে গিয়ে বসতে হিমানীর এত স্পষ্ট কুণ্ঠা চোখে দেখেও বিকাশ যেন বুঝতে পারে না। বাইরের ঘরে বসে ডাক দেয় বিকাশ—হিমানী, আমি এসেছি।

হিমানী ভেতরের ঘর থেকে জবাব দেয়—বসুন তবে, আমার একটু দেরি হবে।

একঘণ্টারও বেশি সময় পার হয়ে যায়। ভেতরের ঘরে বসে, লেসের সুতো ও কাঁটা নাড়াচাড়া

করে হিমানী, কিন্তু দশটা ঘরও বুনতে পারে কিনা সন্দেহ। তারপর ব্যস্ত হয়ে নয়, কিন্তু দায়ে পড়া একটা ইচ্ছার মত, আস্তে আস্তে হেঁটে বাইরের ঘরে আসে, আর দায়ে পড়া একটা শুকনো ভদ্রতার মুখরক্ষা করবার জন্য ওই একটি কথাই বলে—কী খবর!

বিকাশ— আমার কাছে খবর বলতে তো ওই এক আপিসের খবর। সে খবর শুনে তোমার লাভ নেই, শুনতে ভালও লাগবে না।

হিমানী হাসতে চেষ্টা করে— ঠিকই বুঝেছেন।

বিকাশ— একটা কথা বলবার ছিল!

—বলুন!

—তোমাদের রেডিওটা ভাল বাজছে না বোধ হয়। রোজই শুনছি কেমন যেন ঘ্যার-ঘ্যার করছে।

—হ্যাঁ, খারাপ হয়ে গিয়েছে রেডিওটা।

—তবে দাও না বেডিওটা, আমি সারাবার দোকানে দিয়ে আসি। সারাই হয়ে গেলে আমি আবার গিয়ে নিয়ে আসব।

হিমানীর চোখে ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে।—কে আপনাকে রেডিও সারিয়ে আনতে বলেছে?

—কেউ বলেনি।

—নিশ্চয় কেউ বলেছে, কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। সত্যি করে বলুন তো?

—না না, কেউ বলেনি। সুমোহন শুধু ওই দু-একবার তোমাকে ছবি দেখিয়ে আনতে, একটু বেড়িয়ে আনতেও বলেছিল। একবার বোধ হয় তোমার সঙ্গে মার্কেটে যাবার জন্যেও বলেছিল। কিন্তু আর তো কোনওদিন কিছু বলেনি।

হিমানী—কিন্তু আপনিই বা আমার রেডিও সারিয়ে আনতে ব্যস্ত হবেন কেন?

বিকাশ—রোজই নিজের কানে শুনছি, রেডিওটা বাজে আওয়াজ করছে; অথচ দেখছি, এই দশ দিনের মধ্যে কেউ রেডিওটা সারিয়ে আনল না।

নীরব হয়, গম্ভীর হয় হিমানী। বিকাশদার এই ব্যস্ততা তো সুমোহনের ইচ্ছার একটা অভিনয় নয়। বিকাশদা নিজের ইচ্ছাতে ব্যস্ত হয়েছেন। হিমানী বলে—আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হবেন না। রেডিও সারিয়ে আনবার ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারব।

বিকাশ—বেশ তো, তাই করো। কিন্তু আমি ব্যবস্থা করে দিলে কি তোমার কোনও ক্ষতি হত?

হিমানী—না।

বিকাশ—তবে?

তবে এত গম্ভীর হয়ে, আর এত অদ্ভুত স্বরে কথা বলছেন কেন বিকাশদা? চমকে ওঠে না হিমানী, কিন্তু অস্বস্তি বোধ করে। সামান্য একটা কাজের কথা বলতে হলে এত গম্ভীর হতে হয় না; আর এরকম নিষ্পলক চোখ নিয়ে কারও মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার দরকার হয় না।

বিকাশ চলে যায়। কিন্তু সেই বাইরের ঘরেই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে হিমানী। সুমোহনের সঙ্গে তর্ক করবার কোনও যুক্তি নেই, কোনও মানেও হয় না। কিছুদিনের জন্য যসিডিতে গিয়ে থাকতে পারলে ভাল ছিল। কিন্তু যসিডিতে গিয়েও কি মনে কোনও শান্তি পাওয়া যাবে? শুধু কল্পনা করে কিছু বুঝতে পারা যাবে না, আর বিশ্বাসও হবে না, রোজই সন্ধ্যায় বাইরে বের হয়ে যান যে স্কলার, তিনি ভালয় ভালয় রাত্রিবেলায় বাড়ি ফিরে এলেন কিনা।

আজও যা, কালও তা। একটা একঘেয়ে সুরের ভাবনা আর একই রকমের ওঠা বসা ও শোওয়ার একটা জীবন নিয়ে হিমানীর দিন কেটে যেতে থাকে বটে, কিন্তু আর যেন সহ্য করতে ইচ্ছে করে না। যসিডির খোলা মাঠের রোদ-বাতাসের জন্য প্রাণটা ছটফট করে।

দেয়ালির রাত। তুবড়ি ফাটছে, ফানুস উড়ছে, আর আতসবাজির ফুলঝুরি ঝরে পড়ছে; বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর আলো নিভিয়ে দেখতে থাকে হিমানী। এ এক অদ্ভুত খেলা। প্রথমে আলোর ঝলক, তারপরেই ছাই; শুধু ছাই।

ঠাকুর-চাকর সবাই বাইরে বের হয়েছে। দেয়ালির রোশনাই দেখবার জন্য ওরা আজ সব কাজ সন্ধ্যার আগেই সেরে দিয়ে গিয়েছে। আর স্কলার মশাই তো গিয়েছেনই, রোজ সন্ধ্যায় যেমন যান, যেখানে যান সেখানে। বাড়িতে কেউ নেই, মন্দ লাগছে না এই শূন্যতা।

আজ কিন্তু হিমানীর কল্পনাতে একটু ভুল হয়ে গিয়েছে, যদিও সেটা কল্পনার দোষ নয়। আজ বই-এর ঘরে চুপ করে বসে আছে সুমোহন, ঘরে অন্ধকার। দেয়ালির রাতের এইসব আলোর ঝলক আর চমক বোধ হয় সুমোহনের আজ একটুও ভাল লাগছে না। কিংবা হতে পারে, বুড়ি সৌদামিনীর ঘরে আজ সন্ধ্যায় পূরবীর নেমন্তন্ন হয়েছে, সেইজন্যেই বের হয়নি সুমোহন।

আতসবাজির একটা টুকরো অঙ্গার ছিটকে এসে বারান্দার উপর পড়ে। বারান্দাতে আর না দাঁড়িয়ে, বাইরের ঘরে এসে বসে হিমানী। এ ঘরে অবশ্য একটি মার্কারি-আলো জ্বলছে। নীলচে আলো, তবু খুব জোরালো আলো। চাকরটা বোধ হয় ইচ্ছে করে আজ রাতে এই ঘরেও একটা রোশনাই মাতিয়ে দেবার জন্য এই কাণ্ডটা করেছে।

চমকে ওঠে হিমানী। বিকাশদা এসেছেন। কী আশ্চর্য, এত বড় কলকাতার এদিক-সেদিক ঘুরে দেয়ালির আলো দেখবারও কি কোনও শখ নেই বিকাশদার মনে? তাজমহল, দেয়ালি আর পি. সরকারের ম্যাজিক, সবই কি এখানে, এই বাড়িতে?

ঘরের ভেতরে ঢুকে বিকাশ আজ আর হেসে কথা বলে না। সোফাতে বসেও ছটফট করে। সিগারেট ধরায়, কিন্তু সিগারেটের ধোঁয়া টানতে আর ছাড়তে ভুলে যায়। খুব আনমনা আর খুব উদাস, বিকাশের হাত থেকে সিগারেটেও একবার ফসকে পড়ে যায়।

হঠাৎ সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় বিকাশ, হিমানীর কাছে এগিয়ে যায়। দুহাত বাড়িয়ে হিমানীর একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের কাছে ধরে রাখে।—একটা কথা তোমাকে বলতে চাই; শুনে রাগ করবে না বলো, তবে বলব।

হাত সরিয়ে নিয়ে বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হিমানী। হিমানীর চোখ দুটো থরথর করে কাঁপছে, সেই সঙ্গে কী তীব্র একটা ভর্ৎসনার দৃষ্টিও কাঁপছে।—রাগ করেছি, আপনি আর কোনও কথা বলবেন না।

সেই মুহূর্তে থরথর করে কাঁপতে শুরু করে বিকাশের সেই শক্ত পোক্ত চেহারা। এইবার দুহাত বাড়িয়ে, আর হিমানীর দুই হাঁটু ছুঁয়ে, অদ্ভুত এক ভীরু-করুণ আর ফিসফিসে স্বরে যেন ফুঁপিয়ে ওঠে বিকাশ—ভুল হয়েছে। ঝোঁকের মাথায় খুব ভুল করে ফেলেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

হিমানী—আপনি বলুন, কেমন করে, কী ক্ষমা করতে পারি?

বিকাশ—কাউকে কিছু বলবে না। আর, আমাকে এখানে আসতে নিষেধ করবে না!

হিমানী—বাঃ! খুব চমৎকার ক্ষমার কথা বললেন।

বিকাশ—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনওদিন কখনও আমার ভুল হবে না। যদি দেখ, আমি কখনও একটু বাজে কথা বলেছি, তবে তখনি আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিও।

জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকে হিমানী।

বিকাশ বলে—আমাকে আর ভয় করো না, বিশ্বাস করো, আমি তোমার ক্ষতি করব না।

নিরেট পাথরের একটা মূর্তির মত নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হিমানী। রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে কপালের ঘাম মোছে বিকাশ। তারপর চলে যায়।

ভেতরের দরজার পর্দাটা কেঁপে ওঠে না, কিন্তু কেঁপে ওঠে পর্দার ওদিকের একটা ছায়া। আলোহীন করিডরের মেঝের উপর দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে পর্দার আড়াল থেকে বাইরের ঘরের ঘটনার দৃশ্যটাকে দেখেছিল যে সুমোহন, আর কেউ নয়, স্বয়ং সেই সুমোহনই হতাশ হয়ে তার বাইরের ঘরে চলে গেল। একটা সত্যি ফাঁসির দৃশ্য দেখতে পাবে বলে আশা করে শুধু একটা কথা কাটাকাটির দৃশ্য দেখতে হল। সুমোহনের হাতে শক্তিশালী জাপানি ক্যামেরা হতাশ হয়ে আর শিথিল হয়ে ঝুলছে। বইয়ের ঘরের একটা চেয়ারের উপর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুমোহন।

॥ ৬ ॥

থিয়েটার রোডের জোড়া গুলমোরের অভ্যর্থনা একটুও ক্লান্ত হয় না। পূরবী রায়ের সোনার ফ্রেমের চশমাও ঝিকমিক করতে ভুলে যায় না। সুমোহনের দুই চোখে করুণ বিষাদের যে ছায়া লেগে আছে, তা-ও পূরবীর চোখে পড়ে না। পূরবীর দুই চোখ তেমনই উজ্জ্বল হয়ে রোজ সন্ধ্যায় সেই আগন্তুক মানুষটিকে অভ্যর্থনা জানায়, যে এখন শুধু একবেলায় অতিথির মত আসে আর চলে যায়, একদিন যাব হাত ধরে আর চিরকালের আপনজন হয়ে তারই জীবনের সঙ্গে চলে যেতে হবে। তাই সুমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে পূরবী—মনে হচ্ছে, অনেক রাত পর্যন্ত পড়েছ কিংবা লিখেছ, ভাল ঘুম হয়নি !

শুনে খুশি হয় সুমোহন। পূরবী বুঝতে পারেনি। পূরবী কিছু সন্দেহও করেনি। সুমোহনের হতাশ চোখের বিষাদটাকে ঘুমহারা ও রাতজাগা একটা ক্লান্তির ছায়া বলে মনে করেছে।

এক হিসাবে পূরবীর সন্দেহটা একটুও মিথ্যে নয়। ঘুম হয় না, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগেই সময় ফুরিয়ে যায়। শুধু ভেবে ভেবে আর নিঃশ্বাসের একটা ছটফটে কষ্টকে চেপে চেপে সুমোহনের শরীরের সঙ্গে প্রাণটাও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়তে থাকে, সারা রাত পার হয়ে যায়। শুধু বিষাদ নয়, একটা যন্ত্রণাও বটে। এক এক সময় মনে হয়, এই ঘরের সব বই পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আর লেখার খাতা ও ফাইলগুলিকে পোকাতে কুরে কুরে খাচ্ছে। এই যন্ত্রণার ভয় তাদের জীবনে নেই, লেখাপড়া যাদের জীবনের সব চেয়ে প্রিয় আর সব চেয়ে বড় আনন্দ নয়। তারা বেশ আছে।

অনেকদিন আগেই ডায়েরি লিখবার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে সুমোহন, তা না হলে আজ এই যন্ত্রণার অকপট কথাগুলিকে ডায়েরিতে লিখে ফেলতে পারত। এই যন্ত্রণার প্রথম কথা এই যে, হিমানী ওর নিজেরই জীবনের সমস্যাটাকে একটুও বুঝতে পারছে না। যার কাছে থাকলে হিমানীর কোনও লাভ হবে না, জোর করে তারই কাছে পড়ে থাকতে চাইছে। হিমানী তো এই তিন-চার মাসের মধ্যে আর কোনওদিনও এই বই-এর ঘরে আসেনি। সন্ধ্যা হতেই সুমোহনের বাইরে বের হয়ে যাবার সময়ও কোনও ডাক ডেকে কিংবা প্রশ্ন করে বাধা দেয়নি। হিমানী তো খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছে যে, তার কাছে সুমোহনের কোনও কিছুরই আশা এখন আর কোনও দাবি করে না। আজ হিমানী এখানে একটা নিরর্থক অস্তিত্ব মাত্র।

যার কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার কোনও ভরসা নেই, যাকে ভালবাসা দেবারও কোনও ভরসা নেই, তারই কাছে শুধু পাশের ঘরের একটা অচল অনড় পাথর হয়ে পড়ে থাকা একটা একগুঁয়েমি হতে পারে, কিন্তু সেটা জীবনের প্রতি কোনও নিষ্ঠার ব্যাপার নয়। বিকাশকে ভালবাসলে কি হিমানীর কোনও ভুল হত ? কোনও ভুল হত না। একটুও না। যেখানে সব আছে, সেখানে হাত বাড়িয়ে উপহার নেবে না হিমানী, আর যেখানে কিছুই নেই, সেখানে হাত বাড়িয়ে উপহার আশা করবে ? এ এক অদ্ভুত মনের বিকার।

না, আজ নিজেরও কাছে এ কথা বলবে না সুমোহন যে, পূরবীর শুধু লেখাপড়ার জীবনটাই সুমোহনের চোখের ও প্রাণের মায়া হয়ে উঠেছে। পূরবীর চোখের দীপ্তি, মুখের হাসি আর লালচে দুটো ঠোঁটও একটি মায়া। তর্ক করলে বলা চলে, চোখের অমন দীপ্তি, মুখের অমন হাসি আর অমন লালচে ঠোঁট হিমানীর না থাকুক, পৃথিবীর কোনও মেয়েরই কী নেই ?

আছে, নিশ্চয় আছে। কিন্তু দেখতে একই রূপের ও রকমের হলেও সব মায়ার কি একই স্বাদ ? স্বাদটা একই রকম হতে পারে বটে, কিন্তু একই রকম তৃপ্তি হতে পারে না। সুমোহনের প্রাণের অভিরুচি যে তৃপ্তি পেতে চায়, সেটা সুমোহনের বিদ্যাবন্ত জীবনের সহচরী ও সতীর্থা উচ্চশিক্ষিতা পূরবী নাগেরই চোখে মুখে ও হাতে, বুকেতে গলাতে ও খোঁপাতে আছে।

হিমানীর জন্য দুঃখ হয়। নিজেরই জীবনের সম্মানের জন্য হিমানীর প্রাণে একটুও আগ্রহ কিংবা সামান্য চেষ্টাও নেই। বিকাশের সঙ্গে হিমানীকে যে কত ভাল মানায়, আর মানিয়ে নিতে পারলে কত ভাল হয়, এই নিরেট বাস্তব সত্যটাকে চোখেই দেখতে পায় না হিমানী, ইচ্ছে করেই নিজেকে অন্ধ করে রেখেছে।

যন্ত্রণা এই যে, সুমোহন আজ হিমানীর জীবনের সুখের পথের কোনও বাধা নয়, হিমানীই সুমোহনের জীবনের সব সুখের পথের বাধা। বিকাশ যদি হিমানীকে ভাল না বাসত, তবে না হয় বলা যেতে পারত যে, হিমানীর সুখী হবার কোনও পথ নেই। কিন্তু তা তো নয়। হিমানী ইচ্ছে করলেই বিকাশকে বিয়ে করে সুখী হতে পারে। সুমোহনের যন্ত্রণা এই যে, তুচ্ছ হয়ে আর অবমাননা মেনে নিয়েই এখানে পড়ে থাকবার, আর মিথ্যে আশার স্বপ্ন দেখবার একটা মোহের মধ্যে সুখী হয়ে রয়েছে হিমানী।

এই তিন-চার মাসের মধ্যে সুমোহনের নামে অনেক চিঠি এসেছে। সেসব চিঠির জবাবে শুধু একটি চিঠিই লিখেছে সুমোহন—আপনারা শুধু উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি দিচ্ছেন। কিন্তু কেউ একবার এলেনও না। আমার সময় নেই। আপনাদের ওখান থেকে কেউ এসে যদি হিমানীকে এখন যসিডিতে নিয়ে যায়, তবে আপনাদের এত উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি লেখবার আর দরকার হবে না।

যসিডির চিঠির প্রশ্ন : হিমানীর জ্বর সেরেছে কিনা ? এখন কেমন আছে হিমানী ?

কবে হিমানীর আবার নতুন করে জ্বর হল, সেটা অবশ্য জানে না সুমোহন। কিন্তু জানতে ও বুঝতে পেরেছে যে, হিমানীর সেই পুরনো জ্বর দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে ডাক্তার আসছেন আর চলে যাচ্ছেন, দৃশ্যটা নিজের চোখেও দেখেছে সুমোহন। কিন্তু, নিজে একবার হিমানীর ঘরের ভেতরে গিয়ে হিমানীর অবস্থার আর জ্বরের অবস্থার খবর নেবার ইচ্ছে আর করে না। কারণ হিমানীর একরোখা মনের সেই ভয়ানক বিকারের কথাটা আর শুনতে ভাল লাগে না, সহ্য করতেও পারে না সুমোহন। তবু একদিন একবার নয়, পরপর তিনবার হিমানীর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আর বেশ শান্ত অনুনয়ের স্বরে কথা বলে সুমোহন—যসিডির মাঠের খোলা রোদ-বাতাস গায়ে লাগালে যে জ্বর সেরে যায়, সে জ্বর তাড়াতাড়ি সারিয়ে নিলেই তো পারো।

হিমানী—তার মানে, আমাকে যসিডিতে যেতে বলছ ?

সুমোহন—হ্যাঁ।

হিমানী—না, আমি যাব না।

সুমোহন—তোমার বাড়ির সব মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে বার বার চিঠি লিখছে, তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য বলছে।

হিমানী—বলুক, আমি যাবো না।

সুমোহন—তা হলে আমিও আর ওসব চিঠির কোনও জবাব দিতে পারব না।

হিমানী—দিও না।

খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে ও তিক্ত মন নিয়ে সেই যে হিমানীর ঘর ছেড়ে চলে এল সুমোহন, আর কোনওদিন সে ঘরের ভেতরে যায়নি।

কিন্তু হিমানীর ওই ঘর যে সুমোহনের জীবনে কোন ভরসার সঙ্কেত নয়, তা-ও জানে সুমোহন। এই আছে এই নেই, এই জ্বর যেন একটা চতুর ঠাট্টার খেলা। ভাবতে গিয়ে সুমোহনের সেই তিক্ত মনও লজ্জায় ভরে যায়। এ তো সুমোহনেরও মনের একটা বিকার। সুমোহনের বিষাদ যেন চুপে চুপে আর মুখ লুকিয়ে হিমানীর মৃত্যু কামনা করছে, যেন হিমানীর ওই জ্বরই চরম হয়ে উঠে সব সমস্যার সমাধান করে দেয়।

সুমোহনের মনের এই লজ্জাটা কিন্তু হিমানীকে ক্ষমা করতে পারে না। আজ সুমোহনের মনের ভেতরে ওই বিশ্রী কামনা যে এত সহজে, একটা খোলা দুয়ার পেয়ে ঢুকে পড়তে পারছে, সে তো হিমানীর একরোখা জেদের পরিণাম। হিমানী সুমোহনের সুস্থ জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসেরও ক্ষতি করেছে।

কিছুদিনের জন্য হিমানীর যসিডিতে গিয়ে থাকাও সুমোহনের কাছে কোনও আশার অঙ্গীকার নয়। যাবে আবার ফিরে আসবে হিমানী, সুমোহনের এই বাড়ির জীবনে সেটাও একটা চতুর ঠাট্টার লুকোচুরির খেলা।

বিকাশ আসছে। কিন্তু এই বিকাশও একটি ভীরু সঙ্কোচ ; সাহস করতে গিয়ে সেই মুহূর্তে হাঁটু ছুঁয়ে ক্ষমা চেয়ে ফেলেছে আর প্রতিজ্ঞা করেছে, না, আর কখনও এমন ভুল তার হবে না। বিকাশ

এখন একটি অনুতপ্ত অভাজন। মাঝে মাঝে আসে, বাইরের ঘরে চুপ করে বসে থাকে, চা খায়, খবরের কাগজ পড়ে, আর চলে যায়।

এই বাড়িতে এখন যেটুকু অভ্যর্থনা পায় বিকাশ, সেটুকু এই বাড়ির চাকরটারই ইচ্ছা আর অনুগ্রহের দান। বিকাশেরও যা-কিছু কথাবার্তা আর আলাপ-আলোচনা, তাও শুধু এই চাকরের সঙ্গে। বিকাশ জিজ্ঞাসা করে—জ্বর কমেছে ? চাকর বলে—না। বিকাশ জিজ্ঞাসা করে—ডাক্তার এসেছিল ? ওষুধ আনা হয়েছে ? চাকর বলে—হ্যাঁ। ব্যস্, শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট। হিমানীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবারও কোনও দরকার বোধ করে না বিকাশ। এই বাইরের ঘরে বসে দিনরাত ধ্যান করলেও কিছু আসে যায় না।

জানে সুমোহন, চাকরই গিয়ে ডাক্তারকে খবর দেয়। চাকরই ওষুধ আনে। এই কাজটুকু তো বিকাশও করে দিতে পারত। হিমানীও চাকরের মুখে শুনতে পেয়েছে যে, বিকাশবাবু এসেছেন, বাইরের ঘরে বসে আছেন। কিন্তু ওই শোনাটুকুই সার। হিমানী ভুলেও কখনও চাকরটাকে বলেনি যে, বিকাশবাবু যদি এসে থাকেন তবে তাঁকেই বলো, যেন ডাক্তারকে একটা খবর দিয়ে আসেন। বিকাশের কথা ভেবেই দুঃখ বোধ করে সুমোহন। হিমানীর জ্বর থাকলেই বা কী, আর সেরে গেলেই বা কী ? বিকাশের জীবনে কোনও আশার সংকেত ফুটে উঠবে না। বিকাশ যে নিজেই সব আশা ছেড়ে দিয়ে একটা শান্ত-দান্ত মুক্ত পুরুষ হয়ে গিয়েছে।

পূরবী, আশ্চর্য এই পূরবীর প্রাণটা, কোনও দিনও আর কোনও মুহূর্তেও জিজ্ঞেস করল না যে, তুমি যে আশার কথা বলেছিলে, সে আশার কী হল ? কিন্তু আজ যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলে, তবে কী জবাব দেবে সুমোহন ? সত্য কথাটা বলতে হলে বলতে হবে যে, হিমানীর গায়ের সেই পুরনো জ্বরটাকে একটা মরণ-জ্বর বলে সন্দেহ হয়েছিল, ও ডাক্তার ভাদুড়ীও একদিন একবারে স্পষ্ট করে ওই কথাই বলেছিলেন, তাই সেদিন সুমোহন এত স্পষ্ট করে পূরবীকে এই কথা বলেছিল—হ্যাঁ, আশা আছে।

ডাক্তার ভাদুড়ীর এই অভিমত যে বর্ষাকালের ফর্সা সকালবেলার মত একটা ক্ষণ-ভঙ্গুর ছলনা হতে পারে, সেদিন এমন সন্দেহ করতে পারেনি সুমোহন। কিন্তু মাত্র দশদিন পরেই বুঝতে হয়েছিল, হিমানীর ওই জ্বর নিতান্ত একটা চতুর জ্বর। ডাক্তার ভাদুড়ী বললেন, না, এখন আমি নিঃসন্দেহ যে, সিরিয়াস ব্যাপার নয়, জ্বরটা হল মোর মেন্টাল দ্যান ফিজিক্যাল। বাঃ, স্পেশালিস্ট বিজ্ঞতার কী চমৎকার একটি নমুনা !

সেই ডাক্তার ভাদুড়ী তো আসছেন, হিমানীকে দেখছেন আর বেশ হাসিমুখেই চলে যাচ্ছেন। হিমানীর অদ্ভুত জ্বরকে বোধ হয় ওষুধের নাম করে শুধু মিষ্টি সিরাপ দিচ্ছেন ডাক্তার ভাদুড়ী। এই আর এক অদ্ভুত ছলনা। হিমানী বুঝতে পারছে না, মিষ্টি সিরাপ ওর জ্বর সারিয়ে দিলেও ওর জীবনের তিক্ততা একটুও সেরে যাবে না।

কিন্তু পূরবীর কাছে কোনও ছলনার ছায়াকেও আর থাকতে দেবে না সুমোহন। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, কিংবা মুখের কথাতেও একটু আবছায়া রেখে পূরবীকে একটা মিথ্যা আশার মোহ দিয়ে ভুলিয়ে রাখলে পূরবীর যতটুকু ক্ষতি হবে, তার শতগুণ বেশি ক্ষতি হবে সুমোহনের নিজেরই। ভালবাসার মধ্যে কোনও মিথ্যে রাখবে না সুমোহন। সব কথা শুনে পূরবী যদি চমকে ওঠে, মুখ ফিরিয়ে নেয়, সুমোহনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখতেও না চায়, তবে শুধু বলতে হবে, আমি তো কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না, পূরবী, এবার তুমিই বলো, আমি কী করি ? সব বই পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আমি কি একটা নিঃসঙ্গ জীবনের ভিখারী হয়ে যাব ?

থিয়েটার রোডের জোড়া গুলমোর সুমোহনের এই যন্ত্রণার কোন খবর রাখে না। তাই উতলা হয়ে মাথা দোলায়। আর সুমোহনও পূরবীর পড়ার ঘরে ঢুকে দেখতে পায়, হাতে বই, মুখে হাসি, কিন্তু দু চোখ বন্ধ, সোফাতে বসে আছে পূরবী।

সুমোহন—স্বপ্ন দেখে হাসছ নাকি ?

চোখ খুলে আরও হাসতে থাকে পূরবী—হ্যাঁ।

সুমোহন—কিসের স্বপ্ন ?

পূরবী—তুমি সেদিন যে অদ্ভুত কথাটা বলে চলে গেলে, সেই কথাটাই বার বার মনে পড়ছিল।

সুমোহন—কী কথা ?

পূরবী—মনে করতে চেষ্টা করো।

সুমোহন—কত কথাই তো বলেছি, কত কথাই তো মনে পড়ে !

পূরবী—না, সব বাদ দিয়ে শুধু ওই একটি কথাকে মনে করতে চেষ্টা করো।

সুমোহন হাসে—চেষ্টা করলেও মনে করতে পারব না।

পূরবী—খাজুরাহো ! এইবার মনে পড়েছে ?

সুমোহনের দুই চোখের দৃষ্টি সেই মুহূর্তেই মুগ্ধ হয়ে যায়। —হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু মিথ্যে বলিনি।

হাতের বইটাকে খুলে একটা ছবির প্লেটের দিকে তাকায় পূরবী। —খাজুরাহোর মন্দিরের এই হাফ-রিলিফের মেয়ে-মূর্তির সঙ্গে আমার মূর্তির মিল তুমি কোন চোখে দেখতে পেলে ?

সুমোহন—আমার এই চোখেই দেখতে পেয়েছি।

পূরবী—আমার মাথাতে কি এরকম একটা কবরীমুকুট কিংবা চূড়ো করে বাঁধা একটা খোঁপা আছে ?

সুমোহন—না, তা নেই বটে।

পূরবী—তবে ?

সুমোহন—কিন্তু ঠিক ওই রকমই ভঙ্গিতে ওয়েস্ট লাইন একটা ঢেউ হয়ে উথলে উঠে তারপর থাই লাইনের সঙ্গে...। আচ্ছা, তবে সাধুভাষাতেই বলি।

পূরবী—বলো।

সুমোহন—ঠিক ওই রকমই ক্ষীণ-মধ্য, গুরু-উরু, সুডোল শ্রোণি-বলয় আর গভীর নাভিকুহর, সব মিলিয়ে একটি চমৎকার ভরাট কোমলতার আবেদন ছন্দিত করে রেখেছে।

পূরবী—চুপ করো, ঢের হয়েছে, কল্পনার মাত্রা নেই।

সুমোহন—কল্পনাতে কোনও ভুল নেই।

পূরবী—কী করে বুঝলে যে, ভুল নেই ? আমি কি কখনও তোমার চোখের কাছে এই পাথুরে মেয়েটির মত একেবারে খোলামেলা নিলাজ মূর্তিটি হয়ে দাঁড়িয়েছি ?

এগিয়ে এসে পূরবীর গা ঘেঁষে, আর পূরবীর গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে সুমোহন। পূরবীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে, একটি নিবিড় নিঃশ্বাসের আবেগে নিবিড় হওয়া স্বরে কথা বলে সুমোহন—আমার কাছে নিলাজ হতে কি তোমার আপত্তি আছে ?

পূরবী—না।

॥ ৭ ॥

আশার হরিণ ঝরনার জল পান করেছে ; সে বিষাদ আর নেই। কিন্তু আশার হরিণের প্রাণে তবু একটু খেদ আছে। সে ঝরনা এখনও দূরেই আছে। তার কাছে ছুটে ছুটে যেতে হয়, যদিও ছুটে যেতে কোনও বাধা নেই। পূরবী এখন সুমোহনের সব তৃপ্তির দায়িনী ; দুঃখ শুধু এই যে, সে আজও সুমোহনের ঘরে এল না, কবে আসবে তাও কোনও ঠিক নেই। হয়ত কোনও দিনও আসতে পারবে না। ভবিতব্য যদি আর ছলনা না করে একটু করুণা করে, শুধু তবেই পূরবীকে এই ঘরে নিয়ে আসতে পারবে সুমোহন। এ ছাড়া সুমোহন তার ভাবনাতে ও কল্পনাতে আর কোনও ভরসার গুঞ্জন শুনতে পায় না।

পূরবী সত্যিই যে একটা বিস্ময়ের ফুলবনের সৌরভ। সুমোহনের কথা শুনে হেসে ফেলেছে পূরবী। —এই কথা। এই কথা ভেবে তুমি এত লজ্জা পেয়েছ আর এত দুশ্চিন্তা করছ ?

সুমোহন—আমি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার সুযোগ শিগ্‌গিরই হবে।

পূরবী হাসে—কবে সুযোগ হবে ?
সুমোহন—বুঝতে পারছি না।
পূরবী—কোনও দিনও সে সুযোগ হবে কি ?
সুমোহন—তাও বুঝতে পারছি না।
পূরবী—একথা আজ না বলে সেদিন বলে দিলেই ভাল করতে।
সুমোহন—কবে ?
পূরবী—মনে করে দেখো।
সুমোহন—তুমি বলো।
পূরবী—আমাকে সেই নিলাজ কথাগুলি বলবার আগে।

শুধু একটু গম্ভীর হয় পূরবী। চোখ মুছে নেয়। তারপরেই আবার হেসে ফেলে—যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে।

পূরবীর দুই হাত ধরতে গিয়ে সুমোহনের দুটি হাতও কেঁপে ওঠে।—আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু আমি ইচ্ছে করে অসাবধান হইনি, পূরবী। বিশ্বাস করো, আমি সেদিন তোমাকে ওই কথাই বলবার জন্যে এসেছিলাম। কিন্তু—

হাসতেই থাকে পূরবী—কিন্তু খাজুরাহোর ছবি সব ভুল করিয়ে দিল, তাই না ?

সুমোহনের মাথাটা একটু হেঁট হয়ে পড়তেই পূরবীর মুখের হাসি আরও উচ্ছল হয়ে ডাক দেয়—শোনো !

সুমোহন—বলো।
পূরবী—আমার পাশে বসো।

সুমোহন পূরবীর পাশে বসে পড়তেই সুমোহনের হাতে হাত রাখে পূরবী।—একটুও দুঃখ করো না। যদি ভাগ্যে থাকে, তবে তোমার ঘরে যাব, না থাকে যাব না। কিন্তু তুমি তো আসবে।

সুমোহন—চিরকাল আসব।

রোদের আলো যেমন করে আকাশের সব কুয়াশা মুছে দেয়, তেমনি করে সুমোহনের প্রাণের সব আক্ষেপ মুছে দিয়েছে পূরবী। যে ফুলবনের কাঁটা বিঁধবে বলে ভয় করেছিল সুমোহন, সে ফুলবনের শুধু সৌরভ পেয়েছে।

তবু বারবার কী যেন মনে পড়ে, আর মনে পড়তেই আবার একটা ছায়া-ছায়া বিষাদ এসে যেন চোখের কাছে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে সুমোহন, এই তৃপ্তির মধ্যে মস্তবড় একটা শূন্যতা মুখ লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু কেন, কিসের ভয়ে, কার সুখ-অসুখের খেয়ালে এমন করে দুঃসহ একটা শূন্যতাকে সহ্য করবে সুমোহন ?

যতক্ষণ বাইরে থাকে সুমোহন, ততক্ষণ পূর্ণ হয়েই থাকে সুমোহনের প্রাণ। নিউ আলিপুর থেকে থিয়েটার রোড, পথটুকু যেন নিত্য উৎসবের যাত্রাপথ। কিন্তু বাড়ি ফিরে এই বই-এর ঘরে ঢুকতেই সেই উৎসবের আনন্দটুকু যেন সেই মুহূর্তে শুকিয়ে যায়। বার বার শুনতে পাওয়া যায়, পাশের ঘরে বিছানাতে শুয়ে অদ্ভুত এক মানসিক জ্বর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে ঘুমোচ্ছে। একটু বেশি অদ্ভুতই বলতে হবে, সেই জ্বর সামান্য একটু আর্তনাদও করে না। কোনও অস্থিরতা নেই, কোনও মুখরতা নেই। কী অদ্ভুত শান্ত হয়ে ঘুমোতে পারে হিমানী, যেন ওর জীবনে কোনও সমস্যার সামান্য দুঃখও নেই।

কিন্তু সুমোহন যে সত্যিই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারে না আর ঘুমিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারে না। একটা তন্দ্রা এসে পূরবীকে সুমোহনের বুকের কাছে শুইয়ে দেয়, তখন সুমোহনের দুই হাত চমকে ওঠে, নিঃশ্বাসও দুরন্ত হয়, কিন্তু পূরবীর গলা জড়িয়ে ধরতে গিয়েই সেই তন্দ্রা ভেঙে যায়। তারপর সে ঘুম আর আসতেই চায় না। ভুলতে পারে না সুমোহন, ভুলবে কেমন করে, তার মন প্রাণ শরীরের সব তৃপ্তির উৎসব যে এখন থিয়েটার রোডের একটি ফ্ল্যাটের ঘরে একলা শুয়ে পড়ে আছে।

আবার জাগা চোখে একটা দুঃস্বপ্নের মত আর একটা ভাবনা। হিমানী নামে একটা অনড় ও

অবিচল অস্তিত্ব পাশের ঘরে ঘুমিয়ে রয়েছে। জ্বলতে থাকে সুমোহনের এই ভাবনাটাই। একটা আগুন হয়ে কিংবা বিষ হয়ে এখনই যদি পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারা যায়, তবেই জ্বালার শান্তি হতে পারে।

কিন্তু না, সে তো অসম্ভব একটা কল্পনার বিকার।

ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করে সুমোহন। ঘুমিয়েও পড়ে। কিন্তু স্বপ্নের ঘোরে, কিংবা কে জানে কিসের ঘোরে, সুমোহনের ঘুমন্ত শরীরটা অনেক্ষণ ধরে ছটফট করে। তারপর বিছানারই উপর উঠে বসে।

কে জানে কত রাত! কিন্তু বড় নিস্তব্ধ রাত। আর, যেন নিশির ডাক শুনতে পেয়েছে সুমোহন। আস্তে আস্তে হেঁটে, কোন শব্দ না করে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। পর্দা সরিয়ে দিয়ে কী যেন দেখে নেয়। তারপর, একটা অশরীরী ছায়ার মতন লঘু আর মৃদু হয়ে আরও এগিয়ে যায়। হিমানীর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, ঠিকই ঘুমিয়ে আছে যে, সে হিমানী ছাড়া আর কেউ নয়। রোগা হাত, ভাঙা গাল, একটা জঞ্জাল। তবু জোরে উঠছে নামছে ওই জঞ্জালেরই বুকটা। নিঃশ্বাসে খুব জোর আছে।

সুমোহনের দুই চোখ যেন মাতালের চোখ। কটমট করে জ্বলছে। চোয়ালটা শক্ত হতে হতে যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে। জঞ্জালটা এরকম করে বেঁচে থাকবে কেন? শেষ হয়ে গেলেই তো পারে!

হাত দুটোতে বিশ্রী রকমের কাঁপুনি লেগেছে। না, এভাবে এখানে শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে কোনও লাভ হবে না। ডাক দিয়ে, হিমানীকে জাগিয়ে দিয়ে, আর, শুধু একটু বলে দিয়ে চলে যাওয়াই ভাল—তুমি এখানে আর থেকো না। এই আমার শেষ কথা।

কিন্তু না, ওকথা বলবারই বা কী আর দরকার? চলে যায় সুমোহন। বই-এর ঘরে এসে সোফার উপর বসে পড়লেও ধড়ফড় করে ওঠে শরীরটা। বুঝতে পারে সুমোহন, গায়ের গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে ঢোল হয়ে গিয়েছে। কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা ঝরছে। কী আশ্চর্য, এত শ্রান্ত হবার তো কারণ নেই।

রাত আর কতটুকু বাকি? ঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আর বাইরের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারে সুমোহন, ভোর হয়ে গিয়েছে, ঝুর ঝুর করে বৃষ্টিও ঝরছে।

কিন্তু এই ভোরে বাড়ির গেট পার হয়ে কে আসছে এদিকে? বিকাশ? বিকাশের সঙ্গে উনি কে? ডাক্তার ভাদুড়ী?

ঝুর-ঝুর বৃষ্টি তুচ্ছ করে আর হন্‌হন্ করে হেঁটে যারা আসছে, তাদের এবার বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পায় সুমোহন। ঠিকই, বিকাশ আর ডাক্তার ভাদুড়ী এসেছে। বারান্দায় উঠে কথা বলছে দুজনে, সে কথার কিছু শব্দও শুনতে পায় সুমোহন।

অন্য দিন হলে কিংবা অন্য সময় হলে সুমোহন বিকাশের সঙ্গে ডাক্তার ভাদুড়ীকে আসতে দেখেও নিজের ঘরেই বসে থাকত। কিন্তু আজ আড়াল হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। মনটাও যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কী ব্যাপার?

ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দাতে এসে দাঁড়ায় সুমোহন। ডাক্তার ভাদুড়ী শুকনো মুখে হাসি টানবার চেষ্টা করেন। —কী খবর আপনার? এত ভোরে জেগে উঠেছেন, মনে হচ্ছে রাত জেগে পড়াশোনা করেছেন!

বিকাশ একটা কাগজ সুমোহনের হাতে তুলে দিয়ে বলে—রিপোর্ট।

ডাক্তার ভাদুড়ী—আপনি বিচলিত হবেন না। ও রিপোর্ট এখন দেখারও কোনও প্রয়োজন নেই। অন্য সময়ে দেখবেন।

সুমোহন তবু সেই রিপোর্ট পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু ডাক্তার ভাদুড়ী আবার বাধা দিয়ে বলেন—আপনি নার্ভাস মানুষ, আপনি এখন আপনার ঘরে গিয়ে বরং শুয়ে থাকুন। বিকাশবাবু যখন আছেন, তখন সব দরকারের কাজ ঠিক ঠিক হয়ে যাবে।

বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে সুমোহন—কী ব্যাপার?

বিকাশ—এখনই একটা ইঞ্জেকশন দরকার। দেখে আমারই কেমন সন্দেহ হল, হার্টের অবস্থা

বোধ হয় ভাল নয়।

সুমোহন—তুমি কি তা হলে এখানেই.. !

বিকাশ—হ্যাঁ, সারা রাত এখানেই ছিলাম।

সুমোহন—সারা রাত এখানে কোথায় ছিলে তুমি ?

বিকাশ—ওই বাইরের ঘরে। ওই যে, তুমি উঠে এসে হিমানীকে একবার দেখে নিয়ে চলে গেলে, ঠিক তারপরেই আমি এসে দেখলাম, আর সন্দেহ হল।

চমকে ওঠে সুমোহন—তোমাকে তা হলে খুব হয়রান হতে হচ্ছে !

বিকাশ—না না, হয়রান হব কেন ?

ডাক্তার ভাদুড়ী ডাকেন—আসুন বিকাশবাবু।

বিকাশ আর ডাক্তার ভাদুড়ী এগিয়ে যেয়ে হিমানীর ঘরে ঢুকতেই সুমোহন নিজের ঘরে চলে যায়, আর রিপোর্ট পড়েই বুঝতে পারে যে, এইবার হিমানী সত্যিই চলে যাবার ছাড়পত্র পেয়েছে। ইরিটেব্‌ল্ হার্ট, ইনসোমনিয়া আর নিউরাইটিস। হাই ব্লাড প্রেসার হঠাৎ লো হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া লিভারের স্ফীতি, জমাট ব্রঙ্কাইটিস, আর ঘন ঘন সংজ্ঞাহীন আচ্ছন্নতা। জনডিসের আভাস আছে, হাঁপানির ভাবও আছে।

হয় ইচ্ছে করে, নয় ভুল করে রিপোর্টের কাগজের সঙ্গে আর একটা কাগজ দিয়ে ফেলেছে বিকাশ। হিমানীর হাতের লেখা ছোট্ট একটা টুকরো কাগজ—বিকাশদা, আজ চলে যাবেন না, একবার ভেতরে আসবেন।

হ্যাঁ, বিকাশও তাহলে হিমানীর ঘরের ভেতরে গিয়ে দাঁড়াবার হুকুমনামা পেয়ে গিয়েছে।

সবই তো বোঝা গেল, কিন্তু হিমানীর জন্য আর বিকাশেরও জন্য খুব দুঃখ হয়। বিকাশকে এত দেরিতে না ডেকে একটু আগে ডাকলেই তো ভাল করত হিমানী। বেচারা বিকাশ অনেক অপেক্ষার পর যে সুযোগ পেল, সেটা তো শেষ মুহূর্তে হিমানীর শিয়রের কাছে শুধু একটু দাঁড়াবার সুযোগ। শত ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করলেও বিকাশ কি হিমানীকে ধরে রাখতে পারবে ? রিপোর্ট তো বেশ স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিচ্ছে, পারবে না।

অনেকক্ষণ ধরে সুমোহনের মন আর শরীব দুই-ই অদ্ভুত এক অবসাদের ভারে অলস হয়ে পড়ে থাকে। পাশের ঘরে, করিডরে, বাইরের বারান্দায় অনেক পায়ের শব্দ বার বার দৌড়াদৌড়ি করছে, সবই শুনতে পায় সুমোহন, কিন্তু অবসাদের ভারে তবু একটুও চমকে ওঠে না।

অদ্ভুত অবসাদই বটে, যেন একটা বটের ছায়া, শ্রান্তি আর ক্লান্তির মানুষকে শান্ত করে দিয়ে তার দুই চোখ ঘুমে ভরিয়ে দেয়। সুমোহনের রাতজাগা শরীরটা খুবই ক্লান্ত, আর প্রাণটা তো পুরো একটি বছরের বিষাদ আর যন্ত্রণা সহ্য করে খুবই পরিশ্রান্ত। সোফার উপরেই বসে আর ঘুমের ঘোরে ঢুলে ঢুলে এই মেঘলা সকালের পুরো দুটি ঘন্টা পার করে দিয়েই চমকে ওঠে সুমোহন। চোখ খুলে তাকায়, আর দেখতে পায়, ঝলমলে রোদের আলোয় ঘরটা ভরে গিয়েছে। মেঘ নেই, ঝুরু-ঝুরু বৃষ্টিও নেই।

মনটাও আর ঝিমিয়ে পড়তে পারে না। অক্সফোর্ডের ব্ল্যাকওয়েলের কাছ থেকে নতুন বই-এর একটা বড় ক্যাটালগ এসে টেবিলের উপর পড়ে আছে। দুদিন হল এই ক্যাটালগ এসেছে। কিন্তু এই দুদিন মনটা এমনই বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল যে, ওই ক্যাটালগ খুলে নতুন বই-এর নাম আর পরিচযের লেখাগুলির উপর একটু চোখ বোলাতেও পারেনি, ইচ্ছে থাকলেও পারেনি সুমোহন।

ব্যস্ত হাতে নতুন বই-এর ক্যাটালগ পড়তে থাকে সুমোহন। এই তো, ঠিকই, এইরকম একটি বই পেতে চেয়েছিল পূরবী। লেখকের নাম সি. এস. ম্যাক্সওয়েল ; ভারহুতের প্রায় সব মূর্তির পরিচয় বিবৃত করে বেশ বড় একটি মনোগ্রাফ রচনা করেছেন।

তবে তো এখনই টেলিফোনে পূরবীকে খবরটা জানিয়ে দিতে হয়,—তুমি যা চাইছিলে পূরবী, ঠিক তারই খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে বই-এর ঘর থেকে বের হয়ে আর বাইরের ঘরে এসেই দেখতে পায় সুমোহন, টেলিফোনে কথা বলছে বিকাশ।—ডাক্তার ভাদুড়ী নাকি ! শুনুন, এখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি।

তবে নিঃশ্বাসটা স্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কী বললেন ? মাথায় খুব ঠাণ্ডা জল ? আর হাতে-পায়ে অল্প গরম জলের স্পঞ্জ ? আচ্ছা !

বিকাশ চলে যেতেই টেলিফোনের রিসিভার হাতে তুলে নেয় সুমোহন। —কী করছ এখন ? কী বললে ? খুব আশ্চর্য ? কেন ? এই প্রথম টেলিফোনে তোমার সঙ্গে কথা বললাম বলে ?—হ্যাঁ, ভাল খবর আছে। ভারহুত সম্বন্ধে একটা ভাল বই-এর খোঁজ পেয়েছি।

খবর বলা শেষ হবার পরেও বই-এর ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকে সুমোহন। তারপর একটা কোচের উপর বসে পড়ে। বসেই থাকে। ধীর স্থির ও নীরব এই সুমোহন যেন একটা উৎকর্ণ কৌতূহল। হিমানীর ঘরের ভেতরে ব্যাকুল পরিচর্যার একটি উৎসব চলছে, তারই শব্দ শুনছে সুমোহন। স্টোভ জ্বলছে, শব্দ শোনা যায়। কেটলির শব্দ, বালতির শব্দ। ফরফর করে ন্যাকড়া কাপড় ছিঁড়ছে কেউ, তারও শব্দ। বোধ হয় স্পঞ্জ তৈরি করছে বিকাশ।

টেলিফোন শব্দ করে বেজে ওঠে। রিসিভার তুলে কথা বলে সুমোহন। —হ্যাঁ, বলো...আরে না, ঘুমিয়ে পড়িনি। খবরটুকু জানবার জন্যে তো আমি সেই তখন থেকে টেলিফোনেরই কাছে বসে আছি। ...সময় হবে বলছ ? আজই বিকেলে ? আচ্ছা !

শুনে খুশি হয় সুমোহন, বুড়ি সৌদামিনীর ঘরে আজ বিকেলে চায়ের যে নেমন্তন্ন ছিল, অনেক করে বলে-কয়ে সে নেমন্তন্ন কাটিয়ে দিতে পেরেছে পূরবী। আজই বিকেলে মিউজিয়মে যেতে সময় হবে পূববীব।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুমোহন। এই বাইরের ঘরে তো সুমোহনের কোনও কাজও আর নেই। কিন্তু, চলে যাবার সময় বাধা পায়। দেখতে পেয়েছে সুমোহন, একটা অভাবিত আগমন যেন মিছিল হয়ে এগিয়ে আসছে। যসিডির বিধু সরকার আসছেন, যসিডির বড়দা আর বৌদি আসছেন। হন্তদন্ত সেই মিছিলের মুখগুলি বড় গম্ভীর।

বাইরের ঘরের ভেতর ঢুকেই বিধু সরকার একবার সুমোহনের মুখের দিকে তাকালেন, আর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বড়দা সুমোহনের মুখের দিকে একবার তাকিয়েও দেখলেন না। আর বউদি শুধু ভেতরের দরজার পর্দাটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

যেন ঘরের বাতাসটাকেই একবার জিজ্ঞাসা করলেন বিধু সরকার—বিকাশ কোথায় ?

কিন্তু বাতাসের কাছ থেকে জবাব শোনবার আশায় কেউ আর দাঁড়িয়ে রইলেন না। পিতা পুত্র ও পুত্রবধূ একসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে আর ভেতরের দরজার পর্দা ঠেলে হিমানীর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

আর, সুমোহন সবেগে একটা পা ছুঁড়ে চেয়ারটাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে, জোরে জোরে পা ফেলে, একটা দৃপ্ত তুচ্ছতার শব্দ তুলে তুলে তার বই-এর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। দরজার কপাট চাপতে গিয়ে সুমোহনের সবেগ হাতটা ঘষে ঘষে শব্দ করে, কঠোর অবজ্ঞার শব্দ।

॥ ৮ ॥

মিউজিয়ম দেখা শেষ হল। ময়দানেও অনেকক্ষণ বেড়ানো হল। তারপর ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে আরও অনেকদূর, সুমোহনের গাড়ি যেন সন্ধ্যার বাতাস পান করে আর খুব খুশির নেশার মত একটা উল্লাস নিয়ে ছুটছে। গাড়িতে সুমোহনের পাশে শান্ত হয়ে বসে থাকতে গিয়েও পূরবীর আলগা খোঁপা যেন উতলা হয়ে বার বার সুমোহনের কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়ছে।

একটা বাজারের কাছে এসে গাড়ি থামায় সুমোহন। গাড়ি ঘোরায়।

আবার সেই থিয়েটার রোড, সেই জোড়া গুলমোর, আর সেই ফ্ল্যাটের সেই ঘর।

পূরবী বলে—তুমি সেদিন কী যেন একটা কথা বলেছিলে ?

সুমোহন—কবে ?

পূরবী—সেদিন। মনে পড়ছে না বোধ হয় ? তুমি বলেছিলে, চিরকাল আসবে।

সুমোহন—হ্যাঁ। নিশ্চয় বলেছিলাম।

পূরবী হাসে—কথাটা কিন্তু ভাবার্থে অসমাপিকা।

সুমোহন—কী বললে ?

পূরবী—বলা উচিত, চিরকাল আসবে আর চলে যাবে।

পূরবীর চশমার কাঁচ হঠাৎ ঝাপসা হয়ে যায়। হাত তুলে শক্ত করে কপাল টিপে ধরেছে পূরবী। দুই চোখ বন্ধ করে, আর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে যেন একটা ব্যথা চাপতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। ফুঁপিয়ে উঠছে নিঃশ্বাস।

সুমোহন ডাকে—পূরবী, শোনো। একটা কথা শোনো।

চশমা খুলে কোলের উপর রেখে দিয়ে আর চোখ মুছে নিয়ে সুমোহনের মুখের দিকে তাকায় পূরবী—সব শোনা তো হয়েই গিয়েছে। নতুন করে কী আর বলবে তুমি ?

সুমোহনের গলার সুর করুণ হয়ে যায়।—তুমি আজ হঠাৎ খুব বেশি দুঃখ করছ, পূরবী ! কিন্তু আমার একটা কথা শোনো।

পূরবী—দুঃখ না করে পারব কী করে বল ? তুমি শুধু চিরকাল আসতেই থাকবে, আর, কোনওকালে আমাকে নিয়ে যাবে না, এ তো একটা ফাঁকির সঙ্গে আপোষ করা জীবন। সহ্য করতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

সুমোহন—খুব সত্যি কথা। কিন্তু বিশ্বাস করো পূরবী, আর সহ্য করতে হবে না।

পূরবী—এ তো তোমার শুধু একটা আশার কথা।

সুমোহন—না, আমার বিশ্বাসের কথা। আমি জানি, আমি দেখেছি, আমি শুনেছি, আমার বিশ্বাসে একুটও ভুল নেই।

পূরবীর করুণ চোখ আবার উজ্জ্বল হয়ে হাসতে থাকে। সেই চোখে চুমো দিয়ে সুমোহনেরও দুই চোখ হেসে ওঠে।

আর বাড়িতে ফিরে এসে বারান্দার বাইরের ঘরের দিকে যাবার আগে সুমোহনের দুই চোখের হাসি একটা জ্বালার ছোঁয়া লেগে মুহূর্তেই শুকিয়ে মরে যায়। সুমোহনের ভ্রূকুটির সঙ্গে একটা তিক্ত ও বিরক্ত দৃষ্টি কাঁপতে থাকে :

যসিডির কুটুম্বের দল এখনও যায়নি। ওরা এখনও হিমানীর ঘরের ভেতরে আছে। দরজার পর্দার উপর ওদের ছায়া নড়ছে। ওদের চাপা চাপা কথার টুকরো টুকরো ফিসফিসে শব্দও শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু ওরা যাবে কখন ?

যার বাড়িতে এই তথাকথিত কুটুম্বের দল এসেছে, সে আজ ওদের কাছে একটি পুরনো চোখের চেনা-মানুষ মাত্র, তার কাছে ওদের কোনও কাজ নেই। বিধু সরকারের কথাটাও বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, যসিডি এখন শুধু এক বিকাশকেই নতুন চোখে চিনেছে। খুব ভাল কথা। এই ভালটুকু কিছুদিন আগে হলেই তো আরও ভাল হত।

বুঝতে পারেনি সুমোহন যে, বিকাশ আর ডাক্তার ভাদুড়ীও এখন হিমানীর ঘরের ভেতরে বসে আছে। দুজনে বের হয়ে এসে আর বারান্দাতে সুমোহনকে দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়ায়। ডাক্তার ভাদুড়ী বলেন—এখন তো হিমানীকে যসিডিতে নিয়ে যাবার কোনও প্রশ্নই নেই, একেবারেই অসম্ভব। বিধুবাবু বলছেন, কলকাতারই কোনও নার্সিং হোমে নিয়ে গেলে ভাল হয়। আমি বললাম, কোনও দরকার নেই। বিকাশ একাই একশো নার্সিং হোম।

ডাক্তার ভাদুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে আর সব কথা শুনেও সুমোহন কোনও কথা বলে না।

ডাক্তার ভাদুড়ী ডাকেন—চলো বিকাশ।

সুমোহনের ভ্রূকুটি আরও শক্ত হয়ে ওঠে। এই ভাদুড়ী ডাক্তার একটি অষ্টম আশ্চর্য। মাথার একদিক সাদা, আর একদিক কালো। মুখ দেখে বোঝা যায় না, মনে কী আছে। আর মাথানাড়া দেখে বোঝা যায় না, হ্যাঁ বলছেন কি না বলছেন। কোনও সন্দেহ নেই, এই ডাক্তার ভাদুড়ীই যসিডিতে চিঠি দিয়ে ওদের এখানে আনিয়েছেন।

—গোলাপ ! আমার গোলাপ ! আদর করে মেয়েকে ডাকছেন বাপ, বিধু সরকার। যসিডিতে নার্সারি আছে, ফুল বেচে অনেক টাকা রোজগার করেন ভদ্রলোক, তাই মেয়েকে ওই পয়মন্ত নাম দিয়েছেন।

চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করে সুমোহন, বাপের ডাক শুনে মেয়ে কি কোনও সাড়া দিতে পেরেছে ? না, হিমানীর গলার কোনও সাড়া শোনা গেল না।

এগিয়ে গিয়ে বই-এর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় সুমোহন।

আর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তিও নেই। ভবিতব্যের সঙ্কেত খুব স্পষ্ট করেই দেখতে পেয়েছে সুমোহন। সুমোহন আজ বিশ্বাসে উৎফুল্ল একটি অপেক্ষার প্রাণ। রাত ফুরোবে কখন, আর ভোর হবে কখন ? আজ না হয় কাল, কাল না হয় আর দুদিন পরেই বোধ হয় অপেক্ষার শেষে রাত ভোর হয়ে যাবে। মাঝরাত পর্যন্ত মন দিয়ে বই পড়তে পারে সুমোহন, আর বাকি রাতটুকু নিবিড় ঘুম ঘুমিয়ে নিতেও পারে।

ঠিক ভোর হতেই সুমোহনের ঘুম ভেঙে যায়। আর অদ্ভুত একটা কলরব শুনতে পেয়ে সুমোহনের মনের শান্তি বিষিয়ে যায়। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে কুটুম্বের দল। কী আশ্চর্য, ওরা তবে সারারাত এখানে ছিল ?

যসিডির বড়দা বলছেন—আমিই তো প্রথম দেখলাম, চোখ খুলে তাকিয়ে আছে।

যসিডির বউদি বলছেন—কিন্তু তোমাকে নয় ; সবার আগে আমাকেই চিনতে পেরেছে।

বিধু সরকার বলেন—ওঃ !

বড়দা—এখন যাওয়া যাক। আমি না হয় একটু আগেই চলে আসব, তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে তারপর আসবে।

চলে যাক, এখনি চলে যাক ওরা, এই বাড়িতে এসে হল্লা করবার অধিকার ওদের নেই। সুমোহনের তিক্ত বিরক্ত ও রুষ্ট মনটা গরগর করে।

সেই মুহূর্তে মন স্থির করে ফেলে সুমোহন, না, ওরা যতদিন এখানে আসবে থাকবে, ততদিন এ বাড়ির বাইরে থাকবে সুমোহন। হিমানীর ঘর নীরব হোক আগে, তারপর ফিরে আসবে। যারা মনে প্রাণে ও ইচ্ছায়, আর আশায় ভাষায় ও কলরবে সুমোহনের জীবনের কেউ নয়, তাদের হল্লা সহ্য করবার কোন অর্থ হয় না। সুমোহনই বা তাদের সে সুযোগ দেবে কেন ? ওদের নিজেদের জীবনের হল্লা শুনিয়ে সুমোহনকে তুচ্ছ করবার সুযোগ ওদের আর দেওয়া উচিত নয়।

আচার্য হরি শাস্ত্রী নিশ্চয় এতদিনে কাশী থেকে পুরুলিয়াতে ফিরে এসেছেন।

সকাল হতেই রওনা হয়ে গেল সুমোহন। শুধু চাকর জানল, তারপর পূরবী জানল, শুধু দশটা দিন সুমোহন হাজারিবাগে থাকবে আর ফিরে আসবে।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতেই সুমোহনের এই মত্ত অভিযাত্রার আবেগ যেন হঠাৎ একটু হোঁচট খেয়ে চমকে ওঠে। এ কী কাণ্ড করছে সুমোহন ! এ তো যসিডির ওই হল্লার কোনও শাস্তি হল না, হল সুমোহনের নিজেরই শাস্তি। পূরবীকে দশটা দিন একটা শূন্যতার দুঃখের মধ্যে রেখে দিয়ে, আর নিজেও শূন্য হয়ে থেকে কি কোনও শান্তি পাবে সুমোহন ? ওই সব হল্লা তো নীরব হয়েই যাবে, দশ দিনে না হোক বিশ দিনে। হল্লা শোনার গ্লানি থেকে পলাতক হতে গিয়ে পূরবীর কাছ থেকে পলাতক হওয়ার তো কোনও অর্থ হয় না। ওটা ভুল বুদ্ধির একটা নাটুকে কাণ্ড ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। বাড়ি ফিরে এসেই টেলিফোনে পূরবীকে খবর দেয় সুমোহন—যাওয়া হল না।

পূরবী হাসে—জানতাম, যাওয়া হবে না।

সন্ধ্যাবেলায় পূরবীকে যখন কাছে পায় সুমোহন, তখন পূরবী আবার হেসে ওঠে—এ কী পাগলামি করতে চলেছিলে ?

সুমোহন—বাড়িতে থাকতে অসহ্য বোধ করছি।

পূরবী সুমোহনের হাতের কাছে একটা খবর-কাগজ এগিয়ে দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন দেখায়—গেস্ট চাইছেন পার্ক স্ট্রিটের মিসেস উড। থাকবার ও খাওয়ার সব রকম সুবিধে আছে।

সুমোহন—তুমি বলছ ?

পূরবী—আমি তো তাই ভাল মনে করি। বাড়ি যখন এত অসহ্য মনে হচ্ছে তখন কিছুদিন মিসেস উডের গেস্ট হয়েই থাক। যখন ইচ্ছে হবে, বাড়ি গিয়ে দেখে আসবে গোলমাল মিটে গেল কিনা।

সুমোহন—ঠিক কথা ! আমি আজই আসতে চাই ।

বুড়ি সৌদামিনীর ফ্ল্যাটে গিয়ে পূরবী নিজেই টেলিফোন করে আর চলে আসে—হ্যাঁ, মিসেস উড বললেন, আজই আসতে পারেন ।

—তা হলে আমি এখন চলি, কেমন ?

পূরবী—এসো ।

একবার শুধু নিউ আলিপুরের বাড়িতে যাওয়া, আর একটা বাক্স ও কিছু বই নিয়ে নিজের গাড়িতে নয়, ট্যাক্সিতে করে পার্ক স্ট্রিটের মিসেস উডের অতিথিনিবাসে চলে আসা ; দুটি ঘন্টারও বেশি সময় লাগল না । সুমোহন তার এই নতুন নীড়ের ভেতরে সব যত্নেরই সুব্যবস্থা দেখতে পেয়ে খুশি হয় । কিন্তু হাসতেও ইচ্ছে করে । থাকতে কোনও অসুবিধে নেই বটে, কিন্তু যেন একটা পরিহাস আছে । অভিশাপে বিড়ম্বিত একটা জীবনের পরিহাস । সান্ত্বনা শুধু এই যে, এ শুধু দুদিনের বাসা । দুদিন না হোক বড় জোর ত্রিশটি দিনের বাসা ।

কিন্তু দুদিন যেতেই সুমোহনের নতুন অভিযাত্রিক প্রাণটা যেন ছোট্ট একটা কাঁটার খোঁচা লেগে চমকে ওঠে । ছোট্ট একটা সন্দেহের কাঁটার খোঁচা । বাড়িতে গিয়ে বুঝতে পারে সুমোহন, নীরব হয়নি সে বাড়ির কোনও ঘর ; শুধু নিজেরই ঘরটি নীরব হয়ে পড়ে আছে । আর যসিডির হল্লাও সরে যায়নি । বেশ স্পষ্ট করেই শুনতে পায় সুমোহন, বাইরের ঘরে বসে খিলখিল করে হাসছেন যসিডির বউদি ।—কথাটা যে-ই না বলেছি, অমনি হেসে ফেলেছে ; আমার হাতে একটা চিমটিও বসিয়ে দিয়েছে ।

বিধু সরকার—কিন্তু এখনও তো একটা কথাও বলল না !

যসিডির বড়দা চেঁচিয়ে উঠলেন—বলেছে ; বেশ স্পষ্ট করে বলেছে । তুমি শুনতে পাওনি, কিন্তু আমি শুনেছি ।

বিধু সরকার—কী বলেছে ?

বড়দা—বলেছে, নিয়ে চলো ।

বিধু সরকার—সে তো এখন অসম্ভব !

বড়দা—কিন্তু সে কথা তো ওকে বলতে পারি না, আমি শুধু মাথা নেড়ে জানিয়েছি, হ্যাঁ, যাবি ।

ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয় সুমোহন, সেই রিপোর্ট কি তবে একটা পাগল ডাক্তারের প্রলাপ ? হতে পারে ! ডাক্তার ভাদুড়ীর মাথার ঠিক নেই, কথারও ঠিক নেই । কিন্তু আজই আর এত তাড়াতাড়ি এত বেশি সন্দেহ করবার কোনও মানে হয় না । ভবিতব্যের মেজাজে অসম্ভব সম্ভব হয় বটে, কিন্তু আবার সম্ভবও তো অসম্ভব হয়ে যায় !

আবার দশদিন পরে একবার ; তারপর আবার পনেরো দিন পরে একবার, বাড়িতে এসেই চমকে উঠেছে সুমোহনের মন ; ভবিতব্যটা বোধ হয় খুব চতুর এক বিশ্বাসহন্তা ।

ডাক্তার ভাদুড়ী, বিকাশ, বিধু সরকার আর যসিডির সেই বড়দা ও বউদি ; সবাই বাইরের ঘরে, যেন একটি আরামের আসরে বসে হাসাহাসি করছেন ।

বিধুবাবু বললেন—আমার গোলাপ রইল তোমাদের কাছে, আমি এখন ফিরে গিয়ে আমার নার্সারির গোলাপগুলোর একটু দেখাশোনা করি ।

ডাক্তার ভাদুড়ী—যান, একেবারে নিশ্চিন্ত মন নিয়ে চলে যান ।

বড়দা—আমি বলি, বাবা তাঁর পুত্রবধূকেও সঙ্গে নিয়ে যান । ওর তো এখানে কোনও কাজ নেই, হিমির সঙ্গে শুধু ফষ্টি-নষ্টি করা ।

বিকাশ হাসে—তা বললে কি হয় ! বউদি কী চমৎকার করে বার্লি-সুপ তৈরি করে দেন, ওকাজ আমাদের কারও সাধ্যি নয় ।

অসম্ভব প্রায় সম্ভব হতে চলেছে, তারই উল্লাসের কলরব শুনছে সুমোহন । যে প্রাণ চলে যাবার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিল, সেই প্রাণ এখন ছাড়পত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে । এখন হেসে হেসে চিমটি কাটে, ফষ্টি-নষ্টির কথা শোনে, বার্লি-সুপ খায় । হিমানী কি তবে একটি অঘটন ঘটন-পটিয়সী কায়া ?

ভাবনাগুলি যেন পোকার মত সুমোহনের মনের শান্তি কুরে কুরে ধুলো করে ঝরিয়ে দিচ্ছে। বিশ্বাসটা বিদ্রূপ হয়ে মুখ লুকোচ্ছে।

আশার আকাশে শুধু একটি তারা এই যে, হিমানীর অসুখ যদি সেরে যায় তবে সে যসিডিতে চলে যাবে। কিন্তু ভয় এই যে, হিমানী আবার ফিরে আসবে। নিজেরই জীবনের অবমাননাকে ভয় করে না যে, একরোখা অর্থহীন সেই জেদ এবাড়িতে আসতেও ওর ভয় করবে না।

হিমানী যদি যসিডিতে থেকেই যায়, এ বাড়িতে আর কোনওদিনও না আসে, তবে তাতেই বা সুমোহনের জীবন ওই মিথ্যার বন্ধন থেকে কতটুকু মুক্তি পাবে ? শুধু পূরবীর ওখানে যাওয়ার এই পথটুকু সুমোহনের জীবনে যেন নিত্য উৎসবের যাত্রাপথ। যাওয়া আর মনে প্রাণে ও দেহে একটি বিহ্বল পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে আসা। কিন্তু পূরবীকে আপনজন করে এবাড়িতে নিয়ে আসবার অধিকার পাওয়া যাবে না।

বিকাশকেও একটা ভরসা বলে বিশ্বাস করা যায় না। বিকাশ শুধু দৌড়াদৌড়ি করে হয়রান হতে পারে, তাকিয়ে থাকতে পারে, হাত বাড়াতেও পারে, কিন্তু জোর করে ধরতে পারে না।

পার্ক স্ট্রিট থেকে রোজই সন্ধ্যায় একবার থিয়েটার রোড, কিংবা পার্ক স্ট্রিট থেকে নিউ আলিপুর ; পথটা যেন বিফল আশার একটা মরুপথ। যাওয়া, আর মনে প্রাণে দেহে আধপোড়া হয়ে ফিরে আসা। এভাবে এই মরুপথে আর বেশিদিন ছুটোছুটি করতে হলে সুমোহন যে ছাইমাখা একটা আলেয়া হয়ে যাবে, সে আলেয়া দেখে ভয় পেয়ে চোখ ঢাকবে পূরবী।

পূরবীর কাছে গিয়ে বসবার আনন্দটাও মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। কী মনে করবে পূরবী, যদি আবার তাকে শুনতে হয় যে, সুমোহনের সেই ধ্রুব বিশ্বাসও একটা ধুলোর আঁধির মধ্যে পড়েছে, পথ খুঁজে পাচ্ছে না ?

কিন্তু আশ্চর্য, পূরবীর মন প্রাণ ও দেহ ফুলবনের সৌরভে ভরেই আছেই। শীতের বাতাসেও না, গ্রীষ্মের বাতাসেও না, সে সৌরভ কখনও কুণ্ঠিত হবার নয়। হয়ও না। এতগুলি দিন যে পার হয়ে গেল, তার কোনও হিসাব রাখে না, হিসাবও করে না পূরবী।

পার্ক স্ট্রিটের মিসেস উডের অতিথি-নিবাসে বড় জোর একটি মাস থাকতে হবে বলে বিশ্বাস ছিল মনে, কিন্তু তিনটি মাস পার হয়ে যাবার পরেও মনে হয়, কে জানে আর কতদিন এখানে থাকতে হবে ! কারণ, যসিডির সেই দম্পতি, বড়দা আর বউদি এখনও হিমানীকে দেখতে আসে। ওরা নাকি হিমানীর স্বাস্থ্যের আর একটু উন্নতি দেখে নিয়ে তারপর যসিডি চলে যাবে। আর যদি ডাক্তার ভাদুড়ী অমত না করেন তবে হিমানীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।

কিন্তু তারপর মাত্র তিনটি দিন পার হবার পর কয়েকটি বই আনবার হঠাৎ দরকারে বাড়িতে গিয়ে দেখতে পায় সুমোহন, বাইরের ঘরে আর কেউ নেই, শুধু ডাক্তার ভাদুড়ী আর বিকাশ হাসছে আর গল্প করছে।

এগিয়ে যায় সুমোহন—কী খবর ডাক্তার ভাদুড়ী ?

ডাক্তার—এই তো খবর, যা দেখছেন। শুধু আমরা দুজন, আমি আর বিকাশ। যসিডির দম্পতি যসিডিতে চলে গিয়েছেন।

সুমোহন হাসে—তার মানে আপনার পেসেন্টের স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হয়েছে !

ডাক্তার ভাদুড়ী—একটু উন্নতি হবে কেন ? বলতে গেলে, সেরেই গিয়েছে।

সুমোহন—তার মানে, ম্যাজিক !

ডাক্তার ভাদুড়ী —তা বলতে পারেন !

সুমোহন—তা হলে বলুন, আপনাদের মেডিকাল সায়েন্স হল ম্যাজিক, সায়েন্স নয় !

ডাক্তার ভাদুড়ী মিটিমিটি হাসেন—আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের উপরেও একটা সায়েন্স আছে, সেটা একটা ম্যাজিকই বটে।

সুমোহন—সে সায়েন্সের নাম কী ?

ডাক্তারভাদুড়ী—নাম হলো, আর. কে. এম. কে.।

সুমোহন—তার মানে ?

ডাক্তার ভাদুড়ী—তার মানে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

'হেঁ হেঁ হেঁ' হাসতেই থাকেন ডাক্তার ভাদুড়ী। বিকাশও হেসে ফেলে। সুমোহন হাসতে চেষ্টা করেও হাসতে পারে না, ব্যস্ত হয়ে হেঁটে বই-এর ঘরের দিকে চলে যায়।

বই-এর ঘরে ঢুকে টেবিলের চিঠিপত্রগুলির দিকে তাকাতে গিয়েই চমকে ওঠে সুমোহন। আবার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে, কী যেন একটা কথা বার বার বলছেন ডাক্তার ভাদুড়ী।

ডাক্তার ভাদুড়ী বিকাশকে বলেছেন—তুমিই দিয়ে আসবে। যসিডি থেকে কাউকে আসতে বলবার দরকার নেই। ...না, না, তুমিই যাবে।

বিকাশ—আমার তো আর ছুটি পাওয়া সম্ভব হবে না!

ডাক্তার ভাদুড়ী—সম্ভব হতেই হবে। আমি চিঠিতে বিধুবাবুকে এই কথাই জানিয়ে দিয়েছি।

বিকাশ—আমাকে একবার একটু জিজ্ঞাসা না করেই জানিয়ে দিলেন ?

ডাক্তার ভাদুড়ী—একটু ভুল হয়েছে ভাই! যাই হোক, এখন তো আর অন্য কথা লেখা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। যেমন করেই হোক, ছুটির ব্যবস্থা করে রাখো।

এই দিনটির পর মাত্র একটি দিন পরে মিসেস উডের অতিথি-নিবাস থেকে বিদায় নেয় সুমোহন। আর বাড়িতে এসেই বুঝতে পারে, এতদিনে নীরব হয়েছে বাড়ি। কী অদ্ভুত শান্ত একটা স্তব্ধতা। হিমানী নেই মনে হয়। একমাস পরে ছুটি না পাওয়ার ভয়ে বিকাশ বোধ হয় কালই হিমানীকে নিয়ে যসিডি চলে গিয়েছে।

সুমোহনের স্বস্তির নিঃশ্বাসটা হঠাৎ বাধা পায়। শুনতে পায় সুমোহন, এই নীরবতার মধ্যে যেন চুপে চুপে কথা বলছে শুধু হিমানীর ঘর। শুধু দুটি কণ্ঠস্বর। না, বুঝতেও কোনও অসুবিধা নেই, তৃতীয় আর কেউ নেই, ওঘরে এখন শুধু দুজন, হিমানী আর বিকাশ।

স্বস্তি! এমন স্বস্তি কোনওদিনও অনুভব করেনি সুমোহন। ওই ঘরটি যেন সুমোহনের এতদিনের আশা ও বিশ্বাসের একটি কল্পলোক। এখন যদি এই ঘরের ভেতরে দুটি নিঃশ্বাস জড়াজড়ি করে এক হয়ে যায়, তবেই সমস্যাটা সব দিক দিয়ে সুখী একটি পরম নিষ্পত্তির আনন্দে হেসে উঠবে।

কিন্তু স্বস্তির উপরেও বোধ হয় একটা পরাস্বস্তি আছে। একথা জানতে ইচ্ছে করে, বুঝতে ইচ্ছে করে, একেবারে নিঃসন্দেহ হতে চায় সুমোহন, পরম নিষ্পত্তি হয়ে গেল, কি হল না ? কিংবা, আদৌ হবে কিনা ?

কল্পলোকের ঘর যদিও খুব চুপে চুপে কথা বলছে, কিন্তু ভরা দুপুরের এই শান্ত স্তব্ধতা যেন একটা দৈব অনুগ্রহ। ওই ঘরের দরজার কাছে গিয়ে, একটু আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে, আর নিজের নিঃশ্বাসের শব্দটাকে একটু চেপে দিয়ে সবই শুনতে পায় সুমোহন।

হিমানী বলছে—রাগ হয় বইকি! না হয় মরেই যেতাম, তুমি ওরকম একটা কাণ্ড করলে কেন ?

বিকাশ হাসে—ডাক্তারের নির্দেশ ছিল, তা ছাড়া রোগীর সেবা করতে হলে ওসব করতেই হয়।

হিমানী—অমন সেবা না করলেই পারতে! একটা আধমরা শরীরের জিরজিরে হাড়-মাংসকে অমন যত্ন করে ধোওয়া-মোছা করবার দরকার ছিল না, তুমি ইচ্ছে করে...।

বিকাশ বলে—কী বললে ?

হিমানী—বলছি, তুমি আমার পা ছুঁতে গেলে কেন ? নিজের হাতে বেডপ্যান টানাটানি করতে গেলে কেন ?

বিকাশ আবার হাসে—আজ আর ওসব কথা বলে লাভ কী ? ওসব তো চুকেই গিয়েছে।

হিমানী—একটা মেয়ে-নার্স রেখে দিলে না কেন ?

বিকাশ—ডাক্তার ভাদুড়ী বললেন, মেয়ে-নার্স রাখবার কোনও দরকার নেই।

হিমানী—ব্যস্, অমনি তুমি বুঝে নিলে দরকার নেই ? তুমি মনে করলে যে, তুমি নিজেই একটি মেয়ে-নার্স! ছি!

বিকাশ—যাক, যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে।

হিমানী—না, হয়ে গেলেই চলে না।

বিকাশ—তা হলে বলো...।
হিমানী—না, বলব না। কিছুই বলব না।
বিকাশ—আজ কিন্তু আমাকে এখনই উঠতে হবে।
হিমানী—কেন ?
বিকাশ—বিকেলে একবার অফিসে না গেলে চলবে না।
হিমানী—তবে যাও।
দরজার পর্দার কাছে বিকাশের ছায়া নড়ে ওঠবার আগেই নিজের ঘরে চলে যায় সুমোহন।

॥ ৯ ॥

আশা করেনি সুমোহন, আজ সন্ধ্যায় পূরবীকে এই রকম একটি রূপে ও ভঙ্গিতে সোফার উপর এমন করে বিলোল হয়ে বসে থাকতে দেখবে। পূরবীর সাজ আর শরীর দুই-ই যেন দুটি সুন্দর শিথিলিত শোভা। কল্পনাও করতে পারেনি যে, সুমোহনকে দেখতে পেয়েই পূরবী আজ এমন করে এত ব্যস্ত একটি অভ্যর্থনার কথা বলে ফেলবে—দরজাটা বন্ধ করে দাও।

সুমোহন—কী হল, বুকের উপর প্রজাপতির পরাগ ঝরে পড়েছে বুঝি ?

পূরবী—তার মানে ?

সুমোহন—ওই যে ! চোখের সঙ্কেত করে দেখিয়ে দেয় সুমোহন।

পূরবীর বুকের ঠিক সেখানে, যেখানে জামার বোতামটা ঘর থেকে আলগা হয়ে সরে গিয়েছে, সেখানে এক ছিটে পাউডার লেগে আছে।

দেখতে পেয়ে পূরবীর আপনি-রাঙিন লালচে ঠোঁট আরও রঙিন হয়ে যায়। পূরবী ডাকে—কাছে এসে বসো !

পূরবীর কাছে এসে বসে সুমোহন। জানে সুমোহন, আর পূরবীর মুখের দিকে তাকিয়েও বুঝতে পারে, পূরবী এখন সামান্য কিছুক্ষণের নিঃশ্বাস-বিনিময়ের পালা পছন্দ করবে না, কিন্তু কোনও কথাও বলবে না। শুধু বিহ্বলতার একটি স্তবক হয়ে পড়ে থাকবে।

সুমোহনও কোনও কথা বলে না। বলবার দরকার হয় না।

প্রিয় উৎসবের মুহূর্তগুলি যে কত দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তাও বুঝতে পারে না সুমোহন। খাজুরাহোর পাথুরে ভঙ্গির সব রেখা আর বলয় স্বপ্নালু হয়ে যে ভরাট কোমলতা ছন্দিত করে রেখেছে, তারই নিলাজ শোভার উপর নিজের হাতে আবরণ টেনে দিয়ে তারপর ডেকে দেয় সুমোহন।—পূরবী !

পূরবী—বলো।

সুমোহন—শুধু একটি কথাই বলতে চাই, তুমি একটি বিস্ময়।

পূরবী হাসে—কিন্তু মনে করে দেখো তো একবার, সেদিন কি কথাটি বলেছিলে ?

সুমোহন—কী কথা ?

পূরবী—তোমার ধ্রুব বিশ্বাসের কথা।

সুমোহন—হ্যাঁ, বলেছি বইকি !

পূরবী—তার মানে, এখনও কিছু-দূর, আরও কিছু বাকি আছে।

সুমোহন হাসে—তা বলতে পারো। কিন্তু আমি বলব, সেটা কিছুই নয়। সেটা একটা শুধু খটকা। অস্পষ্ট একটা কথাকে একটু স্পষ্ট করে জানবার জন্যে কয়েকটি দিনের অপেক্ষা।

পূরবীর চোখের পাতা ভিজে যায়।—অপেক্ষা ! শুধু অপেক্ষা !

পূরবীর গলা দুহাতে জড়িয়ে আর মাথার উপর মুখ রেখে সুমোহন বলে—শোনো তবে ; এই অপেক্ষার শেষ হবে এই মাসেই, তারপর আর কোনও সমস্যা নয়, শুধু আইনটা দেরি করিয়ে দেবে বলেই একটি বছর পরে আমাদের বিয়ে হবে।

পূরবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে আসবার পর, আর বই-এর ঘরে বসে পাশের বাড়ির

রেডিওর গান অনেকক্ষণ ধরে শোনবার পর বুঝতে পারে সুমোহন, সত্যিই একটা খটকা এখনও একেবারে নিশ্চিন্ত হবার আনন্দটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে, কাছে আসতে দিচ্ছে না। কে জানে বিকাশের কাছে হিমানীর কী কথা বলবার ছিল, কিন্তু রাগ করে বলল না। হিমানী হয়ত বিকাশকে এই কথাই বলতে চেয়েছিল যে, তোমরা সবাই মিলে এ বাড়ি থেকে আমাকে সরিয়ে দিতে যতই চেষ্টা কর, আমি সরব না। মানসিক রোগের মানুষ ; অসুখ অপমান আর তুচ্ছতার ঘরই তার ভাল লাগবে ; অসম্ভব কিছু নয়।

বিকাশ বোধ হয় আজ সন্ধ্যায় আর আসেনি। বিকেলে অফিস করে আবার সন্ধ্যা হতেই এখানে আসা অবশ্য বিকাশের মত মিথ্যে হয়রানির মানুষের পক্ষে অসাধ্য নয়। এসে থাকলেও চলে গিয়েছে নিশ্চয়, রাতও তো মন্দ হয়নি।

পাশের বাড়ির রেডিও হঠাৎ গান বন্ধ করে দিয়ে নীরব হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে শুনতে পায় সুমোহন, হিমানীর ঘরের ভেতরে একটা সুরেলা কলরব হেসে হেসে উথলে উঠেছে।

হিমানীর ঘরের দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে সবই শুনতে থাকে সুমোহন। ঠিকই, দুজনের সঙ্কল্প আর শপথের স্পষ্ট-অস্পষ্ট কথাগুলি হাসিতে খুশিতে ভরে গিয়ে আর সুরেলা হয়ে বাজছে।

হিমানী—বিয়ের কথাটা বাবার কাছে আমি বলতে পারব না, তুমিই বলবে।

বিকাশ—আমিই বলব, কিন্তু তুমি তখন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকবে, একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে, যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েছ। ভাবখানা এমন করবে যে, যেন কিছুই জান না।

হিমানী—বড়দাকেও তুমিই বলবে, আদালতে দরখাস্ত দিতে যেন দেরি না করে।

বিকাশ—সে আর বলতে হবে না, বড়দা তো একেবারে মুখিয়ে আছেন। একবার বললেই হয়।

হিমানী—কে বললে ?

বিকাশ—বড়দাই বলেছেন, আজই বড়দার চিঠি পেয়েছি।

হিমানী—কিন্তু আর এখানে থাকা কেন ? কালই চলে গেলে তো হয়।

বিকাশ—ডাক্তার ভাদুড়ী যখন বলেছেন, তখন একটা মাস থেকে যাওয়াই ভাল।

হিমানী—কিন্তু কেন ? ডাক্তার ভাদুড়ী মিছিমিছি আরও একটা মাস এখানে থাকতে বললেন কেন ? উনি নিজেই তো বললেন, আমার স্বাস্থ্যের পুরো উন্নতি হয়েই গিয়েছে !

বিকাশ হাসে—ডাক্তার ভাদুড়ী বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যেরও পুরো উন্নতি দরকার। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, সাতদিনের মধ্যেই মানসিক স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়ে গিয়েছে, তবে সাতদিনের মধ্যেই চলে যেতে হবে।

হিমানী—বুঝলাম না !...কিন্তু তুমি ওরকম করে হাসছ কেন ?

বিকাশ—তার মানে, একমাসের বেশি এখানে থাকা হবে না। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হোক বা না হোক।

হিমানী—মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি মানে কী ?

বিকাশ—ডাক্তার ভাদুড়ী জানেন।

হিমানী—তুমি জান না ?

বিকাশ—একটু জানি, কিন্তু বলব না।

হিমানী—বলো বলছি।

বিকাশ—না।

হিমানী—ভাল হবে না বলছি, এখুনি বলো, কী কথা।

বিকাশ—না, এখনি বলব না, বলতে পারি না।

হিমানী—বলতেই হবে।

বিকাশ—আচ্ছা, কথা দিচ্ছি, যসিডি যাবার আগের দিনেই কথাটা বলে দেব।

হিমানী—যসিডি যাবার দিনটা কবে ?

বিকাশ—যেদিন কথাটা বলব, ঠিক তার পরের দিন।...আচ্ছা চলি।

সুমোহনের এই মুহূর্তের নিঃশ্বাসটা সফল স্বপ্নের মত কলরব নিয়ে আর ফোয়ারা হয়ে বুকের

ভেতর থেকে উথলে উঠতে চাইছে। বিকাশের পায়ের শব্দ বেজে উঠবার আগেই সরে যায় সুমোহন। বাইরের ঘরের সোফাতে বসেই আবার উঠে দাঁড়ায়। এখনই টেলিফোনে বলে দিতে ইচ্ছে করে, সবই জানা হয়ে গেল, পূরবী। পথে আর কোনও বাধা নেই। ধুলো নেই, কাঁটা নেই, খটকা নেই, সন্দেহ নেই।

বোধ হয় একমাসের মধ্যেই আদালতের নোটিস আসবে। ভাল কথা। আসুক নোটিস, কালই আসুক না কেন! সে নোটিস কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেবে সুমোহন। তুচ্ছতা অবহেলা আর রূঢ়-নিষ্ঠুর ব্যবহার, অভিযোগের সহজ বাঁধা গত হয়ত চড়া সুরে সঙ্গত করার সঙ্গে অনেক মিথ্যে কথাও বলবে। বলুক। অভিযোগের একটি কথারও প্রতিবাদ করবে না, আদালতের ছায়ার কাছেও যাবে না সুমোহন। একতরফা ডিক্রি পেয়ে আর খুশি হয়ে নতুন ঘরে চলে যাক হিমানী। সুখী হোক হিমানী।

এইরকমই একটি সুখী নিষ্পত্তি চেয়েছিল সুমোহন। শেষে তাই তো হল, কিন্তু হবার আগে দুঃসহ ধুলো-জঞ্জালের মত যত মিথ্যে ভয় আর মিথ্যে ভাবনার কী ভয়ানক একটা উৎপাতই না করে নিল। তথাকথিত ভবিতব্য বোধ হয় একটা মূঢ়তার গাধা, জল ঘোলা করে নিয়ে তারপর সেই জলই খায়।

না, আজ এখনই আর এত রাতে পূরবীকে টেলিফোনে কথা না বলে দিলেও চলে। টেলিফোন নয়, মুক্তিসুখের এই কথাটা পূরবীকে বলতে হলে পূরবীর মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলতে হবে। হয়ত বলবারই দরকার হবে না। সুমোহনের চোখের দিকে তাকিয়েই বলে উঠবে পূরবী—বুঝেছি।

—কেমন করে বুঝলে ?

—আগে কোনওদিনও তোমার চোখে এত আলো দেখিনি, আজ দেখছি।

কল্পনার ভাষা বটে, কিন্তু তারই গুঞ্জন শুনতে পেয়ে সুমোহনের দুই চোখ যেন আলোতে ভরে যায়। ঘরের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে সুমোহন।

পরের দিন বিকেলবেলা থিয়েটার রোডের জোড়া গুলমোরের ছবিটা যখন মনে পড়ে, পূরবীর কাছে যাবার জন্য প্রাণটা যখন ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন বুঝতে পারে সুমোহন. আজ দেয়ালি।

বিকেলের আলোর মধ্যেই শহর উৎসবে মেতে উঠেছে, এদিকে-ওদিকে চারিদিকে পট্‌কা ফাটছে। এতক্ষণে মনে পড়ে, যে কথা মনে রাখতে ভুলেই গিয়েছিল সুমোহন। পূরবী বলেছিল, সুমোহন শুনেছিল যে, দেয়ালির রাতে বুড়ি সৌদামিনী পূরবীকে কিছুতেই ঘরের ভেতরে বসে থাকতে দেবে না। বিকেল হতেই বুড়ির সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যেতে হবেই হবে, ফিরতে রাত হবে। 'কাজেই কাল সন্ধ্যায় তুমি এসো না।'

হেসে ফেলে সুমোহন। মনটা এরকম কত ভুলোপনাই তো করল। পূরবী একদিন বলেছিল, আসবার সময় মনে করে মথুরা মিউজিয়মের হ্যান্ডবুকটা নিয়ে আসবে। সুমোহন নিয়ে গিয়েছিল, বার্ডউডের তিব্বতি আইকনোগ্রাফি। পূরবী জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার হাতে ওটা কী বই ? পাহাড়ি পেন্টিং ? সুমোহন জবাব দিয়েছিল—তুমি বলছ যখন, তখন চা খেয়েই যাই।

কে জানে বই-এর এই ভিড়ের মধ্যে কোথায় পড়ে আছে মথুরা মিউজিয়মের হ্যান্ডবুক ? টেবিলের উপর বই-এর গাদার ভেতরে, র‍্যাকের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে থাকে সুমোহন। কী আশ্চর্য, যত অনুরাধাপুর তাঞ্জোর মাদুরা আর নালন্দার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে, শুধু এক মথুরা কোথায় যেন মুখ লুকিয়ে বসে আছেন।

চারদিকের চারটি পাশের বাড়ির রেডিও মত্ত হয়ে গান গাইতে শুরু করেছে।

বই তল্লাশির দুটি হাতের ব্যস্ততা থামিয়ে দিয়ে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় সুমোহন। হঠাৎ মনে হয়েছে সুমোহনের, হিমানীর ঘরের ভেতরেও নিশ্চয় দুটি কণ্ঠস্বরের হর্ষ মিলে-মিশে উৎসব শুরু করে দিয়েছে। আজ বিকাশের অফিসের ছুটির দিন। বিকাশের না আসবার তো কোনওও কারণ নেই।

চোখে পড়েছে সুমোহনের, হিমানীর ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরের ঘরে গিয়ে দেখতে পায়, হিমানীর ঘরের সেদিকের দরজাও বন্ধ। ভেতরে বারান্দায় গিয়েও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, দরজা বন্ধ,

জানালা বন্ধ। বারান্দার শেষ প্রান্তের মুখে লোহার জালি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই শুধু জালের গায়ে চোখ লাগিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, পশ্চিমের দুই জানালা আর দরজাটা খোলা।

জানে সুমোহন, সেই বিচিত্র ডাক্তার ভাদুড়ীরই নির্দেশ আছে, কথাটা নিজের কানেই একদিন শুনতে হয়েছে, হিমানী যেন নিয়ম করে রোজ বিকেলে একটু খোলা-মেলা রোদ-বাতাস গায়ে লাগায়। কোনও সন্দেহ নেই, পশ্চিমের খোলা জানালা আর দরজা দিয়ে বিকেলের অনেক রোদ আর অনেক আলো হিমানীর ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশের বাড়ির উঁচু পাঁচিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে একটা বকুল আর একটা নিম ঝুরঝুর করে পাতা কাঁপিয়ে বাতাস ছাড়ছে। ভাল রোদ আর ভাল বাতাস ভাল করেই গায়ে লাগাতে পারছে হিমানী। জানে সুমোহন, বেশ কিছুক্ষণ, অন্তত একটি-দুটি ঘন্টা ভেতরের দিকের এইসব দরজা আর জানালা বন্ধ করে রাখবার দরকারও আছে। হিমানীর আদুড় গায়ের লজ্জাটাও তো একটা লজ্জা।

চমকে ওঠে সুমোহনের এই ব্যস্ত কৌতূহলের চোখ আর কান। আর, মুখ জুড়ে একটা অদ্ভুত হাসিও শিউরে ওঠে। কত স্পষ্ট করে শুনতে পাওয়া গেল, হিমানীর এই আদুড় লজ্জার ঘরই কথা বলাবলির শব্দে হেসে উঠেছে।

বই-এব ঘরের ভেতর একবার যায় আর ফিসে আসে সুমোহন, হাতে সেই জাপানি ক্যামেরা। যেমন ক্যামেরার লেন্স, তেমনই সুমোহনের চোখ, দুই-ই যেন একই দুরন্ত কৌতূহলে জ্বল-জ্বল করে। ছবি চাই, অবশ্যই চাই, সাবধানের মার নেই। মামলাতে চমৎকার সুবিধার দলিল হতে পারে, সে দলিল হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

কিন্তু সুমোহনের চোখের তৃষ্ণার সঙ্গে ক্যামেরার লেন্সের তৃষ্ণাও যেন বন্ধ দরজা আর জানালার গায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে ফিরতে থাকে। ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই, বন্ধ দরজা আর জানালাগুলি যেন নিখুঁত বদ্ধতার পাথর।

কিন্তু অসাবধানেব মার আছে। সুমোহনের মুখের অদ্ভুত হাসি আবার শিউরে ওঠে। যে জানালার ভেতর দিক থেকে হিমানীর একটা অতি আদুরে আর্কিডের শুঁড় জানালা পার হয়ে বাইরে ঝুলে পড়েছে, সে জানালা একটু ফাঁক হয়ে আছে। আরও ভাল, এই করিডরে রোদের আলো আসে না, আসতে পারে না। তার উপর আরও ভাল, ঠাকুর আর চাকর দেয়ালির মেলা দেখতে চলে যাবার আগে করিডবের শেষপ্রান্তের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গিয়েছে। এই করিডর এখন চমৎকার একটি আবছায়াময় গোপন নিরালা।

বেশ দৃশ্য, অদ্ভুত দৃশ্য। সে দৃশ্যের ভাষা অদ্ভুত, ভঙ্গিও অদ্ভুত। শক্তিশালী জাপানি ক্যামেরা সে ভঙ্গির ছবি ধরে। সুমোহনের দুই চোখ সে ছবির উৎসব দেখে। আর দুই কান সে দৃশ্যের ভাষা শোনে।

হিমানীর আদুড় গায়ের সব লজ্জা আদুড় হয়েই আছে। আলগা শাড়িটা শুধু আঁচলের এক পাক বাঁধনের জন্য কোমরে জড়ানো আছে, নইলে খসে পড়ে যেত। বিকাশের একটা হাতকে দুই হাতে শক্ত করে ধরেছে হিমানী—বলো এবার!

বিকাশ—কী বলব?

হিমানী—কাল যে কথাটা কিছুতেই বললে না:

বিকাশ হাসে—আমরা কাল সকালেই যসিডি রওনা হব।

হিমানী—বেশ তো; কিন্তু কথাটা?

বিকাশ—কথাটা এই যে, ডাক্তার ভাদুড়ী আমাকে বলেছিলেন যে, হিমানী একদিন নিজেই তোমার হাত ধরুক; বুঝিয়ে দিক যে, ওর মানসিক স্বাস্থ্যেরই পুরো উন্নতি হয়েছে। তারপর যসিডি যেও।

হিমানীর গলার স্বর খুশির ঝরনার শব্দের মত কলকল করে হেসে ওঠে।—কী ভয়ানক দুষ্টু বুদ্ধির মানুষ এই ডাক্তার ভাদুড়ী!

বিকাশ—এই হল কথা।

হিমানী যেন চকিত বিদ্যুতের মত একটা ভঙ্গির শরীর। এক নিমেষে দুহাত দিয়ে বিকাশের গলা

জড়িয়ে ধরে, আর বিকাশের মুখের উপর মুখ রেখে যেন ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর জলে ভরা টসটসে চোখ দুটোকে বিকাশের চোখে গালে আর কপালে ঘষতে থাকে। আঃ, কী শান্তি।

হিমানী যেন নিটোল দুটি স্বাদুফলের মায়াতরু। বিকাশের মাথাটাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে চেপে রাখে। হিমানী বলছে—নাও, আমার রক্ত-মাংসের সব স্বাদ তোমার বুকের ভেতর চলে যাক।

চৈত্র মাসের উতলা বাতাসে শালমঞ্জরী যেমন করে দোলে, ঠিক তেমনই করে দুলছে হিমানীর শাড়ির আঁচলের একপাকে জড়ানো কোমরটা। বিকাশের হাত দুহাতে ধরে রেখেছে হিমানী, শালমঞ্জরী যেন তার কোমরে মালা জড়াতে চায়।

বিকাশ ডাকে—হিমানী।

হিমানী—ওরকম করে শুধু কথা বলে ডেকো না ; বুকের উপর জোরে চেপে ধরো আর ডাকো।

সুমোহনের শক্তিশালী ক্যামেরার লেন্স একটু ঝুঁকে পড়ে আর দেখতে থাকে, এলিয়ে লুটিয়ে পড়েছে হিমানী। সে ভঙ্গিতে যেন শুধু একটি ফোটা পদ্মের শোভা ভাসিয়ে রেখে টলমল করছে ভরাদীঘির জল।

ক্যামেরার লেন্স নিজে আকুল না হয়েও কত না বিচিত্র আকুলতার ছবি দেখছে আর ধরে রাখছে। হিমানীর শরীরে এত ভঙ্গির জাদু কেমন করে আর কেন এতদিন ঘুমিয়ে ছিল, কেনই বা জাগেনি, সে প্রশ্ন এই ক্যামেরার চোখে নেই। ক্যামেরা শুধু দেখতে থাকে, হিমানীর এই শরীর যেন অস্থিহীন কোমলতার লতা। আদুড় লজ্জার সব বিস্ময় যেন একটি একটি স্তবক হয়ে ফুটে উঠছে। সেই স্তবকের রেখা ও বলয় যেন দুর্বার এক উচ্ছলতার অর্ঘ্য। হিমানী তার উৎসবের সঙ্গী মানুষটিকে সুখের স্বেদজলে সিক্ত করে দিয়ে এইবার যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে।

শক্তিশালী জাপানি ক্যামেরা শক্ত করে হাতে ধরে রেখে, পা টিপে টিপে হেঁটে সুমোহন আবার বই-এর ঘরের ভেতরে ফিরে গিয়ে দাঁড়ায়। জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। কী আশ্চর্য, ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলে সুমোহন। এত ঘাম কেন ? তবে কী ক্যামেরার লেন্সও ঘামে ভিজে গিয়েছে ?

॥ ১০ ॥

গাছকাটা কাঠুরিয়া শেষ কোপ দেবার আগে তার হাতের টাঙি নামিয়ে যেমন একটু জিরিয়ে নেয়, তথাকথিত ভবিতব্যটা যেন ঠিক তেমনিই একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। উকিল মনতোষবাবু বলেছেন : আমি জানতে পেরেছি সুমোহনবাবু, এই মাসের শেষদিকে আদালতের রায় বের হয়ে যাবে।

স্ত্রী হিমানী দত্তের অভিযোগ এই যে স্বামী সুমোহন দত্ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই সম্পর্ক বর্জন করেছেন, যে সম্পর্ক থাকলে স্বামী আর স্ত্রী এক ঘরে থাকতে পারে। অতএব প্রার্থনা. ডিভোর্স মঞ্জুর করা হোক। স্বামী সুমোহন দত্তের দরখাস্তের কথা এই যে, অভিযোগের বিরুদ্ধে তার কোনওও অভিযোগ নেই। সুতরাং বুঝতে অসুবিধে নেই, কাঠুরিয়ার টাঙির শুধু শেষ কোপটি বাকি আছে। তারপর মিথ্যে সম্পর্কের গাছটা, যে গাছে ফুলও ছিল না পাতাও ছিল না, শুধু ছিল কাঁটা, সে গাছ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গিয়ে নিতান্ত নির্জীব একটা লকড়ি হয়ে যাবে।

হিসাব করে বুঝতে পারে সুমোহন, মাত্র আর সাতদিন পরে মাসের শেষ দিকটা শুরু হয়ে যাবে। তারপর, শুধু একটি বছরের অপেক্ষা। এই অপেক্ষা একটা অপেক্ষা মাত্র। ট্রেন আসতে মাত্র আর একটি মিনিট বাকি ; এমন অপেক্ষায় কোনও কষ্ট নেই। তা ছাড়া টিকিট কেনা হয়েই গিয়েছে, দুটি সিটও রিজার্ভ হয়ে গিয়েছে ; অপেক্ষাতে ক্লেশ থাকবে কেন ? মথুরা মিউজিয়মের হ্যান্ডবুকের খোলা পাতাটার লেখার উপর চোখ রেখেও হাসতে থাকে সুমোহন। বুঝতে পারে সুমোহন, এখানে এই ঘরে আর একা একা বসে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না। এখনি পূরবীর কাছে গিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—এই নাও মথুরা মিউজিয়মের হ্যান্ডবুক। অনেক চেষ্টা আর হয়রানির পরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

আরও কয়েকটা দিন পার হয়ে যাবার পর সেদিন আবার হিসেব করে বুঝতে পারে সুমোহন, মাসের শেষ দিকটার শেষ হতে মাত্র আর দুটি দিন বাকি আছে। সেদিন ঠিক সন্ধ্যা হতেই টেলিফোনে খবর দিলেন মনতোষবাবু—রায় বের হয়েছে, ডিভোর্স মঞ্জুর।

ধন্যবাদ ! টেলিফোনে মনতোষবাবুকে যে কথাটা বলতে ভুলেই গেল সুমোহন, সে কথাটা একেবারে পূরবীর ঘরের দরজার কাছে এসে অদ্ভুত এক উল্লাসের শব্দের মত বেজে ওঠে।

হেসে ওঠে পূরবী—কী ব্যাপার ! কী অপরাধ করলাম আমি যে, ঘরে ঢুকেই আমাকে এরকম একটা ধন্যবাদ দিচ্ছ !

সুমোহন—ধন্যবাদ তোমাকে, ধন্যবাদ আমাকে, ধন্যবাদ তাকেও।

পূরবী—কাকে ?

সুমোহন—সেই মহিলাকে,যার নাম হিমানী।

পূরবী—মহিলা এখন কোথায় ?

সুমোহন—যথাস্থানে। ডিভোর্সের জন্য তিনি যে দরখাস্ত করেছিলেন, আদালত সেটা মঞ্জুর করেছে।

পূরবী—দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বসো !

সোফাতে বসে পড়েই আক্ষেপ করে সুমোহন—ওঃ, মথুরা মিউজিয়মের হ্যান্ডবুকটা খুঁজে পেয়েও আনতে ভুলে গিয়েছি।

পূরবী হাসে—বেশ করেছ।

সুমোহন—রাগ করে হাসছ বোধ হয় ?

পূরবী—তা বলতে পারো।

সুমোহন হাসে—কেন ? কিসের রাগ ?

পূরবী—তুমি ওই সোফাতে বসলে কেন ? আমার পাশে জায়গা নেই ?

সুমোহন এসে পূরবীর পাশে বসে, পূরবীর কাঁধের উপর একটা হাতও রাখে।—ঠিক কথা, আজ তো ঘরে ঢুকেই তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরা উচিত ছিল।

পূরবীর আপনি-রঙিন লালচে ঠোঁট ফুল্ল হয়ে হাসে আর কাঁপে—আর কিছু উচিত ছিল না ?

সুমোহন—বুঝেছি বুঝেছি। দাও, এখনি পড়ে ফেলছি।

পূরবীর চোখ দুটো যেন বেশ কঠিন ও বেশ অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের খোঁচায় কেঁপে ওঠে।—কী বললে ?

সুমোহন—তোমার সেই লেখাটা দাও।

পূরবী—কোন লেখাটা ?

সুমোহন—বাঃ, তুমি নিজেই সেদিন বললে যে, পাহাড়ি পেন্টিংয়ের ভাল-মন্দ বিচার করে তুমি খুব সংক্ষেপে একটা প্রবন্ধ লিখেছ। আমাকে একবার পড়ে দেখতেও বললে। ভুলেই গিয়েছ ?

পূরবী হাসে—না, ভুলিনি। কিন্তু বুঝতে পারিনি যে, তুমি সেই লেখা আজই পড়তে চাইবে। ...আচ্ছা, এখনি নিয়ে আসছি।

উঠে দাঁড়ায় পূরবী, পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে লেখার ফাইলটা হাতে তুলে নেয়। কিন্তু...কিন্তু পূরবীর চোখ যেন গভীর একটা প্রশ্নের আবেশে নিবিড় হয়ে ওঠে। বোধ হয় নিজেরই মনের একটা হঠাৎ-সন্দেহের সত্য-মিথ্যা একটু পরীক্ষা করে দেখতে চায় পূরবী। আয়নার কাছে গিয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আরও একটু সময় লাগে পূরবীর ; খোঁপাটাকে একটু ঢিলে করে দিতে, আর বুকের উপর একটু পাউডার ছিটিয়ে নিতে যতটুকু সময় দরকার।

ফিরে এসে সুমোহনের হাতের কাছে লেখার ফাইলটা রেখে দিয়ে সুমোহনের পাশে বসে থাকে পূরবী। চশমাটা খুলে নিয়ে কোলের উপর রাখে।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলে পূরবী—মনে হচ্ছে খুব মন দিয়ে আমার লেখাটা পড়ছ।

সুমোহন চোখ তুলে পূরবীর মুখের দিকে তাকায়—হ্যাঁ, একটু মন দিয়ে না পড়লে চলবে কেন ?

পূরবী হাসে—পড়ো। আমি তা হলে চুপ করে শুধু তোমার মুখটাকে একটু মন দিয়ে পড়ি।

পড়া শেষ করেই জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে সুমোহন, হাতের ঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর পূরবীর মুখের দিকে তাকায়—বেশ ভাল লেখা হয়েছে। আমার ইচ্ছে, তুমি এই লেখাটা এশিয়ান আর্ট জার্নালকেই দাও।

পূরবী হেসে ওঠে—তাই দেব।

সুমোহন—কিন্তু তুমি বাশোলি আর কাংড়ার মধ্যে যে মস্ত বড় রকমের একটা প্রভেদ দেখেছ, সেটা ঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আসলে ওরা একই। একজনের ময়ূর নীল, আর একজনের ময়ূর বেগুনি। শুধু রঙের রকমফের।

পূরবী—আমি তা হলে আর একবার ভেবে দেখব।

সুমোহন—আমারও সেই কথা।

পূরবী—কিন্তু আমার কথাটা তো কিছুই শুনলে না, একবার জিজ্ঞাসাও করলে না।

সুমোহন—কী ?

পূরবী—এই যে আমি বললাম, আমি এখন তোমার মুখটাকে মন দিয়ে পড়ব।

সুমোহন হেসে ওঠে—পড়েছ নাকি ?

পূরবী—নিশ্চয় !

সুমোহন—কী বুঝলে ?

পূরবী—বুঝলাম যে, তুমি আজ এখানে বোধ হয় চা'ও খাবে না।

সুমোহন—খাব বইকি ! তোমার এখানে চা খেয়ে যে তৃপ্তি পাই, বাড়ির চায়ে সে তৃপ্তি পাই না।

পূরবী—দুঃখের কথা। কিন্তু এ বাড়ির কি শুধু চায়েতেই তৃপ্তি আছে, আর কিছুতে নেই ?

সুমোহন—একজন টিকিওয়ালা পাটনাই মহারাজ ; নাম শুকদেও, পকৌড়ি ভাজে ভাল, কিন্তু চায়ের দফা রফা করে রেখে দেয়।

দুহাত তুলে ঢিলে খোঁপাটাকে একটু আঁট করে ঘাড়ের এক পাশে ঠেলে দেয় পূরবী।—মনে হচ্ছে, তুমি আজ একটু বেশি ব্যস্ত ! তার মানে, তুমি আজ বেশ আনমনা।

সুমোহন—একটুও না। আমি তো ভাবছি, আজ তোমার এখানেই রেডিওর শেষ গান শুনে তারপর বাড়িতে ফিরব।

পূরবী—তোমার বাড়িতে রেডিও নেই ?

সুমোহন—আছে। তবে রেডিও নীরব হয়েই পড়ে থাকে। পাশের বাড়ির রেডিওর প্রচণ্ড সরবতাই যথেষ্ট, কানের ভেতর দিয়ে একেবারে মরমে পশে যায়।

পূরবী হাসে—দুঃখের কথা !

সুমোহন হাসে—কিন্তু দুঃখের কথাটা শুনে তুমি তো বেশ হাসছ দেখছি।

পূরবী—তুমিও তো হাসছ !

সুমোহন—তুমি সত্যিই ক্রিটিক, কিন্তু...।

হঠাৎ পূরবীর হাত ধরে সুমোহন—ইচ্ছে করছে, এখনই এই ক্রিটিকের মুখ বন্ধ করে দিই।

পূরবী চুপ করে শুধু সুমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর সুমোহন মুখ ঘুরিয়ে টেবিলের ফুলদানের দিকে তাকিয়ে পূরবীর হাতে হাত বোলাতে থাকে। আর, সেই সঙ্গে সফল স্বপ্নের তৃপ্তিটাকে মুখরিত করেও তোলে—ভাবতে কী আশ্চর্যই না লাগছে, পূরবী। আর মাত্র একটি বছর পরে তুমি আমার বাড়িতে আমারই কাছে বসে থাকবে। তোমার সঙ্গে আর টেলিফোনে কথা বলতে হবে না। তোমাকে দেখবার জন্য এখানে আর ছুটে আসতে হবে না। হাত বাড়ালেই তোমার এই হাতটি ধরতে পারব।

পূরবীর হাতটাকে পূরবীরই কোলের উপর আস্তে আস্তে রেখে দিয়ে সুমোহন আবার সফল স্বপ্নের কথা বলতে থাকে।—কী ছিল আর কী যে হয়ে গেল। সেই কবে হঠাৎ একদিন ব্রিটিশ মিউজিয়মের সিঁড়িতে প্রথম তোমাকে দেখলাম, আর সেই তোমাকে আজও দেখছি। কিন্তু দুই দেখার মধ্যে কত তফাত ! সেদিন তুমি ছিলে আমার চোখের একটা প্রিয় কৌতুহল, আজ তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় তৃপ্তি।

হঠাৎ উঠে গিয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে যায় সুমোহন, ফুলদানের চেহারাটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। —জয়পুরি মীনার কাজ নিশ্চয়, কী বলো, পূরবী ?

পূরবী বলে—না, কাশ্মীরি।

হেসে ওঠে সুমোহন—তাই তো ! তাই তো ! জয়পুরি কাজে এরকম দেওদার, হ্রদের জল আর শিকারা নৌকো থাকতে পারে না।

আয়া জগমায়া ঘরে ঢুকে টেবিলের উপব চায়ের ট্রে রাখে। সুমোহন বলে—চা আজ না খেলেও চলত।

পূরবীর দুচোখ যেন ঝিলিক দিয়ে কেঁপে ওঠে।

চা খেঁয়ে নিয়েই হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় সুমোহন—আটটা বেজে গিয়েছে দেখছি !

টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরায় সুমোহন। টেবিলের উপর থেকে খাজুরাহো অ্যালবাম তুলে নিয়ে, একটা প্লেটের দিকে তাকিয়ে কথা বলে—তোমার এখানে মশার উৎপাত নেই, কিন্তু আমার ওখানে মশাব উৎপাত যে কী ভয়ানক, সেটা তোমার ধারণাতেই আসবে না।

পূরবীব আপনি-রঙিন লালচে ঠোঁট হঠাৎ যেন সব রক্ত হারিয়ে সাদা হয়ে যায়। হাতের রুমালের ছোট্ট একটা ঘষা দিয়ে বুকের উপরের সেই একছিটে পাউডার মুছে ফেলে পূরবী।

অ্যালবাম রেখে দিয়ে পূরবীর মুখের দিকে তাকায় সুমোহন। হাসতে থাকে সুমোহনের উজ্জ্বল দুটি চোখ।

সুমোহন ডাকে—পূরবী !

পূববী—কী ?

সুমোহন—তোমার মুখটি কিন্তু আজও ঠিক সেই রকমই সুন্দর। সেই প্রথম দেখার দিনে যেমনটি দেখেছিলাম, আজও ঠিক তাই দেখছি।

আবার হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সুমোহন ; হাতের ঘড়ির দিকে তাকায়—ইস্‌, ন'টা বেজে গিয়েছে দেখছি...আচ্ছা, আজ এখন চলি।

সোফা ছেড়ে পূরবীও উঠে দাঁড়ায় আর হেসে ফেলে—ধন্যবাদ !

সুমোহন—কেন ? কিসের ধন্যবাদ ?

পূরবী—বাঃ, তুমি আজ ঘরে ঢুকেই আমাকে একটা চমৎকার ধন্যবাদ দিয়েছ, তুমি চলে যাবার সময় আমিও কি তোমাকে একটা ধন্যবাদ দেব না ?

সুমোহন—তুমি দেখছি শুধু একটি ভাল ক্রিটিক নও, একটি খুব ভাল অবজার্ভারও বটে। হাসতে হাসতে চলে যায় সুমোহন।

সুমোহনের এই হাসির মধ্যে কোনও ক্লান্তি নেই। ভুলতে পারে না সুমোহন, এতদিন পরে তার জীবনের ইচ্ছাটা সব চেয়ে বড় বাধার ভয় পার হয়ে মুক্তপথের পথিক হতে পেরেছে।

আজ রাতে পূরবীর ঘর থেকে চলে যাবার সময় যে হাসি নিয়ে গেল সুমোহন, পরদিন সন্ধ্যায় আবার ঠিক সেই হাসি নিয়ে পূরবীব ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ায়। আসবার সময় ময়দানের কাছে গাড়ির একটা চাকার হাওয়া হুশ্‌ করে ফুরিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু একটুও বিরক্তি বোধ করেনি সুমোহন। তখনও সুমোহনের মুখে ঠিক হাসিই ছিল।

পূরবীর মুখও একটুও গম্ভীব হতে পারে না। সুমোহনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখেই কথা বলে—এসো।

সিল্কের মস্ত বড় একটা স্কার্ফ গায়ে জড়িয়েছে পূরবী। দেখতে পাওয়া যায় না, সোনার চেনের লকেট হয়ে পুরনো বিজয়নগরের তারাপাথর বুকের কোথায় পড়ে আছে। সুমোহন বলে—তোমার এই স্কার্ফের মসলিন বোধ হয় রামপুরি আব-রওয়ান।

পূরবী—না, মুর্শিদাবাদি।

সুমোহন—কাল বাড়ি ফিরে গিয়েই মনে পড়ল, তোমার এখানে একটা ভুল করে গিয়েছি।

পূরবী—কী ভুল ?

সুমোহন—রেডিওর শেষ গান না শুনেই, অনেক আগেই চলে গেলাম।

পূরবী হাসে—তোমার পাশের বাড়ির রেডিও কি বন্ধ ছিল ?

সুমোহন—না।

পূরবী—তবে তো রেডিওর শেষ গান শুনতেই পেয়েছ।

সুমোহন—হ্যাঁ। তবে এখানে শোনা আর ওখানে শোনা, আকাশ-পাতাল তফাত।

পূরবী—আকাশ-পাতাল তফাত নয়, বড় জোর তিন মাইলের তফাত।

সুমোহন হাসতে থাকে—দড়ি ধরে মাপলে তাই বটে। যাই হোক, আজ কিন্তু আমি এখনি তোমাকে এমন একটা কথা বলব, যে কথা শুনলে তুমি রাগ করবে।

পূরবী—বলো, যদিও তোমার কোনও কথা শুনে কোনওদিন আমার রাগ হয়নি, হবেও না।

সুমোহন—আজ আমি এখনই চলে যাব, একটু কাজ আছে।

পূরবী হাসে—আমি একটা কথা বলি, তুমিও রাগ করো না!

সুমোহন—আমি তোমার কথা শুনে রাগ করব ? অসম্ভব!

পূরবী—তবে বলি ?

সুমোহন—বলো।

পূরবী—যেদিন কাজ থাকবে, আসতে অসুবিধে হবে কিংবা আসতেই পারবে না, সেদিন টেলিফোনেই আমাকে বলে দিও যে, আসবে না।

সুমোহন—ঠিক কথা। আচ্ছা, চলি!

শুধু একবার লিণ্ডসে স্ট্রিটের একটি বিপণিতে যেতে হবে, সে বিপণির নাম আব্রাহামস্ স্টুডিও, এই তো কাজ! কিন্তু সেজন্য এত ব্যস্ত হবার কোনওও দরকার ছিল না। তোতা গুলমোরের কাছে এসে গাড়িতে উঠতে গিয়ে সুমোহনের মনে হয়েছে, আজ পূরবীর কাছ থেকে এত তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে আসা উচিত হয়নি। পূরবীর মনে হতে পারে, এ বুঝি এতদিনের সান্ধ্য-মিলনের একটা ছন্দভঙ্গ। কিন্তু এ রকম মনে করলে খুবই ভুল করবে পূরবী।

কিন্তু পূরবী যে ভুল করেনি, করতে পারে না, একটি মাসের আসা-যাওয়ার অনুভবের মধ্যে সুমোহনের সে বিশ্বাস আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হিসাব করে বুঝতে পারে সুমোহন, এই একমাসের মধ্যে মাত্র পাঁচটি দিন পূরবীর সেই সুহাসিত অভ্যর্থনার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু দেখতে পেয়েছে, ঠিক সেই পূরবীই কথা বলছে। পূরবীর ভালবাসা কখনও অভিমান করে না। পূরবীর ওই সব হাসিতে ক্লেশ-ক্লান্তির সামান্য ছায়াও নেই। পূরবীর প্রীতি কখনও কৈফিয়ত চায় না যে, কেন আসতে পারনি।

আজ সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিকেল হয়ে গেল, তবু বৃষ্টির বিরাম নেই। টেলিফোনে ডাক দেয় সুমোহন—পূরবী!

—বলো!

—এই বৃষ্টি সন্ধ্যাতে থামবে বলে মনে হয় না।

—বুঝতে পারছি না।

—তুমি কী করছ ?

—আয়ার সঙ্গে গল্প করছি।

—আজ সন্ধ্যাতে যাওয়া সম্ভব হবে না।

—আচ্ছা!

—হাসছ মনে হচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—শোনো।

—বলো!

—বলছি, যেদিন আসবে কিংবা আসতে পারবে, শুধু সেদিন টেলিফোনে বলে দিও যে, আজ যাব।

—অর্থাৎ. . ।

—অর্থাৎ, যেদিন আসবে না, সেদিন তোমায় টেলিফোন করে কিছুই বলতে হবে না।

—ঠিক কথা।

সারাদিন বই-এর ঘরের সোফাতে বসে, খালিহাতে কিংবা বইহাতে, শুধু নীরব হয়ে থাকা, আর সন্ধ্যা হতেই সচল হয়ে ময়দানের বাতাসে বেড়িয়ে আসা, আর কোনও একটা দিনে টেলিফোনে পূরবীকে শুধু জানিয়ে দেওয়া—আজ যাব। সান্ধ্য-মিলনের দুয়ারের কাছে এভাবে মাঝে মাঝে যেতেই সুমোহনের ভাল লাগে। আরও ভাল লাগে, যখন গিয়েই দেখতে পাওয়া যায় যে, পূরবী আজও ঠিক সেখানেই আর ঠিক তেমনই একটি হাসিমুখ নিয়ে বসে আছে।

সুমোহন বলে—কাগজে পড়েছ খবর ?

পূরবী—কিসের খবর ?

সুমোহন—নতুন বাঁধের জলে ডুবে যাবে নাগার্জুনকোণ্ডা।

পূরবী—ইস, মূর্তিগুলির কী গতি হবে তা হলে ?

সুমোহন—শুনছি, কিছু কিছু মূর্তি সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ...আচ্ছা, এখন চলি !

পূরবী—এসো।

থিয়েটার রোড থেকে ময়দান, ময়দান থেকে একবার ডালহাউসি স্কোয়ার, তারপর ঘুরে গিয়ে চৌরঙ্গি. তারপর আবার ময়দানের পথ ধরে নিউ আলিপুর। সুমোহনের মনটা আক্ষেপ করে ওঠে, না, এমন করে শুধু হাওয়া-খাওয়া একটা চক্করের মধ্যে ছুটে না বেড়িয়ে পূরবীর ঘরে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকলে ভাল হত।

হঠাৎ জোরে ব্রেক দাবিয়ে গাড়ি থামায় সুমোহন। একটা চেনা মুখ চোখে পড়েছে। সুমোহন ডাকে—বিজয় !

বাস-স্টপের আলোর কাছে দাড়িয়েছিল বিজয়, সেই বিজয় কুলকার্ণি। ছুটে আসে বিজয়—কী সৌভাগ্য ! সুমোহন আমাকে চিনতে পেরেছে !

সুমোহন—কী খবর তোমার ?

বিজয়—হাসপাতালে আছেন আমার এক আত্মীয়, তাঁকেই দেখতে গিয়েছিলাম।

সুমোহন—দেশে ফিরেছ কবে ?

বিজয়—এই তো, তিনমাসও হয়নি।

সুমোহন—কী করছ ?

বিজয়—কপালে যা ছিল, তাই করছি। সেই মেশিন। সেই ভাল্‌ভ কমপ্রেসর পিস্টন আর গ্যাসোলিন। হুশ্ হাশ্, ভট ভট্ আর চুঁ চুঁ।

সুমোহন—সেই ফ্যাক্টরিতেই আছ ?

বিজয়—হ্যাঁ। এখন আমি সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার। কী করব বল ? এবার মরলে স্কলার হব।

হঠাৎ গলার স্বর চেপে দিয়ে ফিসফিস্ করে বিজয়—শুনছ সুমোহন ?

সুমোহন—বলো।

বিজয়—তুমি কি জান যে, সেই পূর্বী, নাগপুরওয়ালি সেই পূর্বী এখন কলকাতাতেই আছে ?

সুমোহন হাসে—জানি।

বিজয়—আমি একদিন দেখেছি, থিয়েটার রোড দিয়ে একা-একা হেঁটে যাচ্ছে পূর্বী। কী তার টেনসন, কী তার ভোল্টেজ, কী তার চার্জ আর স্পার্ক ! মত কহো ভাই, মত্ কহো।

সুমোহন—সময় পেলে দেখা-সাক্ষাৎ করো, অন্তত মাঝে মাঝে !

বিজয়—নিশ্চয় নিশ্চয় !

চলে যায় সুমোহন।

ভাদ্রমাসের বৃষ্টির আকাশ সব মেঘ হারিয়ে আশ্বিনের নীলাকাশ হয়ে দেখা দিয়েছে, চোখে দেখেই বুঝতে পারে সুমোহন, বৃষ্টির দিন বলতে গেলে চলেই গিয়েছে। তাই টেলিফোনে পূরবীকে রোজই বলতে ইচ্ছে করে—আজ যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে কি হবে না, ঠিক বুঝে উঠতে পারে

না। তাই বলা হয় না।

গোলোকবাবুকে খবর দেওয়া হয়েছিল, বাড়িটার অন্তত একটু ফেস-লিফ্‌ট্‌ দরকার। দরজা-জানালায় নতুন রং দরকার। সিঁড়িটার মোজায়েক দু জায়গায় ফেটেছে, দেয়ালের অনেক জায়গার ডিসটেম্পার ভুসভুসে হয়ে গিয়েছে। এ দুটো দুরবস্থারও একটা বিহিত করা চাই। সারা বাড়িটারই রং বদল চাই।

লোকজন নিয়ে এসে কাজ শুরু করে দিয়েছেন গোলোকবাবু। কাজেই পূরবীর কাছে রোজই যাওয়ার ইচ্ছা দমিয়ে রাখতে হয়। গোলোকবাবু যখন-তখন নির্দেশ খোঁজেন—গ্রিলগুলোতে অ্যালুমিনিয়াম পেন্ট ধরিয়ে দিই, স্যার, আপনি কী বলেন ?

কিন্তু অনেক দিন পার হয়ে গিয়েছে, বোধ হয় পনেরো দিনেরও বেশি। পূরবী ভুল করে মনে করতে পারে যে..

টেলিফোনে ডাক দেয় সুমোহন—পূরবী !

পূরবী—বলো !

সুমোহন—আজ যাব।

পূরবী—শোনো।

সুমোহন—হাসছ মনে হচ্ছে।

পূরবী—একটা কথা বলছি, শোনো।

সুমোহন—বলো।

পূরবী—আজ এসো না।

সুমোহন—কেন ? তার মানে ?

পূরবী—আমি যেদিন টেলিফোনে বলব, সেদিন আসবে। কেমন ?

সুমোহন—ঠিক কথা। এই ভাল। কোনও-কোনও দিন সন্ধ্যাবেলাতে তোমারও তো অন্য অনেক কাজ থাকতে পারে। তাই না ?

পূরবী—হ্যাঁ।

॥ ১১ ॥

হৈমন্তী কুয়াশার মাস ফুরিয়ে গিয়েছে। এটা এখন শীতের মাস। নিউ আলিপুরের যত গাছের পাতা সন্ধ্যা হলেই কন্‌কনে শীতের ছোঁয়া লেগে কুঁকড়ে যায়, আর সকাল হতেই রোদের আলো লেগে তেজিয়ে ওঠে। সুমোহনের জীবনে শীতের মাসের দিনগুলো কিন্তু ঠিক ওই নিয়মে চলছে না। গাছের পাতা আর মানুষের প্রাণ, এক বস্তু তো নয়। সুমোহনের প্রাণটা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রোদের আলো দেখেও যেন কুঁকড়ে পড়ে থাকে। আর সন্ধ্যেবেলার প্রথম অন্ধকার দেখা দিতেই তেজিয়ে ওঠে। বই-এর ঘরের ভেতরে বসেই বার বার ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মনে হয়, টেলিফোন বুঝি বেজেই চলেছে। কিন্তু তখনি বুঝতে পারে ওটা পাশের বাড়ির টেলিফোনের শব্দ। মাঝে মাঝে বাইরের ঘরে এসে, টেলিফোনের চকচকে চেহারাটার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকতেও হয়। পূরবী ডাক দিলেই যেন তখনি সাড়া দিতে পারে সুমোহন।

ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে, যাই, এইবার হাজারিবাগে গিয়ে আরও অন্তত দশটা দিন থেকে আচার্য হরি শাস্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে করে সেই গান্ধার আর্টের কিছু তথ্য জেনে আসি। কিন্তু সে ইচ্ছেও যেন উথায় হৃদি লীয়ন্তে হয়ে যায়। কারণ, যে কোনও দিনের যে কোনও সময়ে পূরবীর টেলিফোনের ডাক এসে যেতে পারে—আজ এসো। এই অবস্থায় একটা দিনের জন্যও বাইরে গিয়ে থাকলে ভুল হবে। এক ঘণ্টার জন্য বাড়ির বাইরে বেড়াতে গেলেও ভুল হবে।

হেসে ফেলে সুমোহন ; এ যে একটা চমৎকার স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা ! পূরবী যেন অদ্ভুত একটা অপেক্ষার আবেশ দিয়ে সুমোহনের ভালবাসার মনটাকে অভিভূত করে আর অনড় করে বসিয়ে দিয়েছে। শীতের মাসের দিনগুলিও যে ফুরিয়ে যাচ্ছে, তারও কি কোনও হিসাব রাখে না পূরবী ?

আর তিনটে মাস পার হলেই যে পূরবীকে আর থিয়েটার রোডের ওই ফ্ল্যাটের ঘরে বসে থাকতে হবে না, এই বাড়িতেই চলে আসতে হবে, সেকথা তো পূরবীর পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় ! সেকথা যে পূরবীর প্রাণেরই একটা গুঞ্জন !

মনে হয়, মনে হতেই আবার হেসে ফেলে সুমোহন। ক্রিটিক পূরবী আর অবজার্ভার পূরবী বোধ হয় চমৎকার একটি প্ল্যানার পূরবী। পূরবী বোধ হয় মনে মনে ঠিক করে রেখেছে যে, 'আজ এসো' বলে টেলিফোনে ঠিক সেদিনই সুমোহনকে ডেকে নেবে পূরবী, যেদিন সন্ধ্যাবেলাতে সুমোহনের হাত থেকে ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে, আইনের আর আনন্দের সব অনুষ্ঠান সেরে দিয়ে সুমোহনের হাত ধরে বাড়িতে চলে সে আসবে।

তাই ভাল। চিরদিনের আপন হয়ে যাবার আগে কিছুদিনের অদেখা ; ভালবাসার জগতের একটি খুব ভাল প্রথা। তা ছাড়া, এ তো সহজ সুন্দর একটি মেয়েলি কুণ্ঠারও প্রথা। সে কুণ্ঠা থেকে স্কলার মেয়ে পূরবীর প্রাণও রেহাই পেতে পারে না। পূরবীও বোধ হয় এই রকম একটি লাজুক অনিচ্ছা সহ্য করে নিজেকে নীরব করে বসিয়ে রেখে দিয়েছে।

অনেকদিন পরে আবার একদিন, বাইরের ঘরে বসে আর চকচকে টেলিফোনের চেহারাটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকবার পর, যখন আবার বাইরের আলো-ছায়ার চেহারাটা দেখতে চেষ্টা করে সুমোহন, তখন দেখতে পায়, পাশের বাড়ির বকুলের শুকনো পাতা উড়ে এসে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, হালকা ঝড়ের বাতাস বইছে। কী আশ্চর্য, শীতের মাসের দিনগুলি কবে আর কেমন করে এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল ?

চমকে ওঠে সুমোহন। টেলিফোন বেজে উঠেছে।

—কে, পূরবী ?

—না স্যার, আমি, গোলোক বরাট।

—বলুন।

—কাজ আপনার পছন্দ হয়েছে তো, স্যার ?

—বাড়ির বাইরেটা দেখতে খুব ভাল হয়েছে। রোজ পিঙ্ক রং মানিয়েছে ভাল, খুলেছেও ভাল। কিন্তু ভেতরের কাজটা ভাল হয়েছে বলতে পারি না।

—কেন স্যার ?

—মোজায়েকের মেরামত খাপছাড়া হয়েছে। ডিস্টেম্পার কিরকম যেন ঘেযো-ঘেয়ো বলে মনে হচ্ছে।

—ওটা কিছু নয়।

—কেন ?

—ওটা সামান্য ব্যাপার, স্যার। আসল ব্যাপার হল বাইরের চেহারা।

—কী বললেন, আসল ব্যাপারটা কী ?

—বাইরেটা যদি দেখতে খুব চমৎকার হয়, তবে ভেতরে একটু-আধটু এথি-ওথি হলে কী আসে-যায় স্যার ?

—বাঃ, কী চমৎকার কথাই না বলছেন !

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আবার চেয়ারের উপর চুপ করে বসে থাকে সুমোহন। যাক, তবু ভাল, বাড়ির বাইরেটার রং ভাল খুলেছে। পূরবীর কাছে এই রোজ পিঙ্ক খুবই প্রিয় একটি রং।

গেটের কাছে একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে। কে এল ? কে আসছে ? বিজয় কুলকার্নি। আসুক, বিজয় মানুষটা ভাল, কিন্তু সব সময় ওর স্থূল ভাষার কথাগুলি শুনতে ভাল লাগে না।

বিজয় ঘরে ঢুকেই দুহাতে সুমোহনকে জড়িয়ে ধরে, তার পরেই রঙিন খামের একটি চিঠি সুমোহনের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। —আমার শুভবিবাহ।

হেসে ওঠে সুমোহন—খুব ভাল খবর !

বিজয়—পূর্বীর সঙ্গে আমার বিয়ে।

দুচোখ বড় করে আর চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সুমোহন। —কেন ? কী হল ?

বিজয় হাসে—প্রেম হলে যা হয় তাই হল। খুব হঠাৎ আর খুব তাড়াতাড়ি পূর্বীর সঙ্গে যখন খুব ভাল একটা প্রেম হয়েই গেল ভাই, তখন আর দেরি করি কেন ?

চেয়ারে বসেই আবার কথা বলে বিজয়—পূর্বী কিন্তু বড় শান্ত আর বড় লাজুক মেয়ে। দূর থেকে যা মনে হয়েছিল, মোটেই তা নয়। আমি একদিন বললাম—মেশিনের আওয়াজে তোমার আর্টের মূর্তির কান ঝালাপালা হবে না তো পূর্বী ? পূর্বী শুধু মাথা নিচু করে আর মিষ্টি করে একটু হাসল আর বলল—না, হবে না।

সিগারেট ধরায় আর পা দোলায় বিজয়। তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।—জানি তোমার সময় কম, তবু কষ্ট করে একবার যেও, ভাই।...চলি !

মৃদু হর্ষের মত ছোট্ট একটি শব্দ তুলে ট্যাক্সিটা চলে গেল। কিন্তু কী অদ্ভুত একটা চিৎকারের মত শব্দ করে বেজে উঠল সুমোহনের কথাগুলি—চা নিয়ে এসো, শুকদেও।

ঠাকুর শুকদেও ভয় পেয়ে ছুটে আসে। বাবু হঠাৎ এরকম রাগ করে চেঁচিয়ে উঠলেন কেন ? কিন্তু দেখতে পেয়ে নির্ভয় হয়, বাবু শুধু চেঁচিয়ে হেসে উঠেছেন।

সুমোহন বল—এক গেলাস জল দিয়ে যাও।

শুকদেও ব্যস্ত হয়ে চলে যেতেই সুমোহনও ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। টেলিফোনে কথা বলে—হ্যালো, আব্রাহাম্‌স্ স্টুডিও ?

—ইয়েস স্যার।

—আমি এসো দত্ত, নিউ আলিপুর। চেক পাঠিয়ে দিয়েছি, পেয়েছেন ?

—পেয়েছি, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার !

পূরবী ভাবছে, সুমোহন দত্তকে মস্ত একটা ঠাট্টা করা হল। কিন্তু জানে না পূরবী, সুমোহন দত্ত যে পূরবী নাগ নামক বস্তুটিকে একটা ঠাট্টা বলে মনে করে। একটা অভদ্রতা করতে হলে এখনই টেলিফোনে ডাক দিয়ে পূরবীকে আসল সত্য কথাটা বলে দিতে হয়, খাজুরাহোর মিথুন-নায়িকার ওয়েস্ট লাইন আর থাই লাইন খাজুরাহোতেই আছে, তোমাতে ওসবের কিছুই নেই। তোমার শরীরের নিলাজ বিস্ময়ের ছবিটা ভরাট কোমলতার ছবিই নয়, মাংসল জড়তার ছবি। তার মধ্যে কোনও ছন্দ-টন্দ নেই। আর ওগুলিও কোনও লোভন মায়ার রেখা আর বলয় নয়, কতকগুলি খাঁজ আর ভাঁজ। ভাবলে ভয় পাই, লজ্জাও বোধ করি যে, এ হেন একটি বস্তুকে ঘরে আনবার স্বপ্ন দেখেছিলাম।

এক যে ছিল রাজা, সে রাজা বনে মৃগয়া করতে গিয়ে দেখেছিল, গাছতলায় চমৎকার এক রূপসী বসে আছে। রাজা মুগ্ধ, রাজা তখনও জানত না যে, একটা টিয়ে পাখি উড়ে এসে রাজার মাথাটা একটু ঠুক্‌রে দেবে, রাজা তখনই দেখতে পাবে যে, রূপসীর মুখের ভেতরে বড় বড় দাঁত লুকিয়ে রয়েছে, সারা গায়ে ছুঁচের মত রোঁয়া ফুটে উঠছে। রাজার কিন্তু ভাগ্য ভাল, টিয়ে পাখিটা ঠিক সময়ে উড়ে এসে রাজার মাথাতে একটা ঠোকর দিল।

ভাল গল্প। সেই কবে পাটনাতে ছেলেবেলার টিউটর সন্তবাবুর মুখে যে গল্প শুনেছিল, আজ আবার মন দিয়ে সেই গল্পটাকেই শুনছে সুমোহন। সন্তবাবু বেঁচে থাকলে আজ বলতে পারত সুমোহন, আমারও ভাগ্য ভাল সন্তকাকা, টিয়ে পাখিটা আমার মাথা ঠুক্‌রে দিয়েছে। কিন্তু উড়ে আসতে বেশ দেরি করে ফেলেছে।

পূরবীর কাছ থেকে 'আজ এসো' বলে একটা ডাক শোনবার জন্য তবে এতদিন ধরে মিথ্যে এত ছটফট করলে কেন ? এই চকচকে টেলিফোনের ভেতর থেকে যদি কোনও ভুতুড়ে কণ্ঠস্বর মুখর হয়ে এরকম একটা প্রশ্ন করে বসে, তবে কি কোনও জবাব দিতে পারবে সুমোহন ?

নিশ্চয় জবাব দিতে পারি। পূরবী বোধ হয় কখনও পাগলা ইঞ্জিন দেখেনি, কিন্তু আমি দেখেছি। অনেক বছর আগে একদিন দানাপুরের স্টেশনে এক পাগলা ইঞ্জিনের কাণ্ড দেখতে হয়েছিল। ড্রাইভার বেচারা ইঞ্জিনকে পিছিয়ে নেবার জন্য কত কলকাঠি নাড়ছে, কিন্তু ইঞ্জিন শুধু এগিয়েই যায়। থামে না, পিছোয়ও না। এইরকম একটি ইঞ্জিন, পূরবীর ডাক শোনবার জন্য ছটফট করেছিল, পাগলা ইঞ্জিনের পিছিয়ে যাবার শক্তি আর ইচ্ছাটাও বিকল হয়ে গিয়েছিল।

তুমি কিছুই নও পূরবী, একেবারে কিচ্ছু না। তুমি সরে পড়াতে সুমোহন দত্তের বুকের পাঁজরে একটা টোকার ব্যথাও বাজছে না।

সিগারেট ধরিয়ে ঘরের ভেতরে পায়চারি করে খবর-কাগজ পড়তে থাকে সুমোহন। মনের উপর কোনও ভার নেই, নিশ্বাসে কোনও গুমোট নেই, মুক্তি পাওয়া সচল জীবনের অবাধ পায়চারি।

চাকরটাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে সুমোহন—আজ কি বাজার করেছিস রামদেও ?

—মাছ ভাল পেলাম না বাবু। ছানা নিয়ে এসেছি। আলু আর পটলও এনেছি।

—ব্যস, ওতেই হবে। শুকদেওকে বল, ছানার তরকারিতে যেন পেঁয়াজ-রসুন না দেয়।

বই-এর ঘরের ভেতরে এসে পাটনার উকিলবাবুকে চিঠি লেখে সুমোহন—সম্পত্তিটার গোলমাল বোধ হয় এতদিনে মিটে গিয়েছে। সব খবর জানিয়ে চিঠি দেবেন।

স্নান করবার পর এত স্নিগ্ধতা, শরীরে মনে ও প্রাণে, কোনও অনুভব করেনি সুমোহন। শান্তি। সুমোহনের মুখের হাসিতেও স্নিগ্ধতা।

কোনও ক্লান্তি নেই, তবে শুয়ে পড়বার পাঁচ মিনিটের মধ্যে কী নিবিড় ঘুমের আবেশ এসে গেল। তার উপর প্রথম ফাল্গুনের ফুরফুরে দুপুরে বাতাস। সুমোহনের এই গভীর ঘুমের মধ্যে কোনও স্বপ্নও আজ আর নেই।

ঘুম ভাঙে তখন, যখন আকাশে অনেক তারা জেগেছে। বিছানা থেকে উঠে, চোখ-মুখ ধুয়ে, আর বাইরের ঘরে এসে চা খায় সুমোহন। —শুকদেও, আর এক পেয়ালা চা দাও।

আবার চা খেয়ে নিয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় সুমোহন—এঃ, এ যে বেশ রাত হয়েছে দেখছি।

শুকদেও—আমিও তো ভাবছি, বাবু এত রাতে দুবার করে চা খাচ্ছেন কেন ?

সুমোহন—তবে চলো, রাতের খাওয়া খেয়েই নিই।

খেতে খেতে গল্প করে আর হাসে সুমোহন—কে বেশি গাঁজা খায় শুকদেও ? তুমি, না রামদেও ?

শুকদেব—না বাবু, আমি ওই নেশার চিজ কবেই ছেড়ে দিয়েছি।

সুমোহন—আর তুই ? কি রে রামদেও, তুইও ছেড়ে দিয়েছিস নাকি ?

রামদেও হাসে—এই মাঝে মাঝে।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সুমোহনের প্রাণটা এইভাবে সহজ ছন্দে হেসে ঘুমিয়ে আর কথা বলে বলে চলেছে। মনের জোরে মনের সব কাঁটা তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছে সুমোহন। ভাবতে গিয়ে নিজেই আশ্চর্য হয়, একলা হওয়া জীবনটাকে একটুও শূন্যতা বলে মনে হয় না।

বই-এর ঘরে ঢুকে সোফার উপর চুপ করে বসে থাকে সুমোহন। কিন্তু হঠাৎ এই চুপ করে বসে থাকা সুমোহনের চোখ দুটো একবার চমকে উঠেই আবার স্থির হয়ে যায়। জ্বল-জ্বল করে দুটো অপলক চোখ। সে চোখে বই পড়বার কোনও ব্যাকুলতা নেই, ঘুমেরও কোনও আবেশ নেই। একটি মিনিট নয়, দু মিনিট নয়, দু ঘণ্টার সব মুহূর্ত ঝরে ঝরে বাইরের ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে উড়ে চলে যায়। তবু বসে থাকে সুমোহন।

চারদিকে তাকিয়ে যেন একটু দেখতে আর বুঝতে চেষ্টা করে সুমোহন। বাড়িটা এত বেশি নীরব কেন ? কোথায় গেল সেই ফুরফুরে হাওয়া ? এত গুমোট কিসের ? বাইরে, না ঘরের ভেতরে ? হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় সুমোহন, এ যে মাঝরাতের চেয়েও বেশি রাত।

চোখ দুটো বার বার কেঁপে উঠছে। প্রতি নিশ্বাসের বাতাসে কী অদ্ভুত একটা পিপাসাও ছটফট করছে! বুকের উপর একটা হাত চেপে রেখে যেন দুঃসহ একটা জ্বালার উৎপাত চেপে রাখতে চেষ্টা করে সুমোহন।

ধুলো ধুলো ধুলো, ধুলো জমাট হয়ে বইগুলোর চেহারা ঢেকে ফেলেছে। বইগুলোকে জঞ্জালের গাদার মত দেখাচ্ছে। কেউ কি একবার ভুলেও এই ঘরের ভেতরে এল না আর দেখল না যে, বই-এর উপর এত ধুলো জমেছে!

একলা হওয়া এই শূন্যতা যেন একটা রাক্ষুসে কামড়; সুমোহনের পাঁজর চিবিয়ে খেতে চাইছে। একবার উঠে দাঁড়ায়, তারপরেই আবার বসে পড়ে সুমোহন, তার পরেই দুচোখ বন্ধ করে একেবারে

নিঝুম হয়ে যায়।

কিন্তু কতক্ষণ ? আবার হঠাৎ চমকে ওঠে সুমোহন। চোখ মেলে তাকায়। যেন একটা স্বপ্নের ছবিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হাতটা মট্ করে ভেঙে গিয়েছে।

একবার ওদিকে তাকায়, একবার সেদিকে তাকায়, যেন খুব সন্তর্পণে বুঝতে চেষ্টা করছে সুমোহন, ঘরের জানালার কোনও ফাঁক দিয়ে উঁকি দেবার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

ঠোঁট কাঁপে, চোখ কাঁপে, বুকটাও থেকে থেকে যেন উথলে উঠতে চেষ্টা করে। কী দুরন্ত ব্যাকুল একটা পিপাসার মূর্তি এই সুমোহন।

আস্তে আস্তে টেবিলের একটা দেরাজের দিকে হাত বাড়ায় সুমোহন। দেরাজের ভেতর থেকে একটি বস্তু বের করে টেবিলের উপর রাখে। সোনা নয়, হীরা নয়, একটি অ্যালবাম। সে অ্যালবামের গায়ে এক ছিটেও ধুলো নেই।

মন প্রাণ আর চোখের সব পিপাসা ঢেলে এক-একটি ছবি দেখতে থাকে সুমোহন, যে ছবি ধরে ধরে সুখী হয়েছিল শক্তিশালী জাপানি ক্যামেরার লেন্স।

কোনও খাজুরাহোর পাথুরে মিথুন-নায়িকার ছবি নয়, এই সেদিনও এ বাড়ির ওই ঘরে ছিল যে, যার নাম হিমানী, তারই অসাজ অলাজ আদুড়ে দেহটার সব ভঙ্গির সব ছবি। সে ভঙ্গিতে চকিত বিদ্যুৎ আছে, উতলা ঝড় আছে, ভরা দীঘির টলমল জল আছে, শালমঞ্জরীর দোলা আছে। মূর্তিলোকের কোনও মিথুন-নায়িকা জানে না, শুধু এক হিমানী জানে, এলিয়ে পড়া শরীরেও এমন বিস্ময়ের ভঙ্গি কেমন করে সম্ভব হয়। সে ভঙ্গিতে কোমলতার স্তবকের মত একরকম একটি ছন্দিত তনুশোভা ফুটিয়ে তুলতে পৃথিবীর আর কেউ পারে না, শুধু এক হিমানীই পারে।

সুমোহনের কপাল থেকে বড় বড় ঘামের ফোঁটা ঝরে পড়ে। হাত তুলে কপাল মুছতে থাকে সুমোহন।

আলো নিভিয়ে দেয়, শুয়ে পড়ে সুমোহন। ঘুমিয়েও পড়ে।

নিঝুম হয়ে যায় শেষ রাতের প্রহর। কিন্তু হঠাৎ জেগে ওঠে সুমোহন। জেগে ওঠে ঘুমহারা একটা দুরন্ত অবাধ্য পিপাসা।

বিছানা থেকে নেমে, অন্ধকারের মধ্যে পা টিপে টিপে এগিয়ে আর সুইচ টিপে আলো জ্বলে সুমোহন। টেবিলের দেরাজ থেকে টেনে বার করে চকচকে অ্যালবাম। ছবি দেখতে থাকে সুমোহন। চোখের পলক আর পড়ে না। বুঝতে পারে না সুমোহন, আর কতক্ষণ দেখতে হবে আর কতকাল দেখতে হবে।

বসন্ততিলক

ভোর হয়েছে। হঠাৎ একটা ঝড় এল আর চলে গেল। এই তো ব্যাপার। এর মধ্যে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাবার মত কী আছে ?

কিন্তু চন্দ্রবাবু সত্যিই আশ্চর্য হয়েছেন। এই ভোরেব ঝড়ের বাতাসটা যে এদিকের আর ওদিকের সারি সারি যত ঘুমন্ত বাড়িব বন্ধ কপাটের কড়া নেড়ে দিয়ে চলে গেল। তবু কি কেউ জাগলো ?

কে জানে এই ছোট শহরের কোনও বাড়ির কোনও ঘরে কোনও মানুষ সত্যিই জেগেছে কিনা। কিন্তু চন্দ্রবাবু জেগেছেন, ছটফট করেছেন, মোষের শিঙের লাঠিটাকে ব্যস্তভাবে খুঁজেছেন। চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে পাশের ঘরেব ঘুমন্ত চাকরটারও ঘুম ভাঙিয়েছেন। —মধু ওরে মধু! এখন জাগ তো বাবা।

মাসটা আশ্বিন। ভোরবেলার বাতাসে এমনিতেই একটু শীত-শীত ভাবের কাঁপুনি থাকে। তার উপর এই হঠাৎ-আসা ঝড়টা কিছু গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি ছড়িয়ে গাছপালা ভিজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কাজেই বুঝে নিতে হয়, বাইরে বাতাসের ঠাণ্ডাটা নিশ্চয় এতক্ষণে বেশ কনকনে হয়ে উঠেছে।

খসখসে ধাবিওয়াল কম্বল কেটে তৈরি-করা একটি ঢিলে-ঢালা প্রকাণ্ড ওভারকোট আছে চন্দ্রবাবুর। ব্যস্তভাবে ওভারকোট গায়ে চাপালেন। কিন্তু লাল ইমলির মোটা পশমের একটি গলাবন্ধ, আব এক জোড়া ভুটিয়া মোজাও যে আছে। না, আব দেরি করতে পারলেন না চন্দ্রবাবু। গলায় গলাবন্ধ জড়ানো হল না, পায়ে মোজাও পরা হল না। মোষের শিঙের লাঠিটা হাতে নিয়ে আব কাঁটাল কাঠের খড়ম-জোড়া পায়ে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

মেঘলা ভোরের আকাশে কোনও আলো-জাগানি আভা ঝিকমিক করে না। কিন্তু চন্দ্রবাবুর দুই চোখে যেন একটা বিস্ময় চিকচিক করে জ্বলছে। সত্তর বছর বয়সের মানুষটি, মাথায় প্রকাণ্ড টাকের চারদিক ঘিরে লম্বা-লম্বা সাদা চুল এলোমেলো হয়ে ঝুলছে। ভুরু দুটিও একেবারে সাদা। ভুরুর কাছেই দুটি ছায়াময় কালো চোখে শিশুর চোখের কৌতুহল টলমল করছে। তাঁর ছিপছিপে শুকনো শরীরটা এই বয়সেও যেন ছেলেমানুষেব মত তড়বড় করে হাঁটতে চায়।

এপাড়া আব ওপাড়ার যত বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল চন্দ্রদাদুর কাছে অনেক মজার গল্প শুনেছে। তার মধ্যে বিশেষ মজার গল্পটি হল তাঁর নিজেরই জীবনের একটি সাংঘাতিক শখের গল্প। —আমি যখন কলকাতায় ছিলাম, তখন বছরের মধ্যে অন্তত তিনশো দিন থিয়েটার দেখতাম। থিয়েটার না পেলে যাত্রা, যাত্রা না পেলে কবিগান তরজা কিংবা হাফ-আখড়াই।

—কিছুই না পেলে ?

—সেটি কখনও হয়নি। কিছু না কিছু পেয়েই গেছি। ধাঙ্গড়দের ঝুমুরও দেখতে ছাড়িনি।

চন্দ্রদাদুব চোখ দুটো কি সেই দেখার অভ্যাস আর দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবার অভ্যাস আজও ছাড়তে পারেনি ? আজকের ভোরের এই ঝড়টাও কি তবে একটা থিয়েটারের নাটুকে কাণ্ড ?

হতে পারে ; চন্দ্রবাবু হয়ত তাই মনে করেন। কিন্তু এই ছোট শহরের অনেকেই আবার একথাও জানেন যে, ভাল ঘুম হয় না চন্দ্রবাবুর ; কোনও কাজকর্ম কিংবা কোনও চিন্তার বালাই নেই। তাই কী আর করবেন ? ভোর হতে না হতেই বের হয়ে পড়েন আর দোরে দোরে হাঁক দিয়ে লোকের ঘুম

ভাঙিয়ে বেড়ান। ভোরে ঝড়-টড় দেখে আশ্চর্য হওয়া মানে হাঁক ডাক করবার একটা ছুতো তৈরি করে নেওয়া। যা দেখবেন আর যা শুনবেন, তাতেই আশ্চর্য হওয়া চন্দ্রবাবুর মন-প্রাণের একটা অভ্যেস হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রবাবুর বিস্ময়ের প্রশ্নটি হল—ঝড় এল কেন ? কিন্তু আজ ভোরে যদি কোনও ঝড় দেখা না দিত, তা হলেই বা কী হত ! তা হলে শেষ রাতের ট্রেনের শব্দ শুনেই বের হয়ে পড়তেন চন্দ্রবাবু ; আর দোরে দোরে হাঁক দিয়ে লোকের ঘুম ভাঙাতেন---ওহে জয়ন্তবাবু জেগেছ নাকি ? নাইন আপ আজ এত লেট হল কেন ?

চন্দ্রবাবু হলেন এই ছোট শহরের একজন পুরনো বাসিন্দা। চন্দ্রবাবু যখন এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ কি চৌত্রিশ ? এখানে তাঁর চেয়ে পুরনো যাঁরা ছিলেন, তাঁদের একজনও এখন আর নেই।

এপাড়া আর ওপাড়ার বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা চন্দ্রবাবুর জীবনের আরও কিছু খবর রাখে। এখানে এসে দাদু হবার আগে তিনি কোথায় ছিলেন আর কী ছিলেন ? ওদের কাছে মজার গল্প বলতে গিয়ে চন্দ্রবাবু কয়েকবার সেসব কথাও বলে ফেলেছেন। এই গল্পও যেন চমৎকার এক বিস্ময়ের থিয়েটার দেখার গল্প। যেন অনেক-অনেক দিন আগের এক ভোরবেলার ঘুমের একটা স্বপ্নের গল্প। --আমি তখন ঠিক এই চিনুরানীর মেজদার মত...।

চিনু বলে---ধেৎ ; মিথ্যে কথা।

চন্দ্রবাবু---বিশ্বাস কর। তখন ঠিক তোর মেজদার মত আমারও মাথায় আলবার্ট-করা চুলের তেড়ি.. ।

চিনু---ধেৎ।

চন্দ্রবাবু—আমি তখন হাজারিবাগে একটি বাসা নিয়ে থাকতাম।

ঠিকই, একদিন হাজারিবাগের এক জমিদারের কাছারিতে সাতাশ টাকা মাইনের ইংলিশবাবু ছিলেন চন্দ্রবাবু ; তার মানে ইংরাজি ভাষায় চিঠি আর দরখাস্ত লেখবার কাজ করতেন। স্ত্রী ছিল। দুটি মেয়ে ছিল—সীতু আর মিতু। আর ছিল একটি ছেলে, তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি। মিতুর অভ্যেস, বাপের বুকের উপর পা দুটো তুলে দিয়ে ঘুমোবে। ইয়া মোটা গোলগাল একটা খরগোসের মত তুলতুলে, ওই অতটুকু বয়সের মেয়েটার নাক ডাকত কত জোরে—গুর গুর গুর গুর ! ভুসভুস ভুসভুস. ।

চিনুরা আর সন্তুরা হেসে লুটিয়ে পড়ে। চন্দ্রবাবু বলেন—হ্যাঁ রে, সত্যিই, বিশ্বেস কর। সীতুর অভ্যেসটা আরও মজার। আমি খেতে বসলেই কোথা থেকে ছুটে এসে হুট করে আমার কোলে বসে পড়বে।

সন্তু—কেন ?

চন্দ্রবাবু—কুমড়োর ডাঁটা চিবোবে। আলু না, বড়ি না, বেগুনভাজা না ; শুধু কুমড়োর ডাঁটা। ছোট্ট ছোট্ট দাঁত, কিন্তু কী ধার ! সীতু শুধু চুপ করে ডাঁটা চিবোতে থাকে—কুচুর কুচুর কুচুর কুচুর।

নিউমোনিয়া হয়েছিল সীতুর, তাই একদিন খুব ভোরে, জ্বলজ্বলে শুকতারাটা যখন নিবুনিবু হয়ে এল, ঠিক তখন সীতু মরে গেল। মিতুটা ঠিক পরের বছরের বিজয়া দশমীতে, ঠিক মাঝরাতে, ঘুমের মধ্যেই ছটফট করে চন্দ্রনাথের বুকের উপর থেকে পা নামিয়ে নিল আর মরে গেল। অনেক দিন আমাশাতে ভুগে মিতুটা একেবারে এইটুকু একটা...

--কী ? প্রশ্ন করে সন্তু।

—একেবারে এইটুকু একটা শুকনো চামচিকে হয়ে গিয়েছিল।

চিনুর চোখ দুটো ছলছল করে। —তারপর কী হল ?

চন্দ্রবাবু কিন্তু চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন। —তারপর একদিন ড্রপসিন পড়ে গেল রে দিদি।

একদিন সন্ধ্যায় কাছারি থেকে ঘরে ফিরে এসেই চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ—শুনছ, আমার সাত টাকা মাইনে বেড়েছে।

এক মাস ধরে রোজ যেমন আজও তেমনি, সন্ধ্যাবেলাতেই বিছানার উপর শুয়ে আছেন সীতুর

মা। বুকের ভিতরে কিরকম একটা ব্যথা দেখা দিয়েছে। কবিরাজের শিমুল ছালের গুঁড়ো ছেড়ে দিয়ে এল এম এস আশু ডাক্তারের দামি ওষুধ খাওয়ানো হল, তবু ব্যথাটা সারছে না। কিন্তু চন্দ্রনাথের এমন চেঁচিয়ে বলা কথার উত্তরে একটা কথা তো এখন বলতে পারেন সীতুর মা ; বললেই তো হয়, ব্যথাটা বেড়েছে।

না, আর কথা বলেননি সীতুর মা ; বিছানার কাছে এগিয়ে যেতেই বুঝেছিলেন চন্দ্রনাথ, সীতুর মা আর কোনও দিনই কথা বলবেন না।

চিনু বলে—চল সন্তু।

সন্তু বলে—ছোট ছেলেটার নামটা বললে না, দাদু ?

চন্দ্রবাবু একেবারে বিনীত অপরাধীর মত কাঁচুমাচু হয়ে হাসতে থাকেন—ভুলে গেছি। বিশ্বাস কর দাদা ; সত্যি ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে ; ওটার দাঁত ছিল না।

ছোট ছেলেটিকে সীতারামপুরে তার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। সে ছেলে মামার বাড়িতে বড় হয়েছে। শুনছেন চন্দ্রবাবু, সে ছেলে কলকাতায় চাকরি করছে। বিয়েও করেছে। এর বেশি আর কিছুই জানেন না চন্দ্রবাবু। জানতে চেষ্টা করেননি, জানবার ইচ্ছাও হয়নি। সে ছেলেও এমন বাপের কোনও খোঁজ নেয়নি।

সেই যে জমিদারের কাছারির চাকরি ছেড়ে দিলেন চন্দ্রবাবু, তারপর থেকে তিনি এখানে। তিন শো এগারো টাকা খরচ করে তৈরি করা এই ছোট্ট বাড়িটি আছে আর চাকর আছে। আর আছে রাস্তার তেমাথায় তিনটি দোকানঘর, তৈরি করতে তিনশো টাকা খরচ পড়েছিল। দোকান ঘরের ভাড়া মাসে মাসে পাওয়া যায়। চন্দ্রবাবুর দিন চলে যায়। নিজের হাতেই দু'মুঠো চাল ফুটিয়ে নেন, আর শুধু মেথি ফোড়ন দিয়ে বিনা মশলায় কাঁচা পেঁপের তরকারি রাঁধেন। এ ছাড়া চন্দ্রবাবুর জীবনে আজ আর কোনও কাজের ঝঞ্ঝাট নেই।

ভোর হয়েছে, একটা ঝড়ও এসেছে আর চলে গিয়েছে তবু কোনও সাড়া দিয়ে জেগে ওঠে না, এটা কেমন শহর ? চন্দ্রবাবুর মত মানুষ যার পুরনো বাসিন্দা, তার বয়স কতই বা হতে পারে ? ঠিকই, আকারে প্রকারে এটা একটা কচি শহরই বটে।

গ্র্যান্ড কর্ড লাইনের পরেশনাথ আর চৌধুরীবাঁধ পার হয়েই সব ট্রেন যে স্টেশনে থামে, তার নাম বামবাগ রোড। কিন্তু জায়গাটার নাম সরিয়াডি।

খুব ছোট আর খুব ছিমছাম এই ছোট্ট শহর সরিয়াডি পুরনো বস্তি আর বাজারের ছোঁয়াচ থেকে একটু দূরেই সরে আছে। স্টেশনটার সঙ্গে বেশ বড় একটা নিমবাগিচার আড়াল রেখেছে। শহর হয়েও সরিয়াডির সেরকম কোনও শহুরেপনার হই হই নেই।

সরিয়াডি একটি হাওয়ানগর ; তার মানে হাওয়া বদলের জন্য বাইরের মানুষের আনাগোনা এখানে লেগেই আছে। তাঁরা একটা চেঞ্জ-এর জন্যে আসেন ; তাই তাঁরা 'চেঞ্জার'। রাস্তার দু'পাশে সারি-সারি যত ভিলা, কটেজ, ভবন, আলয় আর নিবাস। ম্যানসন-ট্যানসন নেই। হ্যাঁ, বেশ শৌখিন আর রঙিন চেহারার বাড়ি অনেক আছে। যেমন নাগ সাহেবের বাড়িটি, যার নাম হাওয়াই। এই বছরেই তৈরি হয়েছে রঙিন হাওয়াই ; বছরের অন্তত তিনটে মাস এই হাওয়াইয়ে থাকবেন বলে আশা করেন নাগসাহেব। শ্রীলেখা কটেজও কম রঙিন নয়। এই দুই বাড়ির নিজেদেরই বিজলি-বাতি আছে।

এখানে শালবনের হাওয়া পাওয়া যায়, দূরের পরেশনাথ পাহাড়ের নীলচে চেহারাটা যখন তখন দেখা যায়। কুয়োর জল ভাল ; জংলি নদী তিরছির জলও ভাল। হাওয়া-বদলের জন্য বছরের বারো মাসের প্রায় সব মাসেই নতুন মানুষের আনাগোনা কমবেশি চলছেই। শুধু হাওয়া-বদলের মানুষ নয়, ফুর্তির মানুষও আসেন। শখের মানুষও কম আসেন না। আঁকবার মানুষ, কবিতা লেখবার মানুষ ; তা ছাড়া শুধু মুরগির মাংস খাওয়ার মানুষও আসেন।

আজ পিকনিক, কাল শিকার, পরশু শুধু ধানোয়ার রোড ধরে চার মাইল বেড়িয়ে আসা। বাড়ির কুয়োর জল বারবার খেয়ে ক্ষিদে বাড়াতে হয় ; তিরছি নদীর জল খেয়ে চোঁয়া ঢেঁকুর তাড়াতে হয়।

মঙ্গলবারের হাটে যত ইচ্ছে টমেটো কেনা যায় ; খাসি মোরগও পাওয়া যাবে। আঁটসাট ঠাসা

চেহারার কত বাঁধাকপি ! কী ডাঁটো ফুলকপি ! দেহাতিনী পসারিনী দাম হাঁকে—টাকে সের। তাতে চমকে উঠবার কিছু নেই। তার মানে এক টাকা সের নয় ; দু'পয়সা সের। খাও, বেড়াও গান গাও। ছুটোছুটি করো। জোরে গাড়ি চালাও, চেঁচিয়ে হাসো।

রোগী আর রোগিনী হয়ে যাঁরা আসেন, সরিয়াড়ির জল বাতাসের কাছে তাঁদেরও আশার দাবি কিছু কম নয়। শোথের পায়ের ফুলো কমে যাক ; অজীর্ণতার পেট খাসি মোরগের মাংস হজম করুক। অনিদ্রার চোখ এগারো ঘণ্টা ঘুমোবে ; যক্ষ্মার ফ্যাকাশে ঠোঁটে রক্তের আভা লালচে হয়ে ফুটে উঠবে। এই তো চাই ; সরিয়াড়ির একমেসে কিবা দু'মেসে আশ্রয়ের জীবনে ওরা কতই না আশা আরাম সুখ আর তৃপ্তি পেতে চায় !

সরিয়াড়ির এই জীবনটা যেন যত যাযাবর কামনা আর বাসনার ক্ষণকালের ভিড়ের জীবন। একটা অস্থায়িত্বের উৎসবের জীবন। গয়া পাটনা হাজারিবাগ আর কলকাতার মানুষ শখ করে নানা ঢঙের আর নানা রূপের এত বাড়ি এখানে তৈরি করে ফেলেছেন বলেই তো সরিয়াড়ি আজ একটা ছোট শহরের মত চেহারা পেয়ে গিয়েছে। ভাড়া খাটে, এমন বাড়ির সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি। আজ খালি, কাল ভরতি। আবার একটানা তিন মাস ধরে খালি, তারপর একমাসের জন্য ভরতি। আসছে আর চলে যাচ্ছে, সবই নতুন মুখ ; সরিয়াড়ির চোখে একটু পুরনো হতে না হতেই ওরা চলে যায়। এবাড়িতে একটা রুমাল, ওবাড়িতে একটা ছেঁড়া বই কিংবা ভাঙা পুতুল, এ ছাড়া তাদের জীবনের আর কোনও চিহ্ন এখানে থাকে না। তাও বা কদিন থাকে ? চুনকামের ঠিকেদার হাজরাবাবু হঠাৎ একদিন এসে সব জঞ্জাল পরিষ্কার করে দেন। বাড়িওয়ালার টেলিগ্রাম পেয়েছেন হাজরাবাবু নতুন ভাড়াটিয়া আসবে।

এরই সঙ্গে সরিয়াড়ির এইসব মরশুমি ভাড়ার বাড়িগুলিরই আশে-পাশে ভিন্ন এক জাতের বাড়ি আছে, সেগুলি কিন্তু স্থায়িত্বেরই নীড়। স্থায়ী বাসিন্দাদের বাড়ি। অনেক অনেক বাড়ি, যেখানে চিরকাল থাকবার জন্যেই মানুষগুলি থাকে ও আছে। কেউ চাকরি করেন, কেউ পেন্সন পান। কারও কারও ব্যবসা আছে—ইটখোলা, কাঠের গোলা, বাড়ি মেরামতের ঠিকেদারি, ফার্মাসি, ফুলের নার্সারি আর মণিহারি স্টোর। কেউ বাস সার্ভিসের বুকিংবাবু, কেউ পেট্রল পাম্পের ক্যাশমেমো লেখার কেরানি, কেউ বা পাঁচটা ভাড়া-খাটা বাড়ির কেয়ারটেকার।

এঁদেরই বাড়িগুলি হল বারমাসের সুখ-দুঃখের কলরবের বাড়ি। খুঁজলে এখনও হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে, এঁদের বাড়ির ভিটে এখনও আছে—খানাকুলে বীরনগরে আর পাত্রসায়রে অণ্ডালে ঘাটালে আর হরিনাভিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইদিলপুর আর টাঙ্গাইলে ; সাতক্ষীরা কাটোয়া আর হালিশহরে ; কাজললতা আর কেয়াকুলের জঙ্গল এখনও ঘন হয়ে সেসব ভিটে ছেয়ে ফেলেনি। যাই হোক না কেন আজ এঁদের জীবনের সঙ্গে গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের ট্রেনের শব্দ, পরেশনাথের নীলচে চেহারা, শালবনের ঝড়, কাঁকরভরা লাল মাটি, মঙ্গলবারের দেহাতি হাটের বোঙা ধানের চাল আর মোটা অড়হরের ডাল, জংলি নদী তিরছির জলের তিতপুঁটি খুব ভাল করেই মিলে মিশে গিয়েছে।

বাড়ির দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়, ওটা স্থায়ী বাসিন্দার বাড়ি। পাঁচিলের উপর পড়ে আর রোদ খেয়ে কুড়ি বছরের পুরনো লেপ শুকুচ্ছে। বারান্দায় সাইকেল। আদুড় গা নিয়ে ছেলেগুলো ছুটোছুটি করে কিংবা কানামাছি খেলে। উস্কো-খুস্কো চুল, চিরুনি হাতে নিয়ে একটি মেয়ে জানালার কাছে বসে আছে তো বসেই আছে। মাথা আঁচড়ায় না, কোনও তাড়া নেই। গাঁয়ের বুড়ির ঝিঙের ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে বিধবা মহিলা দর করছেন ; কিন্তু সে কী দরাদরি। একটি পয়সা কমাবার জন্য পনেরো মিনিট ধরে বুড়ির সঙ্গে কত তর্ক আর কত কথা কাটাকাটি। বুড়িও জানে, সামনের বাড়ির ফটকের কাছে ওই যে কলকাতিয়া মাইজি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি এমন নিদারুণ দরাদরি করবেনই না ; এক কথায় পয়সা ফেলে দিয়ে দু সের ঝিঙে কিনে ফেলবেন।

তাই বলতে হয়, হাওয়ানগর সরিয়াড়ি একটু মজার শহরও বটে। একই মাটি, একই বাতাস আর একই রান্নাঘর ; কিন্তু দু'রকম জীবনের শিবির। ওরা আর এরা। ওরা হল তিষ্ঠ ক্ষণকাল ; করো ত্বরা ; নাই যে সময় নাই নাই। নিতে চাও তো তাড়াতাড়ি নিয়ে ফেল। এরা হল—আছি চিরকাল ; কিছুই ফুরিয়ে যাচ্ছে না ; কিসের তাড়া ? ব্যস্ত হতে গিয়ে ঠকব নাকি শেষে ?

কিন্তু এই দুই জীবনের মধ্যে কি মেলামেশার কোনও তাগিদ নেই ? হাওয়া খেতে আর বেড়াতে যাঁরা আসেন, তাঁরা কি তাঁদের আশেপাশে এইসব স্থায়ী বাসিন্দাদের বাড়িগুলির কাছে একেবারে অচেনা ও অজানা হয়ে থাকেন আর চলে যান ?

না, তাও নয়। এই যে সেদিন নৈহাটির দয়ালবাবু পুরো তিনটে মাস এখানে থাকার পর চলে গেলেন, তাঁরই স্ত্রী মনোরমা রোজ সকালে কালী ভট্চাজের নাত বউয়ের কোলের ছেলেটাকে নিজের কোলে নিয়ে ধানোয়ার রোডে বেড়াতে যেতেন। যাবার আগে ছেলেটার জন্যে একটা টিয়ে পাখি উপহারও দিয়ে গেছেন।

কিন্তু তারপর ? কালী ভট্চাজের নাত-বউ আশা করেছিল, নৈহাটি থেকে মনোদির অন্তত একটা চিঠি আসবেই আসবে। কিন্তু আসেনি কোনও চিঠি।

শান্তিপুরের বসন্তবাবু কিন্তু চলে যাবার দিন সরিয়াডির সামন্তবাবুর সঙ্গে কোলাকুলি করেছিলেন। —এই তো, ঠিক আর পাঁচটি মাস পরেই, অক্টোবরে পড়তে না পড়তেই আমি আবার আসছি। গৃহিণীরও তাই ইচ্ছে। কেউ না আসুক, আমি না এসে পারব না মশাই। আসতেই হবে।

সেই বসন্তবাবু পাঁচ বছরের মধ্যে আর আসেননি।

॥ ২ ॥

নয়াপাড়ার সড়ক ধরে এগিয়ে যেতেই চন্দ্রবাবু দেখলেন, দুটো ল্যাম্পপোস্টের ঘাড় কাত হয়ে হেলে পড়েছে। টেলিগ্রাফের খুঁটির মাথা থেকে একটি শালিকের বাসা ছিটকে পড়ে রাস্তার পাশের নালার জলে আধ-ডোবা হয়ে ভাসছে। পিঁক পিঁক পিঁক, শব্দ করে কোঁকাচ্ছে শালিকের ছানা। ক্যাকর্ ক্যাকর্ করে উড়ছে আর ঘুরছে দুটো ধাড়ি শালিক। রায় সাহেবের সাধের বাগানের কৃষ্ণচূড়াটার ঘাড় মটকে গিয়েছে।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে এসেছেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন। কী কাণ্ড ? ঝড়ের বাতাস একটা ডাস্টবিনকে রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলেছে দেখ ? জঞ্জালের এক একটা স্তবক রাস্তার উপর ঢেলে দিয়ে ডাস্টবিনটা একেবারে গোষ্ঠবিহারীর বাড়িটার পাঁচিলের গায়ের উপর পড়েছে।

কিন্তু এ কী জঞ্জালের মধ্যে এত চিঠি কেন ? লাল সিল্কের সুতো দিয়ে বাঁধা রঙিন খামের চিঠির তিনটে তাড়া কেন ?

চন্দ্রবাবু ডাকেন—গোষ্ঠ, ওহে গোষ্ঠবিহারী ? জেগেছ নাকি ?

দরজা খুলে আর চোখ মুছতে মুছতে বের হয়ে আসেন গোষ্ঠবাবু—ঘুমোতে একটু রাত হয়েছিল, চন্দর কাকা। বুলুর মার আবার ফিট হয়েছিল।

—কেন ?

—স্বপ্নে দেখেছে ওর হাতে শাঁখা নেই আর ঘরের ভিতরে একটা কালো ছায়া।

চন্দ্রবাবুর চোখের তারার চিকচিকে হাসিটা যেন ফুরফুর করতে থাকে। চেঁচিয়ে হেসেও ফেলেন চন্দ্রবাবু—কিছুর মধ্যে কিছু নেই, খামকা একটা মজার স্বপ্ন, অ্যাঁ ?...

—কিন্তু এটা কী ব্যাপার বলতে পার ?

—কী ?

—ডাস্টবিনের জঞ্জালের মধ্যে এত গোটা-গোটা চিঠি কেন ?

চিঠির তিনটে তাড়ার দিকে যেন দম বন্ধ করে আর অপলক চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন গোষ্ঠবাবু। খামের গায়ে লেখা নামটা পড়ে নিয়েই হাঁফ ছাড়েন। —কণিকা ভরদ্বাজ।

চন্দ্রবাবু—কে সে ?

—ওই যে ওই বাড়ি, ওই স্মৃতিধামে ছিলেন যে ভদ্রলোক, হর্ষনাথ ভরদ্বাজ, বর্ধমানের মুন্সেফ ; তাঁরই মেয়ে কণিকা। তিন মাস ছিল, পরশু দিন ওরা চলে গিয়েছে।

—তিন মাসের মধ্যেই এত চিঠি ?

গোষ্ঠবাবু অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন —চিঠির গায়ে আবার ডাকটিকিট নেই দেখছি। লোকাল ব্যাপার বোধ হয়।

—কী বললে ?

—কী আর বলব বলুন ; হঠাৎ শুনলাম, মিস্টার ভরদ্বাজ চলে যাচ্ছেন, কারণ মেয়ের বিয়ে হবে।

ডাকতে হয়নি, পাশের বাড়ি থেকে হাবুলবাবু নিজেই বের হয়ে এসেছেন। হাবুলবাবু কিন্তু বেশ একটু চড়া রাগের স্বরে কথা বলেন—না, ঠিক লোকাল ব্যাপার নয়। ওরা বাইরের ; ওরা এই করতেই এখানে আসে। দু' দিনের ফুর্তির যত জঞ্জাল এখানে রেখে দিয়ে সরে পড়ে। জানেন না গোষ্ঠদা, এসব কার লেখা চিঠি ?

গোষ্ঠবিহারী—না।

হাবুল—সিন্‌হা লজের ভাড়াটে এক ছোকরা চেঞ্জার।

চন্দ্রবাবু—সে এখন কোথায় ?

হাবুল—সে তো এখন এখানেই আছে আর স্বপ্ন দেখছে।

চন্দ্রবাবু ব্যস্তভাবে বলেন—চলি হে গোষ্ঠবিহারী , চললাম হাবুল ; তোমাদের চায়ের সময় হয়েছে মনে হচ্ছে।

হাবুল—আপনিও একটু. . ।

চন্দ্রবাবু—না না, আমি তো পঁয়ত্রিশ বছর আগেই চা খাওয়ার লোভ ছেড়ে দিয়েছি। অথচ আমি, তোমরা সে খবর জান না, দিনে আটবার চা খেতুম। ছেলের মা ভয় দেখিয়ে বলতেন, উনি মরে গেলে আমি নাকি ভয়ানক জব্দ ; এত ঘন ঘন আমাকে চা করে দেবে কে ? কিন্তু.. আমি একটুও জব্দ হইনি হাবুল ; চা খেতে ইচ্ছেই করে না।

মোষের শিঙের লাঠি দুলিয়ে আর হেসে হেসে এগিয়ে চললেন চন্দ্রবাবু। দেখতে পেলেন, জয়ন্ত মল্লিকের বাড়ির গেট খোলা, গরু ঢুকে বাড়ির বারান্দার টবের গাছ চিবিয়ে খাচ্ছে।

—জয়ন্ত, জয়ন্ত। শিগগির বাইরে এসো।

জয়ন্তবাবু বের হয়ে আসেন ; গরুটাকে তাড়িয়ে চন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথা বলেন—কী আর করা যাবে বলুন ? কাল রাত্তিরে নাগ সাহেবের গাড়ি ঠিক এখানেই রাস্তার উপর ব্যাক করতে গিয়ে আমার বাঁশের জাফরির গেটটাকে কড়মড়িয়ে ভেঙে দিল।

—তারপর ?

—তারপর আর কী ? নাগ সাহেব বললেন, যদিও তাঁর গাড়ির বডিতে তিনটে বড় বড় স্ক্র্যাচ পড়েছে, তবু তিনি কোনও কমপ্লেন করতে চান না।

মুখ টিপে হাসতে থাকেন জয়ন্ত মল্লিক।

চন্দ্রবাবু বলেন—চলি।

মনে হচ্ছে, এইবার মেঘলা ভোরের আকাশে আলোর আভা জেগে উঠবে মানুষের ঘুম ভাঙাবার বেশি সুযোগ পাবেন না চন্দ্রবাবু।

না, এই রাস্তায় আর বেশি এগিয়ে না যেয়ে ডাইনে কিংবা বাঁয়ে কোনও একটা ছোট রাস্তায় ঘুরে যাওয়াই ভাল। রজনীধামের গেট পর্যন্ত এসে বাঁদিকের কালীবাড়ি রোডে ঘুরে গেলেন চন্দ্রবাবু।

থমকে দাঁড়ালেন ; ডাক দিলেন চন্দ্রবাবু। —দিবাকর ! ওহে দিবাকর ! জেগেছ নাকি ?

দরজা খুলে বের হয়ে আসে আর বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে কথা বলে দিবাকর। —ঘুমোলাম কখন যে জাগব ?

চন্দ্রবাবু—অ্যাঁ ? তাইতো ! তোমার চোখ দুটো বেশ লাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

—হবে না কেন ? চিতের ধোঁয়া লাগলে... ।

—কী ব্যাপার ?

দিবাকর—এই তো, আধঘণ্টাও হয়নি, আমি পরেশ মাধব আর বিমল ঘাট থেকে ফিরেছি। মাস দুই হল ওই রজনীধামে নতুন যাঁরা এসেছেন... ।

—কারা ?

—নাম জানি না। এক বুড়ো বাঙালি ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী ; সঙ্গে একটা মাদ্রাজি চাকর।

বারান্দা থেকে নেমে এসে এইবার রাস্তার উপর চন্দ্রবাবুর কাছেই দাঁড়িয়ে কথা বলে দিবাকর। —ভদ্রলোকের স্ত্রী কাল সন্ধ্যাবেলাতেই মারা গেলেন। মল্লিক ডাক্তার এসে খবর দিয়ে গেলেন ! একটা ব্যবস্থা করো।

বুড়ো ভদ্রলোক নিজেও রুগী ; তার উপর কেঁদেকেটে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন। কাজেই, পরেশ মাধব আর বিমলকে ডাকতে হয়েছে। খাটিয়া যোগাড় করতে হয়েছে ! চারজনের মধ্যে একজনের পক্ষেও কাঁধ ছাড়বার সুযোগ হয়নি ; ঘাট পর্যন্ত সারাটা পথ একটানা মড়া বইতে গিয়ে কাঁধ টাটিয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রবাবু—যাক, তোমরাই তা হলে কাজটা ভালভাবে সেরে দিয়েছ ?

—দিয়েছি বইকি। বলতে গিয়ে হেসে ফেলে দিবাকর। —পাঁজির পাতা থেকে মন্তর পড়েছে বিমল ; আর আমি... ।

আবার হেসে ফেলে দিবাকর। —আমি মুখাগ্নি করেছি।

চন্দ্রবাবু—এঃ, একটা কাণ্ডই করেছ তা হলে ?

দিবাকর—কী করব বলুন ? বুড়ির কোনও ছেলে-টেলে এখানে যখন নেই, তখন বাধ্য হয়েই কাণ্ডটা করতে হল, চন্দর কাকা।

এগিয়ে চললেন চন্দ্রকান্তবাবু। চন্দ্রবাবুর চোখের তারার সেই চিকচিকে হাসিটার যেন একটুও ক্লান্তি নেই।

—হেই হেই হেই ! এটা আবার কে রে ? থমকে দাঁড়ালেন, চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু।

একটু দূরে মায়া ভিলার বন্ধ ফটকের লোহার গরাদের উপর দুটো পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বেশ প্রকাণ্ড কিন্তু বেশ কুৎসিত চেহারার একটা আলসেশিয়ান কুকুর। ভিতরে ঢোকবার জন্যে যেন আঁকু-পাঁকু করছে কুকুরটা। বন্ধ ফটকের গরাদগুলিকে শুঁকছে চাটছে আর দু'পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে।

নিকটের একটা ছোট্ট বাড়ির জানালা খুলে কথা বলে ছোট্ট একটা ছেলে—ওর নাম হেন্‌রি। হেন্‌রি খুব ভাল লোক। কাউকে কিচ্ছু বলে না। আপনি এগিয়ে যান দাদু।

চন্দ্রবাবু—যাব তো ; কিন্তু কী ব্যাপার ? কে এটা ?

এইবার ছোট্ট বাড়ির একটি বড় ছেলে ঘরের বাইরে এসে কথা বলে—মায়া ভিলাতে ছিলেন যে দত্তসাহেব, তাঁরই কুকুর হেন্‌রি। দত্তসাহেব হেন্‌রিকে এখানে ফেলে রেখেই চলে গিয়েছেন।

—কেন ?

—হেন্‌রির গায়ে পোকা হয়েছে। এখন পাড়া ঘুরে সব বাড়ির এঁটোকাঁটা খায় আর ঘুরে বেড়ায় ; আর, রোজই ভোরে একবার এসে ওরকম পা তুলে দিয়ে মায়া ভিলার ফটকের গরাদ চাটে।

এগিয়ে চললেন চন্দ্রবাবু। কা কা, পিউ পিউ, পিক পিক—মেঘলা ভোরের নীরব বাতাসে এইবার পাখির ডাকের সাড়াও বেশ মুখর হয়ে উঠেছে। বলাইদের বাড়ির সামনের চালতে গাছের মাথায় অনেক পাখি কিচির মিচির করছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, বলাইটা তবু বাইরের বারান্দার তক্তপোষের উপর পড়ে আছে আর ঘুমোচ্ছে। বলাইয়ের নাক-ডাকার শব্দও শোনা যায়।

জানেন চন্দ্রবাবু, বলাইয়ের এম-এ পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে। রাত জেগে পড়া-শোনা করে বলাই। তবু চন্দ্রবাবু ডাকেন। —ওহে বলাই, আর কত ঘুমোবে।

চমকে জেগে ওঠে বলাই। আর, বেশ বিরক্ত ও অপ্রসন্ন চোখ দুটোকে একটু কুঁচকে দিয়ে কথা বলে—আঃ, কী যে করেন চন্দর কাকা।

চন্দ্রবাবু—একটা ঝড় যে এল আর চলে গেল, টের পেয়েছ কি ?

—না ; তাতে হয়েছে কী ?

—একটু আশ্চর্য হতে হচ্ছে, এ ছাড়া আর কী ?

।মার ঘাড়ের ওপর দিয়ে মাঝরাতে যে একটা ঝড় বয়ে গেছে, সে খবর রাখেন কি ?

—অ্যাঁ ? কী হয়েছে ? সেটা আবার কী ব্যাপার ?

—পাগল ধরবার জন্যে মাঝরাতে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। শুধু কি আমি ? হারান আর নরেনও ভুগেছে। পাগলের ঘুষি লেগে নরেনের কপালে কালশিরে পড়েছে।

—পাগল কোথা থেকে এল ?

—ওই যে অমিয় ভবনে যাঁরা এসেছেন, তাঁদেরই একজন। ইয়া হট্টাকট্টা চেহারা আমাদেরই বয়সের এক পাগল। সব সময় ইংরেজি গান গাইছেন। পাগলকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কাল ঠিক মাঝরাতে ঘরের দরজা ভেঙে অন্ধকারের মধ্যে সোজা তিরছি নদীর দিকে ছুটে চলে গেল। কাজেই...।

কাজেই অমিয় ভবনের চেঁচামেচি শুনে আর পাগলের বউটির কান্নার শব্দ শুনে বলাই হারান ও নরেনকে বের হতে হয়েছে। রোড চৌকিদার বলেছে, দিন দশ হল একটা বুড়ো নেকড়ে তিরছি নদীর আশে পাশে ঘুরঘুর করছে।

—তাই বেশ একটু আশঙ্কা হয়েছিল, চন্দরকাকা।

কিন্তু ভাগ্যি ভাল তিন ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজির পর পাগলকে তিরছি নদীর একটু এদিকেই মাঠের মধ্যে পাওয়া গেল। কিন্তু ধরতে যেতেই বাধা দিল পাগল, একটা ধস্তাধস্তি হয়ে গেল। শেষে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে আসতে হল।

—যাক, শেষ পর্যন্ত...।

—হ্যাঁ, ধরে এনেছি। পাগলকে আবার ঘরে বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু...। হেসে ফেলে বলাই।—পাগলের বউ আজ সকালে একবার যেতে বলেছিলেন, আমাদের তিনজনকে আট আনা করে বকসিস দেবেন।

এগিয়ে চললেন চন্দ্রবাবু। তাড়াতাড়ি পা চালাতে চেষ্টা করেন, যদিও ধারিওয়াল কম্বলের ওভারকোটের ভারে ততটা তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয় না। এদিকে পুবের আকাশও লাল হয়ে উঠেছে।

এই তো ; খাপরার চালার উপর লাল লাল ফুলে ভরা একটা কাঁটালতার ঝাড় চড়ে বসেছে আর ছড়িয়ে আছেন ; তার উপর বসে দুটো শালিক ডাক ছাড়ছে ; এটা প্রদোষ সরকারের বাড়ি। কিন্তু বাড়িটা যেন অনেকক্ষণ আগেই জেগেছে বলে মনে হচ্ছে। জানালাটা খোলা ; কে যেন জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। কী ব্যাপার ? সত্যিই যে প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ী খোলা জানালার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কী দেখছে আত্রেয়ী ? পুবের আকাশের লালচে আলোটাকে ? কী শুনছে আত্রেয়ী ? দূরের তিরছি নদীর ঝর্নার কলকলে শব্দটাকে ? ভাবছেই বা কী ? একটা স্বপ্ন দেখে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছে, সেই স্বপ্নটাকেই ভাবছে নাকি আত্রেয়ী ?

চন্দ্রবাবুর মনে অবশ্য এসব প্রশ্নের কোনও প্রশ্নই ছটফট করছে না। তিনি ভাবছেন, ব্যাপার কী ? প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ী আজ এত ভোরে জেগে উঠল কেন ? কোনওদিনও তো এ সময়ে ওই জানালাটিকে খোলা দেখতে পাননি, আর আত্রেয়ীকে জানালার কাছে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেননি চন্দ্রবাবু।

—আত্রেয়ী নাকি ? ডাক দিলেন চন্দ্রবাবু।

চমকে উঠে আত্রেয়ী।—হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।

—ঝড় এসেছিল, টের পেয়েছিলে কি ?

—পেয়েছি।

—অ্যাঁ ? তা হলে তো অনেকক্ষণ হল জেগেছ।

—হ্যাঁ।

—আর সব খবর ভাল ?

—হ্যাঁ, ভালই।

—তোমার হাতে ওটা কী ?

পুব আকাশের সব আলোর আভা যেন রক্তমাখা হয়ে প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ীর মুখের উপর চমকে ওঠে। হাতটাও কেঁপে উঠেছে।

বোধ হয় আত্রেয়ীর কাছ থেকে একটা উত্তর আশা করছেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু আত্রেয়ী আর কথা বলবে বলে মনে হয় না। চন্দ্রবাবুর চোখের তারাতে কোনও বিস্ময়ও আর চিকচিক করে না। যেন ভয়ানক জটিল ও কঠিন একটা হেঁয়ালির থিয়েটার দেখছেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছেন না।

আত্রেয়ী বলে—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, জ্যাঠামশাই। আপনি একটা আলোয়ান গায়ে দিয়ে বেড়াতে বের হলে ভাল করতেন।

—আচ্ছা, আমি চলি। বাবাকে বলো, আমি এসেছিলাম।

মোষের শিঙের লাঠিটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়েই চলতে থাকেন চন্দ্রবাবু।

॥ ৩ ॥

এই ছোট হাওয়ানগর সরিয়াডির স্থায়ী বাসিন্দা প্রদোষ সরকারের বাড়ির খাপরার চালার উপরে এই কাঁটালতার বিপুল বোঝা কোনও ঝড়ের হাওয়াতে উড়ে যেতে পারে না। ওটা যেন একটা অচলতার ভার। প্রদোষ সরকার নিজেও একটা অচলতা। ভদ্রলোকের একটি পায়ের আধখানা নেই। ক্রাচের উপর ভর করে আস্তে-আস্তে হাঁটতে পারেন। ঘরের ভিতর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতে পাঁচ মিনিট লেগে যায়।

দানাপুরের গোরাবারিকে একশো টাকা মাইনের জিমনাস্টিক মাস্টার ছিলেন প্রদোষ সরকার। দেশি মানুষ হয়েও গোরা সোলজারকে কসরত শেখাবার মাস্টারি শুধু এক প্রদোষ সরকার ছাড়া আর কেউ করেছেন বলে শোনা যায় না। আজও প্রদোষ সরকারের এই বাড়ির একটি ঘরের দেয়ালে পুরনো ফটো ঝুলছে : ব্রিগেডিয়ার সাহেবের চোখের সামনে একটি লনের ঘাসের উপর দুটি হাতের উপর ত্রিশ বছর বয়সের শক্ত-মজবুত শরীরটার ভর রেখে আর পা-জোড়া টান ঊর্ধ্বে তুলে দিয়ে পিকক হয়েছেন প্রদোষ সরকার। সেই ঊর্ধ্বমুখী দুই পায়ের পাতার উপর দু'মণ ওজনের একটি বারবেল সুস্থির হয়ে রয়েছে।

ছাত্রদের সামনে প্যারালাল বারের উপর কসরত করতে গিয়ে একদিন মাস্টারের হাতের কব্জি হঠাৎ মট্‌ করে বেজে উঠল ; ছিটকে পড়ে গেলেন মাস্টার। একটি পা ভেঙে গেল। সেই ভাঙা পা কেটে ফেলতেও হল। অকালে পেনসন পেলেন প্রদোষ সরকার। তারপর থেকে সরিয়াডির এই বাড়িতে একটানা বিশ বছর ধরে একটা অচলতার জীবন।

খুব ছোট বাড়ি কিন্তু মানুষ কম নয়। প্রদোষ সরকার ছাড়া আর যাঁরা থাকেন, তাঁরাও যেন এক-একটা অচলতা।

প্রদোষ সরকারের স্ত্রী হৈমবতী একটি অচলতা। দিনে অন্তত দুবার শ্বাসকষ্ট হবেই। তখন পুজোর ঘরের দরজার কাছে একেবারে ধীর-স্থির হয়ে বসে থাকবেন। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির জলের ছাঁট ঘরে ঢুকে বিছানা ভিজিয়ে দিচ্ছে ; হৈমবতী শুধু তাকিয়ে দেখেন। কিন্তু ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসতে পারেন না, জানলাটাকে বন্ধও করতে পারেন না।

হৈমবতীর এক মাসিমা আছেন, মণিময়ী ; আত্রেয়ীর মণিদিদা। একে তো বেশ বুড়ো মানুষ, তার উপর চোখে ভাল দেখতে পান না। দেয়াল ধরে ধরে হাঁটেন। হাতটাও সব সময় থরথর করে কাঁপছে। তাঁকে খাইয়ে দিতে হয়।

আছেন আত্রেয়ীর কাকিমা সুহাসিনী ; প্রদোষ সরকারের খুড়তুতো ভাই সোমনাথের বিধবা স্ত্রী। ইনিও প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ভাসুরের এই সংসারের হেঁসেল আর ভাঁড়ার আগলে রয়েছেন। রাত বারোটার পরেও খইয়ের ডালা কোলে নিয়ে বসে থাকেন আর ধান বাছেন। কিন্তু তারপর আর উঠতে পারেন না ; মেঝের উপরেই অসাড় হয়ে শুয়ে পড়ে থাকেন।

বুড়ো চাকর রামুয়া ; সেটাও একটা অচলতা। দানাপুরের চাকরি জীবনে এই রামুয়া ছিল প্রদোষ সরকারের ঘরের চাকর। কে জানে কোথায় ওর দেশ ? হাঁপানিতে ভোগে আর যখন ইচ্ছে হয় তখন

একটা কাজ করে। রান্না হতে দেরি হলেই রাগ করে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন অনেক সাধাসাধি করে ওর ঘুম ভাঙাতে হয়। পেট ভরে ভাত খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে রামুয়া। এই তো সেই রামুয়া, যে লোকটা একদিন দানাপুরের গোরাবারিকের ময়দানে ছুটে গিয়ে প্রদোষ সরকারের ভাঙা পা দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল।

অকালে পাওয়া পেনসন, মাত্র একচল্লিশ টাকা ; তাতে যেভাবে থাকতে পারা যায়, সেইভাবেই থাকছেন প্রদোষ সরকার। কাঁটা-লতার প্রকাণ্ড ভার বাড়িটাকে বিঁধছে ; কিন্তু বাড়িটা সেজন্য উঃ আঃ করে না।

এঁরা তো পথের শেষে পৌঁছে গিয়েছেন আর অচল হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু আত্রেয়ীও কি তাই ?

সরিয়াডির স্থায়ী বাসিন্দাদের সকলেই জানে, বেচারা আত্রেয়ী মেয়েটার জীবনও একটা অচলতা।

সেই যে কবে, বোধ হয় পুরো তিনটে বছর পার হয়ে গিয়েছে, প্রদোষ সরকারের মেয়ে এই আত্রেয়ীর বিয়ে হয়েছিল। এখানে নয়, নদে জেলার বীরনগরে ; আত্রেয়ীর মামা, গরিব জমিদার কান্তিবাবু খুব কম টাকা খরচ করে আর খুব ঘটা করে ভাগ্নির বিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আত্রেয়ীর বয়স তখন কত ? সতেরো কিংবা আঠারো। খোঁড়া মানুষ প্রদোষ সরকার অবশ্য মেয়ের বিয়েতে বীরনগরে যেতে পারেননি। আত্রেয়ীকে নিয়ে বীরনগরে গিয়েছিলেন শুধু আত্রেয়ীর মা আর কাকিমা।

মামা তাঁর ভাগ্নির জন্যে ভাল পাত্রই যোগাড় করেছিলেন। পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স হবে, দেখতে বেশ ভাল, রাধাপুরের সাত-আনির মালিক হেমন্ত সেই বয়সে একজন জবরদস্ত জমিদার। ঘোড়ায় চড়ে ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে হেমন্ত, দেখতে পেলেই নয়-আনির প্রজা চাষীরা হাতের লাঙল ক্ষেতের উপর ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। নয়-আনির জ্ঞাতিরা ভয় করে কিন্তু বছরে তিনটে করে মামলা বাধিয়ে ছোকরা সাত-আনিকে সদরে ছুটোছুটি না করিয়েও ছাড়ে না।

সে কাহিনী জানেন চিনুর পিসিমা।—হ্যাঁ, ঠিক ফুলশয্যার দিনে সন্ধ্যাবেলাতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এল। একমাস আগে কোথায় যেন দাঙ্গা ফৌজদারি হয়েছিল ; ন' আনিদের তিনটে লোক খুন হয়েছিল। পুলিশ এসে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে চলে গেল। তখন মেয়েটার মনের অবস্থা কী হয়েছিল, একবার ভেবে দেখুন সন্তুর মা ?

—ছেলেটার বাড়ির মানুষের অবস্থাটাও একবার ভাবুন।

—না, তেমন কান্নাকাটি করবার মত কেউ ছিল না। ছেলের মা-বাপ কেউ নেই। ছেলেমানুষ এক ভাই-পো ছিল, আর এক বিধবা খুড়ি ছিল। তারা দু'জনেই যা একটু কেঁদেছিল।

রাধাপুরের সাত-আনির প্রকাণ্ড দালান-বাড়ির একটি ঘরে সন্ধ্যা ঝাড়বাতির আলো ঝলমল করে জ্বলছে ; তিন বছর আগের সেই ছবিটাকে যে এই সেদিনও স্বপ্নে দেখতে পেয়েছে আত্রেয়ী। তাঁর নামটা মনে পড়ে না, এক মহিলা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে আত্রেয়ীর চিবুক ছুঁয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—ওরে তোরা দেখ এসে, আমাদের হেমন্তর বউয়ের মুখটা কী সুন্দর।

বাইরে একটা সোর-গোল ; মানুষের ছুটোছুটি, যেন একটা আতঙ্কের ব্যস্ততা। হেমন্তের গলার স্বর শোনা যায় ; শান্ত ও গম্ভীর একটা গর্জন—চুপ ; কেউ ছুটোছুটি করবে না।

ঘরে ঢোকে হেমন্ত। গায়ে একটি গেঞ্জি, কাঁধের উপর একটি পুরনো কামিজ ফেলা, আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে হেমন্ত।—আমি এখন যাচ্ছি।

আত্রেয়ী আশ্চর্য হয়ে তাকায়। হেমন্ত বলে—তুমি কিন্তু মিথ্যে ভয় পেও না ; আর আমার ওপর রাগ-টাগও করো না।

আত্রেয়ী—কী হল ?

হেমন্ত—নুটুর কাছ থেকে সব জানতে পারবে। আমি এখন আসি, কেমন ?

হয়ত আরও একটি-দুটি কথা বলত হেমন্ত। কিন্তু সেই মহিলা তখন হতভম্ব হয়ে ঘরের ভিতরেই দাঁড়িয়ে আছেন। হেমন্ত শুধু চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপরেই বলে—তুমি আমাকে এক

গেলাস জল দাও, ওই যে ওখানে কুঁজো।

হেমন্তর হাতের কাছে জলের গেলাস এগিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী। ভয়ানক তৃষ্ণার্তের মত ব্যস্তভাবে ঢক ঢক করে জল খায় হেমন্ত ; খালি গেলাসটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়েই বের হয়ে যায়।

পরের দিনই জমিদার মামা এসে ভাগ্নিকে বীরনগরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর, দিন সাত পরে একটি দিনে বলেই ফেললেন—তোরা এখন আত্রেয়ীকে নিয়ে তোদের জংলি সরিয়াডিতেই ফিরে যা, হেমি।

হেমন্ত সদরের জেল হাজতে আছে ; এখন মামলা চলবে। কতদিন ধরে চলবে কে জানে ? ঠিক কবে যে ফিরবে হেমন্ত ; সেটাও ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে।

আবার সরিয়াডি ; চমৎকার একটা নিশির ডাক যেন আত্রেয়ীকে কদিনের জন্য এখান থেকে নিয়ে গিয়ে একটা ঝাড়বাতির ঝলমলে আলোর কাছে বসিয়ে রেখেছিল। সরিয়াডির সকলেই শুনতে পেল আর দেখতেও পেল, আত্রেয়ী মেয়েটার মাথাটা শুধু সিঁদুরের একটা দাগ নিয়ে ফিরে এসেছে।

মাস ছয় পরে বীরনগরের কান্তিবাবুর একটা চিঠি পড়ে নিয়েই যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রদোষ সরকার, তখন, সবার আগে আত্রেয়ীই দেখতে পেয়ে প্রদোষ সরকারের কাছে এসে চিঠিটাকে হাতে তুলে নিয়েছিল। বোঝা গেল, কবে আসবে হেমন্ত। পাঁচ বছর পরে।

মামার চিঠিটা বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলছে—হেমন্তের পাঁচ বছরের জেল হয়েছে। আর শেখ রহিম, তোরফান আলি, ভিকু সরকার ও ভোলা প্রামাণিক, প্রত্যেকের দশ বছর। এখন আলিপুর জেলে আছে হেমন্ত। আত্রেয়ীকে দিয়ে একটা দরখাস্ত সই করে খুব তাড়াতাড়ি জেলারের কাছে পাঠাবেন, যেন বছরে অন্তত তিনটি বার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সুবিধা পায় আত্রেয়ী।

কিন্তু দু'দিন পরে আলিপুর জেল থেকে লেখা হেমন্তেরই একটি চিঠি পড়ল আত্রেয়ী—তুমি এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা-টেখা করো না, লক্ষ্মীটি। দেখা তো হবেই একদিন।

—আমারও পাঁচ বছরের জেল হল, কাকিমা। চিঠিটা কাকিমার হাতে তুলে দিয়েই সরে যায় আত্রেয়ী। কিন্তু সরে যেতে হলে কতদূরেই বা যাওয়া যেতে পারে ? বাইরের ঘরের এই জানালাটা পর্যন্ত। বাস, তারপর আর যা-কিছু দেখা যায় ও শোনা যায়, সবই একটা অন্য দুনিয়ার ছবি আর শব্দ। শালবন, বিকেলের আকাশ, দূরের ট্রেনের শব্দ ; সন্তুদের গরুটা ডাকছে ; নতুন বাছুরটা ছুটোছুটি করছে। ওরা আত্রেয়ীর জীবনের, আত্রেয়ীর চোখ কান আর নিঃশ্বাসের কেউ নয়।

অন্য দিন হলে, এখনই বের হত আর সন্তুদের নতুন বাছুরটার গায়ে নিশ্চয়ই একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে ফিরে আসত আত্রেয়ী। কিন্তু আর পারবে না আত্রেয়ী, দরকারও নেই। গরুটা শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসবে, আত্রেয়ীর হাতটাকে গুঁতিয়ে সরিয়ে দেবে। আর, সন্তুটাও আত্রেয়ীকে হয়ত চিনতে পারবে না।

পশ্চিমের আকাশটা লাল হল। ঘরের সব জানালা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে আত্রেয়ী।

সরিয়াডির সন্ধ্যাতেও কী কুয়াশার ঘোর। তাই, ওদিকে চন্দ্রবাবুও তাঁর মোষের শিঙের লাঠিটাকে হাতে তুলে নিয়ে বের হয়ে পড়েছেন।

—ওহে গোষ্ঠবিহারী, আজ হঠাৎ এত কুয়াশা কেন ? এটা তো পৌষ নয়।

গোষ্ঠবিহারী—তা তো নয়।

—কুয়াশাতে আবার এত ঝাঁজ কেন ? তোমাদের চোখ জ্বালা করছে না ?

—করছে। কোথাও কাঁচাকয়লার পাইল পুড়ছে বোধ হয় ; তাই খুব ধোঁয়া ছড়িয়েছে।

চন্দ্রবাবু চলে যেতেই হাবুলবাবু বলেন—শুনেছেন তো গোষ্ঠদা, আত্রেয়ীটা আজ বিকেল থেকেই ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে শুধু কাঁদছে।

—শুনেছি।

—ছক পাতবেন নাকি ? না, ইচ্ছে করছে না ?

—নাঃ, আজ আর কিছু ভাল লাগছে না।

—আমারও।

চিনুর পিসিমা, দুধের বাটিটাকে এক ঠেলা দিয়ে সরিয়ে রেখে আর বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন—কী যন্ত্রণা, কোত্থেকে এমন চোখ-জ্বালানো ধোঁয়া এল রে বাবা! ওরে, ও চিনু ; একবার দেখে আয় তো মা, আত্রেয়ী কিছু খেল কি না?

আষাঢ়ের মেঘ যেদিন বিকেলে দূরের নীলচে চেহারার পরেশনাথের গায়ের উপর গলে পড়ে যায়, সরিয়াডির শালবনের উপর দিয়ে জলো হাওয়া ছুটে যায়, আর, কিছুক্ষণ পরেই সব আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে শুধু তারা ঝিকমিক করে, সেদিন মনে করতে হয়, একটা বছর পার হয়ে গেল। বীরনগরের মামার বাড়ির সুপুরিবাগানের মাথার উপরে সেই আকাশের মত সরিয়াডির এই আকাশেও আজ তারা হাসে। কিন্তু সরিয়াডির সকলেই জানে, আত্রেয়ী এই এক বছরের মধ্যে কোনওদিনে কোনওক্ষণেও হাসতে পারেনি। সন্তুর মা দেখেছেন, কত হাসি-খুশি আর কত ফূর্তি নিয়ে ছুটোছুটি করত যে মেয়ে, সে আজ পাহাড়ের মত গম্ভীর। এক বছর আগে, ওই প্রদোষবাবু নিজেও একদিন দেখেছিলেন, আর খুশির আবেগে হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন—পা থাকলে আজ আমি তোরই সঙ্গে একবার ছুটোছুটি করে নিতাম রে আত্রেয়ী।

সেদিন বুড়ো চাকর রামুয়ার গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একটা দেহাতি ভজন গাইতে গাইতে, আর ছুটোছুটি করে ঘরের কাজ করছিল আত্রেয়ী। তার কদিন পরেই তো বীরনগর চলে গেল।

॥ ৪ ॥

গোষ্ঠবাবুর বাড়িতে দাবা খেলার আনন্দের উল্লাসের মধ্যেও হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিয়ে আর গম্ভীর হয়ে আক্ষেপ করেছিলেন হাবুলবাবু—মনে আছে তো গোষ্ঠদা, প্রদোষদার মেয়ে আত্রেয়ীটা একদিন কী কাণ্ড করেছিল?

মনে আছে গোষ্ঠবাবুর। আত্রেয়ী তখন নিতান্ত ছোট্ট মেয়েটি নয়। তেরো বছর বয়সের একটি মেয়ে ; কোনওদিন ফ্রক পরে ; কোনওদিন শাড়ি। বড় বড় দুটো বেণী দুলিয়ে আর ছুটে এসে একটা কাঠবিড়ালিকে ধরবার জন্যে পাঁচিলের উপরে উঠে পড়েছিল।

হাবুলবাবু বলেন—না, কাঠবিড়ালি নয়। সেই যে, চেঞ্জার ছোকরার সেই ক্যামেরাটা?

খুব মনে আছে। সরিয়াডিতে বেড়াতে এসেছিল ফটো তোলবার শখের একটি ছেলে। সব সময় ক্যামেরা হাতে নিয়ে সরিয়াডির এদিকে-সেদিকে ঘুর-ঘুর করত। গোষ্ঠবাবুর বাড়ির ফটকের মালতিলতার কাছে আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়েই ক্যামেরা তুলে ধরল সেই চেঞ্জার ছোকরা।—একটু পোজ করো তো ; লতাটাকে একটু ছুঁয়ে দাঁড়াও তো ; মাথাটা বাঁদিকে একটু হেলিয়ে দাও,...হ্যাঁ ঠিক আছে বাস্!

অচেনা আগন্তুক যা বলছে, ঠিক তাই করছে আত্রেয়ী। চোখ দুটোও ঝকমক করে হাসছে।

ফটোসুখী ছেলেটা বলে—রেডি! ক্যামেরা বলে—ক্লিক।

কিন্তু তার আগেই চোখ বন্ধ করে আর জিভ বের করে দুরন্ত-ধূর্ত একটা ভেংচানির মূর্তিকে ক্যামেরার চোখের উপর এঁকে দিয়েছে, আর গোষ্ঠবাবুর বাড়ির ভিতরে ঢুকেই খিলখিল করে হেসে উঠেছে আত্রেয়ী।—বেশ চমৎকার একটা ফটো তোলালাম, গোষ্ঠকাকা।

ঘুঁটি চালবার জন্য হাত তুলেই হাবুলবাবু বলেন—আমি ছেলেটাকে দু-চারটে বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম। গোঁয়ার দিবাকরটা আবার কোথা থেকে ছুটে এসে ছোকরার ক্যামেরা ভেঙে দিতে চেয়েছিল। আমি অবিশ্যি অতটা গড়াতে দিইনি।

গোষ্ঠবাবু,—শুনছি মেয়েটার মনে এখন আর কোনও ফূর্তি-টুর্তি নেই। শুধু জেলের চিঠির আশায় ছটফট করে।

আলিপুর জেল থেকে চিঠির আশায় ছটফট করা আর চিঠি এলে দুটি-একটি দিনের মত শান্ত হয়ে যাওয়া, আত্রেয়ীর প্রাণটাও যেন একটা জেলের কুঠরীর মধ্যে কয়েদ খাটছে। বাড়ির বাইরে যাওয়া দূরে থাকুক, ঘরের জানালার কাছে গিয়েও দাঁড়াতে চায় না আত্রেয়ী।

হেমন্তর একটা চিঠিকে বার বার দশবার পড়েছে আত্রেয়ী। "দেখতে না এসে ভালই করেছ। একটা চোখের দেখা দিয়ে তুমি তখুনি চলে যেতে ; সে যে আমার পক্ষে কী কষ্টের ব্যাপার হত, তুমি বুঝতে পারবে কিনা জানি না।"

চিঠির দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর চোখ দুটো অদ্ভুত বিস্ময়ে দুটো আলো হয়ে জ্বলজ্বল করে। চিঠি নয় ; হেমন্ত যেন নিজেই এসে আর কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

চিঠি দিয়ে চোখ ঢেকে তখনি আবার ছটফট করেছে আত্রেয়ী : চাপা নিঃশ্বাসটা ফিসফিস করে কথা বলেও ফেলেছে—এতই যদি কষ্ট হয়, তবে পাঁচিল টপ্‌কে পালিয়ে এলেই তো পার।

কাকিমা ডাক দিয়েছেন—এদিকে একবার আয়, আত্রেয়ী।

অনেক রাতেও বিছানার উপর বসে জপ করেন যিনি, আর চোখে ভাল দেখতেও পান না, সেই মণিদিদাও এক মাঝরাতে হঠাৎ ডাক দিলেন—ও হেমি, ও সুহাস, তোমরা ঘুমোচ্ছ কোন সুখে ? দেখতে পাচ্ছ না ?

আত্রেয়ীর মা আর কাকিমা জেগে ওঠেন—কী দেখতে বলছ মাসি ?

—ওঘরে কে যেন জেগে বসে আছে।

—তাই তো !

হৈমবতীর শ্বাসকষ্টের ব্যথাটা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে পারে ; তাই হৈমবতী বলেন—আমি যাব না, তুমি একবার গিয়ে দেখে এসো, সুহাস।

আলো জ্বলছে। বাক্সের ভিতর থেকে হেমন্তের একটা ফটো বের করে নিয়ে টেবিলের উপর রেখেছে আত্রেয়ী। ঘরের ভিতরে যেন ভয়ানক একটা ঠাট্টার ভাষা রাগ করে বিড়বিড় করছে—বাঃ, বেশ কাণ্ড করলে !

আত্রেয়ীর মাথায় হাত রাখেন কাকিমা—ছিঃ, তুই না বলেছিস, রাগ করবি না। যাবার আগে হেমন্ত তোকে রাগ করতে মানা করে গিয়েছে।

আত্রেয়ী—আমি তো ওর ওপর রাগ করছি না। আমার নিজেরই ওপর রাগ হচ্ছে।

আত্রেয়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে আদরের সুরে কথা বলেন কাকিমা—কেন রে আত্রেয়ী, বল আমাকে, কী মনে হচ্ছে ?

—সে কি এখন চাদরপাতা বিছানায় পড়ে ঘুমোচ্ছে ? ঘুমোতে পারছে ? তোমাদের যত মুড়ির মোয়া আর সন্দেশ খাচ্ছে ? সাবধান, আমাকে কাল থেকে চা খেতে দেবে না। আমাকে সাজতে বলবে না।

—চুপ কর, চুপ কর। আত্রেয়ীর মাথাটাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেন কাকিমা।

সরিয়াড়ির শীতের হাওয়া যেমন শুকনো তেমনই কনকনে ; মানুষের চোখ-মুখ রুক্ষ করে দেয়। কিন্তু সে রুক্ষতা আত্রেয়ীর চেহারাটাকে বড় বেশি উদাস করে দিয়েছে। চোখ দুটো এত শান্ত আর মুখটা এত গম্ভীর যে দেখে মনে হয়, ওর মনের গায়েও খড়ি পড়েছে। চিনুর পিসিমা তাই মনে করেন ; কিন্তু কাকিমা বলেন—না, দিদি। প্রায় একুশ বছর বয়স হল মেয়েটার ; সবই বুঝতে পারি।

একটা গল্পের বই হাতে নিয়ে ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে আছে বলেই কি বই পড়ছে আত্রেয়ী ? কাকিমা ওর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝে নিয়েছেন আর সরে গিয়েছেন।

বীরনগরের মামার বাড়ির উঠোনের সেই আলপনার উপর কে-যেন হলুদ-গুঁড়ো দিয়ে বড়-বড় প্রজাপতি এঁকে রেখেছে। তার গায়ের চাদরে গোলাপ আতরের গন্ধ। কপালের কাছে একটা দাগ। দিব্যি হেসে হেসে বলে দিল, ওটা ডাকাতের লাঠির দাগ। রাধাপুরের সে-বাড়ির ঘরে টেবিলের উপর সাদা পাথরের থালাতে গোলাচন্দন ভাসছে। দীঘির ধারে বাজি পুড়ছে ; চমকে উঠছে নীল-লাল আলোর ঝলক। হঠাৎ এসে কানের কাছে ফিসফিস করে বলে গেল।—তোমার মামার অত বড় চিঠি পড়েও বুঝতে পারিনি যে, তুমি এত সুন্দর।

আত্রেয়ীর মুখটা যে সত্যিই চমকে ওঠে আর অদ্ভুত একটা লাজুক হাসির আভায় রাঙা হয়ে যায়।

বই রেখে দিয়ে, শক্ত করে বাঁধা রুক্ষ খোঁপাটাকে এক টানে ধসিয়ে দিয়ে বিনুনী ভাঙতে থাকে

আত্রেয়ী। চোখের পাতাও বেশ ভারী হয়ে নুয়ে পড়ছে।

ঠোঁটের ফাঁকে একটা দুরন্ত অভিমানের ভাষা কেঁপে উঠতে চাইছে—কিন্তু তোমার পাঁচ বছর শেষ হবে কবে ? আমি মরবার পর ?

আয়নাতে আর দেখতে হবে কেন ? সেদিনও হাতের কাছে আয়না ছিল না। বেশ বুঝতেই পারা যাচ্ছে, ভিজে গিয়েছে ঠোঁট আর লালচে হয়ে ফুলে ফুলে কাঁপছে। একটুও লজ্জা নেই ভদ্রলোকের : নিজেই আবার হাত বুলিয়ে অচেনা মেয়ের সেই মুখটার সব ভয় মুছে দিল।

জেলের অফিস চিঠি খুলে পড়ে : তা না হলে বেশ স্পষ্ট করেই লিখে দিতে পারা যায়, সব ভুলে গেলে কেন ?

কাকিমা ডাক দিয়ে বলেন—চিঠি এসেছে, আত্রেয়ী।

হেমন্তের এই চিঠির অনেক কথার মধ্যে আত্রেয়ীর জীবনের এই নালিশটারও একটা জবাব যেন আছে।—আর কী লিখব ? যা লিখতে ইচ্ছে করছে তা'ও ইচ্ছে করেই লিখলাম না। তুমি বুঝে নিও।

বিকেলবেলা বাইরের বারান্দায় নিথর হয়ে বসে আত্রেয়ীর মা'র সঙ্গে একদিন অনেক কথা বললেন প্রদোষ সরকার।—মেয়েটাকে একটু বুঝিয়ে বলো ; বাড়ির বাইরে গিয়ে একটু ঘোরা-ফেরা করুক। আগের মত ঘরের কাজ-টাজ করুক।

—অনেক বুঝিয়েছি।

—এই তো, দেখতে দেখতে তিনটে বছর কেটে গেল ; আর দু'বছর পরেই তো...।

আত্রেয়ী এসে প্রদোষবাবুর চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে।—কী রে ? মেয়ের পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে প্রদোষবাবু হাসতে থাকেন।—এই তো এইরকম শান্তটি হয়ে থাকবি, তবেই না...।

আত্রেয়ী—জেলারের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠাতে হবে, বাবা।

—অ্যাঁ ? কিসের দরখাস্ত ?

আত্রেয়ী—ওকে যেন ঘানিতে খাটিয়ে কষ্ট না দেয়।

—আরে না না ; হেমন্তকে ওরকম সাংঘাতিক কোনও কাজ করতেই হয় না। তোর কান্তি মামা তিনবার দেখা করে এসেছে। প্রথম একটা বছর অবিশ্যি একটা খাটুনির কাজ করতে হয়েছিল, বাগানের কাজ করতে হয়েছিল। এখন জেল হাসপাতালের কাজ, শুধু একটা খাতা লিখতে হয়।

আত্রেয়ীর মা বলেন—তা ছাড়া, তোর মামা আরও ব্যবস্থা করেছে। হেমন্তকে এক ঝুড়ি আম পাঠানো হয়েছে। তুই সে খবর জানিস না ?

আত্রেয়ী—কেমন করে জানব ? তোমরা বলনি, সে'ও কিছু লেখেনি।

প্রদোষবাবু—কিন্তু ভাল আছে হেমন্ত। ভাববার কিছু নেই। তাই তোকেও বলছিলাম...।

আত্রেয়ী—কী ?

প্রদোষ—তুইও একটু কাজ-টাজ নিয়ে থাক। একটু বাইরে ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে ; অ্যাঁ ? কে ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে ? মেয়েটি হাত তুলে তোকেই ডাকছে বলে মনে হচ্ছে।

ফটকের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে আত্রেয়ী। সত্যিই যে তিনজন অচেনা মানুষ রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে প্রদোষ সরকারের বাড়ির এই বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আত্রেয়ীর মা বললেন—হয় ওঁদের এখানে আসতে বলো, নয় তো গিয়ে শুনে আয়, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—আমি পারব না। তুমি যাও।

আত্রেয়ীর মা এগিয়ে যেয়ে ডাকেন।—আসুন।

মেয়েটি বারান্দায় উঠেই হাসতে থাকে।—আমরা এখানে নতুন এসেছি। ইনি আমার বড় বউদি, ইনি মেজদা। আমরা মাত্র দুটি মাস থাকব।

প্রদোষবাবু—কোথায় উঠেছ তোমরা ?

—আমরা আছি শ্রীলেখা কটেজে, সাতদিন হল আছি। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলব।

ছটফটে খুশির ফোয়ারার মত কলকল করে হেসে, আত্রেয়ীর কাছে এগিয়ে আসে মেয়েটি ; আত্রেয়ীর একটা হাতও ধরে ফেলে।—সাত দিন ধরে ঘুরছি, কিন্তু এই প্রথম একটি চমৎকার শ্রীর

সাক্ষাৎ পেলাম। আপনাকে দেখে খুব আশ্চর্য লাগল ; তাই না ডেকে থাকতে পারলাম না। তা ছাড়া, লোকের গায়ে পড়ে ভাব করা আমার স্বভাবও বটে।

আত্রেয়ী—বসুন।

—না, না, এখন বসব না ; আজ শুধু আপনাকে একটু চিনে গেলাম, আর চেনা দিয়ে গেলাম। আমার নাম মঞ্জু।...আচ্ছা, চলি। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

প্রদোষবাবু, আত্রেয়ীর মা আর আত্রেয়ীকে লক্ষ করে তিনটে নমস্কারের ভঙ্গি ছুঁড়ে দিয়েই চলতে শুরু করে মঞ্জু, সেই সঙ্গে মঞ্জুর বড় বউদি আর মেজদা।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির কাঁটালতার ফড়িং তিড়বিড় করে উড়তে থাকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় মঞ্জু। মুখ ফিরিয়ে আর আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে।—ফুল নেব ? আপনাদের এই লতার লাল ফুল ? আচ্ছা থাক ; কাল খুব ভোরে যখন বেড়াতে বের হব, তখন নিয়ে যাব। নিশ্চয়। মনে রাখবেন কিন্তু।

॥ ৫ ॥

বেশ বড় একটা রুমাল দিয়ে আলগা করে জড়ানো একগাদা লাল ফুল। কাঁটালতার ফুল বটে, কিন্তু বেশ মিহি-মিষ্টি একটা সুগন্ধও আছে। রুমালের চার কোণের মুখ টিলে গিঁট দিয়ে একসঙ্গে এমন করে বাঁধা হয়েছে, দেখে মনে হবে, ওটা একটা ফুলের সাজি। রুমালের কোণে হলদে সুতোয় আঁকা নামটাও আছে—আত্রেয়ী। ভালই তো। জানুক মঞ্জু ; এবাড়িতে হঠাৎ এসে যার হাত ধরে হেসে-হেসে এত কথা বলে গেল মঞ্জু, তার নাম আত্রেয়ী।

বলেছিল মঞ্জু, খুব ভোরেই ওরা বেড়াতে বের হবে, আর এই রাস্তা দিয়েই যাবে ; যাবার সময় ফুল নিয়ে যাবে।

কিন্তু এখন তো আর খুব-ভোর নয়। আকাশে এখনও একটু মেঘলা ভাব আছে বলেই সকালবেলার রোদ চাপা পড়ে আছে। নইলে এতক্ষণে সরিয়াডির আশ্বিনের এই সকালবেলার কাঁচাসোনা রঙের রোদ এতক্ষণে ছড়িয়ে গড়িয়ে কোথায় না চলে যেত। মহাদেও পাঁড়ের পোষা পায়রার ঝাঁক উড়ে এসে ওই খেলার মাঠের ঘাসের উপরে হুটোপুটি করত।

ছি ছি, এ কেমন ভুল হল ? কী কথা জিজ্ঞেস করলেন জ্যাঠামশাই ; আর, কী কথাই না তাঁকে বলা হল !

মনে পড়েছে আত্রেয়ীর, চন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার হাতে ওটা কী ? বলে দিলেই তো হত, ওটা এবাড়ির লতার ফুল ; একটি মেয়ে নিজেই যেচে এই ফুল চেয়েছে।

জ্যাঠামশাই সত্যিই কি অনেকদূর চলে গিয়েছেন ?

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার উপর দাঁড়ায় আত্রেয়ী ; তার পর, আরও ব্যস্ত হয়ে, বাগান থেকে নেমে আর সোজা হেঁটে, একেবারে ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এসে দাঁড়ালেই বা এদিকের আর ওদিকের রাস্তার কত দূরের কতটুকু দেখতে পাওয়া যায় ? কিছুই না।

ফটকের মুখে তারের জাল লাগানো তিন কাঠের একটি বেড়া ; যেমন ছোট তেমনই হালকা। আস্তে একটু ঠেলা দিতেই, যেন ছোঁয়া মাত্র খুলে গেল আর সরে গেল ফটকের এই তিন কাঠের বেড়া। হেসে ফেলে আত্রেয়ী। সত্যিই তো, ফটকটা একটু আশ্চর্য না হয়ে পারবে কে ? তিন বছর পরে এই প্রথম বাড়ির বাইরে যাবার জন্য ফটকের তিন-কাঠের বেড়াটাকে আত্রেয়ী আজ ছুঁয়েছে।

কোথায় জ্যাঠামশাই ? একটি কম্বলের ওভারকোট মোষের শিঙের লাঠি দুলিয়ে চলে যাচ্ছে, এমন মূর্তি রাস্তার কোনও দিকেই দেখা যায় না।

কিন্তু মঞ্জু এলেই তো হয়। শ্রীলেখা কটেজও তো এখান থেকে এমন কিছু দূরের বাড়ি নয়। বেশ মেয়ে মঞ্জু · ওর প্রাণটা যেন আলো-বাতাসের সঙ্গে হেলে-দুলে আর নেচে নেচে বেড়াতে চাইছে। মাত্র একমাসের জন্যে এসেছে ; হেসে-খেলে ফুল কুড়িয়ে, আর শালবনের হরিণ দেখে

হাততালি দিয়ে একদিন চলে যাবে। ভালই তো! হাওয়া-বদলের মানুষগুলিকে কেন যে এত নিন্দে করেন হাবুলকাকা আর দিবাকরদা, কোনও মানে হয় না।

খেলার মাঠের উপর মহাদেও পাঁড়ের পায়রার ঝাঁক উড়ছে। মাঠের ভেজা ঘাসের উপর রোদের আলো চিকচিকিয়ে জ্বলছে। শ্রীলেখা কটেজের মঞ্জু এল না ; যদিও এই রাস্তা ধরেই হাওয়া-বদলের অনেক আগন্তুক মানুষ তিরছি নদীর দিকে বেড়াতে চলে গেল।

—আত্রেয়ী যে ; পিছন দিক থেকে হেসে যেন একটি ঝলমলে খুশির বিস্ময় আত্রেয়ীকে ডাক দিয়েছে আর এগিয়ে আসছে। এসেছেন বীণাদি। কালীবাড়ি রোডে হাজারিবাগের গুপ্তবাবুদের যে হলদে রঙের বাড়িতে বাড়ি-তৈয়ারি ঠিকেদারির লোহালক্কড় থাকে, তারই বাইরের দিকের একটি ছোট ঘরে চারটি বেঞ্চ, একটি টেবিল ও একটি চেয়ার আছে। ওই, ওরই নাম হল অন্নদা কিণ্ডারগার্টেন। সরিয়াডির উপকারের জন্য গুপ্তবাবু তাঁর মা'র নামে একটি দানের ফাণ্ড করেছেন ; সেই ফাণ্ড বীণাদিকে কুড়ি টাকা মাইনে দেয়। সরিয়াডির কে না চেনে বীণাদিকে ? তিনি ওই অন্নদা কিণ্ডারগার্টেনের টিচার দিদি।

বীণাদি হাসেন।—যাক, দেখে খুশি হলাম তুমি নিজেই বেরিয়েছ ; আমি ঠিক করেছিলাম, আমিই তোমাকে ঘরের বার করে ছাড়ব।

আত্রেয়ীও হাসে—বিনা দোষে কেন এত ধমকাচ্ছেন বীণাদি ? আমি কি এখনও আপনার কিণ্ডারগার্টেনের মেয়েটি ?

বীণাদি—একশো'বার। কী ভেবেছিস তুই, দমবন্ধ করে আত্মহত্যা করবি ? আর, আমি তাই চুপ করে দেখব ? তা হবে না।

—কিন্তু কী হবে তা হলে ?

—সে কথাই বলতে এসেছি প্রদোষদাকে ; ও প্রদোষদা ? কোথায় আপনি ? আমি বীণা।

দুই ক্রাচের উপর ভর দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন প্রদোষ সরকার। খোঁড়া মানুষ প্রদোষ সরকারও যেন ছুটতে চাইছেন। দুই চোখে অদ্ভুত এক খুশির বিস্ময় উথলে উঠেছে। ফটকের বাইরে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে বীণা হাসছে ; আত্রেয়ীও হাসছে ; তিন বছর পরে সত্যিই যে সূর্য উঠেছে বলে মনে হচ্ছে।

বীণাদি বলেন—শুনে খুশি হবেন প্রদোষদা, আমার বিকাশ জামালপুরের কারখানায় চাকরি পেয়েছে। আর তো আমি আপনাদের সরিয়াডিতে পড়ে থাকতে পারি না, আমাকেও যেতে হচ্ছে। ছেলের কাছেই থাকতে হবে।

প্রদোষবাবু—কী সৌভাগ্য, বেঁচে থাক আপনার বিকাশ। বিকাশের আরও উন্নতি হোক।

বীণাদি—গুপ্ত বাবু এসেছেন ; আমি এখনি গিয়ে তাঁকে বলতে চাই, এবার আত্রেয়ীই অন্নদা কিণ্ডারগার্টেনের দিদি হবে। মাইনে কুড়ি টাকা ; আমি যা পাচ্ছিলাম আত্রেয়ীকেও তাই দিতে হবে।

প্রদোষবাবু—বলুন, বলুন। আর আপনার ছাত্রীকেও একটু বুঝিয়ে বলুন।

আত্রেয়ী হাসে—আর বোঝাতে হবে না ; কিন্তু আমার বিদ্যে তো সীতার বনবাস পর্যন্ত ; আমি পারব ?

বীণাদি—আমার বিদ্যে যে সাত ভাই চম্পা জাগোরে পর্যন্ত! আমি পারলুম কী করে ? অন্নদা কিণ্ডারগার্টেনের জন্য এর চেয়ে বেশি লাগে না।

আত্রেয়ী—বেশ তো, এখন কী করতে হবে, বলুন ? যেতে হবে ?

বীণাদি—না ; আজ তোমার নামে গুপ্তবাবুর চিঠি আসবে ; কাল থেকেই কাজ শুরু করবে। গরমকালে সকালবেলায়, শীতকালে দুপুরে ; রোজ তিন ঘণ্টা। চলি।...তোর হাতে এটা কী ?

বীণাদি হাঁটতে শুরু করেন।—বাঃ, আবার ফুলটুল ছুঁতে শুরু করেছিস তা হলে। খুব ভাল ; রোজ ফুল তুলবি।

আত্রেয়ীও বীণাদির সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে কয়েক পা এগিয়ে যায়।—শ্রীলেখা কটেজ তো আপনার বাড়ি যেতেই পথে পড়বে।

—হ্যাঁ।

—আপনি যদি কষ্ট করে সে-বাড়ির মেয়েটিকে......

—কে ? মঞ্জু ?

—হ্যাঁ। আপনি চেনেন ?

—খুব চিনি। আলাপ হয়েছে। নিখিলের বোন মঞ্জু। নিখিলের বউদি প্রীতি। নিখিলের দাদা অখিলবাবু। চা বাগান আছে, চা-বাগানের শেয়ার আছে। বেশ সুখী মানুষ ওরা। দুঃখের মধ্যে, শুধু বেচারা অখিলবাবুর স্বাস্থ্যটা। সরিয়াডির হাওয়াতে বাত সারবে বলে মনে হয় না।

আত্রেয়ী—মঞ্জু ফুল চেয়েছিল। বলেছিল, আসবে। কিন্তু এল না। তাই বলছিলাম... !

বীণাদি—আমাকে আর অত সোজন্যি করে বলতে হবে না। দে তোর ফুল, আমিই মঞ্জুর হাতে পৌঁছে দেব। তোকে ভাবতে হবে না।

চলে গেলেন বীণাদি। রাস্তার কিছুদূরে এগিয়ে যেয়েই মুখ ফিরিয়ে বলেন—মেয়েটাকে একটু ধমকে-টমকে দেব নাকি ? কথা দিয়ে কথা রাখে না। এ কেমন অদ্ভুত মেয়ে ?

আত্রেয়ী হাসে—না না, ওসব করবেন না। সবাই আপনার কিণ্ডারগার্টেনের ছাত্রী নয়।

বীণাদি—আমি কিন্তু চেঞ্জার মেয়েগুলোকেও ছেড়ে কথা বলি না। তোরাই যত লাই দিস।

গুপ্তবাবুর চিঠি এল সন্ধ্যাবেলা। আত্রেয়ীর জীবনে বাইরের কাজের এই মন-হাসানো পালা শুরু হল পরের দিন, ঠিক সকাল আটটায়। আত্রেয়ীদি অন্নদা কিণ্ডারগার্টেনের নতুন টিচারদিদি হয়েছেন একথা এরই মধ্যে শুনে ফেলেছে সন্তুটা। বই-এর ব্যাগ পিঠের উপর ঝুলিয়ে আর ঠিক সময় বুঝেই সন্তুটা এসে এবাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছে ; চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছে—আত্রেয়ীদি ; এসো।

আত্রেয়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে ছোট্ট সন্তু। পিঠের ওপর বইয়ের বোঝাটা খুব ছোট নয় ; বেশ একটু কুঁজো হয়ে, নতুন জুতোর শব্দ মচ্‌মচ্ করে বাজিয়ে সন্তু যেন রুট মার্চের সোলজারের ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে। পকেট থেকে চট করে একটা মাউথ অরগ্যান বের করে মুখের কাছে তুলে ধরে আর তালে তালে গৎ বাজাতে থাকে সন্তু—আযা লেযা রাজা মামা ! খাযা সোযা রেগা গামা !

আত্রেয়ীর মুখের হাসিটা অদ্ভুত হয়ে ছটফটিয়ে ওঠে। —আঃ কী করছ সন্তু ?

বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে কাকিমাও হাসতে থাকেন।

রজনীধাম পার হয়ে বড় রাস্তার উপরে উঠে চলতে গিয়েই চমকে ওঠে আত্রেয়ী। পিছন থেকে একটা গাড়ির হর্ন খুব জোরে বেজে উঠেছে। রাস্তার এক পাশে সরে যায় আত্রেয়ী আর সন্তু। গাড়িটা কিন্তু আর স্পিড নেয় না ; বেশ আস্তে আস্তে চলতে থাকে। গাড়ি চালাচ্ছেন যিনি, তিনি এক হাতে স্টিয়ারিংয়ের চাকা ধরে রেখে, আর একজোড়া অপলক চোখ তুলে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

সন্তু ফিসফিস করে। —ফণী মিত্র, ক্যালকাটা।

জোরে স্পিড নিয়ে আর কাঁকরের গুঁড়ো উড়িয়ে ছুটে চলে গেল হুডখোলা গাড়িটা।

পরিপাটি প্লাস ফোর, খাঁটি সাহেবি সাজের একটি মানুষ বয়স চল্লিশের বেশি নয় বোধ হয় ; হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকালেন আর পাইপ ধরালেন।

সন্তু ফিসফিস করে। —জগৎ ব্যানার্জি, মিডনাপোর।

সন্তু না বলে দিলেও আত্রেয়ীর বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই, এরা, যাদের অপলক চোখের দৃষ্টি আত্রেয়ীকে একটা অদ্ভুত আবির্ভাব বলে মনে করছে, তারা সরিয়াডির কেউ নয়। এরকমের আরও অনেক বিস্ময়ের চাহনিকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে হল। যাচ্ছিলেন দু'জন তরুণী, তাঁদেরই মধ্যে একজন চোখ টান করে আর আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেই ফেললেন—ইনি আবার কে ?

লালপেড়ে ঘিয়ে রঙের শাড়ি ; খোঁপাটা ঢিলে করে বাঁধা, গলায় শুধু সোনার একটা সরু সুতলি চেন তার সঙ্গে জোড়ামুক্তোর একটা লকেট। পায়ে একজোড়া ফুলকারি চটি। এই তো সাজ। তবু আত্রেয়ীকে একটা রূপের বিদ্যুৎ বলে ওদের মনে হয়েছে, তা না হলে ওদের চোখের চাহনিতে আর মুখের ভাষায় বিস্ময়ের চমক ঝলসে উঠবে কেন ?

অন্নদা কিণ্ডারগার্টেন। চারটি ছোট বেঞ্চিতে ত্রিশটা বাচ্চা ছেলেমেয়ের বসতে অসুবিধে আছে ; কিন্তু ঘরের সামনে খোলা জমিটার উপর ছুটোছুটি করতে কোনও অসুবিধে নেই। যেমন চিনুর

বয়সের মেয়ে আর সন্তুর বয়সের ছেলে আছে ; তেমনই ওদের চেয়ে অনেক ছোটও কয়েকজন আছে। সন্তুর ব্যাগের ভিতর যেমন সেলেট, বই, লাট্টু, মার্বেলগুলির ডিবে আর কাঠের বাঘ ; তেমনই বুলুর হাতে একেবারে কিছুই না, একটা সেলেটও না।

তিন ঘণ্টার আগেই কিণ্ডারগার্টেনের কলরবের ক্লাস বন্ধ করে দিতে হল ; নইলে বুলু ঘুমিয়ে পড়বে।

বাড়ি ফেরবার পথে সন্তু আর আত্রেয়ীর সঙ্গে নেই। সন্তু তার লাট্টু নিয়ে ব্যস্ত। কখনও অনেক পিছনে পড়ে থাকে, কখনও আবার ছুটে ছুটে এগিয়ে যায়।

বেলা হয়েছে। মাইকা কুঠির এগারোটার ঘণ্টা এখনও অবিশ্যি বাজেনি, কিন্তু সরিয়াডির রোদ বেশ তেতে উঠেছে।

কত নতুন মুখ। এ বছর হাওয়াবদলের লোক খুব বেশি এসেছে বলে মনে হচ্ছে। অনেক বেড়িয়ে এইবার ওরাও বাড়ি ফিরছে ; চেষ্টা করে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা বাড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে এক-একটি ক্লান্ত আনন্দ।

আত্রেয়ীও তিন ঘণ্টার পর বাড়ি ফিরছে ; আত্রেয়ীর সামান্য ক্লান্ত চেহারাটা তবু যেন একটা অটুট ফুল্লতা। আত্রেয়ীকে দেখে কয়েকটি যুবক বিস্ময়ের দৃষ্টিও তাই ক্লান্তি ভুলে গিয়ে চমকে ওঠে। শালবনের সবুজের দিকে, আর তিরছি নদীর জলের স্রোতের দিকে তাকাবার সময় ওদের চোখের ক্ষুধা আর তৃষ্ণাও বোধ হয় ঠিক এইরকম চমকে উঠে। শুনতেও পায় আত্রেয়ী, একেবারে কাছে এসে পড়েছে যে কলরবের দল, তারই মধ্যে একটা কথা শব্দ করে হেসে উঠলো—সরিয়াডির মায়াহরিণী।

॥ ৬ ॥

একটি মাসও সময় লাগেনি, সরিয়াডির যত হাওয়া-বদলের অস্থায়ীরা যেটুকু জেনেছেন তাতেই বুঝে ফেলেছেন যে, এখানে স্থায়ীদের একটি বাড়িতে এক অসাধারণী আছেন, যাঁর সঙ্গে স্বামীর কোনও সম্পর্ক নেই। প্রদোষ সরকার নামে একজন স্থায়ী বাসিন্দা আছেন ; গরিব মানুষ, তার উপর একটি পা নেই। মেয়ে আত্রেয়ী কিন্তু একুশ বছর বয়সের একটি অদ্ভুত-সুন্দর চেহারা নিয়ে বারো বছর বয়সের খুকিটির মত হেসে খেলে ছুটোছুটি করেন, যদিও উনি কিণ্ডারগার্টেনের টিচারদিদি। জেলে আছে এই আত্রেয়ীর স্বামী ; কিন্তু স্বামীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবার কোনও চাড় নেই এই মেয়ের প্রাণে কিংবা মনে ; দেখাসাক্ষাৎ করেনও না। খোঁপাটাকে সব-সময় একটু উসকো খুসকো করে রাখেন, আর খুব সরু করে আঁকা গুঁড়ো সিঁদুরের একটা সিরসিরে দাগও সিঁথিতে থাকে : বাস, ওই পর্যন্ত।

সাবধান হয়েছে সরিয়াডির দিবাকর, আর বলাই নরেন ও পরেশ। দিবাকরের সন্দেহ, ওরা একটু বাড়াবাড়ি করবে বলে মনে হচ্ছে। আত্রেয়ী শেষে ভয় পেয়ে আর রাগ করে রাস্তায় বের হওয়াই বন্ধ করে দেয় বোধ হয়।

অস্থায়ী পাগলের ঘুসি খেয়ে কপালে কালশিরে পড়েছে যার , সেই নরেন ওই কালশিরের জন্যে একটুও দুঃখিত নয়। পাগলের ঘুসির আঘাত নরেনের মনে লাগেনি। কিন্তু ফণী মিত্রের গাড়ির হর্ন যার শব্দ শুনে চমকে উঠে রাস্তার এক পাশে সরে গিয়েছে আত্রেয়ী, সেই হর্ন যেন সরিয়াডিকে অপমানিত করবার একটা দুঃসাহসের উল্লাস। দৃশ্যটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজেরই চোখে দেখতে পেয়েছিল নরেন।

নরেন বলে—আত্রেয়ীদি একবার বললেই তো পারেন। তারপর দেখে নেব, ফণী মিত্রের গাড়ির হর্ন, কেমন করে বাজে ?

দিবাকর বলে—আত্রেয়ী অবিশ্যি ওদের ফষ্টিনষ্টিকে গ্রাহ্য করে না। একবার তাকিয়েও দেখে না। নিজের মনেই হাসতে হাসতে চলে যায়।

বলাই বলে—তাই ভাল ; আত্রেয়ী ওদের ঘেন্না করে হেসে হেসেই উড়িয়ে দিক। ওরা ওতেই

সব চেয়ে বেশি জব্দ হবে।

দিবাকর—তা তো হবে ; কিন্তু ওদের আর একটু শক্ত শিক্ষা পাওয়া উচিত ছিল।

পরেশ—গোষ্ঠকাকা কী বললেন ?

দিবাকর হেসে ফেলে।—গোষ্ঠকাকা বললেন, না, গোলমাল করবার কোনও দরকার নেই। আত্রেয়ী তো কণিকা ভরদ্বাজ নয় ; টলমল স্বভাবের মেয়েও নয়।

অস্থায়ীরা সে খবর রাখে না ; কিন্তু স্থায়ীদের কে না জানে যে, আত্রেয়ী একটি অটলতা। আত্রেয়ীর একুশ বছর বয়সের জীবনের সব ইতিহাস জানেন যাঁরা, যেমন চিনুর পিসিমা আর সন্তুর মা ; তাঁরাও বলবেন, আত্রেয়ী একটি অটলতা।

খোঁড়া মানুষ প্রদোষ সরকার এক পায়ে হাঁটতে গিয়েও টলেন না। ষাট বছর বয়সের মানুষটির হাতের পেশিতে পুরনো জিমনাস্টিকের দান, সেই শক্ত-পোক্ত বাঁধুনি এখনও এমন কিছু নেতিয়ে পড়েনি। তাঁরই তো মেয়ে আত্রেয়ী। মেয়েটার ভাগ্যটাই হঠাৎ পড়ে গিয়ে একটু খোঁড়া হয়েছে, এই মাত্র। কিন্তু সেজন্যে আত্রেয়ীর প্রাণটাও টলে মলে যেখানে সেখানে যার-তার কাছে পড়ে যাবে, তেমন প্রাণই তৈরি করেনি আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর কথা সরিয়াডির স্থায়ীদের জীবনের গল্পের আসরেও যেন একটা অটল গর্বের কথা।

কিন্তু একটি মাস পার হয়ে গেলেও দেখা যায়, হাওয়া-বদলের আনন্দের কয়েকটা গাড়ি প্রদোষ সরকারের বাড়ির সামনের ছোট রাস্তাতে বড় বেশি ছুটোছুটি করে। অন্নদা কিণ্ডারগার্টেনে সামনের রাস্তাতেও দু তিনটে জটলা মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আর অনেক হাসাহাসি করে।

একটি গাড়ি একদিন সন্ধ্যায় প্রদোষ সরকারের বাড়ির সামনেই হঠাৎ থেমে যায়। গাড়ি থেকে নামেন যিনি, খাকি জিনের ব্রিচেস পরা আর হাতে রাইফেল, অল্পবয়সের এক শৌখিন শিকারি ভদ্রলোকের মূর্তি, তিনি চাকর রামুয়ার দিকে হাতে নেড়ে ইশারা করেন—এক গেলাস জল।

ঘরের ভিতরে বসেই শুনতে পায় আর দেখতে পায় আত্রেয়ী, জল খেয়ে নিয়েই ভদ্রলোক কেমন যেন জড়ানো স্বরে রামুয়াকে বলেন—বাহবা বাহবা! সরিয়াডির জল! কোথায় লাগে হুইস্কি!

বিড়াল ছানা নিজের লেজের সঙ্গে খেলা করছে দেখতে পেয়ে চিনু যেমন চেঁচিয়ে হেসে উঠে, আত্রেয়ীর মুখেও তেমনই একটা হাসি চেঁচিয়ে উঠতে চায়। ভিতরের ঘরে গিয়ে কাকিমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে আত্রেয়ী—এবার সরিয়াডিতে কত অদ্ভুত রকমের মানুষ এসেছে, কাকিমা।

আরও অদ্ভুত ব্যাপার ; একদিন সকাল বেলা অত বড় হাওয়াইয়ের নাগসাহেব নিজেই প্রদোষ সরকারের এই এত ছোট বাড়িতে হাজির হলেন। বারান্দার চেয়ারে বসা প্রদোষ সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ স্পষ্ট ভাষায় কয়েকটি কথা বললেন।—আমি শুনেছি, আপনি এখানকার খুব পুরনো লোক ; আপনার অবস্থা ভাল নয়। আমার বাড়িতে রান্নার কাজের জন্য একটি মেয়ে চাই। কুড়ি টাকা মাইনে পাবে। কিন্তু চুরি-টুরির অভ্যেস যেন না থাকে।

প্রদোষবাবু ডাকেন—রামুয়া।

রামুয়া বলে—হ্যাঁ, রান্নার লোক পাওয়া যেতে পারে। লছমন ঠাকুর কাজ খুঁজছে।

—নো! নো লছমন ঠাকুর। গম্ভীর স্বরে রামুয়াকে ধমক দিলেন নাগসাহেব।

অপ্রসন্ন ভাবে প্রদোষ সরকারের কাটা পায়ের দিকে যেন সামান্য একটা ভ্রূক্ষেপ করেই চলে গেলেন নাগসাহেব।

মিডনাপোরের জগৎ ব্যানার্জি একদিন সকালে রজনীধামের কাছে রাস্তার উপরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়েই মাথার টুপি ছুঁয়ে সুপ্রভাত জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেও ফেললেন—আপনার বাবার সঙ্গে একটু আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কখন...।

আত্রেয়ী বলে—বাবা সব সময়েই বাড়িতে থাকেন। যখন ইচ্ছে হয় গেলেই দেখা পাবেন।

এগিয়ে যায় আত্রেয়ী। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়। সাইকেল থেকে নামছেন দিবাকরদা।

দিবাকরের চোখের ভঙ্গিটা বেশ শক্ত, আর বেশ শক্ত স্বরে যেন দাঁত চিবিয়ে কথা বলে দিবাকর—কী রে আত্রেয়ী ? কেমন আছিস ?

আত্রেয়ী হাসে—খুব ভাল আছি দিবাকরদা। বউদি কেমন আছেন ?

—হঠাৎ দেখা হল বলে বউদির কথা জিজ্ঞেস করছিস, কেমন ? গিয়ে দেখে এলি না তো একটি দিনও।

—যাব, নিশ্চয় যাব।

—আজকাল আর রাত জেগে সেলাই টেলাই করে না তোর বউদি। চোখে ভালই দেখতে পাচ্ছে। সে কথা থাক, আমি জানতে চাই, ওই সাহেবটিকে তুই চিনিস নাকি ?

—না।

—লোকটা কী বললে তোকে ?

—বাবার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

—আচ্ছা ! ঠিক আছে ! যা, তুই তোর কিন্ডারগার্টেন করগে যা। আমি চলি।

বিড়বিড় করে যেন একটা রাগ চাপতে চেষ্টা করেই সাইকেলে উঠে পড়ে দিবাকর।

গোষ্ঠবাবু বললেন—একটু ওয়াচ কর, বাস, আর বেশি কিছু করতে হবে না।

হাবুলবাবু বলেন—সামান্য কারণে গোলমাল বাধিও না, দিবাকর। অসহ হলে আত্রেয়ী নিজেই বলবে ; তখন না হয়...।

পরেশ বলে—ওসব মতলবকে আত্রেয়ীদি নিজেই লাথি মেরে সরিয়ে দিতে জানেন।

সেকথা সবাই জানে, দিবাকর জানে। সেকথা সরিয়াডির প্রাণের একটি কঠিন ও অনাহত বিশ্বাস। তবু, দিবাকর মনে করে, আত্রেয়ীর মত মেয়ের সঙ্গে ওরকম ছোটলোকের মত ব্যবহার করা ওদের পক্ষে একটুও উচিত হচ্ছে না। একদিন, অন্তত একটিবার, অন্তত একজনকে একটু টিপুনি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেই ভালো হত ; তাতে অন্যগুলোও সাবধান হয়ে যেত।

হাবুলবাবু বলেন—যা ভাল মনে কর, তাই করো। তবে তোমরাও বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলো না।

খোলার মাঠের উপর একদিন বিকেলের রোদে পাখা নরম করে নিয়ে মহাদেও পাঁড়ের পায়রার ঝাঁক যখন অলস ফূর্তির মত শুধু উঁসখুস করছে, তখন প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেশ ব্যস্তভাবে চা খায় দিবাকর। —তোর বউদি অনেক করে বলেছে, একবার দেখা করে আসিস। গেলে লাউয়ের পায়েসও খেতে পাবি।

চা খেয়ে নিয়ে চলেই যাচ্ছিল দিবাকর, কিন্তু হঠাৎ শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হয় ; হাওয়া বদলের একটি মানুষ বেশ প্রসন্নভাবে আত্রেয়ীদের বাড়ির ফটকের তিনকাঠের বেড়াটাকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে, এই দিকেই আসছেন। না, আর চুপ করে থাকবার কোনও মানে হয় না। আত্রেয়ী বলুক আর না-ই বলুক, এই লোকটিকে একটু টিপুনি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সরিয়াডি তোমাদের ফূর্তির রেস্টুরেন্ট নয়।

বারান্দার উপর এসে দাঁড়ালেন আগন্তুক ভদ্রলোক। দিবাকরের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও করলেন না। সোজা আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বললেন আর হাসলেন—চিনতে পারছেন তো ?

আত্রেয়ীর চোখ দুটোও যেন হঠাৎ বিস্ময়ে চমকে গিয়ে জ্বলজ্বল করে। —ও, আপনি ? চিনেছি বইকি। বসুন।

হাত বাড়িয়ে চেয়ারের হাতলটাকে ছুঁয়ে আস্তে একটা টান দেয় আত্রেয়ী।

আগন্তুক বলে—মঞ্জুর বেশ একটা অসুখ গেল।

আত্রেয়ী বলে—তাই বলুন, আমি তো ভেবেই পাইনি, আসব বলেও মঞ্জুদি কেন আসতে পারলেন না।

—আসবার উপায় ছিল না মঞ্জুর। সেই ভোরেই তিনবার বমি করে শুয়ে রইল।

—আপনি তো একবার এসে খবরটা দিয়ে যেতে পারতেন।

—আমি ? হ্যাঁ, আমি অবিশ্যি চেষ্টা করলে একবার আসতে পারতাম। যাই হোক, আপনার ফুল তো ঠিক সময়েই পেয়ে গেছি।

ভদ্রলোকের মুখের ঝকঝকে হাসির সঙ্গে তাঁর চশমার কাচও যেন ঝকঝক হাসতে থাকে।

আত্রেয়ী—মঞ্জুদির অসুখ শিগগির সেরে যাবে নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ, এখন সারবার দিকেই চলছে, কিন্তু ভয়ানক রেস্টলেস স্বভাবের মেয়ে তো। আপনাকে দেখবার জন্যে ছটফট করছে। কিন্তু আপনি কি যেতে পারবেন ?

আত্রেয়ী—পারব বইকি। মঞ্জুদিকে বলবেন, আমি একদিন...।

—যদি কোনও অসুবিধে না থাকে, তবে এখনই চলুন না ? আমার সঙ্গেই চলুন।

এইবার দিবাকরের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক আরও স্নিগ্ধ স্বরে কথা বলেন—আমি নিখিল সেন। দাদার অসুখ, তাই তাকে নিয়ে এখানে এসেছি। অন্তত দু'মাস থাকার ইচ্ছে। বউদি আর আমার বোন মঞ্জুর ইচ্ছে এখানে সারা বছরটাই থাকে, এই ক'দিনের মধ্যেই সরিয়াডিকে ওদের এত ভাল লেগে গিয়েছে। আপনি বোধ হয়...।

আত্রেয়ী—ইনি দিবাকরদা।....আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনি আসছি।

ঘরের ভিতরে গিয়ে কাকিমাকে জিজ্ঞেস করে আত্রেয়ী—যাব ?

কাকিমা—যা তা হলে ; মেয়েটি যখন এত করে ডাকছে।

ঘরের বাইরে এসে নিখিলের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী একটু ব্যস্তভাবেই বলে—চলুন।

নিখিল সেনের সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতেই লতা থেকে পট পট করে কিছু ফুল তুলে নেয় আত্রেয়ী। তার পর আর দেরি হয় না। শ্রীলেখা কটেজের নিখিল সেন আর আত্রেয়ী যখন ফটক পার হয়ে রাস্তার অনেক দূরে চলে যায়, তখন একহাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে আর খুব আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে দিবাকরও প্রদোষ সরকারের এই বাড়ির ফটক পার হয়ে চলে যায়।

॥ ৭ ॥

আত্রেয়ী বলে—আমারও এই কদিন ধরে প্রায় রোজই মঞ্জুদির কথা মনে পড়েছে।

নিখিল হাসে—সেটা তো বেশ বুঝতেই পারছি। তা না হলে কোথাকার কে মঞ্জু আপনাকে দেখবার জন্যে ছটফট করছে, শোনা মাত্র আপনিও তাকে দেখবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠবেন কেন ?

আত্রেয়ী—মঞ্জুদি নিশ্চয় অনেক লেখাপড়া করেছেন।

নিখিল—তিনবার বি-এ ফেল করেছে ; কিন্তু সেজন্যে ওর মনে কোনও আক্ষেপ বা লজ্জা-টজ্জা আছে বলে মনে হয় না।

আত্রেয়ী—ভালই তো।

নিখিল—তা একরকম ভালই।

রজনীধাম পার হয়ে বড় রাস্তায় উঠতেই আত্রেয়ী কুণ্ঠিতভাবে হাসে আর আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে।—আপনি একটু আস্তে হাঁটুন।

নিখিল—ও, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমি খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছি ; তাই না ? কিন্তু আপনিও যেন একটু বেশি আস্তে হাঁটছেন।

আত্রেয়ী—হ্যাঁ, আমি ভুল করে...।

নিখিল—কী ?

কুণ্ঠার হাসিকে জোর করে চাপতে চেষ্টা করে আত্রেয়ী, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হাসিটা যেন ভাঙা ঢেউয়ের জলের শব্দের মত কলকল করে গড়িয়ে যেতে চায়।—তাড়াতাড়িতে ভুল করে ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে বের হয়ে পড়েছি।

নিখিলও চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—বেশ করেছেন। এখন তা হলে খুব আস্তে আস্তেই হাঁটা যাক।

ঘোষ হাউসের দালানের ছায়া পার হয়ে, মায়া ভিলার রেলিংয়ের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার পর নিখিল এইবার হাঁপ ছাড়ে আর হেসেও ফেলে—দেখছি, আস্তে আস্তে হাঁটাও কম সাংঘাতিক ব্যাপার নয়।

এইবার একটা ছোট মাঠ ডিঙিয়ে গেলেই হয় ; তারপর শ্রীলেখা কটেজকে খুব কাছেই দেখতে

পাওয়া যাবে।

আত্রেয়ী বলে—আমাদের চাকর রামুয়া ভুলেই গেছে কোথায় ওর দেশ।

নিখিল—আমাদের দশাও প্রায় তাই ; শুধু শুনেছি দেশ হল পাবনা ; কখনও চোখে দেখিনি। এখন আমরা কলকাতারই মানুষ।

না আর হাঁটতে হবে না। শ্রীলেখা কটেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে, এক হাতে একটা রুমাল দুলিয়ে, আর সেই সঙ্গে নিজেরও সারা শরীরটাকে দুলিয়ে হাসছে আর ডাকছে মঞ্জু—ওয়েলকাম আত্রেয়ী। ফার্স্ট লেডি অব সরিয়াডি ; আসুন, আসন গ্রহণ করুন।

আত্রেয়ীকে হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল মঞ্জু।—ডাক্তার এখনও বাড়ির বাইরে যেতে অনুমতি দিচ্ছে না। তাই, বাধ্য হয়েই তোমাকে ডাকতে হল। তোমাকে না দেখে দেখে সত্যিই আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—আপনি সেদিন...।

মঞ্জু—চুপ।

আত্রেয়ী—তুমি সেদিন সত্যিই এলে না দেখে বেশ ভাবনা হয়েছিল।

—কিসের ভাবনা ?

—মনে হয়েছিল, চলেই গেল নাকি মঞ্জু।

—না, চলে যাইনি। দু' মাস পরেও যাব কিনা সন্দেহ।

আত্রেয়ীর চোখ আরও খুশি হয়ে হেসে ওঠে।—খুব ভাল হয় তা হলে। অন্ততঃ ছ'টা মাস থাকো। চিরকালই থেকে যাও না কেন ?

শোনা যায়, পাশের ঘরে কে একজন ডাকছেন—প্রীতি, প্রীতি, কই তুমি ? মেয়েটিকে একবার আমার কাছে নিয়ে এসো। আমিও একটু দেখি।

মঞ্জু বলে—বড়দা তোমাকে দেখতে চাইছেন।

প্রীতি বউদি এসে আত্রেয়ীকে ডাকেন—তুমি এক মিনিটের জন্য একটু ওঘরে চলো আত্রেয়ী, উনি তোমাকে দেখতে চাইছেন। বাতের রুগী, নিজে উঠে আসতে পারেন না।

দু' পায়ে উলের মোজা ; চেয়ারের উপর বসে আছেন মঞ্জুর বড়দা অখিলবাবু। পা দুটো সামনের একটা টুলের উপর তুলে রেখেছেন। আত্রেয়ী সামনে এসে দাঁড়াতেই অখিল বলেন—পা অচল হয়ে গেলে মানুষের যে কী কষ্ট ; সেটা আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পারি। হ্যাঁ, তোমার কথা বাণীদিদির কাছ থেকে সবই শুনেছি। হেসে খেলে খুশি হয়ে থাকো ; কী আর করবে বল ; আত্রেয়ীকে চা খাওয়াও, প্রীতি।

প্রীতি বউদি চা তৈরি করতে চলে যান। আত্রেয়ীকে নিয়ে মঞ্জুও চলে যায়। ঘরের ভিতরে গোলমাথা ছোট একটা টেবিল ; সেই টেবিলের রেশমি ঢাকনার দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর চোখ দুটো কিছুক্ষণ অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে।—এ নিশ্চয় তোমার হাতের কাজ, মঞ্জু ?

মঞ্জু—হ্যাঁ। কিন্তু এর মধ্যে এত আশ্চর্য হয়ে দেখবার কী আছে ?

আত্রেয়ী—ঝালরটা কী করে এত চমৎকার হল, কী করেই বা লাগালে, বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে চাও ?

—নিশ্চয়।

—এখনই ?

—হ্যাঁ।

বুঝে নিতে পাঁচ মিনিটেরও বেশি সময় লাগে না আত্রেয়ীর। ঝালরটা জোড়া দেওয়া কোনও ব্যাপার নয় ; কাপড়টারই বর্ডারের দশটা করে ঘরের সুতো তুলে নিয়ে একটা করে নট।

মঞ্জুর গলার মাফলারের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী আবার চোখ বড় করে। মঞ্জু হাসে—বুঝতে পারছ, প্যাটার্নটা ?

আত্রেয়ী—না, একটু গোলমেলে ঠেকছে।

মঞ্জু—আজ থাক ; কাল বুঝিয়ে দেব।

আত্রেয়ী—এ ছাড়া আরও কিছু যদি... ।

মঞ্জু—আছে আছে, অনেক আছে। আমার গান আছে ; যেদিন খুশি সেদিনই শুনতে পাবে। এক টিন চকোলেট আছে, যখন ইচ্ছে তখনই খেতে পাবে। চারটে অ্যালবাম আছে, যখন মনে হবে তখনই দেখতে পাবে। এত ঘুষ কবুল করছি ; সত্যি রোজ একবার এসো কিন্তু, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী হাসে—আসব বইকি ; কিন্তু এত শেখা দেখা শোনা আর এক টিন চকোলেট খাওয়া কি ছ'মাসেও ফুরোবে ?

মঞ্জু—না ফুরোলে আরও ছ' মাস থাকব। না হয়, ছ' মাস পরে আবার আসব।

প্রীতি বউদি চা নিয়ে ঘরে ঢোকেন। মঞ্জু বলে—বিপদে পড়েছি আমি। বউদি তো বাইরে বের হতেই চান না আর... ।

প্রীতি বউদি—তুমিই বল আত্রেয়ী, পঙ্গু মানুষকে ঘরে ফেলে রেখে আমি কি করে বাইরে ধেই ধেই করে বেড়াই ?

মঞ্জু—ইনি বেড়াবেন না ; আর মেজদা যদিও বা কখনও বেড়াতে বের হন, তবে আমাকে সঙ্গে নেবেন না।

আত্রেয়ী—কেন ?

মঞ্জু—আমার অপরাধ, আমি বেশি কথা বলি।

প্রীতি বউদি—আমি তো কতবার বলেছি, কারও সঙ্গে যাবার দরকার নেই, তুমি একা নিজেই রোজ একটু বেড়িয়ে এলেই পার।

মঞ্জু—আমিও তো তোমাকে কতবার বলেছি বউদি, সেটা সম্ভবই নয়। আমি কারও সঙ্গে কথা না বলে বলে বেড়াতেই পারি না। বুঝলে আত্রেয়ী, এই হল আমার বিপদ। কিন্তু তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে বিপদ কেটে গেল। রোজ একবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ধানোয়ার রোড ধরে... ।

আত্রেয়ী—বেশ তো, আমারও অসুবিধের কী আছে ? সকালবেলার দিকে অবিশ্যি... ।

মঞ্জু—জানি, সকালবেলা তোমার কিণ্ডারগার্টেন আছে। কিন্তু দুপুর বিকেল আর সন্ধ্যা তো আছে। তা ছাড়া ভোর আছে, গোধূলি আছে, কোকিলডাকা রাত আছে। বেড়ালেই তো হল। চার প্যাকেট চকোলেট সঙ্গে নিয়ে... ।

প্রীতি বউদি—এই তো ! তুমি এত কথা বলেই তো মানুষকে ভয় পাইয়ে দাও।

আত্রেয়ী—আমি একটুও ভয় পাইনি বউদি। আপনি মঞ্জুকে বকবেন না। ...আজ এখন আসি তবে, বউদি। আসি মঞ্জু !

গল্প করতে করতেই চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে আত্রেয়ীর ; মঞ্জুর সঙ্গে অনেক চেনা-শোনাও হয়ে গেল। আজকের মত এখন এখানেই একটি খুশির হাসি রেখে দিয়ে আর একটি খুশির হাসি মুখে নিয়ে চলে যেতে চায় আত্রেয়ী। প্রীতি বউদিও বলেন—আচ্ছা, এস তবে।

কিন্তু আরও একটু দেরি করতে হল। মঞ্জুর সঙ্গে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে এসেই দেখতে পায় আত্রেয়ী, মঞ্জুর মেজদা নিখিলবাবু দু' হাতে তিন চারটে কাগজের ঠোঙা আর প্যাকেট হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে হেঁটে আসছেন। এরই মধ্যে কোথায় গিয়েছিলেন নিখিলবাবু ? বাজারে ? কিসের জন্যে ?

আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে নিখিল বলে—এ কি, আপনি এরই মধ্যে চলে যাচ্ছেন যে !

মঞ্জু—এ সব কী নিয়ে এলে মেজদা ?

নিখিল—কিছু ফল আর খাবার।

মঞ্জু—কেন ?

নিখিল—কেন মানে কী ? বুঝিয়ে বলতে হবে ? তোর কমনসেন্সে কী বলে ?

মঞ্জু—কিন্তু আমাদের একটু বলে যেতে হয় ! আমরা জানব কী করে যে, তুমি খাবার আনতে বের হয়েছ ? আমরা আত্রেয়ীকে চা জেলি আর ডালমুট খাইয়ে দিয়েছি।

নিখিল—তবে কি এ সব জিনিস ফেলা যাবে ?

গোলমাল শুনে ঘরের ভিতর থেকে প্রীতি বউদি বের হয়ে আসেন।—ফেলা যাবে কেন, থাকবে ; কেউ না কেউ খাবেই।

নিখিল—ঠিক আছে ; খেও তোমরা। কিন্তু সেটাও একরকম ফেলে দেওয়াই হল।

মঞ্জু এইবার আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।—আত্রেয়ী, বিপদ থেকে বাঁচাও। একটু বসো ; কিছু খেয়ে যাও।

আত্রেয়ীকে আরও পনেরো মিনিট বসতে হল। নতুন করে খাবারও খেতে হল। আর মন-প্রাণ খোলা এক অদ্ভুত মেজাজের মানুষের একটা অদ্ভুত কথাও কানে শুনতে হল। পাশের ঘর থেকে নিখিলবাবু চেঁচিয়ে বলছেন।—তালশাঁসটা ভাল করে ধুয়ে নিও, বউদি।

এ ঘরে প্রীতি বউদি ফিসফিস করেন।—এমন তালশাঁস আমি জীবনে দেখিনি। যেমন শক্ত, তেমনই নোংরা আর তেমনই...। খাবে নাকি আত্রেয়ী ?

না, আর দেরি হয় না। দেরি হবার আর কোনও কারণ নেই। শ্রীলেখা কটেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে মঞ্জু ; মায়া ভিলার রেলিংয়ের লতাবীথির কাছ ঘেঁষে ঘেঁষে চলে যাচ্ছে আত্রেয়ী। তারপর আর দেখা যায় না ; বাঁ দিকের রাস্তাটাতে হঠাৎ ঘুরে গিয়েছে আত্রেয়ী।

রাস্তা ঘুরতে গিয়েই আত্রেয়ীর এই এক মনে পথচলার ব্যস্ততা হঠাৎ একটা শব্দের আঘাত পেয়ে চমকে ওঠে। সরিয়াডির নীরবতার বুকের ভিতর থেকে হো হো করে অদ্ভুত স্বরের একটা হল্লা ছুটে বের হয়েছে।

তাই তো ! এ পাড়াতে এসে এ আবার কী কাণ্ড করছে সন্তুটা ? একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে, সবার আগে সন্তু। রাস্তার পাশের নালাটার দিকে ঢেলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে সন্তু—মার মার মার।

সন্তুর ওই কচি চোখে-মুখে কী কঠিন আক্রোশ !—কি করছ সন্তু ? ডাক দেয় আত্রেয়ী।

—চোর, চোর, পালিয়ে যাচ্ছে, সরে পড়তে চেষ্টা করছে। বলতে বলতে আর ঢেলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটতে থাকে সন্তু ; আত্রেয়ীর কথার শব্দ সন্তুর কানে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না।

সেই মুহূর্তে, সন্তুর আক্রোশের হেতুটাকে হঠাৎ চোখে দেখতে পেয়েই হেসে ওঠে আত্রেয়ী। এই ব্যাপার ? এর জন্যে সন্তুর এত রাগ ? নালার জল থেকে ছোট্ট একটা পুঁটি মাছকে তুলে নিয়ে একটা ঢোঁড়া সাপ ছটফটিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সন্তু ওকে পালাতে দেবে না।

সন্তুকে আর মানা করে লাভ নেই। ডাকলেও ক্ষান্ত হবে না সন্তু। ঢোঁড়াটাকে তাড়া করে সন্তু আর বাচ্চাদের দল ছুটেই চলেছে।

সন্ধ্যে হতে এখনও বেশ দেরি আছে। ছেঁড়া চটির জন্যে তাড়াতাড়ি হাঁটা যায় না। দরকারও নেই। নয়াপাড়ার রাস্তা ধরে একটু ঘুরে গেলেও চলতে পারে।

পটলবাবুর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই আত্রেয়ীর খুশি চোখের দৃষ্টিটা আবার চমকে ওঠে। কী হল পটলকাকার ?

মস্ত বড় একটা লাঠি হাতে করে বাড়ির বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, আর গেটের কাছে ছুটে এসে মেহেদির বেড়াটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন পটলবাবু। আদুড় গা, গামছা-পরা পটলবাবুর হাতের লাঠিটা যেন কারও মাথায় বাড়ি দেবার জন্য ছটফট করছে।

আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়েই কথা বলেন পটলবাবু।—কেমন আছিস আত্রেয়ী ?

আত্রেয়ী—ভাল।

পটলবাবু—কিন্তু...।

মেহেদির বেড়ার পাতার ফাঁকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে পটলবাবুর চোখের রাগ তেমনই কটমট করে কাকে যেন খুঁজতে থাকে।—যখন-তখন খক্‌খক্ খক্‌খক্ ! এ শালা তক্ষক কাশছে না হাসছে, কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু আমি এটাকে না মেরে...।

লাঠিটাকে বাগিয়ে ধরে আবার এক লাফে মেহেদির বেড়ার ওদিকে চলে গেলেন পটলবাবু।

হেসে ফেলার ভয়ে শাড়ির আঁচলের একটা কোণ মুখের কাছে তুলে ধরে আত্রেয়ী। মুখের হাসিটা কোনওমতে চাপা পড়লেও চোখের হাসিটা উথলে উঠতে থাকে।

আত্রেয়ী—চলি পটলকাকা, কাকিমা এখন বোধ হয়...।

পটলবাবু—কাকিমার এখন ছেলে হবে। পরে একদিন আসিস। হোই হোই হোই। তক্ষক

মারবার জন্যে মেহেদির বেড়ার উপর লাঠি তুলে দৌড়াতে থাকেন পটলবাবু।

বাড়ির কাছে এসেই আস্তে একটা ক্লান্তির হাঁপ ছাড়ে আত্রেয়ী, কিন্তু চোখের আর মুখের হাসিতে একটুও ক্লান্তি নেই। দেখতে পায় আত্রেয়ী কাকিমা বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

কাকিমা বলেন—এত দেরি হল যে!

আত্রেয়ী—দেরি? দেরি কোথায় দেখলে। যা ভেবেছিলাম কাকিমা, মঞ্জুরা সবাই সত্যিই খুব ভাল।

॥ ৮ ॥

কত গান তো হল গাওয়া। শ্রীলেখা কটেজে প্রায় রোজই আসে আত্রেয়ী ; মঞ্জুও গান শোনাতে ভুলে যায় না। আর আত্রেয়ীও গান শুনে এমন মুগ্ধ হয়ে যায় যে, চোখের পাতা যেন ঘুম-ঘুম আবেশে ভারি হয়ে আসে।

মঞ্জু হাসে—না, আর নয়। ঘরের ভিতরে ঠুঁটো হয়ে বসে আর গাইতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু বুঝতে পারছি না, আর কতকাল রইব বসে।

আত্রেয়ী—ডাক্তারকে বলেছ?

হ্যাঁ, অনেকবার ডাক্তারকে বলেছে মঞ্জু—আর মিছে কত পথ চাওয়াবেন ডাক্তারবাবু, আমার পায়ে যে মরচে ধরে গেল। বাইরে বের হব কবে?

মঞ্জুর ছটফটে ভাষার কথা শুনে হেসে ফেলেছেন বুড়োমানুষ মল্লিক ডাক্তার।—আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরো মা।

মনের অনেক জোর খাটিয়ে ধৈর্য ধরে রাখতে চেষ্টা করছে মঞ্জু। কিন্তু আত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে এই ধৈর্যের ভাষাটা যেন হতাশ হয়ে যায়।—কবে যে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হব? কবে যে তিরছি নদীর ধারে একটি পাথরের ওপরে দুজনে বসে থাকব?

ওঘরে বড়দা বসে থাকেন ; বারান্দায় মেজদা ঘুরে বেড়ান, আর প্রীতি বৌদি তো যখন-তখন এঘরে আসছেন, আত্রেয়ীর সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা বলতে অনেক অসুবিধে আছে।

একবার মঞ্জুকে অনুমতি দিয়ে ফেলুন ডাক্তার মল্লিক ; তারপর আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন বের হতে হবে। ধানোয়ার রোড ধরে হেঁটে যতদূর খুশি এগিয়ে যেতে হবে। রোদ যদি বেশি কড়া হয়, তবে একটি শালের ছায়াতে বসতে হবে। জায়গাটি বেশ নিরিবিলি হবে, কাছে কেউ থাকবে না। শুধু দু' একটা তিতির উড়বে ফুরফুর করে, আর ঘাসের বীজের দানা খুঁটে খুঁটে খাবে। তখন আর আত্রেয়ীকে না বলে থাকতে পারবে না মঞ্জু ; আমার এই ছটফটে খুশির শরীরের এক জায়গায় একটি চমৎকার টিউমার আছে, আত্রেয়ী, কিন্তু সে এখনও জানে না ; সে বেচারা আশা করে আছে যে, একদিন আমি তার কাছে যাব। কিন্তু তা তো সম্ভব নয় আত্রেয়ী। তার সঙ্গে আমার বিয়ে হলেও তাকে ঠকতে হবে। তার কোনও লাভ হবে না।

হ্যাঁ, অপারেশন হতে পারে। ডাক্তার বলেছেন, একদিন তাই করতেও হবে। কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করে শুনতে পেয়েছি আত্রেয়ী, সেই অপারেশন আমার টিউমার তুলতে গিয়ে আমার প্রাণটাকেই শেষ করে দিতে পারে। কাজেই, এখন বুঝতে পারছ তো আত্রেয়ী, আমার এদিক-ওদিক কোনওদিকই নেই।

তা একরকমের মন্দ নয় আত্রেয়ী। এখন টিউমারটাই আমার ভরসা। যতদিন এটা আছে, ততদিন সে বেচারাকে মাঝে মাঝে দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

হঠাৎ একদিন, যেদিন আত্রেয়ী ঠিক দুপুরবেলা শ্রীলেখা কটেজে এসে আর সামান্য কিছুক্ষণ মঞ্জুর সঙ্গে গল্প করেই চলে গেল, সেদিন মঞ্জুর মেজদা নিখিলও বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে মঞ্জুর কাছে একটা আক্ষেপের কথা বলেছে—তোর ডাক্তার শুধু তোকে নয়, এই মহিলাকেও বেশ জব্দ করে রেখেছে।

মঞ্জু—আত্রেয়ীর কথা বলছ?

নিখিল—হ্যাঁ।

মঞ্জু—আত্রেয়ীর জন্য হবার কী হল ?

নিখিল—হল না ? মহিলা তোর সঙ্গে বেড়াবার ইচ্ছে নিয়ে রোজই আসছেন, অথচ তোকে এখনও বাইরে বের হবার অনুমতি দিচ্ছেন না ডাক্তার। মহিলাকেও ফিরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু এই মহিলারও তো এখন একটু হেসে-খেলে বেড়ানো দরকার ছিল।

ঠিকই বলেছে নিখিল। বীণাদির কাছ থেকে আত্রেয়ীর জীবনের দুঃখের কাহিনী শুনতে পাওয়া গিয়েছে ; তাতে তো এই কথাই মনে হবে যে, শুধু একটা করুণ রিক্ততা হয়ে ঘরের কোণে পড়ে না থেকে, বাইরের আলো-বাতাসের সঙ্গে একটু মেলা-মেশা করা উচিত আত্রেয়ীর।

মনে মনে ঠিক করেই রেখেছে মঞ্জু, এইবার আত্রেয়ীকে বেশ একটু মিনতি করে আর বুঝিয়ে বলতে হবে—তুমিও আমার মত একটু ধৈর্য ধরে রাখো, আত্রেয়ী।

আজ রবিবার। সকাল বেলার চায়ের পালা শেষ হবার পর প্রীতি বউদি এখন বড়দার কাছে বসে গল্প করছেন। আজ আত্রেয়ীর কিণ্ডারগার্টেন নেই। সময় হয়ে এল, আর কিছুক্ষণ পরে আত্রেয়ী আসবে।

ঘরের ভিতরে বসেই বাইরের বারান্দায় একটা হর্ষের শব্দ শুনে চমকে ওঠে মঞ্জু, ঠিকই, আত্রেয়ী এসেছে। মেজদার সঙ্গে কথা বলছে আত্রেয়ী। —আপনি কোথাও বের হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।

নিখিল বলছে—জিজ্ঞেস করি ; আপনার কি বেড়াতে টেড়াতে একটুও ইচ্ছে করে না।

আত্রেয়ী—খুব ইচ্ছে করে।

নিখিল—তবে চলুন, আমিই আপনাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

আত্রেয়ী—কোথায় যাবেন ?

নিখিল—তার কি কোনও ঠিক আছে ? যেদিকে চোখ যায় সেদিকে যাব।

আত্রেয়ী হাসে—আপনি কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি হাঁটেন।

নিখিল—খুব আস্তে আস্তে হাঁটব।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে মঞ্জু—কোথায় চললে, মেজদা ?

নিখিল—ঠিক নেই। ধানোয়ার রোড হতে পারে, তিরছি নদীও হতে পারে, শালবনও হতে পারে।

মঞ্জু—আত্রেয়ীকে সঙ্গে টানছ কেন ?

নিখিল—ইচ্ছে হল। হ্যাঁ, উনি যদি হাঁটতে ভয় পান, তবে অন্য কথা।

মঞ্জু হাসে—আত্রেয়ী কী বলে ?

আত্রেয়ী—হাঁটতে ভয় পাই না। কিন্তু...।

মঞ্জু—কী ?

আত্রেয়ীর চোখের দৃষ্টিটা যেন কাঁচুমাচু হয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে। —আমার কেমন যেন লাগছে।

মঞ্জু হেসে ফেলে—তার মানে ?

আত্রেয়ী—লজ্জা করছে।

হেসে ফেলে নিখিল—এমন লজ্জার কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া, আমার সঙ্গে লজ্জা করবার আরও মানে হয় না।

নিখিলের গলার স্বরে এক অসাধারণ শান্ত ও বলিষ্ঠের করুণাকোমল মনটাই হেসে ফেলেছে। মানুষ চিনতে পারে, তাই নিখিলের অনুরোধের মনটাকে চিনতে পারছে না আত্রেয়ী। ছোট শহর সরিয়াডির মনই বোধ হয় যত ছোট ছোট ভয়ে ভরা মন ; তা না হলে বুঝতে পারত আত্রেয়ী ; নিখিলের জীবনের কোনও ইচ্ছার জন্যে নয়, আত্রেয়ীরই দুঃখের জীবনের জন্য একটা সমবেদনার ব্যাকুলতা আত্রেয়ীকে বেড়াতে যেতে ডাকছে।

বলেই ফেলে নিখিল—আমি আমার কোনও সুবিধের জন্য নয় ; আপনারই...।

আত্রেয়ী—বুঝেছি ; আপনি আর কিছু বলবেন না। চলুন। আসি মঞ্জু।

মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে আত্রেয়ীর এই মিথ্যে লজ্জা কুণ্ঠিত চোখের হাসিটাও

এইবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মঞ্জু বলে—এসো।

নিখিলের সঙ্গে আত্রেয়ী, শ্রীলেখা কটেজের গেট পার হয়ে আর মাঠের পথ ধরে দু'জনে চলে যাচ্ছে ; বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর স্তব্ধ দুটো চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকে মঞ্জু। সেদিনও তো এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল আর আত্রেয়ীকে একসঙ্গে হেঁটে এই বাড়ির গেটে ঢুকতে দেখেছিল মঞ্জু ; কিন্তু সেদিন মঞ্জুর চোখে এরকমের স্তব্ধতা ছিল না। মঞ্জুর চোখ হেসে হেসে নেচে উঠেছিল।

প্রীতি বউদি ডাক দিয়ে বলেন—ওরা দুজনে সত্যিই কি বেড়াতে বের হল, মঞ্জু ?

—হ্যাঁ, বউদি।

অখিলবাবু বলেন—কে ? কে ? কারা দুজন বেড়াতে গেল ?

প্রীতি বউদি—তোমার ভাই আর আত্রেয়ী।

অখিলবাবু—কেন ? এর মানে কী ?

প্রীতি বউদি—মানে আবার কী হবে ?

অখিলবাবু—এসব অভ্যেস তো নিখিলের নেই। ও যে একা বেড়াতে আর একা থাকতেই ভালবাসে।

প্রীতি বউদি—সে জন্যেই তো বলছি, কোনও মানে হয় না।

মঞ্জু এসে বলে—মেজদা বোধ হয় রাগ করেই এই কাণ্ডটা করল ?

প্রীতি বউদি—কিসের রাগ ? কার ওপর রাগ ?

মঞ্জু—আমার ওপর। ডাক্তার আমাকে বাইরে যেতে দিচ্ছে না বলে আমিও আত্রেয়ীকে সব সময় এখানে আটকে রাখছি।

প্রীতি বউদি—কিন্তু সেজন্যে আত্রেয়ী তো কিছু মনে করেনি।

মঞ্জু—না ; আত্রেয়ী মনে করেনি।

প্রীতি বউদি—তবে ? তবু বেড়াতে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত উঠল কেন আত্রেয়ী ?

অখিলবাবু—ঠিকই বলেছ, কোনও মানে হয় না।

প্রীতি বউদি—নিখিলকে জানি, ওর ব্যস্ত হওয়া আর না হওয়া দুই-ই সমান।

কিন্তু আত্রেয়ীর এত ব্যস্ত না হলেই ভাল ছিল।

চুপ করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবেন প্রীতি বউদি—মেয়েটার জন্যে একটু মায়া হয় বলেই বলছি। তুমি শোন মঞ্জু, ডাক্তার বলুক আর না বলুক, তুমিই আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি একটু ঘুরে-ফিরে আসবে।

মঞ্জু—আমিও তাই ভাবছি।

ঘরের ভিতরে একটি চেয়ারে চুপ করে বসে থাকে মঞ্জু। চোখে পড়ে উলের প্যাকেট আর এক জোড়া কাঁটা গোলমাথা ছোট টেবিলের উপরে পড়ে আছে। কথা ছিল, উলের ব্লাউজের গলার একটা নতুন ডিজাইনের ঘরগুলো আজ ভাল করে বুঝে নেবে আত্রেয়ী।

এখানে বসেই দেখতে পাওয়া যায়, নিখিলের ঘরের টেবিলে একগাদা কাগজপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত লেখালেখি করে শেয়ারের যত পাওনা ডিভিডেন্ডের হিসাব করেছে নিখিল। কথা ছিল, এজেন্ট অফিসের নামে তাগিদের যত রিমাইন্ডার ডাকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু ভুল হবে না মেজদার। ঠিক সময়েই চিঠিগুলিকে ডাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। মেজদা ভুল করে না। মেজদার ভুল হয় না। কিন্তু আত্রেয়ী কি...।

—আমার ভয়ানক বিচ্ছিরি লাগছে, বউদি। থার্মোমিটারটা দাও, টেম্পারেচার হয়েছে মনে হচ্ছে।

মঞ্জুর এই ব্যস্ততার ডাকের মধ্যে যেন একটা করুণ বিষাদের গুঞ্জণ আছে।

প্রীতি বউদি থার্মোমিটার দিয়ে গেলেন। থার্মোমিটার কিন্তু বুঝিয়ে দেয়, কিছুই হয়নি।

বেশ তো, কিছুই হয়নি, হতে পারে না, হবেও না। তবু বেচারা আত্রেয়ীকে একটু বুঝিয়ে দিলেই বোধ হয় ভাল হয়।

ধুলো উড়িয়ে পর পর তিনটে মোটর লরি ছুটে আসছে। রাস্তার এক পাশে সরে দাঁড়ায় নিখিল আর আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী বলে—বুঝতে পারলেন, মোটর লরিগুলো কী জিনিস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ?

নিখিল—না।

আত্রেয়ী—ওদিকে কয়েকটা অভ্রের খাদ আছে। ওর মধ্যে একটা খাদ গোষ্ঠকাকার ; আমি অনেকদিন আগে একবার খাদ দেখতে গিয়েছিলাম।

নিখিল—খাদের ভেতরে নেমেছিলেন ?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ। খাদের কাজ দেখতে একটু ভয় ভয় করে ঠিকই, কিন্তু এক-একটা আওয়াজের পর যখন ফাটা পাথর ঝুপ করে পড়ে যায়, আর অভ্রের টিক্‌রি ঝিকঝিক করে ওঠে, তখন, সত্যিই হাততালি দিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে।

নিখিল—আপনিও তা হলে হাততালি দিয়ে হেসেছিলেন ?

আত্রেয়ী—নিশ্চয়। শুধু আমি কেন ? জয়া মাসিমা, বীণাদি, নয়াপাড়ার জেঠিমা, সবাই।

সড়কের পাশের ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে নিখিল বলে—ক্ষেতের জলে কিলবিল করছে, এগুলো কোনও ছোটজাতের মাছ বোধ হয়।

আত্রেয়ী—ব্যাঙাচি নয় তো ?

নিখিল হাসে—না ; ব্যাঙাচি আমি চিনি।

আত্রেয়ী—ক'দিন আগে নয়াপাড়ার নালাতে কোথায় পুঁটি মাছ চলে এসেছিল।

নিখিল—গত বর্ষার সময় আমাদের চা বাগানের নালাতে প্রকাণ্ড একটা বান মাছ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কুলিরা ওটাকে অজগর মনে করে ধরতেই সাহস করেনি। শেষে গুলি করে মারা হল।

আত্রেয়ী—আপনি শিকার করেন ?

নিখিল—না ; কেন জানি না, ওটা আমার একটুও পছন্দ হয় না।

আত্রেয়ী—আমারও। জয়ন্তকাকা একটা মস্তবড় একটা বাঘ মেরেছিলেন। চকচকে গা, লম্বা ডোরা, বাঘটা দেখতে সত্যিই খুব...।

নিখিল হাসে—খুব সুন্দর ?

আত্রেয়ী—সত্যিই খুব সুন্দর ছিল। দেখলে আপনিও তাই বলতেন।

নিখিল—তারপর কী হল ? মরা বাঘ দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন ?

আত্রেয়ী—না ; কিন্তু জয়ন্তকাকাকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম।

—কী বলেছিলেন ?

—যা বলা উচিত, তাই বলেছিলাম। জঙ্গলের বাঘ জঙ্গলে ছিল, তাকে মারবার কী দরকার ছিল ?

নিখিল—কথাটা ভালই বলেছিলেন।

একটা বুড়ো বট গাছ, অনেক জটার ঝুরি ঝুলে রয়েছে। পাকা বটফল রাস্তার উপর ছড়িয়ে রয়েছে। আত্রেয়ী বলে—সন্ধ্যে হলেই এই বট গাছটা বাদুড়ে ভরে যায়।

নিখিল—তা'ও দেখেছেন ?

আত্রেয়ী—দেখব না ? কতবার বিকেলবেলা এদিকে বেড়াতে এসেছি। ফিরতে সন্ধ্যে হয়েছে ; তখন দেখেছি, কালো কালো বাদুড় উড়ে আসছে আর ঝুপ ঝুপ করে গাছের মাথার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে।

একটু চুপ করে থেকেই হেসে ফেলে আত্রেয়ী—আমাদের রামুয়া একটা বাদুড়।

নিখিল—তার মানে ?

আত্রেয়ী—রামুয়া পাকা বটফল খায়।

নিখিল—আমি তা হলে কুমীর।

আত্রেয়ী—তার মানে ?

নিখিল—আমি মাছ খাই, কুমীরেও মাছ খায়।

আত্রেয়ী—কুমীর কিন্তু মাছ রান্না করে খায় না।

মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করে আত্রেয়ী। নিখিল বলে—হেসেই ফেলুন না কেন ?

আত্রেয়ী—এদিকে আর কতদূর যাবেন ?

নিখিল—বলুন তবে, কোন দিকে গেলে ভাল হয়।

আত্রেয়ী—কোনওদিকে নয়, এখানেই দাঁড়ালে অনেক কিছু দেখতে পাবেন।

আত্রেয়ী হাত তুলে দেখিয়ে দিতে থাকে—ওই দেখুন, পরেশনাথকে কত কাছে মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই তো কাছে নয়। এখান থেকে একুশ মাইল।

নিখিল—জঙ্গলের মধ্যে ওটা একটা গির্জা বলে মনে হচ্ছে ?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ ; ওখানে এক বুড়ো ফাদার থাকেন ; আমরা বড়দিনের সময় কতবার ওখানে গিয়েছি। ফাদার খুব খুশি হয়ে আমাদের প্রত্যেককে একটা করে কমলালেবু দিতেন।

নিখিল—কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে ?

আত্রেয়ী—বলুন তো, কিসের শব্দ ?

নিখিল—বুঝতে পারছি না।

আত্রেয়ী—ওই যে দূরে, মাঠের উপর গরু চরছে দেখছেন, ওখান থেকেই এই শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। গরুর গলার কাঠের ঘন্টার শব্দ।

নিখিল হাসে—তাই বলুন ; আমি ভাবলাম, কোথাও যেন একগাদা ডুগডুগি একসঙ্গে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে এসে একটা বুড়ো ভিখিরী নিখিল আর আত্রেয়ীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

আত্রেয়ী বলে—কেমন আছ জিতু ?

ভিখিরী বুড়ো হাত তুলে কথা বলে—জিতা হ্যায়, দিদি।

নিখিলের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী বলে—ওঃ, কতদিন পরে জিতু বুড়োকে দেখলাম।

নিখিল—কতদিন পরে ?

আত্রেয়ী—অন্তত তিন বছর হবে।

নিখিল—বুড়ো বোধ হয় আপনার কাছে কিছু চাইছে।

চমকে ওঠে আত্রেয়ী, হ্যাঁ, ঠিকই তো ; জিতু বুড়ো আত্রেয়ীর মুখের দিকে কিরকম যেন অদ্ভুত একটা খুশির চোখ তুলে তাকিয়ে আছে।

আত্রেয়ী বলে—কী জিতু ?

জিতু বুড়ো বলে—হামার বকসিস দিদি।

চুপ করে, একেবারে নিথর হয়ে আনমনার মত দূরের গির্জাটার দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী। এত হাসিখুশি চোখ দুটোও হঠাৎ যেন চুপসে গিয়েছে। কিংবা পায়ে হঠাৎ কাঁটা ফুটেছে ; নয়ত বেড়িয়ে ফেরার সব ব্যস্ততা হঠাৎ হোঁচট খেয়েছে। সত্যিই যে, একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে আত্রেয়ী।

—কী হল ? জিজ্ঞেস করে নিখিল।

আত্রেয়ী বলে—আমার কাছে এখন পয়সা-টয়সা নেই।

—আমার কাছে আছে। পকেট থেকে একটা সিকি বের করে ভিখিরী জিতু বুড়োর হাতে ফেলে দেয় নিখিল। চলে যায় জিতু বুড়ো।

কিন্তু আত্রেয়ীর মাথাটা যেন একটা হঠাৎ-ক্লান্তির ভারে অলস হয়ে পড়েছে। কিংবা, সড়কের কাঁকরের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর চোখ দুটো কি যেন খুঁজতে চাইছে। আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কোন সৌভাগ্যের চিহ্ন দেখতে পেল আর এত খুশি হয়ে হাত পেতে বকসিস চাইল বোকা

জিতু বুড়ো ?

নিখিল বলে—দেখছেন, একটা ভালুকওয়ালা আসছে ?

ঝুঁকে পড়া মাথাটা না তুলেই আত্রেয়ী বলে—না।

নিখিল—এই তো ; তাকিয়ে দেখুন একবার।

ধুলোয় ঢাকা পা ; নিশ্চয় অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছে ভালুকওয়ালা। ভালুকটার গায়ের রোঁয়াও ধুলোতে ছেয়ে গিয়েছে। হাত তুলে নিখিলকে সেলাম জানায় ভালুকওয়ালা।—বোলিয়ে হুজুর!

ভালুকওয়ালার হাতে একটা সিকি ফেলে দিয়ে নিখিল বলে—নাচ দেখাও।

ভালুকওয়ালা তার মাথার টুপিটাকে ভালুকটার মাথার উপর রেখে দিয়ে লাঠি নাচাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ভালুকটাও দু'পায়ে ভর দিয়ে আর টান হয়ে দাঁড়ায়। একটা থাবাকে সেলামের ভঙ্গিতে তুলে ধরে নাচতে থাকে ধুলোমাখা ভালুকটা।

হেসে হেসে চেঁচিয়ে ওঠে নিখিল—কী করছেন আপনি ? এদিকে দেখুন।

মুখ তুলে আর নাচের ভালুকের চেহারাটাকে দেখতে পেয়ে হেসে ফেলে আত্রেয়ী।—বেচারার ক্ষিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে।

নিখিল—কী আর করবে বলুন ? চাকরি যখন, তখন ক্ষিদের পেট নিয়েও নাচতে হবে। এই জন্যেই তো আমি চাকরি করি না।

আত্রেয়ী—বাড়ি ফিরতে হবে কিনা।

নিখিল—এখনই ফিরবেন ?

আত্রেয়ী—এখন ফেরাই যাক।

নিখিল—আপনি কি মনে করছেন, খুব বেশি বেড়ানো হয়েছে ?

আত্রেয়ী—না।

নিখিল—তবে ?

আত্রেয়ী—মঞ্জুর সঙ্গে একটা কাজ ছিল। মঞ্জু হয়ত ভাবছে, আমি সব ভুলেই গিয়েছি।

নিখিল—তা হলে বলুন, মঞ্জুকে বেশ একটু ভয় করতেও শুরু করেছেন।

আত্রেয়ী—কেন ভয় করব না ? দোষ করলে ভয় করতেই হয়।

নিখিল—কী দোষ করলেন ?

আত্রেয়ী—কথা ছিল, আজ মঞ্জুর কাছ থেকে উলের একটা প্যাটার্ন শিখব। কাজের কথা ভুলে গিয়ে হুট্ করে বেড়াতে চলে এলাম।

নিখিল—দোষটা আসলে আমারই।

আত্রেয়ী—আপনার দোষ হবে কেন ?

নিখিল—আমিই যে আপনাকে বেড়াতে যাবার জন্য হুট করে একটা তাড়া দিয়ে ফেললাম।

আত্রেয়ী—বেশ করেছেন।

নিখিল—তা হলে আপনিও বেশ করেছেন।

ফেরবার পথে নতুন করে দেখবার কিছু নেই। শুধু গাঁয়ের ডাকঘরের দৌড়াহা তার কাঁধের বল্লমে ডাকের ব্যাগ ঝুলিয়ে আস্তে আস্তে দৌড়ে যাচ্ছে ; বল্লমের ঘুঙুর বাজছে ঝুমঝুম করে।

আত্রেয়ী বলে—আমার শুনতে সব চেয়ে ভাল লাগে দূরের ট্রেনের শব্দ ; তারপর এই ডাকের দৌড়াহার ঘুঙুরের শব্দ।

নিখিল—তিরছি নদীর ঝর্নার শব্দ শুনতে ভাল লাগে না ?

আত্রেয়ী—না ; আগে ভাল লাগত, এখন একটুও ভাল লাগে না।

নিখিল—এখন মানে কখন ? কবে থেকে ভাল লাগছে না ?

আত্রেয়ী—ঠিক মনে নেই, তবে প্রায় তিন বছর হবে।

নিখিল—ঝর্নার কাছে গিয়েছিলেন নাকি ?

আত্রেয়ী—না ; মাঝে মাঝে, অনেক রাতে যখন জেগে বসে গল্পের বই পড়েছি, তখন হঠাৎ

শুনতে হয়েছে। সত্যিই শুনতে ভয় করে, যেন একটা রাগের শব্দ গরগর করছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে।

নিখিল—বর্ষাকালের জংলি নদীতে ও-রকম শব্দ হয়েই থাকে। কিন্তু শীতকালে শুনুন, ওই নদীর ঝর্নার শব্দকেই একটা মিষ্টি গানের শব্দ বলে মনে হবে।

আত্রেয়ী—শীত আসতে এখনও অনেক দেরি আছে।

নিখিল—বেশি দেরি নেই ; বড় জোর আর এক মাস। তখন একটা কাজ করবেন ; সপ্তাহে অন্তত দুটো দিন আপনি বিকেলের দিকে...।

আত্রেয়ী—একা আসতে পারবই না ; অসম্ভব।

নিখিল—একা আসবেন কেন ? মঞ্জু সঙ্গে থাকবে। মঞ্জু তো আর কলকাতা ফিরে যাচ্ছে না।

আত্রেয়ী—আপনি যাচ্ছেন বুঝি ?

নিখিল—যাবার কথা। তবে এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি, এ মাসেই যাব, না, আরও একটা মাস পরে যাব।

আত্রেয়ী—মঞ্জুও হঠাৎ আপনার মত যাব-যাব করে উঠবে না তো ?

নিখিল—করলই বা ? মঞ্জু রইল কি চলে গেল, তাই নিয়ে আপনার ভেবেচিন্তে করবার কী আছে ? আপনি রোজ, অন্তত আরও দুটো বছর খুশি হয়ে নিজের কাজ নিয়ে থাকবেন আর বেড়াবেন। একাই বেড়াবেন। নয়ত, আপনার কিণ্ডারগার্টেনের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বের হবেন।

আনমনার মত পথ চলছে আত্রেয়ী। সড়কের কিনারায় ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছে। দেখতেও পাচ্ছে না যে, হাঁটু পর্যন্ত শাড়িটা চোরকাঁটায় ভরে গিয়েছে।

নিখিল হাসে—এত তাড়াতাড়ি হাঁটছেন কেন ?

আত্রেয়ী—কী বললেন ?

নিখিল—এমন কিছু দেরি হয়নি, খুব বেশি হাঁটাও হয়নি ; তবু আপনার বেশ ক্ষিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে।

আত্রেয়ী হাসে—আপনিও যে কাকিমার মত কথা বলছেন।

নিখিল—তার মানে ?

আত্রেয়ী—কাকিমার ওই এক অভ্যেস যখন-তখন মনে করছেন, আমার বুঝি ক্ষিদে পেয়েছে। দুটো মুড়ি খা, একটু সর খা, এক টুকরো পেঁপে খা, আত্রেয়ী। কাকিমা আমার মুখে সব সময় শুধু ক্ষিদেই দেখতে পান।

নিখিল—আপনি নিশ্চয় খাওয়া নিয়ে সব সময় গণ্ডগোল করেন, তা না হলে কাকিমা...।

আত্রেয়ী—কী বললেন ? আপনি কোত্থেকে কী শুনলেন ?

নিখিল—শুনেছি সামান্য, কিন্তু বুঝেছি অনেকখানি। বীণাদি বলেছেন, আপনি নাকি খেতেই চান না। কাকিমা আপনাকে সাধাসাধি করে হয়রান হয়ে যান।

আত্রেয়ী—বীণাদির কাণ্ড ! গল্প করবার আর কিছু না পেলে আমার খাওয়া নিয়ে গল্প করতে হবে ? বাঃ !

নিখিল—গল্পটা তো মিথ্যে নয়।

উত্তর দেয় না আত্রেয়ী।

নিখিল—এ রকম করবেন না। আর তো মাত্র দুটো বছর ; খুশি হয়ে দিন কাটিয়ে দিন। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করুন, স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর রাখুন।

সামনেই কাছারি পাড়া। একটা মুন্সেফ কোর্ট, দুটো সরকারি ডাকবাংলো, একটা ফরেস্ট আপিস আর এক সাব ডেপুটির খাজনা-মকুব দপ্তরের তাঁবু। রবিবারের কাছারিপাড়া একেবারে নিস্তব্ধ। শুধু ফুরফুর করে উড়ছে কাছারিপাড়ার যত বেগুন গাছের হাওয়া।

আত্রেয়ীর কপালটা ঘামে ভিজে গিয়েছে। ঢিলে খোঁপাটা আরও একটু ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে। কপালের সঙ্গে সেঁটে গিয়েছে। রুমাল তুলে কপাল মোছে আত্রেয়ী।

নিখিল—বাড়ির কাছে এসে পড়েছি মনে হচ্ছে ?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ এবার বাঁদিকের এই রাস্তা ধরে চলুন।

মহাদেও পাঁড়ের পোষা পায়রার ঝাঁক উড়ে চলেছে। আত্রেয়ী বলে—ওরা এখন কোথায় যাচ্ছে, বলুন তো ?

নিখিল—জানি না।

আত্রেয়ী—ওরা যাচ্ছে বাজারের মগনলালের দোকানবাড়িতে।

নিখিল—কেন ?

আত্রেয়ী—রোজ এই সময় ওদের ছোলা খাওয়ায় মগনলাল। ওরা ঠিক বুঝে ফেলতে পারে, খাওয়ার সময় হয়েছে।

নিখিল—তা হলেই বুঝে দেখুন।

আত্রেয়ী—কী ?

নিখিল—পায়রাগুলোও ওদের খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম যেটুকু বুঝতে পারে, আপনি সেটুকুও বুঝতে পারেন না।

আত্রেয়ী—বুঝব না কেন ? সবই বুঝতে পারি। কিন্তু ভাল লাগে না।

নিখিল—ভাল না লাগলে চলবে কেন ? ভাল লাগাতেই হবে।

এইবার দেখতে পাওয়া যায়, শ্রীলেখা কটেজের জানালার পর্দা ফুরফুরে হাওয়াতে ফুলে ফুলে কাঁপছে। কিন্তু আত্রেয়ীর আনমনা চোখে এখনও বোধ হয় শ্রীলেখা কটেজের ছায়া পড়েনি। আত্রেয়ীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই নিখিল বলে—ওই দেখুন, কে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে !

—কে ?

—ওই যে, কটেজের গেটের কাছে।

একটি অদ্ভুত মূর্তি বটে। দেখলে হাসি পায়। সাদা-পাকা বড়-বড় বাবরী চুল, তার উপর একটি হ্যাট ; মালকোঁচা দিয়ে আঁটসাট করে পরা ধুতি। হাতে একটি ছাতা ; সে ছাতার কাপড় নেই। হাতে একগাদা কাগজপত্র।

চমকে ওঠে আর পিছু হটে গিয়ে সরে দাঁড়ায় আত্রেয়ী—ওরে বাবা ! পাগলা দুর্গাচরণ !

নিখিল এগিয়ে যেতেই পাগলা দুর্গাচরণ ব্যস্তভাবে আর খুব গম্ভীর হয়ে নিখিলের হাতের কাছে একটা কাগজ তুলে দেয়—হ্যান্ডনোটটা রাখুন, আর টাকাটা দিয়ে ফেলুন।

দুর্গাচরণের হ্যান্ডনোটের দিকে তাকিয়ে নিখিল বলে—এক লাখ টাকা ?

—হ্যাঁ ; সুদ চার্জ করব না ; কোনও ভয় নেই।

নিখিল—আপাতত চার আনা নিন।

দুর্গাচরণ—দিন।

দুর্গাচরণের হাতে একটা সিকি ফেলে দিয়ে নিখিল আবার বিনীত স্বরে আবেদন করে।—বাকিটা যদি দিতে না পারি, তবে...।

দুর্গাচরণ—ধর্মভয় থাকলে দেবেন ; না থাকে দেবেন না।

নিখিল—মামলা-টামলা করবেন না তো ?

দুর্গাচরণ—না, ওসব আমি পছন্দ করি না।

চলে গেল গম্ভীর পাগল দুর্গাচরণ।

হাসি চাপতে গিয়ে আত্রেয়ীর হাতের রুমালটা পড়ে যায়। রুমালটাকে তুলে নিয়েই, আর মুখর হাসির একটা সোর জাগিয়ে শ্রীলেখা কটেজের বারান্দার দিকে যেন ছুটে চলে যায় আত্রেয়ী।

বারান্দায় উঠে নিখিলও খুশির স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।—এইবার তোর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখ মঞ্জু হাসিয়ে দিতে পেরেছি কিনা।

মঞ্জুর ঘরের ভিতরে ঢুকেই হাঁপ ছাড়ে আত্রেয়ী—এমন কিছু দেরি হয়নি, মঞ্জু। কই, উনের সেই...।

মঞ্জু বেশ গম্ভীর। তাই হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী।

মঞ্জু হাসতে চেষ্টা করে। —এমন কিছু দেরি হয়নি মানে পুরো তিন ঘন্টা হয়েছে।

আত্রেয়ী—সত্যি মঞ্জু, আমি বুঝতেই পারিনি।

মঞ্জু—শোনো আত্রেয়ী।

যেমন মঞ্জুর গলার স্বরে তেমনই মঞ্জুর মুখের হাসিতে যেন শক্ত একটা মায়া খুব সাবধানে কথা বলতে চাইছে।

আত্রেয়ী কিন্তু মঞ্জুর একটা হাত টেনে নিয়ে মঞ্জুর আঙুলের আংটিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেরই মনের একটা অকারণ খুশির খেলা খেলতে থাকে।

শোনা যায়, এঘর থেকে নিখিল বলছে—আমি পোস্ট অফিসে চললাম, ফিরে এসেই কিন্তু চা খাব।

চলে গেল নিখিল। মঞ্জু বলে—আমাদের এই মেজদা একটি অদ্ভুত মানুষ। কী রকম অদ্ভুত জান? এখনই যদি মেজদাকে জিজ্ঞেস করি, আত্রেয়ীকে চেন? সঙ্গে সঙ্গে জিজেস করবে, আত্রেয়ী? কে সে?

হেসে ফেলে আত্রেয়ী—আশ্চর্য।

মঞ্জু—হ্যাঁ আশ্চর্য, কিন্তু হেসো না আত্রেয়ী। মেজদার মত লেখাপড়া জানা মানুষ খুব কমই আছে। পড়ার জন্য ইউরোপে দু'বছর আর আমেরিকাতেও এক বছর কাটিয়েছে। আমি তিনবার বি-এ ফেল করেছি বলে আমাকে ঘেন্না করে মেজদা। আমার কথা ছেড়েই দাও, রত্না মজুমদারের মত মেয়ে, যে-মেয়ে সোনার মেডেল নিয়ে এম-এ পাস করেছে, আর দেখতে তোমার চেয়েও সুন্দর, সে মেয়েকেও কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হয়নি আমার মেজদা এই নিখিল সেন।

আত্রেয়ী—রাজি হলে নিশ্চয় খুব ভাল হত, মঞ্জু।

মঞ্জু—শোনো। মেজদা সাধারণ মানুষ হলে রাজি হত ঠিকই; কিন্তু তা নয়। তাই বলে কি কারও সঙ্গে অভদ্রতা করে মেজদা? তাও নয়। এখনও রত্নার সঙ্গে দেখা হলে মেজদা হাত তুলে নমস্কার জানাতে ভুলে যায় না।

আত্রেয়ী—রত্না কি নিখিলবাবুর চেয়ে বয়সে ছোট নয়?

মঞ্জু—ছোট, কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। মেজদা মানুষটা অকারণে মানুষের উপকার করে। মানুষকে খুব মায়া করতেও ভালবাসে। তুমি জান না: এখানে এই সবিয়াডিতেই সেদিন একটি লোককে মেয়ের বিয়ের জন্য একশো টাকা দিয়েছে মেজদা; কিন্তু মেয়ের বাপ লোকটা আবার একদিন যখন মেজদাকে নমস্কার জানাবার জন্যে দেখা করতে এল, তখন মেজদা লোকটাকে চিনতেই পারল না।

আত্রেয়ী—পরে চিনতে পেরেছিলেন নিশ্চয়?

মঞ্জু—জানি না। কিন্তু সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার কী হয় জান? অনেকেই আমাদের মেজদার দয়া মায়া আর ভদ্রতাকে ঠিক চিনতে পারে না। মনে করে ফেলে, মেজদার বোধ হয় কোনও ইচ্ছে আছে। এই ভুল করে শেষকালে কিন্তু নিজেরাই ঠকে।

আত্রেয়ী—ঠকাই উচিত।

মঞ্জু—মেজদার তো কোনও ক্ষতি হয় না; ওদের নিজেদেরই ক্ষতি হয়।

আত্রেয়ী—হবেই তো।

মঞ্জু—সেই জন্যেই বলছি! তুমি...।

আত্রেয়ীর চোখের তারার জ্বলজ্বলে হাসিতে হঠাৎ যেন ধোঁয়া লেগেছে, হাসিটা আবছা হয়ে গিয়েছে। —আমাকে কিছু বলছ? মঞ্জু?

মঞ্জু—হ্যাঁ। প্রীতিবৌদি বলছেন যে, ডাক্তার বলুক আর নাই বলুক, এবার থেকে আমরা দুজনে বেড়াতে বের হব। তুমি যদি কষ্ট করে...।

মঞ্জুর হাতটাকে শক্ত করে ধরে আত্রেয়ী। মুখটাও একেবারে ফুল্ল খুশির ফুলটির মত মিষ্টি হাসিতে ভরে যায়। —তাই বল! এই কথা! এর জন্যে এত গম্ভীরতা? তোমার কি ধারণা যে

তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে আমার পা ব্যথা করবে ? ছিঃ !

সরিয়াড়ির নয়াপাড়ার সড়কের সেই যে দুটো ল্যাম্পপোস্ট ভোরের ঝড়ের আঘাত পেয়ে কাত হয়ে গিয়েছিল, সে দুটো এখনও কাত হয়েই আছে। সন্দেহ হয়, আরও একটু ঝুঁকে পড়েছে। মনে হতে পারে, বেচারা সরিয়াড়ি যেন তার হেঁট মাথা আর সোজা করে তুলতে পারছে না।

দিবাকর সাইকেল চালিয়ে তার কাঠের গোলাতে যায় আর বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারা যায়, দিবাকরের মাথাটাও যেন ঝুঁকে রয়েছে। মাথা তুলে আর চোখ তুলে কিছুই দেখতে চায় না দিবাকর।

বলাই বলে—আমি বিশ্বাসই করতে পারি না জয়ন্তদা, আত্রেয়ীর মত মেয়ে কখনও...।

জয়ন্তবাবু—আত্রেয়ীর দোষ নয়। দোষ হল ওদের, ওই চা বাগানওয়ালা বড়লোকের পরিবারটি, যাঁরা দু' দিনের জন্যে এখানে এসে এক গরিবের মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার বাড়াবাড়ি করছেন।

বলাই—আমিও তো তাই বলছি।

পরেশ বলে—শ্রীলেখা কটেজের ওই ভদ্রলোককে দেখলে আমার গা জ্বালা করে। ভদ্রলোক যেন আত্রেয়ীদিকেও একটি বান্ধবী মেয়ে মনে করছেন। হো হো, হি হি, কত রকমের কত হাসি।

দাবার ছক সামনে পাতা ; কিন্তু ঘুঁটি চালতে গিয়ে আনমনা হয়ে যান হাবুলবাবু। তারপরেই বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—না ; খুবই অপমানের একটা ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

গোষ্ঠবাবু—শুনছি, আজকাল শুধু মেয়েটিরই সঙ্গে বেড়াতে বের হয় আত্রেয়ী।

হাবুলবাবু—এরকম হলে তবু একটা মানে হয়। কিন্তু এই ছোকরা ভদ্রলোক কি সত্যিই ভদ্র হয়ে থাকতে পারবে ?

গোষ্ঠবাবু—ওরা যাবে কবে ?

হাবুলবাবু—কে জানে ?

গোষ্ঠবাবু—প্রদোষদার জামাইয়ের মেয়াদের আর কতদিন বাকি আছে ?

হাবুলবাবু—তা'ও ঠিক জানি না, দিবাকর বলছিল, বোধ হয় দেড় বছরেরও কিছু বেশি।

গোষ্ঠবাবু—আত্রেয়ীকে যদি...।

হাবুলবাবু—না না ; আত্রেয়ীকে কিছু বলবার কোনও মানে হয় না। আত্রেয়ীর কোনও দোষ নেই। আপনাদের যদি সাহস থাকে, তবে শ্রীলেখা কটেজের লোকগুলোকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করুন না কেন, কবে চলে যাবে ?

গোষ্ঠবাবু—তার পর ? যদি বলে, এখন যাব না ?

হাবুলবাবু—তবে যাইয়ে দিতে হবে। দিবাকর বলছিল, আর দেরি না করাই উচিত।

চিনুর পিসিমা রোজই অকারণে রাগ করে চেঁচামেচি করছেন—এ এক জ্বালা হল। এই দেখলাম বাতাসার ঠোঙাটা এখানেই আছে, এই দেখছি নেই। ওরে ও চিনু, কোথায় সরালি ঠোঙাটাকে ?

চিনু বলে—তুমিই তো সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমার ঘরের কুলুঙ্গিতে রাখলে।

—একবার দৌড়ে গিয়ে দেখে আয় তো মা, তোদের আত্রেয়ীদি আজও আবার বেড়াতে বের হল নাকি ?

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর কাছে যখন তখন আক্ষেপ করেন সন্তুর মা।—জানি না, আপনি কী মনে করেন বুলুর মা, আমি কিন্তু মনে করি, আত্রেয়ী মেয়েটার দোষ নয়।

বুলুর মা—একটুও না। হাওয়া বদলের মানুষগুলো ছল করে চমৎকার হাসতে পারে, ঢং করে চমৎকার মায়া দেখাতে পারে, সেই জন্যেই তো ভয় হয়।

সন্তুর মা—জঞ্জালগুলো যাবে কবে ?

বুলুর মা—বলাই বলছিল, ভয় করবার তেমন কিছু নেই।

—কেন ?

—ওই, শুধু একটা দুটো দিন কটেজের চশমাপরা ছেলেটার সঙ্গে একটু বেড়াতে বের হয়েছিল আত্রেয়ী। তারপর আর নয়। আজকাল শুধু মেয়েটার সঙ্গে বেড়াতে বের হয়।

—তা মেয়েটার সঙ্গে একশোবার বেড়াতে বের হোক ; দুঃখের প্রাণ কদিনের জন্যে একটা সাথীর

সঙ্গে গল্প করে আর হেসে-খেলে নিক না কেন, কোনও দোষ নেই।

—তবু, বাইরের এই লোকগুলো যত তাড়াতাড়ি চলে যায়, ততই ভাল।

—বীণা মাস্টারনি বলছিল, ওরা নাকি লোক ভাল।

—লোক ভাল হলেই কী ? তাতে আত্রেয়ীর কী আসে যায় ? আত্রেয়ীর যা ভাল হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। স্বামীর কাছে নিয়মমত চিঠি লেখে তো আত্রেয়ী ?

—লেখে।

—তবেই বুঝে দেখ, আত্রেয়ীর মনে কোনও খাদ নেই। আমি তাই নরেন ছোঁড়াকে সেদিন খুব ধমকে দিয়েছি।

—কেন ?

—নরেন বলছিল, আত্রেয়ীদিকে আজকাল নাকি একটি চেঞ্জার মেয়ের মত দেখায়।

—দেখাতে পারে। ওই পর্যন্ত। আত্রেয়ীকে তো চিনি, সে মেয়ে কারও ছলনায় টলবার মেয়ে নয়।

—নরেন অবিশ্যি বললে যে, আত্রেয়ীর ওপর কোনও রাগ-টাগ ওদের নেই ; ওরা রেগেছে শ্রীলেখা কটেজের লোকটার উপরে।

সারাদিন পেট্রল পাম্পের চাকরি করে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে আসেন সামন্তবাবু। কিন্তু চায়ে চুমুক দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন—এ কি চা ? না চিরেতার জল ?

নীহারের মা ; সামন্তবাবুর স্ত্রী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কী হল ?

সামন্তবাবু—চিনি খুবই কম হয়েছে। কিন্তু আমি তো আত্রেয়ীর তেমন কিছু দোষ দেখি না। শ্রীলেখা কটেজের সেই ছোকরা ভদ্রলোকটারই যত মায়াবিপনা...।

নীহারের মা এইবার বিরক্ত হয়ে মুখ খোলেন। —কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই তো করবার মুরোদ হল না। যেমন দিবাকর, তেমনই তুমি। শুধু আড়ালে যত গজর গজর।

সামন্তবাবুর গলার স্বর করুণ হয়ে যায়। —কী করা যায় ; বলতে পার ?

মাধব আর বিমল গাঁয়ের ঝিল থেকে মাছ ধরে বাড়ি ফিরবার পথে, সরিয়াডির থানার আউটপোস্টের কাছে, ঠিক যেখানে সড়কের শেষ ল্যাম্প সন্ধ্যা থেকেই নিবু-নিবু হয়ে জ্বলে, সেখানে দাঁড়িয়ে হাওয়াবদলের তিন জন মানুষের হাসি-গল্পের হররা শুনতে পেয়েছে।

নেশাজড়ানো স্বরে কথা বলছেন ব্রিচেসপরা সেই শৌখিন শিকারি ভদ্রলোক। —শ্রীলেখা কটেজের নিখিল সেনের পায়ের ধুলো জোগাড় করে দিতে পারেন মশাই ?

—কেন ? কেন ? এক সঙ্গে প্রশ্ন করেই ফণী মিত্র আর জগৎ ব্যানার্জি মুখ টিপে হাসতে থাকেন।

ব্রিচেস বলেন—নাঃ, বলতে পারব না। বলতে গেলে বুক ফেটে যাবে। আমি কালই চলে যাব।

ফণী মিত্র—থানা অফিসার নাকি আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়েছেন ?

—দিয়েছে মশাই, দিয়েছে।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে মাধব আর বিমলের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সেই নেশাজড়ানো ব্রিচেস। —এই যে, এই এরা, এদেরই থানা অফিসার।

মাধবও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, আর গলার স্বর একেবারে চেপে দিয়ে কথা বলে—চল বিমল ; কিছু বলিস না।

বিমল বলে—কিন্তু এইসব উপদ্রব যাবে কবে ?

একটা মাস, দুটো মাস, তিনটি মাসও পার হতে চলল ; সরিয়াডির প্রাণে একটা অস্বস্তির ব্যথা এইভাবে শুধু ফিসফিস করছে। জোরে চেঁচিয়ে উঠতে পারছে না। অপমানটা গায়ে বিঁধছে, কিন্তু হেঁট মাথা উঁচু করে তুলে ধরতে পারছে না। মিউনিসিপ্যাল-কমিটিরও কী যেন হয়েছে ; বোধহয় ফাণ্ডে কুলোচ্ছে না কিংবা হাত-পা অলস হয়ে গিয়েছে। কাত হয়ে হেলে পড়া ল্যাম্পপোস্ট দুটোকে আর সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া আজও সম্ভব হল না।

দিবাকর মাঝে মাঝে গর্জন করে বটে ; হাবুলবাবুও বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করেন ; কিন্তু কটেজের মানুষগুলিকে টলিয়ে নড়িয়ে সরিয়ে দেবার সাহস আছে কি ? নেই বোধ হয়।

আগন্তুক অস্থায়ীর ব্যবহার প্রায়ই আঘাত পায় ছোট্ট সরিয়াডির স্থায়ী প্রাণগুলি, কিন্তু এরকম আঘাত কোনওদিনও পেতে হয়নি। এ রকম ভয়ও কোনও দিন পেতে হয়নি। বাইরের থেকে দু'দিনের ফুর্তির একটা হাসি এসে প্রদোষ সরকারের মেয়ের জীবনের একটা চিরকালের চিহ্নকে হাসিয়ে পাগল করে আর এলোমেলো করে দিয়ে চলে যাবে ? সরিয়াডির স্থায়িতাসুখী গর্বটাই বোধ হয় ভয় পেয়েছে।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির কাঁটালতার ঝোপের ফড়িংও উসখুস করে। এক পা নিয়ে বারান্দার চেয়ারে চুপ করে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন প্রদোষ সরকার, কিন্তু উঠতে গেলেই যেন টলে ওঠেন। হাতের জোর কি কমে গেল ?

শ্বাসকষ্টের মানুষ হৈমবতী, আত্রেয়ীর মা, তিনি পুজোর ঘরের দরজার গায়ে তাঁর রোগের শরীরের সব অসহায়তা এলিয়ে দিয়ে শুধু দেখতে থাকেন—আত্রেয়ী বেড়াতে বের হয়ে গেল। বলেও গেল না, ঠিক কখন ফিরবে।

কাকিমা কতবার বলেছেন—রোজই শুধু শ্রীলেখা কটেজে কেন রে আত্রেয়ী ? মাঝে-মাঝে দিবাকরের বউয়ের সঙ্গে একটু দেখাটেখা করে আসতে তো হয়।

আত্রেয়ী হাসে—সে তো যাবই ; শান্তি বউদি তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। শান্তি বউদি এখানকার দু'দিনের মানুষ নয়।

কাকিমা—দু'দিনের মানুষদের সঙ্গে শুধু দুটো দিন ভদ্রতা করলেই তো হল।

আত্রেয়ী—আমিও তো তাই করছি। মঞ্জুরা আর মাত্র তিন মাস আছে।

আত্রেয়ী চলে যাবার পর মণিদিদা তাঁর জপের মালা থামিয়ে কথা বলেন—তোমরা আত্রেয়ীকে বেশি বাজে কথা-টথা বলো না সুহাস। ওর দোষ নেই।

কাকিমা—আমি আত্রেয়ীর দোষ ধরছি না। ওর মন, ওর বয়স তো একটু হেসে খেলে থাকতে চাইবেই। কিন্তু একটু সাবধান থাকা উচিত।

প্রদোষবাবু হাসেন—তোমরা সেরকম মেয়ে পাওনি, সুহাস। মিছিমিছি কোনও ভয়-সন্দেহ করো না।

কিন্তু কাঁটালতার ফড়িং বোধ হয় ভয় পেয়েছে বলেই উসখুস করে ভয় তাড়াতে চেষ্টা করছে। প্রদোষ সরকার জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়েন—আমার পা থাকলে আমি নিজেই আত্রেয়ীকে রোজ বেড়াতে নিয়ে যেতাম।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলেন আত্রেয়ীর মা—হেমন্তর চিঠির উত্তর দিয়েছে আত্রেয়ী ? আজ না চিঠি লেখবার কথা ছিল ?

আত্রেয়ীর ঘরের টেবিলটার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন কাকিমা—হ্যাঁ, লিখেছে বলে মনে হচ্ছে।

টেবিলটার কাছে এগিয়ে যান কাকিমা। হ্যাঁ, চিঠিটাকে অর্ধেক লিখেই চলে গিয়েছে আত্রেয়ী।

"আমার একটা অনুরোধের কথা রাখবে কি ? মন খারাপ করো না। সব সময় হেসেখেলে থাকবে। আমিও তো জেলেই আছি। তবু হেসে খেলে বেড়িয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। স্বাস্থ্যের দিকেও একটু নজর রেখো। আর একটা কথা...সব মনে আছে, কিছুই ভুলে যাইনি। তুমি যখন..."

কাকিমা নিজের মনে বিড়বিড় করেন—ভাল কথাই তো লিখেছিস ; সবই তো ঠিক আছে।

চমকে ওঠেন কাকিমা। বাইরের বারান্দাতে কে যেন হঠাৎ এসে আর চেঁচিয়ে উঠেছে—হে হে হে। কেমন আছেন প্রদোষবাবু ? খবর ভাল ?

মোষের শিঙের লাঠিটাকে হাতে দুলিয়ে কথা বলছেন চন্দ্রবাবু।

প্রদোষবাবু—আসুন চন্দরদা, অনেকদিন পরে এলেন।

চন্দ্রবাবু—আসি বা না আসি, সব সময় ভাবতে চেষ্টা করি, আপনারা সবাই ভাল আছেন। ভাল থাকলেই হল।

প্রদোষবাবু হাসেন—আপনার মত ভাল থাকতে আমরা কী করে পারব বলুন ? নানারকম

ভাবনা-চিন্তা তো আছেই, তার ওপর... ।

চন্দ্রবাবু—এতদিনে সত্যি কথাটা তা হলে স্বীকার করলেন ? খুব সত্যি কথা প্রদোষবাবু আমি সবচেয়ে ভাল আছি। যেই হোক, সরিয়াডির যত চেঞ্জার আর নো-চেঞ্জার, সবার চেয়ে আমি চালাক।

প্রদোষবাবু—বুঝলাম না, চন্দরদা। আপনি চালাক হবেন কেন ? আপনি তো জ্ঞানী মানুষ।

—হে হে হে ; চেঁচিয়ে হাসতে থাকেন চন্দ্রবাবু।—কিন্তু আমার জ্ঞানকে যে কেউই পছন্দ করে না।

—কে পছন্দ করে না ?

—দিবাকর, গোষ্ঠ, হাবুল, হয়ত আপনিও।... আচ্ছা, চলি এখন প্রদোষবাবু। আসল কথাটা কী জানেন ? কিছুই না। কিচ্ছু নেই। কিছুই থাকে না। সবই তিরছি নদীকা পানি।

প্রদোষবাবুর পিঠে একবার হাত বুলিয়ে নিয়েই ব্যস্তভাবে চলে গেলেন চন্দ্রবাবু।

—হৈম ? শুনছ ? একবার এদিকে এসো। ডাকতে গিয়ে প্রদোষ সরকারের চোখ ভিজে যায়।

আত্রেয়ীর মা ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন—কী হল ?

প্রদোষবাবু—সবই যদি তিরছি নদীর পানি হয়, তবে বেঁচে থাকব কী করে ?

কাকিমা ছুটে আসেন—বড়দা কেন যে এত ভয় করছেন, বুঝছি না। এই তো চিঠি, হেমন্তকে আজই লিখেছে আত্রেয়ী। পড়ে দেখুন।

চিঠিটাকে পড়ে নিয়েই হেসে ফেলেন প্রদোষ সরকার।—বলেছি না, ভয় করবার মত কিছুই হয়নি, হচ্ছেও না। কিন্তু ওরা যাবে কবে ?

॥ ১০ ॥

না, এখনও তিরছি নদীর ঝর্না দেখতে যাবার অনুমতি পায়নি মঞ্জু। কিন্তু তর সয়নি মঞ্জুর ; একদিন শালবনের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর কানের কাছে গল্পটাকে বলেই দিয়েছে।

মল্লিক ডাক্তার বলেছেন ; বেশি দূরে নয়, বেশিক্ষণও নয়, বাড়ির কাছাকাছি সামান্য একটু বেড়িয়ে আসাই ভাল।

মঞ্জু কিন্তু মল্লিক ডাক্তারের উপদেশ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে রাজি নয়।—না আত্রেয়ী, এত তুকুপুকু করবার কোনও মানে হয় না। একদিন তো অপারেশনের টেবিলে শুয়ে পড়তে হবে, আর উঠতেও হবে না বোধ হয়। তার আগে যা পারি আর যতটা পারি বেড়িয়ে নেওয়াই ভাল।

আত্রেয়ী—এরকম করে কথা বললে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে কোনওদিন বেড়াতে বের হব না।

মঞ্জু হাসে—সত্যি কথা বলছি ; রাগ করছ কেন ?

আত্রেয়ী—একেবারে মিথ্যে কথা। আমি বলছি, তোমার অসুখ সেরে যাবে।

মঞ্জু—কেমন করে বুঝলে ?

আত্রেয়ী—আমার মন বলছে।

আত্রেয়ীর হাত ধরে মঞ্জু যেন করুণ মিনতির সুরে কথা বলে—তাই বলো আত্রেয়ী ; বার বার বলো। সে বেচারাকে আমি যে সত্যি ঠকাতে চাই না। ওর জন্যেই আমার এত বাঁচতে ইচ্ছে করে।

আত্রেয়ীর চোখ ভিজে যায়।—আমাকে আবার একথা বলতে হবে নাকি ? আমি তো তোমার জন্যে মহাদেও পাঁড়ের মন্দিরে পুজো পাঠিয়েছি।

কাছারিপাড়া পার হলেই লাল মাটির যে ডাঙাটা তিরছি নদীর খাত পর্যন্ত গড়িয়ে চলে গিয়েছে, সেই ডাঙায় বড়-বড় কালো পাথরের পিঠ যেন বসবার আসনের মত এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আমলকির কয়েকটা ঝোপও আছে। এক জায়গায় বুনো খেজুর গাছের একটা ভিড়ও আছে। তা ছাড়া কয়েকটা শিরীষও আছে।

কখনও কালো পাথরের পিঠের উপর, কখনও বা শিরীষের ছায়ার কাছে ঘাসের উপর বসে থাকতে ভাল লাগে। মঞ্জুর মুখের হাসিটাও নতুন শিরীষ ফুলের মত লালচে হয়ে যায় ; মঞ্জুর জীবনের গল্প ফুরোতে চায় না।

কিন্তু আত্রেয়ীর জীবনে কি কোনও শিরীষ ফুলের গল্প নেই ? লাজুক রঙিন গল্প ? কিন্তু জানতে চেষ্টা করেনি, জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছে মঞ্জু।

বুঝেছে মঞ্জু, সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ী মঞ্জুর পাশে বসে আর মঞ্জুরই স্বপ্নের গল্প শুনে ধন্য হয়ে গিয়েছে।

আত্রেয়ীর সেই বোকা দুঃসাহসের কোনও চিহ্নও আর নেই। প্রীতি বউদিও একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আত্রেয়ী এসে নিজেই তাগিদ দিয়ে মঞ্জুকে ব্যস্ত করে তোলে আর মঞ্জুর সঙ্গে বেড়াতে চলে যায়।

হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে রেলপার্সেল হয়ে প্রকাণ্ড একটা কাঠের বাক্স এসেছে। গল্পের বইয়ে ভরা একটা বাক্স। আত্রেয়ীও শুনতে পেয়েছে, চেঁচিয়ে কথা বলছেন নিখিলবাবু—জানিস তো মঞ্জু, কার জন্যে এত গল্পের বই আনানো হল ?

মঞ্জু হাসে—তা একটু জানতে পেরেছি বই কি।

একটা একটা করে গল্পের বই বাড়িতে নিয়ে যায় আত্রেয়ী। পড়া শেষ হলেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

বই পড়বার জন্যে আত্রেয়ীর এই ব্যস্ততাও দেখা যায়। তাই মঞ্জু একদিন হঠাৎ আত্রেয়ীকে বলেই দেয়।—তুমি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারনি আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—কী ?

মঞ্জু—মেজদা এত গল্পের বই কার জন্যে আনিয়েছেন, বলতে পার ?

আত্রেয়ী—আমার জন্যেই তো মনে হচ্ছে।

হেসে ফেলে মঞ্জু—ভুল, খুব ভুল ধারণা করেছ আত্রেয়ী। তোমাদের সরিয়াডিতে যে ছোট একটা লাইব্রেরি আছে সেই লাইব্রেরিকে দান করবার জন্যে এত গল্পের বই আনিয়েছে মেজদা।

আত্রেয়ীও হাসে—আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি মঞ্জু। তাই লোভীর মত তোমাদের বই চেয়ে নিয়ে...।

মঞ্জু—না না ; তুমি ঠিকই করেছ। মেজদা বলেছেন, তোমার পড়া হয়ে গেলেই সব বই লাইব্রেরিতে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেজন্যে আবার মনে করে বসো না যে...।

আত্রেয়ী—কী বললে ?

মঞ্জু—আসল কথা হল, মেজদা লাইব্রেরিটাকেই সাহায্য করতে চান।

আত্রেয়ী—তাতেও আমাকেই সাহায্য করা হল। যখন ইচ্ছে তখন লাইব্রেরি থেকে বই আনব আর পড়ব।

মঞ্জু—হ্যাঁ, সে রকম একটা সুবিধা পাবে, ঠিকই।

একদিন শ্রীলেখা কটেজের গেটের কাছে পৌঁছেই যখন গেটের পাশের জবা গাছটার একটা ডাল ধরে কুঁড়িগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী, তখন কঠিন ফিলসফির একটা শক্ত-পোক্ত প্রকাণ্ড বই হাতে নিয়ে আর ঘরের জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে হেসে ওঠে নিখিল—ছুঁয়ে দিন ; একটু ভাল করে ছুঁয়ে দিন।

আত্রেয়ী—কী বলছেন ?

নিখিল—ওই সিঁড়িঙ্গে জবার কুঁড়িগুলোকে আপনি একটু ভাল করে ছুঁয়ে দিন।

আত্রেয়ী—কেন ?

নিখিল—তা হলে কুঁড়িগুলো এখনই ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

আত্রেয়ী—এতদিন তা হলে কী করে কুঁড়ি ফুটেছিল ? আমি তো ছুঁইনি।

নিখিল—ফুটেছিল নাকি ?

আত্রেয়ী—ফোটেনি ?

নিখিল—মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করুন।

বইয়ের লেখার দিকে চোখের সব দৃষ্টি ঢেলে দিয়ে আর একেবারে নীরব হয়ে আবার বই পড়তে থাকে নিখিল।

ঘরে ঢুকেই দেখতে পায় আত্রেয়ী, মঞ্জু হাসছে।—মেজদার কথার মানে কিছু বুঝতে পারলে, আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—না।

মঞ্জু—তোমাকে ঠাট্টা করলেন মেজদা।

আত্রেয়ী—কিসের ঠাট্টা?

মঞ্জু—এই জবাটার শুধু কুঁড়ি ধরে আর ঝরে পড়ে যায়; ফুল ফোটে না। তাই মেজদা বোম্বাইয়ের নার্সারি থেকে খুব দামি সার আনিয়েছে। তিনদিন হল সার দেওয়াও হয়েছে। এইবার দেখবে, কী চমৎকার ফুল ফুটবে।

আত্রেয়ী—ভালই হবে। কিন্তু সেজন্যে আমাকে...।

মঞ্জু—বুঝলে না? তুমি হয়ত মনে করবে যে, সত্যিই তুমি ছুঁয়েছিলে বলে কুঁড়ি ফুটেছে। তাই মেজদা ঠাট্টা করে তোমাকে একটু সাবধান করে দিলেন।

আত্রেয়ী—আমি কিন্তু সত্যিই এরকমের একটা কাণ্ড করেছিলাম একদিন। আমাদের লেবু গাছের গোড়াতে আমি যেদিন জল দিলাম, ঠিক তার পরের দিনেই গাছে ফুল ধরেছিল।

মঞ্জু—সেটা তোমাদের সরিয়াডির লেবু গাছ? কলকাতা থেকে আনানো জবা গাছ নয়।

প্রীতি বউদি হেসে ফেলেন—বসো আত্রেয়ী। একটু চা খেয়ে নাও। মঞ্জুর সঙ্গে মিছে আর তর্ক করো না।

মঞ্জু বলে—পুরো তিনটি মাস ধরে প্রায় রোজই তো মেজদাকে দেখলে; কিন্তু দেখলে তো, কেমন অদ্ভুত মানুষ? হয়ত, কালই দেখবে, ওই এত আদুরে জবাটাকে উপড়ে ফেলে দিয়ে হেসে ফেলবে। জিজ্ঞেস করলে বলবে, নাঃ, এটা একেবারে বাজে জবা রে মঞ্জু।

আত্রেয়ী—তুমি কিন্তু একটা ভুল হিসেব দিলে। এখানে তোমাদের এখনও পুরো তিন মাস হয়নি।

মঞ্জু—না হোক; এবার চলে যাবার কথাই ভাবতে হচ্ছে।

আত্রেয়ী—এত শিগগির চলে যাবে?

মঞ্জু—কপালে থাকলে আবার নিশ্চয় আসব।

পরের দিনই আত্রেয়ীর একটা কাণ্ড দেখে হাসতে থাকে মঞ্জু, প্রীতি বউদিও হাসেন। ওঘর থেকে অখিলবাবুও বলেন—কী হল তোদের মঞ্জু? এত হাসিহাসি কিসের?

আত্রেয়ী এসেছে; আত্রেয়ীব সঙ্গে ওদের চাকর রামুয়া এসেছে। তোয়ালে দিয়ে ঢাকা দুটো মস্ত বড় থালার উপর চারটে করে বাটি, চার রকমের খাবারে ঠাসা। মোট আটরকমের খাবার। রসবড়া আছে, ক্ষীরেব পায়েস আছে; আবার ছোলার ডালের নোনতা হালুয়াও আছে।

মঞ্জু বলে—আত্রেয়ী আমাদের লাস্ট সাপার খাইয়ে দিচ্ছে বড়দা!

অখিলবাবু—আমাকেও একটু দিস।

আত্রেয়ী—মনে করো না মঞ্জু, সবই কাকিমা করেছেন। আমিও নিজে হাত লাগিয়ে অনেক কিছু করেছি। এই চমচম আমারই তৈরি।

নিখিলের গলার স্বর শোনা যায়—আমাকে এক কাপ চা দাও, বউদি।

আত্রেয়ী মঞ্জুর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কথা বলে—নিখিলবাবুকে চায়ের সঙ্গে এই খাবারও কিছু দিয়ে দাও।

চমকে ওঠে মঞ্জু। মঞ্জুর চোখের এতক্ষণের স্নিগ্ধদৃষ্টিটা বেশ একটু রুক্ষ হয়ে কাঁপতে থাকে। আত্রেয়ীর চোখেমুখে এমন আশার হাসির মানে কী? এতদিন পরে, আবার হঠাৎ ভুল করে কী ভেবে ফেলেছে আত্রেয়ী?

মঞ্জু বলে—মেজদা এসময় চায়ের সঙ্গে কিছু খায় না। কিছু দিলেও খাবে না। তুমি সেজন্যে

ব্যস্ত হয়ো না, আত্রেয়ী।
আত্রেয়ী—একবার বলেই দেখো না ?
মঞ্জু এইবার যেন ওর চোখের ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি লুকিয়ে ফেলতে চায় ; তাই নিখিলের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে আর বেশ একটু চড়া স্বরে ডাক দেয়—মেজদা, চায়ের সঙ্গে এখন আর-কিছু খাবে নাকি ?
নিখিল উত্তর দেয়।—হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো চা চাইলাম। তোর বন্ধু কি-সব খাবারটাবার এনেছে শুনলাম, তা থেকে আমাকেও কিছু খেতে দে। শুধু বড়দাকেই দিচ্ছিস কেন ?
মঞ্জু নীরব হয়ে যায়। এইবার প্রীতি বউদি এগিয়ে এসে আত্রেয়ীর মুখের দিকে বেশ শক্ত ভঙ্গির একটি দৃষ্টি তুলে, অথচ খুব মৃদু স্বরে কথা বলেন।—একটা ভদ্রতা দেখালেন আমাদের নিখিল সেন। খাবার খেতে একটুও ইচ্ছে নেই, কিন্তু তুমি হয়ত মনে করবে যে, একজন বড়লোক মানুষ তোমার মত মানুষের জিনিস তুচ্ছ করলেন, সেইজন্যে ; এ ছাড়া আর কোনও কারণ নেই।
আত্রেয়ী—আমি জানি বউদি।
প্রীতি বৌদি—কী জান ?
আত্রেয়ী—নিখিলবাবু খুব মহৎ মানুষ।
মঞ্জু—কথাটা তো বললে, কিন্তু মানেটা বুঝে নিয়ে বলেছ তো ?
আত্রেয়ী—বুঝেছি বইকি। নিখিলবাবু কখনও ছোট হয়ে যেতে পারেন না।
মঞ্জু—নিখিল সেনকে ছোট করে দেবার সাধ্যিও কারও নেই।
আত্রেয়ী—খুব সত্যি কথা।
প্রীতি বউদির চোখের রুক্ষ দৃষ্টিটা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। মঞ্জুর নীরব মুখের গম্ভীরতাও মুছে যায়। সরিয়াডির মেয়ের মুখ থেকে এই উপলব্ধির ঘোষণাটি শোনবার জন্যেই তো প্রীতি বউদি আর মঞ্জুর মন অশান্ত হয়ে উঠেছিল। যে কথাটা আত্রেয়ীকে বুঝিয়ে দেবার জন্য এত চিন্তা আর চেষ্টা হয়েছে, সেটা বুঝে নিতে পেরেছে আত্রেয়ী। সরিয়াডির মেয়ের বুদ্ধি-শুদ্ধি মতিগতি আর দুঃসাহসের উপর প্রীতি-বউদি আর মঞ্জুর মায়ার শাসন সফল হয়েছে।
মল্লিক ডাক্তার একদিন খুশি হয়েই বললেন—হ্যাঁ, এবার একটু দূরে দূরে বেড়িয়ে আসতে পারো মঞ্জু মা। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করো না।
আত্রেয়ী আসতেই মঞ্জুর প্রাণের খুশিটা মুখর হয়ে ওঠে।—ঠিক করেছি আত্রেয়ী, যাবার আগে তোমাকে রাঙিয়ে দিয়ে যেতে হবে।
আত্রেয়ী—বুঝলাম না।
মঞ্জু—আজ নয়, কাল বিকেলে দুজনে তিরছি নদীর ঝর্না দেখে আসি চল। ডাক্তারের কোনও মানা আর নেই।
আত্রেয়ী—বেশ তো।
মঞ্জু হাসে—কিন্তু মুখটি এত শুকনো করে কথা বলছ কেন আত্রেয়ী ?
আত্রেয়ী—কী বললে ?
মঞ্জু—সুন্দর মুখটিকে একটু রাঙা করে নিয়ে কথা বলো।
আত্রেয়ী—আপনি বলুন তো বউদি, আপনাদের চলে যাবার কথা শুনে মুখ রাঙা করি কী করে ?
প্রীতি-বউদিও হেসে সায় দেন—ঠিক কথা।
আত্রেয়ীর সুন্দর শুকনো মুখের মধ্যে কালো চোখের তারা দুটো যেন ভিজে গিয়ে চিকচিক করে। মঞ্জু বলে—ছি আত্রেয়ী, এরকম করছ কেন ? আমরা আবার ছ'মাস পরে আসছি।
আত্রেয়ী—এত সৌভাগ্য আশা করি না।
মঞ্জু—বিশ্বাস করো। বড়দার তাই ইচ্ছে। সরিয়াডির জলবাতাসে বড়দা খুব উপকার পেয়েছেন।
ব্যস্তভাবে ঘরে ঢোকে নিখিল—ট্রেসপাস করলাম, কিছু মনে করিস না মঞ্জু। আমি এঁকেই একটা কথা বলতে এসেছি।

মঞ্জু—আত্রেয়ীকে ?

নিখিল—হ্যাঁ।

মঞ্জু—বলো।

আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে নিখিল—চলুন, কোথায় আপনাদের তিরছি নদীর ঝর্না; আপনাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। যাবেন ?

আত্রেয়ী—চলুন।

চমকে ওঠে মঞ্জু আর দেখতেও পায়, আত্রেয়ীর এতক্ষণের শুকনো মুখে হঠাৎ হাসির আভা লেগে কেমন রাঙা হয়ে উঠেছে।

মঞ্জু বলে—সত্যিই যাবে নাকি আত্রেয়ী ?

আত্রেয়ী—যাই ; নিখিলবাবু যখন বলছেন, তখন একটু ঘুরেই আসি।

চলে গেল নিখিল আর আত্রেয়ী।

গেট পার হতে গিয়েই হাসতে থাকে নিখিল—এই দেখুন, আপনি ছুঁয়ে দিয়েছিলেন বলেই জবাটার কত ফুল ফুটেছে।

আত্রেয়ী হাসে—জানি, বোম্বাই থেকে দামি সার আনানো হয়েছে।

নিখিল আর আত্রেয়ীর মুখের হাসির শব্দ গেট পার হয়ে চলে গেল। প্রীতি ডাক দিয়ে বলেন—ওরা দুজনে বেড়াতে বের হল বুঝি মঞ্জু ?

মঞ্জু—হ্যাঁ।

প্রীতি বউদি—কেন ?

মঞ্জু—জানি না।

॥ ১১ ॥

কাছারিপাড়ার সড়কের সেগুনের ছায়া ধরে এগিয়ে চলেছে নিখিল আর আত্রেয়ী। সড়কের পাশে মিউনিসিপ্যাল অফিসের রেকর্ড ঘরের ঘুলঘুলিটা যেন সরিয়াডির চোখ, কটমট করে তাকিয়ে দেখছে। ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে বাইরে উঁকি দিতে গিয়ে হেড ক্লার্ক হাবুলবাবুর চোখ যেন একটা যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে জ্বলছে।

লালমাটির ডাঙাটার শিরীষের ছায়াও পার হয়ে চলে গেল নিখিল আর আত্রেয়ী। আজ সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ীই যেন গাইড হয়েছে ; সরিয়াডির অচেনা একটি বাইরের মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। যেতে যেতে নিখিলকেই মাঝে মাঝে সাবধান করে দেয় আত্রেয়ী—আঃ, নুড়িগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটছেন কেন ? ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটুন।

দেখতে পায়নি আত্রেয়ী, ওদিকের সড়কের উপরে ছোট নালার কালভার্টের কাছে, তিনটি সাইকেলের হ্যান্ডেল শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সরিয়াডির তিনটে আক্রোশ দম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পরেশ, বিমল আর মাধব, তিনজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে একদিকের মাঠের বুকে এই অদ্ভুত খুশির দুটি মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে।

আত্রেয়ী—আমলকি খাবেন ?

নিখিল—কোথায় আমলকি ?

আত্রেয়ী হাসে—আচ্ছা, আপনি এখানেই চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকুন।

কয়েক পা এগিয়ে যেয়ে মস্ত বড় একটা কালো পাথরের একেবারে মাথার উপর উঠে দাঁড়ায় আত্রেয়ী। পাথরটার গা ঘেঁষে আমলকির ঝোপ। ঝোপের মাথার উপর থেকে পট্‌ পট্‌ করে আমলকি ছিঁড়ে নিয়ে নিখিলের দিকে ছুঁড়তে থাকে আত্রেয়ী—ধরুন।

নিখিল হাসে—নেমে আসুন, আর দরকার নেই।

আঁকাবাঁকা জংলি নদী তিরছির খাত, বালুর উপর দিয়ে ঝিরঝিরে রোগা জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে শেওলামাখা সেঁতসেঁতে বালু। আত্রেয়ী বলে—আঃ, ওভাবে যেখানে-সেখানে পা

ফেলবেন না। চোরাবালি থাকতে পারে।

একটা বেঁটে বুনো খেজুরের গাছ। গাছের তলায় একটা উইঢিবি আর আর কয়েকটা গর্ত। সিগারেট ধরাবার জন্য খেজুর গাছের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে নিখিল।

আত্রেয়ী বলে—সরে আসুন, সরে আসুন।

নিখিল—কেন ?

আত্রেয়ী হাসে—ওই দেখুন, দুটো চোখ কী আশ্চর্য হয়ে আপনাকে দেখছে।

একটা গর্তের ভিতর থেকে ছোট্ট একটা শজারুর বাচ্চা ঘাড়ের কচি কচি কাঁটা কাঁপিয়ে আর চকচকে দুটো রাগের চোখ তুলে তাকিয়ে আছে।

আত্রেয়ী বলে—রামুয়া এখন থাকলে দেখতেন কি কাণ্ড হত ?

নিখিল—কী হত ?

আত্রেয়ী—শজারুটার চোখে কট্ করে এক মুঠো ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে শজারুর মাথাটা চেপে ধরত।

নিখিল—আমিও চেষ্টা করব না কি ?

আত্রেয়ী—থাক, আপনার আর এত সাহস করে দরকার নেই।... শুনতে পাচ্ছেন এখন ? ঝর্নার শব্দ ?

নিখিল—হ্যাঁ, খুব কাছেই তো মনে হচ্ছে।

আত্রেয়ী—না, এমন কিছু কাছে নয়। এখনও প্রায় আধ ঘণ্টা হাঁটতে হবে।

যেতে যেতেই বুনো কুলের একটা ঝোপ থেকে একটা পাকা কুল তুলে নিয়ে আর মুখে ফেলে দিয়ে হাসতে থাকে আত্রেয়ী—আপনি কিন্তু খাবেন না ; আপনার ভাল লাগবে না। মিষ্টি হলেও এ কুল বেশ কষা।

বেশ জোর একটা হোঁচট খেয়েছে আত্রেয়ী, বুঝতে পারেনি আত্রেয়ী, ঘাসের ভিতরে এত বড় একটা ছুঁচলো পাথরের টুকরো লুকিয়ে থাকতে পারে। হঠাৎ ঠোকর লেগে আত্রেয়ীর এক পায়ের চটি দূরে ছিটকে পড়েছে। ঢিলে খোঁপাটাও একেবারে আলগা হয়ে এলিয়ে পড়েছে। পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে আত্রেয়ী—এ কী হল ? আত্রেয়ীর পায়ের দুটো আঙুল রক্তে ভরে গিয়েছে।

চমকে ওঠে নিখিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে নিয়েই ব্যস্তভাবে আত্রেয়ীর কাছে এগিয়ে আসে—শেষে একটা কাণ্ড করেই ছাড়লেন।

হাত তুলে, নিখিলের এই চমকে ওঠা ব্যস্ততাকে যেন শান্ত হতে অনুরোধ করে আত্রেয়ী।—থামুন, আপনি একটুও ব্যস্ত হবেন না।

শালের হাওয়া ফুরফুর করছে। দূরের জঙ্গলের ঘুঘু ডেকেই চলেছে। খোলামেলা একটা বিরাট নিরিবিলির মধ্যে নিখিল সেন হঠাৎ যেন একেবারে একলা হয়ে গিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিখিল সেনের এই স্তব্ধতা হয়ত একটা চকিত মুগ্ধতা। চোখের কত কাছে একটা অদ্ভুত ছবি। খোঁপাটা পিঠের উপর এলিয়ে পড়েছে ; কপালের ঘাম ; ভুরু দুটো যেন একটু কুঁচকে আছে ; আর ঠোঁটের উপর একটা মিষ্টি হাসির নিবিড়তা থমকে রয়েছে। ঘাসের উপর উবু হয়ে বসে আর একটি হাঁটুর উপর চিবুক পেতে রেখে রুমালের ফালি দিয়ে পায়ের পাতার জখমের আঙুল দুটোকে বাঁধছে আত্রেয়ী। সিঁথিতে গুঁড়ো সিঁদুরের সরু দাগটা আর দু' হাতের সোনার রুলির পাশে দুটো শাঁখা। প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ী। অদ্ভুত এক স্টাইলের সাজে সেজে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছে।

নিখিল সেনের এই স্তব্ধতার মুখে কিন্তু অদ্ভুত একটি কৌতুকের হাসিও নীরব হয়ে কাঁপছে। কেমন চট করে আর কত শক্ত ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে নিখিলকে থামিয়ে দিয়েছে সরিয়াডির এই মেয়ে আত্রেয়ী। যদি এখন বিধাতা মশাই নিজেই এসে আর মায়া করে আত্রেয়ীর পায়ের ক্ষতের কাছে হাত এগিয়ে দেন, তবু, আত্রেয়ী বোধ হয় এইভাবে হাত তুলে থামিয়ে দেবে—আপনি এত ব্যস্ত হবেন না।

ভাল ; প্রদোষ সরকারের মেয়ের এই ভয় লজ্জা আর সতর্কতার মধ্যে যেমন বোকা একটা

অবিশ্বাস, তেমনই একটা বোকা স্পর্ধাও আছে। তবু দেখতে মন্দ লাগে না।

একটা সত্য কথা এখনই বলে দিতে পারে নিখিল ; কিন্তু সেটা বেশ একটু রূঢ় অহংকারের কথা হবে বলেই স্পষ্ট করে বলে দিতে ইচ্ছে করে না। স্কুলে পড়বার সময়ই ফার্স্ট এড শিখেছিল নিখিল ; আর ফ্রান্সের একটি বছরের মধ্যে দুটি মাস রেড ক্রসের অ্যাম্বুলেন্সের ভলান্টিয়ারও হয়েছিল। আহতের জন্য মায়া করে রুমাল হাতে নিয়ে কাছে ছুটে যাওয়া নিখিলের জীবনের একটা অভ্যেস মাত্র। এ ছাড়া সরিয়াডির মেয়ের পায়ের জখম ব্যাণ্ডেজ করে দেবার জন্য কোনও গরজ নিখিল সেনের মত মানুষের প্রাণে থাকতেই পারে না।

আত্রেয়ী বলে—চলুন এবার।

তিরছি নদীর কিনারা ধরে আরও অনেকেই হেঁটে চলেছে। বুঝতে পারা যায় ওরা এক-একটি পিকনিকের দল।

আত্রেয়ী বলে—মল্লিক ডাক্তারই সব গোলমাল করে দিলেন। তা না হলে এতদিনের মধ্যে অন্তত একটি দিন মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে এসে আপনারাও এখানে পিকনিক করে যেতে পারতেন। কত খুশি হত মঞ্জু।

নিখিল—এবার আর হল না।

আত্রেয়ী—আবার কখনও কি আপনারা আসবেন ?

নিখিল—আমার তো আপত্তি নেই। কিন্তু ওরা সত্যিই আবার আসতে চাইবে কিনা সন্দেহ।

আত্রেয়ী—তা হলে আপনি একাই আসবেন। অসুবিধের কী আছে ? শ্রীলেখা কটেজ তো আপনারই কাকার বাড়ি। অন্য কাউকে ভাড়া দিতে মানা করে দেবেন।

নিখিল হাসে—আপনি কি মনে করেন, চাকরি করি না বলেই আমার কোনও কাজটাজ নেই ?

আত্রেয়ী—তা মনে করব কেন ? নিশ্চয়ই আপনার অনেক কাজ আছে। কিন্তু কাজের চাপ থেকে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে চলে আসবেন। এই যে, দেখুন চেয়ে, ঝর্নার জল নীচের পাথরের উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে।

নিখিল—বাঃ, আগে ধারণা করতে পারিনি, এমন বিরাট আর বিশাল একটা ঝর্না দেখতে হবে।

আত্রেয়ী—ঠাট্টা করছেন ? কিন্তু খুব ভুল ঠাট্টা। একবার শ্রাবণ মাসে এসে দেখবেন, এই জিরজিরে রোগা ঝর্নার চেহারা সত্যি বিরাট হয়ে ওঠে কিনা ? দেখলে ভয় পেতে হবে।

নিখিল—চেষ্টা করব তা হলে ; দেখি, কোনও শ্রাবণ মাসে আসতে পারি কিনা।

দশ-বারো হাত উঁচু খাড়াই পাথরের মাথার উপর থেকে নীচের পাথরের উপর রোগা তিরছি নদীর একটা লিকলিকে ধারা ঝরে পড়ছে। এপারের ব্যাঙ লাফ দিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে। জলের বুদ্বুদের ছোট ছোট ফোসকা ভেসে উঠেই ফেটে যাচ্ছে। শালবনের হাওয়া রোগা ঝর্নার জলের ঝরঝর শব্দটাকে হঠাৎ এক-একটা ঝাপটা দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে সরে পড়ছে।

আত্রেয়ী—জলের ওপারে যাবেন ?

নিখিল—চলুন।

রোগা জলের ধারাটা দু' হাতের বেশি চওড়া নয়। এক লাফে পার হয়ে গিয়েই ভিজে বালুর উপর দাঁড়িয়ে আত্রেয়ীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় নিখিল—চলে আসুন।

নিখিলের আগ-বাড়ানো হাতের ইচ্ছাটাকে চোখে বোধ হয় দেখতেই পেল না আত্রেয়ী। পায়ের চটি দুটোকে খুলে আর হাতে তুলে নিয়ে আর একেবারে খুশি হরিণীর মত ত্বরিত-চটুল ভঙ্গিতে একটি লাফ দিয়ে জলের ধারাটাকে ডিঙিয়ে পার হয়ে যায় আত্রেয়ী।

নিখিলের মুখে খুশির হাসিটা যেন একটু ঠাণ্ডা-লাগা কাঁপুনির মত সিরসির করে ওঠে। —আপনি বোধ হয় স্কুলের স্পোর্টে...।

আত্রেয়ী—স্কুলে নয়, স্কুলে আমি পড়িনি। কিন্তু দিবাকরদা মাঝে মাঝে স্পোর্ট করাতেন ; তাতে আমিই...

নিখিল—লং জাম্পে ফার্স্ট হয়েছিলেন ?

আত্রেয়ী কলকল করে হেসে ওঠে—নিশ্চয়।

এইবার, ত্রিরছি নদীর জলের ধারার এপারে ধানক্ষেতের আল ধরে ধরে কিছুদূর হাঁটলেই ধানোয়ার রোডের উপরে ছোট একটা আমগাছের ছায়ার কাছে পৌঁছতে পারা যায়।

নিখিল বলে—রোদটা বেশ কড়া।

আত্রেয়ী—এদিকে তো গাছটাছ নেই ; কোথায় দাঁড়াবেন ?

নিখিল—না, দাঁড়াতে চাই না।

কিন্তু ধানোয়ার রোডের উপরে এসে উঠতেই হাঁপ ছাড়ে নিখিল আর হাঁটার ব্যস্ততাও মৃদু হয়ে যায়।—বাঃ বেশ চমৎকার ছায়া।

ছোট গাছ, ছায়াটাও ছোট, এমন ছায়ার মধ্যে জায়গাই বা কতটুকু ?

আত্রেয়ী—আপনি এখানে একটু জিরিয়ে নিন।

নিখিল—আপনি কী করবেন ? চলে যাবেন ?

আত্রেয়ী হাসে—না ; আমি এখন তিলকের মার সঙ্গে একটু গল্প করব।

নিখিল—কে তিলকের মা ?

আত্রেয়ী—ওই যে, রাস্তার পাশে ঝুড়ি নিয়ে বসে রয়েছে। ঝুড়িতে বরবটি।

নিখিল—বুড়ি যে রোদের মধ্যে বসে আছে।

আত্রেয়ী—তাতে কী হয়েছে ?

এগিয়ে যায় আত্রেয়ী। তিলকের মার সঙ্গে কথা বলে আর বরবটির দর করে। আমের ছায়ায় একাই দাঁড়িয়ে আব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে নিখিল—বরবটি কিনবেন নাকি ?

আত্রেয়ী—না।

নিখিল—তবে চলুন। হ্যাঁ, একটা কথা বলি। আপনি কিন্তু বেশ অবুঝ মানুষ।

আত্রেয়ী—কেন ?

নিখিল—কি কাণ্ডই না করলেন। হোঁচট খেলেন, আর রোদে মুখ শুকিয়ে গেছে, তবু একটু ছায়াতে দাঁড়াতেও ভুলে গেলেন।

আত্রেয়ী—ওতে কী আসে যায় ?

নিখিল—না ; খুব আসে যায়। আপনি একটু বুঝে দেখুন।

আত্রেয়ী হাসে—বুঝলাম না।

নিখিল—আজ যদি হেমন্তবাবু আপনাকে এসব কাণ্ড করতে দেখতেন, তবে...।

চমকে উঠে আর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাস্তার পাশের ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী।

নিখিল—তবে তিনি আপনাকে নিশ্চয় বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

সিগারেটের টুকরোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই নিখিল আবার বলে—হেমন্তবাবু কি দুঃখিত হতেন না ? আর আপনাকে ধমক দিয়ে দু-একটা কথা না বলেও ছাড়তেন ?

ঢিলে খোঁপাটাকে একটু শক্ত করে এঁটে দিয়ে আত্রেয়ী যেন একটা নিরেট নীরবতা হয়ে হাঁটতে থাকে।

নিখিল বলে—আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলবার মত এখন কেউ নেই বলেই আমি গায়ে-পড়ে আপনাকে এসব কথা বলছি। কিছু মনে করবেন না। আপনি আপনার নিজের দিকে একটু লক্ষ্য আর যত্ন রাখবেন, আপনি এখন শুধু আপনারই নিজের কেউ নন, আপনি আর একজনের অনেক আশার মানুষ।

আত্রেয়ীর মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নেয় নিখিল। দেখে খুশি হয়, আত্রেয়ীর নীরবতার মুখটা যেন একটা স্নিগ্ধ আলোর আভায় ভরে গিয়েছে।

নিখিল বলে—আমি তো বাইরের মানুষ, দুদিন পরেই চলে যাব। শুধু মুখের ভদ্রতা করে দু' একটা কথা বলা ছাড়া আপনার আর কোনও উপকার তো করতে পারবো না।

ডাঙার জংলি শিরীষের রঙিন মাথা দুলছে, এখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে নিখিল বলে—একটা অনধিকার চর্চা বটে ; কিন্তু বিশ্বাস করুন, ফিলসফি আর সায়েন্সের বই পড়ি আর চায়ের শেয়ারে যত পাওনা ডিভিডেন্ডের হিসাবই করি, হঠাৎ আমার মত

মানুষের শক্ত মনও যেন ছটফট করে ওঠে, হেমন্তবাবু আর কত দেরি করবেন ?

সরিয়াডির থানার আউটপোস্ট ; বারান্দার দেয়ালে গা এলিয়ে দিয়ে একটা রাতজাগা পাহারার চৌকিদার অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

নিখিল বলে—সত্যি যদি কখনও সুযোগ পাই, তবে একদিন নিশ্চয় আসব। অন্তত আপনাদের দুজনকে দেখবার জন্যে একবার আসব। তখন কিন্তু...।

হাসতে থাকে নিখিল। আত্রেয়ীও হেসে ফেলে—বলুন না, কী হবে তখন ?

নিখিল—কী আর হবে ? আপনি হয়ত অনেক কষ্টে চিনতে পারবেন আর বলবেন, হ্যাঁ, এই লোকটা একদিন গায়ে পড়ে অনেক বাজে কথা বলেছিল।

আত্রেয়ী—একটুও বাজে কথা নয়। কিন্তু আপনি কি সত্যিই আসবেন ?

নিখিল—আসব।

আত্রেয়ী হাসে—এটা কিন্তু বাজে কথা।

নিখিল—এতটা মিথ্যেবাদী মনে করবেন না।

আত্রেয়ী—মঞ্জুর বিয়ে হয়ে গেলে যেন একটা খবর পাই।

নিখিল—মঞ্জুর বিয়ে ? হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু সে-কথা আপনাকে জানাতে হলে আমার কিছু লেখবার দরকার হবে না মঞ্জু নিজেই আপনাকে দশ পাতা চিঠি লিখবে।

আত্রেয়ী—আরও একটা খবর, যেটা আপনি...

নিখিল চেঁচিয়ে হেসে উঠে—হ্যাঁ, সেরকম কিছু যদি হয়, তবে তার খবর মঞ্জুর চিঠিতে জানতে পারবেন।

কাছারিপাড়ার সড়কের সেগুন গাছের ছায়া পার হয়ে অমিয় ভবনের কাছে এসে পৌঁছতেই থমকে দাঁড়ায় আত্রেয়ী। অমিয় ভবনে ভাড়াটে নেই। খালি বাড়িটাকে চূনকাম করা হচ্ছে। আত্রেয়ী বলে—আমি এখন আর আপনাদের কটেজে যাব না নিখিলবাবু। সোজা বাড়িতেই ফিরে যাব।

নিখিল—আসুন।

অমিয় ভবনের একটা জানালা হঠাৎ কড়মড় করে বেজে উঠেই বন্ধ হয়ে গেল। হয়ত কেয়ারটেকার হাজরাবাবু নিজেই জানালাটাকে এক ঠেলা দিয়ে আচমকা বন্ধ করে দিয়েছেন।

॥ ১২ ॥

—মার মার মার ! ভয়ানক চিৎকার করে কথা বলছে দূরের একটা হল্লার আক্রোশ।

মোটর-মিস্তিরি পটলবাবু তখন তাঁর বাগানের একটা টিনের শেডের ভিতরে বসে গৌরীনাথের ট্যাক্সির কারবুরেটার মাত্র একটু খুলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে হল্লার শব্দটা ছুটে এসে তাঁর কাজেব মনটাকে বিশ্রীভাবে চমকে দিল।

আদুড় গা আর কালিঝুলিমাখা, একটি গামছা পরা পটলবাবু সেই মুহূর্তে লাঠি হাতে নিয়ে দৌড দিলেন।

পটলবাবুর বাড়ি থেকে সামান্য একটু দূরে নয়াপাড়ার সড়ক যেখানে রেলের লেবেল ক্রসিংয়ের কাছে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে ছোট একটা ভিড় দাঁড়িয়ে আছে, আর চিৎকার করছে।

শুধু চুপ করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের একটা দল ; তার মধ্যে সন্তু আর চিনুও আছে।

সন্তুর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সামন্তবাবু—যা যা যা, তোরা চলে যা এখান থেকে। তোদের আর এখানে দাঁড়িয়ে বেশি মায়া দেখাতে হবে না।

পটলবাবুর দিকে তাকিয়ে হাজরাবাবু বলেন—লাঠির দরকার নেই ; অনাদি এখনি এক গুলিতে ওটাকে সাবড়ে দিতে পারবে।

সামনেই একটা শুকনো অড়হরের ক্ষেত ; তারই উপর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে রুগ্‌ণ হেনরি। এক হাতে বন্দুকটাকে শক্ত করে ধরে অনাদিও এক-একটা লাফ দিয়ে হেনরিকে

ধাওয়া ক'রে চলেছে। গায়ে পোকাপড়া হাড়সার চেহারার ওই কুকুর হেনরি দিন দুই হল পাগলা হয়ে গিয়েছে। ডাক পিয়নের পা কামড়ে দিয়েছে, শ্রীপদবাবুর গরুটাকেও কামড়েছে, আর মল্লিক ডাক্তারকে তিনবার তাড়া করেছে।

সরিয়াড়ির বুকের ভিতরে এই ক'মাস ধরে গুমরে গুমরে কাঁপছিল যে ভিতু আক্রোশ, যেন সেই আক্রোশই এইবার একটা হিংস্র হল্লা হয়ে ফেটে পড়েছে। ফেটে পড়ল অনাদির বন্দুকের গুলির শব্দ। চেঁচিয়ে উঠলেন সামন্তবাবু—ঠিক হ্যায় ; চলে এসো অনাদি।

হাওয়ানগর সরিয়াড়ির এতদিনের নরম আত্মাটা এইবার সত্যিই যেন শক্ত পাথরের ঢেলা হয়ে সব উপদ্রব তাড়িয়ে দেবার জন্য তৈরি হয়েছে।

আর দু'দিন পরেই ফণী মিত্রের গাড়িটা বাক্স-বেডিং সঙ্গে নিয়ে সোজা জি টি রোডের দিকে যেন আতঙ্কিতের মত ছুটে চলে গেল। অন্ধকারে কে যেন একটা ইট ছুঁড়ে ফণী মিত্রের গাড়ির হেড লাইট চুরমার করে দিয়েছে।

একদিন, ঠিক সকাল আটটার সময়, রজনীধামের কাছে সড়কের মোড়ের উপর জগৎ ব্যানার্জি যখন পাইপ ধরাবার জন্যে একটু দাঁড়িয়েছেন, তখন তাঁর দু'পাশে হঠাৎ দুটো সাইকেল ছুটে এসেই থেমে যায়। সাইকেল থেকে যারা দুজন নামে, তারা কোনও কথা বলে না। শুধু জগৎ ব্যানার্জির দুপাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর একটি দিনও দেরি করলেন না জগৎ ব্যানার্জি, সন্ধ্যার ফার্স্ট প্যাসেঞ্জারেই সরিয়াড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

একদিন হাওয়াইয়ের ফটকের সামনে দিবাকরকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই ভ্রূকুটি করলেন নাগ সাহেব। —কে তুমি ? কী মতলব ?

দিবাকরও ভ্রূকুটি ক'রে তাকায়। —একটা মেয়েছেলে যোগাড় করে দিতে পারেন, রান্নার কাজ করবে ? মাইনে কুড়ি টাকা।

নাগসাহেবের চোখ দপ ক'রে জ্বলে ওঠে। —কী বললে ? এর মানে কী ?

দিবাকরেরও চোখ জ্বলে—বুঝে দেখুন।

নাগসাহেবের গালের মাংস কাঁপতে থাকে। —না, বুঝে দেখবার কিছু নেই।

দিবাকরের চোয়াল শক্ত হয়ে থর থরে করে। —আছে।

নাগসাহেবের কটমটে রাগের চোখ দুটো সাদা হয়ে যায়। বিড়বিড় করে কথা বলেন। —তুমি চলে যাও।

দিবাকর দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে—আপনি চলে যান।

নাগসাহেবের সারা শরীরে যেন সরিয়াড়ির শীতের সব কাঁপুনি ভর করছে ; কাঁপতে থাকে নাগসাহেবের গলার স্বর। —অলরাইট। তাই হবে।

নাগসাহেবের এত চমৎকার বাড়ি, যার নাম হাওয়াই, তার ফটকের থামের গায়ে হাতে লেখা হরফে বেশ বড় একটা পোস্টার দেখা যায়—ফর সেল।

পরের দিন সন্ধ্যা হয়ে যাবার পরেও হাওয়াইয়ের কোনও আলো আর ঝলমল করে জেগে উঠল না। কেউ জানতেও পারেনি, ঠিক কখন চলে গেলেন নাগসাহেব। বোধ হয় শেষ রাতের আবছা অন্ধকারের মধ্যে নাগসাহেবের গাড়িটা গা-ঢাকা দিয়ে, হেড লাইট না জ্বালিয়ে, কোনও শব্দ না করে. খুব শ্লো স্পিডে, যেন পা টিপে টিপে সরে পড়েছে।

—কী হল ? কী ব্যাপার ? কদিন ধরে রোজই সন্ধ্যায় হই হই করে পথে বের হয়ে আর হাঁক দিয়ে বেড়াতে শুরু করেছেন চন্দ্রবাবু। ঠিক সন্ধ্যা হলেই কোথা থেকে সাংঘাতিক একটা ধুলোর ঘূর্ণি এসে নয়াপাড়ার সড়ক ধরে ছুটে চলে যায়। সরিয়াড়ির শীতের সন্ধ্যার ঝিমনো বাতাস বুঝি হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ধুলো ওড়াতে শুরু করেছে ; আশ্চর্য না হয়ে পারবেন কেন চন্দ্রবাবু !—ওহে সামন্ত, এত ধুলো কেন ? ধুলোতে আবার এত গরম কিসের ?

ধুলোর ঘূর্ণি থেকে গরম কাঁকরের কুচি শ্রীলেখা কটেজের জানালার কাচে আর আলো-জ্বলা বারান্দার উপর ছিটকে এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার উপর উঠে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন হাবুলবাবু

আর গোষ্ঠবাবু। —বাড়িতে কে আছেন ?

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে নিখিল। —বসুন।

চেয়ারে বসেই হাবুলবাবু বলেন। —আপনারা যাবেন কবে ?

নিখিল—কেন জিজ্ঞেস করছেন, বলুন তো ?

গোষ্ঠবাবু—এর মধ্যে কোনও কেন নেই মশাই ; জানতে চাই, কবে আপনারা যাচ্ছেন ?

নিখিল—বলছি ; আপনারা কষ্ট করে একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসছি।

কটেজের চাকর ছোট একটা টেবিল ঘরের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে এসে বারান্দায় রেখে গেল ; আর দুহাতে দু' পেয়ালা চা নিয়ে বের হয়ে এল নিখিল সেন। মঞ্জুও এল ; দু'ডিস খাবার টেবিলের উপর রেখে দিয়ে মঞ্জু আবার ঘরের ভিতরে চলে গেল। যাবার সময় গোষ্ঠবাবুর দিকে হাত তুলে দুটো নমস্কারও জানিয়ে গেল মঞ্জু।

হাবুলবাবু বলেন—এসব আবার কেন ?

গোষ্ঠবাবু—আমরা যে কথা জানতে এসেছি ; শুধু সেই কথাটা জেনে নিয়েই চলে যাব।

নিখিল—বেশ তো, চা খান। আর, যা বলবার আছে, সবই বলুন।

দরজার পর্দা সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন প্রীতি বউদি ; তাঁর পাশে মঞ্জু। প্রীতি-বউদির চোখে শঙ্কা। মঞ্জুর চোখে আতঙ্ক।

প্রীতি বউদি বলেন—আপনারা আগে চা খেয়ে নিন। তারপর গল্প করুন। আমি এই নিখিলের বউদি।

মঞ্জু—বড়দা ভেতরের ঘরে বসে আছেন। পায়ে বাতের ব্যথা ; তা না হলে নিজেই এসে আপনাদের চা খেতে বলতেন।

হাবুলবাবু—না, সেটা কোনও প্রশ্ন নয় ; কোনও দরকার নেই।

গোষ্ঠবাবু—শুধু একটা কাজের কথা বলতে এসেছি।

মঞ্জু—বলুন ; কিন্তু তার আগে চা খেয়ে নিন।

হাবুলবাবু—তা খাচ্ছি ; কিন্তু কথাটা হল...।

গোষ্ঠবাবু—কথাটা শুধু এই নিখিলবাবুকেই বলতে চাই।

প্রীতি বউদি আর মঞ্জু ঘরের ভিতরে যেতে যেতেই নিখিল বলে—কথাটা শুধু যদি আমাকেই বলতে চান, তবে এখানে না বলে...।

হাবুলবাবু—হ্যাঁ, চলুন, বাইরে গিয়ে রাস্তাতেই কথা বলি।

নিখিল—কিন্তু চা আর খাবার খেয়ে নিন।

চা খেলেন, কিন্তু খাবার খেলেন না গোষ্ঠবাবু। আর রাস্তাতে এসেই নিখিলের চোখের সামনে দুজনে আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন।

হাবুলবাবু—আপনি কি জানেন না, আমাদের প্রদোষদার মেয়ে, আত্রেয়ীর অনেকদিন আগেই বিয়ে হয়েছে।

নিখিল—জানি বইকি। বোধ হয়, প্রায় সাড়ে তিন বছর হল....।

গোষ্ঠবাবু—এই হিসেবটা তো ঠিকই রেখেছেন, দেখছি। কিন্তু আত্রেয়ীর সঙ্গে আপনার ব্যবহারটা কেন এত বেহিসেবী হয়ে উঠল ?

নিখিল—বুঝেছি, আপনারা কী বলতে চাইছেন।

হাবুলবাবু—এখন আপনার কী বলবার আছে বলুন।

হেসে ফেলে নিখিল—আমার কিছু বলবার নেই।

গোষ্ঠবাবু—তবে কে বলবে ?

নিখিল—প্রদোষবাবুর মেয়ে আত্রেয়ীই বলবে। তাকে জিজ্ঞেস করুন।

হাবুলবাবুর গলার স্বর ক্রুদ্ধ হয়ে ঘড়-ঘড় করে—কী জিজ্ঞেস করব আত্রেয়ীকে ?

নিখিল—আমি কোনও বেহিসেবী ব্যবহার করেছি কিনা ; আমি বেহিসেবী ব্যবহার করবার মত একটা লোক কিনা ; আত্রেয়ীকে জিজ্ঞেস করলে সবই জানতে পারবেন।

গোষ্ঠবাবু—তা না-হয় আত্রেয়ীকে জিজ্ঞেসা করা যাবে ; কিন্তু আপনি যাচ্ছেন কবে ?
নিখিল হাসে—ঠিক কবে যাব বলতে পারি না। তবে এমাসেই চলে যাবার কথা আছে।
হাবুলবাবু—ভাল কথা।
নিখিল—খুব সম্ভব, আবার আসব।
গোষ্ঠবাবু—কেন ?
নিখিল—ইচ্ছে।
হাবুলবাবু—ফল খুব খারাপ হবে।
নিখিল—হলে হবে।
গোষ্ঠবাবু—আত্রেয়ীর স্বামী এখন কোথায় আছে, জানেন নিশ্চয় ?
নিখিল—জানি।
হাবুলবাবু—সে যে একদিন এসেও পড়বে, সেটা কি ভুলে গেছেন ?
নিখিল—আমি চাই তিনি শিগগির এসে পড়ুন।
গোষ্ঠবাবু—তখন কী হবে ?
নিখিল হাসে—তখন আমি অন্তত আপনাদের চেয়ে বেশি সুখী হব।
হাবুলবাবু—তার মানে ?
নিখিলবাবু—তার মানে, প্রদোষবাবুর মেয়ের জীবনের জন্য আপনাদের মত স্থায়ীদের মনে যত মায়া আছে, আমার মত একজন অস্থায়ীর মনে বোধ হয় তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম মায়া নেই।
গোষ্ঠবাবুর গলার স্বরের কড়া মেজাজ হঠাৎ যেন নরম হয়ে যায়। .... আপনি একটা ভাল কথা, বেশ চমৎকার কথাই বলছেন, কিন্তু ?
হাবুলবাবু বেশ জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন—এরকম হলে তো ভালই হয়, কিন্তু... ।
নিখিলেরও মুখের ভাষা সব রুক্ষতা হারিয়ে গিয়ে একেবারে স্নিগ্ধ হয়ে যায়।—কোনও কিন্তু নেই। আমি বাইরের মানুষ, আপনাদের প্রদোষদার মেয়ের দুঃখের জীবনকে খুশি করে রাখবার জন্যে আমি আর কতটুকুই বা কি করতে পারি ? সেটা আপনাদের কাজ, আপনারাই করবেন। আমি দু'দিনের জন্যে এখানে এসে দু'দিনের চেনা এক মহিলাকে শুধু মুখের ভাষায় একটু ভদ্রতা দেখিয়ে চলে যেতে পারি, এই মাত্র।
গোষ্ঠবাবু হঠাৎ একেবারে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে ফেলেন—সেটা আপনার মহত্ত্ব।
হাবুলবাবু—বাণীদির কাছ থেকে আপনাদের কত প্রশংসার কথা শুনেছি। মনেও হয়েছে, আপনারা কি কখনও কারও ক্ষতি করতে পারেন ? কখনই না।
নিখিল হাসে—কারও ক্ষতি করব, সে রকম সাংঘাতিক সাহস অন্তত এখনও পর্যন্ত... ।
গোষ্ঠবাবু—না না, ওরকম জঘন্য সাহস আর যেই করুক না কেন, আপনার পক্ষে সেটা সম্ভবই নয়।
হাবুলবাবু—আপনার দাদা সরিয়াড়ির জল-বাতাসে কিছু উপকার পেয়েছেন নিশ্চয় ?
নিখিল—দাদা তো বলছেন পেয়েছেন।
গোষ্ঠবাবু—আপনি ?
নিখিল হাসে—আমার শরীরটা তো সরিয়াড়ির জল-বাতাসের কাছে নতুন করে কোনও স্বাস্থ্য আশা করে না।
হাবুলবাবু—দরকারও হয় না। আপনার তো এমনিতেই সুন্দর স্বাস্থ্য।
নিখিল—তবে আমিও একটি উপকার পেয়েছি। বেশ মন লাগিয়ে পড়াশুনো করতে পেরেছি।
গোষ্ঠবাবু—শুনে খুবই খুশি হলাম নিখিলবাবু। একটা দুঃখের কথা কী জানেন ? এখানে হাওয়া বদল করতে যাঁরা আসেন, তাঁদের অনেকেই সব সময় শুধু ফূর্তির কথা ভাবেন। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কলকাতার অধরবাবুর মত ; বর্ধমানের শৈলেশবাবুর মত... ।
হাবুলবাবু—আর মেদিনীপুরের সরোজবাবুর মত... ।
গোষ্ঠবাবু—হ্যাঁ, অত্যন্ত সদাশয় মানুষও এসেছেন। কী চমৎকার হৃদয় ; আর কত সুন্দর

ব্যবহার। শৈলেশবাবু চলে যাবার সময় আমার হাত ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন।

হাবুলবাবুর চোখের দৃষ্টিটা প্রসন্ন হয়ে হাসতে থাকে।—আপনারা আরও কটা দিন এখানে থেকে গেলেও পারেন। আচ্ছা, আমরা এখন তবে চলি।

॥ ১৩ ॥

গম্ভীর পাগল দুর্গাচরণের একটা অদ্ভুত অভ্যাস আছে। পথে যেতে চেনা-অচেনা কোনও মহিলার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলেই এক লাফে পথের এক পাশে সরে যায়। মুখ ফিরিয়ে আর মাথা হেঁট করে কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সে সময় দুর্গাচরণের গম্ভীর মুখটা বিচিত্র এক লজ্জার হাসিতে ভরে যায়।

—আর একটু বেশি মেজাজ খারাপ করলে বড়ই লজ্জার ব্যাপার হয়ে যেত, গোষ্ঠদা। বলতে গিয়ে বেশ একটু লজ্জিতভাবে হেসে ফেলেন হাবুলবাবু; আর মাথা হেঁট করে দাবার ছকের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

গোষ্ঠবাবুও লজ্জিতভাবে হাসেন—ছিঃ, ভুল ধারণা করে কী বিশ্রী একটা কাণ্ড বাধাতে চেয়েছিলেন।

হাবুলবাবু—আসল অসুবিধেটা কী জানেন? খুব বেশি ভাল লোক হলে তাঁকে চিনতে সকলেই ভুল করে।

গোষ্ঠবাবু—তা বটে; কিন্তু ছোটলোক দেখে দেখে আমাদের চোখের অভ্যেসও খারাপ হয়ে গিয়েছে; তাই ভদ্রলোক চিনতে পারি না।

দিবাকরও লজ্জা পেয়েছে। এই লজ্জার মধ্যে যেন একটা বিস্ময়ের চমক আছে; শ্রীলেখা কটেজের নিখিলকে সত্যিই যে ভদ্রতার একটা বিস্ময় বলে মনে হয়। আত্রেয়ীর স্বামী তাড়াতাড়ি চলে আসুক, এমন প্রার্থনা যার মনের মধ্যে রয়েছে তাকেই আত্রেয়ীর জীবনের একটা ক্ষতির মতলব বলে সন্দেহ করা হয়েছে। ঠিকই বলেছেন গোষ্ঠদা, মানুষ একটু বেশি মহৎ হয়ে গেলে লোকে তাকে চিনতে খুবই ভুল করে।

এক আনাতে চার জোড়া পাকা তাল দিয়ে চলে গিয়েছে এক দেহাতি বুড়ি। চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন চিনুর পিসিমা—ওরে ও চিনু, দেখ তো মা, বুড়িটা চলে গেল নাকি? ভুল করে দুজোড়া বেশি দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

পিসিমার হাসিটা যেমন একটা হঠাৎ-খুশির তেমনই একটা হঠাৎ লজ্জার হাসিও বটে। যা ধারণা করা হয়েছিল, তা নয়। তার চেয়ে বেশি দিয়ে ফেলেছে বুড়িটা। ঠকাবে বলে মিথ্যে সন্দেহ করা হয়েছিল বুড়িটাকে, আর অনেক দরাদরিও করা হয়েছিল। ছি।

চিনু বলে—চলে গিয়েছে বুড়ি।

পিসিমা—তবে একবার একটু দৌড়ে গিয়ে দেখে আয় তো মা, প্রদোষ জ্যাঠা কী করছেন? ঘুমিয়ে আছেন, না হেসে-হেসে গল্প করছেন?

চিনু—দেখেছি।

পিসিমা—কী দেখেছিস?

চিনু—প্রদোষ জ্যাঠা গান গাইছেন।

লজ্জা পেয়েছে আর নিশ্চিন্ত হয়েছে ছোট শহর সরিয়াড়ি। মনে মনে একটা পরাভবও খুশি হয়ে স্বীকার করে নিয়েছে। হাওয়াবদলের জন্য বাইরে থেকে শুধু দুদিনের ফূর্তিগুলি আর স্বার্থগুলি আসে না; দুদিনের একটা মহত্ত্বও আসে।

লজ্জা পেয়ে সরিয়াড়ির প্রাণটাও এবার থেকে বেশ সামলে থাকতে চেষ্টা করছে। নিখিলের সঙ্গে পথে দেখা হলেই নমস্কার জানায় দিবাকর—ভাল আছেন?

দেখতে পাওয়া যায়, হাওয়া বদলের জন্য সরিয়াড়িতে এসে কদিন থেকে দুজন আগন্তুকের মূর্তি নয়াপাড়ার সড়ক ধরে আস্তে-আস্তে হেঁটে বেড়ায়। নিতান্ত অল্পবয়সের এক স্বামী ও তার স্ত্রী; প্রায়

কচি বয়সের একটি মেয়ে। একেবারে শুকনো সাদাটে ও জিরজিরে শরীরের মেয়েটিকে দেখেই চিনে নিতে পারা যায়, ওটা এক টি.বি. রোগিনীর করুণ মূর্তি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেড়াতে বের হয়ে মাঝে-মাঝে সরিয়াডির যত স্থায়ীদেরই বাড়ির গেটের কাছে চুপ করে কিন্তু যেন বেশ ভয়ে-ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

না, আর ভুল করেন না হাবুলবাবু। হাবুলবাবুর এতদিনের কড়া মেজাজের চোখ দুটো যেন একটু করুণ হয়ে যাবার জন্যেই ছটফট করে। গেটের কাছে এগিয়ে যান হাবুলবাবু।—কেমন বোধ করছ এখানকার জলবাতাস ? ভাল ?

ছেলেটি হাসে—হ্যাঁ ভাল তো বটেই ; তার চেয়ে ভাল আপনাদের আশীর্বাদ।

হাবুলবাবু—অ্যাঁ ? চমকে ওঠেন হাবুলবাবু।

ছেলেটি বলে—আপনাদের আশীর্বাদ থাকলেই কুন্তলার রোগ ভাল হয়ে যাবে।

কুন্তলার বড়-বড় চোখ দুটো চকচক করে। সরু শীর্ণ গলাটা একবার কেঁপে ওঠে ; তারপরেই মাথা হেঁট করে হাসতে থাকে কুন্তলা।

অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন হাবুলবাবু—নিশ্চয়, নিশ্চয় কুন্তলা সেরে উঠবে, তুমি ভাবছ কেন ?

বাড়ির ভিতর থেকে হাবুলবাবুর স্ত্রী বের হয়ে আসেন। কাছের বাড়ি থেকে গোষ্ঠবাবু ও তাঁর স্ত্রী বের হয়ে আসেন। সবাই এক সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে কথা বলেন—ভাল হবে বইকি। একটুও ভেবো না।

—শুধু একটু সাবধানে থেকো।

—ডাক্তারের কথা শুনে চলবে।

—কোনও ওষুধ দরকার হলেই বলো, গয়া থেকে আনিয়ে দেবে দিবাকর।

শ্রীলেখা কটেজের সামনের মাঠের উপর দৌড়ে দৌড়ে ঘুড়ি ওড়ায় সন্তু। কটেজের মাথার উপরের আকাশে সন্তুর ঘুড়িটা ডগমগ হয়ে দুলছে। চেঁচিয়ে ডাক দেয় সন্তু—একবার এসে দেখে যাও, মঞ্জুদি, আমার ঘুড়ি তোমাদের বাড়ির ধোঁয়ার ওপরে উঠে গেছে।

কে জানে কবে আর কেমন করে, মঞ্জুর সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে সন্তু। কিন্তু সন্তুর এমন উৎফুল্ল স্বরের ডাক শুনেও ঘরের বাইরে বের হয়ে আসে না মঞ্জু। মঞ্জু বড় গম্ভীর। ছোট্ট সন্তুর ডাক তো নয়, ওটা যেন সরিয়াডির একটা ভয়ানক গর্বের ডাক।

মঞ্জুর আর ঝর্না দেখতে যাওয়া হয়নি। যেতে চায়ও না মঞ্জু। আত্রেয়ী অবশ্য রোজই আসে আর ঝর্না বেড়াতে যাবার জন্যে তাগিদও দেয়।

আত্রেয়ীর যত হাসির কথার সঙ্গে অনেক চেষ্টা করে একটু হেসে নেয় মঞ্জু ; কিন্তু আত্রেয়ী, চলে গেলেই গম্ভীর হয়ে যায়।

যেন একটা ভয়ের ছায়া দেখতে পেয়ে সর্বক্ষণ ভিতু হয়ে রয়েছে মঞ্জুর মন। প্রীতি বউদির কাছে এসে ফিসফিস করে কথা বলে মঞ্জু—আর এখানে দেরি করো না বউদি ; যত তাড়াতাড়ি পার সরে পড়ো।

প্রীতি বউদির চোখ-মুখে একটা গম্ভীর ভয়ের ছায়া সব সময় ছমছম করছে। সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ীর মুখের মিষ্টি হাসিটাকে দেখতে একটুও আর ভাল লাগে না। এ বাড়ির সব সতর্কতার যেন মাথা হেঁট করিয়ে দিয়ে আত্রেয়ীর মুখে একটা বিশ্রী জয়ের আনন্দ হাসছে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভয় করে নিখিলের উচ্ছল খুশির মুখর হাসিটাকে।

প্রীতি বউদির মনের গভীরে আজ যেন একটা অবুঝ ভয় বেশ যন্ত্রণা দিয়ে কথা বলছে—ফিলসফি আর সায়েন্সের বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন বলেই কি নিখিল যেন সব ইচ্ছের ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে চলে গিয়েছেন ? কিংবা, মঞ্জুর এই মেজদাটি কি সত্যিই একটি লোহা ?

—না মঞ্জু, আমার একটুও ভাল লাগছে না। সব লোহা অশোকের থামের লোহার মত নয় যে তার গায়ে মরচে ধরবে না।

মঞ্জু—ওই ভদ্রলোক দুজন বাড়ি চড়াও হয়ে কিরকম বিশ্রী ভাষায় ভয় দেখিয়ে কথা বললেন, শুনলে তো ?

প্রীতি বউদি—শুনেছি বলেই তো বুঝেছি। কে জানে ওদের কী কথা বলে এত বুঝিয়ে দিল আর খুশি করে দিল তোমার তার্কিক মেজদা।
মঞ্জু—থাকগে, ওসব কথা ছেড়ে দাও। এখন তাড়াতাড়ি চলে যাবার ব্যবস্থা করো।
প্রীতি বউদি—তোমার বড়দা বলছেন, এই রবিবারেই দিন ভাল আছে।
ঘরে ঢুকল নিখিল। —তোমরা কি যাবার দিন-টিন ঠিক করে ফেলেছ বউদি ?
প্রীতি বউদি—হ্যাঁ, এক রকম ঠিক হয়েই আছে।
নিখিল—কবে ?
প্রীতি বউদি—এই রবিবারে।
নিখিল—আরও একটা মাস থেকে যাও না।
প্রীতি বউদি—না।
নিখিল—আমি কিন্তু আরও কিছুদিন থাকব।
প্রীতি বউদি—কেন ?
নিখিল—এখানে থাকতে ভালই লাগছে।
প্রীতি বউদি—বুঝতে পারছি না, এখানে তোমার এত ভাল লাগবার মত কী বস্তু থাকতে পারে ?
নিখিল- -সব চেয়ে ভাল বস্তুটি আছে।
চমকে ওঠেন প্রীতি বউদি—কী ?
নিখিল—একেবারে একা হয়ে পড়ে থাকবার সুযোগ ; নিরিবিলি এই কটেজের এই ঘরটি।
প্রীতি বউদি—নিরিবিলি ঘর তো চা-বাগানেও আছে। না, তোমার এখানে থাকবার কোনও দরকার নেই।
নিখিল—আমার কোনও দরকার নেই বলেই তো থাকতে চাইছি।
প্রীতি বউদি—এখানে নানারকম ভয়ের ব্যাপার আছে।
নিখিলের চোখে যেন ধীর-স্থির একটা বিদ্যুৎ জ্বলছে—আমি কাউকে ভয় করি না বউদি। তোমাদের বাজে ভয়কে, সরিয়াডির মিথ্যে ভয়কে, এমন কী নিজেকেও আমি ভয় করি না।
বোধ হয় আর কোনও কথা বলতে চান না প্রীতি বউদি। যেন অদ্ভুত একটা হেঁয়ালির মুখরতা শুনছেন, কিছুই বোঝা যায় না ; বলবারও কিছু নেই। তাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।
নিখিল বলে—সরিয়াডির মত সামান্য একটা জায়গাতে আমার কোনও আশা আর ইচ্ছে থাকতেই পারে না, বউদি।
প্রীতি বউদির মুখের গম্ভীরতা তবু একটুও মুছে যায় না ; বোধ হয় নিখিলের এইসব কথা বিশ্বাস করবারও কোনও ইচ্ছে তাঁর আর নেই।
হেসে হেসে সিগারেট ধরায় নিখিল। হ্যাঁ, চার আনার পেঁপে আট আনায় কিনে একটু ঠকে যেতে পারি। কিংবা, আমার সিগারেটের এই আট টাকা দামের পলকা আইভরি কেস ভুল করে হারিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু সেটা কী খুব বেশি ক্ষতির ব্যাপার হবে বউদি ?... ও গম্ভীর বউদি ? ও নীরব বউদি ?
বলতে বলতে নিখিলের গলার স্বর হঠাৎ যেন একটা চতুর হাসির তুফান হয়ে ফেটে পড়ে। বউদি তবু নীরব ; আর মঞ্জুও নীরব।
নিখিল বলে—কথাটা হল, আমি এখনই রওনা হচ্ছি।
চমকে ওঠেন প্রীতি বউদি, চোখ ফিরিয়ে নিখিলের মুখের দিকে তাকান।
নিখিল—হ্যাঁ, আর পঁচিশ মিনিট পরেই ট্রেন। কাজেই তোমাদের সঙ্গে এখন আর বাজে তর্ক করবার সময় নেই।
দেখতে পেলেন প্রীতি বউদি, সত্যিই তো, বারান্দার চেয়ারের উপর নিখিলের ছোট টুরিস্ট ব্যাগটি কোথাও যাবার জন্যেই তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে ; ব্যাগের উপরে নিখিলের একটা আলোয়ানও চার ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে।

নিখিল—আমি যাচ্ছি। কলকাতায় পৌঁছেই সরকার মশাই আর বেয়ারা বিনয়কে পাঠিয়ে দেব। ওরা বড় টুরারটাকে নিয়ে সোজা বাই রোড চলে আসবে। দাদার পক্ষে এখন ট্রেনে যাওয়া ঠিক হবে না।

প্রীতি বউদির মুখে গম্ভীরতার এক ছিটে মেঘও আর নেই। শান্ত ও প্রসন্ন প্রীতি বউদির চোখ-মুখ যেন একটা লজ্জিত খুশির হাসিতে ভরে গিয়েছে। মঞ্জুও নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে—মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে এ রকম থিয়েটার করবার কী দরকার ছিল, মেজদা ? তুমি সত্যিই একটা যাচ্ছেতাই অদ্ভুত মানুষ।

নিখিল—বাজে কথা ভাবলে এই রকমই জব্দ হতে হয়। ... আচ্ছা, আমি এখন চলি, আর দেরি করব না। চা-টা এখন দরকার নেই।

আলোয়ান কাঁধে ফেলে আর ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়েই ব্যস্তভাবে আরও একটা কথা চেঁচিয়ে বলে দিয়ে চলে যায় নিখিল—কলকাতা থেকে আমি সোজা চা-বাগানে চলে যাব বড়দা।

গেটের কাছে এগিয়ে যেয়ে আবার একটু থেমে নিয়ে কথা বলে নিখিল।—বাজে গল্পের যত বই সবই লাইব্রেরিতে দান করে দিও ; আর আমার সব বই ভাল করে গুছিয়ে দুটো বড় বাক্সে ভরে নিও, বউদি।

নিখিল চলে যাবার পর বারান্দায় পায়চারি করে মঞ্জু আর প্রীতি বউদি দুজনেই অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে হাসতে থাকেন।

প্রীতি বউদি বলেন—নিখিলের মনটা সত্যিই মহৎ, কোনও সন্দেহ নেই। সেই জন্যেই তো দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম।

আত্রেয়ী আসছে ; গেট পার হয়ে জবা গাছটার কাছে দাঁড়িয়েছে আর ওদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে।

—ওয়েলকাম আত্রেয়ী। ডাকতে গিয়ে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মঞ্জু।

প্রীতি বউদিও হাসে—কী ব্যাপার আত্রেয়ী ? তোমাকে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে।

আত্রেয়ী—ব্যস্ত না হয়ে উপায় কী ? মঞ্জু যে সাংঘাতিক কথাটি বলে রেখেছে।

প্রীতি বউদি—কী কথা ?

আত্রেয়ী—আপনারা এ মাসেই চলে যাবেন।

মঞ্জু হাসে—এ মাসে নয়, আত্রেয়ী ; এই সপ্তাহে ; এই রবিবারেই যাচ্ছি।

—বেশ করছ ! আত্রেয়ীর চোখ-মুখ করুণ হয়ে গিয়ে যেন একটা অভিমানের আপত্তি চাপা দিতে চেষ্টা করে।

মঞ্জু—মেজদা তো চলেই গিয়েছেন।

আত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করে—মিথ্যে কথা।

মঞ্জু—তোমার তাই মনে হতে পারে, কিন্তু...।

আত্রেয়ী—ওই তো, বাগানে একটা বেতের মোড়ার ওপর নিখিলবাবুর বই পড়ে রয়েছে।

মঞ্জু অদ্ভুতভাবে হাসে—তাই নাকি ? বইটাকে বাগানে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে মেজদা ? তাই বল। কিন্তু ওটা তো মেজদার চিরকেলে অভ্যেস ; তোমাকে আগেও বলেছি। বিশ্বাস করনি বোধ হয় ?

প্রীতি বউদি চোখ বড় করে হাসেন।—মনে হচ্ছে, এইবার বিশ্বাস করতে পেরেছে আত্রেয়ী ?

আত্রেয়ী—তা হলে সত্যিই আপনারা চললেন, বউদি ? বলতে বলতে আত্রেয়ীর গলার স্বর ছলছল করে ওঠে।

প্রীতি বউদি—হ্যাঁ, ঠিক করেছি খুব ভোরেই রওনা হয়ে যাব। তোমার বাবাকে আমাদের নমস্কার জানিয়ে দিও।

রুমাল দিয়ে চোখ দুটোকে চেপে রেখে কিছুক্ষণ নিথর হয়ে বসে থাকে আত্রেয়ী। তারপরই উঠে দাঁড়ায় ?—চলি বউদি, চলি মঞ্জু।

একবার অখিলবাবুর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় আত্রেয়ী।

অখিলবাবুর চোখ দুটো একবার কেঁপে ওঠে। তবু হেসে হেসে কথা বলেন অখিলবাবু।—হ্যাঁ, এবার আমাদের যেতেই হচ্ছে।

প্রীতি বউদি আত্রেয়ীর পিঠে হাত বুলিয়ে হাসতে থাকেন—ছিঃ, এতে দুঃখ করবার কী আছে?

আত্রেয়ীর একটা হাত ধরে মঞ্জুও হাসে।—তোমার কথা কী আমি কখনও ভুলতে পারব? কখ্‌খনও না।

॥ ১৪ ॥

চন্দ্রবাবুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিয়েছে চিনু আর সন্তু; সেই সঙ্গে বাচ্চা ছেলে-মেয়ের একটা দল।

চিনু বলে—এ কী দাদু? তুমি উনুন ধরাচ্ছ কেন? মধু কোথায়?

চন্দ্রবাবু—মধু নেই রে দিদি।

সন্তু—কোথায় গেল মধু?

চন্দ্রবাবু হাসলেন—মধু জানে।

চিনু—এ কী? তোমার বাক্সটা ভাঙা কেন দাদু? বিছানায় চাদর নেই কেন? আলনাতে জামা-কাপড় কিচ্ছু নেই কেন?

চন্দ্রবাবু উনুনের ধোঁয়াটে মুখের উপরে জোরে জোরে পাখার বাতাস দিয়ে হাসতে থাকেন।—সবই মধু জানে।

সন্তু—মধু আর আসবে না?

চন্দ্রবাবু—চলে গেলে কেউ কী আবার ফিরে আসে?

চিনু—মধুটা তবে নিশ্চয় তোমার সব জিনিস চুরি করে পালিয়েছে।

চন্দ্রবাবু—এ আর এমন কি চুরি হল রে দিদি? আরও কত বড়-বড় জিনিস চুরি হয়ে গিয়েছে।

সন্তু—মা বলছিল, তুমি খুব ভাল লোক; তুমি স্বর্গে যাবে।

চন্দ্রবাবু—স্বর্গেই তো আছি।

সন্তু হাসে—এটা স্বর্গ? এই বিচ্ছিরি ঘর; ধোঁয়া উনুন আর কাঁচা পেপে, হারমোনিয়ম নেই, ফটো নেই, ট্রাইসাইকেল নেই, তোমার তো কিছুই নেই দাদু।

চন্দ্রবাবু—একেই বলে স্বর্গসুখ। বড় হলে বুঝবি।

চিনু—আলুর বড়া খাবে, দাদু? এনে দেব? মা এখন আলুর বড়া ভাজছে।

চন্দ্রবাবু—আর কত খাব?

চিনু—কবে খেলে?

চন্দ্রবাবু—অনেকদিন আগে।

চিনু—কে ভেজে দিলে?

চন্দ্রবাবু—আমার বউ।

চিনু—ধেৎ।

চন্দ্রবাবু—বিশ্বেস কর; আমি তো লঙ্কার ঝাল একেবারেই সহ্য করতে পারি না। তাই শুধু আদাবাটা দিয়ে চমৎকার বড়া ভেজে দিত সেই বউটা।

সন্তু—ছেলেটার নামটা মনে পড়েছে দাদু?

চমকে ওঠেন চন্দ্রবাবু; উনুনের ধোঁয়ার সব জ্বালা যেন তাঁর চিকচিকে হাসির চোখ দুটোর উপর ছড়িয়ে পড়েছে।—কার নাম? কার ছেলে?

সন্তু—সেই যে বলেছিলে; দাঁত নেই, এইটুকু একটা ছেলে।

উনুনটা জ্বলতে শুরু করেছে, এইবার এক হাতে একটা কাঁচা পেঁপে ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়ে আর এক হাতে বঁটিটাকে কাছে টেনে আনেন চন্দ্রবাবু।—নাঃ একেবারেই মনে পড়ে না। নামই ছিল না। তবে আর মনে পড়বে কোন ছাই।

চিনু—আমি কিন্তু সব নাম মনে করতে পারি। রাধুদির ছেলের নাম হরতন, সঞ্জু কাকার ছেলের নাম বিশু, মটর মাসিমার ছেলের নাম বিজয়।

মাথা দোলাতে থাকেন চন্দ্রবাবু—বাঃ, আমাদের চিনুরানী কত নাম ধরে রেখেছে, দেখ।

সন্তু—তুমি কেন পার না ?

চন্দ্রবাবু—আমি চাই না। আমি কিছুই ধরতে টরতে চাই না।

চিনু—তুমি বোকা।

চন্দ্রবাবু—তবে শুনবি ? একটা কথা বলব ?

চিনু—বলো।

চন্দ্রবাবু—এই সরিয়াডিতে একা আমিই চালাক, আর সব বোকা।

সন্তু—আমাদের টিচারদি আত্রেয়ীদিও বোকা ?

চন্দ্রবাবু—ওটা তো সব চেয়ে বোকা।

চিনু হাসে—আত্রেয়ীদিকে বলে দেব কিন্তু।

চন্দ্রবাবু হাসেন—দিস বলে। মিথ্যে কথা তো বলছি না। নিজের চোখে দেখেছি।

চিনু—কী দেখেছ ?

চন্দ্রবাবু—একটা চিঠিকে কত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল তোমাদের আত্রেয়ীদি। ধেৎ, কোনও মানে হয় ?

চিনুরা আর সন্তুরা চলে যায়। কাঁচা পেঁপের তরকারি আর ভাত তৈরি হতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় গুনগুন করে গানও করেন চন্দ্রবাবু। আর খাওয়া শেষ হতেই ব্যস্ত হয়ে মোষের শিঙের লাঠিটি হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান। যেন ফাঁকা ঘরের সব শূন্যতার তাড়া খেয়ে বাইরে ছিটকে পড়েছে সত্তর বছর বয়সের একটা একলা প্রাণ।

এইবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনও নতুন বিস্ময়ের ছুতো খুঁজতে থাকেন চন্দ্রবাবু। মনে হচ্ছে, পুবের আকাশের এক কোণে সামান্য এক টুকরো মেঘ বেশ কালো হয়ে উঠেছে। বেশ তো ! কিন্তু সেজন্যে রোদের তেজ এত কমে যাবে কেন ? সরিয়াডির যত বাড়ির খাপরার চালাগুলির উপর এত ছায়া-ছায়া মায়া-মায়া ভাব কেন ?

চন্দ্রবাবু—কী হে দিবাকর ? আজ তো তোমার ছুটি ? সড়কে দাঁড়িয়েই দিবাকরের বাড়ির জানালার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন চন্দ্রবাবু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জানালার কাছে এসে উত্তর দেয় দিবাকর।

চন্দ্রবাবু—একটু মেঘ করেছে বটে ; কিন্তু সেজন্য চারিদিকে এত কালো-কালো ভাব কেন ? রোদে তেজ নেই কেন ? এরকম তো কখনও দেখিনি। কী ব্যাপার ?

দিবাকর—বৃষ্টি হতে পারে ; আপনি একটা ছাতা নিয়ে বের হলে ভাল করতেন, চন্দরকাকা।

কিন্তু দিবাকরের কথা শেষ হতে না হতেই চলে গিয়েছেন চন্দ্রবাবু। দিবাকরও তার কাঠের গোলার দিকে একবার ঘুরে আসবার জন্য সাইকেল নিয়ে বের হয়ে পড়ে।

—কী রে আত্রেয়ী ? এত রোগা হয়ে গেলি কেন ? আত্রেয়ীর সঙ্গে পথে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করে দিবাকর। আত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করে। —রোগা হওয়াই তো ভাল। ভাত কম খাব বেঁচেও থাকব। শান্তি বউদি কেমন আছেন ?

দিবাকর—তিনি তো মনের সুখে মুটিয়েই চলেছেন।

গোষ্ঠবাবু হাবুলবাবু আর দিবাকর ; সবারই চোখে পড়েছে, কিছুদিন ধরে বেশ গম্ভীর আর বেশ উদাস হয়ে গিয়েছে আত্রেয়ী। মাথা হেঁট করে, শুধু একবার কিন্ডারগার্টেন করতে যায় আর বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু এরকমটি হতে দিলে তো চলবে না।

বাড়ি এসেই দিবাকর ঘরের ভিতরে একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু মায়া করে আর নরম স্বরে কথা বলে। —সেই জন্যেই বলছি। অন্তত তোমার একটু চেষ্টা করা উচিত ছিল।

শান্তি বলে—তুমি ভুলে গেছ বোধ হয়, আমি নিজেই তোমাকে...।

দিবাকরের গলার স্বরে হঠাৎ আবার সরিয়াডির রোদের তেজটা যেন তপ্ত হয়ে দেখা

দেয়। —হ্যাঁ, মাত্র একটা দিনই আমাকে বলেছিলে ; আর আমিও তোমার কথামত আত্রেয়ীকে ডেকেছিলাম। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি, হতেও পারে না। তোমরা সড়কে নেমেই ব্যস্তভাবে চলতে থাকলে বেকুব বলেই বাইরের লোকের কাছে আমাদের কথা শুনতে হয়।

শান্তি—কে আবার কথা শোনালে ?

দিবাকর—শ্রীলেখা কটেজে এতদিন যারা ছিল, তারাই গোষ্ঠদাকে আর হাবুলদাকে বেশ ভাল করে শুনিয়ে দিয়েছে।

শান্তি—বুঝলাম না।

দিবাকর—সেই ভদ্রলোক, নিখিলবাবু, বেশ ঠাট্টা করে বলেই দিয়েছে যে, আত্রেয়ীর মত একটা দুঃখের জীবনের মেয়েকে একটু খুশি করে ভুলিয়ে রাখা এখানকারই লোকের কর্তব্য ছিল। কথাটা তো মিথ্যে বলেনি ?

শান্তি—ঠিকই বলেছে।

দিবাকর—কিন্তু তোমরা কি কোনও চেষ্টা করেছ ? বরং বাইরের দুই মহিলা এসে মেয়েটাকে কটা দিন খুশি করে রেখেছিল। তবু কি তোমাদের একটুও লজ্জা হল ?

শান্তি—চিনুর পিসিমা আর সন্তুর মা তো অনেকবার আত্রেয়ীর কাছে গিয়েছেন।

দিবাকর—এটা পিসিমা মাসিমার কাজ নয়। তোমার কাজ। তুমি চেষ্টা করলে কাজ হত।

শান্তি এইবার মুখ টিপে হাসে—বুঝেছি ; আচ্ছা তাই হবে।

হেসে ফেলে দিবাকর। কড়া মেজাজের দিবাকরের মুখে সত্যিই একটা স্নিগ্ধ ছায়া-ছায়া হাসি। —তবে এতক্ষণ না বোঝার ভান করছিলে কেন ?

গোষ্ঠবাবু বাড়িতে বেশ একটু গণ্ডগোল করেছেন। এটাও একটা মায়ার গণ্ডগোল। —তোমরা মিথ্যেই মেয়ে মানুষ হয়েছিলে। তোমরা নিজেরা একটু গরজ করে মেয়েটাকে কাছে ডাকবে, দুটো ভাল কথা বলবে, তবে তো ? বাইরের লোকের সঙ্গে শুধু লাঠালাঠি করেই কি একটা মেয়ের মন কেড়ে আনতে পারা যায় ?

হাবুলবাবু ভাত খেতে বসে তিনবার হাত থামিয়ে রেখে বিড় বিড় করেছেন—আমরা থাকতে খোঁড়া মানুষ প্রদোষদার একটা অপমান হয়ে গেলে সেটা আমাদের সবারই অপমান। সেটা আমরা বুঝি। কিন্তু তোমরা মেয়েমানুষ হয়েও এটুকু বোঝ না যে, আত্রেয়ীর কোনও অপমান হলেও সেটা তোমাদের মেয়ে জাতটারই অপমান হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের কোনও চেষ্টাই নেই, শুধু মুখেই যত মায়া।

শ্রীলেখা কটেজ এখন শূন্য। কয়েকটা ভাল লোক এসেছিল, আর ভালয় ভালয় চলে গিয়েছে। তাই বাইরের হাতছানিটা প্রদোষ সরকারের মেয়ের জীবনে কোনও অভিশাপ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আত্রেয়ীর ভাগ্যটাকে তো আগলে রাখতেই হবে ; যতদিন না ওর স্বামী জেল থেকে খালাস পেয়ে চলে আসে। সরিয়াডির মায়ার এই ব্যস্ততা একটা সজাগ সাবধানতাও বটে।

একদিন প্রদোষ সরকারের বাড়ির গেটের তিনকাঠের বেড়ার শব্দটা মচকে উঠতেই একটা কাঠবিড়ালি তিড়িং করে লাফ দিয়ে কাঁটালতার ঝোপের গা বেয়ে উপরে উঠে যায় আর তাকিয়ে দেখতে থাকে। হাসতে হাসতে সরিয়াডির শান্তি বউদি এসে বারান্দায় উঠে পড়ে। পা টিপে টিপে আত্রেয়ীর ঘরে ঢুকেই আত্রেয়ীর আনমনা মূর্তিটার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরেই দু'হাত বাড়িয়ে আত্রেয়ীর চোখ চেপে ধরে।

আত্রেয়ী ছটফট করে হাসতে থাকে। —বুঝতে পারছি কে আপনি, তবু বলতে সাহস পাচ্ছি না।

শান্তি বলে—শ্রীলেখা কটেজের বউদি নয়। সরিয়াডির পেত্নী বউদি।

শান্তি বউদির হাত দুটোকে দু'হাতে শক্ত করে ধরে রেখেই আত্রেয়ী বলে—আত্রেয়ী সাড়ে তিন বছর আগে মরে পেত্নী হয়ে গেছে। আপনি কাকে খুঁজছেন ?

শান্তি—এবকম করে কথা শুনিয়ো না আত্রেয়ী ; আমারই দোষ ; আমিই সাড়ে তিন বছর হল মরে পড়ে ছিলাম।

আত্রেয়ী—কেন ? কী হয়েছিল তোমার ?

শান্তি—তোমার দাদা কিছু বলেনি ?

আত্রেয়ী—কই ? দিবাকরদা কিছু বলেছেন বলে তো মনে পড়ছে না।

শান্তি—একেবারে অন্ধ হয়ে যেতে বসেছিলাম, আত্রেয়ী। পুরো তিনটে বছর ধরে, চোখে সবই ঝাপসা দেখতাম।

আত্রেয়ী—এখন ভাল দেখতে পাচ্ছ ?

শান্তি—নিশ্চয় ? খুব বেশি ভাল দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এক এক সময় মনে হয়, ঝাপসা দেখাই ভাল ছিল।

আত্রেয়ী—কেন ?

শান্তি—তোমার দাদাটির অর্ধেক গোঁফ যে পেকে গিয়েছে, এ কুদৃশ্য তা হলে আর দেখতে পেতে হত না। ছিঃ, তিন বছরের মধ্যেই মানুষের চেহারা এত পেকে যায় ! পাকবে না-ই বা কেন ? সব সময় মেজাজ এত তাতিয়ে রাখলে এমনটি হবেই। রক্ষে করবে কে ?

আত্রেয়ী হাসে—তুমি।

শান্তি—তা সত্যি কথা বললে বলতেই হয়, যথাসাধ্য চেষ্টা করেই যাচ্ছি। কোনও আপত্তি করি না।

আত্রেয়ী—কী যে বলছ ! তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝবার সাধ্যি নেই।

শান্তি—থাকগে ; এসব বাসি ফুলের গল্প এখন থাকুক। এখন একটু...

আত্রেয়ী—চুপ করো বউদি। তোমার কথা শুনলে সত্যিই ভয় করে।

শান্তি—কিন্তু আমি এখন তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইছি না।

আত্রেয়ী—তবে ?

শান্তি—দেখতে চাইছি।

আত্রেয়ী—কী ?

শান্তি—তোমার বরের চিঠি ?

আত্রেয়ী—না। আত্রেয়ীর গম্ভীর মুখের উপর একটা যন্ত্রণাক্ত ভ্রূকুটি আস্তে আস্তে কাঁপতে থাকে।

শান্তি মিনতি করে—দাও, অন্তত একটি চিঠি দেখতে দাও।

আত্রেয়ী—না বউদি, মাপ করো।

শান্তি—মাপ করবার সাধ্যি নেই আমার।

আত্রেয়ী—আমারও চিঠি দেখাবার সাধ্যি নেই।

শান্তি—তাতো বটেই।

আত্রেয়ীর হাতের বইটাকে হঠাৎ একটা ছোঁ মেরে লুফে নিয়েই হাসতে থাকে শান্তি। আত্রেয়ী একেবারে স্তব্ধ হয়ে, আর দুটো অপলক চোখ তুলে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে। —কী আশ্চর্য।

শান্তি—আশ্চর্যের কিছু নেই। শ্রীলেখা কটেজের বউদির মত এম এ বি এ পাশ না করলেও এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিসুদ্ধি আমার আছে।

বই খুলে বইয়ের ভিতর থেকে একটা চিঠি বের করে শান্তি। আত্রেয়ী বলে—ও চিঠিটা না পড়লেই ভাল করবে বউদি। না না, পড়ো না বলছি। পড়লে তোমারও একটুও ভাল লাগবে না।

আত্রেয়ীর গলার স্বরের সঙ্গে যেন একটা ক্ষীণ আর্তনাদের শিহরও শান্তিকে বাধা দিতে চাইছে। কিন্তু শান্তি ততক্ষণে চিঠিটাকে পড়ে ফেলেছে। খুব ছোট চিঠি। "গত মাসে তোমার একটিও চিঠি পাইনি। তার আগের মাসে তবু একটা চিঠি পেয়েছিলাম। আশা করি, ভালই আছ।"

চিঠি পড়ে নিয়েই শান্তির চোখ দুটো যেন শুকনো হয়ে ছটফট করতে থাকে। ঘরের এদিকে-ওদিকে ঘুরে ; আর মাঝে মাঝে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, আনমনার মত বাইরের দিকে তাকিয়ে কী-যেন ভাবতে থাকে। তারপরেই একেবারে খুশির হাসিটি হয়ে ছুটে এসে আত্রেয়ীর গায়ের উপর পড়ে। —ওগো বোকা মেয়ে, এ চিঠি কী বইয়ের মধ্যে ফেলে রাখতে আছে ?

আত্রেয়ী—কী বললে ?

শান্তি—এ চিঠি বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে হয়।

চট করে এক হাতে আত্রেয়ীর জামার গলাটা ফাঁক করে, আর এক হাতে চিঠিটাকে টুপ করে সেই ফাঁকের ভিতরে ফেলে দেয় আর দুলে দুলে হাসতে থাকে শান্তি।

কাকিমার ডাক শোনা যায়—তুমি একবার এদিকে এসো, শান্তি।

—এখনই আসছি, কাকিমা। তখনি ব্যস্তভাবে পাশের ঘরে কাকিমার কাছে এসে দাঁড়ায় শান্তি।

কাকিমা—তুমি যখন এসেছ, তখন আর চিন্তা করি না।

আত্রেয়ীর মা—তুমি এবার মেয়েটার ভার নাও শান্তি। আমরা যে সবাই অচল ; কিছুই করতে পারি না, শুধু ভয় পেয়ে পেয়ে আধমরা হয়ে পড়ে থাকি।

মনিদিদা জপের মালা থামিয়ে রেখে কথা বলেন—আর তো মাত্র দেড় বছর। তোমরা এসে মেয়েটার সঙ্গে এরকম একটু হাসাহাসি করলে দেড়টা বছর যে দেড়টা মাসের মত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে।

শান্তি বউদি—সেই জন্যেই তো এসেছি। কিছ্ছু ভাববেন না। আমি এখন আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাব।

আবার ব্যস্তভাবে আত্রেয়ীর ঘরের ভিতরে ঢুকে হেসে ওঠে শান্তি।—চলো, বেড়িয়ে আসি। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, সেজে-টেজে নাও।

আত্রেয়ী—কোনও দরকার নেই।

শান্তি—খুব দরকার আছে।

আয়নার টেবিলের উপর থেকে পাউডারের ডিবেটা হাতে তুলে নেয় শান্তি ; চটপট হাত চালিয়ে আত্রেয়ীর মুখে কপালে গলায় আর ঘাড়ে পাউডার ছিটিয়ে দিতে থাকে। বিরক্ত হয়ে আর দুই ভুরু কুঁচকে দিয়ে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী।

কিন্তু শান্তির ব্যস্ততা সেজন্য একটুও ভয় পায় না একটুও বিচলিত হয় না। আত্রেয়ীর একটা ভুরু আস্তে একটা চিমটি দিয়ে ধরে শান্তি বিহ্বল হয়ে হাসে।—ভুরু তো নয় ; যেন প্রজাপতির ডানা। বুঝবেন ঠেলা হেমন্তবাবু।

হঠাৎ হাত তুলে আর বেশ বড় করে তেল-সিঁদুরের একটা দাগ আত্রেয়ীর সিঁথিতে এঁকে দেয় শান্তি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী। শান্তি বউদির হাত দুটো যেন এক জাদুকরীর হাতের মত খেলা করে করে মায়ার ঝাঁপি খুলে ধরছে। রঙিন শোলার পাখিকে কথা বলাচ্ছে। জলকে আলতা করে দিচ্ছে, আর মাটিকে সোনা।

—চলো ; সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, আর দেরি করলে দেখতেই পাবে না। ব্যস্তভাবে আত্রেয়ীর হাত ধরে টানতে থাকে শান্তি।

—কোথায় যাচ্ছ ? দেখবারই বা কী আছে ?

—কিছু শোননি ?

—না।

—ছোট ঝিলের জলে একটা ডিঙি ভাসিয়েছেন শ্রীপদবাবু। জাল ফেলে সব মাছ ছেঁকে তুলছেন। আজ দুপুর থেকেই এই কাণ্ড শুরু হয়েছে।

হেসে ফেলে আত্রেয়ী।—চলো ; কিন্তু তোমার রকম দেখে মনে হচ্ছে ; তুমিও জাল ফেলে কিছু ছেঁকে তুলতে চাইছ।

—না আত্রেয়ী ; বিশ্বাস করো। আমার কোনও মতলব নেই।

ছোট ঝিলের চারিদিকে লোকের ভিড়, সন্ধ্যে হলেও হালকা হয়নি। কিন্তু সন্ধ্যে হলেও দেখতে কোনও অসুবিধে নেই ; কারণ বেশ বড় একটা চাঁদ উঠেছে। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ঝিলের ধারে এক জায়গায় ঘাসের উপর ধড়ফড় করছে বড়-বড় কাতলা চিতল আর শোল। চাঁদের আলোতে চিকচিক করে জ্বলছে ধড়ফড়ে মাছের গা।

গোষ্ঠবাবু চেঁচিয়ে হাঁক দিলেন—এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় ক্যাচ : কী বলেন শ্রীপদবাবু ?

ঝিলের জলের ডিঙির উপর দাঁড়িয়ে জবাব হাঁকেন শ্রীপদবাবু। —আশা হচ্ছে, এবারের ক্যাচ আরও ভাল হবে।

দিবাকর বলে—এখনও কিন্তু একটাও কালবোশ ওঠেনি।

মাছের নামে যাদের জিভের জল গড়িয়ে পড়ে, তাদেরই আনন্দের এক-একটা গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাথার কাপড় টেনে দিয়ে আর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শান্তি। —চলো আত্রেয়ী ; এখানে সুবিধে হবে না। আমি কি জানতাম ছাই, ওরাও সবাই এখানে এসে জুটেছে ?

আত্রেয়ী হাসে—এর চেয়ে ভাল, ধানোয়ার রোড ধরে একটু বেড়িয়ে আসি চলো।

ধানোয়ার রোডের আমের গাছে নতুন বোল ধরেছে। কাছেই নালার কালভার্টের কাছে সড়কের কিনারায় ঘাসের উপর কারা যেন বসে আছে।

শান্তি বলে—দুর ছাই, এখানে এসেও একটু নিরিবিলি হয়ে বসবার উপায় নেই ; কারা আগেই এসে জুটেছে। চলো, ফিরে যাই।

—আসুন আত্রেয়ীদি ; আসুন বউদি ; ফিরে যাচ্ছেন কেন ?

নরেন, পরেশ, মাধব আর বিমল একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে।

শান্তি হাসে—তাই বল ! তোমরা এখানে ? আচ্ছা, তোমরা এখন একটু দয়া করে সরে পড়ো।

পরেশ—যাচ্ছিই তো। আপনারা এখন একটু দয়া করে বসুন এখানে।

বিমল—কিন্তু একটু আস্তে কথা বলবেন বউদি, কেউ যেন শুনতে না পায়।

মাধব—কিছু মনে করবেন না আত্রেয়ীদি ; গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলবার নিয়ম-কানুন এখনও শিখিনি।

আত্রেয়ী হাসে—যেও একবার দিবাকরদার কাছে ; ভাল করে শিখিয়ে দেবেন।

চলে গেল বিমল মাধব নরেশ আর পরেশ।

নালার জলে চার পাঁচটা পানকৌড়ি তখনও হাবুডুবু দিয়ে খেলা করছে। দু'পাশের সাদা কাশের বন চাঁদের আলোতে আরও সাদা হয়ে হাসছে আর দুলছে। শান্তি বলে—এটা তো ফাল্গুন মাস।

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

শান্তি—তোমার তো আষাঢ়।

আত্রেয়ী—অ্যাঁ ?

শান্তি—অ্যাঁ আবার কী ? যেন কিছু মনে নেই। কিছুই বুঝতে পারছেন না।

আত্রেয়ী—বুঝেছি ; হ্যাঁ, মনে আছে।

শান্তি মুখ টিপে হাসে—আষাঢ় মাস যখন, তখন নিশ্চয় খুব ভিজেছিলে। তাই না ?

আত্রেয়ী—কী বললে ?

শান্তি—আমি তো জানতে চাইছি ; তুমিই বলো।

আত্রেয়ী—কী বলব ?

শান্তি—হেমন্তবাবু প্রথম কী কথাটি বললেন ?

আত্রেয়ী হাসে—এটা কী হচ্ছে ?

শান্তি—কী ?

আত্রেয়ী—এটা জাল ফেলা হচ্ছে না ? খুব যে বড়-গলা করে বলেছিলে, কোনও মতলব নেই।

শান্তি—বলো ভাই ; না শুনলে আজ আমার পেটের সিঙাড়া হজম হবে না।

আত্রেয়ী—আজ বুঝি খুব সিঙাড়া খেয়েছ ?

শান্তি—খুব নয় ; একটি। আমার তো চোখের জন্যে ওসব কড়া-ভাজা জিনিস খাওয়াই মানা।

আত্রেয়ী—তবে খেলে কেন ?

শান্তি—ইচ্ছে করে তো খাইনি।

আত্রেয়ী—তার মানে ?

শান্তি—জোর করে খাইয়ে দিলে আমি আর কী করতে পারি ? ওরকম একটা হাট্টা-কাট্টা নির্লজ্জ

পুরুষ মানুষের গায়ের জোরের সঙ্গে আমি পেরে উঠব কী করে ?

আত্রেয়ী—বাঃ, কী কথাই বললেন ! দিবাকরদা নির্লজ্জ ? আর যিনি চোয়াল নেড়ে সেই সিঙাড়া খেলেন, তিনি হলেন লজ্জাবতী লতাটি ?

শান্তি—যাকগে, বাজে কথার চালাকি ছেড়ে দাও। যা জিজ্ঞেস করেছি, এখন সে কথার সোজা জবাব দাও।

আত্রেয়ী—কী কথা ?

শান্তি—হেমন্তবাবু প্রথমে কী কথা বললেন ?

আত্রেয়ী বোধ হয় একটা ধূর্ত হাসি লুকোবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নালার জলের পানকৌড়ির দিকে তাকিয়ে কথা বলে—কোনও কথাই হয়নি।

শান্তি—হতেই পারে না। মিথ্যে কথা।

আত্রেয়ী—আমি দিব্যি করে বলতে পারি, সত্যি কথা।

শান্তি—তবে ? এর মানে কী ? প্রথমে তুমিই কথা বলেছিলে ?

আত্রেয়ী—আমি বলব কী করে ? আমার তো তখন মুখ বন্ধ।

শান্তি—কে তোমার মুখ বন্ধ করে দিল ?

আত্রেয়ী—যার দরকার ছিল, সে-ই।

শান্তি—তার মানে...।

আত্রেয়ীর মুখের ধূর্ত হাসিটা হঠাৎ যেন একটা ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে—আর মানে বুঝতে হবে না। চুপ করে থাকো।

চমকে ওঠে শান্তি। আত্রেয়ীর একটা হাত শক্ত করে ধরে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। —এইবার বুঝলাম ; উঃ, কী বোকা আমি !

দেখলেন শান্তি বউদি ; আত্রেয়ীর চোখের তারা দুটো যেন দুটো নিবিড় খুশির পানকৌড়ি ; চাঁদের আলো গায়ে মেখে স্বপ্নের জলে হাবুডুবু খেলছে।

শান্তি বলে—তারপর কী হল ?

আত্রেয়ী—তারপর যা হয়েছে আমি চোখে দেখতে পাইনি।

শান্তি—চোখ বন্ধ করে ছিলে বুঝি ?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

—বেশ একটু ভয়-ভয় করছিল ?

—একটু।

—ভয় ভাঙল কখন ?

—তখনই।

—কেন ?

—সে নিজেই হাত বুলিয়ে সব ভয়ের দাগ মুছে দিল।

—তুমি কী করলে ?

—কিছুই না।

—ইচ্ছে হয়নি ?

—হয়েছিল। কিন্তু সেদিন সাহস হয়নি।

—কবে সাহস হল ?

—রাধাপুরে এসে। কিন্তু সব সাহস হঠাৎ মিথ্যে হয়ে গেল।

—কেন ?

—হঠাৎ পুলিস এল : তাই সেও চলে গেল। একটা কথা বলবারও সুবিধে পেলাম না। ঘরে লোকও ছিল।

আত্রেয়ীর মাথাটা অলস হয়ে হাঁটুর উপর ঝুঁকে পড়তে চাইছে। শান্তি তখুনি যেন একটা আহ্লাদের ঝড় হয়ে আর হেসে গড়িয়ে আত্রেয়ীর গায়ের উপর ভেঙে পড়ে। —ধন্যি তুমি ? কোনও

মেয়ে তিনদিনের মধ্যেই বরের সঙ্গে এমন জমাট কাণ্ড করতে পেরেছে বলে আমি কখনও শুনিনি।

কাশের বন দুলছে, সেই দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে শান্তি ; তারপরেই গলার স্বর একেবারে মৃদু করে দিয়ে আর ফিসফিস করে হেসে কথা বলে—হেমন্তবাবু যেদিন আসবেন সেদিনই, প্রথম দেখা হওয়া মাত্র, বুঝলে তো আত্রেয়ী ?

—কী ?

—দেনা শোধ করে দিও।

আত্রেয়ী হাসে—তোমাকে সাক্ষি রেখে, কেমন ?

শান্তি—নিশ্চয় ; আমি উঁকি দেবই।

—সেই আশাতেই থাকো।

—আছিই তো। আর তো মাত্র দেড় বছর।

—দেড়টা বছর বেঁচে থাকতে পারব তো, বউদি ?

—কী ছাই বলছ ? এরকম কথা শুনলে সত্যিই আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

—চলো এবার। আমের বোলের কড়া গন্ধে গায়ে বোধ হয় চিনি জমে গেল।

—ভালই হল। কালই হেমন্তবাবুকে বেশ স্পষ্ট করে কথাটা চিঠিতে জানিয়ে দাও।

—কী ?

—অনেক চিনি জমেছে।

আত্রেয়ীর পিঠে মিষ্টি করে একটা চিমটি কেটেই উঠে দাঁড়ায় শান্তি। আত্রেয়ীর হাত ধরে আর নীরব হয়ে হাঁটতে থাকে।

টাউন আউট-পোস্টের কাছে পলাশের মাথাটা হাওয়াতে দুলছে ; জমাদারের পোষা ময়নাটা ডাকতে শুরু করেছে , সঙ্গে সঙ্গে শান্তির মুখেও একটা নতুন হাসির শব্দ ডেকে ওঠে। —কী সুন্দর চিঠি।

আত্রেয়ী হাসে। —কোন চিঠি ? আজ যেটা পড়লে ?

—হ্যাঁ।

—ও চিঠিতে সুন্দর কী দেখলে ?

—হেমন্তবাবুর মনটাকেই দেখলাম। তোমার চিঠি না পেয়েও কেমন শান্ত মনটি নিয়ে চিঠি লিখেছে। কিছু না জেনেও অনেক কিছু বুঝতে পারি আত্রেয়ী। তোমার স্বামীর মত খাঁটি ভালবাসার মানুষ খুব কমই হয়।

—কেমন করে বুঝলে ?

—বললাম তো, সব কিছু না জেনেও এটুকু বুঝতে পারছি। তোমার হাতের লেখা একটা চিঠিকেই যে-মানুষ এত ভালবাসে, সে যে তোমাকে কত ভালবাসে, সেটা... ।

—কথা বাড়িও না বউদি ; তোমার পায়ে পড়ি।

এইবার চোখ দুটো বেশ টান করে, আর আজকের সব মতলবের পিপাসা ব্যাকুল করে দিয়ে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকায় শান্তি। হ্যাঁ, আত্রেয়ীর চোখের তারাতে চাঁদের আলো ভিজে গিয়ে চিকচিক করছে।

সরিয়াডির শান্তি বউদির একটা মানত সফল হয়েছে এতক্ষণে ; শান্তি বউদির চোখের আর মুখের হাসিও যেন অদ্ভুত এক তৃপ্তির স্বাদ পেয়ে নিবিড় হয়ে ওঠে।

শান্তি বলে—তুমি একটু বড় করে চিঠি লিখলে ভদ্রলোক কী খুশিই না হবেন। ...যাই হোক, বেশি রাত জেগে চিঠি লেখালেখি করো না আত্রেয়ী।

ছোট ঝিলের কিনারাতে ভিড় এখনও কমেনি। চেঁচিয়ে কথা বলছে দিবাকর। —একটা বড় কালবোশ, আর একটা ছোট শোল আমি নিয়ে চললাম শ্রীপদদা।

চমকে ওঠে শান্তি। —শুনলে তো আত্রেয়ী। আমার দফারফা করবার জন্যে তোমার দাদাটি কেমন ব্যস্ত হয়েছেন ?

আত্রেয়ী হাসে—কেন ? কী হল ?

শান্তি—রাত ন'টার সময় একগাদা জীবজন্তু নিয়ে গিয়ে রান্না করতে বললে যে মানুষকে কী হয়রানি করা হয়, সেটা এই ভদ্রলোক একটুও বোঝে না। বোঝবার মনই নেই। সবাই কি হেমন্তবাবু ?

নয়াপাড়ার সড়ক ধরে এগিয়ে চলে যায় শান্তি, আর কালীবাড়ি রোড ধরে আত্রেয়ী।

॥ ১৫ ॥

ঠিক সকালবেলা, সরিয়াডির গা-ঘেঁষা রেল-লাইনের উপর থমকে থাকা যত কুয়াশার চাপ ছিঁড়ে দিয়ে গয়ার পিতৃপক্ষের একটা স্পেশাল ট্রেন হু-হু করে ছুটে চলে গেল। কী ভয়ানক শব্দ। একটা হাহাকার যেন ঝড় হয়ে আর হুইসিল বাজিয়ে ছোট শহর সরিয়াডির মাটি কাঁপিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

চকের বাজারে তখনও ভিড় জমেনি, কোনও হল্লাও জাগেনি। চকের সেই নীরবতার বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে একটা গম্ভীর শব্দ হাঁসফাঁস করে আর দুলতে দুলতে চলে যায়—রাম নাম সৎ হ্যায়।

সেই মুহূর্তে বৈকুণ্ঠ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের উনুনের কাছ থেকে একটা লাফ দিয়ে বের হয়ে এসে চেঁচিয়ে ওঠে শচীন কারিগর।—ধরো ধরো, শক্ত করে ধরো, চেপে ধরে রাখো।

মহামায়া টেলারিংয়ের বিকাশ সবার আগে ছুটে গিয়ে ধরেছিল ; এবার শচীনও এসে চেপে ধরে।

হঠাৎ রাম নাম সৎ হ্যায় শুনেই ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে লোচনবাবুর এক্কার ঘোড়া। ঘোড়াটা রাস্তার পাশের নালা টপ্‌কে ছুটে যাবার জন্য একটা লাফ দিতেই এক্কাটা টাল খেয়ে কাত হয়ে পড়েছে। এক্কার গদির উপরে বসে আর্তনাদ করেছেন লোচনবাবুর স্ত্রী। ঘোমটায় মুখ ঢাকা, আর কোলে দুটো বাচ্চা ছেলে। গাড়োয়ান, থুরথুরে বুড়ো বাবুরাম এক্কা থেকে পড়েই গিয়েছে।

ঘোড়াটা দুই পা তুলে আর চমকে চমকে গা-ঝাড়া দিচ্ছে। কিন্তু পালিয়ে যাবার সাধ্যি নেই। শচীন আর বিকাশ, দু'জনেই শক্ত করে ধরে রেখেছে। শচীনের হাতে ঘোড়ার লাগামটা ; আর বিকাশের শক্ত মুঠোর ভিতরে ঘোড়ার ঘাড়ের চুলের একটা ঝুঁটি।

বুড়ো বাবুরাম উঠে দাঁড়ায়। ভীরু ঘোড়াটার গলায় হাত বোলায়। লোচনবাবুর স্ত্রীর আর্তনাদ শান্ত হয়ে যায়। কোলের বাচ্চা দুটো হাসতে থাকে। বাবুরামের হাঁকের শব্দ শুনে আবার সুন্দর টাপ্‌রি চালে চলতে থাকে এক্কার ঘোড়া।—টাপ্ টাপ্, টাপ্ টাপ্, তড়াপ্!

সন্দেহ হতে পারে ; সরিয়াডির আত্মাটা বুঝি খুব সজাগ হয়ে এইবার সব দিকে পাহারা রেখেছে। প্রায় রোজই এক-একটা কাণ্ড। ধরে রাখো, ছেড়ে দিও না, আটকে ধরো, ফেলে দিও না—এক-একটা ব্যস্ততার কাণ্ড।

একদিন রাত দশটারও পরে ; যখন নয়াপাড়ার সড়কে ঝিঁঝিঁ ডাকছে আর জোনাকি জ্বলছে কালীবাড়ি রোডের যত খেজুর গাছের মাথায়, তখন গোষ্ঠবাবু হাবুলবাবু আর দিবাকর ; বলাই নরেন আর পরেশ ; সেই সঙ্গে থানা অফিসার আর দু'জন কনেস্টবল ছুটোছুটি করে ছোট শহর সরিয়াডির আনাচ-কানাচ তন্ন-তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে থাকে—কোথায় গেল চিনু ?

দেখা গেল, কাছারিপাড়ার কাছাকাছি ছোট একটা বাংলোবাড়ি, নাম ইন্দুনিলয়, তারই বারান্দার উপর একা দাঁড়িয়ে আর ফুঁপিয়ে কাঁদছে চিনু।

ঘরে কেউ নেই, শুধু তিন মাস বয়েসের একটা ঘুমন্ত মানুষ সে বাড়ির ঘরের ভিতরে একটা চৌকিতে একটা তোয়ালের উপর পড়ে আছে।

চিনু বলে—সরিৎ কাকা আর জয়া কাকিমা সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বের হয়েছে, এখনও ফিরে আসেনি। আমাকে বলে গেল, তুমি এখানে থাকো, আমরা এখনি আসছি।

হাবুলবাবু—তুই এখানে কেন এসেছিলি ?

চিনু কাঁদতে থাকে।—আমি রোজই একবার আসি।

—কেন ?

—ওকে দেখতে। ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে দেখিয়ে দেয় চিনু। বুঝতেও আর অসুবিধে নেই, বাচ্চাটাকে

এখানে একা রেখে বাড়ি যেতে পারেনি চিনু ; এটাই হল চিনুর বিপদ।
কিন্তু কে এই সরিৎ আর কে এই জয়া ? পরেশ বলে—মাস চার-পাঁচ হবে, ওরা এখানে চেঞ্জে এসেছিল। বাড়ি থেকে বড়-একটা বের হত না।
থানা অফিসার হাসেন।—আর তো বোঝবার কিছুই নেই গোষ্ঠবাবু।
গোষ্ঠবাবু—না।
হাবুলবাবু—মনে হয় ওরা ছ'টা পঞ্চাশের ট্রেনেই সরে পড়েছে।
থানা অফিসার—বোধ হয়। কিন্তু এখন কী করা যায় ? বাচ্চাটাকে কি থানাতে নিয়ে গিয়ে আমার ফাইলের ওপর ফেলে রেখে দেব ?
হাবুলবাবু—না না, তা হতে পারে না, অসম্ভব। ফেলে দেওয়া যায় না।
থানা অফিসার হাসেন—আমি ঠাট্টা করছি হাবুলবাবু। কিন্তু আপনারা পাঁচজনে মিলে একটা পরামর্শ দিন, রাখা যায় কী করে ?
চিনুকে বাড়ি নিয়ে গেল নরেন। বাচ্চাটাকে আগলে দাঁড়িয়ে রইলেন হাবুলবাবু ও গোষ্ঠবাবু। দিবাকর, বলাই আর পরেশ লণ্ঠন হাতে নিয়ে বের হয়ে গেল। ফিরে এল যখন, তখন রাত দুটো।
বৈকুণ্ঠ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কারিগর শচীন আর শচীনের বউও সঙ্গে এসেছে। শচীনের ছেলে-পুলে নেই ; তাই শচীনের কোনও আপত্তি নেই। আর শচীনের বউকে দেখেই বোঝা গেল, বউটার হাত দুটো যেন ছটফট করছে।
সোজা তরতর করে হেঁটে আর ঘরের ভিতরে ঢুকেই ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে দু'হাতে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে ধরেই বুকের উপর তুলে নিল শচীনের বউ ; আবার মিটমিট করে হাসতেও থাকে বউটা।
বীরমানিকবাবু ; নেপালি ভদ্রলোক, যিনি দশ বছর ধরে এই সরিয়াডির একটি স্থায়ী মানুষ হয়ে ঘিয়ের কারবার করছেন, তাঁরই স্ত্রী নয়াপাড়ার সড়ক ছাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে ছোট ঝিলের কাছে এসে পড়লেন। পাড়ার মানষ তখন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে তাঁকে নয়াপাড়ারই এদিক-ওদিকে খোঁজাখুঁজি করছে।
স্ত্রীর হাত থেকে আফিমের গুলিটা জোর করে কেড়ে নিতে পেরেছেন বীরমানিকবাবু ; কিন্তু ধরে রাখতে পারেননি। মরণবাসনার নারী তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়েই ছুটে বের হয়ে গিয়েছে : বীরমানিকবাবু শুধু পথে দাঁড়িয়ে আর্তস্বরে ডাক দিয়েছেন—ধরো ধরো ধরো ; চলে গেল।
অত দূরে ছোট ঝিলের কাছে পাগল দুর্গাচরণের কাছে নিশ্চয় বীরমানিকবাবুর এই আর্তস্বরের কোনও শব্দ পৌঁছয়নি। কিন্তু, তবু ভুল হয়নি দুর্গাচরণের। বীরমানিকবাবুর স্ত্রীকে ঝিলের জলের দিকে ছুটে যেতে দেখেই একটা লাফ দিয়ে পথের মাঝখানে শক্ত হয়ে দাঁড়াল দুর্গাচরণ।
—হট্ যাও রে পাপী ! দুর্গাচরণের দিকে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে ধিক্কার হানেন বীরমানিকবাবুর স্ত্রী। কিন্তু দুই হাত মেলে দিয়ে আর পথ আটক করে দুর্গাচরণ যেন ভয়ানক কঠিন বাধার পাথরটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
পাড়ার মানুষ ছুটে এসে যখন বীরমানিকবাবুর স্ত্রীকে ঘিরে ধরে, তখন এক লাফে রাস্তার এক পাশে সরে যায় আর অধোবদন হয়ে লজ্জিতভাবে হাসতে থাকে দুর্গাচরণ।
তিন মাসেরও বেশি হবে সিগারেট খাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন সামন্তবাবু। কিন্তু হঠাৎ একদিন নস্যি ধরলেন আর চন্দ্রবাবুকে হো হো করে হাসতে দেখে একটা কৈফিয়তও দিলেন—কী আর করি বলুন ? কিছু একটা না ধরে তো থাকতে পারা যায় না, চন্দরদা।
চন্দ্রবাবু—কিন্তু আমি তো বেশ থাকতে পারছি। আমার কিছুই ধরবার দরকার হয় না। কিছুদিন কাঁচা পেঁপে ধরেছিলাম, তা'ও এখন ছেড়ে দিয়েছি।
সামন্তবাবু—আপনার কথাই আলাদা।
চন্দ্রবাবু উৎফুল্ল হয়ে হাসেন—স্বীকার করছ তা হলে ?
কিন্তু মোষের শিঙের লাঠি দুলিয়ে চন্দ্রবাবু আজ এই সরিয়াডির যাকে যতই বোঝাতে চেষ্টা করুন না কেন, কেউ কিছু বুঝবে বলে মনে হয় না। তা না হলে, সেদিন ঠিক মাঝদুপুরে, যখন নিঝুম হয়ে আছে নয়াপাড়ার সড়ক, তখন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর ঘুমটা ধড়ফড় করে ভেঙে যাবে কেন ?

গেটের মালতীলতার কাছে দাঁড়িয়ে কে যেন ডাকছে—মাসিমা ? মাসিমা ? একবার দয়া করে আসবেন। আমি কেদার।

কে কেদার ? দেখতে পেলেন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী ; সেই ছেলেটি আর সেই মেয়েটি। শুকনো শীর্ণ আর সাদাটে মুখ, সেই কুন্তলা বেশ মুখভার করে আর তফাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গেটের কাছে এগিয়ে গেলেন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী। —আমাকে ডাকছিলে ?

কেদার—হ্যাঁ মাসিমা। আচ্ছা, আপনি ওর দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে বলুন তো, এই ক'দিনে ওর চেহারা অনেক ভাল হয়ে গেছে কী না। আমার কথা বিশ্বাসই করতে চায় না।

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী বলেন—হ্যাঁ, কুন্তলাকে এখন তো বেশ ভাল দেখছি। গাল দুটি তো বেশ সুন্দর লালচে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

কুন্তলা হাসে —কিন্তু আমি তো বাঁচব না, মাসিমা। আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

কেদার—আমাকে দিনরাত এই সব বাজে কথা বলছে, আর, আরও বিশ্রী কথা বলছে। বলছে তুমি আবার বিয়ে করো।

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর মুখের হাসিটা করুণ হয়ে কাঁপতে থাকে। —ছি এসব কথা বলা তোমার একটুও উচিত নয়, কুন্তলা।

কেদার—বেড়াতে বের হয়েও আমাকে ওর হাতটা একটু ধরতে দেবে না। আমাকে শাসিয়ে ধমকে দেয়, ওকে ছুঁয়ে ফেললে আমারও নাকি রোগ হবে। আপনি বলুন মাসিমা, এ সন্দেহের কী কোনও মানে হয় ?

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর গলার স্বর কাঁপে ; চোখ দুটো সেঁতসেঁত করে। —এরকম করো না কুন্তলা ; তোমার স্বামী ছেলেমানুষ, তুমিও ছেলেমানুষ ; বেড়াবার সময় দুটিতে মাঝে মাঝে একটু হাত ধরাধরি করে বেড়াবে। খুব ভাল হবে।

চলে গেল কেদার আর কুন্তলা। সরিয়াডির শালবনের নতুন হাওয়াও যেন ওদের সঙ্গে সঙ্গে ফুরফুর করে উড়ে চলেছে, তবু একটুও ধুলো উড়ছে না।

শান্তিও প্রায় এইরকমই হাতে হাত ধরিয়ে দেবার মত একটা কাণ্ড এই তিন মাসের মধ্যে অন্ততঃ তিনবার করেছে।

—হেমন্তবাবু চিঠিতে কী লিখলেন, আর তুমি সে চিঠির জবাব কী লিখলে, আমি দুই চিঠিকে পাশাপাশি রেখে আগে পড়ে নেব, আত্রেয়ী ; তারপর চিঠি ডাকে দেবে।

আপত্তি করেনি আত্রেয়ী। দুই চিঠিকে শান্তির হাতে তুলে দিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে কাঁটালতার ঘেরানের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছে।

"তোমার চিঠি পড়ে আমি ভুলে যাই যে আমি জেলে আছি। মনে হয়, তুমি আমার চোখের সামনে বসে কথা বলছ।

সেই দিনটির কথা কী কখনও ভুলতে পারি ? হ্যাঁ, মনে আছে বইকি, চলে যাবার আগে তোমার দেওয়া জল খেয়েছিলাম। সে জল কিন্তু আমিই চেয়েছিলাম, তুমি ইচ্ছে করে দাওনি। সেজন্য তোমাকে কিন্তু এতটুকুও দোষ দিচ্ছি না। তুমি আমারই জন্যে অনেক কষ্ট সহ্য করেছ ; আরও কিছুদিন সহ্য করো।"

"বিশ্বাস করো, তুমি চলে যাবার সময় আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। তুমিই বুঝতে পারনি। বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে যেতে। মামার চিঠিতে জানলাম, জেলের হাসপাতাল তোমার জন্যে দুধ বরাদ্দ করেছে। তবু, আমি এখানে কিন্তু দুধ ছোঁবও না। এই জন্যে তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। আমাদের শান্তি বউদি সব সময় তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন। শান্তি বউদি বলেছেন, তুমি নাকি আমাকে আর আমিও নাকি তোমাকে খুব ভালবাসি। সত্যি তো ? ঠিক তো ? পরের চিঠিতে জবাব চাই।"

চিঠি দুটোকে বই-চাপা দিয়ে আত্রেয়ীর টেবিলে রেখে দিয়ে আর কৃতার্থতার আনন্দে যেন ডগমগ হয়ে শান্তিও বাইরে গিয়ে আত্রেয়ীর কাছে দাঁড়ায় আর গল্প করে। —একটা কথা লিখতে ভুলে গেলে কেন ?

আত্রেয়ী—কী কথা ?

শান্তি—তোমার গায়ে এখন যে খুব চিনি জমেছে, সেটা জানিয়ে দিলে হেমন্তবাবু একটু খুশি হতেন না কি ?

আত্রেয়ী—বেশ তো, পরের চিঠিতে লিখব।

শান্তি—আজ সন্ধ্যাবেলা তৈরি হয়ে থেকো, স্টেশনে বেড়াতে যাব।

আত্রেয়ী—আজ হঠাৎ স্টেশনে কেন ?

শান্তি—কিছু শোননি ?

আত্রেয়ী—না।

শান্তি—আজ সন্ধ্যাবেলা পঞ্চম জর্জের ছেলের স্পেশ্যাল পাস করবে।

শান্তির ক্লান্তি নেই। শান্তি যেন ছোট সরিয়াডির ঘরোয়া মায়ার দূত হয়ে প্রায় রোজই আসে হাসে আর চলে যায়। বাইরের মায়া, সে মায়া যতই ভালমানুষ হোক, তার হাতছানির টান থেকে সরিয়াডির মেয়ের প্রাণটাকে আগলে রাখার দায় নিয়ে এই তিন মাসের মধ্যেই শান্তি যা করতে পেরেছে, তাই নিয়ে শান্তির মনের গর্বেরও অন্ত নেই বোধ হয়। যেন তিরছি নদীর একটা ভুল স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দিতে পেরেছে শান্তি। তাই দিবাকরকে যখন তখন এমন কথাও বলতে পেরেছে—এবার গিয়ে একদিন জিজ্ঞেস করো আত্রেয়ীকে, কী রে, তোর সেই শ্রীলেখা কটেজের বউদিকে, না এই শান্তি বউদিকে বেশি ভাল লাগে ?

চিনুর পিসিমা আর সন্তুর মা'ও চুপ করে নেই। তাঁরাও দু'জনে মাঝে মাঝে একেবারে আত্রেয়ীর ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েন, আর আত্রেয়ীকে চোখের সামনে বসিয়ে রেখে গল্প করেন। আত্রেয়ীর জন্য মটর ডালের বড়ি নিয়ে আসেন সন্তুর মা ; আর চিনুর পিসিমা নিয়ে আসেন তাঁর পুজোর ঘরের প্রসাদী ফল—পেয়ারা, শশা আর আখের টুকরো।

কাকিমাও সামনে থাকেন, তাই চিনুর পিসিমার গল্প করতে সুবিধা হয়।—তুমি তো দেখনি সুহাস, আমি দেখেছি, আত্রেয়ীর শ্বশুরবাড়ির দীঘিটার এপারে দাঁড়ালে ওপারের মানুষের মুখ চেনা যায় না। একটা সাগর বলে মনে হয়। রাধাপুরেই তো আমার বেণুমাসির বাড়ি। বিয়ের আগে কতবার বেণুমাসির বাড়িতে গিয়েছি আর কত কাঁটাল খেয়েছি, সবই মনে আছে।

সন্তুর মা—আত্রেয়ীরা তো একাই সাত-আনি।

চিনুর পিসিমা—হ্যাঁ গো ; ন' আনিদের এগারোটা শরিক। যেমন হাভাতে, তেমনই কুচুটে। বেণুমাসির কাছে শুনেছি, সাত-আনিদের দুর্গোৎসবে হাজার কাঙালকে অন্নবস্ত্র দান করা হয়। এমন ঘরের ছেলেই তো হেমন্ত।

একদিন, সেদিন ঠিক মাঝ দুপুরে আত্রেয়ীদের বাড়ির মাঝের ঘরে মাদুরের উপর বসে যখন গল্প করছিলেন চিনুর পিসিমা আর সন্তুর মা, সেদিন একে একে আরও কয়েকজন এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন—গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী, হাবুলবাবুর স্ত্রী, সামন্তবাবুর মা, হাজরাবাবুর দিদি আর শ্রীপদবাবুর ছোট শালী। আত্রেয়ীর মা তাঁর শ্বাসকষ্টের সব বাধা ভুলে গিয়ে সবার সঙ্গে গল্প করেন।—আত্রেয়ী তো শুধু নামেই আমার মেয়ে। তোমরাই হলে ওর আসল মা।

বাইরে ঝুরু ঝুরু শব্দ করে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। কাকিমা হঠাৎ এসে আর দু'চোখে যেন দুটি অদ্ভুত বিহ্বলতা নিয়ে, মৃদু স্বরে ফিসফিস করেন।—দেখবেন তো আসুন।

আত্রেয়ীর ঘরের দরজার একটা কপাট আস্তে একটু ঠেলে দিলেন কাকিমা। সেই ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন সবাই, খাটের উপর শুয়ে আর নিবিড় ঘুমের ঘোরে একেবারে নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে-আত্রেয়ী ; জানালা দিয়ে ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির ছিটে আত্রেয়ীর মুখের উপর এসে ছড়িয়ে পড়ছে। আত্রেয়ীর হাতে একটা খোলা চিঠি। ঘুমের ঘোরে নেতিয়ে পড়া হাতটা চিঠিটাকে কী শক্ত করে ধরে রেখেছে।

গলার স্বর আরও মৃদু করে নিয়ে কথা বলেন কাকিমা।—হেমন্তের এই চিঠিটা আজই এল।

॥ ১৬ ॥

পাটনাতে গিয়ে এম-এ পরীক্ষা দিয়েছে, আর একটা চাকরির চেষ্টাও করেছে বলাই। মাত্র একটা মাস পাটনাতে থাকতে হয়েছে। তারপর সরিয়াড়িতে ফিরে আসতে হল। মা চিঠি লিখেছিলেন ; সুমন্তর কাছে শুনলাম তোমাদের পাটনার মেসে মাষকলাইয়ের ডাল খেতে দেয়। এ কী সর্বনেশে কথা ! এখন আর তোমার মেসে থেকে কাজ নেই। পত্রপাঠ বাড়ি চলে এসো।

ভোরের ট্রেনে রামবাগ রোড স্টেশনে নেমেই সরিয়াড়ির নিমের বাগানে কাকের ডাক শুনতে পেয়েছে বলাই। সরিয়াড়ির ভোরের বাতাসের ছোঁয়া লেগে বলাইয়ের মুখে একটা ভৈরবী ঠুংরিও গুনগুন করে উঠেছে।

কিন্তু কাছারিপাড়ার সড়ক ছাড়িয়ে সামান্য একটু এগিয়ে যেতেই বলাইয়ের মুখে গানের গুনগুন যেন চমকে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল। শ্রীলেখা কটেজের একটা ঘরের সব জানালা এত ভোরেই একেবারে খোলা-মেলা হয়ে সরিয়াড়ির শালবনের হাওয়া খেতে শুরু করেছে। কটেজের বারান্দার উপরে একটা বেতের চেয়ার। চেয়ারের কাছে একটা বেতের টেবিল ; তার উপর মোটা-মোটা চেহারার কয়েকটা বই। বইয়ের উপর একটা চশমাও পড়ে আছে।

তবে কি সেই ভদ্রলোক, যার নাম নিখিল সেন, তিনিই আবার এসেছেন ?

সেদিন সন্ধ্যায় নরেনের সাইকেল শ্রীলেখা কটেজের সামনের রাস্তা দিয়ে তিনবার ছুটে গেল। প্রায় মাঝ-রাত যখন, তখন মাধবও খুব আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে এই রাস্তাতেই একবার ঘুরে গেল। দেখে গেল মাধব, কটেজের বাইরের ঘরের ভিতরে একটা আলো জেগে রয়েছে।

পরের দিন সকালবেলায় শ্রীলেখা কটেজের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে পথের উপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নরেন। না আর এগিয়ে যাবার কোনও দরকার নেই। দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, নিখিল সেনের আলোকিত মূর্তিটা কটেজের গেটের সামনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

নরেন ফিরে এসেই খবর দেয়। —হ্যাঁ দিবাকরদা, নিখিলবাবু আবার এসেছেন।

পরেশ—একাই এসেছেন।

মাধব—সেই মহিলা দুজনের কাউকেই দেখলাম না।

ট্যাক্স-আপিসের বারান্দার ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে আর বেশ চাপাস্বরে হাবুলবাবুর সঙ্গে কথা বলেন গোষ্ঠবাবু। —মাত্র ছ' মাস পরেই আবার ভদ্রলোক চলে এলেন : বুঝছি না এত তাড়াতাড়ি আবার হাওয়া বদলের কী দরকার ছিল ? ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য তো একটুও খারাপ নয়।

হাবুলবাবু—অথচ যাঁর আসা দরকার ছিল, যাঁর বাতের দোষ অনেকটা কমে গিয়েছিল, সেই ভদ্রলোকই এলেন না।

গোষ্ঠবাবু—তবে একটা কথা। মানুষটা তো ভাল।

হাবুলবাবু—তা তো বটেই। তবু এ একটা অস্বস্তির ব্যাপার হল গোষ্ঠদা।

আলো দেখে অস্বস্তি বোধ করতে হচ্ছে ; সরিয়াড়ির মনের সেই অবুঝ অন্ধকার বুঝি এখনও ভীরু হয়েই আছে। আপত্তি করবার কিছুই নেই ; নিখিল সেনের নিন্দে করবার কিছুই নেই ; সন্দেহটা তো কবেই মিথ্যে হয়ে গিয়ে উল্টে সরিয়াড়িকে লজ্জা পাইয়ে দিয়েছে। তবু অস্বস্তি।

পটলবাবুর পেয়ারা বাগানে ফল ধরেছে। কাশীর জাত-পেয়ারার চারা আনিয়ে আর অনেক যত্ন করে এই পেয়ারাবাগান তৈরি করেছেন পটলবাবু। আর, এই প্রথম ফল ধরেছে। তিনটে পেয়ারার ওজন এক সেরের বেশি। পটলবাবুর এই পেয়ারা বাগানের পাঁচিলের পাশে জটাধারী এক সাধু এসে ঠাঁই নিয়েছেন। পটলবাবু সকলকেই বলেছেন, এই সাধু একজন খাঁটি মহাপুরুষ। কিন্তু পটলবাবু সব সময় বাগানের দিকে চোখ রেখে একচালার নীচে একটি চৌকির উপর বসে থাকেন। চোখের চাহনিটা চমৎকার শান্ত কিন্তু বুকের ভিতরে বোধ হয় নিদারুণ অস্বস্তি।

শান্তিও শুনতে পেয়েছে। কিন্তু শান্তির চোখে কোনও ভাবনা চমকে উঠে না, কোনও স্তব্ধতাও থমথম করে না, নিঃশ্বাসেও কোনও অস্বস্তি ছটফট করে না ; কিছুু না। বরং দিবাকরের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছে শান্তি।

দিবাকর—হাসবার কী হল ?

শান্তি—কেন হাসব না ?

দিবাকর—আমি তো বেশ অস্বস্তি বোধ করছি।

শান্তি—কেন ?

দিবাকর—শত হোক, এটা একটা চিন্তার কথা নয় কি ?

ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি দিবাকরের চোখের দিকে এগিয়ে দিয়ে শান্তি আবার হেসে ফেলে—কলাটি। তোমাদের নিখিল সেনকে শুধু বই মাথায় তুলে নিয়েই চলে যেতে হবে।

নিখিল সেন নামে একটা অস্তিত্ব শ্রীলেখা কটেজের ঘরের ভিতরে রাতজাগা আলোর কাছে বসে থাকে—সকালবেলা গেটের সামনের রাস্তায় পায়চারি করে বেড়ায়, ঘটনাটা এর চেয়ে বড় কোনও ব্যাপার হয়ে উঠবে, এমন কোনও লক্ষণও দেখা যায় না। বলাই, মাধব আর নরেন দেখেছে, নিখিল সেন নিজেরই একটা খেয়ালের সুবিধার জন্য নিজের পছন্দমত খুব ছোট একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছেন। তারই মধ্যে থাকেন ভদ্রলোক।

পর পর প্রায় তিনটি মাস পার হয়ে গিয়েছে। বৈশাখী ঝড়ে ধানোয়ার রোডের আমগাছের মাথা থেকে কত কাঁচা আম ধানক্ষেতের উপর ছিটকে পড়ে ছড়িয়ে গড়িয়ে গেল। কিন্তু সে খবর জানবার জন্যে নিখিল সেনের চোখে মুখে কোনও চেষ্টার চঞ্চলতা জাগে বলে মনে হয় না। ভদ্রলোক শ্রীলেখা কটেজের ওই সামনের রাস্তা ছেড়ে একটি পা'ও এগিয়ে যেতে চান না। সরিয়াডির আম কুড়োবার জন্য হাওয়া-বদলের আর সব মানুষগুলির যত চেষ্টা ব্যস্ততা আর ব্যাকুলতা সকাল-বিকাল সব সময় হই-হই করছে কিন্তু নিখিল সেন শান্ত। সে ভদ্রলোকের মনে সরিয়াডির উপর হুটোপুটি করে কিছুই কুড়িয়ে নেবার জন্য কোনও ফুর্তির তাড়া নেই। হাঁটাহাঁটি আর ছুটোছুটি করে সরিয়াডির রাস্তায় ধুলো ওড়াবার কোনও ইচ্ছেও নেই বোধ হয়। এক-এক সময় সত্যিই মনে হয় দিবাকরের, ভদ্রলোক সরিয়াডির ধুলোর ছোঁয়া এড়িয়ে থাকবার জন্যে সকাল-সন্ধ্যা, আর দিন-রাত ঘরের ভিতরে আর বাড়ির কাছাকাছি থাকেন। এত টাকা-পয়সা আর এত বিদ্যে, এরকম মানুষের মনে একটু অহংকার তো থাকতেই পারে। সরিয়াডির প্রদোষ সরকারের মেয়েকে এক মুঠো ধুলো বলে মনে করাও এরকম মানুষের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কে জানে, এমনও তো হতে পারে যে, আত্রেয়ীর চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর কোনও মেয়ে কলকাতার কোনও মস্ত শিক্ষিত মস্ত বড়লোকের বাড়ির একটি ঘরে বসে নিখিল সেনের কাছে এখন চিঠি লিখছে। হতে পারে ; আত্রেয়ীকেই একটা উপদ্রব বলে মনে করেন, তাই ভয় পেয়ে বেশ সাবধান হয়ে গিয়েছেন নিখিল সেন।

যেমন দিবাকরের, তেমনই গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবুর মনের অস্বস্তিও ঠিক এইভাবে একটা বুঝ মেনে নিয়ে এই তিন মাসের মধ্যেই অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। নরেনের সন্দেহের সাইকেলও আর শ্রীলেখা কটেজের সামনের রাস্তা দিয়ে বার বার যাওয়া-আসা করে না।

বলাই বলে—ভদ্রলোক সত্যিই স্কলার মানুষ।

নরেন—আমারও তাই মনে হয়, বলাইদা। কতবার দেখলাম, বই পড়তে পড়তেই কটেজের সামনের রাস্তাতে ঘুরছেন ভদ্রলোক।

অস্বস্তিটা সত্যিই জব্দ হয়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। দাবা খেলার আসরে গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু মাঝে মাঝে ধ্যান ভঙ্গ করে কত কথা নিয়ে কত তর্কই না করেন ; কিন্তু নিখিল সেনের নামে কোনও কথাই মুখর হয়ে ওঠে না। আগেকার ওসব কথা নিতান্তই একটা বাজে সন্দেহের কথা!

অনেকদিন পরে একদিন, দিবাকর যেন অস্বস্তির শেষটুকুও একেবারে শেষ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—আচ্ছা শান্তি, আত্রেয়ী কি জানে না যে, নিখিলবাবু এখানে আছে ?

শান্তি—কী করে বলব ? আমি কোনওদিন জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু তোমার মনে হঠাৎ একথা জাগলো কেন ?

দিবাকর—এমনি ; হঠাৎ মনে হল, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

শান্তি—কী মন রে বাবা! ছিঃ।

দিবাকর ভ্রূকুটি করে তাকায়—তুমি কিসের জন্যে এত দাপট দেখিয়ে কথা বলছ ?

শান্তি—তুমিও বা মেয়েটাকে কী মনে করেছ ?

দিবাকর—কী মনে করেছি ?

শান্তি—তোমার ধারণা, আত্রেয়ীও যেন একটা কণিকা ভরদ্বাজ।—কথা নেই বার্তা নেই, ফস্ করে একটা বাইরের অচেনা-অজানা লোকের সঙ্গে রঙ মাখামাখি করে ফেলবে।

হেসে ফেলে দিবাকর।—আঁতে ঘা লেগেছে মনে হচ্ছে।

শান্তি—হ্যাঁ, আমি তো একটা কণিকা ভরদ্বাজ, ঠিকই।

দিবাকর—আমি কি তাই বললাম ?

শান্তি—বললেই তো। কিন্তু সত্যিই যদি কণিকা ভরদ্বাজ হতাম, তবে আর একথা বলতেই পারতে না। তখন কত নভেলি ভাষায় ডাক দিয়ে দিয়ে আর ভজনা করে কথা বলতে ; সবই জানি।

দিবাকর—কী জান ?

শান্তি—পুরুষমানুষ একরকমই ইয়ে হয়।

দিবাকর—ইয়ে মানে তো গবেট। তাই না ?

হেসে ফেলে শান্তি—তা জানি না। যাই হোক ; আমার কথা হল...।

চুপ করে কী যেন ভাবতে থাকে শান্তি। তার পরেই, যেন একেবারে জয়িনীর মত ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে হেসে ওঠে।—আচ্ছা, ঠিক আছে।

দিবাকর—কী ?

শান্তি—তোমরা যে কত ইয়ে, সেটা শিগগিরই জানতে পারবে।

দিবাকর—কে জানাবে ?

শান্তি—আমি, আমি, আবার কে ?

শান্তির কাছে এগিয়ে যেতে থাকে দিবাকর।—কে তুমি ?

—সাবধান ! হাসতে হাসতে সরে যায় শান্তি। আবার ব্যস্ত হয়ে ঘরের কাজ খুঁজতে থাকে। তিনটে ল্যাম্পের চিমনির সব কালি মুছে দিয়ে তখুনি আবার পিতলের ফুলদানিটাকে তেঁতুল-জলে চুবিয়ে মাজতে থাকে। ঘরের কোনও জিনিসে একটুও ময়লা সহ্য করতে পারে না শান্তি। সব পরিষ্কার হয়ে আর তকতক ঝকঝক করে হাসবে, তবে তো ? তা না হলে, সোনাও আবর্জনা।

মাজা-ঘষা হয়ে পিতলের ফুলদানিটা ঝকঝক করে হাসছে। আত্রেয়ীর মুখটাকেই হঠাৎ মনে পড়ে যায়। মনে পড়বেই বা না কেন ? আজকাল আত্রেয়ীর মুখে যে সব সময়ই সুন্দর শান্ত ও পরিষ্কার একটি ঝকঝকে হাসি ফুটে থাকে।

কিন্ডারগার্টেনের সামনের ছোট জমির ঘাসের উপর কানামাছি খেলছে বাচ্চারা। চিনু আর সন্তু কাচপোকা ধরবার জন্য বুনো তুলসীর একটা ঝোপের আশে-পাশে পা টিপে টিপে ঘুরছে। আত্রেয়ী একটা ছড়ার বই হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাওয়াবদলের তিনজন মহিলা, যাঁরা এই মাসেই এসেছেন, তাঁরা চোখ বড় করে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে সামনের সড়ক ধরে চলে যান। কোনও সন্দেহ নেই, শুধু আত্রেয়ীর সুন্দর মুখটাকে নয় ; মুখের ওই ঝকঝকে হাসিটাকেও বেশ একটু বিস্ময় বলে ওঁদের চোখে ঠেকেছে। শুনতে পায় আত্রেয়ী, চাপা গলায় কি-কথা বলে বলে আর হাসাহাসি করে ওঁরা চলে যাচ্ছেন।—ইনিই বোধ হয় সেই সুন্দরী, যার নামে এত গল্প...।

হঠাৎ চিনু আর সন্তু ছুটে এসে আত্রেয়ীর কাছে একটা অভিযোগের কথা চিৎকার করে শোনাতে থাকে।

—জান আত্রেয়ীদি ; চন্দরদাদু তোমার নামে কী বলেছে ?

আত্রেয়ী—কে ?

চিনু—ওই যে ? দেখছ না ? চিনতে পারছ না ? চন্দরদাদু চলে যাচ্ছেন।

দেখতে পায় আত্রেয়ী ; মোষের শিঙের লাঠিটি হাতে দুলিয়ে অমিয় ভবনের পাশের ছোট রাস্তার

কাঁকরের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছেন চন্দর জেঠামশাই।

সন্তু বলে—দাদু বলেছে ; তুমি সবচেয়ে বোকা।

আত্রেয়ী—কাকে বলেছে ? আমাকে ?

চিনু—হ্যাঁ।

আত্রেয়ী হাসে—কেন ? আমি কী দোষ করেছি ?

চিনু—তুমি একটা চিঠিকে আঁকড়ে ধরে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলে, একদিন দেখতে পেয়েছেন দাদু।

সন্তু—দাদু বলেছে, ধেৎ, কোনও মানে হয় না।

—খুব মানে হয়। সন্তুর গাল টিপে দেয় আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর মুখ আরও ঝকঝক করে হেসে ওঠে।

চিনু—একদিন দাদুকে একথা বলে দিও, আত্রেয়ীদি।

আত্রেয়ী—না চিনু, গুরুজনকে মুখের ওপর একথা বলতে নেই। আমি বলব না। তোমরাও বলবে না।

সন্তু—কী মানে হয় আত্রেয়ীদি ? বলো না ?

আবার সন্তুর গাল টিপে দেয় আত্রেয়ী—ভাল লাগে।

সন্তু আর চিনুও আবার কাচপোকা ধরতে ছুটে চলে যায়।

ভুলে যায়নি শান্তি, দিবাকরকে জব্দ করবার জন্যে যে কথাটি একদিন বেশ ভাল করে চেঁচিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সে কথাটা এখনও ভাল করে জানা হয়নি। শান্তিকে এখন শুধু ভাবতে হয়, কী করে, কী কথা বলে আর কেমন করে জানা যায় ? শ্রীলেখা কটেজের ঘরে আজকাল আলো জ্বলে, আত্রেয়ীর কাছে শুধু এই কথাটা বললেই তো অনেক কথা বলা হয়ে গেল। তার পর দেখা যাক, কী বলে আত্রেয়ী।

কিন্তু ছি, আর এভাবে একটা চোরা প্রশ্ন দিয়ে আত্রেয়ীকে যাচাই করবার কোনও দরকার হয় না। আর জানারই বা কী বাকি আছে ? দেখতেই তো পাওয়া গেল, এই তিন মাসের মধ্যে কোনওদিনও আত্রেয়ীকে শ্রীলেখা কটেজের নাম করে একটা সামান্য কথাও বলতে শোনা গেল না।

হ্যাঁ, একদিন শ্রীলেখা কটেজের সামনের রাস্তা দিয়ে আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলেই তো হয়। তা হলে সেই ভদ্রলোককে আত্রেয়ী নিজের চোখেই দেখতে পাবে। তারপর আত্রেয়ীকে আর কোনও কথা জিজ্ঞেস করে জানবার দরকার হবে না।

কল্পনাতে সবই ঠিক করে রাখে শান্তি। কিন্তু আত্রেয়ীর বাড়িতে এসে গল্প করতে গিয়ে সবই ভুলে যায়। এরকম একটা চেষ্টাকেও যেন বিশ্রী একটা নোংরা মনের চেষ্টা বলে মনে হয়। বেড়াতে যেতে হলে বরং ওই শ্রীলেখা কটেজের রাস্তায় না যাওয়াই ভাল। পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকতে শুধু বেচারা আত্রেয়ীকে নিয়ে এরকম একটা অগ্নিপরীক্ষা খেলা করবার কোনও মানে হয় না।

প্রয়াগবাবুর বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় রামলীলার গান হবে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছেন প্রয়াগবাবু। প্রয়াগবাবুর স্ত্রী নিজেও একবার এসে সব বাড়ির মেয়েদের সেধে গিয়েছেন ; বলেও গিয়েছেন, মেয়েদের বসবার জন্যে ভিন্ন করে খুব ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিকেল হয়েছে। আত্রেয়ীদের বাড়ির মাঝের ঘরে বসে কাকিমার সঙ্গে গল্প করে শান্তি। তাড়াতাড়ি সেজে নিক আত্রেয়ী ; এখনই বের হয়ে, ছোট ঝিলের চারদিকে একটু ঘুরে তারপর রামলীলার গান কিছুক্ষণ শুনে এলেই চলবে।

হঠাৎ কাকিমার মুখের একটা কথা শুনেই শান্তির মুখের হাসিটা যেন হঠাৎ আলোর ঝলকের মত উথলে ওঠে। যেন শান্তিরই জীবনের একটা বিশ্বাসের স্পর্ধা হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছে।

কাকিমা বলেন—হ্যাঁ আত্রেয়ী তো জানেই। রামুয়া কবেই বলে দিয়েছে, কটেজের সেই ছোটবাবু আবার এসেছে ; দিদি, বহুদিদি আর বড় বাবু আসেনি।

শান্তি যেন এখানেই বসে দিবাকরকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে আর মনে মনে বলতেই শুরু করে দিয়েছে—এবার শুনলে তো ? কে না কে, নিখিল সেন নামে কে একজন শ্রীলেখা কটেজে

এসে তিন মাস ধরে বসে আছেন, কিন্তু সেজন্যে আত্রেয়ীর যে কোনও মাথাব্যথা নেই, তার প্রমাণ পেলে তো ? লজ্জা হচ্ছে তো ?

গেটের তিনকাঠের বেড়াটাকে কে যেন বেশ জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। মট্মট্ করে শব্দটাও যেন কাউকে পথ ছেড়ে দিল।

প্রদোষবাবু এখন ঘরের ভিতরে বসে আছেন ; বাইরের বারান্দায় কেউ নেই। কিন্তু একটা আগন্তুক পায়ের শব্দ মচ্মচ্ করে বারান্দার উপর আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায়।

কাকিমা বলেন—দিবাকর বোধ হয়।

শান্তি বলে—সে তো পরেশনাথ গিয়েছে; সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরবে।

কাকিমা—তবে কে এল ?

যে এসেছে তার কোনও ডাক শোনা যায় না। সেই ডাকহীন আগমন তবে কী বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে পড়েছে ?

কিন্তু আত্রেয়ী এ কী করছে ? সাজ সারা হয়নি আত্রেয়ীর ; শাড়ির আঁচলটাকে এখনও হাতে ধরেই রেখেছে ; গলার পাউডারের মোটা ছোপটাকে এখনও মিহি করে মিলিয়ে দেয়নি। পাশের ঘর থেকে হঠাৎ বের হয়ে এসে, মাঝের ঘরের কাকিমা আর শান্তির মুখের দিকে না তাকিয়ে, একটি কথাও না বলে, যেন একটা স্রোতের টানের ফুলের মত ভেসে বের হয়ে গেল।

—কেমন আছেন ? বাইরের সেই আবির্ভাবের কাছে গিয়ে যেন উচ্ছল একটা অভ্যর্থনা হয়ে হাসতে থাকে আত্রেয়ী।

আগন্তুকের গলার গম্ভীর স্বরে কিন্তু বেশ স্পষ্ট একটা অভিযোগের গুঞ্জন শোনা যায়।—আগে জিজ্ঞেস করুন, কবে এসেছি। তারপর প্রশ্ন, কেমন আছি বা না আছি।

আত্রেয়ী—আমি তো জানিই, আপনি এখন এখানে আছেন।

—কতদিন হল আছি, সেটা জানেন কি ?

—তিন মাস বোধ হয়।

—তবে তো জানেনই দেখছি। কিন্তু তারপর ? একটুও তো খোঁজ নিলেন না। মঞ্জু না থাকলেই কি আমি একেবারে সাইফার ?

—মঞ্জু কেমন আছে ?

—খুব ভাল আছে আপনার মঞ্জু ; একটা অপারেশন হয়েছিল। তারপর থেকে স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাল হয়ে চলেছে।

—প্রীতি বউদি ?

—সব ভাল আছে। বড়দাও ভাল আছেন। আমিও ভাল আছি।

—আমিও ভালই আছি।

—ভাল কথা। আমি তবে মিথ্যেই একটা সন্দেহ করেছিলাম।

—কিসের সন্দেহ ?

—মনে হয়েছিল, হয় আপনি জানেন না যে আমি এসেছি ; নয় আপনার অসুখ-টসুখ করেছে।

—দুটোই মিথ্যে সন্দেহ।

—এখন আরও একটা সন্দেহ করছি ; এটা নিশ্চয়ই মিথ্যে সন্দেহ হতে পারে না।

—কী ?

—বেড়াতে বের হচ্ছেন ?

—হ্যাঁ।

—তবে আর একা-একা কেন বেড়াবেন ? আমার সঙ্গেই চলুন।

—কিন্তু...।

—কিন্তু করবার কী আছে ? আমি এই তিন মাসের মধ্যে একদিনও বেড়াতে বের হইনি। আজ এই প্রথম, একটু বেড়াবার ইচ্ছে নিয়েই বের হয়েছি। কিন্তু আপনি থাকতে একা-একা বেড়াতে যাব কেন ? তাই কটেজ থেকে বের হয়ে সোজা আপনার এখানেই চলে এলাম।

—চা খাবেন ?

—চা-বাগানের লোককে চা না খাওয়ালেও চলে।

—আচ্ছা ; একটু বসুন তা হলে।

—না, এখন চা খাব না কিন্তু।

—বুঝেছি। আমি শুধু কাকিমাকে একটা কথা বলে আসছি।

কাকিমা আর শান্তি ; দুজনেই একেবারে নিথর হয়ে বসে আছেন। আত্রেয়ী ঘরে ঢুকেই শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন।—মঞ্জুর মেজদা, নিখিলবাবু এসেছেন। কিন্তু কী ঝঞ্ঝাটে ফেললেন, দেখছ তো বউদি ?

কাকিমা—কিসের ঝঞ্ঝাট ?

আত্রেয়ী—বেড়াতে যেতে বলছেন। এদিকে শান্তি বউদির সঙ্গে...।

কাকিমা—শান্তির সঙ্গেই বেড়াতে যাবি। ও ভদ্রলোকের কথায় কী এসে যায় ?

আত্রেয়ী—তুমি কী বলছ, বউদি ?

শান্তির শুব্ধ চোখ দুটো শুধু একবার কেঁপে ওঠে।—আমি কিছুই বলছি না। তোমার ইচ্ছে।

আত্রেয়ী—তা হলে একবার ঘুরেই আসি, বউদি।

কাকিমা চমকে ওঠেন—সত্যিই যাবি ?

আত্রেয়ী হাসে—হ্যাঁ ; খুব শিগগির ফিরে আসব। খুব দূরে কোথাও যাব না।

খোলা গেটের তিনকাঠের বেড়াটা আবার যখন মট্‌মট্‌ শব্দ করে বেজে উঠে গেট বন্ধ করে দেয়, তখন প্রদোষ সরকারের বাড়ির খাপরাব চালাটাও যেন মট্‌মট্‌ করে বেজে ওঠে। একটা বিড়াল চালার উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়েছে এই মাত্র ; কিন্তু তাতেই কী ভয়ানক মট্‌মট্‌ শব্দ। যেন সব অটলতার হাড়গোড় ভেঙে গেল।

খাট থেকে নামতে গিয়ে প্রদোষ সবকারেব পা টলে যায়। একটা ক্রাচ হাতের মুঠো থেকে ফসকে গিয়ে মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। ভয়ানক বিশ্রী আর্তনাদের মত একটা শব্দও কবেছে এই ক্রাচটা, যেন কেউ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

শান্তি বলে—আমি যাই, কাকিমা।

॥ ১৭ ॥

কাছারিপাড়ার শেষ সেগুন গাছের কাছে একটা সেকেলে পুরনো মন্দিরের ধড় টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ভাঙা-ভাঙা ইঁট-পাথর ছড়িয়ে রেখেছে। তারই পাশে একজন একেলে সাধুর সমাধি, চারদিকে শ্বেত করবীর ঘেরান। ঘেরানের এক জায়গায় ছোট একটা ফাঁকা ; সেই ফাঁক দিয়ে গরু ঢুকে সমাধিব চারপাশের ঘাসের গোছা পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সামনেই রেল-লাইন। লাইনটার দু'পাশের মাটির উপর দিয়ে পায়ে-চলা পথের একটা দাগও লাইনটার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর চলে গিয়েছে। লাইনের পাশের মাটির এই হাঁটুরে দাগ ধরে ধরে টানেল পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসা যায়। এমন বেশি কিছু সময় লাগবে না ; বিকেলের শেষ আলো ফুরিয়েও যাবে না।

শ্বেত করবীর ঘেরান দেওয়া এই সমাধিটা যেন খোলামেলা নিরিবিলির মধ্যেই বেশ নিবিড় একটি ছোট্ট নিরিবিলি। সমাধির কাছে বসবার জন্য শান-বাঁধানো একটি চাতালও আছে। সে চাতালের উপরে বসলে শুধু আকাশের মুখ ছাড়া বাইরের আর কারও মুখ দেখা যায় না। বিকেলের গয়া-গোমো প্যাসেঞ্জার যখন ছুটে চলে যাবে, তখন মনে হবে, অন্য কোনও একটা পৃথিবীর কোলাহল ছুটে চলে গেল।

চলতে চলতে শ্বেত করবীর এই ঘেরানের কাছেই এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে নিখিল সেন, সেই সঙ্গে আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—আপনি বোধ হয় মনে করেছিলেন যে, আমিও এই তিন মাস ধরে একবারে

সমাধিস্থ হয়ে লুকিয়ে আছি।

আত্রেয়ী—তা মনে করব কেন ? আমি তো জানিই, আপনি বই পড়েন ; বই পড়তে খুব ভালবাসেন।

নিখিল—ঠিক কথা ; খুব বই পড়ে নিয়েছি। কিন্তু মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত কাণ্ডও করেছি।

আত্রেয়ী—কী ?

নিখিল—আপনার সঙ্গে কথা বলে ফেলেছি।

আত্রেয়ী—রামুয়া ঘুমের মধ্যে কথা বলে।

নিখিল—না, আপনাদের রামুয়ার মত ঘুমের মধ্যে নয় ; জাগার মধ্যেই আমি কথা বলে ফেলেছি।

আত্রেয়ী হাসে—আমিও একদিন হঠাৎ শান্তি বউদিকে একটা কথা বলে ফেলেই বুঝতে পারলাম, ঘরে কেউ নেই।

নিখিল—একদিন কটেজের গেটের শব্দ হতেই মনে হল, আপনি এসেছেন। অমনি হঠাৎ বলে ফেললাম, আসুন।

আত্রেয়ী—আমি কিন্তু শান্তি বউদিকে ঠিক উল্টো কথাটি বলেছিলাম, এখন যাও বউদি।

নিখিল—এই তিনটে মাস বই নিয়েই কাটিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে বেশ বিশ্রী একটা অস্বস্তিতেও ভুগতে হয়েছে। অনেকবার শুধু রাতজাগাই সার হয়েছে, বইয়ের এক পাতাও পড়ে উঠতে পারিনি।

আত্রেয়ী—বাবাকেও দেখেছি ; এক-একদিন রাত্রিবেলা ফটোর অ্যালবাম হাতে নিয়ে দেখতে বসেন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। মা যখন ধমক-ধামক করেন, তারপর বাবা অ্যালবাম রেখে দিয়ে শুয়ে পড়েন।

নিখিল—কিসের ফোটোর অ্যালবাম ?

আত্রেয়ী—বাবার জিমনাস্টিক আর কসরতের যত পুরনো ফটোর অ্যালবাম। মাটিতে শুয়ে দুপা দিয়ে মস্ত একটা পিপেকে তুলে ধরেছেন বাবা ; পিপের উপর আবার চার জন মানুষও দাঁড়িয়ে আছে।

নিখিল—একটা সত্যি কথা বলছি ; কিছু মনে করবেন না। আপনার ওপর একদিন সত্যিই খুব রাগ হয়েছিল।

আত্রেয়ী হাসে।—শান্তি বউদিকেও দেখেছি ; আমার উপর হঠাৎ এক-একদিন, একেবারে মিছিমিছি রাগ করে বসে থাকেন।

নিখিল—আমি কিন্তু মিছিমিছি রাগ করিনি। আপনি কি মনে করেন যে, আপনাকে বিরক্ত করবার কোনও ইচ্ছে আমার আছে ?

আত্রেয়ী—ছিঃ এ কথা বলছেন কেন ? আমি ওসব কিছুই ভাবি না।

নিখিল—তবে আসেননি কেন ?

আত্রেয়ী—আমি বুঝতে পারিনি।

নিখিল—কী বোঝেননি ?

আত্রেয়ী—বুঝতে পারিনি যে, আমার আসবার কোনও দরকার আছে।

নিখিল—দরকার আছে। কিন্তু আমার দরকার নয় ; আপনারই দরকার।

আত্রেয়ী—আরও গল্পের বই এনেছেন ?

নিখিল—না।

নিখিলের কথাটা যেন অদ্ভুত একটা গম্ভীরতার ধ্বনি হয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েই আবার সামলে নিয়েছে। হাত বাড়িয়ে শ্বেতকরবীর একটা পাতা পট্ করে ছিঁড়ে নিয়ে নিখিল সেন বোধ হয় একটা ছটফটে অস্বস্তিকে মুক্ত করে দেয়।—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি। গল্পের বই না পড়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে কী আপনার খারাপ লাগে।

আত্রেয়ী—না।

গঙ্গা ফড়িংটা বুনো লতার একটা কচি পাতাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। দেখতে পেয়ে আত্রেয়ীর চোখ দুটো শিউরে কাঁপতে শুরু করেছে। তাই বোধ হয় আত্রেয়ীর গলার স্বরটাও বেশ শিউরে উঠেছে।

শ্বেত-করবীর ঘেরানের যে ফাঁক দিয়ে ভিতরে গরু ঢুকেছে, সেই ফাঁক দিয়ে নিখিলও হাসতে হাসতে ভিতরে ঢুকে পড়ে।—বাঃ, জায়গাটা তো বেশ চমৎকার, বসে গল্প করবার মত জায়গাটা বটে। ঘেরানের বাইরে যেখানে দাঁড়িয়েছিল আত্রেয়ী, চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে গঙ্গা-ফড়িংয়ের ফূর্তির কীর্তিটাকেই দেখতে থাকে।

নিখিল ডাকে—কই ? আপনি কোথায় ? ভেতরে আসবেন না ?

নিবিড় নিরিবিলির অন্তঃপুর থেকে নিখিলের গলার স্বরের আহ্বানও একটা নিবিড়তার ডাক হয়ে বেজে উঠেছে। এখানে বসে একঘণ্টার মধ্যেই দেশ-বিদেশের কত সমাধির আর কত ভাঙা-মন্দিরের মজার মজার গল্প শুনিয়ে দিতে পারে নিখিল ; সে গল্প শুনে আত্রেয়ীর চোখের বিস্ময়ও কত নিবিড় হয়ে উঠতে পারে।

আত্রেয়ী হেসে ফেলে—আপনি চলে আসুন ; ওখানে সাপটাপ থাকতে পারে।

ফিরে আসে নিখিল। কিন্তু নিখিলের পায়ে যেন কাঁটা বিঁধেছে। আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিখিল সেনের বিরক্ত চোখ দুটো হঠাৎ কঠিন ঠাট্টার বড়-বড় চোখ হয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে।—আমি ভেতরে ঢোকবার পরেই জায়গাটা সাপে ভরে গেল ; কেমন ?

আত্রেয়ী—কোন দিকে যাবেন ?

নিখিল হাসে—চলুন, যেদিকে আপনার দু'চোখ যায়।

আত্রেয়ী—লাইন ধরে একটু এগিয়ে যেয়ে আর তাড়াতাড়ি ফিরে এলেই তো হয়।

নিখিল—চলুন।

আত্রেয়ী—ছত্রের মেলার সময় লাইনের এখানে গরুর ট্রেন এসে থেমে থাকে।

নিখিল—গরুর ট্রেন মানে !

আত্রেয়ী—ট্রেনে শুধু গরু থাকে ; ছত্রের মেলাতে বিক্রি হবার জন্যে কত গরু নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু প্রয়াগবাবুর একটা গরু ট্রেনে উঠেই একটা কাণ্ড করেছিল।

নিখিল—কী ?

আত্রেয়ী—ট্রেনের ওয়াগনে উঠতে গিয়ে গরুটা মুখ ফিরিয়ে যেই প্রয়াগবাবুর ছোট ছেলেটাকে দেখতে পেল, অমনি একটা লাফ দিয়ে ফিরে চলে এল।

নিখিল—গরুর কাণ্ড।

আত্রেয়ী—কিন্তু কেমন অদ্ভুত কাণ্ড বলুন তো !

নিখিল—হ্যাঁ, দেখতে একটু অদ্ভুত লাগে ঠিকই।

কিন্তু লাইনের কাছে এখন যেতে হলে প্রথমেই বেশ উঁচু একটা কণ্টকাক্ত বাধাকে টপকাতে হবে। তিন ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া রেলের জমির নিশানা হয়ে টানেল পর্যন্ত গিয়েছে। নিখিলের কাছে তিন ফুট উঁচু ওই কাঁটাতারের বেড়া কোনও বাধাই নয়। এক লাফে পার হয়ে গিয়ে হাসতে থাকে নিখিল। আত্রেয়ী চমকে উঠে হাসতে থাকে—ওরে বাবা !

কাঁটাতারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আর আত্রেয়ীর দিকে দু'হাত টান করে দিয়ে হাসতে থাকে নিখিল—কোনও ভাবনা নেই, চলে আসুন।

কিন্তু আত্রেয়ী যেন একটা স্তব্ধ শক্ত ও বধির পাথরের মূর্তি। শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, নিখিলের কথার কোনও শব্দ কানে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না।

নিখিল—কোনও সন্দেহ করবেন না ; আমার হাতে যথেষ্ট জোর আছে ; আপনাকে অনায়াসে তুলে নিতে পারব।

আত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করে—কী যে বলছেন, আমি কিছু বুঝছি না।

নিখিল—কেউ নেই এখানে, কেউ দেখছে না, আপনার লজ্জা করবার কিছু নেই।

নিখিল সেনের চোখ দুটোকে বোধ হয় ভাল করে তাকিয়ে দেখছে না আত্রেয়ী। তা না হলে, বুঝতে পারত আত্রেয়ী, কী অদ্ভুত তীব্র হয়ে জ্বলছে নিখিল সেনের আহত অহংকারের চোখ।

নিখিল সেনের হাত দুটোর এই আগ্রহ যে একটা খেলনা-পুতুলকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁটা তারের বাধা পার করে দেবার জন্য একটা কৌতুকের আগ্রহ মাত্র। সরিয়াডির মেয়ের গা ছুঁয়ে দেবার জন্য নিখিল সেনের মত মানুষের মনে যে কোনও ইচ্ছেই থাকতে পারে না ; সেটা বোধ হয় এখনও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—আপনি কিন্তু খুব ভুল করছেন।

এক পা পিছু সরে গিয়ে, হাতের রুমালটাকে ঠোঁটের উপর চেপে রেখে, আর দুলে দুলে হাসতে থাকে আত্রেয়ী।—কী যে বলছেন আপনি, কোনও মানে হয় না। শেষে কি পড়ে মরে একটা কাণ্ড বাধাব ?

নিখিল—হাসবেন না। বিশ্বাস করুন, পড়ে যাবেন না। পড়ে যেতে দেব না। আমার হাত হাওয়া-বদলের যক্ষ্মারোগীর লিকপিকে হাত নয় যে মট্‌ করে ভেঙে যাবে।

আত্রেয়ীর হাসিটা হঠাৎ যেন একটা পথ দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনি ওখানেই থাকুন। আমি আসছি।

একটু দূরে, ডিঙিয়ে যাবার সুবিধের জন্য কে যেন কাঁটাতারের বেড়াটাকে এক জায়গায় পিটিয়ে বেশ নিচু করে দিয়েছে। লাফ-ঝাঁপ না করেও অনায়াসে পার হওয়া যায়। এগিয়ে যায় আত্রেয়ী, বেড়া পার হয়ে আবার নিখিলের কাছে এসে দাঁড়ায়।

নিখিলের চোখে-মুখে যেন একটা চাপা ঠাট্টার হাসি জ্বলছে।—আমি ভাবলাম, পড়ে-মরে যাবার ভয়ে সোজা বোধ হয় বাড়ির দিকেই চললেন। এখন দেখছি, তা নয়। এখানেই আবার এলেন।

আত্রেয়ী—সন্ধ্যা হবার আগেই কিন্তু বাড়ি ফিরতে হবে।

—নিশ্চয়। কিন্তু এক-একবার মনে হচ্ছে, এখনি ফিরে গেলে মন্দ কী ?

—কেন ?

—ভাল লাগছে না।

—এদিকে না এসে ছোট ঝিলের কাছে বেড়াতে গেলে বোধ হয় ভাল লাগত।

—আপনি যদি আমার একটি কথা বিশ্বাস না করেন, তবে আমার কিছুই ভাল লাগবে না।

—কী কথা ?

—আমাকে ভয় করবার কিছু নেই।

—আপনাকে একটুও ভয় করি না।

—আমি যে এখানে এসে আপনাকে দেখতে চাই, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে চাই, সে শুধু আপনারই জন্য।

—একথা তো আগেও বলেছেন।

—বিশ্বাস করেছেন ?

—নিশ্চয়।

—আমার মত মানুষ এখানে এসে কারও সঙ্গে একটা চিরকালের কাণ্ড বাধাতে পারে না, এটা বিশ্বাস করেন তো ?

—কেন করব না ? প্রীতি-বৌদির কাছ থেকে তো সবই জানতে পেরেছি।

—দু'দিনের জন্যে এসে ছোটলোকও হয়ে যেতে পারি না ; এটাও তো বিশ্বাস করবেন ?

—ছিঃ নিখিলবাবু ; আপনি মিছিমিছি কেন এত শক্ত-শক্ত কথা বলছেন ? এসব কথা আমার তো কোনওদিনই মনে হয়নি।

নিখিল হেসে ফেলে—সবই তো পরিষ্কার বুঝে ফেলেছেন। এবার শুধু বিশ্বাস করুন, আমি দুদিনের ভদ্রতা মাত্র। মাঝে মাঝে এখানে আসব, থাকব, আর বেড়িয়ে গল্প করে চলে যাব। আপনি কি তাতে বিরক্ত হবেন ?

আত্রেয়ী—একটুও না।

—ব্যাস, তা হলেই হল। সব চেয়ে খুশি হব সেদিন, যেদিন দেখব হেমন্তবাবুর সঙ্গে আপনি বেড়াতে বের হয়েছেন। সেদিন আমিও আপনাদের সরিয়াডিকে শেষ সেলাম জানিয়ে সরে

পড়বো।

—আর আসবেন না ?

—সেটা ভবিষ্যৎ জানে ; আমি জানি না।

গুমরে উঠেছে দূরের টানেল। ছুটে বের হয়ে এল হাওড়া-দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার। যেন বিকেলের আলোতে সাঁতার দিয়ে ছুটে আসছে ট্রেনটা। কিন্তু সিগন্যাল পায়নি বলেই মন্থর হতে হতে একেবারে থেমেই গেল।

ট্রেনের কামরার জানালা দিয়ে অনেক চোখ উঁকি দিয়ে নিখিল আর আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে থাকে। নিতান্ত ক্ষণকালের একটি ছবির দিকে কত মুগ্ধ হয়ে ওরা তাকিয়ে আছে। শুধু সিগন্যালের অপেক্ষায় থমকে আছে ট্রেনটা ; যে কোনও মুহূর্তে চলে যাবার সঙ্কেত পেলেই চলে যাবে।

নিখিল আর আত্রেয়ীর চোখে এই ট্রেনটাও ক্ষণকালের মায়ার ছবি হয়ে একটা মুগ্ধতা ঘনিয়ে তুলেছে। হাই তুলছে, হাঁপ ছাড়ছে, কাশছে, হো হো করে হেসে উঠছে, আর বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে কত কথাই না বলে নিচ্ছে যাত্রী প্রাণের একটা মিছিল, যেটা আর দু'তিন মিনিট পরেই এখানে আর থাকবে না, কোনওকালেও না, ইহজীবনেও না। তবু তো দেখতে ভালই লাগে, মায়া করে তাকাতেও ইচ্ছে করে। ট্রেনের দিকে তাকিয়ে নিখিল আর আত্রেয়ী খুশি হয়েই হাসে আর হাঁটতে থাকে।

নিখিলের গলার স্বরে এবার যেন বেশ শান্ত একটা করুণতা ফুটে ওঠে।—আমার একটা অসুবিধে কী জানেন ? আমাকে অনেকেই ঠিক বুঝতে পারে না। এমন কি, বউদি আর মঞ্জু, যারা আমাকে বেশ ভাল করেই চেনে, তারাও মাঝে মাঝে আমাকে যেন একটুও বুঝতে পারে না।

আত্রেয়ী—না বুঝবার কী আছে ?

নিখিল—আমি যে এখানে এসে আপনার মত দুদিনের চেনা এক মেয়েকে ডাকাডাকি করি, এটা যেন আমার একটা খামখেয়ালি বাড়াবাড়ি।

—তাতেই বা কী এসে যায় ?

—হ্যাঁ, মিথ্যে কথা বলব না ; আপনাকে ডাকবার আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াবার একটা ইচ্ছে তো থাকেই ; কিন্তু সে ইচ্ছেটা নিশ্চয় একটা দাবি নয়। আপনার যেদিন খুশি সেদিনই বলে দেবেন, না দরকার নেই। আমিও সেদিন সেই মুহূর্তে খুশি হয়ে, হয় চলেই যাব, নয় সরিয়াডির ঝিলে মাছ ধরতে বসে যাব। জীবনেও আর কখনও আপনার কাছে গিয়ে বলব না যে, বেড়াতে চলুন।

আত্রেয়ীর চোখে বেশ রুক্ষ একটা ভ্রূকুটির ছায়া কাঁপতে থাকে।—আপনি কেন যে এত কথা আর এসব কথা তুলছেন, বুঝি না।

নিখিল হাসে—যাক, এতদিনে তবু রাগ করে একটা কথা বললেন।

আত্রেয়ীও হেসে ফেলে—কিন্তু আর কোনওদিন এসব কথা তুলবেন না।

—হেমন্তবাবুর চিঠি পেয়েছেন ?

—হ্যাঁ।

—কেমন আছেন ?

—ভাল।

—আর তো...বোধ হয় আর এক বছর...।

—না, তারও কম।

খুব জোরে হুইসিল বাজিয়েছে ট্রেন। ধক্ ধক্ করে ধোঁয়া উগরে দিয়ে চলতে শুরু করেছে ট্রেন। আত্রেয়ী হাসে।—মঞ্জু তো একটিও চিঠি দিল না।

—মঞ্জুই জানে, এমন অভদ্রতা করে মঞ্জুর কী লাভ হল ? কিন্তু আপনারই বা তাতে কোনও ক্ষতিটা ?

আত্রেয়ী এইবার মুখ ঘুরিয়ে হাসে—কিছুই জানতে পারছি না, এই একটা ক্ষতি, আর কিছু নয়।

নিখিল—মঞ্জুর বিয়ে হবে শিগগিরই।

—আরও একটা সুখবর পাওয়া দরকার ছিল।

—সে-খবরও হঠাৎ একদিন পেয়ে যেতে পারেন।

—মঞ্জু তো চিঠিই লেখে না ; কী করে পাব ?

—বেশ তো ; আমিই জানিয়ে দেব।

—জানাবার কোনও দরকার নেই ; হাওয়াবদলের জন্য দুজনেই সোজা এখানে চলে আসবেন, তা হলেই হবে।

—অসম্ভব নয়। কিন্তু আপনি কি তখনও এখানে থাকবেন ?

—তখন না থাকি, একদিন ফিরে এসে সবই শুনতে পাব। ভাগ্যে থাকে তো, দেখতেও পাব।

বুঝতে পারেনি আত্রেয়ী, নিখিলের চোখ দুটো তখন অপলক হয়ে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন দেখছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আত্রেয়ী ; মাথা ঝুঁকিয়ে আর দু-হাত দিয়ে খুঁটে খুঁটে হাঁটুর কাছের শাড়িটার গা থেকে কয়েকটা চোরকাঁটা তুলে ফেলে দেয়।

নিখিল বলে—আপনি কিন্তু অনেক রোগা হয়ে গিয়েছেন।

আত্রেয়ী—কিন্তু খাচ্ছি তো খুব।

—বিশ্বাস করি না।

—আপনিও দেখছি শান্তি বউদির মত আমার সব কথা শুধু অবিশ্বাস করেন। শান্তি বউদি সব সময় আমাব মুখ শুকনো দেখছেন। সব সময় ওই এক কথা, খেয়েছ তো আত্রেয়ী ? কী খেলে ? কখন খেলে ?

—বাঃ, শুনে মনে হচ্ছে, আপনার শান্তি বউদিও বেশ মায়ার মানুষ।

—সে আর বলতে ! কিন্তু...... ।

—কী ?

—ভাবতে একটু কষ্ট হচ্ছে, শান্তি বউদি আজ হয়ত আমার উপর রাগ করেছেন।

—কেন ?

—আজ শান্তি বউদির সঙ্গে বেড়াতে বের হবার কথা ছিল। কিন্তু আপনি এসে ডাকলেন বলে আপনারই সঙ্গে চলে এলাম।

—আপনার শান্তি বউদির কিন্তু রাগ করবার কোনও মানে হয় না। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবার সুযোগ উনি তো চিরকালই পাবেন, কিন্তু আমি তো পাব না। আমি তো ট্রেনের মানুষ ; হঠাৎ সিগন্যাল পড়ে যাবে, আর হুইসিল বেজে উঠবে। তারপর আর... ।

আত্রেয়ী—কী ?

নিখিল হাসে—তারপর কে আর কার কোনও মায়ার কড়ি ধারে।

আত্রেয়ী—আবার আপনি বেশি কথা বলতে শুরু করেছেন।

নিখিল—থাক তবে ; কোনও কথাই বলব না।

আত্রেয়ী—তা হবে না। কথা বলতেই হবে। আমাকে ডেকে নিয়ে এলেন কেন ?

নিখিল—কী বলব, বলুন।

আত্রেয়ী—রান্না-বান্না করছে কে ?

নিখিল—ধীরু খানসামা।

আত্রেয়ী—আজ দুপুরে কী খেলেন ?

নিখিল—অনেক কিছু। আতপ চালের ভাত, চারটে আলু সেদ্ধ আর এক চামচ ঘি।

— এ তো সন্ন্যেসীর খাওয়া।

—যখন বেশি পড়াশোনা করি, তখন এর চেয়ে বেশি কিছু খাই না।

—এত পড়াশোনারই বা কী দরকার ?

—কোনও দরকার নেই। ওটা একটা অভ্যেস।

—ছাই অভ্যেস। ছেড়ে দিলেই ভাল।

—হতে পারে ; কিন্তু এ ছাই অভ্যেস ছাড়তে পারব বলে মনে হয় না।

—আমার কথা শুনে ছাড়বেন না জানি ; কিন্তু একদিন একজনের কথা শুনে ছেড়ে দিতেই

হবে।

সত্যিই যে আবার রাগ করে কথা বলছে আত্রেয়ী। নিখিল সেনের জীবনের কঠিন ফিলসফি আর কঠোর সায়েন্সের চোখ দুটো যেন হঠাৎ-বিস্ময়ে বোকা হয়ে গিয়ে সরিয়াডির এক সামান্য মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আত্রেয়ী বলে—এবার ফিরতে হয়।

শালবনের মাথার উপর ঠাণ্ডা সূর্যের চেহারাটা আবিরমাখা হয়ে ঢলে পড়েছে। নিখিল বলে—হ্যাঁ, এখন ফিরে যাওয়াই ভাল। কিন্তু...।

আত্রেয়ী—কী ?

—আপনি কাল একবার আসবেন ?

—কোথায় ?

—কটেজে।

—না। আপনি আসবেন।

—কোথায় ?

—আমাদের রাড়িতে।

॥ ১৮ ॥

সরিয়াডির ঘন সন্ধ্যাটা হঠাৎ লালচে হয়ে জ্বলে উঠেছে।

সন্ধ্যার ট্রেনে পরেশনাথ থেকে সরিয়াডি ফিরে এসেই দেখতে পেয়েছে দিবাকর, কালীবাড়ি রোডের নিতাইবাবুর বাড়ির ঘরের মাচানে আগুন লেগেছে। উড়ছে আগুনের জটা ; গোঁ গোঁ করে শব্দ করে জ্বলছে আগুনের আহ্লাদ। গনগনে গরম ছাই ছিটকে পড়ছে ; গাছের বক উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আগুন নেভাতে এসে ভিড়টা শুধু ভীরু হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। নিতাইবাবুর বাড়ির কুয়োটা একেবারে শুকনো খটখটে ; এক ফোঁটা জল নেই। কিছুই করা গেল না। মাচানের খড়ের পাহাড় দেখতে দেখতে একটা ছাইগাদা হয়ে গেল।

সেই ভিড়ের ভীরু নীরবতার মধ্যে শুধু চন্দ্রবাবুর গলার স্বর একবার হই হই করে চলে গেল—কী ব্যাপার ? কিসের আগুন ? হঠাৎ একটা আগুন কোত্থেকে এল হে দিবাকর ?

বেচারী শান্তি, সরিয়াডির শান্তি বউদি ; দিবাকরের হাতের কাছে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে যেয়েই ফুঁপিয়ে ওঠে।

শান্তির একটা সাধের গর্ব হেরে গেল, একটা মায়ার চেষ্টা মিথ্যে হয়ে গেল, শুধু সেই জন্যে নয় বোধ হয় ; শান্তির জীবনের একটা আদুরে বিশ্বাস, যেটা মায়ের কোলের ছেলের মত একটা আদুরে মানিক, দেখতে ভাল-মন্দ সত্যি-মিথ্যে যা-ই হোক না কেন, সেটাই যে মরে যেতে চলেছে। ভয় না পেয়ে আর ফুঁপিয়ে না কেঁদে পারবে কেন শান্তির মত মেয়ে ?

দিবাকর—শুনেছি, এইমাত্র নরেনের কাছ থেকে শুনতে পেলাম।

শান্তি—তবে আর কী ? আমার কিছু আর বলবার নেই। তুমি যা ইচ্ছে হয় বলতে পার।

দিবাকরের গলার স্বর উদাস হয়ে যায়।

—কী আর বলব ? আমারও কিছু বলবার নেই।

পর পর চারবার হল, ঠিক মাঝরাতে হাজরাবাবুর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। বাকি রাতটুকু আর ঘুমোতেই পারেননি। বার বার সিগারেট খেয়েছেন, তবু যেন গা ছমছম করেছে। সকাল হতেই সামন্তবাবুর কাছে গিয়ে বলেছেন—কিছুই যে বুঝতে পারছি না, সামন্তদা। রোজ রাত্তিরে একটা কাণ্ড হচ্ছে।

—কী হল ?

—বাইরে থেকে কপাটের গা কেউ যেন আঁচড়াচ্ছে বলে মনে হল। টর্চ জ্বেলে আর লাঠি নিয়ে বাইরে গেলাম ; কিন্তু কই ? কেউ কোথাও নেই। আবার যেই ফিরে এসে একটু শুয়েছি আর চোখ

বন্ধ করেছি, অমনি আবার। আবার উঠলাম। কিন্তু কিছুই না, কেউ নেই।

—ছায়ার মত কিছু পালিয়ে যেতে দেখতে পেয়েছেন কি ?

—ঠিক দেখতে পাইনি। তবে মনে হল।

—তবে তো চিন্তার কথা।

—এর মধ্যে আর এক চিন্তে বাধিয়ে রেখেছে প্রদোষবাবুর মেয়ে। আমার তো ভাবতে সত্যিই ভয় করছে সামন্তদা।

—হ্যাঁ, আপনি তো তাও টর্চ জ্বেলে আর লাঠি নিয়ে তেড়েমেড়ে বাইরে গিয়ে ছায়াটাকে তাড়ালেন ; খোঁড়া মানুষ প্রদোষবাবুর যে সে সাধ্যিটুকুও নেই।

শ্রীপদবাবুর বাড়িতে চুরি হয়ে গিয়েছে। এটাও একটা ভয়ানক রহস্যের চুরি। থানা অফিসার বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলেছেন—ঘরের ভিতর থেকে দরজার খিল কেউ খুলে দিয়েছে, তা না হলে কোনও চোরের পক্ষে এমন চুরি সম্ভব নয়।

শ্রীপদবাবু সে রাতে একাই বাড়িতে ছিলেন। আর কেউ ছিল না। তবে কে খুলে দিল খিল ? থানা অফিসারের কথা শুনে শ্রীপদবাবু খুবই ভয় পেয়েছে—তবে কি আমিই হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে খিল খুলে দিয়েছিলাম ?

সন্ধ্যাবেলা ধানোয়ার রোডের কালভার্টের কাছে ঘাসে ভরা ঢালুটার উপর গা এলিয়ে দিয়ে আর শুয়ে-বসে গল্প করতে সাহস করে না নরেন আর বিমল, পরেশ আর মাধব। চিতি সাপটা নিশ্চয় এখানেই ঘাসের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে ঘুরছে ; খোলসটা যদিও একটু দূরে ঝোপের গায়ে ঝুলছে।

কালভার্টের উপরে দাঁড়িয়ে গল্প করতে গিয়ে ওরা যেন স্বস্তি না পেয়ে উসখুস করে। ভয় হয়, হয়ত এখনই এই দিকে বেড়াতে চলে আসবে একটা অপমানের ছবি। তখন দূরে সরে যেতেই হবে।

নরেন বলে—আত্রেয়ীদি কেন যে এরকম একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

পরেন—রজনীধামে নতুন যারা এসেছে, তারা কী বলাবলি করছিল, শুনবে ?

নরেন—কী ?

পরেশ—ইয়া মোটা এক টেকো ভদ্রলোক, হাফ-প্যান্ট পরে আর চুরুট টানে, সেই ভদ্রলোক বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আর হেসে হেসে ওইরকম মোটা আর-এক ভদ্রলোককে বলছেন : জানেন তো মশাই, সরিয়াডিতে শুধু লজ কটেজ আর ভবন নয়, বেড়াবার সুন্দরী সঙ্গিনীও ভাড়া পাওয়া যায়। ট্রাই করবেন নাকি ?

নরেন—চিনিয়ে দিস তো লোক দুটোকে।

মাধব—কিন্তু চিনিয়ে দিলেই বা কী হবে ?

আলোচনার সব শক্তি যেন এইবার স্তব্ধ হয়ে যায়। কেউ আর কোনও কথা বলে না ; বলতে চায়ও না। বলবার মত কিছু খুঁজেও পায় না। যাদের হাত ফণী মিত্রের গাড়ির হেডলাইট চূর্ণ করে দিয়েছে ; যাদের শক্ত ছায়া দেখে জগৎ ব্যানার্জি পালিয়ে গিয়েছে, তারা আজ যেন নিজেরাই ভয় পেয়ে ছায়া হয়ে গিয়েছে।

চিনুর পিসিমার চোখ দুটো ছলছল করে। কুলোর বড়ি তুলতে গিয়ে হাতটা বড়ির উপরেই অনড় হয়ে পড়ে থাকে। নিজের মনেই কথা বলেন পিসিমা ?—ছি ছি, এ কী হল ? এমন কাণ্ড হয়ই বা কেন ? মেয়েটার বুদ্ধিসুদ্ধিতে কী এটুকুও বলে না যে, চিরকালের কথাটা ভুলে গিয়ে দু'দিনের তামাসার নাচ নাচতে নেই ? ওরে ও চিনু একবার দেখে আয় তো মা, তোদের আত্রেয়ীদি এখন কী করছে।

চিনু বলে—দেখেছি, আত্রেয়ীদি এখন গল্প করছে।

—কার সঙ্গে ?

—চিনি না। একজন চশমাপরা চেঞ্জার।

শুধু চিনু কেন, সরিয়াডির কে না দেখেছে আর দেখতে পাচ্ছে ? শ্রীলেখা কটেজের ভদ্রলোক

প্রায়ই এসে প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দায় উঠে শুধু দুটি কথা ধ্বনিত করেন। —আমি নিখিল।

তখুনি বের হয়ে আসে আত্রেয়ী। কোনওদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে, কোনওদিন গেটের কাছে এসে, কখনও বা সামনের রাস্তায় পায়চারি করে। এক-একদিন কাছারিপাড়া ছাড়িয়ে শিরীষ আর খেজুরের ছায়া ছড়ানো ডাঙার চারদিকে দু'জনে বেড়িয়ে আসে। ডাঙার লালমাটির উপর দাঁড়িয়ে ওরা দূরের পরেশনাথের নীলচে চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। কখনও বা দেখতে থাকে, শালবনের সবুজ একদিনের বৃষ্টির জলে কত ঘন হয়ে গিয়েছে।

তবু দিবাকরের মত মানুষের মেজাজও আর ছটফট করে উঠতে পারছে না। দিবাকরের সাইকেলে স্পিড নেই। শান্তির কাছে বসে আর আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে দিবাকর। চন্দরকাকা হে হে করে হেসে হেসে যে কথাটা বলেন, সে কথাটা তবে নেহাত মিথ্যে কিছু নয়।

শান্তি—গোষ্ঠদা কী বলছেন ?

দিবাকর—গোষ্ঠদা আর হাবুলদা তো কথা বলতেই চান না। ওঁরা বলেন, ওঁদের আর কিছু বলবার নেই।

শান্তি—কিন্তু এত ভয় করলে চলবে কেন ?

চমকে ওঠে দিবাকর। —তুমি বলছ একথা ?

শান্তি—বলছিই তো।

বেচারা দিবাকর, ছোট্ট একটি স্থায়িতার ঘরে সুখী হয়ে পড়ে আছে যে মানুষটা, কাঠের গোলাদারি করে আর মাঝে মাঝে ছিপ হাতে নিয়ে ছোট ঝিলের জলে মাছ ধরে যার জীবনের দিনগুলি খুশি হয়ে যায়, ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়া সামান্য বিদ্যের মানুষটি, ফিলসফির তন্ত্রমন্ত্রের কোনও ধারই যে ধারে না, সে মানুষেরই চোখে বেশ শক্ত একটা ভ্রূকুটি হঠাৎ পাকিয়ে উঠতে থাকে। যেন একটা হেঁয়ালির কাছে কৈফিয়ত চাইতে চেষ্টা করছে দিবাকর। দিবাকরের অবুঝ আত্মাটাই যেন রাগ চাপতে গিয়ে বিড়বিড় করে। —না, চন্দরকাকা যা-ই বলুন, তিরছি নদীকা পানি হয়ে শুধু বয়ে গেলে আর সবই বইয়ে দিলেই চলে না। বাঁচতে হলে এক জায়গায় ঠেকে থাকতে হয়।

শান্তি—আমি বলি, অন্তত চেষ্টা করা তো উচিত। তারপর ঠেকে থাকতে পারি বা না পারি, যা হবার হবে। আত্রেয়ী যে একটু চেষ্টাও করে না।

দিবাকর উঠে দাঁড়ায়। —আমি, এখনি আসছি।

দুপুরের রোদে তেতে উঠেছে নয়াপড়ার সড়কের ধুলো। তারই উপর দিয়ে কী সাংঘাতিক স্পিড নিয়ে ছুটে চলে গেল দিবাকরের সাইকেল।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দায় উঠেই ডাক দেয় দিবাকর। —কাকিমা। কাকিমা বের হয়ে আসেন—কী খবর দিবাকর ?

—আত্রেয়ী কোথায় ?

—ঘুমিয়ে আছে।

—আপনি এখুনি আত্রেয়ীকে বলুন, নিখিলবাবুর সঙ্গে যেন আর বেড়াতে না যায়, গল্পটল্পও না করে।

—এখুনি বলব ?

—হ্যাঁ, আমি এখানে দাঁড়িয়েই শুনব, আত্রেয়ী কী বলে।

শুনতে পেল দিবাকর, আত্রেয়ী যেন স্বপ্ন দেখে পাগল হয়ে যাওয়া একটা মানুষের মত কথা বলছে। —না, তা হয় না, কাকিমা। নিখিলবাবুর মত মানুষের সঙ্গে আমি অভদ্রতা করতে পারব না। ভদ্রলোক এলে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলবই, বলা উচিত। না বললে, মিছিমিছি ভদ্রলোককে অপমান করা হয়।

কাকিমা আবার বাইরে এসেই দেখতে পান, দিবাকর গেট পার হয়ে গিয়ে রাস্তার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

যেন অনেক চেষ্টা করে কোনও মতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর ; একটু জোরে হাওয়া

বইলেই ধুলোর উপর পড়ে যাবে দিবাকর আর দিবাকরের সাইকেল।

এগিয়ে আসেন কাকিমা।—শুনলে তো দিবাকর। এখন বলো, আমাদের আর কী করবার সাধ্যি আছে ?

দিবাকরের চোখ দুটো লাল হয়ে গিয়েছে।

—শেষ চেষ্টা করবেন ?

—কী করব বলো ?

—আপনি নিজেই নিখিলবাবুকে একদিন একটু বুঝিয়ে বলুন, নিখিলবাবু যেন আর আত্রেয়ীকে ডাকাডাকি না করেন।

সেদিনই সন্ধ্যায় যখন শ্রীলেখা কটেজের বারান্দায় বসে বই পড়ছে নিখিল সেন, তখন সরিয়াডির একটি করুণ আবেদনের মূর্তি, সরিয়াডির সুহাস কাকিমা চিনুর হাত ধরে সেই বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আর দিবাকর যেন আবছায়া হয়ে গেটের থামের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিখিল একটু বিস্মিত হয়ে তাকায়—কে আপনি ?

—আমি আত্রেয়ীর কাকিমা।

—কী আশ্চর্য, আপনি এখানে কী মনে করে ?

—আপনাকেই একটা কথা বলতে এসেছি।

—বলুন।

—আমাদের আত্রেয়ী তো একটা মুখ্খু সুখ্খু অবুঝ মেয়ে, কিন্তু...।

—কিন্তু তাতে কী আসে যায় ? হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিখিল।

—আপনি তো সবই বোঝেন ; আত্রেয়ীর অবস্থার কথা নিশ্চয় সবই জানেন। তাই আপনি যদি এখন...।

—বলুন।

—আপনি যদি আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা-টেখা না করেন, তবে আমরা সবাই একটু নিশ্চিন্ত হই।

—সে কী কথা ? আপনাদের কিসের এত দুশ্চিন্তা ? আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা-টেখা করে কি আমি ভয়ানক একটা দোষ করে ফেলেছি ?

—আপনার কোনও দোষই নেই। আপনার মত মানুষ আমাদের মত ঘরের একটা মেয়ের সঙ্গে ভদ্রতা করে দুটো কথা বলবে, এটা তো আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আত্রেয়ী যে একটা বোকা মেয়ে, ভুল করে ফেলতে পারে।

—কিন্তু আমার ভুল হতে পারে না ; আমি ভুল-টুল করি না।

—খুব সত্যি কথা।

—তবে তো আপনার আর কিছু বলবার নেই।

—আপনি দয়া করুন।

—কী, দয়ার কথা আবার তুলছেন কেন ? কোনও মানে হয় না।

নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কাকিমা। চিনু হঠাৎ ছটফট করে কাকীমার হাত ধরে টানতে থাকে।

হেসে ওঠে নিখিল সেন। শান্ত সুন্দর ও স্নিগ্ধ হাসি।—আপনি বরং দয়া করে অনুমতি দিন কাকিমা, কাল আপনাদের মেয়েকে একবার পরেশনাথ বেড়িয়ে নিয়ে আসতে চাই ; ট্যাক্সিতে যাব, ট্যাক্সিতেই ফিরব।

ফিরে এলেন কাকিমা। দেখতে পায় দিবাকর, কাকিমার চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছে।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে দিবাকরের চোখ। সরিয়াডির চোখ। কী ভয়ানক আগুন ঠিকরে পড়ছে সেই দুটো চোখ থেকে। সরিয়াডির কাকিমাকে ঠাট্টা করে কাঁদিয়ে দিয়েছে বাইরের একটা ভালমানুষি হামবড়াই, অপমানের জ্বালাটা যেন সরিয়াডির শালজঙ্গলের নেকড়ের মত এইবার হিংস্র হয়ে ছুটে গিয়ে টুঁটি কামড়ে ধরতে চায়। দিবাকরের চোয়াল কাঁপে, দাঁতে দাঁতে শব্দ হয়।

—ঠিক আছে, এখন বাড়ি চলুন কাকিমা।

একদিন, দু'দিন, পর পর সাতদিন সরিয়াডির প্রাণের জ্বালার নেকড়েটা শুধু আড়াল থেকে চোখ

রেখে দেখতে থাকে হ্যাঁ, ট্যাক্সি ক'রে পরেশনাথ থেকে ফিরে এল নিখিল আর আত্রেয়ী। একদিন ছোট ঝিলের জলের একটা শালুক তুলে নিয়ে আত্রেয়ীর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে নিখিল ; শিউরে হেসে উঠেছে আর একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়েছে আত্রেয়ী। নিখিল বলে—কেন, কী হল ? লুফে ধরতে পারলেন না ? আত্রেয়ী হাসে—ওরে বাবা, ঝিলের জলের শালুকে জোঁক থাকে।

রাত মন্দ হয়নি। নয়াপাড়ার সড়কের মোড়ের টিমটিমে বাতি নিবে গিয়েছে। ঝড়ের বাতাস লেগে গভীর অন্ধকারটাই বুঝি ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে। দাঁড়িয়ে আছে পরেশ, মাধব, নরেন আর বিমল।

নরেন বলে—হতে পারে লোকটা সত্যিই একটা স্কলার। কিন্তু নিজেকে ছাড়া আর কাউকে যেন মানুষ বলেই মনে করে না।

মাধব—মাঝে মাঝে সরিয়াডিতে আসবেন, আর কোনও সম্পর্ক নেই এক ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে বেড়িয়ে হেসে আর গল্প করে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করবেন, এ তো বেশ মজার ফিলসফি ! বেড়ে আবদেরে জীবন !

দিবাকর এসে বলে—চল।

শ্রীলেখা কটেজের কোনও ঘরে আলো নেই। বারান্দার উপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায় নরেন, মাধব, বিমল আর পরেশ। দরজার কড়া নাড়ে দিবাকর। দরজা খুলে বের হয়ে আসে কটেজের মালী—সাহেব নেই। আজ বিকেলের ট্রেনে কলকাতা চলে গিয়েছেন।

॥ ১৯ ॥

বিকেল হলে কাঁটালতার লাল ফুলের উপর মৌমাছি গড়ায় আর আত্রেয়ী শুধু গেটের সামনের রাস্তাটুকুর উপর একাই আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ায়। কিন্তু মনটা একা নয়, সে মন একটা অপেক্ষার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; আজ হয়ত নিখিলবাবু আর একটু পরেই এসে পড়বেন।

রামুয়া একদিন হঠাৎ বলে দিল বলেই বুঝতে পারল আত্রেয়ী, নিখিলবাবু এখন সরিয়াডিতে নেই। কটেজের ছোটবাবু তো দশ রোজ হল কলকত্তা চলিয়ে গিয়েছে।

বিকেলের আলো ফুরিয়ে যাবার আগেই, বাড়ির সামনের রাস্তাটুকুর উপর আত্রেয়ীর এই একা ঘুরে বেড়াবার সামান্য চঞ্চলতাও একেবারে মৃদু হয়ে যায়। ফিরে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে, উলের গোছা আর কাঁটা হাতে নিয়ে জানালার কাছে বসে পড়ে।

কাকিমা যখন ঘরের ভিতরে টেবিলের ল্যাম্পটাকে জ্বেলে দিয়ে চলে গেলেন, তখন বাইরের সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারও অনেক পরে, রাত দশটার নীরবতার বাতাসে যখন স্টেশনের লোকো শেডের ভিতর থেকে হাতুড়ি পেটানোর শব্দটাকে বেশ স্পষ্ট করে শোনা যায়, তখন হঠাৎ চমকে ওঠে আত্রেয়ী। উলের গোছা আর কাঁটা তাকের উপর রেখে দিয়েই টেবিলের বইটাকে তুলে ধরে, নাড়া দেয়, খুলে দেখে। টেবিলের সবুজ কাপড়ের ঢাকাটার একটা কোণ তুলে ধরে আর দেখতে থাকে। বিছানার কাছে এগিয়ে যেয়ে বালিশের নীচে আর তোষকের তলায় হাত চালিয়ে খুঁজতে থাকে। আয়নার পিছনে দেয়ালের গায়ে যে খোপের ভিতরে আত্রেয়ী ওর চুল বাঁধবার পুরনো ফিতেগুলিকে একটা কুণ্ডলি করে রেখে দেয়, সেই খোপের ভিতরে চিঠিটাকে পাওয়া গেল।

দু'মাস আগে হেমন্তের এই চিঠিটা এসেছিল। এ চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। কিন্তু হেমন্তের আর একটিও চিঠি কি এই দু'মাসের মধ্যে আসেনি ?

ব্যস্ত হয়ে আবার খুঁজতে থাকে আত্রেয়ী। আলমারির মাথাটার উপরে, সেলাই কলের খোপটার ভিতরে ; কোথাও কোনও চিঠি নেই। কুলুঙ্গিতে মস্ত একটা শঙ্খ আছে, কাকিমা তাঁর হরিনাম লেখা কাগজের টুকরো এই শঙ্খের ভিতরে জমা করে রাখেন। না, এই শঙ্খের ভিতরেও হেমন্তের কোনও চিঠিকে ভুল করে কেউ রেখে দেয়নি।

দু'মাস আগের এই চিঠিটার অনেক কথার মধ্যে হেমন্তের একটা নতুন কথাও আছে—ক'দিন ধরে

শরীর ভাল যাচ্ছে না। ওষুধ খেয়েছি।

রাগ হয় কাকিমার উপর। কাকিমা একবার মনে করিয়েও দিতে পারেনি যে, চিঠিটার জবাব দিতে হবে। জবাব দেওয়া হল কিনা, সেটুকুও খোঁজ নিয়ে জানতে চেষ্টা করেনি কাকিমা। অথচ দিনের মধ্যে অন্তত তিন বার আত্রেয়ীকে জিজ্ঞেস করেছে কাকিমা, ঘুম ভাল হয়েছে কিনা ?

কাকিমা ঘরে ঢুকতেই আত্রেয়ীর এই রাগের মনটাই যেন ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—বেশ হল, তোমার ইচ্ছেই সত্য হল।

—কী হল ?

—দু'মাস ধরে বেশ ভাল করে ঘুমিয়েছি, কিন্তু চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি।

—আমি কেমন করে জানব যে, চিঠির জবাব দিসনি ?

—তুমি কেমন করে জানতে পার যে আমার ঘুম হয়নি ? ছি।

—কাকে ছি করছিস ? বুঝে দেখ।

—আমাকে করছি। শুনে খুশি হলে তো ?

কোনও কথা না বলে চলে গেলেন কাকিমা। আত্রেয়ীর মনটা এবার যেন হেমন্তেরই উপর রাগ করে ছটফট করতে থাকে।—আমি না হয় ভুলে গেছি, কিন্তু তুমিই বা এত হিসেব করে চিঠি লিখবে কেন ? আগে তো চিঠির জবাব না পেয়েও তিনটি চিঠি লিখে ফেলতে ; এখন এমন কী কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলে যে, দু'মাসের মধ্যে আর একটাও চিঠি লিখতে ভুলে গেলে ?

চিঠি লেখে আত্রেয়ী।—জানি, আমার চিঠির এত দেরি দেখে তুমি বেশ কথা শুনিয়ে জবাব দেবে। তাই দিও ; আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু অসুখ কেন হয়েছিল ? এখন কেমন আছ ?

সরিয়াডির আকাশে কোনও মেঘ নেই, যদিও আষাঢ় প্রায় ফুরিয়ে এল। শালবনের হাওয়া রোজই সকালবেলার আলোর সঙ্গে জেগে উঠে ফুরফুর করে, আর দূরের পাহাড়তলির গির্জার ঘণ্টার শব্দ বেশ স্পষ্ট করে শোনা যায়।

দেখতে পেয়েছে দিবাকর, কিণ্ডারগার্টেনের কলরবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিয়ে আত্রেয়ী কল্‌কল্‌ করে হাসছে।

একটা মাস পার হয়ে গিয়েছে, শ্রীলেখা কটেজের ঘরের জানালার গায়ে রাতজাগা আলোর কোনও চিহ্ন দেখা যায় না, বারান্দার বেতের টেবিলে মোটা মোটা বইয়ের কোনও স্তূপও নেই। ধানোয়ার রোডে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেয়েছে আর হেসে ফেলেছে নরেন, কালভার্টের কাছে সড়কের ধুলোর চিতি সাপটা গরুর গাড়ির চাকায় থেঁতলে গিয়ে মরে পড়ে আছে।

প্রদোষ সরকার হঠাৎ বেশ একটু চমকে উঠে জিজ্ঞেস করেন— কই সুহাস ? হেমন্তের চিঠি তো এল না।

কাকিমা— না।

প্রদোষবাবু— তিন মাসের মধ্যেও একটা চিঠি নেই, এর মানে কী ?

—কী করে বলি ? কিছু বুঝতে পারছি না।

—শেষ চিঠিতে কী লিখেছিল হেমন্ত ?

—শরীর ভাল নয়, ওষুধ খাচ্ছে।

চমকে ওঠেন প্রদোষ সরকার।— তারপর দু'লাইন লিখে জানাবে তো হেমন্ত, যে অসুখ সেরে গিয়েছে ?

—জানানো উচিত ছিল।

—হিসেব করে দেখেছ, হেমন্তর মেয়াদের আর ক'মাস বাকি আছে ?

—আর তো মাত্র ছ-মাস।

গেটের তিনকাঠের বেড়াটার দিকে দুই চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকেন প্রদোষ সরকার।

হাবুলবাবুর বাড়িতে দাবার আসরের কাছে কাচের চিমনি দিয়ে ঢাকা কেরোসিনের বাতির শিখাটা বড় উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে। হাবুলবাবু দাবার চাল চালতে গিয়ে হেসে ওঠেন— আর ছ'মাস।

গোষ্ঠবাবুও হাসেন— কার ? সামন্তদার স্ত্রীর ?

হাবুলবাবু— আরে না, দিবাকর বলছিল, প্রদোষদার জামাইয়ের ছাড়া পেতে আর মাত্র ছ'মাস বাকি। সামন্তদার স্ত্রীর ছাড়া পেতে আর মাত্র তিন মাস।

গোষ্ঠবাবু— যাক, এ ছ'মাসের মধ্যে শ্রীলেখা কটেজের উপদ্রবটা আবার দেখা না দেয়, তবেই ভাল।

সেদিন, সরিয়াডির দুপুরবেলার স্তব্ধতা হঠাৎ যেন দুটো রাগী কুকুরের চিৎকার হয়ে প্রদোষ সরকারের ঘুম ভেঙে দিল। সামনের সড়কের গরম ধুলোর উপর দিয়ে কামড়া-কামড়ি করে ছুটোছুটি করছে কে জানে কোথাকার আর কোনও পাড়ার দুটো কুকুর।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন প্রদোষবাবু, তার পর বাইরের বারান্দায় এসে চেয়ারের উপর বসতে গিয়েই একটা ক্র্যাচ হাত ফসকে মেজেতে পড়ে গেল। চেয়ারের কাঁধটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটা চিঠি পড়ে আছে চেয়ারের উপরে। কে জানে কখন এসে চিঠিটাকে এখানে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছে ডাকপিয়ন হরিরাম।

চিঠি পড়লেন প্রদোষবাবু। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের উপর ধপ্ করে বসে পড়ে ডাক দিলেন— এদিকে একবার এসো, সুহাস। যেন প্রদোষ সরকারের আস্ত পা'টা হঠাৎ মট্ করে ভেঙে গিয়েছে, তাই একটা অসহায়তা চেঁচিয়ে উঠেছে।

জেলের চিঠি। তিনশো তের নম্বরের কয়েদি হেমন্ত চৌধুরীর স্ত্রী আত্রেয়ী চৌধুরীকে জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, তার স্বামী সাংঘাতিক অসুখে পীড়িত। যদি দেখা করবার ইচ্ছে থাকে, তবে অবিলম্বে দেখা করে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

চিঠির ভাষা শুনে কাকিমা কাঁপতে থাকেন। প্রদোষ সরকারের কপালটা ঘামে ভরে যায়।

আত্রেয়ীর মা আর মণিদিদা যখন খবরটা শুনতে পেলেন, তখন বিকেল হয়ে এসেছে। পুজোর ঘরের কপাটে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে রইলেন আত্রেয়ীর মা ; আর মণিদিদা তাঁর জপের মালা কপালে ঠেকিয়ে দিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে বসে রইলেন।

আত্রেয়ী এখনও ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক, এ খবর শুনিয়ে দেবার জন্য আত্রেয়ীকে এখন ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলবে, এমন হাত কোনও জহ্লাদেরও থাকতে পারে না।

বাইরের কাকের তাড়া খেয়ে কাঠবিড়ালিটা জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে ঘুমন্ত আত্রেয়ীর গায়ের উপর পড়ে গেল বলেই আত্রেয়ীর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ-মুখ ধুয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী। তারপরেই চমকে ওঠে। —তোমার হাতে ওটা কী, বাবা ?

—জেলরের চিঠি।

কপালটা পিছল, কিন্তু চোখ দুটো যেন শুকনো ছাই-ছাই ; প্রদোষ সরকার এই চিঠির ভাষাটা আত্রেয়ীকে শুনিয়ে দিতেও আর দেরি করেন না।

নিথর হয়ে আর একেবারে নীরব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই সরে যায় আত্রেয়ী। ঘরের ভিতরে গিয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে।

চিনুর পিসিমা এলেন সন্ধ্যাবেলা। জেলরের চিঠির ভাষা তিনিও শুনলেন। দেখেও গেলেন, দু'হাতে মুখ ঢেকে বিছানার উপর শুয়ে পড়ে আছে আত্রেয়ী।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দার সিঁড়ি ধরে নামতে গিয়ে চিনুর পিসিমা হঠাৎ মাথা ঘুরে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন ; কিন্তু সামলে নিলেন আর আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি চলে গেলেন।

শুনতে পেল শান্তি। শান্তির হাত থেকে সন্ধ্যার প্রথম জ্বালানো বাতিটার কাচের ডুম থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল আর চুরমার হয়ে গেল। মাথায় হাত দিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শান্তি।

শুনতে পেলেন জয়ন্তবাবুর স্ত্রী। ডালের কাঁটা হাতে ধরে নিথর হয়ে শুধু উনুনের আগুনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডালপোড়া গন্ধে সারা বাড়ির বাতাস ভরে গেল। শুনতে পেয়েছেন সন্তুর মা। শ্বাস ছাড়তে গিয়ে বুক কেঁপেছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় ডাক দিয়েছেন।

—সন্ধ্যাবেলা আর বাঁশি বাজাসনি সন্তু। কী বিচ্ছিরি তোর বাঁশির শব্দ।'

সন্তু বলে— বাঁশিতে জল ঢুকেছে, মা।

আজই কানপুর থেকে সন্তুর বাবার চিঠি এসেছে। কী আশ্চর্য, যে মানুষ চিঠিতে আত্রেয়ীর নামে কোনও কথা কোনওদিনও লেখেনি, সে মানুষ তার এই চিঠিতে একটা অদ্ভুত কথা লিখে বসে আছে ; আশা করি আত্রেয়ীর স্বামী এতদিনে মুক্তি পেয়েছে।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দাতে বাতি নেই। সড়কের বাতির একটা ঘোলাটে আভা বারান্দার অন্ধকারের গায়ের উপর পড়ে আর মর-মর হয়ে কাঁপছে। কিন্তু প্রদোষ সরকার যেন এরই মধ্যে তাঁর অচল জীবনের সমাধি পেয়ে গিয়েছেন। হাত কাঁপে না, চোখ ছটফট করে না, নিঃশ্বাসের সঙ্গে কোনও ব্যথা উসখুস করে না।

গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু এলেন ; প্রদোষবাবুর উদাস চোখ দুটোর একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

গোষ্ঠবাবু— বেশি মন খারাপ করবেন না, প্রদোষদা।

হাবুলবাবু— এমন কিছু চিন্তা করবার ব্যাপার নয়। মানুষের জীবনে অসুখ বিসুখ তো থাকবেই।

চলে গেলেন গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু। দিবাকর এসে ডাক দেয়। —কাকিমা একবার বাইরে আসবেন ?

কাকিমা বাইরে আসেন— বলো।

দিবাকর— কী ঠিক করলেন ?

কাকিমা— কিছুই না।

দিবাকর— আত্রেয়ী কী বলে ? দেখতে যেতে চায় ?

কাকিমা— জানি না।

দিবাকর— কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি জেনে নেওয়া ভাল। যেতে হলে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াই উচিত।

প্রদোষবাবু বলেন— আর একটা চিঠি এসেছে, বিকেলের ডাকে।

কাকিমা— কার চিঠি ?

প্রদোষবাবু— বীরনগর থেকে লিখেছে আত্রেয়ীর মামা কান্তি। হেমন্তর অবস্থা সুবিধের নয়। আত্রেয়ীকে এখন আর হেমন্তের সঙ্গে দেখা করিয়ে লাভ নেই। এখন দেখার কোনও মানে হয় না। কপালে যা আছে, তাই হবে।

কেউ বুঝতে পারেনি, কখন ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে সবার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী বলে— মামার চিঠিটা দাও।

প্রদোষবাবু বললেন— নাও।

চিঠি হাতে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় আত্রেয়ী। দিবাকরও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ে আর চলে যায়। তাকিয়ে দেখবার মত কিংবা শোনবার মত এখানে আর কিছুই নেই।

কত রাত হল কে জানে ? আত্রেয়ীকে কয়েকবার খেতে সেধেছেন কাকিমা, কিন্তু কোনও কথা বলেনি, খায়ওনি আত্রেয়ী। তবে কে আর খাবে ?

ঘুমোবেই বা কে ? কার চোখেই বা ঘুম আসবে ? কাকিমা সারা রাত জেগে বসে শুধু শুনতে থাকেন ; ঘরেতে টেবিলের আলোর কাছে মাথাটাকে পেতে দিয়ে একটা টুলের উপর বসে আছে আত্রেয়ী। থেকে থেকে ছটফট করছে। মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে কপালটাকে টেবিলের উপর আস্তে আস্তে ঘসছে।

শেষ রাতে, যখন টেবিলের ল্যাম্পের কাচ ধোঁয়ার কালিতে কালো হয়ে গিয়েছে, তখন পাশের ঘর থেকে উঠে আসেন কাকিমা।

টেবিলের উপরে মাথা রেখে, ঘুমিয়ে পড়েছে আত্রেয়ী। কিন্তু একটা চিঠিও লিখে রেখেছে। "এ রকম দেখার কথা তো ছিল না। কথা ছিল তুমি এসে দেখা দেবে। তোমার পায়ে পড়ি, কথা রাখো

তুমি। শিগগির সেরে ওঠো আর চলে এসো। এই চিঠি পেয়েই জবাব দেবে। তোমাকে দেখতে যাব কি যাব না, তুমি নিজে লিখে জানাবে।"

কাকিমা ডাকেন— আত্রেয়ী, এবার শুয়ে পড় তো মা ; নইলে তোর বাবা তো ঘুমোতে পারছেন না।

উঠে গিয়ে বিছানার উপর এলিয়ে পড়ে আত্রেয়ী।

॥ ২০ ॥

শালবনের মাথা ছুঁয়ে সরিয়াডির ভোরের আলো যখন সবে মাত্র জেগেছে, তখন জেগে ওঠে আত্রেয়ী। ঘরে বসে থাকে না, বাইরের বারান্দাতে এসেও দাঁড়িয়ে থাকে না, এগিয়ে যেয়ে গেটের তিনকাঠের বেড়াটার কাছে একবার দাঁড়ায় ; তার পরেই কাঁটালতার ঘেরানের আশেপাশে শিশিরে ভেজা ঘাসের উপর ঘুরে বেড়ায়।

সরিয়াডির প্রাণটাও বোধ হয় ভাল করে ঘুমোতে না পেরে রাত জেগেছে আর ছটফট করেছে, আর, ভোরের আলো দেখা দিতেই সবার আগে আত্রেয়ীকেই দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তা না হলে, আজ এত ভোরে প্রদোষ সরকারের বাড়ির সামনের এই সরু সড়ক দিয়ে এত লোকের আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে কেন ?

চলে গেল নরেনের সাইকেল। সামন্তবাবু আর হাজরাবাবু একসঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলে গেলেন। জয়ন্তবাবু গেটের কাছে একবার থমকে দাঁড়ালেন ; আত্রেয়ীর সঙ্গে একটা কথাও বলে নিলেন। —আজ বেশ ঠাণ্ডা আছে আত্রেয়ী, খালি পায়ে ভেজা ঘাসের ওপর ওভাবে বেড়িও না।

শ্রীপদবাবুও যেতে যেতে একবার থেমে নিলেন— প্রদোষদা এখনও ওঠেননি বোধ হয় ?

আত্রেয়ী বলে— না।

শ্রীপদবাবু— বাবাকে বলো, আমি এসেছিলাম।

বিমল আর মাধব এসেই একটা হাঁক ছাড়ে। — আত্রেয়ীদি কী করছেন ?

আত্রেয়ী— কিছুই না। তোমরা এত সকালে কী করতে বের হয়েছ ?

মাধব— কিছ্ছু না।

বিমল— আমরা দু'জন রাত জেগে শুধু তাস খেলেছি ; ঘুমোতে পারিনি।

আত্রেয়ী হাসে— তাসের পরীক্ষা আছে বোধ হয় ?

মাধব— পরীক্ষা কথাটা মুখে আনবেন না আত্রেয়ীদি ; শুনলে বুক টিপ টিপ করে।

এত সকালে রামুয়া আবার বাড়ির কোনও কাজের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে ?

রামুয়ার হাতের জিনিসটা চোখে পড়তেই এগিয়ে আসে আত্রেয়ী। —চিঠিটা একবার দেখি।

হেমন্তের কাছে লেখা চিঠি ডাকে ফেলবার জন্য ব্যস্তভাবে চলে যাচ্ছে রামুয়া। নিশ্চয় আত্রেয়ীর লেখা দুটো চিঠি এই খামের ভিতরে আছে। খামের উপর কাকিমা নিজেই ঠিকানা লিখে দিয়েছেন।

—আঃ, এ কী করেছ রামুয়া ? হাতটা ভাল করে মুছে নাও।

আঁচল বুলিয়ে খামটাকে একটু মুছে দেয় আত্রেয়ী। স্যাঁতসেঁতে খামের উপরে লেখা নামটা সত্যিই যে বেশ চুপসে গিয়েছে।

—নাও, মাঝ রাস্তায় গল্প করতে বসে আবার দেরি করে ফেলো না রামুয়া। সকাল ন'টার ডাকেই যেন চিঠি চলে যায়।

আত্রেয়ী নিজেই গেটের তিনকাঠের বেড়াটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় ; চলে যায় রামুয়া।

সরিয়াডির প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ী কী তবে বেশ শান্তটি হয়ে ওর অপেক্ষার শেষকৃত্য সেরে দিচ্ছে ? এই চিঠিকেই কী শেষ চিঠি বলে মনে করেছে আত্রেয়ী ? কিংবা পাঁচ বছর আগের পাওয়া একটি স্পর্শকে যত্ন করে প্রাপকের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিল ?

চিনুর পিসিমা তো আগেই দেখে গিয়েছেন, আত্রেয়ী কত শান্তটি হয়ে আঘাত সহ্য করতে পারে। শুধু দু'হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ে ছিল আত্রেয়ী, কেঁদে ভাসায়নি, মেঝেতে মাথা কুটে চিৎকারও

করেনি। সন্তুর মা'ও এই সকালে এসে দেখে গেলেন, জানালার কাছে চুপ করে বসে উল বুনছে আত্রেয়ী।

কাকিমার কানের কাছে একটা কথা বেশ খুশির স্বরেই বলে চলে গেলেন সন্তুর মা। —এই ভাল। কান্নাকাটি করে আর লাভ কী ?

হাবুলবাবু বললেন— এটা একরকম ভালই বলতে হবে, গোষ্ঠদা। আত্রেয়ীটা একটুও মুসড়ে পড়েনি।

গোষ্ঠবাবু— হ্যাঁ ভালই ; এখন শেষ খবরটা ভাল হয়, তবেই সব চেয়ে ভাল হয়।

হাবুলবাবু— আমার কিন্তু ভরসা করতে সাহস হচ্ছে না, গোষ্ঠদা। আত্রেয়ীর স্বামী ছাড়া পাওয়ার আগেই চরম ছাড়া পেয়ে যাবে না তো ?

গোষ্ঠদা— থাক, এ কথা আর এখুনি তুলছেন কেন ? দেখা যাক কী হয় ? আত্রেয়ী যে শান্ত হয়ে গিয়েছে, এটাই একটা ভাল লক্ষণ।

আত্রেয়ী শান্ত হয়ে গিয়েছে, দেখতে পেয়ে সরিয়াডির প্রাণটাও শান্ত হয়ে গিয়েছে। সকলেই বলছেন, এই ভাল।

দিবাকর শুধু একটু গম্ভীর হয়ে বলে— শুনেছ শান্তি !

—কী ?

—বিমল বলে গেল, আত্রেয়ী হেসে হেসে কথা বলেছে।

চমকে ওঠে শান্তি। কিন্তু তার পরেই আনমনার মত তাকিয়ে কথা বলে— হাসতে পারলে তো ভালই।

দিবাকর— আমিও তো বলছি, ভালই। কিন্তু...।

শান্তি— কী ?

দিবাকর— আত্রেয়ী আর একটু কান্নাকাটি করলেই ভাল হত না কী ?

শান্তি— ছি, ওকথা বলতে নেই।

দিবাকর— না না, আমি বলতে চাই, একটু ভাল দেখাত, এই মাত্র। মনের জোর থাকলে হাসবে না কেন ?

মনের জোর বইকি, তা না হলে অন্যদিনের মত আজও সকালে ঠিক সময়মত আর নিয়মমত কিণ্ডারগার্টেন করে আসতে পারত না আত্রেয়ী। সামন্তবাবুর মা পথে যেতে আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছেন। ঠিক সেই আত্রেয়ীই তো চলে যাচ্ছে। সেই ঢিলে খোঁপাটি, গলায় সেই সোনার সুতলি চেনের সঙ্গে জোড়া-মুক্তোর লকেটটি। সিঁথিতে সেই গুঁড়ো সিঁদুরের সরু দাগ ; ঘিয়ে রঙের সিল্কের শাড়ির সেই লাল-রঙা আঁচল। মেয়েটার মুখ দেখে কারও বুঝতে সাধ্যি হবে না যে, ওর ভাগ্যটাকে কাঁদিয়ে দেবার মত একটা খবর কাল বিকালেই এসেছে।

সামন্তবাবুর মা'র এই খুশির চোখের চাহনির সঙ্গে একটা করুণ বিস্ময়ের ছায়াও ছমছম করে। যেন ক্ষণমায়ার চোখ তুলে আত্রেয়ীর এই ঘিয়ে রঙের শাড়ির লাল-রঙা আঁচলটিকে তিনি শেষবারের মত দেখে নিচ্ছেন। কে জানে আর কতদিন ? মেয়েটাকে এই মূর্তিতে আর কি কখনও দেখতে পাওয়া যাবে ?

পটলবাবুর বাগানের একটা গাছের গোড়াতে এই সকালবেলাতেই কুড়ুলের কোপ পড়ছে আর গাছটা থরথর করে কাঁপছে। পটলবাবু শক্ত করে গামছা পরে নিয়ে আর নিজেই কুড়ুল ধরে গাছটাকে কাটতে শুরু করেছেন। পটলবাবুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন একটা ব্যস্ত আক্রোশ হুম হুম শব্দ করে গাছটাকে কাটছে।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে মেহেদির বেড়ার মাথার উপর দিয়ে উঁকি দেয় বলাই। —এ কি ? গাছটাকে কেটে ফেলেছেন কেন পটলদা ?

পটলবাবু— কেটে ফেলাই ভাল নয় কি ? এটার কি আর কোনও সার-বস্তু আছে ?

বেলগাছটা শুকিয়ে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু নেড়ে গাছের মাথায় এখনও কিছু সবুজ পাতা নড়বড় করছে। বলাই বলে— আরও ক'টা দিন অপেক্ষা করলেই পারতেন। মনে হচ্ছে, অন্ততঃ

আরও দু-একটা সিজ্‌ন কিছু ফল ধরত।

পটলবাবু— তার কি কোনও ঠিক আছে রে ভাই ? মগডালেও পিঁপড়ে ধরে গিয়েছে, এটার আর ক'দিন ?

গাছের গোড়ায় আবার পটলবাবুর হাতের কুড়ুল ঝুপঝাপ শব্দ করে আছড়ে পড়তে থাকে।

মহাদেও পাঁড়ের পায়রার ঝাঁকও একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে আছে। কালীবাড়ি রোডের পাশের যে মাঠের উপর পায়রার ঝাঁক আজ সাত-আট বছর ধরে রোজই তিনবেলা আসে বসে আর হুটোপুটি করে, সে মাঠের উপরে একটা ডানা-ভাঙা চিলকে এই সকালে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখেই ওরা একসঙ্গে পাখা ঝাপ্‌টে উড়ে পালিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আর কি এল ? পর পর দশটা দিন পার হয়ে গেল, তবুও না। সরিয়াডির আত্মাটা যেন আর অপেক্ষা করে কিছু বুঝতে চায় না, কিংবা একটু বুঝে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে চায় না।

আত্রেয়ীও দেখতে পায়, গেটের সামনের রাস্তার উপর দিয়ে ডাকপিয়ন হরিরাম চলে গেল। এ বাড়ির কাঁটালতার ফুলের দিকে, বারান্দার দিকে, কিংবা গেটের তিনকাঠের বেড়াটার দিকে একবার চোখ তুলে তাকায়ও না হরিরাম। আত্রেয়ীর জীবনের আশার বার্তাও যেন মহাদেও পাঁড়ের পায়রার মত হঠাৎ পাখা ঝাপ্‌টে উধাও হয়ে গিয়েছে।

কাকিমার চোখও দিনরাত সব সময়েই একটা দুঃস্বপ্নের ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পনেরো দিন পার হয়ে গেল, তবু আলিপুরের জেল থেকে কোনও চিঠি এল না কেন ? জেলরই বা আর কোনও খবর দেয় না কেন ?

পুরো একটি মাস পার হয়ে যাবার পর কাকিমার ভাবনার সব ক্লান্তি দুঃসহ যন্ত্রণার কামড় খেয়ে একদিন ছটফট করতে থাকে। প্রদোষবাবুর কাছে এসে নিঃশ্বাসের শব্দটাকে জোর করে চেপে দিয়ে ফিসফিস করেন কাকিমা। —কোনও খবরই তো এল না।

প্রদোষবাবু বলেন— এখনও কি তোমাদের মনে খবর জানবার ইচ্ছে আছে ? খবরটাকে বুঝে নিতে কি কোনও অসুবিধে আছে ?

চোখ মুছে নিয়ে আর ভয়ে ভয়ে আত্রেয়ীর ঘরের ভিতরে উঁকি দিতে গিয়েই আয়নাটাকে দেখতে পেলেন কাকিমা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে আত্রেয়ী, আর, আয়নায় আত্রেয়ীর চোখ দুটো কাকিমার উঁকি-দেওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে হাসছে। —কী খবর কাকিমা ?

সরে গেলেন কাকিমা। হাসি তো নয়, মেয়েটার চোখে যেন একটা ঠাট্টার আগুন জ্বলছে।

হাবুলবাবু একদিন বলেই ফেললেন— এখনও যখন কোনও খবর এল না, তখন কী খবর যে একদিন আসবে, সেটা কি বুঝতে পারছেন না গোষ্ঠদা ?

গোষ্ঠবাবু— খুব বুঝছি।

হাবুলবাবু— কিন্তু মেয়েটার জীবনটা এ কী রকমের একটা অভিশাপ হয়ে গেল ; দুর্ভাগ্যেরও যেন কোনও রকম নেই।

গোষ্ঠবাবু— আত্রেয়ীও বোধ হয় বুঝেই ফেলেছে যে, আর কোনও আশার খবর আশা করে লাভ নেই।

হাবুলবাবু— হ্যাঁ, দিবাকর বলছিল, আত্রেয়ী আর চিঠি লেখালেখি করে না।

গোষ্ঠবাবুর চোখ দুটো কাঁপতে থাকে।

—কিন্তু খোঁড়া মানুষ প্রদোষদার মত আত্রেয়ীর ভাগ্যটাও কী চিরকাল অচল হয়ে পড়ে থাকবে ? মাত্র তেইশ বছর বয়স মেয়েটার, ভাবতে গেলে আমার কেমন যেন লাগে। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

হাবুলবাবু হঠাৎ চমকে উঠে বলেন— একটু আস্তে কথা বলুন তো গোষ্ঠদা। একটু শুনতে দিন, ঘরের ভিতরে ওঁরা যেন কী একটা কথা বলাবলি করছেন।

ঘরের ভিতরে কথা বলছেন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী আর সন্তর মা। গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী বলছেন— হ্যাঁ সন্তর মা ; সত্যিই একদিন বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম, আমার হাতে শাঁখা নেই। তখন তো ছাই মনেই হয়নি যে, এ দুঃস্বপ্নটা বেচারী আত্রেয়ী মেয়েটারই অদৃষ্টের কথা বলছে।

সন্তুর মা— আজকাল তো বিধবারও বিয়ে হয়।
চমকে ওঠেন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী— অ্যাঁ! তা তো হয়। ...এখনি উঠছেন কেন?
সন্তুর মা— যাই এখন; অনেক কাজ ফেলে এসেছি।

॥ ২১ ॥

কথাটা হয়ত সন্তুর মা'র মুখ ফসকে বের হয়ে পড়েছে— আজকাল বিধবারও তো বিয়ে হয়। কিন্তু হাবুলবাবুর কান যেন একটা দৈববাণীর আশ্বাসের ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন, তাই ওভাবে চমকে উঠেছেন।

সরিয়াড়ির শালবনের হাওয়াটাও যেন এই কথাটাকে লুফে নিয়ে উড়ে বেড়াতে থাকে।

সামন্তবাবু আর হাজরাবাবু দুজনেই নয়াপাড়ার সড়কের মোড়ে তাঁদের ইঁটের গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন আর গল্প করেন। সন্তুর আর চিনুর সঙ্গে গল্প করে করে কিন্ডারগার্টেন থেকে ফিরছে আত্রেয়ী।

—বাবা কেমন আছেন আত্রেয়ী? সামন্তবাবু জিজ্ঞেস করেন।

বেশ হাসিমুখেই উত্তর দেয় আত্রেয়ী— ভাল আছেন।

আত্রেয়ী চলে যেতেই সামন্তবাবু বলেন— আজকাল বিধবারও তো বিয়ে হয়?

হাজরাবাবু— তা হয়।

দিবাকরও বাড়ি ফিরে এসে ঝপাং করে সাইকেলটা বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে ফেলে দিয়ে কথা বলে— শুনেছ, শান্তি?

—কী?

—সবাই বলছে, আজকাল বিধবারও বিয়ে হয়।

চমকে ওঠে শান্তি— তা হয়। কিন্তু...।

দিবাকর— কী?

শান্তি— না, কিছু না।

শ্রীলেখা কটেজের সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে গিয়ে গল্প করে নরেন আর বিমল। নরেন বলে— এমন কী পটলকাকাও বলছেন, আজকাল বিধবার বিয়ে হয়।

শ্রীলেখা কটেজের বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে বিমল কী যেন ভাবতে থাকে। তারপর নিজের মনেই গুনগুন করে কথা বলে— এ ভদ্রলোক আর আসবে বলে মনে হয় না।

অদ্ভুত স্বরের অদ্ভুত একটা কথা। বিমলের মুখ থেকে যেন একটা ভাবনার গুঞ্জন ফস্‌কে পড়েছে।

নরেন বলে— একটা কাজ করা যাক বিমল; কটেজের মালীকে জিজ্ঞাসা করি, সাহেব আবার কবে আসছেন?

শ্রীলেখা কটেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আর ডাক দিয়ে মালীকে জিজ্ঞেস করে নরেন। মালী বলে— না; কবে আসবেন তার কোনও ঠিক নেই।

বিমল— একদিন তো আসবেন?

মালী বলে— কেমন করে বলি? হামি কুছ নেহি জানে।

কে জানে কেমন করে বিমলের মুখ থেকে ফস্‌কে পড়া এই ভাবনার গুঞ্জনও সরিয়াড়ির বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। একেবারে স্পষ্ট করে বলেই ফেলেন— ভদ্রলোক এখন একবার এলেই তো পারেন।

সন্ধ্যার দাবা খেলার আসরে নতুন পেট্রল ল্যাম্পের জ্বলন্ত ম্যান্টেলের তেজ বাড়িয়ে দিয়ে গোষ্ঠবাবুও বলেন— আমার আশা আছে, নিখিল আবার আসবেই।

হাবুলবাবু— না হয় এলই; কিন্তু তার পর?

গোষ্ঠবাবু— তার পর আত্রেয়ীর সঙ্গে তো দেখাশোনা হবেই।

হাবুলবাবু— কিন্তু আত্রেয়ীর জন্যে কি নিখিলের মনে সেরকম কোনও ইচ্ছে-টিচ্ছে আছে ?

গোষ্ঠবাবু—আশা করছি, আছে।

হাবুলবাবু— থাকলেই ভাল !

চিনুর পিসিমা প্রায়ই আসছেন আর দেখে যাচ্ছেন, আত্রেয়ী আর একটুও উতলা নয়। বিকেল বেলাতেও দেখেছেন, আত্রেয়ী ঘুমিয়ে আছে, বুকের উপর একটা গল্পের বই পড়ে আছে।

মাঝের ঘরে বসে কাকিমার সঙ্গে কথা বলেন চিনুর পিসিমা। —একটা কথা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করছি সুহাস ; কটেজের সেই ছেলেটির খবর কী ?

চমকে ওঠেন কাকিমা। সে তো কবেই চলে গিয়েছে।

—তা জানি ; কিন্তু আবার কি আসবে ?

—জানি না। চিনুর পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাকিমারও চোখ দুটো যেন একটা নতুন খবরের বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে কাঁপতে থাকে।

চলে যাবার সময় বাইরের বারান্দার সিঁড়িতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন চিনুর পিসিমা, আর, কাকিমাকে চমকে দিয়ে আবার একটা কথা বলেন— আজকাল তো বিধবার বিয়ে হয়, সুহাস।

দেখতে পেলেন চিনুর পিসিমা, কে জানে কখন জেগে উঠে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী। মেয়েটা তো তবে কথাটা শুনেই ফেলেছে। চিনুর পিসিমা ব্যস্তভাবে বলে— আমি চললুম, সুহাস।

জানালারই কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী। কিন্তু আত্রেয়ীর চোখের দৃষ্টিটাও অদ্ভুত। সরিয়াডির বিকেলের আকাশের আলোটা আত্রেয়ীর চোখের তারা দুটোকে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কাকিমা যে কাছে এসে বারবার ঘুর-ঘুর করে চলে গেলেন, কিছুই যেন দেখতে পেল না আত্রেয়ী। দূরের ট্রেনের একটা শব্দ শোনা যায়, কিন্তু শব্দটা যেন আত্রেয়ীর এই জাগা মনের চেতনার উপর দিয়ে একটা কথা বলে বলে চলে যাচ্ছে— আজকাল বিধবারও বিয়ে হয়। বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাসও যে অলস অবশ হয়ে একটা মূর্ছার কোলে ঢলে পড়তে চাইছে।

বোম্বাই মেল রোজই অনেক লেট হয়ে শেষ রাতের দিকে আসে আর চলে যায়। ঘুমন্ত সরিয়াডির চোখ রোজ ভোরে জেগে উঠেই হাওয়া বদলের কোনও না কোনও নতুন মানুষের মুখ দেখতে পায়। গোষ্ঠবাবু একদিন অপেক্ষা করেন। —সবই নতুন, কোনও চেনা-মুখ আর আসছেই না দেখছি।

সেদিনই সন্ধ্যা হবার আগে দেখতে পেল নরেন, শ্রীলেখা কটেজের জানালা খোলা ; খোলা জানালা দিয়ে বাইরের জবাকুঞ্জের গায়ে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সরিয়াডির সন্ধ্যার সব অন্ধকারও যেন হাজার জোনাকি হয়ে আর আলো চমকে দিয়ে তখনি দেখে নিল, নিখিল সেন এসেছে। শুনতে পেল দিবাকর, শুনলেন গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু। শুনলেন সন্তুর মা। সরিয়াডির একটা কামনার অপেক্ষা সাঙ্গ হল। এখন আত্রেয়ী শুধু শুনতে পেলে হয়।

আত্রেয়ীরই বা শুনতে দেরি হবে কেন ? রামুয়াই বলে দেয়, কটেজের ছোটবাবু এসেছেন।

কিন্তু নিখিল যে শুধু রাতজাগা আলোর কাছে বসে বই পড়ে। সকাল দুপুর আর বিকেল, কোনও সময়েও কটেজের বাইরে সরিয়াডির কোনও আলো-ছায়ার দিকে উঁকি দিতেও চেষ্টা করে না। আত্রেয়ীকে ডাকাডাকি করে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য সেই শখের ভদ্রতাও যে আর ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। কী ব্যাপার গোষ্ঠদা ? হাবুলবাবু বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করেন। কিন্তু আত্রেয়ীই বা ভুল করছে কেন ? নিখিলের সঙ্গে আত্রেয়ীর দেখা হওয়া আজ যে আত্রেয়ীর জীবনেরই গরজ হয়ে দেখা দিয়েছে। চুপ করে ঘরে বসে থাকলে চলবে কেন আত্রেয়ীর ?

শালবনের মাথার উপর ঠিক সন্ধ্যাবেলাতেই ঘন মেঘের টুকরোটা ফেটে গিয়ে ছন্নছাড়া হয়ে যেতেই একটা এক-ফালি চাঁদের আলো সারা সরিয়াডির বুকে ছড়িয়ে পড়ে একটা ঘোলাটে মায়া মাখিয়ে দিল।

কোথায় যেন যাচ্ছে আত্রেয়ী, গেট পার হয়ে রাস্তার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। কাকিমা ব্যস্তভাবে ছুটে আসেন— এই ভর সন্ধ্যেয় ঘরের বাইরে কোথায় চললি এখন ?

আত্রেয়ী— বেড়াতে ?
কাকিমা— কোথায় ?
আত্রেয়ী—কটেজে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কাকিমা। কে যেন দু'হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে কাকিমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। যাবি না বলবার সাহস নেই। যাওয়া ভাল নয় বলবার শক্তি নেই।

রজনীধামের গেট পার হয়ে নয়াপাড়ার সড়ক ধরে হেঁটে চলেছে আত্রেয়ী। শুধু সন্তুটা ওর মাউথ অরগ্যানের রাজা-মামা গত বাজিয়ে কিছুদূর আত্রেয়ীর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে, তারপরেই শ্রীপদবাবুর খরগোসটাকে দেখতে পেয়ে ছুটে চলে গিয়েছে।

জানালার কাছ থেকে হঠাৎ সরে এসে গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী ফিসফিস করেন। —দেখো দেখো, আত্রেয়ী কোথায় যেন যাচ্ছে।

গোষ্ঠবাবুও গলার স্বর চেপে কথা বলেন— যাক, যেতে দাও, ভালই হবে।

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী— কিন্তু যাচ্ছে কোথায় ?

—এমন কিছু অচেনা কারও কাছে যাচ্ছে না।

—যাক তবে। গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী যেন একটা হাঁপ ছেড়ে কথা বলেন। —ভালয় ভালয় একটা গতি হয়ে যাক।

দেখতে পায়নি শান্তি, কখন বাড়ি ফিরে এসেছে দিবাকর, আর এভাবে একেবারে ক্লান্ত হয়ে বাইরের ঘরে চুপ করে বসে আছে। দিবাকরের সাইকেলও আজ আর বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে ঝপাং করে পড়ে কোনও শব্দ করেনি। দিবাকরের সাইকেলের চাকাতে এত ধুলোও কোনওদিন দেখেনি শান্তি।

শান্তি— কখন এলে ?

দিবাকর— এখনি। আত্রেয়ীকে দেখলাম।

—কোথায় ?

—শ্রীলেখা কটেজের দিকে চলে যাচ্ছে। তাই ও-রাস্তায় আর না এগিয়ে অনেক ঘুরে ছোট সড়ক ধরেই পালিয়ে এলাম। ধুলোর ঠেলায় সাইকেল কি আর চলতে চায় ?

দিবাকরের এই চেহারা যেন সরিয়াডির সব গর্বের নিদারুণ এক পরাভবের ধুলোমাখা চেহারা। শান্তির চোখেও যেন একটা কাঁকরের কুচি খর্‌খর্‌ করে বিঁধছে, তাই ভাল করে তাকাতে পারছে না।

দিবাকর— ব্যাপারটা কী রকম হল, শান্তি ?

শান্তি— বড় তাড়াতাড়ি হল।

দিবাকর— দেরি হলেই বা কী লাভ হত ?

শান্তি হাসতে চেষ্টা করে। — একটু ভাল দেখাত।

হ্যাঁ, খুবই তাড়াতাড়ি করে হেঁটেছে আত্রেয়ী ; কটেজের গেটের কাছে পৌঁছেই থমকে দাঁড়ায় আর হাঁপাতে থাকে। কটেজের গেটের পাশে জবার কুঞ্জটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে নিখিল। আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়েই ডাক দেয়। —আসুন।

নিখিলের এই ডাক কোনও চমকিত বিস্ময়ের ডাক নয় ; যদিও আজ এই সন্ধ্যায় এভাবে শ্রীলেখা কটেজের এই নিভৃতে একা নিখিলের কাছে সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ীর আবির্ভাব নিশ্চয়ই একটু বিস্মিত হবার মত ঘটনা। নিখিলের অনেক আমন্ত্রণ পেয়েও যে মেয়ে এই কটেজে একা নিখিলের কাছে কোনওদিন আসেনি, সে মেয়েই তো আজ নিজে ইচ্ছে করে আর জ্যোৎস্নামাখা হয়ে নিখিল সেনের চোখের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিখিলের চোখের কত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আত্রেয়ী, সেটাও নিখিলের পক্ষে একটা নতুন বিস্ময়ের ঘটনা। এভাবে, এমন সুন্দর একটি অকুণ্ঠা হয়ে কোনওদিনও তো নিখিলের চোখের কাছে দাঁড়ায়নি সরিয়াডির মেয়ে এই আত্রেয়ী।

নিখিল বলে— সরিয়াডিতে আসবার কোনও কথা ছিল না। যাচ্ছিলাম আগ্রা ; ট্রেনের কামরার জানালা দিয়ে আপনাদের সরিয়াডির শেষ রাতের চেহারাটা চোখে পড়তেই ঠিক করে ফেললাম,

নেমে পড়ব।

আত্রেয়ী— কবে এসেছেন ?

নিখিল— সাতদিন হয়েছে বোধ হয় ?

আত্রেয়ী— কিন্তু একদিনও তো গেলেন না।

—কোথায় ? আপনাদের বাড়িতে ?

—হ্যাঁ।

—একদিন যেতাম ঠিকই। কবে আর আপনার খোঁজখবর না নিয়ে চলে গিয়েছি।

—আপনার দেরি দেখে আমি নিজেই এলাম।

নিখিল হাসে। —এসেছেন বই কি। আমি জানতাম, একদিন আসবেনই। বলুন, কেমন আছেন ?

আত্রেয়ী— যেমন দেখছেন।

নিখিল— দেখছি তো, আরও সুন্দর হয়েছেন।

চমকে ওঠে না, সরে যায় না, মাথা হেঁট করে না, চোখ ফিরিয়েও নেয় না আত্রেয়ী। নিখিল সেনের এই প্রশস্তির ধ্বনির কাছে যেন একটি সুস্থির মুগ্ধতার ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী।

নিখিল চলে— চলুন, বারান্দায় গিয়ে বসি।

নিখিলের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে, যেন নিখিলের ইচ্ছারই এক শান্ত সহচরী হয়ে বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায় আত্রেয়ী।

নিখিল বলে— বসুন।

বেতের চেয়ারটার উপরে বসে পড়ে আত্রেয়ী।

নিখিল বলে— কাল অনেক রাতে তিরছি নদীর ঝর্নার শব্দটা শুনতে পেয়েছিলাম। তখনই আপনার কথা মনে পড়ে গেল। ...আচ্ছা, চলুন তো, বাগানের মাঝখানে রেঙ্গুন লতার পিরামিডের কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

তখনি উঠে দাঁড়ায় আত্রেয়ী। নিখিলের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে বাগানের যত মরশুমি ফুলের কেয়ারির কিনারা ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। নিখিলের নিঃশ্বাসের বাতাসও যেন কোথাও স্বস্তি পাচ্ছে না; যেন আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে নতুন একটা গ্রহলোকের নিভৃতে গিয়ে দাঁড়াতে আর গল্প করতে চাইছে নিখিল।

রেঙ্গুন লতার পিরামিড, ফুলের মঞ্জরি ঝুলে ঝুলে দুলছে। সে মঞ্জরির দিকে তাকিয়ে থাকলেও কি বুঝতে পারছে না আত্রেয়ী, নিখিল সেনের পাশে কত কাছাকাছি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ? ঢিলে খোঁপাটা যে একটু হলেই নিখিলের কাঁধ ছুঁয়ে ফেলতে পারে; সামান্য হাওয়া লাগলে যে আত্রেয়ীর শাড়ির আঁচল ফুরফুর করে নিখিলের চোখে-মুখে লুটিয়ে পড়তে পারে।

নিখিল বলে— বেশ জায়গা।

নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী। কী যেন বলতে চায় আত্রেয়ী। নিখিল বলে— কিছু বলছেন ?

আত্রেয়ী— আপনি বলুন।

—আমি আবার আসব।

—দু'দিনের জন্য ?

—হ্যাঁ।

—আসবেন আর চলে যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কোনও খবর পাচ্ছি না।

—কার খবর ? হেমন্তবাবুর ?

—হ্যাঁ। কঠিন অসুখের একটা খবর এল, তার পর আর কোনও খবরই নেই।

—এ তো সত্যিই একটা অদ্ভুত কথা বলছেন; এর মানে কী ?

—বুঝতে পারছি না।

—আমিও বুঝতে পারছি না। কিন্তু সত্যিই এমন যদি হয় যে...।

কথাটা হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে কি-যেন ভেবে নেয় নিখিল। তারপর যেন সত্যিই একটা নতুন গ্রহলোকের জীবনের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে দেয়— চিন্তা করবেন না। আপনাকে একেবারে একা হয়ে পড়ে থাকতে হবে না। আমি মাঝে মাঝে আসব।

আত্রেয়ী— আমি এখন যাই।

নিখিল— আসুন। কিন্তু কাল আর আসবেন না। আমি কাল সকালের ট্রেনেই আগ্রা চলে যাব।

আত্রেয়ী— আবার কবে আসবেন ?

নিখিল— মনে হচ্ছে মাস পাঁচ-ছয় পরে একবার আসতে পারব।

॥ ২১ ॥

আজ সকাল থেকে চন্দ্রবাবুর হাঁকডাক বেশ মাত্রাছাড়া রকমের একটা আহ্লাদের চিৎকার হয়ে সরিয়াডির সড়কে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে। —কী ব্যাপার ? এর মানেটা কী ?

মোষের শিঙের লাঠিটাও বড় বেশি দুলছে। এটাও যেন একটা ঠাট্টার লগুড়। অদ্ভুত এক মেজাজ নিয়ে হেঁটে চলেছেন চন্দ্রবাবু। রাস্তার পাশের ডাস্টবিনের গায়ে বেশ জোরে একটা লাঠির খোঁচা হেনে দিয়েই এগিয়ে যান ; মাথা হেঁট করে হেলে পড়ে আছে যে ল্যাম্পপোস্ট, তারও গায়ে লাঠিটাকে একবার ঠুকে দিয়ে আবার চলতে শুরু করেন। —কী ব্যাপার হে দিবাকর ? এত কড়া রোদ্দুরের মধ্যে হঠাৎ দু ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল কেন ?

উত্তর দেয় না দিবাকর। চুপ করে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আর মাথা ঝুঁকিয়ে একমনে সাইকেলটার ধুলো মুছতে থাকে।

আজ বোধ হয় সব বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আর হাঁক দিয়ে সকলকেই উত্যক্ত করবেন চন্দ্রবাবু। ভাল সুযোগ পেয়েছেন চন্দ্রবাবু। আজ রবিবার, সকলেই বাড়ি আছে।

চন্দ্রবাবুর গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েই খোলা জানালার একটা পাট আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিলেন গোষ্ঠবাবু। হাবুলবাবু গেটের কাছ থেকে সরে গিয়ে একেবারে বাড়ির পিছনে বেগুন ক্ষেতের কাছে ঘুরঘুর করতে থাকেন। চন্দ্রবাবুর এই হাঁকডাকের শব্দটা শুনতে একটুও ভাল লাগে না। সহ্য করতেও ইচ্ছে করে না।

—কী ব্যাপার জয়ন্ত ? কাছারিপাড়ার নতুন কুঁয়োর জলে কেরোসিনের গন্ধ কেন ?

চন্দ্রবাবুর কথার জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন জয়ন্তবাবু। আজ সামান্য একটা কথা বলতে গিয়ে কত বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে হাসছেন চন্দ্রবাবু।

রজনীধামের কাছে সড়কের উপরে সামন্তবাবুকে যেন পথরোধ করে থামিয়ে রাখলেন চন্দ্রবাবু। —তোমাদের এত লজ্জা কিসের, সামন্তবাবু ?

সামন্তবাবু মিটমিট করে তাকিয়ে কথা বলেন— কিসের লজ্জাটা দেখলেন ?

—এই যে, আমাকে দেখেই পাশের রাস্তায় সরে পড়বার চেষ্টা করছিলে।

—না না, সরে পড়বার চেষ্টা করব কেন ? বলতে বলতে চন্দ্রবাবুর পাশ কাটিয়ে ব্যস্তভাবে সরে পড়েন সামন্তবাবু।

কে জানে কোথা থেকে আর কেমন করে কী-কথা শুনেছেন চন্দ্রবাবু, যে জন্যে আজ সরিয়াডির মানুষগুলিকে এভাবে ঠাট্টা করে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেন তিরছি নদীর পানি এইবার সরিয়াডির যত স্থায়িতার বড়াই ভাসিয়ে দেবার চমৎকার সুযোগ পেয়ে হাসছে। — ওরে, ও বলাই, একবার এদিকে এসে একটা কথা শুনে যা।

বাড়ির বারান্দার সিঁড়ি থেকে নেমে আসে বলাই ; রাস্তায় এসে চন্দ্রবাবুর চোখের সামনে একেবারে শান্ত-নীরব একটি মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চন্দ্রবাবু হে হে করে হাসতে থাকেন— তোরা নাকি সবাই নো-চেঞ্জার ?

বলাই— জানি না।

চন্দ্রবাবু— বল না ? বলতে লজ্জা করছিস কেন ?

বলাই— আঃ, আপনি মিছিমিছি কেন কথা বাড়াচ্ছেন, চন্দ্রকাকা ?

চন্দ্রবাবু— রাগ করলেও নিশ্চয় মনে মনে স্বীকার করছিস যে, এই চন্দরবুড়োই সব চেয়ে চালাক।

বলাই— কিসের চালাক আপনি ?

চন্দ্রবাবু— আমি থিয়েটার দেখি, তোরা থিয়েটার করিস। বুঝলি ?

চন্দ্রবাবুর চোখ দুটো কি সত্যিই দেখতে পেয়েছে যে, এই সাতদিন ধরে সরিয়াডির আত্মাটা ভিখিরীর মত হিসেব করছে ?

চিনু শুধু বলেছিল— আত্রেয়ীদির গতি হতে পারে, দাদু।

—কী বললি ?

—পিসিমা বলছিলেন, কটেজের নিখিলবাবুর সঙ্গে আত্রেয়ীদির কথা হয়েছে।

চমকে উঠে, চোখ বড় করে আর চেঁচিয়ে হেসে উঠেছিলেন চন্দ্রবাবু— অ্যাঁ ? তা হলে ? তোদের আত্রেয়ীদির হাতের সেই চিঠিটা কোথায় উড়ে চলে গেল রে চিনু ?

প্রদোষ সরকারের বাড়ির সামনের পথে এসেই চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নিলেন, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী। কিন্তু রাস্তার উপর হাজরাবাবুকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু।— আর ধরাধরি করো না, ধরতে চেষ্টা করো না হাজরা। আর লজ্জা বাড়িও না। তোমাদের প্রদোষদার মেয়েকে একটু বুঝিয়ে দাও, সব খালি করে দিয়ে হাল্‌কা হয়ে যাওয়াই ভাল ; আমি যেমনটি ভাল আছি।

রোদে ঘেমে উঠেছেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু কোনও হুঁস নেই। ক্লান্তিও নেই। কোন সকালে বের হয়েছেন, কিন্তু কিছু খেয়ে বের হয়েছেন কিনা সন্দেহ। আগে তবু একটু গুড় চিবিয়ে আর জল খেয়ে বের হতেন। কিন্তু সে অভ্যাসটাকেও বোধ হয় ধরে রাখেননি। ঘরে চুরি হয়ে যাবার পর থেকে ঘরটাকে আরও শূন্য করে দিয়েছেন। ঘরের দরজাও খোলা রেখেই বের হয়ে পড়েন। একেবারে খালি হয়ে যাওয়া আর একলা পড়ে থাকা জীবনের গর্বটাকে আজ যেন রোদের তাপে আরও তাতিয়ে নিয়ে হনহন করে চলে যান চন্দ্রবাবু।

কিন্তু বাড়ির কাছে এসেই রাস্তার একটা নিমের ছায়াতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন চন্দ্রবাবু। চমকে উঠেছে চন্দ্রবাবুর চোখ। কে ওরা ?

চন্দ্রবাবুর দরজা-খোলা বাড়ির বারান্দাতে টিনের একটা তোরঙ্গ, তার উপর কাপড়ের একটা পুঁটলি। সাদা থান-পরা এক নারীর মূর্তি দরজার কাছে মেঝের উপর চুপ করে বসে আছে ; মাথার কাপড় টেনে নামিয়ে দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে। আর, লাল শালুর জামা পরানো একটা শিশু হামা দিয়ে মেঝের এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করে যেন খুশি বিড়াল-ছানার মত খেলছে।

এগিয়ে এসে বারান্দায় উঠলেন চন্দ্রবাবু। বাচ্চাটা চন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলতেই দেখতে পেলেন চন্দ্রবাবু, বাচ্চাটার দাঁত নেই।

—এটা কে রে ? দাঁত নেই কেন রে ? কোত্থেকে এল রে এটা ? একটা ভয়াতুর চিৎকার চন্দ্রবাবুর বুকের ভিতর থেকে ফেটে বের হতে গিয়ে যেন তাঁর শুকনো শরীরের সব পাঁজর গুঁড়ো করে দিয়েছে।

হাজরাবাবু এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন বলেই সবার আগে তিনিই চন্দ্রবাবুর এই চিৎকারের শব্দ শুনতে পেলেন ; সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন— কী হয়েছে চন্দরদা ?

কাঁপছেন চন্দ্রবাবু। —দেখো তো ভাই হাজরা, এরা কারা এখানে বসে আছে।

বিধবা তরুণী খুব মৃদুস্বরে আর ফুঁপিয়ে কি-যেন বলছে। হাজরাবাবু কাছে এগিয়ে এসে, মাথা ঝুঁকিয়ে আর কান পেতে শুনতে চেষ্টা করেন।

চমকে চেঁচিয়ে ওঠেন হাজরাবাবু। —চন্দরদা। আপনার ছেলের বউ আর নাতি। কলকাতা

থেকে এসেছে।

চন্দ্রবাবুর হাতের মোষের শিঙের লাঠিটা হাত থেকে আলগা হয়ে পড়ে যায়। দু'চোখ বন্ধ করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন চন্দ্রবাবু। বুকটা শুধু অদ্ভুতভাবে ধুঁকতে থাকে।

বিধবা তরুণী উঠে এসে চন্দ্রবাবুর ধুলোমাখা পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। সেই সঙ্গে যেন একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আস্তে আস্তে কথা বলে— তিন মাস হল আপনার ছেলে চলে গিয়েছে। এখন আপনি যদি ঠাঁই না দেন তবে আপনিই বলে দিন, কোথায় যাব ?

যে ছেলের নামটা মনে পড়ে না ; যে ছেলে চল্লিশ বছর আগের একটা গল্পের ছেলে মাত্র, তারই বিধবা বউ আর ছেলে চন্দ্রবাবুর জীবনের খালি ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়েছে। চল্লিশ বছর পরে আবার ড্রপসিন উঠল ; কিন্তু এ কী চমৎকার হেঁয়ালির থিয়েটার ! দাঁত নেই সেই বাচ্চাটা হামা দিয়ে ঘুরছে আর হাসছে।

বাচ্চাটা তরতর করে হামা দিয়ে এগিয়ে আসে আর চন্দ্রবাবুর হাঁটু-ধরে উঠে দাঁড়ায়।

হাজরাবাবু ডাকেন— চন্দরদা।

চন্দ্রবাবু— বলো।

হাজরাবাবু— নাতি যে কোলে উঠতে চাইছে।

কেঁদে ফেললেন চন্দ্রবাবু। বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন— এটার নামটা কী গো বউমা ?

—ভুলু।

—তোমার নামটা কী ?

—পারুল।

—ঘরের ভেতরে যাও।

তোরঙ্গ আর পুঁটলিটাকে হাতে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় চন্দ্রবাবুর পুত্রবধূ পারুল !

চন্দ্রবাবু— একটা কথা ছিল, হাজরা।

হাজরাবাবু— বলুন।

বাচ্চাটা চন্দ্রবাবুর কোল থেকে নেমে পড়বার.জন্যে উসখুস করছে। বাচ্চাটাকে তাই বেশ একটু শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন চন্দ্রবাবু। —আত্রেয়ীকে একটা কথা বলে দিও ; পাগলা জ্যাঠামশাইয়ের বাজে কথার কোনও মানে হয় না। যেন কিছু মনে না করে।

একে একে অনেকেই আসছেন। চন্দ্রবাবুর খালি ঘরের দরজার কাছে একটা বিস্ময়ের আবির্ভাবের খবর এরই মধ্যে অনেকেই শুনতে পেয়ে গেছে নিশ্চয়। ছুটে এসেছে চিনু ; তারপরেই এলেন চিনুর পিসিমা। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সন্তুর মা'ও ব্যস্তভাবে আসছেন, আগে আগে সন্তু। সবারই মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন। যেন চন্দ্রবাবুর জীবনের যত শূন্যতার বড়াই এভাবে জব্দ হয়ে বেশ খুশির হাসিই হাসছে।

হাজরাবাবু হেসে ফেলেন— আমি এখন যাই, চন্দরদা।

দুপুর থেকে বিকেল, তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত সরিয়াডিও যেন হাসতে থাকে। বড় জব্দ হয়ে গিয়েছেন চন্দ্রবাবু। ভালই হল। চন্দরদা আর হাঁকডাক করে সরিয়াডির যত ঘর-সংসারকে ঠাট্টা করে বেড়াতে পারবেন না। গোষ্ঠবাবু হাসেন— এবার আর বোধ হয় মোষের শিঙের লাঠি দুলিয়ে রোজ ভোরে বেড়াতে বের হবেন না চন্দরদা।

হাবুলবাবু হাসেন— কী করবেন তা হলে ? ঘরে বসে ঘুমপাড়ানি গান গাইবেন ?

দিবাকর হাসে— নাতির দুধের জন্যে ঘটি হাতে নিয়ে বের হবেন।

আত্রেয়ীও শুনতে পেয়ে হেসে ফেলছে— জ্যাঠামশাইকে আপনি তখুনি বলে দিলে ভাল করতেন, হাজরাকাকা। আমি একটুও রাগ করিনি।

রাত্রি আটটা কুড়ির এক্সপ্রেসে বলাইয়ের এক সন্ন্যাসী মামাকে তুলে দিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে হাসতে থাকে বলাই আর নরেন।

বলাই— মামা তো সন্ন্যাসী, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও আশ্রমে টিকতে পারলেন না।

নরেন— তা হলে কি এখন হিমালয়ের গুহা-টুহাতে... ।

বলাই— আরে ধেৎ, সন্ন্যেসী মামা এখন গয়াতে লক্ষ্মী মাসিমার বাড়িতে চললেন ।

নরেন— তারপর ?

বলাই— তারপর নাকি পুরীতে গিয়ে বীরেন কাকার বাড়িতে কিছুদিন থাকবেন। তারপর কলকাতাতে পুঁটিদির বাড়িতে ।

বলাই আর নরেন একসঙ্গে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চেপে সাইকেলের স্পিড থামিয়ে দেয়। দু'জনেরই চোখে পড়েছে, চকের বাজারে জানকীলালের মুদিখানার বেঞ্চের উপর চুপ করে বসে আছেন চন্দ্রবাবু ।

নরেন মুখ টিপে হাসে আর ডাক দেয়— এখানে কী করছেন চন্দরকাকা ?

চন্দ্রবাবু— জানকীলালের এখানে কাঁচামুগ নেই ।

বলাই হাসে— ভবানীর দোকানে পাবেন ।

চলে গেল বলাই আর নরেন। দু'জনেরই সাইকেলের ঘন্টির শব্দ টুং-টাং করে খুশির হাসি বাজিয়ে কালীবাড়ি রোডের অন্ধকারও পার হয়ে যায়। কিন্তু প্রদোষ সরকারের বাড়ির কাছে এসেই দু'জনেই একসঙ্গে চমকে ওঠে। সাইকেলের ঘন্টি হাত দিয়ে চেপে ধরে শব্দের ঝংকারকে একেবারে বোবা করে দেয়। ব্রেক দাবিয়ে সাইকেল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে বলাই আর নরেন, দুটি শঙ্কিত মূর্তি। নরেনের গলার স্বর কেঁপে ওঠে। —আত্রেয়ীদি কাঁদছে কেন ?

প্রদোষ সরকারের সব বাড়ির ঘরেই আলো শুধু একটি ঘরের বন্ধ জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ যেন গলে গলে ঝরে পড়ছে।

বলাই বলে-- এ তো বেশ সাংঘাতিক কান্না বলে মনে হচ্ছে। ভয়ানক খবরটা এসে গেছে বোধহয় ।

নরেন বলে— দিবাকরদাকে এখুনি খবর দিই বলাইদা ।

শুধু দিবাকর নয়, অনেকেই, প্রায় সকলেই শুনতে পেল, আত্রেয়ী কাঁদছে। পাঁচ বছর আগে একবার, আর এই একবার ; আত্রেয়ীর কান্নার শব্দ সরিয়াডির বাতাসে দু'বার ঝরে পড়লো। সেবার ছিল হেমন্তর কয়েদের খবর, আর এবার হল হেমন্তর চরম ছাড়া পাওয়ার খবর ।

দিবাকরের বাড়ির গেটের কাছে রাস্তার উপর ছোট একটা ভিড়। হাবুলবাবু বলেন— চলুন, একবার একটু দেখা দিয়ে চলে আসি, গোষ্ঠদা ।

জয়ন্তবাবু বলেন— আপনারা যান, আমি একটু পরেই যাচ্ছি ।

দিবাকর বলে— আমার যেতে ইচ্ছে করছে না, শান্তি। এখন আর আমার যাওয়ার কোনও মানে হয় না। এখন তুমি একবার... ।

চোখ মুছে নিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে শান্তি। —না। অসম্ভব। আমি পারব না, আমি পারি না। কারও শাঁখা ভাঙবার নিয়ম আমি জানি না ।

মুখ ফিরিয়ে, মাথা হেঁট করে আর একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে শান্তি ।

কে জানে কার উপর রাগ করে দিবাকরও চেঁচিয়ে ওঠে। —না, আমিও যাব না ।

ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দার উপরে শুধু ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় দিবাকর। বিনাদোষে মার খেয়ে একটা ভাগ্য লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে, এ দৃশ্য দেখে দিবাকরের অবুঝ আত্মাটা শুধু নিজের রাগের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলবে। দেখে দরকার কী ?

কিন্তু এ কী ? আধ ঘণ্টাও তো পার হয়নি ; দিবাকরের বাড়ির গেট খুলে ছায়ার মত এত চেহারা, যেন চোরের মত চুপি চুপি কোনও শব্দ না করে এগিয়ে আসছে কেন ? আবার এখানে এসে ভিড় করবার কী দরকার ?

এসেছেন গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু। তাঁদের পিছনে জয়ন্তবাবু। হাজরাবাবুও হাজির হলেন। বলাই আর নরেনও এসে পড়ে।

সত্যিই যে চোরের মত চাপা-গলায় ফিস-ফিস করে কথা বলেন গোষ্ঠবাবু। আবার ঢোক গিলে যেন একটা লজ্জার অস্বস্তি গিলে ফেলতে চাইছেন। —এবার শান্তিকে সঙ্গে নিয়ে তুমিই একবার

যাও, দিবাকর।

দিবাকর— কেন ?

হাবুলবাবু মিনমিন করে কথা বলেন— কথাটা হল...তার মানে... কোনও খবর-টবর নয়, আত্রেয়ীর স্বামী হেমন্ত নিজেই এসেছে।

সামন্তবাবু— বেশ ছেলে হেমন্ত, কত শান্ত হয়ে বাইরের ঘরে একা বসে আছে আর হাসছে। কিন্তু আত্রেয়ী এ কী কাণ্ড শুরু করেছে ? আত্রেয়ীর এত কান্নাকাটি করা যে খুবই বিশ্রী একটা অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে, নয় কি ?

গোষ্ঠবাবু— কথাটা হল, আত্রেয়ী এরকম কান্নাকাটি করলে ওর স্বামী কিছু একটা মনে করে ফেলতে পারে তো।

জয়ন্তবাবু— বউমাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি একবার যাও, দিবাকর। এখন তোমরা ছাড়া...।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে শান্তি। যেন একটা উতলা উৎসাহের মূর্তি। মাথার কাপড় টানতেও ভুলে গিয়েছে শান্তি এতক্ষণে যেন কাজের মত একটা কাজের ডাক শুনতে পেয়ে সরিয়াডির শান্তি বউদির প্রাণের আবার একটা দুর্বার মতলবের জোর হঠাৎ ঝড়ের হাওয়ার মত জেগে উঠেছে।

দিবাকরের দিকে তাকিয়ে শান্তি বলে— তুমি বাড়িতে থাকো। আমিই যাচ্ছি।

দেখে খুশি হয় শান্তি, প্রদোষ সরকারের এই বাড়ির সব ঘরের আলো আজ একটু উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। দরজা খোলা, জানালা খোলা। বাইরের বাতাসের ব্যাকুলতাও তাই অবাধে ঘরের ভিতরে ঢুকেছে। যত অচলতার ভার শুকনো পাতার স্তূপের মত সে বাতাসের একটা আবেগের আঘাত পেয়ে নড়ে সরে আর গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে অনেক কাজ করে ফেলেছেন কাকিমা। হেমন্তবাবুর খাওয়া হয়ে গিয়েছে, আত্রেয়ীর ঘরটা বেশ গোছানো ও পরিচ্ছন্ন। আত্রেয়ীর ঘরের বড় খাটে নতুন করে একটা বড় বিছানাও পাতা হয়ে গিয়েছে। সেই বিছানার উপর চুপ করে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন এক ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের কপালের একপাশে একটা পুরনো আঘাতের দাগ। কিন্তু কপাল জুড়ে একটা টানা মসৃণতা, কোথাও একটু খাঁজভাঁজ নেই। ঘন কালো চোখের পাতাগুলিও বেশ ভারি ভারি। কঠিন অসুখে ভোগা শরীরটাকেও তো বেশ শক্ত-পোক্ত বলে মনে হয় কিন্তু মুখের ছাঁদের মধ্যে যেন একটা ছেলেমানুষি দুরন্তপনা লুকিয়ে আছে।

ঘরের দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে হেমন্তর মুখটাকে যেন একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয় শান্তি। আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, দাঙ্গা-ফৌজদারির হল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই মানুষেরই ওই শান্ত কালো চোখ থেকে আগুন ছুটে বের হয় কেমন করে ? রাধাপুরের সাংঘাতিক সাত আনির এ কেমন অসাংঘাতিক চেহারা ! ওই চোখ দেখে আত্রেয়ীর তো ভয় পাওয়ার মত কিছুই নেই।

কিন্তু আত্রেয়ীর কান্নার শব্দ এখনও থামেনি। মনে হচ্ছে, কান্নাটা এখন ভিতরের বারান্দার এক কোণে বসে গুনগুন করছে।

এগিয়ে যেয়ে, আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে, আর আত্রেয়ীর একটা হাত শক্ত করে ধরে নিয়েই বুঝতে পারে শান্তি, এই কান্নার সঙ্গে লড়াই করা যেমন-তেমন ব্যাপার নয়।

শখের কান্না, কিংবা রাগের কান্না হলে এখনই থামিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু আত্রেয়ী যেন ওর বুকের ভিতরে একটা সাধের খেলাঘরের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। মাঝে মাঝে দীপ জ্বেলে হেসে ওঠে সেই ক্ষণকালের খেলাঘর ; তারই দরজা বন্ধ করে দেবার জন্য চিরকালের অনুমতি নিয়ে একজন দাবির মানুষ এসে গিয়েছে।

শান্তি বলে— এরকম একটা ঘটা করে কাঁদবার কী মানে হয়, আত্রেয়ী ?

চমকে ওঠে আত্রেয়ী ; শান্তি বউদির মুখের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর ভেজা চোখ দুটোও আশ্চর্য হয়ে যায়। শান্তি বউদির চোখে এমন ভ্রূকুটি কোনওদিন দেখেনি আত্রেয়ী ; এ ধরনের তীব্র স্নেহের আঘাত দিয়ে কোনওদিনও কথা বলেনি শান্তি বউদি।

আত্রেয়ীর কান্নার চাপা-গুঞ্জন বন্ধ হয়ে যায়। শান্তি বলে— কাঁদতে হলে এরকম একটা শোকের

সোর না তুলেও চুপ করে কাঁদতে পারতে। কান্নাটাকে হেমন্তবাবুর কানে শুনিয়ে দেবার দরকার ছিল না।

আত্রেয়ী— তুমি মিথ্যে আমাকে সন্দেহ করবে না, বউদি।

শান্তি— না করে উপায় কী ? হেমন্তবাবু আসাতে তুমি যে খুশি হওনি, সে কথাটাই তুমি তোমার এই বিশ্রী কান্না কেঁদে হেমন্তবাবুকে জানিয়ে দিলে।

আত্রেয়ীর চোখ দুটো হঠাৎ যেন একটা জ্বালার ছোঁয়া লেগে শুকনো হয়ে যায়।

—খুশি হবার সাধ্যি আমার নেই।

শান্তি— তা হলে আর বলছ কেন, আমি মিথ্যা সন্দেহ করছি ?

আত্রেয়ী— বেশ তো আর বলব না।

শান্তি— আমিও তোমাকে বলব না যে, খুশি হও।

আবার আশ্চর্য হয়ে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী— তবে তুমি আর কী বলতে চাও ?

—আমি বলছি, তুমি যা নিয়ে খুশি হয়ে আছ, তাই নিয়ে খুশি হয়ে থাকো। হেমন্তবাবুর সঙ্গে অন্তত একটু ভদ্রতা করো।

—কী করতে হবে ?

—হেমন্তবাবুর কাছে গিয়ে কথা বলো।

—অসম্ভব।

—কী বললে ?

—যদি বলি তবে কাল সকালে বলব।

—এখন বলতে কী অসুবিধে আছে ?

—আমি ও-ঘরে যেতে পারব না।

—কেন ?

—ভয় করে।

—চিঠি দিতে তো ভয় করেনি।

—চিঠি এখনও আমি দিতে পারি।

—এ ভদ্রলোক তোমার কাছে তা হলে শুধু চিঠির মানুষ ? আর কিছু নয় ?

উত্তর দেয় না আত্রেয়ী। যেন ইচ্ছে করে বধির হয়ে গিয়ে শান্তি বউদির এই কঠিন প্রশ্নের রূঢ় বিদ্রূপটাকে তুচ্ছ করতে আর অবিচল অনিচ্ছার একটি পাথর হয়ে বসে থাকতে চায় আত্রেয়ী।

শান্তি— বেশ তো চিঠির মানুষের সঙ্গেই না হয় মিথ্যে করে দু-একটা কথা বললে !

আত্রেয়ী— ও ঘরে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

শান্তি— না হয় মিথ্যে করেই একবার গেলে।

আত্রেয়ী— থিয়েটার করতে বলছ ?

শান্তি— হ্যাঁ। সবাই তো থিয়েটার করে ; তুমিও কিছু কম করনি। তবে আজও এখন একটু থিয়েটারই না হয় করলে।

আত্রেয়ীর হাত ধরে টান দেয় শান্তি— ওঠো আত্রেয়ী। শুধু একটু মুখের ভদ্রতা রক্ষা করতে হবে, এই মাত্র। সবই তো বুঝি, তবু বলছি, একবার যাও। দু-একটা ভদ্রতার কথা হেসে হেসে বলতে হবে। এটুকুও করতে পারবে না কেন ? নিশ্চয় পারবে।

উঠে দাঁড়ায় আত্রেয়ী। শান্তির গলার স্বর আরও নিবিড় হয়ে আরও একটা সান্ত্বনা দিয়ে আত্রেয়ীকে আরও নির্ভর করে দেয়।

—বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করা হবে না ; তোমার যখনই ইচ্ছে হয় চলে আসতে পারবে।

হেমন্তর ঘরের দরজার একটা কপাট ফাঁক করে আত্রেয়ীর কুণ্ঠিত মূর্তিটাকে ভিতরে ঠেলে দিয়েই কপাট ভেজিয়ে দেয় শান্তি।

শান্তির দু'চোখে এইবার অদ্ভুত একটা হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে। এটাও

নিশ্চয় একটা সফল মতলবের হাসি। কিন্তু একটা কঠোর ঠাট্টার হাসিও বটে। বেশ তো, এখন শুধু এই রাতটুকু একটা মিথ্যেরই ঘরে বন্দিনী হয়ে পড়ে থাকুক আত্রেয়ী।

শান্তি বলে— বেশ রাত হয়েছে, কাকিমা, আমি এবার যাই। রামুয়াকে ডেকে দিন, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসুক।

॥ ২২ ॥

খবরের কাগজটাকে বিছানার উপরে রেখে দিয়ে আত্রেয়ীর দিকে তাকায় হেমন্ত।

দরজার ভেজানো কপাটের কাছে দেয়ালটাকে এক হাতে ছুঁয়ে আর মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী।

হেমন্তের চোখ দুটো যেন পাঁচ বছরের যত উপোসি আশার চোখ; একটা নতুন বিস্ময়ে ভরে গিয়ে দেখছে আর শান্ত হয়ে হাসছে, সেই বাসর-ঘরের বাতিটাই বুঝি।

আবার নতুন করে জ্বলে উঠেছে। সেদিনও তো ঠিক, এইরকমই লাজুক রঙিন ছবি মুখ ফিরিয়ে ঠিক এইরকমই একটি ভীরু ভীরু ভঙ্গি নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

কিছুই তো বদলে গিয়েছে বলে মনে হয় না। আত্রেয়ীর হাতের আঙুলে সেই আংটিটাই তো আছে; সোনার চৌখুপির মধ্যে একটা লালমণি। হ্যাঁ, সেই ঢিলে খোঁপাটা বেশি ভারি আর সেই ভুরু দুটো বেশি কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা তো বদলে যাওয়া নয়। সেই ছবিরই রং আরও নিবিড় হয়েছে, ভবে গিয়েছে। গলার খাঁজটা আরও গভীর হয়ে গিয়েছে। হয়ে যাবেই তো; পাঁচটা বছর তো কম নয়।

হেমন্ত ডাকে— এসো।

কিন্তু এগিয়ে যায় না, চোখ তুলে তাকায়ও না আত্রেয়ী। দরজার পাশের দেয়ালের গায়ে হাত রেখে আর মাথা ঝুঁকিয়ে অনড় পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হেমন্ত হাসে— একবার তাকিয়ে দেখো, আমি সত্যিই তোমার চেনামানুষ, না অন্য কেউ?

চোখ না তুলেই কথা বলে আত্রেয়ী। —আপনি এতদিন কোনও খবর দেননি কেন? হেমন্তর চোখের শান্ত হাসিব সব আশার উপর কে যেন ছাই ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু জবাব দিতে একটুও দেরি করে না হেমন্ত। — আপনি এতদিন খবর নেননি কেন?

চমকে ওঠে আত্রেয়ী। কোনও মেঘের ছায়ার ভাষা নয়; বেশ একটা কড়া রোদের ঝাঁজ কথা বলছে। চোখ তুলে হেমন্তের মুখের দিকে তাকায়। আত্রেয়ীরও চোখ দুটো শুকনো রুক্ষ চাপাভ্রূকুটির চোখ।

চোখে পড়েছে আত্রেয়ীর; ভদ্রলোকের কপালের পাশের সেই পুরনো আঘাতের দাগটা; ওটা নাকি ডাকাতের লাঠির দাগ। মনে হচ্ছে, সাত-আনির দুর্দান্ত মেজাজ নিয়ে শিউরে উঠেছে দাগটা।

আত্রেয়ী— আমার যতটা সাধ্যি খবর দিয়েছি।

হেমন্ত— আমিও আমার যতটা সাধ্যি খবর নিয়েছি।

আত্রেয়ী— আমার আর কিছু বলবার নেই।

হেমন্ত— আমারও আর কিছু বলবার থাকতে পারে না।

আত্রেয়ী— আপনি এত বিরক্ত হয়ে কথা বলছেন কেন?

হেমন্ত— আপনিই বা এত বিরক্ত হয়ে জবাব দিচ্ছেন কেন?

আত্রেয়ী— আমি এখনই যাই।

হেমন্ত— হ্যাঁ, আমিও যাচ্ছি।

আত্রেয়ীর চোখের চাহনির সব রুক্ষতা আরও রূঢ় হয়ে কেঁপে ওঠে— কোথায় যাবেন?

হেমন্ত হাসে— আপনার পিছু পিছু যাব না। সোজা স্টেশনেই যাব।

আত্রেয়ী— তা হলে কাকিমাকে ডেকে দিই; কাকিমাকে বলে যান।

হেমন্ত—কোনও দরকার নেই। আপনাকে বলে যাচ্ছি, এই যথেষ্ট।

বিছানা থেকে নেমে পড়ে হেমন্ত। টেবিল থেকে হাত-ঘড়িটা তুলে নিয়ে হাতে পরতে থাকে। আলনা থেকে কামিজটাকে তুলে নিয়ে কাঁধের উপর রাখে।

একেবারে নতুন কোনও দৃশ্য নয়। আত্রেয়ীর চোখ দুটো এবার বেশ অপলক হয়ে যেন পাঁচ বছর আগেরই একটা ঘটনার ছবি দেখতে থাকে। ঠিক এভাবেই কাঁধের উপর একটা কামিজ ফেলে দিয়ে আর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল একটি মানুষ। এই বিছানাটারই মত মিথ্যে হয়ে গিয়ে একটা ফুলশয্যা তখন সে-ঘরের ভিতরেও পড়ে ছিল।

আত্রেয়ী বলে— এটা কিন্তু একটুও ভাল দেখাচ্ছে না।

হেমন্ত— খারাপই বা কি দেখাচ্ছে, তা তো বুঝতে পারছি না।

—খুব খারাপ দেখাচ্ছে।

—হতে পারে।

জুতো পায়ে দিয়ে ফেলেছে হেমন্ত। এইবার বাইরের বারান্দায় যাবার দরজাটার দিকে এগিয়ে যায়।

আত্রেয়ী— বাক্সটা পড়ে রইল।

হেমন্ত— পড়ে থাকুক ; ওটা এবাড়ির চাকরের বকসিস।

—যাবেন না।

—হুকুম করবেন না।

এগিয়ে যেয়ে আর হাত তুলে বন্ধ দরজাটাকে চেপে ধরে আত্রেয়ী— হুকুম করছি না। একটু বুঝতে বলছি।

হেমন্ত— কী বুঝবার আর বাকি আছে ?

আত্রেয়ী— আমি তোমাকে চলে যেতে বলিনি।

হেমন্ত— তা বলনি ; কিন্তু তুমিই বা চলে যেতে চাইলে কেন ?

—ভয় করছিল।

- -কিসের ভয় ?

—তুমি বুঝবে না।

—তুমি বুঝেছ তো ?

—না ; বুঝতে পারলে তোমাকে বলেই দিতাম।

—বুঝে কাজ নেই, বলেও কাজ নেই।

—কিন্তু এখনও তো আমার কথাটার জবাব দিতে পারলে না।

—কী কথা ?

—চিঠি দিলে না কেন ? আমার চিঠি কি পাওনি ?

—পেয়েছি।

—তবে ? উত্তর দাওনি কেন ?

—ইচ্ছে করেই দিইনি।

—এমন ইচ্ছের মানে কী ?

—আমার অসুখের খবর পেয়েও আমাকে একটা চিঠি দিতে যার দু' মাস সময় লাগে, তাকে আরও চিঠি দিয়ে বিরক্ত করবার কোনও মানে হয় না।

—কিন্তু এসেই তো বেশ বিরক্ত করতে পারছ ?

—তুমি বিরক্ত হচ্ছ ; আমি তোমাকে বিরক্ত করিনি।

—যেখানে একটা চিঠি দেবারও ইচ্ছে হল না, সেখানে নিজেই হঠাৎ চলে এলে কেন ?

—হ্যাঁ, ইচ্ছে ছিল হঠাৎ এসেই দেখে নেব, জেনে আর বুঝে নেব ; দু' মাসের মধ্যেও একটি চিঠি দেওয়া কেন তোমার সাধ্যি হয়নি।

—কী দেখলে, কী জানলে, কী বুঝলে ?

—আমাকে চিঠি দেবার ইচ্ছে ছিল না বলেই চিঠি দেওয়া তোমার সাধ্যি হয়নি।

—একটা মিথ্যে সন্দেহ।

—হতে পারে। কিন্তু তুমি তো বলে দিলেই পার কেন চিঠি দিতে পারনি ?

—জানি না।

—আরও দু'-একটা চিঠি দিয়ে জানতে চেষ্টা করলে না কেন যে, লোকটা বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে ?

—মনে হয়নি।

—এ কেমন মন ?

—তুমি বুঝবে না।

আত্রেয়ীর মাথাটা কেঁপে উঠেছে, রুক্ষ চোখের চাহনিটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। বেশ হাঁপাচ্ছেও আত্রেয়ী। এমন কঠোর একটা জিজ্ঞাসা কোনওদিন এসে আত্রেয়ীর আত্মাটারই কাছে কৈফিয়ত তলব করে বসবে, এটা যে কল্পনাও করতে পারেনি সরিয়াড়ির মেয়ে এই আত্রেয়ী। তাই প্রস্তুতও ছিল না ; তাই জবাব দিতে গিয়ে সব নিঃশ্বাসের শক্তি যেন শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

হেসে ওঠে হেমন্ত।—না, আর বলবার কিছু নেই। এরকম চমৎকার কথা বলে মুখ বন্ধ করে দিলে আর কিই-বা বলা যায় ?

আত্রেয়ী—আরও কিছু বলবার থাকে তো, বলে নিতে পারো।

হেমন্ত—তা হলে বলো ; আমি আসতেই তুমি এত কাঁদলে কেন ?

গম্ভীর মুখের প্রশ্ন নয়, বেশ শান্ত-শীতল হাসিমুখের প্রশ্ন। কিন্তু আত্রেয়ী যেন একটা নিরুত্তর স্তব্ধতা। কথা বলতেই পারছে না। আত্রেয়ীর প্রাণটা বোধ হয় একটা অন্ধকার হাতড়ে তন্ন তন্ন করে এমন একটা কথা খুঁজছে, যে কথা বলে দিলে বেশ স্পষ্ট করে বলা হয়েই যায় যে, ভুল করেছি কিন্তু ভুল করবার কোনও ইচ্ছে ছিল না।

হেমন্ত—তোমার যা ইচ্ছে হয় বলে দাও, আমি কিছুই মনে করব না।

আত্রেয়ী—কান্না এসে গেল। ইচ্ছে করে আর চেষ্টা করে তো কাঁদিনি।

হেমন্ত—বাস, এর পর আর কোনও কথা থাকতেই পারে না। হেমন্তর কথাগুলি যেন খুশির স্বরে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে থাকে।

একটু আশ্চর্য হলেও আত্রেয়ীর শ্রান্ত মনের এক কোণে ছোট্ট একটা সন্দেহ সির-সির করে। রাধাপুরের সাত-আনির মেজাজ এতক্ষণে যেন বিদ্রোহী মহালের এক প্রজার জেরা শেষ করে সেই খুশিতে হেসে উঠেছে। এ ছাড়া এমন হাসির আর কোনও মানে নেই। মায়ার মানুষের হাসি ওভাবে গুমরে ওঠে না।

চোখ তুলে হেমন্তর মুখের দিকে তাকায় আত্রেয়ী। দুটো অপলক কৌতূহলের শক্ত ঠাণ্ডা চোখ। যেন চরম জানা জেনে নিতে চায় আত্রেয়ী, কোথায় গেল পাঁচ বছরের আগের চেনা সেই মানুষটির চোখ আর মুখ ?

আত্রেয়ী—ঠাট্টা করলে বোধ হয় ?

হেমন্ত—না।

আত্রেয়ী—আমাকে শুধু তুচ্ছ করতেই এসেছ ?

হেমন্ত—না।

আত্রেয়ী—ঘেন্না করতে, অপমান করতে ?

হেমন্ত—না। বুকে জড়িয়ে ধরতে।

বাঃ, এ তো বেশ অদ্ভুত কথা। বলা নেই, কওয়া নেই, কোনও জানান না দিয়ে রাধাপুরের দীঘির কিনারার মাঠে সেই উৎসবের আতসবাজির শব্দটা হঠাৎ বেজে উঠেছে ; নীল-লাল রঙিন আলোর চমক জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে লুটিয়ে পড়তে চাইছে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে কথা বলে হেমন্ত ;—শুধু সামান্য একটা কথা বলে ফেললাম, তোমার ভয় করবার কিছু নেই। কিছু মনেও করো না।

আত্রেয়ী—কী বললে ? বুঝতে পারছি না। ভাল করে শুনতে পাইনি।

হেমন্ত—অনেক রাত হয়েছে ; তুমি এবার ভেতরে যাও।

আত্রেয়ী—তুমি ?

হেমন্ত—আমি এখন যাব না ; কাল সকালেই যাব।

দুঃসহ এক পরাজয়ের জ্বালা আত্রেয়ীর গলার স্বর যেন পুড়িয়ে দিয়ে জ্বলতে থাকে। —তোমার কিসের এত রাগ ? কী পাপ করেছি আমি ?

হেমন্ত—তুমি যত খুশি পাপতাপ করো, আমার রাগ করবার কোনও গরজ নেই। কিন্তু...

আত্রেয়ী—কী ?

হেমন্ত হঠাৎ উদাস আনমনার মত যেন একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে কথা বলে—আমি তোমাকে এসো বলে কাছে ডাকলাম, আর তুমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলে ?

এই সামান্য একটা কারণে এত বেশি রাগ ! হেমন্তর গলার স্বরে সত্যিই যে একটা ব্যথাভীরু ছেলেমানুষের অভিমান কথা বলছে। হেমন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে থাকে আত্রেয়ী, আর নিঃশ্বাসের মধ্যেও কেমন-যেন একটা স্বস্তি-ছাড়া যন্ত্রণা ছটফট করতে থাকে। চিনতে এত দেরি হল কেন ?

কাঁধের কামিজটাকে আলনার উপর ফেলে দিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে হেমন্ত। তার পর, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের একগাদা তারার ঝিকিমিকির দিকে তাকিয়ে আবার আনমনার মত কথা বলে—আমি তো আশা করেছিলাম, আমাকে দেখা মাত্র তুমি...।

আত্রেয়ী—কী ?

হেমন্ত—আশা করেছিলাম, তুমি ছুটে এসে আমার কাছে দাঁড়াবে আর হাসবে।

কে জানে কেমন আর কিসের জোরে এমন আশাকে স্বপ্নের গভীরে পুষে রেখেছিল হেমন্ত ? জানতে ইচ্ছা করে আত্রেয়ীর ; কিন্তু সব কৌতূহল যেন কাঁটায় ভরা একটা লজ্জার ভয় হয়ে আত্রেয়ীর মুখ চেপে ধরে রেখেছে। মুখ ফিরিয়ে টেবিলের আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী।

কিন্তু হেমন্ত যেন পাঁচ বছর ধরে বুকের ভিতরে জমা করে রাখা যত না-বলা কথা এক নিঃশ্বাসে বলে দিয়ে হালকা হতে চাইছে। —জেলের কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলে আমার মনে হত না। মোটা লাল চালের ভাত আর বুড়ো মুলোর ঘ্যাঁট, মোটা কাপড়ের জাঙিয়া আর খসখসে কম্বল ; ওসব গ্রাহ্যই করিনি। কিন্তু তোমার চিঠি সময় মত না পেলে দিনরাত্রি সব সময় ভয়ানক কষ্ট হত।

আত্রেয়ীর চোখ-মুখ হঠাৎ শিউরে ওঠে, সেই সঙ্গে মুখের প্রশ্নটাও। —কেন ? কী সন্দেহ করেছিলে তুমি ?

হেমন্ত—চিঠির দেরি হলেই সন্দেহ হত, তুমি বুঝি মরে গিয়েছ। তার ওপর, মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখে ফেলতাম, তুমি নেই। জেগে উঠেই কী মনে হত জান ?

—কী ?

—মনে হত, মেয়াদটা যাবজ্জীবন কালাপানি হয়ে গেলেই ভাল হত।

—আমিও একবার সন্দেহ করেছিলাম, তুমি বুঝি আর নেই। কিন্তু আমি তবু কাঁদিনি। বলতে বলতে মাথা হেঁট করে ফেলে, আর কেঁদে ফেলে আত্রেয়ী।

হেমন্ত বলে—অসুখের সময় আমিও মনে মনে বলতাম, যদি আমার কিছু হয়েও যায়, তবু আত্রেয়ী যেন না কাঁদে।

হেমন্তের চেয়ারের কাছে এগিয়ে এসে চেয়ারের কাঁধের উপর হাত রাখে আত্রেয়ী—ক্ষমা করো। কিছু মনে করো না। আমার খুবই ভুল হয়েছিল।

—ভুল ? তুমি আবার কী ভুল করবে ? কিসের ভুল ?

এবার আর চেয়ারের কাঁধের উপরে নয়, পাঁচ বছর আগের চেনা আর পাঁচ বছর ধরে অদেখা মানুষটারই কাঁধের উপর হাত রাখে আত্রেয়ী। —মনের ভুল।

আত্রেয়ীর হাত ধরে হেসে ফেলে হেমন্ত। —প্রাণের ভুল নয়ত ?

আত্রেয়ী—না।

হেমন্ত—তা হলে এবার আমার দিকে ভাল করে তাকাও।

আত্রেয়ী হাসে—তাকিয়েছি।

হেমন্ত—চিনতে পেরেছ ?

আত্রেয়ী—নিশ্চয়। ওই তো সেই কালো চোখ।

হেমন্ত—আমি তো অনেক আগেই দেখতে পেয়েছি—।

ছটফট করে ওঠে আত্রেয়ী। —থামো বলছি। ছাড়ো বলছি।

ভিতরের দিকের দরজার ভেজানো কপাটের দিকে চোখ তুলে শঙ্কিতের মত তাকিয়ে বিড়বিড় করে আত্রেয়ী। —শান্তি বউদিকে বিশ্বাস নেই।

হেমন্ত—তার মানে ?

আত্রেয়ী মুখে হাত দিয়ে আর চমকে চমকে হাসে। —শান্তি বউদি প্রতিজ্ঞা করেছে, উঁকি দিয়ে দেখবেই।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হেমন্ত বলে—রাত দুটো। এখন তোমার শান্তি বউদি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন।

আত্রেয়ী যে হেমন্তের একেবারে বুকের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ; তাই হেমন্তর মুখটাকে ভাল করে দেখতে গিয়ে চোখ দুটোকে ভাল করে তুলে ধরে তাকাতে হয়। এত ব্যাকুলভাবে তাকাতে গিয়ে মাথাটাকে পিছনে হেলিয়ে দিতে হয়। তাই ঢিলে খোঁপাটা হেলে পড়ে ভেঙেই যায়। আর মুখটাও ভাসতে থাকে।

ঘরে আলো জ্বলছে ; টেবিলের আয়নাটারও উপর কোনও ঢাকা নেই। হেমন্ত আর আত্রেয়ী দু'জনে এখন এই আয়নার দিকে তাকালেই দেখতে পেত, পাঁচ বছরের দুটো অপেক্ষার পিপাসা দুজনের মুখ কত রঙিন করে দিয়ে কত রকমের ছোঁয়ার স্বাদ আর তৃপ্তি নিয়ে কত লুটোপুটি করতে পারে।

হাঁপাচ্ছে আত্রেয়ী ; চোখ বুজে আছে, কিন্তু চোখের কোণে জল।

হেমন্ত—এ কী ?

আত্রেয়ী—জিজ্ঞেস করছ কেন ? মুছে দিলেই তো পার।

হাত দিয়ে আত্রেয়ীর চোখ মুছে দিয়েই হেমন্ত বলে—নাঃ, তুমি যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না যে, আমি তোমার কাছে এসে গিয়েছি।

আত্রেয়ী—বিশ্বাস করতে পেরেছি বলেই তো বলতে পারছি। শুধু আজ নয় ; যত দিন বেঁচে থাকব, ততদিন এই কথা বলব।

হেমন্ত হাসে—আমার বুঝি ওই এক কাজ ; তোমার চোখ মুছতে হবে।

আত্রেয়ী হেসে ফেলে—হ্যাঁ, চিরকাল তোমাকে জ্বালাব। পাঁচটা বছর ফাঁকি দিয়েছ কিন্তু আর নয়, সাবধান।

হেমন্ত—এসো, জানালাটার কাছে দাঁড়াই। একটু ভোরের বাতাস গায়ে লাগাই।

চমকে ওঠে আত্রেয়ী—ভোর ?

হেমন্ত—হ্যাঁ মশাই, ভোর হয়ে এসেছে। আত্রেয়ীর চোখের কাছে ঘড়িটাকে তুলে ধরে হেমন্ত।

সরিয়াডির শালবনের হাওয়ার সঙ্গে তিরছি নদীর ঝর্নার শব্দও ভেসে আসছে। খোলা জানালার কাছে হেমন্তের পাশে দাঁড়িয়ে রাধাপুরের গল্প শুনতে থাকে আত্রেয়ী। মেয়াদ দু' মাস মাপ হয়েছিল, তাই ছাড়া পেয়ে এতদিন রাধাপুরেই ছিল হেমন্ত। দীঘির দক্ষিণে নারিকেল বাগানের পাশে নতুন একটা দোলমঞ্চ তৈরি হচ্ছে। খুড়িমা আত্রেয়ীকে দেখবার জন্যে ছটফট করছেন। যেন এক মাসের বেশি দেরি না করে হেমন্ত। ন-আনির খগেনকাকা একদিন নেমন্তন্ন করে পিঠে-পায়েস খাইয়েছেন আর আত্রেয়ীর জন্যে একটা ঢাকাই শাড়িও আশীর্বাদী পাঠিয়েছেন। কিন্তু খালপারের পাটজমির মালিকানা দাবি করে একটা মামলাও এরই মধ্যে দায়ের করে দিয়েছেন। হাসতে থাকে হেমন্ত।

আত্রেয়ী—মাত্র এক মাস নয়, আরও কিছুদিন এখানে থাকো। তার পর তো তোমার কাছেই সারাজীবন আছি।

হেমন্ত হাসে—মাঝে মাঝে একটু...।

আত্রেয়ী—না, কখ্‌খনও না। আমি আর একা থাকতেই পারব না।

হেমন্তের একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আত্রেয়ী। ডাউন বোম্বাই মেল আজ ঠিক সময়েই হুইসিল বাজিয়ে চলে গেল। শালবনের মাথা ছুঁয়ে আকাশের একটা আভাও জেগে উঠছে।

হেমন্ত ডাকে—আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—কী?

হেমন্ত—রাস্তা দিয়ে লোক চলতে শুরু করেছে।

—সে কি? চমকে ওঠে আত্রেয়ী. তার পরেই হেসে ফেলে।—তা হলে এখন তুমি কিছুক্ষণ একা বসে থাকো; নয়ত শুয়ে পড়তেও পারো। আমি তোমার চা নিয়ে আসছি।

॥ ২৩ ॥

ছোট শহর সরিয়াডির গরিব মিউনিসিপালিটির ফান্ডের কিছু জোর বেড়েছে নিশ্চয়। দু' বছর আগের এক ভোরের একটা হঠাৎ-ঝড়ের আঘাতে মাথা হেঁট করে হেলে পড়েছিল যে দুটো ল্যাম্পপোস্ট,. তারা এখন সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নয়াপাড়ার সড়কের উপরে নতুন মেটালও ঢালা হয়েছে।

কে জানে কোন দিকে বেড়িয়ে আসবার জন্যে নয়াপাড়ার নতুন মেটাল-ঢালা সড়ক ধরে হেঁটে চলেছে হেমন্ত আর আত্রেয়ী।

খোলা জানালার একপাশে সরে গিয়ে আর হাত তুলে আত্রেয়ীকে কি-যেন ইশারা করে শান্তি। হাসছে শান্তি; কিন্তু সেই সঙ্গে যেন একটা মিথ্যে ভ্রূকুটি তুলে আত্রেয়ীকে একটু শাসিয়ে দিতেও চাইছে। নিজেরই মাথার কাপড়টাকে টেনে দিয়ে আত্রেয়ীকে বুঝিয়ে দেয় শান্তি—মাথায় কাপড় দাও।

সড়কেরই উপরে হেমন্তের পাশে দাঁড়িয়ে একেবারে মুক্তকণ্ঠে কথা বলে আত্রেয়ী—এটা রাধাপুর নয়; বউদি। এটা সরিয়াডি।

হেমন্ত—অ্যাঁ? কী হল?

আত্রেয়ী—শান্তি বউদি চিমটি কাটছে।

হেমন্ত—কোথায় শান্তি বউদি?

আত্রেয়ী—ওই যে, জানালার কাছে...না আর নেই, পালিয়েছে।

বিকেলে বেড়াতে বের হয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সরিয়াডির সন্ধ্যা ঘন হয়ে যায়, তবু দেখতে পায় আত্রেয়ী আর হেমন্ত, দূরের পাহাড়ের মাথায় তখনও মরা বিকেলের শেষ আলোর ছোঁয়াটা লেগে আছে। আজকাল সরিয়াডির রাতগুলি যেন কুয়াশামাখা স্বপ্নালুতা; আর দিনগুলি ঝকঝকে উজ্জ্বলতার ছবি। শেষ রাতে কাছারিপাড়ার সেগুন গাছের গা জড়িয়ে যেটুকু কুয়াশা থাকে, সেটুকুও ভোর হতে হতেই গলে গিয়ে ঘাসের শিশির হয়ে যায়।

এ বছরে সরিয়াডির মঙ্গলবারের বাজারের এত বড় ময়দানেও নতুন ফুলকপির ঠাঁই আর ধরে না. বাজার ছাড়িয়ে নতুন ফুলকপির লাইন নয়াপাড়ার সড়কের দু'পাশ ধরে প্রায় রজনীধামের কাছাকাছি চলে যায়। হাওয়ানগর সরিয়াডির হাওয়াও বড় শান্ত। ধুলোর ঘূর্ণি নেই, আচমকা ঝড়ের হুল্লোড়ও নেই। মেঘও নেই। পিকনিকের মানুষ তিরছি নদীর পাশে খোলামেলা ডাঙার এদিকে-সেদিকে আসর জমিয়ে হাসে আর গল্প করে। রান্নার ডেকচি আনতে ভুলে গেলেও চিন্তা করে না; টিনের ক্যানেস্তারাতে খিচুড়ি চড়িয়ে দিয়ে ওরা গান গায়।

সরিয়াডির যত আলো ছায়া আর শব্দের জীবনেও আর কোনও উদ্বেগ নেই। দিবাকরের কাঠের গোলাতে করাতের শব্দ সেই পুরনো ছন্দেই বাজতে থাকে। শ্রীপদবাবু ছিপ হাতে নিয়ে ছোট ঝিলের কিনারায় একেবারে সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন। ফাত্‌নার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে চোখ ঢুলু-ঢুলু করে তবু সুস্থির। কাছারিপাড়াতে রেকর্ডঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সিগারেটের

ধোঁয়া ছাড়েন হাবুলবাবু। চিনুর পিসিমার কাঁচা বড়ি একবেলার রোদে শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। সরিয়াডির জীবনে কোনও সমস্যাই নেই।

কিন্তু চন্দ্রবাবুর চোখ দুটো এখনও আশ্চর্য হবার অভ্যেস ছেড়ে দিতে পারেনি। তাই মাঝে মাঝে পথে বের হয়ে পড়েন আর ব্যস্তভাবে হাঁকডাক করেন।—কী ব্যাপার গোষ্ঠবাবু ? কদিন হল ঠিক নৈঋত দিক থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে কেন ?

আত্রেয়ী শুধু মাঝে মাঝে হেমন্তকে একটা কথা বলতে গিয়ে একটু বেশি ছটফট করে ওঠে।—তুমিও যে চেঞ্জারদের মত অস্থিরতা শুরু করে দিলে। এত যাব-যাব করছ কেন ?

হেমন্ত বলে—এক মাসের জায়গায় পাঁচ মাস হয়ে গেল। সরিয়াডির কোনও বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়ার আর বাকিও নেই। লোকে যে এবার ঘরজামাই বলে সন্দেহ করতে শুরু করে দেবে ?

আত্রেয়ী—করুক।

হেমন্ত—খুড়িমা কী ভাবতে পারেন, সেটা বুঝে দেখেছ ?

আত্রেয়ী—কী ভাবতে পারেন ?

হেমন্ত—নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন, হেমন্ত এখন আর সে হেমন্ত নেই।

আত্রেয়ী—না, খুড়িমা এমন একটা বাজে কথা ভাবতেই পারেন না। মা'র কাছে চিঠিতে খুড়িমা তোমাকে আরও কিছুদিন থেকে আর শরীর আরও ভাল করে সারিয়ে নিতে বলেছেন।

হেমন্ত—তোমার মতে, শরীর আরও ভাল করে সারতে আর কতদিন লাগবে ? আরও এক বছর ?

আত্রেয়ী হাসে—না ; ধরো এই আর একটা মাস।

হেমন্ত—বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে, আত্রেয়ী। আমার অনেক কাজও তো আছে।

আত্রেয়ীর গলার স্বরে যেন একটা কোমল অনুরোধের ভাষা গলে পড়ে। —না, আর তোমাকে দেরি করিয়ে দেব না ; শুধু আর একটা মাস।

হেমন্ত—আর একটা মাসই বা কেন ?

আত্রেয়ী—সন্তুর পৈতেটা হয়ে যাক।

একদিন শান্তি, সরিয়াডির বিখ্যাত শান্তি বউদি নিজেই এসে আত্রেয়ীর কানের কাছে খুব আস্তে একটা কথা বলে দিয়ে চলে গেল—ধানোয়ার রোডের আমগাছে বোল ধরেছে, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—তাতে কী হয়েছে ?

শান্তি—এবার একদিন ধানোয়ার রোডে বেড়াতে যাও আর গায়ে চিনি জমিয়ে হেমন্তবাবুর পাশে কিছুক্ষণ বসো। তবে তো বুঝতে পারবেন ভদ্রলোক, সরিয়াডির কেমন জিনিসটিকে তিনি পেয়েছেন।

আত্রেয়ী—এতদিন পরে কি-আর এমন নতুন কথাটি বলছ, বউদি। সেটা তো ভদ্রলোক কবেই বুঝে ফেলেছেন।

শান্তি—বেশ ভাল করে বুঝেছেন তো ?

আত্রেয়ী—হুঁ।

সন্ধে হতেই সরিয়াডির শালবনের মাথায় এক-ফালি চাঁদ আলো ছড়ায়। ধানোয়ার রোডের আমের বোলের গন্ধ নিয়ে বাতাসও থমথম করে। একবার বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করে বইকি। আজ তো আত্রেয়ীর জীবনের কোথাও একছিটেও শূন্যতা কোনও ফাঁকি ধরে রাখেনি।

নালার কালভার্টের কাছে, সড়কের পাশে ঢালুটার ঘাসের উপর বসে হেমন্তের সঙ্গে গল্প করে আত্রেয়ী। নালার জলের পানকৌড়ির গল্প, শান্তি বউদির যত মতলবের গল্প ; কিন্ডারগার্টেনের গল্প, চন্দর জ্যাঠামশাইয়ের যত হাঁকডাকের গল্প। আত্রেয়ীর পাঁচ বছরের একা জীবনটা একেবারে একলা হয়ে পড়ে থাকতে পারেনি, অনেক গল্পের সঙ্গে মেলামেশা করে আর হেসে-খেলে পার করে দিয়েছে।

সড়কের মানুষের চোখ চেষ্টা করলেও কিছু দেখতে পারবে না, কারণ ফালি-চাঁদের আলোটা খুবই ফিকে, তাই এক হাত দিয়ে আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে ধরে গল্প শুনতে হেমন্তরও কোনও অসুবিধে

নেই।

আত্রেয়ী বলে—শুধু তিনটি বছর, কিছুই ভাল লাগত না। তোমার ওপর রাগ করে নয়, নিজেরই ভাগ্যটার ওপর রাগ করে একেবারে ঘরে বন্ধ হয়ে দিন-রাত পার করে দিয়েছি। তার পর হঠাৎ একদিন...।

হেমন্ত—বলো।

আত্রেয়ী—শ্রীলেখা কটেজ নামে সুন্দর একটা বাড়ি আছে, কালীবাড়ি রোডের শেষে ছোট রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যায় ; তুমি দেখেছ ?

হেমন্ত—না।

আত্রেয়ী—ওই কটেজে এসেছিলেন কলকাতার প্রীতি বউদি আর মঞ্জু আমারই সমানবয়সী একটি মেয়ে, আর মঞ্জুর বড়দা অখিলবাবু। ওরা সবাই খুব ভাল লোক। হ্যাঁ, কিন্তু সবচেয়ে ভাল নিখিলবাবু।

হেমন্ত—কে নিখিলবাবু ?

আত্রেয়ী—মঞ্জুর মেজদা।

হেমন্ত—বুঝলাম। কিন্তু নিখিলবাবু সবচেয়ে ভাল হলেন কেন ?

আত্রেয়ী—যদি আবার কখনও আসেন আর তোমার সঙ্গে আলাপ হয়, তবে তুমিও বুঝতে পারবে, এরকম মহৎ মানুষ খুব কমই হয়।

হেমন্ত—তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ। নিজেই এসে কতবার আমাকে ডেকেছেন আর বেড়াতে নিয়ে গেছেন।

হেমন্ত হাসে—এই জন্যেই মহৎ ? আমিও তো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছি ; কিন্তু আমি কি একটা মহৎ লোক ?

আত্রেয়ী হেসে ফেলে—তুমি মহৎ হবে কেন ?

হেমন্ত—কী বললে ?

আত্রেয়ী—তুমি একরকমের মানুষ ; নিখিলবাবু ভিন্নরকমের মানুষ। একেবারে আশ্চর্য মানুষ।

হেমন্তর একটা হাত, যে হাতটা আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে ধরে রয়েছে, সেই হাতেরই উপর একটা জোনাকি বসে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। হাত নামিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরায় হেমন্ত।

আত্রেয়ী—ভদ্রলোক খুব বিদ্বান মানুষ। দিন-রাত সব সময় গাদা-গাদা বই নিয়ে বসে থাকেন। ভুলেও কারও সঙ্গে অভদ্রতা করতে পারেন না। দুদিনের চেনা মানুষকে কত মায়া করে কথা বলতে পারেন।

আত্রেয়ীর বুকের ভিতর থেকে যেন একটা আনমনা আবেগের ঢেউ শ্রদ্ধাময় প্রশস্তির কলরোল হয়ে উথলে পড়ছে। হেমন্ত বলে—সত্যি, এরকম মানুষ হয় না।

আত্রেয়ী—সেকথাই তো বলছি। ভদ্রলোকের মনে কোনও হিসেব নেই, কারও কাছ থেকে কিছুই আশা করেন না, কিন্তু উপকার করেন।

হেমন্ত উঠে দাঁড়ায়—সত্যি, খুব মহৎ লোক। চলো এবার, বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

ঠিকই, আকাশের কোণে সেই একফালি চাঁদ এখন আর নেই। নালার জলের পানকৌড়িকেও আর দেখা যায় না।

বাড়ি ফিরে যাবার পথেও আত্রেয়ীর নানা গল্পের মুখরতা তেমনই উচ্ছল হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে।—মঞ্জুর বোধ হয় বিয়ে হয়ে গেছে এতদিনে ; এইবার নিখিলবাবুর বিয়েটা হয়ে গেলে বেশ ভাল হয়।...কিন্তু তুমি আবার সিগারেট ধরাচ্ছ কেন ?

হেমন্ত—না, ভাবছি ; একটু চিন্তে করতে হচ্ছে।

—কিসের চিন্তে ?

—নুটু লিখেছে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট গগন মুস্তফি মামলাতে বাদি পক্ষের সাক্ষি হবে বলেছে।

—তার মানে ?

--তার মানে, আমার বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে।
—তাতে তোমার ক্ষতি হবে ?
—শেষ পর্যন্ত ক্ষতি হয়ত হবে না, কিন্তু অনেক অসুবিধে হবে, বেশ ভুগিয়ে ছাড়বে।
—কিছু হবে না ; মামলাতে শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতে যাবে।
হেসে ফেলে হেমন্ত।—ঠিক কথা তো ?
আত্রেয়ী—খাঁটি কথা ; একদিন দেখতেই পাবে, আমার কথাটা ফলে গেল কিনা।
হেমন্ত—দেখা যাক।

আত্রেয়ীর কথাটা ফলে গেলে তো ভালই হয়। কিন্তু ফলবে কি ? ভাইপো নুটুর লেখা শেষ চিঠিটা হাতে নিয়ে যখন বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে, আর ল্যাম্পের আলোর তেজও একেবারে কমিয়ে দিয়ে, চুপ করে ভাবতে থাকে হেমন্ত, তখন হেমন্তের অমন টানা-মসৃণ কপালেও যেন একটা ভাঁজের রেখা ফুটে ওঠে। মামলা লড়তে আর ইচ্ছে করে না ; সব ইচ্ছারই জোর যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হেঁয়ালির মত কেমন-যেন একটা খট্‌কা এসে, শুধু হেমন্তের মনটাকে নয়, হাতটাকেও ভীরু করে দিতে চাইছে।

যেন নিজেরই উপর বিরক্ত হয়ে ল্যাম্পের আলোটার তেজ দপ্‌ করে বাড়িয়ে দেয় হেমন্ত। মামলার কথা ভাবতে গিয়ে এসব আবার কোন বাজে কথার দিকে চলে যাচ্ছে মনটা ?

বুঝতে পারেনি হেমন্ত, আত্রেয়ী কখন এসে চেয়ারের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। পিছন থেকেই দু'হাত দিয়ে হেমন্তের গলা জড়িয়ে ধরে আর ধমক দিয়ে হাসতে থাকে আত্রেয়ী—আমি কিন্তু তোমার নুটু ভাইপোর সব চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেব, তুমি যদি ওরকম চিন্তে-টিন্তে করতে থাক।

আত্রেয়ী যখন ওর গভীর ঘুমের মধ্যেও হেমন্তের অলস হাতটাকে নিজেই টেনে নিয়ে নিজের গলায় জড়িয়ে ধরে, তখন হেমন্তের ফাঁকা-ঘুমের উসুখুসে অস্বস্তিটাও লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠে। আত্রেয়ীর তো কোনও ভুল হচ্ছে না ; তবে হেমন্তর হাতটা কেন, নিজেই ব্যস্ত হয়ে আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে ধরতে পারছে না ?

সরিয়াডির এই পাঁচ মাসের প্রতিদিনের জীবন হেমন্তের কাছে সত্যিই যে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের আর অদ্ভুত এক পরিতৃপ্তির জীবন। সেই বিস্ময় আত্রেয়ী, সেই বিস্ময়ের পরিতৃপ্তিও আত্রেয়ী। শুধু দু'হাত দিয়ে তো নয়, আত্রেয়ী যে সর্বক্ষণের ভাবনা দিয়ে হেমন্তকে জড়িয়ে ধরে আপন করে নিয়েছে।

কতবার শুনতে পেয়েছে হেমন্ত, ভিতরের ঘরে কাকিমার সঙ্গে যেন একটা তর্ক বাধিয়ে কথা বলছে আত্রেয়ী।—আমি বলছি, কাকিমা, এ সময়ে একগাদা মিষ্টি খাবার ওকে দিও না ; খেতে পারবে না ; এখন ওর ক্ষিদেই নেই।
কাকিমা—তুই কী করে জানলি যে...।
আত্রেয়ী—আমি জানি, আমি বুঝতে পারি ; এখন ওর ক্ষিদে নেই।

হেমন্তর জুতো পালিশের জন্য মুচি ডাকতে বাজারে যাবে চাকর রামুয়া। কিন্তু যেতে পারে না। আত্রেয়ীই বাধা দিয়ে রামুয়াকে জিজ্ঞেস করেছে—কে বলেছে মুচি ডাকতে ?
—জামাইবাবু।
—যেতে হবে না ; কোনও দরকার নেই।

আত্রেয়ী নিজেই হেমন্তর তিন জোড়া জুতো পরিষ্কার করেছে আর পালিশ করেছে। কতবার চোখে পড়েছে হেমন্তর, উঠোনের মাঝখানে বসে আর গামলার জলে সাবান ফেনিয়ে নিয়ে হেমন্তর একগাদা ময়লা রুমাল আর গেঞ্জি কাচতে বসেছে আত্রেয়ী ; গুনগুন করে গান গাইছে আত্রেয়ী।

হেমন্তর চোখের যত ঘুম আর তন্দ্রাও যেন আত্রেয়ীর জীবনের একটা মায়ার খেলাপাতি হয়ে উঠেছে। হেমন্তর ভোরবেলার ঘুম ভাঙাতে হলে হেমন্তর কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয় আত্রেয়ী। অসময়ের ঘুম ভাঙাতে হলে হেমন্তর হাতের একটা আঙুল মট্‌ করে ফুটিয়ে দিয়েই পালিয়ে যায় আর হাসতে থাকে।

আত্রেয়ীর প্রাণে ভুল নেই ; কোনও সন্দেহ নেই। হঠাৎ মাথাখারাপ হয়ে একটা পাগল হয়ে

গেলেও বোধ হয় সন্দেহ করতে পারবে না হেমন্ত, আত্রেয়ীর প্রাণটা কিপটেমি করে হেমন্তকে কোনও দান না-দেওয়া করে রেখে দিয়েছে, কিংবা দেবে না বলেই ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখেছে।

তবু, কী আশ্চর্য, এই ধানোয়ার রোডের আশেপাশে, কত নিরালার পথে পথে, সন্ধ্যার ছায়া আবছায়া আর ফিকে জ্যোৎস্নার মধ্যে আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে আরও কতবার বেড়িয়ে ফিরে এল হেমন্ত, কিন্তু একটি বারও আত্রেয়ীর কাঁধে হাত রাখতে পারেনি। লজ্জা পেয়েছে হেমন্ত, নিজেরই উপর রাগ করেছে। বুঝতে চেষ্টা করেছে, মনটা এমন ছোট হয়ে গেল কেন ?

শুধু একদিন ; সেদিন সরিয়াডিরি স্তব্ধ দুপুরবেলার বাতাসে দূরের শালবনের ঘুঘুর স্বর হঠাৎ ভেসে যেতেই হেমন্তর কান দুটো যেন চমকে ওঠে। আত্রেয়ীরই হাসিমুখের একটা সামান্য কথাকে কেউ যেন হেমন্তর কানের কাছে চেঁচিয়ে বলে দিয়ে চলে গিয়েছে। তুমি মহৎ হবে কেন ?

কিন্তু রাগ করবার তো কোনও মানে হয় না। কানে জ্বালা ধরলে চলবে কেন ? কথাটা তো নেহাত মিথ্যে কিছু নয়। পাঁচ বছরের জেলখাটা কয়েদি, গাদা গাদা বই পড়তে জানে না। লোকের চোখে চমৎকার দেখাবে, হেমন্তর জীবনটা তো এমন কোনও বিস্ময় দেখাতে পারে না, পারবেও না।

আত্রেয়ীর জীবনকেও চমকে দেবার মত কোনও মহত্ত্বের কাণ্ড করে দেখাতে পেরেছে কি হেমন্ত ? কিছুই না। আত্রেয়ীকে শুধু একটা পাওনা বলে ধরে নিয়েছে আর পেয়ে গিয়েছে। জয় করতে পেরেছে বলে মনে করবার কিছুই নেই ; একটা গর্বের তৃপ্তি নিয়ে আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে ধরতে পারবে কেন হাতটা ?

হেসে ফেলে হেমন্ত ; এ তো অদ্ভুত বিপদ। চেষ্টা করে একটা মহৎ কাণ্ড দেখাতে পারা যায়ই বা কী করে ? আত্রেয়ীর কি তবে একদিন ঝিলের জলে ডুবে যাওয়া দরকার ? আর, একটা মহৎ কাণ্ড দেখাবার সুযোগ পেয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্রেয়ীকে টেনে তুলবে হেমন্ত ?

ঘরে ঢুকেই আত্রেয়ী বলে—এ কি ? নিজের মনেই এত হাসছ কেন ?

হেমন্ত—হাসবার কথা।

আত্রেয়ী—কী ?

হেমন্ত—ভাবছিলাম, তুমি ঝিলের জলে ডুবে গিয়েছ আর আমি একেবারে বীরের মত মরিয়া হয়ে একটা লাফ দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাকে টেনে তুলেছি।

আত্রেয়ী—যত বিদ্‌ঘুটে চিন্তে।

হেমন্ত—কী বললে ?

আত্রেয়ী—কোনওদিনও জলে ডুবব না ; তোমার বীরত্ব দেখিয়ে আমাকে তোলার দরকারও হবে না ; আর...।

হেমন্ত—আর কী ?

আত্রেয়ী—আর, তোমার এরকম দর্প করে হাসবার সুবিধেও হবে না।

হেমন্ত হাসে—ভাল কথা।

কিন্তু হাসিটা যেন অদ্ভুত একটা আক্ষেপের মনমরা হাসি। আত্রেয়ীর চোখে আশ্চর্য-মানুষ হবার সুযোগ এ জীবনে আর হবে না। মনের গভীরে কোথায় যেন একটা অতৃপ্তির ছায়া মুখ লুকিয়ে থেকে গেল।

হেমন্তর কাছে এগিয়ে আসে আত্রেয়ী। হেমন্তর হাতটাকে তুলে নিয়ে গলা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু হেমন্তর হাতটা যেন নিতান্ত অলস উদাস একটা হাত। বেশ রাগের স্বরে ধমক দিয়ে ছটফটিয়ে ওঠে আত্রেয়ী—আঃ, কী হল ? তোমার হাতটার যেন একটুও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই।

হেমন্ত বলে—না ; ভাবছি, খুড়িমাকে আর মিথ্যে কথা বলে বুঝিয়ে রাখা উচিত হচ্ছে না। আর দেরি করা ঠিক নয়। এবার কাকিমাকে একবার বলে নিয়ে যাবার জন্যেই তৈরি হও আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—কাকিমা বলেছে, এই অমাবস্যাটা পার হয়ে যাক।

॥ ২৪ ॥

—ওই দেখো বিমল ; অন্ধকারে সাপের মাথার মণি জ্বলছে।

বেশ বাত হয়েছে, কালীবাড়ি রোডের কাছে এসে সন্তদের ঘুড়ি ওড়াবার মাঠের ওপাশে শ্রীলেখা কটেজের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে ফেলেছে নরেন। সত্যিই, বেশ কুচকুচে কালো অন্ধকার, তার মধ্যে শুধু শ্রীলেখা কটেজের বাইরের ঘরের খোলা জানালাটা যেন জ্বলজ্বল করছে।

নরেন হাসে, বিমলও হাসে। —জ্বলুক, যত খুশি জ্বলুক।

সে রাতেই খবর পেয়ে গেল দিবাকর, শ্রীলেখা কটেজের ঘরে আলো জ্বলছে।

দিবাকর হেসে ফেলে—জ্বলুক।

শুনতে পেলেন গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু, শ্রীলেখা কটেজের ঘরে আলো জ্বলছে। শুনেই হেসে ফেললেন। —জ্বলুক।

কবে এসেছে নিখিল সেন, তা কেউ জানে না। কবে চলে যাবে নিখিল সেন, তাও আজ আর কারও জানবার দরকার নেই। সরিয়াডির প্রাণ এখন শুধু জানতে পেরে খুশি হয়েছে যে, সন্তুর পৈতে হয়ে যাবার পর অমাবস্যা পার হয়ে গেলেই হেমন্ত আর আত্রেয়ী চলে যাবে। খোঁড়া মানুষ প্রদোষদার চোখের মত সরিয়াডির সব মানুষের চোখ বোধ হয় সেদিন স্টেশনের দিকে তাকিয়ে ছলছল করবে, কিন্তু চরম খুশির হাসিও হাসবে।

সাপের মাথার মণি নাই বা জ্বলুক, আর সরিয়াডির কেউ নাই বা জানুক কিন্তু শ্রীলেখা কটেজের বাইরের ঘরে নিখিল সেন এতক্ষণে জানতে পেরেছে, মাথাটা জ্বলছে। কেন জ্বলছে তাও বুঝতে পেরেছে।

বাঙালি ফিলসফারের লেখার উপর নিখিল সেনের শ্রদ্ধা কোনওদিনও ছিল না, আজও নেই। তবু নেহাত অনিচ্ছা নিয়েই, বিদ্যা-জরদ্গব এক বাঙালি ফিলসফারের লেখা এই বইটা এতক্ষণ ধরে পড়েছে নিখিল সেন। কত ভয় দেখিয়ে, কত যুক্তির কচকচি করে মানুষের নকল জীবনের যত লক্ষণ ধরিয়ে দিয়েছেন পণ্ডিতমশাই। নকল জীবনেরই অহংকার নাকি সবচেয়ে বড় গলা করে বলতে পারে ভুল করি না, লোভ করি না, আর কোনও ইচ্ছেরও ধার ধারি না।

বইটাকে এক ঠেলা দিয়ে টেবিলের এক পাশে সরিয়ে দেয় নিখিল। ঘরের বাইরে এসে বারান্দার উপর ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়।

আজই বিকেলবেলা আত্রেয়ীদের বাড়ির চাকর এসেছিল আর মালীর সঙ্গে কথা বলছিল। তার পর ধীরু খানসামার কাছে মালী যে কথাটা খুব আস্তে আস্তে বলেছে, সে কথার শব্দটা নিখিলের কানে যেন একটা চিৎকার হয়ে বেজে উঠেছে। —লেংড়াবাবুকা দামাদ আগিয়া।

ধীরু খানসামা—সেই দিদিমনির বর ?

মালী—আরে হাঁ, হাঁ।

বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই সরিয়াডির যে কোনও শব্দের মধ্যে এই চিৎকারটাকেই শুনেছে নিখিল। সরিয়াডির এই কুচকুচে কালো রাতের ঝিঁঝির ডাকও যেন চিৎকার করে শুনিয়ে দিচ্ছে—আত্রেয়ীর স্বামী হেমন্ত এসেছে।

আর বুঝতে অসুবিধের কী আছে, পর-পর এই দশ দিনের মধ্যে একটি দিনও কেন আসেনি আত্রেয়ী, আর, আজও কেন এল না ? এই দশ দিনের মধ্যে যদিই বা কোনও খবর না পেয়ে থাকে আত্রেয়ী, আজ তো পেয়েছে। চাকর রামুয়া কি খবরটা না জানিয়ে রেখেছে ? তবু কই ? সন্ধ্যা পার হয়ে গেল ; এল না তো আত্রেয়ী !

পাঁচ বছর ধরে অদেখা স্বামীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে ; আত্রেয়ীর কাছে এটা যদি মস্ত বড় একটা সৌভাগ্যের ঘটনা বলে মনে হয়েই থাকে, তবে বেশ তো, সেই সৌভাগ্যের বার্তাটা খুশি হয়ে এখানেও একবার এসে জানিয়ে গেলে কি দোষ হত ? না হয় স্বামী ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়েই আসত। সরিয়াডির মেয়ের মনে কি সামান্য ভদ্রতারও একটু বোধ নেই ?

কৃতজ্ঞতা নামে কোনও বস্তুও কি আত্রেয়ীর প্রাণের মধ্যে নেই ? স্মৃতি নামে কোনও পদার্থ

নেই ? সব ভুলে গেল ?

ভিতরের একটা ঘরে ঘড়ির অ্যালার্ম বাজতে শুরু করেছে। এখন তা হলে রাত একটা ; এখনই তবে জেগে উঠবে খানসামা ধীরু, আর পট ভর্তি করে গরম কফি বাইরের ঘরের একটা ছোট টেবিলের উপরে রেখে দিয়েই চলে যাবে।

কিন্তু তার পর মাথার জ্বালাটা কমবে কি ? মন লাগিয়ে বই পড়তে পারা যাবে ?

কফি খায় নিখিল, আর বুঝতেও পারে, মাথার জ্বালাটা নেই। কিন্তু বই পড়তে আর ইচ্ছেই করে না। এই বারান্দায় চুপ করে বেতের চেয়ারে বসে শুধু রাত জাগতে ইচ্ছে করে।

খোলা জানালা দিয়ে আলোর আভা বাইরে ছড়িয়ে পড়তে গিয়ে ঠিক গেটের কাছের জবাটারই কাছে একটা বাধা পেয়ে থমকে গিয়েছে আর ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে। বুঝতে অসুবিধে নেই, একটা কুয়াশার স্তবক শব্দহীন প্রলেপ হয়ে গেট আর গেটের কাছের জবাকুঞ্জকে ঢেকে ফেলেছে।

আর রাত জাগতে ইচ্ছে করে না। নিখিল সেনের মনটা যেন লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলেছে। আত্রেয়ীর উপর মিছিমিছি এত রাগ করা সত্যিই যে একটা লজ্জা। সরিয়াডির এই সামান্য কুয়াশাকে একেবারে প্রলয়ের বাষ্প বলে সন্দেহ করবার কোনও মানে হয় না।

শেষ রাতের তিনটে ঘণ্টা বেশ ভাল করেই ঘুমোতে পারে নিখিল সেন। আর, খুব ভোরে জেগে উঠেই টেবিলের উপরে স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা নতুন বইয়ের দিকে খুশি হয়ে তাকাতে, এগিয়ে যেতে, আর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলতে পারে নিখিল। বেশ মন দিয়ে বইও পড়তে পারে , যতক্ষণ না ধীরু খানসামা এসে চা দিয়ে যায়।

বিকেল ফুরিয়ে গিয়ে যখন সন্ধ্যাটাও শেষ হয়ে যায় ; তখন বুঝতে পারে নিখিল, আরও একটা সারাদিনের অপেক্ষার মন এইবার বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আজও এল না আত্রেয়ী।

ইচ্ছে হয় বইকি ; বিকেলের দিকে বের হয়ে ধানোয়ার রোড ধরে এগিয়ে গেলে দেখতেই পাওয়া যাবে, হাওয়া-বদলের কত মানুষের খুশির চঞ্চলতা ছুটোছুটি করে আমলকির ঝোপের গায়ে খাবলা দিয়ে দিয়ে আমলকি ছিঁড়ছে। ছোট ছেলেগুলি খরগোস দেখবার আশায় গর্তের মুখে ঢিল ছুঁড়ছে। কিন্তু সরিয়াডিতে এসে এভাবে একা-একা বেড়াতে যাওয়া নিখিল সেনের মত মানুষের জীবনের যে দুঃসহ একটা অপমান।

কিন্তু আত্রেয়ী নিশ্চয় বেড়াতে বের হয়েছে ; আত্রেয়ীর সঙ্গে ওর স্বামী ভদ্রলোকও নিশ্চয় আছেন। সরিয়াডির পাহাড়ি ময়নার মত মিষ্টিস্বরে কতই না খুশির ডাক ডেকে যেন একটি ফিরে-পাওয়া হারানিধির সঙ্গে গল্প করে করে চলে যাচ্ছে আত্রেয়ী।

না, হতেই পারে না। অসম্ভব। কটেজের বাগানের এদিকে-ওদিকে সামান্য একটু ঘুরে বেড়াতে গিয়েই কি-যেন দেখতে পেয়েছে নিখিল ; সঙ্গে সঙ্গে নিখিলের মনের সন্দেহটা আবার নিজের ভুলের লজ্জায় হেসে ফেলেছে।

ওই তো, বাগানের মাঝখানে রেঙ্গুনলতার পিরামিডের বুকে ফুলের মঞ্জরি দুলছে! ওখানে রেঙ্গুনলতার যত পাতার গায়ে সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ীর সেই নিঃশ্বাসের ছোঁয়াটা যে এখনও লেগে আছে। নিজেই ইচ্ছে করে একা-একা এসে, একটি অবাধ আত্মসমর্পণের ছবিটি হয়ে নিখিলের কত কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল আত্রেয়ী। নিখিল সেনের সভ্য-ভব্য আত্মাটা সেদিনও ভদ্রতা ভুলে যেতে পারেনি ; তাই আত্রেয়ীর হাত ধরতে পারেনি। এ সত্য কি ভুলে যেতে পারে আত্রেয়ী ? কখনই না। ভুলে যাবার সাধ্যই হবে না।

কি-এমন ব্যাপার হয়েছে যে, ভুলে যাবে আত্রেয়ী ? সূর্যদেখা চোখ তারার দিকে তাকিয়ে কি নতুন কোনও উজ্জ্বলতা দেখতে পায় আর আশ্চর্য হতে পারে ? হেমন্ত চৌধুরীর মত পাঁচ বছরের জেলখাটা একটা মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর চোখ কতটুকুই তৃপ্তি পেতে পারে ? হতে পারে, পাঁচ বছর আগে হেমন্ত চৌধুরীর সঙ্গে আত্রেয়ীর বিয়ে নামে একটা শাঁখ-বাজানো ব্যাপার হয়েছিল।

আত্রেয়ীর জন্য দুঃখ হয়। আত্রেয়ী এখন একটা নকল প্রাণ তৈরি করে নিয়ে, অনিচ্ছার সব জ্বালা বুকের ভিতরে লুকিয়ে রেখে একটা নতুন দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কথা বলছে আর চেষ্টা করে হাসছে। এ যে আত্রেয়ীর একটা দুঃসহ শূন্যতার জীবন।

কিন্তু বুঝতে এত দেরি হচ্ছে কেন আত্রেয়ীর, এই শূন্যতাকে মিথ্যে করে দিতে পারে যে, সে এখন এখানেই আছে ? একবার এখানে এসে দাঁড়ালেই তো বুঝতে পারত আত্রেয়ী, নিখিল সেনের মন আজ আত্রেয়ীর ভীরু প্রাণটাকে কত নির্ভর করে দিতে পারে।

খুব সাবধান আছে নিখিল সেনের মন, আত্রেয়ীকে বুঝতে আর বিচার করতে গিয়ে যুক্তিছাড়া কোনও ধারণা যেন নিখিলের সবচেয়ে সুন্দর বিশ্বাসের উপর মিথ্যে একটা আঘাত হেনে নিখিলের জীবনের স্বস্তি নষ্ট না করে দেয়। শেষ রাতের ঘুমের স্বপ্নটাও তাই যুক্তি হারিয়ে এলোমেলো হয়ে যেতে পারে না। শুধু স্বপ্নে নয়, জেগে উঠেও নিখিল সেনের মনটা সেই বিশ্বাসেরই গুঞ্জন শুনতে পায়। না ; আর যা-ই করুক আত্রেয়ী, আত্রেয়ীর নিঃশ্বাসের বাতাসে কোনও ধুলো লাগেনি। সরিয়াডিহির মেয়ের ওই নরম রঙিন চেহারা আজ কোনও বাজে লোকের লোভের দাবি মেনে নিতে পারে না ; পারেওনি। আত্রেয়ীর কাছে হেমন্ত একটা ছায়ামাত্র ; কায়া নয়।

বিকাল হয়েছে, চা খাওয়াও হয়ে গিয়েছে ; এবার বাইরে একটু বেড়িয়ে আসবার জন্যেই তৈরি হয়েছে নিখিল। আট টাকা দামের আইভরি কেসের ভিতরে আটটা সিগারেট ভরে নেয় ; কিন্তু তখনি চমকে ওঠে। গেটের কাছে কিসের শব্দ ? আত্রেয়ী ?

না, আত্রেয়ী নয়। মল্লিক ডাক্তারের এক্কাগাড়ি থেমেছে। সড়কের কাঁকরের উপর পা ঘষছে এক্কার ঘোড়া।

—তুমি কবে এসেছ, নিখিল ? নিখিলকে দেখতে পেয়েই হেসে হেসে জিজ্ঞেস করেন মল্লিক ডাক্তার।

—দিন পনেরো হল। আপনি কেমন আছেন ?

—ডাক্তার মানুষের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় আছি।

নিখিলও হাসে—তার মানে ?

মল্লিক ডাক্তার—নিজের শরীরের রোগটাকে বুঝতে পারছি না, ধরতেও পারছি না। যাই হোক, মঞ্জু মা'র খবর কী ?

—মঞ্জুর বিয়ে হয়েছে।

—থ্যাঙ্ক গড। খুব ভাল খবর। এখানেও এইমাত্র আর একটি ভাল খবরের পেসেন্টকে দেখে আসছি। এবার মঞ্জুকে জানিয়ে দিতে পার যে, তার প্রাণের বন্ধু আত্রেয়ীরও খবর ভাল।

নিখিল—হ্যাঁ শুনেছি, আত্রেয়ীর স্বামী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে।

মল্লিক ডাক্তার যেন ব্যাকুল হয়ে হাসেন—না না, শুধু তাই নয়। আত্রেয়ী এখন অন্তঃসত্ত্বা ; ক্যারিং ফুল ফোর মান্থস। দেখে সুখী হলাম, কোনও কমপ্লেন নেই।

সড়কের কাঁকর ছিটিকে দিয়ে মল্লিক ডাক্তারের এক্কাটা চলে যাচ্ছে। আর ছোট্ট একটা আগুনের সাপ যেন নিখিলের বুকের ভিতরে ঢুকে ছোট ছোট জ্বালার কুচি ছিটিকে দিয়ে ছুটোছুটি করছে।

প্রদোষ সরকারের এই মেয়েটি তা হলে একটি মায়াঠগিনী। নিখিল সেনকে ঠকাতে পেরেই খুশি। লালচে ঠোঁট একটা চমৎকার মধুবিষের মিষ্টি মেখে নিয়ে নিখিলের গল্পের সঙ্গে হেসেছে। কাছে কাছে থেকে আর ধরা না দিয়ে দিয়ে নিখিলের চোখে মুখে বুকে শুধু মুঠো মুঠো পিপাসা ছুঁড়ে দিয়েছে।

দাম বাড়াবার কায়দা জানে সরিয়াডিহির মেয়ে এই আত্রেয়ী। এ মেয়েকে প্যারিসের রাতের সোসাইটির ক্লাবের ঘরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় ; একটুও ঘাবড়ে যাবে না ওর ফাঁকা হাসির ঠাট ঠমক আর ঝংকার, লতিয়ে লতিয়ে গা দোলাবার ভঙ্গি, আর মিথ্যে আশ্চর্যের ছায়া দিয়ে চোখের কালো নিবিড় করা চাহনি ; সবারই মাথা ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবে।

কিন্তু মানুষের বুকে তৃষ্ণা মাতিয়ে দিতে এত কায়দাকুশল হয়েও ওর কী লাভটা হল ? কী পেল আত্রেয়ী ? শেষে তো হেমন্ত নামে একটা সামান্য মানুষের বুকের কাছে বেহায়া হয়ে শুয়ে পড়তে হল।

আত্রেয়ীকে চিনতেই খুব ভুল হয়েছে। সেই বোকা-বোকা লাজুক চেহারা দেখে সন্দেহই করতে পারেনি নিখিল, ওটা সরিয়াডিহির একটা সস্তা জংলি লতার চেহারা। ঘিয়ে রঙের সিল্কের শাড়ি দিয়ে

জড়ানো ওই শরীর কারও হাতের ভদ্রতার ছোঁয়া বোঝে না, পছন্দও করে না। থাবা পছন্দ করে। জোর করে চেপে ধরা দাবির কাছে ছিঁড়ে গিয়ে খুশি হয়।

স্নান সেরে নিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নেয় নিখিল। আর, বোধ হয় সরিয়াডির এই দুপুরের স্তব্ধতারই সঙ্গে মিশে থাকবার জন্যে ঘুমোতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুমোবার সাধ্যি নেই। নিখিলের শরীরের সব স্নায়ু আর শিরা জড়িয়ে ধরে একটা নিঃশ্বাস আক্ষেপ করে এইবার কি-যেন বলতে চাইছে। তিরছি নদীর খাতের কাছে, বুনো খেজুরের ছায়ার পাশে সেই নিরালায় অমন চুপটি করে বসে পায়ের আঙুলের জখম বাঁধবার সুযোগ আত্রেয়ীকে দেওয়া হল কেন ? জোর করে কোলে বসিয়ে নিয়ে আত্রেয়ীর পায়ের আঙুলের রক্তমাখা জখমটাকে হাত দিয়ে চেপে ধরতে পারেনি কেন নিখিল ?

রেলের জমির সীমানার সেই কাঁটাতারের বেড়াটা আত্রেয়ীকে পার করিয়ে দিতে কী অসুবিধে ছিল ? ছল-ভীরুতার সেই সাংঘাতিক নারীকে দু হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আর বুকের উপর তুলে নিয়ে বেড়াটার ওপারে নামিয়ে দিলেই তো ভাল হত। খুশি হত, ধন্য হয়ে যেত সরিয়াডির মেয়ে।

কিন্তু আত্রেয়ী তো ভুল করেনি। ভুল করেছে নিখিলেরই একটা মূর্খ ধৈর্য। আত্রেয়ীর প্রাণটা সেদিন যে তৃপ্তি পেতে চেয়েছিল তা পায়নি। দিতে ভুলে গিয়েছে নিখিল। জ্যোৎস্নামাখা একটি উপহার হয়ে নিখিলের কাছে নিজেই এসেছিল, আর বাগানের নিরালাতে রেঙ্গুনলতার কাছে দাঁড়িয়ে নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে সবই দিতে চেয়েছিল আত্রেয়ী। নিতে ভুলে গিয়েছে নিখিল।

আত্রেয়ীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আত্রেযীকে একবার বলে দেওয়াই উচিত, ভুল হয়ে গিয়েছে, কিছু মনে করো না। কিন্তু আর ভুল হবে না। আমি শুধু দু'দিনের পথিক হয়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়ালেও তোমার আশার জীবনে আমার চেয়ে বড় আর কেউ ছিল না, এখনও নেই।

আর দেরি করে না নিখিল। দেরি করবার সাধ্যিও বোধ হয় আর নেই। সরিয়াডির মেয়ের অভিমান শান্ত করে দেবার জন্য নিখিলের এই নিঃশ্বাসটা যে ভয়ানক ছটফট করছে, কিছুতেই শান্ত হতে চাইছে না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। প্রদোষ সরকারের বাড়ির কাঁটালতার উপর বসে এখনও শালিক ডাকছে।

রাধাপুর থেকে রেল-পার্সেল হয়ে লিচুর তিনটে ঝুড়ি স্টেশনে এসে পড়ে আছে। সেই পার্সেল ছাড়িয়ে আনতে স্টেশনে গিয়েছে হেমন্ত। ফিরে এসেই আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে দিবাকরের বাড়িতে চা খেতে যাবে হেমন্ত। ঢিলে খোঁপাতে সাদা গন্ধরাজ গুঁজে দিয়ে আর সাজ সেরে তৈরি হয়েই আছে আত্রেয়ী।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দাতে আবার সেই দুটি কথার ধ্বনি বেজে ওঠে।—আমি নিখিল।

চমকে ওঠেন কাকিমা। প্রদোষ সরকারের চোখের তারা আর নড়ে না। শালিকটাও ডাক বন্ধ করে দেয়।

আত্রেয়ী কিন্তু ব্যস্ত খুশির একটি মূর্তি হয়ে ছুটে গিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ায় আর হেসে ওঠে।—আপনি এসেছেন ?

নিখিল হাসে—এসেছি বইকি। কিন্তু এসে কি কোনও অপরাধ করলাম ?

আত্রেয়ী—একটুও না। আপনার এরকম কথার কোনও মানেই হয় না।

নিখিল—কথাই তো ছিল, আমি মাঝে মাঝে আসব ; আর দেখাও হবে।

আত্রেয়ী—নিশ্চয় আসবেন, দেখাও হবে বইকি। মঞ্জুর খবর কী ? বিয়ে হয়ে গিয়েছে ?

নিখিল—হ্যাঁ। কিন্তু আরও একটা কথা বলবার ছিল।

আত্রেয়ী—বলুন।

নিখিল—এখানে নয় ; কটেজে চলুন।

নীরব হয়ে নিখিলের মুখের দিকে যেন অদ্ভুত বিস্ময়ের একটা তন্দ্রা নিয়ে আত্রেয়ীর কালো চোখের তারা দুটো শিথিল হয়ে তাকিয়ে থাকে।

নিখিল ডাকে—চলুন।

নিখিলের চোখের দৃষ্টিটাও যেন অপলক হয়ে বলতে চাইছে—যেতেই হবে।

আত্রেয়ী বলে—চলুন।

কাকিমা আর দরজার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। বাইরে এসেই আত্রেয়ীকে বেশ রূঢ় স্বরে ধমকে দিয়ে কথা বলেন। —কী হচ্ছে ? কোথায় যাচ্ছিস ?

আত্রেয়ী—এখনি আসছি।

কাকিমা—হেমন্ত জিজ্ঞেস করলে কী বলব ?

আত্রেয়ী—বলবে, আমি এখনি আসছি।

চলে গেল আত্রেয়ী আর কটেজের নিখিল সেন। কাকিমার চোখ দুটো যেন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কসাইয়ের গরুও এমন করে খুশি হয়ে নাচতে নাচতে কিলখানার দিকে ছুটে যায় না ; কিন্তু আত্রেয়ী যাচ্ছে।

জপের মালা থামিয়ে ঘরের ভিতর থেকে মণিদিদা বলেন—ও আপদ আবার কোথা থেকে এল, সুহাস ? আত্রেয়ীকেও কি মরণ ভুলে পেয়েছে ? কোন লজ্জায়, কোন সাহসে আজ বাইরের লোকটার সঙ্গে চলে গেল ?

কাকিমা আর কথা বলেন না। কোনও কথা বলবার শক্তিই নেই। পুজোর ঘরের মেঝের উপর শুয়ে পড়ে থাকেন। আত্রেয়ীর মা, শ্বাসকষ্টের সেই মানুষটা তো আগেই একটা মূর্চ্ছা নিয়ে সেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছেন।

শালিক আর ডাকেনি। কে জানে কতক্ষণ ধরে একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছে শালিকটা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেল। প্রদোষ সরকারের বাড়ির কোনও ঘরে আলো নেই।

চোখে দেখতে পান না মণিদিদা, তাই দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েই কথা বলেন। —ছি ছি, এ কী হল ? দিবাকরকে ডেকে ওই সর্বনেশে কটেজে এখনি একবার যেতে বলো, সুহাস। মেয়েটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুক। হেমন্ত এসে জানতে পেলে যে আগুন জ্বলে উঠবে।

কার সঙ্গে এসব কথা বলছেন অন্ধ মণিমাসী ? চমকে উঠলেন কাকিমা। আতঙ্কিতের মত পুজোর ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের বারান্দায় নিজের চোখেই দেখতে পেলেন, গেটের তিন-কাঠের বেড়াটাকে একটা লাথি মেরে সরিয়ে দিল হেমন্ত।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। তার পর হাতের ছাতাটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে হেমন্তর মূর্তিটা হনহন করে হেঁটে চলে গেল। ছাতাটাকে সত্যিই যে একটা খুনখারাপি হাতিয়ার বলে মনে হয়।

—রামুয়া, ও রামু, শিগগির একবার যাও, দিবাকরকে একটা খবর দাও ; বলো গিয়ে আমি ডাকছি। একটুও দেরি না করে এখুনি যেন চলে আসে।

কিন্তু বাড়িতে রামুয়া নেই। কাকিমা শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মত ডাকাডাকি করে হাঁপাতে থাকেন।

খুব মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। বিদ্যুতের ঝিলিক ছুটছে। বেশ ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝড়ও যেন শনশনিয়ে জেগে উঠছে।

সামনের রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে যারা জোর পা চালিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে তাদের কারও মুখ চিনতে পারা যাচ্ছে না। কাকিমা তবু গলাভাঙা স্বরে একটা আর্তনাদ তুলে ডাকতে থাকেন। —ও বলাই ! ও পরেশ। কে যাচ্ছ তুমি ? একবার শুনে যাও।

কিন্তু ওরা কেউ বলাই নয় ; পরেশও নয়। যারা যাচ্ছে, তারা কাকিমার এই ক্ষীণ আর্তনাদ শুনতে পায় না। নয়ত, বুঝতেই পারে না। আজ সরিয়াডির বাতাসের এই ঝড় যেন ইচ্ছে করেই কাকিমার আর্তস্বরের সব আবেদন উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মিথ্যে করে দিচ্ছে। যেন কেউ শুনতে না পারে ; যেন কেউ ছুটে না আসে। আত্রেয়ী আজ ওরই একলা প্রাণের সম্বল নিয়ে যা ইচ্ছে হয় তাই করুক।

কিন্তু কাকিমা যে একটা দুঃস্বপ্নের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। রাধাপুরের সাত-আনির হাত যে শানানো রাম-দা তুলে ধরতে একটুও কাঁপে না। জীবনের ঝঞ্ঝাট শুধু এক

কোপে শেষ করে দিতেই জানে ; আর কোনও নিয়ম জানে না। আজ হেমন্তর কাছে আত্রেয়ীর এই ভুলের ক্ষমা নেই। সরিয়াডির আকাট মুখ্‌খু মেয়ে যে এখনি একটা রক্তমাখা লাশ হয়ে পড়ে যাবে।

রাস্তার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা সাইকেল ছুটে চলে যাচ্ছে। কাকিমা চেঁচিয়ে ডাক দেন—ও নরেন ! ও নরেন !

কিন্তু ওটা নরেনের সাইকেল নয়।

দিবাকরের বাড়িতে ছুটে যাবার জন্য চেষ্টা করতে গিয়েও যেতে পারলেম না ; দুই পায়ের দুই হাঁটুর হাড়ের গিঁটগুলি যেন খুলে আলগা হয়ে গিয়েছে। মেজের উপর ধপ্‌ করে বসে পড়লেন, আর, একটা প্রাণহীন অস্তিত্বের মত একেবারে নিথর হয়ে গেলেন কাকিমা।

॥ ২৫ ॥

শ্রীলেখা কটেজের বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। টেবিলের একদিকে নিখিল, আর, মুখোমুখি অন্যদিকে আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর খোঁপার গন্ধরাজের দিকে তাকিয়ে কথা বলে নিখিল।—ওটা কি টাটকা গন্ধরাজ ?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ, এই তো, সন্ধে হবার একটু আগে তুলেছি।

নিখিল হাসে—দেখে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু সত্যিই তো নয়।

আত্রেয়ী—কী বললেন ?

নিখিল—মল্লিক ডাক্তার নিজেই একটা খবর শুনিয়ে দিয়েছেন, তাই জানতে পেরেছি।

মাথা হেঁট করে আত্রেয়ী। চোখ দুটো শিউরে ওঠে। আর, মুখের হাসিটা যেন লজ্জারক্ত একটা আলো হয়ে ছলকে ওঠে।

নিখিল—আমি বোধ হয় কালই চলে যাব। কাজেই আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

আত্রেয়ী—আমরাও বোধ হয় আর দু'তিন দিন পরেই চলে যাব।

নিখিল—তা হলে বুঝুন, আজ আমাদের দু'জনের এই দেখাই শেষ দেখা।

আত্রেয়ী—তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু আবার হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যেতে পারে।

নিখিল হাসে—হয়ত হতে পারে। কিন্তু আমাকে দেখবার জন্যে আপনার মনে আর কি কোনও ইচ্ছে কিংবা আশা থাকবে ?

আত্রেয়ী—থাকবে বইকি।

নিখিল—আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না ; ভাবতে আপনার একটু কষ্টও হচ্ছে বোধ হয়।

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

নিখিল—আমাকে কি কখনও ভুলে যেতে পারবেন ?

আত্রেয়ী—না।

নিখিল—এই যে আমি, আপনার দু'দিনের চেনা একটা মানুষ হয়েও বার বার এসে শুধু দু'দিনের আনন্দের জন্য আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এত বেড়ালাম, সে সব কথা মনে থাকবে তো ?

আত্রেয়ী—থাকবে।

নিখিল—সবই ভাল লেগেছিল ?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

নিখিল—আমাকে কখনও ভাল লেগেছিল ?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

নিখিল—এখনও কি ভাল লাগে ?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

নিখিল—এত স্পষ্ট করে আগে কোনওদিন বলেননি কেন ?

আত্রেয়ী—বলবার দরকার কী ? আপনি তো বুঝতেই পারেন।

নিখিল—কিন্তু আপনি কি বুঝতে পারতেন না ?

আত্রেয়ী—কী ?

নিখিল—আপনাকেও আমার খুব ভাল লাগে।

আত্রেয়ী—বুঝতাম।

নিখিল—এখনও তো ভাল লাগছে।

চমকে উঠেছে আত্রেয়ী। কিন্তু মাথা হেঁট করে নয় ; চোখ তুলে সোজা নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়—ভালই তো।

নিখিল সেনের বুকের মরুপিপাসা এইবার জলভরা মেঘের ডাক শুনতে পেয়েছে। সরিয়াডির মেয়ের মুখের ভাষায় আর গলার স্বরে কোনও ভীরুতা কুণ্ঠা কৃপণতা নেই। কথাটা আত্রেয়ীর প্রাণের গোপনের একটি সঙ্কেতের ধ্বনি হয়ে বেজে উঠেছে।

আর দেরি করতে ইচ্ছে করে না। দেরি করে লাভই বা কী ? আত্রেয়ীর খোঁপার ওই গন্ধরাজ হাতের এক টানে ফেলে দিয়ে রেঙ্গুনলতার একটা মঞ্জরি পরিয়ে দিলেই তো হয়। তার পর সরিয়াডির মেয়ের ওই লালচে ঠোঁট দুটো ফুলে-ফুলে কাঁপবে আর নিবিড় এক ইচ্ছার ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

নিখিল—আর একটা কথা জানতে চাই।

আত্রেয়ী—বলুন।

নিখিল—হেমন্তবাবু কি আপনার কাছে একটা আশ্চর্য মানুষ ?

আত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করে ; কিন্তু হাসিটা যেন একটা ব্যথার বাধা পেয়ে ঠোঁটের ফাঁকে আটকে থাকে। কথা বলতে পারে না।

নিখিল—বলুন না ? চেপে রেখে লাভ কী ?

আত্রেয়ী—উনি আশ্চর্য মানুষ হবেন কেন ?

নিখিল—তবে ?

আত্রেয়ী—মানুষ যেমন হয় তেমনই একজন মানুষ।

নিখিল হাসে—নিশ্চয় আমার চেয়ে অনেক-অনেক উঁচুদরের মানুষ।

আত্রেয়ী—ঠাট্টা করছেন কেন ? আমি কি সে কথা বলছি ? আপনার সঙ্গে কি কারও তুলনা হয় ?

নিখিল—তবে ?

নিখিলের চোখের দৃষ্টিটা বড় তীব্র, যেন আত্রেয়ীর হৃৎপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখছে আর কি জানতে চাইছে নিখিল।

আত্রেয়ীর চোখের তারা ছটফট করে।—বলেছিই তো, আপনার মত মহৎ মানুষ আমি কখনও দেখিনি। বার বার জিজ্ঞেস করেন কেন ?

নিখিল—আর হেমন্তবাবু ?

আত্রেয়ী—তার কথা ছেড়ে দিন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিখিল। এগিয়ে যায়। আত্রেয়ীর কাছে দাঁড়ায়। আত্রেয়ীর চেয়ারের কাঁধের উপর হাত রাখে। একেবারে নীরব হয়ে, শুধু উষ্ণ নিঃশ্বাসের একটা বাতাস ছড়িয়ে দিয়ে সরিয়াডির মেয়ের মাথার ঢিলে খোঁপার দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ হাত তুলে দেয়ালের গায়ে আলোর সুইচটাকে চেপে ধরে নিখিল সেন। খুট্ করে একটি শব্দ বেজে ওঠে। শ্রীলেখা কটেজের বাইরের ঘর অন্ধকারে ভরে যায়।

কিন্তু নিতান্ত ব্যর্থ অন্ধকার। একটা অধঃপতিত দুঃসাহসের অন্ধতা মাত্র। সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ী সেই মুহূর্তে নিজেই যেন চকিত বিদ্যুতের মত একটা জ্বালা হয়ে ঘরের অন্ধকার ঝলসে দিয়েছে। আত্রেয়ী নিজেরই হাতে সুইচ টিপে ঘরের আলো তখুনি জ্বেলে দিয়েছে।

সুইচের উপরে একটা হাত শক্ত করে চেপে রেখে আর জ্বলন্ত দুটো চোখ তুলে নিখিলের মুখের দিকে তাকায়।

আত্রেয়ী—মহত্ত্ব দেখাচ্ছেন ?

কিন্তু নিখিল সেনের দুই চোখের তারা একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়ে, ভয়ানক অর্থহীন ও মূর্খ একটা জংলি বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে ; জ্বলছে সরিয়াডির এই মায়ানাগিনীর চোখ।

হাত কাঁপে নিখিলের ; তবু সিগারেট ধরায়। আর, দুই চোখ যেন একটা কুটিল শ্লেষে পিছল হয়ে গিয়ে চিকচিক করে কাঁপতে থাকে। —খুব যে থিয়েটার দেখাচ্ছেন।

আত্রেয়ী—বেশ করছি।

নিখিল—থিয়েটার দেখাবেন আপনার ভদ্রলোকের কাছে, আমার কাছে নয়।

আত্রেয়ী—সে জন্য আপনার উপদেশের কোনও দরকার নেই।

নিখিল—সেদিন চোখে মুখে চাঁদের আলো মেখে একা-একা নিখিল সেনের চোখের কাছে একেবারে একটি নৈবেদ্য হয়ে কেন এসেছিলেন ?

আত্রেয়ী—ইচ্ছে হয়েছিল।

নিখিল—সেদিন নিখিল সেন যদি হাত চেপে ধরত, কী করতেন আপনি ?

আত্রেয়ী—কিছুই বলতাম না।

নিখিল—তবে ?

আত্রেয়ী—চেপে ধরলেন না কেন ? তা হলে তো বুঝতেই পারা যেত...।

—কী বুঝতেন ?

—বুঝতাম, মহৎ না হলেও আপনি একটা মানুষ।

—আজ কী বুঝলেন ? আমি একটা অমানুষ ?

—একটা ভয়ানক নকল মানুষ।

—আপনি তা হলে কী ?

উত্তর দেয় না আত্রেয়ী। বাইরে যাবার দরজাটার দিকে তাকায়। নিখিল সেনের গলার স্বরে ছোট্ট একটা গর্জন শিউরে ওঠে। —যাবেন না।

আত্রেয়ীর চোখে একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে। —ছিঃ, কোথায় নেমেছেন আপনি !

নিখিল—আমাকে এভাবে অকারণে অপমান করে গেলে আমিও কিন্তু আপনার সারাজীবনের আশা-আহ্লাদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

আত্রেয়ী—কিছুই করতে পারবেন না।

নিখিল—সরিয়াডির মেয়ে যে একেবারে সাহসের দেবীর মত কথা বলছেন।

আত্রেয়ী—সাহস আছে বলেই বলতে পারছি।

নিখিল—সাহস করে হেমন্তবাবুর কাছে বলে দিতে পেরেছেন কি, কেন সেদিন একা-একা এই কটেজে এসে নিখিল সেনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন ?

আত্রেয়ী—বলবার দরকার হয় না।

নিখিল—আমি যদি বলে দিই, তবে কী হবে ? দাঙ্গাবাজ জমিদার যে রামদা'র এক কোপে এরকম একটি খাঁটি পতিব্রতা পত্নীর গলা কেটে দু'টুকরো করে দেবে।

আত্রেয়ী—ভালই হবে।

নিখিল—কী বললেন ?

নিখিল সেনের এই ক্ষিপ্র মুখরতার সঙ্গে আর তর্ক করতে চায় না আত্রেয়ী। কোনও কথা না বলে খোলা দরজার দিকে ছুটে চলে যায়।

কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়। বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছে হেমন্ত।

খুব জোরে বৃষ্টি ঝরিয়ে গরগর করছে সরিয়াডির মেঘ। দম্‌কা বাতাসে বৃষ্টির জলের গুঁড়ো ছুটে এসে এই খোলা দরজার কাছে ছিটকে পড়েছে। কিন্তু ঝুঁকে পড়েছে আত্রেয়ীর মাথাটা।

আত্রেয়ী বোধ হয় আর নড়তে পারবে না। ভয় নয় লজ্জাও নয়, চিরকালের মত মুছে যাবার আগে শুধু একটু ধৈর্য। লুকোবার ঢাকবার আর কিছুই নেই। আর চেষ্টা করবারও কিছুই নেই। এখন শুধু যদি হেমন্তের ঘৃণার আক্রোশটা চরম পুরস্কার হয়ে ছুটে এসে আর ক্ষমাহীন হাতে আত্রেয়ীর গলা টিপে ধরে আত্রেয়ীকে চরম ছুটি দিয়ে দেয়, তা হলেই মুক্তি পাওয়া হয়ে গেল। চুপ করে, শান্ত

হয়ে, যেন মাথা পেতে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী।

—চলে এসো আত্রেয়ী। হেমন্ত ডাকে।

মুখ তুলে হেমন্তর দিকে তাকায় আত্রেয়ী। হাসছে হেমন্ত, হাত তুলে ডাকছে হেমন্ত। আত্রেয়ীকে মরণ ঝিলের জল থেকে তুলে নেবার জন্য একটি আশ্চর্য মানুষের হাত ছটফট করছে। হাসিটাও যে বেশ দর্প করেই হাসছে।

এগিয়ে যায় আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর একটা হাত ধরে বারান্দা থেকে নেমে যায় হেমন্ত। ছাতাটা খুলে ধরে।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে নিখিল সেন চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনার কাছে একটা কথা বলবার ছিল, মশাই।

হেমন্ত মুখ ফিরিয়ে তাকায়।—আমার কাছে?

নিখিল—হ্যাঁ।

হেমন্ত—না; কিছ্ছু না, আপনার কিছুই বলবার নেই।

হেসে ফেলে আত্রেয়ী। এক হাতে ছাতা, আর এক হাতে আত্রেয়ীর গলা, হেমন্তও হাসতে থাকে—স্টেশনে গিয়ে মিথ্যে হয়রান হলাম। লিচুর ঝুড়ি আজও এসে পৌঁছয়নি।

শ্রীলেখা কটেজের গেট পার হয়ে কাঁকরের রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে নয়াপাড়ার সড়কের ল্যাম্পপোস্টের কাছে আসতেই চমকে হেসে ওঠে আত্রেয়ী—এবার হাতটা একটু নামাও।

হাত নামায় হেমন্ত, কারণ রাস্তার ওদিক থেকে আর একটি ছাতা একেবারে সামনেই এসে পড়েছে।

চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু—কে? আত্রেয়ী নাকি?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ জ্যাঠামশাই।

চন্দ্রবাবু—তোমার সঙ্গে উনি কে? জামাইবাবাজি নাকি?

আত্রেয়ী মুখ টিপে হাসে—হ্যাঁ; আপনার কোলে ওটি কে?

চন্দ্রবাবু—আমার নাতি। মল্লিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম, পায়ে ফোঁড়া হয়েছে।

আত্রেয়ী—কিন্তু নাতি যে ঘুমিয়ে পড়েছে, একটু শক্ত করে ধরুন।

চন্দ্রবাবু—শক্ত করেই তো ধরে আছি। জোর বৃষ্টির সঙ্গে ঝুরঝুর করে শিলা ঝরছে আর ছাতার উপর আছাড় খেয়ে সাদা খইয়ের মত ছিটকে পড়ছে।

চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন চন্দ্রবাবু—কী ব্যাপার। কী আশ্চর্য। ওহে, ও দিবাকর? আজ হঠাৎ এত শিলাবৃষ্টি কেন?

জিয়াভরলি

আকাশ খুব পরিষ্কার। ভোরের দিকে অবশ্য সামান্য একটু কুয়াশার ঘোর ছিল। কিন্তু সকালবেলার রোদের সাড়া ঝলমল করে জেগে উঠতেই সে-কুয়াশা শুকিয়ে গিয়েছে। আকাশ পাড়ি দেবার জন্যে একশো এগারো নম্বর ফ্লাইটের ডাকোটা ঠিক সময়েই গুমরে উঠেছে।

কলকাতা থেকে গৌহাটি, তারপর গৌহাটি থেকে তেজপুর ; এই ডাকোটার একদফা আকাশযাত্রা তেজপুরে গিয়ে শেষ হবে। অনেক যাত্রীর মত শুক্তি বসুও তেজপুরে নেমে যাবে।

প্লেনে ওঠবার সিঁড়িটার কাছে পৌঁছেই একবার থমকে দাঁড়ায় শুক্তি ; মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে, হ্যাঁ, ওরা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু ছোট্ট সুকুর ছোট্ট হাতটা ছটফট করে রুমাল দোলাচ্ছে। আর মনে হল, বড় পিসি যেন তাঁর চশমাটাকে শাড়ির আঁচলে তাড়াতাড়ি করে একবার মুছে নিয়েই আবার চোখে পরলেন।

বোধ হয় বেশ আনমনা হয়ে গিয়েছিল শুক্তি ; তাই বুঝতে পারেনি, প্লেনটা কখন আকাশে উঠে পড়েছে। পাল্টে গিয়েছে ডাকোটার গুঞ্জনের সুর। নীচের এয়ারপোর্টের কিছুই আর দেখতে পাওয়া গেল না। শুধু দেখতে পাওয়া গেল, ধানক্ষেতের উপর দিয়ে টানা টেলিগ্রাফের তারে সাদা বকের সারি চুপ করে বসে আছে।

প্লেন ছাড়বার আধঘন্টা আগে দমদম এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে বড় পিসিমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল শুক্তি, পিসিমা যেন শুক্তির কোনও কথা শুনতে পাচ্ছেন না। আনমনার মত উসখুস করছেন, আর, আকাশের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করছেন।

হেসে ফেলেছিল শুক্তি।—ওরকম করে কী দেখছ, বড় পিসি ?

বড় পিসি চমকে ওঠেন।—কী বললে ?

শুক্তি আবার হাসে।—একটুও ভেবো না। ভাবনা করবার কিছু নেই। ওটা আমার চেনা আকাশ।

কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলেনি শুক্তি। হ্যাঁ, চেনা আকাশ। বছরে অন্তত পাঁচবার যে মেয়েকে বিমানযাত্রিনী হয়ে কলকাতা থেকে তেজপুরে যাওয়া-আসা করতে হয়, তার কাছে ওই আকাশের সব কিছুই চেনা। মেঘের চেহারা দেখেই বলে দিতে পারবে শুক্তি, ওটা গারো পাহাড়ের মেঘ ; কুয়াশা দেখেই বুঝে নিতে পারে শুক্তি, প্লেন এইবার ব্রহ্মপুত্র পার হবে। জানে শুক্তি, ঠিক কখন প্লেনের জানালার কাচের কাছে চোখ দুটো এগিয়ে নিলে দেখতে পাওয়া যাবে, ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘের ঘূর্ণি উড়ছে আকাশে। সিটবেল্ট কোমরে জড়াবার জন্যে রঙিন নির্দেশের লেখা এখনি দপ করে জ্বলে উঠবে। ঝড়ো হাওয়ার দাপট এড়াবার জন্য ছটফট করে গা-ঝাড়া দিয়ে উপরে উঠবে প্লেন। কিন্তু নীচের ওটা কি তিস্তার বেনো জলের স্রোত ? তবে তো আর দেরি নেই ; শেষ এয়ার-পকেট পার হতে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় লাগবে। এলোপাথাড়ি বাম্প করবে প্লেন।

ঠিকই, যেন চেনা আকাশ দেখতে পেয়ে ভয়কাতুরে পাখির ডানা হঠাৎ খুশির সাহসে ছটফটিয়ে উঠেছে। সঙ্গে কাউকে যেতে হয় না ; একাই এভাবে একহাতে শুধু ছোট্ট একটা ব্যাগ, আর, অন্য হাতে এয়ার-প্যাসেঞ্জের টিকেট বইটাকে দোলাতে দোলাতে চলে যায় শুক্তি। কলকাতা থেকে

তেজপুর ; তেজপুর থেকে কলকাতা একাই যায় আর ফিরে আসে। বড় পিসি তাই একটু আশ্চর্য না হয়ে পারবেন কেন, এই মেয়েই যে কলকাতায় থাকতে ঘরের বাইরে একা বের হতে চায় না। কোনওদিন একা বের হবার দরকার হলে শুক্তির অমন কালো চোখ দুটোও যেন আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

আজ এখন মনে পড়তেই শুক্তির সাহসখুশি প্রাণটা বেশ লজ্জা পায়। ছি, মিছিমিছি অবুঝ হয়ে বড় পিসিকে কত না বিরক্ত করা হয়েছে। বড় পিসির গাড়ির ড্রাইভার কেষ্টবাবু সাতদিনের ছুটি নিয়েছিলেন। সেই সাতদিন কলেজ কামাই করে ঘরেই রইল শুক্তি। বড় পিসি কত করে বোঝালেন, ট্রামে-বাসে একা যেতে ভয় কিসের? কত মেয়েই তো একা-একা ট্রামে-বাসে যাওয়া-আসা করে কলেজ করছে। না, শুক্তির আপত্তি টলাতে পারেননি বড় পিসি। অথচ ওইটুকু মেয়ে, ওই কৃষ্ণাটা সেদিন যেন আরও খুশি হয়ে একাই বের হয়ে গেল ; ট্রামে চড়ে স্কুলে গেল আর ফিরে এল।

এক-আধ বছর নয় ; এই চার বছর ধরে চেনা আকাশের পথে যাওয়া-আসা করতে গিয়ে, আর বার বার দেখে দেখে শুক্তির চোখে অনেক মুখও চেনামুখ হয়ে গিয়েছে। শুক্তি তাদের চেনে, তারাও শুক্তিকে চেনে। এই ডাকোটার পাইলট, যিনি আজ শুক্তিকে দেখতে পেয়েই মৃদুহাসির সঙ্গে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা একটু হেলিয়ে দিলেন, তাঁকে চিনতে একটুও দেরি হয় না শুক্তির। গত বছর গরমের ছুটির শেষে তেজপুর থেকে কলকাতায় ফেরবার ডাকোটাতে ইনিই ছিলেন পাইলট। শুক্তির হাতব্যাগটা হঠাৎ খুলে গিয়ে একগাদা ফটো প্লেনের মেজের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিন এই পাইলট ভদ্রলোক সেইসব ফটো কুড়িয়ে তুলে দিয়েছিলেন।

ওই তো, আরও একটি চেনামুখ। ওই এয়ার-হোসটেস মেয়েটির নাম শান্তি কাপুর। প্রায় এক বছর আগে একবার দেখা হয়েছিল। শুক্তির হাতের কাছে গরম কফির পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে প্রায় দশ মিনিট ধরে গল্প করেছিল শান্তি কাপুর। খুব মাথা ধরেছিল শুক্তির, এই শান্তিই সেদিন ব্যস্ত হয়ে মাথাধরা ওষুধের একটা মিষ্টি ট্যাবলেট নিয়ে এসে শুক্তির কফির পেয়ালাতে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু বড় পিসি আর ওরা, সবাই কি এখনও এই উড়ন্ত ডাকাটোর দিকে তাকিয়ে রানওয়ের শিকল-বেড়াটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে? সুকু কি এখনও রুমাল দোলাচ্ছে? বেণী কামড়াচ্ছে কৃষ্ণাটা? কী আশ্চর্য, কৃষ্ণাকে কতবার ধমক দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল, এটা একটা বিচ্ছিরি অভ্যেস। তবু যখন তখন আনমনা হয়ে যায় কৃষ্ণা, আর, বেণীটাকে মুখের কাছে টেনে নিয়ে কামড়ায়।

বুঝতে পারে শুক্তি, মনটা কেন হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। কী দরকার ছিল কৃষ্ণাকে এত ধমক-ধামক দেবার? একটু আদর করে, গলা জড়িয়ে ধরে আর গাল দুটো টিপে দিয়ে, একটু মিষ্টি করে বলে দিলেই তো হত , বেণী কামড়াতে নেই কৃষ্ণা ওতে অসুখ হতে পারে।

শুক্তিরই বড় পিসির মেয়ে কৃষ্ণা। ঠিক শুক্তিদির মত শক্ত করে বাঁধা একটা বেণী না দোলালে ওর শখের ইচ্ছেটা সুখী হতে পারে না। তেরো বছর বয়স ; কিন্তু এখনও তিন বছর বয়সের বাচ্চার মত ফোলা-ফোলা গাল। না, শুক্তির হাত নিসপিস করলেও কৃষ্ণাকে গাল টিপে আদর করবার এখন আর কোনও উপায় নেই। হাতব্যাগের ভিতর থেকে একটা ফটো বের করে দেখতে থাকে শুক্তি। একটা গ্রুপ ফটো। শুক্তির দশ বছর বয়সের পিসতুতো ভাই ওই ছোট্ট সুকুর জন্মদিনে এই তিন মাস আগে এই ফটো তোলা হয়েছিল।

পিসেমশাই আর বড় পিসি পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে আছেন। তাঁদের সামনে বসে আছে কৃষ্ণা আর সুকু। সুকুর হাতে জন্মদিনের উপহার সেই চকোলেটের তাজমহল। তাজমহলটাকে দু'হাতে ধরে কোলের উপর বসিয়ে, কেমন সুন্দর শান্তটি হয়ে আর চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সুকু। আর, কী আশ্চর্য, কৃষ্ণাটা বেণী কামড়াচ্ছে।

ঝিকঝিক করে হাসতে থাকে শুক্তির চোখ দুটো। শুক্তির কলকাতার জীবনে ওই সুকু আর কৃষ্ণা যে শুক্তির দুটি ভাই আর বোন। জানে না শুক্তি, বুঝতেও পারে না, আপন ভাই-বোন থাকলে ওরা সুকু আর কৃষ্ণার মত না হয়ে অন্য রকমের কিছু হত কিনা।

আর বড়দা? বড় পিসির বড় ছেলে দিবাকরই তো শুক্তির বড়দা। আজ প্রায় দেড় বছর হল

সাত দিনের জন্যেও ছুটি নিতে পারেননি। তাই দিল্লী ছেড়ে কলকাতায় আসতে পারেননি। করুণা বউদিও দেড় বছর হল দিল্লীর বন্দিনী হয়ে পড়ে আছেন।

ভুলতে পারেনি শুক্তি, আজ এখন বরং আরও বেশি করে মনে পড়ছে, দিল্লী রওনা হবার আগের দিন শেক্সপিয়রের কমেডির ভল্যুমটা হাতে তুলে নিয়ে আর চোখ পাকিয়ে শুক্তিকে শাসিয়েছিলেন বড়দা—ফাইনালের ফল যদি ভাল না হয়, তবে জেনো, এই বই দিয়ে পিটিয়ে তোমার ওই তিলফুল নাসিকা আমি থেঁতো করে দেব।

ফাইনাল তো এগিয়ে আসছে। কিন্তু বড়দা বোধ হয় এখনও জানেন না যে, এ বছর ফাইনাল না দেবার জন্যেই তৈরি হয়েছে শুক্তি। বড় পিসিও বলেছেন, থাক এবার, এখনও ক্যালকুলাসের একটা লিমিট বুঝতে হিমসিম খায় যে মেয়ে, সে মেয়ের পক্ষে টেস্ট পার হওয়াই অসম্ভব। ফাইনাল তো স্বপ্ন।

ভাবতে ভয় ভয় করে। বড় পিসি কি পরশু দিনের সেই চিঠিতে বড়দাকে সত্যিই ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছেন ?

করুণা বউদির চিঠিটা কিন্তু একটা সান্ত্বনা। মাসখানেক আগে ইন্দ্রপ্রস্থে বেড়াতে গিয়ে পা মচকে গিয়েছিল করুণা বউদির। পা-মচকানির ব্যথা এখন সেরে গিয়েছে। শুক্তির জন্যে খুব সুন্দর দেখতে একটা রেশমি ওড়না কিনেছেন করুণা বউদি, কুমায়ুনি গাঁয়ের মেয়েরা বিয়ের দিনে যে ওড়না গায়ে জড়ায়। সব কথার শেষে লিখেছেন—পরীক্ষার জন্যে ভাবনা করে মুখ শুকনো করার কোনও দরকার নেই। কোনও ভয় নেই শুক্তি, একটুও ভেবো না। তোমার আসল ফাইনালের সময় আমি তোমার কাছেই থাকব।

কিন্তু এ কেমন সান্ত্বনা ? ভাষাটাও কেমন যেন! ভুল ধারণা করে একটা ভুল নির্ভয়ের বাণী শুনিয়েছেন করুণা বউদি। বউদি জানেন না যে, ফাইনাল না দেবার জন্যেই তৈরি হয়ে শুক্তি আজকাল বেশ ভাবনাহীন মনের খুশিতে দুবেলা এসরাজ হাতে তুলে নিয়ে কৃষ্ণাকে জোর করে গান শেখায়—কত গান তো হল গাওয়া...।

দেখতে পায়নি শুক্তি, শান্তি কাপুর কখন এসে কাছে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে। শান্তি বলে—চিনতে পারছেন ?

শুক্তি—নিশ্চয়।

শান্তি—হাসছিলেন কেন ?

চমকে ওঠে শুক্তি।—অ্যাঁ ? হাসছিলাম ? হবে।

শান্তি কাপুর এইবার মুখ টিপে হাসে।—বোধ হয় কোনও খুব-ভাল-কথা ভাবছিলেন।

শুক্তি—হ্যাঁ, আমার বোন কৃষ্ণার কথা ভাবছিলাম। আবার যেদিন কলকাতায় ফিরব, সেদিন কৃষ্ণাকে একটা গল্প বলে আশ্চর্য করে দেব।

শান্তি কাপুর—কিসের গল্প ?

শুক্তি হাসি।—গল্পটা এই যে, হঠাৎ মনে হল, আপনার এই ডাকোটার গম্ভীর শব্দটা যেন চুরি করে একটা গান গাইছে।

দুই চোখ বড় করে শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শান্তি কাপুর। কোনও কথা বলে না।

শুক্তি বলে—আপনারও নিশ্চয় অনেকবার এরকম মনে হয়েছে। কোনও গানের লাইন মনে পড়ে গেলেই মনে হবে যে, বাইরের শব্দগুলি যেন...। তাই নয় ? কী বলেন আপনি ?

শান্তি কাপুর আবার মুখ টিপে হাসে।—বুঝলাম, গান গাইছে আপনার হৃদয়টি। ইওর হার্ট ইজ সিংগিং।

ব্যস্তভাবে চলে যায় শান্তি কাপুর। কিন্তু শুক্তির মুখের উপর কেউ যেন একটা লাজুক কুহকের আবির ছিটিয়ে দিয়েছে। সারা মুখ লালচে হয়ে গিয়েছে। মাথাটাও একটু হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। মুখ তুলে আর তাকিয়ে দেখতে সাহস হয় না, শান্তি কাপুর এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আর কী করছে।

কৃষ্ণাটার মনে বুদ্ধি-সুদ্ধি নামে কোনও পদার্থ নেই। তা না হলে সেদিন অনায়াসে আস্তে একটা

কথা বলে অন্তত ইশারায় জানিয়ে দিতে পারত কৃষ্ণা, শুক্তিদি সাবধান, শ্যামলদা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তোমার গান শুনছেন আর হাসছেন।

শুক্তি দেখতে পায়নি, কিন্তু কৃষ্ণা দেখতে পেয়েছিল। কৃষ্ণা যে সোজা দরজার দিকে মুখ করে ঘরের ভিতরে চেয়ারটার উপরে বসেছিল। শুক্তি বসেছিল ঘরের কোণের ছোট কোচের উপরে, মখমলে মোড়া একটা পালকের বালিশকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গান গাইছিল। ওই গান, কত গান তো হল গাওয়া...। শুক্তি কেমন করে দেখবে যে, দরজার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না আছে ?

ঘরের ভিতরে ঢুকল শ্যামল। শুক্তির দিকে একবার তাকাল। শুক্তির বুকের ভিতর থেকে যেন এক ঝলক লাজুক রক্তের ভয় উথলে উঠে সারা মুখে রঙিন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পালকের বালিশটাকে তুলে নিয়ে মুখ ঢাকা দেয় শুক্তি।

কৃষ্ণার হাতে মস্ত বড় একটা মাটির কমলালেবু তুলে দিয়ে চলে গেল শ্যামল।—এর চেয়ে ভাল কমলালেবু বাজারে পাওয়া যায় না কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—লিচু ?

শ্যামল বারান্দায় দাঁড়িয়ে জবাব দেয়—এটা লিচুর সিজন নয়।

কৃষ্ণা—বাঃ, মাটির লিচুর আবার সিজন কি ? চালাকি পেয়েছেন ?

—তবে দেখব চেষ্টা করে, পাই কিনা।...কাকিমা কোথায় ? বলতে বলতে চলে গেল শ্যামল, বোধ হয় দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির দিকে, কিংবা নীচের তলার ওই ঘরটার দিকে, যেখানে সুকুর টিউটর গণেশবাবু এখন চুপ করে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন।

মনে পড়বে না কেন ? খুব মনে পড়ছে, শ্যামলবাবুও আজ এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। শুক্তি যখন বড় পিসিকে প্রণাম করে বিদায় নিল, তখন সুকুর পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্যামলবাবু। বেশ বিপদে ফেলেছিলেন বড় পিসি। একবার নয়, বার বার তিনবার শুক্তির কানের কাছে মুখ নিয়ে একটি কথা বললেন, শ্যামলকে দু-একটা কথা বলে যাও, শুক্তি।

পিসিমাকে একবার স্পষ্ট করে বলে দিতে ইচ্ছে করেছিল, আমাকে দিয়ে বলাবার চেষ্টা কেন ? তোমাদের যা ইচ্ছে হয়, যা ভাল মনে কর, তাই করে ফেললেই তো হয়। তোমাদের এই অদ্ভুত সন্দেহ কেন যে, আমি একটা বেহায়া বিদ্রোহিনীর মত তোমাদের ইচ্ছের কথায় একেবারে 'না' করে বসব।

তবে হ্যাঁ, যা আমি পারি না, তা আমি পারি না। শ্যামলবাবুকে কিছু বলতে-টলতে পারব না। তোমাদেরও জেদ আর মরজির রকম বুঝতে পারি না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, শ্যামলবাবুর কাছে আমাকে দিয়ে কথা না বলিয়ে নিলে তোমরা যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছ না। কিন্তু করুণা বউদিকে আমি তো কবেই বলে দিয়েছি, শ্যামলবাবুর মত চমৎকার মানুষ হয় না। আর কত বলব ? কি-ই বা বলবার আছে ?

না, আজ আর মুখ লুকোতে চেষ্টা করেনি, ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করেও ওঠেনি, শ্যামলের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে একটা কথা বলে দিতে পেরেছে শুক্তি—আসি তবে।

বড় পিসি নিশ্চয় খুব আশ্চর্য হয়েছেন। বোধ হয় ভাবছেন, যে মেয়ে আজ এত সহজে একেবারে শ্যামলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পেরেছে, সে মেয়ে এতদিন মুখ বন্ধ করে ছিল কেমন করে ?

হাতঘড়ির দিকে তাকায় শুক্তি। হ্যাঁ, এতক্ষণে সবাই চলে গিয়েছে। বড় পিসির গাড়ি এতক্ষণে বোধ হয় আলিপুর ব্রিজ পার হল। ওদিকে বড় পিসেমশাই এতক্ষণে নিশ্চয় তাঁর চেম্বারে যাবার জন্যে ছটফট করে গাড়ির খোঁজ করছেন। আজ শুক্তিকে বিদায় দিতে বড় পিসেমশাইও এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নিশ্চয় আসতেন। কিন্তু আসতে পারলেন না। শুধু বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে এসে শুক্তির পিঠে হাত বুলিয়ে আক্ষেপ করেছেন, যেতে পারলাম না শুক্তি। সকাল থেকে টেলিফোনে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করছেন মক্কেল, আজ আপিলের শুনানি। আমি আজ খুবই ব্যস্ত। লক্ষ্মী মেয়ে, তেজপুরে পৌঁছেই তার করে একটি খবর দিও।

শ্যামলবাবুও চলে গিয়েছেন। কে জানে কতক্ষণ ওখানে ওভাবে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। কে

জানে কী মনে করে চলে গেলেন।

একটা হাত তুলে, চোখ বন্ধ করে, বাঁ চোখের ভুরুর উপর শক্ত করে একটা আঙুল চেপে রাখলেও মনের ভিতরে এ ছাই চিন্তাগুলি একটুও চাপা থাকতে চায় না। ভাবতে কষ্ট হয় বইকি। শ্যামলবাবু হয়ত আজ সন্ধ্যে হতেই ভুল করে, সেই ভবানীপুর থেকে আলিপুরে বড় পিসির বাড়িতে হঠাৎ একবার এসে পড়বেন। শুক্তির এসরাজটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকবেন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়বেন আর চলে যাবেন—না, আজ আমি আর চা খাব না কাকিমা। চলি কৃষ্ণা, যাচ্ছি রে সুকু।

আবার চমকে উঠতে হল। চোখ মেলে তাকায় শুক্তি। শান্তি কাপুর বলছে—মাথা ধরেছে বোধ হয়।

শুক্তি হাসে।—না।

॥ ২ ॥

কৃষ্ণার চেয়ে বয়সে ন' বছরের বড়, তার মানে, বাইশ বছর বয়স হয়েছে এই মেয়ের, যার নাম শুক্তি। এখনও ভাবছে, এবার ফাইনাল না দিয়ে একটা বছর পিছিয়ে থাকলে কেমন হয়? কে জানে কবে বি-এ, এম-এ পাস করবে এই মেয়ে। কোনওদিন পাস করতে পারবে কিনাও সন্দেহ। তার উপর যদি ফাইনালের ভয়ে এভাবে এক-একটা বছর নষ্ট করতে থাকে, তবে তো...।

জয়ন্ত সরকার বলেন—তুমিও ভুল করেছ। তোমার পরামর্শে মেয়েটা অঙ্ক নিতে বাধ্য হল। তুমি নিজে অঙ্কের গ্র্যাজুয়েট বলে মনে করেছ, সবাই...।

সুমিত্রা বলেন—স্বীকার করি, ভুল হয়েছে। কিন্তু তুমিও ভুল পরামর্শ দিয়েছিলে। হিস্ট্রি নিলে শুক্তির একটুও সুবিধে হত না। তোমার মত শুক্তিরও কিচ্ছু মনে থাকে না।

সত্যি কথা, শুক্তির বড় পিসেমশাই জয়ন্ত সরকার আর বড় পিসি সুমিত্রা, দু'জনেই শুক্তির জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে যতটা চিন্তা করেন, তাঁদের নিজের মেয়ে কৃষ্ণার জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার সিকিভাগ চিন্তাও করেন না। শুক্তির বাবা গগন বসু যেন প্রতিজ্ঞা করে মেয়েটার জীবনটাকে নিয়তির ইচ্ছার কাছে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিয়েছেন। লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছে হলে শিখবে, ইচ্ছে না হলে শিখবে না। যদি বিয়ে করতে চায় তো বিয়ে করবে, না চায় তো চিরকুমারী হয়ে থাকবে। ব্যস্‌ গগন বসু এর বেশি আর কিছু বলতে ভাবতে কিংবা কোনও চেষ্টা করতে পারবেন না।

শুক্তির বাবা, কদমবাড়ি চা-বাগানের বড় মালিক গগন বসুর এই একরোখা ঔদাসীন্য কি মেয়ের প্রতি বাপের বিরূপ মনের একটা কঠিন ভর্ৎসনা? মোটেই নয়। জানেন সুমিত্রা, তাঁর দাদা ওই গগন বসু আজকাল দিনরাত শুধু শুক্তির কথাই ভাবেন। শুক্তির মা কিরণলেখাও মাঝে মাঝে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে কদমবাড়ি থেকে চিঠি লেখেন, কবে আসবে শুক্তি? কলেজের ছুটি শুরু হবে কবে? এদিকে মানুষটা যে সব কাণ্ড শুরু করেছে, সে সব আর লিখে কুলোতে পারব না। বিছানার কাছে একটা ছোট টেবিলে শুক্তির একটা ফটো দাঁড় করিয়ে রেখেছে; ঘুম ভেঙে তাকালেই মেয়ের মুখটি যাতে চোখে পড়ে।

গগনদার দুই মেয়ে, অঞ্জনা ও অর্চনার বিয়ে কবেই হয়ে গিয়েছে। ছেলে নেই গগনদার। তাই এই তৃতীয়া কন্যাটি, বাইশ বছর বয়সের এই শুক্তিকে যেন কোলের মেয়েটি বলে মনে করেন গগনদা। তা করুন না কেন, কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু বুঝতে পারেন না সুমিত্রা, শুক্তির বিয়ের কথা তুলে কোনও মতামত জানতে চাইলেই গগনদার জবাবের চিঠিটা কেন অদ্ভুত এক আতঙ্কের ভাষায় মুখরিত হয়ে ছুটে আসে; না, ওসবের মধ্যে আমি আর নেই।

মাঝে মাঝে গগনদার এমন চিঠিও আসে, যার মধ্যে কী-যেন বুঝিয়ে বলবার একটা করুণ চেষ্টার আর্তস্বর শোনা যায়। চিঠিটাকে বার বার দু-তিনবার পড়ে বুঝতে চেষ্টা করেন সুমিত্রা, কী বোঝাতে চাইছেন গগনদা। 'তোমরা যারা শুক্তির জীবনের ভাল চাও, তারা যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমি কোনও দায়িত্ব নিতে পারব না। কিন্তু শুক্তি কি নিজেই কিছু বলেছে? বলে থাকলে ভালই।'

গগনদার চিঠির এমন জিজ্ঞাসার সামনে বসে ভাবতে গেলে দায়িত্ব নেবার আনন্দটাও একটু করুণ হয়ে যায় বইকি। তাই ভাল, শুক্তি নিজেই বলুক।

কিন্তু কী অদ্ভুত ভীরু স্বভাবের মেয়ে এই শুক্তি। শ্যামলের সঙ্গে আজও ভদ্রভাবে একটু মেলামেশা করতে পারল না। ইচ্ছের কথাটা মুখ খুলে বলতেও পারছে না। অথচ, নিজের কানে শুনেছেন সুমিত্রা, কলেজ থেকে ফিরে এসেই কৃষ্ণাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করেছে শুক্তি, শ্যামলবাবু এসেছিলেন নাকি, কৃষ্ণা ?

সুমিত্রার বড় জা সুধাদির বড় ছেলে এই শ্যামল। শুধু কি দেখতে সুন্দর ? গুণে জ্ঞানে ও রোজগারেও কিছু কম সুন্দর নয় শ্যামল। তিন বছর হল ভিয়েনা থেকে ফিরেছে, সার্জারিতে শ্যামল সরকারের হাতযশ এখন কলকাতার হাসপাতাল ও ডাক্তার মহলের বৈঠকে নিত্যদিনের গল্প হয়ে উঠেছে। এই তো, গত মাসে রাজস্থানের এক কুমারসাহেব এসে শ্যামলের নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। পেটের একটা ভয়ানক ম্যালিগনেন্ট টিউমার অপারেশন করিয়ে, আর এক হাজার এক টাকা দক্ষিণা দিয়ে, বেশ খুশি হয়ে রাজস্থানে ফিরে গিয়েছেন সুস্থ কুমারসাহেব।

শ্যামল সরকারের ভবানীপুরে বাড়িতে একদিন সন্ধ্যা হতেই বেশ সুন্দর একটি উৎসবের আনন্দ জেগে উঠেছিল। শ্যামলের জন্মদিনে চেনা-শোনা বন্ধু ও স্বজনের হাসিখুশি মেলামেশা আর খাওয়া-দাওয়ার উৎসব। বড় জা সুধাদি চিঠি দিয়ে সুমিত্রাকে জানিয়েছিলেন, তোমরা সবাই আসবে।

সবাই গিয়েছিল। অ্যাডভোকেট জয়ন্ত সরকারের মনটা সেদিন জজের একটা রূঢ় কথার আঘাতে খুবই বিষণ্ণ ছিল। তবু, তিনিও শ্যামলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। যায়নি শুধু শুক্তি। করুণা বউদি শুক্তিকে কত সাধাসাধি করে কত কি বোঝালেন। কিন্তু শুক্তি যেতে রাজি হয়নি।

অথচ, কী আশ্চর্য, কৃষ্ণাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে, কৃষ্ণার হাতে ফুলের একটা তোড়া ধরিয়ে দিয়েছিল শুক্তি।—শ্যামলবাবুকে দেবে, ভুলে যেও না কিন্তু।

না, এরপর আর শুক্তির ঘরকুনো স্বভাবটার উপরে রাগ করতে পারেননি বড় পিসি সুমিত্রা। করুণা বউদি তো খুশি হয়ে হেসেই ফেলেছিলেন।

একদিন চন্দননগর থেকে বাড়ি ফিরে আরও একটু আশ্চর্য হয়ে আরও একটু বেশি খুশি হয়েছিলেন সুমিত্রা। বাড়িতে আর কেউ ছিল না, শুধু ছিল শুক্তি। ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন সুমিত্রা, একটা বই হাতে নিয়ে মিররের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শুক্তি।

সুমিত্রা বলেন—এ কী ? সন্ধে হয়ে এল, এখনও সেই দুপুরবেলার শাড়িটা পরে রয়েছ ?

শুক্তি বলে—শ্যামলবাবু এসেছিলেন।

চমকে ওঠেন সুমিত্রা—তাই নাকি। তারপর ?

শুক্তি বলে—বেশিক্ষণ ছিলেন না।

সুমিত্রা—তা তো বুঝলাম, কিন্তু...।

শুক্তি—হ্যাঁ, চা খেয়েছেন শ্যামলবাবু।

সুমিত্রা—কে চা করলে ? তুমি ?

শুক্তি—হ্যাঁ।

সুমিত্রা—কী বললে শ্যামল ?

মুখ না ফিরিয়ে মিররের দিকে তাকিয়ে থাকে শুক্তি। দেখতে পেয়েছিলেন সুমিত্রা, মেয়েটার মুখটা সত্যিই যেন একটা লজ্জার রক্তগোলাপ। চোখের তারা দুটো সন্ধ্যাতারার ভীরু হাসির মত কাঁপছে। না, আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করে মেয়েটার এই মূক লাজুক প্রাণটাকে ত্যক্ত করার কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া, ভাবতে গিয়ে নিজেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়েন সুমিত্রা। সত্যিই তো, শ্যামল যে কথা শুক্তিকে বলেছে, সে কথা শুক্তির বড় পিসির না শুনলেও চলবে। শুক্তি বলবেই বা কেন ?

কিন্তু একটু পরেই বাগানের কদম গাছের মাথায় সন্ধ্যার অন্ধকার যখন বেশ কালো হয়ে উঠেছে,

ঠিক তখন কৃষ্ণার মুখ থেকে একটা উদ্বেগের প্রশ্ন শুনতে পান সুমিত্রা।—শুক্তিদির বোধ হয় জ্বর হয়েছে, মা।

—কে বললে ?

—শুক্তিদি চুপ করে, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বসে আছে।

ছুটে এলেন সুমিত্রা।—কী হল শুক্তি, লক্ষ্মী মা ? মাথা ধরেছে বোধ হয় ?

চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে হেসে ফেলে শুক্তি।—কিছু হয়নি। মিছিমিছি মাথা ধরবে কেন, ছি !

সুমিত্রা—তবে ওঠো। হাতমুখ ধুয়ে সাজ বদলে নাও। সেই কাশ্মীরি মসলিনের শাড়িটা পরো, করুণার মা যেটা তোমাকে উপহার দিয়েছেন। শাড়িটা সত্যিই খুব সুন্দর, কী বলিস কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—সত্যি, চমৎকার। হংসমিথুন আঁকা, ঝলমল ছলছল...।

কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে ধমক দেন সুমিত্রা।—এতক্ষণে কথা ফুটেছে বোকাটার মুখে। কেন, একবার তো শুক্তিদির হাত ধরে বলতে পারতিস, ওঠো শুক্তিদি, গান গাইবে চলো।

কৃষ্ণার স্কুলের পাঠ্য একটা বইয়ে একটা গল্প আছে। কৃষ্ণার ধারণা, ওটাই সব চেয়ে মজার গল্প। একদা এক কাঠুরিয়া কুঠার হাতে লইয়া পলাশবনে প্রবেশ করিয়াছিল।...

কিন্তু কাঠ কাটতে পারেনি কাঠুরিয়া। কোনও পলাশের গায়ে কুঠারের কোপ বসাতে পারেনি। ফাল্গুন মাসের টাটকা ফোটা পলাশফুলের রঙের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই কাঠুরিয়ার চোখ। কাঠুরিয়ার মন বলিল, আহা, এমন শোভা ধরিতে পারে যে তরুর ফুল, তাহার গায়ে কুঠার হানিতে নাই।

শ্যামল ছেলেটি যেন পলাশবনের কাঠুরিয়ার চেয়েও নরম মনের মানুষ। বড় পিসি একদিন জানতে পেরেছিলেন, আর করুণা বউদি নিজের চোখে দেখতে পেয়েছিলেন, শ্যামলের একটা মায়াময় অনুরোধের কথা শুনে কী অদ্ভুত রূঢ় অভদ্রতার কাণ্ড করে ফেলেছিল শুক্তি।

—চলো না, আমাদের ওখানে একবার ঘুরে আসবে। আমার সঙ্গেই চলো। এই তো সামান্য একটা কথা। বারান্দার টবের গোলাপটার কাছে, যেখানে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে লেস বুনছিল শুক্তি, সেখানে এগিয়ে যেয়ে শুক্তিকে শুধু এই কয়েকটি কথা বলেছিল শ্যামল।

বারান্দার একটা চেয়ারের উপর হাতের লেস আর কাঁটা তখনি ঝুপ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরে গেল শুক্তি। সোজা সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠে একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে আর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বসে রইল।

কিন্তু শ্যামলের চোখ দেখে বোঝা যায়, একটুও রাগ করেনি শ্যামল। দুঃখিত ব্যথিত বিষণ্ণ, কিছুই হয়নি শ্যামল। শ্যামলের চোখে মুখে কোনও রূঢ় বিস্ময়ের ছায়াও দেখতে পাওয়া যায়নি। শুক্তির নামে ঠাট্টা করেও সামান্য একটু শক্ত ভাষায় কথা বলতে পারেনি শ্যামল। বরং শ্যামলের মুখের শান্ত হাসিটা যেন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল, শুক্তির এই অদ্ভুত অভদ্র লজ্জার কাণ্ডটাই একটা মায়ার শোভা হয়ে শ্যামলকে আশ্চর্য করে দিয়েছে।

করুণা বউদিকে দেখতে পেয়ে শ্যামল শুধু বলেছিল—শুক্তি আমাকে ভুল বুঝল না তো, বউদি ?

শ্যামল চলে যাবার পর, করুণা বউদিও সোজা দোতলার ঘরে গিয়ে শুক্তির দিকে বেশ রুক্ষ দুটো চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন।—একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, শুক্তি।

শুক্তি—কী হল ?

—শ্যামলের কথার একটা জবাবও না দিয়ে আর ওরকম করে ছুটে পালিয়ে এলে কেন ?

শুক্তি—কেন ? তাতে কি কোনও দোষ হয়েছে ?

—হয়েছে। শ্যামল তোমাকে কী মনে করেছে, সেটা ধারণা করতে পার ?

—পারি। শ্যামলবাবু কিছুই মনে করেননি। হাসতে থাকে শুক্তি। করুণা বউদি হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হয়ে প্রশ্ন করেন—এর মানে কী ?

শুক্তি—তুমিই বুঝতে ভুল করেছ।

শুক্তির মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন করুণা বউদি। তারপর

সরে যান। বুঝতে একটু ভুলই হয়েছে বোধ হয়।

এটা তো দেড় বছর আগের ঘটনা। করুণা বউদির আর দেখবার সুযোগ হয়নি, কিন্তু সুমিত্রা নিজের চোখে দেখেছেন আর নিজের কানে শুনেছেন, সুকুর পড়ার ঘরের ভিতরে বসে কৃষ্ণাকে বার বার শ্যামলের কথা জিজ্ঞাসা করছে শুক্তি।—শ্যামলবাবু কি কখনও তোমার কাছে আমার নামে কোন কথা বলেছেন ?

কৃষ্ণা—হ্যাঁ, কতবার বলেছেন।

—কী বলেছেন ?

—তোমাদের শুক্তিদি আমাকে কেন এত ভয় করে বুঝি না।

—তুমি কী বললে ?

—বললাম, শুক্তিদি ভয়ানক ভীরু।

—একথা কেন বলতে গেলে ?

—তবে কী বলব ?

—বলতে পারলে না কেন, যে যাকে ভয় করে সে কি তাকে নিজের হাতে চা তৈরি করে খাওয়াতে পারে ?

—তুমি আবার কবে শ্যামলদাকে চা খাওয়ালে ?

—খাইয়েছি, তুমি জান না।

—যা জানি না, তা বলব কী করে ?

—তর্ক করো না। যা বলছি, মন দিয়ে শোনো।

—বলো।

—শ্যামলবাবু যদি আবার কোনওদিন আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলে দিও, শুক্তিদি আপনার ওপর কোনওদিনও একটুও রাগ করেনি।

শুক্তির কথাগুলিকে বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছিলেন বলেই সেই ঘরের দরজার একপাশে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন সুমিত্রা। ঘরের ভিতরে আর ঢোকেননি। কৃষ্ণার টনসিলের পেন্টমাখা তুলিটা হাতে ধরে নিয়ে নেপথ্যের এক অবাক কৌতূহলের ছবির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও সুমিত্রার মুখের হাসিটা আর চুপ করে থাকতে পারছিল না। তাই সরে গেলেন সুমিত্রা, আর বারান্দা পার হয়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে বলেই ফেললেন—কৃষ্ণাকে দিয়ে বলানো কেন ? নিজের মুখে বলে দিলেই তো পারো।

রান্নাঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন রাঁধুনী ঠাকুরুণ নিশির মা।—কী মা ? কী বলতে হবে বলুন।

সুমিত্রা হাসতে থাকেন।—আপনাকে কিছু বলছি না, বলছি শুক্তিকে। মন যা চাইছে, তা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারবে না মেয়েটা।

নিশির মা মাথা নাড়েন।—হ্যাঁ মা, একেই বলে আগুভীরু মেয়ে। ওটা বয়সের রীতি মা ; কী আর করবেন, বলুন ?

সেদিন বার বার অনেকবার ভেবেছিলেন সুমিত্রা। ঠিকই, শুক্তির প্রাণটা যেন নিজেকেই ভয় করে করে চলেছে। শ্যামলের কাছে দুটো-একটা কথা বলতে হলে ভুল করে আর লজ্জার মাথা খেয়ে মস্ত একটা ভালবাসার কথা বলে ফেলতে হবে, যেন এইরকম একটা মিথ্যে ভয়ের ছায়া মেয়েটার মন জুড়ে ছমছম করছে। কিন্তু বয়সের রীতি বললে চলবে কেন ? সুকুর মাস্টার ওই যে গণেশবাবুর মেয়ে স্নিগ্ধা, তার বয়সও তো কুড়ি-একুশের কম নয়। সে মেয়ে কত স্পষ্ট করে গণেশবাবুকে বলে দিতে পেরেছে, টেলিফোনের শশাঙ্ককে আমি কথা দিয়ে দিয়েছি, বাবা। তুমি আপত্তি করতে পারবে না।

গণেশবাবু নিজেই সুমিত্রার কাছে মেয়ের ইচ্ছার এই কীর্তির কথা বলেছেন। বলতে গিয়ে গণেশবাবুর গলার স্বরও মাঝে মাঝে বেশ গম্ভীর ও বেশ তিক্ত হয়ে কেঁপে উঠেছে। কিন্তু আপত্তি করেননি গণেশবাবু। গত বৈশাখে শশাঙ্কের সঙ্গে স্নিগ্ধার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

জয়ন্তবাবু কিন্তু সুমিত্রার ধারণাটাকে বাজে চিন্তার এরিথমেটিক বলে ঠাট্টা করেন। —না না, আগুভীরু-টীরু নয় ; ওটা নিতান্ত বাজে কথা। এটা হল একটা লজ্জার বাধা। তুমি আর করুণা গল্প করে চারদিকে রটিয়ে দিয়েছ যে, শ্যামলের সঙ্গে শুক্তির বিয়ে হলে ভাল হয়। কাজেই, শ্যামলের কাছে ঘেঁষতে চায় না শুক্তি। ঠিকই তো, যা অবধারিত, তার জন্যে ছটফট করে লাভ কী ?

সুমিত্রা—বুঝলাম না।

জয়ন্তবাবু—ভালবাসাবাসি তো হবেই একদিন। বিয়ে হলেই ওসব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। কাজেই ড্রামার মত স্টেজিং-এর আগে ভালবাসার রিহার্সাল, ওটা কোনও কাজের কথা নয়।

দিবাকর একবার বলেছিল—না না, ভয়-টয় নয়। শুক্তি বোধ হয় একটু দেরি করতে চায়। অন্তত বি-এ'টা পাস না করে বিয়ে করতে চাইবে না শুক্তি। শুক্তির লজ্জাটা হল মুখ্খু হয়ে থাকবার লজ্জা। তোমরাই বলো, শ্যামলের মত ছেলেকে কোন সাহসে এখনই বিয়ে করতে রাজি হবে শুক্তির মত মেয়ে, যে মেয়ে জীবনে অঙ্কেতে একত্রিশের বেশি নম্বর পেল না ?

করুণা বলেছিল—আমার মনে হয়, শুক্তির মনটা ওর বাবার ওপরেই রাগ করে...না, একটা অভিমান করে রয়েছে বলেই আজও মুখ খুলে কিছু বলতে পারছে না।

চমকে উঠেছিলেন সুমিত্রা। —কেন ? কেন ? শুক্তির কবে এমন মাথাখারাপ হল যে, গগনদার মত মানুষের ওপর...

করুণা—আপনার কাছে শুক্তির বাবার যে চিঠিটা পরশুদিন এসেছে, সে চিঠি পড়েছে শুক্তি।

ঠিকই দেখতে পেয়েছিলেন করুণা বউদি, গগনবাবুর চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে পড়েছে শুক্তি। পড়ছে আর হাসছে। চিকচিক করে হাসছে চোখ দুটোও। আর মুখের হাসিটা যেন ছোট্ট একটা ব্যথার টোকা খেয়ে কাঁপছে। ঠোঁট দুটোও ফুলে উঠেছে বলে মনে হয়।

—আমার ইচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা করো না, সুমি। আমি হ্যাঁ-না কিছুই বলব না। যা বলবার হয় মেয়েই বলবে। গগনবাবুর লেখা চিঠির মধ্যে এই তো মাত্র তিন লাইনের কয়েকটি কথা। এর জন্যে তাঁর মেয়ের মনটার ব্যথিত ও অভিমানিত হবার কোনও কারণ আছে কি ?

সন্দেহ হয় সুমিত্রার, আছে বোধ হয়। তা না হলে শুক্তি কেন আজও ওর ইচ্ছেটাকে এমন করে বোবা করে দিয়ে মনের ভিতরে লুকিয়ে রাখবে ? কিন্তু এরকম একটা অভিমানের সমস্যা থাকলে মেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে ? বাপ কিছু বলবেন না, মেয়েও কিছু বলবে না, বাঃ।

আজ এখন এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকে সবার আগে যে ঘরের ভিতরে গিয়ে আর চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সুমিত্রা, সেটা শুক্তির শোবার ঘর। মেয়েটার অভ্যাসটা তো একটুও এলোমেলো নয়। যেমন নিজেকে, তেমনই ওর এই ঘরের চেহারাকেও বেশ পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখতে ভালবাসে শুক্তি। আজ কিন্তু দেখা যায়, বেশ কয়েকটা ভুল করেছে শুক্তি। বিছানার উপর শুক্তির একটা ছাড়া শাড়ি, কল্কাপাড় একটা টাঙ্গাইল, এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আয়নার টেবিলের পাউডারের ডিবেটাও খোলা।

শুক্তি নেই ; বাড়িটাকে আজ বেশ খালি-খালি মনে হয়। সুমিত্রার মনটা তবু আজ কেন-যেন খুশি হয়ে রয়েছে। শুক্তির ভুলো মনের এই কাণ্ডটাকে দেখতে ভাল লাগছে। হোক না বড় পিসির বাড়ি, শুক্তি যেন এখানেই ওর মনটাকে রেখে দিয়ে দুদিনের জন্য বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়েছে। একটুও মিথ্যে তো নয় ; বছরের যে ক'টা মাস এখানে থাকে, তার মধ্যে কোনও একটি দিনেও তেজপুরে কিংবা চা-বাগানে যাবার জন্যে মেয়েটার মনে কোনও ইচ্ছার তাড়না ছটফটিয়ে ওঠে কিনা সন্দেহ। অন্তত ওর কথার মধ্যে এরকম কোনও তাড়নার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খুব ভাল হত, শুক্তি যদি গত মাসের তোলা ওর ফটোটাকে এই টেবিলের উপরে নিজেই রেখে দিয়ে চলে যেত। তা হলে আর বুঝতে কিছু বাকি থাকত না, কার চোখের খুশির জন্য ফটোটাকে রেখে গিয়েছে শুক্তি।

যাই হোক, আজ যেটুকু বুঝতে পেরেছেন সুমিত্রা, তাতেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এতদিন ধরে এবাড়ির মনে কতই না মিথ্যে উদ্বেগের জল্পনা-কল্পনা আর গবেষণা চলছিল। সব ভুল। আজ যদি দেখতে পেত করুণা, প্লেন ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে বিদায় নেবার সময় শ্যামলের সঙ্গে কথা বলতে

গিয়ে শুক্তির মুখটা কী সুন্দর হয়ে উঠেছিল, তবে করুণাও আজ চেঁচিয়ে হেসে উঠত, না, আর ভাবনা করবার কিছু নেই।

—আসি তবে। এই সামান্য ছোট্ট একটা কথা বলতে গিয়েই শুক্তির প্রাণটা যেন একবুক লজ্জার জলে ডুবে গিয়ে রাঙা হয়ে গেল। তবু তো বলতে পেরেছে। ভয় ভেঙেছে। শ্যামলের সঙ্গে এই প্রথম কথা বলল মেয়েটা। দু'মাস পরে, না হয় আর এক বছর পরে মেয়েটা ওর ভয়-ভাঙা প্রাণের সাহসে শ্যামলের কাছে সে কথাটা বলে দিতে পারবে, যে কথা ওর মুখে আজ সবচেয়ে ভাল শোনায়, সবচেয়ে ভাল মানায়। তখন আর গগনদাকে চিঠি লিখে নিশ্চিন্ত করতে কোনও অসুবিধে থাকবে না, তুমি শুনে সুখী হবে, দাদা ; শুক্তি নিজেই বলেছে।

বারান্দার মেঝের উপর গড়িয়ে বসে আর প্লাস্টিকের একটা এরোপ্লেন নিয়ে ওটা আবার কী খেলা খেলছে সুকু ?

নীল খড়ি ঘষে মেজের উপর একটা আকাশ এঁকেছে সুকু। তার উপর সাদা খড়ির দাগ টেনে দিয়ে একটা লাইনও এঁকেছে। লাইনের আরম্ভে মাঝখানে ও শেষে পর পর তিনটে লাল খড়ির গোলদাগ, দমদম—গৌহাটি—তেজপুর।

সুকু জিজ্ঞেস করে—শুক্তিদি এখন কত দূরে, মা ? প্লেন কি গৌহাটি পার হয়েছে ?

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই হাসতে থাকেন সুমিত্রা।—হ্যাঁ।

প্লাস্টিকের খেলনা এরোপ্লেনটাকে এক ঠেলায় গৌহাটি পার করে দেয় সুকু।

॥ ৩ ॥

মণিমালা, তেজপুরের মণিমাসি বললেন—আমি যে তোর বড় পিসির চিঠির একটি কথারও মানে বুঝতে পারি না।

শুক্তি—কেন ?

মণিমাসি—তুই নাকি ঘর ছেড়ে বের হতেই চাস না ? একা কলেজে যাবার দরকার হলে ভয়ে আধমরা হয়ে যাস ? কথা-টথা বলতেও নাকি তোর ভয়ানক অনিচ্ছে ? বিশেষ করে বাইরের কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে তোর যেন মাথায় বাড়ি পড়ে, শুধু বোবার মত...অ্যাঁ ? তোর বড় পিসি মিথ্যে তোর নামে এত নিন্দে করেন কেন ?

শুক্তি হেসে ফেলে।—নিন্দে কেন হবে ? খুব সত্যি কথা।

সত্যি কথা ? বিশ্বাস করলে যে একটা অদ্ভুত অসম্ভব বিস্ময়কে বিশ্বাস করতে হয়। কিরণদির মেয়ে এই শুক্তি আজ সকাল সাড়ে দশটার পাঁচ মিনিট আগে তেজপুরে পৌঁছেছে। ঘরে ঢুকেই মণিমাসির গা ঘেঁসে মাত্র একটি মিনিট শান্ত হয়ে বসেছে। তারপরেই ছটফট করে উঠে গিয়েছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে স্নান করে আর তড়বড় করে শুধু ভাত ডাল আর আধখানা ভাজা দিয়ে আধপেটা একটা খাওয়া সেরে নিয়ে বাইরে বের হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।—রাজবাহাদুরকে একবার বলে দাও মণিমাসি, গাড়িটাকে যেন এখনি গ্যারেজে না নিয়ে যায়।

মণিমাসি—কোথায় যাবি ?

শুক্তি—যাই একবার মালতীর সঙ্গে দেখা করে আসি। তারপর...শীতলকাকার বাড়ি তো যেতেই হবে। হ্যাঁ, তারপর হয়ত অঞ্জলিদির বাড়িতেও একবার যেতে হতে পারে।

রাজাবাহাদুরকে ডাক দিয়ে কিছু বলবার দরকার হয় না মণিমাসির। ফটকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আর গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই বের হয়ে যায় শুক্তি। যেতে যেতে হাসতে থাকে—মালতীর সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসব। তারপর যদি ইচ্ছে হয়...হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কলকাতার বড় পিসিকে একটা তার করে দিতে হবে যে, আমি তেজপুরে পৌঁছে গেছি।

মণিমাসি হাসতে থাকেন।—সব হবে, সব হবে। কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

মণিমাসি বেশ একটু মোটাসোটা ভারি চেহারার মানুষ। নড়াচড়া করতে ভালবাসেন না, পারেনও না। তাই বলে শুক্তির এই ছুটোছুটির অভ্যাসটাকে যে একটুও অপছন্দ করেন, তা নয়। বরং একটু

ভালই বাসেন। টেবিলের কাছে এগিয়ে যেয়ে আর কলম হাতে তুলে নিয়ে শুক্তির বড় পিসির কাছে তখুনি একটা চিঠি লিখতে শুরু করে দেন। —শুক্তি এখন আমার এখানে আছে। ভালই আছে। কিন্তু একটা কথা ভেবে একটু আশ্চর্য হচ্ছি সুমিত্রা ; তোমাদের ওখানে কেন এত ভিতু হয়ে আর ঘরকুনো হয়ে পড়ে থাকে শুক্তি। আমার এখানে তো বেশ মনের আনন্দে থাকে ; ঘরের বাইরে বেড়িয়ে আসতে ভালবাসে, আর...।

না, শুক্তির নামে এখনই আরও কিছু লিখে ফেলা কি উচিত হবে ? লেখা বন্ধ করে আর কলমটাকে টেবিলের উপর শুইয়ে রেখে কী-যেন ভাবতে থাকেন মণিমাসি।

বেশ তো, মালতীদের বাড়ি না হয় একবার ঘুরেই এল। মালতীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে শুক্তির এই তর-সয়-না ব্যস্ততার তবু একটা মানে হয়। কিন্তু অঞ্জলিদের বাড়িতে কেন ?

শুক্তির বাবা গগন বসুর ছাত্রজীবনের বন্ধু পরমেশ হাজরিকার মেয়ে মালতীও একদিন শুক্তির ছাত্রী-জীবনের বান্ধবী ছিল। সে আজ দশ বছরেরও আগের কথা, শিলংয়ের এক কনভেন্ট স্কুলের হোস্টেলের একটি ঘরে বসে একদিন দুই মেয়েই কান্নাকাটি করে প্রায় একরকমের ভাষায় চিঠি লিখে বাড়ির মানুষকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। —শিগগির নিয়ে যাও, এখানে থাকলে মরে যাব।

আজও জিজ্ঞেস করলে ওদের দুজনের একজনও বলতে পারে না, মালতী কিংবা শুক্তি, মরে যাবার মত দশা কেন হয়েছিল ? আজ বরং ওরা বেশ হাসাহাসি করে গল্প করতে পারে, হোস্টেলের ঘরের জানালার কাছে গোলাপ গাছের গায়ে সব সময় একটা টিকটিকি বসে থাকত, তাই বোধ হয়...।

মালতীর বাবা পরমেশ হাজরিকা আজ আর বেঁচে নেই। মুনসেফ হয়ে কাজের জীবন শুরু করেছিলেন ; সাবজজ হয়ে অবসর নিয়েছিলেন। তেজপুরের কোলিবাড়ি পাড়াতে শান্ত নিরালায়, একসারি কচি নারকেলের আড়ালে একটি বাসাধাঁচের পাকাবাড়ি ছাড়া এমন কিছুই তিনি রেখে যেতে পারেননি, যাকে বিষয়-সম্পত্তি বলে মনে করা যেতে পারে। পারবেনই বা কেমন করে ? শৌখিন মেজাজের মানুষ ; প্রতি বছর দু-তিন হাজার টাকা খরচ করে গাঁয়ের বাড়িতে বিহু পরবের আনন্দ মাতিয়ে তুলে খুশি হতেন। তার উপর ছিল, থিয়েটারের শখ। যখন যেখানে থাকতেন, তখন সেখানে একটা নাট্যুকে সমিতি গড়ে তুলতেন। স্টেজ তৈরির খরচ থেকে শুরু করে অভিনেতাদের চা-বিস্কুটের খরচ পর্যন্ত, টাকা খরচের সব দায় নিজেই নিয়েছেন।

মৃত্যুর এক বছর আগে আরও একটা কাণ্ড করেছিলেন পরমেশবাবু। বড় ছেলে শিশির তখন কলেজের ছাত্র, তবু শিশিরের বিয়ে দিলেন। তার মানে প্রমীলাকে পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে এলেন। প্রমীলা হল নওগাঁ আদালতের সেই টাইপিস্ট কেরানি মহেন্দ্র ফুকনের মেয়ে, যিনি হঠাৎ একদিন আদালতের অফিসঘরে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন আর মরেও গেলেন। পরমেশবাবুর আত্মীয় আর কুটুম্বদের অনেকে অখুশি হয়েছিলেন, এত গরিবের ঘরের মেয়েকে ঘরে আনা কেন ? এটাও কি পরমেশবাবুর একটা শখের খেয়াল ? হতে পারে। কিংবা, হয়ত একটা মমতার খেয়াল।

মারা যাবার একমাস আগে, বড়পেটা থেকে তেজপুরে ফিরে আসবার সময় হাতির দাঁতের দুটি চিরুনি কিনে নিয়ে এসেছিলেন পরমেশবাবু ; একটি মালতীর জন্য, আর একটি শুক্তির জন্য।

সেই পরমেশবাবুর মেয়ে মালতী এখন বাড়িতেই পড়ে। মাইনে দিয়ে কলেজে পড়তে অসুবিধা আছে। প্রাইভেট বি-এ দিতে পারবে বলে আশা করছে। আর, মালতীর দাদা শিশির, যে ছেলেকে তিন বছর আগে দেখা গিয়েছিল, টেনিস ব্যাট হাতে নিয়ে আর স্কুটারে চড়ে ছুটছে ; সে ছেলে আজ একটি প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। পরমেশবাবুর হঠাৎ-মৃত্যুর খবর পেয়ে শিলং থেকে সেই যে চলে এল শিশির, আর তার ফিরে যাওয়া হল না। বি-এ পরীক্ষাও দেওয়া হল না। অথচ, শিলং কলেজের প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, বোটানিতে ফার্স্ট ক্লাস পাবেই শিশির হাজরিকা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আবার চিঠি লিখতে শুরু করেন মণিমাসি। —আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছ। সুকু আর কৃষ্ণাকে আমার আদর জানাবে। করুণার কি এখনও কোনও নতুন খবর নেই ? হ্যাঁ, সাহস করে কলকাতার মানুষকে আবার অনুরোধ করছি ; একবার তেজপুরে বেড়িয়ে যাও। শীতের সময়ে এসো।

ফিরে এসেছে গাড়িটা। শুক্তিও এসেছে। কিন্তু ঘরে ঢুকে মণিমাসির গা ঘেঁসে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। —তবে যাই মণিমাসি, ঘুরেই আসি।

—কোথায় ?

—শীতলকাকার বাড়ি।

—যাও, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

—কিন্তু...।

—কী ?

—মালতীকে দেখে মন বড় খারাপ হয়ে গেল। চাকরি করতে চায় মালতী, তা না হলে আর চলে না। বাড়িতে এতগুলি মানুষ ; মা আছে, দুটো ছোট ভাই আছে। প্রমীলাও আছে। কী করে চলে ? মালতীর দাদা শিশিরবাবুর ওই তো মাইনে, মাত্র একাশি টাকা। আর, প্রাইভেট টিউশনি করে আরও পঞ্চাশ টাকা। দেখলাম, জ্বর হয়েছে তবু একগাদা কাপড় নিয়ে কাচতে বসেছে প্রমীলা। শিশিরবাবুও খুব গম্ভীর ; মাথায় হাত দিয়ে ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে আছেন, কী-যেন ভাবছেন।

—কার কথা বলছিস, শুক্তি ? কোলিবাড়ির শিশির হাজারিকার কথা ? বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে বের হয়ে আসেন মহিমবাবু।

শুক্তি বলে—হ্যাঁ, মেসোমশাই।

মহিমবাবু বলেন—হ্যাঁ, মাথায় হাত দিয়ে একটু ভাবতেই হবে। রাগের মাথায় একটা ভুল করে বসলে, শেষে ওরকম ভাবতেই হয়।

মণিমাসি—ছেলেটা কষ্টে পড়েছে, অভাবে আছে। তাই দুশ্চিন্তা করতে হচ্ছে। ভুল আবার কোথায় হল ?

মহিমবাবু হাসেন। —না, তোমরা জান না, তাই বুঝতে পারছ না। আমি বুঝেছি। স্কুলের ছেলেদের নিয়ে ভালুকপং বেড়াতে যাবে, জঙ্গলের একটা ঝর্নার কাছে বসে আর পিকনিক করে ফিরে আসবে ; সেই জন্যে নেফা অফিসে গিয়ে ইনার লাইন পার হবার পারমিট চেয়েছিল শিশির।

শুক্তি—সেটা আবার কী ?

মহিমবাবু—নেফাতে ঢুকতে হলে সরকারের অনুমতি চাই।

শুক্তি—পাসপোর্ট ?

মহিমবাবু—না না, পাসপোর্ট নয়, পারমিট।

মহিমবাবু—যাই হোক, অফিসার ভদ্রলোক বললেন, হবে না। শিশিরেরও জেদ ; কেন পারমিট দেওয়া হবে না ? এইরকম কেন কেন করে তর্কাতর্কি হতে হতে শেষে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম।

শিশির বলে—নেফা কি আপনার জমিদারি ?

অফিসার বলেন—হ্যাঁ, যতদিন আমি সার্ভিসে আছি, ততদিন আমারই জমিদারি।

শিশির—বাজে কথা বলবার এত সাহস পেলেন কোথায় ?

অফিসার—এখানে গোলমাল করবার এত সাহস পেলেন কোথায় ? এম-পি কুটুম আছে বোধ হয় ?

শিশির—না, নেই। আপনার বোধ হয় মিনিস্টার কুটুম আছে ?

অফিসার—চুপ, আর একটি কথাও বলবেন না, চলে যান। নইলে...।

—পুলিশ ডাকবেন ?

—ডাকতে বাধ্য হব।

—ডাকুন তা হলে ?

মহিমবাবু এইবার জানালার দিকে তাকিয়ে, বোধ হয় দূরের নেফা-পাহাড়ের মাথায় সাদা মেঘটার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—আমি তখন সেখানে ছিলাম। আমিই দুজনের মাঝখানে পড়ে আর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঝগড়াটা থামিয়ে দিয়েছিলাম।

শুক্তি বলে—অফিসার ভদ্রলোকই বা কেমনতর মানুষ ? পারমিট দিলেন না কেন ?

মহিমবাবু—বোধ হয় সরকারের নিয়ম।

হেসে ফেলে শুক্তি। —সরকারই বা কেমনতর ?

শুক্তিকে নিয়ে গাড়িটা ফটক পার হয়ে চলে যাবার পরেও জানালাটার কাছে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন মহিমবাবু ; মহিম দস্তিদার, পনেরো বছর আগে যিনি দিনাজপুরের স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। এই ছিপছিপে সুগৌর বুড়ো মানুষটির কপালে কোনও রেখা ফুটে ওঠে না। চোখ-মুখ সব সময়েই হাসছে ; চমৎকার একটি আশাসুখী চেহারা। জীবনে যা আশা করেছিলেন, তার সবই পেয়ে গিয়েছেন। আরও যা আশা করেন, তাও পেয়ে যাবেন। তিন ছেলে আছে ; তিন ছেলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। রমেন, রথীন, রজত, তিনজনেই দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে কাজ করে। কেউই কনিষ্ঠ কেরানি নয় ; তিনজনেই জ্যেষ্ঠ অফিসার।

গণ্ডগোল তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাটি পছন্দ করেন না মহিমবাবু। তিনি চান, ভাগ্য যা দিয়েছে তাই নিয়ে শান্ত হয়ে থাক আর আশা কর। ভেবে একটু দুঃখও বোধ করেন মহিমবাবু ; মানুষের মন এত সহজে ধৈর্য হারায় কেন ? একটু সহ্য করতে অসুবিধে কোথায় ?

রবার বাগানের এক প্রান্তের এই বাড়ি, যে বাড়িকে 'ভারতী' নাম দিয়ে খুশি হয়েছেন মহিম দস্তিদার ; সে বাড়ি তৈরির সব টাকা দিয়েছে রমেন। গাড়িটা কিনে দিয়েছে রথীন। আর, সেগুন কাঠের সুন্দর আসবাব দিয়ে বাড়িটাকে ভরে দিয়েছে যে, সে হল রজত। মুগার চাদরটি গায়ে জড়িয়ে, ভারতীর চওড়া বারান্দার উপরে যখন পায়চারি করেন মহিমবাবু, তখন অনেক স্বদেশি গান তাঁর মনের ভিতরে গুনগুন করে বাজে। এক-একদিন পাশের বাড়ির লাহিড়ীবাবুর ছেলে, দশ বছর বয়সের হীরক যখন চেঁচিয়ে গান গেয়ে ওঠে—ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে—তখন মহিমবাবুও চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে বলেন—আরও জোরে গাও, হীরক।

মহিমবাবুর বোধ হয় এই সেদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গিয়েছে ; তাই জানালা দিয়ে নেফার পাহাড়ের দিকে ওরকম করে তাকিয়েছেন। এই তো সেদিন, মাস তিন আগে, বিদেশি এক বোটানিস্ট সাহেব এসে সার্কিট হাউসে উঠলেন। নেফার উদ্ভিদের খবর যোগাড় করতে চান এই বোটানিস্ট সাহেব। বললেন, জঙ্গলে ভরা ওই নেফাকে তিনি দ্বিতীয় এক ইডেন বলে মনে করেন।

দিল্লী আর শিলং থেকে সরকারি মহলের কত মানী মহোচ্চ ও পদস্থের কত শুভেচ্ছার চিঠি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সেই বোটানিস্ট সাহেব, ডক্টর সি. টি. এলগিন। চারজন ভি-আই-পি, যাঁরা সে সময়ে সার্কিট হাউসে ছিলেন, তাঁরাও বোটানিস্ট সাহেবকে চা খাওয়াবার জন্য যখন-তখন ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। নেফা অফিসের জিপও যখন-তখন ছুটে এসে বোটানিস্ট সাহেবের দরকারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। সাহেবের জন্য হেলিকপ্টর যোগাড়ের কত চেষ্টা করলেন নেফা-অফিসের সেই মিস্টার মনোহরলাল, শিশির যাকে সেদিন মিছিমিছি অত্যন্ত বিরক্ত করেছে।

ইনার লাইনের পারমিট পেতে বোধ হয় এক ঘন্টাও দেরি হয়নি ; স্বাগত অতিথির মত খুশির হাসি হেসে, সরকারি জিপের আরোহী হয়ে, আর সরকারি শ্রদ্ধার গুরুজন হয়ে নেফা চলে গেলেন বোটানিস্ট এলগিন। তেজপুর থেকে ফুটহিল ; ফুটহিল থেকে চাকু ; তারপর কে জানে কোন দিকে। এর চেয়ে বেশি কোনও খবর আর পাননি মহিমবাবু। সেদিন বোটানিস্ট এলগিনকে বিদায় দেবার সময় সার্কিট হাউসের বারান্দায় দশজন ভি-আই-পি আর অফিসারের ভিড়ের এক পাশে মহিমবাবুও দাঁড়িয়ে ছিলেন।

—শুক্তি কোথায় গেল ? জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে মহিমবাবুর চোখ মুখ হাসতে থাকে।

মণিমালা—কেন ?

মহিমবাবু—জিজ্ঞেস করতাম, এবছর গগনবাবুর বাগানের কিরকম প্রফিট হল ?

মণিমালা—নতুন পাড়ার শীতলের বাড়িতে বেড়াতে গেল শুক্তি।

॥ ৪ ॥

মণিমালা কিন্তু বেশ একটু আশা-অসুখী মানুষ ; যদিও হাসি-খুশি মানুষ। তাঁর তিন ছেলে যেন তিন ভিন্ন জগতে থাকে, যেখানে সবার উপরে ছেলের-বউয়ের ইচ্ছা আর অভিরুচিই সত্য, তাহার উপরে নাই। ছেলেরা তিন বছরের পাওনা ছুটি জমিয়ে নিয়ে সস্ত্রীক বিদেশ বেড়াতে যায়। তারা তেজপুরে আসে না ; আসতে পারে না। এই পাঁচ বছরে তিন ছেলের একজনও তেজপুরে আসেনি। বুঝতে পেরেছেন মণিমালা, পুত্রবধূর সম্মতি না পেলে কোনও পুত্রের আর তেজপুরে আসবার দুঃসাহস হবে না। তবে হ্যাঁ, তারা নিয়মিতভাবে টাকা পাঠায়, আর, মাঝে মাঝে চিঠিও লেখে।

মহিমবাবুর মনে কিন্তু কোনও অভিযোগ নেই। তিনি হাসেন আর বলেন—মন্দ কী ? ছেলেদের কর্তব্যবোধ তো ঠিক আছে।

মণিমালা বলেন—শুধু টাকা পাঠিয়েই কর্তব্য ! ভাল কথা। সুখে থাকুক।

সবই আছে, তবু কিছু নেই ; মণিমালা যেন এইরকমের একটা চমৎকার শূন্যতার মধ্যে থাকেন। আর, সেই জন্যেই বোধ হয় দিদির মেয়ে এই শুক্তিকে এত আপন করে নিয়ে কাছে ধরে রাখতে চান। এ যেন উপোসি মায়ের-প্রাণের একটা তেষ্টা মেটাবার চেষ্টা। জানেন কিরণলেখা, শুক্তিকে কেন এত বেশি ভালবাসে মণিমালা।

জানেন মণিমালা, শীতলের বাড়িতে একবার না যেয়ে পারবে না শুক্তি। গিয়েছে, ভালই করেছে। শীতলের বউ মীরা শুক্তিকে দেখতে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবে। সব কাজ ফেলে রেখে শুক্তির শক্ত বেণীটাকে খুলে দিয়ে খোঁপা বেঁধে দিতে চেষ্টা করবে। মীরার ওই এক অভ্যেস ; শুক্তির মাথাটার দিকে চোখ পড়লেই মীরার হাত যেন নিসপিস করে।

শুক্তিরই বাবা গগন বসুর অনেক দূরসম্পর্কের এক কুটুমের ছেলে নতুন পাড়ার শীতল বিশ্বাস, তেজপুর বাজারে যাঁর সামান্য ধরনের একটা বস্ত্রালয় আছে। মহাজনের দেনা ঠিক সময়ে শোধ করতে না পেরে মাঝে-মাঝে মহিমবাবুর কাছে টাকা ধার চাইতে আসেন শীতল।

শীতল বিশ্বাসের ভাই রতন, নেফা মেডিক্যালের পিয়ন ; বছরে দু-একবার কাজের ছুটি নিয়ে তেজপুরে আসে, নতুন পাড়ার বাড়িতে একটা দিন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে পার করে দেয়। কিন্তু পরের দিনই ছটফট করতে থাকে, ঘুম-টুম হয় না। তার পরের দিন নেফা চলে যায় রতন ; শীতল আর মীরার আপত্তির কোনও কথা গ্রাহ্য করে না। মীরাও রাগ করে তার এই বিচিত্র স্বভাবের দেবরটিকে কথা শোনাতে ছাড়ে না—পাঁচ বছর নেফাতে চাকরি করে তুমিও আস্ত একটি দফলা হয়ে গিয়েছ।

রতন কিন্তু রাগ করে না। হেসে হেসে দফলা ভাষাতে জবাব দিয়ে মীরার রাগটাকে ঠাট্টা করে। সে ভাষার একটা কথাও বুঝতে না পেরে মীরা আরও রেগে যায়।

এবার কিন্তু রতন বেশ জব্দ হয়েছে। প্রায় এক মাস হতে চলল, তেজপুরে এসেছে রতন। কিন্তু যাই-যাই করেও যেতে পারছে না।

সেটা একটা কাণ্ডই বটে ; রতনের কাণ্ড ! সেদিন নেফা থেকে এসে, আর, নতুন পাড়ার বাড়িতে ঢুকেও মেজের মাদুরের উপরে ঘুমিয়ে পড়ে থাকবার আনন্দটাকে ভুলে গেল। তখুনি বের হয়ে গেল, আর দু' ঘন্টা পরে ফিরে এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—দেখে যাও বউদি, নেফা থেকে কী বস্তু নিয়ে এসেছি।

নেফার বস্তু ? সে কী ? রাক্ষুসে মোনপা-মুখোশ ? বুনো কুমড়ো ? ভূর্জ কাঠের ডিবে ? ইয়াক দুধের মাখন ? চকচকে একটা দফলা দা ? কিছুই ধারণা করতে না পেরে, আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে ঘরের বাইরে এসে চমকে উঠেছিল মীরা। রতনের পাশে দাঁড়িয়ে একটা দফলা মেয়ে হাসছে।

তেজপুর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ওই দফলা মেয়ে, যার নাম রেনকি। মাসখানেক আগে নেফা মেডিক্যালের চিঠি নিয়ে আর রেনকিকে নিয়ে পিয়ন রতনই তেজপুরে এসেছিল। হাসপাতালে রেনকিকে ভর্তি করে দিয়েই ফিরে গিয়েছিল রতন, ওর চাকরির সেই জায়গাটিতে, খানোয়া বেস থেকে একদিনের হাঁটাপথ সেই এরিয়াতে, যার নাম বিলং।

শীতলবাবুর বাড়িতে গিয়ে মণিমাসিও একদিন দফলা-মেয়ে রেনকিকে দেখে এসেছিলেন। বয়স কত হবে মেয়েটার ? উনিশ কুড়ি কিংবা একুশ ? ফুলো ফুলো দুটো ভুরুর ছায়ার নীচে দুটো ছোট্ট মিটমিটে খুশি চোখের তারা চিকচিক করে হাসছে। মেয়েটার দুই গালে কেউ আলতা বুলিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু ওটা ওর রক্তেরই রঙের আভা। আর কব্জিটা। বলতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল মীরা। —রেনকিকে একদিন শাড়ি-ব্লাউজ পরিয়ে সিনেমার ছবি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, মণিদি। আমার তো হাতঘড়ি নেই, তাই ভদ্রলোকের হাতঘড়িটাকে রেনকির হাতে পরাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু রেনকির কব্জিতে পুরুষ ঘড়ির ব্যাণ্ডও টাইট হয়ে ছিঁড়ে গেল। শেষে সিল্কের ফিতে দিয়ে...।

হাসি থামিয়ে নিয়ে মীরা আবার বলে—অমন কব্জি হবে না কেন ? মেয়েটা নিজের হাতে ক্ষেতের মাটির ঢেলা ভাঙে আর কাঠ কাটে।

এবার কিন্তু একমাসের ছুটি নিয়েছে রতন। আর নেফা মেডিক্যালও অনুমতি দিয়েছে, হ্যাঁ, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ট্রাইবালের মেয়ে রেনকিকে কোনও ইন্ডিয়ান পরিবারের বাড়িতে কয়েকটা দিনের জন্য থাকতে দিতে পারা যায় ; যদি অবশ্য সে বাড়িতে কোনও রেসপনসিবল বয়স্কা মহিলা থাকেন।

গাঁওবুড়ার মেয়ে রেনকি। খুঁড়িয়ে হাঁটত রেনকি। হাঁটুর কাছে একটা মাংসপেশি কুঁচকে গিয়ে শক্ত ঢেলার মত হয়ে গিয়েছিল। হাঁটতে গেলেই ব্যথা পেয়ে কটকট করত হাঁটুটা। সোজা টান হয়ে দাঁড়াতে পারত না। অপারেশনের পর সেই হাঁটু ভাল হয়ে গিয়েছে। এখন দৌড়তেও পারে। তাই রেনকিকে নিয়ে যেতে চায় রতন। কিন্তু রেনকি বলে আরও কিছুদিন থাকি।

রতন বোধ হয় এখনও চলে যেতে পারেনি। না গিয়ে থাকলে ভালই হবে। শুক্তি তা হলে মেয়েটাকে দেখতে পাবে। খুব খুশি হবে, খুব আশ্চর্য হবে শুক্তি। ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলেন মণিমাসি। দফলা-মেয়েটাকে নিয়ে মীরা কত কাণ্ডই না করেছে। যখন-তখন মেয়েটাকে খেলার পুতুলের মত সাজিয়েছে। দু'বেলা দু'রকম করে খোঁপা বেঁধে দিয়েছে। একদিন মেয়েটাকে দিয়ে লুচি ভাজিয়েছিল মীরা। কালোর মা'র কাছে সে গল্প বলতে গিয়ে হেসে-হেসে লুটোপুটি করেছে মীরা, যার বয়স এখন প্রায় চল্লিশের কাছে এসে ঠেকেছে। তা হলে শুক্তির মত মেয়ে এখন রেনকিকে নিয়ে কী যে কাণ্ড করবে, ভগবান জানেন। শুক্তি এতক্ষণে বোধ হয় দফলা-মেয়েটাকে গান শেখাতেই শুরু করে দিয়েছে, কত গান তো হল গাওয়া...।

নিজেরই কল্পনার মধ্যে মন ডুবিয়ে দিয়ে হাসতে থাকেন মণিমাসি। তারপর আরও দুটো চিঠি লেখা সেরে ফেলেন। তারপর হঠাৎ শুক্তির গলার স্বর শুনে চমকে ওঠেন,—একটু অপেক্ষা করো রাজাবাহাদুর, আমি এখনই আবার বের হব।

শুক্তি বলে—কী চমৎকার মেয়ে রেনকি। আমি ওর গলায় পাউডার মাখিয়ে দিয়েছি, ওর শাড়িতে সেন্ট ছড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু...।

মণিমাসি—কী ?

শুক্তি—আমার হাত ধরে কেঁদে ফেলেছে রেনকি।

—কেন ?

—এখনই চলে যেতে হবে বলে।

—চলে যাচ্ছে নাকি ?

—হ্যাঁ। কী আর করবে বলো ? রতনকাকা বলেছেন, আর একটি দিনও দেরি করতে পারবেন না। দেরি করলে রতনকাকার চাকরি চলে যাবে।

আনমনার মত একটু চুপ করে থেকে শুক্তি আবার কথা বলে—উঃ, কী ভয়ানক রেগে গেল রেনকি। রতনকাকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে রইল ; তার পরেই ঘরের ভিতরে ছুটে গেল। গায়ের শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ, সব সাজ খিমচে টেনে সরিয়ে দিয়ে ওর নিজের সাজ পরে বের হয়ে এল। কী খসখসে ধোকড় কাপড়ের একটা লম্বা কোর্তা পরে, ঝুঁটি করে চুল বেঁধে, শক্ত করে কোমরে চাদর জড়িয়ে, আর, রতনকাকার কাছে এগিয়ে যেয়েই ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রেনকি। —চলো।

মণিমাসি কোনও কথা বলেন না। মণিমাসিও যেন আনমনা হয়ে গিয়েছেন। শুক্তি নিজেই বিড়বিড় করে—ওরা রওনা হবার আগেই আমি পালিয়ে এসেছি। আমার খুব ভয় করছিল মণিমাসি।

মণিমাসি হাঁপ ছাড়েন। —তুই কি এখনই আবার বের হবি ?

শুক্তি—ও...হ্যাঁ...একবার অঞ্জলিদির সঙ্গে দেখা করে আসি।

মণিমাসি—যাও, কিন্তু বেশি দেরি না করে চলে এসো।

শুক্তি—না, দেরি করব না। কিন্তু রতনকাকার মুখের দিকে অমন কটমট করে তাকাল কেন রেনকি ? রতনকাকা কী দোষ করলেন ?

মণিমাসির চোখ চমকে ওঠে। —মীরা তোকে কিছু বলেনি ? বলেছে বুঝি ?

—না, কই, মীরা কাকিমা তো আমাকে কিছু বলেননি।

মণিমাসি আবার হাঁপ ছাড়েন। —না, রতনের দোষ কেন হবে ? ওটা হল সরকারি নিয়ম, ট্রাইবালের মেয়েকে ট্রাইবালের ঘরেই থাকতে হবে।

—কী বিদ্‌ঘুটে নিয়ম ? হাসতে গিয়ে শুক্তির ঠোঁট দুটো কুঁচকে যায়।

চলে গেল শুক্তি।

মণিমাসির মনের এতক্ষণের ছায়া-ছায়া কিন্তুটা এইবার সুস্পষ্ট একটা প্রশ্নের কায়া হয়ে ফুটে ওঠে। এত ব্যস্ত হয়ে অঞ্জলির বাড়িতে কেন বেড়াতে গেল শুক্তি ? মালতী ওর অনেকদিনের চেনা-জানা বান্ধবী। শীতলবাবুর বাড়ি ওর কুটুমকাকার বাড়ি। কিন্তু অঞ্জলি তো এমন কেউ নয় যে, নেমন্তন্ন করে না ডাকলেও তার বাড়িতে ছুটে যেতে হবে। অঞ্জলি যে শুক্তির ডবল বয়সের এক মহিলা। অঞ্জলি যে বিধবা মানুষ।

সোম সাহেবের মেয়ে অঞ্জলি আর ছেলে অনিমেষ, দুজনেই আজ মণিমাসির কাছে একেবারে অজানা জগতের মানুষ নয়। সোম সাহেব ছিলেন রয়্যাল নেভির একজন অফিসার। মহিমবাবু বলেছেন, তাই জানতে পেরেছেন মণিমাসি, সে সময়ে সোম সাহেব ছাড়া মাত্র আর তিনজন ইন্ডিয়ান ভাগ্যবান রয়্যাল নেভির অফিসার হতে পেরেছিল। জার্মানি সাবমেরিনের টর্পেডোতে ঘায়েল হয়ে ব্রিটিশের যে যুদ্ধ-জাহাজটা জিব্রাল্টার থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে সমুদ্রজলে ডুবে গিয়েছিল, সে যুদ্ধ-জাহাজেই ছিলেন সোম সাহেব। মারা গেলেন সোম সাহেব।

সোম লজ ; গণেশঘাটের কাছাকাছি যে লালরঙা বাংলোর বারান্দায় বসে ব্রহ্মপুত্রের আষাঢ়ে ঢলের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়, সে বাড়ি প্রায় পনেরো বছর ধরে খালি পড়েই ছিল। এক মালী ছাড়া আর কেউ সেবাড়িতে ছিল না। অঞ্জলি, অঞ্জলির মা, অঞ্জলির ভাই অনিমেষ, সবাই পাটনাতে সোম সাহেবের দাদার বাড়িতে, ব্যারিস্টার পি. কে. সোমের বাড়িতে থাকত। রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যেদিন শিলিগুড়িতে চলে এল অনিমেষ, তার দশদিন পরে অঞ্জলিকে সঙ্গে নিয়ে অঞ্জলির মা পাটনা থেকে এসে এক সন্ধ্যায় সোম লজে ঢুকলেন, ধূপচন্দন পোড়ালেন, আলো জ্বাললেন।

এমন কিছু পুরনো দিনের ঘটনা নয় যে এরই মধ্যে ভুলে যাবেন মণিমাসি। মাত্র দেড় বছর আগের একটা সকালবেলার ঘটনা। সেদিন শুক্তির সঙ্গে নতুন পাড়ার মীরার বাড়িতে মণিমাসিও গিয়েছিলেন। মণিমাসিরই ইচ্ছে হয়েছিল, গাড়িটা একটু এদিকে-ওদিকে ঘুরে, পদ্মপুকুরের সড়ক ধরে একটু বেড়িয়ে চলে যাক। কিন্তু পদ্মপুকুরের কাছাকাছি এসেই গাড়িটার ইঞ্জিনের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। বেচারা রাজবাহাদুর আধঘন্টা ধরে ইঞ্জিনের যত কলকব্জা টানাটানি আর ঠোকাঠুকি করে শুধু ঘেমে উঠল আর হয়রান হল, কিছুই করতে পারল না। স্টার্ট নিতেই চায় না গাড়িটা।

এক মহিলা, তাঁর সঙ্গে অল্প বয়সের এক ভদ্রলোক, যাঁরা দুজন চমৎকার দুটি হাসি-মুখ নিয়ে গল্প করতে করতে আর আস্তে আস্তে হেঁটে এদিকেই আসছিলেন, তাঁরা এবার গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। শুক্তির কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে মণিমাসি বলেন—নিশ্চয় দিদি আর ভাই। দেখছিস না, একেবারে একধাঁচের মুখ ?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন সেই অল্পবয়সের ভদ্রলোক, রাজবাহাদুরকে কী-যেন জিজ্ঞাসা করলেন। গাড়ির ইঞ্জিনের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে কী-যেন দেখলেন। নিজেই হাত চালিয়ে একটা প্লাগকে

শক্ত করে চেপে বসিয়ে দিলেন। তারপর নিজের হাতেই স্টার্টিং হ্যান্ডেলটাকে শক্ত করে ধরে এক পাক ঘুরিয়ে দিলেন। গর্‌গর্‌ করে গর্জে উঠল গাড়ির স্তব্ধ ইঞ্জিন।

মণিমাসির দিকে তাকিয়ে আর কালিমাখা হাত তুলে একটা নমস্কার জানিয়ে চলেই যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। সেই মহিলা, যিনি এতক্ষণ সড়কের একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিও চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু মণিমাসি বাধা দিলেন—কে আপনারা ? যেচে উপকার করলেন, অথচ একটুও পরিচয় না দিয়ে চলে যাচ্ছেন ?

—আমরা গণেশঘাটের সোম লজে থাকি।

মণিমাসি চমকে ওঠেন।—আপনারা কি সোম সাহেবের ছেলে আর মেয়ে ?

—হ্যাঁ, উনি আমার দিদি।

মণিমাসি—তা তো দেখেই বুঝেছি। কিন্তু এভাবে চলে গেলে তো চলবে না।

—আজ্ঞে ?

গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে, সেই মহিলার দিকে তাকিয়ে মণিমাসি বলেন—আমি সোম সাহেবের মেয়েকেও বলছি, এভাবে চলে গেলে তো চলবে না।

এগিয়ে এসে মণিমাসিকে নমস্কার করে হাসতে থাকেন সোম সাহেবের মেয়ে।—বলুন, কী করলে চলবে ?

মণিমাসি—হয়, আমার সঙ্গে এখনই এই গাড়িতে তোমরা দুজনে আমার বাড়ি যাবে আর চা খাবে। নয়, তোমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে চা খাওয়াবে।

সোম সাহেবের ছেলে আর মেয়ে দুজনেরই মুখের হাসি এইবার খুশির ফোয়ারার মত উথলে ওঠে।—চলুন, আমাদের বাড়ি চলুন।

অগত্যা, কিছুটা নিজেরই কথার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে জব্দ হয়ে, কিছুটা সোম সাহেবের ছেলে আর মেয়ের দুটি চমৎকার হাসিমুখ-অনুরোধের মায়ায় পড়ে সোম লজে না যেয়ে পারেননি মণিমাসি।

হঠাৎ-ঘটনার মত সোম লজের মা দিদি আর ভাই-এর পরিচয় পাওয়ার সেই প্রথম দিনেই দেখতে পেয়েছিলেন মণিমাসি, সোম সাহেবের মেয়ে অঞ্জলির মুখের দিকে তাকিয়ে শুক্তি যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। অঞ্জলি যেন একটা ভিন-জগতের বিস্ময়।

কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, একুশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছে, আজ চল্লিশ বছর বয়সের কাছে এসে পৌঁছেছে অঞ্জলি। তবু অঞ্জলির মুখের হাসি দেখলে মনে হবে, যেন ভোরের শিউলি হাসছে। সাদা সিল্কের শাড়ি, সাদা গরদের ব্লাউজ, সাদা ভেলভেটের চটি, হাতঘড়ির ব্যান্ডও সাদা। আর, মুখের রঙ যেন দুধে ঘষা লালচন্দনের রঙ। অঞ্জলির ঘরের টেবিলে বই-এর পাহাড় ; পরলোকের যত কাহিনীর বই।

মণিমাসি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও শুনতে পেয়েছিলেন, অঞ্জলি বলছে—আমার মুখের দিকে ওরকম করে তাকিয়ে থাকতে নেই শুক্তি। বেশি কাছে আসতেও নেই। আমি হলাম সেই ওই ওদের মত, যাদের শরীর হয় কিন্তু ছায়া হয় না।

বোকার মত তাকিয়ে বিড়বিড় করে শুক্তি—তা কি কখনও হয় ? হতে পারে না, অসম্ভব।

অঞ্জলি হাসে।—হতে পারে। হয়ে থাকে। ওরা শুধু চোখের একটি দৃষ্টি দিয়ে পুকুরের জল শুষে নিতে পারে। ফুলগাছের দিকে তাকালে মুহূর্তে গাছ শুকিয়ে যায়। টুপটুপ করে সব ফুল ঝরে পড়ে যায়।

হেসে ফেলে শুক্তি।—বুঝলাম, আপনি আমাকে কৃষ্ণার মত একটা বোকা খুকি মনে করেছেন, আর তামাসা করে ভয় দেখাচ্ছেন। আমি কিন্তু ভিতু মেয়ে নই, অঞ্জলিদি।

মণিমাসিকে বাড়ি ফেরার তাড়া দেবার জন্য পাশের ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই শুনতে পেয়েছিল শুক্তি, অঞ্জলিদির মা কথা বলছেন—আমার ওই একুশ বছর বয়সের বিধবা মেয়েকে ডাইনি বলে গালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন মেয়ের শাশুড়ি, শিক্ষিতা এম-এ পাস করা শাশুড়ি। একেবারে শূন্য হয়ে এক-কাপড়ে আমার কাছেই ফিরে এল মেয়ে। মেয়েটা ওর স্বামীর একটা ফটোও সঙ্গে আনতে পারেনি, মেয়ের হাত থেকে ফটোটাকে কেড়ে নিয়েছিলেন ওর শাশুড়ি।

কিন্তু শুক্তির ওই মুগ্ধ চোখের করুণ আবেদন ব্যর্থ হয়নি। শুক্তির অনুরোধের জেদ রক্ষা করতে গিয়ে অঞ্জলি অনেকবার এই বাড়িতে, রবার বাগানের এই ভারতীতে এসেছে, বসেছে, হেসেছে। কিন্তু শুক্তির সঙ্গে দু-চারটে কথা বলাবলি করে, আর পাঁচ মিনিটও পার না হতেই চলে গিয়েছে।

অঞ্জলির সঙ্গে অঞ্জলির ভাই অনিমেষও এ বাড়িতে এসেছে। ঘরের ভিতরে বসে শুক্তির সঙ্গে কথা বলতে অঞ্জলির যেটুকু সময় লাগত, সেটুকু সময় বাইরের বারান্দার এদিকে-ওদিকে আস্তে আস্তে হাঁটাহাঁটি করেই পার করে দিত অনিমেষ। বার বার বলে অঞ্জলিকে ধরে রাখতে না পেরে শুক্তি এক-একদিন অনিমেষের দিকে তাকিয়ে, আর বেশ একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ফেলত—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চললেন, এটা কিন্তু একটুও ভাল দেখাচ্ছে না।

অনিমেষ হাসে।—আমার তো ইচ্ছে, আরও কিছুক্ষণ থাকি। কিন্তু...।

হেসে হেসে এত মনখোলা ভাষায় একটা কথা বলে দিয়েও অনিমেষ যেন আরও একটা কথাকে মনচাপা দিয়ে রেখে দিল।

একদিন মণিমাসি আর অঞ্জলির সামনেই অনিমেষ ছেলেটা কত সহজে ওর মনচাপা কথাটাকে স্পষ্ট করে বলে দিয়ে হেসে উঠল—আমি একা এলে নিশ্চয় আরও কিছুক্ষণ থাকতাম।

শুক্তিও হাসে।—তা...এলেই পারেন, কে বারণ করছে।

সেবার শুক্তির কলকাতা চলে যাবার আগে হঠাৎ একদিন একাই এসেছিল অনিমেষ। মণিমাসির সঙ্গে শুধু একটি কথা—কেমন আছেন ? শুক্তির সঙ্গেও শুধু একটি কথা—কলেজ খুলছে কবে ? এ ছাড়া আর কোনও কথা বলেনি অনিমেষ। শুধু শুক্তির মেসো মহিমবাবুর সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে প্রায় আধঘন্টা ধরে অনেক কথা আলাপ করে চলে গেল অনিমেষ।

কিন্তু কলকাতা রওনা হবার আগের দিনে শুক্তি কি ওর বিস্ময়ের সেই অঞ্জলিদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে যায়নি ? গিয়েছিল। সেখানে অঞ্জলি ছাড়া কি আর কারও সঙ্গে কথা বলেনি শুক্তি ? বলেছিল। সোম লজের বারান্দাতে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে সে সন্ধ্যায় শুধু কি ব্রহ্মপুত্রের জলের শব্দ শুনে চলে এসেছিল শুক্তি ? আর কারও কথা শোনেনি ? শুনেছিল।

মণিমাসিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ফিরতে এত দেরি কেন হল রে শুক্তি ?

শুক্তি—অনিমেষবাবুর জন্যে।

মণিমাসি—কেন ? তার মানে ?

শুক্তি হাসে।—অনিমেষবাবুর গল্প বলা আর ফুরোতে চায় না।

—কিসের গল্প ?

—যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প।

—পরলোকের গল্প ?

—না না। যত সব ইহলোকের গল্প।

—তার মানে ?

—এই তেজপুরের যত পাহাড় বন নদী আর মন্দিরের গল্প। এটাই নাকি শোণিতপুর, বাণরাজার রাজধানী।

—অনিমেষ তো ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। ওর মনে আবার এসব গল্পের মায়া কেন ?

—আমিও অনিমেষবাবুকে এই কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

—কী শুনিয়েছিস ?

—বলেছি, আপনি ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে একজন বেদব্যাস হলেই পারতেন।

সেবার, সেদিনের শুক্তির মুখের কথা শুনে মণিমাসি হেসেছিলেন। কিন্তু তারপর আর ঠিক ওভাবে হাসতে পারেননি, বরং একটু গম্ভীর হয়ে ভেবেছিলেন।

কলেজের ছুটির পর আবার কলকাতা থেকে যেদিন তেজপুরে ফিরে এল শুক্তি, সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনিমেষকে এবাড়ির বারান্দার একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখে একটু চমকে উঠেছিলেন মণিমাসি।

অনিমেষের হাসিমুখের একটা খুশিভরা কথা শুনে আরও একটু চিন্তিত হন মণিমাসি। অনিমেষ

বলে—আমিও আজ শিলিগুড়ি থেকে ফিরেছি।

মণিমাসি—খুব ভাল ; তোমাকে দেখে খুব সুখী হলাম। চা খাবে নিশ্চয় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শুক্তি কোথায় যেন গিয়েছে, বোধ হয় কোলিবাড়িতে ওর বান্ধবীর সঙ্গে একবার দেখা...।

—হ্যাঁ, আপনাদের বেয়ারা বলেছে, দিদি এখন বাড়িতে নেই।

শুক্তির বাড়ি ফিরতে আর কত দেরি হবে, কে জানে ? চা খাওয়া হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ বসে রইল অনিমেষ। তারপর চলে গেল।

দেখতে ভুল হয়নি মণিমাসির, অনিমেষ এসেছিল শুনেই কেমন যেন আনমনার মত চোখ করে দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল শুক্তি। রাত আটটার শব্দ বাজিয়ে দিয়ে ঘড়ির বড় কাঁটা নামতে শুরু করেছে—টিক্ টিক্ ! টিক্ টিক্ ! মেয়েটাও যেন ওর বুকের ভিতরের একটা শব্দকে শুনছে আর গুনছে।

শুক্তিকে নিয়ে যাবার জন্য চা-বাগানের গাড়ি এল যেদিন, সেদিনও আবার এসেছিল অনিমেষ। মণিমাসি শুনতে পেয়েছিলেন, বাইরের ঘরে অনিমেষের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে শুক্তি—আমি সেদিন বাড়িতে ছিলাম না বলে আপনি কিছু মনে করেননি তো ?

—না, না, মনে করবার কী আছে ? আমি তো জানতামই যে, আপনি বাড়িতে নেই ; তবু ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তা ছাড়া, তখন টিপটিপ করে বৃষ্টিও পড়ছিল।

—তাই বলুন। বলতে গিয়ে শুক্তির গলার স্বরটা যেন একটা হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল।

না, সেদিন আর নেই, যেদিন মণিমাসির ধারণা হয়েছিল যে, শুক্তি শুধু ওর বিস্ময়ের এক অঞ্জলিদিকে দেখবার জন্য গণেশঘাটের সোম লজে যায়। শুক্তির কলকাতার কলেজের যখন ছুটি শুরু হয়, ঠিক তখনই শিলিগুড়ি থেকে রেলের ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষও ছুটি নিয়ে তেজপুরে চলে আসে, এটাও কি দুটো ছাড়া-ছাড়া হঠাৎ-ঘটনার মিল ? নয় বোধ হয়। মণিমাসি অনেকবার ভেবেছেন, এখনই চিঠি দিয়ে কিরণদিকে স্পষ্ট করে কিছু বলা উচিত হবে কিনা ?

॥ ৫ ॥

—কান্‌ছা ! ডাক দিলেন সোম লজের অঞ্জলি।

সোম লজের বাচ্চা নেপালি চাকর : কথাটা না শুনে শুধু ডাক শুনেই কাজ করতে ছুটে যাওয়া ওর অভ্যাস। ছুটতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাওয়া, আর মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়াও ওর অভ্যাস। দিগ্বিদিক বুঝবার কোনও ধার ধারে না কান্‌ছা।

এহেন এক কান্‌ছা ছুটে এসে ঘরের ভিতরে ঢোকে, আর জলভরা একটা কাচের গেলাসকে টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে অঞ্জলির ঘড়িটারই উপর ধপ করে বসিয়ে দেয়।

গেলাসটা ঝনঝন করে দশ টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। গুঁড়ো হয়ে যায় অঞ্জলির ঘড়ির কাচ।

চমকে ওঠে শুক্তি। —এ কী !

কিন্তু অঞ্জলি হাসেন। —আমি তো জল চাইনি, কান্‌ছা। চাইছিলাম...থাক, তুমি যাও।

শুক্তি আশ্চর্য হয় ; এমন একটা কাণ্ড দেখেও অঞ্জলিদি একটুও রাগ করতে পারলেন না। অঞ্জলিদির প্রাণটা কি রাগ করতেই ভুলে গিয়েছে ?—সত্যি অঞ্জলিদি, আপনি কারও ওপর একটুও রাগ করতে পারেন না কেন, বলুন তো ?

অঞ্জলি—পারি ; শুধু একজনের ওপর। সে ছাড়া আর কারও ওপর আমার রাগ নেই।

শুক্তি—জিজ্ঞেস করলে বলবেন কি, কে সে ?

অঞ্জলি—সে হল সে, যার সঙ্গে উনিশ বছর আগে শেষ দেখা হয়েছিল।

শুনে খুশি হয় না শুক্তি। এটা আবার কী এমন নতুন কথা বলছেন অঞ্জলিদি। অঞ্জলিদির মা'র মুখ থেকে মণিমাসি তো কবেই শুনেছেন, উনিশ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন অঞ্জলিদি, তার এক বছর পরেই সায়েন্সের এক ডক্টরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। খুব ভালমানুষ ছিলেন সেই ডক্টর

বিনয় সেন। অঞ্জলিদিকে ফরগেট-মি-নট বলে ডাকতেন।

অঞ্জলি বলেন—অনু আমার চেয়ে বারো বছরের ছোট। সেদিন আমার সেই ছোট্ট ভাই অনুও আমাকে কাঁদতে দেখে কেঁদে ফেলেছিল—আমার যে বিনয়দার ওপর ভয়ানক রাগ হচ্ছে, দিদি।

শুক্তির মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। শুনতে ভাল লাগে না এসব কথা। কিন্তু অঞ্জলিদির মুখের হাসিটা যেন লালচে হয়ে কাঁপছে। বুঝতেও পারা যায় না, কোন দিকে তাকিয়ে কী দেখছেন।

আবার, কথাও বলছেন অঞ্জলিদি।—দেখা তো হবেই একদিন। তখন জিজ্ঞেস করব, ফরগেট-মি-নট মানে কি ডাইনি?

একটা শনশনে হাওয়া জানালার পর্দা কাঁপিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকছে। অঞ্জলিদির সাবানঘষা মাথার চুল এলোমেলো হয়ে ফুরফুর করে উড়ছে।

অঞ্জলিদি!—ডাকতে গিয়ে শুক্তির গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

অঞ্জলি হাসেন।—হ্যাঁ শুক্তি; আমার গল্প শুনতে নেই। বরং...।

বরং, অনুর গল্প শুনে বাড়ি চলে যাও, এই তো বলতে চাইছেন অঞ্জলিদি। কিন্তু অনিমেষবাবুর গল্পের কাছেও যে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারা যায় না। বেশ ভয় ভয় করে। তা ছাড়া, নতুন করে আর কী-ই বা বলবেন অনিমেষবাবু? সেই তো যত সব...এই তেজপুরের গল্প।

তেজপুরই বা কেমনতর একটা জায়গা? বাণ রাজার মেয়ে উষা এখানে স্নান করতেন, ওখানে ফুল তুলতেন, সেখানে বসে থাকতেন। আর, অনিরুদ্ধ এসে উষার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, ওখানে ছুটে যেতেন, সেখানে বসে ছটফট করতেন। না, ওসর গল্পের ঘাট পাহাড় আর কুঞ্জবন, পাথর মূর্তি আর ভাঙা মন্দির দেখবার জন্যে শুক্তির প্রাণে কোনও সাধ নেই।

না, অবজারভেটরি হিলের মাথায় দাঁড়িয়ে নেফা-পাহাড়ের উত্তরে স্নো-লাইনের ছবি দেখতেও ইচ্ছে করে না। ব্রহ্মপুত্রের চরের শরবন আর ধানক্ষেতের উপর বিকেলের রোদের খেলা দেখবারও ইচ্ছে নেই। অনিমেষবাবু নিজে একাই গিয়ে ওসব মায়াময় শোভা দু-চোখ ভরে দেখে আসুন না কেন?

সোম লজের বারান্দাটা সাঁচির রেলিং ডিজাইনের গ্রিল দিয়ে ঘেরা; তার উপর চকচকে সোনা-রঙের পেন্টের প্রলেপ। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, যেন একটা সোনার খাঁচা হাসছে। অঞ্জলিদির ঘর থেকে বের হলেই এই বারান্দা চোখে পড়ে; একটু চমকে উঠতে হয়; একটু থমকে দাঁড়াতেও হয়। কতবার মনে হয়েছে, দম বন্ধ করে, আর, একটা দৌড় দিয়ে বারান্দাটা পার হয়ে গেলেই তো ভাল। কোথাও না থেমে, একেবারে সোজা হেঁটে গিয়ে আর গাড়ির ভিতরে ঢুকে বলে ফেললেই তো হয়—চলো রাজবাহাদুর। শিগগির চলো।

কিন্তু এ কী অদ্ভুত বিপদ! ইচ্ছে করলেও ওভাবে চলে যাওয়া যায় না। বারান্দার একটা চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন অনিমেষবাবু। যেন শুক্তির পায়ের শব্দ শোনবার জন্য একটা অপেক্ষার ধ্যান দাঁড়িয়ে আছে। কোনওদিনও কি একটুও ভুল হল অনিমেষবাবুর? না, কোনওদিনও না। বৃষ্টির ঝাপটায় বারান্দা ভিজে গেলেও যেমন, আর ফুটফুটে চাঁদের আলো বারান্দায় গড়িয়ে পড়লেও তেমন, ভদ্রলোক ঠিক ওখানে চেয়ারে কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

এরকম করে যদি ইচ্ছে করে একটা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন অনিমেষবাবু, তবে দেখুন না কেন। কিন্তু তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য শুক্তিকে আটক করে থামিয়ে রাখার কী দরকার?

কে জানে, আজ আবার কিসের গল্প বলবার জন্য তৈরি হয়েছেন অনিমেষবাবু। না, আজ আর সময় নেই। গল্প শোনা সম্ভব হবে না। দু মিনিটের জন্য হলেও না। না, আর কিছু শোনবার দরকার নেই।

এগিয়ে যায় শুক্তি, বারান্দায় উঠেও থামে না। হেঁটে যেতে যেতে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে শুধু ছোট্ট একটি কথা বলে নেয়—চলি আজ।

অনিমেষ—যাচ্ছেন? আচ্ছা আসুন।

থমকে দাঁড়ায় শুক্তি। হেসে হেসে কথা বলছে অনিমেষ, কিন্তু গলার স্বরে যেন একটা করুণ

আপত্তির মৃদু গুঞ্জন। কত শান্ত আর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুক্তিরই দিকে তাকিয়ে আছে অনিমেষ।

অনিমেষের দিকে না তাকিয়ে, শুধু দূরের সড়কের একটা গাড়ির হেড লাইটের ছুটন্ত আলোর ছটার দিকে তাকিয়ে কথা বলে শুক্তি—মনে হচ্ছে, আপনি যেন কেমন একটু রাগ করে কথাটা বললেন।

অনিমেষ—হ্যাঁ।

শুক্তির চোখের পাতা শিউরে ওঠে। বুকের ভিতরে শব্দ হয়। রুমাল তুলে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে হাতটাও কাঁপে।

ভয় করছে? হ্যাঁ, অনেক বছর আগে ঠিক এইরকম একটা ভয় পেয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল শুক্তির। শিলংয়ের সেই ঝর্নার শব্দের প্রতিধ্বনিটা পাইনবনের বাতাসে একবার করুণ হয়ে মিলিয়ে আর ফুরিয়ে যায়; আবার হঠাৎ গুমরে ওঠে। শুনতে ভয় করে বইকি।

কথা বলে না শুক্তি। কিন্তু অনিমেষ বলে—আপনি আমার একটাও অনুরোধের কথা শুনলেন না।

শুক্তি হাসতে চেষ্টা করে।—তাতে কী হয়েছে?

অনিমেষ—কিছু হয়েছে বইকি।

শুক্তি—কী যে বলেন! ভৈরবী পাহাড়ের গুলঞ্চ পিয়াল আর নাগকেশরের ছায়াতে বসে পাখির ডাক না শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?

উত্তর দেয় না অনিমেষ। কিন্তু অনিমেষের চোখ দুটো তেমনই খুশি হয়ে শুক্তির মুখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

হেসে ফেলে শুক্তি।—এই তো, এখানে আপনার কাছেই দাঁড়িয়ে গল্প করছি। বাইরে গিয়ে গল্প না করলেও চলে।

অনিমেষ—বাগানে যাচ্ছেন কবে? দিন ঠিক করেছেন?

শুক্তি—না। আচ্ছা, চলি এবার।

এইবার সত্যিই প্রায় একটা দৌড় দিয়ে ছুটে চলে যায় শুক্তি। রাজবাহাদুরও গাড়ি স্টার্ট করতে দেরি করে না। স্টেশন ক্লাবের পাশের সড়কের অন্ধকারের কাছে গাড়িটা পৌঁছে যেতেই হাঁপ ছাড়ে শুক্তি।

অদ্ভুত মানুষ এই অনিমেষবাবু। কী মনে করেন ভদ্রলোক, তেজপুর কি সত্যিই একটা রূপকথার জগৎ? মনে কিংবা মুখের ভাষাতে কোনও লজ্জা না রেখে ভদ্রলোক একদিন কত স্পষ্ট করে সত্যি বলেই দিলেন, হ্যাঁ তাই। একবার জিজ্ঞেস করলে হত, শুক্তি বসু যদি তেজপুরে আর না আসে, তবুও কি আপনি এই তেজপুরকে একটা রূপকথার জগৎ বলে মনে করতে পারবেন?

একটুও ভাবলেন না, একটু বুঝেও দেখলেন না অনিমেষবাবু; আবার একদিন কত স্পষ্ট করে একটা ভয়ানক কথা বলেই ফেললেন—আপনি তো এখনও কিছু বলছেন না।

সেদিন চুপ না করে থেকে বলে দিলেই হত—বিশ্বাস করুন, এখানে এই বারান্দার আলোর কাছে দাঁড়িয়ে আপনার গল্প শুনতে ইচ্ছে করে, ভালও লাগে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না, বলতে পারি না। আপনি জিজ্ঞেসও করবেন না।

—নামুন দিদি, বাড়ি তো পৌঁছে গিয়েছি। রাজবাহাদুর ডাক দিল বলেই চমকে ওঠে শুক্তি, চোখ মেলে তাকায়। গাড়ি থেকে নেমে যায়।

মণিমাসি বলেন—বাড়ি ফিরতে এত দেরি করলি কেন?

শুক্তি—বাগানের গাড়ি কবে আসবে আমাকে নিতে?

মণিমাসি—আসছে সোমবারে আসবে।

শুক্তি—তার মানে আরও সাতদিন পরে।

—হ্যাঁ।

—না মণিমাসি। তোমার গাড়িতেই আমাকে বাগানে পাঠিয়ে দাও।

—দেব।

—কালই সকালে।

—না, কখ্খনও না। আমাকে রাগাবি না। সাবধান।

—রেগো না মণিমাসি, আমাকে ক্ষমা করো। আমাকে কালই সকালে যেতে হবে।

—কেন ?

—দরকার আছে, তুমি বিশ্বাস করো।

—বেশ।

—একটা কথা। সোম লজের কেউ যদি আসেন, অঞ্জলিদি কিংবা অনিমেষবাবু, তবে বলে দিও, আমাকে হঠাৎ দরকারে চলে যেতে হল, যেন কিছু না মনে করেন।

—তাই বলব। কথাটা বলেই গম্ভীর হয়ে যান মণিমাসি।

ভাবতে ভাল লাগে না মণিমাসির ; বোধ হয় একটা সন্দেহও করছেন যে, শুক্তি যেন নিজেরই ইচ্ছেটার হাত থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যেতে চাইছে। কিন্তু কী দরকার ? অনিমেষ তো খুবই ভাল ছেলে।

দুঃখ করে একটা কথা বলেছিলেন কিরণদি, মেয়েটা যেন পাখির স্বভাব পেয়েছে। হঠাৎ শিকলি কেটে পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস। আজ কলকাতা, কাল তেজপুর, পরশু চা-বাগান ; এই করে করে মেয়েটা এরকমের একটা উড়ো-উড়ো ছটফটানির মন পেয়েছে, কিন্তু মানুষের জীবনে তো পাখির স্বভাব খাটে না।

চেয়ারটার উপর একটা ক্লান্ত-শ্রান্ত চেহারা নিয়ে চুপ করে বসে আছে শুক্তি। ওর চোখ দেখে মনে হয়, দেয়াল-ঘড়ির টিক টিক শব্দের টোকাগুলিকে মনে মনে শুনছে।

না, না, শিকলি-কাটা মন নয়। যা কল্পনা করছেন মণিমাসি, তাই বোধ হয় ভাবছে শুক্তি। একটু স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে আরও নিশ্চিন্ত হবেন মণিমাসি। তাই জিজ্ঞেস করেন—কিন্তু তুই কি ওদের কারও ওপরে রাগ করে...।

হেসে ফেলে শুক্তি।—কী যে আবোল-তাবোল সন্দেহ করছ মণিমাসি। কোনও মানুষ কখনও অঞ্জলিদির মত মানুষের ওপর রাগ করতে পারে না।

মণিমাসি—আমি বলছি, হয়ত অনিমেষের ওপর রাগ করে...।

হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শুক্তি।—অনিমেষবাবুর মত মানুষের ওপর আমি রাগ করব ? কখ্খনও না।

মণিমাসি ব্যস্ত হয়ে হাঁক-ডাক করেন—ও কালোর মা, শুক্তিকে খেতে দিতে আর দেরি করো না।

॥ ৬ ॥

নেফার পাহাড়ের ওই মেঘ যেন ঘন-ঘোর এক খেয়ালের প্রহেলিকা। মতিগতির কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। গলে গিয়ে ক্ষয় হতে হতে উপরে উঠতে থাকে ; আবার কখনও বা নীচে নেমে যায়। হঠাৎ আবার বিনা ঝড়েই পাহাড়ের গা থেকে যেন আল্‌গা হয়ে খসে পড়ে আর এদিকের আকাশে ভেসে আসে। সমতলের ধানক্ষেতের বুকের উপর কালোছায়া ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাবার সময় কদমবাড়ি চা-বাগানের উপর এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়। গগন বসু আজ এই কদমবাড়ি চা-বাগানের বারো-আনা মালিক।

বয়সটা সত্তর না হোক, পঁয়ষট্টি বছরের কম হবে না। কিন্তু গায়ে চকোলেট রঙের সিল্কের গেঞ্জি, পরনে সাদা জিনের হ্রস্ব হাফ-প্যান্ট, পায়ে ছোট মোজা, এক হাতে ফেল্টের হ্যাট, আর এক হাতে তামাকের পাইপ ; গগন বসুকে তাই চিনে নিতে কারও অসুবিধে নেই যে, উনি একজন প্ল্যান্টার সাহেব।

গগন বসুর স্ত্রী, প্রায় ষাট বছর বয়সের কিরণলেখাকে দেখলে মনে হতে পারে, উনি একজন শাড়িপরা মেমসাহেব ; এমনই ধবধবে ফরসা ওঁর গায়ের রঙ। আজকাল আর দেখা যায় না, আগে

প্রায়ই দেখা যেত, মাসের মধ্যে অন্তত একবার, তেজপুরের সড়ক ধরে ছুটে চলে যাচ্ছে ঝকঝকে চেহারার একটি মোটরগাড়ি ; গাড়িতে প্ল্যান্টার সাহেব গগন বসুর গা-ঘেঁসে বসে একটা চণ্ড বলিষ্ঠ চেহারার বুলডগ মুখ বাড়িয়ে রয়েছে, আর পথের যত মানুষের ভিড়কে ধমক দিয়ে দিয়ে দুরন্ত এক রাগের ডাক ডেকে চলে যাচ্ছে। গগন বসুর স্ত্রীও সেই গাড়িতে বসে আছেন ; নতুন প্যাকেট ছিঁড়ে বিস্কুট বের করে বুলডগের মুখের কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন।

পঁচিশ বছর আগে, মধ্যপ্রদেশের এক দেশি রাজার ট্রেজারির চাকরি ছেড়ে দিয়ে গগন বসু যেদিন এখানে এসে কদমবাড়ি চা-বাগানের এই সুন্দর সাহেবকুঠির লনের উপর একটি চেয়ার পেতে আর শক্ত হয়ে বসেছিলেন, সেদিন তিনি ছিলেন এই চা-বাগানের চার-আনা মালিক। ওই চার-আনা স্বত্ব গগন বসুর বাবা কান্তি বসুর উইলের দান। একমাত্র ছেলেকে তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু দিয়ে যেতে পারেননি। শেষ বয়সে কান্তি বসু আর এদেশে ছিলেন না। তিনি লন্ডনেই ছিলেন, আর, ত্রিশ বছর আগে সেখানেই মারা গিয়েছেন। গগন বসুর বিদেশিনী সৎ-মা রেবেকা বসুও আজ প্রায় বিশ বছর হল লন্ডনে মারা গিয়েছেন।

সেই কঠিন মামলাতে শেষ পর্যন্ত গগন বসু জয়ী হয়েছিলেন। রেবেকা বসুর ছয়-আনা স্বত্ব গগন বসুরই স্বত্ব হয়ে গেল। রেবেকা বসুর দুই ভাইপো, দুই পিটার্স ভ্রাতা, আর্নল্ড আর আর্থারের দাবি সে মামলায় মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল। দুই-আনা স্বত্বের মরিসও দশ বছর আগে হঠাৎ একদিন লন্ডন থেকে এসে, আর, গগন বসুর কাছে স্বত্ব বিক্রি করে দিয়ে চলে গেলেন।

বারো-আনা মালিক গগন বসু আজও এখনও পুরনো অভ্যাসের নিয়মে কদমবাড়ি চা-বাগানের তার-কাঁটার বেড়ার ওদিকে, উঁচু টিলার উপর এই সাহেবকুঠির বারান্দায় এসে লাভের হিসাবের খাতা পরীক্ষা করেন। আর, ম্যানেজার, ডাক্তার, এমন কি বাগানবাবুও গগন বসুর চোখের সামনে চেয়ারগুলিতে বসে থাকেন।

আজকের এই গগন বসু নিশ্চয় দশ বছর আগের সেই গগন বসু নন। তা না হলে, বাগানবাবু কোন ছার ম্যানেজারও কি গগন বসুর চোখের সামনে চেয়ারের উপর বসতে পারতেন, বসবার সাহস পেতেন ?

যে গগন বসু একদিন তেজপুর বাজারে গিয়ে অনেক খোঁজ করেও তাঁর কুকুরের জামার জন্য পছন্দসই ফ্লানেল না পেয়ে দোকানের লোকগুলিকে কুকুরের চেয়েও অধম জীব বলে মনে করেছিলেন, আজকের এই গগন বসু ঠিক সেই গগন বসু নন।

যে গগন বসু একদিন চা-বাগানের মেশিন ঘরের সামনে মজুর আর কামিনদের একটা হল্লার শব্দ শুনে গুলিভরা বন্দুক হাতে তুলেছিলেন, সেই ভয়ানক কড়া মেজাজের গগন বসু আজ বেশ শান্ত হয়ে বসে শুনতে পারেন, শুনেও বেশ শান্ত হয়ে দেখতে পারেন, অফিস-ঘরের দরজা আটক করে আর হল্লা করে কেরানিবাবুকে শাসাচ্ছে আর ভয় দেখাচ্ছে মদে মাতাল একদল মজুর।

এই যে, দুলাল দত্ত নামে একজন মানুষ, গগন বসুরই এক কুটুম্বজন, যাঁর বয়স তাঁর চেয়ে চার বছরের ছোট, আজ এখন চেঁচিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে গদি-আঁটা চেয়ারের উপর পা তুলে দিয়ে বসলেন, তাঁর সঙ্গে দশ বছর আগে কি কখনও হেসে হেসে কথা বলেছেন গগন বসু ? কখনও না। দুলাল দত্তকে চোখে পড়তেই কিরণলেখাকে ডাক দিয়ে, আর দুই চোখে দুটি কঠিন অপ্রসন্নতার ভ্রূকুটি নিয়ে আদেশ করতেন গগন বসু—তোমার ওই বিচিত্র মেজদাটিকে ওদিকে থাকতে বলো ; আমার কাছে যেন আসে না।

আজ আর সেদিনের মত পাইপ দাঁতে চেপে, একটা শক্ত তৃপ্ত আর উদাত্ত আত্মশ্লাঘা হয়ে কিরণলেখার কাছে সে কথা বলেন না, বলতে পারেনও না গগন বসু, যে কথা আট বছর আগেও একবার বলেছিলেন।—এই দুলাল দত্ত লোকটার জীবনের সবই যেমন ষোল-আনা ব্যর্থতা, আমার জীবনের সবই তেমনই, অন্তত বারো-আনা তো সফলতা। বাগানের আর চার-আনা স্বত্ব ছেড়ে দিতে জনসনকে রাজি করাতে বড় জোর আর একটা বছর লাগবে।

আজ বরং দুলাল দত্তের মুখের ওই হো-হো হাসির সামনে গগন বসুর মুখের হাসিটা বেশ একটু করুণ হয়ে চুপসে যায়। কারণ, জানা আছে গগন বসুর, সব কথার আগে যে কথাটা চেঁচিয়ে বলবেন

এই লোকটি ; বয়সে কিরণলেখার চেয়ে মাত্র সাড়ে সাত মাস বড়, কিরণলেখারই জেঠতুতো দাদা, মেজদা, এই দুলাল দত্ত। অঞ্জনার খবর কী ? অর্চনা কেমন আছে ?

অঞ্জনা আর অর্চনা, গগন বসুর বড় মেয়ে আর মেজ মেয়ে, দুজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দশ বছর আগে অঞ্জনার, আট বছর আগে অর্চনার। অঞ্জনা আর অর্চনা, দুই মেয়ের একজনও আর বোধ হয় এই কদমবাড়িতে বাপ-মায়ের কাছে মুখ দেখাতে আসবে না ; সাংঘাতিক অভিমানে আহত দুটি মুখ। ছয় বছর আগে দুই মেয়ের হাতের লেখা সেই চিঠি দুটো শেষ চিঠি হয়ে গগনবাবুর টেবিলের দেরাজের ভিতরে পড়ে আছে। কিন্তু দেরাজটা কাঠের তৈরি না হয়ে পাঁজরের তৈরি হলে এতদিনে বোধ হয় গুঁড়ো হয়ে যেত। অঞ্জনার চিঠি আর অর্চনার চিঠি, দুই চিঠিরই ভাষা প্রায় একরকমের —ভালই তো আছি। ভালই থাকব। বলতে পারি না, কদমবাড়ি কবে যাব।

ঘর-বর সবই নিজে পছন্দ করেছিলেন গগন বসু। নিজে খোঁজ নিয়ে সব জেনে নিয়েছিলেন। নিজে গিয়ে সবই চোখে দেখেছিলেন। যেমন দিল্লির সুকমল তেমনই নাগপুরের প্রভাত ; দুই ছেলের রূপ-গুণের মধ্যে তিনি তাঁর আশার দুটি আইডিয়াল ছেলের জীবনের পরিচয় পেয়েছিলেন। যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, ভাল সার্ভিসে আছে, বিদ্যা আছে ; আর কী চাই ? কালচার ভাল, স্টেটাস ভাল, প্রেস্টিজ ভাল ; এমন দুই ফ্যামিলির দুই ছেলে। খুশি হয়ে দুই মেয়ের বিয়ে দিলেন গগন বসু। দিল্লির ডাক্তার সুকমলের সঙ্গে অঞ্জনার ; নাগপুরের মিল ম্যানেজার প্রভাতের সঙ্গে অর্চনার।

কিন্তু অঞ্জনা এখন মিরাটের এক মেয়ে-স্কুলের টিচার, পঁচাশি টাকা মাইনে পায়। মেয়ে-স্কুলের হোস্টেলে থাকে অঞ্জনা। আর, অঞ্জনার স্বামী সুকমল থাকে দিল্লীতেই ; একটি ফিরিঙ্গি নার্স মেয়ে এখন তার ঘরোয়া জীবনের বে-আইনি সঙ্গিনী।

অর্চনা তার স্বামীর ঘরেই আছে ; মাতাল মিল-ম্যানেজার প্রভাতের হাতের চাবুকের একটা মারের দাগ কপালে নিয়েও অর্চনা বেঁচে আছে। ম্যানেজার ব্যানার্জিকে নাগপুরে একবার পাঠিয়েছিলেন গগন বসু। দেখে এসেছে ব্যানার্জি, ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে একটা ছেঁড়া তোয়ালে সেলাই করছে অর্চনা। চোখের কোণে কালি, ঘুম হয় না মেয়েটার। হাত দুটো শুকনো রোগা কাঠ-কাঠ, রগ দেখা যায়। অর্চনা হেসেছে। —বাবাকে বলবেন, ভালই আছি।

একদিন মাঝরাতে হঠাৎ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে, আর মাথাটাকে দু'হাত দিয়ে যেন শক্ত করে খিমচে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন গগন বসু—আমি কী তা হলে একটা অপয়া, একটা জঘন্য আহাম্মক ? দুলাল দত্তের চেয়ে দশগুণ আনফরচুনেট জীব ? শুনছ কিরণ, কি বলছি আমি ?

কিরণলেখা শুধু কেঁদেছিলেন ; কোনও জবাব দিতে পারেননি।

চোখ-মুখ আর মাথা ধুয়ে, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিয়ে, খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন, গগন বসু, যেন নিদারুণ এক ক্লান্ত মানুষের নিঃশ্বাস। —শুক্তির বিয়ের জন্য আমাকে কিন্তু চেষ্টা করতে বলবে না কিরণ, কখনও না, সাবধান। আমি পারব না। আমি মানুষ চিনতে জানি না।

—কবে এলেন। কখন এলেন দুলাল মামা ? হেসে চেঁচিয়ে আর লাফিয়ে লাফিয়ে হেঁটে আসে শুক্তি। ধড়াস করে একটা চেয়ারকে কাছে টেনে নিয়ে বসে পড়ে। তখুনি আবার চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে—আমার চা এখানে পাঠিয়ে দাও, মা। আমি এখন দুলাল মামার গল্প শুনব।

গগনবাবুও হাসেন। —বলুন স্যার মেজদা ; এবার আপনার রাজ্যি থেকে কী রত্ন নিয়ে এলেন।

দুলাল দত্ত তাঁর সাদা মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে হাসতে থাকেন। —এনেছি একটা ধনেশ।

—কই কই ? চেঁচিয়ে ওঠে শুক্তি।

কিরলেখা আসেন। চায়ের কাপ শুক্তির হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েই বলেন—লাফাসনি শুক্তি। একটু শান্ত হয়ে বস। গল্প শোন।

আজই এসেছেন দুলাল মামা ; কালই চলে যাবেন। এইরকমই তাঁর আসা-যাওয়ার রীতি। যখন আসেন, তখন তাঁর জীবন ও জীবিকার জংলি রঙ্গভূমি ওই নেফা রাজ্যের একটা-না-একটা প্রাণের নমুনা সঙ্গে নিয়ে আসেন। আজ নিয়ে এসেছেন, একটা ধনেশ পাখি। এর আগে একবার

এনেছিলেন একটা সাদা ময়ূরের বাচ্চা। একবার একটা রঙিন বনবিড়াল। আর কত কী এনেছেন, তার হিসাব তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন।

কিন্তু এবাড়ির সকলেরই জানা আছে, কাল যখন আবার তাঁর নিজের রাজ্যে রওনা হবেন দুলাল দত্ত, তখন ধনেশ পাখিটাকে সঙ্গে নিয়েই চলে যাবেন। সাদা ময়ূরের বাচ্চা, রঙিন বনবিড়াল, আর পোকা-মাকড় যা-কিছু সঙ্গে এনেছিলেন, সবই আবার সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছেন। কিছুই রেখে যাননি। কিরণলেখা জানেন, তাঁর এই মেজদার মাথায় একটু ছিট আছে।

বিয়ে করেননি দুলাল দত্ত। তিনি একা মানুষ। সেই কবে, ত্রিশ বছর আগে, দুলাল দত্তের বয়স যখন ত্রিশ কিংবা একত্রিশ, তখন দেশের বাড়ি বেচে দিয়ে আর আশি হাজার টাকা নিয়ে কাঠের কারবার শুরু করেছিলেন। নেফার জঙ্গলের লিজ নিয়ে বছরের পর বছর কত ছুটোছুটি আর হাঁটাহাঁটি করলেন। কত বার দেঁতো শুয়োরের চোখের সামনে পড়লেন, রাগী হাতির ডাক শুনলেন, ভালুকের পাশ কাটিয়ে দৌড় দিলেন। তবু কোনও বিপদ হয়নি। কিন্তু তাঁর কারবার যেন মরীচিকার ছলনা হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল, শুধু রেখে গেল তাঁকে, ওই নেফারই জংলি মায়ার মধ্যে, সে মায়ার বন্ধন আজও তিনি ছাড়িয়ে উঠতে পারেননি। তিনি আজ চারদুয়ারের কাঠের গোলাদার আগরওয়ালার জঙ্গল সরকার। তার মানে আগরওয়ালার লিজের জঙ্গলের যে কুপে যখন গাছ-কাটা‌ব কাজ হয়, তখন তিনি সেখানে যান ; আর, কাটা গাছের ধড়গুলিকে গুনে নিয়ে চারদুয়ারের গোলাতে একটা হিসেব পাঠিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের পাওনার হিসেব, গাছ প্রতি চার আনা।

তাঁর পাওনার টাকা নেবার জন্যে বছরে দু'তিনবার চারদুয়ারে আসেন দুলাল দত্ত, তাই কদমবাড়ি চা-বাগানে তাঁর খুড়তুতো বোন কিরণের বাড়িতে এসে, বোধ হয় শুধু গল্প বলবার জন্যেই দুটো-একটা দিন থাকেন।

আরও একটা ছিট আছে দুলাল দত্তের মাথায়, কিংবা প্রাণে। ফিরে যাবার সময় একটা ঝুলি ভর্তি করে কেষ্টবিষ্টুর আর শিবের হরেক রকমের ছবি তেজপুর বাজার থেকে কিনে নিয়ে যান। টাকায় কুলোলে রবিবর্মার গঙ্গাবতরণ, হরধনুর্ভঙ্গ আর সীতার পাতালপ্রবেশও কিনে ফেলেন। কিরণলেখা জানেন, এসব ছবির বেশির ভাগই নেফার জঙ্গলের যত গাঁয়ের ঘরে বিলিয়ে দেন মেজদা।

ছবিগুলিকে যত্ন করে বাঁধা-ছাদা করবার সময় কিরণলেখাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে হেসে ফেলেন দুলাল দত্ত।—তোমার তো নিশ্চয় মনে আছে কিরণ, আমাদের জনাই-এর বাড়ির বাইরের ঘরে এরকমের আরও কত ছবি ছিল।

কারবারের জগতে যাঁরা হাঁটাহাঁটি করেন, বিশেষ করে যাঁরা স্লিপার আর তক্তা ঘাঁটিঘাঁটি করেন, তাঁরা জানেন, সেই আশি হাজার টাকায় দুলাল দত্ত আজকাল আশি টাকার মুখ একসঙ্গে দেখতে পান কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেজন্য দুলাল দত্তকে কখনও উদ্বিগ্ন হতে, একটু গম্ভীর হতে, কিংবা নেফার পাহাড়ের মেঘের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেও দেখা যায় না।

শুক্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে গল্প করতে গিয়ে দুলাল মামা যে সব কথা বলেন, তার সরল অর্থ এই যে, ভূলোকে কোথাও যদি স্বর্গ থাকে তবে ওই ওখানে, যেখানে তিনি থাকেন, আকাদের একটা গাঁয়ের কাছে আর জঙ্গলের পাশে তাঁর মাচানঘরটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে।—ওখানে থাকলে মেঘদূত তোর আর পড়বার দরকার হবে না শুক্তি, নিজেই একটা মেঘদূত লিখতে পারবি। একেবারে কবিনী কালিদাসী হয়ে যাবি। -

কিরণলেখার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে দুটি চুমুক দিয়ে দুলাল মামার গলার স্বরের উল্লাস আরও প্রবল হয়ে ওঠে।—তুমি বিশ্বাস করো কিরণ, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। জায়গাটা একেবারে কণ্বমুনির তপোবনের মত। শুক্তিকে ওখানে ঠিক একটা শকুন্তলা বলে মনে হবে।

শুক্তি—কিন্তু গাছের বাকল-টাকল পরে ঘুরে বেড়াতে পারব না।

—বাজে কথা বলিস না। ওসব কিছুই পরতে হবে না। আকা মেয়েগুলোও বাকল-টাকল পরে না। কিন্তু...

শুক্তি—কিন্তু কী ?

—একটা আকা মেয়ে যখন বনসুমের ঘন ছায়ার মধ্যে বসে, আর একটা কাঠবিড়ালিকে কোলে নিয়ে আদর করে, তখন সত্যিই মনে হয়, যেন একটা শকুন্তলা মৃগশিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছে।

শুক্তি—আমার কিন্তু মৃগশিশু চাই ; কাঠবিড়ালিকে আদর করতে পারব না।

—মৃগশিশু কেন ? কপালে থাকলে হস্তিশিশু পেয়ে যাবি।

শুক্তি শিউরে ওঠে—ওরে বাবা !

—ওরে বাবা করবার কিছুই নেই। হাতির বাচ্চা দেখলেই গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করবার জন্যে হাত সুড়সুড় করবে।

শুক্তি—আপনি নিজে কি কোনওদিন...।

—না। দূর থেকে দেখেছি, একটা হাতির বাচ্চা ওর ছোট্ট শুঁড় দিয়ে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে দুলছে। আবার, কচি বাঁশের কচি পাতা, তার মানে নবীন রেণু কিসলয় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন দুলাল মামা।—আরও কত কী দেখছি, বললে বিশ্বাস করবি না।

শুক্তি—আগে বলুন। শোনবার পর বুঝব, বিশ্বাস করা যায় কিনা।

—সত্যি, কালিদাস যেমনটি লিখেছেন, ঠিক তেমনি কাণ্ড করে প্রেম করেন জঙ্গলের হাতি আর হাতিনী। উনি শুঁড়ে করে একটা ফুলেল লতা নিয়ে ওঁর গলার উপর ফেলে দিচ্ছেন। তিনি আবার একগাদা শুকনো ধুলো শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাঁর গলায় মাখিয়ে দিচ্ছেন। নাই বা হল পদ্মরেণু, ধুলোর পাউডারই বা কম কিসে ? তারপর শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি করে দুজনের সে কী পীরিতের খেলা !

গগন বসু অপ্রস্তুতের মত এদিক ওদিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই সরে যান। কিরণলেখা তাঁর মুখের হাসিটাকে আঁচল দিয়ে চেপে ধরেন।—থামুন মেজদা।

দুলাল দত্ত—কেন ? কী হল ?

কিরণলেখা—আপনার মুখ খুললে ভয় করে।

দুলাল মামা—আশ্চর্য, সত্যি কথাকে তোমরা এত ভয় কর কেন ?

শুক্তি চেঁচিয়ে ওঠে।—আমার ভয় করে না, দুলাল মামা। আপনি বলুন।

কিরণলেখা—চুপ কর শুক্তি।

কদমবাড়িতে এসে যখনই শুক্তিকে দেখতে পেয়েছেন দুলাল মামা, তখনই চেঁচিয়ে উঠেছেন—চল শুক্তি, আমার ওখানে গিয়ে অন্তত পাঁচটে দিন কাটিয়ে আয়। আজও তেমনই উৎফুল্লভাবে সাদা মাথাটাকে হেলিয়ে দুলিয়ে আর চেঁচিয়ে হেসে কথা বলেন দুলাল মামা।—চল একবার ; তা হলেই বুঝবি, আমি সত্যি কথা বলছি কিনা।

শুক্তি হাসে।—সব মিথ্যে কথা।

—কেন ? কেন ? আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন দুলাল মামা।

শুক্তি—তিন বছর ধরে এই একই কথা বলেছেন, কিন্তু নিয়ে তো গেলেন না।

দুলাল মামা একবার তাঁর সাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে আর বেশ শান্ত-নরম স্বরে কথা বলেন—টাট্টু চড়তে পারবি তো ? রুপা থেকে দু'দিনের ফুটমার্চ, চড়াই-উতরাই রাস্তা। তারপর আমার আশ্রম। ভেবে দেখ, যদি সাহস থাকে তো বল, কবে যাবি ?

শুক্তি—আজই চলুন।

দুলাল মামা—আমার ওখানে কিন্তু রোজ চা পাবি না।

শুক্তি—মাঝে মাঝে পাব তো ? তা হলেই হবে।

দুলাল মামা—কিন্তু বিনা চিনির চা।

শুক্তি—বেশ তো। কোনও অসুবিধে নেই।

—খাওয়ার মধ্যে শুধু ভাত আর কচুর ঝোল। নয়ত মকাইয়ের ছাতু।

—খুব ভাল।

—খুব ঠাণ্ডা আছে কিন্তু।

—ঠাণ্ডা আমি খুব পছন্দ করি।

—কিন্তু জংলি হাতির ডাকও কি পছন্দ করিস ?

—শুনতে পেলে নিশ্চয় পছন্দ করব।

—বেশ, তা হলে কথা রইল, আসছে বছর পুজোর ছুটিতে...

হেসে ফেলে শুক্তি! হেসে ফেলেন কিরণলেখা।

দুলাল দত্ত—তোমাদের এই জায়গাটি অবিশ্যি খুব খারাপ নয়, কিরণ। কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব সুবিধার নয়। ক্ষিদে হয় না, ঘুমও হয় না। নইলে দু-চারটে দিন থাকতাম।

কিরণলেখা—একবার সাতটা দিন থেকেই দেখুন না কেন।

দুলাল দত্ত—অসম্ভব।... এই এই এই শুক্তি, লক্ষ্মী সোনা...।

শুক্তিকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যেতে দেখে আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে উঠলেন দুলাল মামা। শুক্তি থমকে দাঁড়ায়। —কী হল ?

দুলাল মামা—আমার পাখিটাকে বিস্কুট-টিস্কুট খাওয়াসনি মা। এই নে, নিয়ে যা, আমার কাছে পাকা জংলি ডুমুর আছে!

ঝোলা থেকে পাকা জংলি ডুমুর বের করে শুক্তির হাতে দেন দুলাল মামা। শুক্তিও চলে যায়।

॥ ৭ ॥

পর পর তিনটে দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরেছে। আর বৃষ্টি নেই ; কিন্তু এমন একটা আশ্বিনে দিন ঠিক একটা আষাঢ়ে দিনের মত স্যাঁতসেঁতে হয়ে রয়েছে।

সবুজ ধানক্ষেতের বুকের উপর দিয়ে যেন একটা পঙ্কিলতার দাগ গড়িয়ে চলে গিয়েছে, ওটা কি একটা সড়ক ? থইথই করছে কাদা। এখানে-ওখানে এক-দেড় হাত গভীর এক-একটি গর্ত ; যার মধ্যে থিতিয়ে আছে জল। মাঝে মাঝে একটু শুকনো আর শক্ত মাটির পিঠও দেখতে পাওয়া যায়, যার কাছে জংলি আনারসের ঝোপ ঘন হয়ে ছড়িয়ে আছে। বকের ভয়ে ধানক্ষেতের জলের চ্যাং ছটফটিয়ে লাফ দিয়ে সড়কের গর্তের জলের ভিতর লুকিয়ে পড়তে চায়।

সাইন পোস্টে লেখা আছে—কদমবাড়ি রোড। তাই বিশ্বাস করতে হয়, ওটা একটা সড়কই বটে। মাঝে মাঝে সুরকির লালচে কাদা আর ইঁটের খোয়াও ছড়িয়ে পড়ে আছে, এই কদমবাড়ি রোড অনেক দূরে গিয়ে নর্থ ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে মিশেছে।

খুব ভাল করেছে শুক্তি ; তেজপুরে একটা দিনও আর দেরি না করে, বেশ খট-খটে একটা শুকনো দিনে কদমবাড়ি চলে এসেছে। আর একটি দিন দেরি করলে, শুক্তির মণিমাসির ওই ছ' সিলিন্ডার গাড়িকে আর কদমবাড়ি পৌঁছতে হত না। গাড়ি তা হলে মাঝপথে সড়কের কাদার মধ্যে আটক হয়ে পড়ে থাকত, একটা গণ্ডার বাচ্চা যেমন একদিন...।

গত বছরের আশ্বিন মাসের একটি ভোরবেলায়, যখন সারারাতের বৃষ্টির ঝরানি মাত্র এক ঘণ্টা হল থেমেছে, তখন কদমবাড়ি চা-বাগানের একদল মজুর লাঠিসোটা নিয়ে আর হই-হই করে ওই সড়কের দিকে ছুটে গিয়েছিল। আর, কাদামাখা একটা গণ্ডারের বাচ্চাকে ধরে নিয়ে এসেছিল ; সড়কের কাদায় আটক হয়ে আর অচল হয়ে পড়েছিল গণ্ডারের বাচ্চাটা।

শুকনোর সময়েই সড়কটার যা অবস্থা, তা তো জানাই আছে। তার উপর পর-পর তিনদিনের বৃষ্টি, সড়কটা বোধ হয় পচেই গিয়েছে।

জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পান গগন বসু, ওই সড়ক ধরে পর-পর দশটা মিলিটারি ট্রাক চলে যাচ্ছে। তাঁবুর বোঝা আর বোধ হয় আটা-ময়দার বস্তায় ভরাট হয়ে একটা কনভয় চলেছে। হোঁচট খেয়ে, হুমড়ি দিয়ে, কাত হয়ে, কখনও বা হেলে-দুলে, কখনও বা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক-একটা ট্রাকের চাকা কাদাজলের ছলক তুলে চলে যাচ্ছে। মনে হয়, ভালুকপং যাবার রাস্তা ধরতে চায় মিলিটারির সম্ভারের এই কনভয়। কিংবা ওদিকে, আরও কাছে, নদী জিয়াভরলির এপাশে

সেগুন জঙ্গলের কিনারায়, যেখানে মিলিটারির একটা নতুন ছাউনি হয়েছে, সেখানে পৌঁছবার চেষ্টা করছে কনভয়।

কথাটা মেয়ের মুখ থেকেই শুনতে পেয়েছেন গগন বসু। শুক্তি বলেছে, নদী জিয়াভরলির এপাশে আর ওদিকে আরও এক মাইল দূরে মাটি খুঁড়ে অনেক বাংকার তৈরি করা হয়েছে। —ওই যে, পরশু রাত্রিবেলা গুম্ গুম্ শব্দ শুনে তোমার ঘুম ভেঙে গেল বাবা, ওটা বাজ পড়ার শব্দ নয়। লাইট মেশিনগান প্র্যাকটিস করছে ডোগরা রেজিমেন্টের একটা কোম্পানি।

কে জানে কোথা এসে এসব খবর শুনতে পেয়েছে শুক্তি। খুব সম্ভব ম্যানেজার ব্যানার্জির কাছ থেকে শুনেছে। এই তো মাত্র সাতদিন হল কলকাতা থেকে কদমবাড়িতে এসেছে। এই সাতদিনের মধ্যে যে তিনটে দিন বেশ শুকনো ছিল, সারা বাগান জুড়ে সকাল-বিকেল রোদ ঝলমল করেছিল, সে তিনটে দিন রোজই সকালবেলা বাংলোর সামনের লনের উপর দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে হাঁকাহাঁকি করেছে শুক্তি—মহারাজা! মহারাজা!

ছুটে এসেছে মহারাজা; গগন বসুর আদরের বুলডগ। মহারাজার সঙ্গে ছুটোছুটি করে লনের নরম ঘাস তছনছ করেছে শুক্তি।

বিকেল হয়েছে যখন, তখন দেখা গিয়েছে, চা-বাগানের একটা শিরীষের ছায়াতে বেতের মোড়ার উপর বসে বই পড়ছে শুক্তি। কিন্তু সত্যিই পড়ছে কি? কিরণলেখা বলেন, বই পড়ে না ছাই পড়ে। হাতে ধরা বইটা একটা ছুতো; চোখ বন্ধ করে শুধু চুপ করে বসে থাকে শুক্তি। হঠাৎ চমকে ওঠে আর চোখ মেলে তাকায়, যেন একটা তন্দ্রার আবেশ হঠাৎ ভেঙে গিয়েছে। মাটির ঢেলা তুলে শিরীষ গাছের গায়ে-চড়া একটা কাকলাসের গায়ের উপর ছুঁড়তে থাকে। ঝুপ করে পড়ে যায় আতঙ্কিত কাকলাস।

কনভয়টাকে আর দেখা যায় না। কিন্তু দেখতে পেলেন গগন বসু, সাহেবকুঠির জিপ, নীলরঙা হুডের জিপ গাড়িটা ওই ভয়ানক সড়কের দিকে উল্লাসের হরিণের মত ছুটে চলেছে।

চমকে ওঠেন গগন বসু। কী আশ্চর্য, ড্রাইভার কৈলাস তো নেই; তবে কে এখন ওভাবে জিপটাকে ওই সড়কের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? গগন বসু একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকতে থাকেন—কিরণ, কিরণ, শুনছ?

কিরণলেখা আসেন। —বলো।

—শুক্তি কোথায়?

—এই তো এতক্ষণ এখানেই ছিল; তাই তো, কোথায় গেল মেয়েটা? শুক্তি! শুক্তি!

বার বার ডাক দিয়েও শুক্তির কোনও সাড়া শুনতে পান না কিরণলেখা। গগন বসু বলেন—ওই দেখো।

দেখতে পেলেন কিরণলেখা। আর সন্দেহ করবার কিছু নেই। শুক্তিই জিপ নিয়ে বের হয়েছে।

এখনই দৌড়ে গিয়ে শুক্তিকে থামতে বলা কি কারও পক্ষে সম্ভব? সম্ভব নয়। আর বোধ হয় তিন মিনিটও সময় লাগবে না, জিপ গাড়িটা ওই সড়কের কাদাজলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে; তারপর চাকা স্লিপ করবে। হয়ত একটা গর্ত পার হতে গিয়ে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েই যাবে।

বারো বছর আগে, ওই মেয়ে যখন দশ বছর বয়সের একটা খুকু, তখনই একবার চুপি চুপি চা-বাগানের কলঘরে ঢুকে একটা হাতল টেনে দিয়ে ভয়াবহ একটা কাণ্ড বাধিয়ে ছিল। কলঘরে আগুন ধরে গিয়েছিল, মেশিনের বেল্ট পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সেই মেয়ে আজ এত বড় হয়েও যেন ভুলে গিয়েছে যে, ওর বয়স বেড়েছে। কাউকে না জানিয়ে চুপি-চুপি গ্যারেজ থেকে জিপ বের করে নিয়ে দূরের সড়কের দিকে ছুটে চলেছে। নিজে না বুঝলে কে ওকে বুঝিয়ে দিতে পারবে যে, এরকমের দুরন্তপনা ওকে এখন আর একটুও মানায় না? পঁয়ষট্টি বছর বয়সের বাপ, আর ষাট বছর বয়সের মা; দুটো মায়াদুর্বল শাসনের মন এখন একটু রাগ করেই কামনা করে, জিপটা যেন এখনই অচল হয়ে যায়।

সত্যিই অচল হয়ে গেল নাকি জিপটা? জিপটা যে সত্যিই থমকে দাঁড়িয়েছে। কিরণলেখা

বিড়বিড় করেন—ভাল চাস তো ফিরে চলে আয়, আর এগুতে চেষ্টা করিসনি।

গগন বসুর শুকনো চোখ দুটো হঠাৎ দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে।—কে যেন হাত তুলে জিপটাকে থামিয়েছে।

—কে ? কে ? প্রশ্ন করতে গিয়ে কিরণলেখার গলার স্বরেও যেন একটা ভয় ছলছল করে।

গগন বসু—চিনতে পারছি না। যেই হোক, লোকটা যেন ভদ্রলোকের মত দেখতে সেই রেপটাইলটা না হয়। যদি হয়, তবে আজ আমি আর রাইফেলে গুলি ভরতে একটুও...।

ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে কাঁপতে থাকেন গগন বসু।

কিরণলেখা বলেন—সুজিত বোধ হয়।

সেই মুহূর্তে শান্ত হয়ে যায় গগন বসুর উত্তেজিত মূর্তিটা।

সত্যিই যদি ওই লোকটা সুজিত হয়ে থাকে, তবে তাঁর এত ক্ষুব্ধ হবার কারণ থাকে না ; বরং ব্যাপারটা একটা দৈব বিস্ময় বলে মেনে নিতে হয়। একবার দু'বার নয়, কত কতবার, ওই সুজিত ছেলেটা শুক্তির অবুঝ দুরন্তপনাকে ভয়ানক ভুল থেকে বাঁচিয়েছে।

একবার সাহেবকুঠির মেহেদি বেড়ার ওদিকে কামিনদের ঝুমুরনাচের হুল্লোড় দেখবার জন্যে পিলখানার পিছনে একটা পুরনো উইটিবির উপরে উঠেছিল শুক্তি। সে উইটিবির ভিতরে গোখরো সাপের বাসা। সেদিন সুজিত হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে বলেছিল, শিগগির নেমে আসুন। একবার খুব ব্যস্ত হয়ে আর বিস্কুট হাতে নিয়ে একটা অচেনা কুকুরের কাছে এগিয়ে চলেছিল শুক্তি। হঠাৎ পিছন থেকে ডাক দিয়ে সুজিতই বলেছিল, কাছে যাবেন না, ওটা ক্ষেপা কুকুর।

আরও একটা ভুল, যেটা শুধু একা শুক্তির ভুল নয় ; সাহেবকুঠির বাপ মা ও মেয়ে, তিনজনেরই ভুল ; সে ভুলের ফলে কী ভয়ানক কুৎসিত হয়ে দেখা দিয়েছিল একটা বিপদ। সেদিনও সুজিত হঠাৎ ছুটে এসেছিল।

সুজিত ছেলেটা ভাল ; কারও বিপদ হবার মত চরিত্র সে নয়। তা ছাড়া সেরকমও কিছু নয় যে, ওকে দেখে কদমবাড়ির সাহেবকুঠির কারও চোখ আশ্চর্য হতে পারে।

দু' বছর আগে, পুজোর ছুটিতে, ঠিক এরকমই একটা শুকনো আশ্বিনের দিনে, কলকাতা থেকে কমদবাড়ির বাগানে এসে যেদিন পৌঁছিল শুক্তি, ঠিক সেদিনই গগনবাবুর রাইফেলটাকে আলমারির ভিতর থেকে বের করে নিয়ে নারকেল গাছের দিকে তাক করেছিল। কচি ডাবের ছড়া ঝুলছে গাছের মাথার কাছে। গুলি করে ছড়ার বোঁটা ঘায়েল করে ডাব নামাতে চায় শুক্তি।

কে জানে কোথায় দাঁড়িয়ে শুক্তির এই দুরন্ত খেয়ালের কাণ্ডটাকে দেখতে পেয়েছিল সুজিত। তাই দৌড়ে গিয়ে আর হাত তুলে শুক্তির হাতের রাইফেলটাকে চেপে ধরেছিল।—গুলি চালাবেন না, গাছের উপরে লোক বসে আছে।

চমকে ওঠে শুক্তি, রাইফেল-ধরা হাতটা শিউরেও ওঠে। সেদিন শুক্তির স্তব্ধ চোখের ভীরু-ভীরু বিস্ময় চিকচিক করে দেখতেও পেয়েছিল, ঠিকই, গাছের মাথায় জড়সড় হয়ে ছোট্ট একটা মানুষের চেহারা বসে আছে।

সুজিত ডাক দেয়—নেমে আয় রাজু। ভয় নেই, কেউ তোকে বকবে না।

চা-বাগানের মজুরদের মেট বুধন সরদারের ছেলেটা কাঁদ-কাঁদ হয়ে নারকেলের মাথা থেকে নীচে নেমে এল।

শুক্তিকে খুব বকেছিলেন কিরণলেখা।—কী অবুঝ আক্কেলহারা মেয়ে। ভুল করে যে একটা নরহত্যার কাণ্ড করতে চলেছিলি। ছি ছি। দেশ-গাঁয়ে এমন মেয়েকেই তো গেছো মেয়ে বলে।

সেই পুজোর ছুটি শেষ হবার ঠিক দশদিন আগে এই শুক্তি, যাকে একটা নিদারুণ গেছো মেয়ে বলে নিন্দে করেছিলেন কিরণলেখা, সেই মেয়ে এই বারান্দার উপরে একটা চেয়ারে বসে, আর, একটা পায়ের পাতা দু'হাতে চেপে ধরে, সেই সঙ্গে কেঁদে কঁকিয়ে ফুঁপিয়ে একটা দুঃসহ করুণ আতঙ্কের কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল। শুক্তির ডান পায়ের গোড়ালির কাছে ছোট্ট একটা লালচে স্ফীতি দপদপ টনটন করছে।

কুমুদ ডাক্তার এসে বললেন—এটা একটা ফোঁড়া, মুখ নেই। শুধু একটু ওপেন করে দিতে

হবে।

কার সাধ্যি শুক্তির এই সামান্য ফোঁড়াকে ওপেন করে ! ছুরি হাতে তুলে আর মনে মনে হরিনাম জপে নিয়ে যতবার তৈরি হন কুমুদ ডাক্তার, শুক্তিও ততবার আর্তস্বরের চিৎকার ছেড়ে পা সরিয়ে নেয়। —চলে যান ডাক্তারবাবু, এরকম বুচারি করবেন না। ছিঃ, কিরকমের মানুষ আপনি ! শিগগির চলে যান।

গগন বসু আর কিরণলেখা মেয়েকে কত মিষ্টি কথায় কতই না বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝল না শুক্তি। হার মেনে, অসহায়ের মত ঘরের বাইরে দরজার কাছে দুজনে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বোধ হয় কুমুদ ডাক্তারও হার মেনে চলে যেতেন, কিন্তু যেতে পারলেন না। কারণ হঠাৎ ঘরের ভিতরে ঢুকল সুজিত। শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আর হেসে-হেসে কথা বলে সুজিত—একটু শান্ত হয়ে বসুন।

শুক্তি—বাজে কথা বলবেন না।

সুজিতও আর কোনও কথাই বলেনি। শুধু দু'হাত দিয়ে শুক্তির ডান পা'টাকে শক্ত করে চেপে ধরেছিল।

শুক্তির চিৎকার শুনে চমকে উঠে আবার ঘরের ভিতরে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন গগন বসু আর কিরণলেখা, শুক্তি রাগ করে আর চিৎকার করে সুজিতের কামিজের কলারটাকে খিমচে ধরে একটা টান দিয়ে ফবফর করে ছিঁড়ে দিল। কিন্তু সুজিত অবিচল। কোলের উপর একটা তোয়ালে পেতে নিয়ে তার উপর শুক্তির পা'টাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে সুজিত। কুমুদ ডাক্তার আধ মিনিটের মধ্যেই ফোঁড়া কেটে নিয়ে দু'মিনিটের মধ্যেই ওয়াশ ও ড্রেস করে দিলেন। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে শুক্তি শুধু কাঁপতে আর ফোঁপাতে থাকে। শুক্তির ব্যাণ্ডেজ করা পা'টাকে কোলের উপর থেকে আস্তে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সুজিত।

আজ এখন সাহেবকুঠির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন গগন বসু আর কিরণলেখা, জিপের ভিতর থেকে ঝুপ করে রাস্তার উপরে নেমেই নাচুনে পাখির মত লাফালাফি করে গাড়ির চারদিকে ঘুরছে শুক্তি। শুক্তির বেণীটাও এই লাফালাফির ঠেলায় কাঁধের উপর দিয়ে সামনের দিকে গড়িয়ে পড়ে ঝুলছে আর দুলছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে জিপের একটা চাকার দিকে তাকিয়ে রইল শুক্তি। আর, সেই লোকটাও এগিয়ে এল ; শুক্তির পাশে দাঁড়িয়ে জিপের চাকাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

॥ ৮ ॥

রোগীর বুকে স্টেথিস্কোপ ছোঁয়াবার আগে পাঁচবার, আর রোগীর হাতে ওষুধ তুলে দেবার আগে মনে মনে দশবার হরিনাম জপে নেন চা-বাগানের ডাক্তার, যাঁর নাম কুমুদ রায়।

অনেকদিন আগে গগন বসু একবার হেসে-হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন—ফোঁড়া কাটবার ছুরি হাতে নেবার আগে কতবার হরিনাম জপতে হয়, কুমুদবাবু ?

কুমুদবাবুও হেসে জবাব দিয়েছিলেন—বিশ বার।

—তাই বলুন। আমার ধারণা হয়েছিল, একশো একবার।

এই ডাক্তার, এই কুমুদনাথ রায়ের ভাইপো সুজিত। কাকা আশা করেছিলেন, তাঁর ভাইপো একদিন লেখাপড়া শিখে অন্তত ডাক্তারিটা পাস করবে।

কিন্তু কাকার আশা সফল হয়নি, হবেও না কোনওদিন। ডাক্তারি পড়া দূরে থাকুক, স্কুলের পড়ার শেষ ক্লাসটাও পার হতে পারেনি সুজিত।

বেশ বুড়ো হয়েছেন কুমুদবাবু, তবু চা-বাগানের লোকেরা তাঁকে বলে, নতুন ডাক্তার। কারণ, মাত্র এই দু'বছর হল তিনি এই চা-বাগানের ডাক্তার হয়েছেন। আগে ছিলেন ডুয়ার্সের এক চা-বাগানে পুরো একটি বছর নিজেই পক্ষাঘাতের মত একটা রোগে আড়ষ্ট হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন বলে তাঁর চাকরি গিয়েছে ; সেখানে এক ছোকরা বড় ডাক্তার এসেছেন।

ম্যানেজার ব্যানার্জি বলেছিলেন—সাহেব নিজে বুড়ো হয়েছেন বলেই বোধ হয় বুড়ো জীবনের কষ্ট বুঝতে শিখেছেন। তা না হলে কুমুদবাবুর মত একটা অপদার্থ বুড়ো ডাক্তারকে চাকরি দেবেন কেন ? শুধু কি তাই ? কুমুদ ডাক্তারের অপদার্থ ভাইপো সুজিতকেও চাকরি দিতে রাজি আছেন সাহেব। সুজিতের একটা গতি করে দেবার জন্যে সাহেবের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছেন কুমুদ ডাক্তার। সাহেব বলেছেন—বেশ তো, গৌহাটিতে গিয়ে অন্তত কম্পাউণ্ডারিটা শিখে আর পাস করে, আর একটা সার্টিফিকেট নিয়ে চলে আসুক সুজিত। কম্পাউণ্ডার মথুরাপ্রসাদ যেদিন কাজ ছেড়ে দিয়ে কাশীবাস করতে চলে যাবে, সেদিন সুজিতকে কাজে নিয়ে নিতে অসুবিধে হবে না।

কম্পাউণ্ডার মথুরানাথ কাজ ছেড়ে দিয়ে কবেই চলে গিয়েছে। নতুন কম্পাউণ্ডার নন্দলালও কবেই এসে কাজ ধরে ফেলেছে। আর সুজিত আজও সেই সুজিত। কাজ নেই, কাজের চেষ্টা নেই ; সেজন্যে কোনও লজ্জা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ নেই ! ডাক্তার কুমুদনাথ রায়ের ভাইপো সুজিতনাথ রায় যেন এই কদমবাড়ি চা-বাগানের আলো-ছায়ার মধ্যে এক পরম শান্তির যোগী হয়ে জীবনের দিনগুলিকে ক্ষয় করে দিচ্ছে।

সুজিতের বাবা আর মা, দু'জনের কেউই আজ নেই। পাবলিক ওয়ার্কসের সাব-ওভারশিয়ার মণিভূষণ রায় ডিনামাইট দিয়ে নেফার পাহাড়ের পাথর ফাটাতে গিয়ে যেদিন জখম হলেন আর তেজপুর হাসপাতালে এসে মারা গেলেন, সেদিন তাঁর ছেলে সুজিতনাথের বয়স ছিল চার বছর। আর, সেই মণিভূষণ রায়ের বিধবা স্ত্রী তরুলতা যেদিন তেজপুর হাসপাতালেরই রোগীর বিছানায় একমাস পড়ে থাকবার পর মারা গেলেন, সেদিন তাঁর ছেলে সুজিতের বয়স ছিল সাত বছর।

কাজেই কাকা আর কাকিমার কাছে থেকে আর খেয়ে-পরে আজ পঁচিশ বছর বয়সের জোয়ান হয়ে উঠেছে যে ছেলে, সে আজ কাকা আর কাকিমারই মন-প্রাণের ছেলে। কুমুদ ডাক্তারের বাড়িতে আর কোনও ছেলে বা মেয়ে নেই। তিনি নিঃসন্তান।

কাকার আক্ষেপ, সুজিত মানুষ হল না। কিন্তু কাকিমা মানুষটার মনে কোনও আক্ষেপ নেই। সুজিত যে চাকরি-বাকরি করতে চায় না, চেষ্টাও করে না, সেজন্যে কাকিমা প্রিয়বালার মনে কোনও অভিযোগ নেই। পঁচিশ বছর বয়সের ভাসুরপো যেন এখনও চার বছর বয়সের একটা শিশু। যেন হারাই-হারাই সদা ভয় হয়, সারাক্ষণ তুকুপুকু করছে প্রিয়বালার মনটা। কোথায় গেল ছেলেটা ? রান্নার কাজের ব্যস্ততার মধ্যেই বার-বার উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসেন, আর এদিকে-ওদিকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে থাকেন, কী করছে সুজিত ? বাইরে অনেক দূরে কোথাও চলে গেল নাকি ছেলেটা ?

এমনিতে কথা বলে কম, কিন্তু কী বিচ্ছিরি একটা কথা একদিন বলে ফেলেছিল ছেলেটা।—সে জায়গাটাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে কাকিমা।

কাকিমা—কোন জায়গাটা।

সুজিত—নেফা পাহাড়ের একটা জায়গা ; কাকা বলেছেন, জায়গাটার নাম খেলং। ওখানে নাকি এখনও সড়কের ধারে সেই পাথরটা আছে ; যেটা ফাটাতে গিয়ে বাবা মরে গেলেন।

চেঁচিয়ে ওঠেন কাকিমা—চুপ, চুপ, কখ্খনও এরকম অলক্ষুণে ইচ্ছের কথা বলবি না।

বলতে গেলে কিছুই হয়নি ; কুঞ্জলতার গাছটা একদিন শুধু একটু হেলে পড়েছিল। তাই একটা বাঁশ বেঁধে দিয়ে লতার হেলান ঠিক করে দিচ্ছিল সুজিত। কিন্তু এতেই কাকিমার মনের অস্বস্তি ছটফট করে উঠেছে। চেঁচিয়ে ডাক দেন প্রিয়বালা—ও সুজিত, ওখানে ওরকম করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? ঘরে আয়। ওখানে বিচ্ছিরি পোকামাকড় আছে। শিগগির চলে আয়।

এমনও ব্যাপার হয়েছে, দুপুরের ভাত খাওয়া সেরে নিয়ে সুজিত যখন বিছানার উপর গা গড়িয়েছে, ঠিক তখন পেতলের রেকাবিতে চারটে বড় বড় নারকেল-নাড়ু নিয়ে এসে সুজিতের প্রায় মুখের কাছেই তুলে ধরেন প্রিয়বালা।

—এ কী ! এখুনি তো ভাত খেলাম। আপত্তি করে সুজিত।

—তাতে কী হয়েছে। অনায়াসে এমন অদ্ভুত কথাটাও বলে ফেলেন প্রিয়বালা।

—এখন রেখে দাও, বিকেলে খাব।

—এখন অন্তত একটা খা।

ঠিক এই রকম এক-একটি ঘটনার সঙ্গে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কাকিমা প্রিয়বালা আরও একটা কথা, চেঁচিয়ে নয়, বেশ একটু চাপাস্বরে বলেই ফেলেন—চাকরি-বাকরির কোনও দরকার নেই। তোর কাকার কোনও কথায় একটুও কান দিবি না।

কাকিমার ভীরু প্রাণের একটা কঠিন বিশ্বাস বোধ হয় এই সারসত্য বুঝে ফেলেছে যে, এই পৃথিবীকে বিশ্বাস নেই। তাঁর এই ঘরের বাইরে কোথাও দয়া মায়া মমতা বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। নিষ্ঠুর নিয়তির ডিনামাইট কখন যে কার প্রাণের উপর ফেটে পড়বে, কোনও ঠিক নেই। আজও ভুলতে পারেনি প্রিয়বালা, তরুদি যে ঠিক সেদিনই বড়দাকে বলেছিলেন, আজ আর বাইরে বের হয়ো না। কিন্তু বড়দা তো তরুদির কথা একটু গ্রাহ্যও করলেন না, কাজে বের হয়ে গেলেন। হায় রে কাজ ?

চা-বাগানের সকলেই জেনে ফেলেছে, কুমুদ ডাক্তারের এই শক্ত-সমর্থ জোয়ান ভাইপো সুজিত একটি অদ্ভুত ঘরকুনো স্বভাবের ছেলে। ঘরের বাইরে বের হবার জন্য ছেলেটার প্রাণে কোনও চাড় নেই, তাগিদ নেই। তেজপুরে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে, বাগানের বুধন সরদারও একদিন তেজপুরে গিয়ে সার্কাস দেখে এসেছে। কিন্তু সুজিত যায়নি। কম্পাউণ্ডার নন্দলালও সুজিতকে কতবার সাধাসাধি করেছে, সার্কাস দেখতে তেজপুরে যাবার সঙ্গী করতে চেয়েছে। কিন্তু যেতে রাজি হয়নি সুজিত।

হ্যাঁ, এই এক বছরের মধ্যে মাত্র দু'বার কমদবাড়ি বাগানের বাইরে গিয়েছিল সুজিত। তা'ও নিজের কোনও ইচ্ছের জন্যে নয় ; সাহেব বলেছিলেন বলে।—সুজিত, তুমি আজ তেজপুরে গিয়ে কোলিবাড়িতে আমার বন্ধু পরমেশের বাড়ির বাগানের রাজগাঁদার কিছু চারা নিয়ে এসো। পরমেশ তো নেই ; তার ছেলে শিশিরকে আমার নাম করে বললেই দিয়ে দেবে।

কিন্তু কুমুদ ডাক্তার জানেন, আগে তো সুজিতের এরকম আর এতটা ঘরকুনো স্বভাব ছিল না। সকালবেলা ঘুড়ি ওড়াতে বের হয়ে বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে আসত। একবার না বলে-কয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গিয়েছিল। ফিরে এসেছিল তিন দিন পরে, কেঁদে-কেটে প্রিয়বালার যখন আধ-পাগল অবস্থা। এসব না হয় অল্প বয়সের ঘর-পালানো ছেলেমানুষিপনার কাণ্ড। কিন্তু বড় হয়েও, এই তিন বছর আগেও, ডুয়ার্সের বাগানে থাকতে মাছ ধরবার জন্যে কোথায় না চলে যেত সুজিত। মহাশোল ধরবার জন্যে তোর্সার জলে ডিঙি ভাসিয়ে আর জাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে সারা দিনটা পার করে দিয়েছে। গো-বাঘা মারবার জন্যে সাঁওতাল সরদারের তীর-ধনুক নিয়ে তিন ক্রোশ দূরে গদাই ফকিরের জঙ্গলে ঢুকেছে। শুধু এই কদমবাড়িতে আসবার পরেই দেখা গেল যে, সুজিত যেন ওর প্রাণটাকে একেবারে অলস করে দিয়েছে। এই চা-বাগানের বাইরে গিয়ে কিছু দেখতে শুনতে ও খুঁজতে ওর আর ইচ্ছেই করে না। এই চা-বাগানের বাইরে যেন পৃথিবীটাই আর নেই।

সেদিন একটু লজ্জিত না হয়ে পারেননি কুদুম ডাক্তার, সাহেবের মেয়ে শুক্তি প্রথম যেদিন এসে সুজিতকে বেশ মিষ্টি স্বরে একটা শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।—কী আশ্চর্য, মানুষও এত কুঁড়ে হয়! বুঝতে পারি না, আপনি কাজ করেন না কেন ?

কুমুদ ডাক্তারের বাড়ির গেটের গা-ঘেঁষা কুঞ্জলতার গাছটার কাছে সুজিত ; আর সাহেবকুঠির মেয়ে শুক্তি বুলডগ মহারাজার একটা কান শক্ত করে ধরে নিয়ে সুজিতের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

উত্তর দেয়নি সুজিত। হেসে ফেলেছিল শুক্তি।—গায়ে তো সিংহের জোর, তবে কাজ করতে সাহস নেই, কেন ?

সুজিত—কী বললেন ?

শুক্তি—উঃ কী সাংঘাতিক জোর দিয়ে আমার পা'টাকে চেপে ধরেছিলেন। আর একটু হলে...।

সুজিত হাসে।—কী করব বলুন, আপনি যে কারও কথা শুনছিলেন না, কাউকে বিশ্বাসও করছিলেন না।

শুক্তি—কিন্তু আপনি তখন হুট করে কোত্থেকে ছুটে এলেন ? ছিলেন কোথায় আপনি ?

সুজিত—আমার মনে হয়েছিল, ফোঁড়াকাটার ভয়ে আপনি একটা গণ্ডগোল বাধাবেন। তাই আমি সাহেবকুঠির ফটকের কাছেই ছিলাম।

শুক্তি—বাঃ, বেশ লোক আপনি!

চলে গেল শুক্তি।

সেদিন চলে গেলেও আরও অনেকবার এসেছে শুক্তি। বুলডগ মহারাজাকে সঙ্গে নিয়ে সারা বাগান টই-টই করে ঘুরে বেড়াবার অভ্যাসের সঙ্গে যেন আরও একটা অভ্যাস তৈরি করে নিয়েছে। কুমুদ ডাক্তারের বাড়ির গেটের কুঞ্জলতার কাছে এসে একবার থমকে দাঁড়াবে। হয় সুজিতের কাকিমা প্রিয়বালার সঙ্গে, নয় সুজিতের সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলে চলে যাবে।

প্রিয়বালাকে দেখতে পেলে শুক্তি ওই সেই একই কথা বলে—আপনাদের সুজিত যতই অকেজো মানুষ হোন না কেন, আমার কিন্তু কয়েকটা উপকার করেছেন।

আর, সুজিতকে দেখতে পেলেও ওই সেই একই কথা বলে শুক্তি—আমি যদি বাবাকে বলি, তবে আপনার এখুনি একটা কাজ হয়ে যাবে।

উত্তর দেয় না সুজিত।

শুক্তি—আপনি জানেন না, আমি কিন্তু বাবাকে বলেছি। বাবা আপনাকে কাজ দিতে রাজি হয়েছেন। কাজটা হল, বাগানবাবুর কাজ ; এমন কিছু খাটুনির কাজ নয়। একটা টুল নিয়ে ছায়াশিরীষের কাছে বসে থাকবেন। বসে বসে শুধু দেখবেন, কামিনগুলো ঠিকমত পাতি ভাঙছে কিনা, কলম চায়ের গোড়ায় ঠিকমত জল পড়ছে কিনা ; আর দেখবেন, চৌপলের চারার পাতা মশাতে চুষে শুকিয়ে দিচ্ছে কিনা ; দরকার হলে ঝারি করে একটু গন্ধকজল ছিটিয়ে দেবেন, বাস, এই তো কাজ।

ঘরের ভিতর থেকে প্রিয়বালা বের হয়ে এসে, আর বেশ একটু খুশি হয়ে কথা বলেন—আমি তো মনে করি এটা ভাল কাজ। দূরদেশে যেতে হবে না, বাড়িতে থেকে বাড়ির ভাত খেতে পাবে, অথচ চাকরি করাও হবে।

শুক্তি—এই তো, আপনার কাকিমাও বলছেন। কিন্তু আপনি চুপ করে আছেন কেন ?

সুজিত—একটু ভেবে দেখছি।

—ভেবে দেখুন তবে। বলতে বলতে চলে যায় শুক্তি। কিন্তু তখুনি আবার থমকে দাঁড়ায়। —আমি কিন্তু কলকাতায় চলে যাচ্ছি। বার বার তাগিদ দিয়ে মনে করিয়ে দিতে আর আসব না।

সুজিত—না, না, আপনি আর আসবেন কেন ? আমার খুব মনে থাকবে। তবে...।

শুক্তি—কী তবে ?

সুজিত—তবে এখানে কোনও কাজ না নিয়ে বরং বাইরে কোথাও গিয়ে একটা কাজের চেষ্টা করা ভাল।

শুক্তি—খুব ভাল। তাই করুন। আপনার কাকার তো এই অবস্থা, একশো পঁচিশ টাকা মাইনে পান। তার ওপর আবার বুড়ো হয়েছেন। আপনার একটু ভেবে দেখা উচিত সুজিতবাবু।

সুজিত—হ্যাঁ...আচ্ছা...কিন্তু...

শুক্তি—কী ? বলুন।

সুজিত—মজুমদার কি আজও একবার আসবেন ?

শুক্তি—ওরকম করে বলবেন না। হয় বলুন, মিস্টার মজুমদার। নয় বলুন, সুশান্তবাবু।

সুজিত—হ্যাঁ, সুশান্তবাবুর কথাই বলছি।

শুক্তি—হ্যাঁ, আসবেন। কিন্তু একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন ?

সুজিত—না, এমনই ; এর আগে তাঁকে আরও দেখেছি কিনা, তাই মনে হল...।

শুক্তি—উনি তো মস্ত বড় কন্ট্রাক্টর।

সুজিত—হ্যাঁ, ডুয়ার্সে থাকতে দেখেছি, রেলওয়ের অনেক স্টোরে উনিই সাপ্লাই করতেন।

শুক্তি—আপনার কথা বলব সুশান্তবাবুকে ? তাঁর কাছে নিশ্চয়ই অনেক চাকরি আছে। ইচ্ছে

করলে আপনাকে তাঁর কোনও একটা অফিসে অন্তত ফাইলবাবুর কাজ দিতে পারবেন।

সুজিত—না, বলবেন না।

শুক্তি হাসে।—অদ্ভুত মানুষ আপনি।

শুক্তির হাতে একটা ট্রানজিস্টর রেডিও ঝুলছে। গান গাইছে রেডিও। শুক্তির রঙিন শাড়ির আঁচলটা যেমন, শুক্তির মুখের হাসিটাও তেমন, ফুরফুর করে উড়ছে।

সুজিত বলে—আপনি কি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন ?

শুক্তি হাসে।—একথা কেন আপনার মনে হল ? আমি কি বেড়াতে যাবার সাজ পরেছি ? না, ফিকে নীল শাড়ি ছাড়া আমি বেড়াতে বের হই না।

সুজিত হাসতে চেষ্টা করে।—আমি কী করে বুঝব, বলুন ?

শুক্তি—ঠিক কথা, আমাকে ক'দিনই বা চোখে দেখেছেন যে, বুঝতে পারবেন ? এই তো...বোধ হয় মাত্র এক বছর হল আপনারা কদমবাড়িতে এসেছেন, তাই না ?

সুজিত—হ্যাঁ।

শুক্তি—সুশান্তবাবুও বোধ হয় আপনাদের আসবার মাস দু'তিন পরে, ও হ্যাঁ, সেই যে আপনি ছুটে গিয়ে আমার হাতের বন্দুকটা চেপে ধরলেন, ঠিক সেদিনই সুশান্তবাবু প্রথম এসেছিলেন।

সুজিত—হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

শুক্তি চলে যেতেই কাকিমা প্রিয়বালা দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে বারান্দার উপরে দাঁড়ান ; তারপর সুজিতের কাছে এগিয়ে চোখমুখ করুণ করে নিয়ে আর গলা-কাঁপা স্বরে কথা বলেন—সবই তো শুনলাম, সাহেবের মেয়ে যা বলে গেল। কিন্তু তুই কি সত্যিই চাকরির চেষ্টায় বাইরে যাবি ?

সুজিত বলে—না।

কোথাও যায়নি সুজিত। শুক্তি কলকাতা চলে যাবার পর সারা দিন-রাতের মধ্যে ঘরের বাইরে একবারও বের হয়েছে কিনা সন্দেহ। দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছেন প্রিয়বালা। দেখে খুব কষ্ট বোধ করেছেন কুমুদ ডাক্তার। এ কী ভয়ানক আলস্য দিয়ে জীবনটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছে সুজিত। ঘুমের মানুষও নিশির ডাক শুনে চমকে ওঠে আর বাইরে বের হয়ে যায়। কিন্তু সুজিতের ঘুম যেন ভয়ানক একটা রুপোর কাঠি ছোঁয়ানো ঘুম, ভাঙতেই চায় না।

ম্যানেজার ব্যানার্জিও কুমুদ ডাক্তারকে কথা শোনাতে ছাড়েন না।—কানে জল ঢেলে দিলেই ঘুম ভেঙে যাবে। আপনারা শুধু মায়া নিয়ে তুকুপুকু করবেন, কিছু বলবেন না ; তবে ও-ছেলের শিক্ষা হবে কেমন করে ?

তিন মাস পরে কলকাতা থেকে ফিরে এসে গগন বসুর মেয়ে শুক্তিও কুমুদ ডাক্তারের বাড়ির কুঞ্জলতার কাছে সুজিতকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।—এ কী, আপনি এখনও আছেন ? কোথাও যাননি তবে ?

সুজিত—না।

দুই চোখের দুটি শক্ত ভ্রূকুটির সঙ্গে শুক্তির চোখের তারা দুটোও যেন বেশ শক্ত হয়ে যায়।—আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত।

আর একটিও কথা বলে না শুক্তি। শুধু বুলডগ মহারাজার মাথায় আস্তে একটা টোকা দিয়ে বলে—চল।

জানালার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতে পেয়ে খুশি হন প্রিয়বালা, সাহেবের দুর্দান্ত মেয়ে সকালবেলার শান্ত বাতাসে যেন একটা ঝড় তুলে দিয়ে আর আঁচল উড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ভালই হয়েছে। রাগ করেছে করুক, কিন্তু গরিবের বাড়িতে এসে যেন ধমক-ধামক আর না করে।

শীতের দুপুর যখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, তখন সাহেবকুঠির ভিতরের দিকে বাগানমুখী নিরালা বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে শুক্তিও ভাবে, ঠিকই, ওরকমের মানুষের কাছে এতবার যাওয়াই ভুল হয়েছে, এত কথা বলাও ভুল হয়েছে। ভাল কথার সম্মান দিতে জানে না, ওরা হল সেই রকমের মানুষ।

কী অদ্ভুত স্তব্ধতা। কোথাও একটা শব্দ নেই। মহারাজাও ডাকে না। বাবা ঘুমিয়ে আছেন তাঁর

অফিসঘরের আরাম-চেয়ারে। মা ঘুমিয়ে আছেন শুক্তির ঘরে। শুক্তিরই বিছানায়। কিন্তু বাগানের কলঘরের বয়লারও কি ঘুমিয়ে পড়েছে ? পাতি ভাঙবার কামিনগুলোও কি গান গাইতে ভুলে গেল ?

পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে শুক্তি। কী আশ্চর্য, কুঠির এদিকের এই বারান্দায় কেমন করে এত শব্দহীন হয়ে চলে এলেন সুশান্তবাবু ? কেমন করেই বা বুঝলেন যে, শুক্তি এখন এদিকের এই নিরালা বারান্দার এক কোণে চুপ করে বসে আছে ? তবে কি লনের কিনারা ধরে নরম ঘাস মাড়িয়ে আর খুব আস্তে আস্তে হেঁটে এসেছেন ?

সুশান্ত মজুমদারের কাঁধের সঙ্গে একটা ক্যামেরা ঝুলছে। সুশান্ত মজুমদারের হাতের পাইপের মুখ থেকে যেন সিরসির করে সরু ধোঁয়ার সাপ বের হয়ে কাঁপছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই সুশান্ত মজুমদার তো কতবার এই বাড়িতে এসেছেন। কিন্তু কোনওদিন সুশান্তবাবুকে দেখতে এত অদ্ভুত লাগেনি শুক্তির। সুশান্তবাবুর চোখ দুটোকেও কোনওদিন এত লাল হয়ে হাসতে দেখেনি শুক্তি।

—আমি এখন একজন গরিব কন্ট্রাক্টর, কাকাবাবু। এই কথা বলেছিলেন সুশান্ত মজুমদার, যেদিন হঠাৎ কদমবাড়িতে এসে গগন বসুর কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। দেখেই চিনতে পেরেছিলেন গগন বসু। —চিনেছি, তুমি সুশান্ত।

হ্যাঁ, সেই সুশান্ত। গগন বসুর দার্জিলিংয়ের বন্ধু হেমেনের ছেলে সুশান্ত। দার্জিলিংয়ে হেমেনের তিনটে গার্ডেন আছে, সে গার্ডেনের বৈশাখী ফ্লাশের অরেঞ্জ পিকো'র কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই গেল, হৈমন্তী ফ্লাশের ব্রোকেন পিকো শুশংও প্রায় সোনার দরে বিকিয়ে যায়। কলকাতার ব্রোকারদের সঙ্গে ঝগড়া করে হেমেন একবার বলেছিল, আমি আর আমার চা অকশনে দেব না ; বাগান থেকে সোজা লন্ডনে চালান করে দেব।

সুশান্ত বলে—আমি এখন তেজা সিং-এর পার্টনার। রেলওয়ে সাপ্লাই বলুন, মিলিটারি সাপ্লাই বলুন, এমন কি হর্তাকির্তাদের মেয়ের বিয়ের সামিয়ানা সাপ্লাই পর্যন্ত, অনেক কিছু ঝঞ্ঝাট আপনাদের এই সুশান্তকে সহ্য করতে হয়।

গগন বসু হাসেন। —ভালই তো। যথেষ্ট উন্নতি করেছ।

সুশান্ত—বছরে তেত্রিশ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিই ; আর কত দেব কাকাবাবু ? বলুন ?

গগন বসু—তুমি এখন কোথায় থাক ?

সুশান্ত—সর্বঘটে থাকি, কাকাবাবু। পার্লামেন্ট হাউসের গ্যালারিতে আমাকে দেখতে পাবেন। মিনিস্টারের বাড়িতেও দেখতে পাবেন। আর, খোঁজ নেন তো দেখতে পাবেন, আমি একজন সামান্য রোড ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে গাছতলায় বসে আছি। আপনি কি স্বীকার করবেন না কাকাবাবু, এটা যে সত্যিই একটা ইয়ে ?

গগন বসু—কী বলছ ?

সুশান্ত—এটা যে টাকার যুগ ?

গগন বসু বোধ হয় প্রশ্নটাকে এড়াবার জন্যেই হাসতে থাকেন। —হতে পারে। দেখছি, তুমি বেশ অকপট মনে কথা বলতে পার, সুশান্ত।

সুশান্ত—হ্যাঁ কাকাবাবু ; আমার আর কিছু না থাকুক, আপনাদের আশীর্বাদে অন্তত ওই অ্যাসেটটুকু আছে, অকপটতা।

সেদিন শুক্তির সঙ্গে কথা বলেছিলেন সুশান্ত মজুমদার। —আমি ভাবতে পারিনি যে, আপনি এখানে থাকেন। আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম। মাঝে মাঝে আসব, কিন্তু বিরক্ত হতে পারবেন না।

মাঝে মাঝে, আর বার বার অনেকবার এ বাড়িতে এসেছেন এই সুশান্ত মজুমদার। যখনই এসেছেন, তখনই শুক্তির জন্য ঝুড়ি ভর্তি করে অজস্র ফুল এনেছেন।

—এই সবই তেজা সিং-এর মিসামারি বাগানের ফুল। ফুল ফলাবার মত সময় আমার নেই, মিস শুক্তি বসু। শিলং থেকে ফ্লাই করে তেজপুরে আসি, স্টেশন ক্লাবে থাকি, তারপর তেজা সিং-এর গাড়িটি নিয়ে এখানে ছুটে আসি। কেন আসি বুঝি না।

শুক্তিকে একদিন এরকমের হেঁয়ালিধরনের কথাও বলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন সুশান্ত মজুমদার। তারপর আরও কত কথা বললেন, সব কথাই চুপ করে শুনেছে শুক্তি, আর হাসতে চেষ্টাও করেছে।

গগন বসু বলেন, সুশান্ত কিন্তু বেশ অকপট মনের মানুষ। কিরণলেখা বলেন, হ্যাঁ। শুক্তি বলে, তাই তো মনে হয়।

কিরণলেখা একদিন শুক্তিকে একটা অদ্ভুত কথা জিজ্ঞেসা করেছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁর গলার স্বরে একটা কৌতূহলও বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছিল।—সুশান্ত তো তোরই সঙ্গে বেশি কথা বলে ; কী মনে হয় তোর ? বেশ ভাল ছেলে ?

শুক্তি—তাই তো মনে হয়।

শুক্তিকে একদিন বলেছিলেন সুশান্ত মজুমদার, আমি আপনাকে দেখবার জন্যেই আসি। ওকথা না বললেই ভাল করতেন ; কিন্তু শুধু ওই একটি কথার জন্যেই মানুষকে অভদ্র বলে মনে করা উচিত নয়। বলেছেন, আরও কত কথা বলেছেন, তার মধ্যে কোনও অভদ্রতা ছিল না, যদিও শুনে খুব খুশি হয়নি শুক্তি। বলেছেন, ইচ্ছে করে যে, রোজই এখানে এসে আপনার সঙ্গে একটু টেনিস খেলে চলে যাই।

কিন্তু, সেদিন সত্যিই একটু বেশি কথা বলে ফেলেছিলেন।—চলুন মিস শুক্তি বসু ; একটু প্লেজার অভিযান করে ফিরে আসি। মিসামারির কাছে গাভরু নদীর জলে রবার বোট ভাসিয়ে দুজনে একটু ভেসে আসি। দেখবেন, কত ভাল-ভাল মিলিটারি অফিসারের স্ত্রী আর বান্ধবী সেখানে রবার বোটে ভাসছে, কোরাস গান গাইছে আর ফ্লাস্ক থেকে পানীয় বের করে মনের আনন্দে মুখে ঢালছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

চমকে উঠেছিল শুক্তি। বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তবু বেশ শান্ত ভাষাতেই জবাব দিয়েছিল—ওসব কথা আমাকে বলবেন না। বলে লাভ নেই।

সুশান্তর চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের একটা করুণতা নিয়ে কাঁপতে থাকে।—তবে কি আমাকে এখানে আসতেই মানা করে দিচ্ছেন ?

শুক্তি—না না ; মানা করব কেন ? আসবেন বইকি।

সেই সুশান্ত মজুমদার আবার এসেছে। শুক্তির মুখের দিকে অপলক দুটো চোখ নিয়ে তাকিয়ে খুব মৃদুস্বরে কথা বলে সুশান্ত।—আমি বলি, বরং আরও একটু দূরে গিয়ে ধানসিরি নদীর জলে একটু আনন্দ করে আসা ভাল। আপনি কী বলেন ? আপনার সুইমিং কস্ট্যুম আমিই যোগাড় করে দেব।

চমকে ওঠে শুক্তি।—কী বললেন ?

হঠাৎ শুক্তির কাছে এগিয়ে যেয়ে আর চাপা-স্বরে যেন আরও একটা গভীর অনুরোধের কথা বলেন সুশান্ত মজুমদার।

শুক্তি বসুর দুই চোখের তারা দুটো স্তব্ধ হয়ে যায়। গায়ের শাড়িটাকে দুই হাতে শক্ত করে খিমচে আর চেপে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে শুক্তি। একটা কালো কঠিন আতঙ্কের বোবা পাথর যেন শুকিয়ে মুখের উপর চেপে রয়েছে ; কথা বলতে পারে না শুক্তি।

কিন্তু কে একজন হঠাৎ এসে সেই নিরালা বারান্দার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে।

—সুজিতবাবু। ডাক দিয়েই বারান্দা থেকে ছুটে এসে সুজিতের একটা হাত শক্ত করে ধরে কাঁপতে থাকে শুক্তি।

সুজিত বলে—না, কিচ্ছু হয়নি। কোনও ভয় নেই।

হাঁপাতে থাকে শুক্তি। —আমি পড়ে যাব, আমাকে শক্ত করে ধরুন।

দুহাতে শুক্তির দুই হাত শক্ত করে ধরে জিজ্ঞাসা করে সুজিত—এইবার বলুন, কী হয়েছে ?

যেন একটা লজ্জার যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে করুণ হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে শুক্তির গলার স্বর।—ফটো তুলতে চায় ; ভয়ংকর ফটো।

সুজিতের দুই চোখ দপ করে জ্বলে উঠে শুধু দেখতে পায়, কেউ নেই বারান্দায়। বোধ হয় ওদিকের রেলিং টপকে চলে গিয়েছেন সুশান্ত মজুমদার। হ্যাঁ, চলেই গেলেন। শুনতেও পাওয়া

গেল, গাড়ির শব্দটা সাহেবকুঠির ফটক থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

সুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে শুক্তির মুখটা অদ্ভুত এক উজ্জ্বলতায় ভরে যায়। —কী আশ্চর্য, আবার আপনি!

সুজিতও হাসে। —হ্যাঁ ; কিন্তু এইবার আমি যেতে পারব। আর আমার এখানে থাকবার দরকার নেই।

শুক্তি—এতদিন এখানে কী দরকারে ছিলেন ?

সুজিত—এই তো এই জন্যে, এখনই যা হয়ে গেল। আমি জানতাম, আপনি এরকম একটা বিপদে পড়বেন।

চমকে ওঠে না শুক্তি। কিন্তু শুক্তির চোখের তারা ঝিকঝিক করে। —আশ্চর্য!

সুজিত হাসে। —কিন্তু আর আপনার আশ্চর্য হতে হবে না।

শুক্তি—কী বললেন ?

সুজিত—আপনি যা বলেছিলেন ; এবার কাজের চেষ্টায় বাইরে বের হতে হবে।

—কোথায় যাবেন ?

—দেখি কোথায় যাই। এখনও কিছু ঠিক করিনি।

বাগানের ঝাউয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী-যেন ভেবে নেয় শুক্তি। তারপরেই বলে—আমি কিন্তু আপনাকে একটা ঠিকানা দিতে পারি, চিঠিও দিতে পারি, যেখানে গেলে আপনার কাজ হবে।

সুজিতও চুপ করে শুক্তির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী-যেন ভেবে নেয়। তারপরেই বলে—দিন তবে।

—একটু দাঁড়ান। চিঠিটা লিখে আনছি।

সাহেবকুঠির বাইরের বারান্দার সিঁড়ির কাছে গিয়ে চুপ করে একটা নিরেট পাথরের মত শান্ত ও সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুজিত। ঘরের ভিতরে টেবিলের কাছে বসে চিঠি লেখে শুক্তি—মেজর পি. বোস, আসাম রাইফেলস, লোখরা। আমাদের বাগানের ডাক্তারবাবুর ভাইপো সুজিত রায়কে যদি একটি চাকরি করে দিতে পারেন কাকা, তবে খুশি হব। এবার ছুটির সময় নিশ্চয় আপনার ওখানে যাব। ইতি—শুক্তি।

॥ ৯ ॥

জিপের চাকার টায়ার চুপসে গিয়েছে, হাওয়া নেই। ভিতরের টিউব বোধ হয় ফেটেই গিয়েছে। সুজিত বলে—তা ছাড়া চাকার রিমও ফেটে গিয়েছে দেখছি।

শুক্তি বলে—ছেড়ে দিন। চলুন যাই। জিপ পড়ে থাকুক এখানে, উপেন মিস্তিরি এসে নিয়ে যাবে।

সুজিত—চলুন। কিন্তু আপনি যাচ্ছিলেন কোথায় ?

শুক্তি হাসে—বলব না।

সুজিত—ওই সড়কে উঠলে কিন্তু আপনার বিপদ হত। গর্তে পড়ে বোধ হয় উল্টেই যেত জিপটা।

শুক্তির হাসির দোলা লেগে মাথার বেণীটাও দুলে ওঠে। —কেন বিপদ হবে ? বিপদ থেকে বাঁচাতে আপনিই তো আছেন!

সুজিত হাসে। —সে কথা বললে কি চলে ? আজ তো আর একটু হলে...যদি চাকার হাওয়া ফুরিয়ে গিয়ে আর রিম ফেটে গিয়ে গাড়িটা হঠাৎ অচল হয়ে না যেত...।

শুক্তি—ভুল বলছেন। টিউব বার্স্ট করবার আগেই জিপকে থামিয়ে দেবার জন্যে আপনি হাত তুলেছিলেন।

সুজিত—তা হবে।

শুক্তি—এ তো বড় মজার নিয়ম হয়ে উঠল দেখছি।

সুজিত—কী বললেন ?

শুক্তি—আমার একটা বিপদ হতে চললেই আপনি কোত্থেকে এসে হাজির হবেন।

সুজিত—না না ; আজ কিন্তু আমি সত্যিই জানতাম না যে, আপনি জিপ নিয়ে বের হয়ে এই সাংঘাতিক সড়কের দিকে যাচ্ছেন।

শুক্তি—আমি কিন্তু জানতাম যে, আপনি এখন ওদিক থেকে আসছেন।

সুজিত—আপনি ঠাট্টা করছেন।

শুক্তি—ঠাট্টা করব কেন ? কুঠির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে কি দেখা যায় না যে, আপনি এই সড়কের কিনারা ধরে আস্তে-আস্তে হেঁটে এদিকে আসছেন ?

সুজিত হাসতে থাকে। —তাই বলুন।

শুক্তি—কিন্তু আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

সুজিত—কেন ? লোখরা থেকে আসছি।

—সত্যি কথা বলছেন তো ? এতদিন লোখরাতে ছিলেন ? সত্যিই কাজ করছেন সেখানে ? সাহেবকুঠির খুশি মেয়ে শুক্তির মুখের ভাষা, গলার স্বর আর চোখের বিস্ময়, সবই যেন এক সঙ্গে উথলে উঠেছে।

সুজিত—আমার কাকা কি আপনাকে কিছু বলেননি ? কাকিমার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়নি ?

শুক্তি—না ; কেউ আমাকে কিছু বলেননি। কারও সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি।

সুজিত—এই এক বছরের মধ্যেও কি আপনি কারও কাছ থেকে শুনতে পাননি যে...।

শুক্তি—না, কিছুই শুনিনি, যদিও এক বছরের মধ্যে তিনবার কদমবাড়িতে এসেছি আর কলকাতা চলে গিয়েছি। আমি শুধু জানতাম যে, আপনি এখানে নেই। কিন্তু...।

হঠাৎ চুপ করে আর মুখ টিপে হাসতে থাকে শুক্তি। —কিন্তু বলুন তো, কেমন করে জানতে পেলাম যে, আপনি কদমবাড়িতে নেই ?

সুজিত—বোধ হয় মেজর সাহেব আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, আমি লোখরাতে চাকরি করছি।

শুক্তি—না। একদিন বাগানের নালার জলের হাঁস ধরতে গিয়ে পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। জলে ডুবে যেতেই চলেছিলাম, কিন্তু আপনি তবু এলেন না। তখনই বুঝলাম, আপনি এখানে নেই।

জিপের সুইচের চাবিটাকে দুই হাতে লোফালুফি করে হাসতে থাকে শুক্তি।

সুজিত কিন্তু হাসে না ; চোখ দুটোও অদ্ভুত হয়ে কেঁপে ওঠে। —তারপর কী হল ?

শুক্তি—নালার ধারের ঘাসের ঝুঁটি দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সামলে গেলাম আর উঠে এলাম।

সুজিত—আপনি সাঁতার জানেন ?

শুক্তি—না।

সুজিত—তা হলে বুঝে দেখুন, আপনি খুব ভুল করেছেন। জলের হাঁস ধরতে যাওয়া আপনার একটুও উচিত হয়নি।

শুক্তি—আঃ, ওসব কথা এখন রাখুন। আগে বলুন, কী কাজ করছেন ?

সুজিতের গায়ে খাকি জিনের শার্ট, খাকি ফুল প্যান্ট। চকচক করছে খাকি নেয়ারের বেল্টের পেতল। পায়ে কাদামাখা গামবুট। সুজিতের এই নতুন মূর্তিটাও হাসছে। সুজিত বলে—আমি আসাম রাইফেলের হাবিলদার। আপনার কাকা মেজর সাহেব আমাকে খুব পছন্দ করে এই চাকরি করে দিয়েছেন।

শুক্তির খুশির মনটা যেন চেঁচিয়ে ওঠে। —কী আশ্চর্য ! আপনি সোলজার ! চমৎকার ! আপনি একটা কাণ্ডই করেছেন সুজিতবাবু ! খুব ভাল হল। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে...কাজ পেয়ে সত্যিই খুশি হয়েছেন তো ?

সুজিত—নিশ্চয়।
শুক্তি—তবে চলুন।
সুজিত—কোথায় ?
শুক্তি—বাবার কাছে আপনাকে নিয়ে গিয়ে একবার দেখাই।
সুজিত—আপনি যখন বলছেন তখন সাহেবের কাছে নিশ্চয় একবার গিয়ে দেখা করে আসব। কিন্তু এখন এই কাদামাখা গামবুট পায়ে...।
শুক্তি—ঠিক আছে। ওতে কিছু আসে যায় না। চলুন।
সুজিতের সঙ্গে গল্প করে কাঁকরের ছোট রাস্তা ধরে সাহেবকুঠির ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে শুক্তি। শুক্তির হাঁটবার ভঙ্গিটাও অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে, যেন একটা উতলা খুশির হিল্লোল। শুক্তি যেন কদমবাড়ির সাহেবকুঠিকে একটা জয়ের ট্রফি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে।
দেখে খুশি হলেন গগন বসু।—ভালই করেছ সুজিত, মন দিয়ে কাজে লেগে থাকো। তা হলে আরও ভাল হবে।
শুক্তি—সুজিতবাবুকে এই কাজটা কিন্তু আমিই পাইয়ে দিয়েছি, বাবা।
গগন বসু—তুমি ?
কিরণলেখা—তুই পাইয়ে দিয়েছিস, মানে ?
সুজিত—মেজর সাহেবকে উনিই একটা চিঠি দিয়েছিলেন।
হেসে ফেলেন গগন বসু। সুজিতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।—কেমন আছে প্রণব ?
সুজিত—আজ্ঞে ?
গগন বসু—তোমাদের মেজর সাহেব, মেজর পি. বোস কেমন আছে ?
সুজিত—ভাল। আপনাদের সবাইকে একবার যেতে বলেছেন।
গগন বসু—আর আমার যাওয়া! ওটা আর সম্ভব নয়। হ্যাঁ, এরা যদি যেতে চায় তো যাবে।
কিরণলেখা—আমার তো যেতে ইচ্ছে করে ঠিকই, কিন্তু...।
শুক্তি—আমি কিন্তু যাবই। কাকার বাড়ির কৃষ্ণচূড়ার দোলনাটা নিশ্চয় এখনও আছে।
কিরণলেখা—হ্যাঁ যেও, আর আবার একটা বিপদ বাধিও।
শুক্তি—বাধালেও ভয় নেই। এখন সুজিতবাবু ওখানে আছেন। বিপদ থেকে বাঁচাতে ছুটে আসবেন!
হেসে ফেলে সুজিত। হাত তুলে গগন বসু আর কিরণলেখাকে নমস্কার জানায়।—আসি।
চলে যায় সুজিত। আকাশের দিকে তাকিয়ে শুক্তি বলে—এরকম কড়া রোদ্দুর আরও দুটো দিন থাকুক, সড়কটাও শুকিয়ে যাক, এদিকে ড্রাইভার কৈলাসও এসে পড়ুক, বাস, তারপর আর কোনও কথা নয়, আমি কিন্তু লোখরাতে কাকার বাড়িতে অন্তত দুটো দিনের জন্য বেড়িয়ে আসব।
কিরণলেখা—সাতদিনের মধ্যে একটি দিনও তোকে বই ছুঁতে দেখলুম না। এর মানে কী ? অথচ সুমিত্রার সব চিঠিতে ওই একই কথা পড়তে হয় ; শুক্তি সব সময়েই পড়ায় ব্যস্ত। এত ব্যস্ত যে, সময়মত স্নান করতে, খেতে আর ঘুমোতে ভুলে যায়। মেয়েকে নাকি সবই মনে করিয়ে দিতে হয়।
শুক্তি—বড় পিসি মিথ্যে কথা লেখেন না!
কিরণলেখা—বড় পিসি মিথ্যে কথা লেখেনি। কিন্তু তুমি এখানে এসে বড় পিসির কথাটাকে মিথ্যে করে দিচ্ছ কেন ?
শুক্তি—মনে হচ্ছে তুমি রাগ করে কথা বলছ।
কিরণলেখা—পড়ার কথা বললেই যদি রাগের কথা হয়, তবে তাই।
গগন বসু—যাকগে, পড়তে ভাল লাগলে পড়বে, না লাগলে পড়বে না। ও নিয়ে এত মাথা ঘামাবার আর ব্যস্ত হবার কী আছে ?
শুক্তি—আমি লোখরা থেকে একবার ঘুরে আসি, মা ; তারপর দেখবে, দিনরাত পড়ি কিনা।
কিরণলেখা—সেটা আর হবে না ; হতে বলছিও না। তবে একটু শান্ত হয়ে বাড়িতেই থেকো, যখন-তখন টই-টই করে ঘুরে বেড়িও না।

চলে যায় শুক্তি ; ঘরের ভিতরে গিয়ে কিছুক্ষণ বেশ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ; তারপর টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে।

বই পড়তে চেষ্টা করলে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে আর ঘুম পেয়ে যায়। আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলে চোখ দুটো যেন ধড়ফড় করে জেগে ওঠে আর ভুরু টান করে বই পড়তে থাকে ; শুক্তির অবস্থা দেখে হেসে ফেলেন কিরণলেখা।—বেশ তো, আগে লোখরা থেকে একবার ঘুরে আয়, তারপর পড়া শুরু করিস।

নেফার পাহাড়ের মাথায় মেঘ নেই। সারা দিনের রোদ খেয়ে শুকিয়ে গেল বাগানের পুরনো পিলখানার সামনের কাদাটে মাঠটা। সেই শুকনো মাঠের উপর কাকের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ঠোঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে কাঁকড়া মারছে। তেড়ে যাচ্ছে বুলডগ মহারাজা।

আজই তো ড্রাইভার কৈলাসের ফিরে আসবার কথা। বিকেল ফুরল, সন্ধ্যা হল, নারকেলের পাতার ঝালরে টাটকা চাঁদের আলোর ঝিলিমিলিও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কৈলাস এল না। মঙ্গলদই থেকে কদমবাড়ি আসতে কী এমন সময় লাগে যে, সকালে বের হলে সন্ধ্যার মধ্যেও পৌঁছতে পারা যায় না ?

কৈলাস আসেনি ; কিন্তু কেউ একজন এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু কে ? কে এই সময় বাইরের বারান্দায় গগন বসুর সঙ্গে কথা বলতে পারে ? কিরণলেখা তো এখন শুক্তির এই ঘরের একটা আলমারির জিনিস সাজাতে গিয়ে পুরনো কালের ছোট্ট একটা ফ্রক হাতে তুলে নিয়েছেন আর হাসছেন : সেই দুরন্ত ছোট্ট শুক্তির ফ্রক, এখনও কলঘরের কালির ছোপ লেগে আছে ফ্রকের গায়ে।

হঠাৎ বই বন্ধ করে আর কান পেতে শুনতে থাকে শুক্তি। হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে কথা বলছেন কুমুদ ডাক্তার। বেশ অদ্ভুত রকমের কথা।—আপনি তো জানেন স্যার, গল্পে আছে যে, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল আর হাজার বছরের ঘুম ভেঙে গেল। আমাদের সুজিতকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। সেই আলসেমির ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেছে। খুব খুশি হয়ে কাজ করছে।

গগন বসু—সুজিতকে দেখে আমারও তাই মনে হল।

কুমুদ ডাক্তার—আমি কিন্তু আগে জানতাম না স্যার, আজ জানতে পেলাম, আপনার মেয়ে শুক্তিই চিঠি লিখে সুজিতকে এই কাজটা পাইয়ে দিয়েছে।

গগন বসু হাসেন।—হ্যাঁ, আমিও আজ জানতে পেলাম। দেখছি, শুক্তিও তা হলে দেশের বেকার সমস্যার কথা চিন্তা করতে শিখেছে, যদিও...।

কুমুদ ডাক্তার—আজ্ঞে ?

গগন বসু—যদিও এটুকু চিন্তা করতে শেখেনি যে, নালার জলের হাঁস ধরতে গেলে পা পিছলে যেতে পারে।

কুমুদ ডাক্তার—তা স্যার...ছেলেমানুষের মন স্যার...ওরকম একটু...আচ্ছা আসি স্যার।

হেসে ফেলে শুক্তি। হাতের বইটাকে টেবিলের উপর ফেলে রেখে দিয়ে আর ছুটে গিয়ে এক হাতে গগন বসুর গলা জড়িয়ে ধরে, আর-এক হাতে গগন বসুর মুখটাকেও চেপে ধরে।—তুমি আমাকে এত ঠাট্টা করবে না, বাবা।

কদমবাড়ি চা-বাগানের সাহেবের সোনার ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে ফসকে পড়ে যায় ; হাতের পাইপটাও আর একটু হলে পড়ে যেত। গগন বসুর চেহারাটা যেন গলে যেতে চাইছে ; গলার স্বরও যেন এক বিগলিত তৃপ্তির কলরোল।—কোথায় থাকিস তুই, শুক্তি ? দেখছিস, আমি এখানে একা-একা বসে আছি, তবু তুই ওদিকে পড়া নিয়ে পড়ে আছিস ? কাছে এসে একটু বসবি তো।

শুক্তি—নিশ্চয়। লোখরা থেকে ফিরে আসি, তারপর রোজ তোমার কাছে এসে বসব।

শুক্তির লোখরা যাবার স্বপ্নটাকে আর দুটো দিনও অপেক্ষা করে থাকতে হয় না। সড়ক শুকিয়ে গেল, কৈলাসও এসে গেল। বিকেল হতেই সাহেবকুঠির টুরার গ্যারেজ থেকে বের হয়ে গেটের সামনে শুধু এক মিনিটের মত দাঁড়াল আর শুক্তিকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

কদমবাড়ি থেকে লোখরা পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে ? দেড় ঘণ্টার বেশি নয়। কিন্তু এই শুকনো সড়কের রাক্ষুসে গর্তগুলি টুরারের স্পিড মিথ্যে করে দিয়ে লোখরা পৌঁছতে কত দেরি করিয়ে দেবে

কে জানে ?

কৈলাস বলে—এই সড়কের মেরামতের জন্যে এ বছরের কন্ট্রাক্টর কত টাকা নিয়েছে, সে খবর তো আপনি জানেন না দিদি।

শুক্তি—কত টাকা ?

কৈলাস—একান্ন হাজার টাকা।

শুক্তি—কিন্তু কই, মেরামত করা তো হয়নি।

কৈলাস—মেরামত করবার দরকার কী ? বিল তো মজেসে বন যাতা হ্যায় ; আওর মজেসে পাস হো যাতা হ্যায়।

শুক্তি—কে কন্ট্রাক্টর ?

কৈলাস—মিসামারিকা তেজা সিং আওর মজুমদার।

শুক্তি—তোমার স্ত্রীর অসুখ এখন কেমন ? সেরেছে ?

কৈলাস—একটু সেরেছে। হাঁ, আপনি তো বলবেন...।

শুক্তি—আমি কিছু বলছি না, তুমি চুপ করো।

কৈলাস—রাগ করবেন না দিদি। আপনি বলবেন, এটা নেহরু-রাজ। হম বোলেঙ্গে, হায় ভগবান রাজ ! চোরের জোর, চোরের খাতির, চোরের ইজ্জৎ ! চোরলোগ ওই নেফার পাহাড়কেও গিলে খেয়ে ফেলবে। একদিন বলবেন, ঠিকই বলেছিল মুরুখ কৈলাস।

শুক্তি—আমি বলছি, তুমি চুপ করো।

কৈলাস—চুপ তো করতেই হবে, দিদি। আমার মত গরিবেরও দশটা টাকা খেয়ে নিয়ে তবে আমার লাইসেন্স রিনিউ করেছে পুলিশ। তাই বাড়ির রোগী মানুষটার জন্যে আমি এক টাকারও ওষুধ কিনে দিয়ে আসতে পারিনি। কাকেই বা বলব একথা ?

শুক্তি—আমি তোমাকে পাঁচ টাকা দেব। তুমি চুপ করো।

কৈলাস—আপনি আমাকে না হয় দিলেন। ভগবান আপকো ভালা করে। কিন্তু আরও যে কত কৈলাস আছে দিদি ; তাদের কে দেবে ?

শুক্তি—জানি না। কিন্তু তুমি তোমার মহাভারত থামাবে কিনা ?

কৈলাস—হ্যাঁ, থেমেছি, থেমেই তো আছি।

শুক্তি—কী বললে ?

কৈলাস হাসে।—এই তো মেজর সাহেবকা কোঠি।

চমকে ওঠে শুক্তি। হেসেও ফেলে। লোখরার কাকার বাড়ির গেটের সামনে থেমে আছে গাড়িটা। বাড়ির বারান্দায় আলো জ্বলছে ; তাই দেখতে অসুবিধে নেই, দাঁড়িয়ে আছেন আর হাসছেন বাণী কাকিমা।

গাড়ি থেকে নামে শুক্তি।—কৈলাস, তুমি একটু জিরিয়ে নিয়ে আর চা খেয়ে তারপর যেও।

কৈলাস—কবে আবার আসতে হবে ?

শুক্তি—আমি খবর দেব।

॥ ১০ ॥

বাণী কাকিমা বলেন—আগেই বলে রাখছি, শুক্তি, যাব-যাব করতে পারবে না। এসেছ যখন, তখন অন্তত দশটা দিন থাকো।

শুক্তি—আমার তো দশটা বছর থাকতে ইচ্ছে করে, কিন্তু...ও কী। ও কী। কে ওটা ?

ঘরের ভিতরে চোখ পড়েছে শুক্তির ; আর, যেন সাংঘাতিক একটা লোভের বস্তু দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

—ইস। এতদিন ধরে কত ছাই আজেবাজে কথা মনে পড়েছে, অথচ এটার কথা মনে পড়েনি। বলতে বলতে ঘরের ভিতরে ছুটে গিয়ে বিছানা থেকে একটা বাচ্চাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে দুহাতে

জড়িয়ে ধরে শুক্তি। এটা হল বাণী কাকিমার সেই বাচ্চাটা, এক বছর আগে যেটা বিছানায় শুয়ে শুধু হাত-পা ছুঁড়ত, হামা দিতেও পারত না। আজ এখন সেটা বিছানার উপর বসে, আর, একটা হাত তুলে শুক্তিকে যেন ছোট্ট একটা ঘুসি দেখিয়ে হাসছিল।

বাণী কাকিমা হাসেন।—এটার একটা আশ্চর্য অভ্যেস হয়েছে ; ঘরের লোকের কোলে উঠতে কোনও চাড় নেই। কিন্তু বাইরের লোক দেখতে পেলেই কোলে ওঠবার জন্য উসখুস করবে, হাত ছুঁড়বে।

শুক্তি—এটা কী রকমের কথা হল কাকিমা ? আমি কি বাইরের লোক ?

বাণী কাকিমা—আঃ, আগে শুনে নাও কথাটা। ওই যে, যে লোকটিকে তুমি চাকরির জন্য চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলে, কী-যেন নাম, সুজিত ? হ্যাঁ, সে লোকটিকেও কী অদ্ভুত চিনে রেখেছে এইটুকু বাচ্চা ! ওকে দেখলেই হাত ছুঁড়বে, কোলে ওঠবার জন্যে ছটফট করবে।

শুক্তি—সুজিত কী করে ? কোলে নেয় না ?

বাণী কাকিমা—নেয় বইকি। মাঝে মাঝে কাজের অর্ডার নেবার জন্যে তোমার কাকার কাছে সুজিত যখন আসে, তখন সেই তাড়াতাড়ির মধ্যেও দুষ্টুটাকে কোলে নিয়ে পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-সেদিক বেড়িয়ে আসে।

শুক্তি—দুষ্টুর নামটা কী ?

বাণী কাকিমা—নাম তো এখনও কিছু হল না। তোমার কাকা ডাকেন, হনুমান।

শুক্তি—ধেৎ ! এটার নাম তুলতুল ! সত্যি এটা কী নরম তুলতুলে হয়েছে, কাকিমা !

গগন বসুর খুড়তুতো ভাই প্রণব বসু, মেজর বোস ; শক্ত করে পাকানো বড়-বড় এক জোড়া গোঁফ যাঁর লম্বা-চওড়া শরীরটার সঙ্গে চমৎকার মানায়, তিনি এক বছর আগে এই ঘরের ভিতরে শুক্তির দিকে তাকিয়ে, আর হাত তুলে বাণীকে দেখিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—এই মহিলা কেন যে আমাকে বিয়ে করলেন, বুঝি না। তুই কিছু বুঝিস নাকি শুক্তি ?

শুক্তি—হ্যাঁ, খুব বুঝি।

প্রণব বসু—কী ?

শুক্তি—আপনি এই মহিলাকে বিয়ে করলেন বলে ?

প্রণব বসু—যাই হোক, হনুমানের মা একবার বলুক, আমি ওর কোন স্বপ্নটা ব্যর্থ করে দিলাম। সব সময় কিসের এত অভিযোগ ?

বাণী—পুরো তিনটি বছর হল শান্তিপুর যাইনি শুক্তি। তুমিই বলো, মানুষ এই অবস্থা সহ্য করতে পারে ?

প্রণব বসু—আমি কোনওদিনও আপত্তি করিনি। আমি তো স্পষ্ট বলেই দিয়েছি, যত দিন খুশি বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারো। কিন্তু আমার ইচ্ছের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলব, না। যেতে দিতে আমার ইচ্ছে করে না।

বাণী—কেন করে না ?

প্রণব বসু—আমি একটি খাঁটি স্ত্রৈণ স্বামী, তাই করে না। বাস, এর ওপর আর কথা কিসের ?

কিন্তু প্রণব বসুর মুখের অদ্ভুত গম্ভীরতা তখুনি চেঁচিয়ে হেসে ফেলে।—যাবে যাবে, আমি কথা দিচ্ছি। ডিসেম্বরের আগেই তোমাকে শান্তিপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব।

সেদিনের সে ঘটনার হাসির শব্দটাকে এখন হঠাৎ যেন মনের ভিতরে শুনতে পেয়েছে শুক্তি। তাই জিজ্ঞাসা করে—প্রণব কাকা কোথায় ? কোনও সাড়া পাচ্ছি না কেন ?

বারান্দা থেকে একজোড়া শক্ত জুতোর খটমট শব্দ বাজতে বাজতে ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ঘরে ঢুকেই মাথার টুপিটাকে তুলে নিয়ে আর তুলতুলের মাথায় পরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন প্রণব বসু।—শুক্তি, তুই তা হলে সত্যিই এসেছিস ? তা হলে এইবার একবার জিজ্ঞেস কর তো বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যাটিকে, গত ডিসেম্বরে তাঁর শান্তিপুর যাওয়া কেন হল না।

বাণী ডাকেন—শুক্তি, তুমি ওর আজেবাজে কথায় কান না দিয়ে এখন বরং... ।

প্রণব বসু—আমি সব ব্যবস্থা করেছিলাম, শুক্তি ; কিন্তু এই মহিলাই রাগ করে বললেন, আমাকে

শান্তিপুরে পাঠাবার জন্যে তুমি হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন ? এখন তুই বল... ।

বাণী—তুমি এসো শুক্তি । ওঘরে চলো । দুজনে মিলে চা তৈরি করি আর গল্প করি ।

শুক্তি—চলো ।

প্রণব বসু—আমারও একটা কথা আছে, শুনে যা । এসেছিস যখন, তখন একদিন এগজিবিশন দেখে, আর একদিন মাছ ধরা দেখে তারপর কদমবাড়িতে যাবি ।

শুক্তি—কৃষ্ণচূড়ার দোলনাটা কি নেই ?

চেঁচিয়ে ওঠেন প্রণব বসু—আছে বইকি । আয় আমার সঙ্গে, দেখবি আয় ।

তখুনি টেবিলের উপর থেকে একটা টর্চ তুলে নিয়ে আর জানালার কাছে এগিয়ে যেয়ে বাইরের অন্ধকারের উপর আলো ফেলেন প্রণব বসু । —ওই দেখ আছে কিনা ? ঠিক কিনা ?

দেখে খুশি হযে হাসতে থাকে শুক্তি । হ্যাঁ ঠিক আছে । সেই কৃষ্ণচূড়া আর সেই দোলনা ।

হলই বা ছেচল্লিশ বছর বয়স, প্রণব কাকা আজও ঠিক সেই প্রণব কাকা ; এক বছরে একটুও বদলাননি । এই প্রণব কাকাকে তাই বেশ ভাল লাগে । এই লোখরাকেও তাই ভাল লাগে ।

বাণী কাকিমা অবশ্যি খুবই শান্ত মানুষ ; রাগ করলেও জোরে কথা বলতে পারেন না । প্রণব কাকার হই-চই স্বভাবের শখগুলিকে একটুও পছন্দ করেন না । বাণী কাকিমাকে কিন্তু এইজন্যেই ভাল লাগে ।

বছর দুই আগে, সেবারের পুজোর ছুটিতে যখন লোখরা এসেছিল শুক্তি, তখন এই ঘরে বসে কথায় কথায় শুক্তির কাছে অদ্ভুত একটা অভিযোগও করে ফেলেছিলেন বাণী কাকিমা । —বয়সের হুঁস নেই তোমার কাকার । বড় বেশি ছেলেমানুষি বাতিক । দোলনাতে বসে গল্পের বই পড়ে ।

শুক্তি হেসে ফেলেছিল । —তাতে তোমার এত আপত্তি কেন ?

বাণী—আপত্তি করব না কেন ? এতদিন কিছু ছিল না, ছিল না ; সে এরকম ভালই ছিলাম । এবার আমাকে কী লজ্জায় ফেলেছে, বলো দেখি ?

শুক্তি আশ্চর্য হয়েছিল । —তোমার লজ্জা কিসের ? তুমি তো আর দোলনাতে দুলছ না ।

বাণীও সেদিন একটু আশ্চর্য হয়ে আর চোখ বড় করে শুক্তির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন । তারপরেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে আর হতাশ-উদাস স্বরে একটা আক্ষেপের কথা বলেছিলেন—আমারও মাথা খারাপ হয়েছে । কার কাছে কী কথা বলছি !

শুক্তি—কী হল ?

বাণী—তুমি ঠিক বলেছ । আমার আবার কিসের লজ্জা ? যাই হোক, তুমি কিন্তু এখনও সেই দোলনা-দোলা মেয়েটি, একটুও বড় হওনি ।

আজ আবার কাকিমা সেই দু'বছর আগের পুরনো কথার মত একটা কথা বলে হেসে উঠলেন । —এবার আমি আশা করেছিলাম, তুমি একটু বদলেছ । কিন্তু যা দেখছি, তাতে তো মনে হচ্ছে, এই এক বছরেও একটুও বড় হওনি ।

শুক্তি—না, বড় হইনি । কিন্তু ওরকম হেঁয়ালি করে কথা বললে আমি এখনই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে দোলনাতে বসব আর দুলব ।

বাণী—না শুক্তি, লক্ষ্মী, তুমি এখন ওসব আরম্ভ করলে ভদ্রলোকও এখনি বিউগল বাজাতে শুরু করবে ।

শুক্তি—কিন্তু কী বলছিলে, বলো ।

বাণী—বলবার মত এমন আশ্চর্যের কথা নয় । কিরণদিকে একটা চিঠি দিয়েছি । জানতে চেয়েছি, এখন তোমার বয়স ঠিক কত ।

শুক্তি—বাইশ বছর হয়ে গিয়েছে ।

বাণী—কিরণদিও তাই লিখেছেন । আমিও শান্তিপুরের চিঠির জবাবে সে কথা জানিয়ে দিয়েছি ।

কথা বলে না শুক্তি । শুধু কোলের তুলতুলের দু'হাতের থাবাথাবির নরম উৎপাতের কাছে একটা হাত অলসভাবে এলিয়ে রেখে দিয়ে জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে আনমনার মত তাকিয়ে থাকে । বাণী কাকিমা মুখ টিপে হাসেন । —দেখছি, সত্যিই বড় হয়েছ । ভাবতে শিখেছ তা হলে ? আমি মিথ্যে

সন্দেহ করেছিলাম।

শুক্তি—আমিও তো দেখছি, তুমি এই একবছরে কত বুড়ি হয়ে উঠেছ।

বাইরের ঘরে প্রণব কাকার নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। শুক্তি বলে—এ কী ? কাকা এখুনি ঘুমিয়ে পড়লেন ?

বাণী—চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছেন। চায়ের গন্ধ নাকে গেলে জেগে উঠবেন।

শুক্তি—কিন্তু তার আগে তো কাকার এরকম অভ্যেস দেখিনি।

বাণী—সাধে কি অভ্যেস হয়েছে ? শেষ রাতে উঠে বেরিয়ে যেতে হয়, ফিরে আসতে এক একদিন বিকেল হয়ে যায়। খুব খাটুনি পড়েছে। নতুন প্লেটুনগুলোর মর্টার ট্রেনিং শুরু হয়েছে।

শুক্তি—অনেক দূরে যেতে হয় বোধ হয় ?

বাণী—হয় বইকি। জিপ নিয়ে ছুটছেন, কখনও এ-জঙ্গলে কখনও সে-জঙ্গলে। আর, নদীর কাছে কোনও এক্সারসাইজ থাকলে তো কথাই নেই ; ফিরতে রাত হয়ে যায়।

ঘুমন্ত প্রণব কাকা বোধ হয় চায়ের গন্ধ পেয়েছেন। তাই তাঁর ডাক শোনা যায়।—চা কি হল ?

শুক্তি হেসে ফেলে। কিন্তু বাণী কাকিমা হাসেন না। বরং বেশ একটু অপ্রসন্ন স্বরে কথা বলেন।—তুমি মনে করছ, শুধু কাজের জন্যেই বাড়ি ফিরতে রাত হয় ? না। কাজ শেষ হবার পর মাছ ধরবার জন্যে নদীর জলে ছিপ ফেলে বসে থাকবে। একবার ভেবেও দেখবে না যে, এদিকে একটা মানুষ একা পড়ে আছে।

চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেলেন বাণী কাকিমা।

লোখরার এই রাতটাকে দেখতে বেশ ভাল লাগছে। জানালার দিকে তাকাতেই চোখে পড়েছে শুক্তির, এইটুকু এককুচি চাঁদের আলোতেই আকাশের কালোমেঘ যেন সাদা ধবধবে গুঁড়োর মত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কৃষ্ণচূড়ার মাথা দুলিয়ে দিয়ে হুহু করে ছুটছে লোখরার ময়দানের হাওয়া। কোলের তুলতুল ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই রাত যখন শেষ হয়ে আসে, তখন প্রণব কাকার বুটের খুটখাট শব্দ, কিংবা বাণী কাকিমার চা-তৈরির ঠুং-ঠাং শব্দ শুক্তির ঘুম ভেঙে দিতে পারে না ; এমনই নিবিড় ঘুম। কিন্তু ভোরের দিকের আরও নিবিড় ঘুম হঠাৎ একটা বিউগলের শব্দে ভেঙ্গে যায়।

ধড়ফড় করে বিছানা থেকে নেমে একেবারে খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় শুক্তি।

বাণী কাকিমা বলেন—এ কী ? তুমি ওরকম করে হঠাৎ জেগে উঠলে কেন ?

শুক্তি—এ কী রকমের বিউগলের শব্দ ?

বাণী কাকিমা হাসেন।—কী রকমের আবার ? রোজই তো এইরকম বিউগলের শব্দ আর মার্চ করে ওরা চলে যায়।

বাণী কাকিমা ঠিক কথাই বলেছেন। শুনতে পায় শুক্তি, ভোরের বাতাসকে তালে তালে শিউরে দিয়ে বুটের শব্দের কাতার চলে যাচ্ছে। পাশের বাংলোর ক্যাপ্টেন থাপার চাকর কয়লাচাপানো উনানটাতে আগুন ধরিয়ে রাস্তার উপর রেখে দিয়েছে। ধোঁয়া ছড়াচ্ছে উনানটা। তাই দেখতে পাওয়া গেল না, কারা মার্চ করে চলে গেল।

ভোরের বিউগল রোজই বাজে। মেজর বোসের বাড়ির ফটকের ঠিক সামনে এসেই বেজে ওঠে। একদিন বলেই ফেলে শুক্তি।—আমার কী-রকম মনে হয় জান, কাকিমা ? বিউগলের শব্দটা যেন ইচ্ছে করে আমাদের বাংলোর ঠিক গেটের কাছে এসে বেজে ওঠে।

বাণী কাকিমা বলেন—হতে পারে। ওরা হয়ত মনে করে, বিউগলের শব্দ শুনে খুশি হবেন মেজর সাহেব।

না, কেষ্টচূড়ার দোলনাতে চড়ে বাণী কাকিমাকে আতঙ্কিত করতে চেষ্টা করেনি শুক্তি, যদিও পাঁচটা দিন এই লোখরাতেই কেটে গেল। বিকেল হয়েছে যখন, তখন এক হাতে তুলতুলকে দোলনাতে বসিয়ে আর ধরে রেখে, আর-এক হাতে আস্তে দুলিয়েছে।

সন্ধে হয়। চায়ের টেবিলে বসে বাণী কাকিমার সঙ্গে কথা বলে শুক্তি।—এবার আমাকে কদমবাড়ি ফিরে যেতে হয় কাকিমা, আর দেরি করা চলে না। বাগানে একটা খবর পাঠাবার...।

শুক্তির কথাটা না ফুরোতেই পাশের ঘর থেকে প্রণব কাকা বলে ওঠেন।—হ্যাঁ, শুক্তি, বি রেডি। এখনই বের হতে হবে।

বাণী কাকিমা আশ্চর্য হয়ে বলেন—কী বলছেন ভদ্রলোক?

প্রণব কাকা—বলছি, শুক্তিকে এখন এগজিবিশন দেখাতে নিয়ে যাব।

বেশ সুন্দর আর বেশ অদ্ভুত এগজিবিশন। মস্ত বড় সামিয়ানার নীচে ময়দানের একপাশের একটা জায়গার উপর নানারকমের তৈরি-করা বিচিত্রতা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নদীর উপর পনটুন ব্রিজ, পুরো প্যাক কাঁধে নিয়ে নদী পার হচ্ছে সৈনিক। দুশমনের মেসিনগানের দিকে তাক করে গ্রেনেড ছুঁড়ছে একলা একজন ভয়ানক শক্ত চেহারার জমাদার। রিমাউন্টের টাট্টু ঘোড়ার তিনটে সত্যিকারের নতুন বাচ্চা শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দানা খাচ্ছে। স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ক্যাপ্টেন থাপার বাগানের টমেটো, যার সাইজ ক্রিকেট বলের চেয়েও বড়। আর ওদিকের ওগুলো বোধ হয় নেফার পাহাড়।

মস্ত বড় একটা ত্রিপলকে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে নেফার পাহাড় তৈরি করা হয়েছে। কালো রঙের প্রলেপ দিয়ে পাহাড়ের পাথুরে গা, আর সবুজ রঙ দিয়ে জঙ্গল আঁকা হয়েছে। ঝর্না আর নদীগুলো সাদা। সড়কটা মেটে রঙের। আর পেঁজা তুলোর মোটা একটা লাইন আঠা দিয়ে সেঁটে বরফঢাকা সীমান্তের চেহারাও আঁকা হয়েছে। নীল আলোর খুব ছোট এক-একটা বাল্ব জ্বলছে সেই তুলোর বরফ-লাইনের এখানে আর ওখানে—তোয়াং, ঢোলা, বুমলা, থাগলা।

সত্যিই যে সুজিতবাবু দাঁড়িয়ে আছে এখানে। হেসে ওঠে শুক্তি।—আপনি এখানে কী করছেন?

সুজিত বলে—এটা আমিই তৈরি করেছি।

শুক্তি—আপনি?

সুজিত—হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন থাপা বলেছেন, আমার এই নেফার পাহাড়ই ফার্স্ট প্রাইজ পাবে।

শুক্তি—বেশ, খুব সুখবর শোনালেন। সত্যিই দেখতে খুব চমৎকার হয়েছে এই নেফা-পাহাড়।

লম্বা একটা স্টিক হাতে তুলে নিয়ে, আর স্টিকের ডগাটাকে বুমলার বরফের গায়ে ছুঁইয়ে দিয়ে সুজিত হাসতে থাকে।—আরও একটা সুখবর পেয়েছি। এই বুমলাতে আমাদের প্লেটুনের পোস্টিং হবে।

—তাই নাকি। খুব ভাল হল। সত্যি খুব ভাল খবর। শুক্তির দুই চোখের তারার উপর নীল বাল্বের বুমলার আলোটাও যেন নীলাভ বিস্ময়ের আলো হয়ে হাসতে থাকে।

এতক্ষণ ওদিকে ব্যান্ড-স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন থাপার সঙ্গে গল্প করছিলেন প্রণব কাকা। এইবার হাত তুলে ইশারায় শুক্তিকে ডাক দিলেন। চলে গেল শুক্তি।

আজ ছিল এগজিবিশনের শেষ দিন। কাজেই আর একটি দিন পরে ময়দানের সামিয়ানাও অদৃশ্য হয়ে গেল। শুক্তি বলে—আর দেরি করব না কাকা। এবার কদমবাড়িতে একটা খবর পাঠিয়ে দিন; কৈলাস গাড়ি নিয়ে এসে আমাকে নিয়ে যাক।

প্রণব কাকা—আজ নয়, কাল খবর পাঠাব। আজ তুই বরং এখুনি তৈরি হয়ে নে। কুইক।

শুক্তি—কেন?

প্রণব কাকা—মাছ ধরবি, চল।

বাণী কাকিমা ভ্রূকুটি করেন।—এ কী কথা।

প্রণব কাকা—তার মানে আমি মাছ ধরব, শুক্তি শুধু বসে বসে দেখবে।

বাণী কাকিমা—তাতে শুক্তির লাভ কী?

প্রণব কাকা—শুক্তির লাভ, বসে বসে নদীর বিউটি দেখবে। নদী জিয়াভরলি, একেবারে জীবন্ত ভরলি।

শুক্তির আপত্তি নেই। তাই বাণীও আর আপত্তি করেন না। বরং রান্নাঘরে ঢুকে এক ঘন্টার মধ্যে একগাদা লুচি ভেজে আর হালুয়া তৈরি করে হাঁপিয়ে উঠলেন। এক হাতে খাবারের বাস্কেট তুলে নিয়ে, আর-এক হাতে শুক্তির একটা হাত ধরে প্রণব কাকাও জিপে উঠলেন।

গরগর করে শব্দ করছে জিপের ইঞ্জিন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর জিপের দিকে তাকিয়ে বাণী বলেন—আস্তে চালিও।

মেজর পি. বোস সেই মুহূর্তে তাঁর বাঁ পায়ের বুটের গোড়ালির সব জোর দিয়ে অ্যাক্সিলেটার চেপে দিলেন। চিতে বাঘের মত তিনটে লাফ দিয়েই মত্ত হয়ে ছুটে চলল জিপ।

—অনেকটা রাস্তা। তাড়াতাড়ি না গেলে তাড়াতাড়ি ফিরব কি করে ? তোর কাকিমার কমনসেন্স একটু কম, যদিও মানুষ ভাল। মেজর বোসের গলার স্বরও যেন একটা ছুটন্ত আনন্দে গরগর করে হাসতে থাকে।

—ওই যে ছেলেটা, তোর চিঠি নিয়ে চাকরির জন্যে আমার কাছে এসেছিল...।

শুক্তি—সুজিত।

মেজর বোস—হ্যাঁ, সুজিত ছেলেটা আমার চেয়েও বড় ট্যালেন্ট।

শুক্তি—কী বললেন কাকা ?

মেজর বোস—মাছ ধরতে সাংঘাতিক ওস্তাদ। সেদিন আমাকে কেমন সরল করে বুঝিয়ে দিল, টোপের ঝুল আরও দু'হাত বাড়িয়ে দিন ; তা না হলে এরকম স্রোতের জলে বড় মাছ পাবেন না। সত্যি, টোপের ঝুল বাড়িয়ে দিয়ে ছিপ ফেলতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইয়া বড় একটা সাতসেরি চিতল গেঁথে ফেললাম। তাই আমি...।

লোখরা ময়দানের সীমানা পার হয়ে জিপ এখন একটা আমবাগানের ছায়াঘেঁষা কাঁকরে রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। আমবাগানের ভিতরে অনেক তাঁবু।

মেজর বোস হঠাৎ ব্রেক দাবিয়ে জিপ থামালেন।—তাই আমি যখনই মাছ ধরতে যাই, তখন হাবিলদার সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে যাই। আগেই ওকে একটা খবর দিয়ে রাখি। থাপাকে বলে ওর একবেলার ছুটি করিয়েও নিই।...ওই যে এসে পড়েছে।

আমবাগানের তাঁবুর ভিড়ের ভিতর থেকে বের হয়ে, একটা ছিপ আর একটা থলি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে সুজিত।

ছিপ-ধরা হাতটা জিপের বাইরে রেখে পিছনের সিটের উপর উঠে বসে সুজিত। সামনের সীট থেকে শুক্তি মুখ ফিরিয়ে তাকায় আর হেসে ফেলে।—আপনি মাছ ধরতে ওস্তাদ ?

সুজিত হাসে—সাহেব তাই বলেন।

মেজর বোস—পটাশালিতেই যাওয়া যাক, কী বল সুজিত ?

সুজিত—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

কলকল করে জিয়াভরলির জলের স্রোত যেন পটাশালির যত শিলাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার এক বিপুল কল্লোল তুলে ছুটে চলেছে। ভেসে চলেছে রঙিন হাঁসের সারি। কিনারা থেকে লতার ঝোপ ঝুঁকে ঝুঁকে জিয়াভরলির জলের দুরন্ত ফূর্তির বুকটাকে দেখছে। জলের ভিতর থেকে ছোট ছোট উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক হঠাৎ ছটফটিয়ে লাফিয়ে উঠেই আবার ডুবে যায়। রোদ লেগে হীরার কুচির মত ঝিকমিকিয়ে জ্বলে ওঠে উড়ুক্কু ছোট-মাছের গা।

সুজিত যেখানে বসতে বলেছে, ঠিক সেখানেই বসেছেন মেজর বোস। শক্ত করে ছিপ ধরে আর ফাতনার দোলার দিকে তাকিয়ে ধ্যানীর মত বসে থাকেন। চার ঘন্টার মধ্যে তিনটে ফলুই তুললেন, সাইজ আর ওজন মন্দ নয়।

শুক্তি যখন খাবারের বাস্কেট খোলে, তখন তিনটে খাবারের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসতে থাকেন মেজর বোস।—তোর কাকিমার বেশ কমনসেন্স আছে, তাই না, শুক্তি ? তিনটে প্যাকেট করে দিয়েছে, তোর আর খাবার নাড়া-চাড়া করবার কোনও ঝঞ্ঝাটে ভুগতে হল না। ওসব অভ্যেসও তোর বোধ হয় নেই।

শুক্তি হাসে।—তা হলে বাড়ি গিয়ে বাণী কাকিমাকে একটা ধন্যবাদ জানাবেন।

এতক্ষণে প্রণব কাকার পাশে বসে আর জলের শব্দ শুনে শুনে শুক্তির চোখের পাতা তিনবার জড়িয়ে গিয়েছে ; ঘুমের আবেশ সামলাতে গিয়ে কয়েকবার হেলেপড়া মাথাটাকেও সামলাতে হয়েছে। প্রণব কাকা অবশ্য একবার বলেছেন, ঘুমোতে হলে যা, জিপের সিটে বসে ঘুমোগে। কিন্তু

কাকার কথার তো কোনও মানে হয় না ; জিপের কাছে একটা গাছের ছায়াতে যে চুপ করে বসে আছে সুজিত।

খাবারের একটা প্যাকেট হাতে তুলে নিয়ে সেই গাছের ছায়ার দিকে তাকায় শুক্তি। সুজিতও এসে খাবারের প্যাকেট হাতে তুলে নিয়ে চলে যায়।

শুক্তি বলে—আর কত দেরি করবেন, কাকা ?

প্রণব কাকা বলেন—মনে হচ্ছে, চুপ করে বসে থাকতে তোর আর ভাল লাগছে না, তাই না ?

শুক্তি হাসে—হ্যাঁ।

প্রণব কাকা—তবে কী কববি ?

শুক্তি—আমি বরং...

প্রণব কাকা—বেশ তো, একটু ঘুরে ফিরে দেখ।

ঘুরে ফিরে আর কী দেখবারই বা আছে ? দেখতে পায় শুক্তি, একটু দূরে সেগুনের ছায়ার কাছে সাদাটে চেহারার একটা পাথর স্রোতের জল ছুঁয়ে একটা আরামের বেদির মত পড়ে আছে।

এগিয়ে যেয়ে, সাদাটে পাথরের উপর বসে, আর উঁকি ঝুঁকি দিয়ে নীচের স্রোতের জলের ঘূর্ণিটাকে দেখতে থাকে শুক্তি।

—জলে পা ডোবাবেন না কিন্তু। ডাক দেয় সুজিত। শুনতে পায় শুক্তি।

মুখ ফিরিয়ে দেখতেও পায় শুক্তি, এগিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সুজিত। এদিকের এই সাদাটে পাথরের দিকে তাকিয়ে আছে আর হাসছে।

শুক্তি বলে—ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছেন ? এখানে এসে দেখুন।

আরও কাছে এগিয়ে আসে সুজিত। সাদাটে পাথরটার উপরে উঠেই ব্যস্তভাবে বলে—আঃ, এখানে এই ঘূর্ণিটাকে এত দেখছেন কেন ? হঠাৎ মাথা ঘুরে যেতে পারে। বরং ওখানে তাকিয়ে দেখুন।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, স্রোতের এই ঘূর্ণিটার দিকে আর না তাকিয়ে, মাঝনদীর জলের দিকে তাকিয়ে থাকে শুক্তি।

ওখানে মাঝনদীর রোদমাখানো জল, যেন গলা সোনার ঢল। এখানে ছায়া। সেগুনের পাতার আড়ালে বসে কতরকমের সুরে শিস দিচ্ছে পাখি। জলের গুঁড়ো ছিটকে এসে চোখে-মুখে লাগছে। জলের শব্দটাও অদ্ভুত : পাথরের কাছে এসে ছলছল করে, ছায়ার কাছে কলকল করে।

যেন হঠাৎ-বিহ্বল একটা খুশির গুঞ্জন। আপনমনের একলা ভাষার মত গুনগুন করে কথা বলে শুক্তি।—সত্যি চমৎকার। জিয়াভরলি সত্যি জিয়া ভরলি। প্রাণ ভরে গেল।

॥ ১১ ॥

গৌহাটি থেকে যাত্রীতে ভর্তি হয়ে আর অনেক মেঘ পার হয়ে প্লেন এখন কলকাতার কাছাকাছি আকাশে এসে পড়েছে। বোধ হয় আর দশ মিনিটের মধ্যে দমদম পৌঁছে যাবে এই প্লেন, এই ডাকোটা যার পাইলট হলেন সেই চেনা-মুখ ভদ্রলোক।

কিন্তু এ তো বড় অদ্ভুত অস্বস্তি। এই চেনা আকাশের আসা-যাওয়ার পথে কোনওদিনও এরকমের অস্বস্তি বোধ করেনি শুক্তি। অস্বস্তিটা যেন একটা করুণ কৌতুক।

এ অস্বস্তিকে ভয় করবার কিছু নেই, লজ্জা করবারও কোনও মানে হয় না। কিন্তু, কী আশ্চর্য, শুক্তি হেসে ফেললেও অস্বস্তিটা যেন লজ্জিত হয় না, সরেও যায় না ; বরং বেশ করুণ-শান্ত মুখটা নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, আকাশের পশ্চিমের একটা মেঘের দিকে চোখ তুলে তাকায় ; তারপর সিগারেট ধরিয়ে কোন দিকে যেন চলে যায়।

কদমবাড়ি থেকে রওনা হবার দিন সত্যিই মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর একবার তেজপুরের একটা দিন ; তারপর আর নয়। তারপর আর যা-কিছু দেখতে হল আর শুনতে হল, তার সবই তো মন হাসিয়ে দেবার মত এক-একটা বিস্ময়ের আচমকা আলোর ঝিলিক। শুধু এই

অস্বস্তিটা, যেটা গৌহাটি থেকে প্লেন ছাড়তেই শুক্তির মনের শান্তির একটা নতুন উৎপাত হয়ে উঠেছে, সেটা শুক্তিকে হাসিয়ে দিয়েও হঠাৎ এক-একবার একটু গম্ভীর করে দেয়।

কথা ছিল ড্রাইভার কৈলাস গাড়ি নিয়ে শুক্তিকে কদমবাড়ি থেকে তেজপুরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু কৈলাস নয় ; শেষ পর্যন্ত উপেন মিস্তিরি এসে সাহেবকুঠির টুরারের স্টিয়ারিং-এ বসল আর শুক্তিকে তেজপুরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

মঙ্গলদই থেকে চিঠি পেয়েছে কৈলাস, কৈলাসের স্ত্রী মারা গিয়েছে। কিন্তু কাঁদেনি কৈলাস, শুধু গ্যারেজের একটা পুরনো গাড়ির সিটের ছেঁড়া গদির উপর অনেকক্ষণ ধরে স্তব্ধ মড়ার শরীরের মত লুটিয়ে পড়ে রইল। তারপরেই উঠে এল কৈলাস ; সাহেবকুঠির সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আর গগন বসুর মুখের দিকে একবারও না তাকিয়ে, ফরফর করে ওর লাইসেন্সটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিল।—মাপ করবেন হুজুর, আমি আর চাকরি করব না।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করে কৈলাস, কিন্তু হাসতে পারে না। তবু বেশ শান্তস্বরে বলে—আপনার কাছ থেকে পাঁচ টাকা বকসিস নেবার আর দরকার হল না, দিদি।

শুক্তি—তুমি এখন কোথায় যাবে ? কী করবে ?

এইবার হেসে ফেলে কৈলাস।—দেখি, কোথায় যাই। দেখি কী করতে পারি। ভিখারী যোগী কিংবা পরমহন্‌স, কিছু একটা হতে হবে তো।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কৈলাস। তারপর কৈলাসের চোখ দুটো যেন শক্ত হয়ে ইস্পাতের গুলির মত চিকচিক করে উঠল।—শুনেছি সেই পুলিশ মহারাজ মঙ্গলদই থেকে বদলি হয়ে তেজপুরে এসেছেন। তরক্কি হয়েছে তাঁর, আওরভি উঁচা তক্ত পর বসেছেন। আচ্ছা চলি ; নমস্তে হুজুর, নমস্তে দিদি।

বাবাকে একবার বলে দেখলে হত, কৈলাসকে অন্তত দু'মাসের মাইনের মত টাকা বকসিস করে দাও। যাকগে, না বলে ভালই হয়েছে। সে বকসিস নিতে কৈলাস রাজি হত কিনা সন্দেহ। কৈলাসের তো মাথার ঠিক নেই।

না, ইনি চেনা-মুখ নন, এই এয়ার-হোসটেস। ইনি বোধ হয় সাউথ ইন্ডিয়ার মেয়ে। শান্তি কাপুর থাকলে আজও নিশ্চয় সেবারের মত নিজেই কাছে এসে আর গল্প করে চলে যেত। কিন্তু কে জানে, আবার হঠাৎ কী-কথা বলে ফেলত আর মুখ টিপে হাসত। শান্তির চোখের কোণে সব সময় যেন ভয়ানক একটা বুদ্ধির হাসি চিকমিক করে।

মালতীর চোখে কিন্তু আগের মত সেই দুষ্টু খুশির হাসি আর চিকচিক করে না। হাসে বটে মালতী, কিন্তু বড় বেশি শান্ত হাসি। জিজ্ঞাসা করেছিল শুক্তি, হাতির দাঁতের সেই চিরুনিটা আছে তো মালতী ?

মালতী—আছে।

শুক্তি—মাঝে মাঝে মাথায় দাও তো ?

মালতী—এই তো মাথাতেই রয়েছে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলে, আবার হেসেও ফেলে মালতী।

মালতীর দাদা শিশিরবাবু একটা নতুন চাকরি নেবার খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাননি। মালতী বলে—সরকারি এগ্রিকালচারের চাকরি। একটা পরীক্ষাও হয়েছিল, ইন্টারভিউও হয়েছিল। সব চেয়ে বেশি নম্বরও পেল দাদা। জানই তো, দাদা খুব ভাল বোটানি জানে।

শুক্তি—জানি।

মালতী—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না।

শুক্তি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরিটা পেল কে ?

মালতী—পেয়েছে সুবীর শর্মা নামে কে একজন, কোন এক মিনিস্টারের সেক্রেটারির ভাগ্নে, ইন্টারমিডিয়েটও পাস করেনি। আজ আবার...।

শুক্তি—আজ আবার কী হল ?

মালতী—বোধ হয় রেলওয়ে কিংবা এল আই সি-র চাকরি, দরখাস্ত করবার ফরম আনতে সরকারি

অফিসে গিয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যে আর ফরম পাওয়া হল না।

শুক্তি—কেন ?

হেসে ফেলে মালতী।—কেরানিবাবু বললেন, ফরম পেতে হল অন্তত আমার সঙ্গে একটু ভদ্রতা করুন।

শুক্তি—তার মানে ?

মালতী—তার মানে অন্তত পাঁচটা টাকা দিন, পান খাওয়ার জন্যে।

শুক্তিও হেসে ফেলে।—কী রকম লোক রে বাবা !

মালতী—তারপর যা হবার তাই হয়েছে। দাদার যা স্বভাব, কেরানিবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে। অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বলেও কোনও ফল হল না। তিনি বললেন, বাড়ি যান মশাই, মাথা গরম করবেন না।

শুক্তি—শিশিরবাবু এখন বাড়িতে নেই বোধ হয়।

মালতী—না ; বউদিকে নিয়ে ডাক্তার মুখার্জির কাছে গিয়েছে।

শুক্তি—কী হয়েছে প্রমীলার ?

মালতী—হার্টের কষ্ট।

শুক্তি—সেরে যাবে নিশ্চয়।...আচ্ছা চলি...না, আজ আর চা খেতে ইচ্ছে করছে না, মালতী।

মালতীদের বাড়ির বাইরে এসে একবার, আর রবার বাড়িতে ফিরে এসে একবার, খুব জোরে হাঁপ ছেড়েছিল শুক্তি।

সব শুনেও মেসোমশাই মহিমবাবু কিন্তু অদ্ভুত কথা বললেন আর হাসলেন।—হ্যাঁ, এসব একটু দুঃখের কথা বটে ; কিন্তু ঝগড়াঝাটি আর তর্কাতর্কিও কাজের কথা নয়। একটু সহ্য করতে হয়ই। তা ছাড়া, ভাগ্য নামে একটা ব্যাপার আছে ; সেটাও তো অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীর চওড়া বারান্দার মোজেয়িকের উপর আস্তে-আস্তে হাঁটছেন আর কথা বলছেন মহিম দস্তিদার। মাঝে মাঝে আলোর কাছে এসে থামছেন আর মুগার চাদরটাকে ভাল করে গায়ে জড়াচ্ছেন। দেখতে অদ্ভুত লাগে, মেসোমশাই মানুষটা নিজে এত আলোকিত বলেই বোধ হয় বাইরের কোনও অন্ধকার তাঁর চোখে পড়ে না। ভাল কথাই তো বললেন মেসোমশাই, কিন্তু কেমন-যেন হেঁয়ালির মত কথা। ঠিক বুঝতে পারা যায় না।

শুধু কি একা মহিম দস্তিদার ? এই ভারতীর বাইরের ঘরে মহিমবাবুর যেসব বন্ধু আসেন আর গল্প করে চলে যান, যেমন শৈলেশ্বর শইকিয়া আর মহাদেব চৌধুরী, তাঁরাও সবাই ঠিক ওই রকম হেঁয়ালির মত কথা বলেন, আর দুঃখিতভাবে হাসেন। শৈলেশ্বর শইকিয়ার অনেক বাড়ি আছে এই তেজপুরে ; তা ছাড়া গৌহাটিতে আর শিলং-এ। ইনকম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরী তিন ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন ; দুই জামাইকে দুটি বাড়ি উপহার দিয়েছেন। তা ছাড়া যখন-তখন, প্রায় প্রতি মাসে সোনা কেনাও তাঁর একটা অভ্যাস।

কিন্তু মণিমাসি হঠাৎ খুশি হয়ে যেকথা বলে উঠলেন, তার মধ্যে কোনও হেঁয়ালির ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। ভাবতে পারেনি শুক্তি, মণিমাসির মত মানুষ, যিনি সোম লজ থেকে শুক্তির ফিরতে একটু দেরি হলে দশবার দশরকমের কথা জিজ্ঞেস করেন, তিনি নিজেই এরকম একটা কথা বলে ফেলবেন।

সেই সোম লজ। ভিতরের ঘরে অঞ্জলির সঙ্গে গল্প করছেন মণিমাসি। আর, সোনালি রঙের গ্রিল দিয়ে ঘেরা বারান্দার ঠিক সেখানে সেই চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে অনিমেষ।

ব্রহ্মপুত্রের জলের কোনও ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু শুক্তির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনিমেষের গলার স্বরে যেন ঢেউ জেগেছে, যদিও গল্পের কথাগুলি নতুন রকমের কোনও কথা নয়। তেজপুর এয়ারপোর্ট থেকে সামান্য একটু দূরে একটা বিল আছে ; নাম শোলমারা বিল।

—নাম শুনে ঘাবড়ে যাবেন না। লোকে বলে, আকাশে যদি পূর্ণিমা চাঁদ থাকে, আর বিলের জলে তখন যদি একটা সাদা হাঁস উড়ে এসে নামে, তবে তখুনি দেখা যাবে যে, বিলের জলের উপর নীলপদ্ম ফুটে রয়েছে। কাল তো পূর্ণিমা, চলুন না, একবার দেখেই আসি, সত্যি নীলপদ্ম ফোটে

কিনা।

অনিমেষের এই উতলা অনুরোধের একটা জবাব দিতে হবে। কিন্তু কী জবাব দিতে পারে শুক্তি? নীরব শুক্তির নিঃশ্বাসের বাতাসের সঙ্গে যেন হাঁসফাঁস করছে শুক্তির প্রাণের সব সাহস।

কিন্তু কী আশ্চর্য, মণিমাসি নিজেই হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে কত সহজে বলে দিলেন—বেশ তো, যাও না দু'জনে, একবার জায়গাটা বেড়িয়ে দেখে এসো।

অনিমেষ হাসে।—উনি যদি আপত্তি না করেন তবেই তো যাওয়া সম্ভব।

মণিমাসি—না না, আপত্তি করবার কী আছে? আপত্তি করবে কেন শুক্তি?

শুক্তিও এইবার হাসতে চেষ্টা করে।—আমি আপত্তি করছি না। কিন্তু...।

মণিমাসি—কিসের কিন্তু?

শুক্তি—কলকাতা থেকে ফিরে আসি, তারপর না হয় যে কোনও দিন...

মণিমাসি—বেশ তো; তাই না হয় হবে, আপত্তি না থাকলেই হল।

সেদিনের পর আর যে দুটো দিন তেজপুরে থাকতে হয়েছিল, তার মধ্যে আর একবারও সোম লজে যাওয়া হয়নি শুক্তির, যদিও অনেকবার মনে পড়েছে, সন্ধ্যাবেলার সোম লজের বারান্দায় একটা চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন অনিমেষবাবু। আপত্তি নেই, শুধু এই একটা কথার মধ্যে কে-জানে-কিসের সান্ত্বনা পেয়ে গেলেন অনিমেষবাবু, যে জন্যে শুক্তির মুখের দিকেও রকম অদ্ভুত শান্ত একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইলেন।

নতুন পাড়ার মীরা কাকিমাও যে অদ্ভুত একটা গল্প বলে হাসিয়ে দিলেন। কল্পনা করতে পারেনি শুক্তি, মীরা কাকিমার কাছে গেলে হঠাৎ এরকম একটা গল্প শুনতে হবে। গল্প বটে, কিন্তু সেটা মীরা কাকিমার নিজেরই একটা চিন্তার কীর্তি।

শীতল বিশ্বাস গরিব মানুষ, মীরাও গরিবের ঘরের মেয়ে। কিন্তু মীরার মামার বাড়ি খুবই বড় ধরনের বড়লোকের বাড়ি। সেকথা তো জানাই ছিল শুক্তির; মণিমাসিও শুক্তির কাছে শীতলের বউ মীরার মামার অগাধ সম্পত্তির কাহিনী অনেকবার বলেছেন। আমেরিকা থেকে জাহাজে বোঝাই হয়ে মীরার মামার আমদানির মেশিন আসে। কারবারের হেড অফিস বোম্বাই, সে অফিস দেখাশোনা করে মীমার মামার বড় ছেলে রাজীব। মীরার মামা-মামী থাকেন নাসিকে, গোদাবরীর কাছে শখের দুর্গের মত মস্ত বড় এক বাড়ি। সে বাড়ির বাগানের ভিতরে টেনিস খেলবার তিনটে কোর্ট আছে।

দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত এই রাজীবের গল্প বলে বলে শুক্তির মনের যত সন্দেহ বিস্ময় আর কৌতুকের প্রাণ অক্লান্ত করে দিলেন মীরা। রাজীব সত্যিই রাজীব, দেখতে খুব ভাল। স্বভাবে বা কথায় এক ফোঁটাও অহংকার নেই। রাজীব একদিন ওর অফিসের কেরানি সদাশিব নাইডুর বুড়িমাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল।

হেসে ফেলে শুক্তি।—আমাকে হঠাৎ একটা ট্রেজার আইল্যান্ডের গল্প শুনিয়ে তোমার লাভ কী মীরা কাকিমা?

মীরা—আমার লাভ এই যে, তোমার লাভ হতে পারে।

শুক্তি—বাস, আর নয়, এইবার এখানে তোমার গল্প থামিয়ে অন্য কথা বলো।

মীরা—আমি কিন্তু নাসিকে মামীর কাছে চিঠি লিখে দিয়েছি!

শুক্তি—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

মীরা—রাগ করলে নাকি?

শুক্তি হেসে ফেলে।—এত মজার একটা গল্প শুনে কি কেউ রাগ করে?

মীরা—যাক, তা হলেই হল।

হঠাৎ শুক্তির চোখ দুটো একটু চমকে ওঠে, আর বড়-বড় হয়ে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকায়।—দেয়ালের গায়ে ওটা কী বস্তু ঝুলিয়ে রেখেছ, মীরা কাকিমা?

একটা সামান্য বস্তু। ছোট-ছোট রঙিন পাথর-নুড়ির একটা মালা। ছোট মেয়ের খেলবার জিনিস নয়, মীরার মত বয়সের বাঙালি নারীর গলায় পরবার জিনিসও নয়।

মুখে হাত রেখে হাসি চাপতে চেষ্টা করেন মীরা।—বলতে পারি, কিন্তু বলা উচিত নয়; মণিদি

বলে রেখেছেন, শুক্তির কাছে কখনও এ-গল্প বলবে না।

শুক্তি—তা হলে বলো না।

মীরা—তা হলে বলেই ফেলি। ওটা হল দফলা-মেয়ে সেই রেনকির রাগের মালা।

শুক্তি—তার মানে ?

মীরা—তার মানে অনুরাগের মালা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, রেনকি একদিন এই মালাটাকে ওর ঝোলার ভেতর থেকে বের করে রতন ঠাকুরপোর হাতের কাছে...

শুক্তি—থাক, এবার তুমি চুপ করো।

কিন্তু মীরা কি চুপ করে থাকবার মত মানুষ ? তাড়াতাড়ি করে একটা রেকাবি ভর্তি করে একগাদা জিলিপি নিয়ে এসে শুক্তির হাতের কাছে এগিয়ে দিলেন।—খাও আর শোনো। এমন কিছু বাজে কথা নয় যে শুনতে তোমার খারাপ লাগবে।

রেনকি সেদিন রাগ করে চলে যাবার পরেই দেখতে পেয়েছিলেন মীরা, ঘরের কোনে একটা বাক্সের পিছনে ওই মালাটা পড়ে আছে। রেনকি নয় ; রতনই মালাটাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল ! মীরার কাছে একদিন একেবারে স্পষ্ট করে বলে ফেলেছিল রেনকি, আমি তোমাদের রতনের কাছে বউ হয়ে থাকব।

মীরা জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু রতন কী বলে ?

রেনকি—রতন বলে, তা হয় না।

মীরা—তবে কী করে হবে ?

রেনকি—তবে আমার মুখে রঙ দিয়েছিল কেন রতন ?

মীরা—দিয়েছিল নাকি ?

রেনকি—নিশ্চয়, রতনকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

মীরা—তোমার মুখে কেন রঙ দিল রতন ?

রেনকি—আমি বলেছিলাম।

মীরা—কেন বলেছিলে ?

রেনকি—রতন বলেছিল, যাকে ভাল লাগে তার মুখে রঙ মাখিয়ে দিয়ে পরব করে ওর দেশের লোক।

মীরা—কিন্তু তোমাদের বিয়ে কী করে হবে রেনকি ? সরকারি মানা আছে যে ?

আর কোনও কথা বলেনি রেনকি। শুধু ঘরের আয়নাটার দিকে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

মীরা বলে—সত্যি শুক্তি, রেনকি যেন আয়নাতে ওর মাথার ওই নতুন খোঁপা, গায়ের জরি-হাতা ব্লাউজ, আর রঙিন তাঁতের শাড়িপরা চেহারাটারই ওপর রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখতে আমারও বেশ একটু কষ্ট হয়েছিল শুক্তি।

শুক্তি—রতন কাকা নেফা থেকে আর এখানে আসেননি ?

মীরা—না।

শুক্তি—আসবেন নিশ্চয়। ছুটি পেলেই আসবেন।

মীরা—তাই যেন হয়।

বেচারা দফলা-মেয়ে, বোকা রেনকি ! বেচারা রতন কাকা, নেফা মেডিক্যালের পিয়ন। কিন্তু সরকারি আইনের নিষেধটাকে বেচারা বলতে একটুও ইচ্ছে করে না। মীরা কাকিমার কাছ থেকে এ গল্পটা না শুনলেই ভাল ছিল। হাতে ধরা গল্পের বইটার পাতার উপর শুক্তির চোখ পড়ে থাকলেও হঠাৎ এক-একবার চোখের সামনে যেন রেনকির পাথুরে মালাটা দুলে ওঠে। তাই বইটাকে এখন বন্ধ করে রেখে দিতে ইচ্ছে করে।

গৌহাটি এয়ারপোর্টের মাথার উপর এসে আর কাত হয়ে প্লেন নামতে শুরু করেছে। খোলা বইটা বন্ধ করে হাতব্যাগের ভিতরে ভরে দেয় শুক্তি।

তারপর আর নেফার দফলা-মেয়ে রেনকির কথা নয়, কদমবাড়ির গগন বসুর মেয়ে শুক্তি বসুরই

একটা অদ্ভুত হঠাৎ-বিস্ময়ের অস্বস্তিকে এতক্ষণ ধরে হাসিমুখে সহ্য করতে চেষ্টা করেছে শুক্তি। মনে হয়, এই প্লেন থেকে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত এই অস্বস্তি দূর হবে না। দমদম পৌঁছতে কি দশ মিনিটের আরও বেশি সময় লাগবে ?

গৌহাটিতে নেমে বিরামের পঁচিশ মিনিট সময় অনায়াসে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জের কোচের উপর আর গল্পের বই পড়ে কাটিয়ে দিতে পারা যাবে, এই তো আশা করেছিল শুক্তি। কিন্তু সে আশা যেন একটা আচমকা আষাঢ়ে গল্পের সামনে পড়ে মিথ্যে হয়ে গেল।

পাইলট ভদ্রলোক হঠাৎ কোথা থেকে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন।—আমি আপনাকে চিনি। কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন না ; পরিচয় দিলেও চিনতে পারবেন বলে মনে হয় না।

চমকে ওঠে শুক্তি।—আমি তো সত্যি আপনাকে চিনি না। শুধু আগে দু'একবার দেখেছি। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে ?

—এখানে অনেকেই তো আপনাকে চেনে। জিজ্ঞেস করলে ক্যান্টিনের ম্যানেজারও বলে দিতে পারবেন যে, আপনি প্ল্যান্টার বোস সাহেবের মেয়ে। কাজেই আপনার পরিচয় জেনে নিতে আমার বেশি খোঁজ করতে হয়নি।

শুক্তি—প্লেন ছাড়তে আর কত দেরি ?

—দেরি আছে। অন্তত আরও বিশ মিনিট না পার হলে প্লেন ছাড়বে না। আপনার বাণী কাকিমা কিন্তু আমাকে চেনেন। আমাদের বাড়ি শান্তিপুর। আমার নাম পরিতোষ মৌলিক।

শুক্তি—আমি শান্তিপুর কখনও দেখিনি।

পরিতোষ—দেখলে আপনার খুব খারাপ লাগবে না মনে হয়। আপনার বাণী কাকিমার বাবা হলেন আমাদের পাশের বাড়ির প্রতাপবাবু ; আত্মীয় না হয়েও তিনি আমাদের প্রায় আপন-জন। ছেলেবেলায় প্রতাপকাকাকে খুব ভয় করতাম ; উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে যখন বুঝতাম যে প্রতাপকাকা বাড়ি নেই, তখন ডাণ্ডাগুলি হাতে নিয়ে খেলতে বের হতাম।

শুধু হাতঘড়ির উপর দু'চোখের দৃষ্টিটাকে বসিয়ে রেখে, আর নিজেকে একেবারে নীরব করে নিয়ে বসে থাকে শুক্তি।

পরিতোষ—আপনি বোধ হয় একটু আশ্চর্য হয়েছেন, আর বেশ বিরক্ত বোধ করছেন। সবই বুঝেছি ; তবু সাহস করে আপনাকে আর একটু আশ্চর্য করে দিতে চাইছি।

শুক্তি—কী বললেন ?

পকেট থেকে একটা ফটো বের করে পরিতোষ।—এটা নিশ্চয় আপনার ফটো ?

চমকে ওঠে শুক্তি—এ কী !

পরিতোষ হাসে।—চুরি করিনি।

শুক্তি—একথা কেন বলছেন ? আমি কি তাই মনে করেছি ?

পরিতোষ—তবে কী মনে করলেন ?

শুক্তি—ভাবছি, আপনার কাছে আমার ফটো কেমন করে এল ?

পরিতোষ—মনে নেই কি আপনার ? অনেক দিন আগে একবার আপনার ব্যাগ থেকে...।

শুক্তি—হ্যাঁ, কয়েকটা ফটো পড়ে গিয়েছিল আর আপনি কুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পরিতোষ—তবু বলছি, সন্দেহ করবেন না। তখুনি চুরি করে আপনার এই ফটোটাকে লুকিয়ে রাখিনি। আপনি প্লেন থেকে নেমে যাবার অনেক পরে, হঠাৎ আমার চোখে পড়েছিল, এই ফটোটা সিটের নীচে পড়ে আছে। হ্যাঁ, বলতে পারেন, আপনার ঠিকানায় ফটোটা ফেরত পাঠিয়ে না দেওয়া অন্যায় হয়েছে।

কোনও কথা না বলে আবার চোখ নামিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় শুক্তি। পরিতোষ বলে—এই নিন আপনার সেই ফটো ; আর, কিছু মনে করবেন না যেন।

ফটোটাকে শুক্তির হাতব্যাগের উপর রেখে দিয়ে সরে যায় পরিতোষ। এইবার ব্যস্তভাবে নিজেরই হাতঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর এগিয়ে যেয়ে লাউঞ্জের বাইরের বারান্দায় লতানে গোলাপের কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের একটা মেঘের দিকে তাকায়। তারপর সিগারেট ধরায়। তারপর অন্যদিকে

চলে যায়।

বুঝতে পারে না শুক্তি, ফটোটাকে হাতব্যাগের ভিতরে ভরতে গিয়ে হাতটা কেঁপে উঠল কেন? পরিতোষবাবুকে কি একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল? কিংবা, বলে দেওয়াই উচিত ছিল, ও ফটো আর ফেরত দেবারই বা কী দরকার? দেড় বছর ধরে যে ফটো একজন অচেনা মানুষের কাছে ছিল, সে ফটো শুক্তি বসুর নিজের ফটো হলেও হাত দিয়ে স্পর্শ করতে সত্যিই যে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে হয়।

ভদ্রলোককে কিন্তু মুখর স্বভাবের মানুষ বলে মনে হল না। তবে চক্ষুলজ্জা নিশ্চয় একটু কম। অজানা অচেনা মেয়ের ফটো দেড় বছর ধরে নিজের কাছে পুষে রেখেছেন, এই কথাটাকেই তো খুব ভদ্রভাবে বলে চলে গেলেন। কিছু মনে করবেন না, একথা বলবারও কোনও মানে হয় না।

বাম্প করেনি প্লেন, কিন্তু শুক্তি বসুর এই অস্বস্তির মন যেন হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে ওঠে। বুকের ভিতর একটা ভীরু নিঃশ্বাসের বাতাস ভয়ানক একটা সন্দেহ হয়ে দুলতে থাকে। লোখরা থেকে বাণী কাকিমার শান্তিপুরে লেখা চিঠিটার মানে কি এই পাইলট ভদ্রলোক, এই পরিতোষ মৌলিক?

আর কিছু ভাবতে হচ্ছে করে না, ভালও লাগে না। এই অস্বস্তি এখানেই মরে যাক। চেনা আকাশের পথে এ কী বিশ্রী দুর্ঘটনার মত একটা অচেনা মেঘের উপদ্রব!

যাক, এইবার নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। নামতে শুরু করেছে প্লেন।

প্লেন থেকে নেমে দমদমের মাটিতে পা দিয়েই একেবারে ফুল্ল হয়ে হেসে ওঠে শুক্তির এতক্ষণের অস্বস্তির মন। ওই তো, দাঁড়িয়ে আছে ওরা ; ড্রাইভার কেষ্টবাবু, কৃষ্ণা আর সুকু।

॥ ১২ ॥

কলকাতা থেকে যাবার সময় যে মেয়ের ব্যস্ততাকে পালিয়ে যাবার ছটফটানি বলে মনে হয়, সে মেয়ে বোধ হয় কলকাতায় ফিরে আসবার জন্যেও ছটফট করে উঠেছিল। তা না হলে ঘরে ঢুকে এরই মধ্যে শেলফের সব বই পরিপাটি করে সাজিয়ে ফেলবে কেন শুক্তি? কত ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে শুক্তি। আলনার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে।

ঘরে ঢুকেই বড় পিসি সুমিত্রা যেন একটা হাসি চাপতে চেষ্টা করে কথা বলেন—কী দেখছ তুমি?

আলনাতে একটা কল্কা পাড়ের টাঙাইল। শাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে শুক্তি বলে—শাড়িটাকে এরকম এলোমেলো করে ভাঁজ করলে কে?

সুমিত্রা হাসেন।—কৃষ্ণা।

শুক্তি—কৃষ্ণা কেন?

ঘরে ঢোকে কৃষ্ণা।—শাড়িটাকে কোথায় রেখে গিয়েছিলে, মনে পড়ে?

হেসে ফেলে শুক্তি।—মনে পড়েছে। তাড়াতাড়িতে ভুল করে বিছানার উপর ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলাম।

কৃষ্ণা—সেই জন্যে আমি...।

সুমিত্রা হাসেন।—সেই জন্যে কৃষ্ণা রাগ করে শাড়িটাকে আলনাতে তুলে রেখেছে, লন্ড্রিতে দিয়ে দেয়নি।

শুক্তি—কেন?

কৃষ্ণা—প্রমাণ করে দিলাম কিনা, তুমি সব ভুলে যাও।

কৃষ্ণার গাল টিপে ধরে শুক্তি।—কী ভুলে যাই?

কৃষ্ণা—তুমি কলকাতার বাইরে গেলে একটা চিঠি দিতেও ভুলে যাও কেন।

শুক্তি—চিঠি দিতে ভুলেই যাই ঠিকই, কিন্তু তোমাকে তো ভুলে যাই না।

কৃষ্ণা—শ্যামলদাও বলছিলেন, তোমার শুক্তিদি কি কলকাতাকে ভুলে গেল? কলেজের পুজোর ছুটি তো তিন দিন হল শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু আসে না কেন?

সুমিত্রা তবু দাঁড়িয়ে আছেন। সরে যাবেন বলেও মনে হয় না। কৃষ্ণাকে এখন কী কথা বলে ওর মুখ বন্ধ করা যায়, তাও ভেবে পায় না শুক্তি।

কৃষ্ণার এটা অভিমানের মুখরতা বটে · কিন্তু শুক্তির চোখ-মুখের অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন একটা কঠোর জিজ্ঞাসার ডাক শুনতে পেয়েছে শুক্তি।

কৃষ্ণা বলে—আমি সত্যি খুব রাগ করেছি, শুক্তিদি।

হাসতে চেষ্টা করে শুক্তি।—রাগ করো না কৃষ্ণা। দিদির উপর কখখনও রাগ করতে নেই।

কৃষ্ণা—আমাদের ভুলে যাও কেন ?

শুক্তি—ভুলিনি কৃষ্ণা ; আমি কাউকেও ভুলিনি।

সুমিত্রা হাসেন।—চুপ কর কৃষ্ণা, শুক্তিকে আর বেশি বিরক্ত করিস না।

চলে গেলেন সুমিত্রা।

বাড়ি থেকে কলেজ, আর কলেজ থেকে বাড়ি ; এই চেনা পথের জীবনে নতুন করে দেখে আশ্চর্য হবার মত কোনও ঘটনা নেই, কোনও দৃশ্যও নেই। হাজরার মোড়ে সেই খোঁড়া ভিখারীটা এখনও হরেকৃষ্ণ বলে চেঁচিয়ে ওঠে আর হাত পেতে ভিক্ষে চায়। চেতলার পুল পার হবার সময় দেখা যায়, সেই ভাঙা নৌকাটা নালার কাদার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

শুক্তির সুন্দর মুখটা কি আরও সুন্দর হয়ে গিয়েছে ? তা না হলে শুক্তির বড় পিসি কেন বার বার শুক্তির মুখের দিকে ওরকম করে তাকিয়ে থাকেন ? যখন তখন শুক্তির কাছে এসে দাঁড়াবেন, শুক্তির পিঠে হাত বোলাবেন। সুমিত্রার এ এক নতুন অভ্যেস হয়ে উঠেছে! দিন দিন আদর বাড়িয়ে চলেছেন সুমিত্রা। শুক্তি তাই না হেসে আর না বলে থাকতে পারে না।—তুমি এসব কী আরম্ভ করলে বড় পিসি ? দেখতে পেলে কৃষ্ণা যে হিংসেতে ছটফট করবে।

সুমিত্রাও হাসেন।—ছাই করবে কৃষ্ণা। ও মেয়েকে আমি চিনে নিয়েছি। আমাকে ওর একটু কাছ ঘেঁষে বসতেও দেয় না। ঠেলে সরিয়ে দেয়। ওর নাকি ভয়ানক গরম লাগে।

শুক্তি—আজ বুঝছে না, কিন্তু পরে একদিন বুঝবে, কী ভুল করছে বোকাটা।

আজকাল শুক্তির মুখের এক-একটা কথা শুনে সুমিত্রার মায়াকাতর মন যে কত গভীর তৃপ্তিতে ভরে যায়, সেটা তিনি বুঝতে পারেন বটে ; কিন্তু চোখে তো দেখতে পান না যে, তাঁর মুখের হাসিটাও কত নিবিড় হয়ে থমথম করে। সে ছবি দেখতে পায় শুক্তি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না, বড়পিসির মন এত বেশি খুশি কেন ?

শ্যামল আসে মাঝে মাঝে, যদিও শ্যামলের কাজে ব্যস্ততার অন্ত নেই। পশারের নাম-ডাক যেমন বেড়ে চলেছে, পেশার হাঁকডাকও তেমনি বাড়ছে! তবু তো, এই অফুরান দায়িত্বের ছুটোছুটির মধ্যেও একটু সময় করে নিয়ে এক-একবার, মাসে অন্তত দুটো-তিনটে দিন আলিপুরের এই বাড়ির চা খেয়ে যেতে ভুলে যায় না শ্যামল।

শ্যামলকে দেখে শুক্তিও আর সারামুখের চেহারা লালচে করে, চোখ নামিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে না। বসুন আপনি, কৃষ্ণাকে ডেকে দিচ্ছি ; বেশ তো স্পষ্ট করে ভদ্রতার ভাষণ শুনিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারে শুক্তি। কথা বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলে ভীরু নিঃশ্বাসের বাতাস গিলতে হয় না। সবই দেখতে পান সুমিত্রা।

কত সহজে সেদিন ভবানীপুরে যেতে রাজি হয়ে গেল শুক্তি, যেদিন সুমিত্রা বললেন—সুধাদি আমাদের সবাইকে ডেকেছেন, তুমিও যাবে নাকি শুক্তি ?

কেন কিসের জন্য ভবানীপুরের বাড়ি থেকে এই আহ্বান এসেছে, তার কিছুই জানে না শুক্তি। সুমিত্রা অবশ্য বলতেই যাচ্ছিলেন যে, সুধাদি কীর্তনগান শুনতে খুব ভালবাসেন, তাই ব্যবস্থা করেছেন, সুধাদিরা চেনা এক সুগায়িকা মহিলা আজ তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে কীর্তন গাইবেন।

কিন্তু শুক্তির যাবার ইচ্ছা যেন তৈরি হয়েই ছিল। কিছুই জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইল না শুক্তি, কেন আর কিসের জন্য ভবানীপুরের বাড়ি থেকে আজ হঠাৎ একটা আমন্ত্রণ উপস্থিত হল। সুমিত্রা শুধু একটু প্রশ্ন করে কথাটাকে বলেছেন, আর, শুক্তিও সেই মুহূর্তে রাজি হয়ে জবাব দিয়ে দিল—যাব।

ভবানীপুরের বাড়ির বড়ঘরে সেই সন্ধ্যাবেলায় অনেক মানুষের আসরটিকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিয়ে সুগায়িকা মহিলা যখন চলে গেলেন, তখন ঘরভরা এলোমেলো কলরবের মধ্যেই শুনতে পেলেন আর দেখতে পেলেন সুমিত্রা, দরজার কাছে শ্যামলের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, কত খুশি হয়ে আর হেসে-হেসে কথা বলছে শুক্তি।

শ্যামল হাসছে আর বলছে—আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না।

শুক্তি—বিশ্বাস করুন, আমি আপত্তি করিনি।

শ্যামল—আপত্তি না কর ; কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় তো আসনি। কাকিমা বলেছেন, তাই এসেছ।

শুক্তি—এর মানে কি অনিচ্ছার আসা ?

শ্যামল—হ্যাঁ।

শুক্তি—তা হলে আমি আর কী করতে পারি ?

শ্যামল—একদিন কি নিজেই ইচ্ছে করে আসতে পার না ?

শুক্তি—কী জবাব দেব, বুঝতে পারছি না।

শ্যামল—আসতে ইচ্ছে করে ?

শুক্তি—হ্যাঁ।

রাত ফুরোতে দেরি আছে মনে করে মানুষের চোখ আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে যদি দেখতে পায় যে, লাল সূর্য হাসছে, তবে সে মানুষের চোখের বিস্ময়ও আচমকা রঙিন হয়ে যায়। সুমিত্রার চোখের ও মনের অবস্থাও প্রায় তাই। মনে করেছিলেন, নিজের মুখে শ্যামলের কাছে যা বলবার তা বলতে বেশ দেরি করে ফেলবে শুক্তি, বড় বেশি লাজুক ভীরু আর মনচাপা স্বভাবের এই মেয়ে। কিন্তু কই, দেরি তো করল না শুক্তি। মিথ্যে লজ্জা করল না, ভয়ও পেল না, বেশ মন খুলে ইচ্ছের কথাটা বলে দিল।

দিল্লীতে করুণার কাছে চিঠি লিখলেন সুমিত্রা। সাতদিনের মধ্যে করুণার জবাবের চিঠি পৌঁছে গেল। —আপনি এর চেয়ে আর বেশি কিছু জানতে চাইছেনই বা কেন ? এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর কী-ই বা বলতে পারে শুক্তি ? আপনি এখন অনায়াসে কদমবাড়িতে চিঠি দিতে পারেন যে, শুক্তি নিজেই বলেছে।

জয়ন্ত সরকার সব কথা শুনে খুশি হয়েও শেষে আক্ষেপ করেন। — আমার কিন্তু একটা দুঃখ রয়ে গেল।

সুমিত্রা—কিসের দুঃখ ?

জয়ন্ত সরকার—মেয়েটাকে বছরের পর বছর ধরে আমরা কাছে রাখলাম, এইবার বিয়েও দেব, সবই ভাল। কিন্তু মেয়েটার লেখা-পড়া আর এগুল না।

চুপ করে কী-যেন ভাবতে থাকেন সুমিত্রা। তাঁরও মনে বোধ হয় ছোট্ট একটা ব্যথার কাঁটা বিঁধছে।

জয়ন্ত সরকার মৃদুভাবে হাসেন। —আমি তো যখন তখন তেজপুরের চিঠি পাব বলে ভয় পাচ্ছি। শুক্তির মাসি নিশ্চয় বলবেন, আর বললেও অন্যায় বলা হবে না যে, শুক্তিকে আমরা ভাল করে লেখা-পড়া না শিখিয়ে শুধু তাড়াহুড়ো করে একটা বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

সুমিত্রা—আমি বলি, শুক্তি এই বছরেই ফাইনালটা দিয়ে দিক, তারপর কিরণ বউদিকে চিঠি দেব।

হ্যাঁ নেফা ; এখন শুক্তির মনের কাছে অনেক দূরের সে নেফা যেন আবছায়াময় এক প্রহেলিকার দেশ। ক্ষীণ স্মৃতির একটা ছবি। সেখানে বাচ্চা হাতির খেলা দেখছেন দুলাল মামা। বনের গাছের ছায়ায় শকুন্তলার মত বসে আছে আকা মেয়ে। ক্ষেতের মাটির ঢেলা ভাঙে দফলা-মেয়ে রেনকি।

শুক্তির পরীক্ষা শুরু হল যেদিন, সেদিন সুমিত্রাকে আর না বলে থাকতে পারলেন না জয়ন্ত সরকার। —তুমি এত নার্ভাস হয়ে গেলে কেন ?

সারাটা রাত ঘুমোতে না পেরে জেগে জেগে উসখুস করছেন সুমিত্রা। সকাল হতেই আবার চিন্তা শুরু করেছেন, আজ এখন কী খাবে শুক্তি ? চা না খেয়ে এক কাপ কোকো খেলে কি ভাল হবে ?

জয়ন্ত সরকার হাসেন। —চা ভাল, কোকোও ভাল। মোট কথা পাস করবে শুক্তি, তুমি মিথ্যে চিন্তা করবে না।

পরীক্ষার হলঘরে শুক্তি ঢুকে পড়লেও দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সুমিত্রা। বাড়ি ফিরে গিয়েও দেড় ঘণ্টার মধ্যে আবার ফিরে আসেন। সন্দেহ আছে সুমিত্রার, তিনি নিজে গিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে না থাকলে, শুক্তি ওই খাবারের ডিবের একটা সন্দেশও মুখে দেবে না ; ড্রাইভার কেষ্ট জোরগলায় যতই বলুক না কেন, মা অনেক করে বলে দিয়েছেন, খাবার যেন ফেলা না যায়।

শুক্তির পরীক্ষার শেষ দিনটি শেষ হল যেদিন, সেদিন সন্ধ্যাবেলা কোর্ট থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন জয়ন্ত সরকার সুমিত্রা তখনও বিছানার উপর শুয়ে পড়ে আছেন আর হাসছেন। জয়ন্ত সরকার হাসেন। —কী ব্যাপার ? ব্রত সাঙ্গ হয়েছে, তাই বুঝি খুব নিশ্চিন্ত।

উঠে বসেন সুমিত্রা। কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলার স্বরেই নিশ্চিন্ত মনের আনন্দটা ধরা পড়ে যায়। —সত্যি তাই। আমার এখন ভাবনা করবার কিছু নেই।

এখন শুধু সামান্য দুটি কাজ বাকি ; ইচ্ছে করলে সে দুটি কাজ কাল-পরশু যেকোনও দিনে সেরে ফেলতে পারেন সুমিত্রা। শুক্তিকে তেজপুরের প্লেনে তুলে দেওয়া, আর কদমবাড়িতে কিরণ বউদির কাছে সব-কথা জানিয়ে চিঠিটা লিখে ফেলা।

জয়ন্ত সরকার বলেন—আর দেরি করো না ; শুক্তিকে দু-চার দিনের মধ্যেই তেজপুর রওনা করিয়ে দাও। ওর বাবার মনের অবস্থাটা তো কল্পনা করতে পার।

ঠিক পরের দিন, বৈশাখী সন্ধ্যায় আলিপুরের বাড়ির বাগানে একটা ঝড়ের বাতাস যখন ছুটোপুটি করতে শুরু করেছে, তখন কোর্ট থেকে ফিরে আর ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন জয়ন্ত সরকার, বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে আছেন সুমিত্রা, আর চোখ দুটোও ছলছল করছে।

সুমিত্রার একটা হাত তখনও একটা চিঠিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। জয়ন্ত সরকারের সন্দেহ করতে দেরি হয় না ওই চিঠিটাই একটা নিদারুণ আঘাত, যেজন্য সুমিত্রার মুখটা আহত মানুষের মুখের মত করুণ হয়ে গিয়েছে।

চিঠিটাকে পড়লেন জয়ন্ত সরকার। কদমবাড়ির থেকে শুক্তির মা'র লেখা একটা চিঠি। তারপর আর বুঝতে কিছু অসুবিধে থাকে না ; হ্যাঁ, সুমিত্রার নিশ্চিন্ত মনের স্বপ্নটাই চুরমার হয়ে সুমিত্রাকে কাঁদিয়েছে।

তেজপুর থেকে মণিমালার একটা চিঠি পেয়েছেন কিরণলেখা, তাই কলকাতাতে সুমিত্রাকে জানিয়েছেন : ছেলেটি সবদিকেই ভাল, শুক্তির সঙ্গে চেনা-শোনা আর মেলামেশাও হয়েছে। মণিমালা লিখেছে, শুক্তির আপত্তি নেই। তাই ভাবছি, তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে যাওয়া ভাল। শুক্তিকে একটু তাড়াতাড়ি রওনা করিয়ে দাও। পরের চিঠিতে আরও কথা জানতে পারবে !

পরের দিন যে চিঠি এল, সেটা তেজপুর থেকে লেখা শুক্তির মণিমাসির চিঠি।

—আপনারা শুনে সুখী হবেন যে...ইত্যাদি।

তেজপুরের সোম লজের ছেলে অনিমেষের রূপগুণের অনেক প্রশংসা করে আরও এমন কয়েকটি কথা লিখেছেন তেজপুরের মণিমালা দস্তিদার, যেকথা একেবারে সন্দেহবিহীন একটা ভরাট বিশ্বাসের যত খুশি আবেগের কথা। তাই চিঠির ভাষাও বেশ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কোথায় কোন বিলের জলে নীলপদ্ম ফোটে, শুক্তি আর অনিমেষ দুজনে মিলে সে গল্পও করে। —কাজেই, ওদের দুজনের মনে যখন কোনও অনিচ্ছা নেই, তখন আমি তো মনে করি যে, এ বিয়ে হলে ভালই হবে।

ভাল হলেই ভাল। সুমিত্রার দুটো চোখ শুকনো হয়ে খটখট করে। মন শক্ত করতে চেষ্টা করেন সুমিত্রা, যেন তাঁর কষ্টের কোনও আক্ষেপ শব্দ করে বেজে উঠতে না পারে ; যেন শুক্তি শুনতে না পায়।

এঘরে বসেই শোনা যায়, বারান্দার ফুলের টবের কাছে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করছে আর হাসছে শুক্তি। হাসুক। শুক্তিকে যেন এভাবে আরও দুটো দিন হাসিয়ে রেখে ভালয়-ভালয় তেজপুরের প্লেনে তুলে দিয়ে আসতে পারেন, এ ছাড়া এখন সুমিত্রার আর কিছু চিন্তা করবার বা আশা করবার নেই

তবে তাঁর মনের ভিতরে একটা করুণ বিস্ময়ের প্রশ্ন যেন কথা বলতে চায় ; ওখানে দাঁড়িয়ে হেসে-হেসে কথা বলছে যে শুক্তি, সে কি সেই শুক্তি, যাকে এতদিন তিনি শুক্তি বলে চিনতেন ? যে মেয়ে এখানে শ্যামলের কাছে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছে, সে মেয়ে ওখানে অনিমেষের সঙ্গে নীলপদ্মের গল্প করেছে ?

তবে কি শুক্তিকে ঘেন্না করতে চাইছে শুক্তির বড় পিসির মন ? ছি ছি, অসম্ভব। শুক্তিকে ঘেন্না করতে হলে যে সুমিত্রার বুকের ভিতরের সব মায়ার নিঃশ্বাস নিজের লজ্জার জ্বালায় পুড়ে মরে যাবে।

উচিত-অনুচিত বিচার করে আর লাভ কী ? না হয় ভুল করেই একটা ফুল কুড়িয়েছে শুক্তি ; কিন্তু সেজন্যে কি শুক্তির হাতটাকে ঘেন্না করে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে ? শত হলেও ওটা যে শুক্তিরই হাত।

ভুল বলেই বা মনে করতে হবে কেন ? হয়ত ওটাই আসল সত্য, এটা তেমন কিছু নয়। না, সুমিত্রার আর কিছু বলা সাজে না। শুক্তির ভালবাসার ভাগ্য নিজেই নিজেকে চিনে নিক।

কিন্তু শুক্তি কি বড় পিসির এই খটখটে শুকনো চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারে ? পারে না বোধ হয় ; তা না হলে বড় পিসির হাত ধরে টানাটানি করে আর আদুরে অভিমানেব স্বরে এমন কথা বলতে পারত না, আমি যে আর দুদিন পরে তেজপুরে চলে যাব, সেটা যেন তুমি ভুলেই গিয়েছ বড় পিসি ?

সুমিত্রা হাসেন। —একথা তোমার মনে হল কেন ?

শুক্তি—আমার গান শুনতে পেয়েও তুমি আমার ঘরে ঢুকলে না, তাড়াতাড়ি ওদিকে কোথায় যেন চলে গেলে ?

সুমিত্রা—খবরের কাগজটাকে তোমার পিসেমশাইয়ের ঘরে রেখে এলাম।

শুক্তি—উঃ, কী মস্ত কাজ করলে !

চোখ কাঁপে সুমিত্রার। মুখের হাসিটাও কেঁপে ওঠে। তখুনি সরে যান সুমিত্রা, তাড়াতাড়ি হেঁটে একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে রাঁধুনি ঠাকরুণের সঙ্গে কথা বলেন—নিশির মা, শুনছেন ? পায়েসে বেশি মিষ্টি দেবেন না কিন্তু ; বেশি মিষ্টি হলে শুক্তি সে পায়েস মুখে তুলবে না।

প্লেনের টিকেট কিনে নিয়ে এসেছেন ড্রাইভার কেষ্টবাবু। আজকের রাতটার শুধু ফুরিয়ে যাওয়া বাকি, কাল সকালেই রওনা হয়ে যাবে শুক্তি।

ঘরের আলোর কাছে বসে ডাক দিলেন সুমিত্রা—শুক্তি, শোনো।

—কী বড় পিসি ? ডাক শুনেই ছুটে আসে শুক্তি।

সুমিত্রার চোখ-মুখ হাসছে। কী অদ্ভুত শান্ত অথচ জ্বলজ্বলে হাসি। —তেজপুরের সোম লজের অনিমেষকে তুমি চেন নিশ্চয় ?

চমকে ওঠে শুক্তি। —হ্যাঁ।

সুমিত্রা—তোমার মণিমাসি লিখেছেন, অনিমেষ খুবই ভাল ছেলে। তোমার কী মনে হয় ? সত্যি খুব ভাল ?

শুক্তি—আমার তো তাই মনে হয়।

সুমিত্রার মুখের হাসিটা এবার বড় বেশি স্নিগ্ধ হয়ে যায়। —বেশ তো ; ভালই ; আজ আর কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে বেশি রাত করে দিও না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে।

যেন ভাল ঘুম হয়, যেন শরীর খারাপ না হয়, তাই বেশি রাত না করে শুয়ে পড়তে বলেছেন বড় পিসি। রাত ন'টাও হয়নি, শুয়ে পড়ে শুক্তি।

কিন্তু কিছুতেই যে ঘুম আসে না। বন্ধ চোখ দুটো হঠাৎ ছটফট করে খুলে যায়, ঘরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। বালিশটা তো বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু এপাশ-ওপাশ করলেও মাথাটা কোনও ঠাণ্ডা খুঁজে পায় না কেন ? শক্ত করে বাঁধা বেণীটাই বোধ হয় দুমড়ে গিয়ে ঘাড়টাকে জ্বালাচ্ছে।

বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালে শুক্তি। বেণীটাকে ভেঙে দিয়ে ঢিলে করে একটা খোঁপা বাঁধে। এই ভাল। ওরকম একটা দোলানো বেণী আর দেখতে একটুও ভাল লাগে না। ভাল

দেখায়ও না।

আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে শুক্তি। কিন্তু সন্দেহ হয়, ঘুম কি হবে ? চোখের পাতাগুলি যেন কাঁটার মত শক্ত, নরম হতেই চায় না। উঠে পড়তে ইচ্ছে করে ; ছুটে গিয়ে বড় পিসিকেই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে ; তুমি তো আজ আমাকে কোনও অদ্ভুত কথা বলনি, তবে আমার ঘুম আসে না কেন, বড় পিসি ?

জাগা পাখির মত শুক্তির প্রাণটাও যেন উসখুস করে, কখন ভোর হবে।

ভোর হয়। বৈশাখী সকালবেলার রোদও তেতে উঠতে দেরি করে না। দমদম এয়ারপোর্টের রানওয়ের শুরুপথে সেই অনেকচেনা শিকল-বেড়া ; ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে তেজপুর যাবার ডাকোটা। হেসে হেসে কৃষ্ণা আর সুকুর গলা জড়িয়ে ধরে শুক্তি। বড় পিসিকে প্রণাম করবার সময় আর চোখ তুলে তাকাতে পারে না ; তাই দেখতে পায় না, বড় পিসির চোখে কোনও মায়া আজও আবার আগের মত তেমনি সজল হয়ে উঠল কিনা।

॥ ১৩ ॥

দেখলে তো মনে হয় না যে, তেজপুরের জল মাটি আর আলোছায়ার চেহারা এই সাত মাসের মধ্যে একটুও বদলেছে। এদিকে ব্রহ্মপুত্র, ওদিকে নেফার পাহাড়, আশে-পাশে ধানের ক্ষেত ; সবই তো ঠিক তেমনই আছে। সেই সার্কিট হাউস, স্টেশন ক্লাব আর চক-বাজার। সেই আদালত, নেহরু ময়দান আর রিজার্ভ পুলিশ লাইন। মীনা পার্কের ফোয়ারার জল সেই পাথুরে শিশুর সাপজড়ানো মাথাটাকে ঠিক তেমনই করে ভিজিয়ে দিয়ে ঝরে পড়ছে। কিন্তু তেজপুরের জীবনের চেহারাতে রদবদলের নানা নতুন ঘটনার দাগ পড়েছে, পড়ছে ও আরও পড়বে বলে মনে হয়।

একটি কম্বলে বিড়ির আগুনের পোড়া দাগ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সে কম্বল এখন শিশির হাজরিকার বাড়ির বাইরের ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। এটা হল গগন বসুর ড্রাইভার কৈলাসের কম্বল। কৈলাস এখন তেজপুর জেলের কয়েদি। পুলিশ অফিসার পরেশ ভট্টাচার্যকে বাজারের চকের কাছে দেখতে পেয়েই গলা টিপে ধরেছিল কৈলাস। সেই অপরাধের শাস্তি, এক বছরের শক্ত কয়েদ।

কৈলাসের জামিন হয়েছিল শিশির। মামলাতে কৈলাসকে ডিফেণ্ড করবার জন্য উকিল আর আদালতের সব খরচ দিয়েছিল শিশিরের তিন বন্ধু : অমল ঘোষ, হিতেন রায়, জগদীশ কাকতি। কিন্তু কিছুই হল না। রায় শোনাবার পর কৈলাস সবাইকে নমস্তে জানিয়ে পুলিশ ভ্যানের দিকে চলে গেল।

শীতল বিশ্বাসের সেই ক্ষুদ্র বস্ত্রালয়টিকে তেজপুরের বাজারে আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

কী যন্ত্রণাই না ভুগলেন শীতল বিশ্বাস ! দোকানের খাতা-পত্র ঝোলায় ভরে নিয়ে ইনকাম ট্যাক্সের অফিসে যান আর ফিরে আসেন ! সামান্য আয়ের কৈফিয়ত দিতে দিতে হয়রান হন। সবই সহ্য করছিলেন শীতল বিশ্বাস। কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরী একদিন বেশ ভ্রূকুটি করে হাসলেন। —আপনি যে একজন শীতল অবিশ্বাস নন, সেটা প্রমাণ করতে পারবেন ?

—আজ্ঞে না।

—তা হলে এসব খাতাপত্রের সাধুতা দেখাতে আর আসবেন না।

—তা হলে কী করব, বলুন।

—আমার একজন লোক, নাম মধুবাবু, আপনার কাছে যাবে। তাকে খুশি করে দেবেন।

মধুবাবু এসে বলেছিলেন। —অন্তত দেড় হাজার টাকা দিন। শীতল বিশ্বাস বলেন—না। টাকা থাকলেও দিতাম না।

একদিন মহিম দস্তিদারও বলেন—এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুন শীতলবাবু। আর, আমার টাকাটাও শোধ করে দিন। আপনার কাছ থেকে ইন্টারেস্ট পেতে আমি আর ইণ্টারেস্টেড নই।

এর পর আর দেরি করেননি শীতল বিশ্বাস। দোকান বিক্রী করে দিয়ে মহিমবাবুর পাওনা টাকা

সুদসুদ্ধ শোধ করে দিয়েছেন। মহিমবাবু অবশ্য দুঃখিতভাবে হেসেছেন।—এখন তা হলে সম্পত্তি বলতে আপনার কিছু রইল কি, শীতলবাবু।

শীতল বিশ্বাস—হ্যাঁ, একটা পুরনো মরচে পড়া তোবড়ানো ট্রাক রয়ে গেল।

মহিমবাবু—তা হলে তো অনাদায় ট্যাক্সের জন্য ওটাই ক্রোক হবে।

শীতল বিশ্বাস হাসেন।—হলে হবে, কিন্তু ওরা ঠকবে।

মহিমবাবু চোখ টান করেন।—ঠকবে কেন ?

শীতল বিশ্বাস—ক্রোক করতে আসবার আগেই ওটাকে একটা মুগুর দিয়ে পিটিয়ে দেব ; চমৎকার একটা অপদার্থের পিণ্ডি হয়ে যাবে। সে মাল ওরা নীলাম করে ষাট টাকাও পাবে কিনা সন্দেহ।

হাসতে থাকেন শীতল বিশ্বাস। অদ্ভুত হাসি। যেন একটা ক্ষেপা রোগীর হাসি।

মহিমাবাবু দুঃখিতভাবে হাসেন।—এঃ, আপনি বড় ক্রোধী মানুষ, শীতলবাবু। ক্রোধ কিন্তু একটা রিপু।

কোলিবাড়িতে শিশির হাজরিকা নিজেই এখন ওই বাড়ির একজন ভাড়াটিয়া বাসিন্দা ; বাড়িটা এখন শৈলেশ্বর শইকিয়ার সম্পত্তি।

মালতী বলেছিল, চাকরি করতে চাই, তা না হলে চলবে কী করে ? দিন দিন যে দেনা বেড়েই চলেছে। মালতীর কথা শুনে সেই যে রাগ করে চেঁচিয়ে আর ধমক দিয়ে উঠল শিশির, তার ঠিক সাতদিন পরে বাড়িটাকে বিক্রী করে দিল।

জগদীশ বলে—তাড়াহুড়ো করে এত অল্প দামে বাড়িটাকে বিক্রী না করলেই ভাল করতে, শিশির।

বাড়ির সামনে কচি নারকেলের পাতার ঝালরে চাঁদের আলো চিকচিক করে ; চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নেয় শিশির, জগদীশের কথার কোনও জবাব দেয় না।

শৈলশ্বের শইকিয়া দুঃখিতভাবে হেসেছেন।—তোমার বাবাকে আমি চিনতাম শিশির। মানুষটিকে আমার খুব ভাল লাগত। তাই ইচ্ছে করেই আমি বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে বাড়ি কিনে নিলাম। কিন্তু আমি চাই, তুমি একদিন উন্নতি করে এর চেয়ে অনেক ভাল বাড়ি তৈরি করবে আর সুখে থাকবে।

নেফা মেডিক্যালের পিয়ন রতন বিশ্বাস আজকাল নতুনপাড়ার বাড়ির একটি ঘরের মেঝেতে মাদুরের উপর যেন দুর্ঘটনায় জখম একটা মানুষের চেহারার মত করুণ হয়ে শুয়ে পড়ে থাকে, যদিও রতনের হাতে পায়ে ও মাথাতে কোনও ব্যাণ্ডেজ নেই।

ঘরের দেয়ালে অবশ্য একটা রঙিন নুড়িপাথরের মালা এখনও ঝুলছে। কিন্তু ঘরের জানালা সব সময় বন্ধ করে রাখে রতন, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত, যেন বাইরের কোনও আলো এসে ঘরের অন্ধকার ভেঙে না দেয়, আর কোনও রঙিন জিনিস যেন চোখে না পড়ে।

রতনের চাকরি নেই। নেফার আইন রতনকে ক্ষমা করতে পারেনি। কারণ, দফলাদের গাঁ বিলং একদিন দা হাতে নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে নেচেছে আর নালিশ করেছে, গাঁওবুড়ার মেয়ে রেনকিকে নষ্ট করতে চেষ্টা করেছে মেডিক্যালের পিয়ন রতন।

শীতল বিশ্বাস তাঁর গলার স্বর চেপে আস্তে আস্তে কথা বলেন—হ্যাঁ, ম্যালেরিয়া-ইন্সপেক্টর ধীরেনের কাছ থেকে সব কথা শুনলাম। পলিটিকাল খোসলা সাহেব নিজের হাতে রতনকে গলাধাক্কা দিয়ে কোয়ার্টার গার্ডে পুরেছিলেন। তিনটে মাস কোয়ার্টার গার্ডে বন্ধ ছিল রতন। এক বছরের মাইনে থেকে জমানো টাকার সব টাকা, পুরো পাঁচশো টাকা জরিমানা দিয়েছে রতন। সে টাকা নিয়ে বিলং-এর দফলারা মিথুন কিনেছে, কেটেছে আর খেয়েছে।

মীরা—কিন্তু রতন ঠাকুরপো কি সত্যিই...আমার তো বিশ্বাস হয় না।

শীতল—কিন্তু রতন যে নিজেই স্বীকার করেছে।

চমকে ওঠেন মীরা।—কী স্বীকার করেছে ?

শীতল—রেনকিকে একদিন জড়িয়ে ধরেছিল রতন।

মীরার মুখটা করুণ বিষাদে ভরে যায়।—রেনকি কিছু বলেনি ?

শীতল—রেনকি শুধু একবার গাঁ থেকে পালিয়ে এসে কোয়ার্টার গার্ডের বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল আর কেঁদেছিল। তারপর আর কোনও গণ্ডগোল না করে চলে গেল।...রতন জেগেছে মনে হচ্ছে ?

শব্দ শোনা যায়, ঘরের জানালা খুলছে রতন। কারণ সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ কালো হয়ে উঠেছে।

ডক্টর সি টি এলগিন, সেই বোটানিস্ট সাহেব, তিনিও নেফা থেকে ফিরে এসেছেন। সরকারি সমাদর তাঁকে তোয়াং থেকে হেলিকপ্টরে তুলে নিয়ে তেজপুরে পৌঁছে দিয়েছে। নেফা-অফিসার মনোহর লাল সার্কিট হাউসে এসে এলগিনের কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন।—অনুমান করি, আপনাকে কোনও অসুবিধে ভুগতে হয়নি স্যার ?

এলগিন হাসেন।—একটুও না। আপনার কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন।

মনোহর লাল—কর্তব্য করেছি, এইমাত্র। আমাদের সার্ভিস তো ঠিক চাকরির ব্যাপার নয় স্যার, এটা একটা ডেডিকেশন।

এলগিন—খুব সত্য কথা।

মহিমবাবু আসেন, শৈলেশ্বরবাবু আসেন ; সরকারি গণ্যমান্য আর পদস্থেরাও আসেন। সকলের কুশল-জিজ্ঞাসার জবাবে এলগিন বিনীতভাবে বলেন—আমার পিলগ্রিমেজ প্রায় শেষ হয়েছে। এবার শুধু সাতটা দিন এই তেজপুরের এদিক-ওদিক একটু ঘুরে-ফিরে আর চোখ তৃপ্ত করে চলে যাব।

মহিমবাবু—কিন্তু চলে যাবার আগের দিন যদি আমার বাড়িতে এসে সামান্য একটি চায়ের আসরে বসে টাউনের এলিটের সঙ্গে একটু আলাপ করেন, তবে আমাদের পক্ষে সেটা খুবই সুখের বিষয় হবে।

এলগিন—নিশ্চয় যাব ; এ তো আমার সৌভাগ্য।

মহিমবাবু—তা হলে আশা করছি, আগামী শনিবার সন্ধ্যায় আপনাকে আমাদের মধ্যে দেখতে পাব।

এলগিন—ও ইয়েস ! নিশ্চয়।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা, সার্কিট হাউসের বারান্দায় একা-একা একটি চেয়ারে বসে আর টেবিলের আলোর কাছে একটা কাগজ রেখে যখন দুটি চোখের সব আগ্রহ ঢেলে দিয়ে কী-যেন দেখছিলেন আর পড়ছিলেন এলগিন, তখন হঠাৎ কয়েকটা ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন। সেই মুহূর্তে কাগজটাকে ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ঝুড়ির ভিতরে ফেলে দিলেন।

ছায়া নয় ; শিশির, হিতেন আর অমল এসে দাঁড়িয়েছে। আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে বেশ স্নিগ্ধভাবে হাসেন এলগিন।—আসুন।

শিশির—নেফার ফ্লোরা সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই। আর, কয়েকটা কথাও আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।

একবার শিশিরের, একবার অমলের, একবার হিতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে, তারপর খুব জোরে একবার কেশে নিয়ে হেসে ওঠেন এলগিন।—খুব ভাল কথা। আপনারা কাল বিকেলে আমার এখানে আসুন। আমি খুব খুশি হয়ে নেফার ফ্লোরার অনেক চমৎকার কথা আপনাদের শোনাব।

কিন্তু পরের দিনের বিকালে নয়, শনিবারের সন্ধ্যাতেও নয় ; এই তেজপুরের প্রায় একশোটি বিকেল আর সন্ধ্যা এসেছে আর চলে গিয়েছে, তবু বোটানিস্ট সাহেব এলগিনকে কেউ আর দেখতে পায়নি। সার্কিট হাউসে গিয়ে এলগিনকে দেখতে না পেয়ে শিশির, অমল আর হিতেন হেসে ফেলেছিল। মহিমবাবুর বাড়িতে শনিবারের সন্ধ্যার চায়ের পার্টি একটু দুঃখিতভাবে বিস্মিত হয়েছিল।—এভাবে হঠাৎ কেন উধাও হয়ে গেলেন এলগিন ?

মহিমবাবুর বাড়ি ভারতীর কালোর মা একদিন কিন্তু বেশ একটু ভয় পেয়ে বাড়ির ছাদ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে চলে এলেন।

রাতের কাজ শেষ হবার পর জপের মালা হাতে নিয়ে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কালোর মা। হঠাৎ চোখে পড়ে, দূরে উষাপাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বলছে। আগুনটা যেন পাহাড়ের গায়ে উঠছে নামছে আর হেঁটে বেড়াচ্ছে।—ভাল লক্ষণ নয় মা। বলতে গিয়ে কালোর মা'র গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

মণিমালা বলেন—ও কিছু নয়। ওটা সেই পাগলা সাধুর ধুনির আগুন।

বোধ হয় খুব ভুল কথা বলেননি মণিমালা ; অনেকেরই এ-গল্প জানা আছে ; একজন পাগল সাধু, যার ভয়-ডরের কোনও বালাই নেই, মাঝে-মাঝে উষাপাহাড়ে উঠে ধুনি জ্বালায় আর রাত কাটায়।

কিন্তু তেজপুরের ভিতরে-বাইরে আনাচে-কানাচে আর আশেপাশে সত্যিই যে একটা উপকথার জগতের যত অলক্ষুণে কায়া ছায়া আর ভাষা ঢুকেছে ; ঘুরছে ফিরছে হাসছে আর ছুটছে। বিচিত্র অদ্ভুত করুণ আর কুৎসিত।

মুরগিতে ভরতি হয়ে ছুটে যাচ্ছে টাস্কারের রোড-ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল সাহেবের জিপ। ফুটহিলের কাছে এসে ইনার লাইন পার হবার আগেই সড়কের গর্তে পড়ে মিলিটারির ট্রাকের চাকা ভেঙে গিয়েছে। উল্টে গিয়েছে ট্রাক। ট্রাক থেকে গড়িয়ে পড়েছে সাজানো পেটির স্তূপ ; পেটি ভেঙে বোতল ; আর বোতল ভেঙে গড়িয়ে যায় তরল সোলান আর সাহারানপুর।

বাজারের আড়তদারের গদিতে বসে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে শুধু হাসছেন আর হাসছেন আর টাকা গুনছেন মিলিটারির এক খুশি অফিসার। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে এসে সরকারি পারমিটের একজন কর্তা অফিসার তাঁর সভ্য-ভব্য স্যুট-শোভিত চেহারা নিয়ে এমন একজন কারবারি মহাজনের হাত ধরে হাসছেন আর কথা বলছেন, যাঁর পরনে একটি খাটো ধুতি আর কাঁধে একটি গামছা। হোটেলের টেবিলের এপাশে কন্ট্রাক্টর, ওপাশে ইঞ্জিনিয়ার, মাঝখানে দুটি বিয়ারের বোতল। সাপ্লাইয়ের চালান তখনি তৈরি হয় ; বিলও তখনি। সেই বিল আর চালান তখনি সই করে দিয়ে হেসে ওঠেন ইঞ্জিনিয়ার। কন্ট্রাক্টরও তখনই হাঁক দেন।—জলদি করো বয়, আউর দু'বোতল।

বুঝতে পারা যায় না, চারজন বাইজি কেন এসে ডাকবাংলোতে ঠাঁই নিয়েছে। ওরা বমডিলাতেই বা কেন যেতে চায় ? মাইফেলের বায়না পেয়েছে নাকি ওরা ?

এত রাতে ওখানে ওটা কিসের ভিড় ? মিলিটারির দু'জন অফিসার মানুষের উপরে মারমুখী হয়ে ঝগড়া করছে কেন শিশির আর অমল ? একজন পুলিশ এস-আই বা কেন নির্বিকার অসহায়তার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন ?

সিনেমা হাউসের সামনে রাস্তার একপাশে একটা রিক্সার উপর বেহুঁস হয়ে শুয়ে পড়ে আছে একটা অল্পবয়সের মেয়ে, বোধ হয় গাঁয়ের চাষির ঘরের মেয়ে। মেয়েটার গায়ে নতুন কেনা একটা হালফ্যাশনের মেয়েলি ওভারকোট, মুখে মদের গন্ধ।

মিলিটারির দুই অফিসার একসঙ্গে ছড়ি ঘুরিয়ে নেশাজড়ানো স্বরে ধমক দেন।—আমরা কিছুই জানি না। রিক্সাওয়ালা কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে—আমি কিছু জানি না ; মেলিট্রিসে পুছিয়ে।

মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে পুলিশ এস-আই কাতরস্বরে ডাকেন।—শিশিরবাবু, প্লিজ ; আমার কথা রাখুন। মিথ্যে গোলমাল বাধাবেন না।

টাস্কারের পতাকার হাতির-মাথা দুলে দুলে হাওয়া খায়, ছুটে ছুটে হাওয়া খায় টাস্কারের গাড়ি। এ ব্যস্ততা যেন একটা মত্ততা। বাজারের লোকে বলাবলি করে, ওদের পান আনতে জিপ ছোটে, আর সিগারেট আনতে ট্রাক।

শিশির বলে—সত্যিই কি ওরা রোড তৈরি করে, না ম্যাপ আর মডেলের মধ্যে রোডের দাগ টানে ?

জগদীশ বলে—তা জানি না ; কিন্তু ওদের অফিসার-মেসের সন্ধ্যাবেলার আলোর ঝলমলানি দেখে মনে হয়, যেন একটা কার্নিভালের ফূর্তি চলছে সেখানে।

ফোর্থ ডিভিসনের একটা ব্যাটেলিয়ন এসেছিল অনেকদিন আগে। তারা নেফার পাহাড়ের এদিকে-ওদিকে কবেই চলে গিয়েছে। কিন্তু তারপর আর যারা এসেছে তাদের যেন কোথাও যাবার কথা নেই। তেজপুর আর মিসামারির সেনা-বারিক যেন দুটো বিশ্রামসুখের ধরমশালা। ব্যস্ততা

বলতে শুধু পিকনিকের ব্যস্ততা। এদিকে পিকনিক, ওদিকে পিকনিক ; নিয়মিত রুটিন উৎসবের মত পিকনিক।

স্টেশন-ক্লাবে এসে পানীয় মুখে ঢেলেই মেজর নায়ার বলেন—চিনারা অ্যাগ্রেস করবে, এটা একটা কক অ্যান্ড বুল স্টোরি।

রেলের ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার মুস্তফি তাঁর হাতের গেলাস নামিয়ে রেখে ঢেঁকুর তোলেন।—আমি একজন ক্যাপ্টেনের মুখেও ঠিক একথা শুনেছি।

—কাজেই আমাদের ফোর্স এখানেই থাকবে ; এর চেয়ে বেশি এগিয়ে যাবার দরকার হয় না।

—ঠিক বলেছেন, ইউ আর রাইট !

—যেটা নিতান্ত বর্ডার পুলিশের কাজ, সে কাজে আর্মিকে ভিড়িয়ে দেওয়া খুবই অসঙ্গত।

—আরও সত্যি কথা ; ইউ আর মোর দ্যান রাইট !

—বর্ডার পুলিশ যেন ভয় না পায়, মরেল ঠিক রাখতে পারে ; সেজন্য বড় জোর ইনফ্যান্ট্রির কয়েকটা প্লেটুন পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

—উপরের এইরকম ইনস্ট্রাকশন আছে বোধ হয় ?

মেজর নায়ার হঠাৎ শক্ত করে ভুরু কুঁচকিয়ে বলে ওঠেন—একজন সিভিল চ্যাপ কোন সাহসে আশা করে যে, আমি তার কাছে মিলিটারির একটা সিক্রেট প্রকাশ করে দেব ?'

মিস্টার মুস্তফি একটা হাই তুলে নিয়ে উঠে পড়েন ; গেলাসের দিকে আর তাকান না। চলে যান।

কিন্তু কন্ট্রাক্টর তেজা সিং-এর মিসামারি বাগানে একটি খানাপিনার আসরে, লালপানি আর ভাজা মাংসের ঢালাও উৎসবে, একদিন এই মিলিটারি নায়ার আর সিভিল মুস্তফি দুজনে হাত ধরাধরি করে হাসলেন আর গল্প করলেন। দু'জনের অন্যহাতে তখন দুটি চকচকে প্লাস্টিকের ফোলিও ব্যাগ ঝুলছে ; তার ভিতরে তেজা সিং-এর কৃতার্থতার উপহার একগাদা একশো টাকার নোট কিন্তু কোনও শব্দ করে না।

অনেক যাকে বলে তেজা সিং-এর এজেন্ট, সেই সুশান্ত মজুমদারের টেলিফোনের একটা ডাক শুনে উতলা হয়ে যান, এমন পদস্থ সিভিলের সংখ্যাও কম নয়। মজুমদার সাহেব শিলং চলে যাবেন শুনতে পেয়ে সোজা একেবারে এয়ারপোর্টে হাজির হলেন সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কসের চন্দ্রনাথন ; ইনি সেই চন্দ্রনাথন, যিনি পণ্ডিচেরি ভঙ্গিতে ফরাসি ভাষা বলে পোস্টমাস্টারকে একদিন খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। ফরেস্টের গোস্বামিও সোজা এয়ারপোর্টে ছুটে আসেন। বিদায় নেবার আগে ব্যাগ উপুড় করে গাড়ির সিটের উপরে নোটের তাড়া ঢালেন মজুমদার। গোস্বামি হাসেন।—আশা করি আবার দেখা হবে। চন্দ্রনাথন হাসেন।—ওর্‌র্ রাভোয়ার।

মিসামারি থেকে মাত্র পাঁচ মাইল ; ছোট নদীর কিনারায় আমবাগানের ছায়াকে মিষ্টি করে দিয়েছে ফাল্গুন মাসের কোকিলের ডাক। পিকনিক সেরে নিয়ে শিশির আর শিশিরের স্কুলের ছেলের দল সড়কের ধারে নিমের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ফুটহিলের দিক থেকে বাস আসবে ; ওরা সবাই আবার তেজপুরে ফিরে যাবে।

ছেলেদের চোখগুলি হঠাৎ এদিকে ঘুরে গেল। বুটের শব্দের সঙ্গে সড়কের ধুলো উড়ছে। কাঁধের উপর পুরো প্যাক আর রাইফেল, জাঠ রেজিমেন্টের একটা প্লেটুন আসছে। বেশ শান্ত চাহনি, বেশ শক্ত চেহারা, হাসিমাখা মুখ ; জওয়ানদের কপালের ঘাম ধুলোতে ভরে গিয়ে কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছে। কারও পায়ে ছেঁড়া বুট ; কারও গায়ে ছেঁড়া আস্তিনের উর্দি। ওরা বোধ হয় ফুটহিলের ক্যাম্পের কাছে গিয়ে জিপে উঠবে।

কিন্তু কী অদ্ভুত শিশির হাজারিকার কড়া মেজাজের মন। শিশিরের শুকনো চোখে কোনও সমবেদনার একছিটে ছায়াও কাঁপে না। বরং ছেলেদের সাবধান করে দেয় শিশির।—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো আর দেখো। হাততালি দেবে না, কথা বলবে না, হই-হই করবে না।

চলে গেল জাঠ প্লেটুন। কিন্তু তেজপুর যাবার বাস আসতে বোধ হয় আরও আধঘণ্টা লাগবে। ছেলের দল নিমের ছায়ায় চুপ করে বসে থাকতে না পেরে ছটফট করে।

শিশির হঠাৎ আবার ছেলেদের সাবধান করে দেয়। —কেউ কথা বলবে না। কারণ, ধুলো উড়িয়ে, বুটের শব্দ বাজিয়ে আব একটা জওয়ান-দল কাছে এসে পড়েছে। এটা আসাম রাইফেলের একটা প্লেটুন।

কিন্তু নীরব শিশিরের শক্ত-উদাস চোখ দুটো হঠাৎ চমকে ওঠে। দেখতে পেয়েছে শিশির, বেশ শক্ত বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা আর বেশ অল্প বয়সের ওই প্লেটুন হাবিলদার শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে আর হেসে চলে যাচ্ছে।

কথা বলে ফেলে শিশির—সুজিতবাবু, আপনি!

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

হাত তুলে নেফার একটা পাহাড়ের মেঘলা রঙের মাথাটাকে দেখিয়ে দেয় সুজিত।

ফাল্গুন গেল, চৈত্র গেল, বৈশাখও যায়-যায়; মণিপিসি একদিন খুব খুশির স্বরে হাসতে থাকেন। —কি কালোর মা, ঊষাপাহাড়ের আগুন আর কখনও চোখে পড়েছে?

—জানি না মা, আমি আর ওদিকে তাকাই না।

—তুমি তো মিথ্যে ভয় করে একটা অলক্ষণ দেখতে পেলে; কিন্তু লাহিড়িবাবুর মেয়ে কি বলে গেল শুনবে?

—বলুন, শুনি।

—সকালবেলাতে অগ্নিগড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেয়েছে লাহিড়িবাবুর মেয়ে, বরফে ঢাকা সাদা গৌরীচেন চূড়া উত্তুরে আকাশে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে।

শুনে খুশি হন কালোর মা। —শুনেছি, এটা নাকি খুব সুলক্ষণ।

মণিমালা—খুব সুলক্ষণ। মেয়েটাকে আমি বলেছি; তোর বিয়ে হবে শিগগির, শিবের মত বর হবে তোর।

কথা শেষ করেও হাসতে থাকেন মণিমাসি। হঠাৎ আরও খুশি হয়ে বলে ওঠেন—শুনেছ তো কালোব মা, আজ যে শুক্তির আসবার কথা।

—শুনেছি মা।

—আমারও ইচ্ছে, শুক্তি একবার অগ্নিগড়ে গিয়ে দেখে আসুক উত্তুরে নেফার ওই গৌরীচেন; একটু ভাল করে দেখে আসুক।

॥ ১৪ ॥

শুক্তিকে দেখতে বেশ রোগা-রোগা মনে হয়েছে, তাই একটু দুঃখিত হয়েছেন মণিমাসি। আর, দুঃখের ভাষাটা যেন একটা উদ্বেগের ভাষা। —এখন এরকম একটা রোগাটে মূর্তি ধরলে তো চলবে না। তাড়াতাড়ি শরীর সারিয়ে ফেলতে হবে। শুনছিস তো শুক্তি?

শুক্তি—শুনছি।

মণিমাসি—শরীর ভাল না করে কদমবাড়ি যেতে পারবে না। আমি আগেই বলে রাখছি।

শুক্তি—তা হলে তো আজকেই কদমবাড়ি যেতে হয়।

মণিমাসি—কেন? কেন?

শুক্তি—আমার শরীর খুব ভাল আছে, যথেষ্ট আছে।

মণিমাসি—না, নেই।

শুক্তি—তা হলে আমারও আর কিছু বলবার নেই।

মণিমাসি—আমি কিরণদিকে আজ চিঠি দিচ্ছি, তুমি বেশ কিছুদিন এখানে থাকবে।

শুক্তি হাসে—বেশ কিছুদিন করো না মণিমাসি; অন্তত পরীক্ষার ফল বের হবার আগেই আমাকে সরে পড়তে দিও।

মণিমাসি—পরীক্ষার ফলের কথা ভেবে এত ভয় করবার কী আছে?

শুক্তি—আমার একটুও ভয় নেই। ফেল করলে বড় পিসি ভয়ানক কষ্ট পাবেন, শুধু এই ভয়।

—তা তো বটে ; তোর বড় পিসি দুঃখিত না হয়ে পারবেন কেন ? একে তো বিদুষী মানুষ, তার ওপর তোকে পড়াতে গিয়ে মানুষটা এই বয়সে নিজেও কত খেটেছে। কিন্তু এখন তো আর তোর পাস-ফেল নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই।

মাঝে মাঝে মনে হয়েছে মণিমাসির, শুক্তি যেন বড় বেশি ভাবছে। হাতে কোনও গল্পের বই নেই, রেডিওটারও মুখ বন্ধ, তবু ঘরের ভিতরে একা একটা চেয়ারে বসে শুধু আংটিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঙুল থেকে খুলছে, আবার পরিয়ে ফেলছে।

মণিমাসি বলেন—অনিমেষ এখন তেজপুরে নেই। থাকলে কি আর এই দশদিনের মধ্যে একটা দিনও না এসে পারত ? কিন্তু আসবে। অঞ্জলি বলেছে, বড়জোর আর দেড় মাস। তারপর ছুটি পেতে অনিমেষের আর কোনও অসুবিধা হবে না।

মাঝে মাঝে মনে হয় মণিমাসির, শুক্তি যেন বড় বেশি শান্ত হয়ে গিয়েছে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করছে রাজবাহাদুর, শব্দ শুনে আর দেখতে পেয়েও ছটফট করে ওঠে না শুক্তি।

মণিমাসি বলেন—কী হল তোর শুক্তি ? না মীরা, না মালতী, কারও সঙ্গে একটিবার দেখা করতেও গেলি না, অথচ এক মাসেরও বেশি হল তেজপুরে এসেছিস।

শুক্তি—যাব একদিন।

মণিমাসি—আমি বলি, একদিন অবজারভেটরি হিলে গিয়ে উত্তরে নেফার গৌরীচেন দেখে আয়। সাদা চূড়াটাকে আজকাল বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

শুক্তি—যাব একদিন ; এখন যেতে ইচ্ছে করে না।

মণিমাসি হাসেন।—একা একা যেতে ইচ্ছে করে না বুঝি !

এক-একবার সন্দেহ হয় মণিমাসির, এবার যেন কলকাতা থেকে একটা ক্লান্ত শরীর নিয়ে তেজপুরে এসেছে শুক্তি। তা না হলে আজকাল এত ঘুমোতে আর শুয়ে পড়ে থাকতে চায় কেন মেয়েটা ?

তেজপুরের জষ্ঠি মাসের গরমের জ্বালায় উষাপাহাড় যতই শুকনো আর রুক্ষ হয়ে যাক না কেন, রবার বাগানের বাড়ি ভারতীর কোনও ঘরে সে জ্বালার কোনও ছোঁয়া ঢুকতে পায় না। খস ঘাসের মোটা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে ভারতীর সব ঘরের জানালা আর দরজা। প্রতি ঘণ্টায় পিচকারি দিয়ে জল ছিটিয়ে সে পর্দা ভিজিয়ে রাখবার জন্য দুজন চাকর দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে। পাখা ঘোরে ; ঘরের বাতাস ঠাণ্ডা, বাতাসে ভিজে খসের সুগন্ধ। ঢিলে খোঁপাকে আরও ঢিলে করে দিয়ে, বিছানার উপর শুয়ে আর চোখ বন্ধ করে যেন স্নিগ্ধ একটা স্বপ্ন দেখতে চাইছে শুক্তি। দেখতে পেয়ে মণিমাসির তো তাই মনে হয়।

এগিয়ে আসেন মণিমাসি। শুক্তির বিছানার একপাশে বসে শুক্তির কপালে বেশ কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে নিয়ে চলে যান। বোধ হয় ডাকপিয়ন এসেছে। বোধ হয় কিরণদির কাছ থেকে আর-একটা চিঠি এসেছে।

ভুল নয় মণিমাসির অনুমান। কদমবাড়ি থেকে কিরণলেখার বেশ বড় একটা চিঠি এসেছে। সে চিঠিকে খুব মন দিয়ে বার বার তিনবার পড়লেন মণিমাসি।

কিন্তু চিঠিটা তাঁর হাত থেকে বোধ হয় টুপ করে ঝরে পড়ে যাবে। আলগা হয়ে ঝুলছে তাঁর হাতের চিঠিটা। আর চোখের দৃষ্টিটা যেন কুচি-কুচি হয়ে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। চিঠিটা সত্যিই যে তাঁর এতদিনের একটা সুন্দর বিশ্বাসের গায়ে কালি ছিটিয়ে দিয়ে ভয়ানক ঠাট্টা করছে।

লিখেছেন কিরণলেখা—কলকাতা থেকে সুমিত্রার চিঠি পেয়ে এখন আমার মনে হয়েছে, তুমি চিঠিতে একটু বেশি তাড়াতাড়ি করে অনিমেষের কথা লিখে ফেলেছ। আরও কিছুদিন পরে লিখলে বোধ হয় ভাল করতে। শুধু একা সুমিত্রা নয়, আলিপুরের বাড়ির সবাই, জয়ন্তবাবু, দিবাকর আর করুণা, এমনকি নিশির মা'রও বিশ্বাস যে, শ্যামলের কাছে শুক্তির কোনও আপত্তি নেই। শ্যামলের সঙ্গে শুক্তির চেনা-শোনা আর মেলা-মেশাও হয়েছে। শ্যামলকে চিনতে পারলে তো ? সুমিত্রার বড়জায়ের ছেলে শ্যামল সরকার, ডাক্তার, খুব কৃতী ছেলে। সুমিত্রা একটু দুঃখ করে লিখেছে, ওরা

সবাই এতদিন ধরে যা দেখেছে শুনেছে আর বুঝেছে, সেটা কি একেবারে মিথ্যে ?

অনেকদিন আগে তেজপুরে একটা সার্কাস-দল খেলা দেখাতে এসেছিল। মণিমালা একদিন সেই সার্কাসের খেলা দেখে এসেছিলেন। বেশ হাসি-খুশি চেহারা, বেণী দুলিয়ে একটা মেয়ে তারের উপর নেচেছিল। দুজন দু'রকমের চেহারার ক্লাউন ; একটার মুখে সাদা রঙের, আর-একটার মুখে লাল রঙের ছোপ ; মাটিতে দাঁড়িয়ে তারের দু'পাশের দু'দিক থেকে হাতছানি দিয়ে মেয়েটাকে ডাকে। মেয়েটা তারের উপর দিয়ে নেচে নেচে এসে একবার এই ক্লাউনের মাথাতে, একবার ওই ক্লাউনের মাথাতে রঙিন ছাতাটা ছুঁইয়ে দিয়ে হাসতে থাকে।

একটা রঙ্গিলা খেলা ; তামাসার জীবনে ওরকম খেলা চলতে পারে। কিন্তু শুক্তির মত মেয়ের জীবনে এ খেলা যে বিশ্রী একটা ভুলের খেলা। শুক্তির কি এটুকুও বুঝবার চেষ্টা নেই যে, সার্কাসের মেয়ের খেলাতে যেটা তামাসা, ঘরের মেয়ের জীবনে সেটা একটা ঘেন্না। এ কী কাণ্ড করে বসে আছে শুক্তি ?

কিরণদির এই চিঠির কী উত্তর দেবেন মণিমালা ? ভাবতে গিয়ে মনের মধ্যে একটাও কথা খুঁজে পান না। যেন ভাষা ভুলে গিয়েছেন মণিমালা। এত ভাল একটা শুভেচ্ছা, এত সুন্দর একটা আশা, আর এত ব্যস্ত একটা চেষ্টা, কত হঠাৎ একটা মিথ্যের জঞ্জাল হয়ে গেল। মণিমালার বুকের ভিতরে যেন একটা কান্না মুখ বন্ধ করে শুধু হাঁসফাঁস করতে থাকে। শুক্তির ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকেন মণিমালা।

এখন তো বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে, অনেক রাতে ছাদে উঠে উষাপাহাড়ের গায়ে যে আগুনটাকে জ্বলতে দেখেছিল কালোর মা, সেটা একটা অলক্ষুণে ইঙ্গিত। ভবানীপুরে আপত্তি নেই, সোম লজেও আপত্তি নেই ; ছি ছি, কোনও ভালবাসার মন কি এমন কুৎসিত কথা বলতে পারে ?

সত্যি কি তাই বলেছে শুক্তি ? ও মেয়ের মুখ দেখে তো বিশ্বাস করতেই পারা যায় না যে, দু'জায়গায় দু'জনের কাছে মন সঁপে দিয়ে ও মেয়ের সাধ-স্বপ্ন সবই নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছে। অঞ্জনা আর অর্চনা, ওরা তো এই শুক্তিরই দুই দিদি, ওরা যে জীবনে কোনওদিন এক ছাড়া দুই ভাবতেই পারেনি। ওদের ভাগ্য ওদের ঠকিয়েছে, ওরা ইচ্ছা করে আর ভুল করে ভাগ্যটাকে ঠকাতে চায়নি। কিন্তু শুক্তি যে ইচ্ছে করে আর ভুল করে...। শুক্তির ঘুম ভেঙেছে মনে হয়।

শুক্তির ঘরে ঢুকে, শুক্তির মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর জিজ্ঞাসা করেন মণিমালা—ভবানীপুরের শ্যামলের সঙ্গে তোমার তো বেশ চেনাশোনা হয়েছে।

চমকে ওঠে শুক্তি।—হ্যাঁ।

মণিমালা—তুমি নাকি বলেছ যে, ওখানে তোমার কোনও আপত্তি নেই ?

লালচে হয়ে যায় শুক্তির মুখ। মাথা হেঁট করে আর মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দেয় শুক্তি—অনেক দিন আগে করুণা বউদির কাছে বলেছিলাম।

মণিমালা—বেশ করেছিলে। কিন্তু তোমার আপত্তি নেই, এই কথাটা তো মিথ্যে নয়।

শুক্তি—তা আমি কেন আপত্তি করতে যাব, বলো ? আমাকে ওকথা জিজ্ঞাসা করাই বা কেন ?

মণিমালা—কেন নয় ?

শুক্তি—তোমরা আছ কী করতে ?

মণিমালা—আমি থাকলেই বা কী, আর না থাকলেই বা কী ?

শুক্তি হাসে।—কেন ?

মণিমালা—আমি তো আমার বোকা মনে বিশ্বাস করেছিলাম, অনিমেষের সঙ্গে তোমার কোনও আপত্তি নেই।

শুক্তি—আমি কি কখনও বলেছি যে, আপত্তি আছে ?

চমকে ওঠেন মনিমালা।—তোমার কথাটা আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগল না। খুব বাজে কথা, খুব ভুল কথা।

শুক্তি—কেন ? কিসের ভুল হল ?

মণিমালার গলার স্বর যেন একটা র্ভৎসনার ধমক হয়ে ফেটে পড়তে চায়। তবু খুব চেষ্টা করে

গলার স্বরের সঙ্গে ভাষার রূঢ়তাও সামলে নিলেন মণিমালা। কিন্তু তাঁর চোখ দুটো রুক্ষ হয়ে কাঁপতে থাকে।—আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি একটা মানুষ, না দুটো মানুষ? তোমার কি একটা প্রাণ, না দুটো প্রাণ? গগনবাবুর কি শুক্তি নামে দুটো মেয়ে আছে; একজনের মন ভবানীপুরে, আব একজনের মন তেজপুরে? খুব দুঃখের কথা; আমি কোনওদিন ভাবতেও পারিনি যে, তোমার মত মেয়ে ঠিক বরেন ঘোষের মেয়েটার মত এরকম একটা দোমনা কাণ্ড করবে।

—মণিমাসি! চেঁচিয়ে ওঠে শুক্তি।—আমিও কোনওদিন ভাবতে পারিনি যে, তুমি আমাকে এত শক্ত কথা বলবে।

শুক্তির্র চোখের তারা দুটো যেন ভয় পেয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। থেকে-থেকে শিউরে উঠছে এক-একটা নিঃশ্বাস। মণিমাসির কথাগুলি তো কথা নয়; উষাপাহাড়ের আগুনটার যত ফুলকি, ছুটে এসে শুক্তির মাথার উপর কুচি-কুচি জ্বালার মত ঝরে পড়ছে।

শক্ত কথা সামলাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন মণিমালা। শুক্তি এগিয়ে এসে মণিমালার দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরে। শুক্তির বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাস যেন ক্ষেপে উঠেছে।—আমি ছাড়ব না, বলতেই হবে মণিমাসি, কী দোষ করলাম আমি?

মণিমাসি—আর কত বলব?

শুক্তি—না, আরও বলো। আমাকে বুঝিয়ে দাও।

মণিমাসি—তুমি বুঝে দেখো।

শুক্তি—আমি বুঝতে পারছি না।

মণিমাসি—অনিমেষকে ভাল লাগে?

শুক্তি—হ্যাঁ।

মণিমাসি—শ্যামলকে ভাল লাগে?

শুক্তি—হ্যাঁ।

মণিমাসি—লজ্জার কথা। তুমি ভুল করে তোমার মনটাকে নষ্ট করেছ।

হঠাৎ শান্ত হয়ে যায় শুক্তি। মণিমালার হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু হাত তুলে আর খোঁপাটাকে বাঁধতে পারে না। দুঃসহ একটা লজ্জার ভারে ভারী হয়ে গিয়েছে হাত দুটো। সে লজ্জা শুক্তির গলার স্বরেও একটা যন্ত্রণার আত্মবিলাপের মত বেজে ওঠে।—বুঝতে পেরেছি মণিমাসি; কিন্তু আমি ইচ্ছে করে ভুল করিনি।

মণিমালার চোখমুখ এইবার যেন অদ্ভুত এক উতলা করুণতায় ভরে যায়। শুক্তির হাত ধরে টানতে থাকেন মণিমালা।—আয়, চোখমুখ ধুয়ে নিয়ে আমার কাছে একটু বসবি, আয়।

চোখমুখ ধুয়ে মণিমালার কাছে চুপ করে বসে থাকলেও শুক্তিকে ঠিক আর সেই শুক্তির মত দেখায় না। ঝড় বৃষ্টির পর ভারতীর বাগানের ছোট কামিনী গাছটাকে যেমন দেখায়, শুক্তিকেও প্রায় সেইরকম দেখায়; শান্ত অথচ এলোমেলো। সবই তো বুঝতে পারা গেল, মনটা তাই শান্ত। কিন্তু এর পর যে কী হবে, বুঝতে না পেরে প্রাণটা এলোমেলো।

রাতের কাজ শেষ হবার পর জপের মালা হাতে নিয়ে ছাদে ওঠেন কালোর মা। শুক্তিও ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মণিমালা আপত্তি করেন, না না না, যাসনি শুক্তি। কিন্তু শুক্তি হাসে।—সত্যি আমার খুব ভাল লাগে, তুমি মানা করো না, এখনই চলে আসব।

যেন চেনা-আকাশের তারা খুঁজছে শুক্তির চোখ। দেখতেও অসুবিধে নেই। দুটো তারা জ্বলছে।

ভালই করলেন মণিমাসি। ভুল বুঝিয়ে দিতে গিয়ে কিছু বলতে আর বাকি রাখেননি। বরেন ঘোষের মেয়ে! যেটুকু বলতে বাকি ছিল, সেটুকু ওই একটি তুলনার কথা দিয়ে একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

বরেন ঘোষের মেয়ের গল্প করতে গিয়ে মীরা কাকিমা যে কথাটা বলেছিলেন, সে কথাটাও কী ভয়ানক একটা স্পষ্ট কথা, ডবল প্রেম। শেফালিকা ঘোষ শিলংয়ে থাকতে দুজনকে ভালবেসে শেষে একটা বিশ্রী মামলার কাণ্ড বাধিয়েছিল। আদালতে একটা ফটো দাখিল করেছিলেন উকিল; দু'হাতে

দুজনের হাত ধরে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে শেফালিকা ঘোষ।

সেদিন শেফালিকা ঘোষের গল্প শুনে শিউরে উঠেছিল শুক্তি। আজ নিজের কথা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠতে হয়। কেউ যদি আজ এখন চুপি-চুপি এখানে এসে শুক্তির একটা ফটো তুলে নিয়ে চলে যায়, তবে সেই ফটোতেও দেখতে পাওয়া যাবে, চেনা-আকাশের দুটো তারার দিকে তাকিয়ে শুক্তি বসুও দাঁড়িয়ে আছে।

লজ্জা পেলে তো সত্যটা আর মিথ্যে হয়ে যাবে না। গোলাপকে যে নামে ডাক, শুক্তি বসুর এই আপত্তি-নেই মনটা যে ভালবাসারই মন। বুঝতে চেষ্টা না করে, আর ভুলে থাকতে চেষ্টা করে, কিংবা লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে কি এই ছাই অদ্ভুত মনের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায়? যায় না, যাবেও না। একটা মামলার আদালত যদি এখনই এসে শুক্তির গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়ে বলে যে, মরবার আগে সত্যি কথাটা স্বীকার করে যাও, তবে তো বলতেই হবে, হ্যাঁ, এখনও আপত্তি নেই। শ্যামলবাবুর জন্মদিনে একটা ফুলের তোড়া পাঠাতে, আর অনিমেষবাবুর সঙ্গে বিলের জলের নীলপদ্ম দেখতে যেতে একটুও খারাপ লাগবে না।

দোতলার বারান্দার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মণিমালা ডাকলেন—আর দেরি করো না, শুক্তি। এবার চলে এসো।

এ ছাড়া মণিমালার মনের মায়াটার যে আর কোনও কাজও নেই। আশা করবার কিছু নেই, শুক্তিকে শুধু যত্ন করে আর সাবধানে আগলে রাখতে হবে, যতদিন এখানে থাকতে চাইবে ওর মন।

সব চেয়ে কষ্ট হয় তখন, যখন বুঝতে পারেন মণিমালা, কিরণদিকে আর লিখে জানাবার মত কিছু নেই। আর কিছু লেখবার দরকারও হয় না। কিরণদি এবার তাঁর মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই সব বুঝে নিতে পারবেন। তবু কষ্ট হয় বইকি। গগনবাবুর কথা ভেবেও কষ্ট হয়। কিরণদিরও যে বার বার শুধু এই কথাটাই মনে হবে, শুক্তিকে নিজের মেয়ের মত মনে করে যে-দুটি মানুষ শুক্তির ভাল করতে চেয়েছিল, তাদের আর কিছুই চেষ্টা করবার রইল না। শুক্তিই তাদের চেষ্টার হাত ভেঙে দিয়েছে। কিরণদির এই বয়সের জীবনে এটা কি একটা কঠিন আঘাত হয়ে বাজবে না?

কলম হাতে তুলে নিয়েও কিছু লিখতে পারেন না মণিমালা, একটিও কথা না লিখেও হাতটা যেন ক্লান্ত হয়ে যায়। তবু লিখে ফেললেন—আমি আর কিছু লিখতে পারছি না, কিরণদি। কিছু মনে করো না। তুমি শুক্তিকে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নিও।

ভাঁজ করা চিঠিটাকে খামে বন্ধ করতে গিয়ে আবার একটু ভাবেন মণিমালা। তারপর চিঠির ভাঁজ খুলে আবার লিখতে থাকেন।—না, চিন্তে করবার কিছু নেই, কিরণদি! শুক্তির শরীর এখন বেশ ভাল আছে। আরও ভাল হবে। আরও কিছুদিন, অন্তত পরীক্ষার ফল বের হওয়া পর্যন্ত শুক্তি আমার কাছেই থাকুক।

নেফার পাহাড়ের মাথায় মাঝে মাঝে কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। এক-আধ পশলা বৃষ্টি আশা করছে তপ্ত শহর তেজপুর। শুক্তিও আশা করে; আর দেরি নেই বোধ হয়, এইবার পরীক্ষার ফল বের হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর?

শুক্তি বলে—তারপর আর দেরি করো না। মণিমাসি; মা'র চিঠি আমাকে যেতে বলুক আর না বলুক, তোমার ইচ্ছে হোক বা না হোক, আমাকে কদমবাড়ি পাঠিয়ে দিও।

মণিমাসি—তাই হবে গো মেয়ে। আমি তো একটা মাসি মাত্র, ইচ্ছে থাকলেও কত আর ধরে রাখতে পারব।

সেদিনই কলকাতা থেকে সুমিত্রা সরকারের একটা চিঠি পেলেন মণিমালা,—শুক্তিকে বলবেন, আর সাতদিন পরে পরীক্ষার ফল বের হবে।

—তবে আর কী? মাসির বকা-ঝকা থেকে রেহাই পেয়ে আর সাতদিন পরেই হাঁপ ছাড়বি, শুক্তি।

শুক্তি হাসতে চেষ্টা করে।—তুমি ওরকম করে মিথ্যে কথা বলো না, মণিমাসি। তুমি আবার কবে আমাকে বকা-ঝকা করলে?

মণিমাসির চোখ ছলছল করে। —করেছি বইকি। তুই হয়ত রাগও করেছিস, কিন্তু...।

শুক্তি হাসে। —এইবার কিন্তু আমি সত্যিই রাগ করব, যদিও আগে কখনও রাগ করিনি।

মণিমাসি—তোকে চলে যেতে দিতে সত্যিই আমার একটুও ভাল লাগছে না।

শুক্তি—কী আশ্চর্য, আমি যেন আর তোমার কাছে আসবই না, তুমি এরকম একটা মিথ্যে ধারণা করে যা-খুশি-তাই ভাবছ।

মণিমাসি—না না, কিছু ভাবছি না। ষাট, আসবি বইকি ; যখন ইচ্ছে হয় তখনই চলে আসবি। তবে...।

শুক্তি—কী ?

মণিমাসি—তবে, পরীক্ষার ফল বের হবার পর আরও পাঁচ-দশটা দিন তোকে এখানে আটকে রাখলে কিরণদি কিছু মনে করবেন না বোধ হয়।

শুক্তি হাসে। —সেটা তুমি জান, আর তোমার দিদি জানে।

কিন্তু পরের দিন সকালবেলা মণিমাসির মনের এই মায়ার বিলাপ যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে, জব্দ হয়ে যায়, আর বোবা হয়ে ছটফট করে। এখনই শুক্তির কাছে ছুটে গিয়ে বলে দিতে ইচ্ছে করে, না, তোর এখন আর এখানে থাকতে হবে না, থেকে কাজ নেই, থেকে লাভ কী, থাকা উচিত নয়, তুই আজই কদমবাড়ি চলে যা।

বলে দিতে ইচ্ছে করলেই কি বলতে পারা যাবে ? শুক্তি কি একটু আশ্চর্য হয়ে যাবে না ? তারপর হঠাৎ যদি মেয়েটা মুখ খুলে বলেই দেয়—তুমি যেন তোমার মান বাঁচাবার জন্যে সাবধান হয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছ, মণিমাসি ; তবে সে কথাটা সহ্য করবেনই বা কেমন করে ? কিন্তু সেটা তো খুব-একটা মিথ্যে কথা হবে না।

সোম লজের মালী এসে মণিমালাকে খবর দিয়েছে ; মা আপনাকে বলতে বললেন, শিলিগুড়ি থেকে দাদাবাবু কাল এখানে এসে পৌঁছবেন।

তারপর ? তারপর যা হবে সেটা কল্পনা করতেও অসুবিধে নেই। অনিমেষ নিজেই এখানে আসবে। শুক্তির সঙ্গে কথা বলবে। শুক্তি কথা বলবে। যেকথা আর যেমন কথাই হোক না কেন, সেসব কথার তো কোনও মানে হতে পারে না। দেখতে ও শুনতে বড় জোর একটা ভাল থিয়েটারের মত লাগবে, এই মাত্র। অনিমেষ তেজপুরে পৌঁছবার আগেই শুক্তির কদমবাড়ি চলে যাওয়া ভাল।

কিন্তু সে কথা বলতে হলে যে মণিমালার বুকের ভিতরে একটা লজ্জা মাথা খুঁড়ে মরতে চাইবে। জীবনে কোনওদিন শুক্তিকে একথা বলবার দুর্ভাগ্য হয়নি মণিমালার, তুই এবার চলে যা, শুক্তি। আজ কি সেই ভয়ানক নিষ্ঠুর কথাটা বলতে হবে ?

দেখতে পাননি মণিমালা, শুক্তি কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে। মণিমালার গলার স্বর ছটফট করে। —কী শুক্তি ? কী বলছিস, লক্ষ্মী মা ?

শুক্তি—পরীক্ষার ফল তো আর ছ'দিন পরে বের হবেই, সবাই জানতেও পারবে।

মণিমাসি—হ্যাঁ।

শুক্তি—কিন্তু আমি তার আগেই কদমবাড়ি চলে যাই না কেন ? পরীক্ষার ফল জানবার জন্যে আমায় আর এখানে না থাকলেও তো কিছু আসে যায় না ?

মণিমাসি—যেতে চাস ?

শুক্তি—হ্যাঁ। রাজবাহাদুর কোথায় ?

মণিমাসি—কেন ?

শুক্তি—আমি আজই কদমবাড়ি যাব। রাজবাহাদুরকে গাড়ি বের করতে বলো।

মণিমাসি—এখনই রওনা হতে চাস নাকি ?

শুক্তি—হ্যাঁ।

কদমবাড়ির চা-কলমের গায়ে কচি পাতা ধরেছে। নেফার পাহাড়ের মেঘ বার বার অনেকবার ভেসে এসেছে আর গুঁড়ো বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে। আবার রোদ উঠেছে। আষাঢ়ের এই ফাঁকা চেহারা যে আর বেশিদিন থাকবে না, তারই আভাস দিয়ে কদমবাড়ির আকাশে ঘোর মেঘলা আবেশও মাঝে মাঝে কাল হয়ে ওঠে।

বুলডগ মহারাজা কতবার শুক্তির কাছে এসে ছুটোছুটির হাতছানি দেখবার জন্যে ছটফট করে, শুক্তির শাড়ির আঁচল কামড়ে ধরে টানাটানিও করে। কিন্তু সাহেবকুঠির মেয়ে শুক্তি শুধু চুপ করে বসে থাকে। কখনও বারান্দার এককোণের একটি মেহগনির চেয়ারে, কখনও লনের পাশে কংক্রিটের ছোট বেদিটার উপরে, কিংবা পুরনো পিলখানার সামনে বকুলের ছায়ার কাছে রাখা পদ্মকাটা পাথরটার উপর, যেটাকে পঞ্চাশ বছর আগে পাব্লিক ওয়ার্কসের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রবার্টসন ভালুকপংয়ের কাছাকাছি পুরাকালের একটা প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে কুড়িয়ে আর হাতি দিয়ে টানিয়ে এনে এখানে রেখেছিলেন।

কিরণলেখা বলেন—তোকে একটা কথা একটু বুঝিয়ে বলবার ছিল শুক্তি।

শুক্তি—বলো।

কিরণলেখা—বলবই তো, কিন্তু এটা কী ? তোমার নতুন শখ, না নতুন বাতিক ?

শুক্তি—কী ?

কিরণলেখা—তোমার গায়ের এই শাড়ি ? একেবারে সাদা একটা গরদ।

নেহাতই সাদা একটা গরদ, পাড়ও নেই। এ যেন এই বয়সের জীবনের সব রঙ ধুয়ে-মুছে একেবারে একলা হয়ে থাকবার একটা ইচ্ছার সাজ। লনের এক পাশে সবুজ ঘাসের উপর মিথ্যা ও শান্ত একটি সাদা অস্তিত্ব হয়ে বসে আছে শুক্তি। শুক্তিকে দেখতে তো একটুও খারাপ দেখায় না ; তবু কিরণলেখার দেখতে ভাল লাগে না। চোখে পড়তেই তাঁর চোখের চশমার কাচ বেশ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে ; তাই এগিয়ে এসেছেন আর প্রশ্ন কবেছেন।

শুক্তি হাসে।—খারাপ দেখাচ্ছে ?

কিরণলেখা—না, খারাপ দেখাবে কেন ? কিন্তু ভাল দেখাচ্ছে না।

শুক্তি—আমি তো ভাল দেখাবার জন্যে সাদা গরদ পরিনি।

কিরণলেখা—তবে কেন পরেছিস ?

শুক্তি—ভাল লাগল, তাই পরেছি।

আর কথা না বাড়িয়ে, শুধু শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে মনের প্রশ্নটাকে মনের মধ্যেই চেপে রাখেন কিরণলেখা। বলতে ইচ্ছে করে, আজ হঠাৎ তোমার কেন ভাল লাগছে এই সাদা সাজ ? কী এমন ব্যাপার হল যে, এত শান্ত হয়ে বসে থাকতে হবে ? কিসের এত ক্লান্তি যে, এত কম কথা বলতে হবে ? সবই যে নতুন বাতিক বলে মনে হয়।

কিরণলেখার চোখে চশমার কাচ ঝাপসা হবেই বা না কেন ? বেণী নেই, মস্ত বড় একটা খোঁপা, তার উপর এই সাদা গরদ ; এ যেন অন্য একটা মেয়ে, শুধু মুখটা শুক্তির মত। একটা বছরও পার হয়নি, এত হাসি-খুশি আর এত দুরন্ত মেয়েটাকে কে যেন মনে-প্রাণে আর চেহারাতেও একেবারে অন্যরকম করে সাজিয়ে কদমবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মাঝে অবশ্য একটি দিন, যেদিন শুক্তির পাসের খবরটা নিয়ে কলকাতা থেকে সুমিত্রার চিঠি এল, সেদিন খুব খুশি হয়ে হেসেছিল শুক্তি।—আঃ, আমার কী ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন কেটে গেল, মা।

—কী বললি ?

—তিনটে মাস ধরে সমস্তক্ষণ ভয়-ভয় করেছে ; শুধু মনে হয়েছে, ফেল করলে বড় পিসির মনে কী কষ্টই না হবে।

গগন বসুও না হেসে থাকতে পারেননি—সুমির কাছে থাকলে কারও কি লেখাপড়া না শেখবার সাধ্যি আছে ?

কিরণলেখাও খুশি হয়ে হাসেন। —আসল কথা হল শুক্তির ভাগ্য। শুক্তিকে একটু হিংসে করলে মন্দ হয় না।

গগন বসু—কেন বল তো ?

কিরণলেখা—সুমিত্রার মত পিসি আর মণিমালার মত মাসি থাকতে শুক্তির আর ভাবনা কিসের ? পিসির যত্নে বি-এ পাস করা হল, আর মাসির যত্নে রোগা চেহারা দু'মাসেই ভাল হয়ে গেল।

গগন বসু—ঠিক কথা। শুক্তির মণিমাসির স্নেহচ্ছায়ায় থাকলে কি কারও রোগা হয়ে থাকবার সাধ্যি আছে ?

কিরণলেখা—ঠাট্টা করছ কেন ? মণি বেচারা এমন কিছু মোটা নয়।

কদমবাড়ির সাহেবকুঠির জীবনে সুখী কলরবের সেই দিনটির পর পুরো ত্রিশটা দিন পার হয়ে গেলেও কিরণলেখা কিন্তু এখনও শুক্তির কাছে সেই কথাটা আজও বলতে পারেননি, যেকথা শুক্তির জীবনের একটি সুখী উৎসবের ইচ্ছার কথা।

বলতে গিয়েও অনেকবার কুণ্ঠিত হয়ে চুপ করে গিয়েছেন কিরণলেখা। শুক্তির চোখ দুটো যেন দুটো চোখ মাত্র, তার মধ্যে কোনও ভাবনা আর কল্পনার চঞ্চলতা নেই। দুরন্তপনার সেই ছটফটে মেয়ের এত শান্তপনা দেখতে একটুও ভাল লাগে না কিরণলেখার। সুমিত্রার আর মণিমালার চিঠির অমন শুকনো হতাশ-উদাস ভাষাও ভাল লাগেনি। কিরণলেখার শুধু মনে হয়েছে, আর মনে হতেই বেশ একটু আশ্চর্যও হয়েছেন যে, সবাই যেন চোখের ভুলে মিথ্যে একটা কালোছায়া দেখে ভয় পেয়েছে আর গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। না, মোটেই না ; সাদা গরদ পরতে ভাল লাগবে শুক্তির, এমন কোনও অপরাধ করেনি শুক্তির মন।

তাই কিরণলেখা যেন একটা সুখী লগ্নের অপেক্ষায় আছেন। বোধ হয় কামনা করেন কিরণলেখা, রাতের আকাশের মেঘ হঠাৎ একটু ভেঙে যাক, মুখঢাকা চাঁদটা একবার ঝিক করে হেসে উঠুক, কদমবাড়ি অন্ধকারের গায়ে একটু জ্যোৎস্না ঝরে পড়ুক, আর সাহেবকুঠির বারান্দার কোচের উপর বসে হঠাৎ গুনগুন করে গান গেয়ে ফেলুক শুক্তি ; তখনই শুক্তির কাছে গিয়ে বসে আর হেসে-হেসে কথাটা তুলতে পারবেন কিরণলেখা। বলে দিতে পারবেন, না, তোমার এত গম্ভীর হয়ে যাওয়ার মত কিছুই হয়নি। এরকম হয়েই থাকে ! ওটা একটা সমস্যাই নয় ; কোনও গিঁট নয়, কাঁটা নয়, ময়লা ধুলোও নয়।

আজ থাক তবে। আজ এখন এই লনের ঘাসের উপর চুপ করে বসে থাকুক শুক্তি। যদিও বিকেল ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু এমনই একটা ঘন মেঘলার দিন যে, পশ্চিমের আকাশে একটা লালচে আভার রেখাও ফুটে উঠতে পারেনি। আজ এ সময় কথাটা তুলতে গেলে শুক্তির চোখ দুটোও বোধ হয় ভয় পেয়ে মেঘলা হয়ে যাবে, মুখ ফিরিয়ে নেবে, হয়ত কোনও কথাই বলবে না।

সন্ধ্যা হতেই সাহেবকুঠির সব ঘরে যখন আলো জ্বলতে শুরু করে, তখন বারান্দার চেয়ারে বসে অফিসের হিসাবের খাতায় সই করেন গগন বসু। তারপর পাইপ ধরান। তারপর খবরের কাগজটাকে তুলে নেন।

বৃষ্টি নেই, শুধু ফুরফুরে হাওয়া। সাহেবকুঠির একটি ঘরের রঙিন কাপড়ের পর্দা ফুলে-ফেঁপে কাঁপতে থাকে। সে ঘরের বিছানার উপর বসে আর কোলের উপর একটা বই রেখে আনমনার মত কী-যেন দেখতে থাকে শুক্তি। তারপর কী-যেন শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে।

গগনবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন কুমুদ ডাক্তার। গগন বসু হাসছেন—তা আপনি আর কী করবেন ? আপনিও ওইরকম দু-একটা কথা বলে ভদ্রমহিলাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে রাখুন।

কুমুদ ডাক্তার—তা তো বলছিই ; সব সময় বলছি ; কিন্তু মানতে কি চায় ? মুনসি চাপরাশি দফাদার কামদার সরদার, যাকে দেখতে পাবে, তাকেই ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, হ্যাঁ গো, বুমলা জায়গাটা কোথায় ? এখান থেকে কত দূর ? এবেলা গিয়ে ওবেলা ফিরে আসতে পারব তো ?

গগন বসু—ওরা কী জবাব দেয় ?

কুমুদ ডাক্তার হাসেন। —আমি ওদের সবাইকে যা শিখিয়ে দিয়েছি, তাই ওরা বলে দেয়। ওই তো ওখানে, চারদুয়ারের কাছে বুমলা। মুড়ি-মুড়কি আর কইমাছ, সব কিছুই সেখানে পাওয়া যায়।

তবে, এখন সেখানে যেতে অসুবিধা আছে। পথের উপর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, কাউকে যেতে দেয় না।

গগন বসু—সুজিতের চিঠি-পত্র পাচ্ছেন ?

কুমুদ ডাক্তার—পাচ্ছি। কিন্তু সে সব চিঠি লুকিয়ে রাখতে হয়।

গগন বসু—কেন ?

কুমুদ ডাক্তার—না লুকিয়ে উপায় কী ? সুজিতের কাকিমার হাতে সে চিঠি পড়লে কি তার আর বুঝে ফেলতে কিছু বাকি থাকবে ?

গগন বসু—কী লেখে সুজিত ?

কুমুদ ডাক্তার—আমি ভাল আছি, শুধু এই একটি কথা লিখলেই তো কোনও গোলমালের ভয় থাকত না। কিন্তু হেন তেন অনেক আজে-বাজে কথা লেখে।

গগন বসু—আজে-বাজে কথা ?

কুমুদ ডাক্তার—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার, যেন কোনও প্রাণের বন্ধুকে খবর জানাতে চাইছে, সেইরকমের যত সব কথা। খুব ভাল জায়গা বুমলা। খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর ওদের পোস্ট। মাসে একবার করে হেলিকপটর উড়ে এসে ওদের চাল-ডালের বস্তা ড্রপ করে দিয়ে চলে যায়। রাত্রিবেলায় পাহারার সময় মাথার লোহার টুপির ওপর এক ইঞ্চি পুরু বরফ জমে যায়। খবর পাওয়া গিয়েছে, চিনারা আমাদের সীমানার লাইনের কাছে ঘুরঘুর করছে।

খবরের কাগজটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গগন বসু বলেন। —হ্যাঁ, আজ দেখছি, কাগজেও একথা বলছে।

কুমুদ ডাক্তার—একদিন পেট্রলে বের হয়ে হঠাৎ একটা কস্তুরি হরিণ দেখতে পেয়েছিল সুজিত। কিন্তু ধরতে পারেনি।

গগন বসু—হ্যাঁ, শুনেছি, তোয়াং-এর কাছে পাইনের জঙ্গলে কস্তুরি হরিণ পাওয়া যায়।

কুমুদ ডাক্তার—এখন বলুন স্যার, এসব কথা জানতে পেলে কি আর কিছু বুঝতে বাকি থাকবে ওর কাকিমার, বুমলা কোথায় ? মানুষটা একটু বোকা বটে, কিন্তু খুব বোকা তো নয়।

ফুরফুরে হাওয়াটা এতক্ষণে বেশ একটু উতলা হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের যত শিরীষ মাথা দোলাতে শুরু করেছে। শুক্তির ঘরে ঢুকে আর আয়নার তোয়ালাটাকে হাতে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন কিরণলেখা। কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন।

কিরণলেখা হাসেন। —তোর হাতে ওটা কিসের বই, শুক্তি ?

শুক্তি—এটা একটা বই...একটা গল্পের বই...না না, এটা একটা ছবির বই, এভারেস্টের ছবি।

যাই হোক, বইয়ের পাতায় এভারেস্টের ছবি যত সাদা হোক না কেন, শুক্তির মুখটা যে রঙিন হয়ে হাসছে। এগিয়ে এসে শুক্তির বিছানার উপর বসেন কিরণলেখা। —কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় শ্যামলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

শুক্তি—না।

কিরণলেখা—তেজপুর থেকে আসবার আগে অনিমেষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

শুক্তি—না।

কিরণলেখা—কিন্তু তোর তো নিশ্চয় ইচ্ছে হয়েছিল, দু'জনের কেউ একজন এসে দেখা করুক।

শুক্তি—কী বললে ?

কিরণলেখা—শ্যামল হোক, কিংবা অনিমেষ হোক, যাকে দেখতে পেলে তোমার বেশি ভাল লাগে... ।

শুক্তি—না না, এসব কথা বলো না। আমি তোমার কথার কোনও মানে বুঝতে পারছি-না, পারবও না।

কিরণলেখা—তা হয় না শুক্তি।

শুক্তি—কী হয় না ?

কিরণলেখা—দু'জন কখনও সমান হয় না। আর, দুজনকে কখনও সমান ভাল লাগে না।

শুক্তির মাথাটা ঝুঁকে পড়ে যেন সাদা এভারেস্টের ছবির মধ্যে লুকিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু কিরণলেখা আজ বোধ হয় শুক্তির প্রাণেরই হেঁট-মাথা ভঙ্গিটাকে একেবারে মিথ্যে করে দেবার জন্য তৈরি হয়েছেন। কিরণলেখা বলেন—লজ্জা করবার কিছুই নেই, শুক্তি। দু'জনের সঙ্গে চেনাশোনা হয়েছে, দু'জনকে ভাল লেগেছে, ভালই হয়েছে। ওতে কিছু আসে যায় না। ওরকম হয়েই থাকে। কিন্তু...।

শুক্তির আরও কাছে এগিয়ে এসে, শুক্তির মাথায় হাত রেখে কিরণলেখা বলেন—শুধু একটু বুঝে নিতে হয়, কাকে বেশি বেশ লাগে। এই যে তোমার বাণীকাকিমা, সে মেয়ে কী করেছিল, শুনবে? দু জায়গা থেকে বাণীর বিয়ের কথা এসেছিল। দু'জনেই ভাল ছেলে। কিন্তু বাণী বলেছিল, প্রণব বসুকে বেশি ভাল বলে মনে হয়। কাজেই তোমার প্রণবকাকার সঙ্গে বাণীর বিয়ে হয়ে গেল।

কিরণলেখার মুখের দিকে দুই চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকে শুক্তি। শুক্তির মাথায় হাত বুলিয়ে কিরণলেখা বলতে থাকেন—তোমার অসুবিধে তোমার বাণীকাকিমার অসুবিধের চেয়ে একটুও কঠিন কিছু নয়। ওই দুই ছেলের কারও সঙ্গে বাণীর চেনা-শোনা ছিল না, আর তোমার সঙ্গে দুজনের চেনা-শোনা হয়েছে, এই তো তফাত। তোমার তো বরং ভেবে নিতে ভুল হবার ভয় আরও কম, কাকে বেশি ভাল লাগে।

শুক্তি—তুমি এবার চুপ করো।

কিরণলেখা—চুপ করছি। কিন্তু বলবি তো? বলিস লক্ষ্মী, আমার কাছে বলতে তো কোনও লজ্জা নেই।

শুক্তি—বলব।

কিরণলেখা—কিন্তু বেশি দেরি করো না যেন। সুমিত্রা আর মণিকে একটু তাড়াতাড়ি চিঠি দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিলেই ভাল; ওরাও তো ভাবছে।

চলে গেলেন কিরণলেখা। শুক্তির মনের ভিতরে যেন একটা দীপের আলো জ্বেলে দিয়ে চলে গেলেন। তা না হলে শুক্তির চোখে এমন একটা জ্বলজ্বলে হাসি এতক্ষণ ধরে ফুটে থাকতে পারত না। এই কয়েকটা মাস নিজেকে একটা ভুলের অন্ধকার বলে বিশ্বাস করে যে লজ্জা পেয়েছে শুক্তি, সে লজ্জা যে একটা মিথ্যা ভয়ের অন্ধকার। মা'র কথাগুলি কত স্পষ্ট। কিন্তু এত স্পষ্ট করে বলে দিতে পারলেন বলেই তো শুক্তির মন এমন একটা সান্ত্বনা পেয়ে গেল। চেনা-আকাশে শুধু দুটো তারা; শুক্তিকে শুধু একবার বলে দিতে হবে, কাকে বেশি বেশ লাগে। তা তো বলতেই হবে। অন্তত মা'র কাছে বলে দিতে কোনও লজ্জা নেই।

কিন্তু মাঝরাতের ঘুম হঠাৎ ভেঙে যাবার পর আর ঘুম আসে না যখন, ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাওয়া যায় না যখন, তখন ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারে শুক্তি, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ভালবাসার আশাটা কাকে বেশি খোঁজে আর কাকে কম; হিসেব করতে গেলে সবই এলোমেলো হয়ে যায়। সন্দেহ হয়, সবই মিথ্যে। শুক্তির জীবনের আকাশে ওরা দুজন দুটো তারাই নয়।

কিন্তু অস্বীকার করবার যে সাধ্যি নেই। নীলপদ্মের গল্প শুনতে কি ভাল লাগেনি? কৃষ্ণার হাত দিয়ে ফুলের তোড়া পাঠাতে গিয়ে মনটা কি খুশিতে ভরে যায়নি? শুক্তির ঘুম-ভাঙা চোখের মত শুক্তির চিন্তার সব যুক্তি-বুদ্ধিগুলিও শুধু ছটফট করে; কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারে না। এখন যদি শেষরাতের ঘুমটা হঠাৎ একটা স্বপ্ন এনে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে, কাকে বেশি ভাল লাগে। কিন্তু স্বপ্নের দোহাই দিয়ে তো জবাব দেবার দায় থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। বলতেই হবে। ছি ছি, তবে কি লটারি করে ঠিক করতে হবে?

ধড়ফড় করে উঠে বসে শুক্তি। সাহেবকুঠির বারান্দায় যেন অনেকগুলি ছটফটে পায়ের শব্দ ঘোরাঘুরি করছে। টর্চের আলো জ্বলছে আর নিবছে।

শুনতে পাওয়া যায়, কথা বলছে মালী হরদেও, কথা বলছে দারোয়ান কপিলরাম। কথা বলছেন গগন বসু আর কিরণলেখা। শুক্তিও আশ্চর্য হয়ে আর ব্যস্তভাবে ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দার এই সন্দেহের জটলার এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে।

দারোয়ান কপিলরামের সন্দেহ ; অনেকক্ষণ ধরে যে অদ্ভুত একটা ছায়া ঘুরঘুর করছিল পুরনো গ্যারাজের কাছে, সেটা এখন গ্যারেজের ভিতরে ঢুকেছে।

মালী হরদেও বলে—বন্দুকের আওয়াজ করুন, তা হলেই বের হয়ে আসবে।

কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ করতে হয়নি। একজন মানুষ হাসতে হাসতে পুরনো গ্যারেজের খালি ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এল। দারোয়ান কপিলরাম চেঁচিয়ে ওঠে।—মামাবাবু!

সত্যিই দুলাল দত্ত, শুক্তির দুলাল মামা এসেছেন। সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন দুলাল দত্ত।—সঙ্গে আমার একজন বন্ধুও এসেছেন কিনা, তাই তাঁকে পুরনো গ্যারেজের ওই খালি ঘরের ভিতরে রেখে এলাম।

গগন বসু—আপনার বন্ধু ?

দুলাল দত্ত—ইয়েস স্যার।

কিরণলেখা উদ্বিগ্ন স্বরে কথা বলেন।—বন্ধুকে ওখানে কেন রেখে এলেন মেজদা ? আপনার কথা তো কিছু বুঝতে পারছি না। এত রাত্রে আপনি এলেনই বা কোথা থেকে ?

দুললা দত্ত—নেফা থেকে। আমার আশ্রম থেকে। তা ছাড়া আবার কোথা থেকে ? কিন্তু তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না কিরণ, আমার বন্ধু চা খান না।

কিরণলেখার কাছে এগিয়ে এসে চাপা-স্বরে কথা বলেন গগন বসু।—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, কিরণ। তোমার মেজদার মেজাজ স্বাভাবিক নয়।

কিরণলেখা—আপনি এখন বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন, মেজদা।

দুললা দত্ত—নিশ্চয়।

কিন্তু বারান্দার একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন দুলাল দত্ত। তারপর খুব জোরে একটা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে নিয়ে হাসতে থাকেন।—ব্যাপারটা কী জানেন, গগনদা ? আমি একজন অবাঞ্ছিত, একজন আন-ডিজায়ারেবল। নেফা সরকার আমাকে নোটিস দিয়ে সাতদিনের মধ্যে নেফা ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। আমিও কলা দেখিয়ে তিনদিনের মধ্যে নেফা ছেড়ে বের হয়ে এসেছি। আর যাব না ; ডেকে ডেকে মরে গেলেও, পায়ে ধরে সাধলেও যাব না।

গগন বসু—হঠাৎ এরকম একটা নোটিস কেন ?

দুলাল দত্ত—ওই তো, ওরা ঠিক ধরে ফেলেছে, আমি একটা বাইরের মতলবের লোক ; ট্রাইবাল বেচারাদের খাঁটি ধর্ম নোংরা করে দিচ্ছি। ওদের ঘরে ঘরে যত কেষ্ট বিষ্টুর ছবি বিলিয়েছি। বাস, আর কি রক্ষে আছে ? ভাগো অবাঞ্ছিত, জলদি ভাগো।

কিরণলেখা মিনতি করে বলেন—মেজদা, আপনি এখন চুপ করে ওঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। যাও হরদেও, মামাবাবুকো বাত্তি দেখা কর লে যাও।

কিন্তু চেয়ার থেকে নড়েন না দুলাল দত্ত। এদিকে ওদিকে তাকান আর বিড়বিড় করেন। কী ভয়ানক শূন্য উদাস আর ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে দুলাল দত্তের দুই চোখ।

—উঠুন মেজদা। কিরণলেখা আবার অনুরোধ করেন।

দুলাল দত্ত—তোমাদের এখানে ভাল গিরগিটি পাওয়া যায় ?...নাঃ, আমি জানি পাওয়া যাবে না। আচ্ছা, গুডনাইট। আমি চললাম কিরণ।

উঠে গিয়ে পুরনো গ্যারেজের সেই খালি ঘরের ভিতরে ঢুকলেন দুলাল দত্ত, যেখানে কিছুক্ষণ আগে তাঁর রহস্যময় এক বন্ধুকে রেখে এসেছেন।

কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে বেশ দেরি করছেন দুলাল দত্ত। গগন বসু এইবার উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন—কপিলরাম, তুমি গিয়ে দেখ একবার, কী করছেন মামাবাবু। আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে।

এগিয়ে যেয়ে, ঘরের ভিতরে টর্চের আলো ফেলেই আতঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কপিলরাম—খুন হুয়া হুজুর!

দুলাল দত্তের রোগা ছিপছিপে চেহারাটা অদ্ভুত কঠোর ও গম্ভীর একটা মূর্তি হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। হাতে একটা দা, কাদামাখা প্যান্টালুনে রক্তের দাগ, হাতেও ফোঁটা ফোঁটা

রক্তের ছিটে। আর, ঘরের ভিতরে রক্তমাখা একটা বস্তার ভিতর থেকে একটা মস্তবড় চন্দ্রবোড়া সাপের গলাকাটা ধড় অর্ধেক বের হয়ে রয়েছে।

হাতের দা'টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর বেশ শান্ত স্বরে মালী হরদেওয়ের কাছে জল চাইলেন দুলাল দত্ত। হাত ধুয়ে নিয়ে বললেন—ওটা এতদিন আমার কাছে ছিল। যেখানেই যাক না কেন, ফিরে এসে আমার চং-এর নীচে একটা গর্তের ঘাসের ভিতরে শুয়ে থাকত। ওর চামড়া দিয়ে বেশ ভাল জুতো হবে, জান তো হরদেও ?

আবার কিছুক্ষণ বিড়বিড় করলেন দুলাল দত্ত। তারপর সাহেবকুঠির ফটকের দিকে এগিয়ে চললেন। কপিলরাম ডাকে—মামাবাবু, শুনিয়ে !

কিন্তু কোনও জবাব না দিয়ে চলে গেলেন দুলাল দত্ত।

সাহেবকুঠির বারান্দায় আলোটা দপ দপ করে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন গগন বসু আর কিরণলেখা। কথা বলতে গিয়ে শুক্তির গলার স্বর শিউরে ওঠে।—আমার যে খুব ভয় করছে, মা।

কিরণলেখা বলেন—না, ভয় কিসের ?

গগনবাবু বলেন—ভোর হয়ে এল বোধ হয়।

॥ ১৬ ॥

এটা আবার কিসের ভয় ? কী রকমের ভয় ? বুঝতে পারলে হয়ত এই ভয় ভেঙে যেত। মনে হয়, তেজপুরের মণিমাসির বাড়ির কালোর মা'র মনটাও বোধ হয় ঠিক এই রকম ভয় পায় ; একটা অলুক্ষণে সংকেত দেখবার ভয়। ভয়টা তখনই মনের ভিতরে ছমছম করে, মাঝরাতে যখন ঝুর-ঝুর বৃষ্টি শুরু হয়, আর ঘুম ভেঙে যায়।

মনে পড়ে, ছাদের উপরে জপের মালা হাতে নিয়ে এক-একদিন নিজের মনে কী সব অদ্ভুত কথা বলতেন কালোর মা।—তুমি অবিচার করবে আমার ওপর ; কিন্তু আমার দুঃখ যে একদিন তোমার বিচার করবে। সেটা ভুলে যাও কেন ?

নতুন পাড়ার মীরা কাকিমার কাছে শুনেছিল শুক্তি, কালোর মা'র স্বামী কলকাতার স্কুলের মাস্টার ছিলেন। কলকাতাতে তাঁর একটা বাড়িও ছিল। মিথ্যে মামলা করে একদিন বিধবা কালোর মাকে স্বামীর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দিল তাঁরই সেই দেবর, যাকে তার ছেলেবেলার জীবনে কোলে বসিয়ে ভাত খাওয়াতেন কালোর মা। সে দেবরের এখন ভিখিরী-দশা ; ঠোঙা বেচে, জুয়া খেলে আর ফুটপাতে শুয়ে থাকে।

হঠাৎ শুক্তিকে দেখতে পেয়ে যেন একটু লজ্জিত হতেন কালোর মা।—তুমি এখন নীচে যাও দিদিমণি। অনেক রাত হয়েছে। আমার আবোল-তাবোল কথা শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।

শুক্তি—কিন্তু আপনি ছাদে উঠে আর এই রাতের বেলাতে এখানে বসে ওসব কথা রোজই বলেন কেন ?

কালোর মা—ভয় হয়, তাই বলি। চুপি-চুপি বলি। কাউকে শোনাবার জন্যে তো বলি না।

শুক্তি—সকলেই জানে, আমিও জানি ; আপনি আপনার সেই কবেকার কলকাতার ভয়ের কথা মনে করে এসব কথা বলেন। কিন্তু আর বলে লাভ কী ?

কালোর মা—শুধু কলকাতার কথা মনে করে নয় দিদিমণি, তোমাদের এই তেজপুরেরও যা-সব দেখছি আর শুনছি, মনে করলে ভয় হয় বইকি। যদি শুনতে চাও, তবে একটা গল্প বলতে পারি।

শুক্তি—বলুন !

কালোর মা—এক রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে চলেছেন। হঠাৎ কোথা থেকে একটা অতিক্ষুদ্র মৃগশাবক এসে রাজার পথের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলে, রাজপুত্র আমার মাকে হত্যা করে মাংস খেয়েছে। আমি এখনও ঘাস খেতে শিখিনি রাজা, মায়ের দুধই আমার বেঁচে থাকার সম্বল ছিল। এখন আমি বাঁচি কী করে ? আপনি বিচার করুন। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার বেঁচে থাকবারই দরকার নেই। রাজা তখুনি তরবারির এক কোপে মৃগশিশুর প্রাণসংহার করলেন। কিন্তু

শেষে কী হল শুনবে, দিদিমণি ?

—শুনব।

—শত্রুকে সংহার করবার জন্যে তরবারি তুলতে গিয়েই রাজা বুঝলেন, তরবারিটা যেন সাত-মণ পাথরের মত ভারী। তরবারি তুলতে পারলেন না রাজা, হাতটাই ভেঙে গেল। শত্রুরা হেসে হেসে রাজার মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে গেল।

শুক্তি হেসে ফেলে।—বুঝতে পারছি না, এটা কিসের গল্প বললেন, কালোর মা ?

কালোর মা—অবিচারের গল্প। রোজই ঠাকুরের কাছে এই ভয় নিবেদন করি আর বলি, অবিচার দূর করো ঠাকুর।

চুপ করে আবার মালা জপতে থাকেন কালোর মা।

আজ এখন এই কদমবাড়ির মাঝরাতের অবুঝ ভয়টাকে সহ্য করতে গিয়ে কালোর মা'কে মনে পড়ে, কালোর মা'র সব কথা আর সব গল্পও মনে পড়ে। তবু শুক্তির অবুঝ ভয়টা যেন ছায়া-ছায়া অস্বস্তির মত মনের আনাচে-কানাচে ঘুর-ঘুর করে, সরে যেতে চায় না।

সরে যায় তখন, শুক্তির ঘরে ঢুকে যখন আলো জ্বালেন কিরণলেখা।—শুক্তি, শুনছিস ?

—কী মা ?

—আমি জেগেই আছি। তুই ঘুমো।

এটা কিরণলেখার একটা নতুন অভ্যাস। সে রাতের সেই ভয়ানক বিদ্‌ঘুটে ব্যাপারের পর রোজই একবার মাঝরাতে উঠে এসে শুক্তির ঘরে ঢোকেন আর আলো জ্বালেন কিরণলেখা।

ভাদ্দুরে মেঘের শেষ ঝরানি ফুরিয়ে যেতে কতদিনই বা লাগে ? বেশিদিন লাগেওনি। একদিন মাঝরাতেও যখন ঝুরু-ঝুরু বৃষ্টির কোনও শব্দ আর শোনা গেল না, কদমবাড়ির চা-বাগানের উপর সিরসিরে শিহর ছড়িয়ে দিয়ে একটা উত্তুরে হাওয়া উড়ে চলে গেল, তখন শুক্তির বিছানার মাথার কাছের জানালার শার্সি একেবারে খুলে দিয়েই বলে উঠলেন কিরণলেখা—তারায় ছেয়ে আছে আকাশ। নেফার পাহাড়েও মেঘ নেই। শুক্তি ঘুমোচ্ছিস ?

আবার ঝলমলে আশ্বিনের দিন। ঘাসের শিশিরে সকালবেলার রোদ হেসে-হেসে চিক-মিক করে। উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে উড়ে উড়ে নেফার পাহাড়ের উপর দিয়ে নতুন হাঁসের ঝাঁক আসছে ; নামবে গিয়ে জিয়াভরলির জলে।

শুধু কদমবাড়ির আকাশে নয়, বোধ হয় আলিপুরে শুক্তির বড় পিসি, আর তেজপুরে শুক্তির মণিমাসির মনেও মেঘের গুমোট ভেঙে গিয়ে নতুন রোদের আলো হেসে উঠেছে ; তা না হলে কিরণলেখার কাছে ওরকম খুশি ভাষার দুটো চিঠি তাঁরা লিখতে পারতেন না।

সুমিত্রা লিখেছেন—আপনি আমার মনের খুব খারাপ একটা ভুল ভেঙে দিয়েছেন, কিরণ বউদি। এখন ভাবতে বেশ লজ্জাও হচ্ছে! নিজের পছন্দমত কিছু না হলেই আমরা মনে করে বসি যে, সংসারটা বুঝি ভুল করছে। আপনি শুক্তিকে যা বলেছেন, তার চেয়ে ঢের ভাল কথা ও সত্য কথা আর কিছু হতে পারে না।

মণিমালা লিখেছেন—তোমার চিঠি আমার মিথ্যে দুশ্চিন্তার সব কষ্ট দূর করে দিয়েছে। তুমি বুঝিয়ে দিলে বলেই তো বুঝলাম কিরণদি ; তা না হলে আমার মূর্খ মন কোনওদিনও বোধ হয় বুঝত না যে, ভুল করে মেয়েটাকে কত ভুল কথাই না শুনিয়েছি। শুক্তিকে দেখতে যে খুব ইচ্ছে করছে। খুব অন্যায় করেছি! ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি শুক্তিকে যে কথা বলেছ, সেটাই তো খাঁটি কথা।

এরই মধ্যে কবে, সারাদিনের ঝলমলে রোদের ছোঁয়া পেয়ে শুক্তির সাজের চেহারা বদলে গিয়ে আবার রঙিন হয়ে গেল, সেটা শুক্তিও ঠিক হিসেব করে বলতে পারবে না। গায়ে আবার ফিকে-নীল তাঁতের শাড়ি, কাঁধের উপর আলগা হয়ে পড়ে আছে আর ঝুলছে কচি-সবুজ রঙের একটা হালকা উলের জামা। সাহেবকুঠির শিউলি গাছের ডাল নাড়া দিয়ে ফুল ঝরাতে গিয়ে শুক্তির হাতের উপর ফুলের সঙ্গে গাছের পাতার শিশির-জলও ঝরে পড়ে। শুক্তির চোখের তারাও কেঁপে কেঁপে হাসে। তবে কি এইবার শেষ কথাটা বলে দেবার জন্যে তৈরি হয়ে শুক্তির মন হাসতে শুরু করেছে ? তাই

তো মনে হয় কিরণলেখার। তাই জিজ্ঞাসা করতেও আর বেশি দেরি করেন না। —আর তো বেশি দেরি করা উচিত নয়, শুক্তি।

শুক্তি—কী ?

কিরণলেখা—কী বুঝলে আর কী ঠিক করলে, এবারে বলে দাও। লজ্জা করবার তো কিছু নেই।

শুক্তি কিন্তু বেশ লজ্জিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকায়। —পরে বলব।

কিরণলেখা—তা বলো। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি বলো। কী হল ? হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আবার কী ভাবতে শুরু করলে ?

শুক্তি—কিছু না।

কিরণলেখা—মনে হচ্ছে, বলতে খুব দেরি করবে ?

শুক্তি—না না, শিগগিরই বলব। দেরি হবে না।

কিরণলেখা চলে যাবার পর, সেই শিউলির ছায়ার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুক্তি যেন নিজেরই মনের যত এলোমেলো কথার শব্দ শুনতে থাকে। পিসেমশাইয়ের মক্কেলরা যেমন কৈফিয়ত দেবার জন্য সময় চেয়ে দরখাস্ত করে, শুক্তির প্রাণটাও যেন ঠিক সেরকম দরখাস্ত করে করে শুধু সময় চাইছে। এক-একবার মনে হয়, মা'কে এখনই স্পষ্ট করে একটা নাম বলে দিলেই তো হত, শ্যামলবাবু। চিন্তা করবার সব ঝঞ্ঝাট মিটে যেত। কিন্তু তখুনি লজ্জা পেয়ে চমকে উঠেছে শুক্তির মন, ছি-ছি, বোধ হয় একটা মিথ্যে কথাই বলে ফেলা হত। এরকম করে না বুঝে-সুঝে হঠাৎ অনিমেষের নাম করলে সেটাও যে একটা তাড়াহুড়ো মিথ্যের কথা হবে না, তারই বা ঠিক কি ?

বারান্দার সোফার উপর বসে থেকেই ডাক দিলেন গগনবাবু—ওখানে ওটা কিসের ভিড়, শুক্তি ? কিছু বুঝতে পারছিস ?

সাহেবকুঠি থেকে বেশ একটু দূরে, ম্যানেজার ব্যানার্জির বাংলোর সামনে একটা চালতে গাছের ছায়া যেখানে ছড়িয়ে আছে, সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, ভিড়টা যেন উৎকর্ণ হয়ে কিছু শুনছে।

শুক্তি আশ্চর্য হয়। —বুঝতে পারছি না বাবা। কিন্তু কপিলরাম কেন দৌড়ে দৌড়ে আসছে ?

কপিলরাম এসেই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলে। —নেফা পর হামলা শুরু হুয়া হুজুর। থাগলা'মে চিনালোগ আসাম রাইফেলকা চৌকি ঘির লিয়া।

গগনবাবু—কওন বোলা ?

কপিলরাম—রেডিও বোলতা হ্যায়, হুজুর।

সাতদিন হল কদমবাড়িতে খবরের কাগজ এসে পৌঁছয়নি। চারদুয়ারের কাগজওয়ালা বসন্তলাল, আট-দশদিনের কাগজ একসঙ্গে বাণ্ডিল করে হঠাৎ একদিন আগরওয়ালার ঠিকে-জঙ্গলের গাছ-কাটা সরকারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার তার নিয়ম। তা ছাড়া, সরকারি ডাকঘরের ছাপ নিয়ে যে কাগজটা আসে, সেটা খুব দ্রুতগতিতে এলেও পাঁচদিন দেরি না করে আসবে না।

লোখরা থেকে শুধু মেজর পি. বোসের একটি চিঠি এল। —বাণী এখন শান্তিপুরে তার পিত্রালয়ে আছে। আমিও এখন স্ট্যান্ড-বাই অবস্থায় আছি, বউদি। নেফার গোলমাল বেড়েছে। আরও ফোর্স পাঠাতে হচ্ছে। খুব ব্যস্ত আছি। তাই শুক্তিকে এখন আর লোখরাতে বেড়াতে আসতে বলব না।

লোখরার চিঠিটা পড়ে নিয়ে, আর গগনবাবুকেও একবার শুনিয়ে দিয়ে কিরণলেখা যখন শুক্তির ঘরে ঢুকলেন, তখন টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে শুক্তি। শুক্তির মাথার কাছে রেডিওটা তখন শুধু চাপা-স্বরে একটা গান গাইছে। থাগলার খবর অনেকক্ষণ হল শেষ হয়ে গিয়েছে।

—শুনছিস শুক্তি ?

চমকে জেগে ওঠে শুক্তি। —কী মা ?

—বাণী এখন লোখরাতে নেই।

—কোথায় তবে ?

—শান্তিপুরে।

শুক্তি হাসে। —এবার তা হলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি প্রণব কাকা।

কিন্তু ওরা আবার কারা, নতুন তিনজন আগন্তুক মানুষ, কপিলরাম যাদের পথ দেখিয়ে সাহেবকুঠির ফটকের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসছে ?

একজনের তো গায়ের খাকি পোষাক দেখেই বোঝা যায়, উনি একজন পুলিশ অফিসার। ঢিলে-ঢালা বুশশার্ট আর ঢলঢলে ট্রাউজার, আর-দুজনের একজনের হাতে একটা ফাইল, একজনের হাতে চুরুট। এরাও অফিসার বোধ হয়।

তিনজনেই সাহেবকুঠির বারান্দায় উঠে গগন বসুর কাছে একে একে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করেন।

—আমি মেহরা, সি আর পি।

—আমি মতিলাল, সি আই বি।

—আমি কলিতা, এস আই বি।

গগন বসু আশ্চর্য হয়ে বলেন—বসুন।

আশ্চর্য হবারই কথা। একজন নেফা-পুলিশ, একজন খাস সেন্টারের গোয়েন্দা পুলিশ, একজন সাবসিডিয়ারি গোয়েন্দা পুলিশ ; সাহেবকুঠির বারান্দায় একসঙ্গে এহেন তিন অফিসারের আবির্ভাব, একটা অভাবিত বিস্ময় বলেই তো মনে হবে।

নেফা-পুলিশ মেহরা তাঁর খাকি ক্যাপ তুলে মাথা চুলকিয়ে নিলেন। সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের মতিলাল ক্লান্তভাবে হাই তুলে নিলেন। আর এস-আই-বি'র কলিতা তাঁর নিবু-নিবু চুরুটে মুখ দিয়ে বেশ জোরে একটা টান দিলেন।

মতিলাল বলেন—ডক্টর সি. টি. এলগিনের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয় ?

গগন বসু—এলগিন ? কে সে ?

কলিতা—আপনি তাকে চেনেন না ?

গগন বসু—না।

মেহরা—কিন্তু আমাদের ইনফরমেশন এই যে, এলগিন আপনার এই বাগানে অনেকদিন ছিল।

কলিতা—সে একজন স্পাই, আমাদের শত্রুর চর।

মতিলাল—নেফাতে ঢুকে সে লোকটা অনেক কিছু জেনে নিয়ে সরে পড়েছে।

গগন বসু ভ্রূকুটি করে তাকান। —বুঝলাম, স্পাই পালিয়ে যাবার পর আপনারা খুব অ্যাকটিভ হয়েছেন। ভাল কথা, কিন্তু এই অদ্ভুত ইনফরমেশন কোথা থেকে পেলেন যে, স্পাইটা আমার এখানে ছিল ?

মেহরা—হাই কোয়ার্টার থেকে পাওয়া ইনফরমেশন, অদ্ভুত বললে তো চলবে না।

গগন বসু—আপনার হাই কোয়ার্টার মানে কী ? মিনিস্টার ?

মেহরা—তা তো বটেই, কিন্তু এক্ষেত্রে মিনিস্টারের একজন বিশেষ ট্রাস্টেড ও রেস্পেক্টেড ব্যক্তি। তিনিই বা অকারণে একটা মিথ্যে ইনফরমেশন দেবেন কেন, বুঝতে পারছি না।

গগন বসুর দুই চোখের তারা হঠাৎ যেন আগুন-রঙের ঝিলিক দিয়ে কেঁপে ওঠে। ভুরু দুটো কুঁচকে যায়। তামাকের পাইপটাকে হাঁটুর উপর একবার ঠুকে নিয়েই গগন বসু বলেন—একবার খোঁজ করে দেখুন, মিনিস্টারের এই ট্রাস্টেড ও রেস্পেক্টেড ব্যক্তিটি একটি স্কাউন্ড্রেল কিনা ?

মেহরা—আপনি বেশ উত্তেজিত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

গগন বসু—খোঁজ করে দেখুন, এই স্কাউন্ড্রেলের নাম সুশান্ত মজুমদার কিনা ?

—ওয়েল ওয়েল। দিল্লির আই বি'র মতিলাল চমকে উঠে নেফা-পুলিশ মেহরার মুখের দিকে তাকান। এস আই বি'র কলিতা তাঁর নিবু নিবু চুরুট শক্ত করে কামড়ে ধরে মতিলালের মুখের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকেন।

হঠাৎ হেসে ওঠেন মতিলাল। —তিন পিয়ালি চা ফরমাইয়ে মিস্টার বাসু।

কলিতা বলেন—আপনি কিছু মনে করবেন না, মিস্টার বাসু।

মেহরা বলেন—আর আপনাকে কিছু বলবার নেই, স্যার।

আবার হাই তুলে নিয়ে মতিলাল বলেন—দেখুন তো, মিছিমিছি কী পরেশানি। আমাদের সবারই সন্দেহ ছিল, মজুমদারের ইনফরমেশন বোধ হয় একটা ব্লাফ। সে মহাশয়ের কিছু খবর তো রাখি। কিন্তু...।

গগন বসু—কিসের কিন্তু ?

মতিলাল—কিন্তু কী করব বলুন ? মজুমদারের ম্যাজিক স্টিক যে দিল্লি, শিলং, গৌহাটি আর কলকাতাকেও ছুঁয়ে রয়েছে।

কলিতা—ধরুন, আপনি কাস্টমকে ফাঁকি দিয়ে বিদেশ থেকে দশ লাখ টাকার ডিউটিয়েবল জিনিস আনতে চান ; আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। মজুমদারকে বললেই চমৎকার ব্যবস্থা করে দেবে।

চা আসে। চায়েব কাপে চুমুক দিয়ে মেহরা বলেন—কোনও এক বন্ধু-বিদেশের এমব্যাসি থেকে খবর পাওয়া গেল, বোটানিস্ট বলে নিজেকে পরিচিত করে আর ডক্টর এলগিন নাম নিয়ে একটা লোক নেফাতে ঢুকে নেফার যত লজিস্টিক আর মিলিটারি পোস্টের খবর নিয়ে সরে পড়েছে। তখন তো আর...।

গগন বসু হাসেন।—তখন আপনাদের হুঁস হল।

মেহরা—আমাদের দোষ কোথায় বলুন ? সরকারের অর্ডার ছিল, এলগিনের সব সুবিধার দিকে নজর রাখতে হবে। আমিই তো মশাই সে বেটাকে রোজ মুরগি খাইয়ে খাইয়ে তোয়াং থেকে সেলা, সেলা থেকে দিরাং, দিরাং থেকে রূপা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি।

গগন বসু হাসেন।—জানি না, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। সরকারকে না আপনাদের সবাইকে ?

মতিলাল উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।—আচ্ছা! আচ্ছা! আপভি উপনিষদ পড় চুকেঁ ?

গগন বসু—জি হাঁ, বহুত থোড়া।

মতিলাল—তব তো হমভি উপনিষদ বোলেঙ্গে।

গগন বসু—বোলিয়ে।

মতিলাল—অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ। জৈসা সরকার তৈসা অফিসার। জৈসা গাঁও তৈসা ভঁইস। আচ্ছা...গুড বাই।

চলে গেলেন তিন অফিসার। গগন বসুও ক্লান্তভাবে আর বেশ বিষণ্ণ-উদাস স্বরে ডাক দেন।—শুক্তি, আমাকে ঠাণ্ডা জল খাওয়াবি ?

॥ ১৭ ॥

তেজপুর থেকে মণিমালার তিনটে চিঠি পেয়েছেন কিরণলেখা। সব চিঠিরই সার-কথা, তেজপুরে চলে এসো, কিরণদি।

মণিমালার শেষ চিঠিটা বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলছে।—বুঝতে পারছি না, গগনবাবুর শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল কেন ? কুমুদ ডাক্তারের চিকিৎসায় কোনও সুফল হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া নেফার খবরও ভাল নয়। কাজেই, তোমাদের সবারই এখন তেজপুরে চলে এলে ভাল হয়।

বেশ অসুস্থ হয়েছেন গগন বসু। সব সময় একটা কষ্টকর অবসন্ন ভাব। মাথাটা ভার-ভার, শ্বাস টানতেও একটা হাঁস-ফাঁস ভাব। আর, যখন-তখন পিপাসা। দশ মিনিট পর-পর জিভ শুকিয়ে যায় ; ঠাণ্ডা জল খেতে চান গগন বসু।

হঠাৎ অসুস্থতা বটে ; কিন্তু বুঝতে তো কোনও অসুবিধে নেই, এই অসুস্থতা শুরু হয়েছে ঠিক সেইদিন থেকে, যেদিন পুলিশ আর গোয়েন্দা-পুলিশের তিন অফিসার এসে একটি ইনফরমেশনের রহস্য প্রকাশ করে দিয়ে চলে গেলেন।—মানুষ কত নীচ হতে পারে। চেঁচিয়ে উঠেছিলেন গগন বসু।—আমার মনে হয়, কিরণ, তোমাদের ভগবানও স্কাউন্ড্রেল সুশান্তকে ভয় করে।

কিরণলেখা—চুপ করো। শান্ত হও। জল খাও।

শুধু বিকেল পর্যন্ত, তারপর আর সাহেবকুঠির বারান্দার চেয়ারে বসে থাকতে পারেন না গগন বসু। যতক্ষণ রোদ থাকে ততক্ষণ একটু ভাল লাগে। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই যখন অক্টোবরের কুয়াশা নিবিড় হয়ে কদমবাড়িকে ছেয়ে ফেলে, তখন আর কিছু ভাল লাগে না। ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়েন।

শুক্তিও দেখে বেশ আশ্চর্য হয়। সন্ধ্যা হলেও বাগানের কামিনদের ঝুমুরের নাচ-গান আর হই-হল্লার সাড়া শোনা যায় না। মালী হরদেও হঠাৎ এক-একবার ব্যস্ত হয়ে ফটকের বাইরে কোথায় যেন চলে যায় ; আর কী-যেন শুনে মুখ শুকনো করে ফিরে আসে। সন্দেহ হয়, কুয়াশার ভিতরে যেন নানা রকমের জল্পনা আর কল্পনা চুপি-চুপি ফিসফাস করে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন সত্যিই যত মেচ আর ভোটিয়া মজুর-কামিন কাউকে কিছু না বলে পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় চাপিয়ে আর বাগান ছেড়ে চলেই গেল।

তার দু'দিন পরে চলে গেল সব দফাদার কামদার আর ডান্টিচুনাই কামিন দল।

যেদিন সিটি বাজল না, কলঘরের বয়লার নীরব হয়ে রইল, সেদিন ম্যানেজার ব্যানার্জি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে গগন বসুর কাছে এসে দাঁড়ালেন। —খুব সন্দেহ হচ্ছে, স্যার।

গগন বসু—কী ?

ব্যানার্জি—বাগানে কেউ আর থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।

গগন বসু—কেন ? চিনারা কি কদমবাড়ির ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে ?

ব্যানার্জি কুণ্ঠিতভাবে হাসেন। —না স্যার ; সে কথা নয়। কিন্তু মজুমদার সাহেবের লোক রোজই এসে বাগানের লোকের কাছে যে সব খবর পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে তো...।

চমকে ওঠেন গগন বসু। গগন বসুর শুকনো চোখ দুটো হঠাৎ যেন রক্তমাখা হয়ে গিয়েছে, লালচে হয়ে কাঁপতে থাকে ; গলার স্বরও কাঁপে। —বলুন, থামলেন কেন ?

ব্যানার্জি—মনে হচ্ছে, খুব শিগগির কদমবাড়ির উপর চিনা হামলা এসে পড়বে। যারা থাকবে, তারা বিপদে পড়বে।

গগন বসু—আপনিও কি মজুমদারের লোকের কথা বিশ্বাস করেন ?

ব্যানার্জি—লোকের কথা নয়, স্যার। মজুমদার সাহেব নিজে বলেছেন।

গগন বসুর চোখে একটা কঠোর ভ্রূকুটি থরথর করে। —কোথায় মজুমদার ?

ব্যানার্জি—তিনি কদমবাড়ি রোডের উনিশ মাইলপোস্টে প্রায়ই আসেন। আমাদের কেরানিবাবুকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। তাঁর মত মানুষের কথা তুচ্ছ করা কি উচিত হবে ? ঘটনা খুবই জটিল, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, নয় কি স্যার ?

গগন বসু—কিন্তু কী এমন একটা ওলট-পালট কাণ্ড হয়েছে যে, এখনই এত বিচলিত হতে হবে ? খবর তো শুধু এই যে, থাগলাতে গোলাগুলি চলেছে।

ব্যানার্জি—সেটা তো জানি ! কিন্তু বুঝতে পারছি না স্যার, তিলগাঁও রাজভাটি আর সরুবাড়ি বাগানের সব সাহেব কেন প্লেন চার্টার করে সপরিবারে সরে পড়েছেন।

গগন বসু—তাই নাকি ?

ব্যানার্জি—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। আজ সকালে জিতনগর টি এস্টেটের ম্যাকফার্সন আমাদের এই কদমবাড়ি রোড দিয়েই গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেলেন।

গগন বসু—কিন্তু ম্যাকফার্সনের বাগান কি খালি হয়ে গিয়েছে ?

ব্যানার্জি—না।

গগন বসু—তা হলে বলুন, শুধু কদমবাড়ি বাগান খালি হতে শুরু হয়েছে।

ব্যানার্জি—হ্যাঁ।

গগন বসু—আপনি কি আমার কাছে কোনও পরামর্শ চাইছেন ?

ব্যানার্জি—হ্যাঁ, স্যার।

গগন বসু—আমার কিছুই বলবার নেই। আপনি আসুন এখন।

ম্যানেজার ব্যানার্জির চোখমুখের চেহারা দেখলে মনে হয়, ভদ্রলোকের সব যুক্তি-বুদ্ধি যেন জটিল

একটা বিপদে পড়ে করুণ হয়ে গিয়েছে। গগন বসুর কথা শুনে তাঁর চোখমুখ আরও করুণ হয়ে যায়। —কিন্তু আপনারও তো এখন...।

গগন বসু—না, আমি কোথাও যাব না।

চলে গেলেন ব্যানার্জি। কিন্তু এই চলে যাওয়া যেন ফিরে এসে গগন বসুকে শেষ কথাটা বলে দেবার জন্য তৈরি হওয়া।

তিনদিনের মধ্যে বাগানের সব লোকজনের মাইনে-কড়ির পেমেন্ট চুকিয়ে দিয়ে ব্যানার্জি আবার যেদিন গগন বসুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সেদিন কদমবাড়ির সন্ধ্যার কুয়াশা নিরেট হয়ে গেল। অদ্ভুত স্তব্ধতা, তার মধ্যে ম্যানেজার ব্যানার্জি আর কুমুদ ডাক্তারের পায়ের জুতোর সামান্য শব্দও যেন অমানুষিক আগন্তুকের ভয়ানক পায়ের শব্দের মত বাজতে থাকে।

গগন বসুর ঘরে ঢুকে বিছানার কাছে দাঁড়ালেন ম্যানেজার ব্যানার্জি আর কুমুদ ডাক্তার। গগন বসু বলেন—আপনারা বোধ হয় এখন রওনা হবেন ?

ব্যানার্জি—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি অনুমতি দিন, স্যার।

কুমুদ ডাক্তার—মিথ্যে কথা বলব না, সত্যিই থাকতে খুব আতঙ্ক বোধ করছি। আপনি খুশি হয়ে আমাকে যেতে আজ্ঞা করুন স্যার।

গগন বসু হাসেন। —খুশি হয়েই বলছি, আপনারা চলে যান। যেদিন ফিরে আসতে ইচ্ছে হবে, সেদিন চলে আসবেন। ইচ্ছে না হয়, আসবেন না।

ব্যানার্জি—এই ক্যাশ, সব পেমেন্টের পর যা ছিল, সেটা এখন তো আপনারই কাছে রাখতে হয়, স্যার।

গগন বসু—রাখুন।

ম্যানেজার ব্যানার্জির আর কুমুদ ডাক্তারের চোখ ছলছল করে। —আপনি এখন...।

গগন বসু—আমি যাব না।

চলে গেলেন ব্যানার্জি আর কুমুদ ডাক্তার।

ঘরের বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক দেন কিরণলেখা—হরদেও, শুনে যাও।

কোনও সাড়া শোনা যায় না। কেউ জবাব দেয় না।

কিরণলেখা ডাকেন—কপিলরাম, তুমি কোথায় ?

কেউ জবাব দেয় না। কোনও সাড়া শোনা যায় না।

গ্যারেজের পিছনের ঘরে শুধু একটা আলো আর দুটো ছায়া নড়ছে দেখা যায়।

লণ্ঠন হাতে নিয়ে সাহেবকুঠির বারান্দার কাছে এগিয়ে এল উপেন মিস্তিরি আর তার বউ। —কাকে ডাকছেন মা ? কেউ আর নেই।

কিরণলেখার গলার স্বর শিউরে ওঠে। —কেউ আর নেই ? শুধু তোমরা দুজন আছ ?

উপেন—হ্যাঁ, মা। এই আট মাস ভারী মানুষটাকে নিয়ে হঠাৎ এখন যাব কোথায় ? যাবই বা কেমন করে ?

মাথার কাপড় টেনে দিয়ে উসখুস করে উপেন মিস্তিরির বউ।

কিরণলেখা—আচ্ছা, এসো।

উপেন—দরকার হলে ডাক দেবেন, মা।

বিছানার উপর উঠে বসেন গগন বসু। —আমি বলি, কাল সকালে উপেন তোমাদের দুজনকে তেজপুরে পৌঁছে দিয়ে চলে আসুক।

কিরণলেখা—আমি যাব না। শুক্তি যাক।

শুক্তি বলে—আমি যাব না।

রাতের কদমবাড়ি যেন প্রেতকুয়াশার আঁচল দিয়ে ঢাকা একটা সমাধি ; তার মধ্যে সাহেবকুঠির ঘর আর বারান্দার আলোগুলি শুধু জীবন্ত প্রাণের চক্ষু। শুক্তির ঘরের টেবিলের উপর শুধু ছোট্ট রেডিও সেট কথা বলে ; কী অদ্ভুত গুমরে ওঠে রেডিওর খবরের এক-একটা কথা—চিনা দুশমনের হেভি মর্টার ফায়ার তুচ্ছ করে ঢোলা এখন মরিয়া হয়ে লড়ছে। খিজেমানের তিনটি কোম্পানি পোস্ট

দিন-রাত সমানে মেশিনগান চালিয়ে দুশমনের অ্যাডভান্স ঠেকিয়ে রেখেছে। ফায়ারিং লাইনের বাংকার থেকে বের হয়ে, একাই জয়হিন্দ হাঁক দিয়ে আর গ্রেনেড হাতে নিয়ে চার্জ করেছে, দুশমনের মেশিনগানের গর্জন স্তব্ধ করে দিয়েছে আর মরে গিয়েছে এক জমাদার।

দুই চোখ অপলক করে আর একেবারে নিথর নীরব হয়ে রেডিওর কথা শুনছে শুক্তি, দেখতে পেয়ে কিরণলেখা একটু আশ্চর্য না হয়ে পারেন না। ওসব খবরের মধ্যে এরকম মন-প্রাণ দিয়ে শোনবার কী আছে ? খবর তো নয়, এক-একটা সর্বনাশের হুংকার।

বিছানা থেকে নেমে ঘরের ভিতরে পায়চারি করেন গগন বসু। বোধ হয় রেডিওর সব খবর শুনতে পেয়েছেন, তাই হঠাৎ এই অস্থিরতা। —আমি আবার বলছি, তোমরা দুজনে তেজপুরে চলে যাও।

কিরণলেখা—তুমিও চলো।

গগন বসু—না। এদিকে-ওদিকে কোনও চা-বাগানের লোকজন সরে পড়েনি ; সবার আগে আমার কদমবাড়ির বাগান খালি হয়ে গেল, এটা শুধু আমাকে জব্দ করবার জন্যে এক শয়তানের কারসাজি ছাড়া আর কী হতে পারে ?

কিরণলেখা ভয় পান। —তা হলে তো তোমারই সবার আগে চলে যাওয়া ভাল ছিল।

গগন বসু—না। হাতে হাতে একটা নিষ্পত্তি করে দিয়ে তারপর যাব।

ঝিক করে জ্বলে উঠেছে গগন বসুর চোখ। প্ল্যান্টার সাহেব গগন বসু তো কবেই তাঁর সেই ভয়ানক শিকারের শখ ছেড়ে দিয়েছেন। মাচানে বসে নরখাদক বাঘের মাথা তাক করে বন্দুক তুলতে গিয়ে তাঁর চোখ দুটো যে ঠিক এইরকম ঝিক করে জ্বলে উঠত।

কিন্তু মনের জেদ দিয়ে কি শরীরের অসুখটাকে সব সময় জব্দ করা যায় ? যায় না। গগন বসুও পারেন না। ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে আর জানালা খুলে সাহেবকুঠির ফটকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা রাত পার করে দিয়েই বুঝলেন গগন বসু, জ্বর হয়েছে। রাত-জাগা ক্লেশ আর জ্বরের ঘোর, বিছানার উপর শুয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া তন্দ্রার মধ্যে শুনতে থাকেন, শুক্তির ঘরের রেডিওটা খবর বলছে—খিঞ্জেমান নেই, ঢোলাও নেই। এগিয়ে এসেছে চিনারা।

শুক্তিরও যেন আর কোনও কাজ নেই। শুধু গল্পের বই পড়া, বার বার খোঁপা বাঁধা, আর যখন-তখন রেডিওর সামনে এসে বসে থাকা। একটি একটি করে পার হয়ে যায়, নীরব নির্জন কদমবাড়ির রোদ-ভরা দিন আর কুয়াশা-ভরা রাত।

সেদিন সকালবেলাতেই রেডিওর খবরটা যেন চেঁচিয়ে উঠল। —বুমলা।

এগিয়ে যেয়ে রেডিওর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে শুক্তি। বুমলাতে যুদ্ধ চলছে। ফিয়ার্স ফাইটিং। চিনাদের পুরো একটা ডিভিশন বুমলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যাবেলার রেডিও বলে—বুমলার পতন। শুক্তির মাথাটা হঠাৎ অলস হয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ; ঠক করে ঠোকা খায় কপালটা। এক হাতের দুটো আঙুল দিয়ে কপালটাকে শক্ত করে টিপে ধরে শুক্তি। এই তো সেই বুমলা, যেখানে বরফে ঢাকা পাহাড়ের পাথুরে বুকের উপর দিয়ে দৌড়ে ছুটে পালিয়ে যায় কস্তুরি হরিণ ; তাকে আর ধরতে পারা যায় না।

কপালে ছোট্ট একটা কালশিরার কালো দাগ ; তার মধ্যে ছোট্ট একটা ব্যথাও চিনচিন করে। আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে আর বই হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দার আলোর কাছে একটা চেয়ারে বসে শুধু কদমবাড়ির রাতের নিরেট কুয়াশার চেহারা দেখতে থাকে শুক্তি।

গগন বসুর জ্বরের শরীরটা সন্ধ্যা থেকে গভীর ঘুমে অসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। গভীর ঘুম হলেই তো ভাল, বাবার জ্বর তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। একবার উঠে গিয়ে আর ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখে আসে শুক্তি, মা'ও ঘুমিয়ে পড়েছেন। মা'র চোখের উপর খবরের কাগজটা পড়ে আছে।

উপেন মিস্তিরির ঘরে এখন আর আলো জ্বলছে না। কদমবাড়ির সব শব্দ মরে গিয়েছে। শুধু এই বারান্দার আলোর কাছে পোকাগুলির ছটফটানির শব্দ শোনা যায়।

কিন্তু ফটকের কাছে মুখলুকানো জানোয়ারের মত দাঁড়িয়ে আছে, কী ওটা ? গাড়ি ? এত শব্দহীন

হয়ে কখন এল গাড়ি ? কার গাড়ি ? শুক্তির চোখের কালো তারা দুটো জ্বলে জ্বলে আর ফুলে-ফুলে দেখতে থাকে, এগিয়ে আসছে সুশান্ত মজুমদার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শুক্তি। ততক্ষণে সুশান্ত মজুমদারও বারান্দার সিঁড়ির ধাপের কাছে এসে গিয়েছে। শুক্তি বলে—স্টপ ! আর এক-পা এগুবেন না।

সুশান্ত—তোমার সেই বয়ফ্রেন্ড, কী যেন নাম, হ্যাঁ, সেই সুজিত রায় কোথায় ?

শুক্তি—আছে।

সুশান্তর হাতে একটা ফ্লাস্ক টলমল হয়ে দুলছে। এক ধাপ উপরে উঠে এসেই চোখ কুঁচকে হেসে ওঠে সুশান্ত।—কোথায় আছে ? বুমলাতে ? তবে তো গেছে।

শুক্তি—না, আছে।

সুশান্ত দাঁত চিবিয়ে হাসে।—তবুও আছে ? কোথায় ? হৃদয়ে নাকি ?

শুক্তি—দেখবেন, আছে কিনা ? আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি।

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে রাইফেলটাকে আঁকড়ে ধরে শুক্তি। টেবিলের দেরাজ থেকে দুটো বুলেট নিয়ে লোড করেই আবার ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। কিন্তু সুশান্ত মজুমদারও ততক্ষণে সরে গিয়েছে। গাড়িটাকেও কে-যেন স্টার্ট করে ফেলেছে।

কিন্তু শুক্তির রাইফেলের বুলেট সেই মুহূর্তে চোরাগাড়ির হুডের উপর গিয়ে আছড়ে পড়ে। তখনি আবার, আবার একটা আওয়াজ। যেন কদমবাড়ির রাতের নিরেট কুয়াশার বুকটার সব আক্রোশ ফেটে পড়েছে। একটা বুলেটের চোট খেয়ে চুরমার হয়ে ঝরে পড়ে যায় চোরাগাড়ির কাঁচ। আর একটা বুলেটের আঘাত খেয়ে চোরাগাড়ির বুকের ভিতরে যেন একটা কালো কুণ্ডলি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ঝুপঝাপ করে জখম ভালুকের মত দৌড়ে চলে গেল গাড়িটা।

উপেন মিস্তিরির ঘুম-ভাঙা আর ভয়-পাওয়া ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। কিরণলেখা এসে শুক্তির হাত চেপে ধরে কাঁপতে থাকেন। গগন বসু এসে শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

শুক্তি বলে—সুশান্ত মজুমদার।

গগন বসু—ভাল হল। আরও ভাল হয়, যদি শুনতে পাই যে, ওটা মর্গে গিয়েছে। আমি তো তিনশো দুইয়ের আসামি হবার জন্য তৈরি হয়েই আছি।

কিরণলেখা বলেন—আর কি আমাদের এখানে থাকা উচিত ?

গগন বসু বলেন—না ; এবার আমারও যেতে আপত্তি নেই।

॥ ১৮ ॥

তেজপুর শহর যেন দম-বন্ধ করে রাত সাড়ে আটটার আকাশবাণীর খবর শুনছে। ঘরে ঘরে রেডিওর সামনে বসে আছে উৎকণ্ঠ আর উৎকর্ণ বাপ-মা-ছেলেমেয়ের জটলা। নাতিকে কোলে নিয়ে ঠাকুরমাও শুনছেন। মুখ শুকনো, চোখ করুণ, এক-একটা স্তব্ধতা ; কিন্তু সে স্তব্ধতার ভিতরের প্রাণটা ছটফট করছে।

বাজারের যেখানে যেখানে যে দোকানে রেডিও বাজে, সেখানে সেখানে সে দোকানের সামনে মানুষের বিপুল ভিড়। সাইকেল থামিয়ে ব্যস্ত মানুষ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর শুনছে। থমকে আছে রিক্সা, শুনছে রিক্সাওয়ালা আর রিক্সার আরোহী। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছে পথের মুটে-মজুর আর ফেরিওয়ালা।

আকাশবাণীর খবর হঠাৎ বলতে শুরু করে।—দুঃখের বিষয়...।

সব ভিড়ের সব প্রাণ চমকে ওঠে। সব শ্রোতার চেহারা শক্ত হয়ে ভয়ানক এক খবরের আঘাত সহ্য করবার জন্য তৈরি হয়।

আকাশবাণীর খবর কাটা-কাটা স্বরে গরগর করে।—তোয়াং নেই ; দুশমননে কব্জা কর লিয়া ! আমাদের ফৌজ পিছনে হটে এসে নতুন পজিশন নিয়েছে, লড়বার জন্যে তৈরি হয়েছে।

গুমরে ওঠে ভিড়ের বিচলিত বোবা স্তব্ধতা। এ কী হল ! ঘরের রেডিওর দিকে তাকিয়ে ঠাকুরমা

ডুকরে ওঠেন—হায় ভগবান !

রবার বাগানের বাড়ি ভারতীর দোতলার একটি ঘরে রেডিওর দিকে তাকিয়ে শুক্তি বসুর চোখের তারা দুটোও কেঁপে ওঠে।

কে জানে কেমন দেখতে এই তোয়াং। কল্পনা করে দেখতে চেষ্টা করলে শুধু ছোট্ট একটা নীল আলোর বাল্ব ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

পাশের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছেন গগন বসু। বিছানার কাছে দুই চেয়ারে বসে গল্প করছেন কিরণলেখা আর মণিমালা। কিন্তু মহিম দস্তিদার কোথায় ?

কালোর মা দোতলার বারান্দায় এসে ডাক দেন—মা, আপনি কোথায় ? একবার নীচের তলায় যান।

মণিমালা—কেন ?

কালোর মা—একবার দেখুন গিয়ে ; বাবা কেমন-যেন ছটফট করছেন। আমার কথার জবাব দিলেন না।

দেখেছেন কালোর মা, মহিমবাবুর গায়ের মুগার চাদরটা পড়-পড় হয়ে গায়ের সঙ্গে ঝুলছে। এক-পায়ে জুতো নেই, অস্থির হয়ে ঘরের এদিকে-ওদিকে হাঁটাহাঁটি করে ঘুরছেন।

ব্যস্ত হয়ে আর বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উপরতলা থেকে নেমে এলেন সবাই ; প্রথমে মণিমালা আর কিরণলেখা। তারপর গগন বসু আর শুক্তি।

—কী হল ? এবকম করছ কেন ? কিসের অস্থিরতা ? মণিমালা জিজ্ঞেস করেন।

মহিম দস্তিদার হাসেন।—এমন কিছু ব্যাপার হয়নি। তোয়াং গিয়েছে, তাতে আমাদের এত বিচলিত হবার কী আছে ? কিন্তু...।

গগন বসুর দিকে তাকিয়ে কথা বলেন মহিম দস্তিদার।—কিন্তু কথাটা কী জানেন ? এই গবমেন্ট কি আমাদের বাঁচাতে পারবে ? আশা করবার মত যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

গগন বসুও হাসেন।—আমার কাছ থেকে এসব প্রশ্নের জবাব পাবেন না। আমি জবাব জানি না। তবে আমি বিচলিত নই ; আমার কোনও আশা-টাশা নেই ; যেটুকু ছিল সেটুকুও অনেকদিন আগে চুকেবুকে গিয়েছে।

মণিমালা—কিন্তু কে যে কোথায় আর কখন বিচলিত হল, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

মহিমবাবু—তুমি বুঝতে পারবে না।

মণিমালা—এই তো, রাজাবাহাদুরের কাছে এখনই শুনলাম, কাল বিকালে নেহরু-ময়দানে মস্ত বড় সভা হবে। লড়বার জন্যে জান কবুল করবে সবাই ; চিনাদের শয়তানি কেউ সহ্য করবে না। তা ছাড়া, তুইও তো দেখতে পেয়েছিস শুক্তি, কিছুক্ষণ আগে কত বড় দুটো মিছিল জয় হিন্দ করে চলে গেল।

মহিমবাবু হাসেন।—ওদের কথা ছেড়ে দাও। যাদের কিছু নেই, তাদের কোনও ক্ষতির ভয়ও নেই, বিচলিত হবার প্রশ্নও নেই। যাক সেসব কথা।...আপনি আজ একটু ভাল বোধ করছেন তো, গগনবাবু ?

গগন বসু—হ্যাঁ, অনেকটা ভাল।

মহিম দস্তিদার মানুষটি যে হেঁয়ালির ভাষাতে কথা বলেন, সেটা শুক্তিরও কিছু-কিছু জানা আছে। আজ কিন্তু মনে হয়, মেসোমশাই নিজেও একটা হেঁয়ালি। আজই সকালে এই ভারতীর দোতলার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছিল শুক্তি, নীচের তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির বাচ্চা ছেলেটা, যার নাম হীরক, তার সঙ্গে কথা বলছেন মেসোমশাই ; রাজপুত বীরবালকের নাম করে হীরককে উপদেশ দিচ্ছেন : সময় এসে গেছে হীরক, দেশের মাটির মান রাখবার জন্যে এবার তোমাকেও তরোয়াল ধরতে হবে। মরব তবু নড়ব না, এই হবে তোমার আমার সবারই প্রতিজ্ঞা।

একটু পরেই শুক্তিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন মহিমবাবু।—তুই কি ঠিক বলতে পারবি, গগনবাবু তাঁর চা-বাগান বিক্রী করবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন কিনা ?

শুক্তি—না।

মহিমবাবু—করে ফেললেই ভাল করতেন। আমিও তো দেখছি, এখন আর আমার এই বাড়িটাকে উচিত দাম দিয়ে কেনবার গরজ কারও নেই।

শুক্তি হাসে।—আপনি এসব কী বলছেন, মেসোমশাই ? মণিমাসি শুনলে খুব রাগ করবেন।

মহিমবাবু—তাঁর কথা ছেড়ে দাও। তাঁর অসীম ধৈর্য ; তিনি মনে করেন ধৈর্য ধরা একটা মস্ত গুণ। কিন্তু ধৈর্য ধরতে গিয়ে এই তো দেখা গেল যে, আমার এই বাড়ি কিনে নেবার মত খদ্দের আর নেই।

মহিম দস্তিদার যতই আরও জটিল হেঁয়ালি হয়ে উঠুন না কেন, তেজপুর শহরের জীবনে কোনও হেঁয়ালি নেই। পরের দিন বিকালে যখন নেহরু-ময়দানে বিপুল জনতার সভায় জান-কবুল প্রতিজ্ঞা গুমরে ওঠে, ঠিক তার কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যার আকাশবাণীও জানিয়ে দেয় রাষ্ট্রপতির ঘোষণা, এমার্জেন্সি !

গগনবাবুর কাছে এসে বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মহিমবাবু। তারপর বলেন—এমার্জেন্সি কথাটার সরল অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, সরকার এখন যা-খুশি-তাই করবেন। ভদ্রলোকদের বাড়ি-টাড়ি কেড়ে নিয়ে সৈন্য-সামন্ত রাখবেন। আপনি কী মনে করেন, গগনবাবু ?

গগনবাবু—আমি কিছুই মনে করি না।

চলে গেলেন মহিমবাবু। ফিরে গিয়ে আর বারান্দাতে নয়, ঘরের ভিতরে তাঁর প্রিয় সেই সবুজ রঙের রেক্সিনের আরাম-কেদারাটিতে আধ-শোয়া হয়ে বসে থাকেন। এই ভারতীর বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াতে আর ভাল লাগে না। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে একটা উঁকি দিতেও ইচ্ছে করে না। পাশের বাড়ির হীরক চিৎকার করে গান গাইছে—বল বল বল সবে...। উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দেন মহিমবাবু। শুনতে ভাল লাগে না।

কিন্তু তেজপুরের ঘরে ঘরে তখন হীরকেরই মত গলা ছেড়ে এই গান গাইছে যত রেডিও।

সকাল হলে আরও স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, বদলে গিয়েছে তেজপুর। সেই অদ্ভুত আর ভয়ানক উপকথার তেজপুর যেন হঠাৎ একটা নতুন রকমের প্রাণ পেয়েছে আর চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

খবরের কাগজের হকারের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর কাগজ কিনছে পথের লোক। উড়ছে হেলিকপটর ; আকাশে অদ্ভুত শব্দের হর্ষ ছড়িয়ে দিয়ে নেফার পাহাড়ের দিকে চলে যাচ্ছে। মুখ তুলে হেলিকপটরের দিকে তাকিয়ে পথের লোকের অনেক আশার চোখগুলি চিকচিক করে ; হাত তুলে আর রুমাল উড়িয়ে হই-হই করে ওঠে শুভযাত্রার কামনা।

শিলিগুড়ি থেকে একটানা ছুটে এসে তেজপুর স্টেশনে পৌঁছে যায় মিলিটারির তিনটে স্পেশাল ট্রেন। এসেছে শিখ ব্যাটালিয়ন, জাঠ কোম্পানি আর গোর্খা ব্রিগেড। স্টেশনে লোকের ভিড় জয় হাঁক দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। স্কুলের একদল ছেলে জওয়ানদের মাথার উপর ফুল ছুঁড়তে থাকে। একটা ফুল হাতে লুফে নিয়ে পকেটে রাখে আর হাসতে থাকে একজন অল্পবয়সী শিখ ক্যাপ্টেন।

যো বোলো সো নিহাল, সৎশ্রী অকাল ! হাঁক দিয়ে আর মার্চ করে চলে গেল শিখ ব্যাটালিয়ন।

দিনে রাতে সব সময় এয়ারপোর্টের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, নামছে, থামছে ; আবার ফিরে চলে যাচ্ছে এয়ারফোর্সের ট্রান্সপোর্ট প্লেন। মিলিটারির সম্ভার নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার ভাইকাউন্টও আসছে আর চলে যাচ্ছে। ঘুমোবার মত এক ঘন্টারও সময় পান না প্লেনের কম্যান্ডার ; লাল হয়ে ফুলে আছে চোখ, কিন্তু মুখে শান্ত হাসি।

তেজপুর থেকে মিসামারি, মিসামারি থেকে ফুটহিল ; ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে ছুটে চলে যায় মিলিটারির জিপ। যাচ্ছে আর্মি মেডিক্যালের সম্ভার। যাচ্ছে ফিল্ড সিগন্যালের ইউনিট আর আর্টিলারির জওয়ানদের সেকশন।

আর দেখা যায়, কোলিবাড়িতে শিশির হাজরিকার বাড়ির নারকেল-গাছের গায়ে ছোট একটি কাঠের বোর্ড, তার উপর সাদা হরফে ইংরেজিতে লেখা ছোট একটি কথা—ইয়েস ; ইয়ুথ এমার্জেন্সি সার্ভিস।

টাকা-পয়সার সম্বল নেই, জননেতার ব্লেসিং নেই, সরকারি কর্তার পেট্রনি শুভেচ্ছার বাণী নেই ;

ইয়েস যেন তেজপুরের সামান্য-সাধারণ প্রাণের একটা ব্যস্ততা। শিশির, হিতেন, অমল ও জগদীশ, আর, আরও ওইরকম কয়েকজনের ব্যস্ততা। ওরা ছুটে ছুটে কাজ করতে চায়। কাজের জন্যে তৈরি হতে চায়। ওরা ট্রেঞ্চ কাটে, ফার্স্ট-এড আর ফায়ার ফাইটিং-এর ট্রেনিং নেয়।

দেখতে অদ্ভুত লাগে, সেই শিশির হাজরিকা আজ ইয়েস ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে রাঙ্গাপাড়াতে গিয়ে আর সড়কের পাশে একটা ক্যান্টিন করে জওয়ানদের হাতে গরম চায়ের পেয়ালা তুলে দিচ্ছে।

কম্বল দাও, লেপ দাও, গরম কাপড় দাও। নেফার পাহাড়ের দুরন্ত বরফ আর শীতের কামড় সহ্য করছে লড়াইয়ের জওয়ান, তাদের জন্য মমতার উপহার চাই। আবেদন জানিয়ে তেজপুরের সড়কে সবার আগে মিছিল করে ঘুরে গেল যারা, তারা ওই ইয়েস ছেলের দল।

মিছিলটা রবার বাগানের ভারতীর সামনে এসে দাঁড়াতেই বাইরের ঘর ছেড়ে ভিতরের ঘরে চলে যান মহিমবাবু। সবার আগে কালোর মা বের হয়ে এসে মিছিলের হাতে তার নিজের গায়ের কম্বলটাকে তুলে দিয়ে চলে যান। বের হয়ে আসে শুক্তি, হাতে দুটো গরম আলোয়ানের একটা প্যাকেট। একটু আশ্চর্য হয়ে হেসে ওঠে শুক্তি। —আপনি ? মালতীর খবর কী ?

শিশির হাসে। —ভাল আছে।

শুক্তি—প্রমীলা ?

শিশির—ভালই আছে।

মিছিলটা অনেক দূরে চলে গিয়েছে। মিছিলের গানের স্বর কানে এলেও গানের ভাষার কোনও কথা আর স্পষ্ট করে শোনা যায় না। শুক্তির মনটা কিন্তু বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারে, কিছুই ভাল লাগছে না। ভাবতে গেলে মনের সব চেষ্টা মিথ্যে করে দিয়ে আর নাগাল-ছাড়া হয়ে শুক্তির প্রাণটা হঠাৎ এক-একবার যেন দুরন্ত ছেলেমানুষের মত একটা দৌড় দিয়ে ওই কদমবাড়িতে ফিরে যেতে চায়। কেউ নেই কদমবাড়িতে, তবু যেন অনেক কিছু আছে। বাগানের নালার জলে হাঁস সাঁতার দেয়, ছায়া-শিরীষের গায়ে কাকলাস বসে থাকে, কুঞ্জলতার পাতার ঝোপে কিচির-মিচির করে চড়ুই লাফিয়ে বেড়ায়। তেজপুরের যত মিছিল মুখরতা আর চঞ্চলতার কাছে এসে যেন আরও একলা হয়ে গিয়েছে শুক্তি।

উপরতলার ঘরে মা'র কাছে বসে এখন কত কথাই না বলছেন মণিমাসি ! কিন্তু কোনও নতুন কথা নয়। সোম লজে এখন কেউ আর নেই। ওরা এখন দার্জিলিং-এ আছে। অনিমেষ কয়েকবার এসেছিল। আশা করেছিল অনিমেষ, শুক্তি নিশ্চয় কদমবাড়ি থেকে তেজপুরে শিগগির চলে আসবে। অনিমেষের মা কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, কবে আসবে শুক্তি ?

কিরণলেখা বলছেন—সুমিত্রার চিঠি পেয়েছি। শ্যামল বলেছে, নেফাতে যখন একটা গোলমাল বেধেছে, তখন ওদিকে এখন আর না থাকাই ভাল ; শুক্তির এখন কলকাতায় চলে আসাই তো উচিত।

এসব কথা আর এরকমের কথা অনেক শোনা হয়েছে। আরও শুনতে হবে, যতদিন না শুক্তির নিজের মুখের একটা কথা ওসব জল্পনার ব্যস্ততা শান্ত করে দেয়। কিন্তু তার আগে কি একটা ভাল খবরের কথা শুনতে পাওয়া যাবে না ? কী আশ্চর্য, এত খবর শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে খবরটা যেন নিরেট বোবা একটা পাথর হয়ে নেফার পাহাড়ে কোথায় কোন জঙ্গলে না বরফ-ঢাকা বাংকারের ভিতরে পড়ে আছে !

পার্লামেন্টে প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন, চিনাদের আমরা থামিয়ে দিয়েছি, উই হ্যাভ হল্টেড দেম। ভালই তো। এবাব তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দিলে আরও ভাল হয়।

রেডিওতে দিল্লির সরকারি বক্তৃতা শুনে শুনে ঝিমিয়ে পড়া, তারপর একটা বই হাতে নিয়ে, হয় চেয়ারে বসে নয় বিছানায় শুয়ে বই-এর একটা পাতাও না পড়া, তেজপুরের জীবনের দিনগুলি কেটে যাচ্ছে বেশ ; বেশ চমৎকার একটা কুয়াশার ফাঁকি। কিছুই দেখতে বুঝতে আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যিই হেসে ফেলতে আর সব ভুলে যেতে ইচ্ছে করে।

বিকাল হয়েছে ; এখন এভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকলে মা আবার ডাকাডাকি করবেন, মণিমাসি এসে হাত ধরে টানাটানি করবেন।

উঠে পড়ে শুক্তি। বার বার মিছামিছি খোঁপা বেঁধেই বা কতটুকু সময় কাটিয়ে দিতে পারা যায় ? তার চেয়ে ভাল, বাগানের রোদ গায়ে লাগিয়ে...।

চমকে ওঠে শুক্তির চোখ। জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেয়েছে শুক্তি, মালতী আর একজন অচেনা মহিলা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রাজবাহাদুরকে কী-যেন বলছে। হাত দুলিয়ে ডাক দেয় শুক্তি।—মা মালতী, এসো। ওপরে উঠে এসো।

কী আশ্চর্য, মালতীও যেন একটা ব্যস্ততা। খুব ব্যস্তভাবে কথা বলে মালতী।—দাদার কাছে শুনেছি, তুমি এখানে আছ। তাই মনে হল, তোমাকে ছেড়ে দেব কেন ? তোমাকেও কাজ করতে হবে।

শুক্তি—কাজ ?

অচেনা মহিলা বলেন—আমাদের সমিতি...।

মালতী—ইনি কমলা দত্তবড়ুয়া। প্লিডার শরৎবাবুর স্ত্রী।

কমলা—আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি, আর্মির জওয়ানদের জন্য উলের মোজা সোয়েটার কিংবা মাফলার, যা-হোক কিছু, যেটা আপনার সুবিধে হয়, বুনে দিন। খাকি রঙের উল হলেই ভাল। সোয়েটার হলে ফুল স্লিভ হবে।

শুক্তি—তাই বলুন। এই কাজ ! আচ্ছা, বেশি না পারি অন্তত একটা সোয়েটার বুনে দেব।

কমলা—আপনাকে কিন্তু আমরা উল এনে দেব না। আপনি নিজেই কিনে নেবেন।

মালতী—ওকথা আর শুক্তিকে বলবার দরকার হয় না। এখন চলুন, নতুনপাড়ার দিকে একবার যাই।

শুক্তি হাসে।—উঃ, মালতীর যেন একটা হাঁপ ছাড়বারও সময় নেই মনে হচ্ছে।

মালতী হাসে।—রাগ করো না, আবার দেখা হবে।

নানা রঙের উলের গোছা দিয়ে ঠাসা-ভরতি ঝোলাটাকে হাতে তুলে নিয়ে চলতে থাকে মালতী। বিদায় নিলেন কমলা দত্তবড়ুয়া, তাঁরও হাতে একটা ঝোলা।

মালতীর সঙ্গে দেখা হল, ভালই হল। মনের কাছে না হোক, অন্তত হাতের কাছে একটা কাজের ছুতো ধরিয়ে দিয়ে গেল মালতী। দিনের কিছু সময় একটা কাজের নামে ফুরিয়ে দিতে পারা যাবে। মা আর মণিমাসি অবশ্য মনে করবেন যে, শুক্তি খুব ব্যস্ত হয়ে একটা চ্যারিটির কাজ করছে।

উল কেনার জন্যে টাকা দিয়ে রাজবাহাদুরকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়েই সন্দেহ হয় শুক্তির, রাজবাহাদুর কি উল পছন্দ করতে ভুল করে ফেলবে না ? কিন্তু বেশ ভাল করেই তো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। রঙ খাকি হবে বটে, কিন্তু যেন খসখসে না হয়। পাকা ধানের রঙ হলেই ভাল। একেবারে চকচকে বেশমি ভাব না হোক, একটু নরম মোলায়েম ভাব যেন থাকে। কিন্তু টু-প্লাই হলে চলবে না। যা শীত, ফোর-প্লাই চাই।

ভুল সন্দেহ করেনি শুক্তি। শক্ত দড়ি-দড়ি চেহারার উল নিয়ে এল রাজাবাহাদুর ; সে উল দিয়ে সোয়েটার বুনতে শুক্তির হাতে রুচি নেই, রুচি হবেও না। আরও দু'বার বাজারে গিয়ে অনেক বাছাই করে যে উল কিনে নিয়ে এল রাজবাহাদুর, সেটা অবশ্য অপছন্দ করবার মত কিছু নয়।

কাজটা মন্দ নয়। ভালই তো লাগে। তিনদিনের মধ্যে শুধু দুপুরবেলার সময়টুকু বিছানায় গা গড়িয়ে, সোফার কোণ ঘেঁষে বসে এই সোয়েটারের যেটুকু বুনতে পারে শুক্তি, তাতেই পিঠের সবটা আর বুকের অর্ধেকটা হয়ে যায়। শুক্তির হাতে একটা কাজ ধরিয়ে দিতে গিয়ে মালতী যে সত্যিই শুক্তির মনেও একটা ব্যস্ততার ছোঁয়াচ ধরিয়ে দিয়েছে।

মিছিমিছি খোঁপাটাকে এক টানে খুলে দিয়ে মিররের সামনে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা, আর, আবার নতুন করে খোঁপা বাঁধা ; শুক্তি বসুর এই নতুন বাতিক কিন্তু এখনও বন্ধ হয়নি। উলের কাঁটা থামিয়ে রেখে, কোলের উপর থেকে উলের গোছা আর সোয়েটারের আধখানা বুক নামিয়ে রেখে হঠাৎ এক-একবার ব্যস্তভাবে সোফা থেকে উঠে পড়ে শুক্তি। মিররের সামনে এসে দাঁড়ায় আর খোঁপা খুলে ফেলে। আর, দেখতেও থাকে, কপালের মাঝখানে সেই ফিকে কালশিরার আবছা কালো দাগটা এখনও আছে, একেবারে মুছে যায়নি।

মা বোধ হয় এর মধ্যে একটি দিনও শুক্তির মুখের দিকে ভাল করে তাকাননি। তাই কপালের এই আবছা কালো-দাগটাকে দেখতে পাননি। দেখতে পেলে নিশ্চয় চোখ বড় করে আর গলা কাঁপিয়ে বলেই ফেলতেন, কোথায় মাথা ঠুকেছিস, বল ? গাড়ি থেকে নামতে, না অন্ধকারে আলোর সুইচ হাতড়াতে গিয়ে ঘরের দেয়ালে ? মনে করে দেখ !

হেসে ফেলে শুক্তি।

আর তো কোনও কাজ নেই। আর যা আছে, সেটা যেন তিনটে তিনরকম জগতের ভাষা চুপ করে শোনা, আর শুনে নিয়েই সরে যাওয়া।

তেজপুরের এই নভেম্বরি শীতের বিকালের নরম রোদের আলো গায়ে মেখে বাগানের কামিনী গাছের মাথায় একটা একলা টুনটুনি যখন চুপ করে বসে থাকে, তখন ড্রাইভার রাজাবাহাদুরও গ্যাবেজের সামনের চাতালের এক পাশে ঘাসের উপর বসে ওর মাথার নেপালি টুপির ছেঁড়াগুলিকে সেলাই করে হাসতে থাকে।

রাজাবাহাদুর বলে—বোহোৎ মজা হুয়া, দিদি।

শুক্তি—কী বললে ?

রাজবাহাদুর—লড়াইকে লিয়ে হামি চান্দা দিয়েছে সাত রূপিয়া। হাসপাতালকা জমাদারিনলোগ দিয়েছে বিশ রূপিয়া। নতুনপাড়াকা শীতল কাকাবাবু দিয়েছে দু'শো রূপিয়া। লেকিন...।

কী-যেন বলতে গিয়ে থেমে যায় রাজবাহাদুর, আর মাথা চুলকোতে থাকে। শুক্তি বলে—লেকিন কেয়া ? বলেই ফেল না।

রাজবাহাদুর—লেকিন বাবা কুছ নেহি দিয়া।

শুক্তি—কে ? মেসোমশাই ?

রাজবাহাদুর—হাঁ, দিদি। বাবা এক পয়সা নেহি দিয়া। শইকিয়া সাহেব আওর চৌধুরী সাহেবভি নেহি।

সন্ধ্যাবেলার রেডিওতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বলে—আমাদের জয় হবেই। রেডিওর গানগুলিও বলে, হবে জয়।

কালোর মা বলেন—হবে বিচার।

রাত হয়েছে। স্তব্ধ নীরব প্রহর। তারায় ভরে আছে আকাশ। কালোর মা'র গায়ে কম্বল নেই ; ছাদের উপর একটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে আছেন। আর পুরু ব্লেজার ফ্লানেলের গ্রেট-কোট গায়ে জড়িয়ে ছাদের এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়ায় শুক্তি।

কালোর মা'র কথা শুনে থমকে দাঁড়ায় শুক্তি।—কী বললেন ?

কালোর মা—বলছি, আরও কত অবিচার হল।

একগাদা অবিচারের গল্প বলেন কালোর মা।—তোমাদের ড্রাইভার কৈলাসের জেল হয়েছে। রতনের চাকরি গিয়েছে। শীতলবাবুর দোকান গিয়েছে। শিশিরের বাড়ি গিয়েছে।

হঠাৎ গল্প থামিয়ে আর জপের মালা হাতে তুলে নিয়ে চোখ বন্ধ করেন কালোর মা।

চোখে পড়ে শুক্তির, অনেক দূরের একটা গাছের মাথার অন্ধকারে মিটমিট করছে জোনাকির কুচি-কুচি আলো। আর নেফা-পাহাড়ের শক্ত নিরেট ধড় যেন কুয়াশা হয়ে গলে গিয়েছে।

শুক্তির চোখের উপরেও যেন কুয়াশা গলে পড়তে চাইছে। সরে যায় শুক্তি। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে সিঁড়ি ধরে নেমে চলে যায়।

কিন্তু থামতে বোধ হয় ইচ্ছে করে না। ঘরে ঢুকে আর বিছানাটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই আবার বের হয়ে যায় শুক্তি। যেন শুক্তির বুকের ভিতরে একটা অবিচারের গল্প আজ হঠাৎ উতলা হয়ে উঠেছে। বাঃ, এ তো বেশ অদ্ভুত ভুলো মন, একবার খোঁজ নিতে চেষ্টাও করে না, মানুষটার কী হল বা না হল ?

লোখরার প্রণব কাকা নিশ্চয় একটা কিছু খবর দিতে পারেন। এতক্ষণে কি ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রণব কাকা ? রাত এগারোটা তো এখনও হয়নি।

নীচের তলার একটি ঘরের কাছে এসে দেয়ালের গায়ের আলোর সুইচ টিপে দেয় শুক্তি। দরজা

ঠেলে দিয়ে ভিতরে ঢোকে।

টেবিলের উপর থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে আর অনেক ডাকাডাকি করেও কিন্তু কোনও ফল হয় না। এক্সচেঞ্জ শুধু বার বার ওই একই কথা বলে।—প্লিজ ছেড়ে দিন। নো পার্সোনাল কল।

শুক্তি—কেন ?

—সিকিওরিটি !

রিসিভার নামিয়ে রেখে দিয়ে শুধু একটা করুণ স্তব্ধতার মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ; চোখের তারা নড়ে না।

চমকে ওঠে শুক্তি। মণিমাসির গলার স্বর ঘরের দরজার কাছে এসে পৌঁছেছে। ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে কথা বলেন মণিমালা—এত রাতে এখানে এসে তুই কার সঙ্গে হ্যালো হ্যালো করছিস ?

শুক্তি—লাইন পেলাম না। লোখরাতে প্রণব কাকার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।

মণিমালার পিছন থেকে কিরণলেখার গলার স্বর আরও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে—কেন ?

শুক্তি হাসে।—যুদ্ধের একটা খবর জানতে ইচ্ছে হয়েছিল।

কিরণলেখা—যুদ্ধের খবর ? রেডিও তো সব সময় যুদ্ধের খবর বলছে।

শুক্তি—রেডিওতে সুজিতবাবুর কোনও খবর তো থাকে না।

হেসে ফেলে কিরণলেখা।—সুজিত কি একটা জেনারেল যে, ওর খবর বলবে রেডিও ? সবারই কথা বলতে গেলে রেডিওতে কুলোয় না।

শুক্তি—কিন্তু বলবে তো, বুমলার যুদ্ধের পর রাইফেলের লোকগুলোর কী দশা হল ? রইল, না গেল ? আছে, কি নেই ?

কিরণলেখা—সে সব খবর একদিন পাওয়াই যাবে। খবরের কাগজ আছে কী করতে ? কিন্তু সেজন্যে কি এত রাতে রিং করে প্রণবের ঘুম ভাঙাতে হবে ? খেয়ালের যে কোনও মাত্রা নেই ! তা ছাড়া আমাকে একবার জিজ্ঞেস করবি তো ?

শুক্তি আশ্চর্য হয়।—তোমাকে আবার কী জিজ্ঞেস করব ?

কিরণলেখা—আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো বলে দিতাম, প্রণব এখন লোখরাতে নেই, জোরহাটে আছে।

মণিমালা হাসেন।—যা, এবার শুয়ে পড় গিয়ে, যদি আবার রোগা হবার বাতিকে না পেয়ে থাকে।

কী আশ্চর্য ! ঘুমটাও একটা দুঃসহ লজ্জার ঘুম। বিশ্রী স্বপ্ন তাড়াতে গিয়ে ঘুমটা বার বার ভেঙে যায়। ডান পায়ের গোড়ালিতে কোনও ফুস্কুরির ব্যথা টনটন করছে না, তবু একজনের কোলের উপর পা তুলে দেওয়া ! স্বপ্নটার একটুও লজ্জা হল না। কোনও বিপদ-আপদ নেই, বাঘে-ভালুকে তাড়াও করেনি, তবু ছুটে গিয়ে একজনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরা ! ঘুম ভেঙে যাবার এতক্ষণ পরেও স্বপ্নটার ছোঁয়া যেন গায়ে লেগে রয়েছে। নিঃশ্বাসের সব বাতাস অলস হয়ে গিয়েছে। বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে। জীবনের কোনও মুহূর্তেও এমন লজ্জা পায়নি শুক্তি।

ঘুম আর হবে না। এমন ঘুম আর না হলেই ভাল। রাত আর কতটুকুই বা আছে ? আর না ঘুমোলেও চলবে। বাকি রাতটুকু জেগে বসে কাটিয়ে দিলে ক্ষতি কী ? চোখের চেহারা দেখে মণিমাসি শুধু একটু সন্দেহ করে বলবেন, আজ তোকে এত রোগা-রোগা দেখাচ্ছে কেন রে, শুক্তি ?

বিছানা থেকে নেমে পড়ে শুক্তি। আলো জ্বালে আর জানালাটাকেও খুলে দেয়।

না, এটা রাত নয়। ভোর হয়েছে। হিমেল বাতাসের কনকনে ঠাণ্ডায় গাছপালার মাথা শিউরে শিউরে কাঁপছে। দূরের শঙ্খের শব্দের মত একটা ফিকে গম্ভীর শব্দ ভেসে আসছে। ভোমরাগুড়ি ঘাট থেকে ভোরের ফেরির স্টিমার ছাড়ল বোধ হয়। স্টিমারের বিদায়ধ্বনির স্বরও শীতে কাঁপছে।

তেজপুরের এদিকে-ওদিকে সবদিকেই ধুলো উড়ছে। পথের লোক একটু বেশি তাড়াতাড়ি করে হাঁটে ; রিক্সা একটু বেশি বেগ নিয়ে দৌড়ে যায়। আর গাড়ির হর্নের শব্দগুলি যেন ছুটে চলে যাবার জন্য একটা হঠাৎ-ব্যাকুলতার চিৎকার।

তোয়াং-এর গোমফার বুদ্ধমূর্তির কাছে দীপ জ্বেলে দিতে সেখানে কেউ আর আছে কিনা, ঠিক বুঝতে পারা যায় না। বরং সন্দেহ হয়, কেউ বোধ হয় নেই।

চলে এসেছে, চলে আসছে, আরও চলে আসবে নিশ্চয়, ঘর-ছাড়া যত মোনপা ভোটিয়া আর শারদুকপেন।

আসছে, এসে পড়েছে, আশ্রয় ক্যাম্পের দিকে চলে যাচ্ছে ঘর-ছাড়াদের এক-একটা দল। অনেক রিনচিন আর অনেক ত্রিং, লেই, দোরজি, সাংগে, সাংজা আর কেজাং ; ওরা বড় গম্ভীর।

মাথাতে মোটা মোটা বেণী দুলছে যাদের, রিলিম, সোনাম, পেম, আর পুতি ; ডোয়েমা হোক বা লামু হোক, ওরা সবাই মিটিমিটি হাসে।

ছোয়াং, মেদি, ডাবু আর নোরবু ; বুড়ো আচি সেতু আর ছোকরা মুখরো সেতু ; ওরা বেশ বিরক্ত হয়ে তাকায় আর হাঁপায়।

ওদের কাঁধে পিঠে আর মাথায় বোঝা, ওদের টাট্টু খচ্চর আর বুড়ো ঘোড়ার পিঠে বোঝার ভার। ধুলোমাখা হয়ে, হেসে কেশে রেগে হাঁপিয়ে আর ফুঁপিয়ে, অসহায় ক্লান্তির মিছিলের মত রো তেজপুরের গা-ঘেঁষা সড়ক ধরে চলে যাচ্ছে। বাচ্চা-কাচ্ছা, বুড়ো-বুড়ি আর ছোঁড়াছুঁড়ি ; কে না আছে ?

কিন্তু কোনও দফলা-গাঁয়ের একটিও মানুষ আসেনি। রতন যতই ছুটোছুটি করুক, কঠিন আশার মূর্তি হয়ে সড়কের মাইল-স্টোনের উপর বসে আর চোখ তুলে আগন্তুকের মিছিলের মধ্যে চেনামুখ খুঁজতে যতই চেষ্টা করুক, শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে যায় রতন।

ক্লাস ওয়ান টু থ্রি আর ফোর ; নেফার সরকারি কাজের উত্তমাধম সবাই চলে আসছেন। উত্তমেরা অনেকে একটু আগে এসে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার কোথায় যেন চলে গিয়েছেন। নর্থ ব্যাঙ্কের এদিকে কোথাও নয়, হেথা নয়, আরও দূরে ; অন্য কোনওখানে।

চলে গিয়েছেন দশটি বাড়ির মালিক লাহিড়ি মশাই, তাই হীরকের গলার স্বদেশি গানের কাকলি আর শোনা যায় না। চলে গিয়েছেন একুশটি বাড়ির মালিক শৈলেশ্বর শইকিয়া। চলে যাবার জন্যে ছটফট করছেন ইনকাম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরী ; সিক লিভ চেয়ে দরখাস্ত করেছেন, তার উপর গৌহাটিতে তিনবার টেলিগ্রাম করে রিমাইণ্ডারও দিয়েছেন। চার্টার্ড প্লেন উড়ে উড়ে এসেছে, আর এদিক-ওদিকের যত চা-বাগানের বিদেশি সাহেবকে সপরিবারে তেজপুরের মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে।

মণিমালার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে, আজকের দিনটা যে স্মরণ করে খুশি হবার একটা দিন। অনেক আনন্দের স্মৃতি দিয়ে চিহ্নিত একটি দিন, যেদিন এই ভারতীর ফটকের দু'পাশে দুটি মঙ্গলঘট রেখে তিনি গৃহপ্রবেশ করেছিলেন। মুগার চাদরটি গায়ে জড়িয়ে আগে-আগে চলেছেন মহিমবাবু, পিছনে মণিমালা। তাঁর হাতের থালার উপর কর্পূরের বাতি জ্বলছে। সেদিনটি ছিল আজকেরই মত একটি আঠারোই নভেম্বর।

কোনও বছরে এই দিনটিতে গগনবাবু কিরণদি আর শুক্তিকে কাছে পাননি মণিমালা। তাই তাঁর ইচ্ছে হয়েছে, খুব একটা হই-চই উৎসব নয়, একটু হাসিখুশির কলরব নিয়ে গৃহপ্রবেশের বার্ষিকীর দিনটা সুখী হোক। কিংবা বোধ হয় ছানার পোলাও, রুইয়ের পেটি দিয়ে কোর্মা আর সরভাজা তৈরি করবার মত একটা দিন খুঁজছিলেন মণিমালা। আজ সেইরকম একটি দিন পেয়েছেন।

নিজে খাটলেন, কালোর মা তো খাটছেনই ; তার উপর শুক্তিকেও একটু না খাটিয়ে থাকতে পারলেন না মণিমালা। শুক্তিকে দিয়ে সর ভাজিয়ে নিলেন।

দিনটাও না হেসে থাকতে পারবে কেন ? ভাজতে গিয়ে প্রথমেই সরের তিনটে পিস কড়া জ্বালে

পুড়িয়ে লাল করে দিয়ে শুক্তি যখন আতঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, সর্বনাশ হল, সব গেল মণিমাসি, তখন শুক্তির হাত থেকে ঝাঁঝরাটাকে কেড়ে নিয়ে হেসে ওঠেন মণিমালা।

কিন্তু শুধু একবার, আর ভুল হয়নি শুক্তির।

দুপুরবেলায় খাবার টেবিলের উপর দিয়েও মাঝে মাঝে যেন হাসির শব্দ গড়িয়ে যায়। গগন বসু বলেন— প্রণবের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে শান্তিপুরে গিয়ে যে সরভাজা খেয়েছিলাম, তার স্বাদ মনে আছে। কিন্তু আজকের সরভাজা খেয়ে মনে হচ্ছে, আরও পাকা কোনও কারিগরের হাতের সরভাজা ; অদ্ভুত স্বাদ।

মহিমবাবু— হ্যাঁ ; আমাদের তেজপুরের লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হরগোবিন্দ খুবই ওস্তাদ কারিগর।

গগন বসু— ভুল নাম বললেন, মহিমবাবু !

মণিমালাব মুখের দিকে তাকিয়ে মহিমবাবু হাসেন। — বোধ হয় গোলকবিহারীর দোকানের সবভাজা ? তাই না ?

গগন বসু—না, কারিগরের নাম হল শুক্তি বসু।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে মহিমবাবু কুণ্ঠিতভাবে হাসেন।— তুই ? কলকাতার কলেজে সরভাজাও শেখায় নাকি ?

শুক্তি— না। তেজপুরের ভারতী কলেজে শেখায়।

মহিমবাবু— ভারতী কলেজ ?

শুক্তি— জানেন না ?

মহিমবাবু— না। কখনও তো শুনিনি।

শুক্তি— প্রিন্সিপালের নামটাও শোনেননি ?

মহিমবাবু— না।

শুক্তি—তা হলে শুনবেন ? বলব ?

মহিমবাবু— বলবি বইকি।

শুক্তি— নাম, শ্রীযুক্তা মণিমালা দস্তিদার।

হাসতে গিয়ে গগনবাবুর হাতের চামচ পড়ে যায়। কিরণলেখা হাসি চাপতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শুক্তিকে ধমক দিতে গিয়ে হেসেই ফেলেন। —মুখ-কাটা মেয়ে—এরকম একজন গম্ভীর গুরুজন মেসোর সঙ্গে কি-রকম ঠাট্টা তামাসা শুরু করেছে।

মহিমবাবু এইবার কিরণলেখার মুখের দিকে তাকান।— মনে হচ্ছে, আপনিই শুক্তিকে এই ঠাট্টাটা শিখিয়ে দিয়েছেন।

মণিমালা, ব্যাপার দেখে সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন যিনি, তিনি তাঁর হাসির ভার সামলাতে গিয়ে কোনও কথাই বলতে পারেন না।

বিকাল হতেই গানের মিষ্টি সুরের ছোঁয়া লেগে ভারতীর ঘরের বাতাসও মিষ্টি হয়ে গেল। শুক্তিকে বেশি বলতে হয়নি, শুধু একবারই বলেছিলেন মণিমালা— কতদিন তোর গান শুনিনি শুক্তি।

শুক্তির গান শেষ হবার পর মণিমাসি আরও খুশি হয়ে বলেন— শুক্তির গলার এত মিষ্টি গান আমি আগে কখনও শুনিনি।

কী যেন ভেবেছেন কিরণলেখা ; শুক্তির ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর চোখে যেন আর-একটা উৎসবের আশার ছবি আজ খুব ব্যস্ত হয়ে হাসছে।

যদি এখন মালতী হঠাৎ উপস্থিত না হত, তবে বোধ হয় এখনই শুক্তির ঘরে ঢুকে আর শুক্তিরই চোখের সামনে বসে গল্প করতেন কিরণলেখা।

—এসো মালতী। ডাক দিলেন কিরণলেখা।

চমকে ওঠে শুক্তি। মালতীকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়েও শুক্তি যেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে হাসে। —এখনও ফিনিশ করতে পারিনি মালতী।

মালতী— এতদিনের মধ্যে একটা সোয়েটার বুনে দিতে পারলে না ? একটু তাড়াতাড়ি করো, শুক্তি।

চলে গেল ব্যস্ত মালতী। শুক্তির ঘরে ঢুকে কিরণলেখা হাসেন। —আজ নিশ্চয় স্পষ্ট করে বলতে পারবি। তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম।

বুঝতে অসুবিধে নেই শুক্তির, মা এখন কিসের জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। তেজপুরের বাতাসের ধুলো লালচে গোধুলির মত রঙিন হয়ে উঠতে চাইছে।

কিরণলেখা— আর তো দেরি করা উচিত নয়। ভেবে দেখতে এত দেরিই বা হবে কেন ? তুমি বড় হয়েছ, তোমার তো বুঝে নিতে কোনও অসুবিধে নেই।

শুক্তির নীরব মুখটার উপরেও যেন রঙিন গোধুলির একটা আভা লুটিয়ে পড়েছে। কিরণলেখা বলেন— তুমি কৃষ্ণার মত একটা খুকু মেয়ে হলে, কিংবা ষোলো বছর বয়সের একটা বোকা অবুঝ মেয়ে হলে তোমাকে কিছু জিজ্ঞেসা করতাম না। যা করতাম আমরাই করতাম। তা ছাড়া, তোমার বাবার ইচ্ছের কথাটাও তো জান ; তুমি যা বলবে, তাই হবে।

শুক্তি বলে— বলব। আর দেরি হবে না।

কিরণলেখা— কবে বলবি ?

শুক্তি— আজই।

কিবণলেখার মুখের শান্ত হাসিটা যেন নিবিড় তৃপ্তি নিয়ে থমথম করে। চলে যান কিরণলেখা।

টেবিলের উপর পড়ে আছে উলের গোছা, কাঁটা দুটো আর পরিপাটি করে গোটানো সোয়েটার। ঠাসা বুনোট পেয়ে উলের পাকা ধানের রঙ আরও ঘন আর চকচকে হয়েছে। বুকের সবটাই হয়েছে, পুরো একটা হাতও হয়ে গিয়েছে। আর একটা হাতের অর্ধেক হয়েছে। এত কুঁড়েমি না করলে বাকি অর্ধেক হাতটাও কবেই হয়ে যেত।

না, আজ আর ইচ্ছে করে না। শুধু হাত দুটো নয়, মনটাও আর ওই উলের কাঁটা ধরবার জন্য ব্যস্ত হতে চায় না। বরং চুপ করে খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে।

সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। নেফার পাহাড়ের মাথায় রোদের ছোঁয়া সিরসির করে কাঁপছে। আর ক্লান্ত স্বরে গুরগুর শব্দ করে উড়ে আসছে দুটো হেলিকপটর ; পাখাতে রোদের আভার সোনা-রং জ্বলছে। দুটো সোনালি পাখি বলে মনে হয়।

কিন্তু রাজবাহাদুর যেন কেমন অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করে, আর ছোট ছোট চোখ দুটোকে কুঁচকে আরও ছোট করে দিয়ে, আর্ত মানুষের মত একটা বিষাদের মুখ নিয়ে হেলিকপটর দুটোব দিকে তাকিয়ে আছে।

—ওরকম করে কী দেখছ রাজবাহাদুর ? জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে হেসে ফেলে শুক্তি।

রাজবাহাদুরের গলার স্বর ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে। — জওয়ানকা লাস আতা হ্যায়, দিদি।

—কী বললে ? প্রশ্নটা যেন শুক্তির বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে দিয়ে আর স্তব্ধ নিঃশ্বাসটার ভিতর থেকে ঠিকরে বের হয়ে আসে।

রাজবাহাদুব বলে— জখম লোগভি আতা হ্যায়।

শুক্তি— কিন্তু কোথায় আতা হ্যায় ?

রাজবাহাদুব বলে— এয়ারপোর্টকা ময়দানমে ; কিন্তু আমি ঠিক জানি না দিদি।

সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। কত তাড়াতাড়ি কালো হয়ে গেল আর কনকনে ঠাণ্ডায় ভরে গেল তেজপুরের শীতের এই অদ্ভুত সন্ধ্যা।

শুক্তির ঘরের ভিতরে কিন্তু দপ করে আলো জ্বলে ওঠে। কে যেন ঘরে ঢুকেছে। আর সুইচ টিপেছে। মুখ ফিরিয়ে না তাকিয়েও বুঝতে অসুবিধা নেই শুক্তির, কে এসেছে।

কিরণলেখা বললেন— শুক্তি, চা খাবি চল।

কিন্তু কিরণলেখার এই স্নিগ্ধ আহ্বানের শান্ত হাসিটাকে চমকে দিয়ে ধুলো-ধুলো করে দেয় শুক্তির মুখের একটা কথা, শুকনো পাতার ঝড়ের মত একটা কথা— আমি কিন্তু আজ কিছুই বলতে পারব না, মা।

কিরণলেখা— কেন ?

শুক্তি— সুজিতবাবুর একটা খবর না পেয়ে আমি কিছুতেই বলতে পারব না।

কিরণলেখা— কেন ?

শুক্তি— আমার কথায় চাকরি নিয়ে একটা মানুষ খুশি হয়ে যুদ্ধ করতে বুমলাতে চলে গেল। আজ পর্যন্ত তার কোনও খবরই পাওয়া গেল না। ভাবতে আমার খুব খারাপ লাগছে ; লজ্জা হচ্ছে, স্বস্তিও পাচ্ছি না।

কিরণলেখা— কথাটা ঠিক। আমারও তো কয়েকবার মনে হয়েছে, কী হল ছেলেটার ? কিন্তু সেকথা ভেবে এদিকের সব কিছু তো অন্ধকার করে রাখা চলে না। সেটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

শুক্তি— কিন্তু এরকম বিশ্রী একটা অস্বস্তির মন নিয়ে আমিও যে কিছু বলতে পারছি না। বলতে ইচ্ছেই করছে না, বলতে ভালও লাগছে না।

কিরণলেখা— অদ্ভুত তোমার মন। বড় গোলমেলে মন।

শুক্তি হাসে। — তুমি আমাকে মিথ্যে নিন্দে করছ, মা।

কিরণলেখাও হাসতে চেষ্টা করেন। —বড় নরম মন তোমার। যাই হোক, এখন তা হলে জোরহাটে তোমার প্রণব কাকার কাছে একটা চিঠি দিয়ে দেখো, সুজিতের কোনও খবর পাওয়া যায় কিনা।

ও কী ? রাস্তা দিয়ে একটা হল্লা ছুটে গেল কেন ? এগিয়ে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিরণলেখা। ফটকের কাছে আবছা আলো-আঁধারের ভিতর থেকে রাজবাহাদুরের গলার স্বর চেঁচিয়ে ওঠে। —সেলা খতম।

—দুঃখের বিষয়...। ওদিকের ঘরে কড়কড় করে বেজে উঠেছে রেডিও। —আমাদের সেলা ঘাটির পতন হয়েছে। শত্রুর হামলা আরও এগিয়ে এসেছে ; আমাদের জওয়ানেরা পিছিয়ে এসে বমডিলার ঘাটিতে দাঁড়িয়েছে। দিনরাত যুদ্ধ চলছে।

টলমল করে তেজপুর। খবরের চকিত আঘাতে আহত আর উদ্বিগ্ন তেজপুর। সিনেমা হাউসের কাউণ্টারে টিকিট-কেনার ভিড়ও বিচলিত হয়ে সরে যায়। রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সিট বুকিং-এর তাড়াহুড়ো ব্যস্ততার ভিড়ে ভরে যায়। বড়-বড় আর ভাল-ভাল অনেক মোটরকারের ধকধকে জ্বলন্ত হেডলাইট এয়ারপোর্টের সড়ক ধরে ছুটে চলে যেতে থাকে।

নীচের তলা থেকে একটা উতলা কণ্ঠস্বরও যেন টলমল করে আর সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে। —মা, আপনি কোথায় ? একবার দেখুন এসে, বাবা কার সঙ্গে কী সব অদ্ভুত কথা বলছেন।

কালোর মা এসে যে কথা বলেন, সে কথা ভারতী নামে এই বাড়িটারই অদৃষ্টের একটা ভয়ানক খবর। —বাড়ি বিক্রী করতে চাইছেন বাবা।

কালোর মা'র কথা শুনে মণিমালার চোখেও একটা নির্বোধ বিস্ময় টলমল করে। নীচে চলে যান মণিমালা। গগন বসু আর কিরণলেখাও নামেন, পিছনে শুক্তি।

মহিমবাবুর হাতে বাড়ি-বিক্রীর একটা ডিডের খসড়া। টেলিফোনে কথা বলছেন মহিমবাবু। —আপনি আজ এখনই চলে আসুন মিস্টার দোরজি। আমার সবই রেডি।...ও ইয়েস, আজই তেজপুর ছেড়ে চলে যাব।...না, কোনও আক্ষেপ নেই। টাকা হাতে থাকলে সবই আমার দেশ।

টেলিফোনের আলাপ বন্ধ হবার পর গগন বসুর দিকে তাকিয়ে আর মৃদুভাবে হেসে কথা বলেন মহিমবাবু। —এবার চিনারা এসে গৃহপ্রবেশ করুক ; আমার কোনও আপত্তি নেই, আমার আর কোনও আক্ষেপও নেই, গগনবাবু।

গগন বসু—আপনার কথা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

মহিমবাবু— বাড়ি বিক্রীর ব্যবস্থা করে ফেলেছি। কালিম্পং-এর মার্চেন্ট মিস্টার দোরজি এই বাড়ি কিনতে রাজি হয়েছেন।

—শুনলে তো কিরণদি। কী সুন্দর ব্যবস্থা। আমার গৃহপ্রবেশের স্মরণদিন কী চমৎকার স্মরণীয়

হয়ে উঠল। মণিমালার দু'চোখ থেকে বড়-বড় জলের ফোঁটা ঝরতে থাকে।

মহিমবাবু— আমি আজই রাত্রে তেজপুর ছেড়ে চলে যাব। আপনি কী করবেন, গগনবাবু ?

গগন বসু—যা বলেন। থাকতে বলেন, থাকব ; যেতে বলেন, যাব। আর, এরা কেউ যদি আমাকে বাধা না দেয়, আমি তবে কদমবাড়িতে চলে যাব। আমার তো কোনও অসুবিধে নেই।

কিরণলেখা— আমরা তা হলে কলকাতা চলে যাই।

কালোর মা বলেন— আমি আর কোথায় যাব ? শিববাড়ির মন্দিরে গিয়ে পড়ে থাকব।

এতক্ষণ মণিমালার হাত ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল শুক্তি। এইবার আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে মহিমবাবুর চোখের সামনে দাঁড়ায় আর হাসতে থাকে। —মেসোমশাই !

শুক্তির মুখের হাসিটাও অদ্ভুত , যেন দুরন্ত-করুণ একটা আবেদন। মহিমবাবু বলেন— তুই আবার কী বলতে চাইছিস ?

শুক্তি— রাগ করে বাড়িটা বিক্রী করবেন না মেসোমশাই।

মহিমবাবু— কিন্তু...।

শুক্তি— না না, আপনি আর কোনও কিন্তু-টিন্তু বলবেন না। বলতে বলতে মহিমবাবুর হাতের উপর লুটিয়ে পড়ে বাড়ি-বিক্রীর ডিডের খসড়াটাকে ধরে টানাটানি করতে থাকে শুক্তি।

মহিমবাবু— ওরকম করতে নেই শুক্তি। তুমি সংসারের নিয়মকানুন বোঝ না।

শুক্তি— হ্যাঁ, আমি কিছুই বুঝি না, বুঝবও না। কিন্তু আপনি এটাকে এখন আমার কাছে রেখে দিন।

মহিমবাবু— কিন্তু গবমেণ্ট তো আমার সম্পত্তি বাঁচাতে পারবে না।

শুক্তি— দেখুন না, কী হয় ? আরও ক'টা দিন ধৈর্য ধরতে দোষ কী ?

মহিমবাবু— আর ধৈর্য !

মুখ ফিরিয়ে নিলেন মহিমবাবু ; শুক্তির হাতে খসড়াটাকে ফেলে দিলেন।

কিরণলেখার চোখে তবু একটা প্রশ্নের ছায়া লেগে থাকে।— আজই যদি চলে যেতে হয় তবে...।

মণিমালা চেঁচিয়ে ওঠেন। —না, কখনও না, কারও যাওয়া হবে না। এত যাব-যাব করবার মত কিছু হয়নি।

॥ ২০ ॥

আবার একটা খবর। এ খবর যেন তেজপুরের শেষ আশার উপর একটা কঠোর ঠাট্টার বিস্ফোরণ, শেষ ধৈর্যের উপর একটা রূঢ় ধিক্কার আর শেষ বিশ্বাসের উপর একটা তিরস্কারের ঘোষণা। সন্ধ্যার রেডিও বলে দিল— বমডিলা শেষ !

রাতের রেডিওতে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা জানিয়ে দিল— আসামের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রইল।

রাতের আকাশে একটি হেলিকপ্টার তীব্র আলোর ছটা ছড়িয়ে ঘুরিয়ে নীচের তেজপুরের চেহারা দেখতে থাকে, কেমন করে ছটফট করছে তেজপুর।

পথের জনতার মুখে আতঙ্কের রব— চিনা প্লেন ! বোমা ফেলবে চিনারা !

শিশির অমল আর আরও কয়েকটি ইয়েস ছেলে সারা শহর ছুটোছুটি করে বলে বেড়ায়— চিনা প্লেন নয় ; আমাদের হেলিকপটর।

তেজপুরের ঘরে ঘরে রাত-জাগা মানুষের প্রাণ ছটফট করে। পাড়ায় পাড়ায় বাড়ির দরজার কাছে ঘরের মানুষের জটলা আর অনিশ্চয় অদৃষ্টের গুঞ্জন— যাব কি যাব না ? থাকতে পারা যাবে কি যাবে না ? আর থাকা উচিত হবে কি ?

গোটা পাঁচেক আতঙ্কিত সাইকেল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে যায়।— চিনা আহিল ! চিনা আহি গইছে। চিনালোগ আ গিয়া ! এসে পড়েছে চিনারা !

—কোথায় ? কোথায় ? কত দূরে ? একসঙ্গে শত লোকের শত মুখের করুণ প্রশ্ন হল্লা করে বেজে ওঠে।

—এই তো বালিপাড়ার কাছে এসে পড়েছে। আতঙ্কিত সাইকেলের ছুটন্ত ছায়া পাড়ার রাস্তা ছাড়িয়ে উধাও হয়ে যায়।

জগদীশ হিতেন আর আরও কয়েকটি ছেলে সাইকেল নিয়ে ছুটে ছুটে ভুল আতঙ্কের ঝড় শান্ত করতে চেষ্টা করে। —না না, সব মিথ্যে কথা। বাজে কথা, ওসব গুজবে একটুও বিশ্বাস করবেন না।

—কিন্তু মশাই, এটাও কি একটা বাজে গুজব যে, টাস্কারের দল দুমদাম করে সব সরঞ্জাম আছড়ে ভেঙে পুড়িয়ে আর গুঁড়ো করে দিয়ে সরে পড়ছে ?

জগদীশ বলে— শুনেছি, ওরা নানারকম কাণ্ড করে পালিয়ে যাচ্ছে।

—টাস্কাব অফিসার-মেস তো একেবারে শূন্য। নয় কি ? ওরা বোধ হয় কালকেই যঃ পলায়তি স জীবতি করেছে !

হিতেন হাসে। — তাই তো মনে হয়।

পাড়ায় পাড়ায় মিলিটারির অফিসারদের ভাড়া-করা এক-একটি বাড়ির ভিতরে নিঃশব্দ চুপি-চুপি ব্যস্ততা। লটবহর বাঁধাছাঁদা করে তৈরি হয়ে গিয়েছে অফিসারের দারা-সুত-পরিবার। হুস হুস করে মিলিটারির জিপ আসছে, আলো মৃদু করে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে। অফিসারের প্রিয়-পরিজনে বোঝাই হয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে মিলিটারি জিপ।

—ও শিশিরবাবু, মিলিটারির সব ফ্যামিলি যে চমৎকার সরে পড়ছে।

শিশির বিব্রতভাবে বলে— তা, কী আর করা যাবে বলুন।

—কিন্তু মুরগিব খাঁচা আর মদের বোতলের বাক্সে বোঝাই হয়ে মিলিটারির ট্রাকও যে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে শুরু করেছে।

অমল— হ্যাঁ, দেখেছি।

—একবার খোঁজ নিলেই তো পারেন, আমাদের মেজর কর্নেল আর ক্যাপ্টেন মশাইরা আর্মি কোয়ার্টারে এখনও আছেন, না কেটে পড়েছেন ?

শিশির— মনে হচ্ছে, এখন ওরা বোধ হয়...।

—চম্পট দেবার তালে আছেন বোধ হয়।

শিশির— তাই তো মনে হয়।

—জওয়ান মশাইরাও কি বোঁচকাবুঁচকি কাঁধে তুলে ফেলেছেন ?

অমল—তাঁবুও গুটিয়ে ফেলছে।

—এরাও কি বমডিলার টাইগারদের মত জঙ্গলে ঢুকে পড়বে ?

অমল— সেটা আমি কী করে বলি ? তবে শুনেছি, ওরা শিলিগুড়ির দিকে সরে পড়তে চায়।

—লজ্জার কথা ! এই সব চম্পটপটু বীরদের জন্যেই না শীতের রাতে বাচ্চা ছেলেটার গা'র উপর থেকে লেপ তুলে নিয়েছি আর দান করেছি। ছিঃ।

যাব কি যাব না ? রাত-জাগা শহরের স্বস্তিহীন প্রাণের আক্ষেপ আর প্রশ্ন ভোরের আলো দেখতে পেয়েও কোনও ভরসার সঙ্কেত দেখতে পায় না। বরং দেখা যায়, একরাতের মধ্যেই শহরের এখান-ওখান থেকে কেউ যেন এক-একটা খাবলা দিয়ে মানুষের সাড়া তুলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। নীরব হয়ে গিয়েছে বড়-বড় বাড়ি। গ্যারাজ খালি। এয়ারপোর্টের এপাশে-ওপাশে সব ডাঙা জুড়ে প্রভুবিহীন মোটরকার ছড়িয়ে পড়ে আছে।

দোকানে বেচা-কেনার সাড় জাগে না, যদিও সকালবেলার রোদ তেতে উঠে বেলা বাড়িয়ে দিতে থাকে। সড়কের পাশে অলস হয়ে পড়ে আছে রিক্সার সারি। পানওয়ালার দোকানের ঝাঁপ অর্ধেক খোলা। কোর্ট কাছারি নিঝুম।

চক-বাজারের পথের জনতা হঠাৎ চমকে ওঠে, ও কী ? কী বলছে মাইক।

—আপনা লোকে যেনে পারে টাউন এরি নিরাপদ ঠাঁই লৈ যাওক। আপনা লোকে যেনেকৈ

পারে...। উচ্চকিত মাইকের স্বরে উপদেশ প্রচার করে করে চলে যাচ্ছে সরকারি পাবলিসিটির মোটর ভ্যান।

টলমল তেজপুর ভেঙে পড়ে। ধরো বাস, ধরো ট্রাক, ধরো ট্রেন, চলো ভোমরাগুড়ি ঘাট।

নেবাও উনানের আগুন, হাঁড়ি নামিয়ে রাখো, চলো, বেরিয়ে পড়ি।

গরুর গলার দড়ি খুলে দাও, থাক সাইকেলটা বারান্দাতেই পড়ে থাক। শুধু নগদ টাকা-পয়সা আর গয়না-টয়না যা আছে একটা ছোট বোঝাতে ভরে নাও। আর যদি পার তো সের দুয়েক চাল, কয়েকটা আলু আর নুন।

আরে, রেখে দাও এখন তোমার নিত্যসেবার দেবী এই পিতলের জগদ্ধাত্রীটাকে ; শিববাড়ির মন্দিরের দরজার কাছে রেখে দিয়ে চলে এসো। ট্রাক না পাই হেঁটেই রওনা হব।

আঃ, মানুষ বসতে জায়গা পাচ্ছে না, আপনি আবার আপনার টিয়ে পাখিটাকে খাঁচাসুদ্ধ ট্রাকে তুলছেন। উড়িয়ে দিন ওটাকে আর খাঁচাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিন।

না মশাই, চলুন আমরা বরং ভোমরাগুড়ি হয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে চলে যাই। সড়ক ধরে যেতে হলে ধানসিরি ব্রিজের কাছে আটক হয়ে পড়ে থাকতে হবে। কেন জানেন তো ? শোনেননি কিছু ? আগে মিলিটারি পালাবে, তারপর আমরা সিভিলেরা। শীতলবাবুর ট্রাক বোকা হয়ে ফিরে এসেছে।

না, ভোমরাগুড়ি ঘাটে খুব বেশি অসুবিধে হবে না। ওখানে ইয়েস ছেলেরা আছে। ওরা খুব যত্ন করে স্টিমারে তুলে দেয়।

পুলিশ কোথায় ? সরকারি কেষ্টবিষ্টুরা কোথায় ? সবাই বুঝি ভাগোরথী হবার চেষ্টায় আছে। শুধু এই কয়েকটা ইয়েস ছোকরা আর কত ছুটোছুটি করে খাটবে ?

একজন নিওমোনিয়া রোগী, তিনটি পোয়াতি মানুষ, আর একজন অন্ধ ; আমাদের পাড়ার এই মানুষগুলোর কী গতি হবে, ও শিশিরবাবু ? এরা যাবে কী করে ?

শিশির— চিন্তা করবেন না। একটু অপেক্ষা করুন। আমরা ঠিক সময় মত এসে এদের ট্রাকে তুলে নিয়ে ভোমরাগুড়ির ঘাটে পৌঁছে দেব।

যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়ে চলে যেতে থাকে শহরের অসহায় প্রাণটার যত দুঃখ আক্ষেপ আর আতঙ্কের কলরব। ব্যাগ ঝোলা ও পোঁটলা হাতে নিয়ে বাড়ির মানুষ পথের উপর ছোট ছোট ভিড় হয়ে আর ট্রাকের আশায় উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিকেল ফুরিয়ে যায়, সন্ধ্যা ফুরিয়ে যায়, রাত হয় ; তবু ওরা নড়ে না। সাড়া জাগে তখন যখন এক-দুজন ইয়েস ছেলে ট্রাক নিয়ে এসে ডাক দেয়— চলে আসুন।

তেজপুরের এই রাত , কী অদ্ভুত একটা চটুল-নিলাজ কালো রাত। কত তাড়াতাড়ি খালি হয়ে গেল, নীরব নির্জন আর স্তব্ধ হয়ে গেল শহরটা !

সার্কিট হাউসে আলো নেই। থানাতে পুলিশ নেই। হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, মেথর কেউ নেই। একলা রোগী বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। জেলে কয়েদি নেই, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাগলা ফটক খুলে দেওয়া হয়েছে।

পদ্মপুকুরের কিনারায় মাঠের ঘাসের উপর দাউ-দাউ করে নতুন নোটের স্তূপ জ্বলেছে আর পুড়ছে। ছায়া-ছায়া চেহারা, কারা যেন আবার ওদিকের এক অন্ধকারে ভয়ানক এক গোপন অন্ত্যেষ্টির মত সরকারি অফিসের যত টাকার হিসাবের খাতা আর ফাইল পুড়িয়ে ফেলেছে। শেয়াল ডাকছে ব্রহ্মপুত্রের চরে।

আর, বড়লোকের বাড়ি হয়েও, গ্যারেজে দুটো গাড়ি থাকতেও, ভারতীর নীচের তলার বড় ঘরে রাত-জাগা আলো জ্বলছে। এবাড়ির মানুষগুলি এখনও যায়নি।

সামনের সড়কের অন্ধকারের মধ্যে একটা জ্বলন্ত টর্চের আলো দুলছে। থেমে আছে হিতেনের সাইকেল। ভারতীর গেটের কাছে এগিয়ে এসে ডাক দেয় হিতেন। —এ বাড়ির কেউ এখনও আছেন নাকি ?

বাজবাহাদুর জবাব দেয়। —আছে। কেন ?

হিতেন— এখন তো চলে যাওয়াই ভাল।

আবার টর্চ দুলিয়ে আর সাইকেল ছুটিয়ে চলে যায় হিতেন।

কিরণলেখা বলেন— শুনলি তো শুক্তি। এখন চলে যাওয়াই ভাল।

শুক্তি— হ্যাঁ...কিন্তু আর একটুখানি থেকে যাই, মা।

যাবার জন্য তৈরি হয়েই আছে এ বাড়ির সব মানুষ। যা কিছু সঙ্গে নেবার ছিল, তার সবই দুই গাড়িতে তোলা হয়ে গিয়েছে। তবু যে রওনা হতে এত দেরি হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ আর কিছু নয়, শুধু ওই শুক্তি।

মণিমালা তো অনেকক্ষণ হল চোখ মুখে শান্ত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু শুক্তি হঠাৎ আনমনা হয়ে গিয়েছে। যেন চলে যেতে বাধছে। যেন বিপদের সঙ্গে প্রাণটাকে জড়িয়ে নিয়ে বসে থাকাও একটা মায়ার খেলা। তাই বার বার অনেকবার শুধু ওই একটি কথা বলে এই চলে যাওয়ার ব্যস্ততাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে শুক্তি। —যাচ্ছিই তো, কিন্তু একটু দেরি করো মণিমাসি।

মণিমালা— কিন্তু আর দেরি করা কি উচিত হবে ? শহরে তো আর কেউ আছে বলে মনে হয় না।

সত্যিই কি তেজপুরের কোনও ঘরে কেউ আর নেই ?

আছে। নতুনপাড়ার শীতল বিশ্বাস আছেন ; এই মাঝরাতে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে নড়বড়েএকটা পুরনো ট্রাকের চাকায় জল ঢালছেন। আর, রতন যেন একটা নতুন আশার কালো-ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায় ; মাঝে মাঝে ডাকবাংলোর কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। এক-একবার শিশিরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। শিশির বলে— জ্বর গায়ে নিয়ে তুমি আবার এত রাতে মিছিমিছি ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? বাড়ি যাও রতন।

আছে ; শীতল বিশ্বাসের মত আরও দু'চারজন এখনও আছে, যারা বুঝে নিয়েছে যে, রামেও মারবেন রাবণেও মারবেন, পালিয়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই।

আর আছেন তাঁরা, যাঁরা মুখ লুকিয়ে সরে পড়বার জন্য মাঝরাতের গভীর অন্ধকারটার অপেক্ষায় এতক্ষণ আড়ালে অদৃশ্য হয়েছিলেন।

হেসে ফেলে শিশির। —ওই দেখো অমল, দণ্ডমুণ্ডের একজন মহাপ্রভু কেমন চুপি-চুপি সরে পড়ছেন।

ঠিকই, অগ্নিগড়ের উঁচু টিলার মাথাতে একটি সরকারি অফিসার-ভবনের জানালার আলো হঠাৎ নিভে গেল, আর সড়ক ধরে একটা গাড়ি আস্তে আস্তে গড়িয়ে এসে তারপর জোরে স্পিড নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

—কিন্তু ওখানে একটা গাড়ি যে পিছু-বাতি নিবিয়ে দিয়ে একেবারে চুপটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। চলতে চলতে কথা বলে অমল। গাড়িটার কাছে এসে টর্চ ফ্ল্যাশ করে শিশির।

চমকে ওঠে অমল। —অ্যাঁ ? মাফলার দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে একটা বুদ্ধুর মত গাড়ির ভিতরে বসে আছে, কে ওটা ?

শিশির বলে— তাই তো ! এ যে দেখছি বিখ্যাত নেফা-অফিসার মিস্টার মনোহর লাল, নেফা যার জমিদারি। কথা বলতে গিয়ে শিশিরের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে।

গাড়ির বাম্পারের উপর একটা পা তুলে দিয়ে অমল চেঁচিয়ে ওঠে। — আপনার তো পালিয়ে গেলে চলবে না স্যার। আপনি চলে গেলে ইনার লাইন যে কেঁদে মরে যাবে।

কোনও কথা বললেন না মনোহর লাল। একেবারে ধীর স্থির শান্ত বোবা একটি মাটির পুতুলের মত নিরীহ হয়ে গাড়ির সিটের কোণে বসে থাকেন। তারপর চমকে-চমকে আর কেঁপে কেঁপে এপাশ-ওপাশ করতে থাকেন, যেন একটা ভুতুড়ে হাত তাঁকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

হেসে ফেলে শিশির। —যেতে দাও, অমল। চলো, এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

সরে আসে অমল। সঙ্গে সঙ্গে মনোহর লালের গাড়িটাও স্টার্ট নিয়ে নড়ে ওঠে। অমল বলে— তবে যান মিস্টার আই এফ এ এস ! পদ্মশ্রী পেলে কিন্তু আমাদের একবার স্মরণ করবেন।

ভাগ্যিস পাওয়ার হাউসের কয়েকটি কাজের মানুষ পালিয়ে যায়নি ; তাই এই মাঝরাতের

তেজপুরের নিরেট অন্ধকারে ভরা সড়কের এখানে-ওখানে লাইটপোস্টের মাথায় কিছু আলো জেগে আছে। কিন্তু ওখানে, একটু দূরে, গাছতলার বিদঘুটে অন্ধকারটাকেই বেছে নিয়ে কয়েকটা অপ্রাকৃত প্রাণী যেন ধস্তাধস্তি করছে। একটা গোঙানির শব্দও শোনা যায় ; কেউ যেন কারও গলা টিপে ধরেছে। দৌড়ে এগিয়ে যায় শিশির আর অমল।

পাওয়ার হাউসের বুড়ো চাপরাশি বেচারাকে জাপটে ধরেছে একটা লোক। আর, একটা লোক এক হাতে বুড়োর মুখ চেপে ধরে বুড়োর জামা-কাপড় আর টাকা-পয়সা কাড়ছে। খাটো জাঙ্গিয়া আর ছোট কোর্তা পরা রূঢ় চেহারার দুটো জেল-ছাড়া কয়েদি।

অমলের হাতের স্টিকের বাড়ি খেয়ে সরে যায় কয়েদি দুটো। তারপর দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায়। বুড়োর হাত ধরে শিশির। — ভয় নেই। কিন্তু এত রাত্রে বের না হলে কি চলত না ?

বুড়োকে বাজারের কাছাকাছি রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার ঘুরে যায় শিশির আর অমল।

এদিকের অন্ধকারে নয়, শহরের ওদিকে আমলাপটির রাস্তার একটা আলোর কাছে একটা লোক যেন শক্ত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সামনেই একটা বাড়ির দরজার কাছে একটা জিপগাড়ি, জিনিসপত্রে বোঝাই। বাড়ির দরজা মাঝে মাঝে একটু ফাঁক হয়, তারপরেই যেন শিউরে উঠে বন্ধ হয়ে যায়।

শূন্য তেজপুরের এই ভয়ানক কালো মাঝরাত কি নিদারুণ এক কৌতুকের সুখে বিচার-অবিচারের হিসাব-নিকাশ করবার একটা খেলা দেখাতে চায় ? তা না হলে এরকম এক-একটা ঘটনা এখানে-ওখানে চমক-ছবির মত দেখা দেয় কেন ?

শক্ত পাথরের মত দেখতে ওই লোকটা হল জেল-ছাড়া কয়েদি, কৈলাস। আর ওই যে জিপ জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওটা পুলিশ লাইনের একটা জিপ। আর, মাঝে মাঝে বন্ধ জানালা ফাঁক করে কৈলাসকে দেখতে পেয়েই কাঁপা হাতে জানালা বন্ধ করে দিচ্ছেন যিনি, তিনি সেই উন্নতিময় পুলিশ অফিসার পরেশ ভট্টাচার্য, সরে পড়বার জন্য তৈরি হয়েও সরে পড়তে পারছেন না।

কিন্তু আর কতক্ষণ ? বাড়ির বন্ধ দরজার কপাট খুলে বাইরে বের হয়ে এলেন পরেশ ভট্টাচার্য, পিছু পিছু পরেশ ভট্টাচার্যের স্ত্রী, যিনি উসকো-খুসকো মাথা আর শুকনো মুখ-চোখ নিয়ে, আর, একটা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছেন।

কৈলাসের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে পরেশ ভট্টাচার্যের গলার স্বর ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। —আমার স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ। সাত দিনেরও বেশি হল জ্বরে ভুগছে।

কৈলাসের চোখ, ইস্পাতের গুলির মত চকচকে শক্ত চোখ হঠাৎ যেন চুপসে নরম হয়ে যায়। কৈলাসের পাথুরে মাথাটাও দুলে ওঠে ! মুখে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির ছটফটে হাসি।

খাটো জাঙ্গিয়া, গায়ে ছোট কোর্তা, কাঁধে বিড়ির আগুনে পোড়া ফুটো-ফুটো একটা কম্বল, কৈলাস যেন একজন যোগী পরমহংসের মত ভঙ্গি ধরে চলে গেল। পরেশ ভট্টাচার্যের মুখের দিকে আর একবারও তাকাল না ; একটি কথাও বলল না।

এদিকে ডাকবাংলোর গেটের কাছে হঠাৎ ছুটে গিয়ে রতনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে নিল শিশির। আর, একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে অমলের পিছনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকেন পলিটিকাল খোসলা সাহেব।

সরে পড়ছিলেন খোসলা সাহেব। গাড়ির ভিতরে সব জিনিসপত্র তুলেও ফেলেছিলেন। আর, স্ল্যাক-পরা ও ঘাড়ছাঁটা অদ্ভুত চেহারার এক ফিরিঙ্গি তরুণী-নারীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠতেও যাচ্ছিলেন। কিন্তু উঠতে পারেননি। কোথা থেকে ছুটে এসে খোসলা সাহেবের ঘাড়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে রতন— ক্যারেক্টার ! পিয়নকা ক্যারেক্টার তো বহুত খারাপ হোতা হ্যায়, লেকিন বড়া সাহেবকা ইয়ে কওনসা ক্যারেক্টার ?

রতনকে ঠেলে ঠেলে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় শিশির। —ওর ক্যারেক্টার নিয়ে ওকে সরে পড়তে দাও, তুমি বাড়ি যাও।

রাগে ফুলে ফুলে গজগজ করে রতন। — আমার চরিত্র খারাপ বলে ইনি আমার চাকরি

খেয়েছেন। এখন এঁর চাকরি খায় কে ?

অমল হাসে : —ওর চাকরি কেউ খাবে না। সেটা গ্রেট ডেমোক্রেসির নিয়ম নয়। কিন্তু তুমি চলো এখন।

কে জানে জগদীশ আর হিতেন এখন কোন দিকে ঘুরছে। হাসপাতালে রোগী দুটোর কাছে এখন কে আছে ? বিলাস আর বিভূতি বোধ হয়। কিন্তু লুটপাট করতে পারে, এমন কুমতলবের কিছু প্রাণী এদিকে-সেদিকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। টাউনটাকে একবার চক্কর দিয়ে ঘুরে দেখলে কেমন হয় ?

নতুনপাড়াতে এসে শীতল বিশ্বাসের তোবড়া লক্কড় ট্রাকটাকে নিয়ে ঘুরতে থাকে শিশির আর অমল। স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে হিতেন আর জগদীশকে দেখতে পেয়ে ট্রাকে তুলে নেয়। চেঁচিয়ে হাসতে থাকে জগদীশ। — আমার যে কেমন একটা রাজা-রাজা ভাব হচ্ছে হিতেন। তোমার হচ্ছে না বোধ হয়।

হিতেন— না। আমার এখন এক পেয়ালা গরম চায়ের জন্য প্রাণটা ভিক্ষুক-ভিক্ষুক হয়ে রয়েছে।

মাধববাবুর শূন্য বাড়ির সামনের ঘরের দরজাটা খোলা ; টর্চের আলো ফেলতেই দেখা যায়, চা চিনি দুধ কেটলি টি-পট আর পেয়ালা, সবই এক জায়গায় জড়ো হয়ে পড়ে আছে। কোনও অসুবিধে নেই, শুধু জল গরম করে নিলেই পেয়ালা ভরে চা খেয়ে নিতে পারা যায়। শিশির হেসে হেসে ধমক দেয়। —না হিতেন, এখানে থামবে না। চলো।

এস আই বি'র অফিসবাড়ি উত্তরায়ণ , গোয়েন্দাকুলচন্দ্র বিনা এ বৃন্দাবনও অন্ধকার। উত্তরায়ণের বারান্দাতে একটা বাছুর দাঁড়িয়ে আছে। সড়কের একটা লেটারবক্সের উপর একটা সাদা বিড়াল।

রবার বাগানের কাছাকাছি এসে হঠাৎ ট্রাক থামিয়ে কী যেন দেখতে থাকে শিশির। নীরব নির্জন সড়ক ধরে এক বুড়ো ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন কোথায় ?

ট্রাক থেকে নামে শিশির। —শুনছেন ? কোথায় যাবেন আপনি ?

—মহিম দস্তিদারের বাড়ি খুঁজছি।

শিশির— এই তো, এই যে সামনেই মহিমবাবুর বাড়ির ফটক।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি।

বুড়ো ভদ্রলোক ভারতীর ফটকের ভিতরে ঢুকতেই আবার ট্রাক ছুটিয়ে চলে গেল শিশির আর ইয়েস ছেলের দল।

ভারতীর বারান্দায় উঠে ডাক দেন বুড়ো ভদ্রলোক। —কেউ আছেন নাকি ?

রাজাবাহাদুর এসে চেঁচিয়ে ওঠে। —মামাবাবু !

বড় ঘরের দরজা খুলে কিরণলেখা আর মণিমালা বাইরে এসে চমকে ওঠেন। —মেজদা।

শুক্তি এসে হেসে ওঠে। —কী আশ্চর্য, দুলাল মামা এসেছেন ? দেখলে তো মণিমাসি, আমি দেরি করিয়ে দিলাম বলেই না দুলাল মামাকে ফিরে পাওয়া গেল ?

সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে দুলাল দত্ত হাসেন। —পাগলা ফটক খুলে দিয়েছে, তাই বের হয়ে এলাম ; না এসে উপায় কী ?...আচ্ছা, আমি এখন একটু জিরিয়ে নিই, কী বলো কিরণ ?

শুক্তির মুখের হাসিটা এইবার যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে। —এখন আর জিরোতে পারবেন না, দুলাল মামা।

—কেন ?

—এখন তেজপুর ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমরা সবাই যাব।

—কেন ? তোমরাও সবাই অবাঞ্ছিত হয়ে গেলে নাকি ?

—একরকম তাই।

—শুনলাম, নেফা থেকেও নাকি অবাঞ্ছিত হয়ে দলে দলে সবাই চলে আসছেন।

—আমিও শুনেছি। আপনি কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গে যাবেন।

—তা মন্দ হয় না।

বাইরে আসেন গগন বসু। —আমিই স্টিয়ারিং-এ বসি। শুক্তি আমার পাশে বসুক।

শুক্তি— আমি ড্রাইভ করি, বাবা।

গগন বসু— না, আমিই পারব। আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও তোর চেয়ে কিছু কম নয়।

কালোর মা বলেন— আমি তা হলে শিববাড়ির মন্দিরে... ।

মণিমালা আর কিরণলেখা এক সঙ্গে ধমক দেন। —বাজে কথা বলো না কালোর মা। চুপ করে গাড়িতে উঠে কড়া।

রাজবাহাদুর ডাকে— বাবা আসুন।

মহিমবাবু তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটেন, এগিয়ে যান, গাড়িতে উঠেই চোখ বন্ধ করেন।

ভারতীর ফটক খোলা রেখে দিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল দুই গাড়ি। এখান থেকে বের হয়ে, তারপর নর্থ ট্রাঙ্ক রোড ধরে এগিয়ে...তারপর দেখা যাক, কোথায় কতদূরে গিয়ে থামা যায়। মঙ্গলদই পৌঁছতে পারলে নরেশ কাঞ্জিলালের বাড়িতে কিছুক্ষণ রেস্ট নিতে পারা যাবে। —নরেশ কাঞ্জিলালকে চিনলি তো শুক্তি ?

শুনতে পায় না শুক্তি। শুক্তির শূন্য মনটা যেন মানুষের পরিত্যক্ত ওই তেজপুরের ভয়ানক কালো মাঝরাতের অন্ধকারের মধ্যেই পড়ে আছে।

গগন বসু ডাকেন— শুক্তি !

যেন ধড়ফড় করে জেগে উঠে জবাব দেয় শুক্তি— কী বলছ, বাবা ?

গগন বসু বলেন— আমাদের বাগানের মেশিনারি সাপ্লাই করে কলকাতার যে কাঞ্জিলাল অ্যাণ্ড সন্স, তারই মালিক নরেশ কাঞ্জিলাল।

॥ একুশ ॥

ফিরে চলো ঘরের টানে ! একদিন, দু'দিন, তিনদিন , তারপর পাল্টে গেল নাটকের সিন। সরে যাবার স্রোত এইবার যেন ফিরে আসার স্রোত হয়ে শূন্য দহ ভরে ফেলতে শুরু করেছে। ফিরে আসছে তেজপুরের লোক।

তেজপুরের ভাগ্যটাও বোধ হয় সেই সার্কাসের মেয়েটার মত একটা মেয়ে, তারের উপর নাচছে। একবার ওদিকের ক্লাউনের হাতছানিতে ওদিকে চলে যায়, আবার এদিকের ক্লাউনের হাতছানিতে এদিকে ফিরে আসে।

ট্রেন ভরতি হয়ে, স্টিমার ভরতি হয়ে, আর চারদিকের যত সড়ক ধরে ছুটন্ত জিপ-ট্রাক-বাস আর মোটরকারে ভরতি হয়ে চলে আসছে তেজপুর শহরের পলাতক প্রাণের কল্লোল।

চিনারা যুদ্ধ-ক্ষান্তি ঘোষণা করেছে। বলেছে, ওরা আর এগুবে না। কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে যেতে শুরু করবে। কিন্তু শর্ত এই যে... ।

প্লেন-ভরতি হয়ে উড়ে উড়ে আসছেন যত পলাতক সম্পত্তিময় প্রাণ। এয়ারপোর্টের কাছে অনাথ হয়ে পড়েছিল যত মোটরকার, তারা আবার সনাথ হয়ে আর খুশি-হর্নের হর্ষ তুলে বড়-বড় বাড়ির গ্যারেজে ফিরে এসেছে আর আসছে।

দোকান-পাট খুলছে। ঘরে ঘরে উনানের ধোঁয়া। ছাড়া গরুর গলায় আবার দড়ি পড়েছে। আর, পাব্লিকের মরেল বুস্ট করবার জন্য নেতা, ভি-আই-পি আর মন্ত্রীও আসতে শুরু করেছেন। সার্কিট হাউসের খানসামার হাতে ট্রে-ভরতি পেয়ালাতে আবার গরম চা টলমল করে।

শিলিগুড়ি থেকে মিলিটারির ট্রেন এসে পড়েছে। কোর হেডকোয়ার্টারে অফিসারের ব্যস্ততা উঁকি-ঝুঁকি দেয়। ময়দানে সকালবেলার রোদে জওয়ানের প্যারেড মচমচ করে।

কী আশ্চর্য ! হাসপাতালে ডাক্তার, পুলিশ লাইনে পুলিশ, আর আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট ! তেজপুরের মানুষের চোখে দৃশ্যটা যেন ডি এল রায়ের কবিতার কথার মত একটা বল-কি-হে বিস্ময় !

মঙ্গলদই-এর কাঞ্জিলাল মশাই একটা জেদ করে ভালই করেছিলেন, গগন বসুকে আর তাঁর সঙ্গের সবাইকে শুধু দু'চার ঘণ্টার রেস্ট নিয়েই চলে যেতে দেননি। পুরো তিনটে দিন সবাইকে খুব

যত্ন-সমাদব দিয়ে প্রায় বন্দি করে বেখেছিলেন। —এখান থেকে আবার এত তাড়াতাড়ি সরে যাবার কী দরকার, গগনবাবু ? কিছুদিন থেকেই যান না কেন ? সরে যাবার হলে আমাদেরও তো সরে পড়তে হবে।

কিন্তু রেডিও, খবরের কাগজ আর মঙ্গলদই-এর রাস্তার হল্লা একটা নতুন খবর ছড়িয়ে দিতেই হেসে উঠেছিলেন কাঞ্জিলাল মশাই। —এখন আপনাদের তা হলে তেজপুরেই ফিরে যাওয়া ভাল, গগনবাবু।

হ্যাঁ, তাই আর দেরি করেননি, ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হলেন কদমবাড়ির গগন বসু, কিরণলেখা আর শুক্তি। তেজপুরের মহিমবাবু, মণিমালা, কালোর মা আর রাজবাহাদুর। আর একজন মানুষ, নেফাব এক আকা গাঁয়ের পাশে আর বনসুমের জঙ্গলের ছায়ার কোলে যাঁর নিঃস্ব জীবনের একমাত্র শখের বাসাঘর, বাঁশ-বাঁখারির একটা চং এখনও নড়বড় করছে কিনা কে জানে, সেই দুলাল দত্ত তাঁর সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে বলেন— আবার তেজপুর !

ফিরে যাবার টানে আবাব দুটি মোটর গাড়ি সকালবেলার রোদে ছুটে ছুটে আর ধুলোমাখা হয়ে তেজপুরে ফিরে আসে, আর রবার বাগানের ভারতীর খোলা ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকেই যেন রেস্ট ফিরে পাওয়ার সুখে অলস হয়ে থেমে যায়।

দোতলাতে শুক্তির ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যেয়েই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে শুক্তি। —আশ্চর্য মণিমাসি, আমার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। নিবিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম নাকি ?

মণিমালার সারা মুখ জুড়ে আর-একরকমের খুশির হাসি থমথম করে। —ওঘরের ঘড়িটা এখনও কেমন টিক-টিক করে বেজে চলেছে, শুনছিস শুক্তি ?

শুক্তির ঘরেব টেবিলে দোয়াতের কালিও শুকিয়ে যায়নি, কলমটাও ঠিক সেখানেই পড়ে আছে, আর চিঠি লেখার কাগজেব প্যাডও আছে।

এখন একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপাটাকে খুলে ফেলতে, তারপর একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে কোচের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার আগে জোরহাটে প্রণব কাকার কাছে চিঠিটা লিখে ফেলাই ভাল।

কালোব মা যখন চা খাওয়ার জন্যে শুক্তিকে ডাকতে আসেন, তার আগেই শুক্তির চিঠি-লেখা শেষ হয়ে যায়। খুব বেশি কথা লেখবার তো কিছু নেই। —আপনি শুধু খোঁজ নিয়ে জানাবেন কাকা, আপনাদের নতুন প্লেটুনের হাবিলদার সুজিত রায়, বুমলাতে পোস্টিং হয়েছিল যার, সে এখন কোথায় ? ফিরে এসেছে কি ? —প্রণতা শুক্তি।

রবার বাগানের ভারতীর দোতলার একটি ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আর উঁকি দিয়ে তেজপুরের জীবনেব কতটুকুই বা দেখতে চিনতে আব শুনতে পারা যায়, আবার কী-রকমের মুখর উপকথায় ভরে গিয়েছে তেজপুর ? আর নেফার পাহাড়ের শুধু ওই মেঘলা রঙের চেহারাটাকে দেখেই বা কি আর কতটুকু বুঝতে পারা যাবে, ওখানে ঝুমের আগুনে পোড়া ক্ষেতের মাটির শক্ত ঢেলা ভাঙতে গিয়ে দফলা মেয়ে রেনকি এখনও রতনকাকার জন্যে কেঁদে উঠছে কিনা ? নেফার পাহাড়, জড়সড় হয়ে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা জড়তার পাহাড়। একটা নিরেট বোবা পাথরের পাহাড়।

খবরের কাগজে বিবৃতি হয়ে ছাপা হবার জন্যে কী ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এক-একটি ত্যাগ সাহস আর কর্তব্যনিষ্ঠার গল্প। টেলিফোনে ডেকে ডেকে আর গাড়ি পাঠিয়ে হোটেলে-হোটেলে প্রেসের মানুষ খুঁজছেন ওঁরা, বিবৃতি দেবার জন্য উন্মুখ যত সিভিল মিলিটারি আর পলিটিকাল। খবরের কাগজে ছাপার হরপের গল্প পড়ে তেজপুরের মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়, অফিসার মনোহর লাল সারারাত জেগে একাই হাসপাতাল পাহারা দিয়েছেন ; মাঝে মাঝে রোগীদের মুখে জল দিয়েছেন। আর সিনহা সাহেব একা বন্দুক হাতে নিয়ে সারারাত টেলিগ্রাফ অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। পুলিশের ভট্টাচার্য তাঁর অফিসের টেবিলের উপরেই সারারাত শুয়ে ছিলেন, এক পা'ও নড়েননি।

কিন্তু ওরা কোথায়, যারা শূন্যনগর তেজপুরের দুটো ভয়ানক কালো রাতে রাজা-রাজা হয়ে ঘুরে বেড়াল ? ওরাও আছে বইকি। কিন্তু থেকেও নেই। ওরা আবার সেই সামান্য সাধারণ পুরনো ছায়া

হয়ে গিয়েছে। প্রাইমারি স্কুলের হাজিরা খাতার দিকে তাকিয়ে হিসেব করে শিশির, আর কতজন ছাত্রের ফিরে আসতে বাকি আছে। সামনের টেস্ট পরীক্ষার ভয় ভুলতে গিয়ে সিনেমার টিকেট কিনে নিয়ে হাউসের বারান্দায় ঘুর-ঘুর করে হিতেন। অমল আর জগদীশ বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে পান খায় আর গল্প করে। —আজ আবার ডোগরা রেজিমেণ্টের কিছু লোক বের হয়ে চারদুয়ারে পৌঁছেছে।

—তুমি আজ চারদুয়ার গিয়েছিলে নাকি ?

—হ্যাঁ। বমডিলা থেকে ওরা জঙ্গলে-জঙ্গলে দিনরাত হেঁটেছে, এক মুঠো ছোলাও খেতে পায়নি, মাঝে মাঝে শুধু বুনো কলা পুড়িয়ে খেয়েছে; দারুণ শীতে মুখের চামড়া ফেটে গিয়েছে, পায়ের ফোস্কা ঘা হয়ে গিয়েছে। ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জুতো, কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ছে, দেখলে মন ভয়ানক খারাপ হয়ে যায়।

জোরহাট থেকে প্রণবকাকার চিঠি আসতে খুব বেশি দেরি হল না। শুক্তিকে শুধু সাতটা দিনের অপেক্ষা সহ্য করতে হয়েছে।

ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়ে শুক্তি। হাতটা চমকে চমকে কাঁপতে থাকে। তারপর শুক্তির দুই চোখ যেন অন্ধের দুটো নকল চোখের মত চকচকে পাথর হয়ে নেফার পাহাড়ের দিকে থাকিয়ে থাকে।

লিখেছেন প্রণবকাকা। —কোনও খবর নেই, শুক্তি। তবে বুমলাতে আমাদের আসাম রাইফেলের পোস্টের কী দশা হয়েছে, সেটা অনুমান কবতে অসুবিধে নেই। হয় সবাই মরেছে, নয় কিছু মরেছে কিছু বেঁচেছে। যদি কিছু লোক বেঁচে থাকে, তবে তারাও হয় চিনাদের হাতে সবাই বন্দি হয়েছে, নয় কিছু বন্দি হয়েছে, কিছু পিছনে সরে আসতে পেরেছে। যদি কিছু লোক পিছনে সরে আসতে পেরে থাকে, তবে তারাও শেষে নিশ্চয় স্ট্র্যাগল্ আউট করেছে।

শুক্তির দুই ঠোঁটও যেন শক্ত পাথর হয়ে গিয়েছে, কোনও করুণ আক্ষেপও তাই বিড়বিড় করে উঠতে পারে না। শুধু মাথাটা যেন রাগ করে করে জ্বলছে আর বলছে— সবাই মরেছে, বাঃ, তার মানে সুজিতও মরেছে। মরলেই হল! এত সহজে মরে গেলেই হল ? চালাকি ? অসম্ভব। একটুও বিশ্বাস করা উচিত নয়।

চিঠিটাকে শক্ত মুঠোর চাপে দুমড়ে-মুচড়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় শুক্তি।

চিনাদের হাতে বন্দি হয়েছে ? হোক না। মন্দ কী ? একদিন তো ফিরে আসবে। ফিরে এসে না হয় আবার লড়তে যাবে।

স্ট্র্যাগল্ আউট করেছে ? তা হলে তো ভালই করেছে। না করে উপায়ই বা কী ? জঙ্গলে জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে আর দিশেহারা পথে ঘুরে ঘুরে অনেক কষ্ট পাবে। তবু তো একদিন ঘরে পৌঁছে যাবে। হাত-পা না ভাঙলেই হল।

তবে কি সুজিত সত্যিই ফিরে আসছে ? নিশ্চয় আসছে।

কিন্তু ফিরে আসতে আর কত দেরি করবে সুজিত ? আর কাউকে ভাল করে না চিনুক সুজিত, অন্তত ওর কাকিমাকে তো ভাল করে চেনে। ভেবে ভেবে কত ছটফট করছেন ওর কাকিমা বেচারা, সেটা সুজিতের মত মানুষের পক্ষে ভুলে থাকা সম্ভব নয়। সুজিতের মনও সেরকম নয়। তবে আর দেরি না করে চলে এলেই তো পারে। কিন্তু দোষ দিয়ে লাভ নেই; নিশ্চয় ইচ্ছে করে দেরি করছে না। যা বিশ্রী পাথর জঙ্গল আর পোকা-মাকড়ে ভরা ওই নেফা।

কিরণলেখা এসে বেশ একটু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করেন— জোরহাট থেকে তোর প্রণবকাকার চিঠি এসেছে মনে হল ?

শুক্তি—হ্যাঁ।

কিরণলেখা— কী লিখেছে ? সুজিতের খবর কী ?

শুক্তি—হয়ত মরেছে; কিংবা...।

কিরণলেখা শিউরে ওঠেন। —ছি, ওরকম ভয়ানক বাজে কথা হয়ত করেও বলতে নেই।

শুক্তি— প্রণবকাকা যা লিখেছেন, আমি তাই বলছি। হয়ত বেঁচে আছে। বেঁচে থাকলে

চিনাদের হাতে বন্দি হয়েছে কিংবা লুকিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে হাঁটা দিয়ে চলে আসছে।

কিরণলেখা— তাই বল। তাই যেন সত্যি হয়। তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক ছেলেটা।

চলে গেলেন কিরণলেখা। বললে একটু খারাপ শোনায়, তাই শুক্তিকে একটা কথা বলতে পারলেন না। তাই পাশের ঘরে গগন বসুর কাছে গিয়ে কথাটাকে বলেই ফেলেন কিরণলেখা। —এটা তো একরকম খবর পাওয়াই হল।

মরে-টরে যাওয়া, চিনাদের হাতে বন্দি হওয়া, আর জঙ্গলে-জঙ্গলে লুকিয়ে চলে আসা ; সবই তো এক-একটা খবর। সুজিত ছেলেটার ভাগ্য নিশ্চয় এই তিন খবরের কোনও একটা খবর হয়ে গিয়েছে।

গগন বসু— কিন্তু কোন খবরটা ঠিক ?

তবে তো এই দাঁড়ায় যে, সুজিতের ভাগ্যের একটা ঠিক খবর যেদিন মুখর হয়ে উঠবে সেদিন শুক্তির মনের ইচ্ছাটাও মুখ খুলবে। তার আগে নয়। এটাই বা কেমনতর কথা। ওরকম একটা খবরের অপেক্ষা করে করে শুক্তির ভাগ্যটাও কি দিনের পর দিন অচল হয়ে পড়ে থাকবে ?

শুক্তি কিন্তু ভাবতে ভুল করে না। না, এরকম করে শুধু একটা আওনকি আওয়াজ শোনবার জন্যে কান পেতে আর চুপ করে বসে থাকবার কোনও মানে হয় না। শুক্তির প্রাণটা কি রাতের রেলগাড়ি যে, কেউ একজন এসে সবুজ বাতি দুলিয়ে দেবে, তবে চলতে শুরু করবে ?

শুক্তির চোখে আনমনা ভাবনার ছায়া, কিন্তু দুই ঠোঁটে যেন শক্ত করে চেপে ধরা একটা অদ্ভুত হাসি। দেখতে পেয়ে একদিন মণিমালা জিজ্ঞাসা করেন— তুই তো এখনও কিরণদিকে ঠিক করে কিছু বললি না, শুক্তি। আমরা সবাই যে আশা করে তৈরি হয়ে রয়েছি।

শুক্তি— কী বললে ?

মণিমালা— মাঘ হলে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ; না হয় ফাল্গুনেই হল। কিন্তু তুই বলবি তো ?

শুক্তি— বলব।

মণিমালা— কিন্তু তই নাকি বলেছিস যে, সুজিত নামে সেই হাবিলদার ছেলেটার একটা খবর না পেয়ে.. ।

শুক্তি হাসে। — হ্যাঁ বলেছি, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমি একটা খবরের সঙ্গে চুক্তি করে বসে আছি। খবর পেলে পাওযা যাবে, না পেলে পাওয়া যাবে না।

মণিমালা— তা হলে.. ।

শুক্তি— প্রণবকাকাকে আর একটা চিঠি দিয়েছি। সে চিঠির জবাব আসুক। তারপর... ।

মণিমালা— তারপর কী ?

মণিমালার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে হাসতে থাকে শুক্তি। —তারপর যা বলবার বলেই দেব। তুমি এখন যাও তো মণিমাসি।

কিন্তু জোরহাট থেকে প্রণবকাকার চিঠির আশায় চুপ করে বসে থাকতেও যে ভাল লাগে না। বার বার শুধু মনে হয়, এতদিনে নিশ্চয় এসে পড়েছে সুজিত। শুধু ওর খবর জানবার জন্যে কেউ ব্যস্ত নয় বলেই সুজিত একটা অচেনা বস্তুর মত কোথাও পড়ে আছে। কে জানে কুমুদ ডাক্তার এখন কোথায় আছেন ? সুজিতের কাকিমাই বা কোথায় ? ওঁরা কিছু জানতে পেলেন কি না পেলেন, সেটাও তো জানবার কোনও উপায় নেই।

ও দৃশ্য দেখলে চোখ জ্বলে যায় ! নেফার পাহাড়ের উপর দিয়ে কত হেলিকপটর রোজই আসছে। রাজবাহাদুরও রোজ সেই একই কথা বলছে ; আওরভি আয়া, আওরভি জখম জওয়ান লোগ আ রহা।

কিন্তু নাম-ধাম জানবার তো কোনও উপায় নেই। অদ্ভুত এক সিকিওরিটি ওদের কম্বলে জড়িয়ে আর আড়ালে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

শুক্তির ইচ্ছের জেদ সহ্য করতে গিয়ে রাজবাহাদুরকে একদিন লোখরা ঘুরে আসতে হল।

না, লোখরাতে এখনও কোনও ফিরতি জওয়ান পৌঁছয়নি। হাবিলদার সুজিত রায়ের খবরও কেউ বলতে পারেনি। রাজবাহাদুরের পুরনো বন্ধু জমাদার ধনরাজ লিমবু খুব জোরে মাথা কাঁপিয়ে

আক্ষেপ করেছে, না, আর ভাবনা করবার কিছু নেই। গঙ্গাপানি পি লিয়া হাবিলদার সুজিত।

—কী বললে রাজবাহাদুর ? শুক্তির গলার স্বর শিউরে ওঠেন।

রাজবাহাদুর—জমাদার লিমবু বোলতা হ্যায়, বুমলাওয়ালা জওয়ান লোগ সব খতম হো গিয়া।

—যত সব মিথ্যে কথা। মাথামুণ্ডু নেই, বাজে কথা।

সরে যায় শুক্তি। রাজবাহাদুর যা বলছে, সেটা তো একটা নিরেট অজ্ঞতার মন-গড়া যত জল্পনার রক্তমাখা উল্লাস। জঘন্য। শুনলে কান দুটোও যেন ঘিনঘিন করে।

সরে গিয়েও কোথাও কিন্তু শান্ত হয়ে বা শ্রান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না শুক্তি। ঠিক খবর যে পেতেই হবে। চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না।

নীচের তলায় নেমে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডাকাডাকি করে শুক্তি। —হ্যালো...পি টি আই...আপনি পি টি আই ? মিস্টার গাঙ্গুলি ?

—হ্যাঁ।

—আপনি নিশ্চয় বলতে পারবেন, স্ট্র্যাগলার যারা চলে আসতে পেরেছে, তাদের নাম কেমন করে জানা যায় ?

—এখন জানবার উপায় নেই। ডিফেন্স মিনিস্ট্রি যেদিন জানাবেন, সেদিন জানতে পারা যাবে, তার আগে নয়।

—যারা আসছে, কিন্তু এখনও পৌঁছতে পারেনি, তাদের নামও কি জানতে পারা যায় না ?

—এটা কী-রকমের কথা বললেন ? হেসে ফেলেন গাঙ্গুলি।

—আমি বলছি, যারা চলে আসতে পেরেছে, তারা তো বলতে পারে, আর কে কে আছে, কোথাও তাদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়ে থাকতেও তো পারে।

—তা হয়ত হয়েছে। তা হলে আপনি একটা কাজ করুন। কাউকে চারদুয়ারে পাঠিয়ে খোঁজ নিতে চেষ্টা করুন। শুনছি, সেখানে রাজপুত রেজিমেন্টের কিছু লোক এসেছে।

—আমি আসাম রাইফেলের একজনের খবর চাইছি।

—তা হলে বরং আপনি আজই কাউকে রাঙ্গাপাড়া পাঠিয়ে দিন। আসাম রাইফেলের একজন ডাক্তার, ডাক্তার চক্রবর্তী সেখানে আজ তিন-চারদিন হল এসেছেন। শুনেছি তিনি স্ট্র্যাগল করে প্রায় একুশদিন পরে খুব কাহিল অবস্থায় রাঙ্গাপাড়াতে পৌঁছেছেন।

—রাজবাহাদুর ! তুমি কোথায় ? ডাকতে থাকে শুক্তি।

—জি হ্যাঁ, দিদি ; বলুন।

শুক্তি—তোমাকে এখনই একবার রাঙ্গাপাড়া যেতে হবে।

—বোহোৎ আচ্ছা।

শুক্তির সব উপদেশ আর নির্দেশ মন দিয়ে শুনে নিয়ে রাঙ্গাপাড়া রওনা হয়ে যায় রাজবাহাদুর।

সবই দেখতে আর শুনতে পান কিরণলেখা। শুক্তি যেন মরিয়া হয়ে একটা ব্যাকুল ব্যস্ততার খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে। আর ছুটে ছুটে হয়রান হচ্ছে বেচারা রাজবাহাদুর।

এই ব্যস্ততাকে যেন একটা নিয়ম করে ফেলেছে শুক্তি। সারাদিনের মধ্যে অন্তত একবার টেলিফোন করে পি টি আই-এর গাঙ্গুলিকে বিরক্ত করা আর জেনে নেওয়া, নেফার জংলি বাধা ভেদ করে কে কোথায় ফিরে এল। তারপর রাজবাহাদুরকে একবার তাড়া দিয়ে দৌড় করানো। —যাও, রাজবাহাদুর। শুনে এসো, কী বলে ওরা, কোনও খবর দিতে পারে কী না ?

যাও রাজবাহাদুর, আজ একবার ফুটহিলের ক্যাম্পে গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে এসো। আজ একবার চারদুয়ারে যেতে হবে রাজবাহাদুর। আজ একবার এল বি রোডে সামন্তবাবুর বাড়িতে যাও। একজন ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন রায় এখন সে বাড়িতে আছেন। নেফার ভেতর থেকে এই তিন দিন হল বের হয়ে এসেছেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করে এসো তো, কোনও খবর দিতে পারেন কিনা।

আরও দুদিন দু'বার দু' জায়গাতে গিয়ে আর খোঁজ নিয়ে ফিরে এসেছে রাজবাহাদুর। শুধু শ্রান্ত আর ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে রাজবাহাদুর। যার খবরই নেই, তার খবর দেবে কে ? কী আশ্চর্য ; কেন যে ঝুটমুট এত তকলিফ করছেন দিদি, কিছু বোঝা যায় না।

অনেক গল্প এনে দিয়েছে রাজবাহাদুর। আর কত আনবে ? ডাক্তার চক্রবর্তীর গা বিছুটির ঘষা খেয়ে খেয়ে ঘা হয়ে গিয়েছে। একটা পাথরের খাড়াই টপকাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন, বাঁ পায়ের দুটো আঙুল ভেঙে গিয়েছে।...কিন্তু সুজিত হাবিলদার নামে কারও খবব তো আমি জানি না। তবে সেলা থেকে সরে আসবাব আগে শুনেছিলাম, আমাদের বুমলা পোস্টের কয়েকজন জওয়ান রিট্রিট করতে পেরেছিল।

ক্যাপ্টেন রায় বলেছেন— আমাদের খুব বেশি অনাহার সহ্য করতে হয়নি। বুঝলাম না, দাগানিয়া বস্তির আকারা আমাদের কেন এত সাহায্য করল ? বুঝলাম না, ওদের ঘরে ঘরে কেষ্টবিষ্টুর এত ছবিই বা এল কী করে ? মজার ব্যাপার : পাকা চুলে ভরা সাদামাথার এক সুবেদারকে ওরা সব চেয়ে বেশি যত্ন-আদর করেছে। মকাই চাল মাংস, যা যোগাড় করতে পেরেছে তাই এনে ওরা আমাদের খাইয়েছে। আমাদের অনেক লোককে ওরা ওদের জামা-কাপড় পরিয়ে ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। চিনারা দেখেও কিছু বুঝতে পারেনি।...হ্যাঁ, বেশ কষ্ট হয়েছিল পিঙ্গোলি রোডহেড পর্যন্ত পৌঁছতে। সারা রাত ধরে বেতের জঙ্গল কেটে কেটে রাস্তা করা, আর আগুন জ্বেলে হাতি খেদানো !...কিন্তু আসাম রাইফেলের কারও সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি। শুনেছি, বুমলার কেউই সরে আসতে পারেনি।

চারদুয়ার ক্যাম্পের রাজপুত রেজিমেন্টের নায়েক কুন্দন সিং বলেছে, হ্যাঁ শুনেছি, বুমলাতে আসাম রাইফেলের একজন হাবিলদার একা দাঁড়িয়ে আর এল এম জি নিয়ে কভারিং ফায়ার রেখেছিল ; কিন্তু সে কি আর আছে ?

ফুটহিলের এক ক্যাম্পের কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে আর অনেক চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারেনি রাজবাহাদুর। ক্যাম্পের বাইরে একজন সুবেদারকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বড় বড় চোখ করে চমকে উঠেছেন। —বুমলা ? আসাম রাইফেলকা হাবিলদার ? বাস্, আওর কুছ পুছিয়ে নেহি। নমস্তে !

বাস, তবে আর কী ? এইবার একটা উড়ন্ত হেলিকপটরের দিকে তাকিয়ে, আর হাত তুলে একটা নমস্তে জানিয়ে দিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলেই তো হল। ডেড বডি কোলে নিয়ে আর উড়ে-উড়ে খবরহীন জগতের মেঘের ভিতরে চিরকালের মত মিলিয়ে যাক হেলিকপটর। শুক্তির প্রাণটাও এই অদ্ভুত মিথ্যে ব্যস্ততার সব ধুলো ধুয়ে মুছে দিয়ে পরিষ্কাব হয়ে যাবে।

কিন্তু সকালবেলা বিছানা ছেড়ে উঠতেই শুক্তির মনে যেন একটা পাগল-পাগল শখের লোভ ছটফট করে হাসতে থাকে। একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না কেন ? মা বলবেন, তোর মাথা খারাপ হয়েছে। বাবা বলবেন, ওখানে সিকিওরিটির নিষেধ আছে, কাছে যেতে পারবি না, জেনে শুনে মিথ্যে হয়রান হবার দরকার কী ? মণিমাসি বলবেন, এতদিন পরে তোর আজ আবার হঠাৎ ছুটোছুটি করবার ইচ্ছে হল কেন ?

শুক্তি— রাজবাহাদুরকে একবার বলে দাও, মণিমাসি।

মণিমাসি— কী বলব ?

শুক্তি— আমি একবার বের হব।

কিরণলেখা— কোথায় বের হবি ?

শুক্তি হাসে। —একবার এয়ারপোর্ট ঘুরে আসি।

মণিমালা— এয়ারপোর্ট কি বেড়াবার জায়গা ?

শুক্তি— বেড়াতে তো যাচ্ছি না, শুধু একটু দেখতে যাচ্ছি।

কিরণলেখা— কী দেখবার আছে সেখানে ?

শুক্তি— রাজাবাহাদুর বললে, ফুটহিলের ক্যাম্প থেকে ট্রাকে করে জখম জওয়ানদের এয়ারপোর্টে আনছে আর প্লেনে তুলে দিচ্ছে।

কিরণলেখা— ওটা কি দেখবার মত একটা চমৎকার দৃশ্য ?

শুক্তি—আমি ভাবছি, হঠাৎ যদি সুজিত বাবুকে দেখতে পাওয়া যায়।

কিরণলেখার কথাগুলি বেশ রুক্ষস্বরে বেজে ওঠে। —কী অদ্ভুত তোমার শখ। দেখে এসো তা

হলে।

অদ্ভুত শখ নয় ; জাগা চোখে স্বপ্ন দেখবার অদ্ভুত বাতিক। মিথ্যে বলে বুঝতে পেরেও দেখতে ইচ্ছে করে।

এয়ারপোর্টে গিয়েও কিছু দেখতে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। একটা ট্রাকের ভিতর থেকে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা তুলে সুজিত উঁকি দিয়ে তাকাবে, এটাও একটা মিথ্যে আশা। কেউ কাউকে দেখতে পাবে না, তবু এয়ারপোর্টের বাতাসে প্রতিধ্বনির মত একটা শব্দ বেজে উঠবে, আমি এসেছি ; এমন চমৎকার একটা ম্যাজিক ব্যাপারও সম্ভব নয়। তবু সত্যিই যে একবার ঘুরে আসতে ইচ্ছে করে। কত খোঁজই তো মিথ্যে হয়ে গেল, না হয় এই শেষ খোঁজও মিথ্যে হয়ে যাবে।

শুক্তি বলে— আমি শুধু একটা চান্স নিচ্ছি, মা। জানি কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না, তবু যদি হঠাৎ... !

হেসে ফেলেন কিরণলেখা। —যাও, কিন্তু ফিরতে দেরি করো না।

॥ বাইশ ॥

শুক্তি বলে— একটু আস্তে চলো রাজবাহাদুর।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পিড মৃদু করে দেয় রাজবাহাদুর। শুক্তি যদি না বলত, তবে রাজবাহাদুর বোধ হয় সামনের ওই দুই মিলিটারি ট্রাকের পাশ কাটিয়ে সবেগে এগিয়ে চলে যেত।

তাঁবুর মত করে ছাউনি দিয়ে ঢাকা দুটো ট্রাক আস্তে আস্তে এয়ারপোর্টের দিকে চলে যাচ্ছে। পিছনে শুক্তির গাড়ি। দেখতে অসুবিধে নেই, বুঝতেও অসুবিধে নেই, কয়েকজন জখম সৈনিককে বয়ে নিয়ে চলেছে এই দুই ট্রাক। ট্রাকের ভিতরে আর্মি মেডিক্যালের একজন অফিসার একটা কাঠের বাক্সের উপর চুপ করে বসে আছেন। দুটো স্ট্রেচারকে তো বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কম্বলে ঢাকা হয়ে এই স্ট্রেচারে শুয়ে আছে যে দুজন আহত, তাদের মুখের সামান্য একটু আবছা-চেহারা শুধু দেখা যায়।

নিঃস্পন্দ মূর্তি, নিষ্পলক চোখ, শুক্তির বুকটাও যেন সব নিঃশ্বাসকে নীরব করে দিয়ে ধরে রেখেছে।

সামনের ট্রাকের চাকা বড় বেশি ধুলো ওড়াতে শুরু করেছে। শুক্তির নিষ্পলক চোখ দুটো চমকে ওঠে। —একটু থামো, রাজবাহাদুর।

গাড়ি থামে। ট্রাক দুটো বেশ দূরে চলে যায়। দেখতে পাওয়া যায়, ওদিক থেকে উড়ন্ত ধুলোর ভিতর দিয়ে একটা সাইকেল-রিক্সা সড়কের গর্ত মাড়িয়ে আর ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে এগিয়ে আসছে।

বড় ভুল হত শুক্তির, যদি এই সময় ধুলোর ভয়ে রুমাল তুলে চোখমুখ ঢাকা দিত। দেখতেই পেত না যে, রিক্সার উপরে এমন একটি মানুষ বসে আছে, যার কথা আজও শুক্তির একবার মনে পড়েছে।

রিক্সাতে বসে আছেন আর হাসছেন সুজিতের কাকিমা। তাঁর পাশে খুব রোগা দেখতে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক লালসুতির চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে আছেন।

এটা তো আর জাগা-চোখে দেখা একটা স্বপ্ন নয়। এটা কল্পলোকের একটা জায়গাও নয়। গর্তে ভরা একটা সত্যিকারের সড়কের উপর দিয়ে তেজপুরের সাইকেল-রিক্সা লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে। কিন্তু শুক্তির চোখ দুটো যেন কল্পলোকেরই একটা বিস্ময় দেখে ছটফট করতে থাকে। আর বুঝতেও দেরি হয় না, সুজিতের কাকিমা কেন এত হাসছেন।

—এই রিক্সা থামো।...শুনছেন ? চিনতে পারছেন ? শুক্তির ডাক শুনে রিক্সার ভিতর থেকে একটা খুশি-উতলা মূর্তি ধরে নেমে আসেন সুজিতের কাকিমা, প্রিয়বালা। —ওমা ? এ কী ? সাহেবের মেয়ে নাকি ?

গাড়ি থেকে নামে শুক্তি— হ্যাঁ, আমি শুক্তি। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?

—গিয়েছিলাম ওখানে, এয়ারপোর্টে। রোজই তো যেতাম। তিনদিন হল তেজপুরে এসেছি।

—আপনি ওখানে কেন যেতেন ?

—যাব না ? না যেয়ে পারি ? কেউ যখন আমার সুজিতের কোনও খবর দিলে না, তখন বলাই বললে, চলো মামি, এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি, শুনেছি ওখানে রাইফেলের লোকজন আসছে আর চলে যাচ্ছে।

—বলাই কে ?

—এই তো বলাই।

লাল সুতির চাদর গায়ে জড়ানো, রোগা ভদ্রলোক রিক্সা থেকে নেমে এসে বলেন— আমি রিফিউজি মানুষ। একটা রিক্সা খাটাই, এ ছাড়া আর কোনও রোজগার নেই। পঙ্গু স্ত্রী, বুড়ো মা, আর..।

প্রিয়বালা— তেজপুরে বলাইয়ের বাড়িতেই আছি। আপনাদের ডাক্তারবাবু এখন আছেন রঙ্গিয়াতে। খুব অসুস্থ। আমিও রঙ্গিয়া থেকেই এখানে এসেছি। এইবার ফিরে যাব।

—সুজিতবাবুর খোঁজ পেয়েছেন নিশ্চয় ?

—পেয়েছি, পেয়েছি। এই তো আজ এইমাত্র পেলাম। তাই তো ফিরে যাচ্ছি।

—কে দিল খবর।

বলাইবাবু বলেন— আজ এয়ারপোর্টে লোখরার একজন জমাদারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তার কাছেই শুনলাম, সুজিত ফিরেছে, ভাল আছে, শুধু তিনটে দিন হাসপাতালে ছিল।

প্রিয়বালা মাথা নাড়তে থাকেন। —বাবা রে বাবা, কী মিথ্যুক ছেলে এই সুজিত। ওর কাকাও কী ভয়ানক মিথ্যুক। আমাকে হেনতেন কত কী না বুঝিয়ে দিলে, বুমলা নাকি চার দুয়ারের কাছে খুব ভাল একটা জায়গা। ও ছেলে যে যুদ্ধের চাকরি নিয়ে সেই নেফা পাহাড়ে সরে পড়বে, যে নেফার পাথর ওর বাপকে মেরেছে, এ তো আমি স্বপ্নেও সন্দেহ করিনি। কেঁদে কেঁদে আমার চোখে ঘা হয়ে গিয়েছে। এই দেখুন আপনি, একবার নিজের চোখে দেখে নিন।

শুক্তি— যাক, যা হবার হয়ে গেছে ; এবার নিশ্চিন্ত হয়ে রঙ্গিয়া ফিরে যান।

প্রিয়বালা— হ্যাঁ, খুব নিশ্চিন্ত। দুঃস্বপ্ন গেল। ..হ্যাঁ, আপনাদের খবর একটু বলুন। সাহেব কোথায় আছেন ? আপনার মা কোথায় ?

শুক্তি— আমরা সবাই এখন তেজপুরে আছি।

প্রিয়বালা— কদমবাড়ি যাবেন কবে ?

শুক্তি— ঠিক জানি না।

প্রিয়বালা— আমাদের আর কদমবাড়ি যাওয়া হবে না। ভাবলে বড় দুঃখ হয়।

শুক্তি— কদমবাড়ি আর যাবেন না কেন ?

প্রিয়বালা— ওর ভাঙা শরীরে আর চাকরি পোষাবে না। ভাগ্যি ভাল যে, এককালে রঙ্গিয়াতে একটা কুঁড়েঘর তুলে রেখেছিল, এখন তাই একটা ঠাঁই হল।

শুক্তি—আচ্ছা, আপনি আসুন এখন।

প্রিয়বালা— আপনারা কোন পাড়াতে আছে ?

শুক্তি— রবার বাগানে ; বাড়ির নাম ভারতী।

বলাইবাবু বলেন— হ্যাঁ, মহিমবাবুর বাড়ি ; সে বাড়িকে কে না চেনে ?

প্রিয়বালা— যাই বলুন, রঙ্গিয়া বলুন আর তেজপুর বলুন, কদমবাড়ির মত সুন্দর কেউ নয়। কদমবাড়ির গাছের দুটো রাঙাজবাতে পুজোর থালা ভরে যায়। এক জ্বালের দুধে এই মোটা সর পড়ে। জল-বাতাসও কত মিষ্টি !

শুক্তি হাসে। —তবু তো কদমবাড়িকে ছেড়ে দিলেন।

প্রিয়বালা— ভাগ্য যদি ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে আর কী করবার আছে বলুন ? আচ্ছা, চলি।

চলে গেল রিক্সা।

এইবার রাজবাহাদুরকে গাড়ি ফেরাতে বললেই তো হয়। কত খুশি হয়ে হাসছে রাজবাহাদুর। সুজিতের কাকিমার সব কথার সবই তো শুনতে পেয়েছে।

অনেকক্ষণ তো হল, তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শুক্তি। পথের লোক দেখলে সন্দেহ করবে, গাড়িটা বুঝি অচল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজবাহাদুর ঠিক সন্দেহ করবে, অচল হয়ে গিয়েছে দিদি।

রাজবাহাদুর এখন যদি সত্যিই হঠাৎ একটা কবিত্ব করে বলে দেয়— আওন কী আওয়াজ তো মিল গিয়া, দিদি, এখন ফিরে চলুন ; তবে ? শুক্তি কি তবে না হেসে আর খুব গম্ভীর হয়ে বলতে পারবে, হ্যাঁ চলো।

কী আশ্চর্য, রাজবাহাদুর সত্যিই যে গাড়িটাকে ফেরাতে শুরু করেছে। গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলে শুক্তি। —হ্যাঁ, ঠিক করেছ, বেশ করেছ, চলো।

ভারতীর একটি ঘরের ভিতরে বসে কিরণলেখাও হাসছেন। শুক্তি এসে পৌঁছতে আরও খুশি হয়ে হেসে উঠলেন কিরণলেখা। — জোরহাট থেকে তোর প্রণবকাকার চিঠি এসেছে, শুক্তি।

শুক্তি—বলতে পাবি, কী লিখেছেন প্রণবকাকা। সুজিতবাবু ফিরে এসেছেন।

কিরণলেখা— কী করে বুঝলি ?

শুক্তি— তোমার মুখের হাসি দেখেই বুঝেছি। তা ছাড়া পথেও একজনের মুখে হাসি দেখলাম।

কিরণলেখা— কে ?

শুক্তি— ডাক্তারবাবুর স্ত্রী , সুজিতের কাকিমা।

কিরণলেখা— তাই নাকি ? যাক, খুব ভাল হল, ডাক্তার-গিন্নি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবে।

শুক্ত হাসে। —আমাদের রাজবাহাদুরও এইবার হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হবে।

কিরণলেখা— হবেই তো। সামান্য একটা খবর জানবার জন্যে ছুটোছুটি করে লোকটা এতদিন কী হয়রানই না হয়েছে।

হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে কিরণলেখারও মন। তা না হলে এখন শুক্তির মুখের দিকে ওরকম শান্ত আর স্নিগ্ধ দুটো মায়ার চোখ তুলে তিনি তাকিয়ে থাকতে আর হাসতে পারতেন না।

আর শুক্তি ? কিরণলেখার চোখের সামনের কোচের উপর একটা ক্লান্ত শরীরের সব ভার অলস করে লুটিয়ে দিয়ে বসে আছে যে শুক্তি, সে শুক্তি সত্যিই একটা হাঁপ ছাড়ে। তারপর উঠে দাঁড়ায় ; আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়। আজ শুক্তি নিজেই যে সব চেয়ে বেশি নিশ্চিন্ত একটা শ্রান্তি।

কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকে আর মিররের সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা খুলতে গিয়েই চমকে ওঠে শুক্তি ; আর কথা বলে ফেলে। —এ কী হল ?

ছি ছি, চোখ দুটো জলে ভরে গেল কেন ? বুকটা এমন করে ফুঁপিয়ে উঠল কেন ? শুধু একটা কথাই বা বার বার মনে পড়ছে কেন ?

খোঁপা বাঁধে শুক্তি। চোখ মুছতে হবে, তাই তোয়ালেটাকে হাতে তুলে নেয়। কিন্তু ভাবতে অদ্ভুত লাগে, কী আশ্চর্য, একথা তো কোনওদিনও মনে হয়নি। কোনওদিন তো বুঝতেও পারা যায়নি।

তবে আর কী ? কিছুই না। কিন্তু মা যেন সেই অদ্ভুত কথাটা আর জিজ্ঞেস না করেন যে, কাকে ভাল লাগে ? ও কথার জবাব দেবে না, দিতে পারবে না শুক্তি। মা যেন শুধু জিজ্ঞেস করেন, কাকে ভাল মনে হয়।

তেজপুরের শীতের বিকেলের শেষ আলোতে দূরের ধুলোর চেহারা রঙিন গোধূলির মত হয়ে উঠল কিনা, সেটা আজ আর দেখতে চেষ্টা করে না শুক্তি। হাতে-ধরা বইটার উপর যেন ঘুম-ঘুম চোখের একটা ক্লান্ত দৃষ্টি গড়িয়ে দিয়ে সোফার উপর চুপ করে বসে থাকে। হঠাৎ এক-একবার মনে পড়ে যায়, আর মনে পড়তেই হেসে ফেলে, দিবুদা মাঝে-মাঝে যে কবিতার বইটা খুব সুর করে পড়তেন, সে কবিতার শেষে একটা চমৎকার কথা ছিল— তামাম শোধ।

এই বিকালের ডাকে আরও কয়েকটা চিঠি এসেছে, সেগুলিও যেন এক-একটা নিশ্চিন্ততার চিঠি। কদমবাড়ি থেকে ম্যানেজার ব্যানার্জির অনেক চিঠি নিয়ে একজন লোক এসেছে। সেসব চিঠি

এখনও পড়ে শেষ করতে পারেননি গগন বসু।

শৈলেশ্বরবাবুর চিঠি পেয়েছেন মহিমবাবু। সাতদিনের মধ্যেই তেজপুরে ফিরে আসছেন শৈলেশ্বরবাবু, কারণ তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি ফেলেছে কয়েকজন ভাড়াটিয়া। বাড়িভাড়া আদায়ের জন্য তিনি মামলা করতে চান।

ইনকাম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরীর চিঠিও পেয়েছেন মহিমবাবু। তিনিও আসছেন। কারণ তাঁর কাছে বিশেষ কয়েকজন অ্যাসেসির জন্য বিশেষ দরকারের কথা বলতে সুশান্ত মজুমদার খুব শিগগির তেজপুরে এসে পড়বেন।

কলকাতা থেকে সুমিত্রা সরকারের চিঠি পেয়েছেন কিরণলেখা— এবার স্পষ্ট করে একটা খবর দিন, কিরণ বউদি। আর দেরি করা কী ভাল দেখায় ?

আরও যে দুটো চিঠি এসেছে, সে দুটো চিঠি দু'বার পড়ে নিয়ে হাসাহাসি করেছেন কিরণলেখা আর মণিমালা। নাসিক থেকে মীরার একটি চিঠি এসেছে। শান্তিপুর থেকে বাণীর একটি চিঠি।

কিরণলেখা— বাণী দেখছি এখনও শান্তিপুরেই আছে।

মণিমালা— মীরা যে গোলমালের সময় তেজপুর ছেড়ে একেবারে অতদূরে নাসিকে চলে গিয়েছে, এ খবর তো আমাকে কেউ দেয়নি।

কিরণলেখা হাসেন। —যাই হোক, বাণীর আর মীরার এসব কথার এখন তো আর কোনও মানে হয় না।

মণিমালার— না। শুক্তিকে তবে এখানেই ডাকি।

এখানে মানে ভারতীর বাইরের বারান্দার এইদিকে, যেখানে এরই মধ্যে একটি আলো জ্বলতে শুরু করেছে, কয়েকটি চেয়ার পড়ে আছে, আর দুই চেয়ারে বসে এতক্ষণ কথা বলছিলেন কিরণলেখা আর মণিমালা। এদিকেরই বাইরের ঘরের ভিতরে একটি টেবিলের কাছে বসে চেক লিখছেন গগন বসু। ম্যানেজার ব্যানার্জি জানিয়েছেন, বাগান চালু করতে হলে এখন বেশ কিছু টাকার দরকার হবে।

মণিমালার ডাক শুনতে পেয়েই চলে আসে শুক্তি। —বাঃ, সন্ধ্যে ভাল করে না হতেই আলো জ্বেলে বসে আছ, মণিমাসি।

মণিমাসি— না রে মেয়ে ; সে জন্যে নয়। অনেক চিঠি পড়তে হল। আলো না থাকলে চিঠির লেখা কী এই বয়সের চোখে আর পড়া যায় ?

কিরণলেখা বলেন— কলকাতা থেকে তোর বড় পিসির চিঠি এসেছে শুক্তি। জানবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সুমিত্রা, তুই কী বলতে চাস ?

তড়বড় করে হেঁটে বেড়ায় না, ছটফটও করে না ; বেশ শান্ত হয়ে এক-ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি। কিন্তু জবাব দিতে গিয়ে হেসে ফেলে। —আমি কিছু বলতে পারব না।

কিরণলেখা— একথার মানে ?

শুক্তি— তোমরা ভেবে ঠিক করে নাও, কাকে বেশি ভাল মনে হয়।

কিরণলেখা— আমরা যদি বলি, শ্যামল ?

শুক্তি— হ্যাঁ, তবে তাই।

মণিমাসি— আমি তো মনে করি, অনিমেষ ভাল।

শুক্তি হাসে— হ্যাঁ, তবে তাই ভাল।

কিরণলেখা চশমার দুই কাচ আশ্চর্য হয়ে চিকচিক করে।— তোমার নিজের কোনও পছন্দ-অপছন্দ থাকবে না, এটা কেমন কথা ?

শুক্তি— এ কথা তুলে আর কোনও লাভ নেই, মা।

কিরণলেখা— তুমি সত্যি কথা বলছ ?

শুক্তি— একটুও মিথ্যে বলছি না।

কিরণলেখা— তা হলে তোমার বাবাকে এই কথা বলি ?

শুক্তি— বলো। কিন্তু বলে লাভ কী ? বাবা তো বলেই রেখেছেন যে...।

কিরণলেখা— কী বলে রেখেছেন ?

শুক্তি— বাবার মানুষ চিনতে খুব ভুল হয়। অনেক দেখেও মানুষ চিনতে পারেন না।

হঠাৎ মাথাটাকে ঝুঁকিয়ে হেঁট করে দিয়ে মুখ লুকোতে চেষ্টা করে শুক্তি। কারণ, বাইরের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন গগন বসু, আর বারান্দার শুক্তির মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছেন। গগন বসুর হাতের পাইপে ধোঁয়া নেই ; তাঁর কপালের সেই গভীর তিনটে রেখা হঠাৎ যেন আরও গভীর হয়ে গিয়েছে। আবার ঘরের ভিতরে চলে গেলেন গগন বসু।

কিরণলেখা বলেন— শান্তিপুর থেকে বাণীও যে একটা অদ্ভুত চিঠি লিখেছে। পাইলট অফিসার পরিতোষের সঙ্গে তোমার তো কয়েকবার দেখা আর আলাপও হয়েছে।

শুক্তি— হ্যাঁ।

কিরণলেখা— তবে কি বলব যে, পরিতোষও ভাল ?

শুক্তি— ভাল বইকি। খারাপ কেন হবে ?

কিরণলেখা— তোমার আপত্তি নেই ?

শুক্তি— না।

কিরণলেখার মনের এতক্ষণের দুঃসহ বিস্ময় এইবার যেন আর্তনাদ হয়ে বেজে উঠবে। —মীরার মামার ছেলে রাজীবের কথাও তো মীরার কাছে তুমি শুনেছ।

শুক্তি— শুনেছি।

কিরণলেখা— রাজীবও নিশ্চয় খুব ভাল ছেলে।

শুক্তি— হ্যাঁ। শুনে তাই তো মনে হয়।

কিরণলেখা— তবে কি রাজীবের মা'র কাছে চিঠি দেব ?

শুক্তি— দাও।

কিরণলেখা— আপত্তি নেই তোমার ?

শুক্তি— না।

কিরণলেখা— তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

শুক্তি— রাগ করো না, মা। কেউ চেনা, কেউ শোনা, এই মাত্র। তার বেশি তো কিছু নয়। কাকে কার চেয়ে ছোট মনে করব বলো ? এরা সবাই সমান।

কিরণলেখা আর কোনও কথা বলেন না। কথা বলেন মণিমালা।— আমি বলি কিরণদি, শুনছেন কিরণদি ?

কিরণলেখা— বলো।

মণিমালা— শুক্তিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। বরং আমরাই ভেবে দেখি...।

কিরণলেখা— হ্যাঁ, অগত্যা তাই। আচ্ছা, শুক্তি, তুমি এবার যাও।

চলেই যাচ্ছিল শুক্তি। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। চোখে পড়েছে শুক্তির, গেটের দিক থেকে হেঁটে আসছে রাজবাহাদুর, তার পিছনে আরও দুজন। গেটের বাইরে রাস্তার উপর একটা রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে।

সে দুজন সোজা এগিয়ে এসে একবারে বারান্দার উপরে উঠে দাঁড়ায়। হেসে কথা বলেন কিরণলেখা।— এ কি ? ডাক্তারগিন্নি যে ! এখন কোথায় আছেন আপনি ?

প্রিয়বালা— আছি রঙ্গিয়াতে।

কিরণলেখা— এই মেয়েটি কে ?

প্রিয়বালা— আমার দূর সম্পর্কের ভাগ্নে হয় বলাই ; তারই বাড়িতে এই মেয়ে এইতো মাত্র মাস দুই হল এসেছে। বলাইয়ের এক জ্ঞাতিখুড়োর মেয়ে। এ মেয়ের বাপও নেই, মাও নেই।

কিরণলেখা— বসুন আপনি, তুমিও বসো।

প্রিয়বালা— সাহেব ভাল আছেন ?

কিরণলেখা— হ্যাঁ।

প্রিয়বালা— কিন্তু আর বসব না। যাচ্ছি ইস্টিশানে। সন্ধ্যের ট্রেনেই রঙ্গিয়া ফিরে যাব।

এগিয়ে আসে শুক্তি। —ট্রেন ছাড়বে কখন ?

প্রিয়বালা— এই তো, এই সন্ধ্যে ছ'টায়।
শুক্তি— তবে তো এখনও সময় আছে।
প্রিয়বালা— তা...সময় একটু তো আছে... কিন্তু নেই বললেই চলে।
শুক্তি— আপনি আর মাত্র পাঁচটি মিনিট বসুন।
প্রিয়বালা হাসেন। — কেন ? আপনার ইচ্ছেটা কী ?
শুক্তি হাসে। — না, আপনাকে কেক-বিস্কুট খাওয়াব না ; শুধু একটা জিনিস দেব।
প্রিয়বালা— জিনিস ?
প্রিয়বালার কথার কোনও জবাব না দিয়ে চলে যায় শুক্তি। ফিরে এসে একটা চেয়ারের উপর শক্ত হয়ে বসে, হাসে, আর কাগজে মোড়া একটা সোয়েটারকে কোলের উপর রাখে ; উলের কাঁটা হাতে তুলে নেয়। — আপনি একটু দেরি করুন। এমন কিছু সময় লাগবে না। হাতটা পুরো হয়েই গিয়েছে। শুধু কাঁধের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, বাস।...শুনছেন, সুজিতবাবুকে দেবেন এই সোয়েটার। ভুলে যাবেন না যেন।
প্রিয়বালা হাসেন। —সোয়েটার ?
শুক্তি— হ্যাঁ। মালতী এসে যদি কখনও জিজ্ঞেস করে, তবে বলে দিতে পারব, সোয়েটার বোনা ফিনিশ করেছি, একজন যুদ্ধের মানুষকেই ওটা দিয়ে দিয়েছি ; ফাঁকি দিইনি।
খুব ব্যস্ত শুক্তি। শুক্তির হাতে উলের কাঁটা যেন সময় জয় করবার জন্য ছটফটিয়ে কাজ করছে। পাকা ধানের রঙ, নরম ফোরপ্লাই উলের সোয়েটার শুক্তির কোল থেকে হঠাৎ এক-একবার পড়-পড় হয়ে ঝুলে পড়ে। তখুনি ব্যস্ত হাতে আবার কোলের উপরে টেনে তুলে নেয় শুক্তি।
কিরণলেখা আর মণিমালা, দুজনে শুধু নীরব হয়ে বসে আছেন আর দেখছেন। সুজিতের কাকিমা প্রিয়বালাও তাই একেবারে নীরব। তিনি শুধু সাহেবকে একবার দেখতে পেলেন, ঘরের ভিতরে সাহেব যেন ছটফট করে ঘুরছেন। মাথার কাপড়টাকে টেনে আরও বড় করে নামিয়ে দেন প্রিয়বালা।
—এই নিন, হয়ে গেছে। সোয়েটারটাকে প্রিয়বালার হাতে তুলে দেয় শুক্তি। বেশ জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে। তারপর, যাকে চোখে দেখতে পেয়েও এতক্ষণের এই ব্যস্ততার জন্য যার সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারেনি শুক্তি, তারই সঙ্গে কথা বলে— তুমি কে ? তোমার নামটাও তো শুনতে পেলাম না।
মেয়েটি বলে— পূরবী।
বেশ দেখতে পূরবী। একটু রোগা রোগা বটে, কিন্তু বেশ নরম দুটো ঠোঁট। চোখেও বেশ জ্বলজ্বলে একটা হাসি। বয়স কত হবে ? শুক্তির সমান না হোক, বড় জোর দু-তিন বছর ছোট। ঢাকাই তাঁতের শাড়িতে ছোট-ছোট রঙিন বুটি। গায়ে জড়ানো ধূপছায়া ছাপের একটা স্কার্ফ। খোঁপাটাও ঢিলে ছাঁদে বাঁধা হয়ে ঘাড়ের একদিকে তোলা।
প্রিয়বালা এইবার অদ্ভুত একটা তৃপ্তিভরা হাসি মুখে নিয়ে কথা বলেন— আপনাদের কাছে পূরবীকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাব বলেই তো এলাম। এ মেয়ে এখন আমার কাছে থাকবে। বুঝলেন তো, সুজিতের জন্যে এই মেয়েকে রঙ্গিয়া নিয়ে চললাম। ওখানেই বিয়ে হবে।
শুক্তি— তাই বলুন। এমন চমৎকার খবরটা এতক্ষণ চেপে রেখেছিলেন কেন ? আর তুমিই বা কেমন ? ধরা পড়ে যাবার ভয়ে বুঝি চুপটি করে বসে আছ, কোনও কথা বলছ না ?
কী যেন বলতে গিয়ে আর বলতে পারে না পূরবী। চোখ নামিয়ে আর মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।
শুক্তির মুখের হাসিটা এইবার যেন খুশি ঝর্নার শব্দের মত উথলে ওঠে। — দেখছেন তো, আপনার পূরবী সত্যিই যে বিয়ে হবার আগেই ধরা পড়ে গেল।
—দেখেছি। খুব খুশি হয়ে হেসে ফেললেন প্রিয়বালা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। —এবার আমরা আসি।
প্রিয়বালা আর পূরবী দুজনেই কিরণলেখা আর মণিমালার দিকে হাত তুলে নমস্কার জানায়।

আর, শুক্তির দিকে হাত তুলে নমস্কার জানাতে গিয়ে পূরবীর মুখটা হঠাৎ লাজুক হয়ে হাসি লুকোতে চেষ্টা করে।

পূরবীর কাছে এগিয়ে আসে শুক্তি ; গলার স্বর একটু চেপে দিয়ে, দুই চোখ বড় করে, হেসে হেসে আর ফিসফিস করে কথা বলে— খুব ভাল হল। ছুটির সময় দু'জনে মিলে একবার বেড়াতে বের হয়ে জিয়াভরলি নদীটা দেখে এসো। কী চমৎকার সেই জিয়াভরলি। দেখলে প্রাণ ভরে যাবে।

কালকেতু

প্রায় রোজই সন্ধ্যায় যে মোটর গাড়িটা দমদমের এই বাড়ির ফটকের কাছে এসে একেবারে থেমে যায়, সেটা খুবই চমৎকার ও চকচকে একটা ক্যাডিলাক। ফটকের আলোর আভা লেগে ক্যাডিলাকের বডির পালিশ আরও চকচক করে।

বাড়ির নাম 'নিরঞ্জন', যদিও বাড়ির চেহারাটি অনেক রঙে রঞ্জিত। যাঁরা ভাষার অর্থ টেনে মহিম বসুর এই বাড়ির নামের ভুল ধরেন আর একটু হাসাহাসিও করেন, তাঁরা জানেন না যে, বাড়ির নামটি মহিম বসুর বাবার নাম। নিরঞ্জন বসু আজ আর বেঁচে নেই। চল্লিশ বছরেরও বেশি হবে, তিনি নানারকমের জ্বরজ্বালায় ভুগে ভুগে, বলতে গেলে একরকমের বিনা চিকিৎসাতেই মারা গিয়েছেন। যাবার আগে একমাত্র ছেলে মহিমের জীবনটার জন্য একমাত্র যে বিষয়-সম্বল রেখে গিয়েছিলেন, সেটা হল জ্ঞাতি ভাইয়ের কাছে বন্ধকে বাঁধা একটি গ্রাম্য বাড়ি। বিশ বছর বয়সে নৈহাটির এক জুট মিলের সাতাশ টাকা মাইনের কেরানি হয়েছিলেন নিরঞ্জন বসু। চল্লিশ বছর বয়সে নানা রোগের কারণে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যখন কেরানিগিরির কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, তখন মাইনে ছিল তেত্রিশ টাকা। তারপর পাঁচ বছর ধরে শূন্য রোজগারের জীবন। স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আবার গ্রামের বাড়িব আশ্রয়ে ফিরে এলেও দুশ্চিন্তার কঠোর প্রশ্নটা একটুও নরম হয়নি। পাঁচটি জীবনের বেঁচে থাকবার আশা কোথায়, আর উপায়ই বা কী ? কাজেই অসহায় আর নিরন্ন ভাগ্যটার পেটের খোরাক যোগাবার জন্য বাড়িটাকে বন্ধক দিতে হয়েছিল।

বাড়ি বন্ধক দিয়ে কত টাকা পেয়েছিলেন নিরঞ্জন বসু ? আড়াই হাজাব টাকা। এই আড়াই হাজার টাকার একটি পয়সাও তিনি ওষুধ কিনতে খরচ করেননি। ওষুধ কেনবার জন্য বার বার অনেক পীড়াপীড়ি করতে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করেছেন মহিমের মা। বড় ছেলে মহিমও রাগ করে অনেক চেঁচামেচি ও ঝগড়া করেছে। তবু নিরঞ্জন বসুর ওষুধ-বিরোধী প্রতিজ্ঞাটাকে একটুও টলাতে পারেনি। মাত্র দেড় টাকা খরচ করলে শম্ভু কবিরাজের পাচন কিনে আনতে পারা যায়। যে পাচন দিনে দু'বার করে খেলেও সাতটা দিন চলে যায়। কিন্তু না, কিছুতেই না। নিরঞ্জন বসু কোনও ওষুধের ছিটেফোঁটাও মুখে দেবেন না।

এইভাবে পাঁচটি বছর চলবার পর, বড় ছেলে মহিমের বয়স তখন সাড়ে উনিশ বছর, তখন একদিন হঠাৎ দাওয়ার উপর বসে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন নিরঞ্জন বসু। সেই অদ্ভুত হাসির অদ্ভুত শব্দ শুনে চমকে উঠলেন মহিমের মা। —কী হল ?

নিরঞ্জন বসু সেইভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলেন—সবই ফুরিয়েছে, মাত্র দশ টাকা দশ আনা আছে। দাহ করবার খরচ ওতেই হয়ে যাবে মনে হয়।

কী আশ্চর্য, সেই রাত্রিতে সারা আকাশ ভরে কোটি কোটি তারা যখন হীরের কুচির মত ঝিকঝিক করছে, তখন খুবই শান্ত ও মৃদুস্বরে মহিমকে নাম ধরে ডাক দিয়েই মরে গেলেন নিরঞ্জন বসু।

সেই নিরঞ্জন বসুর সেই বড় ছেলে মহিমই হলেন আজকের এই মহিম বসু, রেলওয়ে কন্ট্রাক্টর, যাঁর বাড়ির গ্যারেজের দুটি গাড়ির চেহারা কোনও ক্যাডিলাকের চেহারার চেয়ে কম চকচক করে না। মহিম বসুর ছোট ভাই ধীরেন বসু এখন লন্ডনের ডাক্তার ; বোন দীপালি এখন মিরাটের

ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার গুহ রায়ের গৃহিণী। দীপালির বিয়ের দু'বছর পর, মহিমের বিয়ের তিন বছর আগেই মা মরে গেলেন। মহিমের বিয়ের শুভদিনের উৎসবটাকে কল্পনা করে ছেলের বউয়ের সুন্দর একটি মুখও কল্পনা করেছিলেন মা। সেই মুখের শোভার সঙ্গে চমৎকার মানাবে, এরকম লতাফুল ডিজাইন নিজেই ভেবে নিয়ে মুক্তোর একজোড়া দুল গড়িয়ে রেখেছিলেন। ব্যস্, ওই পর্যন্ত, ধীরেনের বউয়ের জন্যও একজোড়া মুক্তোর দুল এখনই গড়িয়ে রাখলে ভাল হয় বলে মনে করে যখন তিনি ডিজাইন ভাবতে শুরু করেছিলেন, তখন বুকের ভিতরের ব্যথাটা বেশ জোরে জোরে টোকা দিয়ে তাঁর নিঃশ্বাসের স্বস্তি ও শান্তি ধড়ফড়িয়ে দিতে শুরু করেছে। তাই আর সময় পাননি মা। দেয়ালের গায়ে নিরঞ্জন বসুর ছোট্ট পুরনো ফটোর সামনে যে আসনটি সব সময় পাতা থাকে, একদিন তারই উপর বসে অনেকক্ষণ জপ করবার পর শুয়ে পড়লেন মা। ঘুমিয়েও পড়লেন, কিন্তু আর জাগলেন না।

দমদমের এই বাড়ির শুধু চেহারাটা দেখে প্রতিবেশীদের মধ্যে যাঁরা মহিম বসুকে বুঝতে চেষ্টা করেন, তাঁরা খুবই ভুল করেন। তাঁরা জানেন না, তাঁদের জানবার কথাও নয় যে, ষাট বছর বয়েসের এই মানুষটি, যিনি প্রতিবছর গ্রীষ্মের সময় সিমলাতে চলে যান, আর বাড়িতেও ধুতি-জামার বদলে সাহেবি কেতায় গাউন প্যান্টালুন পরে বসে থাকতে ভালবাসেন, তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের একটি রোগা মানুষের গেঞ্জি-পরা চেহারার ফটোর কাছে দাঁড়িয়ে এখনও মাঝে মাঝে অভিমানী ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে ওঠেন আর চোখের জল মোছেন। আর একটা যে অভিমানের ব্রত মহিম বসুর জীবনে আজও আছে ও চলছে, তার খবর মহিমবাবুর স্ত্রী হেমলতা ছাড়া আর কেউ জানে না। এটা হল সাড়ে উনিশ বছর বয়সের মহিম বসুর একটি অভিমানের জের। বাবা যেদিন মারা গেলেন, সেদিন সকালবেলাতে এক বাটি দুধ দিয়ে বাবাকে অনেক সাধাসাধি করেছিল মহিম—কবরেজমশাই বলেছেন, তোমাকে দুধ খেতেই হবে। নিরঞ্জন বলেছিলেন—না রে বাবা, কবরেজ বললেও আমি একটা রাক্ষস হয়ে যেতে পারি না।

—কী বললে ?

—বলছি, সামান্য এই দুধটুকু যদি আমিই খেয়ে ফেলি তো ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না।

চেঁচিয়ে ওঠে মহিম।—বাজে কথা বলবে না। ভগবান তোমার মত বোকা নয় যে, ক্ষমা করবেন না।

খুব রাগ করে জবাব দিয়েছিলেন নিরঞ্জন বসু!—না। ভগবান বলবেন, তুই বেটা তোর রোগা-রোগা ছেলেমেয়েদের রক্ত খেয়েছিস।

তারপরেই বেশ শান্ত হয়ে আর মহিমের পিঠে হাত বুলিয়ে কথা বলেছিলেন সেই রুগণ আর জীর্ণ-শীর্ণ মূর্তির মানুষটি—আরে বোকা ছেলে, বুঝিস না কেন ? আমিই যদি এই দুধটুকু খেয়ে ফেলি তো দীপু আর ধীরু কী খাবে ? দুধটা ওদের দরকার, আমার নয়।

আশে-পাশে যত বাড়ি আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে মাথাউঁচু বাড়ি হল মহিম বসুর এই রঙিন 'নিরঞ্জন'। বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই যে, এটা বেশ বড় রকমের এক বড়লোকের বাড়ি। প্রতিবেশীদের অনেকের ধারণাতে একটা সন্দেহের প্রশ্নও আছে : এত টাকা কি এমনিতেই কখনও হতে পারে রে, বাবা ? বেশ একটু এথি-ওথি না করে, বেপরোয়া হয়ে দু'চারটে দাঁও না মেরে, রাতারাতি পাগড়ি বদল না করে, পাঁচরকমের কারসাজির করিৎকর্মা না হয়ে কেউ কি কখনও টাকার মালিক হতে পেরেছে ?

হেমন্তবাবু কিন্তু কিছু খবর রাখেন। তাই শুধু তিনিই পাড়ার পরিচিত ছেলেদের চাকরিহীন জীবনের বিষাদ ও বিমর্ষতার নিন্দা করে মাঝে মাঝে অনেক উৎসাহের কথাও বলেন : এই যে মহিম বসু, তিনি যে একদিন কানপুরের এক পাঞ্জাবি ঠিকেদারের কাঠের গোলাতে বিশ টাকা মাইনের মুনশির কাজ করেছিলেন, সেকথা কি তোমরা জান ? জান না। তাই তোমরা হা-হুতাশ করে ঘুরে বেড়াও। শুধু চেষ্টা খাটুনি আর প্রতিজ্ঞার জোরে, বাধাবিপত্তি আর পরীক্ষার অনেক আঘাত সহ্য করে, লাইন মেরামতের কুলিসর্দারির অবস্থা থেকে উঠতে উঠতে শেষে একদিন রায়না নদীর ব্রিজের মত অত বড় একটা ব্রিজ তৈরির কন্ট্রাক্টর হয়েছিলেন মহিমবাবু। আজ দেখো, যে মহিমবাবু একদিন

মহাজনের কাছ থেকে ধার-করা সামান্য টাকার পুঁজি নিয়ে রেলওয়ের ঠিকেদারি কারবার শুরু করেছিলেন, তিনি এখন কী বিরাট একজন ধনী মানুষ। কী সুখের সংসার! রূপে-গুণে শিক্ষায় যেমন তাঁর ছেলেটি, তেমনই তাঁর মেয়েটি, দু'জনেই কত সুন্দর, কত চমৎকার। তোমরা মনে কর : মহিমবাবুর ছেলে ওই বিকাশ শুধু চকচকে মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে ছুটোছুটি করে। তোমরা জান না যে ওই বিকাশ মাসের মধ্যে সাতদিন মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের ভিতরে নতুন লাইন তৈরির কাজে যখন তাঁবুর ভিতরে থাকে, তখন শুধু শুকনো চিঁড়ে চিবিয়ে একটানা সাতটা দিন পার করে দেয়। রান্নাকরা একথালা ডাল-ভাতও কপালে জোটে না। আর, ওই যে মেয়ে, মহিমবাবুর একমাত্র মেয়ে সুপ্রভা, যার পিয়ানোর শব্দ তোমরাও শুনেছ, তার সম্বন্ধে তোমরা বোধ হয় শুধু এইটুক জান যে, সে মেয়ে ফিলসফিতে এম-এ পাস করে এখন শুধু পিয়ানো বাজায়। একবার তোমাদের মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করবে, তবেই জানতে পারবে, সুপ্রভা তোমাদের পাড়ার ওইসব গীতা আর মিতাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি কাজের মেয়ে। রান্নার লোক থাকলেও বাড়ির দু'বেলার জলখাবার নিজের হাতে তৈরি করে সুপ্রভা। উচ্ছের সুক্তো থেকে শুরু করে দোগোস্তা কারি আর বিরিয়ানি-পোলাও পর্যন্ত সবই রান্না করতে জানে, পারে, আর করেও থাকে ওই পিয়ানো-বাজানো মেয়ে। তোমাদের মাসিমা নিজের চোখে দেখেছেন, প্রায় বিশরকমের আচার ও মোরব্বা তৈরি করে আর বয়ম-ভর্তি করে আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছে সুপ্রভা। মহিমবাবুকে যে শাল গায়ে জড়িয়ে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তোমরা দেখতে পাও, সেই শালের ওপর রেশমিসুতোর নকশাগুলি সুপ্রভারই হাতের কাজ। আর দু'মাস ধরে প্রায় রোজই যে চমৎকার একটি ক্যাডিলাক মহিমবাবুর বাড়ির ফটকে এসে থামে, সেটা যে...।

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেলেন হেমন্তবাবু। ছেলেদের সঙ্গে ওই চমৎকার ক্যাডিলাকের কথা আলোচনা না করলেও চলে, না করাই উচিত।

ওই ক্যাডিলাক রোজই সন্ধ্যায় কোথা থেকে আর কতদূর থেকে এখানে আসে আর চলে যায়, সেটা অবশ্য প্রতিবেশীদের কেউই জানেন না। শুধু হেমন্তবাবু জানেন যে, বালিগঞ্জ থেকে আসে। কোন বাড়ির গাড়ি, কাদের গাড়ি, তাও তিনি জানেন। কিন্তু কারও কি বুঝতে কিছু বাকি আছে? সকলেই বুঝেছে, মহিম বসুর মেয়ে সুপ্রভার ভালোবাসার টানে গাড়িটা আসে। গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে আসে যে, যার বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বলে মনে হয়, তার নাম কেউই জানে না, হেমন্তবাবু অবশ্য জানেন। তাকে যেদিন প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন হেমন্তবাবুর স্ত্রী শৈলবালা, সেদিন তিনি বেশ বিগলিতস্বরে তাঁর বিস্ময়ের কথাটা বলেই ফেলেছিলেন। —এ যে সত্যিই একটি রূপকুমার।

নিজেরই বাড়ির ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে প্রথম দিনের সেই দৃশ্যটি দেখতে পেয়েছিলেন শৈলবালা। বিকালবেলা চকচকে একটা গাড়ি এসে মহিমবাবুর 'নিরঞ্জনের' ফটকের কাছে থেমেছে, একজন বিধবা মহিলা গাড়ি থেকে নামছেন। খুব হাসি-খুশি দুটি চোখ, বেশ সুদর্শন একটি ছেলেও গাড়ি থেকে নামল। মহিমবাবুর স্ত্রী হেমলতা এগিয়ে এসে মহিলাকে প্রণাম করতেই হেমলতাকে জড়িয়ে ধরলেন সেই বিধবা মহিলা।

এরা কি মহিমবাবুর কুটুম্ব? কিংবা নিতান্ত নিমন্ত্রিত দুটি মানুষ? সেই প্রথম দিনে এরকমের দুটি একটি প্রশ্ন হেমন্তবাবুর স্ত্রী শৈলবালার মনে দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু আজ আর ওরকমের কোনও প্রশ্ন নেই। আজ শুধু প্রশ্ন, বিয়েটা কবে হবে?

বিয়ে এখনও হয়নি, শুধু মেলামেশা চলছে, এরকমের একেলে অভিরুচির কাণ্ড-কারখানা যাঁর চোখে ঘোর অনাচার বলে বোধ হয়ে থাকে, তিনিও অর্থাৎ চারু ডাক্তারের মা'ও চকচকে ক্যাডিলাকের দিকে রাগের চোখ নিয়ে তাকাতে পারেন না। তিনি বলেন, সুপ্রভার মত মেয়ের সঙ্গে এরকমের সুন্দর ছেলেকে যে খুবই ভাল মানায়, সেটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না? তুমিও না, আমিও না।

দমদমের মহিম বসুর মেয়ে সুপ্রভার সঙ্গে বালিগঞ্জের চমৎকার ছেলে সন্দীপ রায়ের মেলামেশা আর কথাবার্তার যে আনন্দ এই 'নিরঞ্জন'-এর ড্রইংরুমের ভিতরে রোজ সন্ধ্যায় উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, সে আনন্দ সৌভাগ্যের আকস্মিক দান বলে মনে করেন মহিমবাবু, মনে করেন হেমলতা। সুপ্রভার

দাদা বিকাশও তাই মনে করে। সন্দীপের বাবা মাধব রায় আজ আর বেঁচে নেই। তিনি বিগত হয়েছেন আজ থেকে প্রায় ন'বছর আগে। মাধব রায়ের মৃত্যুর ঘটনাটা করুণ ছবির মত এখনও মাঝে মাঝে মহিমবাবুর মনের ভিতরে ভেসে ওঠে।

মাধব রায় নিজের গুণে ও কৃতিত্বে একটা দুঃস্থ লোন অফিসকে বিশ বৎসরের মধ্যে সুস্থ ও সম্পন্ন করে বিপুল আমানতের যে ব্যাঙ্কটি গড়ে তুলেছিলেন, সেই ব্যাঙ্কেরই অফিস থেকে একদিন টেলিফোনে মহিমবাবুকে তিনি ডেকেছিলেন—'আপনি আজ বিকেলের মধ্যে একটু সময় করে নিয়ে আমার অফিসে একবার আসুন! সামান্য পরিচয়ের জোরেই এত বড় একটা অনুরোধ করে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না। আপনার কাছে আমি কাজ-কারবারের কথা বলব না, টাকা-পয়সার কথাও বলব না। আমি আপনার কাছে শুধু আমার একটা আশার কথা বলব।' ব্যাঙ্কের অফিসে মাধব রায়ের চেম্বারে ঢুকেই দেখতে পেয়েছিলেন মহিমবাবু, টেবিলের উপর নীরব ও নিস্পন্দ মাধব রায়কে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার এসে দুঃখিতস্বরে বললেন, প্রাণ নেই।

মহিমবাবু সেদিনও হেমলতার কাছে পূর্বস্মৃতির নানা কথা বলতে গিয়ে মাধব রায়ের কথাও বলেছেন—আমার ষাট বছরের জীবনে আমি সন্দীপের বাবা মাধব রায়ের মত সৎ ও সজ্জন মানুষ খুব কমই দেখেছি। আমি এখনও মাঝে মাঝে ভাবি, মাধব রায় তাঁর কোন আশার কী কথা আমাকে বলতে চেয়েছিলেন?

সন্দীপের মা চারুশীলাও হেমলতার কাছে নিতান্ত অজানা কোনও নতুন মানুষ নন। হেমলতা যখন বেথুনে আই-এ পড়তেন, চারুদি তখন বি-এ পড়তেন। কী সুন্দর গান গাইতেন চারুদি। কিন্তু সেজন্য চারুদির মেজাজে সামান্য একটুও অহংকার ছিল না। বললেই গান শুনিয়ে দিতেন।

এই তো সেদিন, বেলুড়ের উৎসব দেখতে গিয়ে চারুদির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। সৌভাগ্যের কোনও ইঙ্গিত না থাকলে এক যুগ আগের দেখা ও চেনা চারুদিকে আবার হঠাৎ দেখতে পাওয়া যাবে কেন? শুনে আশ্চর্য হলেন আর খুশি হয়ে বললেন চারুদি—তুমিই মহিমবাবুর গৃহলক্ষ্মী?

হেমলতা বলেন—আমার এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলের বিয়ে হয়নি, মেয়েরও বিয়ে হয়নি।

চারুশীলার দুই চোখ যেন হঠাৎ-আলোর আভা লেগে হেসে ওঠে।—মেয়ে নিশ্চয় তোমার মত সুন্দর?

হেমলতা—আপনার মত সুন্দর নয়।

চারুদির হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন হেমলতা—কথা দিন, আমাদের বাড়িতে একদিন আসবেন। তবে বিশ্বাস করব যে, আপনি সত্যিই আমাদের সেই চারুদি।

কথা দিয়েছিলেন চারুশীলা। আর, বোধ হয় সেই কথারই মান রাখবার জন্য দু'দিন পরে এবাড়িতে এসে হেমলতাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কিন্তু সুপ্রভার মুখের দিকে তাকাতেই তাঁর খুশি-চোখের দৃষ্টিটা বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। তিনি যেন তাঁর মনের ভিতরে একটা প্রশ্নের গুঞ্জন শুনছিলেন—এ কী সত্যিই একটা সৌভাগ্যের ইঙ্গিত?

চারুশীলা বলেছিলেন—আমি তো আর গাইতে পারি না, হেম। আমি বরং তোমার মেয়ের গান শুনব।

'তোমারই রাগিনী জীবনকুঞ্জে', সুপ্রভার গান শুনে খুব খুশি হলেন চারুশীলা—তোমার কি মনে পড়ে হেম, শকুন্তলাদির ফেয়ারওয়েল সভাতে আমি এই গানটি গেয়েছিলাম।

হেমলতা—খুব মনে পড়ে।

সন্দীপকে দেখে হেমলতার চোখের বিস্ময়টাও কিছু কম নিবিড় হয়ে ওঠেনি। সুপ্রভার জন্য এইরকম একটি পাত্রই তো আশা করেন হেমলতা। মহিমবাবুর মনেও নিশ্চয় এইরকম আশার গুঞ্জন জেগেছিল, নইলে তিনি কেন সন্দীপের হাত ধরে বাগানের গাছপালার কাছে ঘুরে বেড়িয়ে এত গল্প করলেন?

সন্দীপের মুখের দিকে না তাকিয়ে, সন্দীপের দু'চারটে কথার জবাব দিতে গিয়ে সুপ্রভার মুখটা বার বার লালচে হয়ে উঠেছিল। সেদিন স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে না পারলেও, আজ খুবই স্পষ্ট করে বুঝতে পারে সুপ্রভা, তার আশার লজ্জাটাই সেদিন ধরা পড়ে যাবার ভয়ে শিউরে উঠেছিল।

পরের দিন সন্ধ্যা হতেই সন্দীপের ক্যাডিলাক যখন এসে বাড়ির গেটের কাছে থেমেছিল, তখন সুপ্রভার ভীরু আশার বুকটা আর-একবার শিউরে উঠেছিল। কী আশ্চর্য। সত্যিই তো, সন্দীপবাবু এসেছেন। কেন এসেছেন ? বাবার সঙ্গে ব্যাঙ্কের অবস্থার কথা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য ? চারু-মাসিমার কাছ থেকে নেমন্তন্নের কোনও চিঠি নিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক ? বাবা আর মা, দু'জনের কেউই তো এখন বাড়িতে নেই। কী বিপদ, কে এখন সন্দীপবাবুর সঙ্গে কথা বলবে ?

কিন্তু বিপদ কাটাবার তো কোনও উপায় নেই। লজ্জা-ভীরু প্রাণটাকে একটু সাহসী করে নিয়ে আর হেসে হেসে এগিয়ে এসে বারান্দার উপর দাঁড়ায় সুপ্রভা।—আসুন, কিন্তু মাসিমা এলেন না কেন ?

সন্দীপ হেসে ফেলে—আপনার মাসিমার তো আসবার কোনও কথা ছিল না।

সুপ্রভাও হেসে ফেলে—আপনারও আসবার কোনও কথা ছিল না।

—না, কিন্তু না এসে পারলাম না। আসতে বাধ্য হলাম।

—কেন ?

—তোমাকে আর একবার দেখবার জন্য।

চমকে ওঠে সুপ্রভা। মাথাটা ঝুঁকে পড়ে। কোনও কথা আর বলতে পারে না সুপ্রভা। একটা বোবা মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্দীপ হাসে।—ড্রইংরুমের ভিতরে কি আমার প্রবেশ নিষেধ ?

—না না, সে কী কথা ? আপনি ভুল বুঝবেন না। বদ্ধ নিঃশ্বাসটাকে মুক্ত করে দিয়ে কথা বলে সুপ্রভা।

ড্রইংরুমের ভিতরে ঢুকেও দাঁড়িয়ে থাকে সন্দীপ। কোচের উপর বসে না। সুপ্রভা বলে—বসুন।

সন্দীপকে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুপ্রভা হাসতে চেষ্টা করে।—অন্তত ততক্ষণ বসুন, যতক্ষণ না আমি চা নিয়ে আসি।

সন্দীপ—ভাল কথা, বসছি।

চা নিয়ে আসে সুপ্রভা। চা খেয়ে উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ—তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে, যদি ভাল না লাগে, তবে এখনই বলে দাও সুপ্রভা।

সুপ্রভা—কী বললেন ?

সন্দীপ—তুমি যদি মনে কর যে, আমার আর আসা উচিত নয়, তবে আমি কোনওদিনও আসব না।

সুপ্রভা—সে কথা আমি বলতে পারি না। আমি বরং বলব যে...।

সন্দীপ—বলো।

সুপ্রভা—আপনি যদি মনে করেন যে, এখানে আপনার আসা উচিত, তবে আসবেন।

সন্দীপ—আমি তো মনে করি আসা উচিত।

সুপ্রভা আবার মাথা হেঁট করে, কার্পেটের নকশার ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে কথা বলে—তবে আসবেন।

—তোমার আপত্তি নেই ?

—না।

সেদিন সন্দীপ চলে যাবার পর ড্রইংরুমের দরজার পর্দাটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে, অনেকক্ষণ এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে যেন মনের ভিতরের একটা উতলা আবেগের ভার সহ্য করবার চেষ্টা করেছিল সুপ্রভা। বুঝতে তো কিছু আর বাকি নেই, কেন এখানে আসতে চায় সন্দীপ। আর সুপ্রভাকে দেখবার জন্য সন্দীপের ইচ্ছাটাই বা এত আকুল হয়ে উঠেছে কেন ? আর বেশি প্রশ্ন না করে ভালই

করেছে সুপ্রভা। কুয়াশা সরে গিয়েছে, ভোরের আকাশের আলো বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে আর কিসের প্রশ্ন।

ভদ্রলোক বোধ হয় কিছু রেখে-ঢেকে কথা বলতে পারেন না। ভদ্রলোকের ইচ্ছার ভাষাটা বড় বেশি স্পষ্ট। হলই বা, সেজন্য এত চমকে ওঠবার কোনও মানে হয় না। ভালবাসার প্রাণ অনেক হিসেব করে, অনেক দেরি করে আর রেখে-ঢেকে কথা বলবে, এরকম কোনও নিয়ম আছে কি? সবারই জীবনেরই সাধ-অসাধ কি একই নিয়মে চলে?

গল্প শুনেছে সুপ্রভা, ব্যাধের বাঁশির শব্দ শুনে বনের হরিণ মুগ্ধ হয় আর ছুটে আসে। কিন্তু সন্দীপের কথাগুলিকে ব্যাধের বাঁশির শব্দ বলে সন্দেহ করবার তো কোনও মানে হয় না। সন্দীপ যে ঘরের ছেলে, সে ঘর মাধব রায়ের মত সৎ ও সজ্জন মানুষের স্মৃতি দিয়ে আর চারু-মাসিমার মত মানুষের সরল মনের মায়া দিয়ে তৈরি করা ঘর। বাবা আর মা যে তাঁদের মেয়ের জীবনের জন্য এইরকম একটি ঘর পছন্দ করেন, সেটা বাবা আর মার কথাবার্তার ভাষাতে বার বার অনেকবার শুনতে পেয়েছে সুপ্রভা। সন্দীপকে দেখতে পেয়ে বাবা আর মার চোখে খুশির উচ্ছ্বাস দেখে বুঝতে পেরেছে সুপ্রভা, সন্দীপকে তাঁরা পছন্দ করেই ফেলেছেন।

নিজের ইচ্ছেটাকেও কি চিনতে আর বুঝতে কিছু বাকি আছে? না, একটুও না। সেদিনই, প্রথম দেখার দিনেই মনে হয়েছিল সুপ্রভার: এইরকম একটি মানুষ যদি অন্তত মুখের দুটো কথা দিয়ে সুপ্রভাকে ভালবাসে, তবে সুপ্রভা তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসার সাহস পেয়ে যাবে। তাই তো হল। সন্দীপ যে ভাষায় যতটুকু কথা বলেছে, তাই যথেষ্ট। সুপ্রভার প্রাণটা এখন নির্ভয়ে, নির্ভয়ে কেন, অনেক সাহস নিয়ে সন্দীপকে যদি ভালবাসতে পারে, তবে ভালই হবে।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে, তারপর হেসে ফেলে সুপ্রভা। বাবা আর মা ফিরেছেন। ভেলভেটের পর্দাটাকে হাতের দোলায় দুলিয়ে দিয়ে কথা বলে সুপ্রভা।—সন্দীপবাবু এসেছিলেন, এই কিছুক্ষণ আগে চলে গেলেন।

হেমলতা—কী আশ্চর্য, সন্দীপ সত্যিই তবে এসেছিল!

মহিমবাবু—সন্দীপ একাই এসেছিল?

সুপ্রভা—হ্যাঁ।

হেমলতা—চা খেয়েছে সন্দীপ?

সুপ্রভা—হ্যাঁ।

হেমলতা—চারুদি ভাল আছেন?

সুপ্রভা—সে কথা তো জিজ্ঞাসা করিনি।

মহিমবাবু হাসেন—জিজ্ঞাসা করতে হয়।

সুপ্রভা—বলে গেলেন, আবার আসবেন।

হেমলতা—আসুক না। ভালই তো। শুধু আমরা কেন, সবাই বলবে, ভাল হল। কিন্তু তোর কি কোনও আপত্তি আছে?

সুপ্রভা—না।

সুপ্রভার পিঠে হাত বুলিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন হেমলতা। তারপর সুপ্রভার কপালে একটা চুমো খেলেন।

॥ ২ ॥

ছোট্ট স্প্যানিয়েলের বকলসের ঘুঙুর টুং-টুং করে বাজে। ক্যাডিলাকের হর্নের শব্দ শুনেই ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে আসে। গেট পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তারপর সন্দীপের আগে আগে গুট গুট করে হেঁটে আবার ফিরে আসে, ড্রইংরুমের ভিতরে ঢোকে। তারপর সুপ্রভার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই চলে যায়।

সন্ধ্যা হতেই, আর সন্দীপের এসে পৌঁছবার সময় হবার আগেই, ড্রইংরুমের ভিতরে এসে কোচের

উপর চুপ করে বসে থাকতে গিয়ে সুপ্রভার মুখে যে হাসি আর যে লজ্জার আবেগ ফুটে ওঠে, ছোট্ট স্প্যানিয়েল যেন তারই ছবির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আর খুশি হয়ে চলে যায়।

একদিন, দু'দিন, পরপর চারদিন স্প্যানিয়েলের উৎসাহের রকম দেখে আরও লজ্জা পেয়েছিল সুপ্রভা। মুখের ওপর রুমাল চেপে ধরেও সেই লজ্জার হাসিটাকে লুকোতে পারেনি। দেখে ফেলেছিল সন্দীপ। খুব খুশি হয়ে সন্দীপও হেসেছিল।—বাঃ, তোমাদের স্প্যানিয়েলকে বেশ জ্ঞানী ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু শুধু চারটে দিন, তারপর আর নয়। এই দু'মাসের মধ্যে আর কোনও একটি সন্ধ্যাতেও না। ক্যাডিলাকের হর্ন বেজে উঠলেও ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়নি এই স্প্যানিয়েল। একবারও, একটু উঁকি দিয়ে তাকিয়েছে কিনা সন্দেহ।

সন্দীপ জিজ্ঞাসা করেছে—কই, জ্ঞানী ব্যক্তিটি কোথায় গেল ? আর দেখতে পাই না কেন ?

সুপ্রভা—বোধ হয় বাবার ঘরের ভিতরে বসে আছে।

সন্দীপের কথার জবাব দিতে গিয়ে আজ বেশ জোর করে একটু হাসতে চেষ্টা করে সুপ্রভা। সেই প্রথম দিনে কিন্তু কোনও চেষ্টাই করতে হয়নি। স্প্যানিয়েলের কাণ্ড দেখে সেদিন যেন সুপ্রভার জীবনের রঙিন আশার হাসিটা মুক্ত ফোয়ারার মত স্বচ্ছন্দে উথলে উঠেছিল। কিন্তু আজ...।

সন্দীপ নিশ্চয় ভুলে গিয়েছে, ঠিক কবে আর কখন ড্রইংরুমের ভিতরে হঠাৎ ঢুকে, আর সুপ্রভার কোলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে সুপ্রভার গম্ভীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল ছোট্ট স্প্যানিয়েল। তারপর সেই যে তিনটে লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল তো চলেই গেল, আর ফিরে এল না। সন্দীপ থাকতে আর কোনওদিন ফুর্তির টুং-টুং শব্দ বাজিয়ে ড্রইংরুমের ভিতরে ঢোকেনি ওই স্প্যানিয়েল।

এই বাড়ির উদার অভ্যর্থনার অতিথি সন্দীপ রায় যে তিন সন্ধ্যে না ফুরোতেই এরকম একটা অদ্ভুত কথা এত স্পষ্ট করে এই বাড়ির মেয়েকে শুনিয়ে দিতে পারে, এ সন্দেহ সুপ্রভার ধারণা-কল্পনার একটা অন্ধকার কোণের মধ্যেও ছিল না।

হঠাৎ বলে উঠেছে সন্দীপ—যাই মনে কর সুপ্রভা, একটা সত্য কথা আমি বেশ স্পষ্ট করে বলে দেব, তোমরা মনে-প্রাণে কিন্তু খুবই সেকেলে মানুষ।

চমকে ওঠে সুপ্রভা, মুখের হাসিটা ফিকে হতে হতে শেষে একেবারেই মিলিয়ে যায়।

কোনও কথা বলে না সুপ্রভা। সন্দীপ কিন্তু কথা বলতেই থাকে—ভাল বল আর মন্দ বল, আমি কিন্তু দেহে-মনে-প্রাণে এক আস্ত একেলে।

সুপ্রভার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সন্দীপের সুন্দর মুখের উজ্জ্বল দুটি চোখ আরও উজ্জ্বল হয়ে হাসতে থাকে।—তাই বলে আমাকে একটা রহস্য-মানুষ বলে মনে করো না। আমিও মানুষকে ভালবাসতে পারি। শ্রদ্ধা মায়া মমতা আর কৃতজ্ঞতা, আমারও প্রাণে আছে। কিন্তু সেগুলি আমার নিজের যুক্তি বুদ্ধি বিশ্বাস আর অভিরুচির জিনিস। তোমরা যাকে মায়া বল, আমার মায়া ঠিক সেরকমটি না হতেও পারে।

মনে আছে সুপ্রভার, তখনই কোথা থেকে ছুটে এসে ছোট্ট স্প্যানিয়েল ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল। বেশ কিছুক্ষণ সুপ্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর চলে গেল। তখনও কথা বলেই চলেছে সন্দীপ। হঠাৎ, কী আশ্চর্য, কথা বলতে গিয়ে সন্দীপের গলার স্বর বেশ তীব্র উঠেছে।—এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন সুপ্রভা ? কোনও কথাও বলছ না কেন ? আমার কথাগুলি শুনতে তোমার বোধ হয় খারাপ লাগছে।

সুপ্রভা—বুঝতে পারছি না, আপনি কী বোঝাতে চাইছেন।

সন্দীপ হাসে।—শুধু এইটুকু বোঝাতে চাইছি যে তুমি ভুল করে আমাকে যেন ভুল বুঝে না ফেল।

—একথা আপনার মনে হল কেন ?

—এটা আমার ঠিক মনের কথা নয়, সুপ্রভা, এটা আমার মনের একটা ভয়ের কথা। আমার ভয়, তুমি হয়ত আমাকে ভুল বুঝে ফেলবে, বুঝতে ভুল করবে, আর সন্দেহ করবে যে, সন্দীপ রায় বোধ

হয় একটা খুব অদ্ভুত মানুষ, কিংবা একটা হামবাগ।

সুপ্রভা—না, আমি ওরকম সন্দেহ করি না।

সন্দীপ—ব্যস, তোমার এই সামান্য একটু অঙ্গীকারই আমার কাছে যথেষ্ট। আমার আশা ছিল, তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, আমার জীবনটা তোমার কাছ থেকে সেই সান্ত্বনা পেয়ে যাবে, নিশ্চয় পাবে; যে সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য ঘুমের মধ্যে আমার স্বপ্নও ছটফট করে।

কথা থামিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ। সুপ্রভা বলে—একটু বসুন। এখনই যাবেন না। আমি চা নিয়ে আসি।

—না। চায়ের জন্য আমি এখন তেমন কিছু তৃষ্ণার্ত নই। আমাকে এখনই যেতে হবে চক্রবর্তীর আর্ট এগজিবিশন দেখতে। আমি এখন একটু মিষ্টি চিত্ররসের জন্য তৃষ্ণার্ত।

সুপ্রভা—আসুন তবে।

সন্দীপ—আসুন বলো না। বলো, চলুন।

সুপ্রভা—ঠিক বুঝতে পারছি না, কী বলছেন।

সন্দীপ—তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

সুপ্রভা—না।

সন্দীপ—কেন?

—না, তা হয় না।

—ছবি দেখতে কি তোমার ভাল লাগে না?

—ভাল লাগে বইকি!

—তবে আপত্তি করছ কেন!

সন্দীপের প্রশ্নের উত্তর দেয় না সুপ্রভা। হেসে ফেলে সন্দীপ।—এইবার বুঝতে পারছ, কেন আমি বলেছি যে, তোমরা মনে-প্রাণে সেকেলে, যদিও তোমাদের বাড়ির দোতলার ঘরে একটা পিয়ানো আছে?

সুপ্রভা—শুধু আছে বলছেন কেন? পিয়ানোটা বাজেও তো!

—হ্যাঁ জানি, সে পিয়ানো তুমিই বাজাও। কিন্তু কী সুর বাজাও? নারদ মুনির তৈরি যত বিটকেলেমির রামকেলি আর টোড়ি কিংবা নোটন-নোটন-পায়রাগুলি। এই তো।

—আপনি পিয়ানো বাজালে কী সুর বাজাবেন?

—পিয়ানো বাজাতে আমি জানি না। জানলে হয় একটা মুনলাইট-সোনাটা, নয়ত স্ট্রাউসের ব্লু-ডানিউব বাজাতাম।

হেসে ফেলে সুপ্রভা—জানলে খুব ভাল করতেন।

—কিন্তু, তুমি কি সত্যিই আমার সঙ্গে যাবে না?

—না।

—কেন?

—সেটা তো আপনি জেনেছেন।

—অ্যাঁ? কী জেনেছি?

—আমরা মনে-প্রাণে সেকেলে।

—হ্যাঁ, কিছু মনে করো না, আমার মনে এরকম একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি..

কথা থামিয়ে আর গলার রঙিন টাইয়ের নিখুঁত গেরোটার উপর হাত বুলিয়ে হাসতে থাকে সন্দীপ। ঠিকই, সন্দীপের মুখের হাসিটা যেন হঠাৎ-জ্যোৎস্নার ঝলকের মত উথলে উঠেছে, আর চোখদুটোতে নিবিড় এক মায়ার আবেশ ছড়িয়ে দিয়েছে। নারী হোক বা পুরুষ হোক, যে কেউ মানুষ এখন সন্দীপের এই সুহাসিত মুখের ছবিটাকে দেখলে মনে করতে পারে, এই চমৎকার সুন্দর চেহারার মানুষটি তার বুকের ভিতরে বুঝি একটা চাঁদ পুষে রেখেছে। এই মানুষ যদি বনের একটি হরিণ হত, তবে তার দুই চোখের এই জ্যোৎস্নাময় আবেশের কাছে কোনও হরিণী বোধ হয় আত্মহারা না হয়ে

পারত না।

সন্দীপ বলে—আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই ডাকছি, চলো। একবার মাত্র পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে চক্রবর্তীর আঁকা ছবির এগজিবিশন দেখে নিয়ে, তারপর সোজা খিদিরপুর ডক। আমার পাশে দাঁড়িয়ে তুমি দেখবে, জলের উপর জাহাজের ছায়া পড়ে কী অদ্ভুত ইলিউশন সৃষ্টি করেছে। মনে হবে, ওই জাহাজটা যেন একটা মিথ্যে মায়া, আর ছায়াটাই সত্যিকারের একটা জাহাজ।

দেখতে পায় সন্দীপ, দুই চোখ অপলক করে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সুপ্রভা। আবার হাতঘড়ির দিকে তাকায় আর তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরায় সন্দীপ, যেন একটা পুলকিত ব্যস্ততার আবেগে ছটফট করে। —চলো, আর দেরি করা উচিত নয়। যদি ইচ্ছে কর, তবে তোমার বাবা আর মাকে একটু বলে এসো। আমি বলি, এত বলাবলিরই বা কী দরকার? তুমি তো একটা বাজে অন্ধকারের হাত ধরে আরও বাজে অন্ধকারের মধ্যে ছুটোছুটি করবার জন্যে যাচ্ছ না। যাচ্ছ, আমার সঙ্গে, আমার হাত ধরে, জীবনের একটা আনন্দ আর আলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে।

সুপ্রভা বলে—না।

সন্দীপ—তুমি তো ফিলসফি নিয়ে এম-এ পাস করেছ!

—হ্যাঁ।

—তবে তোমাদের ইন্ডিয়ান ফিলসফির কিছু থিওরির কথা নিশ্চয় পড়েছ?

—কিছু কিছু।

—তোমাদের উপনিষদ কি একথা বলে যে, আকাশে যদি আনন্দ না থাকত, তবে কে আকাশকে চাইত?

—হ্যাঁ, বলেছে।

—তবে?

—তবে কী?

—তবে, একথাও কি বলা যায় না যে, যদি আকাশের চারিদিকে পাঁচিল থাকত, তবে আকাশকে কে চাইত?

—বলা যেতে পারে।

—তবেই বোঝো! জীবনের চারদিকে যদি পাঁচিল থাকত, তবে জীবনকে কেউ চাইত না। ঠিক কথা কি না?

—ঠিক কথা বলেই তো মনে হয়।

—তাই বলছি, ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকতে নেই। চলো, বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি।

—না, তা হয় না।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে সন্দীপ। —আচ্ছা। তোমার যখন এতই আপত্তি, তখন আমার আর কিছু বলাব নেই। আমি এখন চলি।

চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও আবার দাঁড়িয়ে পড়ে সন্দীপ। সিগারেটের ধোঁয়ার একটা ফুরফুরে কুণ্ডলি হেলেদুলে বাতাসে ভাসছে; তারই দিকে তাকিয়ে আর খুব মৃদুস্বরে, যেন নিজেরই মনের কাছে একটা ব্যথার বিস্ময় নিবেদন করে। —আমার নিজের জন্যে নয়, তোমারই জন্যে আমি তোমাকে একটা আনন্দের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

সুপ্রভা কিন্তু একেবারে নীরব আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্দীপও বোধ হয় বুঝতে পারে যে, না, ওই স্তব্ধতা কোনও আবেদনের কোনও করুণতায় বিচলিত নয়। পিয়ানো-বাজানো এই মেয়েকে সেকেলে ভীরুতার একটি নিরেট মূর্তি বলে মনে হয়। সন্দীপের মত একেলে অভিরুচির মানুষ, তার ভালবাসার আশার পথে এরকম একটি মূর্তিকে দেখতে পাবে বলে বোধ হয় কোনওদিনও কল্পনা করেনি। সন্দীপের এতগুলি কথার কোনও একটির কথার আবেদনেও কি সাড়া দিল সুপ্রভা? সন্দীপের ইচ্ছা ও চেষ্টার সব ভাষা, সব চমক আর সব কৌতুক ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তবু, সন্দীপ যেন আজই এই মুহূর্তে সব শূন্য করে দিতে চায় না। তার আশার স্বপ্নটাকে এখনও ধরে রাখতে চায়। সহজে শিথিল ও অলস হয়ে যাবে, এমন ধাতু দিয়ে তৈরি হয়নি সন্দীপের প্রাণ।

সন্দীপ বলে—গ্রিক গল্পের সেই গালাশিয়া জীবন্ত নারী নয়, আইভরির তৈরি একটি নারীমূর্তি, নিতান্ত একটি জড়বস্তু ; সেও পিগম্যালিয়নের ব্যাকুল আবেদনের কথায় সাড়া দিয়ে কথা বলেছিল। তুমি কিন্তু আর একটিও কথা বলছ না সুপ্রভা। আমি চলে যাচ্ছি দেখেও কি আমাকে একটি কথা বলবার দরকার তোমার নেই ?

সুপ্রভা—কিছু মনে করবেন না। বুঝতে পারছি না, আমি আপনাকে কী কথা বলতে পারি।

সন্দীপ—বেশ তো, আজ এখনই না বলতে পার, কাল বাদে পরশু তো বলতে পারবে ? আচ্ছা, আসি এখন।

॥ ৩ ॥

দেখে আশ্চর্য হয়েছে সুপ্রভা, নিয়মিতভাবে একটি সন্ধ্যা বাদ দিয়ে পরের সন্ধ্যায় বালিগঞ্জের ক্যাডিলাক ঠিক সময়ে এসে ফটকের আলোর কাছে দাঁড়িয়েছে। সুপ্রভারই ধারণাটা মিথ্যে হয়ে গিয়েছে, সত্য হয়েছে সন্দীপের কথা। সন্দীপ এসেছে।

এই দু'মাসের মধ্যে এইভাবে কতবারই তো এসেছে আর চলে গিয়েছে সন্দীপ। কিন্তু ড্রইংরুমের ভিতরে দু'জনের মেলামেশার যে-কে-সেই অবস্থার বিশেষ কিছু নড়চড় হয়নি। দৃশ্যের মধ্যে নতুন কোনও আলো বা ছায়ার সম্পাত ঘটেনি। সন্দীপ অবশ্য অনেক নতুন কথা বলেছে, তার প্রায় সবই একটা স্বপ্নময় আকুলতার কথা। বলতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করেনি সন্দীপ : তুমি দূরে সরে যেতে চাইলেও আমি দূরে সরে যেতে পারব না। আমি আসবই, না এসে পারব না।

শুনে চমকে উঠেছে সুপ্রভা। নীরব আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পারলেও, সুপ্রভার বুকের ভিতরে যেন একটা ভয়ের ছায়া চমকে ওঠে। মা আর বাবা, দু'জনের কেউই এখনও জানে না যে, সন্দীপ রায়ের জন্য তাঁদেব মেয়ের মনে এখন কোনও অভ্যর্থনার ছিটেফোঁটাও আর নেই। তাঁরা এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁদের প্রাণের বাতাসের মধ্যে উৎসবের শঙ্খধ্বনি শুনছেন।

বিশ্বাস ছিল সুপ্রভার, সন্দীপ আর আসবে না। একটা স্তব্ধ ও নিরেট লোহার কপাটের উপর শতবার মাথা ঠুকলেও সেই কপাট যে কখনও খুলবে না, এই সত্যটুকু কি জানেন না, কিংবা বুঝতে পারেন না এমন একজন মডার্নিস্ট জ্ঞানী, যাঁর নাম সন্দীপ রায় ? ধারণা হয়েছিল সুপ্রভা তার আপত্তি আব অনিচ্ছার 'না' কথাটা খুবই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। তবে আর কেন ? প্রত্যাখ্যানের পর আবার এসে অনুরোধ করলে যে মাথা নিচু করা হয়, নিজেকেই অপমান করা হয়, এই বোধটুকুও কি ভদ্রলোকের চিন্তায় আর চরিত্রে নেই ?

ভয় হয়, এরকম অদ্ভুত মানুষ, এই সন্দীপ রায় চিরকাল এখানে আসতেই থাকবে। ক্লান্ত হবার কিংবা ক্ষান্ত হবার মত মানুষ হলে এই কদিনের মধ্যে সুপ্রভার গম্ভীর মুখের আর উদাস চোখ দুটোর নীরব তাড়নায় ভদ্রলোকের মনে এবাড়িতে আসবার দুরন্ত উৎসাহ ক্লান্ত কিংবা ক্ষান্ত হয়ে যেত। সন্দীপ রায় যেন তাঁর মনগড়া আমিত্বের একটা ভাষ্য শোনাবার জন্য একজন সহিষ্ণু শ্রোতা খুঁজছিলেন। মহিম বসুর মেয়েকে সেইরকম শ্রোতা বলে মনে করে সন্দীপ রায়। সব কথার মধ্যে শুধু আমি আর আমি। একদিনও আর ভুলেও জিজ্ঞাসা করেনি, তোমার বাবা আর মা কেমন আছেন ? এবাড়ির মহিম বসু আর হেমলতা বসু যেন সত্তাহীন দুটো ছায়া, দুটো নাম মাত্র। সন্দীপ কোনওদিনও বলল না, চলো সুপ্রভা উপরতলার ঘরে একবার যাই, তোমার বাবা আর মার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। তা হলে বলতে পারত সুপ্রভা, আপনি বসুন, আমি বাবা আর মাকে ডেকে নিয়ে আসছি। সন্দীপের একেলে সৌজন্যের শাস্ত্রটা বোধ হয় মনে করে যে, সুপ্রভা যেন জগৎছাড়া একটা একলা-জীবনের মেয়ে, এই ড্রইংরুমের ভিতরে বসে শুধু সন্দীপের জন্য অপেক্ষার তপস্যা করছে।

যেমন রোজ, তেমনই আজও জিজ্ঞেস করে সুপ্রভা—চারুমাসিমা কেমন আছেন ?

সন্দীপ হাসে। —তোমার অনর্থক জিজ্ঞাসার এই বাঁধা গৎ রোজই কেন শোনাও ?

এরকম অদ্ভুত পাল্টা প্রশ্ন শুনতে হবে, এরকম ভয় সুপ্রভার কল্পনাতে ছিল না। প্রশ্ন শুনে

সুপ্রভার মনের গম্ভীরতা হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে মুখর হয়ে ওঠে। —বাঁধা গৎ হতে পারে, তবু তো এটা একটা ভদ্র জিজ্ঞাসা !

—হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু আমি আজ আর আমার জবাবের বাঁধা গৎ তোমাকে শোনাব না। বলতে পারতাম, যেমন এতদিন বলে এসেছি, তিনি ভাল আছেন ; কিন্তু সেকথা না বলে শুধু একটা অনুরোধের কথা বলব, তুমি আর ওকথা জিজ্ঞাসা করবে না।

—কেন ?

—তোমার চারু-মাসিমা যেমন থাকেন, তেমনই আছেন। এর মধ্যে জিজ্ঞাসা করার কী আছে ?

সুপ্রভা—এরকম কথা আপনার কাছ থেকে শুনতে পাব বলে কল্পনাও করতে পারিনি। পারলে, জিজ্ঞাসা করতাম না।

সন্দীপ—হ্যাঁ, আমার মা কিংবা বাবার সম্পর্কে তোমার মনে জিজ্ঞাসার কথা থাকলেও আমাকে বলো না।

সুপ্রভা—কেন ?

সন্দীপ—ওঁরা আমার পিতামাতা আর আমি ওঁদের ছেলে, ব্যস, এছাড়া আমার জীবনের মধ্যে কোনও মাধব রায় কিংবা চারুশীলা রায় নেই।

চমকে ওঠে সুপ্রভা। চোখের তারা দুটো ছটফট করে—কিন্তু আপনার বাবার সম্পত্তিটাও কি আপনার জীবনের মধ্যে নেই ?

—আছে। সেজন্য আমি আমার বাবার সম্পত্তির কাছে কৃতজ্ঞ। বাবার কাছে নয়।

—একথার মানে ?

—বাবার কাছ থেকে আমি শুধু টাকাই পেয়েছি, আর কিছু পাইনি।

—আর মার কাছ থেকে ?

—বড়মাসি বলেন, আমি মার চোখ দুটো পেয়েছি।

—আর কিছু পাননি ?

—না, কিছু না। বাবার কাণ্ডজ্ঞান আমি পাইনি, মার ধর্মজ্ঞানও পাইনি। ওঁদের জীবন থেকে আমি কোনও শিক্ষাই পাইনি।

—আপনার দুর্ভাগ্য।

—আমার সৌভাগ্য।

—কেন ?

—মাধব রায়ের কাণ্ডজ্ঞান এমনই অদ্ভুত ছিল যে, তিনি তাঁর টাকার বারো আনা ভাগ হাসপাতালে দান করে দিলেন, আর খুব পুণ্যি লাভ করলেন। কিন্তু হা অদৃষ্ট, সে পুণ্যি এমনই পুণ্যি যে, হার্ট-স্ট্রোক হয়ে ব্যাঙ্কের অফিস ঘরেই মরে যেতে হল।

সুপ্রভার চোখের চেহারা কত কঠোর হয়ে উঠেছে, সেটা দেখতে পেয়ে আর বুঝতে পেরেও সন্দীপের মুখরতা একটুও মৃদু হয়ে যায় না। বরং আরও উদ্দীপ্ত স্বরে কথা বলে সন্দীপ। —আর, চারুশীলা রায়ের ধর্মজ্ঞান এমনই অদ্ভুত যে তাঁর ঠাকুরঘরের ফুল-বাতাসাকে আমি একটা আবর্জনা বলে মনে করি বলে তিনিও আমার টাকাকে আবর্জনা বলে মনে করেন। প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমার টাকায় কেনা চাল-ডালের একটা দানাও ছোঁবেন না। কোন্নগরে থাকেন তাঁর এক উকিল ভাই, কীর্তন শুনে ভাবাবেশে যিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন, তাঁরই কাছ থেকে প্রতি মাসে পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে তোমার চারুমাসিমা তাঁর আতপচাল-মার্কা জীবনযাপন করেন।...কী ? কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও ?

—হ্যাঁ।

—বলো।

—চারু-মাসিমা তবে আপনার গাড়িটাকে ছুঁলেন কেন ? তিনি সেদিন তো আপনারই গাড়িতে চড়ে এখানে এসেছিলেন।

—অ্যাঁ ? হ্যাঁ। গাড়িটা কিন্তু তাঁরই। মাধব রায় ওই গাড়ি তাঁর স্ত্রীর নামে কিনেছিলেন।

—বাড়িটাও কি... ।

—হ্যাঁ, ঠিক সন্দেহ করেছ। বাড়িটাও চারুশীলা রায়ের বাড়ি। পুণ্যাত্মা মাধব রায়ের দানের দাপট থেকে রক্ষা পেয়ে সামান্য কয়েক লাখ টাকার শেয়ার আর ডিবেঞ্চার আমার কপালে জুটেছে। বিশ্বের ইতিহাসে মাধব রায়ের উইল হল দ্বিতীয় ম্যাগনাকার্টা। ... ও কী ! তুমি হাসছ বলে মনে হচ্ছে। বোধ হয় তোমার মনে হয়েছে যে, লোকটা প্রলাপ বকছে। তা নয়। আমি স্পেডকে স্পেড বলি। বিন্দুকে সিন্ধু বলি না।

গল্প শুনেছিল সুপ্রভা, কোনও এক পাগলা পুরুত মঙ্গলঘটের উপর কুলো চাপিয়ে দিয়ে কুলোর পুজো করেছিল—কুলায় নমঃ, কুলায় নমঃ। সুপ্রভার আশার ভাগ্যটাও যেন কুলোচাপা সেই মঙ্গলঘটের মত মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। ভালবাসার ছোঁয়া আছে, এমন একটি কথাও এই ড্রইংরুমের বাতাসে বেজে উঠল না। শুধু মতামতের তর্ক আর তর্ক। সেই পাগলা পুরুষের কুলোপুজোর মন্ত্রের মত যত অবান্তর আব লক্ষ্যভ্রষ্ট মুখরতা। কিন্তু কুলোপুজোর এই মুখরতার শেষ হবে কবে ? সহ্য কববাব শক্তি ফুরিয়ে আসছে সুপ্রভার।

সন্দীপ রায়ের স্বপ্নে স্বভাবে ও শখে একেলে কোন মহত্ত্বের কী বস্তু আছে, কিছুই বুঝতে পারে না সুপ্রভা। সন্দীপ রায়ই জানে, একেলে বলতে সে কী বোঝে। এটুকু অবশ্য খুবই স্পষ্ট করে বোঝা যায় যে, নিজেকে একেলে বলতে বেশ গর্ব বোধ করেন ভদ্রলোক।

সন্দীপের সব কথার শেষে ওই একটি ভণিতা থাকে, সেটা একবার বলে নিতে কোনওদিনও ভুলে যায় না সন্দীপ। —চলো, বাইরে যাই, একটু বেড়িয়ে আসি।

বেড়িয়ে আসবাব কত না সুন্দর বিচিত্র আর বিমুক্ত জায়গাব নাম বলেছে সন্দীপ। ময়দান, বেড-বোড আব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের সিঁড়ি। মিস সিরাজির হনি-বার, যেখানে রঙিন মোমবাতির রঙিন আলোর কাছে, দোলনা চেয়ারের ভেলভেটের উপর বসে, আর সামান্য একটু চেরি মধু খেলে জীবনটাকে মধুময় বলে মনে হবে। তার চেয়ে ভাল, ডিং-ডং কাফে, যেখানে আলোর ফোয়ারার সঙ্গে আদুড় গায়ের থরথর শিহর মিশিয়ে দিয়ে রূপসী মেয়েরা নাচে, আর প্রিয়দের পাশে প্রিয়ারা বসে মাশরুম-সুপ খায়। সমস্তক্ষণ একটা চমৎকার ঘণ্টাধ্বনির মিউজিক বাজতে থাকে। যে যাব মনের কথা মুখ খুলে মনের মানুষটির কাছে বলতে পারে। অন্য কেউ, তৃতীয় কোনও একলা অভাজন কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করলেও সেসব কথার কিছুই শুনতে পায় না। ডিং-ডং কাফেব বাতাসে শুধু মিউজিক নয়, ম্যাজিকও আছে।

বলতে বলতে যেন একটা ভাবের আবেগে বিহ্বল হয়ে যায় সন্দীপের গলার স্বর। অনুরোধ করে সন্দীপ—তুমি একবাব দেখবে চলো, সুপ্রভা।

প্রাণের এইসব আবেগের কথা শুনে সুপ্রভার বুঝতে কিছু কি আর বাকি আছে, কেমনতর জীবন ভালোবাসেন এই ভদ্রলোক ? ঘরের বাইরে এইসব আলো ছায়া হাওয়া আর ফোয়ারার কাছে সন্দীপের হাত ধরে আর হেসে হেসে ছুটোছুটি করবে এক সঙ্গিনী, যার প্রাণ কখনও ক্লান্ত হবে না, যার বুকটা কখনও হাঁপাবে না। বার বার ওই একটি দুর্মর অনুরোধের কথা বলে সন্দীপ এ বাড়ির ভীরু মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, এই হল একেলে ভালবাসার জীবন। সে জীবনের কাছে ঘরের বাতির আলোর চেয়ে বাইরের আতসবাজির আলোটাই বেশি দরকারের আর বেশি দামের বস্তু।

বেশ তো, সন্দীপ বায় এবার সরে পড়লেই তো পারে। মিছিমিছি তার একেলে অভিরুচির গর্বটাকে এখানে নিয়ে এসে সময় নষ্ট করে কেন ? সন্দীপ রায় কি মনে করেছে যে, এইভাবে এসে এসে বিদ্যাবুদ্ধি ও কালচারের চমক দেখিয়ে, চমৎকার এক কুহক সৃষ্টি করে মহিম বসুর মেয়েকে মুগ্ধ করে ফেলবে ? আতসবাজির আলোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে সুপ্রভার সাবধান প্রাণ ?

কিন্তু সুপ্রভা কেন তার চিন্তার মধ্যে এত সব গবেষণা পুষে রেখে আর এত কষ্ট করে সন্দীপ রায়ের এই অসাধ্যসাধনের চেষ্টা সহ্য করছে ? আজই তো স্পষ্ট করে বলে দিতে পারে সুপ্রভা, আপনি এখানে আর আসবেন না।

কী আশ্চর্য, সুপ্রভা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সব কথা খুব গম্ভীর হয়ে আর খুব স্পষ্ট করে বলে দিতে

পারলেও ওই একটি কথা আজও বলে দিতে পারল না। সন্দীপ এসে পৌঁছবার আগে সুপ্রভার প্রতিজ্ঞার মধ্যে কথাটা বেশ মুখর হয়ে বাজতে থাকে। কিন্তু সন্দীপ চলে যাবার পরেই বুঝতে পারে, কথাটা আজও বলা হল না। ভদ্রতার সংস্কারে বাধে, অভ্যাসের নিয়মে বাধে, ভাষাতে আর রুচিতেও বাধে নিশ্চয়—তা না হলে সন্দীপ রায়কে স্পষ্ট কথা বলে এখানে আসতে নিষেধ করে দিতে পারছে না কেন সুপ্রভা ? সত্যিই তো, ওরকম একটা কঠোর ভর্ৎসনার কথা সুপ্রভার মুখে আসতে পারে না। সন্দীপ রায় নামে এই ভদ্রলোক যাচ্ছেতাই খামখেয়ালের যেমনতর মানুষ হোক না কেন, তার নিজের কাছে তো নিজের একটা সম্মান আছে। নির্বোধ মানুষ ভিখিরীকে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু ওরকম নির্বোধের কাণ্ড কি সুপ্রভার মত মেয়ের পক্ষে সম্ভব ? তা ছাড়া, সন্দীপ রায়কে একটা ভিখিরী বলে মনে করা সুপ্রভার মত মেয়ের কোনও অহংকারের সাহসেও সম্ভব নয়।

তবে কি মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিদ্যুতের মত কোনও আশার বিদ্যুৎ সুপ্রভার এই উদাস গম্ভীরতার মধ্যে ধৈর্য ধরে লুকিয়ে রয়েছে ? সত্যিই সেদিন বিকেল থেকে আকাশের মেঘ খুব কালো হয়ে ঘনিয়ে উঠেছিল, যদিও মাসটা ফাল্গুন। কিন্তু প্রথম বিদ্যুৎ চমকে উঠল অনেক পরে, সন্ধ্যাটা যখন বেশ ঘনিয়ে উঠে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে, তখন। জানালার কাচের গায়ে বিদ্যুতের ক্ষণচমকের আভা হঠাৎ শিউরে উঠতেই, সুপ্রভার মাথাটা যে ভয়-পাওয়া লজ্জার আঘাতে ঝুঁকে পড়ে। কারণ, ভয়-পাওয়া এই লজ্জাটা যে একটা গোপন আশার হঠাৎ-বিদ্যুতের চমক। আসুক না সন্দীপ, এসে এসে একদিন তো সত্যিই বলে উঠতে পারে : আমার সঙ্গে বাইরে গিয়ে তোমার ছুটোছুটি করবার কোনও দরকার নেই সুপ্রভা। ওতে কী আর এমন আনন্দ আছে ? আজ এখানেই বসে সারা সন্ধ্যাটা তোমার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

বাঃ, কী অদ্ভুত ধৈর্যধরা আশা ? রুমাল দিয়ে চোখ মোছে সুপ্রভা। কপালটাকেও এক হাতে শক্ত করে টিপে ধরে। জাগা মনের কাছে ঘুমন্ত মনের আশাটা ধরা পড়ে গিয়েছে। বুকের ভিতরে অদ্ভুত একটা কষ্টও ছটফট করছে। সাবধান মনের ভিতরে এমন অদ্ভুত ভুল কবে আর কেমন করে ঢুকে পড়েছে, ভগবান জানেন।

উঠে গিয়ে দরজার পর্দা সরিয়ে আকাশ-ভরা অন্ধকারের চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থাকে সুপ্রভা। বৃষ্টি পড়ছে। ঝড়ও শুরু হয়েছে। দমকা বাতাসের দাপটে জাপানি চামেলির লতাটা ছেঁড়া-ছেঁড়া হয়ে লনের ঘাসের উপর শুয়ে পড়েছে। সন্দীপ বোধ হয় আজ আর আসবে না।

ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলে সুপ্রভা। দু'মাস আগেও এই ড্রইং-রুমের ভিতরে একলা হয়ে বসে থাকার শান্ত জীবনের কোনও সন্ধ্যাতেও সুপ্রভা কি কল্পনা করতে পেরেছিল যে এরকম একটা জটিল অদৃষ্টের সমস্যা তার চোখের এত কাছে এসে দাঁড়াবে ? কী চমৎকার সমস্যা ! একজনের আশা, সুপ্রভা একদিন খুশি হয়ে আতসবাজির আলোর কাছে গিয়ে ছুটোছুটি করতে রাজি হয়ে যাবেই যাবে, কোনও আপত্তি করবে না। আর একজনের আশা, সন্দীপ একদিন এসে, ড্রইংরুমের এই জয়পুরি বেলোয়ারিবাতির আলোর কাছে বেশ শান্ত হয়ে বসে থাকবে আর উঠতেই চাইবে না। সমস্যাটা যেন দু'জনের দুই আশার লটারির দ্বন্দ্ব। বলে ফেলবে সন্দীপ : তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটোছুটি করবার কোনও সাধ আমার নেই। এখানে তোমার কাছে এসে বসে থাকতে ভাল লাগছে।

ক্যাডিল্যাকের হর্নের শব্দ বেজে ওঠে। বৃষ্টি আর ঝড়ের শব্দের সঙ্গে মিশে গিয়ে গাড়ির হর্নের শব্দটা যেন একটা মায়াবাঁশির উতলা স্বরের মত বেজে উঠেছে। সুপ্রভার দুই চোখের তারায় জয়পুরি বেলোয়ারিবাতির আভাও ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে। আজ আর একটুও গম্ভীর হতে পারে না সুপ্রভা। স্বপ্নময় আশার আবেশ সত্যিই সুপ্রভার এই জাগা চোখের দৃষ্টিটাকে নিবিড় করে দিয়েছে।

ঘরে ঢুকেই হেসে ওঠে সন্দীপ। —আমি ঝড়-বৃষ্টি একটুও পছন্দ করি না।

সুপ্রভাও হাসে। —ঝড়-বৃষ্টি তো আপনার একটুও ক্ষতি করতে পারেনি।

সন্দীপ—কী বললে ?

—আপনি তো গাড়িতে এসেছেন, বৃষ্টিতে ভিজতে তো হয়নি।

—কিন্তু গাড়িটাতে স্পিড দিতে পারিনি, বড়ই অসুবিধে হয়েছে। প্রায় শম্বুকগতির মত খুবই

আস্তে আস্তে আর থেমে থেমে আসতে হয়েছে।

—বসুন।

—হ্যাঁ, বসব বটে। এসেছি যখন, তখন কিছুক্ষণ তো বসতেই হবে। তবে বেশিক্ষণ নয়।

—কোনও কাজের তাড়া আছে ?

—না, একটুও না ! আমার কাজের সব তাড়া বিকেলের আগেই ফুরিয়ে যায়। টাকা-পয়সার হিসেবের কোনও কাজ আমি সন্ধ্যেবেলা কিংবা রাতেরবেলার জন্য রেখে দিই না। অবাধ সন্ধ্যার অবাধ আনন্দ, এ না পেলে মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে ?

—আপনার বিরুদ্ধে আমাদের সবারই কিন্তু একটা অভিযোগ আছে।

—আঁ ? অভিযোগ ? কী অপরাধ করেছি যে অভিযোগ থাকবে ?

—আমাদের এখানে আপনি শুধু এক কাপ চা ছাড়া সামান্য একটু খাবার খেতেও আপত্তি করেছেন। আজ কিন্তু খেতে হবে।

—কী খাওয়াবে ? চিংড়ি কাটলেট ?

—না, মা আজ নিজের হাতে ক্ষীর-সন্দেশ তৈরি করেছেন। বলেছেন, সন্দীপকে আজ ক্ষীর-সন্দেশ খেতেই হবে।

—মাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে দিও। সেকেলে মধুরতার এসব জিনিস খেতে মন্দ নয় বটে, দুঃখের বিষয়, তবু আমি এসব জিনিস খেতে পছন্দ করি না।

—কী খেতে পছন্দ করেন, বলুন।

—যদি বলি, ইংলিশ-স্টেক পছন্দ করি, তবে ? তবে ও জিনিস আমাকে এখনই খাওয়াতে পারবে ?

—পারব। তবে এই মুহূর্তে নয়, এক ঘণ্টা সময় লাগবে। কিন্তু বলুন তো, ইংলিশ-স্টেক কি খুব একেলে জিনিস ? আমি তো জানি, রাজা আর্থারের এক রাঁধুনে চাকর প্রথম এই ইংলিশ স্টেক তৈরি করে রাজার পাতে দিয়েছিল। খেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন রাজা আর্থার। সে তো পাঁচশো বছরেরও আগের ব্যাপার।

সন্দীপ—তার মানে...অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে...

সুপ্রভা—আমি বলতে চাই, ইংলিশ স্টেক বয়সে আমাদের ক্ষীর-সন্দেশের চেয়ে কম বুড়ো আর কম সেকেলে নয়।

—তার মানে, তুমি আজও আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে না।

—যাব বটে, কিন্তু...

—কিন্তু আজ নয়, এই তো ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন ?

—ভাল দেখায় না।

—তোমার মনের মধ্যে সেকেলে কূপের একটা মণ্ডুক না থাকলে, তুমি এরকম অদ্ভুত কথা বলতে পারতে না। যাই হোক, আমার কথা শুনে তুমি আজ রাগ করতে পারো, কিন্তু একদিন তোমার ভুল ভাঙবে।

হাতঘড়ির দিকে তাকায় আর উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ।—যা-ই হোক, আজ তোমাদের ক্ষীর-সন্দেশ খেলাম না বলে কিছু মনে করো না। আমি তো আবার আসবই, না এসে পারব কেন ? তুমি আমাকে শত ভুল বুঝলেও আমাকে তোমারই কাছে আসতে হবে।...হ্যাঁ, বেশ সুন্দর একটা বিলিতি গল্পের ছবি এসেছে। আমার মনে হয়, গল্পটা শুনলে তোমার এখনি গিয়ে ছবিটা দেখে আসতে ইচ্ছে করবে। গল্পটা শুনবে তো বলি।

—বলুন।

—বিখ্যাত এক ডাক্তারের সঙ্গে পার্কের ভিতরে রোজই ঘুরে বেড়াত একটি তরুণী। এই তরুণী হল বিখ্যাত ডাক্তারের বিখ্যাত হাসপাতালের মেঝে মোছবার একজন মেড, তার মানে ডাক্তারেরই

বেতনভুক এক চাকরানি। ডাক্তারের সময় কম, কাজের অন্ত নেই, তাই পার্কের ভিতরে বেড়াবার সময়টুকুর মধ্যেই কিছু কথা বলে ওই মেড-মেয়েটিকে কালকের মত ধোয়া-মোছার কাজের হিসেব বুঝিয়ে দিতেন। ওই পার্কে লর্ডদের আর নাইটদের মেয়েরাও বেড়াত। ডাক্তারের সঙ্গে মেড-মেয়েটিকে রোজ বেড়াতে দেখে সবারই ধারণা হয়ে গেল যে, মেয়েটি ওই বিখ্যাত ডাক্তারের বাঞ্ছিতা প্রেমিকা। ডাক্তার যেদিন কাজের ডাকে শহরের বাইরে যান, কী আশ্চর্য মেড-মেয়েটি সেদিনও পার্কে একলা বেড়াতে আসে। লর্ডদের আর নাইটদের মেয়েরা তাকে দেখে খুব সৌজন্য আর সম্মানের ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে আর হেসে হেসে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু একদিন ওই মেড-মেয়েটির কাজের একটা ভয়ানক ভুলের জন্য রুষ্ট হয়ে ডাক্তারমশাই তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। পরদিন পার্কে বেড়াতে এসে ডাক্তার দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, মেড-মেয়েটি এসে তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি বলছে : আমি চাকরি চাই না, মাইনে চাই না। শুধু আপনার সঙ্গে বেড়াতে চাই। ডাক্তার ভ্রূকুটি করেন—কেন ? মেয়েটি বলে, লর্ডদের আর নাইটদের মেয়েরা আমাকে আপনার প্রিয়া মনে করে খুশি হয়েছে আর অভিনন্দন জানিয়েছে। আমি আমার এই সম্মানটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চাই। ডাক্তার বললেন—সেটা তো নিতান্ত মিথ্যে সম্মান, ওদের একটা ভুল ধারণার দেওয়া সম্মান। মেয়েটি বললে—আমার জীবনে ওই ভুল সম্মান তো কোনও নির্ভুল সম্মানের চেয়ে কম সত্য নয়। ওদের ভুল ধারণার সঙ্গে যে আমার জীবনের আনন্দ বাঁধা পড়ে গিয়েছে।

—তারপর কী হল ?

—ডাক্তার এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। বেশ দুঃখিত হয়ে আর চোখের জল মুছে মেয়েটি চলে গেল। সেদিন চলে গেল বটে, কিন্তু একদিন ফিরে এসে ভয়ানক প্রতিশোধ নিল।

—প্রতিশোধ ?

—হ্যাঁ, ডাক্তার পার্কে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে আর মেঝে মোছবার বুরুশ হাতে নিয়ে মেয়েটি সেই ডাক্তারের কাছে এসে দাঁড়াল। চমকে উঠল লর্ডদের ও নাইটদের পার্কচারিণী মেয়েরা। ছি, ছি, এই ডাক্তার যে একটা চাকরানির সঙ্গে প্রেম করেছে ! সবাই ডাক্তারের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকায়। ডাক্তারের সম্মান চুলোয় গেল। —গল্পটার আসল তত্ত্বটা বুঝতে পারছ তো ?

সুপ্রভা—না।

সন্দীপ—বাইরের সত্যটাই জীবনের আসল সত্য, ভিতরে যত মিথ্যে থাকুক না কেন।

—তার মানে ?

—তার মানে লোকে যদি মনে করে যে তুমি একজন মস্ত বড় বিদুষী, তবেই তুমি সত্যিকারের একজন বিদুষী—তোমার মনের ভিতরে সামান্য অ-আ-ক-খ থাকুক বা না-থাকুক। তার, আমার পেটের ভিতরে দশটা প্লেটো আর অ্যারিস্টটলের পাণ্ডিত্য গিজগিজ করলেও লোকে যদি সেটা দেখতে না পায়, তবে আমি কিসের পণ্ডিত ? লোকে তো আমাকে গণ্ডমূর্খ বলেই জানবে। তাই বলছিলাম...।

আবার ব্যস্ত হয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ, বেশ ব্যস্ত স্বরে কথা বলে। —তাই বলছিলাম, মানুষের ভালবাসার জীবনও এই নিয়মে চলে। লোকে যদি জানে, দেখে, দেখে খুশি হয় আর মনে করে যে, অমুক শ্রীমান ও অমুক শ্রীমতীর মধ্যে ভালবাসা হয়েছে, তবে...তবে তার চেয়ে বেশি আর কিছু হল না বলে একেবারে অখুশি হবার তো কোনও কারণ থাকতে পারে না।

কথার আবেগ হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে সুপ্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। বোধ হয় হঠাৎ চোখে পড়েছে সন্দীপের, সুপ্রভার চোখের তারা দুটো যেন ভয় পেয়ে থরথর করে কাঁপছে।

ঠিকই দেখেছে আর বুঝেছে সন্দীপ। ভয় পেয়েছে সুপ্রভা। এইবার স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে, কী চায় সন্দীপ। সন্দীপের একেলে জীবনতত্ত্বের সারকথার নিদারুণ শব্দটা এতদিনে স্পষ্ট করে শুনতে পাওয়া গেল।

সন্দীপ বলে—আমার ভয় হয়, আমার কথাগুলি তুমি ভুল বুঝে আমাকেও ভুল বুঝবে।

সুপ্রভা বলে —আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করব না। কিন্তু আপনি নিজেই একদিন ঠিক বুঝবেন যে, আপনি আজ অনেক ভুল কথা বলে ফেলেছেন।

হাসতে থাকে সন্দীপ।—বেশ তো, যদি আজ বুঝিয়ে দিতে পার যে, আমি ভুল কথা বলেছি, তবে তো ভালই হয়। তোমার ভাল, আব আমারও ভাল...আচ্ছা, আজ তবে চলি।

সুপ্রভা—আসুন।

সন্দীপ—কাল কিন্তু আমি তোমার কোনও আপত্তির কথা শুনব না। আমি আজই ফোন করে হাউসের বক্স রিজার্ভ করে রাখব। তোমাকে যেতেই হবে, ছবিটাকে একবার দেখতেই হবে।

বৃষ্টি নেই। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঝাপসা চোখে একটা ঝাপসা দৃশ্য দেখতে থাকে সুপ্রভা। চলে যাচ্ছে সন্দীপ। একটা আশাহত শূন্যতার মধ্যে সুপ্রভার আত্মাটাকে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে সন্দীপ রায়। যাক, আবার তো আসবে।

॥ ৪ ॥

দমদমের রঙিন 'নিরঞ্জন'-এর লনের পাশে জাপানি চামেলির লতা সন্ধ্যার ফুরফুরে বাতাসে যখন দুলতে শুরু করেছে, আর ড্রইংরুমের একটি কোচের উপর বসে একমনে একটা তার-ছেঁড়া গিটারের নতুন তার বাঁধছে সুপ্রভা, তখন দমদম থেকে অনেক দূরে কালীঘাটের এক ক্লাবের গানের জলসাতে গান শুনছে সন্দীপ রায়। সন্দীপের পাশের চেয়ারে বসে গান শুনছে এক তরুণী, রাসেল স্ট্রিটেব মিস ডি'সিলভার বিউটি সেলুনে প্রায় রোজই গিয়ে হেয়ার ডু সেরে আসে কালীঘাটের যে মেয়ে, যার নাম সিপ্রা। ইস্পাতেব প্লেট দিয়ে তৈরি দুটো বিরাট আকারের ইংরেজি হরফ, দুটো 'টি' পাশাপাশি বসানো আছে যে বাড়ির পোর্টিকোর মাথার উপর, সেটা ট্র্যাক্টর ট্রেডার্স-এর মালিক অনাথ চৌধুরীব বাড়ি। এই অনাথ চৌধুরীর মেয়ে সিপ্রা চৌধুরী। আজ সিপ্রা চৌধুরীর মাথাতে যে খোঁপা দেখা যাচ্ছে, সেটার নাম শাহজাদি খোঁপা। কাল ছিল একটা গেইশা খোঁপা, পরশু দিন ছিল লায়লা খোঁপা।

জলসাব আসরের ওদিকে একদল ছেলে মুখ টিপে-টিপে হাসে আর ফিসফিস স্বরে বলাবলি করে : উনি তো ওঁর খোঁপা দেখাবার জন্য গানের জলসাতে এসেছেন। উনি গানের ধার ধারেন না। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ আবার ওঁর খোঁপা দেখবার জন্য গানের জলসাতে আসেন।

এক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ওঠেন—আস্তে! বড় গণ্ডগোল হচ্ছে।

ছেলের দল আরও আস্তে, আরও চাপা স্বরে কথা বলাবলি করে. ওই যে, যে ভদ্রলোক এখন সিপ্রা চৌধুরীর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে কথা বলছেন, তিনি তো পরশু দিন এই জলসাতে এসে সিপ্রা চৌধুরীর খোঁপার দিকে তাকালেন আর গলে গেলেন।

একটু বেশি রস করে কথাগুলি বললেও ফিসফিসে স্বভাবের ওই ছেলের দল মিথ্যে কিছু বলেনি. খুব বাড়িয়েও বলেনি। ক্লাবের অনেক অনুরোধের চাপে পড়ে শেষে রাজি হয়েছিলেন সন্দীপ রায়, মাত্র সাতটার সময় দশ মিনিটের জন্য এসে জলসার শুধু উদ্বোধন করে দিয়েই সে চলে যাবে। এরকম গানের তীর্থে ধৈর্যের কাকের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে সে পারবে না। সময়ও নেই. রুচিও নেই।

জলসার উদ্বোধনের কাজটা সেরে দিয়ে, অর্থাৎ প্রকাণ্ড একটা পিতলের পিলসুজের দশটা পলতে জ্বালিয়ে দিয়ে, আসরের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, একটু হেসে আর আবছা নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে যখন চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সন্দীপ, তখন এই সিপ্রা চৌধুরী এগিয়ে গিয়ে সন্দীপের কাছে দাঁড়িয়েছিল আর হেসেছিল। সন্দীপ বলেছিল—আপনি বোধ হয় আমাকে কোনও কথা বলতে চান!

সিপ্রা—হ্যাঁ! আমি এই ক্লাবের মিউজিক-সেকশনের সেক্রেটারি সিপ্রা চৌধুরী।

উৎফুল্ল হয়ে হেসে ওঠে সন্দীপ।—বাঃ, আপনার খুব সাহস আছে বলে মনে হচ্ছে।

—একথা কেন বলছেন?

—নইলে এরকম একটা সাংঘাতিক কর্তব্যের সেক্রেটারি হতে পারবেন কেন ?

—না, একটুও সাংঘাতিক কর্তব্য নয়। যা কিছু দরকার হয়, সবই হরেনদা করেন। আমি শুধু নামেই সেক্রেটারি।

—আপনি ভাল গাইতে পারেন নিশ্চয় ?

—না, না, গান-টান আমার আসে না। সবাই অবশ্য মনে করে যে, আমি খুব ভাল গাইতে পারি, গানও ভাল বুঝি।

—এরকম শখের সেক্রেটারি হবার শখ ছাড়া আর কোনও শখ নেই ?

—না, একটুও না।

—আমি তো মুক্তচোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আছে।

—সে কী ! কী আশ্চর্য। কী দেখতে পাচ্ছেন ?

—আপনার চমৎকার খোঁপার শখ আছে।

হেসে হাঁপ ছাড়ে সিপ্রা। —তাই বলুন। হ্যাঁ, খোঁপার শখ আছে।

সন্দীপ—ভাল শখ। আপনার সুরুচির প্রশংসা করতে হয়।

সিপ্রা—কিন্তু বড় পিসি তো একটুও প্রশংসা করেন না। বকে বকে কিছু আর রাখেন না।

—বড় পিসিরা ওরকম বকাবকি করবেনই। তাঁরা হলেন বিঁড়ে-খোঁপার সেই যুগের, খুব বিদ্‌ঘুটে না হোক বেশ ঘুটঘুটে সেই যুগের মানুষ।

—আমিও বড় পিসিকে প্রায় এরকম কথা শুনিয়ে দিই। কিন্তু শুনিয়ে দিলেই বা কী হবে ? রেহাই নেই। বড় পিসি বকতেই থাকেন।

—কাকে বকেন ? আপনাকে, না আপনার খোঁপাটাকে ?

—আমাকে বকেন, খোঁপাটাকেও বকেন।

—খুব ভুল করেন বড় পিসি। বকাবকি না করে বরং আপনার হাতের কাজের প্রশংসা করা তাঁর উচিত ছিল।

—না, এটা আমার হাতের কাজ নয়, মিস ডি'সিলভার বিউটি সেলুনের হাতের কাজ।

এইবার বেশ চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সন্দীপ—তাই বলুন। খোঁপাটার তা হলে একটা নাম আছে নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, এটা ইরানি স্টাইলের খোঁপা। নাম, লায়লা খোঁপা।

—বেশ সুন্দর নাম। লায়লা খোঁপা দীর্ঘজীবী হোক।

—ঠাট্টা করছেন না তো ?

—এই তো ভুল বুঝলেন। আমি একেবারে মন খুলে কথা বলি, তাই অনেকে আমাকে বুঝতে ভুল করে। ভাল কথা বললে ভয় পায়, আর ঠিক কথা বললে সন্দেহ করে যে, বেঠিক কথা বলছি। বিশ্বাস করুন, আপনার লায়লা খোঁপা সত্যিই সুন্দর খোঁপা, দেখতে আমার মত বেরসিক ব্যাঙ্কার মানুষের চোখেও ভাল লাগছে।

উজ্জ্বল হয়ে হাসতে থাকে সিপ্রা চৌধুরীর চোখ দুটো। —বড় পিসি বলেন, লায়লা খোঁপা না ছাই, ময়লা খোঁপা !

সন্দীপ—বলতে দিন। ওসব কথা কানে তুলবেন না।

সিপ্রা—কিন্তু আপনি শুধু বাতি জ্বালিয়ে কাজ সেরে দিলেন, কিছু বললেন না কেন ? সবাই আশা করেছিল, আপনি কিছু বলবেন।

—আজ কিছু বলবার ইচ্ছেই হল না। যদি আবার একদিন আসি তবে বলব।

—যদি নয়, বলুন আসবেন। এই গানের জলসার আয়ু সাত দিন। কথা দিন কাল আবার আসবেন।

—কাল নয়, পরশু দিন আসব।

কথা রেখেছে সন্দীপ রায়। সিপ্রা চৌধুরীর কাছে দু'দিন আগের সেই উৎফুল্ল অঙ্গীকারের মান রক্ষা করেছে।

বেশ নামকরা কয়েকজন গুণী ওস্তাদ এসেছেন। আসরের তানপুরার ভিড়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওস্তাদেরা বসে আছেন। রামপুরের, লক্ষ্ণৌ-এর, আর গোয়ালিয়রের ওস্তাদ।

গান শুরু হবার আগে তানপুরার গুঞ্জন শুরু হতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ। গানের আসরকে লক্ষ করে চমৎকার এক অনুরোধের কথা বলে।—গুণীরা আমার জিজ্ঞাসার সাহস মাফ করবেন। আমি জানতে চাই, পরজ রাগের সঙ্গে শুদ্ধ মধ্যম মাঝে মাঝে লাগিয়ে দিয়ে বসন্ত রাগ কি গাওয়া যায় না ? আমার ধারণা, গাওয়া যায়। এখন উপস্থিত গুণীজনদের কেউ যদি সেটা গেয়ে শোনাতেন, তবে সবাই শুনে সুখী হত।

রামপুরের ওস্তাদ বলেন—হাঁ হাঁ, সো ভি হো সক্‌তা।

হরেনদা চেঁচিয়ে ঘোষণা করেন।—আপনারা মন দিয়ে শুনুন, ওস্তাদজি বসন্ত রাগ গাইছেন।

সবারই উৎসুক চোখের দৃষ্টি যেন একটা চমকিত বিস্ময়ের আবেগে সন্দীপের মুখের দিকে ছুটে যায়। কে এই ভদ্রলোক ? গানের এত গূঢ় তত্ত্বের খবর যিনি রাখেন, তিনিও নিশ্চয় একজন গুণী।

এদিকে-ওদিকে গুঞ্জন শোনা যায়—এস-আর। এস-আর। বালিগঞ্জের সন্দীপ রায়। শুধু টাকাতে নয়, ইনি জ্ঞানে-গুণে-বিদ্যায় আর ট্যালেন্টেও বড়লোক।

শ্রীবিনায়ক হালদার, যিনি হরেনদার বিশেষ অনুরোধে গান শুনতে এসেছেন, আর তামাকের পাইপে কামড় দিয়ে প্রথম সারির একটা চেয়ারে বসে আছেন, তিনি তাঁর পাশের চেয়ারের অধ্যাপক ভদ্রলোককে বলেন—উনি একজন ইনটেলেকচুয়াল। আপনাদের আলট্রা-মডার্ন হিমাদ্রি মিত্তিরের চেয়েও অনেক মডার্ন। যেমন আইডিয়াতে, তেমনই বাস্তব জীবনে।

এই সব গুঞ্জন আর মন্তব্যের শব্দ নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছে সন্দীপ। তার পাশে বসে আছে যে সিপ্রা চৌধুরী, সেও নিশ্চয় শুনেছে। যার নাম করে এত প্রশস্তি উপচে উঠেছে, তার চোখ দুটো যতটা উজ্জ্বল হয়ে হাসছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে হাসছে সিপ্রা চৌধুরীর দুই চোখ।

রামপুরের ওস্তাদ বসন্ত রাগের আলাপ শুরু করেছেন। সন্দীপ বলে—চলুন, সিপ্রা চৌধুরী।

চমকে ওঠে সিপ্রার শাহাজাদি খোঁপার মুক্তোর ঝালর।—সে কী, বসন্ত রাগ শুনবেন না ?

—না।

—কিন্তু আপনিই তো অনুরোধ করলেন যে...।

—হ্যাঁ, আমিই বসন্ত রাগ গাইতে বলেছি। ব্যস, ওই পর্যন্ত। সাধ হয়েছিল, দুটো কথা বলি। বলে দিয়েছি, আমার সাধও মিটে গিয়েছে, আর এখানে বসে থাকতে পারছি না। চলুন, বাইরে যাই।

—আমিও যাব ?

—নিশ্চয়। অবিশ্যি, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে...।

—না না, আপত্তি কেন হবে ?

উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সিপ্রা। শ্রোতাদের প্রথম সারির দুটি চেয়ার খালি করে দিয়ে দু'জনে একসঙ্গে হেঁটে বাইরে চলে যায়।

জলসার ভলান্টিয়ার ছেলেরা, যারা প্রবেশপথের মুখে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে, তারা হাঁকডাক করে।—এই যে, এদিকে, ওই যে আপনার গাড়ি, ওই ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

সিপ্রা বলে—আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আপনি তাই বোধ হয় ইচ্ছা করে আমাকে দিয়ে কর্তব্যের কাজটা করিয়ে নিলেন।

সন্দীপ—কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।

সিপ্রা—মান্য অতিথি যখন গানের সভা ছেড়ে চলে যান, তখন গান সেকশনের সেক্রেটারির কর্তব্য হল, অন্তত গেট পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এসে তাঁকে বিদায় দেওয়া।

—আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি ভুলেই গিয়েছি যে আপনি হলেন ক্লাবের গান সেকশনের সেক্রেটারি।

—যা-ই হোক, স্বীকার তো করবেন যে সেক্রেটারি তার...।

—স্বীকার করি, সেক্রেটারি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। এখন আমি আমার কর্তব্য পালন

করব। আপনাকে একটা ভাল ছবি দেখতে নিয়ে যাব।

সিপ্রার চোখে একটা বিস্ময়ের আবেশ টলমল করে। সে বিস্ময় যেন সিপ্রার মুগ্ধ প্রাণের একটা শিহরণ। কথা বলতে গিয়ে সিপ্রার গলার মৃদু স্বর যেন বিহ্বল হয়ে আরও মৃদু হয়ে যায়। —আমি ছবি দেখি বটে, কিন্তু আপনার সঙ্গে ছবি দেখতে যাওয়া...ভাবতে কেমন যেন লাগছে। এতটা কি এত শিগ্‌গির...।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় সিপ্রা। আর, সন্দীপ রায়ও হঠাৎ সিপ্রার একটা হাত ধরে ফেলে কথা বলে। —কী বললে ?

সিপ্রা—আপনার সঙ্গে ছবি দেখতে যেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আজ এখনই কেন ?

সন্দীপ—আজই সকালে ছবির হাউসে আমি টেলিফোন করে একটা বক্স রিজার্ভ করে রেখেছি।

—তবে একবার বাড়িতে গিয়ে, বড় পিসিকে একটু বলে নিয়ে, তারপর না হয়...।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে সন্দীপ—ছবির সময় হয়ে এসেছে সিপ্রা।

—কিন্তু ছবি শেষ হতে তো বেশ রাত হয়ে যাবে।

—রাত দশটা হয়ে যাবে।

—তবে ?

—এখানে গানের জলসা কি রাত দশটার আগে শেষ হবে ?

—না।

—তুমি কি গান শেষ না হবার আগেই বাড়ি চলে যেতে ?

—না।

—বড় পিসি কি জানেন না যে, তুমি গানের জলসায় এসেছ ?

—জানেন।

—তাঁকে কি এমন কোনও কথা বলে এসেছ যে, তুমি রাত দশটার আগেই বাড়িতে ফিরবে ?

—না।

—তবে আজ এখনই আমার সঙ্গে ছবি দেখতে যেতে তোমার চিন্তা করবার তো কিছু নেই। কেউ তোমার কাছে কৈফিয়ত দাবি করবে না। করবে কি ?

—না।

—তবে চলো।

—চলুন।

আজ এখানে এই গাঢ় সন্ধ্যায়, কালীঘাটের একটি কাদামাখা পথের উপর চাকার দাগ এঁকে দিয়ে চকচকে ক্যাডিলাক যখন সন্দীপ রায় ও সিপ্রা চৌধুরীকে নিয়ে নতুন উল্লাসের হর্ন বাজিয়ে ছুটতে শুরু করে, তখন এখান থেকে অনেক দূরে সেখানে দমদমের 'নিরঞ্জন'-এর গেটের কাছে একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেয়ে সুপ্রভার মন থেকে অনেকক্ষণের অপেক্ষার সব অস্বস্তি ঝরে পড়ে যায়। ভদ্রলোক এতক্ষণে পৌঁছলেন। আগে কোনও দিনও এত দেরি করে আসেননি।

ড্রইংরুম থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বুঝতে পারে সুপ্রভা, না, সন্দীপ আসেনি। ক্যাডিলাক নয়, একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয়, হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছে ট্যাক্সিটা। তাই বনেট তুলে দিয়ে ইঞ্জিনের কলকব্জার উপর ঠোকাঠুকি করছে ড্রাইভার।

ঘরে ঢুকে আবার দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকায় সুপ্রভা। না, আজ আর আসবেন না সন্দীপ রায়। কিন্তু কেন ? হঠাৎ কোনও অসুখে পড়ে যাননি তো ?

তার-বাঁধা গিটারটাকে হাতে তুলে নেয় সুপ্রভা। কিন্তু গিটার যেন আনমনা সুপ্রভার অসাবধান হাতের একটা ধাক্কা খেয়েছে। মিথ্যে একটা ঝংকার তুলে নীরব হয়ে যায় গিটার।

কিন্তু ওদিকে ততক্ষণে সন্দীপ রায়ের ক্যাডিলাক পার্ক স্ট্রিটের মোড় পার হয়ে গিয়েছে। সিপ্রা বলে—উঃ, এত জোরে গাড়ি চালাবেন না। আমার বেশ ভয় করছে।

সন্দীপ হাসে—আমি কোনও কিছুই আস্তে চালাতে পারি না। আস্তে চলতেও পারি না। যেমন আমার এই গাড়িটা, তেমনই আমার জীবনটাও স্পিড ভালবাসে।

সিপ্রা—তা আমি জানি।
সন্দীপ—তুমি কেমন করে জানলে ?
—হরেনদার কাছে আপনার অনেক কথা শুনেছি।
—নানা রকম ভয়ের কথা বোধ হয় ?
—না, একটুও ভয়ের কথা নয়। আমি কত কতবার ভেবেছি, যদি আপনাকে কোথাও দেখতে পাই, তবে একটু ভাল করে দেখব।
এক হাত স্টিয়ারিং-হুইলের উপর রেখে অন্য হাতটাকে সিপ্রা চৌধুরীর কাঁধের উপর এলিয়ে দেয় সন্দীপ। —এ কথা বলে দিয়ে তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করে দিলে, সিপ্রা।
—আপনিও কি একটি কথা বলে আমাকে নিশ্চিন্ত করে দিতে পারেন না ?
—পারি। কিন্তু তুমিই বলো, কী কথা শুনতে চাও ?
—আপনি বুঝে দেখুন, কী কথা শুনতে পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।
—আমি রোজ তোমাকে দেখতে চাই। একটি দিনও বাদ দিতে চাই না। একথা শোনার পরেও যদি তোমার মনে কোনও প্রশ্ন থাকে, তবে...।
ছবির হাউসের কাছে পৌঁছে গিয়েছে দুরন্ত স্পিডের ক্যাডিলাক। সন্দীপ হেসে ফেলে। —এখন ছবিটাকে একটু ভাল করে দেখো। আমি একটুও হিংসে করব না।
আলোয় ঝলমল সিনেমা নিকেতনের ভিতরে ছায়াবৃত হলের দর্শকমঞ্চের এক দিকে আরও ছায়াবৃত বক্স যেন একটি নিবিড় নিবালা। তারই ভিতরে সন্দীপ রায়ের পাশে বসে সিপ্রা চৌধুরীর প্রাণটা বোধ হয় সব প্রশ্ন হারিয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। তবু সিপ্রার মনে হয়, সন্দীপের হাতটা এখনই এত উতলা না হয়ে একটু শান্ত হলে ভাল হত। নইলে ঘুমিয়ে পড়বে সিপ্রা, ছবি দেখা আর সম্ভব হবে না। সিপ্রার গলাটাকে এভাবে এক হাতে জড়িয়ে ধরে থাকলে সন্দীপও কি ছবিটাকে ভাল করে দেখতে পারবে ?
ছবিতে পার্কের ভিতরে ডাক্তারের পাশে পাশে হেঁটে ডাক্তারের অর্ডার আর উপদেশের কথা শুনছে হাসপাতালের মেড-মেয়েটি। মেয়েটির মুখে কী সুন্দর হাসি আর চোখে কী চমৎকার চাহনি! মুখে কোনও কথা না বললেও বুঝতে পারা যায়, ওই মেয়ের প্রাণটা কী কথা বলছে।
চমকে ওঠে সিপ্রা। সন্দীপ বলছে—চলো বাইরে যাই।
সিপ্রা—ছবি তো সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এখনই চলে যেতে চাইছ কেন ?
—ও ছবি এখন না দেখলেও চলবে।
—তবে চলো।
ছবির ঘর থেকে বের হয়ে এসে, আর লাউঞ্জের সোফার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে যায় সন্দীপ, থেমে যায় সিপ্রা। সন্দীপ বলে—না, এখানেও নয়। চলো, একেবারে বাইরে চলে যাই।
একেবারে বাইরে এসে আর ফুটপাথের এদিক ওদিক দু'দিকে দু'বার ভ্রূক্ষেপ করেই সিপ্রার হাত ধরে সন্দীপ রায়। —এইবার আমরাই ছবি হয়ে একটু ঘুরে বেড়াই, কেমন ?
সিপ্রা—আঃ, হাতটা ছাড়ুন।
সিপ্রার হাতটা ছেড়ে দিয়ে হেসে ফেলে সন্দীপ। —তোমার মনে সেকেলে লজ্জার কালিঝুলি কিছুটা আছে মনে হচ্ছে।
—আমার অবস্থাটা একটু ভেবে দেখবেন তো। কত লোক যাওয়া-আসা করছে, এর মধ্যে চেনা লোকও থাকতে পারে। কী মনে করবে তারা, যদি দেখতে পায় যে, অনাথ চৌধুরীর মেয়ে একেবারে বেপরোয়া হয়ে এক ভদ্রলোকের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ?
—মনে করবে যে, অনাথ চৌধুরীর মেয়ে তার ভালবাসার মানুষটির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
—সেটাই তো আমার ভয়।
—বুঝতে পারছি না, কী করে তোমার এই ভয় ভেঙে দেওয়া যায়।
—আজ এখন ফিরে চলুন।
—তারপর ?

—কাল একবার হরেনদার কাছে বলুন, তারপর হরেনদা যেন একবার বড় পিসির সঙ্গে কথা বলেন।

—কী কথা ? কিসের কথা ?

—তোমার ইচ্ছের কথা।

—আমার ইচ্ছের কথাটা তুমি বুঝেছ, এটাই কি যথেষ্ট নয় ?

—আমার পক্ষে যথেষ্ট বৈকি। কিন্তু...কিন্তু কিছু মনে করো না, আজ আমার সত্যিই লজ্জা করছে। বিয়ে হয়ে যাক, তারপর দেখবে, তোমার হাত ধরে চলতে আমার একটুও লজ্জা করবে না।

—বিয়ে যেদিন হবে, সেদিন তো হবেই। সেটা কেউ খণ্ডাতে পারবে না। কিন্তু তার আগে কি আমি তোমাকে একটি দিনও দেখতে পাব না ?

—পাবে বইকি, নিশ্চয় পাবে। বলতে গিয়ে সন্দীপের হাত ধরে ফেলে সিপ্রা। —যদি কোনও সোমবার বাসেল স্ট্রিটে মিসেস ডি'সিলভার সেলুনের কাছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, তবে আমাকে নিশ্চয় দেখতে পাবে।

—বেশ তোমার ভালবাসার এটুকু আত্মদানও আপাতত আমার কাছে যথেষ্ট। চলো, এবার বাড়ি ফিরে যাই।

—চলুন, কিন্তু আমার বাড়ি পর্যন্ত যাবেন না। আমাকে ভবানীপুরের কোথাও, মার্কেটের কাছে কিংবা সিনেমা হাউসের কাছে নামিয়ে দেবেন।

॥ ৫ ॥

বাসেল স্ট্রিটের একটি ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষার যে নায়িকা, যার নাম সিপ্রা চৌধুরী, তার মন-প্রাণ শুধু একটি শব্দ শোনবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। সন্দীপের ক্যাডিলাকের সাইরেন-হর্নের শব্দ। শব্দটাকে মনে-প্রাণে চিনে ফেলেছে সিপ্রা। গাড়িটা চোখে পড়বার আগেই, শুধু হর্নের শব্দ শুনে বুঝে ফেলতে পাবে সিপ্রা, সন্দীপ আসছে। মাঝে মাঝে অন্য গাড়িও সাইবেন-হর্ন বাজিয়ে ছুটে যায়। সে গাড়িকেও চোখে না দেখে শুধু হর্নের শব্দ শুনেই বলে দিতে পারবে সিপ্রা, ওটা সন্দীপের গাড়ির সাইরেন-হর্নের শব্দ নয়, ওটা এক বুড়ো সাহেবের রেসিং-গাড়ির সাইবেন-হর্নেব শব্দ। শব্দ শুনেই যখন বুকের ভিতরে অদ্ভুত এক চঞ্চলতার ঝংকার শিউরে ওঠে, নিঃশ্বাসের বাতাস নিবিড় হয়ে যায়, তখন বুঝতে পারে সিপ্রা, এ নিশ্চয় সন্দীপের গাড়ির হর্নের শব্দ। এতক্ষণে সন্দীপ আসছে!

আজ সন্দীপকে বলতে হবে : এখানে এসে পৌঁছতে এত দেবি করে দাও বলেই তো ফিরতে এত দেরি হয়। রোজ রাত দশটায় বাড়ি ফেরবার কোনও কৈফিয়ত বড় পিসি আর বিশ্বাস করতে পারছেন না। বড় পিসির বকাবকির দুরন্ত ভাষা যে চড়-চাপড়ের চেয়েও দুরন্ত হয়ে উঠেছে, সেটা তুমি কল্পনা করতে পার না বলেই আমার অনুরোধ গ্রাহ্য করছ না, বাড়ি ফিরতে রোজই রাত করে দিচ্ছ। রোজই দশরকমের মিথ্যে কথা বলে বড় পিসির কাছে কৈফিয়ত দিতে আমার একটুও ভাল লাগছে না।

অনাথ চৌধুরীর মেয়ে সিপ্রা চৌধুরীর ঘরের জীবনে বড় পিসির বকুনি যেমন একটা ভয়, তেমনই একটি মায়াও বটে ; মরুভূমিতে যেমন রুক্ষ খেজুর গাছের ছায়াও ছায়া। বাড়িতে আরও মানুষ আছে, কিন্তু কারও কাছ থেকে বকুনি শোনবার ভয় নেই সিপ্রার। বড় পিসি মাঝে মাঝে খুব রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন—হোটেলবাড়ি! হোটেলবাড়ি! কেউ যেন কারও কেউ নয়। মেয়েটাকে একবার কাছে ডেকে নিয়ে কেউ কোনওদিন একটা মায়ার কথাও বলে না, কী অদ্ভুত বাড়ি রে বাবা!

বাপ অনাথ চৌধুরীর কাছে তাঁর কাজ-কারবার এমনই ধ্যানজ্ঞান আর তপস্যা যে, মেয়ের সঙ্গে পাঁচটা মিনিটও কথা বলবার সময় পান না। মাসের মধ্যে বড়জোর একটা-দুটো দিন, সিপ্রাকে চোখে পড়লে জিজ্ঞাসা করে ফেলেন—কেমন আছিস ? সিপ্রা যদি বলে, কাল হঠাৎ খুব জ্বর হয়েছিল, তবু

অনাথ চৌধুরীর মুখে দ্বিতীয় কোনও প্রশ্নের কথা বেজে ওঠে না। তিনি ব্যস্ত হয়ে চার-পাঁচটা ফাইলকে বড় ফিতে দিয়ে একসঙ্গে জড়িয়ে বাঁধতে থাকেন, জার্মানির ক্রুপস্ হের্শেল আব মার্সিডিজের সঙ্গে তাঁর করেসপন্ডেন্সের বড় বড় ফাইল।

বড় পিসি রাগ চাপতে গিয়ে চাপাস্বরে গজগজ করেন—টাকাওয়ালা লক্ষপতির ঘরের চেহারা আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখিনি। মা-মরা মেয়ের এমন অনাদর, তাও আবার বাপের কাছে, কেউ কি কোথাও দেখেছে ? আমি তো দেখিনি।

প্রতিবেশী নন্দবাবুর স্ত্রী যেদিন আসেন, সেদিন বড় পিসি বেশ গলা ছেড়ে তাঁর আক্ষেপের অনেক কথা বলেই ফেলেন : মেয়ের বাপ-ভাগ্যির ছিরি তো এই, দাদা-ভাগ্যির ছিরিটাই বা কী রকম ? এক দাদা সপ্তাহের মধ্যে ছ'দিন শ্বশুরবাড়িতে থাকবার পর একদিন এসে এবাড়িতে থাকবেন। আর এক দাদা মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন সাহেবি হোটেলে থাকবার পর একদিন এসে এবাড়িতে থাকবেন। আমি ভাবি, ওরা একদিনের জন্যেই বা আসে কেন ? না এলেই তো পারে।

নন্দবাবুর স্ত্রী হাসতে থাকেন। —তা বললে চলবে কেন দিদি ?

বড় পিসি—জানি জানি, সবই বুঝি, ওরকম করে বাপের সম্পত্তিকে একটু ছুঁয়ে না থাকলে ওদের চলবে কেন ? কিন্তু বোনটাকে একটু তো দেখবি। এক দাদা বোনকে শুধু একটি কথা বলেন পড়ছিস, না, পড়া ছেড়ে দিয়েছিস ? আর এক দাদা শুধু বলেন—ইংরেজিটা খুব ভাল করে শিখে নিবি, নইলে কিস্সু হবে না। ব্যস, ওই পর্যন্ত। দাদারা এই খবরটুকুও রাখেন না, কিংবা ভুলেই গিয়েছেন যে, বোনটা দু'বছর আগেই বি-এ পাস করেছে।

চলে যাবার জন্য নন্দবাবুর স্ত্রী উঠে দাঁড়াতেই বড় পিসির গলার স্বর যেন ফুঁপিয়ে ওঠে। —মেয়েটার জন্যে কেউ কিছু ভাববে না, শুধু আমি যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছি। একরোখা অবাধ্য মেয়েকে সামলে রাখতে আর চিন্তে করতে করতে আমার আয়ু যে ফুরিয়ে এল। আমি তবে কাশী যাব কবে ?

সন্ধ্যাবেলা সিপ্রাকে মিররের সামনে দাঁড়িয়ে সাজতে দেখে বড় পিসির উগ্র মুখরতার স্বর হঠাৎ নরম হয়ে যায় : দেখতে সুন্দর, লেখাপড়া ভাল শিখেছে, সে মেয়ের জন্যে একটি সৎপাত্র পেতে কোনওই অসুবিধে নেই। কিন্তু সেজন্য চেষ্টা হবে, তবে তো ! বাপ কোনও চেষ্টা করবেন না, দু-দুটো দাদারও কোনও চেষ্টা নেই। জলজ্যান্ত একটা বউদিও তো আছে। সেও কি একটু চেষ্টা করতে পারে না ? ইচ্ছে করলেই পারে। কিন্তু ইচ্ছে করবে কেন ? যে বউ পুজোর দিনেও শ্বশুরকে একটা প্রণাম করবার জন্যে আসে না, সে কি তার শ্বশুরের মেয়ের জন্য কোনও দরদ বোধ করতে পারে ? কখখনও পারে না। আমি জানতে চাই, এরা কি তবে সত্যিই মেয়েটাকে চন্দ্র-সূর্যের নামে উৎসর্গ করে দিয়েছে ?

সন্ধ্যা হতেই সিপ্রা যখন বড় পিসিকে ডাক দিয়ে বলে, আমি এখন একটু বাইরে যাচ্ছি, তখন বড় পিসির আপত্তি আর অনিচ্ছার প্রাণটা আবার চেঁচিয়ে ওঠে—শুধু ফ্যাশান আর ফাংশান—ফাংশান আর ফ্যাশান ! ওই নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাস তো দে। আমি কিছুই বলব না। আমি বলবার কে ?

সিপ্রা হাসে। —তুমি না বললে কে আর বলবে ?

বড় পিসি—আমি তবে স্পষ্ট করে বলছি, শুনে নাও মেয়ে। যদি এবছরেও তোমার বিয়ে না হয়, তবে আমি আর এখানে থাকব না। আমি কাশী চলে যাবই যাব।

রাসেল স্ট্রিটের একটি ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে অনেক বিস্ময়ের কথা ভাবতে গিয়ে একটা নতুন বিস্ময়ের দৃশ্য কল্পনা করতে পারে সিপ্রা। আশ্চর্য হয়ে হরেনদার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন বড় পিসি। হরেনদা বলছেন : একজন খুব সৎপাত্র সিপ্রাকে পছন্দ করে ফেলেছে, এইবার বিয়ের একটা শুভদিন ঠিক করতে হবে। বড় পিসির এতদিনের রুষ্ট মেজাজের চোখ-মুখের উপর কী চমৎকার খুশির হাসি ফুটে উঠেছে।

কিন্তু সন্দীপ এসে গিয়েছে। হাসছে সন্দীপ। সন্দীপও কি সিপ্রার কল্পনার এই ছবিটাকে দেখে ফেলেছে ? তাই তো মনে হয়। সন্দীপের মুখে এত সুন্দর হাসি ফুটে উঠতে কোনওদিনও দেখেনি

সিপ্রা।

সিপ্রা বলে—বোটানিকাল গার্ডেনে বেশ সুন্দর নিরালা জায়গা অনেক আছে।

সন্দীপ—নিরালা ?

হাত দিয়ে মুখের হাসিটা চেপে নিয়ে সিপ্রা বলে—হ্যাঁ। কেউ দেখতে পাবে না।

সন্দীপ—কেউ যদি না-ই দেখল, তবে কী আর হল, কোন লাভটা হল ?

সিপ্রা—আমাদের দু'জনের লাভ হল।

সন্দীপ—তা হলে তো বলতে হয়, অমাবস্যার রাতে একটা শ্মশানের বাঁশঝোপের ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকা আরও ভাল, কাকপক্ষীও দেখতে পাবে না।

সিপ্রা—লোকে না দেখলে কী আসে যায় ?

সন্দীপ—সবই আসে যায়। লোকে না দেখলে, তোমার জীবনের কোনও কিছুই সত্য হয়ে উঠতে পারে না।

সিপ্রা—কিছুই বুঝলাম না।

সন্দীপ—বেশি বোঝাতে হলে তো বেশি মুখ খুলতে হয়।

সিপ্রা—হ্যাঁ, বেশ তো, মুখ খুলেই বলো না কেন ? কোন কথাটাই বা মুখ খুলে বলতে তুমি বাকি রেখেছ ?

সন্দীপ—বিয়ে ব্যাপারটা দু'জনের মধ্যে যে কী সম্পর্কের ব্যাপার, সেটা সকলেই জানে। তবু গায়ে হলুদ-টলুদ মেখে সেটা লোককে জানিয়ে আর বুঝিয়ে দিতে হয়। দুজনের ভালবাসার ব্যাপারটাকেও তেমনই লোককে জানিয়ে দেখিয়ে আর বুঝিয়ে দিতে হয়।

সিপ্রা—বাঃ, খুব বললে ! লোকে দেখলেই সব হয়ে গেল ?

সন্দীপ—আসলটার সবই হয়ে গেল। লোকে যদি না জানল যে, তুমি আমাকে ভালবাস, তবে আমি কী করে দেখব জানব আর বুঝব যে, কে আমাকে হিংসে করছে আর কে-ই বা আশ্চর্য হচ্ছে। তা হলে আমিই বা কী করে কোন গর্বটা বোধ করব ?

সিপ্রা—সত্যি করে যদি ভালবাসা না থাকে, আর মেলামেশার ও ছুটোছুটির কাণ্ড দেখে লোকে যদি মনে করে ভালবাসা হয়েছে, তবে…।

সন্দীপ—একই ব্যাপার। সেটাও জীবনের একটা লাভ। ধরো, কেউ ভুল করে আমার গলায় মালা পরিয়ে দিল, সেজন্য মালাটা তো আর মিথ্যে হয়ে যায় না, আমার গলাটাও নয়।

সিপ্রা—বুঝলাম না।

সন্দীপ—এর মধ্যে না বোঝবার মত কিছুই নেই। আমি খুবই সোজা সহজ সরল সত্য কথা বলছি।

সিপ্রা—আমার কথা শোনো। সামনে একটা পুকুর, সে পুকুরের এক কোণে কেয়ার ঝোপ, পুকুরের জলে বড়-বড় পদ্মপাতা ভেসে রয়েছে। পেছনে আইভি লতার মস্ত বড় একটা মাচান। আর, দু'পাশে হাসনুহানার ঝাড়। এর মধ্যে বসে গল্প করতে কি তোমার ভাল লাগবে না ?

সন্দীপ—কতক্ষণ বসে থাকতে হবে ?

—অন্তত দুটো ঘণ্টা তো বসে থাকা উচিত।

—না, ওরকমের নিরালা আর ওরকমের একঘেয়ে তপস্যা আমার ধাতে সইবে না।

—আমার সঙ্গে বসে দু'ঘণ্টা গল্প করলে কি একঘেয়ে তপস্যা করা হয় ? তা হলে তো বলতে হয়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার রোজই চার ঘণ্টা ধরে ছুটোছুটি করাও একটা একঘেয়ে তপস্যা।

মাথাটাকে হঠাৎ কাত করে দিয়ে, শাহাজাদি খোঁপার মুক্তাঝালর দুলিয়ে, মুখ টিপে হেসে, আর দুই চোখের কালো ভুরু দুটোকে বিলোল করে দিয়ে সন্দীপের মুখের দিকে তাকায় সিপ্রা—মুখ খুলে বলতে লজ্জা করছে, তবু বলছি। চলো, আমি তোমার কাঁধে মাথা রেখে আর চুপ করে বসে থাকব। আর তুমি খুব আস্তে গুনগুন করে বসন্ত রাগ গাইবে। কেউ শুনতে পাবে না, শুধু আমি শুনব।

—অ্যাঁ ? কী বললে ? বসন্ত রাগ ?

—হ্যাঁ !

—সেটা আবার কিসের রাগ ?

—মনে নেই ? সেদিন গানের জলসাতে তুমিই তো বললে, কী করে বসন্ত রাগ গাইতে হয় ।

—ও, হ্যাঁ ! বলেছিলাম ঠিকই । বলবার দরকার ছিল, তাই বলেছিলাম ।

—কিন্তু সে গান তুমি নিশ্চয় গাইতে জান, গাইতে পার ।

—মোটেই জানি না, একেবারেই পারি না । গানের জলসার উদ্বোধন করতে হবে, তাই গান নিয়ে ভালমন্দ তর্কাতর্কির একটা বই থেকে ওই কয়েকটা কথা জেনে নিয়েছিলাম । ...কী ? কী ভাবছ ?

—কিছু ভাবতে পারছি না ।

—তুমি যেমন ক্লাবের গানের সেক্‌শনের সুগায়িকা-সেক্রেটারি, আমিও তেমনই গানের সুগায়ক-পণ্ডিত ।

—ঠাট্টা করছ কেন ? আমি গান শুনতে ভালবাসি, গান শোনা আমার একটা শখ । শুধু হরেনদার অনুরোধের চাপে পড়ে সেক্রেটারি হয়েছি । কিন্তু তুমি... ।

—বলো, মনে হচ্ছে আজ তোমার মুখে প্রশ্ন-সরস্বতী ভর করেছে ।

—তুমি সেদিন নিজেই ভাল ছবি দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে, আর আমাকেও সেই ছবি দেখাবার জন্যে নিয়ে গেলে, কিন্তু.. ।

—এই রে ! এ যে দেখছি সাদাসিধে প্রশ্ন-সরস্বতী নয়, কালো কুটিল সন্দেহ-সরস্বতী ভর করেছে ।

—কিন্তু, তুমি তিনটে মিনিটও না ফুরোতে উঠে পড়লে ।

—তোমাকে যখন কাছে পেয়ে গেলাম, তখন একটা ছবির কাছে আর বসে থাকব কেন ? তিন মিনিট ছবি দেখেছি, তাই যথেষ্ট । তার বেশি দেখা আমার সাধ্যিতে কুলোয় না ।

—ছবিটাকে তা হলে তুমি আগে দেখনি ।

—না ।

—তবে কী করে বললে যে, এটা খুব ভাল ছবি ।

—আমার বন্ধু বিনায়ক এই ছবির গল্পটা একদিন আমাকে শুনিয়েছিল ।

—শুনতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগেনি ?

—অ্যাঁ ? —হ্যাঁ । যতদূর মনে পড়ে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগেনি ।

সন্দীপের দুই চোখের উচ্ছল উজ্জ্বলতার হাসিটা হঠাৎ যেন একটা ময়লা ধোঁয়ার ঝাপটা লেগে আহত হয়েছে । সিপ্রার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কথা বলে সন্দীপ । —ধান ভানতে এত শিবের গীত একটুও ভাল শোনাচ্ছে না, সিপ্রা ।

সিপ্রা হাসতে চেষ্টা করে । —শিবের গীত বলছ কেন ? আমি তো তোমারই গীত গাইছি ।

—তুমি আমার কোনও কথাই বুঝতে পারছ না, বার বার শুধু একই কথা বলছ । এটা কি আমার গীত হল, না তোমার সন্দেহের গীত হল ?

—ছি ছি, ওকথা বলো না । বলতে নেই । আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই, আমি বরং নিজেরই উপর রাগ করছি, কেন তোমার সব কথা বুঝতে পারি না ।

—আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি, তোমার মনের সমস্যাটা কী ?

—কী ?

—তোমার মত মেয়ের মনে যতটা একেলে রুচি থাকা উচিত ছিল, ততটা নেই । থাকলে আমাকে বুঝতে তোমার একটুও অসুবিধে হত না ।

—বুঝি না, একেলে রুচি বলতে তুমি কী বলতে চাইছ । পাড়াতে কেউ কেউ আমার নিন্দে করে, অনেকে আবার প্রশংসাও করে যে, আমি বড় বেশি আপ-টু-ডেট মেয়ে ।

—খুব ভুল কথা নয় ।

—আমি যা-ই হই না কেন, আমি তো নির্ভয়ে তোমার কাছে এসেছি । তুমি যেখানে নিয়ে গিয়েছ, সেখানে গিয়েছি আর যতক্ষণ থাকতে বলেছ, ততক্ষণ থেকেছি । বড় পিসি রোজই ধমক

দিয়ে বলেছেন, এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকিস ? আমি স্পষ্ট করে বড় পিসিকে বলে দিয়েছি : যেখানে থাকতে ভাল লাগে, সেখানেই থাকি। এরপর যদি আমি সবচেয়ে আনন্দের কথাটা স্পষ্ট করে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তবেই কি আমি একটা সেকেলে বস্তু হয়ে গেলাম ?

সিপ্রা চৌধুরী তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সেই কথাটা আজ এত স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা না করলে, আজ এতক্ষণ ধরে রাসেল স্ট্রিটের ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে দু'জনের মধ্যে এত কথা বলাবলির ব্যাপার হত না।

সিপ্রা বলছে—আর দেরি করা কি ভাল দেখায় ? আরও দেরি করবার কি কোনও দরকার আছে ? তুমি শুধু বলে দাও, বিয়েটা কবে হবে, কবে হলে ভাল হয়। আমি তা হলে তারিখটা হরেনদাকে একবার জানিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যাব। তারপর যা-কিছু করবার, বড় পিসিকে আর বাবাকে জানিয়ে দেবার আর বুঝিয়ে দেবার সব দায় হরেনদাই বইবেন।

এতক্ষণ ধরে এত কথা বলাবলির পর আবার সিপ্রার এই জিজ্ঞাসার কথাটা ফিরে এসেছে। এর আগে দু-চারবার এই জিজ্ঞাসার আভাস সিপ্রার মুখের হাসিতে, চোখের কালো তারার চঞ্চলতায়, আর দু-চারটে লাজুক ভাষার শব্দে ফুটে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু আজ বড়ই স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে।

এই দু মাস ধরে, শুধু প্রতি সপ্তাহে একটি সোমবারে নয়, সব বারেই সন্দীপের ক্যাডিলাক তৃষ্ণার্ত হয়ে ছুটে এসেছে, অপেক্ষার নায়িকা সিপ্রা চৌধুরীকে বুকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। দুরন্ত হয়ে ছুটেছে। যেখানে মানুষের মেলা, যেখানে আলোর মেলা, যেখানে উৎসব আর এগজিবিশন, সেখানে উপস্থিত হয়ে দু-চার মিনিট জিরিয়েছে ক্যাডিলাক, তারপর আবার ছুটেছে। দু'মাসের মধ্যে সন্দীপের সঙ্গে তিনবার এয়ারপোর্টে আর একবার হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেও ঘুরে বেড়িয়ে এসেছে সিপ্রা।

ক্যাডিলাক একটুও ক্লান্ত হয়নি, ক্লান্তিবোধ করে না। কিন্তু সিপ্রা চৌধুরী একটু ক্লান্ত না হয়ে পারেনি। আজও আবার ছুটোছুটি করবে নাকি ? সিপ্রার মুখে এরকম প্রশ্ন শুনে সন্দীপেরও বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, এটা সিপ্রা চৌধুরীর ক্লান্তিরই প্রশ্ন। হেসে হেসে সিপ্রাকে বুঝিয়েছে সন্দীপ : ভালবাসা কখনও ক্লান্ত হতে পারে না সিপ্রা, ঝর্নার জল কখনও ক্লান্ত হয় না। কিন্তু সন্দীপের মুখের এ ধরনের উপমাময় ভাষা শুনেও সিপ্রার মুখের হাসিটা ঝর্নার মত কলস্বরে উচ্ছলিত হয়ে উঠতে পারেনি।

সন্দীপ বলে—তা হলে কি আজ এখানে শুধু দাঁড়িয়ে থাকাই হবে ?

সিপ্রা—তুমি তো এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলছ না।

সন্দীপ—আমাকে কি একটু ভেবে দেখবার সময়ও দেবে না ?

সিপ্রা—ভেবে দেখবে ? এখনও . ।

সন্দীপ—পাঁজির পাতা ওল্টাতে হবে না ঠিকই, তবু তো একটু ভাবতে হবে। যেকোনও দিনকে চট করে একটা শুভদিন বলে ধরে নেওয়া তো উচিত নয়।

হঠাৎ জ্যোৎস্নার আলোর মত একটা হঠাৎ-তৃপ্তির হাসি সিপ্রার মুখে চমকে ওঠে। সিপ্রার প্রাণের ভিতরে উৎকণ্ঠ জিজ্ঞাসাটার সব বিষাদ সেই আলোর ছোঁয়া লেগে এক মুহূর্তেই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। রাস্তার লোকের আর গাড়ির যাওয়া-আসার দৃশ্যটা যেন সিপ্রার চোখেই পড়ছে না। সন্দীপের গায়ের রঙিন ফ্লানেলের কোটের যে বোতামটা সন্দীপের বুক ছুঁয়ে রয়েছে, তারই উপর লুটিয়ে পড়ে সিপ্রার একটা হাত। —বেশ তো, একটু ভেবে নাও। একটা দিন ঠিক করবার জন্যে কতই বা আর ভাবতে হবে ?

সন্দীপ—ভাবতে এমন কিছু সময় লাগবে না। আজ কিংবা কাল কিংবা পরশু, এর মধ্যেই আমি ভেবে ফেলব। কিন্তু আজ কি আমি এখান থেকেই চলে যাব ?

সিপ্রা—না, কখ্খনও না।

সন্দীপের একটা হাত শক্ত করে ধরে নিয়ে সিপ্রা বলে—চলো, কী যেন নাম, কোন রেস্টুরেন্টে যাবে বলেছিলে ?

সন্দীপ—অরোরা ?

সিপ্রা—না, অরোরা নয়।

সন্দীপ—তবে কলরডো।

সিপ্রা—না-না, ওরকমের কোনও নাম তো বলনি।

সন্দীপ—আমারও ঠিক মনে পড়ছে না। আমি বলি, আজ আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

সিপ্রা—কিন্তু আজ যে সত্যিই...তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না...কেন আজ তোমার সঙ্গে ছুটোছুটি করতে এত ইচ্ছে হচ্ছে।

সন্দীপ হাসে—তবে চলো, গাড়িটা যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাই।

চকচকে ক্যাডিলাক ছুটতে শুরু করে বটে, কিন্তু তার সেই উদ্দাম বেগ আজ আর নেই। যেন একটু আনমনা হয়েছে দুরন্ত উল্লাসের ক্যাডিলাক। দিক্‌ভ্রান্তের মত কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে, ঘুরে এসে আবার সেদিকেই চলে যাচ্ছে।

আলিপুরের সড়কের একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ক্যাডিলাক।

গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে সড়কের পাশের একটা বাড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ। বাড়ির লনের সবুজ ঘাস আর বারান্দার উপর টবে বড় বড় ডালিয়ার উপর নকল জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে দিয়ে জ্বলজ্বল করছে ব্যালকনির উপর পূর্ণিমার চাঁদের মত চেহারার একটা ল্যাম্প।

আবার ছুটতে শুরু করে ক্যাডিলাক। দশ মিনিটও লাগে না, হাজরা রোডের মোড়ের কাছে এসেই থেমে যায়, যেখানে চেঁচিয়ে হাঁকাহাঁকি করছে রজনীগন্ধার একটা ফেরিওয়ালা।

সিপ্রার চোখে একটা নিবিড় তৃপ্তির আলো যেন বিহ্বল হয়ে ভাসতে থাকে। —রজনীগন্ধা কিনবে বুঝি?

সন্দীপ—কী বললে?

সিপ্রা—ভালই হবে। তোমার দেওয়া রজনীগন্ধা আজ হাতে ধরে রেখেই বড় পিসিকে বলব আজ তুমি আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবে না। হরেনদা এসে তোমাকে বলবেন, এ রজনীগন্ধা কোথা থেকে এসেছে।

সন্দীপ—আমি তো রজনীগন্ধা কিনব বলে এখানে থামিনি।

সিপ্রা—তবে এখানে থামলে কেন?

সন্দীপ বলে—এটা হাজরা মোড়, যেখানে তোমাকে রোজই নেমে যেতে হয়।

—অ্যাঁ, তাইতো! বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে যায় সিপ্রা।

॥ ৬ ॥

দমদমের হেমলতার কাছে চিঠি লিখেছেন বালিগঞ্জের চারুশীলা রায়। —আমার স্বপ্ন ব্যর্থ হল, হেম। জানতে পেরেছি যে, সন্দীপ তোমার ওখানে যায় না। কিন্তু কোথায় যে যায়, তা জানি না। আমার বিশ্বাস ছিল, তোমাদের বাড়ির বাতাস গায়ে লাগলে আমার ছেলের সব বিকার শান্ত হয়ে যাবে। তোমার মেয়ে সুপ্রভা তো হীরের-টুকরো মেয়ে! তাই আশা করেছিলাম, সে মেয়ের কাছে এসে কাচও কাঞ্চন হয়ে যাবে। তাই আমি ইচ্ছে করেই সেদিন সন্দীপকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। খুব ভুল করে ফেলেছি, হেম। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন।

দমদমের মহিম বসুর বাড়িতে সেই চকচকে মোটরগাড়ি আর আসে না। একটি মাস পার হয়ে গেল, তবুও আর এল না। তাই সন্দেহ করেছেন চারু উকিলের মা: এ কী রে বাবা, মেঘটা শুধু গর্জে গেল, বর্ষালি না।

হেমন্তবাবুর স্ত্রী শৈলবালার কাছে সন্দেহের কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন চারু উকিলের মা—বিয়ে হবে না।

শৈলবালা এরকম কোনও সন্দেহ না করে, কিন্তু বেশ চিন্তিত হয়ে একদিন মহিমবাবুর বাড়িতে এসেছিলেন, আর হেসে হেসে হেমলতার কাছে তাঁর আশার কথাটা বলেছিলেন: মনে হচ্ছে, আপনাদের এখানে শিগগিরই একটা শুভ ব্যাপার হবে।

হেমলতা বললেন—না।
—আপনি ভাল আছেন ?
—হ্যাঁ।
—মহিমবাবু ভাল আছেন ?
—হ্যাঁ।
—বিকাশ ভাল আছে ?
—হ্যাঁ, চিঠি পেয়েছি ভাল আছে।
—সুপ্রভা ভাল আছে ?
—হ্যাঁ।
—ওই যে চমৎকার ছেলেটি, যে আপনাদের এখানে প্রায় রোজই আসত, সে এখন কোথায় ?
—জানি না।
—কিন্তু সে কি আর আসবে না ?
—না।
—সে কি একথা নিজেই বলে দিয়ে গিয়েছে ?
—না, তার মা যে চিঠি লিখেছেন, সে চিঠি পড়ে বুঝেছি যে তাঁর ছেলের আর এখানে আসবার মন নেই।

হেমলতার শান্ত মুখটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, আর নিজেরই একটা করুণ নিঃশ্বাসের উচ্ছ্বাস সামলে নিয়ে চলে গেলেন শৈলবালা। তিনি জানেন যে, তাঁর একটা দুর্নাম আছে। তিনি নাকি বড়ই ছিঁচকাঁদুনে স্বভাবের মানুষ। লোকে বলে, ছিঁচকাঁদুনে শৈলদি।

হেমন্তবাবুর কাছে এসে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন শৈলবালা—বিয়ে হবে না।

হেমন্তবাবু—কেন ?

শৈলদি—ছেলের মা নিজেই চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রভাকে তাঁর ছেলের পছন্দ হয়নি।

হেমন্তবাবু—কী আশ্চর্য, নিজেকে কি একটা দেবতা বলে মনে করে বালিগঞ্জের মাধব রায়ের ছেলে ?

হেমন্তবাবুর মুখ থেকে সন্দীপের মা চারুশীলার এই চিঠির কথা শুনতে পেয়েছেন সেই ভদ্রলোক, কালীঘাটের গানের জলসাতে যিনি সেদিন উপস্থিত ছিলেন, হেমন্তবাবুরই ভাগ্নে বিনায়ক হালদার, যাঁর চোখে সর্বদা সোনার ফ্রেমের চশমা চিকচিক করে, যিনি সব সময় ধূমপানের একটি সুবঙ্কিম পাইপ কামড় দিয়ে ধরে রাখেন, সে পাইপের মধ্যে ধোঁয়া কিংবা তামাক থাকুক বা না থাকুক।

এই বিনায়ক হালদারের মুখ থেকে খবর শুনে সন্দীপ জানতে পেরেছে যে, মা একটা চিঠি লিখে দমদমের সেই অদ্ভুত বাড়ির কাউকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিয়ে হতে পারে না, হবেও না।

বালিগঞ্জের রায়ভবনের দোতলার একটি ঘরে বিনায়কের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে সন্দীপ, হাতের গেলাসের হুইস্কি উছলে ওঠে।—মাতৃদেবী তো জীবনে একটাও ভাল কথা বলতে পারলেন না, ভাল একটা কাজও করতে পারলেন না। এই প্রথম একটি ভাল কাজ করলেন। বেশ করেছেন, চিঠি দিয়ে সত্য কথাটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে ভাল করেছেন।

প্রতি সপ্তাহে রবিবারের সকালবেলাতে সন্দীপ রায়ের এই বাড়িতে একবার না এসে পারেন না বিনায়ক হালদার। সন্দীপ জানে, কথায় কথায় বিনায়ক সন্দীপকে জানিয়েও দিয়েছে যে, সন্দীপের ইনটেলেক্ট আর পার্সোনালিটি বিনায়কের কাছে সত্যিই শ্রদ্ধাময় একটি বিরাট বিস্ময়। তিনি নিজেও স্বাধীন চিন্তার মানুষ, কিন্তু সন্দীপ রায়ের স্বাধীন চিন্তার অবাধ উদারতা তাঁকেও বিস্মিত করেছে। কোনও ইনহিবিশন নেই, চিন্তায় ও আচরণে কোনও পুরনো বিশ্বাসের উপদ্রব নেই, সন্দীপ রায়ের মত দ্বিতীয় কোনও বিশুদ্ধ আধুনিক মানুষ বিনায়কের চোখে কখনও পড়েনি।

সন্দীপও তাঁর ভক্ত এই বিনায়ক হালদারের একজন অনুরাগী বন্ধু। কোনও রবিবারের সকালবেলাতে বিনায়ক না এলে সন্দীপের সকালবেলার প্রাণটা যেন দুঃসহ একটা শূন্যতা বোধ করে। সন্দীপেরই ইচ্ছার মমতায় সন্দীপের ব্যাঙ্কে একটি কাজ পেয়েছেন বিনায়ক হালদার। কাজটা

কোনও চাপ দিয়ে বিনায়কের স্বাধীন চিন্তার জীবনটাকে উৎপীড়িত করে না। যেদিন ইচ্ছে হয়, সেদিন একবার ব্যাঙ্কে যান বিনায়ক। অফিসের একটি কামরার নিভৃতে বসে এক পেয়ালা চা পান করেন আর চলে যান। ব্যাঙ্কের সকলেই জানে যে, বিনায়ক হালদার হলেন সন্দীপ রায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিনা কাজের ও মোটা মাইনের একজন সম্মানিত পোষ্য।

এহেন বিনায়ক হালদার আজ তাঁর হাতের গেলাসে চুমুক না দিয়ে, আর একটু আশ্চর্য হয়ে সন্দীপের মুখের দিকে তাকান।—আমি ভাবছি, ওখানে তোমার মেলামেশার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ম্যাচিওর করল না কেন? হেমন্তমামার কাছে যা শুনেছি, তাতে আমার তো মনে হয়েছে যে, সে মেয়ে সত্যিই চমৎকার মেয়ে।

সন্দীপ—তোমার এরকম মনে হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়নি।

—কেন হয়নি, বলতে পার?

—পারি। সে মেয়ে হল সেকেলে অভিরুচির একটি পুতুল।

—তাই বল। গেলাসে চুমুক দিয়ে নিয়ে হাঁফ ছাড়েন বিনায়ক হালদার।

সন্দীপ বলে—তুমি তো জান, আমি আর যা কিছু সহ্য করতে পারলেও, সেকেলেপনা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

বিনায়ক—জানি, খুব জানি। ওটা সহ্য করা উচিতও নয়। কিন্তু...।

গেলাসে আর একটা চুমুক দিয়ে বিনায়ক বলেন—কিন্তু এই যে সেদিন দেখলাম, যে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তুমি গানের জলসা থেকে চলে গেলে, যার সঙ্গে তোমার এখন মেলামেশা চলছে, সে মেয়েকে তো বেশ একেলে অভিরুচির মেয়ে বলে আমার মনে হয়েছে!

—খুব একেলে না হোক, খুব সেকেলেও নয়।

—আমার মনে হয়, মেলামেশার ব্যাপার ম্যাচিওর করতে খুব বেশি সময় না লাগলেই ভাল হয়।

সন্দীপ—তুমি কিন্তু খুবই অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছ বিনায়ক। ভালবাসা কি বাজপাখি? দেখবে আর সেই মুহূর্তে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে, এটা কি ভালবাসার নিয়ম?

বিনায়ক—না না, কখ্খনও না, হতেই পারে না!

বিনায়ক গেলাস রেখে দিয়ে আর পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তেই, সন্দীপ বোতলটাকে বিনায়কের গেলাসের দিকে এগিয়ে দেয়।—আর একটু নাও।

বিনায়ক—হ্যাঁ, নেব। কিন্তু তুমি...যে সেই দুটি মাত্র চুমুক দিয়ে গেলাসটাকে রেখে দিয়েছ, আর তো একবারও তুলছ না দেখছি।

সন্দীপ—তুমি তো জান, আমি কোনও অভ্যাসের দাস হতে পারি না। একেবারেই না। ওই যা-কিছু যেটুকু যতক্ষণ ভাল লাগে, ব্যস, তার বেশি আর নয়।

বিনায়ক—আমি দেখেছি, সবকিছুতে তোমার কেমন-যেন একটা অনীহা আছে।

সন্দীপ—আছে হয়ত। আমি সাঁতার দিতে ভালবাসি, ডুব দিতে ভালবাসি না। এটা যদি জলের প্রতি অনীহা হয়, তবে হল।

—ওঃ ওঃ ওঃ। বিনায়ক হালদার বিহ্বল হয়ে বুকভরা শ্রদ্ধার উদ্গার তুলতে থাকেন।—ওঃ, তুমি কত সহজ করে জীবনের কত কঠিন রহস্যের তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে পার, সন্দীপ! এ না হলে আমার মত কট্টর-যুক্তিবাদী মানুষ কি তোমার কাছে আসত, আর তোমার মুখের কথা শুনতে এমন দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করত?

সন্দীপ—আমি কোনও বই পাঁচ-পাতার বেশি পড়ি না, কোনও ছবি তিন-মিনিটের বেশি দেখতে পারি না, কোনও গান এক মিনিটের বেশি শুনি না। যদি অমৃত পাই, তবুও আমি শুধু একটু সিপ করব, তার মধ্যে নিজেকে চুবিয়ে দেব না। আমি বেশিক্ষণের কোনও কিছুই চাই না, বিনায়ক।

বিনায়ক—খুব ভাল। সুন্দর ফুলটাকে একবার দেখলাম, বড় জোর আর একবার দেখলাম। তারপর আর তো কিছু করবার নেই। একঘেয়েমি জীবনের বিউটি নষ্ট করে।

সন্দীপ—সময়ের অপচয় আর অপমান করাই হল সেকেলে মনোবৃত্তির সবচেয়ে বড় আনন্দ। কবি হতে হলে সারারাত চাঁদ দেখতে হবে, ধার্মিক হতে হলে সারারাত চাঁদ দেখতে হবে, ধার্মিক হতে

হলে দিনে পাঁচ লক্ষ নাম জপ করতে হবে, পণ্ডিত হতে হলে একটা শ্লোককে রোজ একশোবার করে সারা বছর পাঠ করতে হবে, সেকেলে সাধের এই জঘন্য স্বভাবটা আসলে কিন্তু একরকমের কাঙালপনা।

বিনায়ক—নিশ্চয় নিশ্চয়, কাঙালপনা বইকি ?

সন্দীপ—এই কাঙালপনারই নানারকম গালভরা নাম আছে। নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা...।

হেসে চেঁচিয়ে ওঠেন বিনায়ক। কৃতজ্ঞতা, লেগে থাকা, পড়ে থাকা। সবটুকু খাব, সবখানি নেব, শেষ পর্যন্ত দেখব, চিরকাল অপেক্ষা করব, ইত্যাদি ইত্যাদি! ডুবে মরবার যত দড়ি-কলসি। আমাদের স্থিতপ্রজ্ঞ-দাদার কথা তোমাকে কোনওদিন বলেছি কি ?

সন্দীপ হাসে—না।

বিনায়ক—বাগবাজারের স্কুলমাস্টার হরলালের বড়দা, আমি তাঁর নাম রেখেছি স্থিতপ্রজ্ঞ-দাদা। উঃ, ভদ্রলোক একুশ বছর ধরে শুধু এক পাণিনি পড়েছেন।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সন্দীপ।—অর্থাৎ ব্যাকরণ-বিদ্যার একটি ঝাঁকামুটে হয়েছেন। বীভৎস। এটাই হল সেকেলে স্কলারশিপ, যার মধ্যে ইনটেলেক্টের কোনও কাজ থাকত না। যা-ই হোক, আমি বলতে চাই, নিষ্ঠা-ফিষ্ঠা সবই দরকার। কিন্তু তার একটা মাত্রা থাকা চাই।

বিনায়ক—নিশ্চয় চাই।

সন্দীপ—আমি বলতে চাই, কৃতজ্ঞতা ভাল, কিন্তু কৃতজ্ঞতার বন্ধনটা ভাল নয়। নিষ্ঠা-ফিষ্ঠা মন্দ নয়, কিন্তু নিষ্ঠার বন্ধন ভাল নয়।

বিনায়ক—ওঃ ওঃ, তুমি সত্যিই...।

সন্দীপ—তুমি অভিযোগ করতে পারো, সন্দীপ রায় নামে লোকটা বুঝি শখের ভালবাসার একটা ভ্রমর। আজ এই ফুলে, কাল সেই ফুলে...।

বিনায়ক—না না না, এরকম কদর্য অভিযোগ আমি করতেই পারি না।

সন্দীপ—যেটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক ভয়, সেটা হল ওই ভয়। ভুল করে যেন সেকেলে স্বভাবের কোনও মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনী না করে ফেলি। দোষ বল আর গুণ বল, আমি এই ভয়টাকে খুব ভয় করি।

বিনায়ক—এটা তোমার ভয় নয় সন্দীপ, এটা তোমার সৎসাহস।

সন্দীপ—আমি যা, আমি তা। আমি নিজেকে জানি। নিজের মনের সঙ্গে তো কোনও ফাঁকি চলে না বিনায়ক। ভাল করে না বুঝে-সুঝে, একটু যাচাই না-করে, কাউকে চট করে বিয়ে করে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা নিন্দে কর, বা যা-ই কর।

বিনায়ক—নিন্দে করব কেন ? কখ্‌খনও না। এটা তো আদর্শবাদী মানুষের সতর্কতা, সততা।

ঘরের দরজার কাছে এক আগন্তুকের হাস্যময় মূর্তি দেখা দেয়। চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ।—ওই দেখো বিনায়ক, যাকে দেখলে আমার এই সকালবেলার আনন্দ একেবারে নস্যাৎ হয়ে যাবে, তিনি এসেছেন।

খাকি-রঙের মোটা কাপড়ের শার্ট, আর খাকি-রঙের শক্ত জিনের ঢিলে প্যান্টালুন, দু-তিন দিনের না-কামানো গালে ছাঁটা ঘাসের মতো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এইরকমের শ্রীসম্পন্ন একটি মূর্তি। সে মূর্তির হাতে কালো কাপড়ের একটা রুমাল।

বিনায়ক গলদশ্র ডাকেন—এসো মন্দার।

সন্দীপ—ঘেঁটু ফুলের নাম মন্দার!

কালো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ঘরের ভিতর ঢোকে মন্দার। ধপ করে সোফার উপর বসে। সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ তার হাতের সেই গেলাসটা মন্দারের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়, যে গেলাসে সন্দীপের দুই চুমুকের ছোঁয়া লেগে আছে।—নাও, গিলে ফেলো।

মন্দারের মুখে অদ্ভুত এক নিবিড়-শান্ত হাসি ফুটে ওঠে। এক চুমুকে গেলাসের তরল অবদানের সবটুকু খেয়ে ফেলেই ঢেঁকুর তোলে মন্দার।—আজ ভেবেছিলাম, আসব না।

সন্দীপ—সে কী ? তুমি আসবে না, আমার এমন সৌভাগ্য কি কোনওদিনও হবে ?

মন্দার—আমাকে যদি একটা গরম কোট কিনে এনে না-দাও, তবে এই মাঘের শীতের কোনওদিনও তোমার এখানে আমার আসা সম্ভব হবে না, বন্ধু।

সন্দীপ—'কিনে এনে না-দাও' কথাটার মানে কী হয়, বন্ধু ? আমি তোমার মাইনে-করা একজন চাকর নাকি, বন্ধু ? আমি তোমার জন্যে গরম কোট কিনব, নিজের হাতে বয়ে নিয়ে আসব, আর তোমার করকমলে সমর্পণ করব, তুমি এতটা আশা কর কোন সাহসে, হে বন্ধু ?

মন্দার হাসে।—তুমি তোমার বাঁ-হাতে কুড়িটা টাকা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই তো পার, বন্ধু ! তা হলেই আমি টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে আর গরম কোটটা কিনে ফেলতে পারি, বন্ধু।

সত্যিই বন্ধু। সন্দীপের কলেজ জীবনের এক ক্লাসের বন্ধু। অতীতের সেই বন্ধুত্বের দাবিতে মন্দার আজ সন্দীপের এক গেলাসের বন্ধু হতে পেরেছে।

তিন বছর আগে, এই রকমই এক মাঘের শীতের সকালবেলাতে মন্দার দত্ত হঠাৎ এসে দাবি করেছিল।—আমাকে একটা চাকরি দিতেই হবে সন্দীপ। নইলে আমি একেবারে না খেয়ে মরে যাব।

সন্দীপ—কিন্তু চাকরি করবার কি তোমার সামান্য যোগ্যতাও আছে ? আমি তো ভুলে যাইনি যে, তুমি অঙ্কেতে শূন্য পেয়েছিলে, ইংরেজিতে তিন আর বাংলাতে সাত।

—আমি কি তোমার জুতো মোছবার চাকরিটাও করতে পারব না ? নিশ্চয় পারব।

—বাজে কথা বলো না।

—তা হলে তুমিই একটা কাজের কথা বলো। মোট কথা, আমাকে টাকা দিতেই হবে, কোনও কাজ দাও বা না-দাও।

—মাস গেলে ত্রিশটা টাকা দিতে পারি, তার বেশি নয়।

—তাই দিও।

—কিন্তু মনে রেখো, আমার এই চ্যারিটির মেয়াদ মাত্র একটি বছর, তার বেশি নয়।

—বেশ।

কথা ছিল, মাস শেষ হলে একদিন এসে ত্রিশটা টাকা নেবে আর চলে যাবে মন্দার। কিন্তু মন্দার দত্ত নিজের ইচ্ছায় একটা কাজ খুঁজে বের করেছে। কাজ করবার জন্য রোজই একবার এ-বাড়িতে আসে মন্দার। সন্দীপের চাকর মালী আর বাবুর্চিকে বকাবকি করে। সবারই কাজের ভুল ধরে। সবাইকে শাসায় এবার ভুল করলে আর রক্ষে নেই। যে ভুল করবে, তাকে একেবারে ডিসমিস করে দেওয়া হবে। শাসানি শেষ হবার পর বেশ শান্ত হয়ে চা আর পাউরুটি খায় মন্দার। তারপর চলে যায়।

নীচের তলার ঘরে ও বারান্দায় মন্দার দত্তকে একদিন ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বিনায়ক হালদার জিজ্ঞাসা করেছিলেন— আপনি বোধ হয় এ বাড়ির নতুন কেয়ারটেকার ?

মন্দার জবাব দিয়েছিল— হ্যাঁ, কেয়ারটেকার বলতে পারেন, আবার ডোন্ট-কেয়ারটেকারও বলতে পারেন।

খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল সন্দীপ, প্রথম যেদিন এক রবিবারের সকালবেলাতে, মন্দার দত্ত হন্তদন্ত হয়ে এই ঘরের ভিতর ঢুকেছিল। ধমক দিয়েছিল সন্দীপ।— তুমি এখানে এলে কেন ? তোমাকে তো আমি ডাকিনি।

মন্দার—বিনায়কবাবু যদি এখানে আসতে পারেন, তবে আমিও কি আসতে পারি না ? আমিই তো তোমার পুরনো বন্ধু, বিনায়কবাবু সেদিনের বন্ধু।

সন্দীপ—না, তুমি এখানে আসবে না।

মন্দার—বিনায়কবাবুর মত আমিও কি একটু হুইস্কি পেতে পারি না। বিনায়কবাবুর মত আমিও কি তোমাকে সম্মান করতে পারি না ?

হেসে ফেলে সন্দীপ— তা হলে কী আর বলি, তা হলে একটু হুইস্কি খেয়েই যাও।

সন্দীপের আপত্তি এইভাবে টলিয়ে দিয়ে, এই ঘরের ভিতরে এসে বসবার, আর সন্দীপকে সম্মান

করবার যে অধিকার নিজের চেষ্টায় তৈরি করে নিয়েছিল মন্দার, সে অধিকার আজও অটুট আছে। সন্দীপকে সম্মান করবার একটা পদ্ধতিও নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে তৈরি করে নিয়েছে মন্দার। মন্দারকে লক্ষ করে যে ভাষায় যত কৌতুক করুক না সন্দীপ, তার সে কৌতুকের মধ্যে তাচ্ছিল্যময় যত উল্লাস থাকুক না কেন, মন্দার শুধু হাসে। মন্দারের এই অমধুর হাসিটাই হল সন্দীপের প্রতি মন্দারের খুশি-প্রাণের সম্মানময় অর্ঘ্য। মন্দারকে তুচ্ছ করে কৌতুক উপভোগ করবার অভ্যাসটা সন্দীপেরও একটা নেশা হয়ে উঠেছে, যেন সন্দীপের ব্যক্তিত্বেরই একটা নেশা। সে নেশাতে দুই চুমুক হুইস্কির নেশার চেয়ে বেশি মাদক আবেশ আছে।

সন্দীপ বলে— দেখছ বিনায়ক, মন্দারকে আজ হাসপাতালের মড়াঘরের একটা দারোয়ানের মতো দেখাচ্ছে কী না ?

মন্দারের মুখের শান্ত হাসিটা থমথম করে।

বিনায়ক বলেন— হ্যাঁ, ঠিক, সেই রকমই দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু দাড়িটা কামিয়ে ফেললে...।

মন্দার বলে— দাড়ি কামাতে পয়সা লাগে।

সন্দীপ— শুনলে তো বিনায়ক, মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের যুক্তিটা ?

মন্দার হাসে, শুধু হাসে ! শান্ত নীরব হাসি। কিন্তু সন্দীপের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দটা যেন একটা নিগূঢ় তৃপ্তির ঝংকার।

সন্দীপের কোনও কথার কিংবা কোনও সঙ্কেতের অপেক্ষায় না থেকে, মন্দার হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরে রাখা বোতলটাকে কাছে টেনে নেয়। গেলাসে হুইস্কি ঢালে, এক চুমুকে খেয়ে ফেলে, ঢেঁকুর তোলে।

সন্দীপ বলে— আহা, কী নির্লোভ, কী লজ্জাশীল একটি সজ্জন এই মন্দার দত্ত। শুনছ বিনায়ক ?

বিনায়ক— বলো, বলো।

সন্দীপ— এই বিশ্বে, এমন চিজটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

মন্দার দত্ত তার হাতের কালো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে আর হাসে।

সন্দীপ— ছেলেবেলায় গল্পের বই-এর ছবিতে হাট্টিমাটিমটিম দেখেছিলাম। আমাদের মন্দার দত্ত হলেন একটি জ্যান্ত হাট্টিমাটিমটিম, যদিও চেহারাটা ভিন্ন রকমের।

মন্দার হাসে। সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে— আজ বেশ ভাল লাগছে।

সন্দীপ— কেন ?

মন্দার— কেন আবার কী ? তোমার সবই ভাল। তোমার বাবুর্চি, তোমার মালী, তোমার বেয়ারা, সবাই ভাল।

সন্দীপ— আমার নামটা করছ না যে ? আমি বুঝি ভাল নই ?

মন্দার— সেটা কি আর বলতে হবে ? তোমার মত মানুষ হয় না। এবার শুধু...।

সন্দীপ— এত লজ্জা করে হাসছ কেন ?

মন্দার— এবার শুধু তোমার মত ভাল কেউ একজন এবাড়িতে চলে আসুক।

সন্দীপ—শুনলে তো বিনায়ক, কী কথা বলছে মন্দার ?

বিনায়ক--- শুনেছি।

সন্দীপ— মন্দার এতদিনে এই প্রথম একটা ভাল কথা, মানুষের মত কথা বলল।

টেলিফোনের শব্দ বেজে উঠেছে। রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে কথা বলে সন্দীপ— কে ? দীপালি ? কী খবর ?...না, আজ নয়। কী বললে ? আশার পথ চেয়ে বসে থাকতে আর ভাল লাগে না ? তা তো লাগবেই না। কিন্তু আজ আমার অনেক কাজ আছে...হ্যাঁ, ওটাও কাজ, অস্বীকার করছি না।...না, কালও নয়। পরশু অর্থাৎ সোমবারে যাব...হ্যাঁ, অবশ্য অবশ্য।

পাইপের ধোঁয়া মুখ ভরে টেনে নিয়ে আর দুই চোখে একটা চকচকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ধরে নিয়ে কথা বলেন বিনায়ক— দীপালি ! এখন তবে হোয়ার ইজ সিপ্রা ?

সন্দীপ হাসে— যেখানে আছে, সেখানে আছে।

বিনায়ক— তার মানে বোধ হয় এই যে... ।

সন্দীপ— তার মানে যেখানে ছিল, সেখানে আছে। আমি আর কি করতে পারি বলো ?

॥ ৭ ॥

দীপালি সোমের জন্মদিন। টেবিলের উপর বিরাট আকারের একটি কেক। কেকের উপর রঙিন আইসিং-এর প্রলেপ যেন চমৎকার করে আঁকা একটি ছবি। সে ছবিতে হ্রদের নীল জলের উপর পঁচিশটা লাল পদ্ম ভাসছে। টেবিলের উপর পঁচিশটা ডালিয়ার পাশে পঁচিশটা মোমবাতি জ্বলছে।

দীপালির কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কথা বলে সন্দীপ। —আমি মনে করেছিলাম, বড়জোর আঠারোটা মোমবাতি জ্বলবে, তার বেশি নয়, কোনওমতেই নয়।

সন্দীপের পিঠে একটা চিমটি কেটে দীপালি হাসতে থাকে। —এ কথার মানে কী ? নিশ্চয় কোনও অষ্টাদশীর জন্যে তোমার প্রাণটা আইঢাই করছে।

সন্দীপ— একটুও না, কোনওদিন না, কখ্খনও না।

দীপালি— তবে একথা বললে কেন, উইকেড বয় ?

সন্দীপ— বুঝতেই তো পারছ, কেন বলেছি। দেড় বছর আগে তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল, এ মেয়ের বয়স আঠারোর বেশি হতে পারে না। দেড় বছর পরে দেখেও মনে হয়েছে— বয়স যা-ই হোক না কেন, চেহারাটা আঠারো।

দীপালি—একই কথা।

সন্দীপ— কার কথা ?

দীপালি— তোমার স্বপ্নের লোভটার কথা। ভাবছ, অষ্টাদশী খুব মিষ্টি। সুইট এইটটিন ! আহা সুইট এইটটিন !

সন্দীপ— টোয়েন্টিফাইভ ইজ সুইটার।

যে দীপালির সঙ্গে আজ এখন অত অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলছে সন্দীপ, দু'মাস আগে তার নামও জানত না ; যদিও দেড় বছর আগে তাকে শুধু চোখে দেখবার একটা ব্যাপার ঘটেছিল। দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরবার পথে সন্দীপকে যখন পালাম এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল, তখন এক বৃদ্ধ বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে সন্দীপের কিছু বার্তালাপ হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম মহাদেব সেন। মহাযুদ্ধের কয়েকটা বছর মিলিটারির জন্যে দু'লক্ষ তাঁবুর অর্ডার সাপ্লাই করে, এবং আরও পাঁচ-সাতটা কাজ-কারবার করে নিয়েই মহাদেব সেন সেই যে বিরাম গ্রহণ করলেন, আজও তিনি সেই বিরামের মধ্যে রয়েছেন।

মহাদেব সেন বলেছিলেন— আমরা যাচ্ছি শ্রীনগরে ছেলেকে দেখতে। ছেলে হল আর্মি মেডিকাল-কোরের কর্নেল। প্রতি মাসে ফরোয়ার্ড এরিয়া থেকে মাত্র একদিনের জন্যে শ্রীনগরে আসবার অনুমতি পায়। সেইজন্যে আমরাও প্রতি মাসে দু'একদিনের জন্যে শ্রীনগরে যাই, ছেলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়। কলকাতায় আলিপুরে আমার একটা বাড়ি আছে বটে, তবে থেকেও লাভ নেই। আমরা এখন দিল্লিতেই থাকি।...আপনার ব্যাঙ্ককে বলে বাড়িটাকে বিক্রি করিয়ে দিতে পারবেন ?

ভদ্রলোক তখনি তাঁর পকেট থেকে বের করে তাঁর নামের যে কার্ড সন্দীপের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে আলিপুরের বাড়ির নাম আর ঠিকানাও ছিল।

সন্দীপ—অ্যাঁ ? বাড়ির নাম এমসেন ? আমি এই বাড়ি দেখেছি। এতদিনে বুঝলাম, বাড়িটার নাম এমসেন কেন ?

মহাদেব সেন একটু হেসে নিলেন। —মিলিটারির যত সাহেব অফিসার সবাই আমাকে এমসেন বলে ডাকত। নামটা আমারও খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই নতুন বাড়িটাকেও এমসেন নাম দিয়ে দিলাম।

সন্দীপ— সুন্দর বাড়ি।

এমসেন— সুন্দর বাড়ি তো বটে, কিন্তু একেবারে খালি বাড়ি।

সন্দীপ—ভাড়া দিয়ে দিন না।

এমসেন— না। হয় বেচে দেব, নয় খালি পড়ে থাকবে।

শ্রীনগরের প্লেন ছাড়বার সময় যখন হয়ে এসেছে, ঠিক তখন এমসেন তাঁর আত্মপরিচয়ের পারিবারিক বিবরণ খুব তাড়াতাড়ি ও খুব সংক্ষেপ করে শুনিয়ে দিলেন। —এই সব বাচ্চা-কাচ্চা আমার নাতি-নাতনী, আমার ছোট মেয়ের ছেলে-মেয়ে। আর ওই যে মেয়েটি এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে গল্প করছে, ওটি হল আমার বড় মেয়ের মেয়ে।

যে মেয়েকে সেদিন এয়ার-হোস্টেসের সঙ্গে গল্প করতে দেখেছিল সন্দীপ, সেই মেয়েই হল আজকের এই দীপালি সোম। স্বামীর সঙ্গে বিয়ের বিচ্ছেদ হবার পর এমসেনের বড় মেয়ে যখন আবার বিয়ে করে নতুন স্বামীর ঘরে চলে গেলেন, তখন তিনি তাঁর দশ বছর বয়সের মেয়ে দীপালিকে তার দাদুর ঘরে রেখে দিয়ে গেলেন। দীপালি তাই দাদুর অজস্র আদরের আলো দিয়ে লালিত একটি দীপ। দাদু ডাকেন, দীপ। সে ডাক শুনে সন্দীপও দীপালিকে এখন 'দীপ' বলে ডাকে।

এমসেনের ছোট জামাইয়ের চাকরিটা হল এক ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানির চাকরি। এ বছর সিঙ্গাপুর, সে বছর আবাদান, পরের বছর কলম্বো ; চাকরিটা যেন অস্থিরতার বিশ্ব-পরিক্রমা। ছোট মেয়েকে তার স্বামীর সঙ্গে থাকতে হয়। লেখাপড়ার স্থায়ী সুযোগের দরকারে তাঁর ছেলেমেয়েরা দাদুর কাছে স্থায়ী আশ্রয়ে থাকে। রব, রিটা, লোলা আর সোনা।

আজ থেকে দু'মাস আগের যে রাতে সন্দীপ রায়ের চকচকে ক্যাডিলাকের ভিতর থেকে সিপ্রা চৌধুরী শেষবারের মত নেমে চলে গিয়েছিল, সেই রাতেই তো আলিপুরের 'এমসেন'-এর ব্যালকনিতে চাঁদবাতির জ্যোৎস্না দেখেও সন্দীপের মনে প্রশ্নটা চমকে উঠেছিল, সেই এমসেন কি সত্যিই সপরিবারে দিল্লি থেকে আবার আলিপুরে ফিরে এসেছেন ?

পরের দিনই সকালবেলা টেলিফোন করে জানতে পেরেছিল সন্দীপ, না, বিক্রি হয়ে যায়নি বাড়িটা। এমসেনই সপরিবারে ফিরে এসেছেন। আর সেই যে সেই সকালবেলাতে আলিপুরে গিয়ে এমসেনের সঙ্গে দেখা করে আর খুশি হয়ে চা খেয়েছিল সন্দীপ, তারপর আর বোধ হয় ভেবে দেখবার মত একটু সময়ও পায়নি যে, কিংবা ভেবে দেখবার ইচ্ছাও হয়নি যে, রাসেল স্ট্রিটের একটি ল্যাম্পপোস্টের কাছে ফুটপাথের উপর এখনও কেউ দাঁড়িয়ে থাকে কী থাকে না।

দীপালি সোমের সঙ্গে সন্দীপের এই দুই মাসের মেলামেশার জীবন যেন একটা উৎসবের জীবন। তার মধ্যে আবেশ আবেগ ও আকুলতার কী না আছে ! ক্যাডিলাকের অক্লান্ত ছুটোছুটি তো আছেই ; গান আছে, ফুল নিয়ে লোফালুফি আছে, তুলোর বল নিয়ে পিটাপিটির খেলাও আছে, আর ব্যালকনির উপরে চাঁদবাতির জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে গলা জড়াজড়ির দৃশ্যও আছে। সামনের বাড়ির জানালা থেকে উঁকি-দেওয়া একটা মেয়েলি মুখের ছায়া চমকে ওঠে আর সরে যায়। দীপালি সোম বলে— দেখেছে তো বয়ে গেছে।

দাদু এমসেন বলেছেন— ওর নামটা যদিও দীপালি, ওকে আমি যদিও দীপ বলে ডাকি, ওর বিউটি যদিও সত্যিই একটা দীপই বটে, তবু ওকে আমার মাঝে-মাঝে পাগলি-ঝোরা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। ওর আনন্দটা বড়ই চঞ্চল। চাণক্যপুরির রাস্তায় একবার ট্রাফিক-পুলিশের সিগন্যাল তুচ্ছ করে এত জোরে গাড়ি চালিয়েছিল যে, আর একটু হলে...।

মাথা দুলিয়ে হেসে উঠেছে দীপালি— না সন্দীপ, আর একটু হলেও কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হত না। দাদু যতই ভয় করুক, আর আমি যত জোরে গাড়ি চালাই না কেন, অ্যাক্সিডেন্ট আমার কোনওদিন হয়নি, হয় না, হবেও না।

সন্দীপের মনে হয়েছে, এমসেনের এই বেশ-সুন্দর নাতনীর পাগলি-ঝোরা স্বভাবটা আরও সুন্দর। সত্যি, দীপালি সোমের প্রাণটা যেন ক্লান্তিহীন আবেগের ঝর্না, বেড়াতে বের হয়ে কোথাও পাঁচ মিনিটও থেমে থাকতে চায় না। এক-একদিন রেড রোডে রাত দশটার নীরবতার উপর যেন রাগ করে হেসে ওঠে দীপালি। মোটর গাড়িটার গায়ে আস্তে একটা চড় মেরে ছটফটিয়ে ওঠে।

—এই মরুভূমির মধ্যে আর এক মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। চলো, তোমার অরোরা কিংবা কলরডোর জ্যাজ শুনি।

দেখে খুশি হয়েছে সন্দীপ, পাঁচ মিনিট জ্যাজ শুনেই ছটফট করে উঠেছে দীপালি। সন্দীপের হাত ধরে টেনেছে— চলো।

রাতের চৌরঙ্গির পথে হাজার লোকের চোখের উপর দীপালির কোমরে হাত রেখে চলতে চলতে সন্দীপ যেন শুনতে পায়, বুকের ভিতরে অদ্ভুত এইরকম একটি সঙ্গিনীর জন্যেই তো ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তোমার জীবনের উপোসি আশাটা। উপরে একেলে রুচির জলুস, আর ভিতরে সেকেলে রুচির অন্ধকার, এমন দো-আঁশলা প্রাণের মেয়ে নয় দীপালি।

দীপালি একবার নয়, অনেকবার বলেছে— আমার মনে কিন্তু একটা ভয় আছে, সন্দীপ।

—ভয় ? সে কি ? কিসের ভয় ?

—ভয় এই যে, তুমি একদিন হয়ত চট করে বলে ফেলবে : চলো, এবার একদিন ছাঁদনাতলায় দাঁড়াই।

—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, কোনওদিনও ওকথা বলব না।

—তোমার সঙ্গে যেখানেই যাই আর যেখানেই দাঁড়াই, ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

দীপালির কথা শুনে সন্দীপের প্রাণ যেমন বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে, তেমনই নির্ভয় আনন্দে ভরে গিয়েছে।

আলিপুরের বাড়ির লনে ঘুরে-ফিরে সঙ্গিনী দীপালির সঙ্গে সন্দীপের গল্প করবার ইচ্ছেটা এক-একদিন থামতেই চায় না। বিকেল থেকে শুরু হয় গল্প, আর রাত ন'টায় দাদু এমসেনের ডাক শুনে গল্পের আনন্দটা চমকে ওঠে। এমসেন ডাক দিয়েছেন— ভেতরে এসো, বৃষ্টি পড়ছে।

তাই তো, সত্যিই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু ভেতরে এসে বসলেও গল্প করবার আবেগটা বসে পড়ে না। বাইরের বৃষ্টির মত গল্প করবার মুখর আনন্দটাও ঝুরুঝুরু করে ঝরে পড়তে থাকে।

সন্দীপ বলে— দাদুর কাছে শুনলাম, তুমি নাকি ক্লে-পিজিয়ন শুটিং-এ ফার্স্ট হয়েছিলে ?

দীপালি— হ্যাঁ, তিনবার ফার্স্ট হয়েছি।

হাত দুটোকে হঠাৎ একটা রাইফেল তোলার ভঙ্গিতে তুলে ধরে, আর সন্দীপের বুকের দিকে তাক করে হাসতে থাকে দীপালি—এতদিন শুধু মাটির পায়রা বধ করেছি, এবার বালিগঞ্জের একটা জীবন্ত পায়রাকে বধ করব।

সন্দীপ— সে পায়রা বেচারা তো বধ হয়েই গিয়েছে। আবার কেন ? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আলিপুরের পায়রা কি এখনও বধ হয়নি ?

পাগলি-ঝোরার চঞ্চল হর্ষের কলস্বর হঠাৎ যেন একটু নিবিড় হয়ে ছলছল করে, দীপালি বলে— সে কথা আর জিজ্ঞেস করছ কেন ? সত্যি, আমি কোনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, একটা অচেনা মানুষকে একদিনেই এত ভাল লেগে যাবে।

বাড়িয়ে বলেনি, দীপালি। সেই প্রথম দিন, যেদিন এমসেনের বাড়িতে এসে চা খেয়েছিল সন্দীপ, সেদিন দীপালি শুধু একবার সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই দাদুর চেয়ারের গা-ঘেঁষে আর চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। দাদু যখন বললেন, এবার আমাদের দীপের একটা গান শোনো সন্দীপ, শুধু তখন একবার চমকে উঠে আর হেসে হেসে, সন্দীপের মুখের দিকে আরও ভাল করে তাকিয়ে দাদুর কথার জবাব দিয়েছিল দীপালি। —উনি গান শুনতে ভালবাসেন কি না, জানি না।

সন্দীপ—খুব ভালবাসি।

কী সুন্দর স্বরে আর কী চমৎকার ভঙ্গিতে কথাটা বলেছে সন্দীপ। শুনে মনে হয়েছিল দীপালির, গানকে নয়, সন্দীপ যেন দীপালিকেই বলছে, খুব ভালবাসি।

একবার অবশ্য সন্দেহ হয়েছিল দীপালির, এটা হয়ত দীপালির মনের একটা আশার কুহকের কথা। সন্দীপ রায় শুধু চা খেয়েই চলে যাবার জন্যে এসেছেন। শুধু দাদুর কথার মানরক্ষা করবার জন্যে গান শুনতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু দীপালি তার মনের এই মুহূর্তের মুগ্ধতার কাছে অস্বীকার করতে পারেনি যে, শুধু দাদুর ইচ্ছেটা নয়, দীপালিরও খুশি-মনের ইচ্ছেটাও সন্দীপ রায়কে গান

শোনাতে চাইছে।

দীপালি হাসে— আমি কি এই চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে গান গাইব ?

এমসেন ব্যস্তভাবে বললেন— না না, তোমরা দু'জন এখন ওই ঘরে গিয়ে বসো।

দাদুর ব্যস্ততা ও আগ্রহের রকম দেখে দীপালির আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, দাদুর প্রাণটা নাতনীর প্রাণের আগেই সন্দীপকে পছন্দ করে ফেলেছে। কুঁড়ি ধরতে আর ফুল ফুটতে একটুও সময় নিল না, আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। কিন্তু একটুও খারাপ আশ্চর্য বলে তো মনে হচ্ছে না। কারোলবাগের 'হামেশা বাহার' নামে লেডিজ ক্লাবটা যেদিন একটু উদার হয়ে নারী-পুরুষের মিক্সড় ক্লাব হয়ে গেল, আর পুরনো নিয়মটাকে শুধরে দিয়ে প্রস্তাব নিল যে, এবার থেকে বিবাহিত মেয়েরা তাদের স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে আসতে তো পারবেই এমন কি ইচ্ছে করলে কুমারী মেয়েরা তাদের বয়-ফ্রেন্ডকেও সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের আনন্দে সামিল হতে পারবে, সেদিন এমন কিছু খুশি হতে পারেনি দীপালি। বরং একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল যে, হিমাংশু মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের ভিতরে ঢুকলে সবাই মনে করবে যে, এই বুঝি দীপালি সোমের ফ্রেন্ড। হিমাংশুকে এড়িয়ে একা একা ক্লাবে আসবার আশা কম। বড্ড ছিনেজোঁক স্বভাবের মানুষ এই হিমাংশু। ফ্যান্সি ড্রেসের আসরে মথুরার গয়লানি সাজবে বলে মনে করেছিল দীপালি। হিমাংশুও অদ্ভুত একটা জেদ ধরে বসল, সে মথুরার গয়লা সাজবে। দূর দূর রাগ করে ফ্যান্সি ড্রেসের অনুষ্ঠানের দিনে ক্লাবেই যায়নি দীপালি। আর, অজিত খোসলার আশাও একটা বলিহারি জেদ। এক বছর ধরে অকারণে দৌড়াদৌড়ি করেছে অজিত। রোজই একবার এমসেনের কারোলবাগের বাড়িতে হাজিরা দিয়েছে। কারোলবাগের কাকও এত নিয়মিত সময়ে আর এত লোভী হয়ে কারও বাড়িতে আসে না। বাড়ির বাইরের ঘরে, যে ঘরে টিউটরের কাছে বসে লেখাপড়া করে রব আর রিটা, সেই ঘরের ভিতরে একটা গদিহীন চেয়ারের উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় পার করে দিয়েছে অজিত। দীপালি শুধু একবার ওই ঘরের ভিতরে এসে অজিতের সামনে বড় জোর দু'-তিন মিনিট দাঁড়িয়েছে আর হেসে হেসে কথা বলেছে— ছবি আঁকতে অজন্তা যাচ্ছেন কবে ?

অজিত হাসে— আগে আপনার ছবি আঁকব, তারপর যাব।

দীপালি— কবে আঁকবেন বলে আশা করেন ?

অজিত— আপনি যেদিন বলবেন।

দীপালি— তবে সেই আশাতেই থাকুন।

হঠাৎ কথা ফুরিয়ে দিয়ে আর হাসির ফোয়ারা উথলে দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গিয়েছে দীপালি। আর, অজিত খোসলা সেই হাসির ফোয়ারার শব্দ শুনে যেন ধন্য হয়ে চলে গিয়েছে। পরদিন আবার এসেছে।

ফ্লাইং-অফিসার কুশল সিং-এর প্রেমিকা মঙ্গলার কাছে অজিত খোসলার কথা বলতে গিয়ে বার বার হেসে ফেলেছিল দীপালি। মঙ্গলা বলেছিল— ওকে দৌড়তে দাও, তুমিও শুধু ওইরকম একটু হেসে ওকে আরও দৌড় করিয়ে হয়রান করে দাও। তারপর নিজেই সরে যাবে।

তাই হয়েছিল। এক বছর ধরে দৌড়াদৌড়ি করবার পর অজিত খোসলা আর আসেনি। ছবি আঁকতে অজন্তা চলে গেল। জানে না দীপালি, ফিরে আর দিল্লিতে কখনও এসেছিল কি না অজিত।

সন্দীপকে দেখে প্রথম দিনেই দীপালি সোমের মনে ফুলবনের হঠাৎ উতলা বাতাসের মত সাড়া জাগিয়ে যে ইচ্ছেটা দেখা দিয়েছিল, সে ইচ্ছে কোনও দিনও আর কাউকে দেখে কখনও দীপালির মনে দেখা দেয়নি। তাই সন্দীপকে গান শোনাতে কোনও কুণ্ঠা বোধ করেনি। পর পর দুটি গান গেয়েছিল দীপালি। 'বাঁধিয়ে কী দিয়ে, রেখেছো হৃদি এ' ; তারপর 'দিল মেরে দিওয়ানা'।

প্রথম দিনেই দীপালির গানের মধ্যে অকুণ্ঠ অভ্যর্থনার যে স্বাদ পেয়েছিল সন্দীপ, সে স্বাদ এই দুই মাসের মেলামেশার মধুরতায় আরও মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। কেনই বা না হবে ? দীপালির মুখের দিকে তাকিয়ে কোনওদিনও সামান্য একটু গম্ভীরতার ছায়া দেখতে পায়নি সন্দীপ। কোনওদিনও কোনও আনমনা ভাবনার ছায়া দীপালির চোখেমুখে ফুটে উঠতে দেখেনি। দীপালির মনপ্রাণ যেন সর্বক্ষণ

হাসছে। সন্দীপের সঙ্গিনী হয়ে ছুটোছুটি করবার এই জীবনের মধ্যেই দীপালি তার প্রাণের সবচেয়ে বড় আনন্দের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে।

দীপালির জন্মদিনের পরদিনের বিকেলবেলাটা যে এত সুন্দর হয়ে দেখা দেবে, ভাবতেই পারেনি দীপালি। বর্ষাকালের কলকাতার ভাগ্যে এরকম ঝলমলে বিকেল একটা দৃশ্যের মত দৃশ্য বটে। বাইরে বের হবার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল দীপালি। কিন্তু কী আশ্চর্য, আজ যেন মনের ভুলে বেশ একটু অদ্ভুত রকমের সাজ করে ফেলেছে। ক্রিম মাখানো ফাঁপানো চুলের স্তবক নয়, ডবল বেণী। ফুরফুরে স্বচ্ছ মসলিনের সেই জেব-উন্নিসা নয়, একটা লালপেড়ে ধনেখালি, আঁচলটা কোমরেতে এক পাক জড়ানো। গায়ে সেই ছোট রেশমি চোলির একফালি আবরণ নয়, একটা ব্লাউজ। কপালে কুমকুমের টিপ। দেখে সন্দেহ হতে পারে, দীপালি সোম বুঝি ইচ্ছে করে এরকম মূর্তিমতী আটপৌরেটি হয়ে কোনও ফ্যান্সি ড্রেসের আসরে গিয়ে চমক সৃষ্টি করবার মতলব ধরেছে।

সন্দীপ এসেই চমকে ওঠে— এ কী ?

দীপালি হাসে— মন্দ কী ?

সন্দীপ— মন্দ না হোক, ভালও নয়। এরকম সাজে দীপকে বেশ একটু নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে।

দীপালি বলে— যেমনই দেখাক, আজ এই রকমই সাজবার শখ হল।

সন্দীপ— কিন্তু...।

দীপালি— কিন্তু আবার কী ? অত খুঁটিয়ে চিন্তা করছ কেন ? বাইরে গিয়ে এই বিকেলবেলার আলোতে ময়দানের কাছে একবার দাঁড়াই, তখন বলো, কেমন দেখাচ্ছে তোমার দীপালিকে।

সন্দীপের একটা হাত ধরে টান দিয়ে, আর কলকল হাসির ফোয়ারা উথলে দিয়ে কথা বলে দীপালি— না ময়দানে নয়, আজ তোমার সঙ্গে অনেক দূরে চলে যাব। চলো, ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে যত দূর পারি চলে যাই। সূর্য ডুবলেই ফিরে আসব।

হেসে ওঠে সন্দীপ, দীপালির কাঁধে হাত রাখে। —বাঃ, তোমার মুখ থেকে একথা শোনবার জন্যেই তো কান পেতে রয়েছি।

বাড়িয়ে বলেনি সন্দীপ। সন্দীপের প্রাণটাই হেসে উঠেছে, যেন মেঘমুক্ত নীলাকাশের হাসি। দীপালির কলকল হাসির শব্দের মধ্যে পাগলি-ঝোরার প্রাণের এক ঝলক হর্ষের শব্দ শুনতে পেয়েছে সন্দীপ।

দীপালি বলে— চলো।

সন্দীপ বলে— চলো, আর দেরি করে লাভ নেই।

॥ ৮ ॥

ডায়মন্ডহারবার রোডের পাশে একটা ধানক্ষেতের কাছে এসে থেমে পড়েছে সন্দীপের ক্যাডিলাক। এদিকে ধানক্ষেতের জলের মধ্যে নীলকলমি ফুটে রয়েছে। ওদিকে ধানক্ষেতের শেষ সীমাটা গাছপালা নিয়ে ডুবন্ত সূর্যের লাল আভার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সন্দীপের পাশে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে ডুবন্ত সূর্যের ছবি দেখছে দীপালি। বড়ই শান্ত আর বড়ই স্থির, দীপালির এই মূর্তি।

একটুও হাসছে না দীপালি, কোনও কথাও বলছে না। আকাশের রঙিন আভা দীপালির মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে ঠিকই। কিন্তু দীপালি তো এতক্ষণের মধ্যে একবারও সন্দীপকে জিজ্ঞাসা করল না, বলো এবার কেমন দেখাচ্ছে আমাকে ? জিজ্ঞাসা করলে বেশ স্পষ্ট করেই বলে দিতে পারবে সন্দীপ, না, মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না।

দীপালি কি সত্যিই কিছু ভাবছে ? না, শুধু মনে মনে ওর নিঃশ্বাসের শব্দগুলিকে শুনছে ? ইচ্ছে হয় সন্দীপের, দীপালির এই শান্ত ও স্তব্ধ মূর্তির কাঁধটাকে আস্তে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে যে, এদিকে এভাবে আর বেশি সময় নষ্ট করলে ওদিকে কলরডোর জ্যাজ ফুরিয়ে যাবে। ডুবন্ত সূর্যের ছবিটার মধ্যে কী এমন বিস্ময় আছে যে, ওরকম অপলক চোখে তাকিয়ে দেখতে হবে।

দেখতে পায় সন্দীপ, দীপালির এতক্ষণের শান্ত মুখটা বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কেন ? ভুরু

দুটোই বা এমন করে কুঁচকে রয়েছে কেন ? দুঃসহ অস্বস্তিটাকে আর সহ্য করতে না পেরে ডাক দেয় সন্দীপ—দীপ।

কী অদ্ভুত ব্যাপার। সাড়া দেয় না কেন দীপালি ? ডুবন্ত সূর্যের রাঙা আলোর জাদুতে কি বোবা হয়ে গিয়েছে দীপালি ? না, কান দুটোই বধির হয়ে গিয়েছে ?

চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ— দীপ, শুনছ ?

দীপালি— শুনছি, বলো।

সন্দীপ— চলো, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই।

দীপালি— সত্যিই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ইচ্ছে করছে, বসে পড়ি।

সন্দীপ— কোথায় বসবে ? সড়কের এই ধুলোর উপর ?

হাসতে চেষ্টা করে দীপালি—তা...আজ না হয় ধুলোর উপর একটু বসলামই।

সন্দীপ— তোমার এই কিম্ভুত আটপৌরে সাজ দেখে আমার ঠিক এই ভয়ও হয়েছিল যে তুমি আজ একটা কিম্ভূত কাণ্ড না করে ছাড়বে না।

দীপালি— তবে চলো, ফিরেই যাই।

সন্দীপের ক্যাডিলাক আবার শব্দ করে কলকাতার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছুটতে থাকে। দীপালি বলে– আজ কিন্তু আমি আর কোথাও যাব না। কলরডোর জ্যাজ না হয় আর একদিন শোনা যাবে, আজ থাকুক।

সন্দীপ— কেন ?

দীপালি— আজ আর ইচ্ছে করছে না !

সন্দীপ— ইচ্ছেই বা করছে না কেন ?

দীপালি— কিছু মনে করো না, আজ সত্যিই বেশ ক্লান্তি বোধ করছি।

চমকে ওঠে সন্দীপের বুকটা। দীপালির মুখে ক্লান্তির কথা ! এ যে একটা মিথ্যে পৃথিবীর বাজে ঠাট্টার প্রতিধ্বনি। পাগলি-ঝোরার জল কি গতি হারিয়ে হঠাৎ একটা হ্রদ হয়ে গেল, কোনও পদ্মফুল ফুটবে আশা করে ?

আলিপুরের এমসেনের ফটকের কাছে এসেই থেমে যায় ক্যাডিলাক, ভিতরে আর ঢোকে না। নেমে যায় দীপালি, সন্দীপ কিন্তু স্টিয়ারিং চাকাতে হাত রেখে সিটের উপর বসেই থাকে।

দীপালি— এ কী ? তুমি নামবে না ? ভিতরে যাবে না ?

সন্দীপ— তুমি আজ বড়ই ক্লান্তি বোধ করছ। তোমাকে আর বিরক্ত করা উচিত নয়।

দীপালি— ছি-ছি, তুমি খুবই ভুল বুঝেছ। তোমার কাছে বসে থাকতে তো ক্লান্তি নেই। তোমার যতক্ষণ ইচ্ছে থাকো, যতক্ষণ ইচ্ছে আমাকে বসিয়ে রাখো। আমার তাতে কোনও ক্লান্তি হবে না, একটুও না।

গাড়ি থেকে নেমে আর দীপালির সঙ্গে হেঁটে বারান্দার উপরে উঠতেই থমকে দাঁড়ায় সন্দীপ। —আজ আর উপরে যাব না, দীপ, এখানেই বসি।

দীপালি— বেশ তো, এখানেই বসি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে বারান্দার দেয়ালের গায়ের আলো নিবিয়ে দেয় দীপালি।

—এ কী করলে ? চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ।

দীপালি— মনে হচ্ছে, সামনের বাড়ির জানালাতে একটা ছায়া দাঁড়িয়ে আছে আর এদিকে তাকিয়ে আমাদের দু'জনকে দেখছে।

সন্দীপ— দেখুক না, তাতে আমাদের কিসের ক্ষতি ?

দীপালি— না সন্দীপ, ওরকম করে কেউ আমাদের দু'জনকে দেখবে কেন ? আমরা কি দুটো আশ্চর্য প্রাণী ?

—তোমার ক্লান্তির রহস্যটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছি।

—কী বুঝলে ?

—আমার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যেতে তোমার আর ইচ্ছে হচ্ছে না।

—না, অনেক তো হল। আর কেন ?

—কিন্তু এরকম ঘরকুনো হয়ে আর থিতিয়ে বসে থাকাই কি ভালবাসার একমাত্র নিয়ম ?

—না, তা নয়, কিন্তু সর্বক্ষণ ছুটোছুটি করাই কি একমাত্র নিয়ম ?

—বুঝতে পারছি না, দীপ ; তোমাকে আজ এরকম একটা তর্কের ভূতে ধরেছে কেন ? তুমি তো কোনওদিনও এরকমের একটিও কথা বলনি।

—খুব সত্যি কথা, কোনওদিনও বলিনি।

—বরং ঠিক এর উল্টো কথা বলেছিলে।

—বলেছিলাম।

—তবে আজ আবার হঠাৎ মিছিমিছি...।

—আজ হঠাৎ মনে হয়েছে যে...।

সন্দীপ বলে— বলো, আজ হঠাৎ কী মনে হয়েছে ?

কথা বলতে গিয়ে দীপালির গলার স্বর যেন নিবিড় হয়ে ভরাট হ্রদের জলের মত টলমল করে।

—মনে হয়েছে, তোমাকে আমি ঠকাচ্ছি।

সন্দীপ— তার মানে ?

দীপালি— তোমাকে আমি খুব বেশি ছুটোছুটি করিয়েছি। আর তুমিও অদ্ভুত, শুধু ছুটোছুটি করেই খুশি হয়েছ।

সন্দীপ— খুশি হওয়া উচিত, তাই খুশি হয়েছি। তোমারও খুশি থাকা উচিত।

দীপালি— না।

সন্দীপ— তবে কি ছাঁদনাতলায় যাওয়া উচিত ?

দীপালি— ওরকম তুচ্ছ করে কথাটা বলো না।

সন্দীপ— তুমিই একদিন ছাঁদনাতলাকে তুচ্ছ করে আর ঠাট্টা করে বলেছিলে যে, ওটা একটা ফাঁসিতলা।

দীপালি— বলেছিলাম, খুব ভুল কথা বলেছিলাম। তখন তো ধারণা করতে পারিনি যে, তোমার জন্যে আমার মনে অন্য রকমের একটা মায়া এসে আমাকে এত ভাবিয়ে তুলবে।

হেসে ফেলে সন্দীপ।— অন্য রকমের মায়া! কথাটা শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু...

—কিন্তু কী ?

—অন্য রকমের মায়াটা সাত তাড়াতাড়ি একটা বাঁধাবাঁধির ব্যাপার হয়ে উঠলে ভাল হয় না।

—খারাপই বা কী হয় ?

—সেটা তোমাকে আমি শতকথা বলেও বোধ হয় বোঝাতে পারব না।

—কেন পারবে না ?

—তোমার মত মেয়ের মনেও একটা সেকেলে গোঁয়ার্তুমি লুকিয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

—সেকেলে ?

—হ্যাঁ।

—ভালবাসার মানুষটা যদি বিয়ে করতে চায়, তবেই কি সেটা একটা সেকেলেপনা হয়ে গেল ?

—আমি ঠিক ওকথা বলছি না।

—তবে কী বলছ ?

—আমি বলছি, একটু দেরি করা উচিত।

—দেরি করে লাভ কী ?

—লাভ আছে। দেরিটা হল ভালবাসার পরীক্ষা।

—দুটো মাস তো পার হয়েছে। পরীক্ষার যা কিছু ছিল, তাও হয়ে গিয়েছে।

—আমি এখনও ঠিক স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি না দীপ, তুমি কী বলতে চাইছ।

—তুমি তোমার মার কাছে আমার কথা কোনওদিন বলেছ ?

—না।

—এবার তবে বলে দাও।

—আরও দু'তিনটে মাস দেরি করলে কি ভাল হয় না ?

—আর দেরি করতে ইচ্ছে করছে না। বিশ্বাস করো সন্দীপ, আমি বড্ড ক্লান্ত। আর ছুটোছুটি না করে তোমার বুকের উপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

দীপালির শেষ কথাটা যেন ছোট একটা উচ্ছ্বাসের মত শব্দ তুলেই নীরব হয়ে গেল। হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল নাকি দীপালি ? কিংবা ঢোঁক গিলে একটা নিঃশ্বাসকে বুকের ভিতর আটকে রেখে দিল ? বারান্দায় অন্ধকার, তাই দেখতে পায় না সন্দীপ, ক্লে পিজিয়ন শূটিং-এ তিনবার ফার্স্ট হয়েছে যে মেয়ে, সে মেয়ের চোখের পাতা কেমন করে ভিজে যায়।

সন্দীপ— সত্যি যদি বুকের উপর শুয়ে পড়বার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে শুয়ে পড়লেই তো হয়। বাধা কোথায় ? অসুবিধেরই বা কী আছে।

দীপালি— ছি সন্দীপ, এরকম ভয়ানক কথা বলতে নেই। তুমি নিশ্চয় আমার উপর রাগ করে কথা বলছ। না, রাগ করো না সন্দীপ।

সন্দীপ বলে— আচ্ছা, আমি এখন চলি।

দীপালি— এসো। মা কী বললেন, সে কথা আমাকে কিন্তু কালই বলবে।

সন্দীপ— মা যদি বলেন, না, এখনই নয়। কিংবা কোনওদিনও নয়, তবে ?

দীপালি— তবে আমি নিজেই তোমার মার কাছে যাব আর বলব যে, আমি তো একটা রকেট নই মা, আমি মানুষেরই মেয়ে। একটা শূন্যের মধ্যে আর কতকাল ছুটে বেড়াতে পারি, বলুন ?

সন্দীপ— আচ্ছা।

॥ নয় ॥

মৃদু ঝড়ের বাতাস হঠাৎ এক-একবার মত্ত হয়ে উঠছে। বাগানের শিরীষের মাথা থেকে শুকনো পাতার এক একটা ঝটকা জানালা পার হয়ে ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ছে। সন্দীপের গেলাসের ভেতরেও কয়েকটা শুকনো পাতা ভাসছে। গেলাসের হুইস্কির এই অবস্থার চেহারাটা সন্দীপের চোখে বোধ হয় পড়েনি। তাই গেলাসটাকে হাতে ধরেই বসে আছে। যে চিন্তার ঝঞ্ঝাট থেকে এইমাত্র মুক্ত হয়ে গিয়েছে সন্দীপের উদ্বিগ্ন মন, সে চিন্তার একটা আবছায়া এখনও মুখের আর চোখের উপর থমকে রয়েছে।

এই দশ দিনের মধ্যে আলিপুরের এমসেনের বাড়িতে আর যেতে পারেনি সন্দীপ। টেলিফোনেও দীপালিকে কোনও কথা বলতে পারেনি। দীপালিও এই দশদিনের মধ্যে একবারও টেলিফোন করে সন্দীপকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করেনি। একটুও স্বস্তি বোধ করতে পারেনি সন্দীপ। সব সময় মনের মধ্যে একটা ভয় ছমছম করেছে, এই বুঝি দীপালির অদ্ভুত জিজ্ঞাসার কথাটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল। রাস্তার গাড়ির শব্দ শুনে চমকে উঠতে হয়েছে, এই বুঝি এমসেনের বাড়ির গ্যারেজের সেই কড়া রঙের টুরার ছুটে এল।

দশদিন পর আজ এইমাত্র, এই পাঁচ মিনিট হল, দীপালির জিজ্ঞাসার কথাটা টেলিফোনে বেজে উঠেছে। —কে ? সন্দীপ ?

সন্দীপ—হ্যাঁ, আমি।

—তোমার কি অসুখ করেছে ? শরীর ভাল নয় ?

—অসুখ করেনি, শরীর ভাল আছে।

—কাজের চাপ বেড়েছে ?

—না।

—তবে এলে না কেন ? আসছ না কেন ?

—তুমি কি আজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে একটা ছবি দেখতে যেতে পারবে ?

—না।

—কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে।

—যেও।

—আর কি কিছু তোমার জিজ্ঞেস করবার আছে ?

—না।

—তবে আর...।

—তবে শোনো, শুধু একটি কথা বলতে চাই।

—বল।

—আমি কোনওদিন ভুলেও আপনার মার কাছে গিয়ে কোনও কথা বলব না।

—কী বললে ?

—আপনি এখন একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন, মিস্টার রায়। আপনার নাম করে কোনও কথা কারও কাছে বলতে, আমার নিজের কাছেও বলতে, আমার মনে একবিন্দু ইচ্ছেও আর নেই।

খট করে একটা শব্দ করে স্তব্ধ হয়ে গেল টেলিফোন। বুঝতে কোনও অসুবিধে নেই, দীপালির শেষ জিজ্ঞাসার সব কথা শেষ হয়ে গিয়েছে, রিসিভার নামিয়ে দিল দীপালি।

সন্দীপের এই দশদিনের ভয় আর অস্বস্তির তো সমাধি হয়ে গেল। তবু সন্দীপের চিন্তান্বিত মুখটা এখনও পরিচ্ছন্ন ও প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারেনি। আলিপুরের এমসেনের নাতনীর ভেলকি দেখে আশ্চর্য হয়েছে সন্দীপ। কী ভয়ানক ভেল্‌কি ! জেব-উন্নিসা মসলিন এক মুহূর্তের মধ্যে আটপৌরে ধনেখালি হয়ে গেল ! সন্দীপের নিশ্চিন্ত প্রাণের বিশ্বাসটাকে হঠাৎ এভাবে অপমানিত করতে দীপালির একটুও বাধল না। দীপালির ভেলকি যেন একটা হিংস্র নখর, সন্দীপের জীবনে সুস্বপ্নটাকে ছিঁড়ে দিয়েছে।

বিনায়ক যদি জিজ্ঞাসা করে, কী হল, দীপালিকে বিয়ে করতে তোমার অনিচ্ছা কেন,— তবে জবাব দিতে পারবে সন্দীপ— না অনিচ্ছা নেই, তবে ভয় আছে।

ভয় এই যে, বিয়ে হয়ে যাবার পর দীপালির ভেলকি আরও ভয়ানক হয়ে উঠবে। ঘরের বাইরে বের হতেই চাইবে না। যদি নিতান্তই বের হতে চায়, তবে মাসি-পিসির বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যেতে চাইবে না। সন্দীপের হাত ধরে আর হেসে হেসে ঝলমলে বাইরের উৎফুল্ল আলো-ছায়ার কাছে ঘুরে বেড়াতে কোনও আনন্দ পাবে না। মনে করবে, এসব হল জীবনের যত পণ্ডশ্রম। শামুক যেমন ডোবার পাঁকটুকুর মধ্যে থেকেই সুখী, দীপালিও তেমনই ঘরকুনো আহ্লাদের একটা ডোবার পাঁকটুকুর মধ্যে থেকেই সুখী হয়ে যাবে। দীপালির ভাব-ভঙ্গি, কথা ও ভাষার মধ্যে এরকমের একটা নিউরোসিসের লক্ষণ ধরা পড়ে গিয়েছে। এরকম মেয়ের সঙ্গে সন্দীপের বিয়ে হলে, সেটা নিতান্ত শরীরের বিয়ে ছাড়া আর কিছু হবে না, হতেও পারে না।

এমসেনের নাতনী বলেছেন যে, তাঁর আর ছুটোছুটি করতে ভাল লাগছে না। কিন্তু তিনি তো ভালই জানেন যে, সন্দীপ রায় ঘরকুনো জীবনকে ঘেন্না করে, ছুটোছুটি করতেই ভালবাসে। তবে তিনি আর কী করে, কেমন মন নিয়ে সন্দীপ রায়কে ভালবাসতে পারবেন ? তিনি কি এমনই মহীয়সী যে, পাপকে ভালবাসবেন না, কিন্তু পাপীকে ভালবাসবেন ? তোমার ছুটোছুটিকে ভাল লাগে না, কিন্তু তোমাকে ভাল লাগে ! বাঃ, কী চমৎকার একটি মিথ্যেবাদী হেঁয়ালির কথা ! জিজ্ঞাসা করি, সন্দীপ রায়ের প্রাণের স্বভাবটাকে না ভালবেসে সন্দীপ রায়কে ভালবাসতে পারা যাবে কী করে ?

বিশ্বাস ছিল, দীপালি কখনও হেঁয়ালি হয়ে যাবে না। বিশ্বাস ছিল, বিয়ে হোক বা না হোক, দীপালি সোম চিরকাল সন্দীপ রায়ের মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে, সন্দীপের হাত ধরে চারদিকের সব সাধ-ও সব আনন্দের কাছে ঘুরে বেড়াবে। দীপালি হবে সন্দীপের তৃপ্তি ও গর্বের ছবি, আর সন্দীপ হবে দীপালির তৃপ্তি ও গর্বের ছবি। সন্দীপ রায়ের সে বিশ্বাস ওই মেয়েই তো মাতিয়ে তুলেছিল। তুমি মেয়েই না সেদিন ব্যালে দেখে বিহ্বল হয়ে হাজার লোকের চোখের সামনে, সন্দীপ রায়ের বুকের উপর তোমার মাথাটাকে হেলিয়ে দিয়েছিলে ? সন্দীপ রায়ের সে বিশ্বাস তুমি কত সহজে ভেঙে দিলে। এটা যদি নিওরোসিস না হয়, তবে বলতে হয়, এটা সাপিনীর স্বভাব। আচমকা আর খুবই অকারণে তুমি সন্দীপ রায়ের নিশ্চিন্ত প্রাণটার উপর ছোবল দিয়েছ। তোমাকে ক্ষমা করতে পারি

না।

কই, বিনায়ক এখনও আসছে না কেন ? মন্দারই বা আসতে এত দেরি করছে কেন ?

এতক্ষণে চোখে পড়ে সন্দীপের, গেলাসের ভিতরে আবর্জনা ভাসছে, শিরীষের শুকনো পাতা। গেলাসটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে দরজার দিকে তাকায়।

বিনায়ক আর মন্দার, দু'জনে এক সঙ্গে হেঁটে আর হেসে হেসে ঘরের ভিতরে ঢোকে। টেবিলের উপর রাখা গেলাসটাকে হাত বাড়িয়ে নেয় মন্দার। বিনায়ক তাঁর পাইপের মুখের ভিতর তামাক এঁটে ও টিপে দিয়ে সন্দীপের মুখের দিকে তাকান আর কথা বলেন। —আজ সন্দীপকে একটু অতিরিক্ত প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

সন্দীপ— অপ্রসন্নতারই উল্টো পিঠের নাম প্রসন্নতা। নয় কি ?

বিনায়ক— ওঃ ওঃ, তোমার কথার স্টান্ট বড় চমৎকার, বড়ই সুন্দর। এবং স্টান্ট হলেও কত লজিকাল ! আমার জিজ্ঞাস্য, তোমার প্রসন্নতার উল্টো-পিঠে সত্যিই কি কোনও অপ্রসন্নতা আছে ?

সন্দীপ— আছে। ...এঃ, মন্দারের বকরাক্ষসে কাণ্ডটা দেখলে না, বিনায়ক ?

বিনায়ক মুখ ঘুরিয়ে মন্দারের মুখের দিকে তাকান। সন্দীপ বলে— ওই গেলাসের মধ্যে এই রকম অনেকগুলো শুকনো শিরীষপাতা পড়েছিল। বকরাক্ষস এক চুমুকে হুইস্কির সঙ্গে পাতাগুলোকেও গিলে ফেলেছে।

মন্দার— আমি মনে করেছি, ওটা একটা স্টাইল।

সন্দীপ— হুইস্কির মধ্যে আবর্জনার মত একগাদা শুকনো শিরীষপাতা ; এটা স্টাইল হয় কী করে ?

মন্দার— বড়লোকের স্টাইল ওই রকমই হয়।

বিনায়ক— যাক, যা হবার ছিল তা হয়েই গেল। তুমি তোমার স্টাইলে আর একটু হুইস্কি খাও, মন্দার। এবার তুমি বলো সন্দীপ, কী যেন বলছিলে ? হ্যাঁ, প্রসন্নবাবুর সঙ্গে তোমার কী বিষয়ে কী যেন মতভেদ আছে ?

সন্দীপ— মনে হচ্ছে, আজ বেশ তৈরি হয়ে এসেছ, বিনায়ক। কোথায় গিয়েছিলে যে এতটা রসস্থ হতে হল ?

বিনায়ক— গুণাকর দত্তের নাম শুনেছ ? একদা যাঁহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়, সেই গুণাকর দত্তের নাম কখনও শুনেছ ?

সন্দীপ— না।

বিনায়ক— না শোনবারই কথা। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগের ইন্ডোবার্মা শিপিং কোম্পানির প্রাক্তন ডিরেক্টর গুণাকর দত্ত আজ একজন অশ্ববিদ্যামহার্ণব, রেসুড়ে জগতের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

মন্দার— বুড়োটাকে আমি দেখেছি। আলখাল্লার মত দেখতে মস্ত বড় একটা পাঞ্জাবি আর ঢলঢলে পায়জামা পরে, আর বাঘছালের জুতো পায়ে দিয়ে পার্ক সার্কাসের বাজারে মুরগি কিনতে আসে।

বিনায়ক— না, না। গুণাকর দত্তের চেহারাটা বাঘের মত নয় ; মুরগির মতও নয়। বেশ সুন্দর চেহারা।

সন্দীপ— যা-ই হোক, তুমি গুণাকর দত্তের কথা বলো।

বিনায়ক— তা হলে তো বলতে হয়, কোনও গুণ নাই তার কপালে আগুন। শেয়ার-টেয়ার সব বেচে দিয়ে আর শেয়ার-বেচা টাকার প্রায় সবই ঘোড়ার নামে এবং আরও বিবিধ আনন্দের নামে ফুঁকে দিয়ে চমৎকাব একটি নির্ধনপতি সদাগর হয়ে গেলেন গুণাকর দত্ত। সাতটি বছর, বাস, তারই মধ্যে সব কিছু ফুস।

হাসতে থাকে সন্দীপ। —বিনায়ক হালদারের প্রাণ আজ তূরীয়ানন্দের সাগরে ডুবে গিয়েছে।

বিনায়ক— ঠিক, খুব ঠিক। গুণাকর দত্তের অনুরোধের চাপে পড়ে জলীয় বস্তুটা খুব বেশি খেয়ে ফেলেছি। এর চেয়ে ভাল হত, যদি সক্রেটিসের মত এক গামলা হেমলক খেয়ে ফেলতাম।

মন্দারও হাসে। —আমলকিতে নেশা কাটে না, তেঁতুলে কাটে।

সন্দীপ— আর কাটে গবেট মন্দারের কাঁচা মাথাটাকে চিবিয়ে খেলে।

বিনায়ক—গুণাকর দত্ত কিন্তু সত্যিই একজন সুপারম্যান। যখন ধনপতি ছিলেন, তখন আমির আলি অ্যাভেনিউ-এর যে বাড়ির যে ফ্ল্যাটে ছিলেন, আজও সেই বাড়ির সেই ফ্ল্যাটে আছেন। ঠাটবাট দেখলে কারও সামান্য একটু সন্দেহ করবারও সাধ্যি হবে না যে, উনি বস্তুত একজন শূন্যকুম্ভ। দশ বছর ধরে শুধু ধারকর্জ করে যে এরকম একটা জমকালো জীবনের খরচ চালিয়ে দিতে পারা যায়, সেটা গুণাকর দত্তকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না।

মন্দার— কিন্তু কই, আমি তো চেয়ে চেয়েও পাঁচটা টাকা ধার পাই না।

বিনায়ক—তোমার কথা আলাদা। তুমি হলে একজন সাংঘাতিক মন্দার দত্ত। তুমি গুণাকর দত্ত নও। তুমি কালো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছ। তোমাকে চিনে নিতে আর বুঝে ফেলতে কারও ভুল হতে পারে না। যাই হোক, এবারে একটু কান লাগিয়ে আমার কথাটা শোনো, সন্দীপ।

সন্দীপ— কান লাগিয়েই আছি, বলো।

বিনায়ক—গুণাকর দত্ত একবার তোমার কাছে এসে বিশেষ দরকারের কিছু কথা বলতে চান। তুমি যদি আসতে বল, তবেই তিনি আসবেন। নচেৎ নয়।

সন্দীপ— না, এসব লোকের কোনও বিশেষ দরকারের কথা শুনতে আমি রাজি নই। বিশেষ দরকার মানে তো ওই একটি দরকার, টাকা ধার পাওয়ার দরকার।

বিনায়ক— না, তিনি আমাকে বলেছেন এবং তোমাকেও বলতে বলেছেন যে, টাকা ধার চাইবার কোনও ইচ্ছে নিয়ে নয়, তিনি অন্য কোনও বিষয়ে, একেবারে ভিন্ন কোনও বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। আমার মনে হয়, ফরেন কারেন্সি নিয়ে তিনি একটা সমস্যায় পড়েছেন।

সন্দীপ—বুঝেছি। না না, ওসব ব্যাপারে তাঁকে কোনও সাহায্য করতে পারব না। কাজেই কোনও আলোচনা করতে পারব না।

বিনায়ক— উনি কিন্তু জানেন যে, তুমি এ বিষয়ে অনেককে সাহায্য করেছ।

সন্দীপ— করেছি, বেশ করেছি। কিন্তু তাঁর মত একজন নির্ধনপতি সদাগরকে ও বিষয়ে সাহায্য করবার কোনও গরজ আমার নেই।

বিনায়ক— যাক, তা হলে গুণাকর প্রসঙ্গ একেবারে চুলোয় যাক। এখন বলো, কী যেন তুমি বলতে চাইছিলে ?

মন্দার— সন্দীপ বলছিল যে, এদিকে প্রসন্ন আর ওদিকে অপ্রসন্ন, মাঝখানে তা হলে কে আছে ?

মন্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে সন্দীপ— ইনিও দেখছি চিদানন্দ সাগরে ভাসতে শুরু করেছেন।

বিনায়ক— আমারও কিন্তু একই প্রশ্ন, কে আছে ?

সন্দীপ— তার মানে ?

বিনায়ক— মানে হল, কেউ কি এখনও আছে, না কেউই নেই ?

সন্দীপের চোখের ভ্রূকুটি বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। —না, কেউ নেই। কিন্তু আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন করলে কেন ?

বিনায়ক— কদিন আগে তোমাকে দেখলাম কি না, তখন রাত নটা হবে, তুমি একাই গাড়ি থেকে নামলে, আর জুলিয়াসের ফটোস্টুডিওতে ঢুকলে।

সন্দীপ— হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছ। মনের ভুলে, বিশ্বাসের ভুলেও বটে, একজন ট্রেটরের ফটোর বিশ কপি প্রিন্ট করতে দিয়েছিলাম। জুলিয়াসকে বলে এলাম, আর প্রিন্ট করবার দরকার নেই।

বিনায়ক—ট্রেটর ?

সন্দীপ— হ্যাঁ, তাকে ট্রেটর বলাই উচিত।

বিনায়ক— আমার কিন্তু এটা বিশ্বাস করতে...।

সন্দীপ— যে মেয়ে দুমাস ধরে হাসাহাসি করে হঠাৎ একদিন গম্ভীর হয়ে যায়, তাকে তুমি কী বলবে ?

—বলব, তার মনের ভিতরে নতুন কিছু এসেছে।

সন্দীপ— যে মেয়ে দুমাস ধরে ছুটোছুটি করার পর হঠাৎ একদিন বলে ফেলবে, আর ভাল লাগছে না, বসে পড়তে ভাল লাগছে, তাকে তুমি কী বলবে ?

বিনায়ক— বলতে তো ইচ্ছা করে যে, তার পায়ে ব্যথা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এত সরল নয় যে, এত সরল করে বলা যায়।

সন্দীপ—যে মেয়ে মসলিনের শাড়ি ছাড়া অন্য কোনও শাড়ি ছোঁয় না, কাশ্মীরি সিল্ক যার খস্‌খসে বলে মনে হয়, সে মেয়ে যদি হঠাৎ একদিন একটা আটপৌরে ধনেখালি পরে বসে, তবে তাকে তুমি কী বলবে ?

—বলতে হয়, তার মনের মধ্যে একটা আটপৌরে বিপ্লব ঘটে গিয়েছে।

—সে মেয়ে যদি হঠাৎ বিয়ে করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তবে তাকে ওই সন্দেহ করতে হয় না কি, যে...।

—সন্দেহ হয়, তার এখন গৃহিণী হবার সাধ হয়েছে, বাহিরিণী হয়ে থাকতে তার আর ভাল লাগছে না।

—কিন্তু তার স্বামী মশাইয়ের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ?

—তোমার মত স্বামী হলে অবস্থাটা খুবই শোচনীয় হবে।

—সেইজন্যেই আমি সাবধান হয়েছি।

বিনায়ক— খুব ভালো করেছ।

সন্দীপ— তার ঘরকুনো আহ্লাদের দড়ি আমার জীবনটাকেও ফাঁসি দিয়ে ঘরের কোণে রেখে দেবে।

বিনায়ক— ঠিক সন্দেহ করেছ। তোমার হাত ধরে বাইরে বেড়াতে তার ভয়ানক লজ্জা হবে। বাবুর্চিকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই হেঁসেলে ঢুকবে। সুর করে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে শুরু করবে।

মন্দার বলে— একটু রাত করে বাড়ি ফিরলে মুখ শুঁকবে।

সন্দীপের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে ওঠে— ওরকম একটি কট্টর গিন্নিপদার্থের মুখে মুখ রাখতে আমার গা ঘিনঘিন করবে। ওরকম মেয়েকে আমি ঘেন্না না করে পারি না।

বিনায়ক— কাজেই, যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। তুমি বেঁচে গিয়েছ, আর, সে মেয়েও বেঁচেছে।

মন্দার— কাজেই, তোমার যখন কোনও সঙ্গিনী সত্যিই নেই, তখন আজ সন্ধ্যায় দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে একটা ভাল ছবি দেখে এসো।

সন্দীপ— অন্য দিন হলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আজ পারব না। আজ আমাকে একটা নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যেতেই হবে। জয়াজী লিমিটেড তাদের একটা নতুন ফ্যাক্টরি চালু করবে। জয়াজীর সেক্রেটারি দু'বার ফোন করে বলেছেন— আপনাকে আসতেই হবে, না এলে খুব দুঃখিত হব।

মন্দার উঠে দাঁড়ায় আর হাসতে থাকে। — কাজেই দশটা টাকা দাও। আমরা দু'জনে আজ সন্ধ্যায় ছবি দেখবার সাধ মিটিয়ে নিই।

সন্দীপ—দিচ্ছি। ছবি দেখবার পর ট্যাক্সি করে বিনায়ককে বাড়িতে পৌঁছে দিও।

মন্দার—তা হলে আরও পাঁচটা টাকা দাও।

সন্দীপ— এই নাও।

॥ ১০ ॥

হাইড রোডের পাশে বিরাট এক সেকেলে বাগানের আম জাম আর তেঁতুলের বড় বড় পুরনো গাছের ভিড়ের কাছে যে প্রকাণ্ড বাড়িটাকে মাথাভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অনেকের সন্দেহ হত যে, এটা বোধ হয় কোম্পানির আমলের কোনও বাবু মহাশয়ের বাগানবাড়ির করুণ অবশেষ,

আজ আর সেই বাড়িটার সেই চেহারার কোনও চিহ্ন নেই। আজ সন্ধ্যায় সেখানে আলোর মালা জড়িয়ে ঝলমল করছে জয়াজী লিমিটেডেব নতুন ফ্যাক্টরির বাড়ি। পুরনো আম জাম আর তেঁতুলের কোনও চিহ্ন নেই। সেখানে আজ ঘাস-মরা জমির উপর একটি রঙিন সামিয়ানা দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চাশটি টেবিল আর দুশো চেয়ার। টেবিলের উপর পানামোদের ক্রকারি সাজানো রয়েছে।

ফ্যাক্টরির সামনে একটি মেশিনের কাছে দাঁড়িয়ে বার্মিংহামের জনৈক মিস্টার ওয়েবস্টার অল্পকথার একটি বক্তৃতায় ফ্যাক্টরির উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানালেন। জনৈকা ভারতীয়া তরুণী নারকেল ফাটিয়ে মেশিনের গায়ে নারকেলের জল ঢেলে দিলেন। সুইচ টিপে দিলেন মিস্টার ওয়েবস্টার। সঙ্গে সঙ্গে গরগর করে মেশিনের আনন্দের শব্দ কাঁপতে শুরু করে দিল। ফ্যাক্টরির উদ্বোধন হয়ে গেল। চাকা লাগানো একটা চেয়ারের উপর বসে থেকেই হোস্ট জয়াজী তাঁর গেস্টদের ধন্যবাদ জানালেন। বেশ কষ্ট করে ধন্যবাদের বক্তৃতাটা পড়লেন জয়াজী, তাঁর জিভের জড়তা এখনও ভাল করে কাটেনি। ছ'মাস আগে পক্ষাঘাতের স্ট্রোক হয়ে বেচারা জয়াজী একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে গিয়েছিলেন। এখনও হাঁটতে পারেন না. ভাল করে দাঁড়াতেও পারেন না, তাই চাকা-লাগানো চেয়ারে বসে তাঁকে ঘোরাফেরা করতে হয়।

সামিয়ানার তলায় পানামোদের আসরের একটি প্রান্তে চাকা-লাগানো চেয়ারের উপর বসে রইলেন জয়াজী। দেখতে পায় সন্দীপ, জয়াজীর চাকা-লাগানো চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলছেন যে ভদ্রলোক, তিনি যেন জয়াজীর প্রতিনিধি হয়ে অতিথিদের আপ্যায়িত করবার ভার নিয়েছেন। ভদ্রলোকের মাথাটার সবই সাদা, কাঁধটা বেশ ঝুঁকে রয়েছে, চুরুটধরা হাতটা মাঝে মাঝে থরথর করে কেঁপে উঠছে। বেশ বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারা যায় না, ভদ্রলোক কি বাঙালি, না অবাঙালি ? সাদা পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা, কাঁধে একটি জরিদার সাদা চাদর, কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের হাসিটা একটুও সাদাটে নয়। বেশ উচ্ছল হাসি, লালচে হাসি মনে হয়। ভদ্রলোক এরই মধ্যে নিশ্চয় দু'চার পেগ পানীয় সেবন করে নিয়েছেন, নইলে, তাঁর মুখটা এত লালচে হয়ে উঠবে কেন ? ভদ্রলোকের মুখে ভাষার শব্দ নেই বললেই চলে, হাসির শব্দটাই বেশি। বুঝতে অসুবিধে নেই, এটা তাঁর জিভের কোনও জড়তার ব্যাপার নয় ; সেবনজাতীয় একটা বিহ্বলতার ব্যাপার।

কিন্তু আর একজন যিনি তরতর করে ঘুরে ফিরে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলছেন, তিনি কে ? যিনিই হোন, তিনিও বোধ হয় এই আসরে আপ্যায়িকার কাজ করছেন। তিনি বোধ হয় জয়াজীর কোনও আত্মীয়া।

গত বছর কলকাতাতে লণ্ডনের এক ব্যালে দল এসে অর্কিড-কুইন নামে যে রূপকথার নাটক নেচে দেখিয়েছিল, তার মধ্যে অর্কিড-কুইনের সাজ হাসি আর ভঙ্গি ছিল সবচেয়ে বেশি মনমাতানো দৃশ্য। দেখে কে না মুগ্ধ হয়েছিল ? সন্দীপের মনে হয়, আপ্যায়িকা ওই তরুণী নিশ্চয় অর্কিড-কুইন ব্যালে দেখেছে। খুব ভাল করে দেখেছে নিশ্চয়। তা না হলে ঠিক সেই অর্কিড-কুইনের মতো সাজ হাসি আর ভঙ্গি নিয়ে নিজের চেহারাটাকে এত মাতিয়ে তুলতে পারত না।

এই আসরে যেমন দেশি অতিথি, তেমনই বিদেশি অতিথি ; যেমন পুরুষ অতিথি, তেমনই মহিলা অতিথিও আছেন। কিন্তু কেউ একজনও সন্দীপের পরিচিত নন। সন্দীপের টেবিলের তিন দিকের তিনটি চেয়ারই শূন্য। এরকমের একলা বসে থাকতে যদিও সন্দীপের একটুও ভাল লাগে না, তবু সন্দীপের মনে কোনও অস্বস্তি ছটফট করে না। সৌজন্যের খাতিরে আর দশটা মিনিট বসে থেকে, তারপর জয়াজীকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যেতে হবে, এই তো।

আপ্যায়িকা তরুণী এসে সন্দীপের পাশের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েছে। অতিথিদের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলছে তরুণী, সেটা ইংরেজি ভাষা। তারপরের টেবিলের কাছে গিয়ে যে ভাষায় কথা বলল, সেটা উর্দু। কাছের আর একটি টেবিলের কাছে গিয়ে যে ভাষায় কথা বলে হেসে উঠল তরুণী, তার অর্থটা না বুঝতে পারলেও এটুকু বুঝতে পারে সন্দীপ, ওটা ফরাসি ভাষা। ওই টেবিলের অতিথিরা বোধ হয় ফরাসি কনস্যুলেটের লোক। গালের উপর হাতের একটি আঙুল ছুঁইয়ে রেখে আর মৃদু শ্রাগ করে কাঁধ দুটোকে একটু উথলে দিয়ে অন্য টেবিলের দিকে চলে গেল তরুণী।

কোনও সন্দেহ নেই, আপ্যায়নের আর্ট খুব ভাল আয়ত্ত করেছে এই তরুণী। সবারই মন জুগিয়ে হাসছে, কিন্তু কাউকে মন জোগাচ্ছে না। তরুণীর পরিচয় অনুমানেও কিছুই ধরা যাচ্ছে না। বাঙালি, না অবাঙালি ? বিবাহিতা, না অবিবাহিতা ? তবু কেন যেন মনে হয়, তরুণী বোধ হয় তার মনটাকে গোপন সোনার কাঠির মত এখনও তার বুকের কোটরে লুকিয়ে রেখেছে, কাউকেই স্পর্শ করতে দেয়নি।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে, যে নারী তার সুহাসিনী মূর্তি নিয়ে তরতরিয়ে হাঁটছে আর সব টেবিলকে লক্ষ করছে, সে নারী সন্দীপের টেবিলের কাছাকাছি এসেও লক্ষ্যহীন হয়ে গেল। আপ্যায়িকা তরুণী সন্দীপকে যেন দেখতেই পেল না। সন্দীপের চেহারার অহংকারটা একটু বিস্মিত হয়েছে, একটা খোঁচাও খেয়েছে বোধ হয়। আপ্যায়িকা মহাশয়া কি ইচ্ছে করেই লক্ষ্যহীন হয়ে সন্দীপের টেবিলটাকে দেখল না, আর বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে, সন্দীপের মত রূপবানের কোনও ধার সে ধারে না এবং অনেক রূপবান তার দেখা আছে ?

যা-ই হোক, আর তো এখানে এভাবে চুপ করে বসে থাকবার কোনও অর্থ হয় না। এখন চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু মনটা এভাবে অনেকক্ষণ ধরে উঠি-উঠি করেও যেন উঠে যেতে চাইছে না। যদি জানতে পারা যেত, কে ওই তরুণী, যে এখন এই পানামোদের আসরের সব টেবিলকে হাসিয়ে আর খুশি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবে এভাবে একটা অস্বস্তি নিয়ে থিতিয়ে থাকতে হত না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করা যায় ? জয়াজীর জিভের জড়তার কাছে, কিংবা সাদামাথা ভদ্রলোকের বিহ্বলতার কাছে এই জিজ্ঞাসার কথা বলে কোনও লাভ নেই, বলা উচিতও নয়। বললে বেশ খারাপ শোনাতেও পারে। জিজ্ঞাসা করেও যদি জবাব না পাওয়া যায়, তবে সেটা আরও খারাপ ব্যাপার হবে।

কিন্তু না জেনেও যে সত্যিই চলে যেতে ইচ্ছা করছে না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে সন্দীপ, উঠি উঠি করেও দেড়টি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উঠে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ট্রের উপর বোতল সাজিয়ে কতবারই তো বয় এল আর চলে গেল। বয় বলেছে, সাব পেগ ? সন্দীপ বলেছে, না। সন্দীপ সেই প্রথম পেগের দু চুমুক স্বাদ পান করে নিয়ে পিপাসা মিটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটার পিপাসা মিটছে না, কে এই তরুণী ?

এরই মধ্যে অনেক টেবিলের উপর অনেক গেলাস গড়িয়ে পড়েছে। কারও কারও করধৃতকম্পিত-গেলাস ফসকে পড়ে ভেঙেছে। এখনও ভাঙছে, ভাঙা গেলাসের ঝন্‌ঝনানি ক্রমেই বাড়ছে। অনেক টলমল চেহারা আসর ছেড়ে চলে গিয়েছে, চলে যাচ্ছে। অথচ, যার চেহারার মধ্যে একটুও টলমলানি প্রবেশ করেনি, যার দুই চুমুকের নেশা দুই কাশিতেই ফুরিয়ে গিয়েছে, তারই মনের মধ্যে চলে যাবার কোনও তাড়া নেই, তাগিদও নেই।

কিন্তু সন্দীপের বিফল ধ্যানের সব ক্লেশ বুঝি এবার ঝরে পড়ে যাবে। আপ্যায়িকা তরুণী হেসে হেসে সন্দীপের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। চোখে দেখেও আকস্মিক এই বিস্ময়ের দৃশ্যটাকে বিশ্বাস করতে পারে না সন্দীপ। অবশেষে বিশ্বাস করতে হয়। সন্দীপের টেবিলের কাছে এসে একটি শূন্য চেয়ারের উপর বসে পড়েছে সেই তরুণী, নাম-না-জানা সেই প্রহেলিকা।

—আমি এষা দত্ত। আমি আপনাকে চিনি, যদিও আপনি আমাকে চেনেন না।

বহুদিনের অদেখার পর প্রিয়জনকে দেখে কথা বলতে গিয়ে যে আবেগ গলার স্বরে উথলে ওঠে, এষা দত্তের সম্ভাষণের স্বরে যেন সেইরকম প্রীতিপ্লুত আবেগ উথলে উঠেছে।

সন্দীপ—আমি অবশ্য আপনাকে চিনি না, কিন্তু শুনে আশ্চর্য হচ্ছি যে, আপনি আমাকে চেনেন।

এষা—আপনার কি মনে পড়ে যে, আপনি একদিন চক্রবর্তীর ছবির এগজিবিশন দেখতে গিয়েছিলেন ?

—মনে পড়ে।

—আপনি চক্রবর্তীকে চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন, মনে পড়ে ?

—না। সত্যিই কোনও চমৎকার কথা বলে থাকলে হয়ত মনে থাকত।

—বলেছিলেন। সে কথাটা আমার মনের মধ্যে আজও গুন্‌গুন্ করে। আজও ভুলতে পারিনি। আপনি বলেছিলেন—ছবিতে রূপ ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর তুলির আসল কাজ নয়, সার্থক

কাজও নয়। আসল কাজ হল, রূপের আবেগ ফুটিয়ে তোলা।

—হয়ত বলেছিলাম, মনে পড়ছে না। এবার আপনি বলুন তো, ওকথা আমি বলে থাকলে খুব ভুল কথা বলেছিলাম কী ?

—আমি আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি, আপনি কী নির্ভুল কথা বলেছিলেন। কতবার ইচ্ছে হয়েছিল, আপনার কাছে গিয়ে আরও ভাল করে কথাটাকে শুনি, আরও ভাল করে বুঝে নিই।

—কিন্তু আমার নামও তো আপনার জানা নেই, আমার কাছে যেতেন কী করে ?

—আপনি চলে যাবার পরে চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করে আপনার নাম-ধাম আর পরিচয় সবই জেনেছিলাম।

—তাই বলুন। রহস্যটা পরিষ্কার হল।

—কিন্তু স্মৃতিটা বোধ হয় এখনও পরিষ্কার হয়নি।

—কার স্মৃতি ?

—আপনার, আবার কার ?

—বুঝলাম না।

—আপনার কি মনে পড়েছে যে, সেদিন আপনার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আমি ছবি দেখছিলাম ?

—আপনি ? আপনি সেদিন আমার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—না, হতে পারে না। আমার শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, চোখে খুব গাঢ়-আঁধারী একজোড়া গোগো, আর গায়ে বেশ গাঢ় নীলরঙের শাড়ি, এইরকম সাজে এক মহিলা আমার কাছেই দাঁড়িয়ে ছবি দেখছিলেন।

—তার মানে, আমাকেই দেখেছিলেন।

—সে কী ? আপনিই সেই নীলাম্বরা মহিলা ?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনার স্মৃতিটা এখনও একেবারে পরিষ্কার হয়নি।

—কেন ?

—আপনার কি মনে পড়ে যে, সেই নীলাম্বরা অনেকক্ষণ ধরে আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল।

—না।

—ঠিকই, সামান্য মানুষের সামান্য প্রাণের কোনও ব্যাপার আপনার মতো মানুষের চোখে পড়বে কেন ?

—কিন্তু আপনিও তো কিছুক্ষণ আগে এখানে ওইরকম একটা ব্যাপার করে দেখালেন। আমার টেবিলের এত কাছে এসেও আমাকে দেখতেই পেলেন না।

—মনের ভুলে নয়, চোখের ভুলেও নয়, কোনও মেজাজের ভুলেও নয়, আমি ইচ্ছে করেই আপনাকে দেখতে পাইনি।

—অদ্ভুত ইচ্ছে।

—না, একটুও অদ্ভুত ইচ্ছে নয়। ছেলেমানুষের লোভের স্বভাব কখনও লক্ষ করেছেন ?

—না।

—বাচ্চা ছেলে তার পাতের সবচেয়ে প্রিয় আর লোভনীয় খাবারটাকে রেখে দিয়ে অন্য সব হাবিজাবি খাবার আগে খেয়ে নেয়।

—তা জানি, দেখেছিও।

—আমিও তাই করেছি। যার সঙ্গে কথা বলতে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগবে, যাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হবে, তাকে ইচ্ছে করেই না-দেখার মধ্যে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করছেন ?

—বিশ্বাস করতে অবশ্য একটু...।

—বিশ্বাস করুন, সন্দীপবাবু।

অর্কিড-কুইনের চোখে গোগো নেই। সন্দীপের এখন ভাল করে আর স্পষ্ট করে দেখতে কোনওই অসুবিধে নেই। এষা দত্তের দু'চোখের দুই কালো তারার উপর সত্যিই সুন্দর একটি আবেদনের আলো ঝিকমিক করছে।

এ কী ? চমকে ওঠে সন্দীপের দুই চোখ। এষা দত্তের দুই চোখের দুই কোণ থেকেই সত্যিই যে বড়-বড় দুটি জলের ফোঁটা ঝরে পড়ল। এষা দত্তের শরীরটাও বোধ হয় অবশ হয়ে গিয়েছে। হাত তুলে চোখ দুটোকে মুছতেও পারছে না।

সন্দীপ—আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়েছি, এষা। এতটা ভাবতে পারিনি।

এষা—ঠিকই, এতটা ভাবতে পারবেন কেন ? একটা মানুষ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সর্বক্ষণ আপনার কথা ভাবছে অথচ আপনার কাছে কখনও আসছে না, এটা তো কেউ ভাবতে কিংবা বিশ্বাস করতে পারে না।

সন্দীপ—আমি কখনও ভাবতে পারিনি বটে, কিন্তু আজ আমি বিশ্বাস করছি। শোনো এষা, আমি বিশ্বাস করছি।

এষা—আপনি জানেন না, আপনাকে শুধু একটু ভাল করে দেখবার জন্যে আমাকে কী নির্লজ্জ চক্রান্ত করতে হয়েছে।

সন্দীপের দুই চোখের উৎফুল্ল দৃষ্টিটা দীপ্ত হয়ে ওঠে—চক্রান্ত ?

এষা—হ্যাঁ, রীতিমত চক্রান্ত। ভাবনার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, শেষে একদিন মুখ খুলে বাবার কাছে তোমার কথাটা বলেই ফেললাম। আমার মনের আসল কথাটা অবিশ্যি নয়, তোমার সঙ্গে চেনাশোনার বন্ধ রাস্তাটা যাতে খুলে যায়, তারই জন্য একটা চেষ্টার কথা। বাবাকে বলেছিলাম, একদিন যেন তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করে আসেন। আর তোমাকে একদিন আমাদের বাড়িতে এসে চা খেয়ে যেতে নেমন্তন্ন করেন। কিন্তু বাবার যা ভুলো মন...যাক সে কথা, আমি বেহায়ার মত মুখ খুলে স্যারের সেক্রেটারি বলবন্ত ভাইকে ধরে বসলাম, জয়াজী লিমিটেডের নতুন ফ্যাক্টরির উদ্বোধনের দিনে সন্ধ্যাবেলার পার্টিতে যেন তোমাকে নেমন্তন্ন করেন আর আসবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। তাই...।

লজ্জিত হয়ে হেসে ফেলে এষা।—আমার অনুরোধের কথা শুনে বলবন্তভাই অবিশ্যি একটু মুখ টিপে হেসেছিলেন, তবু আমি হাসিনি। কারও সন্দেহের কাছে একেবারে স্পষ্ট করে ধরা পড়ে যেতে আমার ভাল লাগে না, বরং একটু ভয়ই করে। যাক, আমার চক্রান্তের স্বপ্ন তো সফল হয়েছে। এখন তুমি যদি আমার হন্যেপনা আর বেহায়াপনা ক্ষমা করে দাও, তবেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

সন্দীপ—মনে হচ্ছে, জয়াজী পরিবারের সঙ্গে তোমার খুব মেলামেশা আছে।

এষা—হ্যাঁ, সেই কবে, প্রায় পাঁচ বছর আগে আমি জয়াজীকে স্যার বলতে শিখেছিলাম, তাই অভ্যেসের নিয়মে আজও স্যার বলি। আমি স্যারের ভাইঝি মৃদুলার গভর্নেস ছিলাম। এই চাকরিটারই জন্যে জয়াজীকে স্যার বলতে হত। স্যার একদিন বললেন, এষা অব তুমকো বোম্বাই যানা পড়েগা।

সন্দীপ—কেন ?

এষা—মৃদুলা ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসল যে, সে কিছুতেই আর কলকাতায় থাকবে না। বোম্বাই তার ভাল লাগে, তাই বোম্বাইয়েই থাকবে। আমাকেও তাই মৃদুলার সঙ্গে বোম্বাইয়ে স্যারের বাড়ি জয়াজী ম্যানসনে চারটি বছর কাটিয়ে দিতে হয়েছিল।

সন্দীপ—চাকরিটা নিজেই ছেড়ে দিয়েছিলে, না ওরাই—

এষা—না, আমিই ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

সন্দীপ—কেন ?

এষা—মৃদুলার যেমন বোম্বাই ভাল লাগে, আমারও তেমনই কলকাতা ভাল লাগে। তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতাতে চলে এলাম। সে চাকরিতে কিন্তু কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না। সত্যি কথা, বোম্বাইয়ের জীবনটাতেও কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না। সকাল, বিকেল, দুপুর, সন্ধ্যা আর রাত, মাঝরাত হলেই বা কী আসে যায়, শুধু বেড়াও আর বেড়াও। এবেলা মালাবার হিল, তো ওবেলা জুহু। আজ

কানহেরি, তো কাল এলিফ্যান্টা দ্বীপ। যেমন মৃদুলা, তেমনই তার দাদা চিরঞ্জীব, তেমনই আবার চিরঞ্জীবের বন্ধুদল। সবাই যেন আমোদের উড়ন্ত প্রজাপতি। নাচ দেখা, গান শোনা, আর ছবি দেখা ; পিকনিক, হিচহাইকিং আর প্লেজার ট্রিপ—রেস্টুরেন্ট, বিয়ার-বার আর, বলতে লজ্জা করে, রাতের ক্লাবের স্ট্রিপটিজ, সব কিছুই যেন লুঠ করে প্রাণ ভরাবার আনন্দে ছুটোছুটি করা ওদের জীবনের একটা অভ্যেস।

সন্দীপ—অভ্যেসটা কি খুব খারাপ ?

এষা—একটুও খারাপ নয়। আমারও একটুও খারাপ লাগেনি। কিন্তু সেজন্যে বোম্বাইয়ে পড়ে থাকব কেন ? কলকাতা কি একটা গোবি মরুভূমি ?

সন্দীপ—আমি তা মনে করি না।

এষা—আমিও তা মনে করি না। চমৎকার আনন্দের আর আবেগের জীবন কলকাতাতেও আছে, ইচ্ছে থাকলে আর খুঁজলেই পাওয়া যায়।

অদূরে অলস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে বয়, তার দিকে আঙুল তুলে ইশারা করে এষা—ইধর আও।

বয় এসে বলে—ফরমাইয়ে।

এষা—দুটো স্প্যানিশ-এর দুটোই কি খরচ হয়ে গিয়েছে ?

বয়—একঠো হ্যায়।

এষা—নিয়ে এসো।

বয় আবার ফিরে এসে টেবিলের উপর একটা বোতল রাখে, ছিপি খোলে। এষা বলে—তুমি চলে যাও, বয়। এখানে তোমার আর কিছুই করতে হবে না। আমি আছি।

সন্দীপ—তোমার এত ব্যস্ত হবার কোনও দরকার ছিল না।

এষা—ছিল। আমি যা বলছি, শোনো। আমি যা করছি, দেখো। আজ আমি তোমার মনের ভিতরে ঠাঁই পেয়ে গিয়েছি, আমার মনের আনন্দ আমি নিজের হাতে তোমার গেলাসে ঢেলে দেব।

সন্দীপ—তোমার গেলাস কই ?

এষা—আমাকে ক্ষমা করো।

নিজের হাতের বোতলটাকে কাত করে ধরে সন্দীপের গেলাসে স্প্যানিশ লাল মদের ছোট্ট একটি ঝর্না ঝরিয়ে দেয় এষা দত্ত। সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে আর নিবিড়-মৃদু স্বরে যেন চরম আত্মনিবেদনের একটি অঙ্গীকার গুঞ্জরিত করে শুনিয়ে দেয়—যখনই ইচ্ছে হবে, আমার কাছে চাইবে। আমি তোমাকে সব দেব। আজ শুধু আমার এই সামান্য উপহার নিয়ে খুশি হও। খাও, সন্দীপ।

গেলাস হাতে তুলে নিয়ে আর কথা বলতে গিয়ে সন্দীপেরও গলার স্বর নিবিড় হয়ে যায়।—আমার এখন আর বলতে একটুও কুণ্ঠা নেই এষা, তোমাকে ভালবাসতে আর কাছে পেতে ইচ্ছে করছে।

বুকের ভিতরে এরকমের তেষ্টার আবেগ জীবনে কোনওদিনও অনুভব করেনি সন্দীপ। চার চুমুকে গেলাস খালি করে দিয়ে এষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে এষার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুন্দর, এমন অনেক মেয়েকে চোখের কাছে আর বুকের কাছেও পেয়েছে সন্দীপ। চোখ মুখ আর নাকের ধরন-গড়নের হিসেব ধরলে, তাদের অনেকের চেয়ে এষা দত্তকে কম সুন্দর বলে মনে করতে হবে। আর, যদি শরীরটার ধরন-গড়নের হিসেব করা হয়, তবে এই এষা দত্তকে একটা ছন্দিতা ললিতা বা কোমলতা বলে কেউ মনে করবে না। কিন্তু এষা দত্তের এই অনিখুঁত রূপের মধ্যেই এমন একটি নিখুঁত মনোহারিতার জাদু আছে, যা ওসব মেয়ের কারও রূপের মধ্যে ছিল না। মনে হয় সন্দীপের, এষা দত্তের এই শখের অর্কিড-কুইন মূর্তি যদি এই মুহূর্তে নিসাজ ও নিলাজ হয়ে যায়, তবে সেই জাদু আরও দুরন্ত হয়ে উঠবে। রূপ যা-ই হোক, এষা দত্তের রূপের আবেগ খুবই সুন্দর। এই সুন্দরতা তাদের কারও মধ্যে কখনও দেখতে পায়নি সন্দীপ। বিশ্বাস করতে তাই খুবই আশ্চর্য লাগে সন্দীপের, এষা দত্তের মত নারী সন্দীপের জীবনের সহচরী, সন্দীপের সব আনন্দের নায়িকা হতে চায়, আর সেই ইচ্ছায় মাসের পর মাসের প্রতীক্ষা সহ্য করেছে।

এষা বলে—এই স্প্যানিশ মদের নাম জান ?
সন্দীপ—না। আমি স্প্যানিশ ভাষা জানি না।
এষা—আমিও জানি না। কিন্তু নামটার অর্থ জেনে নিয়েছি।
সন্দীপ—অর্থটা কী ?
এষা—অর্থ হল, আঙুরের যৌবন।
সন্দীপ—সুন্দর নাম ! নামটা এষার যৌবন হলে আরও ভাল হত।
এষা—হয়ত ভাল হত।
সন্দীপ—তুমি তো বেশ ভাল ফ্রেঞ্চ বলতে পার। কোথায় শিখলে ?

এষা হাসে।—অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে দিতাম, ফ্রান্সের সরবোন ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় শিখেছি। কিন্তু তুমি জিজ্ঞাসা করছ বলেই বলতে হচ্ছে, চন্দননগরে ছোটমামার বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়বার সময় শিখেছি।

সন্দীপ—কিন্তু কই, আর একটু দাও। স্প্যানিশ মদিরা সত্যিই বেশ টেস্টফুল।
এষা—তোমার ড্রাইভার এসেছে ?
সন্দীপ—না। গাড়ি নিয়ে আমি একাই এসেছি।
এষা -তবে থাক, আর খেও না।
সন্দীপ—কিন্তু...।

এষা—এই বস্তুটি কলকাতাতে দুর্লভ। কিন্তু বলবন্তভাই খুবই জোগাড়ে লোক। কাকে যেন টেলিফোন করে নিয়ে কোথায় যেন গেলেন, আর দু ঘন্টার মধ্যে দুটি স্প্যানিশ নিয়ে ফিরে এলেন।

সন্দীপ—তবে দুর্লভের আর এক গেলাস টেস্ট সুলভ হলে...।
এষা—না, থাক। যেটুকু খেয়েছ, তার চেয়ে বেশি এখানে আর খাওয়া উচিত নয়।

সন্দীপ—কিন্তু বিশ্বাস করো এষা, তোমার ওই পেয়ার অব লিপস্, এই ঠোঁট দুটিকে চমৎকার দুটি তাহিতি ঠোঁট বলে মনে হয়।

এষা হাসে।—কোনও তাহিতি সুন্দরীর সঙ্গে কোনওদিন দেখা হয়েছিল নিশ্চয় ?

সন্দীপ—হ্যাঁ, স্বপ্নে। এটা আমার স্বপ্নের অভিজ্ঞতার কথা, তাহিতি ঠোঁট বড়ই টেস্টফুল। মডার্নিস্ট হয়েও চক্রবর্তী অবিশ্যি তর্ক করে চেঁচায়, অজন্তা ঠোঁট, অজন্তা ঠোঁট। কিন্তু অজন্তা ঠোঁট আমার একটুও পছন্দ নয়। সেকেলে কিছুই আমার পছন্দ নয়।

এষা—এবার উঠতে হয়। আর এখানে দেরি করবার দরকার নেই।
সন্দীপ উঠে দাঁড়ায়—হ্যাঁ চলো, এখানে আর কোনও দরকার নেই।

চাকা-লাগানো চেয়ার আর নেই, চলে গিয়েছেন জয়াজী। সাদামাথা সেই বৃদ্ধও নেই। পানামোদের আসরে তখন মাত্র দু'জন অবশিষ্ট অতিথি আছেন, আর কেউ নেই। তাঁরাও দুই চেয়ারের উপর নেতিয়ে পড়েছেন, ঘুমিয়ে আছেন। প্রায়-নিস্তব্ধ আসরের প্রায়-নির্জন পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে সন্দীপ রায় আর এষা দত্ত গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। এষা বলে—আমাকে এখন বাড়িতে পৌঁছে দিতে তোমার কি কোনও অসুবিধে কিংবা...।

সন্দীপ—চুপ ! চলো। বলো, কোথায় তোমার বাড়ি ?
এষা—আমির আলি অ্যাভিনিউ।

ছুটে চলে সন্দীপের উৎফুল্ল ক্যাডিলাক। সন্দীপের পাশে যেন নিবিড় এক আবেশের সুখে বিভোর হয়ে আর নীরব হয়ে বসে থাকে এষা, সন্দীপের ভালবাসার অঙ্গীকার পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে যার এতদিনের আশা আর অপেক্ষা।

সন্দীপ বলে—আমি কবি নই, কবিতা করে মনের কথা বলতে পারি না। তবু বলতে ইচ্ছে করছে, আমরা দু'জন যেন দূর আকাশের একটা তারার দিকে ছুটে চলেছি।

এষা—হ্যাঁ, আমরা কোনওদিনও থামব না, জিরোব না, ক্লান্তও হব না।

সন্দীপ—আজই কে যেন আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর কথা বলছিল...। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বিনায়ক বলছিল, আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের গুণাকর দত্তের কথা।

এষা—আমার বাবা, গুণাকর দত্ত। তাঁকে তো তুমি আজ দেখেছ, স্যারের ইনভ্যালিড চেয়ারের কাছে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন। আজকের পার্টির গেস্টদের সঙ্গে কথা বলবার দায়িত্ব তো তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মনটা শিশুর মনের মত এমনই সরল আর ভুলো যে, সে দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নিজেরই অবস্থা তরল করে তুললেন। স্যার বাধ্য হয়ে শেষে আমারই উপর সে দায়িত্ব তুলে দিলেন।

সন্দীপ—জয়াজীর সঙ্গে তোমার বাবা বোধ হয় অনেকদিন থেকে একটা জানা-শোনা সম্পর্ক আছে।

এষা—হ্যাঁ, মৃদুলার গভর্নেস এষা দত্তের বাবার গুণাকর দত্ত, এই পরিচয়ের সূত্রে স্যারের সঙ্গে বাবার একটু মেলামেশার সম্পর্ক হয়েছে। কিন্তু যিনি তাঁর আসল বন্ধু ও একমাত্র বন্ধু, তাঁর নাম বোধ হয় তুমিও শুনেছ।

—শুনেছি বোধ হয়। বোধ হয় কেন, মনে হচ্ছে নিশ্চয় শুনেছি।

—বাবার বন্ধুর নাম, পিটার শ্যামলাল।

—অ্যাঁ? কয়লার রাজা বলে যাঁর একটা সুনাম আছে, সেই পিটার শ্যামলাল?

—হ্যাঁ, তাঁর ঘোড়ারও সুনাম আছে।

—থাকবারই কথা।

—তাজ মুল্‌কি বিক্রম স্যামসন বীরবাহাদুর আর সোহরাব, নামগুলি তুমি শুনেছ নিশ্চয়।

—শুনেছি বোধ হয়।

—এরা সত্যিই এক-একটি হিরো। পিটার শ্যামলালের এইসব রেসহর্সের নাম তুমি সিঙ্গাপুর আর কলম্বোতেও শুনতে পাবে। আমার বাবা এই পিটার শ্যামলালের সব কাজ-কারবারের একমাত্র অ্যাডভাইসর।

—বাঃ।

—আমার মনে অবিশ্যি একটা দুঃখ আছে, বাবা আমার চেয়ে তাঁর এই বন্ধুকেই বেশি ভালবাসেন।

সন্দীপ—না এষা, এরকমের দুঃখ-টুঃখ মনের মধ্যে পুষে রেখে কোনও লাভ নেই। যে যেখানে যেমনটি আছেন, তিনি সেখানে তেমনটি হয়ে থাকুন, আমাদের সেজন্যে চিন্তিত হবার কোনও মানে হয় না।

এষা বলে—এবার সত্যিই যে একটু থামতে হবে, সন্দীপ।

সন্দীপ—এই কি তোমাদের বাড়ি?

এষা—বাড়িটা আমাদের নয়। এই বাড়ির দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের একটি ঘর তোমার এষার ঘর, যে ঘরে আজ সারারাত জেগে বসে থাকবে তোমার এষা, মনে মনে একজনের সঙ্গে কথা বলবে, আর ঘুমোতেই পারবে না। আচ্ছা, আমি এখন নামি। আসি।

সন্দীপ ডাকে—এষা! নেমে যাবার আগে...।

এষা—বলো।

সন্দীপ—তাহিতি ঠোঁট?

এষা—হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছে।

॥ ১১ ॥

কলকাতার মাঘ ফাল্গুন চৈত্র আর বৈশাখ—একের পর এক এসেছে আর চলে গিয়েছে। ময়দানের আকাশনিম বিলাতি শিরীষ আর মাদাগাস্কারি গুলমোরের ফুল ও পাতার শোভা বদলে গিয়েছে। কিন্তু এই চার মাসের মধ্যে আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের একটি বাড়ির সামনে একটি দৃশ্যের চেহারা একটুও বদলায়নি। সন্ধ্যা হলেই সন্দীপের ক্যাডিলাক ছুটে এসে এই বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। কোনওদিন কিছুক্ষণ, কোনওদিন অত্যন্ত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে যায়।

প্রতিবেশীদের চোখে এই বাঁধা-ধরা নিয়মিত দৃশ্যটা কোনও কৌতূহল জাগিয়ে তোলে কি তোলে না, সেটা কারও চোখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। অন্যে পরে কা কথা, এই বাড়িরই তিন নম্বর ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় ঘরের খোলা দরজার কাছে একটি চেয়ারের উপর যাকে বসে থাকতে দেখা যায়, তাঁরও চোখে কি কোনও কৌতূহল চঞ্চলিত হয় ? একটুও না। কন্যা এষা দত্ত যখন সন্দীপের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে আর সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠে কিংবা নেমে চলে যায়, তখন পিতা গুণাকর দত্ত নিবিষ্টচিত্তে খবরের কাগজ পড়তে থাকেন, চোখ তুলে একবার তাকানও না। ক'দিনই বা তাঁকে দেখতে পেয়েছে সন্দীপ ? এই চার মাসের মধ্যে মাত্র পাঁচবার। এষা নিজেই বলেছে—বাবা রাত্রিবেলাতে এখানে থাকেন না। সন্ধ্যে হতেই বেরিয়ে যান, ফিরে আসেন সকালবেলা।

সন্দীপ—কোথায় যান ? এতক্ষণ কোথায় থাকেন ?

এষা—এই বাড়ির সাত নম্বরে যিনি থাকেন, তিনি একজন মিস্টার লাহিড়ী। তিনি লোকের কাছে রটিয়ে বেড়ান—মেয়ের ঘরের ভিতরে রাত্রিবেলা অদ্ভুত ও বেপরোয়া হাসাহাসির শব্দ বরদাস্ত করতে পারেন না বলেই, গুণাকর দত্ত সন্ধ্যে হতেই বাইরে চলে যান আর হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিংরুমে শুয়ে থাকেন। পাশের বাড়ির জয়ন্ত মল্লিককে যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তিনি বলবেন যে, মেয়েরই ইচ্ছায় বা হুকুমে বাবা গুণাকর দত্ত রাত্রিবেলাতে ঘরে থাকেন না। বড় হলের একটা জুয়ার ক্লাবে রাত কাটিয়ে সকালবেলা বাড়িতে ফিরে আসেন। আর, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি বলব যে, পিটার শ্যামলালের ইচ্ছা ও অনুরোধের মানরক্ষা করবার জন্য তার বন্ধু গুণাকর দত্ত রোজই রাত্রিতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে কাজ-কারবারের ভালমন্দ অবস্থার কথা আলোচনা করেন, পরামর্শ দেন, আর ডিনারের পর সেখানেই একটি ঘরের বিছানাতে শুয়ে বুড়ো মানুষটি রাত্রিবেলার বাকি কয়েকটা ঘন্টা পার করে দেন।

সন্দীপ—আমাকে আর বেশি বলতে ও বোঝাতে হবে না, এষা। লাহিড়ী একটা নিরেট মিথ্যেবাদী আর জয়ন্ত মল্লিক একটা গবেট মিথ্যেবাদী। ওদের যা ইচ্ছে হয় তাই বলুক, আমাদের সেজন্য চিন্তিত হবার কোনও মানে হয় না।

হেসে ফেলে এষা—যে যেখানে যেমনটি আছে সে সেখানে তেমনটি থাকুক। তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করবার কিছু নেই।

সন্দীপও হাসে।—হ্যাঁ, চিন্তা করে কোনও লাভও নেই।

এই চার মাসের মধ্যে সন্দীপের জীবনের রূপ একটুও বদলায়নি। কিন্তু ভাবনার স্বভাবটা বদলেছে। আনন্দের ছুটোছুটির কোনও প্রোগ্রামের জন্য সন্দীপকে কিছুই আর ভাবতে হয় না। সন্দীপের ভাবনাটা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করে, আজ সন্ধ্যায় সন্দীপের জীবনের আবেগটাকে এষা তার নিজেরই ইচ্ছার আর উৎসাহের দুরন্ত টানে টেনে নিয়ে কোথাও কোনও আনন্দের কাছে নিশ্চয় পৌঁছে দেবে। নিশ্চিন্ত হয়েছে সন্দীপ।

বিনায়ক বলেছে—এটা তোমার সৌভাগ্য, সন্দীপ। দেশি ফিলসফির কথাও এই যে, প্রকৃতিই কাজ করেন এবং পুরুষ তাঁকে অনুসরণ করে চলেন। বিনায়কের কথা শুনে খুব খুশি হয়েছে সন্দীপ।—যা-ই বলো বিনায়ক, দেশি ফিলসফির যত বাজের কথার মধ্যে এটা কিন্তু একটা ভাল কথা।

সন্দীপ তো এত জেনেও কোনওদিন জানতে পারেনি যে, এই কলকাতাতে ওরকম চমৎকার একটা ক্লাব আছে। এষারই ইচ্ছায় কথায় ও আগ্রহে একদিন সেই ক্লাবে গিয়ে আলো-ঝলমল সুইমিং-পুলে সাঁতার দিয়ে যে আনন্দ পেয়েছে সন্দীপ, সে আনন্দ আগে কোনওদিন কল্পনাও করতে পারেনি। এষাব সাঁতারের কাছে কোথায় লাগে রাজহংসীর সাঁতার ? ছোট্ট একটি বিকিনি পরে সুইমিং পুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এষা, একটানা দশ মিনিট ধরে সাঁতার কাটল। এষার চমৎকার ব্রেস্টস্ট্রোক সুইমিং-পুলের জল উথলে দিয়ে যেন সন্দীপের চোখের আর বুকের তৃপ্তিটাকেই উথলে দিয়েছে।

এষা বলেছে—আমার কোনও সমস্যা নেই সন্দীপ। ঘর নামে কোনও ভয় আমার প্রাণে নেই।

সন্দীপ—কী বললে ? ঘর-বাঁধা জীবনকে তোমার ভয় করে না ?

কলকল করে হেসে ওঠে এষা। —ঘর আমাকে বাঁধতে পারে না, পারবেও না। আমিই ঘরকে বাঁধতে পারি।

সন্দীপ—ঠিক বুঝলাম না।

এষা—ঘরের বাইরে আমি তোমাকে যে আনন্দ দিতে পারি, ঘরের ভিতরেও সে আনন্দ দিতে পারি। আমার কাছে দুই-ই সমান।

এষার মুখের এই কথা শোনবার পর দশটা দিনও পার হয়নি, একদিন সন্দীপের প্রাণটা এই বিশ্বাসে ভরাট হয়ে গেল যে, ঘরের জীবনকে আনন্দ-উতলা করে তুলতে জানে এষা। মিথ্যে বলেনি এষা, বাড়িয়েও বলেনি।

সে ঘর আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর এই বাড়ির দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের একটি ঘর। সেই ঘরের ভিতরে একটি উৎসবের উচ্ছ্বসিত মধুরতার মধ্যে ডুবে গিয়ে সন্দীপের প্রাণটা যেন নতুন একটি বিশ্বাসের মুক্তা পেয়ে গেল। না, এষার মত মেয়ে ঘরবাসিনী হতে চাইলেও ভয় করবার কিছু নেই। তাতে সন্দীপের জীবেনর সাধ আশা আর আনন্দ একটুও ব্যথিত হবে না।

চার-পাঁচটা বোতল থেকে চার-পাঁচ রকমের পানীয় ঢেলে কাচের জারের বুকটা পরিপূর্ণ করে দিয়ে হাসতে থাকে এষা। —তোমার চেনা ওই অরোরা আর কলরডোর বার-এ কী-ই বা পাওয়া যায় ? কী-ই বা ওরা জানে ? একঘেয়ে স্বাদের যত সাদামাটা ড্রিঙ্ক ছাড়া কী-ই বা ওরা দিতে পারে ? আমি যা দিচ্ছি সেটা একবার খেয়ে দেখো। তারপর বলো, কেমন স্বাদ আর কেমন লাগল।

সন্দীপ—এটা তুমি কী তৈরি করলে ?

এষা—এটাকে বলা চলে, প্যারাডাইস ককটেল। অ্যাপ্রিকট ব্র্যান্ডির সঙ্গে ড্রাই জিন, তার উপর একটু লেমন জুস ঢেলেছি। কিন্তু আমার নিজের রুচির ফর্মুলা একটু অন্য রকমের। আমার প্যারাডাইস ককটেলে কিছু ক্রিম দিতে হয়। তাই দিয়েছি। খেয়ে দেখো, তারপর বলবে কেমন লাগল।

তিন-চার চুমুকের টানে যতখানি পারা যায় খেয়ে নিয়ে সন্দীপ হাসতে থাকে। —ভাল, কিন্তু বড়ই লঘু।

এষা। —হ্যাঁ, এটা মেয়েদেরই রোচে ভাল। আমার মনে হয়, তোমার দরকার মার্টিনি কিংবা দু'নম্বরের শেরি টুইস্ট। যা-ই হোক, সে না হয় আর একদিন হবে, আজ শুধু এই...।

সন্দীপ—আমার বিশ্বাস, এই লঘু প্যারাডাইস বার চারেক পেটে পড়লে বেশ গুরুতর হয়ে উঠবে।

এষা—হোক না।

সন্দীপ—তুমি দেখছি, এক চুমুকের টানেই গেলাস খালি করে দিচ্ছ।

এষা—এই রকমই আমার অভ্যেস। গেলাস হাতে নিলে আমি আর বেশি টিকুতে পারি না। আর এরকম করে এত দূরে বসে থাকতেও পারি না।

নিজের চেয়ার ছেড়ে সন্দীপের চেয়ারের কাছে এসে আর চেয়ারের কাঁধটা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এষা।

কী যেন ভাবছে এষা। শরীরটা হঠাৎ এক-একবার দুলে উঠছে। হয় মনের ভিতরে একটা নতুন ইচ্ছার দোলা, নয় লঘু প্যারাডাইসের আবেশ। এষার দু'পায়ের পাতা যেন কার্পেটের উপর একটা ছন্দ দুলিয়ে আর বুলিয়ে দিচ্ছে!

সন্দীপ—এ কী হচ্ছে, এষা ? এরই মধ্যে আর এতটুকুতে তোমার স্টেপ যে টলতে শুরু করেছে।

এষা—আমার স্টেপ কখনও টলে না সন্দীপ। এতটুকুতে না, অতটুকুতেও না।

সন্দীপ—তবে ?

এষা—তবে বলতে হয়...কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু কথা দিচ্ছি তোমাকে, ভাল ফ্লোর যদি কখনও পাই, তবে আমার স্টেপের কাজ তোমাকে তখন দেখিয়ে দেব।

সন্দীপের চোখে মুখে যেন চকিত বিস্ময়ের শিহর ছড়িয়ে পড়ে। যাকে সেদিন মন-মাতানো সাজ

আর ভঙ্গির অর্কিড-কুইন বলে মনে হয়েছিল, তার শরীরটা যে সত্যিই গুণের আর কাজের একটি সোনার খনি।

এক হাতে এষার কোমর জড়িয়ে ধরে সন্দীপ।—তুমি আমাকে আশ্চর্য করে দিলে, এষা। যত দিন যাচ্ছে, আমি ততই বেশি আশ্চর্য হচ্ছি।

এষাও সন্দীপের গলা জড়িয়ে ধরে।—আমি গর্ব করছি না, তবু বলব, কী জানে আর কতটুকুই বা জানে ওরা ?

সন্দীপ—কারা ? কাদের কথা বলছ ?

এষা—ওই, তোমাদের সেই রাতের ক্লাবের মেয়েগুলো, যে ক্লাবের তুমি একজন ন্যাওটা ভক্ত। একটা বাজে বলরুমের যত ভাড়া করা বাজে নাচনি। নাচের কী আর কতটুকুই বা ওরা জানে ? আহা, মিসেস থাম্বাটা নামে সেই ধুমসি, কী নাচই নাচলেন। যেমন কিম্ভুত বডি-সোয়ে, তেমনই কিম্ভুত ফুটওয়ার্ক। এটুকু শিক্ষা নেই যে, ওয়ালজে ন্যাচারাল টার্ন থেকে রিভার্স টার্নে যেতে হলে ওরকম বকের মত শুধু স্টেপ তুললে আর ফেললেই হয় না। মাপ মত এগোতে আর পিছোতে হয়।

এমন করে কোনওদিনও এত মুক্তকণ্ঠ হয়ে নিজের গুণের পরিচয় প্রকাশ করেনি এষা। আজ বোধ হয় ইচ্ছে করেই সন্দীপের প্রাণটাকে শত রকমের বিচিত্র বিস্ময়ে ভরে দেবার জন্য এক একটি বিরাট পর্দা সরিয়ে দিয়ে সন্দীপকে এক একটি নতুন আকাশের জ্যোৎস্না দেখিয়ে দিচ্ছে, সন্দীপও দেখে দেখে বিহ্বল হয়ে যাচ্ছে।

অপলক চোখে এষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। এষার চোখে ছোট্ট একটি ভ্রূকুটি, বুঝতে অসুবিধে নেই সন্দীপের, ওটা নিবিড় এক অভিমানের ভ্রূকুটি। কিন্তু কেন ? কী ভাবছে এষা। এষা বলে—তুমিই বা আমার কী আর কতটুকু জেনেছ ? কতটুকু চিনেছ ?

স্বীকার করে সন্দীপ—না, চিনতে পারিনি। কিন্তু আজ বলতে পারি, চিনেছি।

সন্দীপের গলা ছেড়ে দিয়ে সরে যায়, আবার নিজের চেয়ারের কাছে গিয়ে টেবিলের একটা ট্রের ঢাকা সরিয়ে সন্দীপের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।

সন্দীপ—খাবারও আনিয়ে রেখেছ ?

এষা—না আনিয়ে উপায় কী ? রোজারিও'র কিচেনের প্যাটি তোমার খুব পছন্দ, তাই আনিয়েছি। নইলে আমি নিজের হাতেই...আমি বলব, কী আর কতটুকুই বা জানে তোমার রোজারিও ? ওরা কি পারবে, তোমার জন্যে রোস্ট ডাক আ'লোরাঁজ তৈরি করে দিতে ? জানে কি ওরা, ফ্রেঞ্চ চিজ সুপ তৈরি করতে হলে তিন কাপ চিজের সঙ্গে অন্তত দু'চামচ শেরি আর চার কাপ চিকেন স্টক মেশাতে হয় ?

প্যারাডাইস ককটেলের জাগ সন্দীপের হাতের কাছে এগিয়ে দেয় এষা—খাও, খেয়ে ফেলো। আর আমাকে দশ মিনিটের জন্য ক্ষমা করো, আমি আসছি।

দশ মিনিটও লাগে না, তিন মিনিটের মধ্যে প্যারাডাইস ককটেলের শেষের ফোঁটাটাকেও খেয়ে নিয়ে শূন্য জাগের দিকে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। জাগের কাচ ঝিকঝিক করে হাসছে। সেই হাসির মধ্যে যেন সন্দীপের একটা স্বপ্ন হাসছে। সেই স্বপ্নের মধ্যে যার মুখটা হাসছে, সেটা এষারই মুখ।

—এই যে আমি। তোমার এষা। চিনতে পারছ তো ?

দশ মিনিট শেষ হবার আগেই অদৃশ্য অন্তরাল থেকে যেন একটি অনাবরণ কুহকের ছবি হয়ে আবার ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে এষা। যে শাড়ি গায়ে জড়িয়েছে, সেটা একটা সিল্কের নেট বলে মনে হয়। স্বচ্ছ শাড়িটাকে একটা বস্তু বলেই মনে হয় না। ওটা আবরণ নয়, আবরণের একটা মায়া।

চেয়ারে বসে না এষা। টেবিলের কাছে এসে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা হেলিয়ে আর মাথার ফাঁপানো চুলের স্তবকটাকে একটু দুলিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে।—বলো এবার, আমার এই লং-মোবাইল হেয়ার-ডু তোমার দেখতে ভাল লাগছে কি লাগছে না ? এরকম পিন-কার্ল রিপ্‌ল তোমার পছন্দ হয় কি না ?

সন্দীপ—একথা কেন আর জিজ্ঞাসা করছ ?

এষা—সাজতে আমি ভালবাসি বটে, কিন্তু সেজন্য আমি খুব বেশি মাথা ঘামাই না। মাসে একশো টাকাও লাগে না। সামান্য কিছু পাস্তুরাইজড ফেস ক্রিম, এক শিশি অল-টোন শ্যাম্পু, এক শিশি স্কিনটনিক লোশন, আর একটি মাত্র নন-স্মিয়ার লিপস্টিক হলেই চলে যায়। চোখের জন্য মাসকারা পেন্সিল বড় একটা ছুঁই না, দরকারও হয় না।

সন্দীপের চোখের কাছে নিজের চোখ দুটোকে এগিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে এষা।—ভাল করে দেখে নাও, একান্ন টাকা দিয়ে কেনা নকল আইল্যাশ নয়।

নিজের ছবি উন্মোচিত করে দেখাবার একটা নেশায় পেয়েছে এষাকে। সে আজ এই মুহূর্তে সন্দীপকে বোধ হয় একটি পরম বিস্ময়ের সত্য বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, পৃথিবীতে যত আলো রং আর স্বাদুতা আছে, সবই এষার মন-প্রাণ ও শরীরের মধ্যে আছে। সন্দীপ একেবারে মুগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এষার এই নেশার আবেগ থামবে না।

দেখতে পায় এষা, সন্দীপের চোখে চরম ব্যাকুলতার ছবিটি এইবার ফুটে উঠেছে। এষা বলে—বলতে পার, কেন আমি এখন এরকম একটা হালকা সাজ করেছি ?...বলতে পারলে না। তবে শোনো...।

সন্দীপ—বলো।

এষা—তোমার কোলে বসতে হবে, তাই এরকম সাজ।...অ্যাঁ, এত আস্তে আস্তে কী বলছ তুমি ? পাগল হয়ে গেলে নাকি ?

সন্দীপ—না, কিছু বলছি না। শুধু ভাবছি একটা কথা। শুধু মনে পড়ছে, ড্রাইডেনের কবিতার কয়েকটা কথা। হে প্রিয়া, আমাকে তোমার ওই দুই ঠোঁটের উপর চিরকাল পড়ে থাকতে দাও ; তোমার দুই ঠোঁটের স্বাদের কাছে দেবতাদের সুধারসও বিস্বাদ।

সন্দীপের কাছে এসে দাঁড়ায় এষা।—তোমার সেকেলে ড্রাইডেন কী আর কতটুকুই বা বুঝেছেন ?

নন-স্মিয়ার লিপস্টিক দিয়ে রাঙানো এষা দত্তের দুটি চমৎকার তাহিতি ঠোঁট তখনি সন্দীপের মুখের উপর লুটিয়ে পড়ে বিচিত্র কারুকলার দুরন্ত-মধুর স্বাদ ঝরিয়ে দিতে থাকে। দেখে খুশি হয় এষা, সে স্বাদের প্লাবনে সন্দীপের মুগ্ধ হৃৎপিণ্ডটা ভেসে যেতে চাইছে।

সে রাতে সন্দীপের ক্যাডিলাক সকাল পর্যন্ত রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে রইল। আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের শিমুলের মাথার উপরে যখন অনেক রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, তখন এষার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাডিলাকের কাছে এসে দাঁড়ায় সন্দীপ। রাতজাগা অলস ও অচল গাড়িটা আবার সচল হয়ে ছুটতে থাকে।

॥ ১২ ॥

রূপের আর গুণের যত রকমের সুন্দরতা আছে, তা থেকে তিল তিল করে নিয়ে একসঙ্গে করলে তিলোত্তমা হয়। এরকম একটা কল্পনার কথা শুনতে পাওয়া যায়। এষাকে তবে কী বলতে হয় ? তিলোত্তমা ?

সন্দীপ রায়ের মনটা অনেকবার এরকমের প্রশ্ন করে এষার কথা ভেবেছে আর হেসেছে। হাসিটা আদ্যিকেলে গল্পের কল্পনার কথাটাকে ঠাট্টা করেছে বটে, কিন্তু সন্দীপের মনটাকে নয়। সন্দীপের মন কাল্পনিক গ্যাসের বেলুন নয়। যুক্তিতে না মানলে কিছুই মানে না সন্দীপ। যুক্তি আর প্রমাণ দিয়ে এষাকেও বিচার না করে পারেনি সন্দীপ। এর আগে অনেক আশা করে যাদের খুব কাছে গিয়ে খুব ভাল করে দেখতে পাওয়া গেল, তাদের প্রাণবস্তুর আর জীবনটার ষোল আনার মধ্যে চার আনা আলো, বারো আনা অন্ধকার। যাকে একটু উজ্জ্বল বলে মনে হল, তারও আলো পাঁচ-ছয় আনার বেশি নয়। এষার তুলনায় তারা কিছুই নয়। তুলনা করলে বলতে হয়, বিজলী বাতির আলোর কাছে মেটেপিদিমের আলো। যা চেয়েছিল ও আশা করেছিল সন্দীপ, তার সবই এষার আছে। যা

আশা করতে পারেনি সন্দীপ, যে আনন্দ স্বপ্নেও জানা ছিল না, তাও যেন এষার হাতে মালা হয়ে দুলছে। চাইলেই পাওয়া যায়। না চাইলেও পাওয়া যায়। এষার কথা ভাবতে গিয়ে কল্পনার ভাষাটা যদি একটু বাড়াবাড়ি করে, তবে করুক না। কল্পনা তো কোনও মিথ্যেকে লুকিয়ে রেখে কথা বলছে না।

সন্দীপের জীবনে এষা দত্ত একটি বিস্ময়কর প্রাপ্তি। যেন সুপ্রসন্ন অদৃষ্টের আকস্মিক উপহার। যদি সন্দীপ সেদিন ভুল করে কিংবা কুঁড়েমি করে জয়াজী লিমিটেডের নতুন ফ্যাক্টরির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হত, তবে সন্দীপের জীবনটা আজও বোধ হয় কোনও একটা পুরো পুরনো মিথ্যা কিংবা আধখানা নতুন কোনও মিথ্যার সঙ্গে ছুটোছুটি করে শুধু হয়রান হত। এষাকে পাওয়া যেত না। সে বঞ্চনার চেয়েও একটি আরও অদ্ভুত বঞ্চনা এই হত যে, জীবনে কোনওদিনও জানতে পারত না সন্দীপ, কী তৃপ্তি থেকে জীবনটা বঞ্চিত হল।

আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর রাস্তার শিমুল নতুন ফুলে রঙিন হয়ে উঠেছে। সন্দীপের জীবন যে নতুন আহ্বানের সঙ্কেত পেয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে, সেটাও কম রঙিন নয়। প্রতি সন্ধ্যায় আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর এই বাড়ির দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের একটি ঘরে এষা দত্ত যে অভ্যর্থনার নায়িকা হয়ে সন্দীপের অপেক্ষায় থাকে, সে অভ্যর্থনা বসন্তোৎসবের চেয়ে কম রঙিন নয়। এই উৎসবের আবির গুলাল কুঙ্কুম আর রংঝারি, সবই হল এষা। ভালবাসার অতিথিকে শত তৃপ্তি দিয়ে অভিষিক্ত করতে এষার কোনও কুণ্ঠা নেই।

হেসে হেসে জুহুর সমুদ্রস্নানের গল্প করতে করতে এষা একদিন হঠাৎ বলে ওঠে—সব পরীক্ষাই তো দিলাম, এবার...।

সন্দীপ—অ্যাঁ ? কী বললে ? থামলে কেন ?

এষা—না, যতটুকু বলেছি ততটুকুই বলেছি। এর বেশি বলব না।

সন্দীপ—তবে কী করে বুঝব যে, তুমি কী বলতে চাইছ ?

এষা—কেন ? যতটুকু বললাম, তাতে কি কিচ্ছু বোঝা যায় না ?

সন্দীপ—সত্যিই বুঝতে পারছি না। কিসের পরীক্ষা কবে কোথায় দিলে ?

সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে এষার দুই চোখের সুস্থির দৃষ্টির মধ্যে যেন একটা প্রশ্নের বিস্ময় জ্বলজ্বল করছে। কথাটার অর্থ একটুও কেন বুঝতে পারল না সন্দীপ, বোধ হয় এই নীরব প্রশ্নটারই বিস্ময়।

পরমুহূর্তে হাতের রুমাল তুলে মুখ-চাপা দিয়ে হেসে ওঠে এষা।—আমি কিন্তু বুঝেছি, তুমি কেন বুঝতে পারছ না।

সন্দীপ—তা হলে তুমিই বলো, কী বুঝেছ।

এষা—তোমার বোধ হয় মনে হয়েছে যে, আমি বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

সন্দীপ—না না, কখনও না।

এষার দুই চোখের দৃষ্টি আরও জ্বলজ্বল করে।—আমি সেরকম মেয়ে নই সন্দীপ, যারা বিয়ের শর্তে ভালবাসে।

সন্দীপ—আমি জানি, আমি জানি।

এষার দুই উজ্জ্বল চোখ আরও প্রখর হয়ে হাসে।—যাকে আমি ভালবাসলাম সে যদি আমার সঙ্গে চিরকাল থাকে, তবেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেল ; বিয়ে হোক বা না হোক।

সন্দীপ—আমিও তাই বিশ্বাস করি, এষা। বিয়েটা ভালবাসার শর্ত হবে কেন ? বিয়ে তো ভালবাসার শেষ নয়, বিয়ের পরেও ভালবাসা থাকে। ভালবাসা তার নিজের জোরেই বেঁচে থাকে, বিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখে না। কাজেই...

এষা—কাজেই আমরা বেশ আছি, খুব ভাল আছি।

সন্দীপ—আমি একথা বলি না যে, বিয়ের কোনও দরকারই নেই। বিয়ে যদি হয় তো হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ে কি ভালবাসার একটা...। বলতে গিয়ে হেসে ফেলে সন্দীপ।—আমি শুধু সেকেলে শাস্ত্রী পণ্ডিতকে নয়, একালের বড় বড় মাথাওয়ালা চিন্তাবিদকেও জিজ্ঞাসা করতে চাই, হ্যাঁ

মশাই, বিয়েটা কি প্রেমের সায়েন্টিফিক রেজাল্ট, অথবা একটা অবধারিত অপরিহার্য স্বাভাবিক পরিণাম ?

এষা—মনে হচ্ছে তোমার গেলাস খালি হয়ে গিয়েছে ?

সন্দীপ—হ্যাঁ।

এষা—তাই বলো !

সন্দীপ—অ্যাঁ ? আমার বেশ নেশা হয়েছে বলে সন্দেহ করছ ?

এষা—না না, বিশ্বাসের কথাটাকে খুব জোর দিয়ে বললে অনেক সময় ওরকম শোনায়।

হাসতে থাকে সন্দীপ।—না, তা হলে আর জোর দিয়ে কোনও কথা বলব না। বরং তুমি বেশ একটু জোর দিয়ে...। এষাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সন্দীপ।—সেদিনের মত বেশ শক্ত করে একটু...।

এষা—আমার একটা অনুরোধের কথা শুনবে ?

সন্দীপ—নিশ্চয় শুনব, বলো।

এষা—আজ আমাকে মাপ করো। ছেড়ে দাও। শান্ত হয়ে বসো।

সন্দীপ—বেশ তো, ছেড়ে দিচ্ছি ; কিন্তু...তুমি যেন আনমনা হয়ে অন্য কোনও কথা ভাবছ।

এষা—ভাবতে বাধ্য হচ্ছি সন্দীপ। কত চেষ্টা করলাম, না আর ভাবব না ; তবু ভাবনাটা যেন জোর করে মনের মধ্যে ঢুকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

সন্দীপ—কিসের ভাবনা ?

এষা—স্যারের ভাইঝি মৃদুলা কলকাতাতে এসেছে। আমাকে দেখেই আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, অব তুমকো নেহি ছোড়েঙ্গে।

সন্দীপ—এর মানে ?

এষা—এর মানে, মৃদুলা এখন ওর বাবার সঙ্গে টোকিওতে যাবে আর সেখানেই থাকবে। মৃদুলা বলেছে, এষাদিকেও যেতে হবে, ওর সঙ্গে থাকতে হবে, মাস্ট মাস্ট মাস্ট। তুমি তো জান না সন্দীপ, মৃদুলা ওর বাবার কত আদরের মেয়ে। মৃদুলা যদি ওর বাবাকে ধরে বসে যে, এষাদিকে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিতে হবে, তবে রাজি হতে এক মুহূর্তও দেরি করবেন না মৃদুলার বাবা।

সন্দীপ—এসব কী অদ্ভুত কথা বলছ এষা। কোথাকার কে এক মৃদুলা...পাঁচ হাজার টাকা মাইনে...টোকিও। এসব শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছে না।

এষা—আমারও কি শুনতে ভাল লেগেছে ? একটুও না।

সন্দীপ—তুমি আপত্তি করে, শুধু স্পষ্ট করে একটা 'না' বলে দিয়ে ওরকম অদ্ভুত অনুরোধের মুখ বন্ধ করে দিলেই পারতে।

এষা—আমি আপত্তি করেছি। স্পষ্ট করে 'না' বলে দিয়েছি। তবু...।

সন্দীপ—তবু আবার কী ?

এষা—টোকিওর জন্যে আমার প্রাণ কাঁদে না, পাঁচ হাজার টাকা মাইনের জন্যেও না। কিন্তু মৃদুলা খুব দুঃখ পাবে, শুধু এই কথা ভেবে আমাকে খুবই কষ্ট পেতে হচ্ছে। ভেবেছিলাম, তোমাকে এসব কিছুই বলব না। তবু বলে ফেললাম।

সন্দীপ—আমাকে না বললেই ভাল করতে।

এষা—ঠিকই বলেছ। কিন্তু এসব কথা নিয়ে তোমার তো ভাবনা করবার কিছু নেই।

সন্দীপ—ঠিক, আমার ভাবনা করবার কিছু নেই, শুধু শুনতে ভাল লাগে না, এইমাত্র।

এষা আবার আনমনা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এষার পিঠে হাত বুলিয়ে কথা বলে সন্দীপ।—মৃদুলার কথা ভেবে তোমারও তো এত দুঃখ বোধ করবার কিছু নেই। তুমি মৃদুলার কথা ভুলে যাও।...আচ্ছা, আমি এখন তবে চলি।

এষার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসবার পর বাড়িতে ফিরে এসেও সন্দীপের মনটা সারাক্ষণ অদ্ভুত এক অস্বস্তির পীড়ন সহ্য করতে থাকে। মৃদুলার আবদেরে অনুরোধ যেন সন্দীপের জীবনের সৌভাগ্যটাকে ছিঁড়েফুঁড়ে নষ্ট করে দেবার একটা চক্রান্তের দাবি। রাতের ঘুমটাও বার বার তিনবার

ভেঙেছে। বুঝতে পেরেছে সন্দীপ, অস্বস্তিটা স্বপ্নের মধ্যেও ঢুকেছে। মাঝে মাঝে এই অস্বস্তির জ্বালা এত তীব্র হয়েছে যে, এষার ইচ্ছাটাকেও সন্দেহ করে ফেলেছে সন্দীপ। এষা অবিশ্যি বলছে যে, মৃদুলাকে খুব স্পষ্ট করে 'না' বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি সেকথা বলেছে এষা ? এষার টোকিও চলে যাওয়া যে সন্দীপের ভালবাসার সর্বনাশ, এই সহজ-সরল বাস্তব সত্যটি কি এষার বুঝতে কোনও অসুবিধে আছে, একটুও না। হতে পারে, অসম্ভব নয়, সন্দীপকে আপাতত একটা মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে এষা একটা বানানো কথা বলেছে, মৃদুলাকে 'না' বলে দেওয়া হয়েছে। ওদিকে মৃদুলাকে হয়ত 'হ্যাঁ' বলে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে এষা। কিন্তু এষার বুদ্ধিটাকে এরকম ভয়ানক একটা দু'মুখো সাপ বলে বিশ্বাস করতে পারে না সন্দীপ। না, না, সন্দেহ নয়। সন্দেহ করবার কিছু নেই। শুধু এষাকে ভুল বোঝবার ভয় থেকে রক্ষা পেতে চায় সন্দীপ। কিন্তু, কি আশ্চর্য, তবু অস্বস্তির ভার একটুও হালকা হয় না কেন ? এই অস্বস্তির ভার অনেক হালকা হয়ে যেত, যদি শুধু এটুকু জানতে পারা যেত যে, এষা যা বলেছে সেটা এষার জীবনের কোনও ক্লান্তির ভাষা নয় ; সত্যিই মৃদুলা নামে একটা উৎপাত এষাকে টোকিওতে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি শুরু করেছে।

তাই আর দেরি করে না সন্দীপ। পরদিন ব্যাঙ্কে যাবার আগেই সন্দীপের ক্যাডিলাক ছুটে গিয়ে জয়াজীব বাড়ির গেটের কাছে এসে দাঁড়ায়।

জয়াজী তাঁর অফিস-ঘরে চাকা-লাগানো চেয়ারের উপর বসে আছেন। সন্দীপকে দেখতে পেয়ে বেশ খুশি হয়ে কথা বলেন জয়াজী—এসো, তোমার কথা আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। মনে পড়বেই তো, মাধববাবু আমার কারবারের কাজে কত সাহায্যই না করতেন ; সেসব কথা তো ভুলে যাইনি। হ্যাঁ, যদি ব্রেনে প্যারালিসিস হত, তবে সবই ভুলে যেতে হত।

জিভে জড়তা থাকলেও খুব উৎফুল্ল হয়ে কথা বললেন জয়াজী।

সন্দীপ—মনে হয়, আপনি এখন বেশ সুস্থ আছেন।

জয়াজী—মোটামুটি।

সন্দীপ—আপনার ভাইঝি মৃদুলা বুঝি টোকিও যাচ্ছে ?

জয়াজী—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি কি মৃদুলাকে চেন ?

সন্দীপ—না, আমি এষাকে চিনি। তার কাছ থেকে শুনলাম যে...।

জয়াজী—বুঝেছি, এষাও তোমাকে চেনে।

সন্দীপ—মৃদুলা বোধ হয় এষাকে টোকিওতে নিয়ে যেতে চাইছে।

জয়াজী—জানি না ; এরকম কোনও চমৎকার খবর আমার কানে আসেনি।...হ্যাঁ, এষা কি তোমার কোনও আত্মীয়া ?

সন্দীপ—না।

জয়াজী—বুঝেছি, বুঝেছি। তোমার বোধ-হয় জানতে ইচ্ছে হয়েছে, এষাও টোকিওতে যাবে কি যাবে না ?

সন্দীপ—হ্যাঁ।

জয়াজী—হ্যাঁ, ঠিকই, এই বয়সে জানতে-টানতে খুব ইচ্ছে হয়।

সন্দীপ—আমি এখন তবে চলি।

জয়াজী —হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবে আবার এসো।

সন্দীপের নিঃশ্বাসের বাতাসে এখন আর কোনও যন্ত্রণা নেই। মিথ্যে অস্বস্তির গুমোট ভেঙে গেল। নিজেরই কাছে নিজেকে বেশ লজ্জিত বোধ করে সন্দীপ। এষাকে ভুল বোঝবার ভয় থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। ক্লান্ত হয়নি এষা। এষার প্রাণে, এষার ভালবাসার প্রাণেও সেই ওদের ভীরু প্রাণের হঠাৎ-বাতিকের মতো অদ্ভুত কোনও ক্লান্তি দেখা দেয়নি।

কিন্তু কী ভয়ানক আশ্চর্য, অস্বস্তিটা তবু সরে যেতে চাইছে না। জয়াজী যদিও কিছু বলতে পারলেন না, তবু বিশ্বাস করতে হয় যে, মৃদুলা সত্যিই এষাকে টোকিওতে নিয়ে যেতে চাইছে। মৃদুলার অনুরোধটা যদি খুব কাঁদাকাটি শুরু করে দেয়, তবে এষা কি শেষ পর্যন্ত টোকিওতে

না-যাওয়ার ইচ্ছাটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারবে ? টোকিওতে কবে যাবে মৃদুলা ? যাবার দিন কি ঠিক হয়ে গিয়েছে ? না যাওয়া পর্যন্ত সন্দীপ এই অস্বস্তির পীড়ন সহ্য করতে হবে। সব সময় মনটা কিম্ভুত একটা ভয় পুষে রাখবে, এই বুঝি মৃদুলার জন্যে এষার মমতা উথলে উঠল, তারপর ঢেউয়ের মত দুলতে শুরু করল, আর সেই ঢেউয়ের উপর দিয়ে মৃদুলার সঙ্গে তার গভর্নেস এষা দত্তকেও নিয়ে জাহাজটা চলে গেল। সে দুর্ভাগ্য কেমন করে সহ্য করবে সন্দীপ ? মনে হয়, মৃদুলা নিশ্চয় আজ আবার টেলিফোনে এষাকে ডেকেছে। আর এষাও সেই ডাক শুনেই ছুটেছে ; মৃদুলার কাছে গিয়ে বলেছে—আমি তোমার সঙ্গে না গেলে কি চলবেই না, মৃদুলা ?

এটা তো এষার মনের একটা ভয়ানক দুর্বলতার ভাষা ? এষা নিজেও বুঝতে পারছে না যে, মৃদুলার অনুরোধেব কাছে কত তাড়াতাড়ি নেতিয়ে পড়ছে এষার অনিচ্ছার শক্তিটা।

আজ সন্ধ্যায় আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুতেই দেখতে পায় সন্দীপ, সড়কের শিমুল গাছের একটা ডাল ভেঙে গিয়ে ঝুলছে। ভাঙা ডালের সব ফুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। যেন পুড়ে গিয়েছে। সত্যিই কি এটা একটা দুর্লক্ষণ ?

উপরতলায় ওঠবার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতেই বাড়ির দারোয়ান সেলাম করে সন্দীপের হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দেয়। এষা লিখে রেখে গিয়েছে এই চিঠি—এইমাত্র মৃদুলা ফোন করে ডাকল। তাই যাচ্ছি। তুমি রাগ করো না। কাল সন্ধ্যায় তুমি তো আসছই, আবার দেখা তো হবেই।

ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসতেই বুঝতে পারে সন্দীপ, এখনই গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়া উচিত নয়। জীবনে কোনওদিন কোনও শেরিতে কিংবা হুইস্কিতে সন্দীপের হাত দুটোকে এত অবশ করে দিতে পারেনি। এষার মমতা-ভীরু মন মৃদুলার অনুরোধের কাছে যে বিকিয়ে যেতে পারে, তারই সঙ্কেত শিমুল গাছের ভাঙা ডালের সঙ্গে ঝুলছে।

জানে না, বুঝতেও পারে না সন্দীপ, গাড়িতে সিটের উপরে এভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে কতখানি সময় ফুরিয়ে গেল ! সন্দীপকে এভাবে বসে থাকতে দেখে কেউ আশ্চর্য হয়েছে কি হয়নি, তাও বুঝতে কিংবা দেখতে পায়নি সন্দীপ।

না, আর এই অস্বস্তি সহ্য করবার কোনও অর্থ হয় না। এরকম হারাই-হারাই সদা-ভয়-হয় অবস্থা কবিতার মধ্যেই থাকুক, মানুষের জীবনে থাকতে পারে না। আর দেরি না করে চরম নিষ্পত্তি করে ফেলাই উচিত।

দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে সন্দীপ, ট্যাক্সি থেকে এষা নামছে। হেসে হেসে হাত তুলে সন্দীপকে ইশারা করছে—এসো।

আজ সন্ধ্যায় দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের সেই ঘরে শেরির গেলাসে চুমুক দিয়ে সন্দীপ স্পষ্ট ভাষায় চরম নিষ্পত্তির কথাটাই বলে ফেলে—এবার তুমি তৈরি হয়ে থাকো, এষা। আর আমি তোমাকে এখানে পড়ে থাকতে দেব না।

চমকে ওঠে এষা—কী বললে, ঠিক বুঝলাম না।

সন্দীপ—আমার ইচ্ছা, আমাদের বিয়েটা এবার হয়ে যাক, আর দেরি করবার কোনও মানে হয় না।

এষা—বিয়ে ?

সন্দীপ—হ্যাঁ, আমি জানি তুমি বলবে যে, বিয়ে হলেই বা কি আর না হলেই বা কি ? না, আমি আর একথা শুনতে চাই না, যদিও খুব সঙ্গত কথা।

এষা—বেশ তো, বিয়ে হবে, বিয়ে হোক। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করবার কি কোনও দরকার আছে ?

সন্দীপ—আছে।

এষা—কেন ?

সন্দীপ—আমার জীবনে তুমি তো একটা বন্ধন নও। বন্ধন হতেও পারবে না, হবেও না। এটা যখন বুঝতে পেরেই গিয়েছি, তখন আর দেরি করব কেন ?

এষা—বেশ, তোমার ইচ্ছে হলে আমার তো কোনও অনিচ্ছে হতে পারে না।

সন্দীপ—তবে শোনো, আজ এখনই তুমি আমার সঙ্গে যাবে, আমার কাছেই থাকবে। আমি সাত দিনের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলব।

এষা—এবার আমার একটা অনুরোধের কথা শুনবে?

সন্দীপ—বলো।

এষা—আমি তোমার সঙ্গে এখনই তোমার বাড়িতে যাব। তোমার কাছে অনেকক্ষণ থাকব। কিন্তু রাত্রিতে আমাকে এবাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে যেও, সন্দীপ, প্লিজ।

সন্দীপ—বেশ, কিন্তু আমার আরও একটা অনুরোধ আছে। তুমি এই ক'দিন কোনও সকাল-দুপুর কিংবা বিকেলে আমাকে সঙ্গে না নিয়ে এবাড়ির বাইরে কোথাও যাবে না, মৃদুলা ডাকলেও যাবে না।

হেসে ফেলে এষা—বেশ তো, এটা আমার পক্ষে একটুও কঠিন কথা নয়।

সন্দীপ—তবে চলো।

ঘর থেকে বের হয়ে এষার হাতটা এক হাতে বেশ শক্ত করে ধরে রেখেই গাড়িতে ওঠে সন্দীপ।

॥ ১৩ ॥

থেকেও নেই, এই অবস্থা যেমন একটা অদ্ভুত নাস্তিত্ব, তেমনই নেই তবু আছেন, এই অবস্থাও একটা অদ্ভুত অস্তিত্ব। বালিগঞ্জের রায়ভবন, এত বড় একটি তিনতলা বাড়ির সবচেয়ে ছোট ঘরে যিনি থাকেন, চারুশীলা রায়, তিনি এই রকমই একটি অদ্ভুত অস্তিত্ব। প্রতিবেশীদের অনেকে ভুলেই গিয়েছেন যে, চারুশীলা রায় আজও এই বাড়িতে আছেন। ন'মাসে ছ'মাসে ক্বচিৎ কখনও তাঁকে বাইরে বের হতে দেখা যায়, তখন প্রতিবেশীদের সবারই মনে পড়ে, হ্যাঁ, মাধব রায়ের স্ত্রী এখনও এই বাড়িতে আছেন।

বছর দু'য়েক আগে অ্যাটর্নি নরেশবাবুর স্ত্রী, তাঁর ছোটমেয়ে সুমিত্রার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসে যখন এই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন বেশ চমকে উঠেছিলেন।—এ কী চারুদি! আপনি এই ছোট্ট ঘরে থাকেন।

চারুশীলা হেসে হেসে বলেছিলেন—হ্যাঁ, আমি এই আকাশ-ঘরে থাকি।

ঠিক কথা, চারুশীলার জীবনটা যেন শূন্যতার আকাশের মধ্যে এক টুকরো ঠাঁই খুঁজে নিয়েছে। তেতলার বারান্দা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা ঝুল-চাতালের উপর কাঠের একটি ছোট কেবিন-ঘর, যে ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মাধব রায় রোজই ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যোদয় দেখতেন। আজ সেই ঘরের মেঝের উপর চারুশীলার ছোট একটি বিছানা আর ছোট একটি ডেস্কের উপর মাধব রায়ের খুব ছোট একটি মার্বেল মূর্তি। সন্ধ্যা হলে যখন তাঁর এই আকাশ ঘরে আলো জ্বালেন চারুশীলা, তখন পালিশ করা বিকানির মার্বেলের মাধব রায়ের চোখ দুটো চিকচিক করে। চারুশীলা বলে ফেলেন—তুমি হাসছ, না কাঁদছ, বুঝতে পারছি না।

দমদমের হেমলতাকে তাঁর চারুদি যে কথা বলেছিলেন, সেটা চারুদির জীবনের একটা করুণ সত্য আমি আর গান গাইতে পারি না হেম! মাধব রায়ের মৃত্যুর পর একদিনও গান গাইতে পারেননি চারুশীলা। তিনি আছেন বটে, তাঁর গলার গান মরে গিয়েছে। মাঝে কয়েকটা দিন তাঁর মনটা অশান্ত হয়ে খুব ছটফট করেছিল। নিঃশ্বাসটা যেন বার বার আর্তনাদ করেছে—স্বপ্ন ব্যর্থ হল, স্বপ্ন ব্যর্থ হল। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছেন, পাশের বাড়ির জানালার কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে একটা পাখিকে দেখবার চেষ্টা করছে। একটা ঘুঘু পাখি, ফরফর করে উড়ে উড়ে গাছের এই ডাল ছেড়ে ওই ডালে বসছে। বুঝতে অসুবিধে নেই, মেয়েটি একটি নতুন বউ। চারুশীলার মনটা বলে উঠেছে, স্বপ্ন ব্যর্থ হল। আর একটি বাড়ির জানালার গরাদ ধরে নাচানাচি করছে একটা এক-বছর বয়সের বাচ্চা। চারুশীলার নিঃশ্বাসটা ডুকরে উঠেছে, স্বপ্ন ব্যর্থ হল।

না, আর জানালার কাছে এসে কখনও দাঁড়িয়ে থাকেন না চারুশীলা। আর মনটাও কয়েকদিনের মধ্যে নিজেই শান্ত হয়ে গিয়েছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখবার কিছু নেই। শূন্য, সবই শূন্য।

অনেকদিন পর আবার চমকে উঠেছেন চারুশীলা। ঘুমটা ধড়ফড়িয়ে ভেঙে গিয়েছে। জেগে উঠেই বিকানির মার্বেলের মাধব রায়ের দিকে তাকিয়েছেন আর কথাও বলে ফেলেছেন—কেন ডাকলে ?

স্মৃতির ভাষা আর স্বপ্নেতে শোনা একটা ডাক। ডেকেছেন মাধব রায়। কোনওদিন কোনও স্বপ্নেতে সে মানুষটা এমন করে তাঁকে কখনও ডাকেনি। খুব আস্তে কথা বলা যাঁর অভ্যাস, সেই মাধব রায় কত জোরে চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছেন—চলো চারু, একটু তাড়াতাড়ি করো, নইলে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যাবে। চলো, এখান থেকে বের হয়ে সোজা হাঁটা দিয়ে, বুদ্ধ মন্দিরটা একবার দেখে নিয়ে, লেক হয়ে, তারপর রাসবিহারীতে এসে, সম্ভব হলে মহানির্বাণের ভিতরে একটু উঁকি দিয়ে, তারপর গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে কিছু সাদা পদ্ম, না পাই কিছু শালুকই না হয় কিনে নিয়ে এলাম।

আজ বিকেলে বিছানায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন চারুশীলা। কখন সন্ধ্যা হয়েছে, কখন বিশুর মা এসে ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছে, কিছুই বুঝতে পারেননি। স্বপ্নেতে মাধব রায় এসে ডাক দিয়েছেন বলেই ঘুমটা ভেঙে গেল।

উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন চারুশীলা। বারান্দার জাফরির জালের ভিতর দিয়ে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না এসে মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিন তাঁর হাত থেকে ফসকে গিয়ে অনেকগুলো সাদা শালুক মেঝের উপর পড়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল, শালুকগুলি যেন টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না।

আজ অনেকদিন পরে শুকনো চোখ দুটো আবার এমন করে ভিজে গেল কেন ? একলা প্রাণটা তাই একটু রাগ করেই জিজ্ঞেস করতে চায়, আর কেন ডাকো ?

> সে বসন্ত সে বরষা, সে আনন্দ সে ভরসা,
> আঁধারে মিলায়ে গেছে, আর পাবে নাকো।

আজকের সন্ধ্যার বাতাসের ভাবটাও বেশ উতলা। তাই বারান্দার ওদিকের একটা টবের বুকের ছোট্ট তুলসী গাছটা মাথা দুলিয়ে কাঁপছে। আস্তে আস্তে হেঁটে তুলসীটার কাছে এসে দাঁড়াতেই চারুশীলার শূন্য প্রাণের অভিমান আরও উতলা হয়ে ওঠে। তাই আর নীরব হয়ে থাকতে না পেরে বলেই ফেলেন ; কবিতার কথাগুলি তাঁর গলার স্বরে বেশ উতলা হয়ে বেজে ওঠে :

> আর কেন ডাকো ?
> এখন কিসের দাবি ? হারায়ে গিয়েছে চাবি
> ভেঙে গেছে বীণা বাঁশি, আর হবে নাকো।

না, মনটাকে আর এভাবে কাঁদিয়ে কোনও লাভ নেই। মাঝে-মাঝে এরকম এক-একটা ডাক শুনতে পেলেই তো হল। হোক না স্বপ্ন ; সে মানুষটার সঙ্গে এই বাড়ির এই সিঁড়ি ধরে নেমে গিয়ে, সোজা হাঁটা দিয়ে, বুদ্ধ মন্দিরটা একবার দেখে নিয়ে, লেক হয়ে আবার রাসবিহারীতে ফিরে আসা যাবে। গড়িয়াহাট মার্কেটের সাদা শালুকও কিনতে পারা যাবে। না, সবই হারিয়ে যায়নি। তার পায়ের শব্দ তো এ বাড়িরই বাতাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে চমকে উঠলেন চারুশীলা। মনে হয় দোতলার বড় ঘরের ভিতর থেকে শব্দটা ছিটকে বের হয়ে সন্ধ্যাবেলার বাতাসটাকে যেন ক্ষেপা কুকুরের মত কামড়ে দিয়ে আবার চুপ হয়ে গিয়েছে। কিসের শব্দ ? এরকম ভয়ানক একটা বিশ্রী শব্দ দোতলার বড়ঘরের ভিতরেই বা বেজে উঠবে কেন ? বড়ঘর যে একটি জাগ্রত স্মৃতিঘর। মাধব রায় তাঁর শখ আর মায়া দিয়ে যে রকম করে সাজিয়েছিলেন, আজও ঠিক সেরকমেরই সেজে রয়েছে এই বড়ঘর। সেই সব সোফা, সেই মেহগনির টেবিল। চার দেয়ালের গায়ে সেই চারটি বড় বড় রঙিন ছবি—গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার, নীলাচলের সমুদ্র, কৈলাস ও মানস আর শিলং-এর পাইনবন ও ঝর্না।

একগাদা কাচের বাসন একসঙ্গে মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেলে যেরকম শব্দ হয়, এই শব্দও তেমনই একটা বিকট ঝনঝনানি। কই, বিশুর মা এখনই গিয়ে জেনে আসুক, এ কিসের

শব্দ।

শুধু পাঁচটা মিনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে আর অপেক্ষা করতে হয়। বিশুর মা আসতেই জিজ্ঞাসা করেন চারুশীলা—কোথায় ছিলে ?

বিশুর মা—এখানেই ছিলুম, মা।

—বিশ্রী একটা শব্দ হল, শুনেছ ?

—শুনেছি।

—জেনেছ, কিসের শব্দ ?

—জেনেছি। বাবুর্চিকে শুধোলুম, কিসের শব্দ হলো গা ? বাবুর্চি বলে, টেবিল থেকে কাচের গেলাস বোতল জগটগ সব হঠাৎ পড়ে গিয়েছে, তাই শব্দ হয়েছে।

—ঘরের ভিতর কারা ঢুকেছে ? বলতে পার ?

—হ্যাঁ মা, পারি। বাবুর্চি যা বললে, তাই বলতে পারি।

—বলো।

—আমাদের সাহেব আর একজন লেডি সাহেব।

—তুমি এখনই একবার বাইরে যাও, বিশুর মা। একটা ট্যাক্সি ডেকে আন।

— কেন মা ?

—আমি এখনি হাওড়া স্টেশনে যাব।

—কেন মা ? কোথায় যাবেন আপনি ?

—যেখানেই যাই, আর এখানে ফিরে আসব না।

—এ কী বলছেন মা, শুনে যে আমার ভয় করছে, মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

হেসে ফেলেন চারুশীলা।—কোনও ভয় নেই। তুমি যাও, ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসো, একটুও দেরি করো না।

পাঁচটা মিনিটও সময় লাগে না। আকাশ ঘরের ডেস্কের উপর থেকে মাধব রায়ের ছোট্ট মার্বেল মূর্তিটাকে কাগজে জড়িয়ে হাতে তুলে নিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেন চারুশীলা। গেটের কাছে গিয়ে থামলেন ও দাঁড়িয়ে রইলেন।

ট্যাক্সি আসে। পিছনের কোনও আলো আর কোনও ছায়ার দিকে একটিবারও মুখ ফিরিয়ে তাকালেন না চারুশীলা। চলে গেলেন।

স্টার্ট দিতে গিয়ে ট্যাক্সির ইঞ্জিন খুব জোরে শব্দ করে উঠতেই খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে সন্দীপ রায়ের সান্ধ্য আনন্দের শান্তিটা। এ সময়ে কে এল ? কোন নির্বোধ ?

নতুন গেলাস হাতে নিয়ে জানালার কাছে এসে দেখতে পায় সন্দীপ, না কেউ আসেনি। কেউ গেল বোধ হয়।

—কে চলে গেল ফটিক ? ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে সন্দীপ।

বাবুর্চি জবাব দেয়।—মা চলে গেলেন।

—কোথায় গেল ?

—ঝি বলছে, তিনি হাওড়া স্টেশনে চলে গেলেন।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে আবার সোফার উপর এষার পাশে বসে পড়ে সন্দীপ।—মাতৃদেবী বেশ একটা ড্রামাটিক কাণ্ড করলেন।

এষা—কী ব্যাপার ?

সন্দীপ—তিনি হাওড়া স্টেশনে চলে গেলেন। খুব সম্ভব তিনি কোন্নগরে তাঁর উকিল ভাইয়ের বাড়িতে চলে গেলেন। তার মানে এই বাড়ি ছেড়ে দিলেন।

এষা—কেন ?

সন্দীপ—বেশ বুদ্ধি রাখেন, তাই এই কাণ্ডটা করলেন। যেন আমি আর কোনওদিনও তাঁকে একটা কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেবার কোনও সুযোগ না পাই।

এষা—কিসের কর্তব্যের কথা ?

সন্দীপ—ক'দিন আগে আমি তাঁকে সবিনয়ে অনুরোধ করেছিলাম : আর দেরি না করে তুমি এবার বাড়িটাকে আমার নামে গিফ্‌ট করে দাও। তিনি শুধু একটি কথা বললেন : না। অথচ...।

এষা—কী ?

সন্দীপ—অথচ সকলের কাছে এমন একটা ভাব দেখান যে, বাড়িটার জন্যে তাঁর মনে কোনও মায়া নেই। শুধু মাধব রায়ের স্মৃতিটুকুর জন্য যা কিছু মায়া। তাই ইচ্ছে করে তিনতলাতে ছোট একটা কাঠের ঘরে থাকেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলেই উদাস হাসি হেসে অদ্ভুত একটা কথা বলেন : এই আকাশ-ঘরে থাকতে আমার ভাল লাগে। আমি দেখে সত্যিই বেশ আশ্চর্য হয়েছি, বৈরাগ্যের বুলি কী ভয়ানক চালাক হতে পারে।

এষা—তুমিই বা এমন অনুরোধ করতে গেলে কেন ? কী দরকার ছিল ? তিনি গত হলে এ বাড়ির স্বত্ব তো তোমারই হয়ে যাবে।

সন্দীপ—হবে ; যদি তিনি সুস্থচিত্তে গত হয়ে যান তবে। এ ধরনের সেকেলে মানুষের মতিগতির কোনও স্থিরতা নেই। পুণ্যি বাতিকের ঝোঁকে হয়ত হঠাৎ একদিন কোথাকার কোনও এক গরু-হাসপাতালের নামে বাড়িটাকে গিফ্‌ট করে ফেলবেন। কিন্তু দেখলে তো এষা। সেকেলে মানুষের মেজাজটা বোভাইন হলেও বুদ্ধিটা কত চাণক্যাইট।

আবার উঠে গিয়ে আব ঘরের দরজা খুলে দিয়ে ডাকতে থাকে সন্দীপ—ফটিক ! ফটিক ! একটা ঝাঁটা আর ঝুড়ি নিয়ে শিগগিব এখানে একবার এসো। মেঝের উপর ছড়ানো এইসব ভাঙা কাচের সব টুকরো এখনি সরিয়ে নিয়ে যাও।

সন্দীপের সান্ধ্য জীবনের সাধ ইচ্ছা আর তেষ্টা এখন আর যাযাবরের মত ছুটোছুটি করে না। এমন কি, আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর কোনও বাড়ির দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের কাছে গিয়ে দরজার কলিংবেলের বোতাম টিপতে হয় না। এষা দত্তের ঘরের উৎসব ঠাঁই-বদল করে সন্দীপেরই বাড়ির এই বড়ঘরের ভিতরে চলে এসেছে। সন্দীপকে বের হতে হয় না। রোজ সন্ধ্যায় যথাসময়ে যেমন আদেশ করেছেন সাহেব, ড্রাইভার বাবুলাল তেমনই সন্দীপের চকচকে ক্যাডিলাককে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে লেডি সাহেব এষা দত্তের বাড়ির কাছে হাজির করে আর লেডি সাহেবকে তুলে নিয়ে চলে আসে।

তারপর যখন রাত নিবিড় হয়, যখন শুনতে পাওয়া যায়, টালিগঞ্জের পুলিশ ব্যারাকের বিউগলের ঘুমকাতুরে স্বর বাতাসে এলিয়ে পড়ে ফুরিয়ে গেল, তখন এষা দত্ত তার এলিয়ে পড়া মাথাটাকে সন্দীপের বুকের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়, আর উঠে দাঁড়ায়—এবার যেতে হয়!

ড্রাইভার বাবুলাল বার বার কাশতে থাকে, এষা দত্ত আবার ক্যাডিলাকের ভিতরে উঠে বসে। লেডিসাহেবকে আমির কালি অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসে ক্যাডিলাক। কাশি থামিয়ে বাড়ি চলে যায় বাবুলাল।

এই নিয়মটা সন্দীপের ইচ্ছার সৃষ্টি হলেও এষাও খুশি হয়ে বলেছে—এই ভাল। তোমার ওরকম ছুটোছুটির কষ্ট আমার চোখে আর একটুও সহ্য হচ্ছে না। আমার কাছে তোমার আর ছুটে আসতে হবে না, আমিই তোমার কাছে যাব। তোমার গাড়িটা ভাল বটে, তোমার হাতে গাড়িটা চলেও ভাল, তবু বিশ্বেস নেই। তোমার আনমনা হাতটা সামান্য একটু কেঁপে উঠলে গাড়িটা যে কী ভয়ানক কাণ্ড করে ফেলবে, ভাবতে আমার বুক কাঁপে। না সন্দীপ, এই ভাল, আমিই আসব।

আজ নিয়ে পর পর চারটি সন্ধ্যা ও রাত রায়-ভবনের এই বড়ঘরের ভিতরে অনেকক্ষণ থেকেও সন্দীপের মনের সব অস্বস্তি শান্ত করে দিতে পারেনি এষা। কারণ মৃদুলা এখনও টোকিও চলে যায়নি। এই চারদিনের মধ্যে অন্তত সাতবার এষাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সন্দীপ : আর তো মাত্র ক'টা দিন বাকি। আমি এরই যে কোন একটি দিনে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলব। কিন্তু তুমি কি তোমার বাবাকে কথাটা একবার বলে নেবে না ?

এষা—বলব।

সন্দীপ—না, আর বলব বলব করো না। বলে দাও।

অন্যদিনের মত আজও রাতটা যথাসময়ে নিবিড় হয়ে উঠেছে। রাস্তার নীরবতার মধ্যে শুধু বুড়ো

রাত-ভিখারীটা গলার স্বর কঁকিয়ে কঁকিয়ে ঘুরছে। সন্দীপ বলে—কাচের গেলাস পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যাওয়ার শব্দের মধ্যে একটা মিউজিক আছে। নয় কি ? তোমার কী মনে হয় ?

এষা—তোমার যা মনে হয়, তাই। আমার তো ভিন্ন করে একটা মন নেই।

সন্দীপ—যে যা বলে বলুক, আমি বলব শাঁখের শব্দের মধ্যে ওরকম মিউজিক নেই। একটুও না।

এষা—লোকে কিন্তু মনে করে যে, শাঁখের শব্দ খুব পয়া, খুব শুভ।

হেসে ফেলে সন্দীপ—আমি মনে করি কাচের গেলাস ভাঙবার শব্দ আরও পয়া, আরও শুভ। একটা সুলক্ষণ।

যেন একটা চকিত বিদ্যুতের আভা এষা দত্তের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সন্দীপের একটা হাত শক্ত করে ধরে আর বুকের কাছে টেনে নিয়ে কথা বলে এষা—হ্যাঁ শুভ, নিশ্চয় শুভ। তোমার কথাতে একটুও ভুল নেই, সন্দীপ। এতক্ষণ তোমাকে কথাটা বলিনি, বলতে পারিনি, তাই এখন বলছি। কাল সকাল ন'টার সময় শুভ কাজটার সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে। বাবাকেও বলা হয়ে গিয়েছে। বাবার অনুমতিও পাওয়া হয়ে গিয়েছে।

সব অস্বস্তির অবসান। সন্দীপের চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—এষা, তুমি সত্যিই একটি বিস্ময়। কী আশ্চর্য, কাল সকাল ন'টায় ?

এষা—হ্যাঁ, সন্দীপ। রেজিস্ট্রার বিনয়বাবুকে জানিয়ে রাখা হয়েছে। তোমার পক্ষে আর আমার পক্ষে যাঁরা উপস্থিত থাকবেন তাঁদেরও বলে রাখা হয়েছে। আমি শুধু বলবন্তভাইকে ফোন করে একটু বলে দিয়েছিলাম। শোনা মাত্র বলবন্তভাই সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

হেসে ফেলে সন্দীপ।—আমার কিন্তু একটা বিশ্রী অসুবিধে আছে। আমার ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হয়।

এষাও হাসে—আন্দাজ ক'টার সময় তোমার ঘুম ভাঙে।

সন্দীপ—আটটার আগে নয়।

এষা—আমি সকাল ছ'টায় তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দেব।

সন্দীপ—সে কী ? সেটা আবার কী করে সম্ভব হবে ?

সন্দীপের কাঁধের উপর একটা হাত তুলে দেয় এষা—আমি তো আজ এখানে তোমার কাছেই থাকব।

সন্দীপ—বাড়ি যাবে না ?

এষা—না।

সন্দীপ—এঃ, আমার প্ল্যানটা মাঠে মারা গেল।

এষা—তোমার প্ল্যান ? সেটা আবার কী ?

সন্দীপ—তোমাকে চমকে দেবার প্ল্যান। আমি মতলব এঁটেছিলাম, আজ তোমাকে কিছুতেই বাড়ি যেতে দেব না। আজও না, কালও না, কোনওদিনও না। কিন্তু তুমিও কি ভেবে রেখেছিলে যে তুমি আজ রাতে বাড়ি যাবে না ?

এষা—না। তোমার কথা শুনে মনটা এত নিশ্চিন্ত আর এত খুশি হয়ে গেল যে, এক মুহূর্তের মধ্যে একটা সাধের স্বপ্ন দেখে ফেললাম। সকাল ছ'টায় আমি তোমাকে জাগিয়ে দেব, নিজের হাতে মনের মত করে সাজাব। তারপর এখান থেকে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়িতে একবার যাব। দশ মিনিটের মধ্যে আমি সেজে নিয়ে সাড়ে আটটার মধ্যে রেজিস্ট্রার বিনয়বাবুর অফিসে পৌঁছে যাব। তারপর সন্দীপ...তারপর আমি তোমার স্ত্রী। এবার তুমি বলো, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলো, যেন আমার প্রাণটা শুনতে পায়।

এবার মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে সন্দীপ, এষা দত্তের ভালবাসার বিপুল মমতায় বিহ্বল ও বিস্মিত সন্দীপ, প্রীত ও কৃতার্থ সন্দীপ।—তারপর, আমি তোমার স্বামী।

বালিগঞ্জের রায়ভবনের ঘরের ভিতরে সেই সন্ধ্যায় কাচের গেলাস চূর্ণ হওয়ার যে শব্দটাকে শাঁখের শব্দের চেয়েও শুভাবহ সুলক্ষণ বলে মনে করেছিল সন্দীপ, সেই শব্দটা এখন এই বড়ঘরের ভিতরে প্রতি সপ্তাহের অন্তত একটি সন্ধ্যার নিয়মিত শুভ উৎসব হয়ে উঠেছে। কোনওদিন একটু কম, কোনওদিন একটু বেশি, বিহ্বল ও বিবশ অনেক হাতের ঠেলা লেগে কাচের গেলাস জাগ আর জার টেবিল থেকে পড়ে যাচ্ছে আর ভাঙছে।

সন্দীপ রায়ের এই বিবাহিত ঘরোয়া জীবনের সান্ধ্য আসরে যাঁরা নিয়মিত উপস্থিত হয়ে থাকেন, তাঁরা হলেন সেই ক'জন ভদ্রলোক, যাঁরা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের দিন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মিল এজেন্ট সুরজিৎ সামন্ত, মেজর পৃথ্বীরাজ, কুমার সুরঞ্জন, শেয়ার ডিলার অনিমেষ ঘোষ আর জয়াজী স্যারের সেক্রেটারি সেই বলবন্তভাই। সন্দীপেরই মত এক-একটি সুখী চেহারা; বয়সে কেউ ত্রিশ, কেউ বা পঁয়ত্রিশ। বিনায়ক হালদারও আসেন, কিন্তু সামান্য কিছুক্ষণ থেকেই চলে যান। কিন্তু যার উপস্থিতি একেবারেই পছন্দ করে না সন্দীপ, সেই লোকটি কালো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আর উৎফুল্ল হয়ে সন্দীপের এই ঘরোয়া সান্ধ্য আসরে উপস্থিত হতে কখনও ভুলে যায় না। সন্দীপ শেষে বলতে বাধ্য হয়েছে। —তুমি এত রেগুলার না হলেও তো পারো, মন্দার।

মন্দার—কেন সন্দীপ, আমি কোনও অপরাধ করলাম? আমি না হয় এটিকেট জানি না, ইংরেজি বলতে-কইতে পারি না, কিন্তু কাউকে তো বিরক্ত করি না।

মন্দারের কথার কোনও প্রতিবাদ করতে পারে না সন্দীপ। দেখেছে সন্দীপ, মন্দারকে দেখতে পেয়ে সবাই যেন আরও খুশি হয়। মন্দার ঘরে ঢুকলেই হাসিখুশির একটা সাড়া পড়ে যায়। সবাই ডাকে—মন্দার এখানে বসো। মন্দার, প্লিজ টেক ইওর সিট হিয়ার। মন্দারবাবু আইয়ে, হামারে নজদিগ বৈঠিয়ে।

মন্দারকে দেখে আর মন্দারের চালচলন আর কথাবার্তার রকম-সকম দেখে এষা যেন একটু গম্ভীর হয়ে যায়, কিন্তু বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। একদিন আসরের গল্প আলাপের উচ্ছল হর্ষের মধ্যে মন্দারের কণ্ঠস্বর হঠাৎ উদাত্ত হয়ে বেজে উঠল। —মিসেস রায়ের বোধ হয় একটু বরফ চাই।

চমকে ওঠে এষা—হ্যাঁ, চাই বইকি। কিন্তু আপনি উঠছেন কেন? আপনি বসুন, মন্দারবাবু।

কিন্তু এষার আপত্তি মাঠে মারা গেল। মন্দার উঠে এসে টেবিলের জাগের ভিতর থেকে বরফের একটা বড় চাকলা তুলে নেয়। কালো রুমাল দিয়ে বরফের চাকলাটাকে জড়িয়ে ধরে মেঝের উপর ধোবিয়া আছাড়ের ভঙ্গিতে ঠুকে-ঠুকে গুঁড়ো করে ফেলে। একটা ছোট জারের মধ্যে সেই বরফ গুঁড়ো ঢেলে দিয়ে এষার হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। মন্দারের ব্যস্ততার রকম-সকম দেখে এষা হেসে হেসে যেন লুটিয়ে পড়তে চায়।

হেসে ফেলে সন্দীপও—মন্দার একটু বেশি ক্লাউনিশ।

এষা বলে—বেশ মজার মানুষ।

প্রতি সপ্তাহের এই ধরনের এক-একটি উৎসব নিতান্ত অকারণ উল্লাসের ব্যাপার নয়। কারণ থাকে। এক একটা শুভ ঘটনার স্মৃতিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এক-এক সন্ধ্যার উৎসব আহ্বান করা হয়। আহ্বান করবার নায়িকা স্বয়ং এষা রায়। কোন সপ্তাহের কোন দিনে কী কারণে আনন্দ করা হবে, এষাই বলে দেয়। প্রথম দিনের সান্ধ্য সমাবেশের উপলক্ষ ছিল, সন্দীপ রায় ও এষা রায়ের বিবাহিত জীবনের শুভারম্ভ। শুভ ঘটনার মাসগুলিকে তো একসঙ্গে হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব নয়। ওই তারিখগুলিকে নয়, বারগুলি স্মরণ করতে হয়। স্মরণ করেছে এষা, চক্রবর্তীর এগজিবিশনে যেদিন প্রথম সন্দীপকে দেখতে পেয়েছিল এষা, সেদিন ছিল সোমবার, জয়াজী লিমিটেডের ফ্যাক্টরি উদ্বোধনের দিনে পানামোদের আসরে সন্দীপের সঙ্গে প্রথম কথা বলেছিল এষা, সেদিন ছিল বুধবার। এষার জন্মদিন শুক্রবার। সন্দীপের জন্মদিন রবিবার। এই রকম ও এইভাবে এক একটি শুভবার কোনও একটি সপ্তাহে উদ্‌যাপিত হয়। সেই শুভবারে ব্যাঙ্ক থেকে সন্দীপকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হয়। এষার কাছ থেকে শুনে নিতে আর জেনে নিতে হয়, আর বাবুর্চি ও

বেয়ারাকে বলে দিতে হয়, আজ কী কী বস্তু কতটা করে কিনে নিয়ে আসতে ও রেডি করে রাখতে হবে।

এষা যেদিন বলে ফটিককে পাঠালে হবে না, তুমি নিজেই যাও, সেদিন সন্দীপকেই মার্কেটে গিয়ে এষার পছন্দের শেরি ও জিন কিনে আনতে হয়।

ব্যাঙ্কের সবাই জেনেছে, সাহেব বিয়ে করেছেন। তাই একদিন সকালবেলা একটা দরখাস্ত হাতে নিয়ে ব্যাঙ্কের ক্লার্ক তমোনাশ এসে এই বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়িয়েছে। দরখাস্তের বক্তব্য—ব্যাঙ্কের কর্মী আমরা সবাই আপনার শুভজীবন কামনা করে একটু আনন্দ করতে চাই। আশা করি, আপনি এজন্য কিছু টাকা মঞ্জুর করবেন।

বাড়ির বেয়ারা সেই দরখাস্ত হাতে নিয়ে সন্দীপের কাছে পৌঁছে দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। দরখাস্ত পড়ে হেসে ফেলে সন্দীপ।

এষা—কী ব্যাপার ?

সন্দীপ—আমার ব্যাঙ্কের লোকেরা আমার বিয়ে হয়েছে শুনে আনন্দ করবার জন্য কিছু খেতে চাইছে। সেইজন্য ওদের কিছু টাকা চাই।

এষা—দিয়ে দাও।

দরখাস্তের উপর মঞ্জুরী টাকার অঙ্কটা লিখে দিয়ে আর সই করে বেয়ারাকে ডাক দেয় সন্দীপ—নিয়ে যাও।

এষা—কত টাকা দিলে ?

সন্দীপ—একশো টাকা।

এষা হাসে—বাঃ।

সন্দীপ—তুমি কী বলো ? আর একটু কম করে দেব ?

এষা আবার হাসে। —তোমার ইচ্ছে।

দরখাস্তটা বেয়ারার হাতে না দিয়ে আবার কলম চালিয়ে একশো টাকার অঙ্কটাকে কেটে নতুন একটা ক্ষীণতর অঙ্ক বসিয়ে দেয় সন্দীপ। —নিয়ে যাও।

দরখাস্ত হাতে নিয়ে বেয়াবা চলে যেতেই প্রশ্ন করে এষা,—কত দিলে ?

সন্দীপ—একান্ন।

সন্দীপের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে এষা এইবার বেশ অদ্ভুত স্বরে হেসে ফেলে। —বাঃ।

সন্দীপও হাসে। —এ মাসে কত টাকার কাচের গেলাস আর জাগ ভেঙেছে বলতে পার ?

এষা—না।

সন্দীপ—ফটিক বললে, দেড়শো টাকার।

এষা—বেশ তো, মন্দ কী ? শখের জন্যে মানুষ কত দেড়শো টাকা গুঁড়ো করে দেয় তা কি জান না ?

সন্দীপ—আমি যে তা জানি, সেটা তুমিও জান।

এষা—আমি তো শুধু জানি যে, তুমি আমার জন্যে এ পর্যন্ত মাত্র আড়াই হাজার টাকা খরচ করেছ। একটা লিকলিকে চেন-নেকলেস, তার লকেটে এইটুকু এক টুকরো হীরে, ব্যস।

সন্দীপ—এটা আবার কী রকমের কথা বললে, এষা ? এই যে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা-না-একটা আনন্দের জন্যে এত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে, সেটা কি...।

এষা—সেটা তো আমার জন্যে তুমি খরচ করছ না।

সন্দীপ—কী বললে ?

এষা—তোমার জীবনের, তোমার ঘরের সুখের জন্য তুমি টাকা খরচ করছ, আমার জন্যে নয়।

সন্দীপ—তোমার কথাগুলি আরও হেঁয়ালি হয়ে গেল।

এষা—একটুও হেঁয়ালি হয়ে যায়নি। তুমি বাইরে ছুটোছুটি করে হয়রান হয়ে যাচ্ছিলে, আমি তোমাকে সেই মিথ্যে হয়রানি থেকে রক্ষা করে তোমার জীবনকে একটি সুখের ঘর পাইয়ে দিয়েছি।

তুমি যেরকম সুখের ঘর চেয়েছিলে, ঠিক সেই রকম সুখের ঘর।

সন্দীপ—যা-ই হোক, আমার মনে হয় যে, আমার সুখের ঘরের এই সব খরচ একটু কমিয়ে ফেললে ভাল হয়, তাতে আমার সুখের কিছু কমতি হবে না।

এষা—খরচ যখন কমবার হবে, তখন নিজেই কমে যাবে। কিন্তু সেজন্য তুমি কোনও চেষ্টা করো না, সন্দীপ। তাতে ফল ভাল হবে না।

চমকে ওঠে সন্দীপ। এ কি সত্যিই এষা কথা বলছে ? না, দ্বিতীয় কোনও ডেলফির ওরেকল্ কথা বলছে ? বুঝতে পারা যায় না, এবার ভাষাটা হেঁয়ালি, না, কথা বলবার এই নতুন ভঙ্গিটা হেঁয়ালি ? এষার গলার স্বরও যে বদলে গিয়েছে মনে হচ্ছে।

সবকিছুই কত তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। সন্দীপের সাধ-অসাধ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে একটু ভ্রূক্ষেপও না করে সব বদলে যাচ্ছে। স্কচ-হুইস্কির স্বাদটাও অন্যরকমের হয়ে গিয়েছে, সেই ঝাঁজ আর পাওয়া যায় না। দু'চুমুক খেলেই ঢেকুর তুলতে হয়। যেন ঝাল-মেশানো ডাবের জলের ঢেকুর। কবে আর নিজের হাতে শেরি-টুইস্ট তৈরি করে খাওয়াবে এষা ? অনেকদিন তো পার হয়ে গেল। কত সহজে আর কত শিগগির এষা তার এই সেদিনের সেই ব্যাকুল শপথের কথাটা ভুল গিয়েছে।

বাইরে বেড়াতে যাবার সেই ব্যস্ততা ও তাড়া আজ আর নেই। ক্বচিৎ কখনও এষা যদি হেসে হেসে হঠাৎ বলে ফেলে যে, আজ একটা খুব বাজে ছবি দেখতে ইচ্ছে করছে সন্দীপ, তবে এষার সঙ্গী হয়ে বাইরে বের হবার জন্য অবশ্য একটু ব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। পুরনো আনন্দের স্বাদটা বুকের ভিতরে আবার একটু ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে।

একদিন হঠাৎ এইরকমই ভঙ্গিতে হেসে হেসে গলার চেন-নেকলেসের হীরের লকেটকে দুই আঙুলের টিপের মধ্যে ধরে আর বেশ জোরে এক একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কথা বলতে থাকে এষা।—আজ ইচ্ছে করছে, খুব বাজে একটা...।

সন্দীপ—কিন্তু ও কী করছ ? লকেটটা যে ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

এষা—যাবে তো যাবে। তোমার আড়াই হাজার টাকার ক্ষতি হবে, তার বেশি তো নয়।

এটাই বা কী কম হেঁয়ালির কথা। সন্দীপের আড়াই হাজার টাকার ক্ষতিটা যেন নিতান্ত তুচ্ছ একটা ক্ষতি, বটগাছের একটা পাতা ধুলোর উপর পড়ে গেলে গাছটার যেমনতর ক্ষতি হয়ে থাকে।

কিন্তু এষার গলার ওই নেকলেসের হীরের দামটাকে সামান্য একটা বটপাতা বলে মনে করলেও তো এষার মনে রাখা উচিত যে, ওটা বটপাতা নয়, ওটা সন্দীপের ভালবাসার প্রতীক, স্ত্রী এষার গলাতে স্বামী সন্দীপের প্রথম উপহার।

সন্দীপ—কী যেন বললে তুমি ?

এষা—আজ বিকেলে একটা বাজে জায়গাতে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করছে।

সন্দীপ—বলো, কোথায় যেতে চাও ?

এষা—ঢাকুরিয়া লেক।

সন্দীপ—আমি তা হলে ব্যাঙ্ক থেকে একটু আগেই...।

এষা—না না, তোমাকে একটুও ব্যস্ত হতে হবে না। তোমার আজ আমার সঙ্গে বেড়াতে বের না হলেও চলবে। তুমি আজ অন্য একটা গাড়ি নিয়ে ব্যাঙ্কে যাও, ক্যাডিলাক থাকুক।

এর পর পুরো একটি মাসের মধ্যে কোনও একটি দিনও এষার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবার জন্য সন্দীপকে ব্যস্ত হতে হয়নি। ক্যাডিলাক আছে, বাবুলাল ড্রাইভার আছে, এষার বাইরে বেড়াতে যাবার ইচ্ছেটার জন্য সন্দীপের সঙ্গ তার দরকার হয়নি। এষা একাই বের হয়েছে আর ফিরে এসেছে।

বড়ঘরের টেবিলের কাছে একটি কাচের গেলাস হাতে নিয়ে একলা বসে থাকে সন্দীপ, আর খোলা জানালা দিয়ে কলকাতার চৈত্র সন্ধ্যার উতলা বাতাস ঘরের ভিতরে ঢুকে হুটোপুটি করে। তখনও সন্দীপের মনের ভিতরে কোনও প্রশ্ন খুব বেশি হুটোপুটি করে না। শুধু মনে হয়, এষা সত্যিই একটি অদ্ভুত...চমৎকার...দুরন্ত হেঁয়ালি।

মনে হয়, তাই ভয় হয় সন্দীপের, এষা যদি কোনওদিন বাইরে বেড়াতে যাবার আগে হঠাৎ বলে

ফেলে, আজ তুমিও চলো—তবে সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারবে সন্দীপ ? বোধ হয় পারবে না। যদি জোর করে নিজেকে ব্যস্ত করিয়ে নিয়ে এষার সঙ্গে বেড়াতে বের হয় সন্দীপ, তবেই বা কী হবে ? সেই দুরন্ত আনন্দের স্বাদটা কি আবার সন্দীপের রক্ত ও নিঃশ্বাসের মধ্যে তেমন করে মেতে উঠতে পারবে ? পারবে না। কিন্তু সে কথা স্পষ্ট করে আর মুখ খুলে এষাকে বলে দিতেও পারা যাবে না। বললে, খুব ভুল বুঝবে এষা। হয়ত একটা সন্দেহই করে বসবে যে, এষার জন্যে সন্দীপের প্রাণের ভিতরে সেই ভালবাসা বুঝি আর নেই।

একটা কথা কিন্তু ঠিকই বলেছিল এষা, বড়ঘরের ভিতরে এষার জীবনের স্মৃতিপুলকিত সান্ধ্য আমোদের হর্ষ যখন কমে যাবার হবে, তখন নিজেই কমে যাবে। ঠিকই কমে গিয়েছে। যেদিন ঢাকুরিয়ার লেকে বেড়িয়ে আসবার জন্যে একাই বের হয়ে গেল এষা, তারপর এই তো পুরো তিনটি মাস পার হয়ে গেল, কিন্তু কই, বড়ঘরের ভিতরে অতিথিদের আমোদিত সমাবেশ তো আর হয়নি। বাবুর্চি ফটিকও কোনওদিন অভিযোগ করে ভাঙা ক্রকারির কোনও হিসাব দাখিল করেনি।

এরই মধ্যে এষা একদিন হেসে হেসে বলে ফেলেছে।—তুমি কি একটা ব্যবস্থা করে দেবে না, আমার যে বেশ অসুবিধে হচ্ছে।

সন্দীপ ঠাট্টা করে হাসে।—এত দূরে বসে কথা বললে তো অসুবিধে হবেই।

চেয়ার থেকে উঠে সন্দীপের কাছে এসে একই সোফার উপর বসে আর সন্দীপের হাতের উপর হাত রাখে এষা—ঠাট্টা করে কথাটা বললে কেন, সন্দীপ ? এটা তো তোমার দাবির কথা।

সন্দীপের বুকের বাতাস যেন পুরনো সৌরভে ভরে গিয়ে নিবিড় হয়ে যায়। এ তো কোনও হেঁয়ালি নয়, সেই এষাই কথা বলছে। এষার হাতটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে এষার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। দেখতে পায় সন্দীপ, ঠিকই তো, কোনও ভুল নেই, নন-স্মিয়ার লিপস্টিকের রঙিন প্রলেপ নিয়ে সেই তাহিতি ঠোঁট সেই রকমই ফুল্ল হয়ে ফুটে রয়েছে।

সন্দীপ বলে—আমি থাকতে তোমার কোনও অসুবিধে কেন হবে, এষা ?

এষা—দুঃখের কথা, তুমি থাকতেও আমার অনেক অসুবিধে হচ্ছে। তুমি তোমার ব্যাঙ্কে আমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দাও, যেন আমি অন্তত এক লাখ পর্যন্ত ওভারড্র করতে পারি।

সন্দীপ—বেশ তো, তাই হবে। আজকালের মধ্যেই হয়ে যাবে।

এষা—আরও একটি কাজ করো। তুমি তোমার ব্যাঙ্কের তরফে চিঠি লিখে দোকানগুলোকে জানিয়ে দাও যে, আমার সই-করা স্লিপ পেলেই যেন আমার দরকারের জিনিসগুলি পাঠিয়ে দেয়।

সন্দীপ—দোকানগুলোর নাম ঠিকানা একটা কাগজে লিখে আমাকে দিও।

এষা—লিখেছি, কাগজটা তোমার ডায়েরির মধ্যে রেখে দিয়েছি।

সন্দীপ—বেশ করেছ। আজকালের মধ্যেই দোকানগুলোকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেব।

এষা হাসে—আজকালের আজটা কিন্তু ফুরিয়ে এসেছে। বলো, কালকের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দেবে !

সত্যিই এখন রাত দশটা। ভাষার ভুলটা বুঝতে পেরেছে সন্দীপ। ঠিকই, আজ নয়, কালই সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কিন্তু আজকাল রাত দশটার সময় এষাকে এমন করে এত কাছে কবেই বা পাওয়া যায় ? খুব কম। সে তো আজ প্রায় এক মাস আগের একটি রাতের কথা। ঘুমের মধ্যে যেন একটা ব্যাকুল নিশির ডাক শুনতে পেয়ে জেগে উঠতে হয়েছিল। এষার ঘরের বন্ধ দরজার উপর বার বার হাত ঠুকে সন্দীপের ব্যাকুল ইচ্ছেটা বার বার মাথা ঠুকেছিল। এষা তারপর দরজা খুলে দিল। কিন্তু কী অদ্ভুত একটা কথা কত সহজে বলে দিল এষা আর কোনওদিনও আমার ঘরের বন্ধ দরজার উপর এরকমের হামলা করবে না। যখন তখন তোমার ইচ্ছে হলেই কিছু হবে না। আমার ইচ্ছে হলে তবেই হবে।

আজ এখন তো ঘুমিয়ে পড়েনি এষা, যদিও রাত দশটা বেজে গিয়েছে। এষার জাগা প্রাণটা সন্দীপের কত কাছে, সন্দীপের সঙ্গে হাতে হাতে বাঁধা হয়ে সোফার উপর বসে আছে।

এষা—মনে হচ্ছে, আজ তুমি আমার হাতটাকে এখন ছেড়ে দিতে পারবে না।

সন্দীপ—না। এখন তুমি আমার কাছেই থাকবে।

এষা—থাকব।

এর পর, এই রাত ফুরিয়ে যখন ভোর হয়ে যায়, আর অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে সন্দীপের ঘুম ভেঙে যায়, তখন বুঝতে পারে সন্দীপ, শব্দটা পাখির ডাকের শব্দ নয়, ক্যাডিলাকের ইঞ্জিনের শব্দ। কী আশ্চর্য, আজ এই ভোরবেলাতেই কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে এষা ?

এর পর আরও কত রাত এল আর ফুরিয়ে গেল, কিন্তু এষাকে কোনও রাতেও তো ঠিক এমন করে এত কাছে আর পাওয়া গেল না। ভাবতে বেশ আশ্চর্য লাগে সন্দীপের, এষার ভালবাসার ইচ্ছেটা যেন ঢেউয়ের বুকে চাঁদের ছবি। এই ভেসে উঠছে, এই ডুবে যাচ্ছে। কখন যে কাছে এসে বসবে আর হাতের উপর হাত রাখবে, কোনও ঠিক নেই। আবার কখন যে সরে যাবে, কোনও ঠিক নেই। বুঝতেও দেয় না, কখন সরে গেল। এষাকে একদিন আর একবার একটু ঠাট্টা করে আর হেসে হেসে জিজ্ঞেস করলে হয়—কী গো সুনয়না, তোমার কি কখনও নয়নে পড়ে না যে, এই ঘরের এই সোফার উপর এক ব্যক্তি তোমারই আশায় রাত দশটা পর্যন্ত বসে আছে আর হাই তুলছে ?

এক মাসের মধ্যে কত দিন আর কত রাত তো পার হয়ে গেল, কিন্তু ওরকম একটা সামান্য ঠাট্টার কথাও এষাকে কখনও বলতে পারেনি সন্দীপ। কেন পারেনি ? বুঝতে পেরেছে সন্দীপ, বড় বেশি ভালবেসে ফেললে মানুষের মন এই রকমই নরম হয়ে যায়। ভয় হয়, এরকম নিরীহ ঠাট্টার কথা শুনেও হয়ত খুব দুঃখ পাবে এষা।

কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, তুমি কি বালুচর শাড়ি দিয়ে ঘরের যত দরজা ও জানালার পর্দা তৈরি করবে ? একদিনে একসঙ্গে সাতটা বালুচর শাড়ি কিনে ফেললে কেন ? আজই ব্যাংকের কাছে শাড়ির দোকানের বিল এসেছে, বিলের টাকাও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু একবার এষাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে সাতটা বালুচর কেন ?

একথাও এষাকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি সন্দীপ। জুয়েলার ঠাকুরদাসেরও একটা বিল এসেছে। গ্রেগরির ওয়াইন-স্টোরের বিল এসেছে। কোনও সন্দেহ নেই আরও বিল আসবে, আসতেই থাকবে।

কিন্তু একটা বিল দেখে সন্দীপের চোখের বিস্ময় যেন বুকের ভিতরে গিয়ে থমথম করে। এ কী ব্যাপার ! এষার প্রাণটা যেন ফল্গুর অন্তঃশীলা ধারার মতো একটা কাণ্ড করে বসে আছে। এই বিলটা হল জেন্টস ড্রেসের একটা বিল। বিল পাঠিয়েছে ড্রেসমেকার 'চ্যাম্পিয়ান'। বিলের মধ্যে কোট শার্ট আর ট্রাউজার আছে, আদ্দির আর সিল্কের পাঞ্জাবিও আছে। এষার ভুলো মনের তুফানি কাণ্ড দেখে যা মনে হয়েছিল, তা তো সত্য নয়। যার কাছে আসতে ভুলে যায় এষা, তাকে ভুলে থাকতে পারেনি। তারই জন্য উপহার যোগাড় করে রেখেছে! তবু জিজ্ঞাসা করতে হবে এষাকে : তুমি কেমন করে জানতে পারলে যে, এই মাসের একুশ হল আমার জন্মদিনের তারিখ ?

কিন্তু কী অদ্ভুত এষার ভুলো মনের কাণ্ড ? একুশ তারিখ এসেছে ; সকাল থেকে সন্ধ্যা, তারপর রাত দশটা পর্যন্ত আশায় আশায় অপেক্ষাও করেছে সন্দীপ। কিন্তু কোথায় এষা, আর কোথায়ই বা এষার উপহার ? বড়ঘরের টেবিলের উপর শেরির একটি বোতল আর দুটি গেলাস রেখে ফিরে-আসা ক্যাডিলাকের হর্নের আর ফিরে-আসা এষার হাসির শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে বসে থেকে সন্দীপের নিশ্চল শরীরটাও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দুপুরের রোদে তিন ঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করলেও বোধ হয় মানুষের শরীর এত ক্লান্ত হয় না। আর, দু'মিনিটের স্বপ্নটাও যেন একটা মরে-যাওয়া শোভার ভয়ানক বিশ্রী ছবি। আলমোড়াতে এক ঘণ্টার শিলাবৃষ্টিতে হোটেলের অত বড় ফুলবাগানটার সেই শ্মশানদশার ছবি। ফুল নেই, পাতা নেই, দাঁড়িয়ে আছে শুধু যত নেড়া কাঠির ঝোপ।

॥ ১৫ ॥

চমকে দেবার মত আর আশ্চর্য হবার মত ঘটনার নতুন দৃশ্য প্রায় রোজই দেখতে হচ্ছে। বালিগঞ্জের রায়ভবন যেন এক অন্তহীন নাটকের স্টেজ। সন্দীপের মনে হয়েছে, হ্যাঁ, স্টেজই বটে। সবচেয়ে মজার কথা, এই নাটকে সবাই আছে, শুধু নেই এক সন্দীপ রায়। বাবুর্চি বেয়ারা ড্রাইভার

চাকর আর মালী, ওরাও আজকাল যেন শুধু এক দিদি-সাহেবকে দেখতে পায় আর বার বার সেলাম করে। এষাকে দেখতে পেলে সবাই যেন ক্রীতদাসের মত এক একটি বিনীত ভঙ্গির মূর্তি হয়ে যায়। এষার ডাক শুনতে পেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। সেদিন গ্যারেজের কাছে অচেনা একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দীপকে তেমন কিছু আশ্চর্য হতে না হলেও ভাবতে হয়েছে, কী চায় লোকটা, গ্যারেজের কাছেই বা দাঁড়িয়ে আছে কেন ? লাল জ্যাকেট আর সাদা প্যান্ট, মাথায় সাদা টুপি, কে এই লোকটা ?

বুঝতে দেরি হয়নি সন্দীপের, অচেনা কেউ নয়, খুব চেনা। লোকটা হল ড্রাইভার বাবুলাল। বাবুলালকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারা গেল, নীল রঙের উর্দি দিদি-সাহেবের পছন্দ নয়, তাই বাবুলালের নতুন রঙের উর্দি হয়েছে।

বারান্দার সিঁড়িতে পাথুরে সিংহটার কেশরের উপর বেশ শ্যাওলা জমেছে। দেখতে পেয়ে সেদিন সিংহটার ঘাড়ের উপর একটা পা তুলে দিয়ে আর ঘষে ঘষে শেওলা তুলতে অনেক চেষ্টা করেছে সন্দীপ। কিন্তু তুলতে পারা গেল না। কেশরের খাঁজে খাঁজে শ্যাওলা জমেছে ; সহজে সরবে কেন ?

বিকেলের সব আলো তখনও ফুরিয়ে যায়নি, সন্ধে হতে একটু দেরি আছে। তাই সিংহের ঘাড়ে একটা পা রেখে আর সিগারেট মুখে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সন্দীপ। কিন্তু একটা নতুন দৃশ্য দেখে চমকে উঠতে হয়।

ট্যাক্সি থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক। বেশ ঘষা-মাজা পরিচ্ছন্ন চেহারা। গায়ের পোশাকটা নিতান্ত প্লাস-টু বটে ; শুধু শার্ট আর ট্রাউজার, গরমের দেশে যেটা খুব বেশি চক্ষুশূল নয় ; কিন্তু বিকেলের রোদে ভদ্রলোকের পোশাক যেরকম চিকচিক করছে, তা দেখে ধারণা করতে হয় যে, পোশাকের কাপড়টা সিল্কের ড্রিল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ক্রিম রঙের শার্ট আর বাদামি রঙের ট্রাউজার। ছোট-বড় অনেকগুলো প্যাকেট দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আর বুকের উপর চেপে রেখে ভদ্রলোক এদিকেই আসছেন।

কিন্তু আর অনুমান করবার দরকার হয় না। সন্দীপের মুখের সিগারেটের আগুনটা যেন আশ্চর্য হয়ে আর চমকে চমকে জ্বলতে থাকে। চিনতে আর বুঝতে পেরেছে সন্দীপ, মন্দার এসেছে।

সন্দীপের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় মন্দার। —বেচারা সিংহটাকে ওরকম করে মাড়াচ্ছ কেন ?

সন্দীপ—তবে কি তোমাকে মাড়াব ?

মন্দার হাসে—আমাকে মাড়িয়ে তোমার আর কী লাভ হবে ?

সন্দীপ—কিন্তু তোমার এ দশা কেন ?

মন্দার—খারাপ দশা বলছ ? না, একটুও না। আমি তা মনে করি না। আমি খুব ভাল আছি। আমার এখন বেস্পতির দশা।

সন্দীপ—আমি জিজ্ঞেস করছি, এসব কী ? কিসের বোঝা ?

মন্দার—এসব এষা রায়ের ফরমাশি জিনিসের বোঝা।

সন্দীপ—কিন্তু এসব বোঝা তোমার বইতে হচ্ছে কেন ?

মন্দার—এষা রায়ের ইচ্ছে আর আমারও ইচ্ছে। তিনি নিজের মুখে বলেছেন, তাই তাঁর ফরমাশ খাটছি।

সন্দীপ—তাতে তোমার কী লাভ হচ্ছে ?

মন্দার—বাঃ, লাভ নয় ? অনেক লাভ। দু'দশ টাকা যখনই চাইছি, তখনই তিনি দিয়ে দিচ্ছেন। না চাইতেও দিয়েছেন। তিনি তোমার মত কিপটে মানুষ নন। তিনি এখন বাড়িতে নেই বোধ হয় ?

বলতে বলতে বাড়ির ভিতরে চলে যায় মন্দার। বাড়ির ভিতরে কোথায় কোন ঘরের ভিতরে জিনিসগুলি রাখতে হবে, সবই নিশ্চয় মন্দারের জানা আছে। মন্দারের কথা শুনে আর ভাবভঙ্গি দেখে এখন বুঝে নিতে কোনও অসুবিধে নেই যে, ফরমাশ খাটবার জন্য এ বাড়িতে আনাগোনা করা এখন মন্দারের জীবনের একটা স্বচ্ছন্দ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। গৃহবলিভুক্ পায়রার মত এই মন্দার

এখন এষার বকশিশভুক্ একটি প্রাণী।

দু'তিন মিনিটের মধ্যেই বাড়ির ভিতর থেকে ফিরে আসে মন্দার। সন্দীপ বলে—কিন্তু, এষার কাছ থেকে এরকম পোশাক-টোশাক চাইতে তোমার একটুও লজ্জা হল না কেন, মন্দার?

মন্দার—বিশ্বাস করো, আমি চাইনি। উনি নিজের ইচ্ছেতে দয়া করে দিয়েছেন। নইলে আমার কোনও দরকার ছিল না। আমাকে তো একটা বাঁধিপোতার গামছাতে মানিয়ে যায়।

সন্দীপ হেসে ফেলে—কিন্তু তুমি কি সেটা বিশ্বাস কর?

মন্দার—করি বৈকি। আমি আগে যখন গণেশদার ব্যামাগারে একসাইজ করতাম, তখন আমার এমনই অভাব ছিল যে, একটা শালুর জাঙ্গিয়াও কিনতে পারিনি। অগত্যা বাঁধিপোতার গামছা পরেই প্যারালাল বারে পিকক হতাম, রিং-এ টি হতাম। ব্যামাগারের একটা পুরনো ফটোতে তুমি দেখতে পাবে, জাঙ্গিয়া-পরা মদ্দদের মধ্যে শুধু আমি একা গামছা পরে দাঁড়িয়ে আছি।

চলে যায় মন্দার। সন্দীপ আবার সিগারেট ধরায়। যাক, এতদিনে আর এতক্ষণে একটা অদ্ভুত রহস্যের ঘোর কেটে গেল; ড্রেসমেকার 'চ্যাম্পিয়নে'র সেই বিলের রহস্য। বিলে লেখা পোশাকের ফর্দটা ছিল মন্দারের জন্য এষার খুশিমনের যত বকশিশ-সামগ্রীর ফর্দ।

কোনও সন্দেহ নেই, মন্দার দত্ত একটি বাঁধিপোতা গামছা ছাড়া আর কিছু নয়! এষা সেই গামছা দিয়ে পা মুছে নিচ্ছে। তবু এষাকে একটু বলে দেওয়া উচিত যে, এরকম অদ্ভুত মানুষকে দিয়ে ফাই-ফরমাশ না খাটানোই ভাল। অভাবী ইডিয়টিক মানুষ, ভুল করে কিংবা বোকামি করে কখনও যে কী ক্ষতি করে ফেলবে, তার কোনও ঠিক নেই।

বলি বলি করেও কথাটা এষাকে কোনওদিন বলতে পারে না সন্দীপ, যদিও পুরো একটা মাস পার হয়ে গেল। এক মাসের মধ্যে অন্তত সাতবার এষার সঙ্গে সন্দীপের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছে। গাড়ির কথা, নতুন কার্পেটের কথা, জল বাতাস আর হিট ও হিউমিডিটির কথাও অনেক হয়েছে। কিন্তু ওই সামান্য কথাটা এষাকে বলে দেওয়া আর সম্ভব হয়নি। বললে হয়ত খুবই ভুল বুঝে ফেলবে এষা। হয়ত মনে করে বসবে যে, তার একটা সামান্য দয়া-দাতব্যের ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করে সন্দীপ একটি নিরেট সেকেলে স্বামীর মত স্ত্রীর উপর ওভার লর্ডগিরি করতে চাইছে। মুখে হয়ত কিছু বলবে না, কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হবে। আর এষার সেই চাপা অসন্তোষের চাপে বেচারা মন্দারের সব বকশিশের আশা থেঁতলে যাবে।

ক'দিন পরে একদিন ব্যাংক থেকে বাড়ি ফিরে এসেই মনে হয় সন্দীপের, আজ বোধ হয় বড়ঘরের ভিতরে বড় রকমের কোনও ব্যাপার হবে। বাবুর্চি ফটিক টাটকা ন্যাপকিন কোমরে জড়িয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। শব্দ শুনে বোঝা যায়, বড়ঘরের ভিতরে চেয়ার টেবিল সাজানো হচ্ছে। মস্ত বড় একটা ফুলদান আর ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বেয়ারা বড়ঘরের ভিতরে ঢুকছে।

করিডরের এদিক থেকে ওদিকে হেঁটে বেড়াচ্ছে এষা। বালুচর শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পড়ে মেঝের গা বুলিয়ে চলছে। এষার পায়ের ভেলভেটের চটি মেঝের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলছে। শব্দ না করলেও বোঝা যায়, বালুচরের আঁচল আর ভেলভেটের চটি আজ বেশ উতলা হয়েছে।

সন্দীপকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে এষা—তোমার আর একজন যে বন্ধু আছেন, যার নাম বিনায়ক, ইচ্ছে হয় তো তাঁকে একবার ফোন করে বলে দিতে পারো যে, আজ সন্ধ্যা সাতটায় এখানে যেন আসেন।

সন্দীপ—কেন?

এষা—বিশেষ ব্যাপার আছে।

সন্দীপ—কী?

এষা—খুব ঘটা করে নয়, ছোট্ট করে একটা 'অ্যাজ ইউ লাইক' হবে। যাক, যা তোমাকে বলবার ছিল, বলে দিলাম, তুমি দয়া করে গেস্টদের আসবার একটু আগেই এসো।

সন্দীপ—আর কিছুই কি বলবার নেই?

এষা—না; তোমাকে বলবার মত আর কী কথা থাকতে পারে, ভেবে পাচ্ছি না।

সন্দীপ—আমাকে একটু বলবে তো, আজকের আনন্দের উপলক্ষটা কী?

এষার রঙিন ঠোঁট কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে।—সত্যিই শুনতে চাও ?

সন্দীপ—অবশ্যই চাই।

এষা—তবে শোনো। এষা এতদিনে তার মনের মত আর প্রাণের মত মানুষ পেয়েছে—এই হল উপলক্ষ।

সন্দীপের দুই চোখে, বুকের ভিতরেও একটা রঙিন বিস্ময়ের আবেগ কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে। অন্য কেউ নয়, সত্যিই যে সেই এষা কথা বলছে। সন্দীপের মন-প্রাণ রূপ-গুণ আর রক্তমাংসের সবচেয়ে বড় গর্বটাকে অভিনন্দিত করে কথা বলছে এষা। এষার একটা হাত বুকের উপর তুলে নিয়ে সন্দীপের এখনই বলে দিতে ইচ্ছে করছে যে...কিন্তু কোথায় এষা ?

ব্যস্ত হয়ে চলে যাচ্ছে এষা। যেতে যেতে একটা দুঃসহ অভিযোগের কথা বলছে।—ওঃ, এই অবেলায় গায়ে গরম জল ঢেলে আবার চান করতে হবে। এতবড় একটা একেলে মানুষ হয়েছেন, কিন্তু ঘরে স্টিম-বাথের একটা সরঞ্জাম রাখতে পারেননি।

শুধু আজ নয়, এই ক'মাসের মধ্যে এষা অনেকবার এভাবে আর প্রায় এইরকমের ভাষায় সন্দীপের একেলে অভিরুচির প্রাণটাকে যেন কঠিন একটা ঠাট্টার টোকা দিয়ে কথা বলেছে। বোধ হয় বুঝিয়ে দিতে চায় এষা, সন্দীপ রায়ের একেলে অভিরুচির অহংকারটা এষার কাছে যেন একটা ঘুণধরা আবর্জনা। সন্দীপের জীবনটা নতুন আনন্দের তেষ্টায় দুরন্ত হয়ে কতদূরেই বা এগিয়ে যেতে পেরেছে ? রঙিন পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা লিলি পণ্ড পর্যন্ত, এই তো ! কিন্তু এষার জীবনের তেষ্টা যে অনেক অনেক দূর এগিয়ে যেয়ে মুক্ত মত্ত ও দুরন্ত একটা পাহাড়ি ঝর্নার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। অস্বীকার করে না সন্দীপ। তাই এষার ঠাট্টার টোকায় সন্দীপের মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেও মুখে কোনও প্রতিবাদের ভাষা চঞ্চল হয়ে ওঠে না, উঠতে পারে না।

নতুন করে কিছু আর ভাববার দরকার নেই। এষাকেও কোনও কথা আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই, কোনও লাভও নেই। মোটামুটি একটা নীরব অস্তিত্ব হয়ে পড়ে থাকাই যে এখন সন্দীপের পক্ষে একটা নিরুদ্বেগ শান্তির জীবন, এ সত্যটাকে মনেপ্রাণে মোটামুটি বুঝেই ফেলেছে সন্দীপ।

ঠিকই, আজ সন্দীপের না জানলেও চলত, কেন আর কিসের জন্য বড়ঘরের ভিতরে আজ বিশেষ উৎসবের দরকার হয়েছে। সাতটা বাজবার পনেরো মিনিট আগেই সন্দীপ এসে বড়ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়। বিনায়ক এলেন সাতটার দশ মিনিট আসে।

হেসে ডাক দেয় সন্দীপ—এসো বিনায়ক, ভিতরে গিয়ে বসো।

সাতটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে একসঙ্গে উপস্থিত হলেন পৃথ্বীরাজ, সুরঞ্জন, সুরজিৎ, অনিমেষ আর বলবন্তভাই।

—ওয়েলকাম। সন্দীপের মুখের হাসিটা উচ্ছ্বসিত হয়ে আগন্তুক অতিথিদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানায়।

আগন্তুক অতিথিরা ভিতরের চলে যেতেই হাতঘড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ, সাতটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। আজ বোধ হয় মন্দার আর আসবে না।

সন্দীপের মনের মধ্যে অনুমানের ভাষাটা ফুরিয়ে যেতে না যেতেই দেখতে পায় সন্দীপ, মন্দার এসে গিয়েছে। কিন্তু...এ কী, মন্দারের এ কী রকমের অদ্ভুত সাজ। সিল্কের পাঞ্জাবি আর ফরাসডাঙা ধুতি, মন্দার যেন কোম্পানির আমলের একটি সম্ভ্রান্ত বাঙালিবাবুর মূর্তি।

মন্দারের চেহারাটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। সন্দীপের চোখের তারা দুটো যেন জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু হেসে ফেলে সন্দীপ।—আজ এরকম অপরূপ সাজে সাজবার ইচ্ছে হল কেন, মন্দার ?

মন্দারও হাসতে থাকে।—আমার নিজের ইচ্ছেতে নয়, সন্দীপ। মিসেস রায়ের ইচ্ছেতে। উনি যেমনটি বলে দিয়েছেন, আমি ঠিক তেমনটি সেজেছি।

সন্দীপ—যাও, ভিতরে গিয়ে বসো।

সাতটা বাজতে এক মিনিট বাকি। এইবার সে-ই এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়, যে আজ বড়ঘরের

বিশেষ উৎসবের অধীশ্বরী, এষা। আজ এষার গায়ের শাড়ি আর চোলির আবরণ প্রকারে যেমন খুব রঙিন, আকারে তেমনই খুব সামান্য। এই ছোট্ট চোলি আর একটুখানি শাড়ি যেন ফুলের গায়ের উপর রঙিন পরাগের দুটি ছোপ। সন্দীপের বুকের ভিতরে সব প্রশ্নের সমাধি তো হয়েই গিয়েছে, তবু সমাধিটাই যেন কেঁপে ওঠে। বিস্ময়ের কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বের হয়ে শুধু সামান্য একটা শব্দ করে ফেলে—এ কী ! অদ্ভুত সাজ।

এষা হাসে—এই তো...'ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইক'।

সন্দীপও হাসে।—ভাল, মনে হচ্ছে...অ্যাজ ইউ লাইক করতে গিয়ে শেষে একটা স্ট্রিপ-টিজ করে ফেলবে।

সন্দীপের হাতের উপর মৃদু-লঘু একটা টোকা দিয়ে হেসে ওঠে এষা—ফেললামই বা ; তাতে তোমার তো কোনও ক্ষতি নেই। চলো, ভিতরে যাই।

এষার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে, হেসে হেসে অদ্ভুত এক খুশির আবেগ উচ্ছলিত করে বড়ঘরের ভিতরে ঢুকে গেস্টদের সহাস্য মূর্তিগুলোর দিকে তাকায় সন্দীপ। গেস্টরা হাত তুলে খুশির সঙ্কেত জানায়—ওয়েলকাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, সামান্য একটা কথা বলতে গিয়ে ওরা ওরকম অদ্ভুত স্বরে হেসে উঠল কেন ? ওরা কি কাগজের হংসমিথুন দেখে চমৎকার কৌতুকের হাসি হাসছে ?

ডোভার লেনের হরিপদ প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ অদ্ভুতরকমের ঘুড়ি উড়িয়ে খুব আমোদ জমিয়ে তোলে। উড়ছে ঘুড়ি, কাগজের হংসমিথুন ; হরিপদর হাতের নাটাইয়ের এক একটা অদ্ভুত টানের কায়দাতে কতরকমই না ঢঙ দেখিয়ে ঢলাঢলি করছে কাগজের হংস ও হংসী ! হংসী তার গলা দিয়ে হংসের গলাটি জড়িয়ে ধরছে। হাততালি দিয়ে হেসে উঠছে রাস্তার ভিড়। ঠিকই, কৌতুকেরই দৃশ্য বটে।

বিনায়কের পাশের চেয়ারে বসে আর শেরির গেলাস হাতে নিয়ে দেখতে থাকে সন্দীপ, এষার হাতের গেলাসটাই যেন মাতাল হয়ে বার বার এষার মুখের উপর উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছে। দশ মিনিটের মধ্যে দু'বার গেলাস খালি করে ফেলেছে এষা। এষার চোখ-মুখ বিহ্বল হয়ে কী চমৎকার হাসি হাসছে।

লেডি অব দি লেক ! লেডি অব দি লেক ! হাততালি দিয়ে হেসে উঠছে শেরির নেশার আমেজে আমোদিত অতিথিরা। জানত না সন্দীপ, কোনওদিন জানবার সুযোগও হয়নি যে এষার আবার এরকম একটা উপাধি আছে।

কিন্তু বিনায়ক জানে বোধ হয়, তা না হলে এরকম অদ্ভুতভাবে কেশে কেশে ধোঁয়া ছাড়বে কেন বিনায়ক ?

সন্দীপ বলে—কী বিনায়ক, তুমি দেখছি কথাটা শুনে একেবারে আশ্চর্য হয়ে কেশেই ফেললে।

বিনায়ক—না, একটুও আশ্চর্য হইনি। কথাটা আমি তো নতুন শুনছি না। এর আগে দুবার শুনেছি। একদিন সকালবেলা, একদিন সন্ধ্যেবেলা। লেকের জলে নৌকা বাইছেন এষা রায়, আর ওঁরা সবাই লেকের ধারে দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে আর হেসে হেসে চিৎকার করছেন, লেডি অব দি লেক। লেডি অব দি লেক !

চেঁচিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন পৃথ্বীরাজ—লাফ অ্যাজ ইউ লাইক।

মত্ত হাসির হল্লা জেগে ওঠে। সবাই হাসছে, নানারকম সুরে ও স্বরে ; যেন বিকট এক অপার্থিব জগতের যত হাস্যরসের মিশ্র কাওয়ালি।

সুরজিৎ সামন্ত গেলাস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চেঁচিয়ে উঠলেন—ডান্স অ্যাজ ইউ লাইক।

মেঝের উপর ঘুরে ঘুরে আর হেলে-দুলে একপাক নেচে নিয়ে আবার চেয়ারের উপর বসে পড়লেন সামন্ত।

হাত থেকে গেলাস পড়ে যাচ্ছে। হাতের ঠেলা লেগে কাচের জার উল্টে যাচ্ছে, পড়ছে আর ভাঙছে, ঝন্ ঝন্ ঝন্ ! এই অবিরল তরলতার আবর্তের মধ্যে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনও বা শক্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়ায় শুধু একজন, মন্দার দত্ত। এষার বকশিশভুক প্রাণী সেই মন্দার দত্ত হঠাৎ যেন একটি কঠোর প্রভুত্বের কলোসাস হয়ে উঠেছে। এষার টেবিলের চারদিকে

আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছে মন্দার। তাই এষাকে শুভেচ্ছা জানাবার আবেগময় চেষ্টাগুলি এষার টেবিল থেকে একটু তফাতে থেকে কলরব করছে, এষার টেবিলের কাছে এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে পারছে না। মন্দারের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে ওঠে সুরঞ্জন—থ্যাংক ইউ বডিগার্ড।

হ্যাঁ, বডিগার্ডই বটে। মন্দার দত্তের চরিত্রটা তো সন্দীপের অজানা নয়, নিজের ইচ্ছেতে একটা পছন্দমত কর্তব্য তৈরি করে নেওয়া তো মন্দারের পুরনো অভ্যেস। এই মন্দারই নিজের ইচ্ছেতে বাবুর্চি ও বেয়ারাকে ধমক-ধামক করে এবাড়ির কেয়ারটেকারের একটা কর্তব্য তৈরি করে নিয়েছিল।

কিন্তু বডিগার্ডের একটা অদ্ভুত সাহসের কাণ্ড দেখে চমকে ওঠে সন্দীপ। সত্যিই যে এষার বডিকে গার্ড করছে মন্দার। এরই মধ্যে দু'বার এষার হাত থেকে গেলাস কেড়ে নিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে মন্দার। টলতে টলতে তিনবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এষা, বোধ হয় নাচতে চায় এষা। কিন্তু তিনবারই হাত তুলে এষার ঘাড়টা একটু চেপে দিয়ে এষাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। দেখলে সন্দেহ হয়, এষার ঘাড়ে হাত রাখবার এই দুঃসাহসের কর্তব্যটাও নিজের বুদ্ধিতে তৈরি করে নিয়েছে মন্দার।

ভ্রুকুটি সামলাতে গিয়ে সন্দীপের কপালটা কুঁচকে যায়। হাত তুলে আর তুড়ি বাজিয়ে ইশারা করে ডাকতেই সন্দীপের কাছে এসে দাঁড়ায় মন্দার।—বলো।

সন্দীপ—তুমি ওসব কী খবরদারি করছ ? ম্যানার্স ভুলে যাচ্ছ কেন ?

মন্দার—উনি বলেছেন বলেই খবরদারি করছি।

সন্দীপ—উনি বলেছেন ?

মন্দার—হ্যাঁ।

সন্দীপ—বলেছেন, তুমি আজ আমার কাছে কাছে থাকবে, মন্দার। বেশি বাড়াবাড়ির কোনও ব্যাপার দেখলে তুমি সামলাবে।

সন্দীপ—যাও।

বিনায়কের পাইপ-ধরা মুখটা বড় বেশি ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করেছে, বড় বেশি গাঢ় ধোঁয়া। সন্দীপের চোখের সামনের বাতাসটা যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। তাই আসরের মানুষগুলিকে এক একটা বিকট ছায়াজীবের মত দেখায়।

সন্দীপ—তুমি আজ খুব কড়া টোব্যাকোর ধোঁয়া ছাড়ছ, বিনায়ক।

বিনায়ক—না, না, কড়া টোব্যাকো নয়। আমি আজও আমার পছন্দের সেই ভলকানো ব্র্যান্ড, সেই নিতান্ত মাইল্ড টোব্যাকো কিনেছি, যেটা আমি বরাবর খেয়ে আসছি।

বিনায়কের মাইল্ড তামাকের ধোঁয়াতেই সন্দীপের চোখে বেশ জ্বালা ধরেছে। কটকট করছে চোখ দুটো। তবু দুই চোখের ভুরু টান করে দেখতে থাকে সন্দীপ, ছায়াজীবগুলো একের পর এক এষাকে গুডনাইট জানিয়ে চলে যেতে শুরু করেছে। আর, চেয়ার থেকে উঠেই একটা হাত বাড়িয়ে ডাক দিয়েছে এষা—মন্দার !

কী অদ্ভুত জ্বলন্ত দৃশ্য। কোনও মেঘ ধোঁয়া ছায়া কিংবা আবছায়া দিয়ে ঢাকা দৃশ্য নয়। স্তব্ধ হয়ে বসে দেখতে থাকে সন্দীপ, এক হাতে এষার একটা হাত আরেক হাতে এষার বিলোল কোমরটাকে জড়িয়ে ধরে এষাকে আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এষার এক অদ্ভুত বডিগার্ড। এষার পা দুটো টলছে।

বিনায়কের টোব্যাকোর সব ধোঁয়া যখন সরে যায়, সন্দীপের চোখের সামনের বাতাসটা পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন বুঝতে পারে সন্দীপ, দু'ঘণ্টার মত্ততার আসর এখন একেবারে স্তব্ধ ও শূন্য। যেন জগৎ-ছাড়া একটা স্তব্ধতা ও শূন্যতার এককোণে বসে আছে সন্দীপ। না, পাশের চেয়ারে বিনায়কও নেই। কে জানে কখন কোন ফাঁকে সরে পড়েছে বিনায়ক।

সামান্য দু'চার চুমুক শেরি কতটুকুই বা নেশা ধরিয়ে দিতে পারে ? কিছুই না। না, নেশার ঘোরে নয়, বিশ্রী রকমের একটা তন্দ্রার ঘোরে সন্দীপের সারা শরীর অলস হয়ে ঢুলছে ; মাথাটা বার বার ঝুঁকে পড়ছে ; চোখ দুটোতে তাকিয়ে থাকবার জোর আর নেই। তন্দ্রাটাও যেন ঝন্‌ঝন্ শব্দের ঘোর, মাথার উপর আছড়ে পড়ছে, ভাঙছে আর গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে এক একটা কাচের গেলাস।

দাঁতে দাঁত ঘষে আর দু'চোখের বড়-বড় পাতাগুলোকে বড় বড় কাঁটার মত খাড়া করে কথা বলছে এষা—আমি তো তোমার একেলে অভিরুচির পেট বেশ ভাল ক'রে ভরে দিয়েছি ; তবে আর তোমার কী বলবার আছে ?

—আছে ; একশো'বার আছে !

—না, নেই ।

এষার এক ধমকেই তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। বুঝতে পারে সন্দীপ, মাথার ভিতরটা কটকট করে জ্বলছে, তাই তন্দ্রাটা উত্তপ্ত হয়ে ও আরাম না পেয়ে বার বার ছিঁড়ে যাচ্ছে। বাঃ, খুব চমৎকার অবস্থা ! আজ তন্দ্রাতে এষার ধমক শুনতে হল, কাল স্বপ্নেতে আর পরশু হয়ত মূর্চ্ছার মধ্যে এষার ধমক শুনতে হবে ।

আজকের এই বিচিত্র অ্যাজ-ইউ-লাইক উৎসবের আসরে এষার সঙ্গে সন্দীপকে হেসে হেসে ঢুকতে দেখে বিনায়কও মুখ টিপে হেসেছে আর বলছে—আজ তোমাকে বিশেষ রকমের আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে। সন্দেহ হচ্ছে, তোমার লাইফের একটা হাইপার-রোমান্টিক ব্যাপার আজ হয়ে গিয়েছে কিংবা হবে। তখন বলতে পারেনি সন্দীপ, হ্যাঁ তাই বটে। মাটিতে সাঁতার কেটে পাগল যেরকমের হাইপার-রোমান্টিক আনন্দ পায়, আমিও সেইরকম আনন্দ পেয়েছি।

বাবুর্চি ফটিক দু'বার দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে চলে গেল। হাতঘড়ির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। যেন নিদারুণ এক সংকল্পের দুটি কঠোর চক্ষু হিসেব করে বুঝে নিচ্ছে ; আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে দুঃসহ একটা ধৈর্য ধরে রাখতে চেষ্টা করছে। না, এখন নয়। রাত আরও গভীর হোক।

ধৈর্য ধরে বসে থাকতে গিয়ে আবার তন্দ্রার মত একটা আবেশ এসে চোখ দুটোকে জড়িয়ে ধরে, যদিও মাথার ভিতরে কটকটে জ্বালাটা একটুও শান্ত হয়নি। সন্দীপের একটা হাত হিংস্র জন্তুর থাবার মতো ভঙ্গিতে কপালটাকে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে।

একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে সন্দীপ, মুখ তুলে আর চোখ খুলে বড়ঘরের দরজার দিকে তাকায়। কিসের শব্দ ? গাড়ির শব্দ নাকি ? ক্যাডিলাক কি কাউকে নিয়ে বাইরে চলে গেল ? শব্দটা যেন সন্দীপের তন্দ্রাটাকে মাড়িয়ে দিয়ে আর ভেঙে দিয়ে পালিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে সন্দীপের বুকের ভিতরে ধৈর্যধরা অপেক্ষার নিঃশ্বাসটা যেন ফুঁসে উঠে শব্দ করে—রাত কত হল ?

হাতঘড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ। রাত দুটো। না আর অপেক্ষা নয়। আর ধৈর্য নয়। আর সহ্য করা উচিত না। এই মুহূর্তে একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক। সে নিষ্পত্তির জন্যে যদি মেয়েমানুষটার গলা টিপে ধরতে হয়, জিভ উপড়ে ফেলতে হয়, লোহার রডের এক আঘাতে তাহিতি ঠোঁট থেঁতলে দিতে হয়... ।

এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে এষার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায় সন্দীপ ! দরজার গায়ে লাথি মেরে চেঁচিয়ে ওঠে —খোলো ।

খুলে যায় দরজা। ঘরের ভিতরের নিবিড় নীল কুহেলিকার মত আলোটার এক ঝলক আভা খোলা দরজা দিয়ে করিডরের মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে। ঘরের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে সেইখানে এসে দাঁড়ায় নিশীথ-সুখের একটি আলোড়িত মূর্তি, এষা। এষার ঢিলে পায়জামা যেমন শিথিল, তেমনই শিথিল এষার গায়ের ঢিলে জ্যাকেট। জ্যাকেটের তিন বোতাম-ঘরের দুটিই খোলা, বেল্ট আলগা হয়ে ঝুলছে। এলোমেলো চুলের একটা ছন্নছাড়া কার্ল কপালের উপর ছেঁড়া দড়ির মত ঝুলছে, এষার মাথাটা যেন এইমাত্র একটা ঝড় সহ্য করেছে। আর তাহিতি ঠোঁটের উপর দিয়ে নিশ্চয় একটা প্লাবন বয়ে গিয়েছে, নইলে নন-স্মিয়ার লিপস্টিকের রং এমন করে গলে যাবে আর ছড়িয়ে পড়বে কেন ?

—ঘরের ভিতর কে ? চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ ; আহত বাঘের হৃদ্‌পিণ্ড থেকে আক্রোশের একটা গর্জন উথলে উঠেছে ।

—চেঁচাবে না, আস্তে কথা বলো । —খুব শান্ত, খুব মৃদু, নিষ্কম্প স্বর ।

শিউরে ওঠে সন্দীপ। সন্দীপের কণ্ঠনালীর উপর যেন ভয়ানক শক্ত একটা লাঠির বাড়ি পড়েছে,

ভাষা থেঁতলে গিয়েছে, স্বর ছিঁড়ে গিয়েছে। নীরব হয়ে এষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এষা—কী বলছিলে, বলো!

সন্দীপ—তোমার ঘরে কে?

এষা—কেউ নেই।

সন্দীপ—আছে।

এষা—এখন নেই। এতক্ষণ ছিল।

সন্দীপ—কে ছিল?

এষা—মন্দার ছিল।

সন্দীপের চোখের তারা একবার শিউরে উঠেই কুঁচকে যায়। বুকের উপর হাতুড়ি পড়ছে; ফুসফুসটা তাই চুপসে গিয়েছে। আর টিপটিপ করে না বুকটা।

এষার শান্ত চোখের দুই ভুরু প্রজাপতির পাখার মত দুলতে থাকে।—এই সামান্য একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এরকম একটা অসময়ে তেড়ে এলে কেন?

সন্দীপ—কী বললে! সামান্য কথা?

এষা—হ্যাঁ। দেখতে পাওনি, মন্দার যে এইমাত্র চলে গেল?

সন্দীপ—না।

এষা—কেন? বাবুর্চি ফটিক দেখেছে, বেয়ারা অনাদি দেখেছে, মন্দার চলে গেল। গাড়ির শব্দ শুনে মালী জেগে উঠেছে আর গেট খুলে দিয়ে দেখেছে, মন্দার চলে গেল। ওরা তো রোজই দেখছে। তবে তুমি কেন কিছুই দেখতে পেলে না?

সন্দীপ—কার হুকুমে রোজ গাড়ি ক'রে মন্দারকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়?

এষা—আমার হুকুমে।

সন্দীপ—গাড়িটা তোমার নয়।

এষা—তোমারও নয়। ওটা চারুশীলা রায়ের গাড়ি।

সন্দীপ—মন্দার তো একটা জানোয়ার।

এষা—খাঁটি জানোয়ার, মেকি মানুষ নয়।

সন্দীপ—তুমি এবাড়ি ছেড়ে এখনি চলে যাও।

এষা—এটা চারুশীলা রায়ের বাড়ি, তোমার বাড়ি নয়। তোমার কথায় আমি এবাড়ি ছাড়তে পারি না।

সন্দীপ—আমি তোমাকে ডিভোর্স করব।

এষা—খুব ভাল কথা।

সন্দীপ—তা হলে চলে যাও।

এষা—না, আদালত যতদিন না ডিভোর্স মঞ্জুর করে, ততদিন আমি এখান থেকে নড়ব না।

সন্দীপ—কেন?

এষা—আমার ইচ্ছা। কিংবা দশ লাখ টাকা দাও, এখুনি চলে যাচ্ছি। নইলে যাব না।

সন্দীপ—আমি তা হলে...।

সন্দীপের দুই চোখের তারা, দুটো ঠাণ্ডা অঙ্গারের কুচি, হঠাৎ দপ ক'রে জ্বলে ওঠে।—আমি তা হলে তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলব।

এষা—পৃথ্বীরাজ তা হলে এক গুলিতে তোমার খুলি উড়িয়ে দেবে। সুরঞ্জন এক গুলিতে তোমার বুক ফুটো ক'রে দেবে। আর অনিমেষ তোমার...।

সন্দীপ—ওরা তো চোরাই সোনার কারবারি, যত স্মাগলার!

এষা—তুমিও তো ফরেন কারেন্সির স্মাগলার।

না, আর এষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না সন্দীপ। একবার করিডরের ওদিকে, একবার সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে শুধু ছটফট করে। যেন মাথা ঠুকবার জন্যে এই পৃথিবীর সীমার বাইরে কোনও পাষাণের কাছে ছুটে যেতে চাইছে। থরথর করে কাঁপতে থাকে সন্দীপ, যেন প্রচণ্ড

বেগের একটা ঝড় এসে সন্দীপকে ঠেলছে। চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ।—আমি তা হলে আত্মহত্যা করব।

হেসে ফেলে এষা। ইস্পাতের বাঁশির শিসের মত কী তীব্র সেই হাসির শব্দ।—তোমার কী আত্মা আছে যে, আত্মহত্যা করবে ? বাজে কথা, মিথ্যে কথা, বাচ্চা ছেলের আবদেরে বায়নার কথা। ভাল চাও তো চুপ ক'রে চলে যাও, আর ভাল ছেলেটির মত চুপ করে ঘুমিয়ে থাকো।

সেই মুহূর্তে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে, আর খোলা দরজা আবার বন্ধ করে দেয় এষা। ব্যস্ত হয়ে নয়, শব্দ করে নয়, দরজার কপাট দুটো যেন স্টেজের দু'পাশের দুটি কাটা পর্দার মত আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে জুড়ে গেল।

কিন্তু বেশ শব্দ করে বেজে ওঠে সন্দীপের ঘরের টেবিলের একটা দেরাজ। দৌড়ে এসে ক্ষিপ্র হাতের এক টানে দেরাজ খুলে রিভলভার হাতে তুলে নিয়েছে সন্দীপ।

চেয়ারের উপর একেবারে ধীর-স্থির পাথুরে মূর্তির মত বসে থাকে সন্দীপ। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। ছটফট করে উঠে দাঁড়ায়, লাথি মেরে চেয়ারটাকে সরিয়ে দেয়। শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আবার ছটফট করে, সরে গিয়ে রঙিন ভেলভেট দিয়ে মোড়া ছোট সোফাটার কাঁধ এক হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু চোখের সামনে ওই মিররের ঝকঝকে চেহারাটাকে সহ্য করতে পারে না। ঘব ছেড়ে আবার করিডরের উপর এসে দাঁড়ায়। না, এখানে নয়। রঙিন মোজেয়িকের উপর যেন এক খল হাসির পালিশ চিকচিক করছে। না, এখানে নয়। সরে যায় সন্দীপ ! দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যায়। সন্দীপের দু'পায়ের দুপদাপ শব্দটা মত্ত হয়ে তেতলার করিডর ও বারান্দার উপর ঘুরতে থাকে।

ছোট একটা ঘর, সে ঘরের দরজাটা তালাবন্ধ নয়, একটা কপাট খুলেই রয়েছে। ঘরের ভিতরে অন্ধকার। ঠিক জায়গা। বুকটাকে চোখে পড়বে না, কিছুই চোখে পড়বে না, তাই ছটফটও করতে হবে না।

কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকেই ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে সন্দীপের বুক। অন্ধকারের মধ্যে মেঝের ওপর ছোট একটা বিছানাকে মাড়িয়ে ফেলেছে সন্দীপ। ভুতুড়ে ঘর, কী ভয়ানক ভুতুড়ে ঘর। এটা তো সেই আকাশ-ঘব ! মানুষ নেই তবু তার বিছানাটা পড়ে আছে। শূন্য ঘরের ভিতরে এই জমাট অন্ধকারটা যেন একটা জমাট অভিশাপ, এখনই চেঁচিয়ে একটা বিকট হাসি হেসে কথা বলে ফেলবে, তুমি এখানে কেন ?

এক লাফে ঘরের দরজা পার হয়ে আর ছুটে গিয়ে, বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে হাঁপ ছাড়ে সন্দীপ।

চুপ করে, একটা নিশ্চল আবছায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকে সন্দীপ। সত্যিই তো, হত্যা করবার জন্যে এতক্ষণ ধরে এত ছুটোছুটি করে আত্মাটাকে খোঁজা হল। কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। মিথ্যে হয়রান হতে হল।

অলস হাত, ক্লান্ত, হাতের কব্জিতেও কোনও জোর নেই। কপাল বেয়ে ঠাণ্ডা ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। রক্তের শিরাগুলির ভিতরে হিম ঢুকছে। রিভলবারটা বোধ হয় ঝুপ করে হাত থেকে খসে পড়বে।

আকাশে তারা নেই। গাছের মাথা নড়ে না, বাতাসের সাড়া নেই। তবু একটা ঘুম-ভাঙা কাক যেন ডাক ছাড়তে না পেরে কঁকিয়ে উঠছে।

না, আর এখানে মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থাকবার কোনও অর্থ হয় না। রাত বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। সিঁড়ি ধরে এক পা দু'পা করে আস্তে আস্তে নেমে যায় সন্দীপ। নিজের ঘরে ঢুকে দেরাজের ভিতরে রিভলবার রেখে দিয়ে, রঙিন ভেলভেটে মোড়া সোফার উপর বসে পড়ে আর অবশ শরীরটাকে এলিয়ে দেয়।

মিষ্টি হাসির শব্দটা সেতারের তারের ঝঙ্কারের মত বেজে উঠেছে। সন্দীপের ঘুম ভেঙে যায়, চোখ মেলে তাকায়। দেখতে পায় সন্দীপ, এষা হাসছে। এষার গায়ের ফিরোজা-নীল শিফনের শাড়িটাও হাসছে। এষার হাতে একটা খবরের কাগজ দুলছে।

সন্দীপের কাঁধ ছুঁয়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে, হাসির সেতার আবার বেজে ওঠে।—আমি ভাবছি, এরকম একটি সুন্দর মানুষের এত স্টাউট একটি শরীরের ভিতরে কী হাড়গোড় নেই? থাকলে এরকম করে কেন্নোর মত গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে থাকতে পারবে কেন?

সন্দীপ—কী হল?

এষা—ওঠো, সোজা হয়ে বসো।

হেসে ফেলে সন্দীপ। ঘাড় টান করে আর সোজা হয়ে বসে।

এষা—সোফা থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াও।

গা-মোড়া দিয়ে আর হাই তুলে নিয়ে হাসতে থাকে সন্দীপ। সোফা থেকে নেমে দাঁড়ায়।

এষা—ছি ছি, কী কাণ্ড! বাচ্চা ছেলেও ভুল করে এভাবে একটা সোফার উপর শুয়ে থাকতে আর ঘুমিয়ে পড়তে পারে না।

সন্দীপ—ক'টা বেজেছে?

এষা—ন'টা বেজে গিয়েছে।

সন্দীপ—এঃ! তা হলে তো সত্যিই বেশ নিবিড় একটা ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েছি।

এষা—আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি রাতটার উপর রাগ করে সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিলে?

সন্দীপ—না না, রাতটার উপর রাগ করব কেন! এমন কিছু অগ্নিকাণ্ড করেনি তো রাতটা যে, রাগ করতে হবে।

এষা—সত্যি করে বলো।

সন্দীপ—তুমি সত্যি করে বলো তো, তুমি কি বালুচরের উপর রাগ করে শিফন পরেছ?

এষার হাসিটা ভোরের পাখির কাকলির মত বেজে ওঠে—না, তা কেন হবে?

সন্দীপ—তবে? এরকম কথার কি কোনও মানে হয়?

এষা—তবে আর আমাকে অবাক করে দিও না। মুখ ধুয়ে নাও, চা খেয়ে নাও। সাজ-টাজ সেরে তৈরি হয়ে নাও। ফটিককে বলে দিয়েছি, এখনি তোমাব ব্রেকফাস্ট এখানে দিয়ে যাবে।

ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায় এষা। মুখ ফিরিয়ে কথা বলে।—আজ আমি এবেলা কোথাও যাব না। তুমিই আজ ক্যাডিলাক নিয়ে বের হবে।

সন্দীপ—কেন বলো তো?

এষা—আমি ফোনে মুরারিবাবুকে বলে দিয়েছি, তুমি আজ ব্যাঙ্কে যাবে না।

সন্দীপ—কেন বলো তো?

এষা—বলছি, তুমি তৈরি হয়ে এসো তো। আমি ড্রইংরুমে আছি।

সন্দীপের তৈরি হতে আর ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। এরই মধ্যে নীচতলার ড্রইংরুম থেকে দু'বার রিং করেছে এষা—একটু তাড়াতাড়ি করো, আর দেরি করো না।

সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাইটা হাতে তুলে নিতেই আবার শুনতে হয়, রিং করছে এষা।—তোমার চেক-বইটা সঙ্গে নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি করো।

চলতে চলতে সিগারেট ধরিয়ে আর তাড়াতাড়ি হেঁটে নীচতলার ড্রইংরুমের দরজার কাছে সন্দীপ এসে পৌঁছতেই এষা বলে—তাড়াতাড়ি করতে বলছি এই কারণে যে, ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবার সময় হল আটটা থেকে দশটা।

সন্দীপ—কে ভদ্রলোক?

এষা—বলছি। চলো গাড়িতে বসো, তারপর সবই বুঝিয়ে বলছি।

ক্যাডিলাকের চকচকে বডি হাসছে। দেখতে পেয়ে, সন্দীপের খুশি চোখের তারা দুটো যেন

হেসে হেসে চিকচিক করে। গাড়িতে উঠে দু'হাতে স্টিয়ারিং হুইলটাকে জড়িয়ে ধরে সন্দীপ। —বলো।

এষা। —শোনো।

হাতের খবর-কাগজটা সন্দীপের চোখের সামনে স্টিয়ারিং হুইলটারই উপর রেখে দিয়ে, লাল পেন্সিলের একটা দাগ সন্দীপকে দেখিয়ে দেয় এষা। —বিজ্ঞাপনটা একবার পড়ে নাও।

চার লাইনের একটা বিজ্ঞাপন। রিচি রোডের একটা নতুন বাড়ির একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া নিতে হলে ল্যান্ডলর্ডের সঙ্গে সকাল আটটা থেকে দশটার মধ্যে দেখা করে কথা বলতে হবে।

সন্দীপ—পড়লাম।

এষা—তুমি এখনই গিয়ে এই ফ্ল্যাট ভাড়া করে ফেলো। যদি সেলামি চায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সেলামির টাকাও দিয়ে দিও।

সন্দীপ—কিন্তু কেন বলো তো ? কিসের জন্যে ?

এষা—মন্দারের জন্যে। হাওড়ার একটা এঁদো গলিতে মন্দারকে আর পড়ে থাকতে দেওয়া চলে না, উচিতও নয়।

সন্দীপ—তাই বলো।

গাড়ি স্টার্ট করে সন্দীপ। এষা বলে—তারপর মন্দারের জন্যে কিছু ফার্নিচার কিনে ফেলবে, একটা লোকের দরকার আর কম্ফোর্টের জন্য যা দরকার। দেখবে, ফার্নিচারের সবই যেন বার্মা সেগুনের হয়।

সন্দীপ—আচ্ছা।

চলতে থাকে গাড়ি। এষা বলে—মন্দারের জন্যে একটা রেনকোট কিনবে। দেখবে, জিনিসটা দেখতে ভাল হয় আর মজবুতও হয়।

সন্দীপ—আচ্ছা।

অনেকদিন পর আবার সন্দীপের জীবনে ছুটোছুটি করবার একটা তাগিদ এসেছে, একেবারে নতুন তাগিদ। কিন্তু ক্যাডিলাক কেন যেন ঠিক সেই স্পিড আর নিতে পারছে না, যদিও খুব স্পিড নিয়ে সন্দীপের হাতের এক একটা সিগারেট তিন-চার টানেই জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এষার ইচ্ছা আর অনুরোধের তিনটি কাজ শেষ করতে তিন ঘণ্টাও সময় লাগে না। তারপর ? এষা তো আর কোথাও যাবার কথা বলেনি। তারপর কোথায় যাবে সন্দীপ ?

বেলা একটা বেজেছে। নতুন-কেনা রেনকোটের মস্ত বড় প্যাকেটটা হাতে নিয়ে চৌরঙ্গির একটি শোভাময় বিরাট বিপণির বাইরের সিঁড়ির শেষ ধাপের উপর দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে সন্দীপ, কোথায় যাওয়া যায় ? যাওয়ার মত জায়গা এই পৃথিবীতে কোথাও নেই, এ তো হতে পারে না। কিন্তু কোথায় ?

হ্যাঁ আছে। আবার বিপণির ভিতরে গিয়ে বিপণির সার্ভিস কাউন্টারের টেলিফোনে কথা বলে সন্দীপ। —বিনায়ক, এক মিনিটও কালক্ষেপ না করে আর ট্যাক্সি করে চলে এসো। আমার বর্তমান ঠিকানা, কলরডো বারের যে কোনও একটি কেবিন। বিয়ারের সঙ্গে হুইস্কি মিশিয়ে একটু তর্পণ করব। চলে এসো।

এরপর আর কতটুকুই বা সময় লাগে ? মাত্র আধ ঘণ্টা। কলরডোর দোতলায় বারের একটি কেবিনের নিভৃতে সন্দীপ আর বিনায়কের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে দুই গেলাসের হুইস্কি মেশানো বিয়ারের বুদ্বুদ শিউরে শিউরে ফেটে যেতে থাকে।

বিনায়ক বলেন—না, এই জীবনটা কিছুই নাঃ, একটা ইঃ, উঃ আর আঃ।

সন্দীপ—এটা তো সিনিকের কথা। যে মানুষ জীবনে ভাল কিছুই পেল না, ভাল কিছুই দেখতেও পেল না, আর তার সব আশা বিফল হয়ে গেল, এরকম একটা পরাজিত মানুষের কথা।

বিনায়ক—আমিও তো তাই বলছি। আমি বলছি, এটা হল ব্যাঙ্কের মুরারিবাবুর জীবনের কথা। স্ত্রী মৃত্যুর পর খুব আশা করেছিলেন যে, সুন্দরী ছোট শালীটিকে বিয়ে করবেন। কিন্তু আশা বিফলে

গেল। ছোট শালী জনৈক ছোকরা ডাক্তারকে বিয়ে করে ফেলেছে। মুরারিবাবু এখন বলছেন, তীর্থে যাব, সংসারকে বিষ বলে মনে হচ্ছে।

সন্দীপ—আমি বলতে চাই, জীবনে সে-ই হল সত্যিকারের জয়ী মানুষ, যার ভালবাসা জয়ী হয়েছে।

বিনায়ক—ওঃ, কী সুন্দর কথা। তুমি সত্যিই কত চমৎকার করে খুব অল্প কথায় বড় বড় কঠিন আইডিয়ার কথা কত সহজে বলে দিতে পার! আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে শুনি।...কিন্তু, এ যে তোমার নিজেরই কথা বলে ফেলেছ সন্দীপ। তুমি কি মনে করো যে, আমি সেটা বুঝতে পারি না? আমি কি এতই বোকা একটা ইন্টেলেকচুয়াল?

সন্দীপ—আমার বলতে কোনও কুণ্ঠা নেই, এষার ভালবাসা আমাকে সত্যিই আশ্চর্য করে দিয়েছে।

বিনায়ক—আশ্চর্য হবারই কথা। আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, সে ভালবাসার তুলনা নেই। তবু যদি তুলনা করে বলতে হয়, তবে...না, সোনার মত ভালবাসা বলব, না, কারণ সোনাতেও দাগ পড়ে। বলব, হীরের মত ভালবাসা, কোনও দাগ পড়ে না।

সন্দীপ—আমি তোমার মত অত কাব্যি করে কথা বলতে পারি না। তবু বলব, এষার মনের ভিতরে যেন একটা আলো আছে।

বিনায়ক—আছে নিশ্চয়।

সন্দীপ—সেকেলে মেয়েরা যেমন পিদিম জ্বেলে স্বামীর মঙ্গলের ব্রত করত, এষার ভালবাসাও তেমনই...যাকে বলে...।

বিনায়ক—যাকে বলে, সেকেলে পিদিমের আলোর মত জ্বলছে আর স্বামীর মঙ্গলকামনা করছে।

সন্দীপ—হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই দাঁড়িয়েছে বিনায়ক। আমি বুঝতেই পারিনি যে, এষার প্রাণের ভিতরটা একেবারে...যাকে বলে...একটা স্বামী-জ্ঞান স্বামী-ধ্যান সেকেলে মেয়ে।

বিনায়ক—তুমি যে আগে কিছু বুঝতে পারনি, সেটা আমি খুবই বুঝতে পেরেছিলাম। ভাবতে গিয়ে খুব রাগ হত যে, তুমি কেন কিছুই বুঝতে পারছ না?

সন্দীপ—যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল।

বিনায়ক—আমি বলব, যার শুরু ভাল আর শেষও ভাল, তারই ভাল সবচেয়ে ভাল ভাল।

হেসে হেসে যেন লুটিয়ে পড়তে চায় সন্দীপ—তুমি একটা সিরিয়স চিন্তার কথাকেও কত সহজে হাসিয়ে দিতে পার, বিনায়ক। অদ্ভুত!

বিনায়ক—তুমি হাসতে পারো, কিন্তু আমি সিরিয়স কথা সিরিয়স করেই বলছি। সফল ভালবাসার মানুষ আমি আমার জীবনে একটিই দেখেছি।

সন্দীপ—কে সেই ভাগ্যবান?

বিনায়ক—তুমি। মনে করো না যে, আমি তোমাকে একটু তোয়াজ করে কথাটা বলছি। দেশি এপিক-এ কচ-দেবযানীর ভালবাসার গল্প আছে। গ্রেট অ্যান্ড গ্র্যান্ড ভালবাসা। কিন্তু সে ভালবাসার দশা শেষে কী দাঁড়াল? বিয়ে তো হলই না, তার উপর একদিন দু'জন দু'জনকে গালমন্দ করে আর অভিশাপ দিয়ে দু'দিকে সরে গেল। কিন্তু এখানে কী দেখছি? একজন আর একজনকে চিরকালের মত আপন করে নিয়েও ভাবছে, কী করে আরও আপন করা যায়।

সন্দীপ—সত্যি বিনায়ক, আমার বলতে লজ্জা নেই, এষা আমাকে এক মিনিটের জন্যেও কাছছাড়া করতে চায় না।

বিনায়ক—বুঝেছি বুঝেছি, তুমি এখন নোঙর-বাঁধা জাহাজ, মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াবার সাধ্যি এখন নেই।

সন্দীপ—আরও একটা কথা শুনলে বোধ হয় তুমি লজ্জা পেয়ে আশ্চর্য হবে। আমারও আর বাইরে বেড়াতে কিংবা বের-টের হতে ইচ্ছে করে না।

বিনায়ক—এই রকমই হয়, সন্দীপ। ভালোবাসা এমনই একটি বন্ধন। যা-ই হোক, বাইরে কোথাও না যাও, অন্তত এখানে মাঝে মাঝে এসো। আর, বিনায়ক হালদার নামক বন্ধুটিকে মনে

রেখো, একেবারে ভুলে যেও না।

সন্দীপ—না না, ভুলে যাব কেন, আসব, মাঝে মাঝে এখানেই আসব। আজ তবে এখন...।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ।

বিনায়কও উঠে দাঁড়ায়।—হ্যাঁ, এখন বেদব্যাস বিশ্রাম করুক। আমরা চলি। কিন্তু...।

সন্দীপ—কী ? কিছু বলতে চাও ?

বিনায়ক—হ্যাঁ, তোমার হাতে এটা কী বস্তু ?

সন্দীপ—মন্দারের জন্য একটা রেনকোট কিনলাম।

বিনায়ক—অ্যাঁ ? কী বললে ? কার জন্যে কিনলে।

সন্দীপ—মন্দার, মন্দারের জন্যে।

বিনায়ক—ওঃ ওঃ, কী আর বলি ! কিছুই বলা যায় না। অনির্বচনীয় !